

নব্যভারত

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

সপ্তবিংশ খণ্ড—১৩১৬।

কলিকাতা,

২১০/৫ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, নব্যভারত-প্রেসে,
শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও ২১০/৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ৩/ তিন টাকা।

নব্যভারত।

সপ্তবিংশ অঙ্ক।

১৩১৬

আমরা ও তাঁহারা।

নির্মেষ আকাশে কি উজ্জ্বল কিরণছটাই
খেলিতেছিল; মদিরা-বিভোর লোকের ভায়,
ঐ ছোঁয়াতি-বিভোর অলস প্রাণ নিভুতে
চলিয়া চলিয়া পড়িতেছিল;—আবার স্নিগ্ধ-
তায়, আবার জীমূত-গর্জনে, আবার মায়ের
আহ্বানে সে যে জাগিবে, সে আশা ছিল না।
সেই সংসার-বিতৃষ্ণা আজ কোথায়?

আমরা মন্দিবার জগ্ৰহ প্রস্তুত হইতে-
ছিলোঁ, সকল আশা যখন কালের স্রোতে
ভাসিয়া গিয়াছিল, বহুদিনের কঠোর সাধনার
পরেও, যখন গোলামীতেই এদেশ ভুবিতে-
ছিল, তখন, আমরা, নিরাশার তিমিরে আত্ম
সমর্পণ করিয়া, মৃত্যুর জগ্ৰহ প্রস্তুত হইতে-
ছিলাম। চতুর্দিকে জাগিতেছিল, কেবল
নিরাশা এবং কেবল নিরাশা। সাহিত্য-জগৎ
হইতে যখন একে একে অক্ষয়কুমার, মাই-
কেল, বিজ্ঞানসুগর, ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ,
হেমচন্দ্র গেলেন, তখন জাগিল কেবল নিরাশা;
ধর্ম-জগৎ হইতে যখন কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ,
বিবেকানন্দ, প্রতাপচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথ গেলেন;
তখন নিরাশা জাগিল; রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্র হইতে
যখন রামগোপাল, হরিশচন্দ্র ও কৃষ্ণদাস

গেলেন, তখন জাগিল কেবল নিরাশা, আর
নিরাশা! যখন বঙ্গ নিরাশার ঘনাকারে
আচ্ছন্ন, তখন শিবাদল ও পেচকের নৃত্য
আরম্ভ হইল, আবেদন-নিবেদনের দ্বিধাজরী
প্রতাপে চতুর্দিক প্রকম্পিত হইল। তখন
নিরাশায় এদেশের কবি গাহিলেন—

“তোমরা ব্রিটিশ জাতি, পবিত্র উৎসাহে মাতি
ধরার দাসস্বগ্রথা করিলে বারণ,
তোমাদেরই পদতলে, তোমাদেরই ছায়াতলে,
ভারত দাসত্বে আজ হশো নিমগন।”

এবং চতুর্দিকে জাগিয়া উঠিল,—“আমরা
নাই, আমাদের কোন কর্তব্য নাই, কেবল
তোমরা আছ, তোমরা যাহা করিতে হই,
কর।” আর্জুনাদ উঠিল—“আমাদের ঘরের
দ্বারের লোক না খাইয়া মরিতেছে, ওগো
তোমরা কি করিতেছ, রক্ষা কর,
আমাদের গৃহ-কোণে ম্যালেরিয়ায় পূরঞ্জী
মৃতবৎ, ওগো কোথায় তোমরা, উদ্ধার
কর।” এইরূপ কত নিবেদনের কাহি-
নীই কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল! হারু-
এব্রাহিম লিঙ্কন, তুসি-জীম্বুও থাকিলে, কি
এরূপ ভারতকে দাসত্ব হইতে উদ্ধার করিতে,

নির্লজ্জ বেল্লিকের দল তাঁহাদের হস্তে কর্তব্যের ভার ত্রুস্ত করিয়াই মহাযুগ্মে আত্মসমর্পণ করিল। তবুও “আমরা আছি” যাহারা বলে, তাঁহারা বেল্লিক হইতেও মহাবেল্লিক ! যাহাদের কোন কর্তব্য ছিল না, তাহারা কি জাগিয়াছিল ? এ জগতে যাহার কোন কাজ নাই, সে কেন বাঁচিবে ? অসম্ভব কথা,—তখন সব মহা সুস্থিতিতে নিমগ্ন হইয়াছিল। চীৎকার, আন্দোলন, বিকটধ্বনি যাহা কিছু স্তনীৰ্যকাল এদেশে শুনিয়াছে, সে সব বিকারের সম্মোহন-ধ্বনি। এই অবস্থায়, এদেশ, কি জানি কেন, বিধাতার ক্রপা-কণিকা বর্ষিত হইল, অলপ্পী-মহুরা দুর্জয় কর্জন-কৈকিরীর কর্ণে কি মদিরা ঢালিয়া দিল, অমনিই সর্প গজ্জিয়া উঠিল, ঢাকাতে ষষ্টি-ফণা ঘুরাইয়া কর্জন যে বিষ ঢালিয়া আসিলেন, তাঁহাতে বিকারের রোগীর বিষ প্রয়োগ হইল;—সুপ্ত ব্যক্তি চক্ষু মেলিয়া চাহিল,—আরো কত কি করিল ! সে সব কথা তোমরাও জান, তাঁহারাও জানেন, স্ততরাং আর পুনঃ পুনঃ লিখিয়া প্রয়োজন নাই। তার পর—কত কুস্তকর্ণ জাগিয়া প্রাণ দিল ! তাহা দেখিয়া পৃথিবী আজ বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিতেছে—ভারতে কি হইতেছে ?

আমরা এ কথার কি উত্তর দিব ? উত্তর দিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু লেখনী চলিতে চাহে না;—কেননা, আমাদের উত্তর কাহারও ভাল লাগিবে না। সম্মোহিত জাতির লোকের নিকট অপ্রিয় কথা ভাল লাগিবার নয়। গুরুজি গুপ্ত বিলাতে বড় চাকরী পাইলেন, অর্থাৎ পাকা গোলামীতে মজিলেন, আনন্দে এদেশ বিভোর; কিন্তু তিনি স্বদেশের কি উপকার করিয়াছেন, কেহ তাহা আজিও জানে না।—শিখজি শ্বখোপধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশ কৈামরে হাণিয়া দেশের সর্বনাশ-সাধনে বদ্ধ-

পরিকর হইলেন, এদেশ হাসিয়াই অস্থির ! আর আজ—দুঃখের উপর দুঃখের মসীমান কাহিনীতে দেশ আচ্ছন্ন, তবু, সত্যপ্রসঙ্গের বড় গোলামীর পদপ্রাপ্তিতে এদেশে আনন্দের উপর আনন্দের কোলাহল চলিতেছে; লোকেরা হাসিবার আর অবসর পাইতেছে না ! মহা গোলামীর মহা ইচ্ছা ! দেশ, স্ততরাং, মহানন্দে আজ বিভোর !! জেলায় জেলায়, দেশে দেশে কত হাহাকার—কত নির্বাসন, কত নির্ধ্যাতন, কত অপমৃত্যু—কিন্তু দেশ আজ আনন্দে বিভোর ! রিপনের স্বায়ত্ত-শাসনের ইতিহাস কি ঘোষণা করিতেছে ? লেজিসলেটিব-সভাসমূহে দেশী সভ্যদের দ্বারা কি উন্নতির ইতিহাস লিখিত হইতেছে ? মেটা বা গোথলের প্রতিভা কোথায় ক্ষুরিত হইল—? কি কাজে লাগিল ? সে সব কে না জানে, কিন্তু তবুও দেশ সম্মোহিত,—হাসিয়াই পাগল ! সদলে, দিগ্বিজয়ী গ্লাডস্টোন, হোমরুল দিতে অক্ষম হইলেন, বহুবিরোধী সভ্যের মধ্যে একাকী সত্য-প্রসঙ্গ এদেশকে স্বর্গে তুলিতে সক্ষম হইবেন !! কি সম্মোহনের কুহক গো !! অধীনতার জালে আবদ্ধ নরনারী কি মোহে আচ্ছন্ন গো !! আজও আমরা চিনিলাম না, উঁহারা কি ধাতুর লোক। এই মোহাচ্ছন্ন-তার দিনে, আমাদের উত্তর তাঁহাদের বা তোমাদের কাহারও ভাল লাগিবার নয়।

তাঁহাদের কথা আমরা আর কি লিখিব ? কতজন ভয় দেখায়, ভাল কন্নিম লিখিলে এদেহে আর প্রাণ থাকিবে না ! কেন যে তাঁহারা চির ভীতকে আরো ভয় দেখান, তাহা জানি না। কিছুই শিখি না—তবু, ইনি, উনি, তিনি, সকলে ভর্যেই অস্থির ! ডেপুটীর লল, ম্যাজিস্ট্রেটের দল,—গবর্নমেন্টের পোষাপুত্রের

দল—দিবারাত্রি কত ভয় দেখান! কেহ কেহ বলে, ব্যক্তিগত দোষের কথা নয়, ইতিহাসের কথা বলায় কোন দোষ নাই। ইতিহাস ত ঢাকা থাকে নাই; সে সব কথা অত্ৰ দেশের লোকেরা বলিতে পারে, আমরা পারিব না কেন? অপিচ, কেহ কেহ বলে, আমরা পরাধীন, আমাদের সে সব কথা বলাও সাজে না। জোয়ানের অধিপতীর কথা, নেপোলিয়নের নির্বাসনের কথা, ঘৃষ্মকর্ণ ক্রান্তির পতনের কথা,—মেহেদিব শব্দে অবমাননা প্রভৃতি দ্রুতির কথা, অত্ৰে বলে, ব্লুক, কেহ কেহ বলে, আমরা বা তোমরা বলিলেই দোষের হয়। তাঁহারা খ্রীষ্টের উপাসক হইয়াও ধর্ম রক্ষা করে না, “সে কথা অত্ৰে বলে ব্লুক”, কেহ কেহ বলে, “তোমরা বলিও না। মহ্লামার-রাওয়ের নির্বাসনের কথা, বালক দলিপের ব্যাপ্তিস্থের কথা, রাণী বিন্দনের কথা,—অথবা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিচার-বিভ্রাটের কথা, অথবা, আরো শত শত কলঙ্কের কথা—ইতিহাসের কলঙ্কিত পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া ফেলিয়া দিয়া ঐ-ওয়ার্ণের পূজা কর, ও সব কালিমার কথা স্মরণ করিয়া বৃথা দণ্ডের বোকা ভারি করিও না। ও সব যে বিদ্বেষ-বিষের কথা, তাহা কি তোমরা জান না? সুতরাং সিরাজের পতনের কাহিনীও ভুলিয়া যাও, এবং ক্লাইবের স্বতি-সিংহাসন মাথায় তুলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ কর। এ যুগ, সে যুগ, এ শতাব্দী, সে শতাব্দী, সব দিনের সব কথা এক এক করিয়া ভুলিয়া যাও,—ভুলিয়া যাওয়া ঐ মুক্ত আকাশ তলে দাঁড়াইয়া ঐ মুক্ত বায়ুতে উড়াইয়া দেও,—“পরম অধর্মী চারী রঘুকুলপতি” এবং অন্তরে লিখিয়া রাখ—“দোষ কারু নয় গেঁ মা, আমি স্বথাত মলিলে ডুবে মরি শ্যামা।” প্রকৃত কথা এই,

খাল কাটিয়া লোণা জল আনিয়া আমরা যত অনর্থের মূল ঘটাইয়াছি। মনে হয়, আমাদের সংস্পর্শে আসিয়াই তাঁহারা “মবাবী” শিখিয়াছেন, নচেৎ তাঁহাদের গুণের শেষ কোথায়? তাঁহারা শক্তিশালী, আমরা শক্তিহীন; তাঁহারা জম্মী, আমরা জিত; তাঁহারা কস্মী, আমরা অলস; তাঁহারা একাগ্র, আমরা বিদ্বেষ-বিষে জর্জরিত,—ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই। তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন তুলনা চলে কি? তাঁহারা পরোপকারী, আমরা পরশ্রীকাতর, তাঁহারা কর্তব্যপরায়ণ, আমরা কর্তব্যজ্ঞানহীন; তাঁহারা শাসক, আমরা শাসিত, তাঁহারা রাজা, আমরা প্রজা,—তাঁহারা স্বাধীন, আমরা পরাধীন,—তাঁহারা স্বাবলগী, আমরা পরমুখাপেক্ষী,—কোন তুলনা চলে কি? তবু কেন যে তাঁহারা আবাদিগকে অবিদ্বান করেন, তাহা আমরা বুঝি না। তাঁহারা কি না করিতে পারেন, এবং এই প্রগতে কি না করিয়াছেন! তাঁহারা, অত্ৰকে দমন করিবার সময়, আত্মকলহ, আত্ম-মত-বিরোধ যেরূপ ভুলিতে পারেন, এরূপ আর কেহ পারে কি? বিলাতের যত দল আছে,—অত্ৰকে শাসন করিবার সময় বা দেশের গৌরব রক্ষা করিবার সময়,—সব মিলিয়া একাকার হয়,—এক পায়ের উপর সকলে দাঁড়ায়, তাহা কে না জানে? রিপণ হইতে কটন, হিউম হইতে মর্লি—ডিস্ট্রেলি হইতে গ্লাডোষ্টোন, অত্ৰকে দমন করিবার সময় সব মিলিয়া একাত্মক হন, তাহা জানে না কে? তাঁহাদের নীতিই এই—ছলে, বলে, কোশলে তাঁহাদের প্রভাব বা প্রভাব, সম্মান বা গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। আর আমাদের নীতি—কেবল কণ্ডা, বিবাদ, কলহ ঘরিয়া ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হওয়া। সুতরাং তুলনা

কথা বলিও না। তাঁহারাঃ মানুষ, আমরাও মানুষ, একথা বলা আমাদের পক্ষে সাজে না। অশেষ গুণের সংস্পর্শে আসিয়াও আমরা মানুষ হইলাম না,—স্বজন ও স্বদেশ-বাৎসল্য শিখিলাম না,—বলিব কি “গুণ হয়ে কাণি হ’ল বিতার বিতায়।” হুঃখ এই, দেখিয়াও শিখিলাম না, এত দৃষ্টান্তের সংস্পর্শে আসিয়াও বিধাতার ইচ্ছিত বুঝিলাম না। তাঁহারা যেরূপ আমাদের লোকের দ্বারা আমাদের অনিষ্ট করিতেছেন, এরূপ এজগতে আর কেহ কখনও করিতে পারিয়াছে কি? প্রতাপে, অর্থ, ছলে, ভালবাসায়, কৌশলে এই ভারতবর্ষকে কি সম্বোধনই তাঁহারা ভুলিয়া রাখিয়াছেন! এরূপ করিতে আর কেহ কখনও এ জগতে পারিয়াছে কি? আজও তাঁহারা কেমন ভুলিতেছেন! আমাদের কত বড় বড় জ্ঞানী—বড় বড় কর্ম্মী—তাঁহাদের সম্বোধন-মন্ত্বে আজ গোলাম হইতেও গোলাম হইয়া স্বদেশের অনিষ্ট করিতেছে, একবার চিন্তা করিয়া দেখ, তারপর বলিও,—তুলনা চলে কি না? তুলনা—এক্ষেত্রে একেবারেই অসম্ভব। তুলনা চলে কি,—মেঘে আর শাদ্দুলে, ধর্ম্মে আর অধর্ম্মে, পুণ্যে আর পাপে? ভাই, তোমার পায়ে পড়ি, ঘোর বৈষম্যের রাজ্য তুলনার কথা মুখে আনিও না। আমরা মরিয়াছি ত, মরিয়াই যাই, আর কেন ভোজের বাজির কথা, শুধু বালকের ক্রীড়ার কথা বল? আমাদের পক্ষে মরণই শ্রেয়, নির্বাসনই পুণ্য-পুত!

সত্যই বলিতেছি, বাহারা নিজের, পায়ের উপর নিজেরা ঝুঁড়াইতে চায় না, তাহাদের পক্ষে মরণই ভাল। যে জাতির লোকে আপনার কাগজ বা কাছের প্রশংসা নিজে

ছাপাইয়া অথ সম্পাদকের দ্বারা ঘোষণা করে; বার-বিলাসিনীদিগের ভ্রায়, চাকটিকো সাজাইয়া, চুটকি সাহিত্যের মোহিনী নায়ায় নরনারীকে ভুলাইয়া পয়সা সংগ্রহ করে এবং একই প্রবন্ধ একই সময়ে নানা পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া লোককে প্রতারিত করে,—যে জাতির ধার্মিকেরাও, ধর্ম্ম অস্ত্রের রক্ষণীয় ও পালনীয়, এই কথা ঘোষণা করিয়া, বিশেষে বিচরণ করিয়া আত্ম-তৃপ্তি লাভ করে; এবং শয়নে স্বপনে অস্ত্রের অনিষ্ট চিন্তা করে,—যে জাতির লোকেরা ধর্ম্ম না বুঝিয়াও ধর্ম্মের কথা বলিতে চায় এবং ধর্ম্ম-সত্য করে, সে জাতির লোকদের পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়। এ দেশের জাগরণের অর্থ, পিপীলিকার পালক-উদগমের ভ্রায়, মৃত্যুর পূর্বাভাস! হায়, মায়ের প্রসাদী নির্দোষী অবোধ শিশুগণ, কেন এসব কথা বুঝিয়া সতর্ক হইল না? জুডাস ইষ্কারিয়টগণ যে এদেশের ঘরে ঘরে বিচরণ করিতেছে, কেন তাহারা একথা বুঝিতে পারিল না? মহা প্রহেলিকা, মরিবার অব্যবহিত পূর্বেও পতঙ্গ অগ্নিতে প্রবেশ করিতে ছাড়ে না! এই সকল কথা বুঝিয়াই বুঝিবা, মহারাজা স্বর্ঘ্যকান্ত, অথবা মহারাজা রাধাকিশোর, অথবা রাজা মহিমারঞ্জন, অথবা রমাকান্ত, কাব্যবিশারদ, ব্রহ্মবান্ধব, আনন্দমোহন, উমেশচন্দ্র, অকালে কালের অন্তরালে যুথ লুকাইলেন! আর ব্রজেন্দ্র কিশোর?—আর পালিত, ঘোষ-যুগল, সর-কার, দত্ত এবং চৌধুরী? তাঁহারা যে আজও এদেশের জন্ত অশ্রুপাত করিতেছেন, কর্ম্মক্ষেত্রে খাটিতেছেন এবং অর্থ ঢালিতেছেন, সে কিসের জন্ত, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। বুঝিতে পারিতেছি না, তাঁহারা মানুষ, না দেবতা? বুঝিতে পারিতেছি না, তাঁহারা

সংসারী, না সন্ন্যাসী ;—দেহী, না অদেহী ? জীবিত লোকের প্রশংসা করা আমাদের নিয়ম-বিরুদ্ধ, কিন্তু—তাঁহারা মানুষ কিনা, অনেক সময়ে নির্জনে বসিয়া ভাবি। ভাবিয়া কুংকিনারী পাই না। তবুও তাঁহাদিগকে চিন্তা করি, তবুও তাঁহাদিগকে প্রাণে রাখিয়া প্রাণ জুড়াই। তাঁহারা আঁধার ঘরের মালিক, মহা অন্ধকারের ক্ষণ-বিহীন, মহা বিকারের মহোৎসব। তাঁহারা তুলনা-রহিত বলিয়াই তাঁহাদের “গুণ” নাই।

যাউক, সে সব কথা। বলিতেছিলাম, উঁহারা এখন, এই দিনে, আমাদের সর্ব কাঙ্ক্ষের বিরোধী ;—আমাদের কোন কাজই আর তাঁহাদের ভাল লাগে না। কেবল তাঁহাদের মনে অবিশ্বাস অধিকার করিয়া রহিয়াছে। জেতা ও জিতের এসবক বড় বিষম সম্বন্ধ ;—ইহাতে “কাহারও মঙ্গল নাই। আমাদের ক্লাসনেল-বিভাগ সমূহ তাঁহাদের চক্ষের শূল, আমাদের জাতীয় সভ্যসমিতি তাঁহাদের নয়নের কণ্টক, আমাদের “বদেদী-আন্দোলন”, তাঁহাদের প্রাণ-সংহারক, আমাদের “বন্দেমাতরম্ মন্ত্র” তাঁহাদের নিদ্রা-নাশক ! তাঁহাদের ভাল লাগে কি ? আমরা লেখা পড়া শিখি, তাঁহাদের ভাল লাগে না, আমরা ছুপয়সা উপার্জন করি, তাঁহাদের সহ হয় না—আমরা দেশের সেবা করিয়া দেশকে জাগাই, তাঁহাদের ইচ্ছা নয়, আমরা বাঁচি, তাঁহারা মোটেই চায় না, আমরা মানুষ হই, তাঁহারা মোটেই পছন্দ করেন না ! জগদীশ চন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র ও রাসবিহারী—কেন এজাতের লোক হইলেন, তাঁহারা নিয়ত চিন্তা করেন ? এজাতের গৌরব, তাঁহাদের আর মোটেই সহ্য হয় না। শুধু ইংলিসম্যান, পাওনিয়র কেন, বিলাতের বড় বড় কত শত শত

সম্পাদক, দিন রাত্রি অকথ্য ভাষায় এদেশে সম্বন্ধে নানা অনৃত বাণী প্রচার করিতেছেন ? স্বার্থে বা পড়িলে এমনই হয়। তাঁহারা যদি সহিষ্ণু হইতেন, ভাল হইত ; কিন্তু তাঁহারা সাত সমুদ্র তের-নদী পার হইয়াছেন কি কেবল আমাদের স্বার্থে তুলিতে ? আমাদের মহা দোষ, একথা আমরা বুঝি না। তাঁহাদের স্বার্থ—আমাদের বিলোপ সাধনে তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা। জান না কি কর্জুন কি বলিয়া গিয়াছেন ? “তোমরা কাঠুরে ও ভিত্তি হইবে—আবার কি ?” সুতরাং আমরা থাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া উঠিলে, অথবা সুশিক্ষিত হইলে, অথবা ধনী হইলে তাঁহাদের প্রাণে তাহা সহিবে কেন ? ব্যবসা বাণিজ্য—স্বাধীন বাণিজ্যের ছলমায়, অবাধ লুণ্ঠনের বলে সব তাঁহারা একচেটিয়া করিতে চাহেন। তাহার বিরুদ্ধে যদি কোন কথা বল, জানিয়া রাখ, তাহা তাঁহারা সহিবেন না। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশনের কথা মনে নাই কি ? হায় নিরপরাধী কৃষ্ণকুমার, অগ্নিনীকুমার,—আজ বৎসরের প্রথম দিনে, তোমাদের জন্ত অশ্রু ফেলিল এজেন্সের কয়জন লোক ? হায়, আজ দারুণ ভয়ে এই বঙ্গ নীরব, সকল আন্দোলন থামিয়া গিয়াছে, আজ পুতচরিত্র সত্যপ্রসঙ্গের গৌরবে এদেশ মহানন্দে বিভোর হইয়াছে ! এই একটা ঘটনায় সব হুঃখ, যেন আজ লোকেরা ভুলিয়া গিয়াছে ! ছেলে ভুলানের কি যাহুকরী সম্মোহন-মন্ত্র তাঁহারা জানে গো !!

তাঁহারা এখন এইরূপেই লোকদিগকে ভুলাইতে চাহেন। এক হাতে কটোর ; শাসন, অবাধ লুণ্ঠন, অত্যাচার ছেলে ভুলাইবার জন্ত মোমের পুতুলের ন্তু। তাঁহারা

প্রকারান্তরে, আমাদিগকে নীরব করিতে, আমাদের দ্বারাই আমাদিগের শাসনের নির্মম আইন রচনা করিবেন, সর্ব প্রথমে সেই আয়োজন করিতেছেন। কিন্তু আমরা মরণের ফাঁদে মাথা দিবার সময়ও সে কথা বুঝিলাম কই ?

যা'ক কথা বকাবকিতে প্রয়োজন নাই। আমাদের এবং তাঁহাদের ভাল-মন্দ-জড়িত সম্বন্ধটা যদি আমরা ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিতাম, তবেই আমরা ধন্ত হইয়া যাইতাম। বড় বৃক্ষের নীচে ছোট বৃক্ষ বাড়ে না—বড় জাতির ধারে ক্ষুদ্র জাতির টিকিয়া থাকা বড় কঠিন। তাঁহাদের সংস্পর্শে আমাদের বিলোপই কি তবে বিধাতার নিয়ম ? এই সকল কথা বুঝাইতে পারিলে কৃতার্থ হইতাম। জাতীয় ভাষা ভিন্ন জাতির হিতের কথা কাহারও কর্ণে প্রবেশ করে না। এইজন্ত, অকিঞ্চিৎকর শক্তি লইয়া, বিগত ২৬ বৎসর, আমরা, একাদিক্রমে, জাতীয় ভাষায়, দ্বারে দ্বারে, জেতা-জিতের সম্বন্ধ এবং স্বাবলম্বনের কথা কীৰ্ত্তন করিয়া আসিলাম। কেহ সে সব কথা শুনিল না ; যাহারা শুনিল, তাহারাও ক্রকৃৎকিত করিয়া গালাগালি দিয়া পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল ;—উপেক্ষা, গালাগালি এবং নির্মম ব্যবহার—শক্তিশেলের ছায়া চতুর্দিক হইতে অন্তরে বিদ্ধ হইল। অথবা যাহারা শুনিল, তাহারা আরো ভাল করিয়া পা চাটিতে আরম্ভ করিল। কাহার নিন্দা করিব, এবং কাহার প্রশংসা করিব ? পক্ষে কে, এবং বিপক্ষে কে, তাহা জানি না। জানি কেবল এই—প্রাপ্তি এবং ক্রান্তিতে

হৃৎখ এবং দারিদ্র্যে, এই বাক্কো জর্জরিত হইয়া, ক্রন্দন বা হাহাকার করিলেও, এদেশে সহায়ত্ব মিলিবার নয়। সুগোর কৃষ্ণ-কুমার ও অশ্বিনীকুমার আজীবন দেশের জন্ত খাটিয়াও তাহা পান নাই, আর কে পাইবে ? সুতরাং এখন মরণের দ্বারে দাঁড়াইয়া, স্বদেশের কালিমার কথা স্মরণ, মনন ও ধ্যান করা ভিন্ন আমাদের আর গতান্তর নাই ; অথবা এখন সম্বল কেবল অশ্রু। তাই দিবারাত্রি কেবল অশ্রুপাত করিতেছি, এবং প্রার্থনা করিতেছি—দেশের মঙ্গল হউক ; অসংখ্য লোক অনাহারে মরিতেছে, খাটিবার শক্তি নাই ; অসংখ্য লোক দারুণ ব্যাধিতে প্রাণ দিতেছে, ঔষধ যোগাইবার অর্থ নাই ; অসংখ্য বিধবার অশ্রুতে মেদিনী সিক্ত হইতেছে, উদ্ধারের সামর্থ্য নাই ;—অসংখ্য লোক অশিক্ষার অন্ধকারে বিচরণ করিতেছে, উন্নত করার উপায় নাই। এই অবস্থায়, এই বাক্কো, এখন কেবল মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছি। স্বদেশের সেবা করিবার বড় সাধ ছিল, তাহাও আর আমাদের দ্বারা হইবে না, কেননা, শক্তি অতি সামান্য—বুথা চেষ্টা এবং বুথা খাটুনি ! দীন হৃৎখীদের মৃত্যুর দিনে, তোমরা কৃপা করিয়া এক এক বিন্দু অশ্রু ফেলিও, নববর্ষে তোমাদের চরণে কেবল ইহাই প্রার্থনা। এবং যিনি ত্রিকালজ্ঞ, তাঁহার চরণে এই প্রার্থনা, হৃৎখ-বিপদে, শয়নে স্বপনে তিনিই যেন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকেন এবং দেশের মঙ্গল কামনা লইয়াই যেন মরিতে পারি। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

ভাওয়ালে ।

আমি পরবাসী ।

যুবক! আমি নানান দেশে, নানান কষ্টে নানান ক্রেশে,
মন বয়েনা কোন খানে, পাণার মত ভাসি,
কিন্তু এখন আমি ফুলে ডুলি প্রাণের সকল বেথা,
দুদিন পরে মূরে কিরে তাইতে আবার আসি,

আমি পরবাসী ।

২

আমি পরবাসী,

দিক্‌দিগন্ত আছে ব্যাপি, উড়ে উড়ে আকাশ ছাপি,
হাজার হাজার গজার বনের সবুজ শোভা রাশি,
সিঁদু যেন গ্রাম তরঙ্গে, খেতে নেন অঙ্গে অঙ্গে,
শীত বসন্তে সমান কোটে ফেন-পুষ্প হাসি,

আমি তাই দেখিতে আসি ।

৩

আমি পরবাসী,

বনভরা সবুজ টিলা, মাথায় আছে আকাশ মিলা,
মরকত মন্দিরের মত শোভা পরকাশি,
ঝুঁকে ঝুঁকে মেলে পাখা, উড়ে মায়ের খেত পতাকা,
বৈশাখ মাসে বকের শোভা দিক্‌দিগন্তে ভাসি,

আমি তাই দেখিতে আসি ।

৪

আমি পরবাসী,

শশক হরিণ খেলছে বনে, সতত প্রফুল্ল মনে,
ভাই ভগিনীর মত আমি তাদের ভালবাসি,
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী, বাঘ ভালুক একই দেশী,
তেজ স্বাধীনতা অরণ্য-বিলাসী ।

আমি তাই দেখিতে আসি ।

আমি পরবাসী,

শুকনা বিলে শুকনো খালে, বন-বরাহ পালে পালে,
পুঙ্খ শালুক পদ্মালে মলিল-পিপাসী,
বৈশাখে চাতকের ডাকে, নবীন জলধি ধবকে থাকে,
বনবালা পুঙ্খ দিয়ে ভাটিফুলের রাশি !

আমি তাই দেখিতে আসি ।

৫

আমি পরবাসী,

বনে বনে ডাকছে কত, দয়ালু শ্রামা অবিরত,
মুগ্ধমতী রাগ রাগিণী—তারাও বনবাসী,
ব্যাঘ'রবে শুক রবি, কি ভীম বন-ভৈরবী !
দাবান্নিতে অন্ধ্রে সাহস-দীপক অগ্নি রাশি,

আমি তাই দেখিতে আসি !

৬

আমি পরবাসী,

কেমন পুষ্প বনদেশ, মহিষ আছে, নাইক মেঘ,
বন শূন্য ধস্ত মেঘ নহে অবিধাসী,
অতি তুচ্ছ কীট পতঙ্গ, তারাও নহে সত্য-ভঙ্গ,
কুকুর নয় যে পা চাটতে গলায় পরে' ফাঁসি,

আমি তাই দেখিতে আসি !

৭

আমি পরবাসী,

কেমন আশ্র-নির্ভরতা, ধস্ত বস্ত সজীবতা !
স্বাধীন মূর্তি স্বাধীন ক্ষুধা সবাই উল্লাসী,
তাদের বন ভারাই ভোগে, জরা যুগ্মশাকে রোদে,
তারাই রাজা তারাই প্রজা তারাই অধিবাসী,

আমি তাই দেখিতে আসি !

আমি পরবাসী,

স্নানে তাম্রা ব্যাধের হাতে, বন্ধু ক গুলি বর্ষাঘাতে,

দেয় নু তবু স্বাধীনতা—কীৰ্ত্তি অবিনাশী,

কি মহান সে বস্ত্রধর্ম, বান-প্রস্থ মহাকর্ম,

এর কাছে বা কোথায় লাগে গয়গঙ্গা কাশী,

আমি তাই দেখিতে আসি !

১০

আমি পরবাসী,

অস্ত্র বস্ত্র পশু পক্ষী, ধস্ত বস্ত্র রাজলক্ষ্মী,

দর্শনে তার চিত্ত জুড়ার মহাপাতক নাপি,

পার্শ্বে তার পুণ্য বায়ু, বুদ্ধি করে পরমায়ু,

নির্ভরে ধমনী নাচে বুকের রক্ত রাশি,

আমি তাইতে হেথা আসি !

১১

আমি পরবাসী,

বর্ষাকালে বেলাই বিলে, শাপলা শালুক হুম্মী মিলে,

কমল বনে ফুটে উঠে কমলার সে হাসি,

ভারতী কি স্নেহের ভরে, বীণা রেখে কবির করে,

পদ্য-সরে হরে আছেন পদ্যবনবাসী,

আমি তাই দেখিতে আসি !

১২

আমি পরবাসী,

চিলাই যখন ছ'কুল ভরা, দুই তীরে তার ধান আর ধরা,

নুতন সবুজ শাড়ী পরা কলহংসভাবী,

কবের অণু রেণু বা কার, অমল মলে ফুটছে তাহার,

কমল কুমুদ রূপে গন্ধে চিতা-ভস্ম-রাশি !

আমি তাই দেখিতে আসি !

১৩

আমি পরবাসী,

শরতে সে শশীর হাসে, শ্রামল বনভূমি ভাসে,

হেমন্তে সে হেমাঞ্চল লুটার পাশাপাশি,

খেতে খেতে সোণা ঢালা, আনন্দে কৃষকের বাগা,

হলু দেয়, কাঁচি হাতে খেতে যায় শ্রমী,

আমি তাই দেখিতে আসি !

১৪

আমি পরবাসী,

ওগো শ্রামা বনভূমি, বিপুলা বিশালা ভূমি,

কবিতা কল্পনা মোর তোর চিরবাসী,

আমি বা বৃষ্টিব কি মা, তোরও শ্রাম-মহিমা,

ভূখাপি সেবিব তোর চির অভিলাষী,

আমি তাইতে হেথা আসি !

১৫

আমি পরবাসী,

দে কোলে একটুকু জাগা, আমি অতি হৃৎভাগা,

আমি যে সম্মান তোর উদাসী সম্মানী,

অণুতে রেণুতে নাথি, নে মা শ্রামাঞ্চলে ঢাকি,

জনমের মত মাগো মোছা অশ্রু রাশি,

আমি তাইতে হেথা আসি !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস ।

রাজা মহিমারঞ্জন।

যাঁহারা ধর্মে নিবিষ্ট-চিত্ত, চরিত্রে উজ্জল, পরোপকারে সতত উত্তমশীল, ক্রোধ-ঈর্ষ্যা-দি-বিবর্জিত,—এরূপ মহাপুরুষদিগের অভ্যুদয় এই পৃথ্বী-মণ্ডলে সর্বদা হয় না। ইঁহারা বিধাতার আশীর্বাদ-স্বরূপ। কদাচিৎ কোন প্রদেশে এইরূপ মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিয়া, কিছুকালের জন্য আপনাদিগের উজ্জল আলোকে প্রদেশ-বিশেষকে আলোকিত করিয়া, আবার কাল পার্ভ বিলীন হইয়া পড়েন। ইঁহাদের দ্বারা পৃথিবীর যে কল্যাণ হয়, তাহাই স্থায়ীভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। এবশ্পকার পুরুষবর্গের অভ্যুদয় না হইলে, এ পৃথিবী বাসের যোগ্য হইতে পারিত না।

যে মহাত্মার নাম এই প্রবন্ধের শীর্ষদেশকে সম্বলিত করিয়াছে, বঙ্গদেশে এখন কে আছে, যিনি ইঁহাকে জানেন না? কত অনাথা দরিদ্র, কত অভাবগ্রস্ত গ্রন্থকার, কত ‘সমাজ’, কত সাধারণ-হিতকর কার্য্য-সমূহ ইঁহার মুক্তহস্ততার কৃপালাভ করিয়াছে, গণ্যনার দ্বারা তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। এই দীনের আশ্রয়, দরিদ্রের বন্ধু, উত্তর-বঙ্গের কলপাদপ, বিগত চৈত্র মাসে স্বদেশ-বিদেশকে শোকাকুলিত করিয়া, পর-লোকে প্রস্থান করিয়াছেন। বিগত চৈত্রে কাকিনায় অকস্মাৎ রক্তমাংস রোগ কোথা হইতে আসিয়া উৎপত্তি হইল। গৃহে গৃহে শিশু সকল এই রোগে আক্রান্ত হইতে লাগিল এবং আক্রান্ত শিশুমাত্রই ইঁহার কবলে কবলিত হইল! রাজা মহিমারঞ্জনও ইঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না।

অল্প কয়েক বৎসর পূর্বে, এই রাজারই সভা-পণ্ডিত, বর্তমান কালের কালিদাস, মহাকবি শ্রীধর বিজ্ঞানস্বামী এই মর-ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কাকিনা-রাজের রাজমুকুটের উজ্জল হীরক-খণ্ড তখনই থসিয়া পড়িয়াছিল। আজ সেই মহাকবির আশ্রয়-দাতা, সেই কবির সতত-সহবাস-প্রিয় রাজা মহিমারঞ্জনও থসিয়া পড়িলেন! উত্তর-বঙ্গ গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল! হায়! আর কি ইঁহাদের শ্রুত স্থান পূরণ হইবে?

বঙ্গদেশের জমীদারবর্গের একটা অখ্যাতি আছে যে, ইঁহারা নিতান্তই আত্ম-বিলাস-পরায়ণ। কিন্তু রাজা মহিমারঞ্জনকে এই অখ্যাতি স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইনি সাধারণ, সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের জায় জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতেন। ইঁহার বাস-ভবনের সামগ্রীগুলি, ইঁহার নিত্য ব্যবহারের পরিচ্ছদ সকল, ইঁহার আহার-বিহারের দ্রব্যনিচয় ইঁহাকে গৃহস্থশ্রামস্থ সন্ন্যাসী বলিয়া ঘোষণা করিত। ইনি বিষয়-কর্ম্মের গুরু ঝগড়া ও ঘোর-রোলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়াও, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-কর বস্তুনিবহে পরিবৃত্ত থাকিয়াও, নির্লিপ্ত যোগীর জ্ঞান থাকিতেন, ইঁহার চিত্ত সে গুলিতে আবদ্ধ থাকিত না; ইনি নিয়ত পৃথিবীর উদ্ধারদেশে আপন চিত্তটিকে নিবদ্ধ রাখিতে পারিয়াছিলেন। আনন্দের স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সংসারের কত বিপদ, কত ভীষণ ঝটিকা, ইঁহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে,—অন্ত হইলে ছটফট করিয়া ছুটিয়া বেড়াইত,—কিন্তু এই মহাপুরুষের ধীরতার ক্ষতি কিছু-

তেহ জন্মাইতে পারিত না। বঙ্গদেশের ধনী-দিগের পক্ষে ইহা কম প্রশংসার বিষয় নহে। একপ আত্ম-সংযম এদেশে নিতান্ত সুলভ নহে। কিন্তু কিসের বলে ইঁহার এই বিস্ময়-কর নিলিপ্ততা অর্জিত হইয়াছিল?

ইহার মূলে দুইটা কারণ বর্তমান ছিল। এই দুইটা কারণ, ধনিবর্গের মধ্যে বর্তমান কালে সর্বত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় না। একটা ইঁহার সুশিক্ষা, অপরটা ইঁহার ধর্ম-প্রবণতা।

ইনি যেরূপ সুশিক্ষিত ছিলেন, তাহা বঙ্গদেশে কে না অবগত আছেন? ইংরাজী বিজ্ঞান এবং নানা বিভাগীয় তথ্যসমূহে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। সংস্কৃত-ভাষাও ইনি বুঝিতে পারিতেন। উদ্ভিদ শাস্ত্র (Botany), প্রাণীতত্ত্ব, চিকিৎসা ও শারীর-বিজ্ঞা, নানাদেশীয় ইতিহাস, ইংলণ্ডের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বস্তুনিচয়, ইঁহার কণ্ঠাগ্রে ছিল। কে, ডি, ঘোষের ত্রায় সুবিজ্ঞ ডাক্তারও, চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধে ভয়ে ভয়ে ইঁহার সহিত আলাপ করিতেন। প্রাণীতত্ত্ববিদ ইংরেজ পণ্ডিতেরা ইঁহার অভিজ্ঞতা দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ইঁহার পাঠ্যাগার বিবিধ বিষয়ের গ্রন্থ-রাশিতে পরিপূর্ণ থাকিত। এবং ইনি নিয়ত একান্তে ঐ সকল গ্রন্থরাশির তত্ত্বনিচয়ের আলোচনায় নিমগ্ন থাকিয়া, অসামান্য বিজ্ঞা ও নানাবিশ-য়িনী অভিজ্ঞতা উপার্জন করিয়াছিলেন। এ প্রকার বিদ্যা দ্বারা যাঁহার চিত্ত মার্জিত ছিল, তাঁহার আত্মসংযমের অভাব হইবে কেন? কিন্তু ইহা ছাড়াও, তাঁহার আর একটা বিশেষত্ব ছিল।

বৈদান্তিক ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনায় ইনি জীবনের অবিক সময় ব্যয়িত করিতেন। উপনিষদ্ গ্রন্থগুলি ইঁহার সত্যীব প্রিয় ছিল।

প্রচলিত প্রামাণিক প্রত্যেক উপনিষদ্ হইতে যে কোন শ্লোক, যে কোন মন্ত্র, ইনি অনর্গল উচ্চারণ করিতে পারিতেন। প্রত্যেক মন্ত্রের অর্থ ইনি উত্তম জানিতেন। ইনি বাসন্তবনের সন্নিকটে, লতাগুচ্ছ-পরিবৃত্ত, একটা নিরুজ্জন, অত্যন্ত কৃত্রিম ভূখণ্ড প্রস্তুত করিয়া গাইয়া-ছিলেন। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে, ইনি প্রাত্যহ এই ভূখণ্ডে উপবেশন করিয়া, কলুনাদিনী ধীর-প্রবাহিনী ত্রিশোতার তুল্য ভূমির উপরে বিলম্বিত, অনন্ত নীল আকাশের দিকে চাহিয়া, পবিত্র ঔপনিষদিক শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিতেন এবং ধ্যান-ভ্রমিত নেত্রে সেই শ্লোকগুলির অর্থ ও তাৎপর্য আত্ম-হৃদয়ে অনুভব করিতেন। একপ ব্যক্তির আত্ম-সংযমের অভাব হইবে কেন? আমি সঙ্গে থাকিয়া দেখিয়াছি, একবার দার্জিলিংয়ের হিমাচলের একটা নিরুজ্জন, মহোচ্চ, গভীর, আকাশচূষি শৃঙ্গ দেখিয়া, এই মহা-পুরুষ, তখনই তথায় উপবেশন করিয়া, উপনিষদের কয়েকটা গভীর মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, সেইখানে মুদ্রিত নেত্রে ধ্যানমগ্ন হইলেন! সমৃদ্ধির কোলে এরূপ সন্ন্যাসী কয়জন মিলে?

যাঁহার ইঁহার জীবিতকালে, কখনও ইঁহার আলাপ শুনিয়াছেন ও সহবাস-সুখ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা কখনও ভুলিতে পারিবেন না বলিয়া, আমাদের বিশ্বাস। হয় কোন ঐতিহাসিক তত্ত্বালোচ-নায়, নয় বৈদান্তিক ব্রহ্মতত্ত্বে, অথবা, ইঁহার বৈঠকখানা সর্বদা মুখরিত থাকিত। সংসারের সহস্র জালায় মুহুমান হইয়া ইঁহার নিকটে গেলে, ইনি উদ্ধতন রাজ্যের এমন মধুময়ী কথা উত্থাপন করিতেন যে, সেই অমৃতের স্রোতে তপ্ত-হৃদয় প্রাবিত হইয়া

যাইত। বাঙ্গালা দেশের কয়জন ধনীর আগারে, লোকে সংসারের ধন-জন ও আশ্ব-গরিমা প্রকৃষ্ট কথার পরিবর্তে, একরূপ ব্রহ্ম-রূপা ভূমিতে পাইয়া থাকেন? উত্তর-বঙ্গের উজ্জল প্রদীপ নির্দীপিত হইয়াছে !!

ইহার দানের কথা, পীড়িতের প্রতি ককুগার কথা, আমরা কেমন করিয়া বলি? মহিমারঞ্জনের সাহায্য স্পর্শ করে নাই, বঙ্গে একরূপ নিরাশ্রয় বিধবার গৃহ কয়টা আছে? ইহানাই নানা প্রকার ব্যববাহুল্যে দানের পরিমাণ কিছু সংক্ষিপ্ত হইলেও, কাকিনার ঘরের যেরূপ দান ছিল, বঙ্গের কয়টা জমিদারের ঘরে অদ্যাপি তদ্রূপ আছে? কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিতই তাঁহার গৃহে বিমুখ হইতেন না। সূত্রজ্ঞকার মাজেই তাঁহার সামান্য লাভ করিতেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের বিলাত গমনের সাহায্য ইনিই করিয়া ছিলেন। অগণিত ছাত্র তাঁহার রূপায় শিক্ষা লাভ করিতে পারিয়াছে। তাঁহার ধনে কত রোগী বাঁচিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ইনি ভারতের ইতিহাসবিশ্বস্ত স্থানগুলি স্বয়ং পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছিলেন। স্থান-দর্শনজনিত অভিজ্ঞতার প্রতি তাঁহার এত শ্রদ্ধা ছিল যে, তিনি প্রতি বৎসর আপন কোষ হইতে সনগ্রহ ব্যয় দিয়া, আপনার আশ্রিত ও প্রজাবর্গকে দলে দলে, সুদূর দাক্ষিণাত্যে, গুজরাটে, বোম্বে, পঞ্জাবে পাঠাইয়া দিতেন এবং তাহারা ফিরিয়া আসিলে, পুজানুপূজ-রূপে সকল স্থানের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেন। ইহা তাঁহার বাৎসরিক কৃত্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারই ব্যয়ে বিগত দিল্লিদরবারে, এই প্রবন্ধের লেখক, দিল্লিদরবার দেখিতে এবং দ্বাআ, জয়পুর প্রভৃতি স্থান দর্শনে সমর্থ হইয়াছিল। ইহারই ফলস্বরূপ শ্রীম্বর বিদ্যা-

লকার প্রণীত “দিল্লি-মহোৎসব-কাব্যম্”, বিশ্ব-গৌরবে এত সমাদৃত হইতে পারিয়াছিল।

তাঁহার মহামুভবতা ও ঔদার্য্য আদর্শ স্থানীয় ছিল। তাঁহার পরিজনবর্গ কেহই কোনদিন ইহার ক্রোধ দেখিতে পায় নাই। ধনীরা প্রায়ই অসহিষ্ণু হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষমাশীলতার তুলনা ছিল না। তাঁহার গ্রাম বাকুপট্ট ব্যক্তি বড় সুলভ নহে। যত গুরুত্ব জটিল বিষয়ই হউক না কেন, ইনি বহুক্ষণ ব্যাপিয়া সেই বিষয়ের আলোচনা করিতে পারিতেন এবং লোকে মন্তব্যবৎ চাহিয়া থাকিত।

পিতৃভক্তি তাঁহার মত আমরা কম দেখিয়াছি। তিনি পিতার মত পিতা পাইয়াছিলেন। রাজা শম্ভুচন্দ্রের নানের সহিত কোন্ শিক্ষিত ব্যক্তি অপরিচিত? শম্ভুচন্দ্রের কথা বলিতে বলিতে ইনি গদগদ হইয়া উঠিতেন। কোথার কোন্ কালে, শম্ভুচন্দ্রের বৈদান্তিক শিক্ষাগুরু পরমহংস পরমানন্দ, হৃদয়ে স্বরূপ সম্বন্ধে একখানি দীর্ঘ পত্র সংস্কৃত ভাষায় শম্ভুচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন; সেই কীটদষ্ট পত্রখানি রাজা মহিমারঞ্জন অতিশয় প্রায় চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত, পিতার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রক্ষা করিয়াছিলেন। গত মাঘ মাসে, সেই পত্রখানি, দেবনাগরে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবার জন্ত, এই প্রবন্ধলেখক আদ্যষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু হায়! সে পত্র এখন অপরি-শোধিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে!

রাজা মহিমারঞ্জনের অভাবে বঙ্গদেশের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহসা পূরণ হইবে বলিয়া আশা নাই।

এই মহাপুরুষের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটা পদ্য এস্থলে সংযোজিত হইল। :—

স্বর্গে সুরেন্দ্র-ভবন ছাড়িয়া,
 সুরেন্দ্র-দর্শিত-পথে,—
 এসেছিলে এই মরত-ভবনে,
 চড়িয়া পুষ্পক-রথে ।
 ভব-হিত-তরে, যেদিন হে নৃপ !
 জনমিলে ভবে আসি,
 কাঁদিল স্বর্গে দেবতার কুল,
 হাসিল মরত-বাসী ॥১॥
 তুমি, বিবিধ-বিধান, জীবের কল্যাণে,
 সঁপিলে আপন প্রাণ,—
 তুমি, কাতরে, আপন-হস্ত বাড়া'য়ে,
 করিলে আশ্রয় দান ।
 করুণার শ্রোতে ভাসাইলে ধরা ।
 বিপুল তোমার দান—
 কত অনাথ দরিদ্রে, করিল রক্ষা,
 যাঁচা'য়ে তাদের প্রাণ ॥২॥
 মর্শ্ব-পীড়ায় হইয়া কাতর,
 দৃষ্ট-হৃদয় লইয়া,
 নিত্য আসিত কত নর-নারী,
 তোমার নিকটে ছুটিয়া ।
 মুহূর্ত্ত তোমার নিকটে বসিলে,
 হেরিলে মৃতি তোমার,

ছাঁখ-ক্লেশ, চিত্ত-দাহন—
 থাকিত না কিছু আর ॥৩॥
 তব, প্রতিভার তীব্র আলোক ছুটিয়া,
 বন্ধে করিল উজল ;
 তব, জ্ঞান-দীপ্ত ধর্ম্ম-কাহিনী,
 ছুটিল চৌদিকে বিনমল ।
 তুমি, ধ্যান-পুত চিত্তে নিয়ত,
 ব্রহ্ম-অমৃত পানে,—
 নিত্য মগন থাকিতে হে নৃপ !
 ব্রহ্মের জন্ম পানে ॥৪॥
 তুমি, আপনার ব্রত পর-উপকার—
 করি ভবে উদ্ধাপন,
 সমগ্র-অস্ত্রে, কাঁদায়ে এ ভবে,
 স্বর্গে করিলে আরোহণ !
 তুমি নাই ভবে ; ঐ দেখ চাহি,
 নিবিড় তামস-রাশি—
 ঢাকিয়া তপনে, ঢাকিয়া চন্দ্রমা,
 ফেলিছে ধরায়ে গ্রাসি ।
 ঐ আর্জুনাদ, ঐ হাহারব,
 দীনের চক্ষুর জল—
 রোদন-ধ্বনির সহিত মিশিয়া,
 প্রাবিতেছে ধরাতল ॥৫॥
 শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য ।

মানব সমাজ । (৪)

সমাজের প্রথম ও শেষ কথাই মানুষ এবং তাহার কর্ম্ম । মানুষ বলিতে সংখ্যা ও দেহ ; এবং কর্ম্ম বলিতে দেহ ও মন ;—
 এই কয়েকটা কথা সম্মুখে বিবেচ্য ।

সংখ্যা ।—যে দেশে যে পরিমাণ লোক প্রতিপালিত হইতে পারে, তদপেক্ষা জন সংখ্যা কিছু অধিক থাকা উচিত । তাহা

হইলে জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা হয় ; সুতরাং জনগণ শ্রমশীল, কৌশলী ও বুদ্ধি-বৃত্তিতে উন্নত হইয়া উঠে । দেশের প্রতি-পালনক্ষমতা অপেক্ষা জনসংখ্যা ন্যূন হইলে আহাৰ্য্য বস্তু অপেক্ষাকৃত অনায়াসলভ্য হয় । তাহার ফলে জনগণ অলস এবং উদ্যোগ-শক্তিহীন হইয়া উঠে । সুতরাং দেহ ও মন

উভয়ই-কালক্রমে দুর্বল হইয়া যায়। কিন্তু জনসংখ্যা ইচ্ছাক্রমে বৃদ্ধি করিবার উপায় কি? উদ্ধার দুই প্রকার। এক প্রকার রুগ্ন, দুর্বল, অল্পায়ু বংশজ ব্যক্তির অপত্যোৎপাদন না করা, অথবা যথাসম্ভব কম করা। দ্বিতীয় প্রকার, সুস্থ, সবল, এবং বয়সপতা দীর্ঘায়ু বংশজ ব্যক্তির অপত্যোৎপাদন করা। অপত্যের সংখ্যা এবং আয়ুঃ অনেক পরিমাণে বংশগত নিয়ম অনুসারে নির্দিষ্ট হয়। উন্নত বংশে অল্প সংখ্যক অপত্য হওয়াই নিয়ম, কোন বংশে অধিক সংখ্যক হইয়া থাকে। কোন বংশে অল্পায়ুঃ, কোন বংশে দীর্ঘায়ুঃ। কাহারও বংশ-পরম্পরাগত পীড়া আছে, কাহারও নাই। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া বিবেচনা পূর্বক বিবাহ সংস্কার নিষ্পন্ন করা আবশ্যিক। কিন্তু বিবাহক্ষেত্রে সংকীর্ণ হইয়া গেলে বিবেচনা করিবার স্থল থাকে না। এ নিমিত্ত সুস্থ সবল সচ্চরিত্রদের পক্ষে, অর্থাৎ যাহাদিগের অপত্যোৎপাদন করা বিধেয়, তাহাদিগের পক্ষে, বিবাহক্ষেত্রের প্রসার অথবা বিস্তৃতি সাধন অত্যন্ত প্রয়োজন। তাহারা রুগ্ন, অবসন্ন, অর্থাৎ যাহাদিগের অপত্যোৎপাদন করা বিধেয় নহে, তাহারাও ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের পক্ষে বিবাহক্ষেত্রের প্রসার অপ্রসার সমান। তাহাদিগের জায় সমভাবাপন্ন নরনারী যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া জীবন ব্যাপার নিষ্পন্ন করিতে পারেন, কিন্তু পূর্বে বয়স্করণ (sterilization) সংঘটন করা উচিত। ইহাতে কোনই ক্রেশ নাই, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

জনসংখ্যা বিবেচনা করিতে আর এক কথা বিবেচ্য। বিভিন্ন জাতীয় নরনারীর সংসর্গে অনেক সময় জনসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া

থাকে। বাঙ্গালী, মৈথিলী, মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি ভিন্ন জাতীয় নরনারীর মধ্যে যৌন সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে অপত্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার আশা করা যায়। কিন্তু তাহারা কোন কোন অংশে উন্নত, এবং কোন কোন অংশে অন্নত। দেহ বিষয়েও কোন অংশে যোগ্য এবং কোন অংশে অযোগ্য হওয়া সম্ভব। কিন্তু একজাতীয়-গণ মধ্যে, যথা রাঢ়ী, বারেন্দ্র মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রবর্তিত হইলে, বিবাহ ক্ষেত্রের বিস্তৃতি হওয়ায়, অপত্য সংখ্যা এক দিকে যেমন বর্দ্ধিত, অপর দিকে অপত্যগণও পূর্বাপেক্ষা সবল, সুস্থকায়, সুগঠিত হইতে পারে।

সংখ্যা সম্বন্ধে বলিতে গেলে জনগণের অবস্থার কথাও উল্লেখ করিতে হয়। দরিদ্র, অবস্থার ব্যক্তিগণের অপত্য অধিক সংখ্যক হইয়া থাকে; এবং ধনিগণের অপত্য সংখ্যা অল্প। অবস্থা অতিরিক্ত মাত্রায় অর্থশালা হওয়া নানা প্রকারেই অমঙ্গলজনক। একথা ব্যক্তির পক্ষেও যেমন, সমাজের পক্ষেও তেমনই প্রকৃত। সমাজে ধনবিভাগ বেশী হইলে, কেহই অতিরিক্ত ধনবান হইতে পারে না। তাহা হইলে অপত্য সংখ্যাও আশাক্রম হওয়া সম্ভব। বেশী দরিদ্রও নহে, এবং অতীব ধনবানও নহে, এইরূপ সমাজে জনসংখ্যা মোটের উপর উন্নত থাকিয়া যায়। তবে, কালক্রমে উহার স্থান বৃদ্ধি, উত্থান পতন অনিবার্য। সে দীর্ঘকালের কথায় এখানে আমাদিগের বেশী প্রয়োজন নাই।

বিবাহক্ষেত্রের বিস্তৃতির কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাহাদিগের বিবাহ সামাজিক নিয়মের কঠোরতা বশতঃ নিষিদ্ধ অথবা দুঃসাধ্য, তাহাদিগেরও বিবাহ সম্ভব হওয়া

উচিত। এই সকল কঠোর নিয়ম বর্জন করা উচিত। দৃষ্টান্ত স্থলে অতিরিক্ত পণ গ্রহণ এবং বিধবা বিবাহ নিষেধের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল সামাজিক দুরাচার জনসংখ্যা হ্রাস হওয়ার প্রবল কারণ। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই এ সকলের সংস্কার করা যায় না। ইহাদিগের মূল কারণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অনুসন্ধান করা আবশ্যিক। তৎপর তাহা প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত অগ্রবিধ কারণের সমাবেশ করা প্রয়োজন। এতদ্দেশে সমাজ তত্ত্বের নিয়মানুসারে ঐ সকল দুরাচারের মূলানুসন্ধান করা হয় না, সুতরাং ফলও হয় না। যাহা হউক, জনসংখ্যার দিকে বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে সমাজ কোন মতেই পরিপুষ্ট থাকিতে পারে না। বহুবিধ পীড়ার সমাজের জনসংখ্যা হ্রাস করিতেছে। তখন কি কর্তব্য? বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ঐ সকল পীড়ার মূলানুসন্ধান করতঃ তাহার প্রতিবিধান করাই একমাত্র উপায়। তাহা না করিলে সমাজ উৎসন্ন হইবেই, কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। কিন্তু কোন কোন সমাজে একটি অবৈতনিক মন্ত্রী পাইবার নিমিত্ত যেরূপ চেষ্টা ও আগ্রহ দেখা যায়, এ সকলের দিকে তাহার শতাংশও দেখা যায় না। ইহারই নাম দেশ-বৎসলতা !!!

অকাল মৃত্যু ও জনসংখ্যা হ্রাস হইবার আর এক প্রধান কারণ, চিরাগত আচার ব্যবহারের পরিবর্তন। ইহাতে প্রাপ্তবয়স্কদিগের অপেক্ষা শিশুদিগের মৃত্যু অধিক হইয়া থাকে। শিশু-মরণাধিক্যের বহু কারণের মধ্যে বাল্যবিবাহও একটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্দেশে বাল্য বিবাহিত নরনারীর প্রথম অথবা দ্বিতীয় সন্তান বোধ

হয় অনেকেরই শিশুকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। শিশুগণই ভবিষ্যৎ বংশ। তাহাদিগের মৃত্যু সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ভবিষ্যৎ বংশ উৎসন্ন হইয়া যায়। এই সকল এবং আরও নানাবিধ বিষয় বিবেচনা করতঃ যাহাতে সমাজের জন সংখ্যা হ্রাস না হয়, তদ্রূপ ভাবে সামাজিক বিধি সকল প্রণীত ও প্রতিপালিত হওয়া উচিত। তাহা না হইলে সমাজ কখনও উন্নত হইতে পারে না; আর উন্নতি বন্ধ হইলেই অবনতির সূচনা হয়, এ কথা বিশেষ রূপে স্মরণ রাখা কৰ্তব্য।

দেহ।—দেহ সম্বন্ধে প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, দেহ গঠন প্রায় সম্পূর্ণ রূপে বংশানুক্রমের নিয়মাধীন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেহকে কিছু পরিবর্তিত করিতে পারে, কিন্তু এখন আর বংশানুগত বিধানের হাত হইতে ছাড়াইয়া লইতে পারে না। কোন কালেই পারিয়াছে কিনা, তাহাও বিশেষ সন্দেহজনক। যাহা হউক, দেহ এখন প্রধানতঃ বংশানুগত। দেহের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও সবলতা যত চেষ্টা দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি করা যাইতে পারে; কিন্তু সে অধিক নহে। তাহা হইলেও দেহের বল বিক্রম অকস্মাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেই পারে না, এ কথা বলিতেছি না। এখন আর ক্রম বিবর্তনবাদে পূর্ববৎ আদর নাই। অনেক উচ্চ শ্রেণীর জীববিজ্ঞানবিৎ* বিশ্বাস করেন যে, জীব অকস্মাৎ পূর্ব পুরুষগণ অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক জ্ঞানে বিবর্তিত হইতে পারে।† এ কথা সত্য

* Morgan, De Vries, Thomson etc. etc.

† The current belief assumes that species are slowly changed into new types. In contradistinction to this conception, theory of mutation assumes that new species and varieties are produced from existing forms by sudden leaps.

—Species and Varieties by Hugo De Vries P VIII.

হইলে দুর্বল পিতামাতারও অকস্মাৎ অতিরিক্ত মাত্রায় সৰল পুত্র কন্তা হওয়া অসম্ভব মনে করা যায় না। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত অধিক নহে। সচরাচর ও সাধারণতঃ বংশা-মুক্তিমের নিয়মানুসারেই ফলাফল গণনা করিতে হয়। তাহা হইলে বংশদোষ অথবা বংশগুণ অপরিবর্তিত থাকিলে অপত্যের দোষ গুণও অপরিবর্তিত থাকিয়া যাইবে। অপত্য দুর্বল, অবসন্ন হইতেছে; এরূপ স্থলে সৰল উদ্ভূত করিবার উপায় কি? উপায় দ্বিবিধ। প্রথম উপায় পূর্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি— অর্থাৎ সুস্থ সৰল বংশীয়গণের সহিত যৌন সম্বন্ধ স্থাপন। এই নিয়ম বংশ পরম্পরায় প্রতিপালিত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ প্রথমতঃ যেরূপ সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, অবশেষে তাহা আর স্থির থাকে না। এতদপেক্ষা স্থায়ী সুফলপ্রদ উপায় এই:—যাহারা সুস্থ, তেজস্বী, পুষ্টদেহ, তাঁহারা ই অপত্যোৎপাদন করিবেন; অস্ত্রে করিবে না। একথাও পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপ হইলে বংশাহুগত নিয়মানুসারে গুরুশোণিতগত অবস্থার বিকাশ হইয়া স্থায়ী ফলের আশা করা যায়। কিন্তু এই উপায়ে যদি জনসংখ্যা হ্রাস হইবার উপক্রম হয়, তখন এই বিধির কাঠখোঁদ এবং অলঙ্ঘনীয়তা কিছু কমাইয়া দেওয়া উচিত। বিধি নিষেধ প্রণয়ন করিতে অবস্থানুসারে কিছু কিছু পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকা উচিত। ফলতঃ বিবাহ বিধান ভিন্ন যখন জ্ঞাতোৎপাদনের আর কোন বৈধ ও হিতকর উপায় নাই, তখন বিবাহ বিধি সকলের সংস্কারই একমাত্র ভরসা স্থল। যাহাতে

সুস্থ, সৰল, কর্মঠ পুত্র কন্তা লাভ হয়, তদ্রূপ বিধান সকল রচিত ও পালিত হওয়াই চাই। নচেৎ সমাজ রক্ষা হইতেই পারে না।

আমি এইরূপ বলিতে কেহ যেন মনে করেন না যে, আমি সমাজকে একটা কলের মত নিয়মাবধানে চালাইতে চাই। মানব সমাজ (অথবা অস্ত্র কোন সমাজই) কলের মত ইচ্ছানুরূপ পরিচালিত করা যায় না। সমাজ তত্ত্বের নিয়ম সকল দৃঢ়জ্ঞা। কিন্তু যদি প্রযত্নের কিছুমাত্র ক্ষমতাও অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, জীবতত্ত্বের ও সমাজ তত্ত্বের নিয়মানুসারে না চলিলে কোন সমাজই ধ্বংসের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না। এতদ্দেশে বর্তমান সময়ে যদি কেবল মাত্র বিবাহ বিধির সংস্কার উদ্দেশ্যে সমাজের অগ্রগণ্য মিলিত হইয়া বিবেচনা পূর্বক নিয়ম সকল গঠিত করেন, এবং তাহা প্রতিপালন করেন, তাহা হইলেই সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করা হয়। এ কার্য যেমন দ্রুত, কর্মঠ ও তেমনই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু বর্তমান সময়ে কেবল এই উপায়ে কর্ম নিশ্চতরূপে অহুষ্ঠিত হইবার আশা করা যায় না। ইহাতে ভাব বিস্তারের বিশেষ সহায়তা হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বাস্তব পথে সমাজকে পরিচালিত করিতে হইলে কতিপয় অগ্রণী ব্যক্তির, স্বীয় জীবনে, স্বীয় আচারে, তদ্রূপ পথ অনুসরণ করতঃ অপরকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক। এই দৃষ্টান্তই আদর্শ রূপে সমাজকে উন্নতির পথে লইয়া যায়।

শ্রীশশধর রায়।

প্রেম ও প্রকৃতি ।

প্রেম ও প্রকৃতি।—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম প্রণীত, সাহিত্য প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য বার আনা। বাঙ্গালা কবিতার গতি এখন অল্প পথে হইয়াছে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র যে স্বর আলাপ করিতেন, তাহা এখন আর শুনিতে পাওয়া যায় না। নূতন গায়কগণের আবির্ভাবের সঙ্গে নূতন স্বর এক্ষণে আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু জানি না, প্রাচীনত্বের প্রতি আমাদের কেমন অহুঁরাগ, সেই পরিচিত স্বর শুনিবা মাত্র আমাদের চিত্ত পুলকিত হইয়া উঠে, উৎকর্ণ হইয়া আমরা আবার তাহা শুনিতে চাই। সেই জন্য আমরা নগেন্দ্র বাবুর গ্রন্থখানিকে অহুরাগের সহিত পাঠ করিয়াছি। নগেন্দ্র বাবু আর কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার বর্তমান গ্রন্থখানি দেখিয়া মনে হয়, তিনি শিক্ষানবীশ নহেন; অভিজ্ঞের স্থান, অভিজ্ঞের সম্মান তাঁহার প্রাপ্তিযোগ্য।

প্রেম ও প্রকৃতি দশ সর্গে বিভক্ত কবিতা-গ্রন্থ। দুই একজন প্রতিষ্ঠাবান লেখক ভিন্ন এখন আর কাহারও কবিতা বাঙ্গালা সাহিত্যের বাজারে বিক্রয় না। এ সময় মুদ্রণ-সৌন্দর্য্য এবং চিত্রমালায় বিভূষিত করিয়া নগেন্দ্র বাবু যে একখানি কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার অতিরিক্ত সাহসিকতার কার্য্য হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর কবিতাহুঁরাগ এখনও একবারে যায়

নাই, স্মৃতরাং মনে হয়, প্রেম ও প্রকৃতির আদর হইবে।

প্রেম ও প্রকৃতির ভাষা অতি মধুর এবং আদর্শ অতি মহান। কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনে, কি মানব চিত্তবৃত্তির বিশ্লেষণে, কি ভগবৎ প্রেমের উদ্দীপনায়, কবি সর্বত্র তাঁহার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। একই ছন্দে আদ্যোপান্ত লিখিত হইয়াছে বলিয়া এবং একই ভাবের স্থানে স্থানে পুনরাবৃত্তি হইয়াছে বলিয়া, গ্রন্থখানি সাধারণ পাঠকের নিকট একটু নীরস বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহার স্থানে স্থানে এরূপ পবিত্র ও গম্ভীর ভাবের সমবেশ আছে যে, পাঠ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। প্রেমই মানবাত্মার সর্ব্বশ্র, প্রেমই ভগবানকে লাভ করিবার একমাত্র উপায়। কবির নিজের ভাষায় বলিতে হইলে “প্রেমই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম” এবং “প্রকৃতি প্রেমের বিশ্বপ্রেম চিরসংস্থিত।” কবি উপাসকের দ্বারা প্রকৃতিকে আরাধনা করিয়াছেন। একদিকে হিমাচলের ভূবারমণ্ডিত শৃঙ্গে ও পুরুষোত্তমের তরঙ্গ-বিপ্লব বেলাতটে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি প্রকৃতির রূপমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন, এবং অপর দিকে, মালাবারের এলালতা-বিন্ধ তরুকুঞ্জের অন্তরালে, হৃদয়ের কলকলনাদিনী ভাগীরথীর কূল আদীন হইয়া তিনি তাঁহার প্রশান্ত মুখচ্ছবি দর্শনে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছেন। প্রকৃতি তাঁহার নিকট মূঢ় প্রস্তরময়ী জড়শক্তি মাত্র নহেন, চিন্ময়ী দেবী। আর প্রকৃতির

অন্তরালে থাকিয়া যিনি তাঁহাকে রূপ-রস-
গন্ধময়ী করিয়াছেন, সেই সঙ্গে কবি তাঁহারও
সহা উপলব্ধি করিয়াছেন। সমালোচনার
কাব্যের মর্ম্ম প্রকাশিত করিবার আমা-
দিগের অভিপ্রায় নাই, পাঠক নিজেই তাহা
অবগত হইবেন। কবির উদ্দেশ্য কি,
তাঁহার লিখন প্রণালী কিরূপ, বুঝাইবার
জন্ত আমরা তাঁহার কাব্য হইতে দুই চারিটা
স্থান উদ্ধৃত করিয়া এই সমালোচনা শেষ
করিব। কুমারিকা ‘অন্তরীপে’ নামক নবম
সর্গের প্রারম্ভ একরূপ ;—

“ভারতের সীমা শেষ, কি বিচিত্র রম্যদেশ,
কি বিপুল বারিধির ভৈরব গর্জন !

বিলোল নীলাশুরাশি সৈকত চূষিছে আসি,
কুমারিকা-অন্তরীপে বিমুগ্ধ নয়ন ॥”

মালীবারের বর্ণনা এইরূপ ।—

“নারিকেল-কুঞ্জঘন বিকশিত ফুলবন,
সুন্দর শ্যামল কান্তি বনানী ছায়ায়,
জড়ায় পাদপদলে, লতিকা সোহাগে ঢলে
ব্রিহৎ কুঞ্জে বসি কোতুকে কুলায় ॥”

কিন্তু কবি কেবল প্রকৃতির বাণ্য
সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ নহেন, তাঁহার প্রার্থনা এইরূপ—

“দেখাও প্রেমের ছবি হে বিশ্বের মহাকবি !

অমোঘ সাধন ফলে প্রেমের ঐশ্বর ।

যে প্রেম-কলিকা পেয়ে রশ্মির রেখাটা ছেদে,

এই মর্ত্যভূমি তর এতই সুন্দর ॥”

তাঁহার প্রেমের আদর্শ কিরূপ, তাঁহা
নিম্নের কবিতায় ব্যক্ত হইবে ;—

“প্রেমিক প্রমিকা হও, হৃৎথে রও হৃৎথে রও,
প্রেমের সাধনা জেনো নিকাম সাধনা ;
তাজ সুখ, তাজ আশা, তাজ বাঁসনার বাঁসা,
মর-তৃষা নহে প্রেম—ভবের যাতনা ॥”

প্রেমের তৃপ্তি সম্বন্ধে ;—

“সে আশা ক’রনা ভবে, ভাগ্যে থাকে ভোগ হবে
নিবৃত্তিতে প্রবৃত্তির তৃষা কত দূর ।

কঠোর সাধনা হৃৎথে, আজন্ম ব্যথিত বুকে,
প্রেমের লুকান মূর্ত্তি মধুর মধুর ॥”

প্রকৃতির নিকট তাঁহার এই প্রার্থনা
সফল হউক ।

“প্রাণে ঢালিয়াছ সুখা মিঠেছে আত্মার ক্ষুধা,
জনমের চির হৃৎথ চির জীবনান ;

জগতেও এই মত, ঢালি শাস্তি অবিরত,
জুড়াও বিশ্বের দেবি, বিদগ্ধ পরাণ ॥”

কবি দীর্ঘজীবী হউন, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে
এইরূপে প্রকৃতির আরাধনা করিতে থাকুন ।
তিনি এইরূপ কবিতা লিখিতে থাকুন ।
বাক্যলাভা উপকার হইবে। “কাল নির-
বধি পৃথ্বীও বিপুল ॥” বাহারী তাঁহার “সমান
ধর্ম্মা”, তাঁহার তাঁহার কাব্যের সমাদর
করিবেন ।

ত্রিযোগীন্দ্রনাথ বসু ।

বাসন্তী-গীতা ।

ভূমিকা ।

ঐসং প্রাণময়ের প্রেমনিখাস । বিপুল
বিশ্ববংশীর রক্তে, রক্তে সে নিখাস আপু-

রিত হইয়া একতানে পবিস্কুরিত । সেই
একতান সংগীতের তরলিত মর্ম্মোচ্ছাস অশ্রু-
রূপে পরিণত । প্রেম, সঙ্গীত ও অশ্রুর অভি-

ব্যক্তি সৌন্দর্য্য। ফুল, জ্যোৎস্না, কলকর্পে
প্রভৃতি সৌন্দর্য্যের বিকাশ মাত্র। চারুবিক-
শিত প্রেমবৈচিত্র্যের অশ্রুধারী সংগীত-মাধুরী
এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বিষয়ীভূত, এই জ্ঞাত
ইহার নাম বাগমতী-গীতা রাখা হইল।

আভাস।

অনন্ত প্রসারিত অক্ষকার,—অপার,
অগাধ, অনালোক-বিচ্ছুরিত স্বচিভেদ্য অক্ষ-
কার। ভীমশূন্য ঘননিবিড় তমঃপুঞ্জের গভীর
সহায় পরিপূর্ণ। অসীম রহস্তাধার শাস্ত্রত
নভোগুণ ধ্যানস্তিমিত সৌম্যমূর্তি ভাপসবৎ
নিষ্পন্দ, নীরব। বিশ্বপ্রপঞ্চ মাতৃক্ষুশিত জগৎ
শিশুর ছায় গাঢ় যোগনিদ্রাভিভূত;—অবি-
ক্ষুব্ধ, প্রশান্ত;—নিশ্চল, নির্জীব; কিন্তু
বিকাশোন্মুখ, সর্বাবয়বসম্পন্ন, পূর্ণকলেবর—
যেন ফুট ফুট হইয়াছে, অথচ ফুটিতেছে না।

অবতরণ।

দূরে—স্বপ্নময় দিগন্ত কোলে—প্রীতিমন্দা-
কিনীর কবিতাময় তীরভূমে—তিমির যব-
নিকা উদ্ঘাটিত করিয়া বিশ্বপ্রাণের প্রেম-
নিশ্বাস প্রবাহিত হইল। সেই শীতল, স্নিগ্ধ,
পীবনশ্রুন্দী নিশ্বাস-স্পর্শে নিদ্রিত বিশ্বের
বিশাল দেহে সর্বদ্বন্দ্বী রোমাঞ্চ হইল। কবি
কল্পনা-বিহারিনী প্রমদার শিরীষ-কোমল
পদপল্লব-তাড়নে কাব্যকাননের অশোক
বিকাশের ছায়, বৃন্দাবনবিলাসিনী চারুচঞ্চলা
রূপসী রাই বিনোদিনীর তরল বিলোচন
সম্পাতে নীলোৎপলবনবিলসনের ছায়, সেই
নিশ্বাসের উদ্বোধনী শক্তি প্রভাবে নিমেষে
অনন্ত আকাশের স্তরে স্তরে অসংখ্য হাসিত-
চ্ছবি জ্যোতির্ময় সৌরজগৎ ফুটিয়া উঠিল।
মুহূর্তসঞ্চারী নবপলন-হিলোলে প্রকৃতির শ্রাম
অঙ্গে তেরকের পর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল।
পুলকধ্বংস হরিৎপল্লব-শোভিত লতাবিভানের

অন্তরালে অপূর্ণ রূপমাধুরী প্রক্ষুটিত কবিতা
প্রেমের বিপনী খুলিয়া দিল। আর সেই
ক্লম-ক্লম-স্বরভি-সম্পৃক্ত ধীর পমীরচুম্বিতা
অক্ষুটকলনাধিনী স্রোতধিনীর একতানে
স্বর মিশাইয়া বনবিহঙ্গিনী কলকর্পে তান
পুরিল।—পৃথিবী হইতে অগণিত প্রাণিবৃন্দের
আনন্দ কোলাহল বিমান পথে উথিত হইয়া
সেই ভূমা মহান সচ্চিদানন্দের বিজয় মাংমা
উদঘোষিত করিল। অন্তরীক্ষ সেই রিঙ্গর
ঘোষণার হ্রস্বভিনাদে দিগদিগন্তর আলো-
ড়িত ও প্রতিধ্বনিত হইল। ভুলোক, দ্যুলোক
সমস্তের প্রেমময় সর্বৈশ্বরের গৌরবাহুর্কর্তন
করিয়া গাত্রোত্থান করিল, এবং শূন্যবস্ত্রে
নিয়ন্ত্রিত কক্ষে প্রধাবিত হইয়া তাঁহার
আরতি, স্তুতিবন্দনা ও সিংহাসন প্রদক্ষিণ
করিতে প্রবৃত্ত হইল।—বসন্তের সুধাময়
নিশ্বাস স্পর্শে চরাচর অমৃতের অধিকারী
হইয়া নব জীবন লাভ করিল।

প্রেমক্ষরণ।

বসন্তের আবির্ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রীন,—
বসন্তের সঞ্জীবন হিলোলে বিশ্বমালাকে অক্ষুট
আভাসপূর্ণ তমোময় পূর্নরাগের পর বিনোদ-
মাধুরী-বিলসিত জ্যোতির্ময় অহুরাগের সঞ্চার
ও বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সন্মোহন বিকাশ,—এই
জ্ঞাত বসন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ, ইহার তিরোভাবে
নিখিল ভুবনের প্রলয়। প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রেমের
পূর্নহুচনা। প্রাণিজগতে স্বতঃপ্রণোদিত আশ্র-
বিনিময় বা প্রেমের স্বাভাবিক অধিষ্ঠান,
সেইজ্ঞাত বসন্তের আবির্ভাব ঐশ্বর্য্যের অব-
তরণ,—প্রাণময় বসন্ত প্রেমের অগ্রদূত
ও পুরোহিত, বিশ্বরঙ্গালয়ের অন্তরাল-
বর্ত্তিনী প্রচ্ছন্ন প্রেমশক্তির দৃশ্যমান
লীলাভিনেতা। মর্ত্য্য বসন্তের লীলা
কানন, কিন্তু বসন্ত অপার্থিব। যেমন পৃথিবী

জ্যোৎস্নার জ্বীড়াভূমি হইলেও জ্যোৎস্না পার্থিব পদার্থ বিশেষ নহে, চক্রেয় জ্যোতি মাত্র, তেমনই, বসন্তও অপার্থিব,—পৃথিবী ইহার লীলাস্থলী মাত্র। যে দেশের ফুলগুলি চির-অম্লান,—ছুটে কিন্তু ঝরে না, যে দেশের চাঁদ চির-অপ্রকাশ,—উঠে কিন্তু মরে না, শুধু অন্তর্হীন, অবিমিশ্র, নিরবচ্ছিন্ন স্বথ সৌন্দর্য্য খেলিয়া বেড়ায়, বসন্ত সেই জ্যোতির্ময় দেশের অধিবাসী, মর্ত্যে দিব্য সুবমার উৎস রূপে, প্রতিভাত। মর্ত্য ও স্বর্গ—অন্নপ্রাণ ও মহাপ্রাণ—যে অচ্ছিন্ন প্রেমডোরে বাধা, মর্ত্যে বসন্ত সেই প্রেমের ক্ষুধা। কাব্যজগতে কোকিলের সুর সেই প্রেমের পঞ্চম, শিশির সেই প্রেমের অশ্রু, মলয়ানিল সেই প্রেমের স্নিগ্ধ স্বাস, নৈশ গগনে দিগন্তব্যাপি নক্ষীত-ময়ুমাধুর্য্য সেই প্রেমের জীবন্ত ভাবলীলা। বসন্তে অন্তঃপ্রকৃতির প্রেমভিসার। এই প্রেমভিসারের উন্মাদিনী শক্তি প্রভাবে প্রেমিকপ্রাণ অধীর হইয়া অনন্ত অতৃপ্ত অগন্ত্য পিপাসার শাস্তির জন্ত অবলীলাক্রমে আত্ম বিক্রয় করে। প্রেমব্যাকুলতা যখন অন্তর্মুখীন হইয়া সারসব্বাতে সম্মিলিত হইতে অশক্ত হয়, ভ্রান্ত প্রেমিক তখন আত্মার উপ-মিত ছায়াতে আসক্ত হইয়া পড়ে, সেই জন্তই Narcissus স্বচ্ছসলিল দর্পণে স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া প্রেমে মগ্ন হইয়া-ছিলেন। যখন আত্মার ছায়াও অন্তঃক্ষুর বিষয়ীভূত হইল না, তখনই Pygmalion হৃদয়-নিহিত সৌন্দর্য্য রাশি স্বহস্ত-নির্মিত প্রতিমাতে প্রতিফলিত দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলেন।

বসন্তে বাহ্য প্রকৃতির বাসন্ত সজ্জা। নিম্নে শুভ্রবসনা কোমুদীর বিমল উৎসঙ্গে ঘুমন্ত জগৎ, আর সুপ্ত জগতের ভ্রামবন্ধে

ঘুমন্ত কোমুদী—কেমন অভিন্নভাব, কি অলৌকিক নেশা! এমন মাখামাখি, এমন কোলাকুলি, এমন মেশামেশি, হৃদয়ে হৃদয়ে এমন গাঁথাগাঁথি, আত্মার এমন আত্মোৎসর্গ, স্বাতন্ত্র্যের এমন নির্ব্যাণ, একত্বের এমন আহুতি, এমন মদবিভোর, পবিজ, স্বর্গীয় প্রেম কে কোথায় দেখিয়াছ? এ প্রেম বাসন্ত্য প্রেমের ছায়া বা উপছায়া মাত্র। ব্রজলীলায় বিশ্বরূপিনী রাধিকা সে প্রেমের মূর্তিমতী প্রতিকৃতি, গোকুল সে প্রেমের লীলাভূমি, বৃন্দাবন সে প্রেমের কোলকুঞ্জ।

প্রেম ধর্ম্মবন্ধন বা যোগের আরম্ভ ও সোপান,—যোগে প্রেম অঙ্কুরিত ও ক্রমবিক-শিত, যোগেই প্রেম মুকুটীত, পল্লবিত ও মুঞ্জরিত, যোগেই প্রেম অনন্তদলে মাধবী-মাধুরীতে পূর্ণ কুসুমিত। যোগ ও প্রেম চিরন্তন একই গ্রামে সুর বাঁধা,—নেইজন্ত বসন্ত যোগী, প্রকৃতির নিভৃত অন্তঃপুরে মনোজ্ঞ তপোবন সাজাইয়া সমাধিময় বসন্ত যোগানন্দর উপভোগ করে। বিরহে এই প্রেমযোগ সম্যক্ ক্ষুটিত, সেই জন্ত বসন্তে, ব্রজবধুর প্রেমলীলায় বিরহ। এই প্রেম অপরাহ্নের ছায়ার ভায়,—সর্বব্যাপক, বিশ্ব-গ্রাসী, অনন্তপ্রসারী। সার্বভৌমিকতা প্রেমের প্রাণ, সেইজন্ত বসন্ত গৃহত্যাগী বাউল, বিশ্ববাসী উদাসীন, সম্যাস ধর্ম্মের শিক্ষা-গুরু, বৈরাগ্য, উদারতা ও আত্মবিতরণের অবতার।

সঙ্গীতোচ্ছ্বাস।

বসন্তের প্রেমলীলা-রহস্তে প্রাণ বিনিময় সংগীতহৃদবাহী,—প্রেমিকপ্রাণের কথোপ-কথন ও উত্তরপ্রত্যুত্তর, প্রেমিক হৃদয়ের ধ্বনি প্রতিধ্বনি ও দেখাসাক্ষাৎ সঙ্গীতেই সম্পন্ন হয়। সংগীত প্রেমিকপ্রাণের স্বাক্ষর,

প্রেমিক হৃদয়ের তাড়িত বার্তামহ ও Open Sesame, প্রেমচক্রের কেন্দ্রাভিকর্ষণশক্তি । সেই জন্ত প্রেমের প্রবাহে ও পরিণামে সংগীত । বসন্ত সঙ্গীতের আচার্য্য । সুকণ্ঠের কলকণ্ঠ সেই উদ্দাম, উদ্ভাস্ত, অবিরামগুঞ্জরি সঙ্গীতের অব্যক্ত প্রতিধ্বনি মাত্র । গিরি-কন্দরবিহারিণী শৈবলিনী উন্মিষক্ষে যে অক্ষুট প্রতিনিবোধন কলসনে সাগরসঙ্গমে বহিয়া যায়, উদাসী মলয়ানিল যে স্নললিত গাথা গাহিয়া আকুল প্রাণে বনে বনে বিচরণ করে, শ্রামপত্রাবশুষ্ঠিতা কুসুমরূপসী যে মধুর নীরব সুরভিসম্ভারসিক্ত সঙ্গীতে কুঞ্জকানন প্রাবিত করে, বসন্ত সে সঙ্গীতের পূর্বধ্বনি । প্রতিধ্বনি পূর্বধ্বনির পরিচায়ক,—যেখানে প্রেম সেখানে সঙ্গীত । সঙ্গীত প্রেমের রূপান্তরিত নামান্তর মাত্র,—সেইজন্ত বিশ্বপ্রেম-রাজ্যে বসন্ত বিপুলবিশ্বকনোগ্রাহকের সঙ্গীত-সমষ্টি । এই প্রাণকাড়া সঙ্গীতে প্রাণীর প্রাণিষ বিলোপ হয়, চরাচর আত্মহারা হইয়া, নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়া—সেই এক ভুবন-ভুলান, মোহন, জীবন্তসঙ্গীতে লয়প্রাপ্ত হয় । এই আত্মবিলোপ যখন হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন পাখী আর পাখী থাকে না, একটা চিত্তহারী বন্ধার, একটা ভ্রমণশীল অশরীরী বাণী, অথবা একটা জীবন্ত অদৃশ্য প্রহেলিকা বলিয়া অনুভূত হয়, অসেনচক স্নকুমার শিশু-টীকে প্রেমলীলায়িত অক্ষুটকাকলি ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না, তরলতা সঙ্গীতের এক একটা উন্মাদক সুরে পর্য্যবসিত হয় । এইখানেই বসন্তের পরিণাম, প্রাণের বিলয়, প্রেমের সমাধি ।

অতীক্স খুলিয়া দেও । একবার পূর্ণেন্দু কিরীটিনী নক্ষত্রকুন্তলা মাধবীবামিনীর দিগন্ত প্রসারিণী ভুবন উজলা সৌন্দর্য্যছটার দিকে

একটু অবহিতচিত্তে দৃষ্টিপাত কর । দেখ নীরব, নিস্তব্ধ, সুষুপ্ত গগনপটে সুধাংগ মদালসমহুর গতিতে ছুটিয়া বাইতেছে, দিগ-দিগন্ত প্রাবিত করিয়া জ্যোৎস্নার স্রোত বহিতেছে ; সেই উচ্ছ্বসিত চন্দ্রকিরণের স্নিগ্ধ হিলোলে ব্রহ্মাণ্ডকে প্রেমোন্মাদে অস্থির করিয়া তুলিতেছে ; সমীরণ মুহু মধুর লহরী সঞ্চালন করিয়া বিশ্বপ্রেমকোলে একটুকু সোহাগ মিশাইতেছে,—কি যেন একটা সৌন্দর্য্যের কুহকমাথা ঐজ্জ্বলিক মায়া মন্মথ ব্রহ্মাণ্ডকে ছাইয়া ফেলিয়াছে । এই নিখুম নিশীথে সূদূর কাননবিবর আপুরিত করিয়া কি একটা অব্যক্তনাদী কলবিহঙ্গম-কণ্ঠবৎ মধুর, মনোমোহন, উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতধ্বনি উথিত হইল,—নিখিলপ্রকৃতি সেই জাগ্রত জীবন্ত সঙ্গীতে সাড়া দিল, জ্যোৎস্না বৃক্ষ-চ্ছায়ার সহিত জড়াজড়ি করিয়া নবশপথচিত সেই কাননপ্রান্তের শ্রামশয্যার ঘুমাইয়া পড়িল,—চতুর্দিকে পাখীর সমন্বরে উল্ধধ্বনি করিল, ফুলেরা বিচিত্র মালা রচনা করিয়া ফুটিয়া উঠিল,—আর পবন সেই বিকচবন-প্রস্থনরাজির সুরভিভার ছড়াইয়া দিগন্তনা সহচারিণী নিশীধিনীর তারকাহীরকমণ্ডিত বেণীবিনায়িত চিকুরদামে পরিমল-পরিপ্লুত কুসুমরেণু মাখাইয়া দিল এবং রজতকৌমুদী-প্রফুল্ল প্রেমোৎফুল্ল ব্রহ্মাণ্ডের প্রীতিগাথায় সুর বাধিয়া সৌগন্ধমদিরার বিভোর হইয়া কুঞ্জে কুঞ্জে ছুটিয়া গেল । এই কাননোথিত সুর-কণ্ঠনিঃসৃত সংগীতে, এই মনোমোহন বাণীর সুরে, প্রাণের নিভৃতনিরালা, ভাবপুঞ্জের লীলা-ভূমে, কেমন একটুকু ছায়ারূপী আবেশময় ভাবের মদিরা ঢালিয়া দিল, প্রাণ আর ঘরে থাকিতে চায় না, পাখা বাধিয়া উড়িয়া উড়িয়া আকাশের কোলে, পাখীর খোলে,

তটিনীর কলস্রনে, ঐ জোছনার প্রাণে মিশী-
ইয়া যাইতে চায়। ঐ যে বাশীর লীলাময়ী
স্বরলহরীর পেছনে কি' একটা তানলয়সংযুক্ত
বাস্ময় সংগীতের মত অক্ষুট আধ আধ সুর
উঠিতেছে, আকুলপ্রাণ দেহ ছাড়িয়া সেই
মোহময় আবিলতাজড়িত সঙ্গীতস্রের পিছু
পিছু ছুটিয়া দূরদিগন্তের পারে কোথায় কোন্
সৌন্দর্য্যরাজ্যের প্রান্তদেশে হারাইয়া যাইতে
চায়। 'বুঝি ঐ মুরলার আবেশময় সুরে—ঐ
প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতের স্বপ্নময় ঘুমঘোরে, প্রকৃতি-
রূপিনী প্রেমময়ী রাধা কুলত্যাগিনী, গৃহত্যাগিনী
হইয়াছিল! আজিকার এই উৎসবময় দিনীখে
সৌন্দর্য্যের কামকাননে, জড়ে জড়ে, চেতনে
অচেতনে, ইন্দ্রিয়ে অতীন্দ্রিয়ে কি একটা মধুর
সামগ্রীর আদান প্রদান চলিয়াছে। ঘোমটা
খুলিয়া ফুলবনিতা প্রাণ ভরিয়া বৃকের মধু
পিয়াইতেছে, গুঞ্জোন্মত্ত মধুকর সেই মঞ্জুকুলে
গুণগুণিয়ে ফুলমধু লুটিয়া লইতেছে। বাক্য-
ক্ষুধি নাই, অগচ নীরবে প্রেমমালাপ চলি-
য়াছে,—প্রেমালাপ এই ভাবেই চলিয়া থাকে।
প্রেমালাপ মুখে নয়, বুকে; ভাষায় নয়,
ভাবে। একটুকু স্বচ্ছ, স্তূর্ণিশীল হাসিতে,
একটু ম্লিন, পবিত্র চাহনিতে, ছই এক ফোঁটা
সরল, অকৃত্রিম অশ্রুপাতে হৃদয়ের কত রাশি
রাশি কথা ফুটিয়া পড়িয়াছে, ভাষায় তা ফুটা-
ইতে পারে নাই। প্রেমিকের চাতকত্ববা-
-বিস্ফারিত নয়ন, চকোবীর চঞ্জিকালোলুপ
চক্ষু, আকুলবক্ষের কাতর আর্তনাদে
মুগ্ধিত। মাদুরের ভাষা তো নিরেট প্রত্যাক,
অতি চতুর প্রবঞ্চক; মনের প্রকৃত ভাব
গোপন করার, কেমিকেল প্রেমে—গিল্টির
আবছায়ায়—লোক ভুলাইবার এমন
সহজ সঙ্কেত আর নাই, আত্মপ্রবঞ্চনারও
বুঝি আর এমন অপক্লপ কোশল নাই।

মাদুরের ভাষা প্রেমপথের বিষম পরিপন্থী।
প্রেমালাপ এই ভাষায় চলে না, তাই মনের
একটা স্বতন্ত্র, নীরববাগ্মিতাপূর্ণ ভাষা সৃষ্টি
হইয়াছে। এ ভাষা আত্মবাক্য বা পরহস্তারক
নহে, ইহা মরণের ভাষা নহে; জাগরণের
ভাষা,—নীরব, অগচ কখনশীল, প্রেম-
সমাচার ভ্রমিত, উদ্বোধনী ভাষা। এই
ভাষার বৈজ্ঞাতিক প্রভাবে বধিরতা দূর হয়,
মাদুর Pythagoras এর জ্ঞান জ্যোতিষ্ক-
মণ্ডলের সফরগে অতিজাগতিক সঙ্গীত
শুনিতে পায়। যে ভাষায় অন্তঃপুর ও বহি-
রকটীর কথায় দ্বন্দ্বকন্ডের সুর নাই, আজ
এই মধুযামিনীতে সেই ভাষায় প্রেমমালাপ
চলিয়াছে। Orpheus এর বীণার স্বরকারে
যে মদিরাময়ী ভাষা শুনিয়া তকলতা মন্ত্রমুগ্ধের
জ্ঞান নাচিতে নাচিতে স্বস্থান হইতে বিচলিত
হইত,—গোপেন্দ্রনন্দন ব্রজহুলালের বেণু-
ধ্বনিতে যে ঐক্সজালিক ভাষা শুনিয়া ধেমু-
বৎস গোষ্ঠে ফিরিয়া যাইত, লীলারসময়
শ্যামচাঁদের সপ্তরঙ্গ, মোহন বংশীর বিনোদ-
বাদনে যে কুহেলিকাময় ভাষা শুনিয়া উচ্ছলিত
যমুনাবারি উজ্জ্বল বহিত,—Amphion এর
বীণানিশ্বনে যে চিত্তবিমোহিনী ভাষা শুনিয়া
স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রস্তরশ্রেণী Troy এর প্রাচীর
সংগঠিত করিয়াছিল,—রাখালশী বনমাণী
মূলীবিলাসে যে উদ্বোধনী ভাষা শুনিয়া
বৃন্দাবনে—রাসরসস্বরীর সেই মুকুলযৌবনের
লীলাকাননে—এককালে ষড়ঋতু সমুপজাতি
হইত, আজ সেই অলৌকিক ভাষাহীন ভাষায়
কথাবাক্য চলিয়াছে। এই নীরব ভাষা
সংগীতের মুকুটমণি,—কখনশীল ভাববৈচিত্র্যের
সম্মোহন স্ফূরণ,—প্রাণেব আবিল তরঙ্গ-
লীলার মর্ম্মস্পর্শী আকুল আর্তনাদ! 'এই'
সঙ্গীত নিত্যাবী, অবিধ্বংসি। তাই এখনে

স্বপ্ননা তাহে যুগযুগান্ত-উচ্চারিত সামগানের
অক্ষুটরাগিণী গুনিতে পাওয়া যায়, অতীতের
কত বিবাদছায়ামণ্ডিত ক্ষীণপ্রতিধ্বনি আমা-
দের প্রাণের অন্তঃস্থল আলোড়িত করে,
অদৃষ্টের পূর্ণাভাস ও লুপ্তস্মৃতির আগরণ
হৃদয়কন্দরে মহুত হয়, স্বপ্নে সত্যের প্রতিষ্ঠা
হয়, বিশ্ববিধানের স্বরবিকাশ নিগূঢ় প্রেমা-
লাপে প্রতি আশ্রয় আশ্রয় উদ্বোধন-কার্য
সম্পাদন করে। এই প্রেমপ্রসঙ্গে বা প্রাণ-
বিনময়ে ব্রহ্মাণ্ডটা একটা সৌন্দর্যের পণ্য-
বীথিকা, সঙ্গীত ইহার ভিত্তি ও গ্রন্থী,—
অন্তঃসলিলা কস্তুর ত্রায় অন্তরে অন্তরে স্রোত
বাহিয়া চলিয়াছে। এই যে সৌন্দর্য্যে অভি-
ব্যক্ত প্রেমবিপণী ব্রহ্মাণ্ড, সঙ্গীত ইহার সমস্ত
অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে একটা অদৃশ্য বাঁধনে বাঁধিয়া
রাখিয়াছে, সঙ্গীতের মাধ্যাকর্ষণে ব্রহ্মাণ্ড
হিন্নবৃত্ত, ভ্রষ্টলক্ষ্য হয় না। সঙ্গীত সমগ্র বিশ্ব
জুড়িয়া স্তরে স্তরে, পরতে পরতে, গুচ্ছে গুচ্ছে
ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে। ইহা চিরন্তন, অবি-
কৃত ও মৃত্যুহীন। জলধির কল্লোলে কল্লোলে
এখনও Saphor শোকগাথা Phonograph-
ধৃত সঙ্গীতবৎ গুনিতে পাওয়া যায়, বাঁকা
শ্যামের বাঁশরীর গান এখনো আভীর পল্লীর
হাওয়ায় মিশিয়া রহিয়াছে, জিবেগীর ঘাটে
অসংখ্য আর্ত নরনারীর কত যুগযুগান্তরের
আকুল আর্তনাদ এখনো প্রতিনিয়ত প্রতি-
ধ্বনিত হইতেছে, জয়দ্রুধিনী জননীর সক্ররুণ
বিলাপধ্বনি বুঝি আজিও অশোককাননের
তরুণাথে বাঁধা রহিয়াছে, যমুনাগুলিন বুঝি
এখনো সুরারিমোহনের কথা মনে করাইয়া
দেয়, একটা মাথুর গুনিলে প্রাণ কি
একটা অজানা পুলকে পুরিয়া শিহরিয়া
উঠে,—অতীতে বর্তমানে, মৃতে জীবিতে
কেমন ঐধুর দেখা সাক্ষাৎ হয়। সঙ্গীত

প্রাণের কি সুন্দর বাহন! সঙ্গীতে আরোহণ
করিয়া প্রাণ কত পূণ্যতীর্থে বিচরণ করে,
কত কুসুমস্বাসের আশ্রাণলয়, কত রমণীয়
দৃশ্য, কত কমনীয় দ্রব্য সন্দর্শন করিয়া বিমল
আনন্দ রস উপভোগ করে! হায়, কেন সহসা
এই রুদ্ধবন্ধোনিহিত স্মৃতির সমাধি উন্মোচিত
হইল!—মনে পড়িল আমার পুরাকালের
কুসুমজীবনের কথা। সেই মধুর জীবন-
বসন্তে আমার একটা কোকিলবন্ধু ছিল, এই
সুত্র প্রাণটার যখনই উড়িবার ইচ্ছা হইত,
তখনই তাহাকে তাহার সুললিত 'বরলহরী
বিস্তার করিতে বলিতাম, আর আমার পিক-
সখা ভাববিহ্বল হইয়া যাই সঙ্গীতে তান
ধরিত, অমনি প্রাণবিহগিনী উন্মাদিনী হইয়া
সেই সঙ্গীতে চড়িয়া জীবনের সঙ্গীর্ণ গণ্ডি
অতিক্রম করিত এবং আকাশের মুক্তবায়ুতে
উধাও হয়ে কোথায় ফোন সুরপুরে যাইয়া
অনন্ত সঙ্গীত-সিন্ধুতে ডুবিয়া হারাইয়া যাইত।
সঙ্গীতের কি অপরিমিত শক্তি! বুঝি তাই
ঋষিগণের নিকট দৈববাণী হইয়াছিল "গানাৎ
পরতরং নাহি।" এই সঙ্গীত-প্রতি রূপ দর্শ-
নের পূর্বগামী। বৈষ্ণব কবিগণের অমর
পদাবলী শ্রবণ করিলে সমস্ত বৃন্দাবন দৃশ্য-
বলী আসিয়া চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়।
সঙ্গীত অতি সহজেই মূর্তি পরিগ্রহ করে।
এই যে ফুল, এই যে জ্যোৎস্না, এই যে ক্ষুট-
নক্ষত্ররাজি আকাশমণ্ডল,—এ সকলই
ঘনীভূত সঙ্গীত মাত্র। এই সঙ্গীতে ফুলবাস
ও নক্ষত্র কিরণে স্বর্গে মর্ত্যে কথাবার্তা চলে,
—এই সঙ্গীতে মেঘমালা আকাশ বাহিনী কে
জানে কোথায় ছুটিয়া যায়,—বুঝি নক্ষত্রেরা
বাঁশী বাজাইয়া ডাকিয়া লইয়া যায়,—এ
সঙ্গীত প্রেমের রাখীবন্ধন। কোকিলের
ঝকার, ফুলের পাপড়ি, বসন্তের ক্ষুণ্ণ,

প্রাইটের সেই “মেঘদূত”—এ সঙ্গীতের এক একটা মোহন সুর। তাই কবি সেই গভীর, পবিত্র দিনে,—যেদিন কালের করাল চূষনে দেহকুসুমিকা ঝড়িয়া পড়িবে, সেই মৃত্যুদিনে, ইহ পরকালের সন্ধিস্থলে একটা ফুল দেখিয়া মরিয়া চাহেন, অথবা swan পাখীর জ্ঞায় সঙ্গীত-কণ্ঠে পরলোকস্থ হইতে ইচ্ছা করেন। প্রেমের, পরিণতি এই সঙ্গীতসুরে। সেই জ্ঞাত Echo অশ্রুগীতী হইয়া এখনো আকুল প্রাণে প্রতিধ্বনি করিয়া বেড়ায়, নিরাশ প্রেমে Echoর দেহ শুকাইল বটে, কিন্তু সঙ্গীতাত্মক যে প্রাণ, তাহা এখনো বনে প্রান্তরে, অচলে গহনে, বাপীতটে, শৈবলিনীর সিকতাময় পুনিনে,—যেখানে সেখানে—তরুলতা কাঁপাইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া যায়।

সঙ্গীতের বাড়ী স্বর্গে—মর্ত্যে সেই সুরলোক হইতে অবতারিত। তাই এখানে দেবাদিদেব ত্রিলোচন তাহার প্রবর্তক। ভোলা মহেশ্বর শিখা ফুকাইয়া অশানে অশানে ঘুরিয়া বেড়ান,—কারণ অশান আধ্যাত্মিকতার অন্তিম পীঠস্থান, পার্থিব জীবনের শেষ লীলাবাস, শোকহৃৎখের সমাধিক্ষেত্র, ইহ পরকালের সেতুবন্ধ, স্বপ্নময় ভবিষ্য জীবনের তীরভূমি;—অশানে না গেলে মানুষ সঙ্গীতের মাধুর্য্য, সঙ্গীতের স্বর্গীয় ভাব ভাল করিয়া বুঝে না, সঙ্গীতকে স্থায়ীভাবে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারে না, চোখের সম্মুখ দিয়া বিদ্যুৎ চম্কাইয়া কি জানি কোথায় লুকাইয়া পড়ে, প্রাণে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। এই অনন্ত জীবন ও অনন্ত মরণের রাজ্যে আমাদের জীবন-অশানে প্রেমময়ের উৎখলিত আত্মা সঙ্গীত আমাদের আগরণের জন্তই নিরন্তর নিনাদিত হইতেছে। এই

সঙ্গীতই মহিব-পল্লব বটারব। মৃত্যুর অর্থ আর কিছুই নহে,—পৃথিবীর লীলাখেলা এড়াইয়া সেই জ্যোতিষ্মন সঙ্গীতাত্মক প্রাণ বা প্রাণাত্মক সঙ্গীতে উদ্ভূত, পরিণত ও লীন হওয়া মাত্র। সঙ্গীতের অঙ্গীমে মিলন, সাকারের নিরাকারে অবসান, শরশয্যায় বাসর শয্যায় সমাপ্তি, মৃত্যুর চিন্ময়ে পরিণতির নামই মৃত্যু। ইহা অমৃতেরই সোপান। ইহাই বোগীর বোগ, তাপসের তপোধন ও সমাধি, ভক্তের ভাগবত সিজি, কবি কল্পনার পরিণামকুঞ্জ, ধর্ম ও দর্শনের চরম তীর্থ। ইহাতেই বৈতবাদীর তত্ত্বমসি, ইহাতেই বৈদান্তিক অবৈতবাদীর সর্বোচ্চ সাধনার সাহসং।

৫

অশ্রুমাধুরী।

মিলনের এই মহাতবে অশ্রুর সুরময়ী পূর্ণমুষ্টি নীরবগুপ্তিত। অশ্রুই পার্থিব প্রেম-সঙ্গীতের পূর্ণবিকাশ ও পর্যাবসান। এই বিকাশে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিশদরূপে পরিষ্কৃত হয়, কারণ অশ্রুসিক্ত প্রেমই সৌন্দর্য্যের পূর্ণ নিলয়। মানুষ আবহমানকাল প্রেমের সেবক, সৌন্দর্য্যের উপাসক। যখন মোহ-নিদ্রা ভঞ্জে মানুষ জাগ্রত হয়, তাহার বাধিধ্য অপনীত ও অন্তশুদ্ধ উদ্ভীলিত হয়, তখন হৃদয়ের উদ্ভুক্তগবাক্ষে, প্রাচীবাভাসনে উবার রক্তিমচ্ছটার জ্ঞায়, সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধোজ্জ্বল লাবণ্যচ্ছটা হৃদয়ের দিগ্বলয় বিভাসিত করে। অন্ধকার অন্তর্হিত হয়, এবং নৃত্যতী বাসন্তী বল্লরীর জ্ঞায় সৌন্দর্য্যের বিলাসনৃত্য প্রাণ-রক্তভূমিকে তরঙ্গায়িত করে। এই সৌন্দর্য্য-বিকাশে মুখের হিরণ্ময় হয়, হিরণ্ময় জ্যোতি-র্দ্বয়ে পরিবর্তিত হয়, আধিভৌতিক আধ্যাত্মিকে পরিণত হয়। মানবের অন্তরে নাহিরে যে সৌন্দর্য্য বিখরোচয় উদয়সাং করিয়া

বিদ্যাজিত রহিয়াছে, যাহার বিবাহ বন্ধনে মানব জীবন ইন্দুকর-প্রফুল্ল-বিকচ-কুমুদ স্বয়মাময় হয়, সেই অপার অপরিণীম সৌন্দর্য মুকুরে করিনিকুরষ প্রতিবিষবৎ, নিখিল অক্ষি-গোলকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ছায়াবৎ, একটা ক্ষুদ্র অশ্রুবিন্দুর স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত। নিশীথের ঘূমে ঢলু ঢলু জ্যোৎস্নালহরী, কলস্ত-বাত্যান্ধোলিত কাননবল্লরীর চঞ্চল লাবণ্য, যুথিকামরী সন্ধ্যার ক্রোড়ে যৌবনের নাগর দোলায় মৃদু পবন হিল্লোলে ফুল প্রস্থনের মন্দদোলনি—সকলেরই পরিণাম ঐ অশ্রু। যেমন সংগীতের উৎস—কবিকুঞ্জের অমৃত-প্রস্রবণ—তুবনবিজয়ী কুউরব, তেমনই সমগ্র সৌন্দর্য্য সমষ্টির নির্যাস বা ঘনসার, পূর্ণ অভিব্যক্তি ও এক কেন্দ্রস্থল—ঐ বিশ্বসৌন্দর্য্যের তিলোত্তমা অশ্রু। মানব হৃদয়ের দেবোত্তর ভূমিতে ইহার অধিবাস। মানব সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে মুগ্ধ হয় সত্য, কিন্তু ইহার সমষ্টি ভীমকান্তি অশ্রুবিন্দু তাহার প্রাণে বিভীষিকা উৎপাদন করে,—কারণ ইহার অসীম সৌন্দর্য্য স্থল দৃষ্টির বিষয়ীভূত নহে, ইহা অতীন্দ্রিয় গোচর। যখন মনের সহিত সুর বাধা হয়, তখনই ইহার স্বরূপ ভাসমান হইয়া ফুটিয়া উঠে। বৃন্তহলাল রসফুল কুসুমের স্নিগ্ধ লাবণ্য, প্রমদার স্নেহময় বিলোল কটাক্ষ, বালেন্দ্রবিচ্ছুরিত কুমুদিনীর শীত রশ্মি—এ সমস্তই অশ্রু সৌন্দর্য্যের নিকট পরাভূত। পরিমলবাহী প্রভাত পবনের কুসুম নিখাসের জীবন্ত পরিণাম যেমন কবিতাময়ী প্রকৃতির শিশিরাশ্রুবিন্দু, তেমনই দ্রবীভূত—প্রেম বা তরলিত সঙ্গীতোচ্ছ্বাসের পরিণাম সেই সৌন্দর্য্যের পূর্ণনিধান অশ্রুকণা। যদি কোথাও হৃদয় বিকাইয়া, হারাইয়া থাকে, তবে দেখিরাহ, একবিন্দু নিখিল অশ্রু প্রভাবে

হৃদয় প্রেম-সোপানের কত উচ্চে আরোহণ করিয়াছে। হায়, মানুষের প্রতি নিখাসে, প্রতি দৃষ্টিসম্পাতে কত অশ্রু সিঁদাঘসারাহু-সমীরবৎ হায় হায় করিয়া অহুক্ষণ আকাশে মিশাইয়া মরিয়া যাইতেছে, হৃদয়ের নিভৃত-কন্দরে শৈশব স্মৃতির ছায় কত মধুর স্মৃতি প্রতিনিয়ত কত অশ্রু ঝরাইতেছে, কেহ তাহা লক্ষ্য করে না!—নিজ্জনে উদ্বৃত হয়, নিজ্জনেই বিলয় পায়। কত স্নকুমার শিশু স্নোহাগ ভরে ভাবাবেগ-পরিপ্লুত হইয়া আচ্ছাদে গলিয়া অশ্রুরূপে উছলিয়া পড়িয়াছে, কত রূপসী স্ফুটনোন্মুখ যৌবন মালঙ্ঘের পুষ্প-বজ্রার তরঙ্গাভিবাতে অশ্রুতে পরিণত হইয়াছে, কত Eloisa যৌবনে যোগিনী হইয়া মূর্ত্তিমতী অশ্রু-কণিকা হইয়াছে, কে তাহার গণনা করে! যে অশ্রুর প্রভাবে এই কটকাকীর্ণ সংসার নন্দন-কানন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, হৃদয়ের দগ্ধ মরুভূমে শত কুবলয় ফুটিয়া উঠে, যে অশ্রুর তিরোভাবে মানুষ দেবত্ব হারাইয়া দানব হয়, যে অশ্রুর বৈদ্যুতিক স্পর্শে সমগ্র হৃদয় আলোড়িত করিয়া সৌন্দর্য্য রাশি উথলিয়া উঠে, মানুষ কিনা সেই অশ্রু হইতে দূরে থাকিতে চায়! নিশীথের শাস্ত জ্যোছনার গভীর অরণ্যাগী ভেদ করিয়া যে সঙ্গীতস্রোত মর্ত্যালোক পরিত্যাগ করিয়া অনন্তের দিকে ধাবিত হয়, যাহার পুত্ৰহিল্লোলে পুণ্যতীর্থের স্নাত তপস্বীদের ছায়া অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান বৃক্ষরাজি শিশিরাশ্রু ঝরাইয়া দেয়, সেই সঙ্গীতেরও পরিণাম ঐ স্বচ্ছ নিখিল অশ্রু,—ঐ ভড়ীভূত বিধোদর পুণ্যক্ষেত্রে, মুনি ঋষির তপোবন, যোগতাপসের নৈমিষারণ্য, স্বর্গের সোপান, মুক্তির পুষ্পরথ। সত্যদেহকে মহেশ্বরের যে অশ্রুসিক্ত শোকাব্রততা। ইহারই নাম

বাগ। এই অশ্রুতেই প্রেমযোগের বন্ধনী
সাম্যের বীজমন্ত্র নিহিত। রুদ্রভেজে কুসু-
মিতা ব্রততী পুষ্পে পল্লবে শুকাইয়া যায়, স্নিগ্ধ
শিশির সিকনে তাহার ক্ষুধি,—সেইরূপ
হাসিতে পুষ্পি হৃদয়োত্থানের কুলগুলিকে
নির্মীলিত করে, অশ্রু ইহার ক্ষুধি বিধায়ক।
সংসারের সমস্ত আগুন নিবাইয়া অশ্রু শান্তির
উৎস্বরূপ মানবকে আশা ও আশ্বাস প্রদান
করে,—তাই বৃষ্টি স্থবি কল্পনায় বাড়বানলের
স্থান সমুদ্র গর্ভে—অশ্রুসমস্তির নির্বাণকোলে
—নির্দীপ্ত হইয়াছে। বিচিত্র লীলাপূর্ণ জগ-
তের পাণ্ডশালায় অশ্রু ক্ষণস্থায়ী অতিথি,
বিদ্রাবতার ছায় চমকে জদয়াকাশকে আলো-
কিত করিয়া নিমেষে অন্তহিত হয়, তাই
অশ্রুর সহিত অনেক স্থলে মানবের ঘনিষ্ঠ
পরিচয়ের অভাব। সাক্ষ্য তারকা ও উষার
ক্ষণালোকের ছায় অশ্রুর ভিতরেও একটু
শান্তিপূর্ণ স্নিগ্ধ হাসি আছে, তাই মানুষ সাক্ষ্য
ও উষাকে এত ভালবাসে। এ হাসিতে
চাঞ্চল্য নাই, ইহা গাভীর্ঘ্যাপূর্ণ। অশ্রু কবি,
—শোকেই শোকের উৎপত্তি। মানুষের
নয়নাসার অশ্রুর সামান্য বাহ্য বিকাশ মাত্র;
অন্তর্বিকাশে ফুল, পল্লব, লতাকুসুম, শৈবালিনার
জলকল্লোল, নিদাঘের পত্রমর্শ্বর, এ সকলই
ঘনীভূত অশ্রু। তাই Narcissusএর প্রণয়
সংগীতের পরিণাম ফুল। শ্রামসুন্দরের বংশী-
ধ্বনির পরিণাম অশ্রু না হইলে মানিনার মান
ভীষিত কি? সাগরের উর্মি সংবাতে Sapho
তাঁহার অশ্রুসিক্ত শোক সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি
গুনিতে পাইয়াছিল, এক একটা সমাধিস্তম্ভ
আখিজলের পাষাণমূর্তি ব্যতীত আর কি?
ব্রহ্মজ্ঞ জৈশা বিশ্বপিতার প্রেমনিম্বসিতের ছায়
প্রোবৃত্ত হইয়া অপরূপ সঙ্গীতলীলা করিয়া
জগতের আনন্দোত্তম অশ্রুতে পরিণত হইলেন!

৬

পর্যাবসান।

প্রেম চিরনবীনত্বপূর্ণ, তাই বসন্ত চির
নবীন। প্রোচের গাভীর্ঘ্য, যুবতীর বিলাস-
ভঙ্গি, কিশোরের চিত্তচাঞ্চল্য, বয়ঃসন্ধির
আবেশময় মদবিভোর ভাব,—বসন্তে এ সক-
লই আছে, অথচ বসন্ত চিরযুবক;—যৌবনে
বসন্তের পূর্ণ ক্ষুধি। প্রেম সৌন্দর্যের প্রস-
বণ, তাই যৌবন বড় সুন্দর। বসন্তে সেই
সৌন্দর্যের চরম বিকাশ, কলকণ্ঠে সে বিকাশ
সঙ্গীতরূপে নির্গত। ফুল সে সৌন্দর্য্য ক্ষুদ্র
জদয়টি ভরিয়া পুরিয়া রাখে, সেইজন্ত ফুল
সুন্দর। সৌন্দর্য্য কোমলতা আছে, কোম-
লতায় স্নিগ্ধতা আছে, তাই ফুলশয্যা এত
মধুর, এত সুস্বিক্ত, সুকোমল, সুন্দর;—তাই
বিবাহবাসরে ফুলশয্যা বিদ্যায়। প্রেম; সৌন্দর্য্য,
সঙ্গীত, নবীনত্ব আর প্রাণ—এ সকলই
কাব্যের উপাদান, সেইজন্য বসন্ত কাব্য।
শুধু কাব্য নহে, একটা আত্মস্থরহিত মহা-
কাব্য। এ কাব্যের নিকট মানুষের মহাকাব্য
অতি অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ হইতেও তুচ্ছ। যে
অনন্ত প্রেম, অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত সংগীত
লইয়া বসন্ত, পৃথিবীর বড় বড় মনীষীগণ সেই
গুলির আভাস মাত্র পাইয়া এক একটা অমর
কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবী হইতে
বসন্ত সম্ভোগ নির্বাসিত কর, পৃথিবী সমস্ত
হারাইয়া একেবারে কবিতাশূন্য, প্রাণশূন্য
হইয়া পড়িবে। এ বড় বিষম মায়া, বড়
হর্ভেত্ত সমস্তা। প্রাণীর সত্তাবিন্দু যখন এই
কুহেলিকাময় সমস্তার রহস্তসিদ্ধিতে বিলীন
হয়, তখনই নিত্যসান্নিধ্য ও অনন্ত মিষ্টান।
ইহা বিশ্বনিয়ন্তার আশাকুসুমাত্মীর্ণ চিরনবী-
নত্ব পূর্ণ বিধান। এই স্বপ্নময় প্রহেলিকার,—
এই প্রহেলিকাময় স্বপ্নের—সম্যক্ রহস্তো-
দঘাটনের নামই জীবনমুক্তি। শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়।

অদেশ-প্রেরণ (৩)

১. সামাজিক ।

২য়—অঙ্ক ।

স্থান দেবভবন ।

কালরাত্রি ।

উত্তমানন্দ স্বামী—বক্তা ।

বক্তৃতা হইতেছে—*

আমাদের সমাজকে আত্ম পীড়ন হইতে রক্ষা করা আবশ্যক । আমি ভরসা করি, অল্প বাঁহারা এই “দেবভবন” সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা হিন্দুধর্ম-বিরুদ্ধ আত্ম-মর্যাদা-বিরুদ্ধ, ঘৃণিত “বণিক বিবাহ প্রণালী” বন্ধ করিয়া, হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত, যুক্তি-সম্মত, সর্ব ধর্ম-অনুমোদিত, সর্ব সমাজের মঙ্গলজনক বিশুদ্ধ বিবাহপ্রণালী প্রচলিত করিবার জন্য দলবদ্ধ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন । আমাদের বিশ্বাস, শুভ কার্য্য করিবার জন্য, সমাজের মঙ্গলজনক অনুষ্ঠানের জন্য, ভারত-বর্ষে এক্ষণে একটা মাহেঞ্জ যোগ উপস্থিত হইয়াছে । সংকার্য্য করিবার জন্য, হাজার হাজার লোক, সহস্র সহস্র যুবক, প্রস্তুত হইয়া, দলপতির ও পথ নির্দেশের জন্য, অপেক্ষা করিতেছেন । আমাদের বিশ্বাস, সহস্র বিশুদ্ধচিত্ত যুবক ঘুরিয়াছেন, সমাজের সংস্কার না হইলে, সমাজ নীচ বণিক প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হইতে থাকিলে, কোন দিন দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে না । তবে তাঁহাদের পথে কুতর্কের কণ্টক আছে । সেই কণ্টক উন্মূলিত করা আবশ্যক । পাপের স্বভাব, সে যে লোককে কেবল প্রলুব্ধ করে, তাহা নহে, পাপ-বিচার-শক্তিকে নষ্ট করে । আমি হিন্দু, আমি সন্ন্যাসী, হিন্দু শাস্ত্রই আমার পক্ষে যথেষ্ট । কিন্তু আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, বলুন আপনারা হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে এই বিষয় বিচার করিতে

চাহেন, না ইউরোপীয় যুক্তি অনুসারে এ বিষয় আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন ? (প্রথমে ইউরোপীয় যুক্তি অনুসারে আলোচনা করুন) আচ্ছা তাহাই করিতেছি । “হাঁ, আপনাদের অনেকেই মন, এক সম্মতিদায় ইউরোপীয় পণ্ডিতের কুতর্ক-কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়াছে । সেই কুহেলিকা কাটিয়া গেলে, সত্যের স্বরূপ আপনি প্রকাশিত হইবে । এমন কি, তখন হিন্দু শাস্ত্রের মত স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইবে ।

বিচার তিন প্রকার হইতে পারে । তাহা এই—(১) কেবল যুক্তি আশ্রয় করিয়া বিচার করা । (২) কেবল শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া বিচার করা । (৩) যুক্তি ও শাস্ত্র উভয়ই পর্যালোচনা করিয়া বিচার করা । আমি অল্প আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে কেবল যুক্তি অবলম্বন করিয়া পথ বিচার করিব ।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, পাপ আত্মপীড়ন । এক্ষণ দেখা যাউক, পাপ যদি আত্মপীড়নই হয়, তাহা হইলে কেন লোকে তাহা করে ? অথবা কেমন করিয়া সমাজে পাপ প্রবেশ করে, এবং প্রবেশ করিলে পরে কেমন করিয়া সেই পাপ-প্রবাহ বহিতে থাকে ? কোন ব্যক্তির মন যখন পাপ দখল করে, তখন সেই ব্যক্তির নীচ অঙ্গরূপ রূপ রূপ তাহার উচ্চ অঙ্গরূপ বিবেককে পীড়ন করে । তখন সেই ব্যক্তি তুচ্ছ ক্ষণিক সম্ভোগ বাসনার মোহে অনন্ত সুখকে পায় তৈলিয়া ফেলিয়া দেয় । সেরূপ অবস্থায়, হয় সেই ব্যক্তি, যে মন্দ কাজ করিতেছে, তাহা মোহে মুগ্ধ হইয়া একবারেই বুঝিতে পারে না, অথবা বুঝিতে পারিলেও প্রলোভনে পড়িয়া বিবেকের আদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে অসমর্থ । সমাজ-স্বক্ষেপকতক সেইরূপ । যখন সমাজে কোমল পাপ প্রচলিত হয়, তখন একশ্রেণীর লোক ভ্রান্ত

* নব্যভারত ১৩১৫—পৌষ সংখ্যা ৪৯৫ পৃষ্ঠার পর ।

হইয়া তাহা পাপ বলিয়া বুঝিতে পারে না, আর একশ্রেণীর লোক বুঝিয়াও, কার্যকালে বোঝানুসারে চলিতে পারে না। মাতাল বৃদ্ধ সুরাপান ভাল নহে, কিন্তু মদ পাইলে ছাড়িতে পারে না।

প্রথমতঃ, যাহারা “বণিক বিবাহ প্রণালী” যে পুণ্য বা সমাজের অনিষ্টজনক প্রথা, তাহা আদৌ স্বীকার করেন না, তাঁহাদের যুক্তি আন্দোচনা করা যাউক। তাঁহারা বলেন, পাত্রীপক্ষ, যখন যে পাত্রের ধন ইত্যাদি অধিক আছে, তাঁহাকেই কন্যা দিতে চাহেন, তখন পাত্রপক্ষ যে কন্যার পিতা অধিক টাকা দিতে পারেন, তাঁহাকে কেন বিবাহের জন্ত মনোনীত করিবেন না? সঙ্গতিসম্পন্ন পাত্র যাহারা প্রার্থনা করেন, এমন কন্যাপক্ষগণ, প্রত্যেকে নিজের কন্যার ভাবী সুখের জন্ত, যিনি যত অধিক টাকা দিতে পারেন, তাহা দিবার প্রস্তাব করেন। যিনি সর্বপেক্ষা অধিক টাকা দেন, তিনিই পাত্র লাভ করেন। ইহাতে অধ্যক্ষই বা কোথা, সমাজের অনিষ্টই বা কোথা? উন্নয়নপক্ষ প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে, স্বাধীনভাবে, দেখিয়া শুনিয়া, আত্মবল বুঝিয়া সুঝিয়া, চুক্তি করিতেছে। ইহাতে পাত্রপক্ষের দোষ কি? পাত্রীপক্ষ তাহার ধনবলের অতীত ধন দিতে যদি স্বীকার করেন, দোষ তাঁহার নিজের। কারণ পাত্রপক্ষত পাত্রীপক্ষের নিকট দস্যুর ছায় বলপূর্বক টাকা কাড়িয়া লন না। পৃথিবীর সমুদয় কার্যই হই পক্ষের স্বাধীন ইচ্ছা, স্বাধীন চুক্তি অনুসারে, প্রতিযোগিতা সহকারে, হইতেছে। বিবাহের পণ সৰ্বক্ষেত্রে মন তাহাই হইতেছে। তাহাতে দোষ কি?

এই যুক্তির মূলে মুক্ত প্রতিযোগিতা, যাহাকে আপনারা Free competition বলেন (একজন fair competition) আচ্ছা fair competition বলেন এবং স্বাধীন-চুক্তি অঙ্গীকার অর্থাৎ freedom of contract বলেন, তাহাই সমাজের নিয়ামক হওয়া উচিত, ইহা ধরিয়া লওয়া হইতেছে। এইটী যে ভ্রমমূলক, তাহা আমি দেখাই-তেছি।

আমি স্পষ্ট করিয়া দেখাইব যে, সমাজে

যেখানেই ব্যক্তিগত স্বার্থ, স্বাধীনচুক্তি, ব্যক্তিগত স্বার্থচালিত অসংযত প্রতিযোগিতার ফলে সমাজের অনিষ্ট হয়, সেখানেই সমাজের তাহা দমন করা উচিত এবং ইদানীং ইউরোপীয় সমাজ এই মহৎ তথ্য বুঝিয়া, সমাজের সমুদয় ক্ষেত্রেই—কি কৃষিকার্যে, কি বাণিজ্যে, কি কারবারে, সকল বিষয়েই অসংযত প্রতিযোগিতাকে নিয়মবদ্ধ করিতেছেন। সামাজিক প্রতিযোগিতা যখন সমুদয় সমাজের স্বার্থ লক্ষ্য না করিয়া, ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের স্বার্থ সাধন করিবার চেষ্টা করে, তখন সেই প্রতিযোগিতা অসংযত। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা যখন নিজে সর্বদীন প্রকৃত মঙ্গলের প্রতি দৃকপাত না করিয়া ইচ্ছা বা রিপূর্বিশেষ চরিতার্থ করে, তখন সেই প্রতিযোগিতা অসংযত। ইহা আমি পূর্বে আরও স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছি। আপনারা যদি চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, এই প্রতিযোগিতা সংযত করিবার জন্ত শাস্ত্রের বিধি, সমাজের প্রথা, আইন আদালতের ব্যবস্থা,—নানা প্রকার উপায় অবধারণ করা হইয়াছে।

কিন্তু ইউরোপে গত শতাব্দীতে অনেক পণ্ডিত ধনতত্ত্বে প্রতিযোগিতার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তথাপি বিলাতের অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যদি অন্ত্যায় স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, নিজ নিজ স্বার্থ বিবেচনানুসারে অর্থ উপার্জন করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে মোটের উপর সমাজের অধিক মঙ্গল সাধিত হইবে। অর্থাৎ প্রতিযোগিতার ফলে সমাজের মঙ্গল হয়। আপনারা জ্ঞানেন, ইংরাজিতে competition, fair competition, বিলাতের একপক্ষ ধন বিজ্ঞানের একটা বুলি। বিজ্ঞান লয়ে ছাত্রদিগের মধ্যে competition, বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতাদিগের মধ্যে competition; প্রভু ও ভূত্যের মধ্যে যেতন লইয়া competition; বিবাহ নিপণিতে বর ও পাত্রী লইয়া competition, চতুর্দিকে competition—বিলাতী জগৎ, বিলাতী সভ্যতা, competitionএ আছে। তবে আমি কি, ভাই, পাপ পুণ্যের বিচার ছাড়িয়া দেও,

আত্মমর্যাদাদেও, ছাড়িয়া দেও, মনুষ্যত্বের কথা ছাড়িয়া দেও। competitionএর অর্থ জয়কর কর। আমি বলিয়াছি, competition অস্ত্রের স্বার্থ লক্ষ্য করে না,—আপনারা বলিতে পারেন, আমি “Fair competition” প্রতিযোগিতা নামে বিখ্যাত কলঙ্ক আরোপ করিতেছি। তজ্জন্ত ধনবিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ বর্তমান অধ্যাপক নিকলসন (Nicholson) competitionএর যে স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই বলি—

“On the positive side competition implies that every person tries to attain his own economic interests regardless of the interests of others. (আপনারা লক্ষ্য করিবেন regardless of the interests of others.) negatively it is implied that this self-interest is not attained by combination or by law or by custom.*

দেখিলেন, প্রতিযোগিতা কিরূপ বস্তু। এই প্রতিযোগিতার গুণে, ইউরোপে, সমাজের লোকগুলা যেন ধনাগারে প্রবেশ করিবান্ধু, সকলে দ্বারদেশে ঠেলাঠেলি, হড়াহড়ি, ধাক্কাধাক্কি করিতেছে। যে সবল বা ধূর্দ, সে দুর্বল বা নিরীহ ব্যক্তিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া বা পদদলিত করিয়া, রত্নভাণ্ডারে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছে। এই প্রতিযোগিতার সংগ্রামে, ভাট ভাইকে, ভাট ভগ্নীকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া, তাহার বকের উপর দিয়া হাঁটিয়া, তাহার করুণ আর্তনাদের প্রতি করুণাত না করিয়া, ধনাগারে প্রবেশ করা অধর্ম বা অত্যাচার বিবেচনা করেন। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য প্রতিযোগিতা নীতি! স্থিরভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যায়, পরস্পর শত্রুতার নামই প্রতিযোগিতা। কিন্তু স্বত্বের বিষয়,—অধুনা ইউরোপে প্রতিযোগিতার তামসী নিশার অবসান হইবে, সহবেদনামূলক সহযোগিতার উদা ধনতত্ত্ব-প্রকাশকে নূতন আশার কিরণে রঞ্জিত করিতেছে—শৃগাল শাব্দিকাদি হিংস্র পশুর ব্যবহারের পরিবর্তে দেবতার ভাণ্ড আন্য়ন করিয়া দিতেছে—

ধনতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিতেছে, এবং অন্ধ স্বার্থমূলক প্রতিযোগিতাকে সংযমিত করিবার কৃত্রিম নীতিগণ ব্যবস্থা করিতেছেন। ধনতত্ত্বের প্রত্যেক বিভাগে তাহা দেখিতে পাইবেন (উদাহরণ দিন)।

চতুর্দিকেই উদাহরণ। প্রভু ও ভৃত্যের বা মজুরের কথা ধরুন। বিলাতে পূর্বে ভৃত্য বা মজুরদিগের প্রতিযোগিতা ছিল। মজুরগণ এত অল্প বেতন পাইত যে, তাহাতে তাহাদের জীবন নির্বাহ হওয়া কঠিন হইত। কিন্তু তখন প্রতিযোগিতা ও স্বাধীন চুক্তিই সমাজের বুলি ছিল, তখন লোকে বলিত, এই রূপ অত্যল্প বেতন পাওয়াই নিয়ম। ধনতত্ত্ব ইহাকে “iron law of wages” বলে (N. 128) কিন্তু যেমন চক্ষু কুঠিতে লাগিল, তাহার ধর্মঘট করিয়া সমিতি করিতে লাগিল যে, নির্দিষ্ট বেতনের কমে কোন শ্রমী কার্য্য করিবে না। এই দেখুন এখানে শ্রমীর বুলি, প্রতিযোগিতা তাহাদের বেতন হ্রাসের মূল। তখন আর কেহ এমন কথা বলিল না যে, প্রভু ধনীগণত কোন শ্রমী দরিদ্রকে বলপূর্ব্বক অল্প মজুরিতে কাজ করাইত না। পূর্বে প্রভু ও ভৃত্য, ধনী ও শ্রমী—স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে বেতন বা দৈনিক পারিশ্রমিক স্থির করিত—অর্থাৎ প্রতিযোগিতা অসংঘত ছিল। প্রতিযোগিতা ধর্মঘট দ্বারা যখন সংঘত হইল, তখন মজুরির হাব বাড়িল। ইহা দেখিয়া কোন কোন সভা দেশে আদালত হইতে মজুরির হ্রাস করিয়া দেওয়া হইতেছে।*

আবার, পূর্বে কৃষিকার্যের স্বাধীন চুক্তি ও প্রতিযোগিতা, বিলাতে কলকারখানায় মজুরদিগের জীবন ও অঙ্গ নিরাপদ রাখিতে পারে নাই। তখন অসংঘত প্রতিযোগিতার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ বলিভেন যে, সকল কল কারখানায় মজুরদিগের জীবন ও অঙ্গাদি রক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা করা হইবে না, সেখানে মজুরগণ কাজ করিতে চাহিবে না। সুতরাং মজুরদিগকে পাইবার জন্ত কল

* Elements of Political Economy, Nicholson, p 159.

* ইহাকে “Judicial wages” কহে।

কারখানার প্রভূরা আপনাই সম্যক ব্যবস্থা করিবেন। আর যে কলকারখানায় জীবন ও অঙ্গাদির হানি হইতে পারে, সেখানে যদি মজুরগণ কাজ করতে যায়, সে দোষ কল কারখানার প্রভুদিগের নহে, কারণ প্রভুরা ত বলপূর্ব্বক কোন মজুরকে ধরিয়া কাজ করায় না। উভয়পক্ষের স্বাধীন চুক্তি অনুসারে (যেমন “বণিক বিবাহে” হইতেছে) কার্য হইয়া থাকে। সুতরাং এ বিষয়ে সমাজের বা আইন-কর্তাদের অস্ত্র নাই। কিন্তু সভ্য জগতের সমাজহিঁদ্রী বিজ্ঞ মনুষ্যদণ্ডী ব্যক্তিগণ এই পাপ যুক্তির উপর নির্ভর করেন নাই। তাই, স্বাধীন চুক্তিকে সংবত করিবার জন্য নানা আইন হইয়াছে ও হইতেছে। * এক্ষণে কর্ম্মকর্তারা আইন দ্বারা বাধ্য হওয়ায়, তাহারা মজুরদিগের জীবনাদি রক্ষা করিবার জন্য রেল ইত্যাদি সাবধানা ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে মজুরদিগের বিশেষ মঙ্গল হওয়ায় সমাজেরও মঙ্গল হইতেছে।

ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে কেবল মাত্র স্বাধীন চুক্তির উপর নির্ভর করিয়া আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে কি ভীষণ কাণ্ড চলিতেছিল। যুক্ত প্রদেশে প্রস্তুতি “টিনে” বন্ধ করা মাংস বহুল পরিমাণে ইউরোপে বিক্রয় হয়। টিনের নিক্ষিপ্ত মাংস-বিক্রেতাগণ এমন গলিও মাংস ব্যবহার করিত, যে মাংস হাত দিয়া মাংস-ব্রুদে ফেলিবার সময় আপনাপন খসিয়া পড়িত। কখন বা তাহাতে মৃত কুকুরাদি নিক্ষিপ্ত হইত। সর্ব্বাপেক্ষা লোম-হরণ ব্যাপার এই যে, এমন অভিযোগ হইয়াছিল যে, ঐ কারখানার একজন কুলি, দুর্ব্বটনাবশতঃ কলের ঘূর্ণায়মান চক্রে পাড়িয়া মরিয়া গিয়াছিল। তাহারও মৃতদেহ নাকি ঐ খাত্ত-মাংস-ব্রুদে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এবং অশ্রুগত গলিত মাংসের সহিত মিশ্রিত হইয়া খাত্তরূপে বিক্রীত হইয়াছিল। বাহা হউক,

* নীচে ইংলও হইতে উদাহরণ দেওয়া হইতেছে :—

The first Employers' Liability Act was passed in 1880, other Acts followed.—The Workmen's Compensation Acts 1897 and 1900.—The new Workmen's Compensation Act 1906. D. M. Y. B. 27.

অনুসন্ধান ও বিচারে সমুদয় কথা ঠিক প্রমাণ না হইলেও, এটা বেশ বৃদ্ধা গিয়াছিল, কেবলমাত্র ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রতিযোগিতা ও স্বাধীন চুক্তির উপর নির্ভর করায় ক্রেতাগণ বাহা অত্যন্ত ঘৃণা অথাত্ত, তাহাও সুখাত্ত বলিয়া পয়সা দিয়া ক্রয় করিয়া খাইয়া, না জানিয়া নিজেদের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছিল। এই জন্য তখন আইন করা হইল। তাহাতে স্বাধীনতা থকা করিয়া সমাজকে রক্ষা করা হইল। এই রূপে, যেখানে প্রতিযোগিতা ও অবাধ স্বাধীনচুক্তি সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর দেখা গিয়াছে, সেই অনিষ্ট নিবারণ করিবার জন্য প্রতিযোগিতা ও স্বাধীনচুক্তিকে শৃঙ্খলিত করা হইয়াছে। এ বিষয়ে, আমেরিকার শ্রায় দূর দেশে না গিয়া কলিকাতাতেই বসিয়া আপনাদি উদাহরণ পাইতে পারেন। ঘৃত, দুগ্ধ, মিষ্টানের ভেজাল নিবারণ করিবার জন্য বিধি হইয়াছে, আপনাদি জানেন। এখানে সমাজের মঙ্গল জন্য, ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বাধীন চুক্তিতে হস্তক্ষেপ করিয়া অসং বিক্রেতাগণকে সংবত করা হইয়াছে। কৃষিকার্য্যে, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে, প্রভু ও ভূত্যের মধ্যে, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সমাজের মঙ্গলের স্বাধীনচুক্তি সংবত করা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা দেখাইলান।

এক্ষণে কৃষিকার্য্য আলোচনা করিব। এখানেও যেহেতু স্বাধীনচুক্তি ও অসংযত প্রতিযোগিতাহেতু সমাজের অনিষ্ট হইতেছে, দেখা গিয়াছে, সেখানেই স্বাধীনচুক্তি ও অপ্রতিহত প্রতিযোগিতাকে বিধিবদ্ধ করিয়া সংবত করা হইয়াছে। আইন অপেক্ষাধর্ম্ম শাস্ত্র আমার অধিক আলোচ্য বিষয়, আপনাদিগের মধ্যে বাহারা আইনজ্ঞ, বিষয়ীলোক আছেন, তাহারা আয়লও দেশের এবং দেশের “পঁরা খাজনা” বিষয় আমার অপেক্ষা ভাল অবগত আছেন। সুতরাং আমার তাহা বলা বাহুল্য। (বলুন বসুন) আয়লও দেশের কৃষক, কর্ত্তাপ্য, কৃষকগণ—তাহাদের অবস্থা কি, তাহা জানেন না, এই অভিশপ্ত অসংযত প্রতিযোগিতার তথা-কথিত “স্বাধীনচুক্তি” অনুসারে খাজনা দ্বির হওয়ায় কি ভীষণ দুর্দশা হইয়াছিল বিদেশে:

বাহাদের সামান্য জমীদারী আছে, তাহারও জানেন যে, এক প্রকাণ্ড স্থানে কৃষকদিগের মধ্যে জমীদার বা তাহার কর্মচারী জমী “ডাক-নীলামে” বিলি করেন। এই নীলামে যে প্রজা খাজনার নিরিখ সর্বাপেক্ষা অধিক ডাকে, তাহা সেই জমী আবাদ করিতে দেওয়া হয়। জমী প্রজার একমাত্র জীবিকা নির্বাহের উপায়। জমী না পাইলে, সে না খাইয়া মরিবে। সুতরাং যখন ডাক আরম্ভ হয়, তখন প্রজারা প্রতিযোগিতার বশবর্তী হইয়া বিবাহ প্রতি ২, ৩, ৬, ৮, ১০, ১২ এইরূপ এত অধিক খাজনা দিতে অঙ্গীকার করে যে, জমীর ফসল হইতে তাহা দিতে হইলে, তাহাদিগের স্রুফলা বৎসরে খাওয়া বা এক বেলা খাওয়া চলে, আর অজন্মা বৎসরে এক বেলাও আহার সংগ্রহ হয় না। তখন দুর্ভিক্ষে মৃত্যু। তখন কৃষক নিরুৎসাহে জীবন্ত হইয়া থাকে। কখন বা দাঙ্গা, হাঙ্গাম, গৃহদাহ ও দস্যুবৃত্তি করে। আয়লণ্ডে এইরূপ হওয়ায় সেখানে অবশেষে আদালত হইতে খাজনা স্থির করিয়া দিবার আইন হয়। * বঙ্গদেশেও নিরিখ অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় পাবনা জেলায় হাঙ্গাম হইয়াছিল। এবং বঙ্গীয় কৃষকদিগের অবস্থা ভাল করিবার জন্য সরকার বাহাদুর বাধ্য হইয়া, আয়লণ্ডের ত্রায় বঙ্গদেশেও, অসংযত প্রতিযোগিতাকে ও অবাধ স্বাধীন চুক্তিকে কি দমন করেন নাই? দমন করা কি উচিত হয় নাই?—আমি দেখাইলাম, কৃষিবিভাগে জমীদার ও কৃষকদিগের মধ্যে অবাধ স্বাধীন চুক্তিতে যেখানে অনিষ্ট হইয়াছে, সেখানে স্বাধীন চুক্তি প্রতিহত হইয়াছে।

এমন কি, জমী বন্দোবস্ত সঙ্কে কেবলমাত্র প্রতিযোগিতা এবং স্বাধীন চুক্তির উপর নির্ভর করিলে আর চলে না, এই বিবেচনা করিয়া ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট একটা বিধি করিয়াছেন। তাহাতে, প্রতিযোগিতায় খাজনা বাড়াইবার জন্য, ইংরাজ জমীদারগণ জমী ফেলিয়া রাখিতে পারিবেন না; অর্থাৎ

কেহ জমী চাহিলে তাহাকে গ্রাহ্য সূত্রে তাহা দিতে হইবে। *

আপনারা আরও উদাহরণ চাহেন কি? এক্ষণে কি আপনারা স্বীকার করিবেন না যে, যখনই প্রতিযোগিতা বা স্বাধীন চুক্তিতে সমাজের অনিষ্ট হইতেছে, প্রতিপন্ন হয়, তখন সমাজ সেই প্রতিযোগিতা, সেই স্বাধীন স্বত্বীকার প্রথাকে সঙ্কোচ করিতে পারে এবং সঙ্কোচ করা উচিত—এই অতি সহজ কথা কি এখনও আপনারা স্বীকার করেন না? (স্বীকার করি)

ভাল, তাহা হইলে আমার প্রতিপাত্ত বিষয় সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। “যে প্রতিযোগিতা বা স্বাধীন অঙ্গীকারে সমাজের কষ্ট হয়, তাহা সংযত করা উচিত; “বণিক বিবাহ প্রণালী”তে সমাজের বড় কষ্ট হইতেছে; সুতরাং বণিক বিবাহ প্রণালী সংযত করা উচিত। আর কিছু বলা আবশ্যক কি? (বর্তমান বিবাহ প্রণালীতে কি কষ্ট হইতেছে, সবিস্তারে বলুন)। আপনারা চোখের উপর যে কষ্ট দেখিতেছেন, তাহা যদি অমূল্য না করেন বা স্বীকার না করেন, আমি ত তুচ্ছ জীব, স্বয়ং ভগবান আসিয়া আপনাদিগকে উপদেশ দিলেও কোন ফল হইবে না। (“কষ্ট স্বীকার করি”, “খুব কষ্ট”, “খুব ফষ্ট”) এক্ষণে রাজা একরূপ আইন করিতে পারেন না। তজ্জন্য বাহাতে “বণিক বিবাহ প্রণালী” বন্ধ হয়, আপনারা দলবদ্ধ হইয়া তাহার চেষ্টা করুন। হে ছাত্রবৃন্দ! হে অবিবাহিত যুবকগণ! হে সচরিত্র কুমারগণ! সমাজকে বণিক বিবাহ প্রণালী রূপ গুরুতর পাপ হইতে, তোমরা রক্ষা কর। সামাজিক বিষয়ে এই বিবাহ প্রণালীর সংস্কার কার্যে তোমরাই রাজার স্থান অধিকার কর,—“বণিক বিবাহ প্রণালী” অমূল্যে কখন বিবাহ করিবে না—যে বিবাহে টাকা কড়ির চুক্তি আছে, সে বিবাহ করিবে না—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রলুব্ধ পিতামাতাকে তোমরাই ধর্মের পথে লইয়া আইস। জাতীয় বিনাশ পাপের অনিবার্য ফল। তাহা হইতে সমাজকে রক্ষা কর, যুক্তি ও

* ইহাকে judicial rents বলে।

* The Small Holdings and Allotments Act came into force on January 1, 1908.

বিবেককে সন্মান করিয়া, শাস্ত্রকে মানিয়া, স্বদেশ-প্রেমকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া, ভগবানকে স্মরণ করিয়া, প্রতিজ্ঞা কর “বণিক বিবাহ” করিবে না। (করতালি)

আমি বলিয়াছি, আমাদের দেশের রাজা বিদেশী। সামাজিক নিয়ম সম্বন্ধে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না; হস্তক্ষেপ করা ইচ্ছনীয়ও নহে। স্ত্রীরা এ বিষয় আপনারা নিজে প্রতীকার না করিলে কোন উপায় নাই। এখন আমাদের দেশ স্বাধীন ছিল, তখন এ বিষয় রাজার কিরূপ শাসন ছিল, তাহার একটা দৃষ্টান্ত বলি। মাস্ত্রাজ হাইকোর্টের জজ মাননীয় সঙ্করং নেয়ার, Social Conference-য়ের সভাপতি নির্বাচিত হইয়া তাঁহার বক্তৃতায়, এই উদাহরণটা উল্লেখ করিয়া ছিলেন। “খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর একটা অহুশাসন লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লেখা আছে, যে ব্যক্তি স্বর্ণ (অর্থ) লইয়া কন্যার বা পাত্রের বিবাহ দিবে, সে ব্যক্তি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইবে।” (করতালি) কেবল করতালি দিলে হইবে না। ধর্ম্মকর্ম্ম আপনারা সম্পাদন করুন। এক্ষণে হে স্বদেশপ্রেমিক হরিভক্ত যুবা কুমারগণ! তোমাদের হরিভক্ত কার্য্যে দেখাও, তোমাদের ভগবদ্ভক্তি, পুণ্যাহুষ্ঠানের জ্যোতিতে দেশে দীপ্তি পাউক। তোমাদের মধ্যে এই পুণ্য প্রতিজ্ঞাতে আবদ্ধ হইবার জন্তকে প্রস্তুত আছ? কতিপয় যুবক যুগপৎ দণ্ডায়মান হইয়া (“আমি” “আমি” “আমি”—“আমি”)। ষাঁহারা “বণিক বিবাহ” করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করিতে অগ্ধ প্রস্তুত আছেন, তাঁহারা অগ্ধ কেবল নাম লিখিয়া দিন। জগৎ তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা লওয়া হইবে না, এক মাস বেশ ধারভাবে চিন্তা করিয়া যদি তাঁহারা আত্মীয় এই প্রতিজ্ঞা করিতে ইচ্ছুক থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা করান হইবে, এবং তাহার এক সপ্তাহ পরে তাহাদের অভিষেক হইবে (মহা করতালি-ধ্বনি)।

[সভাভঙ্গ]।

রমানাথ। বিজয়! আমাদের বাসায় যাবে?

বিজয়। একটু পরে যাব। এক্ষণ স্বামী-স্বীর বাসায় যাব। (সকলের প্রস্থান)।

তৃতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

স্থান—রামধন বাবুর শয়ন কক্ষ—কাল—রাত্রি।

রামধন বাবু। শয্যায় শয়ন করিয়া আলি-বোলায় তামাক খাইতেছেন, তাহার স্ত্রী—মেজতে কার্পেটের উপর আসান।

স্ত্রী। কি বল?

রামধন বাবু।—কি বল?

স্ত্রী। আমি বলি, বিজয়কে ডেকে পাঠাই।

রামধন। আমি কি বিজয়কে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিইছি?

স্ত্রী। তোমার কিছু দোষ নাই, দোষ আমার। তুমি আমাকে বলেছিলে যে, “বিজয় বকুলপুরের জমিদারের মেয়েটা বিয়ে না করলে আমি বিজয়ের মুখ দর্শন করোঁ না। আমি সেই কথা না বুঝে, বিজয়কে বলে-ছিলাম। বিজয় সেটা উল্টা বুঝেছিল।

রামধন বাবু। হাঁ, আমি বলেছিলাম-ইত। এখনও বলছি।

আমার ছেলে যদি আমার কথা না শোনে, আমি তার মুখদর্শন করোঁ না। নিশ্চয়ই।

স্ত্রী। তুমি কি এমন মনে কর যে, তুমি বিজয়ের মুখদর্শন করোঁ না, আর বিজয় বাড়ীতে থাকবে? তুমি কি জান না, সে যেমন নম্র ও পিতৃভক্ত, তেমন অভিমানী। সে খুব নম্র, সে তোমার আমার খুব বাধ্য—কিন্তু ভারি একরোকা, একটু মাত্র অপমান বোধ করলে, আমি দেখেছি, আমার বিজয়ের চোখ জলিয়া উঠে—আবার স্নেহের সম্পর্ক যেখানে, ক্ষণকালেই চোখ জলে ভরে যায়। বিজয় যে তোমার পুত্র। তুমিও যেমন জীবনে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর নাই, সেও কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে না। এক্ষণে সময় আছে, বিজয়কে তুমি ডাকলেই বিজয় আসবে।

রামধন। এত বড় আশঙ্কা! আমি কিছু না বলতে, বাড়ী হতে চলে গেল!

আশ্রয় প্রতি এত অবস্থা ? যত আদর দিচ্ছি, ততই বাড়ছে। আমি কখনই বিজয়কে ডেকে পাঠাব না, দেখবো কত দূর তার আশ্পর্ক। (দীর্ঘ নিশ্বাস)।

স্রী। দেখবে দেখবে, তুমি কত সহ্য কর্তে পারবে? এ দুদিনেই তোমার যুগ কালী হয়ে গিয়েছে। বিজয় গিয়ে অবধি রাত্রিতে একটু ঘুমোতে পাছ না—আমি কি দেখতে পাই না, তুমি রাত্রিতে একবার বই নিয়ে বসো, আবার বারান্ডায় পাইচারি করে বেড়াও, এই রকমে এই কয় রাত্রি প্রভাত হয়ে যাচ্ছে—আমার নিজের কথা আমি কিছু বলতে চাই না—আমি সব কষ্ট সহ্য কর্তে পারি—আমি হিন্দুব মেয়ে—কষ্ট পেলে নীরবে সহ্য কর্তে পারি—বুক ফাটলেও নিজের জন্ত কিছু বলবো না, তবে মার প্রাণ—জ্ঞানত।

রামধন। তুমি তাকে ডাক, আমি কি বাধা দিচ্ছি?

স্রী। তুমি না ডাকলে সে আসবে না।

রামধন। আমি ডাকবো না—আমি ডাকবো না।

স্রী। নাথ! আমি মিনতি করছি। ছেলের বয়স অল্প, সে অবুঝ হতে পারে—তুমি বিজয়, বুদ্ধিমান—তুমি জেদ করে বোসে থাকলে, এ সোণার সংসার ঈদারথার হোয়ে যাবে—একমাত্র ছেলে, আর অমন ছেলে, লোকে রলে রত্ন, অমন হয় না—সে যদি ঘরে থেকে উদাসীন হয়ে চলে গেল, তা'হলে আমাদের এ সংসারে আর কি সুখ, এ জীবনে আর কি আবশ্যক?

রামধন। তুমি যে বড়ই অবীর হয়ে উঠলে।

স্রী। ঐ শুন নাথ, রূপ রূপ ক'রে বৃষ্টি এল। আমার সোণার বাছা হয়ত গাছতলার ভিজে শীতে থর থর করে কাঁপছে (এই বলিয়া চক্ষে অঞ্চল দিয়া ক্রন্দন)।

রামধন। কেঁদো না। আমি তলে তলে খবর রাখছি। নীলমণি মিত্র তার সন্ধান পেয়েছে।

স্রী। আঁ—সন্ধান পেয়েছে? কোথায় কোথায়?

রামধন। কাশীতে কোন সন্ন্যাসীর

কাছে সে বেদান্ত পড়তে গিয়েছে।

স্রী। না, নাথ, যখন সন্ন্যাসীর নিকট গিয়াছে, তখন সন্ন্যাসী হবে, নিশ্চয়ই মনে কবেছে। (উদ্ভিন্ন স্বামীর পা ধরিয়া) নাথ, তোমার দাসীকে বাঁচাও—এই সুখের সংসারকে নিজে ইচ্ছা কোরে ঋণী কোরে ফেলো না। তুমি নিজে না ডাক, বিজয়কে আমি ডাকি, তুমি অল্পমতি দেও—চূপ কোরে থাকলে কেন? আমি তোমার পা'ধরে অল্পমতি চাচ্ছি।

রামধন বাবু। তোমার যা ভাল, বোধ হয়, তাই কর।

২য় দৃশ্য।

স্থান বারান্দা। উত্তমানন্দ স্বামীর কুঠার।

উত্তমানন্দ স্বামী। আমি তোমাকে কলিকাতারই বলেছি, তোমাকে সন্ন্যাস-মন্ত্র দিব না। তবু, বৎস, কেন কাশীতে আমার আছে এসেছ? বাড়ী যাও।

বিজয়। কেন মন্ত্র দিবেন না, প্রভু!

উত্তমানন্দ স্বামী। তুমি কেন সন্ন্যাসী হতে চাও?

বিজয়। আমি একেবারে বিবাহ কর্ণো না। সন্ন্যাসী হোয়ে একেবারে চিরকৌমাৰ্য্য ব্রত গ্রহণ কর্ণো।

উত্তমানন্দ স্বামী। সন্ন্যাসী না হোয়েও ভীষ্মের মত সে ব্রত লওয়া যায়।

বিজয়। আমি আপনার নিকট বেদান্ত পড়বো।

উত্তমানন্দ স্বামী। ঘরেও বেদান্ত পড়া যায়।

বিজয়। না প্রভু! ঘরে থাকিতে আর আমার মন নাই। আমি সংসারের তুচ্ছ সুখ ত্যাগ করে, আপনার নিকট সন্ন্যাস মন্ত্রে দাক্ষিত্য হব; বেদান্ত পড়বো। সাধন করে সিদ্ধ হয়ে দেশে দেশে ধর্ম প্রচার কর্ণো—আর আপনার দাসানুদাস হয়ে, আপনারই প্রদর্শিত পথে চলবো। প্রভু! ঘরে আমার প্রাণটা কেবল কেঁদে উঠে। প্রতিদিন যখনই নানা ব্যঞ্জন, নব-নীত, দুগ্ধ কীর দিয়ে অতি পুষ্ট অভ্যন্তর অন্ন খাই, তখনই মনে হয়, হায় কত গরিব লোক দুই বেলায় এক মুঠা ভাতও পাবে

না; কত লোক না খেয়ে মর্ছে। তখন প্রাণ কেঁদে উঠে। তখন ভাবি, এর কি কোন উপায় নাই। এই কথা বৃদ্ধিবার জন্ত পিতৃ-দেবের নিষিদ্ধ ধনতত্ত্ব পড়তাম। বৈশাখে যখন টানা পাথর তলে, বরফ দেওয়া জল খাই, তখন মনে হয়, কত গ্রামে জলকষ্টে মানুষ ও গরু মরিয়ে মর্ছে। বাবার জমিদারী থেকে যখন খাজনার টাকা আসে, তখন মনে হয়, এই টাকা হয়ত দুঃখী কৃষকের বুকের রক্ত, তাহারা সর্বস্ব হয়ত আমাদের দিয়ে সে সপরিবারে অনাভাবে কাঁদছে। বাবা সে দিন বলছিলেন, বিজয়ের জন্ত একটা পৃথক দোতালার বৈঠকখানা কোরে দিব। মাঝে পাথর এসেছে, আমি দেখে ভাবলাম, আমাদের ভালার উপর তালি হচ্ছে, মাঝে মেলের মেজে হচ্ছে—কিন্তু যাদের শ্রমের টাকাতে এসব হচ্ছে—তাদের কুঁড়ে ঘরের মটকায় খড় নাই। আমার বিয়েতে বাবা নাকি দশ হাজার টাকার নানা হীবা মুক্তার গহনা দিবেন—আমার জীর গায়ে দশ হাজার টাকার গহনা, আর কুবক-বধু শতগ্রন্থি বস্ত্র—জীর্ণ ছিন্ন বস্ত্র পোরে লজ্জা নিবারণ কর্তে পাচ্ছে না! আমাদের মধ্যে কারও একটু অসুখ করলেই বাবা আমাদের দেওঘরে নিয়ে যান। আর শত সহস্র গ্রাম ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা, বসন্ত ও প্লেগে উৎসন্ন হোয়ে ক্ষয় হইয়াছে। প্রভো, নিস্তক নিশিথে, যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়ে, তখন, আমি যেন দুঃখীদিগের ভয়ানক আর্তনাদ শুনে পাই—সে আর্তনাদ আকাশ ভেদ কোরে উঠে—ভয়ানক দুঃখীগণের আর্তনাদ—ভয়ানক, ভয়ানক—সেই ভয়ানক আর্তনাদ শুনে আমার বুক দরাস দরাস করে। সেই গভীর গম্ভীর নিঃশব্দে মধ্যে যেন শুনতে পাই, কে বলছে—“বিজয়, এক্ষণে তুমি শুয়ে, দুঃখ-কেন্দ্রান্ত শয্যায় শুয়ে? শুনে পাচ্ছনা কি ঐ হাহাকার ক্রন্দন—ঐ গগনভেদী ক্রন্দন? বিজয়, এক্ষণে তুমি বিষয় ভোগে মগ্ন—উঠ, বিজয় বাহিরে এস, বিষয় ভোগ ছাড়—দেশের জন্ত জীবন উৎসর্গ কর।”, প্রভো, আমি দেশের মঙ্গলের জন্ত এ জীবন উৎসর্গ কর্তে চাই—দয়া করে আমাকে সন্ন্যাস

মন্ত্র দেন। বিষয় সূত্রে আমার মন নাই।
• উত্তমানন্দ। অর্থাৎ তুমি বলছো বিষয় সূত্রে তোমার বৈরাগ্য হয়েছে। হাঁ, যদি তোমার বিষয় সূত্রে যথার্থই বৈরাগ্য হয়ে থাকে, তাহা হলে তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ কর্তে পার। কারণ শ্রুতি বলেন—

যদহরেব বিরজতে তদহরেব প্রব্রজেৎ ।
অর্থাৎ অধিকারী পুরুষের যে দিনে সর্ব বিষয়-সূত্রে বৈরাগ্য হইবে, সেই দিনেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত প্রকৃত বৈরাগ্য হইতে পারে না। ‘দণ্ড গ্রহণ মাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ’, অর্থাৎ দণ্ডাদি চিহ্ন লইবা মাত্র পুরুষ নারায়ণ রূপ হইয়া যায়। এই প্রেরোচক বচন শুনিয়া কেহ কেহ সন্ন্যাসী হইতে চাহেন। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি বিনা কেবল মাত্র দণ্ডাদি গ্রহণে জ্ঞাননিষ্ঠা রূপ ফল পাওয়া যায় না; বরঞ্চ প্রত্যাঘ প্রাপ্তি হয়।

বিজয়। প্রভো, তবে শ্রুতি কেন বলেন, কেবল ত্যাগেই মোক্ষলাভ হয়?

উত্তমানন্দ। হাঁ, শ্রুতি বলেন “এতম্বেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি ইতি ন কৰ্ম্মণা ন প্রজ্ঞা ধনে ন ত্যাগেনৈকেমৃতম্-মানন্তঃ” অর্থাৎ “যাহারা আদিতীয় ব্রহ্মরূপ লোক লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। অগ্নিহোত্রাদিক কৰ্ম্ম দ্বারা, অথবা পুত্রাদি প্রজা দ্বারা অথবা সুবর্ণাদি ধন দ্বারা-ব্রহ্মভাবরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হন না, কিন্তু কেবলমাত্র ত্যাগ দ্বারা সেই মোক্ষ রূপ অমৃত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।”

বিজয়। আমিও ত সংসারের সর্ব কৰ্ম্ম ত্যাগ করিতে চাই।

উত্তমানন্দ। বৎস, শ্রুতির এই বচন কেবল শুদ্ধচিত্তবৃত্ত ব্যক্তির জন্ত অতিপ্রেম হইয়াছে। নিকাম কৰ্ম্ম করিয়া যে চিত্তশুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সেই চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত সন্ন্যাস আদৌ সম্ভব নহে। এই কথা আমাদের দেশে অনেকে না বুঝিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে তাহাদের এবং দেশের অনেক আশ্রিত হইয়া থাকে।

বিজয়। তবে এক্ষণে আমি কি কর্ব্বো?

উত্তমানন্দ। শাস্ত্র তাহার উত্তর অতি সংক্ষেপে দিয়াছেন—

“সমস্তু: সন্ততঃ কার্য্য কৰ্ম্মসমাচর ”

অর্থাৎ তুমি ফলাশক্তি-শূন্য হইয়া, নিকাম ভাবে কেবলমাত্র পরমেশ্বরের প্রীতির জন্য সর্বদা অবশ্রম কর্তব্যরূপে বিহিত কার্য্য অনুষ্ঠান কর—“অসন্তোহচরন্ কৰ্ম্ম, পরমা-প্রোতি পুরুষঃ” “যেহেতু অনাসক্ত হইয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে পুরুষ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হন।” অতএব তুমি গৃহে কিরিয়্যা যাও, সেখানে নিকাম ভাবে কৰ্ম্ম করিও। দেশের যে সকল ছুঃখের কথা বলিলে, তাহার সাধাগত প্রতিকার কর। পিতা স্বর্গ, পিতা দেবতা, তিনি অজ্ঞায় কোরে তাড়না কর্লে ভায়া অক্ষুদ্র ভাবে সহ কর্লে। বৎস, যাও, গৃহে ফিরে যাও ।

(নীলমণি বাবুর প্রবেশ)

নীলমণি। বিলক্ষণ! ঠাকুর, ছেলে মাল্যটাকে ফুলে সম্যাসী কবীর চেষ্টা করছো বুঝি। ঠাকুর, তোমার এই কাজ ?

উত্তমানন্দ। বৎস! বসো।

নীলমণি। বসবো, খাবো—সেত আছেই (বসিয়া) কে আছেরে, একবার তামাক দিতে পারিস।

উঃ উঃ ঘুরে ঘুরে ঠাকুর হযরাগ হইছি, (একটা শিখ পা ধোবার জল আনিয়া নীলমণি বাবুকে দিল, পা ধুইয়া বসিলেন—এমন সময়ে একজন তামাক আনিয়া দিল)

নীলমণি। (হকা লইয়া তাহাতে এক টান দিয়া) বাঁচলুম। ঠাকুর, আপনি লোক ভাল, তা কি আমরা জানি না। তবে বিজয়! বাবা, তুমি কেন এমন কর্লে? চল, বাড়ী চল। টোর টেনে। মাঠাকুরণ কেঁদে কেঁদে মারা পলেন। বাবু এই কয় দিন আহাৰ নিদ্রা ত্যাগ করেছেন। এমন কোরে মা বাপকে কাঁদাতে আছে ?

বিজয়। মা বাবা ভাল আছেন ত ?

নীলমণি। কেবল প্রাণে প্রাণে বেঁচে আছেন।

বিজয়। মনোরমা কেমন আছে ?

নীলমণি। তোমার ভগ্নী কেবল ফুপিয়ে কান্ধে—আর বল্ছে “মা, দাদা কোথায় গেলেন।”

৩য় দৃশ্য।

স্থান—বৈঠকখানা।

কাল—প্রাতঃকাল।

(রামধনবাবু—চেয়ারে বসিয়া হাতে Bengalee বাহিরে রাস্তার দিকে তাকাইয়া)

এমন সময় একখানি ল্যাণ্ডো গাড়ী বারান্দায় লাগিল। তাহা হইতে নীলমণি ও বিজয় নামিয়া রামধন বাবুর সম্মুখে আসিলেন।

বিজয় পিতার চরণ-ধূলি লইয়া করযোড়ে রামধন বাবুর সম্মুখে নত মস্তকে দাঁড়াইলেন। রামধন বাবুর চোখে এক ফোটা জল আসিল, কিন্তু কিছুই বলিলেন না।

বিজয়। পিতঃ, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

রামধন। (পুত্রের মস্তকে হাত দিয়া অক্ষুট স্বরে আশীর্বাদ করিলেন) যাও তোমরা মা ও মনোরমার সহিত সাক্ষাৎ করগে।

*(বিজয়ের প্রস্থান)

নীলমণি। মহাশয় অনুমতি হয় ত আমিও এখন আসি।

রামধন। হাঁ খাওয়া দাওয়া করুন গে।

৪র্থ দৃশ্য।

স্থান—রামধন বাবুর লাইব্রেরী।

কাল—রাত্রি।

(রামধন বাবু ও বিজয় আসীন—সম্মুখে টেবিলের উপরে কতকগুলি পুস্তক।)

বিজয়। Tariff Reformএর কথাটা কি, আজ আমাকে ভাল কোরে বুঝিয়ে দেবেন কি ?

রামধন। কথাটা কিছু জটিল।

বিজয়। তারই জন্য আপনার কাছে ওটা বুঝিয়ে নিতে চাচ্ছি।

রামধন। Tariff Reform, এক কথাটা ধর্তে গেলে, সেই পুরাতন কথা—Free Trade বা Protection.

বিজয়। তা'ব Preferential Tariff এ কথাটা কতকটা নতুন নহে কি ?

রামধন। কতকটা নতুন বটে, কিন্তু

Canadian-Preferential Tariff প্রথম
১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিজয়। Preferential Tariff টা কি?

রামধন। ১৯০৬ খ্রীঃ Canadaতে যে
ত্রিবিধ তারিফের ব্যবস্থা হইয়াছিল—তাকে
সাধারণত Tripartite Tariff বলে, সেটা
তোমাকে উদাহরণ স্থানে বলি তুমি অতি
সহজে কথাটা বুঝতে পারবে। ক্যানডার
গবর্ণমেন্ট তিন প্রণীত শুল্কের ব্যবস্থা করে-
ছিলো। (১) ইংলণ্ডের এবং তাহার উপনি-
বেশের মালের উপর সর্বাপেক্ষা কম শুল্ক
আদায় হইবে। (২) অন্যান্য দেশের মালের
উপর সর্বোচ্চ হারে শুল্ক আদায় হবে।
(৩) কিন্তু যে সকল দেশ ক্যানডার সহিত
সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ, এবং কম শুল্ক ক্যানডার
মাল তাদের দেশে বিক্রয় কর্তে দেবে, তাহা-
দের মাল ক্যানডাতে মধ্যম হার অনুসারে
শুল্ক দিয়া বিক্রয় হতে পারে। ধর, কানে-
ডাতে ইংলণ্ডের কাপড়ের উপর যদি
শত করা ৫ টাকা শুল্ক দিতে হয়, অন্যান্য
দেশের, যাদের সঙ্গে ক্যানডার সন্ধি হয়
নাই—তাদের শত করা ১০ দশ টাকা দিতে
হবে; আর মধ্যবর্তী প্রণী—অর্থাৎ
যে সকল দেশ ক্যানডার সহিত সন্ধি-
বদ্ধ, তাদের শত করা ৭ সাত টাকা
শুল্ক দিতে হবে। বুঝলে ত সকলের অপেক্ষা
England এবং তাহার Coloniesকে pre-
ference দেওয়া গেল; তার পর যে সকল
দেশ সন্ধিসূত্রে ক্যানডাকে duties সম্বন্ধে
preference দেবে; তারপর Highest
tariff অন্যান্য সমুদয় দেশের জন্য। আমি
ইংরাজিতে সংক্ষেপে বলি—

In the Tripartite Tariff each
of the three parts had a separate

application. The Highest or Gene-
ral Tariff for the world at large.
The lowest or British preferential
tariff was for Britain and her Colo-
nies only. The intermediate Tariff
was for such foreign countries, as
after negotiation, consented to
grant equivalent favours to Canada.
বুঝলে?

বিজয়। আজ্ঞে?

রামধন। Australia ও Englandকে
preference দিয়াছে।

বিজয়। ইংলণ্ডে Tariff Reform
কিভাবে করিবার জন্য Chamberlain প্রভৃতি
ব্যক্তিগণ আন্দোলন করছেন?

রামধন। (1) The taxation of
foreign manufactured goods অর্থাৎ
ইংলণ্ডে পুনর্ব্যবহার protection প্রবর্তিত
করা আবশ্যক। (2) Imperial prefer-
ence based upon foreign agricul-
tural produce.

বিজয়। এখানে preference কি রকমে
কাহাকে দেওয়া হবে?

রামধন। ইংলণ্ডের কলোনিগুলি, অন্য
দেশের অপেক্ষা কম শুল্ক দিয়া, ইংলণ্ডে
তাহাদের শুল্কাদি বিক্রয় কর্তে পারবে।
অর্থাৎ Colony গুলিকে শুল্কাবশয়ে ইংলণ্ড
preference দিবে। তা হলে Colonyতে
ও Englandএ খুব সদ্ভাব হবে।

বিজয়। হাঁ, কথাটা মূলে হচ্ছে—
Free trade অথবা protection।

চাকরের প্রবেশ

চাকর। আহা! প্রস্তুত।

(উভয়ের প্রস্থান)।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

মুলেখক নগেন্দ্রনাথ মৌম্বা :

জন্ম—বগুড়া, আগষ্ট, ১৮৫৪ খ্রীঃ।

মৃত্যু—কলিকাতা, ৫ই এপ্রেল, সোমবার, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ।

বয়স—৫৫ বৎসর মাত্র।

৩

"The paper of which he was editor was uniformly characterised by outspoken sincerity, lofty principles and distinction of style in a degree that is rarely found in any country in the world." *Edward Baker.*

এ জগতে কে বড়, কে বা ছোট? বহুবার লিপিয়াছি, আপনাপন মহত্ত্ব ও বিশেষত্ব সকলেই বড় এবং আপনাপন দুৰ্দ্ধতিতে সকলেই ক্ষুদ্র। এক সময়ে যে বড়, অল্প সময়ে সে ক্ষুদ্র; এক সময়ে সে ক্ষুদ্র, সে অল্প সময়ে বড়। এ গেল, সাধারণ নিয়ম। ইহা ভিন্ন জগতে বিশেষ নিয়ম আছে। কি কারণে ইয়, তাহা জানি না, এ জগতে দেখি, এক এক সময় এমন এক এক লোক জয়গ্রহণ করেন, যাঁহাদের সমতুল্য ব্যক্তি আর কোথাও পাওয়া যায় না। অথবা এমন এক একজন লোক দেখা যায়,—তাঁহাদের তিরোধানের পর কত যুগযুগান্তর চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু সেরূপ লোক আর পাওয়া যায় নাই। * সেরূপ লোক ফ্রান্সে হইলে নান ধরেন নেপোলিয়ন, ইটালীতে ম্যাট্‌সিনি, ইংলণ্ডে কারলাইল, জার্মেনীতে গেটে, আমেরিকাতে এনারসন্ ও এডিসন, ভারতবর্ষে কালিদাস, রুসিয়াতে টলস্টয়। অথবা—পালেস-টাইনে খ্রীষ্ট, ভারতবর্ষে বুদ্ধ, আরবে মহম্মদ, চীনে কনফিউস্‌। অথবা, আমাদের বঙ্গ খ্রীষ্টেচন্ড, রামমোহন, বিভাসাগর, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ। জুগৎ

জাগিতেছে, জাগুক;—ইহাদের সমতুল্য লোক আর জগতে আসিবে না। কবার বলে, যেমনটা যায়, তেমনটা আর হয় না। মহাপুরুষদের জীবনে বিধাতার অপূর্ণ হীরা।

এসিয়া পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান, কেন না, এসিয়াই সকল ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষদিগের জন্মস্থান—খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ, কনফিউসস প্রভৃতি। এসিয়ার মধ্যে আবার ভারতবর্ষ বিধাতার বিশেষ চিহ্নিত স্থান। পৃথিবীর আর কোন্ দেশের নামে মহাসাগরের নাম হইয়াছে? কোন্ মহাদেশে হিমালয়ের স্তায় পর্বত, এবং গঙ্গা, সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্রের স্তায় নদী আছে? আর কোন্ দেশে, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, রামচন্দ্র, নানক, কবীর, খ্রীষ্টেচন্ড প্রভৃতির স্তায় লোক জন্মিয়াছে!! ভারতের মধ্যে আবার বঙ্গ বিধাতার বিশেষ চিহ্নিত স্থান। বঙ্গোপসাগরের নামে ভূগোলে যেমন বঙ্গ প্রসিক্তি লাভ করিয়াছে, গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের মিলন-স্থান বলিয়াও তেমন বিখ্যাত হইয়াছে। আর কতীত? এই বঙ্গে যে সকল মহাপুরুষের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে, ভারতে আর কোথাও সেরূপ হয় নাই। খ্রীষ্টেচন্ড, রামমোহন, রামকৃষ্ণ, দেবেন্দ্রনাথ, প্রতাপচন্দ্র, বিবেকানন্দ, বিভাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এবং আরো কত মহাত্মা যে দেশে

* "When nature removes a great man, people explore the horizon for a successor; but none comes, and none will." *Emerson.*

জন্মিয়াছিলেন, সে দেশ যেমন তেমন দেশ নয়। বঙ্গ—অনেক মহাপুরুষের পুত্র চরণ-ধূলিতে পবিত্র হইয়াছে। এরূপ বুদ্ধি বা, আর কখনও হইবে না।

বঙ্গে অনেক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু অনেকেই, অল্প বা অধিক পরিমাণে দলের লোকের দ্বারাই সর্বত্র পরিচিত;—কেহ কেহ বা নিজ প্রশংসা নিজে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ্য পত্রিকায় ছাপাইয়া সর্বত্র পরিচিত;—কেহ কেহ বা এমনই নিলজ্জ যে, জীবিত কালেই নিজ জীবন-চরিত প্রকাশ করাইয়া সর্বত্র পরিচিত হইতে অভিলাষী। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও ছিলেন যে, নিজের দোষ ত্রুটি স্বরণে সদা সঙ্কুচিত এবং ব্রিয়মান থাকিতেন, কেহ প্রশংসা করিলে লজ্জায় নরিয়া বাইতেন। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে ঋষি রামতনু এবং রাজনারায়ণই প্রধান। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে মহাত্মা নগেন্দ্রনাথ ঘোষ অগ্রতর। আজ বঙ্গের মহাহৃদয় যে, এই মহাত্মা, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে, মর্ত্যলীলা শেষ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি নিজের প্রশংসা নিজে করিতেন না, শুনিতে চাহিতেন না,—সদা সঙ্গোপনে, নিহিতে থাকিতেই ভাল বাসিতেন। নগেন্দ্রনাথ অপার্থিব চরিত্র এবং অসাধারণ শক্তি লইয়া এই বঙ্গে অবতরণ করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন, নগেন্দ্র নাথ দেশ-বৈরী ছিলেন। তাহা মিথ্যা কথা। শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ পূর্বে, ভারতে জাতি গঠনের স্বপ্নে প্রমত্ত হইয়া, তিনিই প্রথম Indian Nation পত্রিকা চালাইতে আরম্ভ করেন। যেমন ছিলেন নবগোপাল, তেমন ছিলেন, নগেন্দ্রনাথ। জাতীয় নামে এরূপ

গৌরব, তদানীন্তন কালে আর কে করিত? এই এক স্থানেই তাঁহার পতীর স্বদেশান্ত্রাণের পরিচয় রহিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, তিনি ইংরাজের প্রশংসা পাইবার জন্যই “স্বদেশী গ্রহণের” বিরুদ্ধে অনেক অযৌক্তিক কথা লিখিতেন। আমরা একথাও অস্বীকার করি। তিনি কি ইংরাজের প্রশংসা কখনও নিজ কাগজে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন? তিনি প্রশংসার কান্দাল ছিলেন না। পরন্তু কেহ তাঁহার নিন্দা করিবে, ইহা ভাবিয়াও তিনি কখনও লেখনী সংযত করিতেন না। যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহাই লিখিতেন। অনন্ত-সাধারণ স্বাধীনতার ক্ষুরণ তাঁহার প্রতি কথায় হইত। ইংরাজের প্রশংসা-লোলুপ হইলে, যে মহাসমিতির নাম শুনিলে ইংরাজগণ অকুণ্ঠিত করে, সেই কল্‌সেসের একান্ত প্রভিনসিয়াল কনফারেন্সের সভাপতি হইতে তিনি সম্মত হইতেন না। তিনি স্বাধীন জীব, স্বাধীন ভাবেই চলিতেন, স্বাধীন ভাবেই লিখিতেন! তোমার প্রশংসা বা তাঁহার নিন্দার তিনি যদি কোন খোঁজ লইতেন, তবে তাঁহাকে আমরা মহাপুরুষ নামে আখ্যাত করিতাম না। গড্ডলিকা-প্রবাহের পথ ধরিয়া কেহ এজগতে বড় হইতে পারে নাই। স্বাধীন চিন্তা ভিন্ন কেহ কখনও কৃতী লেখক হইতে পারে নাই। প্রতিভার অগ্রতর সহায় স্বাধীনতা। যেখানে প্রতিভা, সেইখানেই স্বাধীনতা। স্বাধীনতা নাই, প্রতিভা আছে, আমরা কখনও শুনি নাই; অপিত, প্রতিভা আছে, স্বাধীনতা নাই, ইহাও সম্ভব নহে। ইংলণ্ডের ঋষি-প্রতিভা কেবল স্বাধীনতাকেই ফুটিয়াছিল, আমেরিকার ঋষি-প্রতিভা স্বাধীনতার পর্ণ-কুটারেই ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল। কার্লাইল

বা এমারসন, কেশবচন্দ্র বা বঙ্কিমচন্দ্র—এই স্বাধীনতা বলেই ফুটিয়া ফুটিয়া, জগতে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। নগেন্দ্র নাথ স্বাধীনতার সেবক, এই স্বাধীনতার জন্ত তাঁহাকে অনেকের নিকট নিন্দিত হইতে হইয়াছে, কিন্তু তিনি যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহাই করিতেন ও লিখিতেন। যাহা লিখিতেন, তাহাতেই অনন্তসাধারণ স্বাধীনতার সুরণ হইত—লোকেরা পড়িয়া অবাক হইত এবং বলাবলি করিত, নগেন্দ্র নাথের কি কলমের জোর এবং লেখা কি সুন্দর। নগেন্দ্র নাথের স্বাধীন লেখা, স্বাধীন চলাফেরা, স্বাধীন কথাবার্তা—অনন্তসাধারণ প্রতিভার স্ফুট নিদর্শন স্বরূপ এদেশে অক্ষয় হইয়া রহিল।

তাঁহার অসাধারণ স্বাধীনতার জীবন্ত দৃষ্টান্তের পরিচয়, নূতন মিউনিসিপাল আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার সময়, অন্তান্ত কমিসনারদিগের সহিত মিলিয়া তিনিও যে গোরবের পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে পাওয়া যায়। তিনি যদি ইংরাজের পাচটা বা প্রশংসার জন্ত লালায়িত হইতেন, তবে এই গোরবের পদ পরিত্যাগ করিতেন না। কিম্বা করিলেও, পরে আবার, রাধাচরণের আয়, পুনঃ ঐ পদ গ্রহণ করিতেন। এই আইনের তীব্র প্রতিবাদ তাঁহার স্বাধীনতার উচ্চ দৃষ্টান্তের স্থল।

তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স ও এলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; কিন্তু কে না হয়? তিনি বিলাতে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাই বা কে না হয়? তিনি সুদীর্ঘকাল মেট্রপলিটান কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, তাহাও কত কত লোকে হইয়া থাকে। তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষক, কলিকাতার অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। কত বঁত লোক ঐ সকল কাজ করিয়া

থাকে। কত লোক কত পদ পাইয়া থাকে, আবার বিশ্বস্তিতে ডুবিয়া যায়—কেহ নামও লয় না। আর্মারী ও সকল কোন গণনার বিষয়ই মনে করি না। নগেন্দ্র নাথের গণনার বিষয়—তাঁহার অনন্ত-সাধারণ ইংরাজি লিখিবার ক্ষমতা। তিনি ইংরাজি লেখার যে ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অসাধারণ। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই বঙ্গে ইংরাজি লেখার কি নগেন্দ্র নাথকে কেহ অতিক্রম করেন নাই? কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াছেন কি না, জানি না। ৮শ জুজু মুখোপাধ্যায়, ৮ লাগবিহারী দে, ৮ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি তাঁহার এক শ্রেণীর লোক হইতে পারেন, কিন্তু তিনি কাহারও পশ্চাতে ছিলেন না। সময়ে ২ নগেন্দ্রনাথের লেখা পড়িয়া মনে হইয়াছে—এরূপ লেখা বুঝি আর কোথাও পড়ি নাই, এরূপ বুঝি আর কাহাতেও সম্ভব হয় নাই। পুস্তক তাঁহার অধিক নাই, বড় ছুখনি এবং ছোট ৪ খনি। * কিন্তু তাঁহার কৃষ্ণদাস পাল ইংরাজি ভাষার এক অপূর্ণ গ্রন্থ। যত দিন ইংরাজি ভাষা থাকিবে, এ পুস্তকের অনাদর হইবে না। তাঁহার অল্প বড় পুস্তক মহারাজা নবকৃষ্ণ। ঐ পুস্তকে তাঁহার প্রতিভা, অর্থের খাতিরে কিছু পারসান হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইংরাজি লেখার অসাধারণ ক্ষমতা তাহারও পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় স্ফুটিত রহিয়াছে। পুস্তক অপেক্ষাও, তাঁহার সম্পাদিত নেশন পত্রিকা—তেই, তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পত্রিকা পরি-

* Kristo Das Pal—a study, and the Life of Maharaja Nova Kissen of the Sovabazar Raj family and of several brochures—the most notable being “Indian views of England,” “Moral Canker,” “Contract of the East and West,” “Liberal education in India.” His last work “England’s work in India” has just been completed, the final proofs having been passed by him on the Sunday preceding his death on Monday morning.

চালনের শিক্ষা তিনি ইংলণ্ডে লাভ করিয়াছিলেন। একপ বোগ্যতার সহিত তিনি, শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ কাল, নেশন পরিচালন করিয়াছিলেন যে, তাহার তুলনা এদেশে মিলে না। অমৃত-বাজার লিখিয়াছেন যে, “পত্রিকা পরিচালনে তিনি অকৃত-কার্য্য হইয়াছিলেন।” * আমরা বুঝি না, অমৃত বাজার এই কথা কি অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। এই কথার মধ্যে কিছু পুতি-গন্ধময় বিবেচনের পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রিকা সম্পাদনে তিনি যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, এদেশে তাহা তুলনা রহিত,—অন্ত যে কোন দেশের যে কোন উৎকৃষ্ট পত্রিকার সহিত তাহা সমতুলিত হইতে পারে। সহায়তহীন কণ্ঠকাকীর্ণ দেশে একাদিক্রমে ২৫ বৎসর কোন পত্রিকা চালান, সামান্য কথা নহে। এদেশে পত্রিকা চালান পুষ্পশয়া নহে, পদে পদে লাজনা ও অভাবের তাড়নায় জর্জরিত হইতে হয়। গভীর স্বদেশানুরাগ না থাকিলে কেহই এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না। তিনি যে জীবনের অর্দ্ধ-সময় এই পবিত্র কাজে ব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে তাহার গভীর স্বদেশানুরাগের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, তাহার লেখনী ধারণ সার্থক হইয়াছে। আমরা অনেক সময়ে তাহার “স্বদেশী-গ্রহণের” বিরুদ্ধ মন্তব্যের সহিত ঐক্য হইতে পারি নাই, কখন কখন সে সকলকে তদীয় জীবনের কলঙ্ক মনে করিয়াছি, পরন্তু কখন কখনও তাহার “স্বদেশীর” বিরুদ্ধ যুক্তিহীন লেখা

পাঠ করিয়া অন্তরে বিশেষ বাতনা পাইয়াছি, কখনও কখনও সন্দেহ হইয়াছে, তবে কি তিনি স্বদেশের উন্নতিকামী নহেন? লুণ্ঠনে দেশ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, তবু তিনি বুঝেন না, ইহা কিরূপ কথা? কত সময় ভাবিয়াছি, এত বড় লোকের লেখনী হইতে এ কি মত-ভ্রান্তি বাহির হইল! কিন্তু তবুও আজ মুক্ত আকাশের তলে, মুক্ত লেখনীতে অকপটচিত্তে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, মত-সংঘর্ষণ এ সংসারের ধূলি মাটির জিনিস—তাহা ব্যক্তিত্ব-দূষিত, তাহা অসংযমের হলাহল। দেশের অধিকাংশ লোকের বিরুদ্ধে তাহার চলা স্বৈচ্ছাচার-মূলক বলিয়াই উপেক্ষিত হইয়াছে। মানুষ অসম্পূর্ণ জীব, তাহাতে রাবিস বা ময়লা থাকা অসম্ভব নয়; তাহা থাকিলেই যে “মল্লের সমস্ত মহত্ব গেল, তাহা নয়। সে সকল পরিবর্ত্তন করিয়া, মানুষের প্রকৃত মহত্বের অনুসরণ করাই খাঁটি লোকের কর্তব্য। যে রাবিস বা ময়লা তাহাতে ছিল, ব্যক্তির সহিত তাহা স্থানে ভ্রমীভূত হইয়া গিয়াছে;—এখন কেবল তাহার অমানুষী শক্তিই জাগিয়া উঠিতেছে;—আজ সকলে একবাক্যে কেবল তাহারই প্রশংসা করিতেছে। মত-রাহতে তাহার প্রকৃত শক্তি-স্বর্য্যকে আবৃত করিয়া রাখিতে পারে নাই।

তাঁহার প্রকৃত শক্তি—শুধু তাঁহার লেখায় পরিষ্কৃত হয় নাই;—উহাও বাহিরের জিনিস, হয় ত উহাও কালে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; হয় ত তাহাও কালে নিন্দিত হইবে; কিন্তু তাঁহার প্রকৃত মহত্ব—তাঁহার অনিন্দিত দেব-দর্শিত পবিত্র চরিত্র। অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া তিনি সংসার-লীলা করিয়া গিয়াছেন—এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যেও কেহ তাঁহার চরিত্র-

* If he did not succeed as a journalist it was due not to any lack of ability on his part, but mainly to two causes.

Patrika—7th April, 1909,

স্বপ্নন দেখে নাই।—তিনি সর্বদা সংযত থাকিতেন, তাঁহার ভিতরের চিত্র-সৌন্দর্য্য বাহিরে অতি অল্পই প্রকাশ হইত। প্রকৃত ধার্মিকের লক্ষণই এই যে, তাঁহার প্রকৃত মহৎ-গভীরে; অতলেই গুপ্ত থাকে। নির্জনে বাস, নিভৃত সাধনের নিত্য সহায়। তিনি কোলাহলে, আন্দোলনে ঘুরিতে বড়ই ভয় পাইতেন। এদেশে প্রবাদ আছে “চুনাপুঁটা অল্প জলে ফর ফর করে, কিন্তু রোহিত কাতলা গভীর জলে নীরবে বিচরণ করে।” আমরা ক্ষণবিদ্রাবৎ কতই চক্ৰম্ করি, কতই আফালন করি, কতই লোক ভুলাইয়া বেড়াই, কিন্তু প্রকৃত ধার্মিকেরা গভীরে, অতলে, সদা সংসার-নিরপেক্ষ হইয়া, ডুবিয়া থাকেন। সেইরূপ ছিলেন, ঋষি রামতনু, ঋষি রাজনারায়ণ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, সাধু অবদারনাথ। নগেন্দ্রনাথ রাখাশ্বামী সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছিলেন, রাখাশ্বামী সম্প্রদায়ের মতামত কি, আমরা তাহা জানি না। যাহাই হউক, যে সম্প্রদায় নগেন্দ্রনাথ ঘোষের চরিত্রের জায় চরিত্র উৎপন্ন করিয়াছে, সে সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব অচিরে দেশে ব্যাপ্ত হইবে। তিনি চলিতে ফিরিতে, যাইতে বসিতে, হাটিতে শুইতে—সদা গান্ধীর্ষ্যে ডুবিয়া থাকিতেন। বোধ হয়, তাঁহরে চিত্ত সংসারের অতীত নিত্যানন্দ ধামে সদা প্রধাবিত ছিল। তিনি মৃত্যুর পূর্ব দিনও কাজ করিয়াছিলেন, প্রফ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু যখন সময় আসিল, নির্বিকারচিত্তে, মহা যোগীর জায়—নির্বীণে আত্মসমর্পণ

করিলেন। * নগেন্দ্রনাথের, গভীর আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ চিত্র—তাঁহার যোগী-জনোপযোগী মহা সমাধিতে প্রকটিত। ধন্ত নগেন্দ্রনাথের অনিন্দিত,—দেবভুলভি পুত চরিত্র।

তবে যাও, দেব, সেই নিত্যানন্দ ধামে, যেখানে যশ ও গিদ্দার উত্তেজনা নাই,— সংসারের বিদ্রোহ-বিষের যন্ত্রণা নাই; অবিচারের কশাঘাত নাই,—এই মর্ত্যভূমির যাহা কিছু ভীত,—তাঁহার কিছুই নাই। তুমি অনিন্দিত যে পুত চরিত্র রাখিয়া গিয়াছ, আমরা হিংসা-বিদ্বেষ ভুলিয়া, নিত্য তাঁহার অনুসরণ করি এবং পূজা করি,—আর ভূমি—কারলাইল, এমারসন, শবুট্র এবং প্রতাপ-চন্দ্রের সম-আসনে বসিয়া সেই মহেশ্বরের মহাধ্যানে নিমগ্ন হও, যাহার সমতুল্য পুণ্ডর—ইহকাল ও পরকাল আর কোথাও নাই। তুমি কখনও সংসার-বিষে জর্জরিত হও নাই—তোমাকে আর অধিক কি বলিব, তোমার নিকট এই একটা প্রার্থনা—তোমার অকপট স্বদেশ-ভক্তি ও স্বদেশ-সেবা এবং অনিন্দিত নিঃশূল চরিত্র যেন এদেশে অম্লহত হয়। তোমার অভাবে বঙ্গ আজ কাঁদিতেছে— তোমার স্থান আর পূর্ণ হইবে না, বলিতেছে, আশীর্বাদ করিও, তোমার চরিত্রানুসরণ করিয়া এদেশে যেন তোমার জায় শত শত লোকের অভ্যুদয় হয়। তবেই তোমার পরিশ্রম সার্থক হইবে এবং তোমার স্মৃতি অক্ষয় হইবে। বিদাতি তাহাই করুন।

* God's finger touched him and he slept. Indian Nation April 12, 1909.

হুম-বিবাদ ।

নূতন বৎসর, নূতন গচিব, নূতন রকমের আমায়ের একটা আনন্দ । ইহা দেখিতে ভাল, শুনিতে ভাল, লোকের কাছে বলিতে ভাল, একটা গাল-ভরা সমাচার । পরন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, ইহাতে কাহারও কোন লাভ হয় নাই, কাহারও পেট ভরে নাই, কাহারও কোন প্রকার দুঃখ ঘুচে নাই । ব্যাপারটা একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক ।

সিংহ মহাশয় নূতন ধরণের সিংহস্থ প্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনে বসিলেন ; একরূপ আফ্লাদেয় বিষয়, সন্দেহ নাই যে, একজন ভারতীয় উপযুক্ত ব্যক্তি সম্রাট কর্তৃক সম্মানিত হইলেন, স্বৈতাজের একটুটিয়া রাজমন্ত্রীস্বে বরিত হইলেন । কিন্তু এই আশাতিরিক্ত পদোন্নতিতে তাঁহার লোকসান বৈ লাভ ত দেখি না, তিনি বাহা রোঙ্গগার করিতে-ছিলেন, হয় ত তাহার চারি আনা রকম তাঁহার এখনকার আয় হইল । সাধারণ লোকে বলে, “সকল কথা ফাঁকা, আসল কথা টাকা” :—বাস্তবিক উপরে ভগবান নীচে টাকা, এই দুই আপনাপন ক্ষেত্রে সর্ব-শক্তিমান, সেই টাকাই যখন এতটা কমিয়া গেল, তখন এই পদমর্যাদার সঙ্গে সিংহ মহাশয়ের ও তৎসঙ্গে আমাদের সমুহ ক্ষতি হইল বলিতেই হইবে । তারপর হাজার হইলেও চাকরী চাকরীই । এডভোকেট জেনেরলী চাকরী ছিল না, অত্যাশ্চর্য্যের মত সরকার বাহাদুরের নিকট বার্ষিক একটা খোক টাকা পাইতেন মাত্র, উহাতে তাঁহাকে স্বাধী-

নতা বিক্রয় করিতে হয় নাই । সিংহ মহাশয়কে আমরা যতদূর জানি, তিনি একজন অতি সুন্দর প্রকৃতির স্বাধীনচেতা জীব ; এখন তাঁহাকে পরাধীন হইতে হইল, ইহা কম ক্ষোভের বিষয় নহে । চাকরীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটা পুরাতন কাহিনী মনে পড়িল ;—অনেকেই জানেন, সুবিখ্যাত শ্রীগোরাঙ্গভক্ত সনাতন গোস্বামী গোড়ের বাদশার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন । একদা গভীর রজনীযোগে ভয়ঙ্কর বড়ঘুড়ির মধ্যে নরপতি তাঁহাকে তলব করেন, অগত্যা তিনি লোকলঙ্কার সহ রাজপ্রাসাদান্তিমুখে যাইতেছিলেন ; পথের ধারে এক কুটারস্থ মেথর তাহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল “বল্ দেখি এই অন্ধকার নিশিতে এই ভীষণ দুর্যোগে কে যাইতেছে ?” মেথরাণী উত্তর করিল, “মানুষ কখন এমন সময় বাহির হইবে না, বোধ হয় কুকুর যাইতেছে ।” ইহা শুনিয়া মেথর বলিল, “তোমার ভুল হইয়াছে, কুকুরও কখন এরূপ অবস্থায় বাহির হইবে না, কোন প্রকার আশ্রয় গ্রহণ করত আরামে থাকিবে, এ নিশ্চয় চাকর, প্রভু ডাকিয়াছে, কাজেই বাধ্য হইয়া, এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও, তাঁহার নিকট যাইতেছে ।” সনাতন সেইস্থানে একটু দাঁড়াইয়া মেথর-মেথরাণীর কথোপকথন শুনিলেন, মনে বড় স্থগা হইল, ভাবিলেন চাকরীর খাতিরে তিনি আজ কুকুরেরও অধম হইলেন । দৈবযোগে সেই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গোড়নগরের সমীপে বিরাজিত ছিলেন ; সনাতন তাঁহার চরণাশ্রয় ঈশ্বরতঃ

সকল প্রকার দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া রক্তকৃত্য হইলেন। তদনন্তর কিছু দিন পরে সনাতন গৃহভাগী সন্ন্যাসীর বেশে গোড়নগরে প্রত্যাবর্তন করিলে বাদশা স্বয়ং তাঁহার কুঠীতে গিয়া বলেন, “সনাতন! শুনিয়াছি, তুমি একজন মহা বৃদ্ধক হইয়াছ, আমাকে কিছু বৃদ্ধকী দেখাও।” তিনি আসিতেছেন শুনিয়া সনাতন মুখ ফিরাইয়া বসেন, তদবস্থায় থাকিয়া গোড়েশ্বরের কথার উত্তরে নির্ভীক চিত্তে বলিলেন, “কিছুদিন পূর্বে যখন তোমার গোলামী করিতাম, কত কুর্শি করিতে করিতে তোমার সিংহাসন সমক্ষে উপস্থিত হইতাম, আর আজ আমি সেই সনাতন তোমাকে উপেক্ষা করিয়া তোমার দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসিয়া আছি, ইহা অপেক্ষা বড় বৃদ্ধকী আর কি দেখিতে চাও?” ভূপতি স্তম্ভিত হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

তাই বলিতেছিলাম, চাকরী যত বড় বড় হউক না কেন, উহা হইতে গোলামীর কলঙ্ক কেহ মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। একারণ কবি গাইয়াছেন, “অশ্বখের শেষ চাকরী করা”। আমরা হইন, মহতের ভাবের ধার দিয়া যাইতে অক্ষম, আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ত এই বুঝি যে, নিতান্ত পেটের দায়ে এই দগ্ধোদর ভরিবার জন্য, ছলভ মানব জনম পাইয়া লোক চাকরী করতঃ পরাধীনতা শৃঙ্খল গলায় পরিতে বাধ্য হয়। বাহার একমুষ্টি খাইবার, একখানা পরিবার সংস্থান আছে, তাহাতে যদি মনুষ্যের নিকাশ হইয়া থাকে, যে কখনই স্ববৃত্তি অবলম্বন করিতে চাহিবে না।

ঐর্ষ্যপ্রেক্ষিতে যোগী আছে বা হইতে পারে, একথা শুনিলে অনেকে হয়ত আশ্চর্য

বোধ করিবেন, কিন্তু বাস্তবিক অবস্থান ছিলেন, আমরা জানি, তিনি এখন জীবিত কিনা বলিতে পারি না। প্রায় বার বৎসর হইল তিনি এক দিন আমাদের কাছে বলেন যে, ব্যারিষ্টার এন্. পি. সিংহ যেক্রপ উঠিতেছেন, কালে তাঁহার ব্যবসায়িক উন্নতির পীমা থাকিবে না। কিন্তু একদিক হইলে আর একদিক হয় না, বিষয়ে বাঁড়িলে পরমার্থে কমিতে হয়। পার্থিব উন্নতি সম্বন্ধে তাঁহার কথা বিলক্ষণ ফলিয়াছে, পরমার্থ-তত্ত্ব আমরা বুঝি না, সুতরাং তদ্বিষয়ে কিছু বলিতেও পারি না। সিংহ মহাশয়ের বৈষয়িক উন্নতি লক্ষ্য করিয়া প্রধান বিচারপতি পেথেরাম সাহেবও উচ্চ আশা প্রকাশ করিতেন। সেই সিংহ মহাশয় আজ ব্যবসয়ে চরমোন্নতি লাভ করিয়াও, সমর্থ বয়সে, বিপুল ত্যাগ-স্বীকার করত পদমর্যাদার লোভে, তথা ভারতবাসীর মুখোজ্জ্বল করিবার অভিপ্রায়ে, ইন্দ্রদ্রপদে অভিষিক্ত হইয়া বৃটিশ ভারতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় যোজন করিলেন।

এস্থলে আর একটা কথা আলোচনা করিলেও দোষের হয় না। অনেকের কাছে, সঙ্গে সঙ্গে সিংহ মহাশয়ের মুখেও, শুনা যাইতেছে যে, এই অভূতপূর্ব দান ইন্সরাজরাজের স্বতঃপ্রবৃত্ত বদান্ততার ফল ভিন্ন আর কিছুই নয়; মহানুভব মলে-প্রমুখ লিবারেল সম্প্রদায় ভারতবাসীর প্রতি প্রীত হইয়া উদার-চিত্তে এই উচ্চ সম্মান আমাদের কাছে প্রদান করিলেন, ইহার আর কোন অন্তরূপ কারণ নাই। সম্বশ একথা সর্বতোভাবে স্বীকার্য যে, মুক্তহস্ততা ভিন্ন দানের প্রযুক্তি আর কেহ হইতে পারে না, বন্ধমুষ্টি ব্যক্তির নিষিদ্ধ এক কপর্দকও আশা করা বোর বাতুলতা মাত্র,

পরন্তু কেহ কি বুক ঠুকিয়া বলিতে পারেন যে, সাম্রাজ্যময় ঘোর অশান্তির প্রাদুর্ভাব না হইলে এই দু্যনের জরীনা রাজপুরুষদের মনে উদয় হইত? তবে ভয়ের কথা যদি কেহ উল্লেখ করেন, তদ্বিকল্পে অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, ব্রিটিশ সিংহ মুণ্ডমালার দস্তবিকালে ভীত হইবার লোক নহেন। ভারতবাসীকে কাহারও ভয় করিবার ত কোন কারণ দেখিতে পাই না, কঙ্কালসার শতকোটি জীব দশজন সবল শরীরীর নিকট কিছুই নয়, তখন ভয় কাহার বা কিসের? তবে চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ খেঁকিকুকুর যদি অনবরত ঘেউ ঘেউ রবে চীৎকার করিতে থাকে, তজ্জন্ত ঘে ঘোর অশান্তি "উৎপন্ন হইবার কথা, অবশ্য তাহার ভয় আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। চীৎকারের মাত্রাটা আজকাল যে প্রকার বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এত বড় এক টুকরা রুটি ফোলিয়া দেওয়া কিছু বেশী কথা নয়। কিন্তু ইহাতে যে কোলাহল প্রশমিত হইবে, এরূপ আশা ত দেখিতেছি না, কারণ এখনও অসংখ্য কণ্ঠ হইতে এই ধ্বনি শুনা যাইতেছে "ময় ভূঁখা হৌ, ময় পিয়াসা হৌ।" এই অগণ্য ক্ষুৎপিপাসা-শ্রমাতুর ক্রয়ের জীবগুলিকে শান্ত করিতে গৈলে যাহা যাহা চাই, তাহার ত কোনই জ্ঞানোজ্ঞান দেখি না। জন কয়েক ভদ্রসন্তান বড় বড় চাকরী পাইলে ত কোটা কোটা কাকাল ভাইদের পেট ভরে না; যতদিন তাহাদের আর্জিনাদ বিধাতার সিংহাসন কাঁপাইতে থাকিবে, ততদিন রাজ্যে শান্তি আনয়ন করে কাহার সাধ্য? তাই ভাবি

সুচতুর অমাত্য মল্ল-মিল্টো বাহাদুরদ্বয় যে মাদ্রাজী চা'ল চালিলেন, তাহাতে মন ভিজিবার ব্যবস্থা হইল, কিন্তু চিড়া ত ভিজিবে না। ভারতের দীন হুংখী প্রকৃতিবর্গের ক্রেশনিবারণের কি ব্যবস্থা হইতেছে? ১. —

বহুকাল হইল প্রেমাবতার ধর্মপ্রাণ কবীর একতন্ত্রী হস্তে লোকের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া গিয়াছেন :—

‘হুংখী পড়ে পাহাড়তরু কোই না থবর লিন্।
সুখীকো যো কাঁটগড়ে সবকোই হার হার কিন্।
অর্থাৎ

হুংখী পড়ে পাহাড় তল কেহ থবর না লয়।
ধনীর পাশে ফুটলে কাঁটা সবাই করে হার হার ॥

সাধারণতঃ অগতের এই নিয়ম বটে; কিন্তু এখন ত অনেকে ইহা বুঝিয়াছেন যে, ব্যষ্টির সূখে প্রকৃত স্থায়ী সুখশুদ্ধতা একেবারে অসম্ভব, সমষ্টির কল্যাণ ব্যতীত সংসারে শান্তি পাওয়া যায় না। এই সত্যটা বুঝিতে পারিয়া আমাদের রাজস্বাতি তাঁহাদের দেশে হুংখীর হুংখমোচনের নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন; পরন্তু সেই ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা আমাদের দেশে তদ্রূপ কোন চেষ্টায় চেষ্টাবান নহেন। ইহাই আমাদের বিলাপের কারণ।

ও সকল কথা এখন থাকুক, উপসংহারে আর একবার বলি যে, অত বড় মুগ্ধকে আমরা রাজদরবারে অতি সামান্য মূল্যে বিক্রয় করিয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, ইহাই আমাদের ক্ষোভের কারণ, উচিত মূল্য পাইলেও একটা কথা ছিল।

ত্ৰিচন্দ্রশেখর সেন।

ধর্ম ও বিজ্ঞান ।*

ধর্মের সহিত বিজ্ঞানের চির বিরোধ ঘোষিত হইয়া আসিতেছে। ধার্মিক বৈজ্ঞানিককে সভয়ে নিরীক্ষণ করেন; বৈজ্ঞানিক ধর্ম-প্রচারকের প্রতি বিদ্রূপপূর্ণ কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন। ধর্ম ও বিজ্ঞানের এই বিরোধ একান্তই অপরিহার্য্য কিনা, বর্তমান প্রবন্ধে ইহাই আলোচনার বিষয়।

অনেক সময়ে দেখা যায়, বিবাদে প্রকৃত কারণ বর্তমান না থাকিলেও লোকে ভয়ঙ্কর বাক্য-সময়ে প্রবৃত্ত হয়, পরে "আমিও ত তাহাই বলিতেছিলাম, আমিও ত তাহাই বলিতেছিলাম" বলিয়া বিপক্ষ ব্যক্তির কর মর্দন পূর্বক প্রস্থান করে। উপস্থিত ক্ষেত্রেও বিবাদে কারণ এই জাতীয় কিনা, আমরা তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব।

এ পৃথিবীতে লোকে ধর্মের আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া ধার্মিক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, এবং বিজ্ঞানের সূত্র কণ্ঠস্থ করিয়া বৈজ্ঞানিক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; সুতরাং ধর্মের সহিত বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও, ধার্মিকের সহিত বৈজ্ঞানিকের ভয়ানক ঝড়যুদ্ধ চলিতে পারে।

পাঠা খাওয়াটা ধর্মের কার্য্য, কি মূর্গা খাওয়াটা প্রকৃত ধর্মের লক্ষণ, বিজ্ঞান যতদিন ইহার মীমাংসায় ব্যস্ত থাকিবে, কিম্বা পৃথিবীর সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরাটাই বৈজ্ঞানিক প্রণালী-সম্বন্ধ, কি সূর্য্যের পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরাটাই বিজ্ঞানানুসৃত ধর্ম, যত দিন ইহার বিচারে প্রবৃত্ত থাকিবে, ততদিন

ধার্মিকের সহিত বৈজ্ঞানিকের বন্ধুত্ব সংস্থাপনের আশা ছরাশা মাত্র। আমরা ধার্মিক নহি, বৈজ্ঞানিক নহি; কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে মনুষ্য হৃদয়ে চিরদিন বিরাজ করিতেছে ও করিবে; এবং প্রাকৃতিক নিয়মে একটা শৃঙ্খলা ও প্রকৃতির বিধানের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্য অগ্নাধিক পরিমাণে মূর্খের ও পণ্ডিতের হৃদয় চিরদিন আকর্ষণ করিয়াছে ও করিবে; তাই, সাহস করিয়া বলিতে পারি, যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি ধর্মের প্রাণ হয়, আর প্রাকৃতিক ব্যাপারে নিয়ম ও শৃঙ্খলার আবিষ্কার যদি বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ধর্ম ও বিজ্ঞানে প্রকৃত বিরোধ কোথাও নাই; পরস্তু ধর্মই বিজ্ঞানের লক্ষ্য এবং বিজ্ঞানই ধর্মের ভিত্তি।

প্রভাত ও সন্ধ্যাগগনের তপন দেবের লোহিত মূর্ত্তি কত মননানন্দদায়ক; সুনীল আকাশের চন্দ্রের উদয় কত মনোহর; রজনীর অন্ধকারে যখন প্রকৃতি দেবীর স্বহস্ত-রচিত বর্ষিকাগুলি—সুদূর আকাশের সুবিশাল তারকা সমূহ, সহস্র হীরক খণ্ডের স্তায় ঝকঝক জ্বলিতে থাকে, তখন কাহার না হৃদয় বিস্ময়-রসে আপ্লুত হয়? কিন্তু বিজ্ঞান সাহায্যে যখন আমরা জানিতে পারি যে, জগৎ-প্রকাশক তপনদেব শুধু একখানা তপ্ত খালা মাত্র নহেন, আয়তনে ইনি প্রায় ১৪ লক্ষ পৃথিবীর সমান, এবং ইহারই আকর্ষণে বন্ধ হইয়া পৃথিবী এবং পৃথিবীর স্তায়

আরুও কয়েকটা বৃহদায়তনের পদার্থ ইহাকে বেঠেন করিয়া আপন আপন নির্দিষ্ট পথে ঘুরিতেছে, এবং ইহাদের পরস্পরের আকর্ষণে এমন সামঞ্জস্যের বিধান রহিয়াছে যে, কেহ কাহারও কক্ষ হইতে ত্রিলমাত্র বিচ্যুত হইতে পারে না; যখন আমরা জানিতে পারি যে, অনন্ত আকাশের ঐ কোটা কোটা নক্ষত্র, জ্যোতিতে বিমল-কিরণ চন্দ্রদেব দ্বারা পরাঙ্কিত হইবার নহে, প্রকৃত পক্ষে ইহারা এক একটা প্রকাণ্ড সূর্য্য এবং ইহারা আমাদের নিকট হইতে এত দূরে অবস্থিত যে, সেকেণ্ডে লক্ষ কোশ বেগে চলিয়াও আলোক ইহাদের কোন কোনটার নিকট হইতে এক মনুষ্যজীবনেও আমাদের এই পৃথিবীতে পৌঁছিতে পারেনা। যখন এই বিশ্বের প্রকাণ্ডত্ব আমাদের প্রকৃতভাবে উপলব্ধি হয়, তখন আমরা বুঝিতে পারি, এ অনন্ত-বিশ্ব পৃথিবী একটা সামান্য বালুকা কণামাত্র; আর, পৃথিবীবাসী আমরা, আমরা অণু অণু, কীটাপুঁকীট, নগণ্য ক্ষুদ্র জীব। তখন আমাদের জ্ঞান-গর্ভ ভাঙ্গিয়া যায়, তখন আমাদের মস্তক, আমাদের অজ্ঞাতসারে এই অপূর্ণ কোশল-ময় বিশ্ববিধাতার চরণে আপনি প্রণত হইয়া পড়ে। যখন দূরবীক্ষণ সাহায্যে শক্তি সম্পন্ন হইয়া কোটা গোজন দূরস্থিত নক্ষত্রদ্রুগতের সৃষ্টি ও ধ্বংস কার্য লক্ষ্য করি ও অতীবীক্ষণের সহায়তায় স্থল দৃষ্টি পাইয়া জলবিন্দু মধ্যবর্তী সহস্র সহস্র কীটের ভাবণ জীবন-সংগ্রাম অল্ললোকন করি, তখন প্রকৃতির এই সৃষ্টি ও ধ্বংসকারিনী মূর্তি আমাদের মনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়, হর্ষ ও আশুকা উৎপাদন করে। তখন মনে হয়, যিনি সত্যস্বরূপ, সত্ত্বপথ অবলম্বনেই তাঁহাকে পাওয়া যায়, আশ্রয় বিজ্ঞানের আলোক-বর্জিত হস্তে না

লইয়া সেই সত্য পথে প্রবেশ করিবার অধিকার কাহারও নাই।

কয়েকটা উদাহরণ দিতেছি,—

(১) নিউটন তাঁহার গভীর নিয়মে বলিয়াছেন “ক্রিয়া মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে।” যখনই দেখিবে, কোন একটা পদার্থ অপর একটা পদার্থের প্রতি বল প্রয়োগ করিতেছে (টানিতেছে বা ঠেলিতেছে) তখনই বুঝিবে, দ্বিতীয় প্রদার্থও প্রথমটির প্রতি সমান বল প্রয়োগ করিতেছে। চুম্বক যখন লোহকে আকর্ষণ করে, লোহও চুম্বককে সমান পরিমাণে আকর্ষণ করে বা টানে। পৃথিবী যখন বৃষ্টি বিন্দুকে আকর্ষণ করে, বৃষ্টি-বিন্দুও পৃথিবীকে ঠিক সেই পরিমাণে আকর্ষণ করে। সূর্য্য পৃথিবীকে টানে, পৃথিবীও সূর্য্যকে সমান টানে। ঘোড়া যখন গাড়ীকে টানে, গাড়ীও ঘোড়াকে টানিয়া থাকে এবং সমান পরিমাণে টানে। ইহা জড় বিজ্ঞানের কথা; পরীক্ষা দ্বারা ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যেখানেই টান আছে, সেই থানেই উহার পান্টা টান আছে; আকর্ষণ মাত্রেরই পান্টা আকর্ষণ আছে। ‘ক’ ‘খ’কে আকর্ষণ করিলে ‘খ’য়েরও ‘ক’কে আকর্ষণ করিতেই হইবে; আকর্ষণ উভয় পথ হইতে হইবে এবং সমান পরিমাণে হইবে। যেমন আকর্ষণ সম্বন্ধে, তেমনি বিকর্ষণ সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম; ‘ক’ যদি ‘খ’কে ঠেলিয়া দেয়, তবে ‘খ’ও ‘ক’কে ঠেলিয়া দিবে—সমান বলে ঠেলিয়া দিবে। দুইটা চুম্বকের উত্তর ধ্রুব কাছাকাছি রাখিলে দেখা যায়, উভয়েই উভয়কে ঠেলিয়া দেয়। ‘ক’ ‘খ’কে ঠেলিয়া দিলে ‘খ’ ও ‘ক’কে ঠেলিয়াই দিবে, টানিয়া আনিবে না; আবার ‘ক’ ‘খ’কে টানিয়া

‘আনিলে ‘খ’ ও ‘ক’কে ‘তানিয়াই আনিবে, ঠেলিয়া দিবে না। ইহা জড় বিজ্ঞানের নীরস কথা। কিন্তু যিনি ভাবুক, তিনি কি ঐ পর্য্যন্ত শুনিয়াই, ঐ পর্য্যন্ত জানিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন? না; ভাবুক বলিবেন, ‘তবেই দেখ বৈজ্ঞানিক, তুমি টেনে ধরণেই আমি টেনে ধরি, তুমি ঠেলে দিলেই আমাকে ঠেলে দিতে হয়; ভালবাসিলেই ভালবাসি, আর তুমি ঘৃণা করিলেই আমাকে ঘৃণা করিতে হয়। ভাই, আইস ভাই বৈজ্ঞানিক, তোমার গবেষণা, তোমার পরিশ্রমলব্ধ জ্ঞানকেই ভিত্তি করিয়া আমরা জগতে প্রেমের মাহাত্ম্য প্রচার করি, আইস জোর করিয়া আমরা সকলকে বলি “যদি ভালবাসা পাইতে চাহ, তবে ঘৃণা করিও না। যদি ঘৃণা কর, প্রতিদানে ঘৃণা পাইবে, ভালবাসা পাইবে না; আইস সকলকে বলি, অজ্ঞ নরের চক্ষু ফুটাইবার জন্ত, জগতে প্রেমশিক্ষা দিবার জন্তই করুণাময় বিধাতা, এই বাহু-জগতে, এই জড়জগতে, জড়ে জড়ে মহাকর্ষণের সৃষ্টি করিয়াছেন। আইস, জ্ঞানাক্স মানবকে বলি, যদি জড়ের অধম না হইতে চাহ, যদি জড়ের উপর তোমার আসন বলিয়া গর্ব কর, তবে জানিও—

“এ বিশাল বিশ্ব ভালবাসাময়
প্রতি অণুহুদে প্রেমের বাস।
বিনা প্রতিদান, বিনা বিনিময়,
প্রেম নাহি হয় কভু প্রকাশ।”

(২) বিজ্ঞান বলিতেছেন “জড় অবি-
নশ্বর, জড়ের ধ্বংস কল্পনাতেই আসে না।”
বিজ্ঞানের এই গর্বপূর্ণ উক্তি শুনিয়া, জড়ের
এই প্রাধান্তের কথা শুনিয়া দার্শনিক ধার্মিক
কি আশ্রয় বিলোপ প্রাপ্তিতেই সশঙ্কিত
হইয়া পড়িবেন?—ধার্মিক বলিবেন “তবেই

দেখ বৈজ্ঞানিক, যদি তুমি জড়েরই ধ্বংস
কল্পনা করিতে পার না, তবে তুমি যাহার
বলে গর্ব কর, যাহাকে তুমি প্রকৃতপক্ষে
‘আমি’ বল, যাহা তোমার আত্মা, তাহার
ধ্বংস তুমি কি প্রকারে কল্পনা করিতে পার?
তোমাকে বলিতেই হইবে, সময়ের অন্ত পর্য্যন্ত
তোমার আত্মা কোন না কোন ভাবে বিরাজ
করিবেই করিবে।

(৩) বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেরা ‘সিদ্ধান্ত
করিয়াছেন “শুধু জড় নহে, জড়জগতে শক্তিও
অবিনশ্বর। যেমন জড় সৃষ্টি করা বা ধ্বংস
করা মহুয়ের সাধ্যাত্মক নহে, সেই রূপ,
জড়ের শক্তিরও সৃষ্টি করা বা ধ্বংস
করা চলে না। জড়ের শক্তি ভিন্ন ভিন্ন
মুর্তিতে বিরাজ করিয়া থাকে। শক্তি কখনও
আলোকরূপে, কখনও তাপরূপে, কখনও
শব্দরূপে, কখনও তড়িৎপ্রবাহরূপে প্রকা-
শিত হইয়া থাকে। শক্তি এখন আলোকরূপে
বিরাজিত; পরে আলোকের ধ্বংস হইয়া
উহা তাপরূপে প্রকাশিত হইতে পারে।
তাপ অথবা আলোকের লোপ প্রাপ্তি ঘটিতে
পারে, মূর্তি বিশেষে শক্তির ধ্বংস হইতে
পারে বটে, কিন্তু যে পরিমাণ শক্তি এক
মূর্তিতে লোপ প্রাপ্ত হইবে, ঠিক ঐ পরিমাণ
শক্তি অন্য মূর্তিতে ফুটিয়া উঠিবে। মোটের
উপর, শক্তির বিনাশ নাই; সমগ্র জগতের
শক্তির পরিমাণ আজিও যাহা আছে, কল্যাণ
তাহাই ছিল, আবার কল্যাণ তাহাই থাকিবে,
উহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই। বৈজ্ঞানিকের এই
কথা শুনিয়া ধার্মিকের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল
হইয়া উঠিল না কি? ধার্মিক দেখিলেন,
বৈজ্ঞানিক যাহা বলিতেছেন, সকলই তাহার
মতের পোষকতা করিতেছে, হ্রস্বোদ্য বিষয়
সরল করিতেছে, তাহার স্বর্গে উঠিবার

সিঁড়ির আবর্জনাসমূহ সাফ করিয়া ফেলিতেছে। তখন তিনি পরীক্ষালব্ধ সত্যের দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়াইয়া উচ্চৈশ্বরে জগৎ সমক্ষে বলিবেন “আর তবে ভাই, অলস, অকর্মণ্য জীবন যাপন করিয়া ইহকালের উন্নতির পথে, পরকালের স্বর্গের পথে কণ্টক রোপণ করিও না।” বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, জড়জগতের শক্তি অবিনশ্বর, জড়ের কার্যের ধ্বংস নাই, কোন না কোন মূর্তিতে উহা বিরাজ করিবেই করিবে। যদি তুচ্ছ জড়ের শক্তিরই প্রকৃত অস্তিত্ব আছে, তবে কি আমাদের মনের শক্তির, মানসিক কার্য সমূহের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই! না; তাহা কখনও হইতে পারে না; তোমার মনের প্রত্যেক কার্য, তোমার প্রত্যেক ভাব, প্রতি ইচ্ছা, তোমার স্মৃতি ও তোমার কুভাব, তোমার রাগ, ঘেব, অহঙ্কার, আত্মাভিমান ও তোমার পরোপকারবৃত্তি কোন না কোনরূপে জগতে চিরকাল বিরাজ করিবেই করিবে। শক্তির এক মূর্তির গোপসাধন হইলেও অল্প মূর্তিতে উহা ফুটিয়া উঠিবেই উঠিবে। এখন, তোমার মনে ক্রোধের উদয় হইয়াছে; সময়ে ক্রোধের লোপ হইবে, কিন্তু অমৃততাপান্নি তোমার হৃদয়ে তখন প্রজ্জ্বলিত হইবে। তাই বলিতেছি, সতর্ক হও, ভবিষ্যতের চিন্তা কর তোমার ভবিষ্যতের সহিত তোমার বর্তমানের সম্বন্ধ রহিয়াছে, তোমার বর্তমান তোমার অতীতের দ্বারা নিয়মিত হইতেছে। তুমি এতদূর কিছু কর, তোমার সমস্ত কার্য, কোন না কোন মূর্তিতে বিরাজ করিতেছে ও করিবে। তোমার কার্যের ফল তোমাকে ভোগ করিতেই হইবে, কর্মফল-ভোগ তোমার এড়াইবার ঘো নাই। আজ যে সামান্য পাপ-চিন্তা টুকু তোমার অন্তরে কালিমার

রেখা অঙ্কিত করিতে না করিতে বিলীন হইয়া গেল, মনে রাখিও, উহা একেবারে মুছিয়া যায় নাই, অলস অন্ধরে প্রকৃতির গায়ে উহা চিরকালের জন্তে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। আজ যে সামান্য পরোপকারবৃত্তি তোমার মনে উদিত হইলেও তুমি উহার সফলতা সম্পাদনে অকৃতকার্য হওয়ার তোমার অন্তঃকরণে ক্ষোভ উৎপন্ন করিল, মনে রাখিও, ঐ ক্ষোভেই উহার পরিসমাপ্তি নহে; ঐ পরোপকার বৃত্তি, ঐ ক্ষোভ, বিশ্ব-রচয়িতার বিশ্বগ্রহে চিরদিনের জন্ত অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে; মনে রাখিও, পাপ কখনও শাস্তির হস্ত এড়াইবে না, পুণ্য কখনও অপূর্ণ হস্ত থাকিবে না।

(৪) তাপ প্রয়োগ করিলে পদার্থ মাত্রই প্রসারিত হয়, উহার আয়তন বাড়িয়া যায়; আবার তাপ বাহির করিয়া লইলে উহা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। ইহা বিজ্ঞানের কথা। এই নিয়মের কি ব্যতিক্রম নাই? কোন একটা পদার্থ সম্বন্ধেও কি এই নিয়মের অপূর্ণতা লক্ষ্য করা যায় না? না, প্রকৃতির বিধান সার্বভৌমিক; সর্বত্র সমানভাবে বিরাজমান। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল,—না, ঐ নিয়ম সার্বভৌমিক নহে—ইহারও ব্যতিক্রম আছে। জল, ঠাণ্ডা করিলে ক্রমে সঙ্কুচিত হয় বটে, কিন্তু উহার উষ্ণতা ৪ ডিগ্রীর কম করিলে আর উহা সঙ্কুচিত হয় না; তৎপরে উহার আয়তন ক্রমে বাড়িতে থাকে। তবেইত, প্রকৃতির বিধানে অপূর্ণতা আসিয়া পড়িল, প্রাকৃতিক নিয়মে ক্রমভঙ্গ সম্ভব হইল। তাহা হউক, কিন্তু সে অপূর্ণতা, সে ক্রমভঙ্গ কি মধুর! এই ব্যতিক্রম, এই অপূর্ণতার সঙ্গে। সৃষ্টজীবের জীবন মরণের কি মধুর সম্বন্ধ বিরাজ করি-

তেছে। নিয়মের এই ব্যতিচার আছে বলি-
য়াই মৎস্য প্রভৃতি জলচর জীব জীবন ধারণ
করিতে সমর্থ হইয়াছে—নতুবা, যদি ঐ
ডিক্রীর নীচেও জল ক্রমাগত সঙ্কুচিত হইয়া
উহার গুরুত্ব বাড়িতে থাকিত, তাহা হইলে
শীত প্রধান দেশে সেই জমাট গুরু বরফ জল
অপেক্ষা ভারী হইয়া নদী, নালা, পুষ্করিণীর
তলদেশ আশ্রয় করিত, এবং উপরিস্থিত জল-
রাশিও অনুরূপ ভাবে শীতল হইয়া বরফ
সৃষ্টি করিতে করিতে সমুদ্র জলরাশিকে
কঠিন পদার্থে পরিণত করিত। কিন্তু মঙ্গল-
ময় বিধাতা জীবের মঙ্গলের জন্য প্রাকৃতিক
নিয়মের গতিরোধ করিয়াছেন,—তাই বরফ
জল অপেক্ষা লঘু—তাই লঘু বরফ জলের
উপর ভাসিয়া নিয়ের জলরাশিকে জলচর
জীবের আবাসযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে।
ইহাই বিধাতার করুণা। জীবের মঙ্গলের
জন্য বিধাতা স্বকীয় বিধান খণ্ডন করিতে
প্রস্তুত। কিন্তু, জ্ঞানপথে অধিকতর অগ্রসর
হইয়া আমরা যখন জানিতে পারি যে, মঙ্গলো-
দ্দেশ্যমূলক উপরিউক্ত ব্যতিক্রম প্রকৃতপক্ষে
ব্যতিক্রম নহে—মঙ্গলোদ্দেশ্য সাধন করি-
বার জন্য তিলমাত্রও নিয়মের অন্তর্থা করা
হয় নাই, যখন বুঝিতে পারি যে, ঐ ডিক্রীর
কম উষ্ণ জলে ঐ নিয়ম একই ভাবে ক্রিয়া
করিতেছে, কেবল অণু সমূহের এক প্রকার
নূতন সমাবেশ হইয়া দানা বাঁধিবার ফলে
বরফজল অপেক্ষা লঘু হইয়া পড়িয়াছে, এবং
সঙ্গে সঙ্গে বিধাতার মঙ্গলোদ্দেশ্য সাধিত হই-
তেছে, তখন জ্ঞান ও ভক্তি, আনন্দ ও বিশ্বাস,
আশা ও তৃপ্তি যুগপৎ উদ্ভিত হইয়া আমাদের
অস্তঃকরণ আমাদের অন্তঃকামারে বিধাতার
করুণার ভিত্তি হইয়া পড়ে।

ধার্মিক বলি কাহাকে ? বাহার ঈশ্বরে

বিশ্বাস দৃঢ়, ঈশ্বরে ভক্তি অচলা। এই
বিশ্বাস ও এই ভক্তির মূল কোথায় ?—
তাহার মহিমা দর্শনে, তাহার সর্গশক্তিমত্তার
উপলব্ধিতে। কে তাহার মহিমা কিয়ৎপরি-
মাণেও অনুভব করিতে পারে ?—কে প্রকৃত-
পক্ষে তাহার অনন্তশক্তির ব্যতিক্রম আভাস
পাইতে পারে ?—জ্ঞানী। তাই বলিতেছি,
ধার্মিক ও বৈজ্ঞানিক ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়
জীব নহেন। যিনি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, তিনি
ধার্মিক ; যিনি প্রকৃত ধার্মিক, তিনি জ্ঞানী।
বৈজ্ঞানিক বলেন, এহ যে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড
দেখিতেছ, ইহা সর্বত্রই নিয়ম দ্বারা চালিত
হইতেছে,—সে নিয়ম অখণ্ডনীয়, অপরিবর্ত-
নীয়,—মহান। সে নিয়মে ব্যতিক্রম নাই,
ভেদাভেদ জ্ঞান নাই, দেশ, কাল, পাত্র
বিচার নাই—সে নিয়ম সকল দেশে, সকল
কালে, সমান ভাবে ক্রিয়া করিতেছে।
ধার্মিক বলেন “তথাস্তু” এই বিরাট বিশ্ব
সর্বত্রই নিয়ম দ্বারা পরিচালিত। সে নিয়ম
সকল দেশে, সকল কালে, সমান ভাবে
ক্রিয়া করিয়া আসিতেছে ; তাই আইস তাই
বৈজ্ঞানিক, সেই নিয়মের সৃষ্টিকর্তা, সেই
শৃঙ্খলার রচয়িতা, সেই অনন্ত উদারতা,
অনন্ত করুণা, অনন্ত শক্তির আধার
সেই বিরাট পুরুষের শরণাপন্ন হই।
আইস, ভক্তিভরে, যুক্তকরে, আমাদের
জরা-মরণসম্পন্ন এই ক্ষুদ্র জীবনের দুঃখ
কষ্ট তাহাকে জানাই। বুঝা সে বৈজ্ঞা-
নিকের বিজ্ঞানগ্ৰন্থ, যিনি জগতে নিয়ম
ও শৃঙ্খলার আবিষ্কার করিয়া তাহার
পশ্চাতে নিয়ন্তার মঙ্গলময় হস্ত কথ-
নও অনুভব করিতে পারেন নাই। বুঝা সে
ধার্মিকের আত্মপরিভূষ্টি, যিনি সমগ্র জীবন
প্রেম ও ভক্তির বিমল প্রবাহে প্রবাহিত

হইয়া, সাধারণতঃ পর্বত-গহবরের উদ্দেশ্যে
ধাবিত হইয়াছেন। যদি তাঁহাকে প্রকৃত-
পক্ষে জানিতে চাহ, তবে তাঁহার স্বরূপ অমু-
সন্ধান কর—এই ব্রহ্মাণ্ডটা ছাড়িয়া দিয়া
ব্রহ্মাণ্ডপতির অমুসন্ধান করিও না। যদি

প্রকৃত ধার্মিক হও, তাহা হইলে প্রকৃতির
বিধানে নয়ন আবৃত করিলে চলিবে না।
যদি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক হও, তাহা হইলে জগ-
তের নিয়ম ও শৃঙ্খলার, প্রেম ও করুণার
অস্তিত্ব উপলব্ধি না করিয়া পারিবে না।

শ্রীমুরেজনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ফরিদপুরের ধনুস্তরি।

প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে যখন ফরিদপুর
হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া
কলিকাতা আসিয়া কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া-
ছিলাম, তখন ফরিদপুর কি এবং কোথায়,
ইহা পশ্চিম-বঙ্গবাসী সহপাঠিগণের কোতুলক
উৎপাদন করিত। যখন আমরা বলিতাম,
ফরিদপুর একটি জেলা, তাহার উত্তরে এক
জন বলিয়াছিলেন—“কৈ এমন জেলার নাম
ত কোন দিন শুনি নাই! ইহা বোধ হয়
ম্যাপে পাওয়া যাইবে না।” সেই মানচিত্রে
অস্তিত্ববিহীন নগর্য ফরিদপুর আজ বঙ্গ-
দেশে, এমন কি, সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ
করিয়াছে। সে কাহার জন্ত? চারিটা
উজ্জল নক্ষত্র ভারতের এই গগনকোণে সমু-
দিত হইয়া সমগ্র দেশ আলোকিত করিয়াছে
বলিয়া। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি,
শ্রীযুক্ত অধিকাচরণ মজুমদার, শ্রীযুক্ত দেবী
প্রসন্ন রায় চৌধুরী এবং স্বর্গীয় কবিরাজ
দ্বারকানাথ সেন কবিভূষণ, এই চারি মহাত্মা
ফরিদপুরের সেই চারিটা উজ্জল নক্ষত্র।
ইহারা নিজ নিজ কক্ষক্ষেত্রে এক একজন
অসাধারণ পুরুষ। নিজ নিজ কক্ষক্ষেত্রে
দেশের অভ্যুদয় করে ইহারা অনন্যসাধারণ
কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। প্রথমে কবি মহাত্মার
নাম হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের ইতিহাসে অলস্ত

অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে। শ্রীযুক্ত অধিকা-
চরণ মজুমদার রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতবাসী
প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। দেবীপ্রসন্নের
নাম বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্বর্ণীয়
থাকিবে। আর আয়ুর্কোদ-শাস্ত্রে অগাধ
পাণ্ডিত্য ও আয়ুর্কোদীয় চিকিৎসা-নৈপুণ্যে
কবিরাজ দ্বারকানাথ বিগত ত্রিশ বৎসর বিপুল
কীর্তি সঞ্চয় করিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জল
করিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, এই
শেষোক্ত নক্ষত্রটি, আমাদের কাছে শোকসাগরে
ভাসাইয়া, সম্প্রতি অন্তর্মিত হইয়াছেন।

আজ আয়ুর্কোদ শাস্ত্রের আলোচনা ও
আয়ুর্কোদীয় চিকিৎসার স্রোতে দেশ প্রাবিত।
কলিকাতার গলিতে গলিতে এখন কবিরাজ-
গণের সাইনবোর্ড, গলিতে গলিতে কবিরাজী
ঔষধের দোকান। এখন কবিরাজী চিকিৎ-
সার প্রসার প্রতিপত্তি এলোপ্যাথিক চিকিৎ-
সাকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। অমুক চক্র
দাস বা সেন গুপ্ত, কাব্যকণ্ঠ বা কবিচূড়ামণি—
(সম্ভবতঃ কবি ও কাব্যের সহিত আয়ুর্কোদের
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ)—উপাধি গ্রহণ করিয়া কলি-
কাতার এক গলিতে বাসা করিয়া সাইনবোর্ড
টান্ধাইলেন এবং এক বিজ্ঞাপন বাহির করি-
লেন। সেই বিজ্ঞাপন-পুস্তিকার ললাটে
লেখা “ধর্মার্থ কামমোক্ষাণামারোগ্যং মূল-

মুত্তমম্” এই শ্লোক—তাহার মধ্যে লেখা, “অগ্ন্যন্ত সমস্ত কবিরাজ যে ঔষধ প্রস্তুত করেন, তাহা কৃত্রিম, কেবল আমার ঔষধই খাঁটি”—তাহার শেষে লেখা, “আমাদের প্রস্তুতকৃত কুসুম-টোল (কবিরাজ মহাশয়-দিগের কলাণে সব রকম কুসুম ফুরাইয়া গিয়াছে, এখন বাকী কেবল আকাশকুসুম !) সর্বপ্রকার শিরোরোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ, তাহা ব্যবহার করিলে স্মৃতিশক্তি ও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায়, মূৰ্খ পণ্ডিত হয়,” ইত্যাদি। এই বিজ্ঞাপন প্রচারিত হওয়ার অল্পদিন পরেই দেখিবে, সেই কবিরাজ মহাশয় মকঃমল হইতে অর্ডার পাইতেছেন এবং কলিকাতায়ও তাঁহার পসার হইতেছে। পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাঁহার ভিজিট ৪ টাকা হইবে, দশ বৎসরের মধ্যে তিনি ৮ টাকার কমে কোথায়ও পদার্পণ করিবেন না।

কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্বে এরূপ ছিল না। তখন ইংরেজী শিক্ষিত সমাজে কবিরাজ Quack (হাতুড়ে) বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার অপরাধ এই, যদিও ঔষধ ব্যবহারে রোগ সারে, তবু তিনি বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাঁহার চিকিৎসা প্রণালীর ব্যাখ্যা (demonstrate) করিতে পারেন না। হাতের নাড়ী ধরিয়া কবিরাজ যে রোগ নির্ণয় করিতে পারেন, একথা তখন কেহ বিশ্বাস করিত না। এমন কি, এখনকার দিনেও এরূপ ইংরেজী শিক্ষিত লোক দেখিয়াছি, যাহারা বলেন, রোগ নির্ণয় করা কবিরাজ-দিগের সাধ্যাত্ত নহে, তাহারা ডাক্তারদের নিকট শুনিয়া চিকিৎসা করেন। যে কয়জন মহাত্মার কার্য্যকৌশলে এবশ্রকার সংস্কারপূর্ণ কলিকাতার শিক্ষিত-সমাজে আৰ্য্যজাতির প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা বদ্ধমূল

হইয়াছে, আমাদের ফরিদপুরের দ্বারকানাথ তাঁহাদের অন্ততম। তাঁহার পূর্বে এই আয়ুর্বেদ বিভারূপ সুরতরঙ্গিনী কোন খ্যাতনামা গঙ্গাধরের শিরঃশোভা সম্পাদন করিতেন। আমাদের দ্বারকানাথই সেই সুরধুনীকে ভগীরথের স্নায় নিম্নবঙ্গে প্রবাহিত করিয়া সমগ্র দেশবাসীর শোকতাপ হরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রভাবেই আজ সমগ্র দেশ সেই ভাগীরথীর মৃতসজীবনী সুধাধারায় প্লাবিত। এমন কি, এলোপ্যাথিক চিকিৎসার অন্ধ-পক্ষপাতী ইংরেজ গবর্ণমেন্ট পর্যন্ত তাঁহার প্রভাব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে “মহানহোপাধ্যায়” উপাধিতে ভূষিত করিয়া আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহা আমাদেরও বিশেষ গৌরবের কথা।

কিন্তু দ্বারকানাথ কেবল ভগীরথ নহেন, তিনি একজন ধ্বন্তরি। তিনি আমাদের ফরিদপুরের ধ্বন্তরি। ফরিদপুরবাসী জনসাধারণের দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল, একবার তাঁহাকে দেখাইলে সব রোগ সারিয়া যাইবে। তাই কঠিন রোগগ্রস্ত অর্থশালী রোগিগণ কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাকে দেখাইতেন, আর যাহারা অর্থহীন, তাহারা সেই ধ্বন্তরির দর্শনাভিলাষে পূজার অবকাশ পর্যন্ত পথপানে চাহিয়া থাকিতেন; এবং পূজার সময় তিনি বাড়ী আসিলে তাঁহাকে দেখাইয়া কৃতজ্ঞ হইতেন। তাই, দুই একবার, পূজার সময়ে থান্দারপাড় গিয়া দেখিয়াছি, তাঁহার ঘাটে অসংখ্য রোগীর নোকা বাধা। তিনিও দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া, হাসিমুখে উপস্থিত রোগীদিগকে দেখিয়া, যথাযোগ্য ব্যবস্থা ও ঔষধ প্রদান করিতেন। দুর্গোৎসব উপলক্ষে অনেক ধনশালী ব্যক্তি অন্ন ও বস্ত্র দ্বিতরণ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করেন, আমাদের ধ্বন্তরি

মহাশয় সেই সঙ্গে সঙ্গে ঐযথ বিতরণও করিতেন।

অনেকের ধারণা, ঐহাহারা ইংরেজীশিক্ষিত নহেন; তাঁহাদের তেমন কর্তব্যবোধ (sense of duty) নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস যে ভ্রাত্ত, কবিরাজ দ্বারকানাথ তাহার জাজল্যমান প্রমাণ। তিনি একদিন কথায় কথায় আমাকে বলিয়াছিলেন—“দেখুন, আপনাদের বিশ্বাস, আমরা স্বাধীন, আর আপনারা গবর্ণমেন্টের চাকুরী করেন বলিয়া পরাধীন। সেটা একে বারেই ভুল। আপনারা একজনের গোলাম, আমরা সাত জনের গোলাম। আপনারা আফিসের কয়েক ঘণ্টা কাজ করিয়াই খালাস পান, আর আমাদের দিন নাই, রাত্রি নাই, কেবলই রোগীর ভাবনা ভাবিতে হয়। কত লোকের জীবন মরণ আমাদের হাতে, ইহাতে আমরা সুখে, নিদ্রা যাইব কি করিয়া?” বলা বাহুল্য; তাঁহার ঞ্চয় কর্তব্য-নিষ্ঠ চিকিৎসকই এরূপ বলিতে পারেন। এমন ইংরেজীশিক্ষিত কৃতবিদ্য ডাক্তারও ত দেখিয়াছি, ঐহাহার রোগীর সহিত সযত্ন কেবল সাত মিনিটের জন্ত। অর্থাৎ থার্মোমিটার লাগাইয়া বসিয়া থাকিতে পাঁচ মিনিট (তাঁহাও আরার এখন এক মিনিটের থার্মোমিটার হইয়াছে!)—রোগীর নাড়ীর স্পন্দন গণনা করিতে লাগে এক মিনিট—আব প্রেসক্রিপ্চু-সন লিখিতে লাগে এক মিনিট। ডাক্তার সিঁড়ির উপর থাকিতে থাকিতেই হাত বাড়ান, রোগীর নাড়ী ধরিবার জন্ত; আবার এই সাত মিনিটের পরই লক্ষ দিয়া উঠিয়া পশ্চাৎ না ফিরিয়া আর একবার হাত বাড়ান, ভিজিট গ্রহণের জন্ত। ভিজিটের টাকা কয়টা পকেটস্থ করিয়াই অমনি গুড়-গুড় করিয়া প্রস্থান করেন। এই শ্রেণীর চিকিৎসকের

অগাধ বিভ্রা থাকিতে পারে, যথেষ্ট হাতবশও থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাদের উপর রোগীর বিশ্বাস থাকে কি? এরূপ হটকারী-চিকিৎসকের যে ভুল ভ্রান্তি হইতে পারে, তাহার বিচিৎ কি? কবিরাজ দ্বারকানাথ ধীরচিত্ত ছিলেন বলিয়াই সর্বশ্রেণীর রোগীর বিশ্বাস-ভাজন হইয়া এতদূর প্রতিপত্তি লাভ করিয়া ছিলেন।

দ্বারকানাথ কেবল একজন ধ্বংসস্তরি বলিয়া তাঁহার গোরব নহে, তিনি একজন মনবী পুরুষ ছিলেন। বাল্যকাল হইতে দারিদ্র্যের ক্রোড়ে লালিত হইয়া, তিনি দারিদ্র্যের কষ্ট বুঝিতেন। এইজন্য দরিদ্রকে তিনি কখনও উপেক্ষা করিতেন না, তাঁহার নিকট একজন ধনবানের যে আদর, দরিদ্রেরও সেই আদর ছিল। সকলকেই হাসিমুখে যথাযোগ্য ব্যবস্থা দান করিতেন। বিশেষতঃ করিদপুর জেলার নাম করিলে, তাঁহার নিকট অতিদীন হীন ব্যক্তিও অশেষ সমাদর লাভ করিত। দেশের কথা উঠিলে তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিত। একজন পরিচিত দেশের লোক দেখিলে তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইতেন। তখন শত কাঁজ কেলিয়া ফরিদপুরের কথা লইয়া মজিয়া যাইতেন। অধ্যয়নশীল ছাত্র-বৃন্দের অধ্যাপনা, গৃহপূর্ণ রোগীর ব্যবস্থা-দান পরিত্যাগ করিয়া, কত দিন নিভৃত বসিয়া এই প্রবন্ধলেখকের সহিত দেশের কথার আলোচনা করিয়াছেন।

তাঁহার প্রাধান্য লাভের আর একটা কারণ, তাঁহার সহৃদয়তা ও সামাজিকতা। তিনি সকল শ্রেণীর লোককে যথাযোগ্য আলাপ ব্যবহারে যুক্ত করিত পর্মিতেন। এ বিষয়ে আরার নিজের যে অভিজ্ঞতা আছে, তাহা অস্বাভাবিক প্রকাশের আশঙ্কা

স্বেচ্ছাও না বলিয়া পরিলাম না। কবিরাজ মহাশয় আমাকে বাল্যকাল হইতে বিশেষ রূপে জানিতেন এবং স্নেহ করিতেন। আমার চাকুরী হওয়ার চারি পাঁচ বৎসর পরে, উদ্ভিষ্ট হইতে ছুটি লইয়া দেশে বাইবার সক্ষম একদিন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি প্রথম দর্শনে আমাকে চিনিতে পারেন নাই, কারণ অনেক দিনের পর দেখা এবং আমার চেহারারও পরিবর্তন হইয়াছিল। তাঁহার ছাত্র কুঞ্জলাল (ইনি এখন “ভিষগরত্ন” উপাধিতে পরিচিত) তখন তাঁহার কাণে কাণে কি বলিলেন, আর অমনি কবিরাজ মহাশয় হাসিতে হাসিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—“একে ত সিংহ, তা’তে আবার ডেপুটী—ভয়ে আমার কথা সরিতেছিল না।” বলা বাহুল্য, উহাতে আমিই অধিক লজ্জিত হইলাম।

ইহার পর আর একদিন ঢাকায় দেখা। তিনি ঢাকার কোন বড় লোকের (বোধ হয় ভাওয়ালের রাজার) চিকিৎসার জন্য সেখানে গিয়াছিলেন। তাঁহার বাসায় দেখা করিতে গিয়া দেখি, লোকে লোকারণ্য। আমাকে দেখিয়া যে কত আনন্দিত হইলেন, তাহা বলা যায় না। পরে রেলওয়ে ষ্টেশনে আর একবার দেখা হইল। তাঁহার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বেশ, অর্থাৎ পায় চটীজুতা ও গায় একটা সামান্য চাদর দেখিয়া আমি খেন কি বলিলাম। তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন—“দেখুন, এই চটীজুতা পায় দিয়া আমরা যাহা করিয়া গেলাম, তাহাই আমা-
বেরূপে যথেষ্ট। আর যত দিন বাঁচিব, এই চটীজুতাই পরিব।”

চুয়াডাঙ্গা থাকিবার সময় আমার স্ত্রীর শিরঃপীড়ার জন্য তাহাকে কলিকাতা লইয়া

গিয়া কবিরাজ মহাশয়কে দেখাইলাম। আমি যেখানে উঠিয়াছিলাম, তিনি তাঁহার প্রধান ছাত্র হরিহর খাবুকে সঙ্গে করিয়া সেখানে আসিয়া আমার স্ত্রীকে দেখিলেন এবং যথোচিত ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। আমি ভিজিটের কথা সাহস করিয়া তাঁহার নিকট বলিতে না পারিয়া, হরিহর খাবুর হাতে যোলটা টাকা দিতে উত্তত হইলাম। কবিরাজ মহাশয় তাহা দেখিয়া বলিলেন—“সে কি? আপনার কাছে আমি ভিজিট লইব কেন?”

আমি বলিলাম—“লইবেন না কেন? আমার পাঠ্যাবস্থায় লইতে বলি নাই, এখন আমি ঈশ্বরেচ্ছায় চাকুরী করিয়া দু’টাকা রোজগার করিতেছি। এখন আপনাকে ভিজিট লইতে হইবে।”

তিনি হাসিয়া বলিলেন—“আশীর্বাদ করি, আপনি চাকুরীতে উন্নতি লাভ করিয়া আরও অধিক উপার্জন করেন। আমি আপনার কাছে ভিজিট লইতে পারিব না।”

গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে “মহামহোপাধ্যায়” উপাধিতে ভূষিত করিলে, আমি সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন—“গবর্ণমেন্ট আমাকে উপাধি দান করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন, মনেহ নাই, কিন্তু আমি আমার আত্মীয় বন্ধুগণের স্নেহ ও ভালবাসা অধিককর গৌরবের বিষয় মনে করি।”

এইরূপ তাঁহার আদর্শ মহুষ্কোচিত গুণ-গ্রামের বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এক্ষণে একাধারে সর্বগুণের সমাবেশ, অগাধ পাণ্ডিত্যে অসীম বিনয় ও নম্রতা, অতুল ঐশ্বর্যে নিরতিশয় সরলতা ও নিরভিমান, উচ্চ পদে আন্তরিক সহায়ত্ব ও অমানি-

কতা, কঠোর কর্তব্যপালনে মধুরতা জগতে
একান্ত দুর্ভেদ। সাথে কি তাঁহার আকস্মিক
তিরোধানের স্নানবস্ত্রের নগরে নগরে হা-
কায় পড়িয়াছে! তাঁহার চরিত্রের
পূর্ণজ্যোতিঃ দ্বারা তাঁহার জন্মভূমি এত
দিন আলোকিত হইয়াছিল, এখন তাঁহার

পূণ্য স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া ধস্ত হইবে।
'আমরা আশা' করি, তাঁহার উপযুক্ত
পুত্র শ্রীযুক্ত বোগীন্দ্রনাথ বিশ্বভূষণ এম্, এ
তাঁহার পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া
ব্যবসায় প্রতীষ্ঠাভাজন ও দেশে কল্যাণ-
ভাজন হইবেন। শ্রীযুক্তমোহন সিংহ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

কৃষি-ক্ষেত্র।

চের চের বৃক্ষ লোহার ফলস্র,
কর চূর্ণ চূর্ণ এই ছার কার,
রাখ লুকাইয়া যতনে তাহার
যে ধনে, মানব, পোষ জীবন ;
হৃদয়-শোণিত বিতরি অপার,
করি দিব তারে শত গুণ তার,
তোমার জিনিস রহিবে তোমার,
নিম্নে যেও সুষে নিজ ভবন।

শিখি নাই দয়া গৌতমের স্থান,
করে নাই প্রেম জাইষ্ট-প্রদান,
পড়ি নাই গীতা, জানিনা কোরাণ,
করেন দীক্ষিত মোরে নিমাই,
অপার্থিব ভাষে হৃদয় মাঝার
কে যেন শক্তি করিয়া সঞ্চার,
শিখায়েরে মোরে এই ব্যবহার

এ ভাবে বিভোর আমি রে তাই।
কেন মোরে লয়ে এত ঘাঁটাঘাঁটি,
এত লাঠালাঠি, এত কাটাকাটি,
আপোষে আমায় কেন বাঁটাবাঁটি
না পার করিতে, হে সভ্য নর ?
মোর বৃকে পড়ে কত পদাবাত,
করি না কখন তাহে নেত্রপাত,
সাধি নিজ কাজ শুধু দিন রাত,
কেন হিংসা, রাগে তুমি হে মর ?

কুপোষ্য ভাবিয়া বৃকের সম্মান
নাশ হবে মোর, নহি স্মরণ,
প্রশান্ত অন্তরে করি স্নান দান
বাড়াই তাহারে রয়ে যে যার,

পালনের অংশ কত নাহি মাগি,
হইনা লাভের কোন দিন ভাগী,
দিও কিছু খেতে, পুরস্কার লাগি
কত না আমার পরাণ ধায়।
পচা লতা পাতা আমার আহাৰ,
যদি ইচ্ছা হয় দিও কিছু সার,
ঢেল কিছু জল উপরে আমার,
পিপাসায় গেলে ছাতিটা ফাটি।
দিও খেতে কিছু সরষা গোবর,
পুকুরের কাঁদা রেখ থরে থর,
মাটা বলে যদি ইহাতে কাতর
হও, হবে তবে তুমিই মাটা।

শ্রীবিবেকানন্দ ভট্টাচার্য।

নববর্ষে।

হে নবীন, হে স্নানর, এস তুমি আজি,
ললাটে আঁকিয়া দীপ্ত তরুণ তপন,
এ বৈশাখে পূণ্যমাসে নব রশ্মিপাতে,
জাগাও নবীন বীৰ্য্য নবীন জীবন।

অই হাসে ফুল দিবা রোদ্র ঝলমল,
স্নানমুখে গেছে চলে অতীত বরষ,
নব আশা, নব ভাষা, নব প্রাণ লয়ে,
এসহে নবীন বর্ষ জীবন্ত হরষ।

যে ছুঃখ, বিবাদ জালা সহিয়াছি মোরা,
অতীতের সনে তার হ'ক তিরোধান,
সম্মুখে উন্নত গিরি লক্ষ্য উচ্চতম,
নিম্নে গর্জি মহাসিন্ধু শক্তি পরণ।

নব বলে বুক বেঁধে হও অগ্রসর,
কি ভয় ? কেনরে ভীত কল্পিত অন্তর ?

শ্রীযোগেন্দ্রমাধব গুপ্ত ।

প্রেম-পূজা ।

সারা জীবনের প্রেমে বাহিরি' জগতে,
করে নিল প্রেমময়, তোমারি সন্ধান,—
ততিনী নিঃসরি' যথা শৈল-শৃঙ্গ হ'তে,
খুঁজে নয় কোথা সিদ্ধ প্রাণেশ মহান !

হে দেব, আরাধ্য মম ! হৃদয়-ভাণ্ডার
তোমারি চরণে আজি দিহু মুক্ত করে ;
পুষ্প যথা আপনারি সম্পদ সস্তার,
নয় করি দেয় নিত্য ব্রহ্মাণ্ডের তরে ।

আমার পৃথক সখা কিছু নাই আজ,
সারা প্রাণ নিঃশেষিয়া দিয়েছি তোমায়,
গেমতি স্তন্দরী উষা তপনের মাঝ,
সানন্দে হারিয়ে পলে ফেলে আপনায় !

ভক্তের এ প্রেম-পূজা হ'ল কি গৃহীত,
নাহি জানি ওগো প্রিয়, হে চির-বাহিত !
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ।

গোধূলির তারা ।

অগ্নি জ্যোতির্ময় ফুল, ধরণীর আলো !
দিনান্তের মানছায়ে—স্নিগ্ধ সন্ধ্যার,
সুহাস লাবণ্যভরা আঁখি তব খোলো ;
জাগাইয়া তোল বিধে গোধূলি অরুণ ।
না জানি ও দৃষ্টিমাবে কত সুখ আছে ;
পর্যবে জাগায় দেয় আনন্দ উচ্ছ্বাস ।
জীবনের দুঃখ দৈন্ত্য সব যায় যুচে ;
আপনি জাগিয়া উঠে প্রেমের হতাশ ।
কার প্রেমে মজি অগ্নি সূচকহাসিনি !
নীলিমার তলে আসি দেখা দাও নিতি ।
শেফালি ধরণীলুটে, শিহরে অবনী ;
শুনিয়া তোমার কণ্ঠে বিরহের গীতি ।
চাহিয়া নিমেষহীন ধরণীর পানে ;
কাহার সৌন্দর্য্য-সুখা করিতেছ পান ।
কার ছবি বুকে করি বিকচ আননে ;
ধৌন-মুগ্ধ যোগী সম করিতেছ ধ্যান ।

• আপন আলোকে তুমি আচ্ছন্ন আপনা ;
কাহার আঁখার প্রাণ চাহ দীপিবারে ?
কার লাগি দীর্ঘকাল অক্লান্ত সাধনা ;
প্রেমের অঞ্জলি রচি ডাকিছ কাহারে ?
দেখ চাহি তব প্রেমে কবি আত্মহারা !
অগ্নি সৌন্দর্য্যের রাগি, গোধূলির তারা !
শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন ।

যাত্রী ।

বহিছে বহু প্রবল ঝটিকা,
ডাকিছে ডাকুক বাণ !
যখন তরণী দিছি ভাসাইয়া,
দেখিব নিয়োজি প্রাণ !
যদিও পবন বহে প্রতিকূলে,
যদিও সলিল উঠে কূলে কূলে,
তবুও আমার আশার আলোক,
হইবে না নিরবাণ !

বহিছে বহু প্রবল ঝটিকা,
ডাকিছে ডাকুক বাণ !
(২)

বহিছে বহু প্রবল ঝটিকা,
ডাকিছে ডাকুক বাণ !
যখন তরণী দিছি ভাসাইয়া,
দেখিব নিয়োজি প্রাণ !

যদিও আমার ভাঙ্গা তরুধান,
পবনের বেগে বহিছে উজান,
তবুও রোধিতে পবনের গতি,
আমি সদা আগুয়ান ;

বহিছে বহু প্রবল ঝটিকা,
ডাকিছে ডাকুক বাণ !
(৩)

বহিছে বহু প্রবল ঝটিকা,
ডাকিছে ডাকুক বাণ !
যখন তরণী দিছি ভাসাইয়া,
দেখিব নিয়োজি প্রাণ !

ঋষ, যথাকালে যতনের ফলে
বাইব তরিয়া সাগরের কূলে,
হৃৎকলের বল অনাথের নাথ
রয়েছেন ভগবান !

বহিছে বহু প্রবল ঝটিকা,
ডাকিছে ডাকুক বাণ !

• শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত ।

মণিপুর ও মিথি।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পূর্বোত্তর ও পশ্চিমোত্তর ব্রহ্মের প্রান্ত সীমায় মণিপুর। মণিপুর পর্বতভূত প্রদেশ। বর্তমান সমতল ভূমি পূর্বে একটি সমুদ্রবৎ হ্রদে পরিণত ছিল। তাহারই বর্তমান অংশ লাগটাক। (১) মহাভারতের সময়ে মিথিরা (২) পর্বত বাসেই ছিল। তখন লাগটাক অধিকাংশ ভাগ গ্রাস করিয়াছিল। যে অংশ ভূভাগে পরিণত হইয়াছিল, সেই অংশের নাম খোগন (৩) বাক্কা। এই খোগন বাক্কাই অর্জুন পরাভব-ক্ষেত্র।

অর্জুন-চালিত অশ্বমেধের অশ্ব বক্রবাহন এই স্থানে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া, ইহার নাম খোগন-বাক্কা হইয়াছে। এই সেই স্থান, যেখানে সেই দ্বিখিজয়ী বীর স্বীয় পুত্র-হস্তে নিহত হন। ক্রমবিকাশে লাগটাক সন্ধীর্ণ হইতে সন্ধীর্ণতর হইয়া বর্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ইমফাল (৪) উপত্যকায় পরিণত হইলে, মিথিরা ক্রমে ক্রমে পর্বতবাস ত্যাগ করিয়া ইমফাল উপত্যকা ভূমে বাস আরম্ভ করিয়াছিল। এখন উপত্যকা-ভূমি মিথি পরিপূর্ণ। মিথিগণ মানবজাতির মঙ্গোলিয় শাখাভুক্ত মাইয়ং মোরাম প্রভৃতি সম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন। মিথিগণ ক্রমশঃ আৰ্য্য সংস্পর্শে আৰ্য্যজাতির নিকটতর হইয়াছে ও হইতেছে। তাহারা এখন তাহাদের পর্বত-বাসী আত্মীয়দিগের অনেক দূরবত্তী হইয়াছে;—এখন আর সহজে সেই অসভ্য আত্মীয় শ্রেণীতে গণনা করা যায় না। বেশ ভূষা, আহার বিহার, চালচলন সকলই পরিবর্তিত। কারুকার্য্য ও সূচিকার্য্য সূচাক্রমে শিথিয়াছে। মিথি রমণীরা অতি সুন্দর

বস্ত্রাদি বয়ন করিতে পারে। মিথিদিগের বাহ্যিক পরিপাট্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। গীত বাজে সুদক্ষ হইয়াছে। এখন তাহারা বৈষ্ণব—সকলেই ভীলক মালাধারী এবং পাণ্ডববংশীয় বলিয়া পরিচয় দেয়। পূর্বে মিথিদিগের লিখিত ভাষা ছিল—এখন নাই। এখন বঙ্গাক্ষরে তাহাদের কথিত ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। অনেকে বাঙ্গালা বেশ বলিতে ও লিখিতে পারে।

মিথিরাজ-বংশ-বৃক্ষ।

চিত্রভাষ্ক

ছহিতা—চিত্রাঙ্গদা অর্জুন-সংযোগে

বক্রবাহন

সুপ্রবাহ

পাখাঙবা

অর্জুন-চিত্রাঙ্গদা-সংযোগে বক্রবাহন। বক্রবাহনের এক পুরুষ পরেই আবার অনার্য্য নাম পাখাঙবা—এই পাখাঙবা হইতে বৈষ্ণব না হওয়া পর্য্যন্ত অনার্য্যে অবনতি হইয়াছিল। কিন্তু যে অজ্ঞাত মহাপুরুষ দূরারোহ পর্বতমালা ও কুকি প্রভৃতি অসভ্য জাতি পরিপূর্ণ চাং (৫) সকল উত্তীর্ণ হইয়া ইমফাল উপত্যকায় প্রবেশ পূর্বক মিথিদিগকে গৌরবাবিত পাণ্ডব বংশীয় বুকাইয়া বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তিনিই ধন্ত—তাহারই কৃপায় আজ আমরা অজ্ঞের তীরভূমির গীতগোবিন্দের গীত ইমফাল উপত্যকায়, এমন কি, নর্ত্তকী বালিকাদিগের মুখেও শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হই।

ত্রিদেবনারায়ণ ঘোষ।

(৫) চাং—গ্রাম, বস্তি।

(১) লাগটাক—হ্রদের নাম।

(২) মিথি—মণিপুরবাসী।

(৩) খোগন—অশ (ঘোটক)।

(৪) ইমফাল—নদীর নাম।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

১। The Past, Present and Future of the Refuge. আমরা আতুর-প্রেমের এই কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইলাম। এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা না হইলেও, শ্রীযুক্ত আনন্দ মোহন বিশ্বাস মহাশয় পবিত্র সেবা কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া যে আদর্শ দেখাইতেছেন, তাহার তুলনা নাই। বিধাতা এই আশ্রমকে আশীর্বাদ করুন।

২। Report of the Calcutta Orphanage for the year 1903—বাগ্যবাগীশ বাঙ্গালী এখন কমিশ্যন হইতেছেন। এই অনাথাশ্রমের কার্য্যবিবরণ তাহার অভ্যুজ্জল দৃষ্টান্ত। সেবা-বীর শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, রক্ষাকর্ত্তা এবং পরিচালক। সুন্দর রূপে কার্য্য চলিতেছে। সদিচ্ছার সহায় যে ভগবান, এই আশ্রম তাহার সাক্ষী।

৩। আর্থিকায়স্থ প্রতিভা। ত্রৈমাসিক কায়স্থ পত্রিকা, দেব শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার বি-এ কর্ত্তক সম্পাদিত। আমরা সাময়িক পত্রিকার সমালোচনা করি না;—এই পত্রিকা খানিকে সাময়িক পত্রিকা না বলিয়া জাতীয় ইতিহাস বা জাতীয় উন্নয়ন বলিলেই ভাল হয়। কায়স্থ জাতির উন্নয়নের জন্ত যে সকল মহাপুরুষ চেষ্টা করিতেছেন, সম্পাদক কালীপ্রসন্ন তাহার অন্তর। বার্লুকো লোক নিকুংসাহিত ও নিশ্চেষ্ট হয়, কিন্তু এই মহাত্মার জীবন তাহার জীবন্ত প্রতিবাদ। তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় যেন উৎসাহের অগ্নিকণা। একরূপ নিঃস্বার্থ জীবন বহুভূমির গোরব। কায়স্থ জাতির বিবাহের পণ-প্রথা এবং বিবাহ-সংস্কার কার্য্যে তদীয় প্রতিভা নিয়োজিত হইলে এদেশের প্রভূত উপকার হইবে। উপনয়ন ইত্যাদির প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সমাজ-সংস্কারে কায়স্থ প্রতিভা নিযুক্ত হইলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব।

৪। স্বদেশ-কুসুম। শ্রীমদ্বাকুফ বাগতি প্রণীত, মূল্য ৯০ (ছেলে ভুলান ছড়া)। ছেলেদের উপযোগী করিয়া লিখিত। লেখকের কবিতা লিখিবার শক্তি অসাধারণ।

পুস্তক খানি পড়িয়া আমরা স্তম্ভী হইলাম। স্বদেশী আন্দোলনের দিনে ঘরে ঘরে বালক বালিকাদেয় হাতে এই পুস্তক দিলে দেশের বিশেষ উপকার হইবে।

৫। শ্রীমদ্বাহবি বেদবাস্য প্রণীত গুপ্ত-কাশী বা শ্রীশ্রী৮বজ্রেশ্বর সাহায়া। মূল শ্লোকসহ বঙ্গীয় ভাষায় পরাৱাদি ছন্দে অনুবাদিত। মূল্য ১। ৪ খানি সুন্দর হারফটোন-ছবি-সংলিখিত। বীরভূমি কড়িয়া-নিবাসী শ্রীজটিল বিহারী চক্রবর্ত্তী কর্ত্তক প্রকাশিত। নামেই পুস্তকের কথা অভিযুক্ত। এই প্রাচীন পুঁথি খান প্রকাশ করিয়া জটিল বাবু সর্বসাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণের নিকট এই পুস্তকের বিশেষ আদর হইবে, আশা করি।

৬। সীতা। শ্রীধ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত, মূল্য ১। গ্রন্থকার অনুরোধ করিয়াছেন যে “তাঁহার যেন এই নাটকখানিকে কাব্য কলা হিসাবে মাত্র দেখেন, ইতিহাস বা ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া বিচার করিতে না বলেন।” সে বিচার অনিবার্য্য, কেন না, রামায়ণের অবমাননা হইলে সকলের প্রাণে আঘাত লাগে। জীজ্ঞাতির প্রতি গ্রন্থকারের গভীর অনুরাগের পরিচয়ে আমরা অনন্দিত হইলাম। কিন্তু তাঁহার রামচরিত্র কিছু ধর্ম্ম হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। শূদ্রক রাজার শিরশ্ছেদ ব্রাহ্মণের শাস্ত্রীয় ব্যবহারের ভ্রায়বিগর্হিত অনুশাসনের প্রতিবাদ স্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সমস্ত কথা আর একটু পরিষ্কৃত হইলে ভাল হইত। আমরা ধ্বিজেন্দ্রলালের লেখার বিশেষ পক্ষপাতী বলিয়াই এই কয়েকটা অপ্রিয় কথার উল্লেখ করিলাম। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, এই পুস্তক গুণ-শূন্য। অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় এই গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় রহিয়াছে। পড়িতে পড়িতে অশ্রু সঞ্চার করা যায় না। তদীয় লেখনীতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক।

৭। গীতা-ছায়া সমন্বিত। শ্রীমন্তগ-বদনীতা, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সেন গুপ্ত, মূল্য ১। পড়ে অনুবাদিত গীতা। ভাষা প্রাঞ্জল এবং মধুর।

প্রকৃতির প্রতিশোধ ।

একটা সংস্কৃত বচন আছে,—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদিহ উচ্যতে ।

বেদপাঠী ভবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্মজানাতী ব্রাহ্মণঃ ॥

স্মৃতিতেও এই জাতীয় একটা শ্লোক আছে,—

বিপ্রঃ শূদ্রসমান্তাবধিজ্ঞেয়ান্তু বিচক্ষণৈঃ ।

যাযুষ্মদে ন জায়ন্তে বিজ্ঞা জ্ঞেয়ান্ত তৎপরম্ ॥

সাংখ্য, ১৮।

মানুষ মাত্রই জন্মকালে শূদ্র থাকে, কিন্তু পরে সংস্কার বলে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়। এই দ্বিজত্ব ব্রাহ্মণত্ব নহে। কেন না, যিনি সংস্কৃত, তিনিই দ্বিজ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, এ তিনিই সংস্কৃত, সূত্ররাং তাহারা তিন জনেই দ্বিজ। যাহার দ্বিজত্ব লাভ হইল না, সে শূদ্রই রহিয়া গেল। শূদ্রের সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন—নচ সংস্কারমহতি। যে জন্মগত শূদ্র সংস্কারের দ্বারা পরিহার করিবার সুযোগ পাইল না, সে শূদ্রই রহিয়া গেল। সূত্ররাং দেখা যাইতেছে, এইরূপ শ্রেণী বিভাগে কোনও রূপ অস্বাভাবিকতা নাই। জন্মস্থান দ্বারাই মানুষের স্থান নির্দেশ হইতেছে না। তাঁহার শিক্ষা ও সংস্কারের দ্বারা তাহা নির্দিষ্ট হইবে। ইহাই স্বাভাবিক। মানুষ কি প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহা জন্মকালে নির্ণীত হওয়া সুকঠিন। তাহা আবার শিক্ষা ও সজ্ঞের দ্বারা নানাপ্রকারে পরিবর্তিত হইতে পারে। সেই জন্য ব্যক্তি বিশেষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কি শূদ্র, তাহা তাহার সংস্কারের দ্বারা স্থিরীকৃত হওয়াই স্বাভাবিক। ইহাই গৌতানির্দিষ্ট “গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ” জাতি নির্দেশ। উপরি-
 ধৃত শ্লোকে যে সংস্কারের দ্বারা দ্বিজত্ব প্রাপ্তি কেবল স্বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নহে, গুণ কর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণেরও উচ্চ নীচ শ্রেণী নির্দেশ করা হইয়াছে। প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব ব্রাহ্মজ্ঞান-সাপেক্ষ, তাহার পূর্বেও কর্ম্ম আছে।, সেটা বেদ পাঠ। বেদেই ব্রাহ্মজ্ঞান রহিয়াছে, সূত্ররাং বেদ পাঠ ব্রাহ্মজ্ঞান লাভের

সোপান। অগ্রে বেদপাঠ দ্বারা বিপ্রত্ব লাভ করিতে হইবে, তার পর তাহার অর্থের ধারণার দ্বারা ব্রাহ্মজ্ঞান আরম্ভ হইলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ পদবী লাভ হইবে, তাহার পূর্বে নহে। যাহারা পরবর্তী কালে জাতি বস্তুটিকে জন্মগত করিয়া জাতিভেদের নিগড়ে সমাজ-
 দেহকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এমন সব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যাহাতে মনে হয়, তাঁহাদের এরূপ ইচ্ছা ছিল না যে, জাতিভেদের জন্মগতত্বরূপ ফাঁস সমাজদেহের স্বার রোধ করিয়া তাহার বিনাশ সাধন করে। মনু স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন—

যোহনধাতা বিজ্ঞো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্ ।

স জীবন্তেব শূদ্রমশান্তু গচ্ছতি সাধমঃ ॥

মনু, ২।১৬৮।

ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেই নিরাপদে ব্রাহ্মণত্বরূপ জমিদারী বজায় থাকিতেছে না। যদি বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হও, তবে তুমি একা নও, সপরিবারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ব্যবস্থার এক অর্ক পরিচ্যাগ করিয়া কেবল অপরাধ গ্রহণ করাতেই যত বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। এক কবিবাজ যখন তাঁহার শিষ্য-
 বর্গের কাছে তেলের গুণ বর্ণনা করিতে-
 ছিলেন, “স্বতাদষ্টগুণং তৈলম্” তখন ভৃত্য মনে করিতেছিল, লোকেরা কি মূর্থ, তেলের যখন এত গুণ, তখন তাহারা ঘি খাইয়া কেন বেশী পয়সা খরচ করিয়া মরে। তাহ বাড়ী যাইয়া সে স্বীয় পরিবারে ও প্রতিবাসীবর্গের মধ্যে স্বীয় বিজ্ঞা জাহির করিয়া দিল। কিন্তু কিছু দিন যাইতে না যাইতেই সকলে অজীর্ণ পীড়া প্রভৃতি রোগে যখন শীর্ণ হইয়া পড়িল, তখন ভৃত্য বলিল, “কবিবাজ মহাশয়, আপ-
 নার উপদেশ পালন করিতে ঝাইয়া বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়াছি, এখন উপায়,” এই বলিয়া আশুপূর্ব্বক বর্ণনা করিল। শুনিয়া তো কবিবাজ মহাশয়ের চক্ষুস্থির। তিনি

বলিলেন, “হা, মূর্খ! তুমি ব্যবস্থার অন্ধাংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া বিপদে পড়িয়াছ। “স্বভা-দৃষ্ট গুণং তৈলম্,” সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে? কিন্তু “মর্দনাৎ নতু ভক্ষণাৎ।” আমরাও “চাতুর্ক্যংময়া সৃষ্টং” এই ব্যবস্থার-নামে সমাজ দেহকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া তাহা শত রোগে ভীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, কেন না, আমরা ব্যবস্থার অপরাধ একেবারেই তুলিয়া গিয়াছি। চতুর্বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা “গুণকর্মবিভাগ-শঃ।” অন্ধাংশ গ্রহণ করিয়া আমাদের দশাও কবিরাজ-ভৃত্যের দশা হইয়াছে। এখন ব্যবস্থাকারগণ আসিয়া যদি দেখেন, তবে তাহাদেরও চক্ষু স্থির হইবে, সন্দেহ নাই। বেদাধ্যয়ন তো দূরের কথা, যাহার ক অক্ষর গোমাংস, যাহার পেটে ডুবুরী নামাইয়া দিলে বর্ণমালার কনিকাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যাহাকে শূদ্র বলিয়া ঘৃণা করা হয়, তাহারই গৃহে তিনি টাকা মাছিয়া-নাম্ব যিনি ভৃত্য কর্ণে নিযুক্ত, তিনিও জন্ম-দোষে ভট্টাচার্য বা বন্দোপাধ্যায়, ত্রিবেদী বা চতুর্বেদী। পঞ্চাশ পুরুষ পূর্বে কোনও বংশে একটি মানুষের মত মানুষ জন্মিয়া-ছিলেন বলিয়া যেমন আরও একশত পুরুষ উপরে চলিয়া গেলে এক বনমানুষে যাইয়া ঠেকিয়া পড়া বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে, তেমনই আবার অভিব্যক্তিবাদের (Evolution এর) নিয়মানুসা-রেই পঞ্চাশ পুরুষ নিয়গামী হইয়া এক গোষ্ঠি অমানুষে আসিয়া পৌঁছান আশ্চর্যের কথা নহে। বরং সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান-সম্মত। বর্তমান কালের বিবর্তনবাদের (Evolution) এক জন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার Kelly সাহেব বলি-য়াছেন—Evolution has become un- fortunately synonymous in the ‘minds of many readers with that of development ; and alas! evolution is often the diametrically opposite of development. Development in- cludes the idea of improvement ; evolution includes both the idea of improvement and that of degenera- tion.

(Government or
Human Evolution.)

সুতরাং মহাশয় লাভের প্রকৃত পন্থা পরি- ত্যাগ করিয়া, কোন পুরুষে ঘি বাইয়াছিলাম, সেই জন্ত আজ বসিয়া হাত ভাঁকিলে কোনই লাভ দেখিতেছি না। বরং নুনা অহঙ্কারে ক্রমে অধঃপতন হইতে, অধঃপতনের গর্ভেই পড়িয়া যাইতে হইবে।

উপনিষদে ব্রাহ্মণ্য লাভের যে সূচী পন্থার নির্দেশ আছে, তাহাই বাস্তবিক বিজ্ঞানসম্মত পন্থা। সত্যকাম জাবাল গুরু গৌতমের নিকট উপস্থিত হইয়া দীক্ষা গ্রহ-ণের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে গুরু তাহার গোত্র জিজ্ঞাসা করিলেন। সত্যকাম বলি-লেন—আমি আমার মাতাকে, আমার গোত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, মাতা বলিলেন, “বহু চরস্ত্রী পরিচারিণী যৌবনে স্বামলভে সাহমেতন্নবেদ যদগোত্রমস্মি।” তখন গুরু অবাক হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “নৈতদব্রাহ্মণ্যঃ বিবক্তুমর্হতি।” তিনি নীচ জন্মা অস্পৃশ্য বলিয়া তাহাকে দূরীভূত করিয়া দিলেন না, কিন্তু “ন সত্যাদগা” এই বলিয়া তাহাকে উপনয়ন প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণ্যে উন্নীত করিয়া দিলেন। যিনি এমন ভীষণ সত্য কথা বলিতে পারেন, তিনি যদি ব্রাহ্মণ না হন, তবে ব্রাহ্মণ কে? জানি না, এ যুগের কত ব্রাহ্মণ জাবালির কৌলীন্তে কুলীনত্ব লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত, যাহারা জাবালির ব্রাহ্মণ্য দাবী করিয়াও তাহার সত্যকাম্যের অধিকারী নহেন, তাহাদের ব্রাহ্মণ্য নিতান্ত ভিত্তিহীন। “নৈতদব্রাহ্মণ্যো বিবক্তুমর্হতি” ব্রাহ্মণ্য লাভের, মহাশয়ের গৌরবময় উচ্চাসন লাভের এই প্রশস্ত উদার পথ থাকিতে, জন্মগত ব্রাহ্মণ্যের কৃত্রিম পথে চলিয়া ব্রাহ্মণ্যদেব একেবারে পা ভাঙ্গিয়া খোঁড়া হইয়া বসিয়া-ছেন, আর অগ্রসর হইবার শক্তি নাই। ব্রাহ্ম-ণ্য দশ জনে অর্পণ করে, উহা দাবী করিতে হয় না। ব্রাহ্মণ্য দাবী করিতে যৈ অহ-মিকার প্রকাশ পায়, তাহাতে ব্রাহ্মণ্যদেব আপনাতেই আপনি সঙ্কুচিত হইয়া লুপ্ত হন—ব্যপৈতি তত্ত্ব ব্রাহ্মণ্য শূদ্রত্ব সগচ্ছতি। জন্মগত ব্রাহ্মণ্যের এক দোষ যে উহা দাবী করিতে হয়। তাই বংশপরম্পরায় এই দাবী

দোঁবে ব্রঙ্গাণ্ডেব ক্রাণ হইতে ক্রীণতর হইয়া ক্ষুদ্রমনে দেশ ত্যাগ করিয়াছেন। এখন কেবল মাত্র “তেজোহীন ব্রঙ্গাণ্ডের নির্কিষে খোলস” ঐ পৈতৃভাষা কীধে বুলিতেছে; তাহাও আবার অধিকাংশ স্থলে Glasgow cotton। ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ। কিন্তু বাহায়া ঐ শূদ্রের সাহায্যে ব্রঙ্গজ্ঞান-বিহীন হইয়াও ব্রঙ্গাণ্ডের আশ্রয় করিবেন, শাস্ত্র তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ কটুক্তি করিতে ছাড়েন নাই। এবার কেবল শূদ্র বলিয়াই নিকৃতি দেন নাই, ব্রঙ্গাণ্ডেরই নীচে নামাইয়া দিয়াছেন—
ব্রঙ্গতবৎ ন জানাতি ব্রঙ্গশূদ্রো গর্ভিতঃ।

তেনেই মত পাপেন বিপ্রঃ পঙ্কজাশ্রিতঃ।

অত্রি, ৩৭২।

রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, রাবণ বধের পর দেবতারা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সমবেত হইলে শ্রীরাম ইন্দ্রকে বলিলেন, আমি মীতা উদ্ধার করিয়া সিন্ধু-কাম হইয়া দেশে ফিরিতেছি, কিন্তু আমার জ্ঞাত বাহারা হত হইয়াছে, তাহাদের জাপুল অনাথই রহিয়া গেল, ইহার কি কোনও বিহিত হইতে পারে না। তখন ইন্দ্রাদেশে মেঘগণ যুদ্ধক্ষেত্রে অমৃতবর্ণণ করিলে বানরগণ পুনরুজ্জীবিত হইয়া “রাবণকে মার, ইন্দ্র-জিত্বেকেশ্বর” বলিয়া গর্জন করিতে লাগল, তখন রামচন্দ্র প্রমাদ ভাবিয়া বলিলেন, ইন্দ্র, তুমি এ কি করিলে, আবার কি আনাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে? একই ক্ষেত্রে যুদ্ধ করারে কারতে যখন পাণাপাণ হত হইয়াছে, তখন অমৃতবর্ণণে বানরগণ জীবিত হইলে রাক্ষসগণও জীবিত হইবে নাকি? ইন্দ্র বলিলেন, তাহার আর সম্ভাবনা নাই। রাক্ষসগণ মৃত্যুকালে “শ্রীরাম” ভাবিতে ভাবিতে মরিয়াছে সুতরাং তাহারা মূর্তি লাভ করিয়াছে, বানরেরা ভাবিয়াছে “রাবণ কুণ্ড-কর্ণ” সুতরাং তাহারা মূর্তি পাইবে কিসের জোরে? এ শূদ্র, ইহার জল গ্রহণ করিতে নাই, এ নীচ, উহার ছায়া স্পর্শ করিতে নাই, এ অন্ত্যজ, উহার গৃহে বাইতে নাই, এই শূদ্র-ভীতি, এই শূদ্র চিন্তাও জাতব্রঙ্গ-গকে শূদ্র করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। যে

পরিমাণে দেশ অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। যে রামায়ণের আদিকাণ্ডে বৈশ্রবীর ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভজাত সন্তান সিদ্ধমূর্তিকে হত্যা করিয়া দশরথের ব্রঙ্গহত্যা হইল, সেই রামায়ণেরই উত্তরাণ্ডের কবি রামচন্দ্রকে দিয়া শূদ্র তপস্বীর মন্তকচ্ছেদনে রক্ষা হইয়া লইয়াছেন। অধঃপতন আর কাহাকে বলে?

উপনিষদে উক্ত হইয়াছে “বো এতাদ্বাদিতা স্মারোগাৎ প্রৈতি সঃ ব্রাঙ্গণঃ।” কিন্তু সম্প্রতি এক দল লোকের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহারা পৌত্তলিকতার সমর্থন করিতে বাইয়া বলিতে চান যে, ব্রঙ্গকে জানা যায় না। ইহাতে পৌত্তলিকতা কতদূর রক্ষা পাইবে, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়াও এ কথা বলা বাইতে পারে যে, ইহাতে ব্রাঙ্গাণ্ডের খাস রোধ হইল। কেন না, “ব্রঙ্গ জানাতি ব্রাঙ্গণঃ।” সুতরাং ব্রঙ্গকে যদি জানা না যায়, তবে ব্রাঙ্গ হইবারও আর আশা রহিল না। তারপর, ব্রাঙ্গাণ্ডের পথে আরও কটক আছে। শূদ্র হইতে ব্রাঙ্গাণ্ডে পৌছিতে হইলে বৈশ্রবীর ও ক্ষত্রিয়ের মধ্য দিয়া বাইতে হয়। শূদ্র অর্থ দাসত্ব। যে সর্ব বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী, সেই শূদ্র, দাস। এই শূদ্র হইতে উন্নয়নের পথে সর্বপ্রথম স্বাধীনভাবে নিজের অন্ন সংস্থান। নিজের খাওয়া পরার জন্য অস্ত্রের গন্ধগ্রহ না হইয়া সে জন্য নিজের যে চেষ্টা, তাহাই বৈশ্রবীর প্রথম ধাপ। খাওয়া পরার সংস্থান হইলে পর আত্মরক্ষার চেষ্টা। ইহাও ক্ষত্রিয়ের প্রবেশ, কিন্তু ক্ষত্রিয় কেবল আত্মরক্ষা নহে, অস্ত্রের সাহায্যে বটে—“আর্ভজাণ্যয়তঃশঃ” বিপদের উদ্ধার ক্ষত্রিয় শব্দের ধাতুগত অর্থ—

কৃতাৎ কিল ত্রায়ত ইতাদ্রঃ।

ক্ষত্রয় শব্দ ভুবনেষু কৃৎ: ॥

কিন্তু এই ধানেই শেষ নহে। যাহা ক্ষুদ্র আমির রক্ষার জন্য আরম্ভ হয়, তাহাই পার্শ্ববর্তী দশজনের সেবার লাগে, শেষে সমস্ত দেশে বিস্তৃত হইয়া সার্বিকতা লাভ করে। ক্ষত্রিয়ের পরিণতি দেশ রক্ষার আশ্রয়দান, ইহার এক ধাপে উপরে উঠিয়া

শূদ্রায়ামসি বোশ্যন শূদ্র জ্ঞানপদাধিপ।

দেশ বিদেশ ভুলিয়া যখন সর্বভূতে আত্ম প্রসার হয়, তখনই ব্রাহ্মণত্ব। কিন্তু শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণত্বে পৌঁছিবার মধ্যস্থলে এই যে বৈশ্বা ও ক্ষত্রিয়ের সেতু, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। “কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্য বৈশ্ব-কর্ম” — বাণিজ্য তো পরহস্তগত, শিল্প বিনষ্ট। নষ্ট শিল্প দেশের কৃষি অন্ন সংস্থাপনে অসমর্থ। গরু তো খাইয়াই উজাড়। উহা খেত ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য, স্ততরাং রক্ষার আর উপায় নাই। ক্ষত্রিয়ের * কথা না বলাই ভাল। অস্ত্রের সাহায্য তো দূরের কথা, একটা হিংস্র পশুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলেও যেরূপ চুকিয়া দরজা বন্ধ করা ছাড়া আর উপায় নাই। অস্ত্র আইন ক্ষত্রিয় হরণ করিয়াছে। স্ততরাং শূদ্র ও ব্রাহ্মণের মধ্যে যে সমুদ্র, তাহা আর পার হইবার উপায় নাই। তাই সমস্ত দেশ শূদ্রপূর্ণ হইয়াছে এবং সেই জন্তই আমরা সমস্ত ভারতবাসী খেত ব্রাহ্মণগণের হস্ত শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণের যে ব্যবহার শাস্ত্র-নির্দিষ্ট, তাহাই কড়ায় গলিয়া প্রাপ্ত হইতেছি। দুই চারিটা দৃষ্টান্ত দিলেই প্রকৃতির প্রতিশোধ কি, তাহা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

দেশে উচ্চ শিক্ষার বেদ গান বন্ধ হই-তেছে বলিয়া আমরা কতই না চীৎকার করিতেছি। কিন্তু আমরা ভুলিয়া গিয়াছি,

* বঙ্গদেশে এক দল ক্ষত্রিয় লাতের জন্ত উট্টিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাহাদের মনের ভাব এই যে, তাহারা নিতান্তই ক্ষত্রিয়, তবে গায়ের জোরে অস্ত্রের তাহাদিগকে শূদ্র করিয়া রাখিয়াছে। স্ততরাং কলমের জোরে শূদ্র ঘুচাইয়া ক্ষত্রিয় স্থাপন করিতে হইবে। যাহারা একদিন যেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া দল বখা গ্রহণ করতঃ শূদ্র বরণ করিয়াছিলেন; কেবল বরণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, কিন্তু লজ্জাশূন্য হইয়া সেই দাসত্বকেই কোলীন্দ্র্যপ স্বর্গে উট্টবার সিঁড়ি বানাইয়াছিলেন (selling the birth right for a mess of pottage) তাহারা এখন অস্ত্রের বাড়ি ঘোষ চাপাইলে চলিবে কেন? বরং যিনি প্রকৃত ক্ষাত্রোত্তম দেখাইয়া মনুষ্য বজার রাখিয়াছিলেন—দত্ত কল্প ভূত নয় সঙ্গে এসেছে—তাহাকে তো সমাজে হীন করিয়াই রাখা হইয়াছে; বাহা কর্ম্মভাবে গিয়াছে, তাহা; শুণ্ণকর্ম্ম বলে লাভ করিতে হইবে। নতুবা গমার একটা দড়ী খুঁটাইলে কল কি? কল সময় বিশেষে দরকার হইলে কেবল কলগায়েই চলিবে।

শূদ্রের বেদে অধিকার নাই। শাস্ত্রকুরগণ বলিয়াছেন, শূদ্র যদি বেদ শ্রবণ করে, তবে তার কর্ণে উত্তপ্ত দ্রব ধাতু ঢালিয়া দিবে, শূদ্র যদি বেদ উচ্চারণ করে, তবে তাহার জিহ্বা টানিয়া ছিড়িয়া ফেলিবে।

বেদমুপশ্রবতস্তপুজতুভ্যাং শ্রোত্র প্রতিপুরণ মুদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদঃ।

গৌতম, ১২শ অধ্যায়।

আমাদের খেত শাস্ত্রকারগণ কেবল শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিবার আয়োজন করিয়া-ছেন মাত্র, গত পাপের জন্ত এখন গুণ্যস্ত ও কোন আইন জারী করেন নাই। করিলে আমরা নাচাঁর। কেন না, শাস্ত্র বান্দ ফলে, তবে কাহার দোষ। শুনিলে তো তপ্ত দ্রব ধাতুর ব্যবস্থা, আর ধারণ করিয়া রাখিলে মৃত্যু দণ্ড। J. C. Bose, P. C. Roy, যাহারা বেদের ধারণা করিয়াছেন, এতদিন তাহাদের কি দশাই না হইত, যদি খেত ব্রাহ্মণগণ আমাদেরই শাস্ত্র অনুশরণ করিতেন। ভারত মহাসাগরটা তপ্ত দ্রব ধাতুতে পূর্ণ করিয়া তাহাতে সমস্ত দেশটা শুদ্ধ ফেলিয়া দিতে হইত। ইহাতেও শাস্ত্রকার-গণের মনে তৃপ্তি হইল না। অবশেষে নরকের ভয় দেখাইয়া তবে ছাড়িলেন,—বেদাঙ্গের বিচারেণ শূদ্রস্ত নরকং প্রবর্ম।

পরশুর, ১৬৪

আমরা রেল গাড়ীর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বসিতে যাইয়া খেতব্রজগণ কর্তৃক অপমানিত হইয়া কাগজ পত্রে কতই না আন্দোলন করি। তবুও তো আমাদের প্রতি শাস্ত্রামুখী ব্যবস্থা হয় না। শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে একাসনে বসিবার স্পর্ধা! সহাসনমতিপ্রেম্পকুংকটস্থাপকট্টজঃ।

কর্ত্যং কৃতাক্কোনির্বাস্তঃ ক্ষিচং বাস্তাবকর্তয়েৎ
মহু, ৬২৮১

তপ্ত লৌহের দ্বারা শরীর দগিয়া দেশা-স্তর করিয়া দাও বা পশ্চাদ্দেশ কাটিয়া দাও, অবশ্য যেন না মরে। আহা কি দয়! যেন না মরে! একটা ব্যবস্থা সঙ্গেও আমরা যে কেবল ছুটি ঘুঘি ও একটি অর্দ্ধচন্দ্র খাই-য়াই মানে মানে (!!) বাঁচিয়া যাই, সে পরম সোভাগ্যই মনে করিতে হইবে।

‘বছর’বছর ৫০ কোটি টাকা দেশ হইতে বাহির হইয়া যায়। ইহা ভাষিয়া আমরা একেবারে অধির হইয়াছি এবং সেজন্য দিগ্দিগকে ঢোল বাজাইতেছি। কিন্তু শূদ্রের যে ধনে অধিকার নাই, সে কথা ভুলিয়া গিয়াছি। শূদ্র ধন সঞ্চয় করিলে ব্রাহ্মণ যখন তখন কাড়িয়া লইতে পারেন। বিশেষতঃ তাহার ধন সঞ্চয়ে যে ব্রাহ্মণাদি জাতির বিঘ্নের সম্ভাবনা—যথা মমু ১০।১২২—শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্যো ধনসঞ্চয়ঃ। শূদ্রো হি ধনমাসাথ ব্রাহ্মণানেন বাধতে॥ ইহা না মানিয়াও যদি শূদ্র ধন সঞ্চয় করে, তবে ব্রাহ্মণ অনে কোন দ্বিধা না করিয়া তখন তাহা কাড়িয়া লইতে পারিবে, তাহাতে তাহার কোনই দোষ হইবে না— মমু. ৮।৪১৭

বিশ্রবঃ ব্রাহ্মণঃ শূদ্রদ্যুযোপাদানমাচরেৎ।

নহি তস্যান্তি কিঞ্চিং স্বং ভৰ্তৃহাধাধনো হি সঃ॥

যেত ব্রাহ্মণও এই আইনই জারী করিয়াছেন। থাাকারে নামক একজন মাল্লাজের ব্যবস্থা সচিব মমুর পুনরুজ্জীবি করিয়া গিয়াছেন— “In India that haughty spirit, independence and deep thought which the possession of great wealth sometimes gives ought to be suppressed.”

ইহারই নাম প্রকৃতির প্রতিশোধ। মানব সভ্যতারূপ মহাচক্রের আবর্তনের কোন্ নিয়মালুসারে, রাজনীতির কোন্ গুচ উদ্দেশ্য সাধনে, অর্থনীতি শাস্ত্রের কোন্ গুহ কারণে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের প্রতি সর্বদেশে সর্বকালে একই ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন, সে বুদ্ধিস্তের মর্শ্বোৎঘাটন সমরাস্তরের জন্ত রাখিয়া দিলেও এ চিন্তা মন হইতে দূর করিয়া দেওয়া যায় না, আমরা যে অগ্নিভাবে জীর্ণ, অর্থিভাবে শীর্ণ, পেটের দায়ে ভদ্র সন্তান যে ডাকাতিতে প্রবৃত্ত, তাহা কেবল আমাদের জাতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত। সমাজের এক অঙ্গকে হীন করিয়া রাখিলে সে হীনতা ক্রমে সর্বোঙ্গে ব্যাপ্ত হইবেই। প্রকৃতির প্রতিশোধ অনিবার্য।

সময়ে সময়ে কোন কোন উদার-হৃদয়ঃ ব্যবস্থাপক ভারতবাসী শূদ্রকে কিছু কমাইয়া তাহাদিগকে কিছু কিছু অধিকার দিবার

প্রস্তাব করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে ভারতপ্রবাসী স্বৈরাচারগণ স্বতঃ পরতঃ নানা প্রকার বাধা প্রদান করেন। তাহার কারণে যে, ভারতবাসীর দেশ শাসনের কোনই ক্ষমতা নাই। ইহার অস্ত্রের অধীনে থাকিবার জন্তই স্বেচ্ছা হইয়াছে। আমরা চাড়া দিলে কি হইবে, আবার অস্ত্রের অধীনতা গ্রহণ করিবে। সুতরাং ইহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়া লাভ কি? ইহাদিগকে চিরদিনই আমাদের দাসত্ব করিতে হইবে। ইহাতে আমরা চটিয়া যাই, সন্দেহ নাই। কিন্তু চটিবার পূর্বে আমাদের দেখা কর্তব্য, এ বিষয়ে শাস্ত্রকার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন। নতুবা অধর্ম হইবে! আমাদের কিন্তু চটিবার কোনই কারণ নাই। অস্ত্রের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছ, অবস্থার ফেরে সেই ব্যবহার তোমার নিজের প্রতি যখন প্রযুক্ত হইতেছে, তখন অহুশোচনা নিতান্তই বিকল। মমু বলেন,—

ন স্বামিনা নিম্নষ্টোহপি শূদ্রো দান্তাধিমুচ্যতে।

নিম্নগংহি তত্তস্ত কৃত্যাত্তদপোহতি॥ মমু. ৮।৪১৪

প্রভু মুক্ত করিয়া দিলেও শূদ্রের দাসত্ব যায় না, কেন না, দাসত্ব উহার স্বাভাবিক। সুতরাং একজন মুক্ত করিয়া দিলে আর একজন তাহাকে ধরিয়া আনিয়া দাস্তেনিযুক্ত করিবে, তা ক্রয় করুক আর না করুক। যেহেতু, শূদ্র তু কারয়েদাস্তঃ ক্রীতমক্রীতমেব বা। ৮।৪১৩

ইহার উপর মন্তব্য নিম্নয়োজন। কর্মফল হাতে হাতে। এদেশে সর্বদাই এরূপ দেখা যায় যে, যেত কৃষ্ণ স্বন্দে যেত ব্রাহ্মণগণের কোনই দণ্ড হয় না। যে অপরাধে কৃষ্ণের প্রাণদণ্ড, তাহাতে যেতের বড় জোর অর্থদণ্ড। স্বৈরাচার হাতে কৃষ্ণাঙ্গের প্রাণ নাশ হইলে, ভূরি প্রমাণ সত্ত্বেও তাহার প্রাণ দণ্ড হয় না। ইহাতে আমরা চীৎকারে গগন মেদিনী বিদীর্ণ করিয়া ফেলি। আমরা চীৎকার করি, কারণ আমরা ভুলিয়া যাই যে, যেত কৃষ্ণের বিবাদে ইহাই চিরন্তন বিচার প্রণালী। মমু স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, ব্রাহ্মণ শত দোষে দোষী হইলেও কখনও তাহার প্রাণদণ্ড হইতে পারিবে না। দণ্ড তো শূদ্রের

কথা, সে চিন্তাও রাজা মনে আনিবে না, “তন্মাদন্ত বধং রাজা মনসাপি ন চিন্তয়েৎ।” যদি ব্রাহ্মণ দোষই করে, তবে বড় জোর তাকে দেশান্তর করিতে পার, কিন্তু তাহার সর্বস্ব তাহার সঙ্গে দিয়া দিতে হইবে,—

ন জ্ঞত ব্রাহ্মণং হস্তাং সর্বপাপেণপি স্থিতম্।

রাষ্ট্রাদেনং বহিঃ কুর্যাৎ সমগ্রধনমকৃতম্ ॥ মমু. ৮।৩০

আগে বিধান করিয়া রাখিয়াছ, এখন চীৎকার করিলে কি হইবে?

যে অপরাধে ইংলণ্ডে একজন ভারত-বাসীর জন্য কয়েক টাকার মুচলিকা হয় * সেই অপরাধে এখানে তাহার প্রাণ লইয়া টানাটানি। কেন না, সেখানে শূদ্র ব্রাহ্মণের ভেদ নাই, সকলেই বিজ্ঞ। সেখানে শূদ্র থাকিতে পারে না, সে স্বাধীন দেশ, “দাসত্ব শূজল যুঁচে যার নামে।” কিন্তু ভারত শূদ্র দেশ—ব্রাহ্মণ-পদসেবিত শূদ্র দেশ—সুতরাং এখানে বিজ্ঞ শূদ্র সম্বন্ধীয় ভেদ আইন থাকিবেই। তাই শ্বেতাঙ্গ-পরিচালিত কাগজে এ দেশবাসীর গালাগালি থাকিলে তাহা ধর্তব্যই নহে, বড় জোর একটা মৌখিক ধমক। আর কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গদিগের নিন্দা করিলে নাকে কাণে তিন বিঘত খত দিলেও জাতি-বিদ্বেষ উৎপন্ন করার জন্য কারাদণ্ড। কিন্তু তাহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন, শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে কটুবাক্য প্রয়োগ করে, তবে হয় “জিহ্বায়াঃ প্রাপুয়া-চ্ছেদম্, (১) না হয় একেবারে “শূদ্রস্ত বধ-মহতি।” (২) অথবা শূদ্রের যদি এতটা ধৃষ্টতা হয় যে, ব্রাহ্মণ কোন দোষ করিলে তাহা প্রদর্শন করিয়া উপদেশ দিতে যায়, তবে “তপ্তমাসেচয়েত্তেলং বক্তে, শ্রোত্রে চ পার্থিবঃ। (৩) রাজা তার চোখে মুখে তেল গুরুম করিয়া ঢালিয়া দিবেন। ভার্গবস্ বর্তমান যুগে এ আইন পূর্ণমাত্রায় জারি হয় নাই, নইলে কি আর রক্ষা থাকতো। সম্প্রতি কিছু কিছু হচ্ছে বটে। ব্রাহ্মণের প্রতি বাচনিক অপরাধেই তো শূদ্রের এই শাস্তি। সুতরাং শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের গায়ে হাত তোলে,

তাহা হইলে তাহার যে ফি ছুদ্পা হইতে পারে, তাহাতো সহজেই অমুমেষ। এ জন্য সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব নয়। একজন গ্রীষ দেশীর ব্যবস্থাপক দোষের শাস্তির ব্যবস্থা করিতে করিতে চুরি পর্য্যন্ত উঠিয়াই প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন। তার উপরে আর তিনি হা’লে পাণি পাইলেন না।। সেই জন্য লোকে বলিত যে, তিনি রক্তের দ্বারা আইন রচনা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনু মহাশয়কে পারিবার যো নাই। তিনি আদেশ করিয়াছেন, ভূগণ্ডের দ্বারা যদি ব্রাহ্মণকে তাড়না কর, তবে ২১ জন্মে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে—

তাড়য়িত্বা ভূগেনাপি সংরস্তান্মতি পূর্যকম্।

একাংশতিমাজাতিঃ পাপযোনিসু জায়তে ॥

আমরা এই ৩০ কোটি ‘কালী আদমী’ পরম্পরের সংসর্গে আসিতেছি, তাহাতে যে দুর্ঘটনা ঘটে না, তাহা নহে! কিন্তু তাহার মূল নির্ণয় করিতে কোনই কষ্ট হয় না। কিন্তু যেই কোন শ্বেতাঙ্গ অমুকম্পা পুরঃসর আমাদের স্থানিত ক্রুরাঙ্গে হস্তাঙ্গণ করেন, অমনি শারীর বিজ্ঞানের কোন্‌ হুল্লঙ্ঘ্য হুজ্জ অবলম্বন করিয়া যে আমাদের বেয়াড়া প্রাণটা হঠাৎ অবধা বন্ধিত হইয়া ফাটিয়া যায়, তাহা কোনও দেহতত্ত্বাবদ পণ্ডিত এ পর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বন্দুক সকল দেশেই ব্যবহৃত হয়। অবশ্য ভারতবাসী শূদ্রের তাহাতে অধিকার নাই, ওটা তাহার হাঙ্গাম। কিন্তু কোন দেশেই এরূপটা দেখা যায় না, যেমন এ দেশে। যখনই কেঁনি শ্বেতাঙ্গ বন্দুক হাতে লইলেন, অমনি বেহায়া গুলিটা অবধা হইয়া দশ দিক্‌ দিগন্ত প্রসারিত থাকিতেও আর কোন দিকে না বাইয়া ঠিক যেখানে একটা কালশূদ্র বসিয়া হয়তো দিনান্তে এক পয়সার ছাতু খাইতেন, সেখানে সেইখানে বাইয়া তাহার উদরের মধ্যে স্থায় বাসস্থান নির্দেশ করিল এবং উহাকে দুর্ভিক্ষপীড়িত জীবনভার হইতে মুক্তিপ্রদান করিল! আমরা এমনই ধৃষ্ট যে, এ জন্তও আবার রাজদ্বারে বাইয়া উপস্থিত হই। অবশ্য অধিকাংশ স্থলেই বেকসুর খালাস।

* * * * * ভট্টাচার্য-ওয়ার্ণার সংবাদ স্তম্ভ ৮।

(১) মমু. ৮।২৭। (২) ঐ ৮।২৬। (৩) ঐ ৮।৩২

কিন্তু মনু ছাড়িবার পাত্র নহেন। ব্রাহ্মণকেও শাস্তিভোগ করিতে হইবে। তবে, যদিও ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে শূদ্রের বাচনিক অপরাধেও তাহার প্রাণদণ্ড, ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রাণনাশ করিলে, প্রায়শ্চিত্ত করিলেই চলিবে। আর সে প্রায়শ্চিত্তের ঘটাই বা কত! মনু মহাশয় কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কন না। তিনি স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন, শূদ্রহত্যা আর কুকুর, বিড়াল হত্যার প্রায়শ্চিত্ত একই—

শাস্ত্রানুকূলো হবা চাযং মনুকমেব চ।

মণোগোল্লঙ্কাকাংশ শূদ্রহত্যারতং চরেৎ। মনু, ১১।১৩২

অর্থাৎ

আমরা ইরাণ দেশের কাজী,
এসেছি একটা নতুন আইন প্রচার কর্তে আজি।
পাশী ঠেকিলে ইরাণ গায়,
তাহার মাথাটা বাঁচান হইবে দায়,
আর, ইরাণ লইলে পাশীর মাথা,
তাহাতে হইতে হইবে রাজী ॥ কেন না,
আমরা ইরাণ দেশের কাজী।

হাসির কথা নয়। ইহা শুধু হাসির গান বা কবির কল্পনার বৃথা বিজ্ঞম্বন নহে। উহা মানবধর্ম-শাস্ত্রের যথাযথ অনুবাদ। হায় রে কর্মফল; জগতের ইতিহাসে আর কোনও জাতি জাতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এমন হাতে হাতে প্রকৃতির প্রতিশোধ কড়ার গণ্ডায় বুঝিয়া পাইয়াছে কি না, তাহা জানি না।

দেশে জাতীয় উন্নতির সাড়া পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু আগে জাতীয় জীবন, পরে উন্নতি। শরীরের পক্ষে যেমন সকল অবস্থার একতার উপর শারীরিক জীবন স্থাপিত, জাতির পক্ষেও তেমনই তাহার সকল অংশের একপ্রাণতার উপর তাহার জীবনীশক্তির পরিচয়। এক অঙ্গকে বাধা দিয়া অঙ্গ অঙ্গ কিছুতেই ইষ্টলাভ করিতে পারে না। জাতীয় সমপ্রাণতা ছাড়া জাতীয় একতা সম্ভব নয়। সমবৈধীনা, সমপ্রাণতা ছাড়া অসম্ভব। এক অঙ্গের ব্যাধি যদি অঙ্গ অঙ্গ অনুভব না করে, তবে জাতীয় জীবন কথাটা নিতান্তই অর্থশূন্য। সমপ্রাণতা ছাড়া যেমন জাতীয় জীবন হয় না, তেমনই আকাজ্জক একতা ছাড়া ও অধিকারের সমতা ছাড়া সমপ্রাণতা জন্মিতেই পারে না। ইহাই সর্বসাধারণের

মধ্যে বহনবজ্র। এই বহনবজ্রের অভাবে আমাদের জাতীয় জীবন গড়িতেছে না। স্বদেশী আন্দোলন আমাদের কাছে এ কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া দিয়াছে যে, আমাদের জাতীয় জীবনের সকল অঙ্গ একত্রে বাঁধা নহে। বর্তমান অবস্থায় তাহা হইতেও পারে না। দেশে কোন পরিবর্তন আসিবার উপক্রম হইলে সকলের যদি তাহাতে সমান পরিমাণ উপকার বা অপকারের সম্ভাবনা না থাকে, তবে সকলের তাহাতে সমান উৎসাহ হইতে পারে না। আমাদের দেশের উচ্চ শ্রেণীর আকাজ্জক সঙ্গে যে নিয়ন্ত্রণী সহায়ভূতি দেখাইতে পারে না, তাহার কারণ এ নয় যে, নিয়ন্ত্রণীর অনুভব শক্তি নাই। তাহারা দেখে যে, ইহাতে তাহাদের লাভ কি। তাহারা যে স্থানে জন্মিয়াছে, সে স্থান হইতে নড়িবার বা উঠিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। তাই তাহাদের নড়িবার বা উঠিবার কোনই উৎসাহ হয় না। সুবিখ্যাত নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় যখন সুইটজারল্যান্ডে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এক দিন রেলস্টেশন হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় তাহার ট্রান্সবাহী মটর পশ্চাৎ হইতে ভারতের রাজনীতি বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া বলিল যে, তাহাদের রূবে সে দিন কথা হইতেছিল, ভারতবর্ষ এত বড় দেশ, তবে কেন ক্ষুদ্র ইংলণ্ডের অধীন? চাটুর্ঘ্যে মশায় স্তম্ভিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, “তুমি মুটে, এ খবর তুমি কিরূপে পাইলে এবং ইহাতে তোমার লাভই বা কি?” তখন মুটে অতি গভীর ভাবধারণ করিয়া বলিল, “মহাশয়, আজ আমি মুটে; কাল সাধারণতন্ত্রের সভাপতি হইবার পথে আমার কোন বাধা নাই।” সুইটজারল্যান্ড এত ক্ষুদ্র দেশ—বঙ্গদেশের একটি ক্ষুদ্র জেলার সমান হইয়াও কিরূপে ইউরোপের বিরাট শক্তিসত্ত্বের মধ্যেও আপনার স্বাভাব্য ও স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, এইখানে তাহার মূল। সামান্য মুটের মনেও আকাজ্জক জাগিতেছে, সে এক দিন দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে পারে। বাহার স্বপ্নে উচ্চ আকাজ্জক জাগে না, বাহার মনে উচ্চ ভাব আসিতে পারে না, তাহাকে কে অহঙ্

প্রদান করিতে পারে ?' আকাজ্জব একতা ও অধিকারের সমতা বাতাত আর কিছুতেই একপ্রাণতা আসিতে পারে না। আমার দেশ বলিতে দেশনায়ক ও সামান্য মুন্সুর যখন একই জিনিষ বুঝে, তখনই সমপ্রাণতা আসিয়াছে, বুঝিতে হইবে, তৎপূর্বে নহে। হিন্দুর দর পাঠান, পাঠানের পর মোগল, মোগলের পর মাহাট্টা আসিয়াছে ও গিয়াছে, কিন্তু এই ভারতে এমন জনসম্মত আছে, যাহাদের কাছে উত্তরোত্তর অল্প কষ্ট ছাড়া অল্প কোন পরিবর্তনের খবরই পৌছায় নাই। খবরে তার স্বার্থ কি ? সে যেখানে জন্মিয়াছে, সে স্থান হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার অধিকার তাহার নাই। কুর্ভাবই এমন স্বভাব হইয়া গিয়াছে যে মুক্তির আকাজ্জাও হৃদয়ে জাগ্রত হয় না। এ দেশে যে Civic life গজাইতে পারে নাই, তাহার একটা প্রধান কারণ উই যে মানুষ পরিবারের বাহিরে আসিয়া আপনায় স্থান খুঁজিয়া পায় না। সমাজে উচ্চ নীচের কৃত্রিম বেড়া এমন ঘন সন্নিবিষ্ট যে কোথায় আগ্রসর হইলে কাহার উপর অনধিকার প্রবেশ হইবে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তাই মানুষকে সঙ্কুচিত হইয়া পরিবারের গভীর ভিতরেই আবদ্ধ রাখিয়াছে। পরিবার বলিলে জিনিষটা যে কি, তাহা সকলেই বুঝি, দেশ বলিলে কি বুঝায়, সর্ব সাধারণ সে বিষয়ে একমত নহে। দেশ বলিয়া জিনিষটার অস্তিত্বই অনেকের ধারণার অতীত। তাই যখন দেশের কাজে সর্ব সাধারণের সহায়ত্বের প্রয়োজন হইয়াছে, তখন সাড়া মিলিতেছে না। ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ। এত দিন যাহাদিগকে অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে, এখন তাহাদের নিকট হইতে উত্তর না পাইলে দোষ কাহার ? সকল কৃত্রিম ভেদ বিনাশ করিয়া মানুষকে মানুষ্যত্বের উদার ভূমিতে ঝাঁড় করাইতে না পারিলে, সকলকে অধি-

কারের মমতা দিয়া আকাজ্জব একতা জন্মাইতে না পারিলে জাতীয়তা দৃঢ়-ভিত্তি পাইবে না। কৃত্রিম বাধ ভাঙ্গিয়া দাও, গুণ কণ্ঠাঙ্কসারে মানুষকে স্বাধীন স্থান লাভ করিতে দাও, জাতিগঠন অতি সহজ হইবে। ২২ কোটির মধ্যে যে জাতির ৬ কোটি অস্পষ্ট পণ্ডবৎ ব্যবহৃত, সে জাতির পদদ্বয় নিশ্চল পাষণময়, তাহার উঠিবার আকাজ্জা বিড়ম্বনা নয় কি ? মহাত্মা জৈনা বলিয়াছেন, “যদি বেদীর কাছে আসিয়া মনে পড়ে তোমার তাইএর সঙ্গে বিবাদ আছে, তবে নৈবেদ্য সেখানে রাখিয়া যাও, বিবাদ মিটাইয়া আইস, নতুবা তোমার উপহার গৃহীত হইবে না।” যতদিন মানুষকে মানুষ বলিয়াই গ্রহণ করিতে না পারিতেছি, মানুষ বলিয়াই মানুষের অধিকার নির্দিষ্ট না হইতেছে, তত দিন ভ্রাতৃ বিরোধ ঘটিতেছে মা। তাই বুঝি এত আত্মোৎসর্গ, এত জীবনদান, এত প্রাণত্যাগ সকলই বৃথা হইয়া যাইতেছে, মা কিছুর গ্রহণ করিতেছেন না। আমাদের জাতীয় জীবন গুরুত্বাধি প্রাপ্ত। এ বোঝা না নামাইলে আর উঠিতে পারিতেছি না। বেলুন চাঁড়িয়া দিলে, এক দম উপরে উঠিয়া যায়, তারপর থামে। কিছু বোঝা ফেলিয়া না দিলে আর উঠে না। আমাদেরও উর্দ্ধ গমন বুঝি থামিয়া গেল, তাই বোঝা পাতলা করিতে হইবে। আমার মনে হয়, এই জাতিভেদের বোঝা না নামাইতে পারিলে, আমরা আর উঠিতে পারিব না। সকলকেই ব্রাহ্মণত্বের অধিকার না দিলে ব্রাহ্মণত্ব সজীব থাকিতে পারে না। ভারতের কৃত্রিম জাতি-বিভাগ ইহাই সপ্রমাণ করিয়াছে। ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ। একচেটিয়া অধিকার (Monopoly) যেমন অর্থনীতি শাস্ত্রের বিরোধী, তেমনই সমাজ-বিজ্ঞান-সম্মতও নহে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

রাজর্ষি রামমোহন ।

"Great men can only spring from a great people, just as an oak, however high it may tower above every other tree in the forest, depends on the soil whence it derives its nourishment. The soil must be enriched by the countless decaying leaves.

—Joseph Mazzini

"মহাপুরুষদিগকে জন্ম দিবার জন্ম জাতিকে উচ্চ হইতে হয় এবং ইহারা জন্মিয়াও জাতিকে উচ্চ করিয়া তোলেন। * * * ইহাদিগকে লইয়াই জাতির গৌরব। যেমন দূর হইতে হিমালয়ের ক্ষুদ্র পাংশৈল সকল ভাল করিয়া দেখা যায় না, কিন্তু চিরতুহিনাবৃত শৃঙ্গরাজি লক্ষিত হইতে থাকে এবং হিমালয়ের মহাব জ্ঞাপন করে, তেমনি, অপর জাতি সকল দূর হইতে এই সকল, অসাধারণ পুরুষের আলোকমণ্ডিত মস্তক দর্শন করিয়া জাতিগত মহাব অনুভব করিয়া থাকে।" শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

আমি যখন নির্জনে রাজা রামমোহনের কথা একান্ত মনে চিন্তা করি, তখন আমার বক্ষঃস্থল যেন আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠে। আমি যেন রাজর্ষি রামমোহন রায়ের পশ্চাতে আমাদিগের এই হতভাগ্য পতিত জাতির মহত্ত্ব দেখিতে পাই। উপনিষদকার মহর্ষি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যেমন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন—“শ্রুত্ব দেবাঃ অমৃতশ্চ পুত্রাঃ।” মহর্ষি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গাই, যেমন, দিব্যচক্ষে স্বতঃসিদ্ধান্তের মত দেখিতে পাইলেন, এই যে সাদৃশ্য ত্রিহস্ত পরিমিত মানব, এই যে ক্ষুদ্র জীব, রোগ শোক ভরা মৃত্যুর অধীন, ক্ষণভঙ্গুর দেহধারী ধূলিকণা হইতেও তুচ্ছ, এই সামান্ত জীব, সেই দেবাদিদেব আনন্দস্বরূপ অমৃতস্বরূপের পুত্র, তেমনি কি, আমরা রাজর্ষি রামমোহনের

পশ্চাতে আমাদের জাতীর জীবনের মহত্ত্ব, গৌরব ও মহিমা দেখিতে পাইতেছি না ?

রাজা রামমোহন রায় একজন অসামান্ত প্রতিভাশালী মহাপুরুষ ছিলেন। অবতারবাদীদিগের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, তিনি একজন অবতার ছিলেন। * আমি অবতারবাদ মানি না। অবতারবাদ মানাকে পাপ মনে করি। অবতারবাদের অর্থ, অনন্ত পুরুষ এতটা ছোট হইতে পারেন, আর মানুষ এত বড়, এত উন্নত হইতে পারে না। সর্বশক্তিমান পুরমেশ্বরের ও অমৃতস্বরূপের পুত্র মানবের উভয়েরই অপমান করা হয়। ঈশ্বর ও মানব উভয়কেই ছোট করা হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, রাজা রামমোহন রায় অবতারবাদ মানিতেন না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, মহাপুরুষ কাহাকে বলে ? মহাপুরুষের লক্ষণ কি ?

সব গুলি লক্ষণ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিতে না পারিলেও, ছই চারিটা মোটা মোটা লক্ষণ বলিতে পারা যায়। যথা (১) জ্ঞানে গভীরতা, (২) প্রেমে বিশালতা, (৩) কর্তব্যে নিষ্ঠা, (৪) ঈশ্বরে একান্ত নির্ভরশীলতা।

আমরা আজ এই চারিটা লক্ষণ দ্বারা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

জ্ঞানে গভীরতা।

রাজা রামমোহন রায় যে সংস্কৃত, আরবী,

* প্রকাশদ্বয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ-বি-এল মহাশয় রাজার এক সাংসদিক আশ্রমসমূহে তাঁহাকে অবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

পার্সি, উর্দু, ল্যাটিন, ইংরাজি, গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বাঙ্গালা ভাষার কথা আর কি বলিব, তিনি বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা। রাজা রামমোহন রায়ের পূর্বে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা গদ্য ছিল না, তিনি ইহার প্রবর্তক বলিলেও অতুক্তি হয় না। কেবল পত্র দলিলাদিতে গদ্য ব্যবহৃত হইত। অপর সকল বিষয়ে অধিকাংশ সময়েই পদ্য ব্যবহৃত হইত। তাহাও উচ্চ অঙ্গের পদ্য ছিল না। তিনিই সর্ব প্রথমে বাঙ্গালাকে ভাষায় পরিণত করেন। * বাঙ্গালাকে ভাষায় পরিণত করিতে গিয়া তাঁহাকে ব্যাকরণ পর্য্যন্ত লিখিতে হইয়াছিল।

সংসারে অনেকেই সুপণ্ডিত ছিলেন, এখনও আছেন। এখন এমন ভাষাজ্ঞ শাস্ত্র বিদ পণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের ভাষাজ্ঞান ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিতে স্তুতি হইতে হয়। কিন্তু হায়! এমন গভীর পাণ্ডিত্য সঙ্গেও অনেকের সঙ্কীর্ণতা “কূপমণ্ডুকত্ব” যায় নাই। রাজা রামমোহন রায়ের পাণ্ডিত্যের কথা বলিতে গিয়া ভক্তিবাজন পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—“বলিতে কি, শঙ্করের পরে এমন মনস্বী পুরুষ আর এদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই।”

পরলোকগত Rev. Flecher Williams রামমোহন রায়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধবাসরে বলিয়াছিলেন “বর্তমান শতাব্দীতে রাজা রামমোহন রায়ের মতন একজন মহাপুরুষ সমগ্র পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই।”

* ‘As by Wiclif in England and Luther in Germany, so also by Rammohan in Bengal the despised dialect of the common people was made the vehicle of the highest ideas and became thereby permanently elevated. —Collet’s Life.

” রাজা রামমোহন রায়ের পাণ্ডিত্যের ও উদারতার সীমা ছিল না। তিনি সমগ্র মানব-জাতিকে এক পরিবার-ভুক্ত মনে করিতেন। তিনিই প্রকৃত পক্ষে “ঈশ্বরের পিতৃহ ও মানবের ভ্রাতৃত্ব” ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে লোকে হাজার মানবের ভ্রাতৃত্বের কথা প্রচার করুন না কেন, কিন্তু স্বার্থে বিন্দুমাত্র আঘাত পড়িলে তীক্ষ্ণ তরবারীর দ্বারা ভ্রাতার শিরচ্ছেদন করিতে কিঞ্চিন্মাত্র পরাশ্রুত হন না। রামমোহন রায়ের উদারতা দেশ কালের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তাহার নিকট হিন্দু মুসলমান, ইংরাজ ফরাসী, স্পেন পর্তুগাল, আসিয়া ইউরোপ কিছুই ছিল না। তিনি সকল জাতিকে সমানভাবে আপনায় ভাবিতেন ও সম্মান করিতেন, * এবং তিনি সকল দেশের শাস্ত্রকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করিতেন। † তিনিই সমস্রয় দর্শনের (Comparative philosophy) প্রথম প্রতিষ্ঠাতা।

তিনি যখন যে ধর্ম-সম্প্রদায়ের সহিত ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন সেই সম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্র দ্বারা তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। † স্বার্থসিদ্ধির জন্ত কোনও দিনই ফোনও

* তাঁহার সুবিশাল হৃদয়ে জাতি বিশেষের কোন বিশেষ দাওয়া ছিল বলিয়া বোধ হয় না—লেখকের “সমাজসংস্কারে রাজা রামমোহন রায়।”

† It was the characteristic of the Raja that in all his theological discussions with his opponents, he would always accept the authority of their particular scriptures first, as infallible, for argument’s sake and then would fight out his own cause. Truly Mr. Adam wrote to Dr. Tuckerman “that he is both a Christian and a Hindu—a Christian with Christians and a Hindu with Hindus” and we would like to add a Mahommedan with Mahommedans.—Raja Rammohan Roy and Christianity.

শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করেন
মাই। বর্তমান সময়ে ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে
যে তর্ক বিচার পদ্ধতি অবলম্বিত হয়, তাহা
পাঠ করিলে লজ্জিত হইতে হয়। অনেক
সময় ছুঃখ হয়। নিজের মতকে সমর্থন
করিবার জন্ত মহামহোপাধ্যায়গণ কল্পপ-
ভাবে শাস্ত্রের সরল অর্থ পরিত্যাগ
করিয়া কদর্থ ও খণ্ডাংশ উদ্ধৃত করিয়া
থাকেন, তাহা পূজ্যপাদ স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “বিধবাবিবাহ প্রস্তাব”
নামক পুস্তকখানা পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে
পারা যায়। এই মহাপুরুষদিগের মানসিক
সততা (Intellectual honesty) বলিয়া
কোনও জিনিষ নাই। রাজা রামমোহন রায়
এ সব ক্ষুদ্রতা নীচতার উপরে উঠিয়াছিলেন।
তাহার ফল এই হইয়াছিল যে, খ্রীষ্টীয়ানেরা
তঁাহাকে খ্রীষ্টীয়ান, মুসলমানেরা তঁাহাকে
মৌলবী *, হিন্দুবা তঁাহাকে বৈদান্তিক হিন্দু
বলিয়া মাত্র করিতেন। † সংসারে একরূপ
অতি কম লোকই দেখিতে পাওয়া যায়,
ঐহাদের মৃত্যুর পর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের
লোকেরা তঁাহাদিগকে আপন সম্প্রদায়ের
লোক বলিয়া দাবী করিয়াছেন। ‡ ইংলণ্ড

* Many Moslem Divines regarded Rājā Rammohan Roy as a moslem.--Amir Ali's Hand Book of Mohammedan Law.

† The Mohammedans would call him a Mohammedan, Hindus would call him a Vedantic Hindu, the Christians a Unitarian Christian.—Collet.

† The followers of every prevailing religion would reckon him after his death as one of their coreligionists.—Collet's Life and Letters of Raja Rammohan Roy.

রামমোহন রাধের মৃত্যুর পর হিন্দু ভাইকে বেদান্তামুগানী ব্রহ্মজ্ঞানী, খ্রীষ্টীয়ানেরা খ্রীষ্টীয়ান এবং মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা মুসলমান বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল।—
‘বেদান্ত’ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রাজা রামমোহন রাধের জীবনচরিত ।

বাইবার পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন “আবার
মৃত্যুর পর খ্রীষ্টীয়ান, মুসলমান, হিন্দু, সকলেই
নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া আমাকে
জ্ঞান করিবে, কিন্তু আমি কোনও সম্প্রদায়ের
নহি” + তিনি কোনও উপধর্মের অনুষ্ঠান
ছিলেন না। তাঁহার ধর্ম উদার বিশ্বজনীন
ব্রাহ্মধর্ম। ‡ তাঁহার এই উদারতা ও সার্ব-
ভৌমিকত্বের কথা উল্লেখ করিয়া Miss
Acland লিখিয়াছেন:—

Yes, far from Ganges consecrated wave,
Beneath our pallid graves and
 northern skies,
A stranger's hand hath laid thee in
 thy grave,
And strangers' tears have wept thy
 obsequies.
A stranger? No thy "caste" was human
 kind;
Thy home—wherever freedom's
 beacon shone;
And England's noblest hearts
 exulting shrined
The turb and offspring of a burning zone.
Pure generous mind! all that was
 just and true
All that was lovely holiest brightest best—
Kindled thy soul of eloquence anew,
And woke responsive chords in every
 breast.

প্রেমে বিশালতা।

একটা ব্রহ্মসঙ্গীতে আছে:—

"এ ভবে না ধরে শ্রেন উধলিয়া বায়রে

দশ দিক পুরে অবিরাম ।”

রাজা রামমোহন রায়ের প্রেম ভারতে
ধরে নাই, পৃথিবীতে উল্লসিত পড়িয়াছিল।
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, তিনিই প্রকৃত পক্ষে
ঈশ্বরের পিতৃ ও মানবের ভ্রাতৃদের মার্থ অর্থ
বুঝিয়াছিলেন। ইহা হইতেই তাঁহার মহা-
প্রাণে মানব আত্মার মহত্ব-জ্ঞান ফুটিয়া
উঠিয়াছিল। তিনি মানব আত্মাকে দেই

+ શક્તિસ્પદ નગેન્દ્ર વાવુર જીવનચરિત્ર ।

‡ He really belonged to no sect. His religion was Universal Theism.—Collet's Life.

মহান পরমাত্মার অংশ বলিয়া ভাব করিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নিকট মানবের ভ্রাতৃত্ব অতীব মূল্যবান ছিল। সেই জন্তই, তিনি, কি সামাজিক দাসত্ব, কি রাজনৈতিক অত্যাচার, কোনও প্রকার মানব আত্মার অপমানজনক ব্যবহার সহ্য করিতে পারিতেন না এবং অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। মানুষ যে মানুষকে শৃগাল কুকুরের স্থায় ব্যবহার করিবে, তাহা তাঁহার নিকট একবারেই অসহনীয় ছিল। এই সকল কারণে পৃথিবীর যে কোনও জাতির মধ্যে যে কোনও বিভাগে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা হইত, রাজা রামমোহন রায় তাহাতে প্রাণমনের সহিত আপনাকে ঢালিয়া দিতেন।

আষ্ট্রিয়াবাসিগণ যখন ইটালীবাসিদিগকে অনেক চেষ্টার পর যুদ্ধে পরাস্ত করিল, সেই সংবাদ কলিকাতায় আসিবামাত্র রাজা রামমোহন রায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। বন্ধুদিগের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে পারিলেন না। স্পেনে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইলে রাজা রামমোহন রায় আনন্দে অধীর হইয়া কলিকাতা টাউনহলে একটা বিরাট ভোজ্য দিলেন। ফরাসী বিপ্লবের সময় তিনি অতি ব্যগ্রতার সহিত বিলাতী ডাকের প্রতীক্ষা করিতেন। যখন দেখিতেন, স্বাধীনতা-প্রয়াসিদিগের পরাজয় হইয়াছে, তখন দরদর ধারে তাঁহার হৃৎকোষ দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত।

ইংলণ্ড যাত্রাকালে উত্তমাশা অন্তরীপে (Cape of Good Hope) তিনি জাহাজে পড়িয়া গিয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, ফরাসিগণ আপন জাহাজে স্বাধীনতার চিহ্নস্বরূপ ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তীর্ণ করিয়াছেন, রাজা রামমোহন রায় আনন্দে

অধীর হইয়া ভগ্ন পদেই সেই ত্রিবর্ণ পতাকাকে অভিবাদন করিবার জন্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। কাহারও নিষেধ মানিলেন না। ভগ্ন পদে অতি কষ্টে ফরাসী জাহাজে গিয়া সেই পতাকাকে অভিবাদন করিলেন এবং ফিরিয়া আসিবার সময় “জয় ফরাসীর জয়! জয় ফরাসীর জয়!” বলিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে ফিরিয়া আসিলেন। ‘কি স্বাধীনতা-প্রিয়তা! এক দিকে যেমন এই বিশ্ব-জনীন প্রেম, দেশ ও কালে অবিকল না থাকিয়া, সমগ্র মানব জাতিতে বিস্তৃত হইয়াছিল, তেমনি, অন্য দিকে, তাঁহার অসাধারণ স্বজাতিপ্ৰীতি ও স্বদেশবৎসলতা বিদ্যমান ছিল। স্বজাতি ও স্বদেশের উন্নতির জন্ত তিনি চির জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কষ্টে, দুঃখে, নির্যাতনে, স্বদেশীয়দিগের অকৃতজ্ঞতার ও কৃতব্রতায় * তিনি কোনও দিন বিচলিত হন নাই। উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিত ব্যক্তি হইতে নিরক্ষর নিরন্ন দরিদ্র প্রজাদিগের জন্ত তিনি সমান ভাবে খাটিয়াছিলেন। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, ইচ্ছা করিলে—তাঁহার মতন প্রতিভাশালী লোক—অনায়াসে ক্রোড়পতি হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি অর্থ, পদমর্যাদা পদে নিক্ষেপ করিয়া দরিদ্রতার মুকুট মাথায় লইয়া আনন্দে কঠোর স্বদেশ-সেবার ব্রত গ্রহণ করিলেন।

ইংলণ্ডে গিয়া ভারতীয় দরিদ্র প্রজা-

* “His life was seriously threatened by a gang of assassins.” * * * “Fire arms, gunpowder and daggers were immediately procured and burken dances employed to guard the premises * * * Whenever Rammohan went into town he took with him dagger and sword-stick and was accompanied by Mr. Martin, who carried sword stick and pistols and by other armed attendants—” Collet’s Life and Letters of Raja Rammohan Roy.

বর্ণের সম্বন্ধে অধিকার সংরক্ষণের জন্য পুস্তক স্বহস্তে লিখিয়া ইংরাজ জনসাধারণের নিকট বিতরণ করিতেন ।† পার্লামেন্টারি কমিটিতে (Parliamentary Committee) সাক্ষ্য প্রদান কালে অকট্য যুক্তি সহকারে এদেশের শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগকে উচ্চ পদ সকল প্রদান করিলে গবর্ণমেন্টের কার্য যে অতি সুন্দর রূপে সুনির্ভর হইবে, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন । যে শাসন ও বিচার বিভাগ লইয়া ইংলণ্ড ও ভারতে এত আন্দোলন চলিতেছে, তিনি সুদূরদর্শী দৃষ্টির দ্বারা এই অপবিত্র সম্মিলনের বিরুদ্ধে বটু-সম্পত্তি (৭৬) বৎসর পূর্বে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন । এদেশের ভাষা, আচার ব্যবহার, প্রথা, অভ্যাস, অহুতান বিষয়ে অনভিজ্ঞ, সুদূরদর্শী অল্পবয়স্ক ইংরাজ যুবকদিগকে বিচারামনে বসাইলে কিরূপ বিচার বিভ্রাট হইতে পারে, তাহা তিনি কমিটিকে, সাক্ষ্য প্রদান কালে, সুস্পষ্ট রূপে অবগত করাইয়াছিলেন । ইংলণ্ডে অবস্থান কালে তিনি খ্রীষ্টীয়ানদিগের উপাসনালয়ে যাইতেন এবং তাঁহার যখন একত্রে সম্মিলিত উপাসনা করিতেন, তখন রাজর্ষি রামমোহন রায় একান্তে বসিয়া কাঁদিতেন, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন “আমার দেশের লোকের অবস্থা ভাবিয়া কাঁদিতেছি, তাহারা

† দুঃখী কৃষিজীবী! যে সময়ে তোমরা স্বদেশ ও বিদেশের জন্য অপর্যাপ্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়াও নিজের স্বচ্ছন্দ মনে ও নিরস্ত্র নয়নে অতাপকূট তুল-গ্রাসণ গ্রহণ করিতে পাও নাই, সেই সময় তিনি ঐ দুঃসহ দুঃখ রাশি পরিহার করিয়া তোমাদের সমস্ত হৃদয় শীতল করিবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন ও তজ্জন্ত *

* * * তোমাদের অজান্তারে ঐশ্যের রাজপুরুষের নিকট বৃহত্তর জিহ্বা বিশেষ কাতরতা প্রকাশ করেন ।

—উপাসক সম্প্রদায়—অক্ষরসুহার দণ্ড ।

কত দিনে ভ্রম ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া উদার বিশ্বজনীন ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবে ।”

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে যে Reform Bill পার্লামেন্টে মহা-সভায় বিচারার্থ উপস্থিত করা হয়, তাহাতে প্রজাপুঞ্জের স্বাধীনতা বিস্তার করিবার প্রস্তাব ছিল । রাজর্ষি রামমোহন একাগ্রচিত্তে ইহার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন । * তিনি আপনাকে ইহাতে এতদূর ঢালিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছিলেন, যদি এই Bill বিধিবদ্ধ না হয়, তাহা হইলে তিনি তাঁহার যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়া স্বাধীনতার রক্তভূমি আমেরিকায় গিয়া বাস করিবেন । † কি স্বদেশ-প্রেমি, কি স্বজাতিবৎসলতা !

তাঁহার মানব আত্মার মহত্ব-জ্ঞান অতীব উন্নত থাকাতে তিনি সকলকেই প্রাণের সহিত “ব্রাদার” বলিতেন । আজ কালের ফাঁপা ফোলা অন্তঃসার-শূন্য “ভাই”এর মতন তিনি “ব্রাদার” শব্দ ব্যবহার করিতেন না । “ব্রাদার” বলিবার সময় তাঁহার সমস্ত হৃদয়, সমগ্র প্রেম আসিয়া যেন মানুষকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিত ।

মানব আত্মার মহত্ব-জ্ঞান আত্ম মর্যাদার রূপান্তর মাত্র । তাঁহার অসাধারণ আত্ম-মর্যাদা-জ্ঞান ছিল । তিনি যখন কলেজের

* “I have been impatiently waiting in London to know the result of the Bill”—In a letter to Miss Kiddel.

† As I publicly avowed that in the event of the Reform Bill being defeated I would renounce my connection with this country, I refrained from writing to you or any other friends in Liverpool until I knew the result.—In a letter to Mr. William Rathbone. He was resolved on leaving England and transferring himself and his allegiance to the United States.—Cotton.

অগ্নীনে সেরেস্তাদারের * কার্য গ্রহণ করেন, তখন তিনি কলেक्टरকে স্পষ্ট জানাইয়া ছিলেন যে, যখন তিনি কার্যোপক্ষে তাঁহার সম্মুখে যাইবেন, তখন তাঁহাকে বসিতে আসন দিতে হইবে এবং অপরাপর কর্ম-চারীর জায় তাঁহার প্রতি হুকুম জারি করা হইবে না। কলেक्टर স্বীকৃত হইলে তিনি কার্য গ্রহণ করেন। †

এক দিন জ্যৈষ্ঠ মাসের নিদারুণ গ্রীষ্মের সময় হঠাৎ অপরাহ্নে তিনি তাঁহার বন্ধু আডাম সাহেবের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। উত্তেজনার তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া আডাম সাহেবের মনে ভয় হইল। রাজর্ষি রামমোহন বলিলেন “তুমি যদি কিছু মনে না করত আমার পাক্‌ড়ীটা খুলিয়া ফেলি।” এবং ভয়ানক জল আনিতে বলিলেন। জল খাইয়া একটুকু সুস্থ হইয়া বলিলেন “আমার জীবনের সর্ব প্রধান আঘাত ও সর্ব প্রধান দুঃখ আজ পাইয়াছি। বিশপ Middleton আমাকে প্রলোভন দেখাইয়া খীষ্টান করিতে চায়। ছি ছি, সে

* তখন সেরেস্তাদারকে দেওয়ান বলিত। রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধুপণ তাঁহাকে সর্বদা “দেওয়ানজী” বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

† তিনি এই মর্মে একটা লেখাপড়া করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দেন, যখন তিনি কার্যের জন্ত তাঁহার (কলেक्टरের) সম্মুখে আসিবেন, তখন তাঁহাকে আসন দিতে হইবে এবং সামান্ত আমলাদিগের প্রতি যে প্রকারে হুকুমজারি করা হয়, তাঁহার প্রতি সে প্রকার করা হইবে না।—শ্রদ্ধাঙ্গদ নগেন্দ্র বাবুর জীবনী।

* * * under a written order or agreement signed by the latter (Mr. John Digby, Collector of Rungpore, that “Rammohan Roy should not be kept standing in his presence, or receive orders as a common amla from the huzoor.”—Leonard's Brahmo Samaj.

আমাকে এত ছোট লোক মনে করে!” ইহার পর তিনি বিশপ Middleton এর মুখ দর্শন করেন নাই।

সতীদাহ লইয়া Lord William Bentinck রাজর্ষি রামমোহনের সহিত পরামর্শ করিবার জন্ত একজন পারিষদকে (Aides de-camp) তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। উক্ত প্রকৃতি পারিষদ রাজার নিকট উপস্থিত বলিলেন “গবর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেটিক আপনার সহিত দেখা হইলে সন্তুষ্ট হইবেন।” রাজা রামমোহন রায় উত্তর করিলেন “আমি এখন বৈষয়িক কার্য পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র চর্চা ও ধর্ম্মানুশীলনে নিযুক্ত রহিয়াছি। আপনি অনুগ্রহ পূর্বক লাটসাহেবকে আমার সম্মান জানাইয়া বলিবেন যে, তাঁহার মতন প্রতাপাশ্রিত মহৎ ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত হইবার আমার ইচ্ছা নাই, তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন।” পারিষদ ফিরিয়া সকল কথা বলিলে পর সূচতুর মহাত্মা বেটিক বলিলেন “পুনরায় তাঁহার নিকট গিয়া বলুন যে, মিষ্টার উইলিয়ম বেটিকের সহিত আপনি একবার অনুগ্রহ করিয়া দেখা করিলে তিনি অত্যন্ত বাধিত হইবেন।” রাজা রামমোহন রায় এ শিষ্টাচারের হাত এড়াইতে পারিলেন না। * “

* Lord William Bentinck * * * sent one of his aides-de-camp to him expressing his desire to see him. To this the Rajah replied “I have now given up all worldly avocations and am engaged in religious culture and in the investigation of truth. Kindly express my humble respects to the Governor General and inform him that I have no inclination to appear before his august presence and therefore I hope that he will kindly pardon me.” * * * * *. The Governor General answered “Go back and tell him again that Mr. William Bentinck will be highly obliged to him if he will kindly see him once.”—Collet.

এক দিকে এই অসাধারণ আত্মসম্মানের জ্ঞান, অল্প দিকে আবার অসাধারণ আত্ম-বিলোপ। বাহ্যতঃ এই অসামঞ্জস্য দেখিয়া অবাক হইতে হয়।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্ণ্ট একটা শিক্ষা-সমিতি নিয়োগ করিয়া সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিয়া তাঁহাদের হস্তে প্রাচ্য শিক্ষা বিস্তারের ভার অর্পণ করিলেন। রাজা রামমোহন রায় স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি প্রাচ্য শিক্ষা প্রচারে দেশের কি প্রকার অবস্থা হইবে ও প্রাচ্য শিক্ষা বিস্তারের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া লর্ড আমহার্ণ্টের নিকট একখানি আবেদন প্রেরণ করেন।* শিক্ষা বিষয়ে এরূপ স্মৃতিপূর্ণ মহামূল্য দলিল অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচ্য পক্ষের জয় হইলে কলিকাতা হিন্দু কলেজ স্থাপন করিবার জন্য একটা সমিতি নিয়োগ হয়। সূত্রীণ কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার হাইড ইষ্ট (Sir Hyde East) মিঃ হারিংটন, মহাত্মা ডেভিড হেয়ার, গোপীনাথ দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, গঙ্গানারায়ণ দাস ও বৈজনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সেই সমিতির সভ্য নিযুক্ত হন। গোড়া হিন্দুগণ রাজর্ষি রামমোহনের সেই সমিতিতে সভ্য হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি করিলেন। সত্য-

* ইহার দ্বারা কেহ না মনে করেন যে, রাজর্ষি রামমোহন প্রাচ্যশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তিনি কেবল্য তুলনামূলক (comparative) উপকারের কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি বেদান্তচর্চা প্রবর্তিত করিবার জন্য স্বয়ং বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রের অশুশীল ও অধ্যাপনা প্রচলিত রাখিবার উদ্দেশ্যে এদেশীয় চক্ষুপাশী সম্ভারের অধ্যাপকগণের আনুকূল্য আর্থনা লিখিয়াছেন।—লেখক

প্রিয়, জ্ঞাননিষ্ঠ, মহাত্মা হেয়ার ইহা সহ করিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন, যাহার প্রসাদে ও প্রতিভা বলে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইতে চলিল, তাঁহাকেই তাহার কমিটি হইতে বাদ। তিনি অনেক তর্ক বিতর্ক করিলেন। হিন্দুয়া বলিলেন, রামমোহন রায় সভ্য নিযুক্ত হইলে তাঁহারা কলেজের সহিত কোনও প্রকার সম্পর্ক রাখিবেন না।* রাজা রামমোহন রায় যখন এই সব কথা শুনিলেন, তখন তিনি বজ্রবর হেয়ার সাহেবকে বলিলেন “ছি ! ছি !! আপনি কি পাগল হইয়াছেন, আমার নাম না থাকিলে ক্ষতি কি ? এতে যে আমার দেশের লোকের উপকার হইবে। আপনি কি মনে করেন, আমার নাম না থাকিলে আমি ইহার জন্য খাটিব না, কলেজের সহিত আমার সম্পর্ক থাকিলে যদি ইহার ক্ষতি হয়, আমি অনায়াসে সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিব।”† হেয়ার সাহেব রাজার মুখের দিকে তাকাইয়া অবাক হইয়া গেলেন। দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধন যাহার জীবনের ব্রত, তিনি কি সম্মানের প্রয়াসী ! ‡

এই আত্ম-বিলোপের কথা ভাবিলে আর একজন মহাপুরুষের কথা মনে পড়ে। তিনি মহাত্মা মহর্ষি দেবেজনাথ ঠাকুর। অনেকেই তাঁহার স্বরচিত জীবনচরিত পাঠ করিয়াছেন

* It was subsequently reported that Rammohan Roy would be connected with the college. The orthodox members on the other hand and all said that we will have nothing with the College.” Pearychand Mitra's A biographical Sketch of David Hare.

† “If my connection with the proposed college should injure its interests, I would resign all connections.” — Pearychand Mitra's A biographical sketch of David Hare.

‡ “There was no difficulty in getting Rammohan Roy to renounce his connection as he valued the education of his countrymen more than the empty honour of his name as a committee man.”—Ibid:

এরং লক্ষ্য করিয়াছেন যে তাহাতে তাঁহার সুবৃহৎ জীবনের (৮৯ বৎসর জীবিত ছিলেন) কৈবল্যমাত্র এক চত্বারিংশৎ বৎসরের (৪১ বৎসর) ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার কারণ কি? ইহার কি কোনও গুঢ় রহস্য নাই!! ভক্তিভাজন পণ্ডিতপ্রবর শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, “তাঁহার ৪১ বৎসর বয়সের সময় কর্মক্ষেত্রে অনেক প্রতিভাশালী কন্ঠ ব্যক্তি আসিয়া পড়েন। পাছে আত্মজীবনী লিখিতে গেলে ইহাদের কার্যের নিন্দা* অজ্ঞাতসার তাহাতে আসিয়া পড়ে, এই ভয়ে তিনি আর অগ্রসর হন নাই, এইখানেই ক্ষান্ত দিলেন।” কি আশ্চর্য্য আত্মসন্মান জ্ঞান! কি আত্মবিলোপের উজ্জল দৃষ্টান্ত!!

এই আত্মসন্মানের ও “আত্মবিলোপের” অপূর্ণ সম্মিলন অভাবে অনেক মহাপুরুষদিগের অধঃপতন হইয়াছে। আত্মপ্রতিষ্ঠা অনেক সময় প্রেয়ঃ হইলেও কোনও কালে শ্রেয়ঃ নয়, একথা অনেকে ভুলিয়া যান।

কর্তব্যে নিষ্ঠা।

রাজর্ষি রামমোহন রায় যে কাজে হাত দিতেন, সে কাজ সুসম্পন্ন না করিয়া কিছুতেই ছাড়িতেন না। তিনি কিছুতে পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না। যাহা একবার ধরিতেন, তাহা বজ্রমুষ্টিতেই ধরিতেন, তাহা হইতে কিছুতেই বিচলিত হইতেন না। প্রতিবন্ধক পাইলে তাঁহার প্রচুরশক্তি যেন লাফাইয়া উঠিত।

তিব্বতে গিয়া লামাদিগের* সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্ম আইয়া নানা প্রকার তর্ক বিচার উপস্থিত করেন। তিব্বতবাসীগণ লামা-উপাধিধারী

জীষিত মহম্মদবিশেষকে এই বিশ্বত্বকাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করে। রামমোহন রায় এই ভয়ানক কুসংস্কারের প্রতিবাদ করিলে তিব্বতবাসী পুরুষগণ তাঁহাদের ধর্ম্ম হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করেন।* কোমলহৃদয়া, স্নেহ-প্রেমবিগলিতা তিব্বতীয় মহিলাদিগের সাহায্যে তিনি প্রাণরক্ষা করেন। সেই দিন হইতেই তিনি কোনও দিনই নারীজাতিকে ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগের উন্নতির জন্ত কি বাল্যে, কি যৌবনে, কি বার্কাক্যে, চিরজীবনই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন।

জ্ঞান শিক্ষা বিস্তার, সহমরণ নিবারণ, বহু বিবাহ নিরোধন, বাল্যবিবাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বিবাহে পণগ্রহণ-নিবারণ, পৈত্রিক সম্পত্তিতে নারীদিগের অধিকার প্রভৃতি নারীজাতির হিতকর ও উন্নতসাধক সকল কাজেই তিনি তন্ময় হইয়া গিয়া ছিলেন।

নারীজাতি সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপিত হইলে তিনি সম্রমের ও সম্মানের সহিত উল্লেখ করিতেন।

দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলন হওয়া উচিত বলিয়া তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। লর্ড আমহার্ণকে আবেদন করিয়া, নিজে স্বয়ং নিজব্যয়ে পাশ্চাত্যশিক্ষার জন্ত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গৃহে গৃহে গিয়া ছাত্রসংগ্রহ করিতে লাগিলেন।†

তিনি শ্রীরামপুরী পাদরী সাহেবদিগের

* He often incited the anger of the worshippers of the Lama by his rejection of their doctrine that this pretended deity—a living man was the creator and preserver of the world.—Dr Lant carpenter.

† আমার পিতা রামমোহন রায়ের অনুরোধে ঐ

সহযোগে ইংরাজি বাইবেল অনুবাদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কোন কোন শব্দের অনুবাদ লইয়া তাঁহাদের সহিত মতবৈধ হয়। তিনি এক অর্থ করেন, পাদরী সাহেবেরা অন্য অর্থ করেন। তিনি পাদরীদিগের অনুবাদে সন্তুষ্ট না হইয়া হিব্রু ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়া স্বয়ং মূল পুস্তক পাঠ করিলেন এবং অস্বাভাবিক ও অলৌকিক অংশ বাদ দিয়া খ্রীষ্টের উপদেশ সুখ শান্তির পথপ্রদর্শক (Precepts of Jesus—Guide to peace and Happiness) নাম দিয়া একখানি পুস্তক মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন। ইহাতে পাদরী সাহেবদিগের সহিত তাঁহার তুমুল তর্কযুক্ত হয়। পাদরীগণ, কিছুতেই তাঁহাকে পরাজিত করিতে না পারিয়া, তাঁহাদের মুদ্রাঘ্রালয়ে তাঁহার পুস্তকাদি মুদ্রিত করিতে অস্বীকার করিলেন। রাজা রামমোহন রায় দমিবার পাত্র ছিলেন না, প্রতিকূলতা বশতঃ নিজ সংকল্পিত অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করা দূরে থাকুক, তিনি নবীন উৎসাহে কার্যো প্রবৃত্ত হইলেন। স্বয়ং মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া কম্পোজিটারকে কাজ শিখাইয়া নিজের গ্রন্থ ছাপাইয়া ছাড়িলেন।†

ঈশ্বরে নির্ভরশীলতা।

আমাদের দেশের একটা গ্রাম্য প্রবাদ আছে:—“ভবী ভুলিবার নয়।” রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মালোচনার কথা ভাবিলে ঠিক এই কথাই মনে পড়ে।

† * It announces that while all the previous works of the author on the subject of christianity had been printed at the Baptist Mission Press, Calcutta, the acting proprietor had after the second Appeal appeared declined * * * to print any other production of Rammohan on the same subject. Rammohan was therefore obliged to purchase his own type and rely on native superintendence.—Collet's Life.

কি চাঁকুরীর সময়ে, কি বিষয় কার্যের মধ্যে, কি রঙ্গভূমিতে, কি নৃত্যাগারে, কি সুখদ-গোষ্ঠিতে, যেখানেই তিনি গিয়াছেন, সেই খানেই লোকে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে যে, কিছুক্ষণ পরেই তিনি অত্যমনস্ক হইয়া এক কোণে কোন না কোনও বন্ধুর সহিত ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা উপস্থিত করিয়া তাহাতেই একবারেই মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। স্বীয় লক্ষ্য-সাধনে কি আবেশ! কি নেশা! সর্বত্রই সকল সময়েই এক চিন্তা, এক প্রসঙ্গ, এক ধ্যান, এক জ্ঞান।

রাজর্ষি রামমোহন সকল প্রকার সংস্কারে অগ্রণী ছিলেন। আমরা এমন কোন হিতকর সংস্কারের কথা জানি না, বাহা তাঁহার সুবিশাল হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তিনি সকল প্রকার সংস্কারের শীর্ষদেশে দাঁড়াইয়া আশ্বাস দিয়াছেন। * প্রকৃত কথা, তাঁহার ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, মানব প্রকৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই ধর্ম্ম মানব মনের আকাঙ্ক্ষা ও মানব জীবনের উদ্দেশ্যকে ওতপ্রোত ভাবে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে এবং ক্রমশঃ মানব প্রকৃতিকে উচ্চ হইতে উচ্চতর ঐশ্বর্য্যে আকর্ষণ করিতেছে। আনি “Raja Ram Mohan Roy and Christianity” নামক প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, তাঁহার শিক্ষাসংস্কার, সামাজিক সংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কার, সকল সংস্কারের ভিতরে মনিহারের অন্তর্ভুক্ত হইবার ভাৱ তাঁহার সার্বভৌমিক ধর্ম্মভাব বিস্তারিত ছিল।† এবং তাঁহার

* ব্রহ্মসম্পদ স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাজার এক স্মৃতি-সভায় এইরূপ বলিয়াছিলেন।

† Any one who is least acquainted with the life and work of Raja Rammohan Roy cannot fail to understand that the

এই স্ৰমহান্ উদার ধর্ম্যভাব তাঁহার সকল প্রকার সংস্কারকে অমুরঞ্জিত করিয়াছিল। এই সার্বভৌমিক ধর্ম্যভাবকে মহাত্মা থিওডোর পার্কার (Theodore Parker) religious element আখ্যা দিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় এই উদার ধর্ম্য ভাবকে মানব মাত্রেয়ই সাধারণ সম্ব বলিয়া মনে করিতেন। এই জন্ত তিনি দেশ, কাল ও জাতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও জগতের জাতি সমূহের মধ্যে একটা প্রকৃতিগত একতা দেখিতে পাইতেন। এই উদার সার্বভৌমিক ভাব তাঁহাতে বিশ্ব-জ্ঞানী প্রেম উৎপন্ন করিয়াছিল। সেই জন্ত তিনি সকল প্রকার নির্ধাতন সহ করিয়াও স্বেচ্ছকর নরসেবা ব্রতে আপনার প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। এই অসাধারণ মানব প্রেমই তাঁহাকে সংসার-বিমুখ সন্ন্যাসধর্ম্মে বীতরাগ করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি ধর্ম্মকে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াও “জগৎ মিথ্যা” বলিয়া সংসার পরিত্যাগ করেন নাই। বরং তিনি সংসারকেই বিধাতার লীলাক্ষেত্র বলিয়া মনে করিতেন। সংসারই ধর্ম্মসাধনের প্রধান ক্ষেত্র। প্রস্তর খণ্ড সকল যেমন ঘূর্ণবর্ত্তে পড়িয়া মন্ডল ও সগোল হইয়া শালগ্রামে পরিণত হয়, তেমনি, মানুষ সংসারের ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাতে পড়িয়া প্রকৃত মানুষ হইয়া দাঁড়ায়। পাপ প্রলোভনের

root of his was religion. The social, political, literary reforms in whichever he took part were but the outcome of his deeply intense theistic passion.

লেখকের—Raja Rammohan Roy and Christianity”

“তিনি যে কোন কার্যেই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সকলেরই মূলভিত্তি ধর্ম্ম। নৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক যে কোন সংস্কারের কথা বলুন না কেন, তাহাদের সকলেরই মূলতত্ত্ব তাঁহার ধর্ম্মপ্রবর্ত্ত।

—লেখকের “সমাজ-সংস্কারে রাজা রামমোহন রায়।”

মধ্যে বাস করিয়া যিনি নিষ্কলঙ্ক ও নিষ্পাপ থাকিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বীর।

“বিকার হেতৌ বিক্রিয়ন্তে দেহবান্

চেতাংসি তয়েব ধীরাঃ।”

যুদ্ধে শত্রুজয় করা অপেক্ষা আত্মজয় করাই প্রকৃত বীরত্ব। ইহাতে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই।

ভক্তিভাজন পণ্ডিত প্রবর শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন “সর্বদাই দেখিতে পাই, প্রচলিত ধর্ম্মের সাধকগণ, বিশেষতঃ ধর্ম্মপ্রচারকগণ আপনাদিগকে ধার্ম্মিক দেখাইবার জন্ত কতই ব্যগ্র হন। পৈরিক ধারণ করিয়া, মালা কমণ্ডলু লইয়া গৃহ পরিবার ত্যাগ করিয়া, কতরূপে মানুষকে বলেন, তোমরা যেরূপ আমরা সেরূপ নই, তোমরা সংসারী আমরা বিরাগী, তোমরা ভোগী, আমরা যোগী, তোমরা আসক্ত আমরা ত্যাগী ইত্যাদি। রামমোহন রায়ের মতিগতি যেন ঠিক ইহার বিপরীত ছিল। তিনি উপদেশ লিখিয়া অপরকে দিয়া পড়াইতেন, গ্রন্থ লিখিয়া শিষ্যদিগের নামে ছাপাইতেন, একদিনও আচার্য্যের আসনে বসেন নাই। আহার ব্যবহার আলাপে সামান্ত মানবের জায় থাকিতে প্রয়াস পাইতেন। তাঁহাতে ধর্ম্মেব অস্বাভাবিকতা কিছুই ছিল না।” *

রাজা রামমোহন রায় যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালে বঙ্গদেশে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান সভ্যতা বিগত ধর্ম্মবিহীন হইয়া ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। উদার বিজ্ঞা-শিক্ষা, স্বাধীন চিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক পরিচালন, এ সব কিছুই ছিল না। বঙ্গবাসীগণ, হিন্দুধর্ম্মের দুর্জয় শাসনে ঘোর স্বার্থপর ব্রাহ্মণ-দিগের প্রবল প্রভাবে স্বাধীনতা বিসর্জিত

* প্রবন্ধাবলী।

হওয়ায়, গডাল্লিকা প্রবাহের স্থায়, লোকপরি-
স্পারণিত রীতিনীতির ও বৈশাচারের অনু-
সরণ করাতেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া মনে
করিত। প্রাণপ্রতিম জীবন্ত শিশু সন্তানকে
সাগরবক্ষে মিক্ষেপ করা, জলন্ত চিতা বক্ষে
পতিব্রিয়োগকাতরা শোকোন্মত্তা, হিতাহিত-
জানশূন্য মাতা ভগিনী হ্রিতাকে দগ্ধ করা,
পরম ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইত।
তৎকালে মহুগের পশুবৎ আচরণ সকল যেন
মূর্ত্তমান হইয়া বিকটবেশে সর্বত্র বিচরণ
করিত। * হুর্গোৎসবে বলিদান, কালীপূজার
পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্য গীতাদি, নন্দোৎসবের
কীর্তন, দোলযাত্রার আবীর, রথযাত্রার
গণ্ডগোল, বুলবুল ও ঘুড়ীর খেলা, কুম্ভযাত্রা
ও কবির লড়াই লইয়া সকলেই মহানন্দে
কালযাপন করিত। * চতুর্দিকে কেবল পৌত-
লিকতার বাহ্যধড়র ও তান্ত্রিকদিগের স্থপিত
ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল যখন গাঢ় তমসচ্ছন্ন অজ্ঞা-
নতা ও ভ্রমের গভীরতম কূপে বঙ্গবাসি-
দিগকে নিমগ্ন করিতেছিল, তখন রাজর্ষি
রামমোহন রায় “একমেবাদ্বিতীয়ম্”র স্বর্ণা-
ক্ষরে লিখিত উজ্জ্বল পতাকা লইয়া কন্ধ্যক্ষেত্রে
অবতীর্ণ হইলেন। পৌতলিকতার দুর্ভেদ্য
হুর্গের মধ্যে “একমেবাদ্বিতীয়ম্” অনন্ত স্বরূপ
মহান প্রভু পরমেশ্বরের বিজয় নিশান উড্ডীন
করা তাঁহার জীবনের এক মহা ব্রত ছিল।
ষোড়শ বৎসর বয়সে তিনি যে “একমেবা-
দ্বিতীয়ম্” পরব্রহ্মের জয় পতাকা হস্তে ধারণ

* * * লেখকের তাঁহার পূজ্যপাদ স্বর্গীয় শতবর্ষীয়
(১০০ বৎসর দশ মাস) পিতামহ-দেব-বর্ণিত
“সকালের কথা” শুনিতে শুনিতে শরীর রোমাঞ্চিত
হইয়া উঠিত। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে
হইতে লুৎথক বিদেশে (দেব্রাহন) থাকায় সে সব কথা
লিখিয়া রাখিতে পারেন নাই।

করিয়াছিলেন, তাহা স্মৃতি, স্মৃতি, সম্পদে,
বিশ্বদে, রোগে, শোকে, স্নেহে, কষ্টে,
নিষ্ঠাতনে, দেশে বিদেশে, বাল্যে যৌবনে,
বাব্বিক্যে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত একাগ্র-
চিত্তে তাহা বহন করিয়াছিলেন। “হায়! ব্রাহ্ম
ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য তাঁহার কত যত্ন
করিতে হইয়াছিল, তাঁহার ধন গেল, সমুদ্র
বিষয় গেল, দিল্লির বাদসাহের বেতনভোগী
পর্যন্ত হইয়া জীবন পোষণ করিতে হই-
য়াছে।” *

তিনি পৌতলিকতার নাম গন্ধ পর্যন্ত
সহ করিতে পারিতেন না। মহর্ষি দেবেজ্ঞ-
নাথ ঠাকুর মহাশয় বাল্যকালে তাঁহার পিতা-
মহের প্রতিনিধি হইয়া রাজা রামমোহন
রায়কে হুর্গোৎসবে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া-
ছিলেন। হুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া
রাজা ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন “আমাকে
পূজার নিমন্ত্রণ!” মহর্ষি শেষ বয়সেও
বলিয়াছেন “সে স্বর আমি যেন এখনও
শুনিতে পাইতেছি।”

হুর্গোৎসবেব সময় প্রতিমাকে বিবিধসাজে
সাজাইয়া লোকে যখন বিসর্জন করিতে
বাহিত, তাঁহার কোন বন্ধু তখন যদি বলিতেন,
“দেওয়ানজী দেখুন দেখুন কেমন প্রতিমা
সুন্দর সাজাইয়াছে” রাজর্ষি অমনি তখন
বলিয়া উঠিতেন “Brother! Brother!!
ours is universal religion” “ভাই,
ভাই, আমাদের যে সার্বভৌমিক ধর্ম্ম।”
একথা বলিতে বলিতে রাজার দুকপোল
ভাসিয়া অবিরত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর তার-
তের পক্ষে এক শুভ দিন গিয়াছে। সেই
দিন রাজা রামমোহন রায়ের সহিত, কথো—

* মহর্ষি দেবেজ্ঞনাথ ঠাকুর।

পদ্ধতন করিবার জন্ত বহু সংখ্যক সুশিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।* ভারতের ধর্ম সম্বন্ধীয়, রাজনৈতিক অবস্থা, ইহার ভবিষ্যৎ উন্নতি এবং ভারতীয় দার্শনিক-দিগের মতামত সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। প্রধান প্রধান সুপণ্ডিতগণ তাঁহার অসাধারণ তর্কশক্তি দেখিয়া অবাক হইয়াছিলেন। তিনি তিন ঘণ্টাকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া তর্কবিশারদ পণ্ডিতদিগের জটিল প্রশ্ন সকলের সহজতর প্রদান করিয়াছিলেন।† পণ্ডিতগণ তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া একবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! ইহাই তাঁহার পার্থিব জীবনের শেষ কার্য, তাঁহার জীবন-নাটকের শেষ অঙ্ক! এই মহা দিনে ভারতের বিমুক্ত

* A large party was invited to meet the Rajah at Stapleton Grove on the 11 of September. —Mary Carpenter's "Last days of Rammohan Roy."

† In conversation at Stapleton Grove were men fully competent to judge of intellectual power and one and all admired and were delighted by the clearness, the closeness and the acuteness of his arguments, and the beautiful tone of his mind * * * the Rajah continued for three hours, standing the whole time, replying to all the enquiries and observations that were made by a number of gentlemen who surrounded him, on the moral and political state and prospects of India on the

পূর্ণ শশধর রাহুগ্রস্ত হইলেন।‡ ক্রমশঃই তাঁহার শরীর দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তখনও তাঁহার মানসিক শক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। ১৯শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায় অরাক্রান্ত হইলেন। ক্রমশঃই অর বাড়িতে লাগিল, ক্রমে অরবিকারে পুরিগত হইল। কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর ২টা ২৫ মিনিটের সময় প্রদীপ্ত প্রদীপ নিকর হইয়া গেল! স্বাধীনতার ঐক্য স্বাধীন দেশে প্রাণত্যাগ করিলেন। পৃথিবীর পঞ্চভূত পৃথিবীতে প্রত্যর্পণ করিয়া "ওম্" "ওম্" উচ্চারণ করিতে করিতে, সেই অমর আত্মা পবিত্র অমরধামে চলিয়া গেলেন।* ইংলণ্ড কাঁদিল। ভারত কাঁদিল। চিরতরে ভারতের অদৃষ্ট ভাঙ্গিল! হা ঈশ্বর! তোমার রহস্য, তোমার মঙ্গলময় বিধান কে বুঝিবে?

শ্রীমুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

elucidation at great length of certain dogmas of the Indian philosophers."

—Dr. Lant Carpenter L.L.D.

‡ I perceived that he was much exhausted with the excitement and fatigue of the preceding evening—I bid,

* The Raja seemed to pass much of his waking time in prayer * * * His utterance of sacred "Aum"—one of the last words he was heard to utter.—Collector's Life.

জড়তত্ত্ব !*

পদার্থ কাঁহাকে বলে, ভিজ্ঞাসা করিলে
 বিজ্ঞানের বালকমাত্রেই উত্তর করিবে—
 “আমরা ইউক্লিড: যে সকল বস্তু দেখিতে পাই,
 তাহাদিগকে পদার্থ কহে।” কিন্তু যে অন্ধ,
 তাহাকে পদার্থ কি বুঝাইতে হইলে আর
 ওরূপ বলিলে চলিবে না। একটা শব্দ উৎ-
 পন্ন করিয়া তাহাকে বুঝাইতে হইবে যে,
 বাহা হইতে শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, উহা একটা
 পদার্থ। আবার যে অন্ধ ও বধির, তাহাকে
 পদার্থ কি বুঝাইতে হইলে, তাহার শ্রোত্রিয়
 বা তাহার স্পর্শজ্ঞানের সাহায্যে উহা তাহাকে
 বুঝাইতে হইবে। এই কথাই সারার্থ হইল
 এই যে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিক ইত্যাদি ইন্দ্রিয়-
 গণের সাহায্যে আমরা বাহাদিগকে জানিতে
 পারি, অথবা ইন্দ্রিয়গণ আমাদের নিকট
 বাহাদের সংবাদ আনিয়া দেয়, তাহাদিগকে
 পদার্থ কহে। কিন্তু, একটু বিবেচনা করিয়া
 দেখিলে বুঝা যাইবে যে, আনাদিগের ইন্দ্রিয়-
 গণের উপর নির্ভর করিয়া পদার্থের সংজ্ঞা
 নির্দেশ করা একান্ত নিরাপদ নহে। ‘ছায়া
 ত’ আমরা দেখিতে পাই, ছায়াটা তবে কি
 রূকম পদার্থ? বাটীটা, বাটীটা যে রকম পদার্থ,
 ছায়াটা কি সেই রকম পদার্থ? দর্পণের ভিতর
 যে আমার মুখের মতন একটা মুখ দেখা যায়,
 সেটুকি রকম পদার্থ? সে মুখে কখনও
 আগ্নেয় মুখের (যে মুখ দিয়া এত কথা
 বলিতেছি, সেই মুখের) মতন পদার্থ হইতে
 পারে না। কারণ তাহা হইলে ত আমি
 আর একজন থাকি না, তাহা হইলে আমি

যে বহু হইয়া পড়ি। শুধু কি এই গুণগোল?
 ভূতের কথা ভাবিতে ভাবিতে সভয়ে মুখ
 তুলিয়া দেখি, সম্মুখে এক বিকটাকার প্রকাণ্ড
 শরীর অথচ সেটা কিন্তু কিছুই নহে। আলোক
 নাই, অথচ যেন দিব্য জ্যোৎস্না দেখিলাম;
 শব্দ নাই অথচ যেন দিব্য শব্দ কর্ণে ধ্বনিত
 হইল, অনেক সময় এইরূপ ভুল হয়। ইন্দ্রিয়-
 গণ পদার্থ-সমূহের সংবাদ আমাদিগকে
 আনিয়া দেয় বটে, কিন্তু অনেক সময়ে ভুল
 সংবাদও আনিয়া থাকে। কাজেই, ‘পদার্থ’
 কাঁহাকে বলে, ইহা ঠিক করিবার জন্য আমা-
 দের কেবল ইন্দ্রিয়গণকে ‘বিশ্বাস’ করিলে
 চলিবে না; বাহাদিগকে পদার্থ বলি, তাহা-
 দের কতকগুলি ধর্ম জানা আবশ্যিক; এমন
 কতকগুলি ধর্ম জানা আবশ্যিক, বাহা পদার্থ
 মাত্রেই বিद्यমান আছে এবং পদার্থ ভিন্ন আর
 কিছুতে নাই। পণ্ডিতগণ দেখিলেন, কতক
 গুলি পদার্থের বিশেষ ধর্ম এই যে, তাহাদের
 সকলেরই ভার আছে। তাঁহারা এই পদার্থ
 গুলির নাম দিলেন ‘জড়পদার্থ’। অতএব
 পদার্থটা জড়পদার্থ কি না, ইহা জানিতে
 হইলে, আমাদিগকে ইহা দেখিলেই চলিবে
 যে, উহার ভার আছে কি না। যদি ভার
 না থাকে, তবে উহা জড়পদার্থ নহে।

ইহা এক রকম বোঝা গেল, কিন্তু তবু
 জ্ঞানের সীমানায় আসিতে পারিলাম কই?
 জড়পদার্থের ভার কেন আছে? কতকগুলি
 পদার্থের ভার আছে, আর কতকগুলির নাই
 কেন? বাহাদের ভার নাই, তাঁহারা কি রকম-

পদার্থ? জড়পদার্থগুলিই বা এক একটা এক এক রকমের কেন? একটা আবার আর একটার সঙ্গে মিশে কেন? মিশিয়া আবার নূতন রকমের একটা উৎপন্ন হয় কেন? কতকগুলি পদার্থ শক্ত, কতকগুলি তরল কেন? এই যে বিভিন্ন রকমের জড়পদার্থ দেখা যাইতেছে, ইহারা কি সকলেই ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের? অথবা, ইহাদের বংশানুক্রমিক স্রোত সংগ্রহ করিতে পারিলে ইহাদের আদিপুরুষে একমাত্র উপাদানের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইবার সম্ভাবনা? এইরূপ এবং ইহাপেক্ষা বড় বড় প্রশ্ন মনে উদ্ভিত হইয়া আমাদের জ্ঞানগর্ভ চর্চিত করিয়া দেয়। যিনি জ্ঞানসমুদ্রের কূলে দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনিই ইহার অনন্তত্ব দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাই 'জ্ঞানী ব্যক্তির হৃদয়ের অন্তস্তলে এই কথা ধ্বনিত হয় "আমি যাহা কিছু শিখিয়াছি, তাহা হইতে এই মাত্র বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমি কিছুই জানি না।" যিনি এই কথা বলিতে পারেন, তিনি কিছু শিখিয়াছেন, অজ্ঞে নহে। জ্ঞানের সীমানা বহু দূরে, তথায় পৌছিতে মনুষ্যের ক্ষমতায় কুলায় কি না, তাহা জানি না। মূল কারণে পৌছিবীর ক্ষমতা আমাদের নাই, আমাদের ক্ষমতা জড়পদার্থের কতকগুলি ধর্মের সহিত পরিচিত হওয়া মাত্র।

জড়ের এক প্রধান ধর্ম এই যে, ইহার ভাব আছে। সোণ, রূপা, ইট, কাঠ, পাথর, ইহারা জড়পদার্থ, কেননা ইহাদের ভাব আছে। আলোক, তাপ, ছায়া, হিংসা, ক্রোধ, লোভ, ইহারা জড়পদার্থ নহে, কেননা ইহাদের ভাব নাই।

জড়ের আর একটা ধর্ম এই যে, জড় খানিকটা ব্যয়গা জড়িয়া অবস্থান করে। এই

ধর্মটা শুধু জড়েরই ধর্ম, এরূপ বলা চলে না। (পণ্ডিতগণ, ঈশ্বর অথবা আকাশ বলিয়া এক বিশ্বব্যাপী পদার্থের কল্পনা করেন; কিন্তু এই ঈশ্বর অথবা আকাশকে তাঁহারা জড়পদার্থ বলেন না)। যাহা হউক, জড়পদার্থের এই ধর্ম আছে বলিয়াই একটা জড়পদার্থ যেখানে আছে, সেখানে আর একটা জড়পদার্থের থাকা অসম্ভব। যদি জড়ের এই ধর্ম না থাকিত, যদি একটা জড় যেখানে আছে, আর একটাও সেইখানে থাকিতে পারিত, তাহা হইলে একটার ভিতর দ্বারা একটা পূরিয়া, তাহার ভিতর আর একটা পূরিয়া, সমস্ত জড়জগৎ একটা জড়বিন্দুতে পরিণত করা সম্ভবপর ব্যাপার হইত। কিন্তু সেরূপ হওয়াটা বোধ হয়, যিনি এই জড়জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন (যদি কেহ সৃষ্টি করিয়া থাকেন) এবং এরূপ স্থল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রেত নহে।

জড়ের আর একটা ধর্ম—সঙ্কোচনশীলতা। এই ধর্ম হইতে জড়সম্বন্ধে আমরা মস্ত একটা তথ্য উপনীত হইতে পারি। চাপ দিলাম, ঠাণ্ডা করিলাম, আর পদার্থটা সঙ্কুচিত হইয়া গেল। তবেই জড়পদার্থ নারোট নয়। যদি নারোট হইত, তবে সঙ্কুচিত হইতে পারিত না; কারণ জড়ের একটা অংশ যেখানে আছে, সেইখানে আর একটা অংশ থাকিতে পারে না। কাজেই জ্ঞান হয়, জড়পদার্থ নারোট নয়; জড়পদার্থ মাত্রেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ আছে এবং এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে ফাঁক আছে। সেই অংশগুলি এত ক্ষুদ্র আর তাহাদের মধ্যে ফাঁক এত অল্প যে, সহজচক্ষে আর আমরা তাহা ধরিতে পারি না; কিন্তু চাপ দিলে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ গুলি অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি হয় কাজেই

পদার্থটা সঙ্কুচিত হয়। এখন প্রশ্ন এই, সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি কেমন? তাহাদের আকৃতি, প্রকৃতি কিরূপ? তাহাদের ধর্ম কি? তাহারাও কি স্থানতর অংশে বিভক্ত হইতে পারে? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে জড়ের আর একটা ধর্ম আলোচনা করা যাউক।

জড়ের আর একটা ধর্ম—বিভাজ্যতা। আমরা যে সমুদয় জড়পদার্থ লইয়া নাড়াচাড়া করি, তাহাদের সকলকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায়। এখন জিজ্ঞাস্য হইয়া পড়ে, এই ভাগ করাটা কতদূর পর্য্যন্ত চলিতে পারে? ভাগ করিতে করিতে কি এমন একটা ক্ষুদ্র অংশ পাওয়া যাইবে, যাহাকে আর ভাগ করা যাইবে না? অথবা সেরূপ অংশ কখনই পাওয়া যাইবে না? এই একটা মস্ত প্রশ্ন। ড্যান্টন 'এই' প্রশ্নের একরকম উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমরা ভাগ করিবার ক্ষমতার একটা সীমা আছে। পদার্থকে ভাগ করিতে করিতে এমন একটা ক্ষুদ্র অংশ পাওয়া যাইবে, যাহাকে আমরা আর ভাগ করিতে পারি না। এই অতি ক্ষুদ্র অংশকে বলা যাইবে পরমাণু। যে উপায়ে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা কতকটা এইরূপ :—“মনে করা যাউক যে প্রতি পদার্থই কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি এবং পরমাণুগুলিই হইতেছে উক্তার ক্ষুদ্রতম অংশ এবং ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন এক একটা নির্দিষ্ট ওজন আছে। তাহা হইলে একটা পদার্থের ভিতর ৫টা, ৭টা, ১০টা পরমাণু থাকিতে পারে, কিন্তু সাড়ে পাঁচটা, পোণে সাতটা বা সওয়া দশটা পরমাণু কোন পদার্থের ভিতর থাকিতে পারে না। যখন ছইটা পদার্থ মিশিয়া একটা

নূতন পদার্থ উৎপন্ন করে, তখন একটার কতকগুলি পরমাণু আর একটার নির্দিষ্ট সংখ্যক কতকগুলি পরমাণুর সহিত মিশিয়াই একটা নির্দিষ্ট রকমের পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ মনে কর, একটা পদার্থ 'ক' এর একটা পরমাণু আর একটা পদার্থ 'খ' এর ১টা পরমাণুর সহিত মিশিয়া একটা নূতন পদার্থ 'ট' উৎপন্ন হইল। এই 'ক' এর ১টা পরমাণুও 'খ' এর ১টা পরমাণু যখনই ঐ ভাবে মিশিবে, তখন একই পদার্থ 'ট' পাওয়া যাইবে; 'ট' ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যাইবে না। যদি 'ক' 'খ' মিশাইয়া আরও নূতন নূতন পদার্থ 'ঠ' 'ড' 'ঢ' ইত্যাদি পাইতে হয়, তবে 'ক' এর ১টা পরমাণুর সহিত আর 'খ' এর ১টা পরমাণু মিশিলে চলিবে না; 'ক' এর ১টার সঙ্গে 'খ' এর ২টা, ৩টা, ৪টা, ৫টা পরমাণু মিশিলে তবে নূতন নূতন পদার্থ 'ঠ' 'ড' 'ঢ' 'ণ' ইত্যাদি পাওয়া যাইবে। এখন, 'খ' এর সকল পরমাণু গুলিরই ওজন সমান এবং প্রতি পরমাণুরই একটা নির্দিষ্ট ওজন আছে। 'ক' এর একটা পরমাণুর সহিত 'খ' এর ১টা পরমাণু যোগে যে 'ট' পদার্থ হইল, ইহার যে ওজন হইবে, 'খ' এর ১টা না হইয়া ২টা পরমাণু যোগে যে 'ঠ' পদার্থ হইল, 'ট' এর অপেক্ষা তার ওজন কতটুকু বেশী হইবে? না, 'খ' এর একটা পরমাণুর ওজন বাহা। আবার 'খ' এর ৩টা পরমাণু যোগে যে পদার্থ 'ড' হইল, 'ট' এর অপেক্ষা তাহার ওজন কতটুকু বেশী হইবে? না 'খ' এর ২টি পরমাণুর ওজন বাহা। অর্থাৎ এই বিভিন্ন পদার্থ 'ট' 'ঠ' 'ড' 'ঢ' ইত্যাদির ওজন এক নির্দিষ্ট সংখ্যার ওজন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। যদি পরমাণুবাদ সত্য বলিয়া ধরা যায়, তবে এই রকম একটা নিয়ম দেখা

যাইবে। পরীক্ষা দ্বারা এই নিয়মের যথার্থ্য প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং এই পরমাণুবাদ সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

পরমাণু বিভক্ত হয় নাই বটে, কিন্তু পরমাণু একেবারে অবিভাজ্য, একথা বলিতে পারা যায় না। বিভাজ্যতা এই ধর্মটি পরমাণুতেও আরোপ করা যায় কিনা, তাহা এখন পর্য্যন্ত ঠিক হয় নাই।*

এই পরমাণুবাদ স্বীকার করিলেই পরমাণু সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। পরমাণুগুলি নিত্যন্ত ক্ষুদ্র, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাদের আয়তন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা কি? তাহাদের পরস্পরের ভিতর মোটামুটি দূরত্ব কিরূপ? একঘন ইঞ্চি জায়গার ভিতর তাহাদের কতগুলি থাকে? পরমাণু গুলি কিরূপ অবস্থায় আছে?—ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, না একস্থানেই স্থির হইয়া আছে? না, একস্থানে থাকিয়াই হেলিতেছে, ছলিতেছে? না হেলিয়া, ছলিয়া, ঘুরিয়া, ফিরিয়া ইত্যন্ত: বিচরণ করিতেছে? পরমাণুগুলি মোটের উপর ব্যাপারখানা কিরূপ? তাহাদের উৎপত্তি কোথা হইতে?

* কিছুদিন পূর্বে ক্রক্স, রন্টজেন, টমসন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ, ক্যাথের পাত্র হইতে বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া এবং উহার ভিতর তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঐ ক্যাথের পাত্র হইতে এক প্রকার নূতন রকমের আলোক বহির্গত হয়, যাহাকে ইংরাজী ভাষায় cathode rays অথবা অবস্থাবিশেষে Rontgen rays বলে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে তড়িৎ-ধর্মাক্রান্ত, অত্যন্ত বেগবান অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জড়বিল্লুর গতি হইতেই ঐ আলোকের উৎপত্তি। এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জড়বিল্লু সকল পরমাণু নহে; পরীক্ষা দ্বারা উহার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উহার জড়পরমাণু অপেক্ষা অনেক ছোট, উহাদের প্রায় দেড় হাজারটি একত্র করিলে একটি উজ্জ্বল পরমাণুর সমান হইবে।

না, তাহারা কখনও উৎপন্ন হয় নাই, চিরকাল হইতে তাহারা একই মূর্তিতে বিরাজ করিতেছে? তাহাদের কি ঘিনাশ আছে? একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্তি বলনায় আসে না। তবে নষ্ট হইলে তাহারা কি অবস্থায় পরিণত হইবে? তাহাদের দশাটা কেমন হইবে? অথবা তাহাদের কখনও বিনাশ হইবে না, সময়ের অন্ত পর্য্যন্ত একই মূর্তিতে তাহারা বিরাজ করিতে থাকিবে; এই সকল প্রশ্ন আমাদের মনে উদয় হয়। এই সকল প্রশ্নের সহুত্তর পাইলে অবশ্য আমাদের অন্তত: কতকটা জ্ঞানলাভ হইল, একথা বলা যাইতে পারে। দেখা যাউক, পণ্ডিতগণ কতদূর এই সমস্ত উত্তর দিতে পারিয়াছেন।

প্রথম, পরমাণুর আয়তন সম্বন্ধে:—

একটা ত্রিকোণ কাঁচ বা বাঁড়ের কলমের ভিতর দিয়া সূর্য্যের সাদা আলোক চলিয়া আসিলে উহা রঙ্গিন হইয়া পড়ে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সূর্য্য হইতে যে সাদা আলোক আইসে, ইহা বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। বৈজ্ঞানিকগণের মতে, চোখের বাহিরে আলোক আর কিছুই নহে, আকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি চেউ নাত্র। এই চেউগুলি অতি ক্ষুদ্র, এক ইঞ্চির ৪০ হাজার, ৫০ হাজার ভাগের একভাগ হইবে। এই চেউগুলি আসিয়া যখন আমাদের চোখে ধাক্কা দেয়, তখনই আমাদের আলোক-জ্ঞান হয়। চেউগুলি বিভিন্ন আকারের ছোট, বড়, মাঝারি ইত্যাদি। একটা নির্দিষ্ট আকারের চেউ চোখে যে ধাক্কা দেয়, তাহীতে একটা নির্দিষ্ট বর্ণের জ্ঞান হয়। এই অতি ক্ষুদ্র চেউগুলির মধ্যে যে আয়তনের একটু পার্থক্য, তাহা হইতেই বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি। সূর্য্যের আলোকে এই রকম অসংখ্য

চেউ আছে; ইহাদের সমবেত ধাক্কার ফলে স্বর্গের আলোক আমাদিগের নিকট শাদা বলিয়া বোধ হয়। বাতাসের ভিতর দিয়া এই ছোট বড় চেউগুলি সমান বেগে অগ্রসর হয়। ঝাড়ের কলমের ভিতর স্বর্য়ালোক প্রবেশ করিলে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলোকের বেগ একটু ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। ইহার ফল হয় এই যে, শাদা আলোকের ভিন্ন ভিন্ন রং ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে বাকিয়া যায়, সুতরাং ফাঁক ফাঁক হইয়া পড়ে। তজ্জন্মই ঝাড়ের কলমের ভিতর দিয়া স্বর্য়ালোক চলিয়া আসিবার পরে উহা আর আমরা শাদা দেখি না, রঙ্গিন দেখি। ঝাড়ের কলমের অণুগুলির ভিতর দিয়া যখন শাদা আলোকের ছোট, বড় নানা আকারের চেউগুলি চলিয়া যায়, তখন তাহাদের বেগ বেশী কম হইয়া যায়। যদি আলোকের চেউগুলির তুলনায় ঝাড়ের কলমের অণুগুলি নিতান্তই ক্ষুদ্র হইত, তাহা হইলে ঐরূপ ব্যাপার ঘটিতে পারিত না। এইরূপে অণুর আয়তন যদি আলোকের চেউয়ের আয়তনের ১০,০০০ ভাগের এক ভাগ ধরা যায়, তাহা হইলে একটা অণুর আয়তন হইল, এক ইঞ্চির ৪০ কোটি ভাগের এক ভাগ। অণুর আয়তন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মাইবার জন্ত বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে উহার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। অধ্যাপক ম্যাক্সওয়েল বলিয়াছেন “এমন একটা জিনিষ ৭৩০,০০০,০০০ ছোট আর সহজ চক্ষে দেখা যায় না; অতটুকু জায়গার মধ্যে অল্পজ্ঞান নামক বায়বীয় পদার্থেরও অন্ততঃ ৬৮ কোটি পরিমাণ আছে।” ক্লিফোর্ড লীহেব বলিয়াছেন, “এখনকার খুব উন্নত ধরণের অণুবীক্ষণ যন্ত্রে একটা জিনিষকে ৬ হাজার

হইতে ৮ হাজার গুণ বড় দেখায়; এরূপ অণুবীক্ষণ যন্ত্রও পদার্থের অণুগুলিকে দৃষ্টিগোচর করাইবার পক্ষে সম্পূর্ণ অল্পযোগ্য। যদি এইরূপ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষমতা ফের আবার অতগুণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারিত, তবে উহা জলের অণুগুলিকে দেখাইলেও দেখাইতে পারিত।” লর্ড কেলবিন বলিয়াছেন, “একটা ফুটবল যত বড়, ততবড় একটা জলের গোলক মনে কর। এখন এই জলের গোলকটা ফুলিতে ফুলিতে যদি ফুলিয়া আমাদের পৃথিবীর মতন এতবড়টা হইতে পারিত, তাহা হইলে জলের অণুগুলি দেখা যাইত। কত বড় দেখা যাইত? না, বন্দুকের গুলি অপেক্ষা কিছু বড় বড় এবং কামানের গোলার অপেক্ষা কিছু ছোট ছোট।”

তারপর প্রশ্ন—পদার্থের অণুগুলি কি স্থির হইয়া আছে, না তাহারা গতিবিশিষ্ট? এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের মত এই যে, কোন পদার্থেরই অণুগুলি একেবারে নিশ্চল নহে। কতকগুলি পদার্থের অণুগুলির পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ এক রকম নাই বলিলেই চলে এবং ইহারা অবিরন্ত বেগে ছুটাছুটি করিতেছে—ইহারা বায়বীয় পদার্থ। এইরূপ ছুটাছুটি করিয়া ইহারা আধার পাত্রের চারিদিকে ধাক্কা দিতেছে; ইহা হইতেই বায়বীয় পদার্থের চাপ। উদ্ভিজ্জ বাষ্পের অণুর বেগ সেকেন্ডে এক মাইলের বেশী। তরল পদার্থের অণুগুলিও ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, কিন্তু ইহাদের পরস্পরের ভিতর অল্প বিস্তর আকর্ষণ আছে। কঠিন পদার্থের অণুগুলি একস্থানে থাকিয়াই স্পন্দিত হইতেছে—তরল অথবা বায়বীয় পদার্থের অণুগুলির শ্রায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় না। তাই, একটা বালিপূর্ণ টবের গায়ে ছিদ্র করিয়া

দিলে বালি বাহির হইয়া যায় না, কিন্তু একটা জলপূর্ণ পাত্রেয় গায়ে ছিদ্র করিলে জল সবেগে বহির্গত হইয়া যায় ।

তারপর জিজ্ঞাস্ত এই—পরমাণুর কি বিনাশ আছে? পরমাণুর বিনাশ আছে কিনা, জিজ্ঞাস করাও না, জড় পদার্থের বিনাশ আছে কিনা, জিজ্ঞাসা করাও তাহাই; কারণ কতকগুলি পরমাণু লইয়াই এক একটা জড় পদার্থ। পরমাণুর যদি ধ্বংস না থাকে, তবে জড়েরও নাই। কিছু দিন পূর্বে ল্যাবোয়্যাসিয়ে প্রমাণিত করিয়াছেন, জড়ের ধ্বংস নাই। পরে, জড়ের স্তায় শক্তিও অবিনশ্বর, এই কথা পণ্ডিতগণ জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু, “না সতো বিদ্যাতে ভাবো, না ভাবো-বিজ্ঞতে সত্যঃ” এই কথাটা বহুপূর্বে হইতেই আমাদের শাস্ত্রে উক্ত আছে। যাহা একেবারে ধ্বংস হইতে পারে, তাহার প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব নাই, আর যাহার প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব আছে, তাহা একেবারে ধ্বংস হইতে পারেনা, সে যেরূপ পদার্থই হউক না কেন, জড়ই হোক আর অজড়ই হোক। মোটের উপর ‘কিছুনা’ হইতে ‘কিছু’ উৎপন্ন হইতে পারেনা আর ‘কিছু’ কিছুনা’তে পরিণতও হইতে পারেনা। কিন্তু জড়ের রূপান্তরগ্রহণ সম্ভব কি? শক্তি অবিনশ্বর, কিন্তু শক্তি বহুরূপী, ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে প্রকাশ হইতে পারে। এই যে, “যে শক্তি ব্যয় করিয়া আমি সবলে টেবিলের উপর মৃষ্টাঘাত করিলাম, সে শক্তি একেবারে ধ্বংস হইলনা। আঘাত করাতে একটা শব্দ উৎপন্ন হইল, কতকটা তাপ উৎপন্ন হইল, ইহা আমারই সারীরিক শক্তির নূতন মূর্তিতে বিকাশ মাত্র। আর আমি যে এত শক্তি-সম্পন্ন, আমার এ শক্তি আসিল কোথা হইতে? মহাবীর হইয়াই কি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম?

না, আমরা আহাৰ করি বলিয়াই এত শক্তি সম্পন্ন হইতে পারিয়াছি। খাদ্য জন্মায় কে? সূর্য্যদেব, তাহার তাপ ও আলোক দানে। সূর্য্যদেব ক্রমাগত এত তাপ ও আলোক দিতেছেন কি করিয়া? না, তিনি ক্রমাগত স্বীয় দেহ সঞ্চিত করিতেছেন; ইত্যাদি। শক্তি সম্বন্ধে একথা বুঝা গেল। তাপ নষ্ট করিয়া আমরা আলোক পাইতে পারি, আবার আলোকের শক্তি হইতে তাপ পাইতে পারি। হাতে হাতে ঘষিয়া তাপ উৎপন্ন করিতে পারি, আবার তাপের সাহায্যে ইঞ্জিন চালাইতে পারি। কিন্তু জড় সম্বন্ধে কি একথা খাটে? একটা জড় কি অল্পটায় পরিণত হওয়া সম্ভব? নৌহ কি তাম্রে পরিণত হওয়া সম্ভব! তাম্র কি স্বর্ণে পরিণত হওয়া সম্ভব? সম্ভব হইতে আপত্তি কি? * লৌহ স্বর্ণে পরিণত হইলে জড়ের রূপান্তর হইল মাত্র, একেবারে ধ্বংস ত হইল না। যদি এইরূপ হওয়া অসম্ভব হয়, তবে কেন অসম্ভব? লৌহের একটা পরমাণু যেমন, লৌহের আর একটা পরমাণুও তেমন। কিন্তু লৌহের পরমাণু ও স্বর্ণের পরমাণু এক রকম নয়। কতকগুলিতে লামঞ্জ ও কতকগুলিতে পার্থক্য দেখা যায় কেন? চির দিন হইতেই কি কতকগুলি এক রকম আর অপরগুলি অল্প অল্প রকম হইয়া আছে? কতকগুলি দেখিতেছি ঘট, কতকগুলি দেখিতেছি কলসী, কতকগুলি দেখিতেছি হাঁড়ী। যদি চিরদিন হইতে একই ভাবে চলিয়া আসিতেছে,

* কিছু দিন হইল কুরী সাহেব ও তাহার পত্নী রেডিয়ম নামক একটা ধাতুর আবিষ্কার করিয়াছেন। এ রেডিয়ম ধাতুকে হিলিয়ম নামক অপর একটা ধাতুতে পরিণত হইতে দেখা গিয়াছে।

তবে সকলগুলিই ঘট, অথবা সকলগুলিই কলসী হইল না কেন ? তবে কি একমাত্র মুক্তিকা হইতেই এই ভিন্ন ভিন্ন পাত্রের উদ্ভব হইয়াছে ? দেখা যাউক, এসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের কি মত—তাহাদের মতে পরমাণু জিনিষটা কি !

ডেমোক্রাইটাস্ বহুপূর্বে বলিয়াছিলেন, পরমাণু জিনিষটা খুব শক্ত, তবে পরমাণুগুলির ভিতর ফাঁক ফাঁক আছে—তাই জল, বায়ু আর আমাদের নিকট শক্ত নয়। নিউটনের ধারণাও কতকটা ঐরূপ ছিল। শব্দ, বায়ুর ভিতর দিয়া কতবেগে অগ্রসর হয়, এইটা হিসাব করিতে যাইয়া তিনি দেখিলেন যে, শব্দের প্রকৃত বেগ যাহা, তাহার হিসাবের বেগ তাহাপেক্ষা কম হইয়া দাঁড়ায়। পরমাণুগুলি কঠিন, এই মত ধরিয়া তিনি উপরোক্ত পার্থক্যের কারণ নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অণুগুলি শক্ত, উহাদের ভিতর দিয়া শব্দ যাইতে সময়েরই আবশ্যক হয় না ; কাজেই শব্দের প্রকৃত বেগ তাহার হিসাবের বেগ হইতে বেশী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু নিউটনের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। উপরোক্ত পার্থক্যের প্রকৃত কারণ লাপ্লাস্ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন, পরমাণু একেবারে শক্তি হইতে পারে না। পরমাণুর অভ্যন্তরেও একরকম স্পন্দন চলিতেছে। বিভিন্ন গ্যাসের অণুগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যায় স্পন্দন হইয়া থাকে। তাই ভিন্ন ভিন্ন গ্যাস আলাইয়া ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গের আলোক পাওয়া যায়। লবন পেঁড়াইলে হলুদে আলো পাওয়া যায় ইত্যাদি।

রাসায়নিক বলেন যে, মধ্যস্থ ঐকটা বিদ্যুৎ চারিদিকে একরকম স্থিতিস্থাপক বায়বীয়

পদার্থ ঘিরিয়া আছে, ইহাই পরমাণু।

বস্কোভিচ্ জড়পরমাণুকে একেবারে উড়াইয়াই দিতে চাহেন। তিনি বলেন, পরমাণু আর কিছুই নয়, কেবল কতকগুলি বিন্দু মাত্র ; এই বিন্দুগুলি জড় নহে। উহার আকর্ষণ, বিকর্ষণ বলের কেন্দ্র মাত্র।

কিন্তু পরমাণু কি, এসম্বন্ধে লর্ড কেল্বিন বাহা বলিয়াছেন, তাহাই অন্ত্যন্ত মত অপেক্ষা আমাদের মনে বেশী লাগে। তাহা কতকটা এইরূপে বুঝান যাইতে পারে:—সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া ঈশ্বর অথবা আকাশ নামক পদার্থ বিद्यমান ; এইরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। শুধু কল্পনা নহে—এই ষাটটা, বাটটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ যতদূর নিঃসন্দেহ, এই ঈশ্বর অথবা আকাশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঠিক ততদূর অথবা তাহাপেক্ষা বেশী নিঃসন্দেহ। সমগ্র জগৎ জুড়িয়া এই আকাশ বিद्यমান। আলোক, এই আকাশের একরকম চেউ মাত্র ; তাপও এই আকাশেরই অপেক্ষাকৃত বড় বড় চেউ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাড়িৎ কি ? না, এই আকাশেরই ক্রিাবিশেষ মাত্র, চুম্বক শক্তি এই আকাশেরই একপ্রকার ঘূর্ণী। এই সমস্ত বৃহৎকাণ্ডের মূলে এই এক আকাশ, পণ্ডিতগণ ক্রমে এই তথ্যে উপনীত হইয়াছে। আমরা যাহা জড়পদার্থ বলি, তাহার মূলেও এই এক আকাশই বর্তমান, এরূপ বিবেচনা কেমন ? কেল্বিনের মতে, জড়পরমাণু এই আকাশেরই আবর্ত বিশেষ মাত্র। তবে জড় ও আকাশ একই পদার্থ ? সে কেমন কথা ? আমরা যে বলটা লইয়া খেলা করি, ছুড়িয়া ফেলি, একজনের মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া রক্ত পর্য্যন্ত বাহির করি, সেই বলটা আর আকাশটা কেমন করিয়া একরকমের পদার্থ হইল ?

আকাশটা আছে না আছে, তাহাত 'আমরা' অল্পভবই করিতে পারি না। ইহার উত্তর এই যে, ঈশ্বর অথবা আকাশ আমরা অল্পভব করিব কি করিয়া? আমরা অদন্ত ঈশ্বর সাগরে নিমজ্জিত। এ সাগরের পৃষ্ঠ নাই, তল নাই, উপর নাই, নীচ নাই। ডুবিতে ডুবিতে সাগর-নিম্নস্থিত যুদ্ধিকাতেও পৌছিতে পারিব না, ভাসিতে ভাসিতে এই সাগর ছাড়িয়া বায়ুতেও উঠিতে পারিব না। কিন্তু, উপর নীচ না দেখিলে কি সাগরের অস্তিত্ব অল্পভব করা যায় না? সমুদ্রের ভিতর মাছ থাকে, হাঙ্গর কুম্ভীর থাকে। এই সকল জন্তু সমুদ্রপৃষ্ঠে ভাসিয়া উঠিয়া চক্ষু বিস্তার করিয়া সমুদ্রজলে নিরীক্ষণ না করিলে কি ইহারা বুঝিতে পারে না, জল আছে কিনা আছে? পারে বটে। ইহারা যখন সবেগে অগ্রসর হয়, সমুদ্রের জলটা বাধা দেয়। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যের বিষয়, আকাশটা সে রকম কোন বাধাই দেয় না। আকাশের ভিতর ঘর্ষণের মত কোন ব্যাপার সংঘটিত হইবার ঘো নাই। এই আকাশের অস্তিত্ব আমরা অল্পভবই করিতে পারি না। তবে আমরা কি অল্পভব করিতে পারি? অল্পভব করিতে পারি, ইহাতে যে আবর্ত ওঠে, ইহাতে যে ঘূর্ণী উপস্থিত হয়। এই আবর্তই আমাদের নিকট 'কিছু' বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তৎপন্ন আর সকলেই আমাদের নিকট 'কিছুনা' বলিয়া বোধ হইবে। জড় পরমাণু এই রকম এক একটা আবর্তবিশেষ। ঘর্ষণবিহীন ঈশ্বরে আমরা ইচ্ছা করিলে আবর্ত উৎপন্ন করিতে পারি না; আবর্তগুলি আমাদের ইচ্ছানুসারে সৃষ্টি করা অথবা ধ্বংস করা আমাদের ক্ষম-

তার মধ্যে নহে। তবে এই আবর্তগুলি উৎপন্ন হইল কি করিয়া?

সে কথা এখন পর্য্যন্ত কেহ বলিতে পারেন না; জ্ঞানের সীমানা এইখানে।

আর এক কথা, ঈশ্বর অথবা আকাশ নিত্যন্ত mobile; ইহার যে আবর্তগুলি, তাহারা এত কঠিন হইল কি করিয়া? হাঁ, তাহা হইতে পারে। বায়ু কঠিন নয়, কিন্তু ঘূর্ণিবায়ুতে কাঠিগের বিশেষ আভাষ পাওয়া যায়। ইঞ্জিন হইতে যে বাষ্পের এক একটা গোলাকার পদার্থ 'ঘুপ' করিয়া বাহির হয়, তাহা আকৃতিবিশিষ্ট এক একটা কঠিন পদার্থের মত প্রতীয়মান হয়। একটা রবারের ব্যাগের ভিতর জল পুরিয়া, সবেগে ঘুরাইয়া দিলে এই জলটা কঠিন পদার্থের মত যেন হয়। অধ্যাপক টেট সাহেব একটা এক মুখ গোলা বাস্তুর খোলামুখে একখানা পরদা লাগাইয়া ও বাস্তুর অপর দিকে একটা ছিদ্র করিয়া দেখাইয়াছেন, যখনই পরদায় আঘাত করা যায়, তখনই ছিদ্রের ভিতর দিয়া বায়ুর অস্তুরীয়ে প্রায় একটা গোলাকার পদার্থ সবেগে বহির্গত হইয়া আইসে। কিন্তু ঈশ্বর ঘর্ষণবিহীন, বায়ুত সেরূপ নয়, কাজেই আকাশের আবর্ত যে জড়পরমাণু, তাহা চিরকাল রহিয়া গেল, কিন্তু বায়ুর আবর্ত সহজেই ভাঙিয়া যায়।

এই ব্যাপার দেখিতে অতি সুন্দর, টেট সাহেব দেখাইয়াছেন, লর্ড কেলবিন দেখিতেছেন এবং দেখিতে দেখিতেই তিনি তাহার পরমাণুতত্ত্বের ভিত্তি 'সংস্থাপিত' করিয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপার প্রত্যেকেই দেখিতে ও দেখাইতে পারেন। একটা বিস্কুটের বাস্তুর খোলামুখে একখানা পুরুকাগজ আঁটিয়া বাঁধিয়া অপরদিকের

টিনের ঠিক মধ্যস্থানে পয়সার মতন একটা গোলাকৃতি ছিদ্র করুন। বায়ুর অঙ্গুরীয়কগুলি চোখে দেখা যাইতে পারে, তজ্জন্ম কিছু ভ্রাকড়া পোড়াইয়া বায়ুর ভিতর রাখিয়া উহা ধূমপূর্ণ করুন। এখন, কাগজের উপর অঙ্গুরীয়ার আন্তে আন্তে আবাত করিলে অঙ্গুরীয়াকৃতি এক একটা গোলাকার পদার্থ বাহির হইয়া অসংখ্য গোলাকার পদার্থে গৃহপূর্ণ করিয়া ফেলিবে। ১০ হাত তফাৎ হইতে প্রদীপের দিকে একটা বায়ুর অঙ্গুরীয়ক ছাড়িয়া নিম্নে প্রদীপ ধপ্ করিয়া নিভিয়া যাইবে, যেন কোন কঠিন পদার্থ আসিয়া প্রদীপের উপর পড়িল।

এই গেল আধুনিক পণ্ডিতগণের জড় পরমাণুতত্ত্ব। এখন একটা কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। একমাত্র পদার্থ হইতেই যে এই দৃশ্যমান স্বর্গতের সৃষ্টি হইয়াছে, পণ্ডিতগণ ক্রমে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন। এই একমাত্র পদার্থ সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া বর্তমান। এই একমাত্র পদার্থই সংপদার্থ, এই একমাত্র পদার্থই বিঘ্নমান; ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই, আর কিছু থাকিতেও পারে না। জগৎ ইহা হইতেই অভিব্যক্ত। এই একমাত্র পদার্থকে ‘যা’ ‘তা’ মনে না করিয়া ইহাকে একটা উচ্চতর আসন দিলে কেমন হয়? ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিতেছেন “জগতে একমাত্র পদার্থ ঈশ্বরই বর্তমান; জড় ইহারই অভিব্যক্তি, ইহাতেই লিপ্ত।”

স্বয়ং ভগবান আমাদের কাছে বলিয়াছেন :—

“মন্তঃপরতরং নাত্মং কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয়।

ময়ি সর্বমিদং প্রোক্তং সূত্রে মণিগণাইব।”

ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, ঈশ্বর বিশ্বব্যাপী। ভগবান বলিয়াছেন “ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমুর্জিতা।”

ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন “আকাশের আবর্তগুলি আকাশের ভিতরই এদিক ওদিক ছুটিয়া বেড়ায়, তাহাতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই।” ভগবান বলিয়াছেন “আকাশস্থিত এই সর্বগ মহানবায়ু যেরূপ সর্বদা বিচরণ করিতেছে, অথচ আকাশের সহিত বায়ুর মিশ্রতা সম্পাদক কোন সম্বন্ধ নাই, সেইরূপই এতৎসমস্ত বিশ্ব আবাত্তে অবস্থিতি করিতেছে; অথচ আমার সহিত ইহার মিশ্রতা নাই।

“যথা কালস্থিতো নিত্যং বায়ুঃসর্বত্রগো মহান্ তথা সর্বানি ভূতানি মৎসংস্থানীত্বাপধারয়।”

ভগবান বলিয়াছেন, তাঁহা হইতেই এই জগৎের উৎপত্তি, তিনিই এই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। কিরূপে ধারণ করিয়া আছেন?—“ভূতভ্রমচ্ ভূতশোমমাত্মা ভূতভাবনঃ।”

জড়জগতের উৎপত্তি আকাশ হইতে; যদি লয় হয়, তবে আকাশেই লয় হইবে। ভগবান বলিয়াছেন :—

“অহং সর্বস্ত প্রভবো নন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।”

“অহং কৃৎসন্তজগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।”

প্রলয়ের কথা ভাবিয়া আমরা একান্ত অধীর হইয়া পড়ি। ভগবান আমাদের কাছে আশ্বাস দিয়াছেন। কল্পক্ষেত্রে ধ্বংস হইবে, কল্পান্তে আবার সৃষ্টি হইবে।

“সর্বভূতানি কৌন্তেয়! প্রকৃতিং যান্তিমামিকাং কল্পক্ষেত্রে, পুনস্তানি কল্পাদৌ বিশ্বজামাহং।”

“প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিশ্বজামি পুনঃপুনঃ

ভূতগ্রাম মিমং কৃৎসমবশং প্রকৃতেবশাং।”

তিনি আরও বলিয়াছেন, মূঢ়ব্যক্তিগণই তাঁহার বিশ্বরূপ কল্পনা করিতে পারে না, তাঁহাকে মনুষ্যের জ্ঞান আকৃতিবিশিষ্ট মন করিয়া অবজ্ঞা করে।

“অবজানন্তি মাংসূতা মানুযীংতনুমাশ্রিতঃ
পরংভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরং ।”

• ইউরোপীয় পণ্ডিত এক আকাশেই অনন্ত
মূর্তির বিকাশ দেখিতে পাইয়াছেন। শত
শত গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্যাদি একমাত্র
আকাশেরই অনন্তমূর্তি। বহুপূর্বে ভগবান
আপনার অনন্তরূপ অর্জুনকে দেখাইয়া-
ছিলেন। অর্জুন, ভগবানের সেই অনন্তরূপ
দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অর্জুন সেই
একমাত্র, আদি, অন্ত, মধ্যাহ্ন ভগবানে
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইয়া বিস্মিত,
ভীত, স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

“অনেক বাহুদর বস্ত্র, নেত্রঃ

পশ্চামি স্বাং সর্ব্বতেহনন্তরূপং

নান্তং নমধ্যং নপুনস্তবাদিং

পশ্চামি বিবেক্ষয়! বিবেক্ষয়!”

“অনাদি মধ্যাস্তমন্তবীৰ্য্য

মনস্তবাহুং শশিহর্য্য নেত্রঃ

পশ্চামি স্বাং দীপ্তহতাশ বহুঃ

স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপস্তং ।”

বিস্মিত নেত্রে সেই অনন্তমূর্তি দেখিতে
দেখিতে অর্জুন ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

“অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোহস্মি দৃষ্টা

ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।

তদেব মে দর্শয় দেব! রূপং

প্রসীদ দেবেশ! জগন্নিবাস!

“হে অনন্তশক্তিসম্পন্ন! তোমার অনন্ত
রূপ দেখিয়া আমি বিস্মিত, ভীত হইয়াছি।
তুমি এই অনন্তমূর্তি সম্বরণ করিও। আমাকে
তোমার সেই সৌম্যমূর্তি দেখাও।”

অর্জুন বাহা দেখিয়াছিলেন, বাহা দেখিয়া
স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, আমরা কল্পনা-
নেত্রে, ভীত, বিস্মিত, স্তম্ভিত চিত্তে তাহা
দেখিতে দেখিতে তাঁহার স্বরূপ অবগত হইয়া,
সেই অনন্তসাগরে, চিরতরে, এই ক্ষুদ্র সাগ-
রোন্মি মিলাইতে পারিব কি?

শ্রীহরেক্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ।

জীবন-সন্ধ্যায় ।

সুনীল-সাগর-কূলে, স্তব্ধ নীলিমায়,

দেবীর নিষ্ঠালা এক সৌরভ ছড়ায় ;

প্রভাত-শোভন-ফুল-নলিনীর দল—

প্রহনে প্রণব গাঁথা—ভরা পরিমল ;

কামিনী মুকুল গজ্জ, মুদ্রল, মেঘন,

অর্জুনে চালে সুধা সাস্তনা মধুর ;

প্রীতির প্রফুল্ল ছবি নক্ষত্র-কিরণ,

সোহাগ শিশুরে রচে স্বপ্ন সম্মোহন !

অনিলে-গুঞ্জরে মুহু বীণার বজ্রার,

কলকণ্ঠে উঠে গীত-মাধুরী-সম্ভার ।

ললিতে কোমল মিশে, মধুরে শীতল,

উল্লাসে সাগর-বেলা করে টলমল !

একাকী মুদিত কবি-সন্ধ্যা নিরালায়,

নেহারে মদির দৃশ্য জীবন-সন্ধ্যায় ।

২

আলোক নিবিল ধীরে, স্তব্ধ সমীরণ,

নীরব হইল কণ্ঠ, বীণার নিশ্বন ।

নিবিড় জলদজাল ঘেরিল অশ্রু,

ডুবিল তিমির গর্ভে সৈকত সাগর ।

বহিল প্রমত্ত বেগে ক্ষিপ্ত প্রভঞ্জন,

উত্তুঙ্গ-তরঙ্গ-বীথি করে আফালন ।

সহসা ভাঙ্গিল স্বপ্ন, কাঁপিল হৃদয়,
 আতঙ্কে পূরিল প্রাণ, গজিল প্রলয়।
 কোথায় সাধনা প্রীতি, কোথা ফুলবাস ?—
 সম্মুখে যে ফেনায়িত ভীম অটুহাস।
 উভালে করাল মিশে, ক্রুরে ভয়ঙ্কর,
 তবাসে সাগর-বেলা কাঁপে থরথর।
 একাকী স্তম্ভিত কবি নির্জন বেলায়,
 নেহারে ভীষণ দৃশ্য জীবন-সন্ধ্যায়।

৩

অবশ শিখিল তম্বু ; শুক্ল মন প্রাণ ;—
 নিমেষে উভয় দৃশ্য হ'ল অন্তর্ধান ;
 প্রয়াণ করিল মায়া-মোহন ছলনা,

কুহক-স্তম্ভিত আত্মা লভিল চেতনা। ..
 চারিভিতে হৃদয়িত প্রলয়ের ধ্বনি,
 ভেসেছে ভাটার টানে জীবন-তরণী।
 নয়ন মুদ্রিছে ধীরে ; সম্মুখে পাথার,
 তরঙ্গ-সঙ্কুল পথ—অনন্ত-বিস্তার।
 ফুটিল আধারে ক্ষীণ আশার আলোক।
 ভাঙিল ভবের পারে ভূমানন্দ-লোক।
 আলোকে আনন্দ মিশে, উজ্জ্বলে নির্মল,
 নেহারে ভবিষ্য দৃশ্য পথিক বিহ্বল।
 একাকী প্রবুদ্ধ কবি ভাসিল ভেলায়,
 তাজি মর্ত্য মায়া-পূরী জীবন-সন্ধ্যায়।
 শ্রীশ্রীচন্দ্র রায়।

বাণ ও শোণিতপুর।

‘বোধ্যবান’ বাণ, ‘চারুদর্শন’ উষা ও
 ‘কামিনী-মনোমোহন’ অনিরুদ্ধ, এই কয়টি
 চরিত্র অতি প্রাচীন যুগের গৌরব-স্মৃতির
 উদ্দীপক। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে :—
 “বাণ মহাত্মা বলিরাজার একশত পুত্রের
 জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাহার সহস্র বাহু। তিনি
 তাণ্ডব সময়ে বাহুদ্বারা গিরিশের তুষ্টি সাধন
 করিতেন। ভগবান্ ভক্তবৎসল শরণ্য
 সর্বভূতেশ্বর তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে
 কহিলে, তিনি তাঁহাকে তাঁহার পুরস্কৃত
 ইহিতে বাচুগ্রা করিয়াছিলেন। এই বাণ
 বীর্ষ্যবর্গ সাতিশয় গর্বিত হইয়া একদা
 স্বর্ঘ্যবর্ণ কিরীট দ্বারা ভগবান গিরিশের পদা-
 বৃত্ত স্পর্শ শূরক কহিলেন,—“হে মহাদেব !
 আপনি অপূর্ণকাল ব্যক্তিদিগের কামপুরক ও
 কল্পতরু ; হে লোকগুরো ! আপনাকে
 নমস্কার করি। আপনি আমাকে সহস্র বাহু
 দিয়াছেন, এই সকল আমার সাতিশয় ভাবের

কারণ হয়। আমি আপনা ব্যতীত জিলো-
 কের মধ্যে আমার যোগ্য প্রতিধোন্ধা
 দেখিতে পাই না। কণ্ঠে নিবন্ধন ভারভূত
 বাহু সকল দ্বারা পর্বত নিকর চূর্ণ করিতে
 করিতে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত দিক্‌হন্তীদিগের
 নিকট গমন করি, কিন্তু তাহারাও ভয় পাইয়া
 পলায়ন করে।”

শ্রীমদ্ভাগবতে এই অমিতভোজা বাণের
 বংশ পরিচয় এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে।
 প্রজাপতি দক্ষ স্বীয় ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপকে
 দান করেন। কশ্যপের ঔরসে দিতি-গর্ভে
 দৈত্যকুলের উৎপত্তি। আদি দৈত্য হির-
 গ্যাঙ্ক ও হিরণ্যকশিপু যমজ জন্ম গ্রহণ
 করেন।

হিরণ্যকশিপু

পুত্র প্রহ্লাদ

তৎপুত্র বিরোচন

তৎপুত্র বলি

বলির শতপুত্র—জ্যেষ্ঠ বাণ।

যে হৃদ্বর্ষ কুলের দমন হেতু ভগবান্ বিষ্ণুকে ক্রমাশয়ে বরাহ, নৃসিংহ ও বার্মন মূর্তি পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল, বীৰ্য্যবান্ বাণ সেই মহৎ কুলের উপযুক্ত বংশধর। ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্যে সুপরিচিত “হরিহরের যুদ্ধ” দৈত্যকুলপতি বাণের দর্পনাশের জন্তই সংঘটিত হইয়াছিল।

বাণরাজ-কন্যা ‘চাক্রদর্শনা’ উষা অনিন্দ্য-সুন্দরী। যৌবন সমাগমে তিনি দ্বারকাবিপতি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র প্রহ্লাদনন্দন অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া তৎপ্রতি অমুরাগিণী হন। বাণরাজার প্রধান অমাত্য কুম্ভাস্তের তনয়া চিত্রলেখা উষার সহচরী ছিলেন। উষার মনোগত ভাব জ্ঞাত হইয়া তিনি তাঁহার প্রিয়জনের সহিত মিলন সংঘটনে যত্নবতী হন। ‘উষা ‘কামিনী মনোমোহন’ অনিরুদ্ধের পরিচয় জ্ঞাত ছিলেন না। এইজন্ত চিত্রলেখা দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ, দৈত্য, বিছা-ধর, যক্ষ ও মনুষ্যদিগের মধ্যে যত সুপুরুষ ছিলেন, সকলের অবিকল চিত্র অঙ্কিত করিয়া উষাকে দেখাইতে লাগিলেন। অনিরুদ্ধের চিত্রদর্শন করিয়া রাজপুত্রী লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া ঈষৎ হান্তসহকারে কহিলেন “এই তিনি।” অতঃপর মায়্যাবিনী চিত্রলেখা পর্য্যঙ্কোপরি সুযুগ্ম অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়া উষার গৃহে আনয়ন করিলেন। অনিরুদ্ধ গান্ধর্ব্ব বিধানে উষার পাণিগ্রহণ করিয়া উষার আবাসে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনিরুদ্ধ কেবল ‘কামিনী-মনোমোহন’ ছিলেন না। গান্ধর্ব্ব বিবাহের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইলে পর দৈত্যকুলপতি বাণ বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে অনিরুদ্ধকে ধৃত করিতে আগমন করিলেন। “সেই সমস্ত সৈন্য তাঁহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া চতুর্দিকে দণ্ডায়-

মান হইলে পর যেমন শূকর-মূখ-পতি কুকুর-দিগকে সংহার করে, বীর অনিরুদ্ধ, সেইরূপ, তাহাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। হনন কার্য্য আরম্ভ হইলে পর সকলে ভয়শিরাঃ, ভয়োক বা ভয়-বাহু হইয়া জ্বলন হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। তখন বলবান্ বলিনন্দন কুপিত হইয়া আপন সৈন্তের সংহারকারী অনিরুদ্ধকে নাগপাণ দ্বারা বন্ধন করিলেন।”

নারদমুখে অনিরুদ্ধের বন্ধন ও যুদ্ধ-বিবরণ পাইয়া কৃষ্ণ-দৈবত ব্যুৎপত্তি বাণরাজ-ধানী শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন। বাণ শঙ্করের পরম ভক্ত। তাঁহার রক্ষার নিমিত্ত ভগবান্ রুদ্র—পুত্র ও প্রমথগণ সঙ্গে লইয়া রামকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই মহাবুদ্ধে নাহেখর ও বৈষ্ণব জরের সৃষ্টি ও উভয়ের তুল্য সংগ্রাম হইল। নাহেখর জরের পরাভবের পর শ্রীহরি বীৰ্য্যবান্ বাণের চারিটা ভিন্ন সমস্ত বাহুই ছেদন করিলেন এবং শঙ্করোপদেশে বাণ শ্রীহরির শূরণাপন্ন হইলেন।

এইটী শ্রীমদ্ভাগবতের প্রস্তাব। এতদ্ভা-তীত বহু পুরাণ ও উপপুরাণে এই আখ্যা-য়িকাটী পরিকীর্তিত হইয়াছে। ভগবদ্গুণ-বর্ণনার অক্ষয় উৎস স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াই যে এই উপাখ্যানটী সুপরি-চিত হইয়াছে, এমন নহে। বীৰ্য্যবান্ বাণ-জরের দমন, হরি কর্তৃক হরের পরাজয়, ও শ্রীকৃষ্ণের বংশ বিস্তার, এই কয়টা অমুরো-ণীয় কারণের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ লীলার সমস্ত পুরাণেতিহাসে প্রায়ই এই বৃত্তান্ত পরিত্যক্ত হয় নাই। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগ-বতে বাণ, উষা ও অনিরুদ্ধের যেরূপ চরিত্রোৎ-কর্ষ লক্ষিত হয়, অত্র সে রূপ হয় নাই। এই

হেঁতু আমরা শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই গল্পাংশ আহরণ করিলাম। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এই গল্পটা বহুল বিস্তৃত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে হর-পার্বতী ও অশ্বিনকুমারের এত অধিক প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে যে, বাণ, উষা ও অনিরুদ্ধ তাঁহাদের হস্তের ক্রীড়নক স্বরূপই প্রতীত হন। শিব ও শিবানীর ক্রীড়া কোতুক দৃষ্টে উষা লালাসাবতী হওয়ার শিবানী স্বপ্নযোগে উষাকে, অনিরুদ্ধ দর্শন করাইতেছেন এবং অনিরুদ্ধের আদর্শনে ব্যথিতা উষা আহার নিদ্ৰা ত্যাগ করিলে পর সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দৈত্যবর বাণ শঙ্করের পদতলে নিপতিত ও মূচ্ছিত প্রায় হইয়া রোদন করিতেছেন। উদ্ধ-র্শনে শঙ্কর, শঙ্করী, কান্তিকের ও গণেশ্বর হস্ত করিতেছেন। গণেশ্বর বাণের প্রবোধার্থ বলিতেছেন :—

স্বপ্নে কৃষা স্বয়ং দেবী মন্তঃ কৃষাস্থায়জ্ঞং।

অধুনা বাম পার্শ্বে চ শঙ্কোত্তিষ্ঠতি মুকবৎ ॥

অর্থাৎ আমার জননীই স্বপ্নে স্বয়ং কৃষাস্থায়জ্ঞকে উদ্ভূত করিয়াছেন, আর এখন পিতার বাম-পার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, যেন কিছুই জানেন না !! এই পুরাণে উষা ও অনিরুদ্ধের সুদীর্ঘ রূপবর্ণনা সবে ও তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগ-বতের ভ্রাতা ‘চাক্ষুর্দর্শনা’ ও ‘কামিনী মনো-মোহন’ বলিয়া প্রতীয়মান হন না। বৃহদ্রথ পুরাণে অনিরুদ্ধ অশ্বিনকুমারের সহিত অভেদ-রূপেই উল্লিখিত হইয়াছেন। যথা :—

সকর্ষণো বাসুদেব ইতি ভাগবতেনহ।

ভাগবতেন পূর্ণত ব্রহ্মণোহর্কঃ প্রকথ্যতে ॥

প্রহ্মাশ্চানিরুদ্ধশ্চ কলৌ ভাগবতেনহ।

কালিকা পুরাণে অশ্বিনকুমার প্রাধান্য নাই। কিন্তু এই গ্রন্থেও শোণিতপুরাণগতি বাণের উল্লেখ আছে। তিনি এই পুরাণে রাজধর্মবিৎ, মিত্র ও সহপদেষ্টারূপে পরি-

কীর্ণিত হইয়াছেন। মহাত্মারতের অঙ্গীকৃত হরিবংশে অশ্বিনকুমার প্রাণীপ অনিরুদ্ধের কাহি-নীর অনুরোধে যে উষা এবং বাণরাজার ইতি-বৃত্ত ও থাকিবে, ইহা উল্লেখ করা বাহ্যল্যমাত্র। ফলতঃ বিভিন্ন পুরাণেতিহাসে বর্ণিত, বিভিন্ন বর্ণে প্রতিকলিত বাণ, উষা ও অনিরুদ্ধের চরিত্র একত্র আলোচনা করিলে এক অতি সুদীর্ঘ ও সুখপাঠ্য প্রবন্ধ রচিত হইতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবত ও পুরাণগুলির বিবিধ ভাষা গ্রন্থ গুলিতেও বাণ, উষা ও অনিরুদ্ধের প্রাধান্য কম নহে। এমন কি, এই উপাখ্যান অবলম্বনে সুদীর্ঘ কাব্যগ্রন্থ পর্য্যন্ত বিরচিত হইয়াছে।* তদ্ব্যতীত অতিপূর্বে কামরূপ-নিবাসী পণ্ডিত চন্দ্রভারতী কৃত ‘কুমার হরণ’ ও আধুনিক কালে শ্রীহট্ট-নিবাসী কবির রামকুমার নন্দী প্রণীত ‘উষোদাহকাব্য’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীমদ্ভাগবত বা পুরাণ-কথিত স্বল্প সংখ্যক উপাখ্যানই স্বতন্ত্র কাব্য-কারে পরিকীর্ণিত হইয়া গৌরবান্বিত হই-য়াছে। প্রসঙ্গক্রমেও এই বৃত্তান্তটা সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত বহুল উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের ‘বিশ্বাস্থলরে’ এই দুইটা পদ দেখিতে পাওয়া যায় :—

“এইরূপে অনিরুদ্ধ উষা হরেছিল।

তাঁহারে বাঁধিয়া বাণ বিপাকে পড়িল ॥”

কবিকুলচূড়ামণি মধুসূদন দত্ত—

“দানবনন্দিনী উষা নমে তব পদে
বহুবর।”

এইরূপে, এক উষা পত্রিকা রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অমর কর্ণপর্শে উষা-পত্রিকা সমাপ্ত হইলে উষা যে বীরাজনারায়ণ মধ্যে উৎকৃষ্ট স্থানলাভের যোগ্য হইত, এরূপ অস্বপ্ন করিবার কারণ আছে। উষার—

* ‘বাণ-পরাজয়’ গীতাভিনয় দ্বারাও অনেক পুস্তক বাণ-রাজার কাহিনী সুগঠিত হইয়াছে।

চরিত্রের আলোচনা প্রদেয়ে আমরা তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব ।

বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন কাব্যরসজ ব্যক্তিদের দ্বারা বহুল বর্ণিত হইয়া উবা ও অনিরুদ্ধ-দ্ব্যতীত বৃত্তান্তটী নানা রসের আধারস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে । যে সকল ঐতিহাসিক-তথ্যমুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ভাষার অভ্যন্তর দিয়া বিভিন্ন কালের রুচি, রীতি, নীতি, সভ্যতা ও সামাজিক প্রথাদির নির্দেশ করিতে সমুৎসুক, তাঁহারা এই প্রসঙ্গটী অবলম্বন করিলে উদ্দেশ্যসিদ্ধির অল্প পুঞ্জীকৃত উপাদান প্রাপ্ত হইবেন । পূর্বকালে মন্ত্র তন্ত্র ও অমাহুদী মায়ার অল্প কামরূপভূমি প্রসিদ্ধ ছিল । চিত্রলেখা কর্তৃক মায়াবলে অনিরুদ্ধ হরণ বর্ণনার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া কামরূপ-নিবাসী চন্দ্রভারতি মায়াবিনী চিত্রলেখার নানা অভূত রূপ ধারণ বর্ণন করিয়াছেন । ভাদ্রমাসে, অর্দ্ধনিশীথে, চন্দ্রগ্রহণকালে আকাশে উড্ডীয়মান খঞ্জরীট পক্ষী একটা বাঁটিয়া তদ্বারা বটিকা প্রস্তুতকরতঃ কপালে ফোঁটা দিয়া চিত্রলেখা কৃষ্ণ ভ্রমরী দেহ ধারণ করিয়াছিল ও দুর্গম দ্বারকার প্রবেশ পূর্বক পূর্ব প্রস্তুত উপাদানে অনিরুদ্ধের কপালে একটা ফোঁটা দিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণভ্রমরে পরিণত করিয়াছিল । ভ্রমরী ভ্রমরকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া উবার গৃহে লইয়া আসিয়াছিল । ইহারই নাম “হরণলুকী” মায় । শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের ভাষা-গ্রন্থ-প্রণেতা কামরূপ-নিবাসী পণ্ডিত অনন্ত কন্দলিও এই ‘হরণলুকী’ মায়ার বর্ণন করিয়াছেন । শ্রীমদ্ভাগবতের অন্ত্যস্ত ভাষাগ্রন্থে কোথাও এই বিষয়ের উল্লেখ নাই । ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ভাষা গ্রন্থ-রচয়িতা কালীকিশোর বিজ্ঞানভূষণ সম্ভবতঃ শাস্ত ছিলেন । তিনি হরি কর্তৃক হরের, ধরাজয় নীরবে সহ

করেন নাই । বাদবসন্ত সহ শ্রীহরি যখন বিরূপাক্ষ-রক্ষিত বাণাসুরকে আক্রমণ করিলেন, তখন কবি অনিরুদ্ধের মুখে ভগবতীর এক সুদীর্ঘ স্তব নির্গত করাইয়া তাঁহার সহায়তার ডাকিনী যোগিনীসহ মহাশক্তিকে প্রেরণ করিয়া দিলেন । অনিরুদ্ধের বিজয়লাভে হরিহরের উপর মহাশক্তির প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইল ! দুঃখের বিষয়, ভাষা গ্রন্থগুলিতে উবার গৃহে অনিরুদ্ধের পঞ্চাশ ব্যঞ্জনসহ অন্ন, তোজন — অপহৃত অনিরুদ্ধের জন্ত, পুত্রশোকাভূত বঙ্গরমণীকুলের স্নায়, বাদববধুদিগের বিলাপ — স্বপ্নাস্তে অনিরুদ্ধের অদর্শনে উবার বিরহিনী কামিনীর স্নায় খেদোক্তি প্রভৃতির অবতারণার বৈরূপ কাব্যরসের উপভোগ হয়, শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত বাণ, উবা ও অনিরুদ্ধ চরিত্রের মুণ্ডপাত দর্শন করিয়া । তেমনি মনঃ-ক্লম্ব হইতে হয় । যে বীৰ্য্যবান বাণ জিহুবনে তাঁহার প্রতিবোদ্ধা দেবিতে না পাইয়া — সূর্য্যবর্ণ কিরীটের দ্বারা গিরিশের পদাম্বুজ স্পর্শ পূর্বক আহুতস্বতাবের পূর্ণতাভ্যন্তু তাঁহাকেই যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়াছিল — ইনবীৰ্য্য বাঙ্গালী কালীকিশোরের হাতে পড়িয়া সেই তেজোগর্জিত অসুরপ্রধান বাণ, স্বকুলের অবমাননাকারীর বিরুদ্ধে নালিশ করিতে কৈলাস শিখরাভিমুখে ধাবমান ! যে উবা অনিরুদ্ধকে বিবাহিতা যজ্ঞপত্নী সা চ পুণ্যবতীসতী ।

নিশ্চলা সততং সাধ্যা রত্নিনী সন্নিবী সদা ॥
বলিয়া বিবাহার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন ; এবং যে অনিরুদ্ধ স্বল্পযোগে চারুদর্শনা উবার প্রেমার্থিনী-সুঁতি সন্দর্শন করিয়াও —

অহং ক্লম্বস্ত পৌত্রশ্চ কামদেবাস্বজঃ স্বয়ং ।
কথং গৃহামিত্যাকান্তে তরোরহুমতিং বিনা ॥
বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, পণ্ডিত চন্দ্রভারতির হস্তে পড়িয়া তাঁহারা এরূপ কামাতুর

ও কামতুরার তার চিত্রিত হইয়াছেন যে, তাহার উল্লেখ করিতেও লক্ষ্যবোধ হয়। কবির রাক্ষুসার নন্দীর ‘উবোবাহ কাব্য’ আধুনিক রচনামত। কিন্তু তাঁহার উষা, শিক্ষিতা স্নকতা, স্তব্যা পদবাচ্য হইলেও তাঁহাকে ব্রতচারিণী, পার্বতী-পূজানিরতা ও পরম নিষ্ঠাবতী হিন্দুসম্প্রদায়ের ভাবনা দেরিরা কিঞ্চিৎ কোভ থাকিয়া যায়। আর মনে হয়, তাঁহার উষা সেই কালের সেই উষা নহে। এই সম্বন্ধে মহারাষ্ট্র-দেশ-প্রচলিত বথরে (গ্রাম্য কবিতার) উষার চরিতোৎকর্ষ লক্ষিত হইয়া থাকে। নিষ্ঠাবতী স্বধর্ম-নিরতা রাজ্ঞী অহল্যাবাই বাণরাজনন্দিনী উষার -তার ধর্মশীলা বলিয়া একটি বথরে বর্ণিত হইয়াছেন। প্রাচীন কালে লিখিত উষার বৃত্তান্ত সমষ্টি হইতে উষা ইষ্টদেবী পার্বতীর পূজন-শীলা কুমারী, প্রেরিকা যুবতী, সাধনী ভার্ঘ্যা ও পতিকুল এবং পিতৃকুল, এই উভয়েরই উজ্জল-কারিণী বলিয়া প্রতীতি হন। চিত্র-দর্শন দ্বারা উষার পতি নির্বাচন সমগ্র পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্যে একটি অতুলনীয় ঘটনা। উষা একবার মাত্র ভাবী পতির দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই কারিণী-মনোমোহনরূপ চকিতের ন্যায় একবার মাত্র দেখিয়াই তাহার স্নগড়ীর প্রেমোৎফুল্ল হৃদয়ে এরূপ দৃঢ় প্রেমিত হইয়া গিয়াছিল যে, সহস্র সুপুরুষ দেখিয়াও তাঁহার অণুমাত্র চিত্ত-বিকার জন্মে নাই। ইহা কি সতীর চূড়ান্ত লক্ষণ নহে? মহর্ষি বেদব্যাস, মহাভারতের প্রধান নায়িকা পঞ্চ পাণ্ডব-পত্নী দ্রৌপদী ও একদা মনে মনে কর্ণের প্রতি অভিলাষিণী হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উষার চরিত্রে সতী রমণীর যে আদর্শ

প্রতিকলিত হইয়াছে, বিষয় পরীক্ষাক্ষেত্রে তাহা অনস্বয় রহিয়াছিল। এই বিশেষণটি সামান্য নহে।

অধুনা জনসাধারণের মধ্যে অধিকতর জ্ঞানবিস্তার হেতু ভারতের পূর্ব গৌরব কথার সমধিক আলোচনা হইতেছে। পুরাণ-ভিহাসে, উল্লিখিত স্থানের নির্দেশ ও ব্যক্তি-দিগের আবির্ভাব কাল প্রভৃতির নিরূপণ দ্বারা পূর্ব ইতিহাস সম্বলনের চেষ্টা হইতেছে। বাণরাজা এবং তাঁহার রাজধানী শোণিতপুর সম্বন্ধেও নানা আন্দোলন আলোচনা হইয়াছে।

আমরা নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক বিবরণীতে উষা ও অনিরুদ্ধ এবং বাণরাজধানী শোণিতপুরের উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি।

১। সার উইলিয়ম হর্টের সংলিখিত দরজা জিলার বিবরণী। ২। শ্রীযুক্ত বি, সি, এলেন আই-সি-এস মহোদয় কর্তৃক সম্পাদিত আসাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটের। ৩। শ্রীযুক্ত ই, এ গেইট সি-আই-ই মহোদয় লিখিত আসামের ইতিহাস। এতদ্ব্যতীত এসিয়াটিক সোসাইটির জর্জাল, ইণ্ডিয়ান রিভিউ প্রভৃতি পত্রে এতৎ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখিত হইয়াছে। কটন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম্-এ মহোদয় “Notes on the archeological remains of Tezpur” শীর্ষক যে সুলিখিত প্রবন্ধ গবর্ণমেন্টের নিকট প্রেরণ করিয়া আসামের বিভিন্ন স্থানে প্রক্ষিপ্ত নান্য কীর্তিচিহ্নগুলি একত্র সংরক্ষণের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতেও এই বিষয়ের সমুচিত উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত বত্বর অসুসন্ধান হইয়াছে, তদ্বারা ইহাই প্রতীত হয় যে, বর্তমান তেজপুরই বাণরাজ্য-শাসিত শোণিতপুর।

এই সময়ে স্থানীয় অসুস্থতায় বাগী নির-
শিথিত বিবরণগুলি সংগ্রহ করা যায় ।

১। তেজপুরের যে স্থানে বর্তমান
কাছারী গৃহ নির্মিত হইয়াছে,—প্রবাদ ঐ
স্থানেই উবার আবাসগৃহ ছিল ।

২। তেজপুর হইতে প্রায় ৩ মাইল
দূরবর্তী দেউরী গ্রামের সন্নিকটে, পরস্পর
সংলগ্ন সাতটা পুকুরিণীর চিহ্ন অত্যাশি বর্তমান
আছে; প্রবাদ, উবার স্নানার্থ ঐগুলি খোদিত
হইয়াছিল ।

৩। তেজপুর হইতে প্রায় দুই মাইল
দূরবর্তী ঔণ্ডি নামক একটি পাহাড়ের
শৃঙ্গে উবার তাঁতশালা ছিল, প্রবাদ অধুনা
তাহা ভূগর্ভে প্রোথিত আছে ।

৪। তেজপুর হইতে প্রায় আড়াই মাইল
দূরে কশিপু নারী একটি ক্ষুদ্র নদী আছে ।
কখন কখন তীর্থ-যাত্রিগণ উহার পক্ষিল জলে
স্নানার্থ আগমন করেন, প্রবাদ বাণরাজ্যার
বাহ ছেদিত হইলে পর রক্তশ্রোত-প্রবাহে এই
নদীর সৃষ্টি হইয়াছিল ।

৫। তেজপুর হইতে ৩ মাইল দূরবর্তী
বরালীমারা গ্রামের সন্নিকটে একটি বৃহৎ অক্ষ
পুকুরিণী বাণরাজ মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের নামে
পরিচিত ।

৬। তেজপুর হইতে অনতিদূরে পর্বতীয়া
গ্রামের সন্নিকটে একটি বৃহৎ মাঠ বাণযুদ্ধের
স্থল বলিয়া নির্দেশিত হয় ।

৭। তেজপুর হইতে ১২০ মাইল দূরবর্তী
ভালুকপাম নামক স্থানে কতকগুলি অট্ট-
লিকার ভগ্নাবশেষ বাণরাজ্যার আবাসস্থল
বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ।

৮। তেজপুরের উপকণ্ঠস্থ 'মহাভৈরব'
নামক শিব উবারই প্রতিষ্ঠিত, কেহ কেহ
এইরূপ বলিয়া থাকে ।

৯। তেজপুরের সমীপবর্তী ভৈরবী দক্ষিণ
সম্মুখেও এরূপ উক্ত হইয়া থাকে ।

১০। কথিত আছে বাণ, তেজপুর হইতে
৩ মাইল দূরে ভমরাগুরির সন্নিকটে এক
কাশী স্থাপনের প্রয়াস করেন, কিন্তু অকৃত-
কার্য হন । কতিপয় শিক্ষিত লোক ধাতীত
অস্ত্রের নিকট এই বিষয় কিছু জানা যায় না ।

১১। ভমরাগুরির সন্নিকটে একটি ও
ধেমুথনা পাহাড়ে একটি রক্তপদচিহ্ন আছে ।
উভয়ের মধ্যে ব্যবধান প্রায় ৫ মাইল । জনৈক
শিক্ষিত ব্যক্তি বলেন বাণযুদ্ধে ওপর্বান রক্ত
এই দুই স্থানে দুই পদ রক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান
হইয়াছিল ।

বাস্তবিক তেজপুর বাণরাজ্য ও তদীয়
কন্যা উষা সম্বন্ধীয় প্রবাদে এরূপ পরিপূর্ণ যে,
এ সমস্তই অলৌকিক এরূপ মনে করা দুঃসাধ্য ।
এই সম্বন্ধে একটি গল্প বলা অপ্রাসঙ্গিক
হইবে না । তেজপুর-নিবাসী জনৈক বন্ধু
বলেন, তাঁহার কোনও বাঙ্গালী বন্ধু একদা
তেজপুর সহরময় হোলা অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রোভি-
মুখ নিম্নতল বক্রগতি ভূখণ্ড সকল দেখিয়া
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, ঐ গুলি কি
প্রকারে হইল ? বন্ধুবরকে উত্তর দানে অস-
মর্থ দেখিয়া তাঁহার বাঙ্গালী বন্ধুটী সহাস্তে
বলিলেন, এই সামান্য কথাটা আপনি বলিতে
পারিলেন না ! বাণযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চর্যই
গরুড়ে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিলেন ;
যুদ্ধকৌড়া আরম্ভ হইলে পর, পক্ষিরাজ গরুড়
নিশ্চর্যই স্তূতিক্রম নথরদ্বারা ক্ষিতিল বিদীর্ণ
করিতে আরম্ভ করেন, তদ্বারাই এই সকল
"হোলার" সৃষ্টি হইয়াছে । উবার আবাস গৃহ,
জ্ঞানের পুকুরিণী এবং তাঁতশালা প্রভৃতি
যে রূপ পরস্পর বহু ব্যবধানে প্রদর্শিত হয়,
তদ্বারা গরুড়ের নথরোৎপাতে হোলায় সৃষ্টি

ভার, ইহারাও কোনও কল্পনাশ্রিত ব্যক্তির দ্বারা উবার নামের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ অসম্ভব কল্পা খাইতে পারে; কিন্তু ইহাও বিবেচ্য যে, ঐগুলি উষা কর্তৃক নিত্য ব্যবহৃত হইত, এরূপ কথিত হয় না, বরং বিভিন্ন সময়ে ঐগুলি বিভিন্ন কার্যোপলক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এইরূপই জনশ্রবাদ। বাণ-কর্তৃক স্বীয় রাজধানী হইতে বহু দূরে কণ্যার আবাসবাটী নির্মাণ, এইটীও পূর্বকালীন রাজপদ্ধতির বিরোধী নহে।

দিনাজপুরের অন্তর্গত নিতপুরেও বাণ ও তদীয় কস্তা উষা সম্বন্ধে এবিধ জনশ্রবাদ প্রচলিত আছে। তাহা অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বপ্রণীত “রাজা সীতারাম রায়” নামক গ্রন্থ মধ্যে লিখিয়াছেন “বিরূপাক্ষ শিবের উপাসক বীর্ষ্যবান বাণ দিনাজপুরে রাজত্ব করিতেন। তদীয় কুমারী উষা যদুবংশীয় অগ্নিকঙ্কের প্রেমা-কাঙ্ক্ষণী হইয়া গোপনে তাঁহার গলে বরমালা অর্পণ করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে প্রবল যদুকুলের সহিত বাণের যে যুদ্ধ হয় এবং বিজয় ও শিব-জয়ের প্রাচুর্ভাবের পর যে সন্ধি হয়, তাহা বাণ ও ভৈরব পক্ষে অস্বাভাবিক নহে।” অথচ এই অংশের টীকাতে তিনি উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে লিখিয়াছেন :— “অনেকে বলেন, দিনাজপুরের মধ্যে নিতপুরই—বাণের রাজধানী কল্পিতপুর। আসামী ভাষায় তেজ অর্থ শোণিত। তেজপুরই শোণিতপুর। তেজপুরে উবার বাড়ী, বাণের গুরুর প্রভৃতি স্থান আছে। তেজপুরে অট্টালিকায় ভগ্নাবশেষ অনেক বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর আছে। দিনাজপুরের নিতপুরেও বিরূপাক্ষ শিব ও তেজপুরেও এক শিবমন্দির আছে। উবার বিবাহের ধরণটিও কিছু আসাম

দেশীর। ইহাতে অসম্ভব নয়, আসামের তেজপুর হইতে দিনাজপুরের নিতপুর পর্য্যন্ত বাণের রাজ্য বিস্তৃত ছিল।”

দিনাজপুরের নিতপুরে বাণ ও উষা সম্বন্ধীয় লোকশ্রবাদ কতদূর প্রবল, তাহা আমরা বরং অনুসন্ধান করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হই নাই। ঐতিহাসিক বিবরণীতে এই পর্য্যন্ত যতটুকু লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তদ্বারা বিরূপাক্ষ শিবের অস্তিত্ব ভিন্ন দিনাজপুরের দাবী আর কোনও বিষয়েই সমধিক অগ্রগামী নহে। পুরাণে বাণকর্তৃক ‘বিরূপাক্ষ’ শিবের পূজার বিষয় উল্লিখিত আছে, ‘মহাভৈরব’ শিবের অর্চনার উল্লেখ নাই। কিন্তু “মহাভৈরব,” “বিরূপাক্ষ” প্রভৃতি শিবের নামান্তর যাত্র, এরূপ মনে করাও অযৌক্তিক নহে। তেজপুর হইতে দিনাজপুর পর্য্যন্ত, বাণের রাজ্য বিস্তৃত থাকা সম্ভবপর; কিন্তু বর্তমান তেজপুর অঞ্চলই যে প্রতাপশালী বাণের রাজধানী শোণিতপুর ছিল, এ বিষয়ে দ্বিধা হইতে পারে না।* এই অঞ্চলে স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে রাজা বাণ, কুমার অনিরুদ্ধ ও কুমারী উষা সম্বন্ধীয় প্রবাদ এরূপ বহু প্রচলিত যে, সাধারণ গৃহস্থেরাও স্ব স্ব কস্তাদিগকে উবার ভার গুণবতী দেখিতে অভিলাষ করিয়া থাকে। এমন কি, নিকটবর্তী পার্শ্ব জাতি—আঁকাদিগের রাজগণও আপনাদিগকে বাণ বংশোদ্ভব বলিয়া গৌরবান্বিত মনে করে। আঁকাদিগের এই দাবী

* তেজপুরের ডিপুটী কালেক্টর আসামের প্রত্নতত্ত্ব-পারদর্শী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বলেন যে, পূর্বে তেজপুরের নাম “শোণিতপুর” হইছিল। ইংরেজের আমলে কোল ও ডেপুটী কমিশনার দায়িত্বকে “আসামীর” করিবার নিমিত্ত শোণিতপুর, পরিশেষে ‘তেজ’ কবাইয়া বর্তমান “তেজপুর” নাম দিয়াছেন!!

কৃত দূর সঙ্গত, তাহা এখনও অহুসন্ধান সাপেক্ষ । ইহাদের মধ্যে লিপিমালায় প্রচলন নাই । সুতরাং এই সম্বন্ধে অহুসন্ধানের সাফল্যের সম্ভাবনাও কম । আকারা অনার্য্য—কিন্তু দিতি-সুত বাণ অসুর পদবাচ্য হইলেও অনার্য্য নহেন । অসুর অর্থে অুর-বিরোধী মাত্র বুঝায় । সুতরাং আকাদিগের এই দাবী স্বধীসমাজে গ্রহীত হইবে কিনা, সংশয়ের বিষয় । তাহাদের বর্তমান অসভ্যাবস্থাও তাহাদের এই দাবীর অস্বকূল নহে । পুরাণ-বর্ণিত বাণ 'রাজবংশ' যে ঈদৃশ অক্ষর-জ্ঞান-বর্জিত শিল্পকলা-রহিত অসভ্যাবস্থায় উপনীত হইয়াছে, এইরূপ অহুমান করিতে কষ্ট কল্পনার প্রয়োজন । বরং তেজপুর-বাসীদের মধ্যে বাণরাজ সম্বন্ধীয় কীর্ত্তি কাহিনী আবহমান কাল হইতে ঈদৃশ আগ্রহ

'সহকারে উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে যে, তদ্বারা সন্নিহিত পার্শ্বত্যা জাতি 'পর্য্যন্ত উদ্বোধিত হইয়াছে, 'এইরূপ' অহুমান করা সহজ-সাধ্য ।

আসাম প্রদেশ বর্তমানে বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে । কিন্তু এক সময়ে যে এই প্রদেশটী সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরুঢ় জনমণ্ডলীতে পূর্ণ ছিল, আসামের সর্বত্র তাহার নানা নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে । এই প্রাচীন ভূমি বাণ ও উবার আবাস ভূমি ছিল, এ কথা স্বরণ হইলে যে পূর্ব গোরবের আদর্শ স্মৃতিপথে সন্নিহিত হয়, তাহা ভারতের যে কোনও অংশের পূর্ব গোরব গাধার সহিত তুলনার অযোগ্য নহে ।

শ্রীউমেশচন্দ্র দে ।

জন্মভূমি ।

(১)

এই মম জন্মভূমি ! ভ্রাম্য, বরাকনা
সিদ্ধরশ্মি উন্মেষিণী, সত্যত শোভনী,
তরুরাগে বিশোভিত সিন্ধু চলদল
তমাল পনস নীপ বজ্রল নির্মল
পাতিয়াছে বকে যার, শান্ত সিন্ধুছায়া,
প্রগাঢ় প্রশস্তি তরে শীতলিতে কারা ।

(২)

এই মম জন্মভূমি ! সুবর্ণ সিংহা,
লক্ষীরূপে পদ্মনেত্রে বিচ্ছুরিত দয়া ;
নিখাসে প্রবাহে যার বসন্ত অনিল
বকে বহে কীর ধারা—প্রসন্ন সলিল ;
সুস্মরিত পিক কণ্ঠ—কুহরণ ছন্দ,
রেণুতরা পদ্মলোথ, কন্দ, মল্লিগন্ধ ;
মেঘবল পরিপ্লুতা বমতা-রূপিনী
বর্ষে সাত্ত বৎসলতা অতিভূ-গামিনী ।

(৩)

সবুগুণ বহে যার ধমনী ব্যাপিয়া, •
সেই দেবী জাগে ওই প্রীতি বিধারিয়া,
ববিষ্ঠা, বরেন্গা, সিন্ধা, বেদপরাধণা
মাস্থিক বর্ষিণী মাতা পছম আননা !
ঘ্যান যার, হিমালয় স্মৃতি ধরিয়া,
দৃঢ়ভাবে স্বর্ণস্পর্শী আছে দাঁড়াইয়া ।

(৪)

এ দেবতা জগতের কল্যাণদামিনী
সপত্নী সম্মান তরে দীপ্তি-বিধারিনী,
তামসী, রাজসী পূজা রক্ত উৎক্ষেপণ,
দন্তের উদ্রাস্ত গাথা, বীরত্ব গর্জন •
মা আমার নাহি চান । মা চান কেবল,
শান্তি, প্রীতি, দয়া, শ্রদ্ধা, নহে পত্নবল ;
উচ্ছ্বল নীতিভ্রষ্ট, রিপু-পদানত
ক্লিষ্ট কিন্তু সুপুচ্ছিতে করিতে আগ্রহ ।

(৫)

মা আমার করুণার দেবী মূর্তিমতী
আর্দ্রে দৈন্তে আশ্রিত্তে কররূপাগতী
শতপূর্ণ, নেত্ররম্য বিশাল প্রান্তর
স্বর্ণবীধি বক্ষে ধরি হাসে নিরন্তর ;
প্রীতিগর্ভা শৈবলিনী সৌম্য শৈলমালা
শম্পদীর্ণ তরুতল যেন শান্তি ঢালা
শ্রামল ক্রান্তার-কান্তি, আশ্বাদলবিত
কল বরকলিতে ভরা, পবন বেষ্টিত
সুনীল উল্লোচে জ্বাকুসুম শকাশ,
মহাছাতি অরুণের অপূর্ণ বিকাশ ;
অমঞ্জীর-পদা-কত্র উষা রূপসীর
অতি মুহু চলনের ক্ষরিত মন্দির
পান করি, গম্মরাগী বিদ্রাৎ কম্পনে
হাসিয়া ডাকিয়া লয় নব জাগরণে ।

(৬)

দ্বিরেক গুঞ্জন কল কাকলির তান,
কাণের ভিতরে যেন স্রুধা করে দান ।
শুধাংশুর অতি মুহু অতি মুহু কর
শ্রান্ত প্রাণে স্রুধাসিকি করে মনোহর ।
অনিদ্র প্রবণা তারা আকাশে বসিয়া
কান্তিময়ী দেবতায় দেখে নিরখিয়া,

এখন চারুতা ভরা জননী আমার,
মমতা কম্পিত বক্ষে প্রীতির পাখার
ফুটপ্রভা সান্বিতা চির সজীবনী
ছড়াইছে শক্তি-শ্রোত দিবস রজনী ।

(৭)

স্থাপিয়া হৃদয় মাঝে বিভব্যা মাগার
কে উহার, বিদ্বাজ্জিব পূজা তরে ধার,
কে উহার অসংখ্যমী নির্মল হৃদয়
তামসী পূজার ক্রিয়া করে অভিনয় ?
প্রচ্ছন্ন শিশুন ব্যাধ দেবী পূজা তরে
হোতু বেশে কেন ব'সে বেদীর উপরে ?
মায়েরে পুঞ্জিতে চাও, মুখ ভক্ত হয়ে
পরিহরি ঘেব, হিংসা, অর্থ্য হাতে ল'য়ে,
কাক্সালের বেশ ধরি, হও অগ্রসর,
ধর্ম্ম স্বজ্ঞে ভা'রে ভা'রে বাধ পরম্পর ।

(৮)

মা আমার স্বার্থ পণ্ড কুখির জেপিতা
ওই ভোগ্যে ওই কাম্যে হন পুলকিতা,
বিচারের তীক্ষ্ণ অসি নিষ্ক হস্তে ধরি,
একাবতে স্বার্থপণ্ড ছই খণ্ড করি,
মহোন্মাদে প্রিয়তম * উঠ গরজিয়া
শুচি হোমানল-চিত্তে উঠিবে জলিয়া ।
শ্রীবেণোদারীলাল গোস্বামী ।

অদ্বৈতবাদ ও ঋগ্বেদের দেবতা । (৩)

আমরা এই প্রবন্ধের বিগত সংখ্যায়
বেদান্তদর্শন হইতে দেবতাবর্ণের সম্বন্ধে ছইটি
সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলাম । ঋতিতে
সূর্য, আকাশ (ভোঃ), প্রাণ, অগ্নি প্রভৃতি
শব্দ দ্বারা ব্রহ্ম সত্তাই লক্ষিত হইয়াছেন,
ইহাই বেদান্তদর্শনের প্রথম সিদ্ধান্ত । কার্য-
বর্ণের স্বতন্ত্র, স্বাধীন কোন সত্তা নাই ;
কারণের সত্তাতেই উহাদের সত্তা । সুতরাং

বাহারা পরমার্থদর্শী তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, তাঁহাদের
চক্ষে সূর্য, আকাশ, অগ্নি প্রভৃতি কার্যাবর্ণ
কোন স্বাধীন পদার্থ বলিয়া অগ্রহৃত হইতে
পারে না । ঐ সকল পদার্থ দ্বারা তাঁহাদের
চিত্তে, তদ্ব্যবস্থার কারণ-সত্তাই অগ্রহৃত হইয়া
থাকে । ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত । আমরা
এই সিদ্ধান্তের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া

শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বোস ।

দেখাইরাহি যে, ঋগ্বেদে উল্লিখিত সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাও এক ব্রহ্মপদার্থই বিকাশ বা নাম ভেদ মাত্র; উহারা কোন স্বতন্ত্র, স্বাধীন জড় পদার্থ নহে। তারপর, বেদান্তের বিতীর সিদ্ধান্ত এই যে, যখন ঋতুর উল্লিখিত সূর্য্য, আকাশ, অগ্নি প্রভৃতিতে প্রচুররূপে “ব্রহ্মলিঙ্গ” বা ব্রহ্মেরই “পরিচায়ক” চিহ্ন রহিয়াছে, তখন ঐ শব্দগুলি কোন স্বাধীন জড় পদার্থকে বুঝাইতেছে না; উহাদের দ্বারা ব্রহ্মই লক্ষিত হইতেছেন। তখন আমরা দেখিব যে, বেদান্তের এই বিতীর সিদ্ধান্ত ঋগ্বেদের দেবতাবর্ণের উপবে প্রযুক্ত হইতে পারে কি না? যদি হয়, তাহা হইলে বেদান্তমতানুসারে ঋগ্বেদের দেবতাগুলি দ্বারা নিশ্চয়ই ব্রহ্মপদার্থই লক্ষিত হইবেন। এখন আমরা তাহাই দেখাইতে আগ্রহ করি হইব।

ঋগ্বেদে বহুগুলি ‘দেবতা’ উল্লিখিত হইয়াছেন, প্রত্যেক দেবতা সম্বন্ধেই প্রচুর সূক্ত আছে। এই সকল সূক্ত হইতে বহুচ্ছাক্রমে যেটা গ্রহণ করা যায়, তাহাতেই দেখা যায় যে, এই সূক্তে যে সকল বিশেষণ প্রদত্ত আছে, সেই বিশেষণগুলি কোন জড় পদার্থের উপবে প্রযুক্ত হইতে পারে না। বিশেষণগুলি ব্রহ্মেরই উচ্চভাব প্রকাশক। আমরা এই সংখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন দেবতা সম্বন্ধে কতকগুলি সূক্ত এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। এই সকল উদ্ধৃত সূক্তের নীচে সারনাট্যসম্মত ব্যাখ্যাও প্রদান করিতেছি। পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন যে, এই সকল সূক্তে যথেষ্ট পরিমাণে “ব্রহ্মলিঙ্গ” বা ব্রহ্মেরই পরিচায়ক চিহ্ন র্ত্তমান আছে। সুতরাং এই সকল দেবতা দ্বারা, দেবতাবর্ণের অমুগত বা অমুহ্যত ব্রহ্মপদার্থই প্রতিপাদিত হইতেছেন।

(১) “সোম” দেবতার বর্ণনে এইরূপ সূক্ত আছে :—

সমিধা ওষধীঃ সোম ! বিখাঃ,

সমপো অজনয়ৎসংগাঃ ।

স্নাততহোহর্কস্তরীক্ষং,

সং জ্যোতিষা নিতমো ববর্ধ ॥”

হে সোম দেবতা ! তোমা হইতেই এ বিশ্বের ওষধি সকল জন্মিয়াছে; তোমা হইতেই জল উৎপন্ন হইয়াছে এবং তুমিই মণ্ড্যদেহে ইন্দ্রির শক্তি ও বাহুজগতে কিরণ সকলকে সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি এই সুবিশাল অন্তরীক্ষকে বিস্তারিত করিয়া দিয়াছ, এবং তুমিই হে সোম ! সূর্য্য জ্যোতি দ্বারা বিপুল অন্ধকারমাশিকে আবরিত করিয়া রাখিয়াছ।

“সংহি বিশ্বতো মুখো বিশ্বতঃ পরিতুরসি ।

অপ নঃ শোভতদবন্ ॥”

হে সোম ! তুমি সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত রহিয়াছ। তুমি যে কেবল বিশ্ব-ব্যাপ্ত তাহা নহে, তুমি এই বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া—বিশ্বাতীত রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছ। আমাদের শারীরিক, বাচিক ও মানসিক পাপরাশিকে দূরীভূত কর।

“তবেমাঃ প্রজাঃ দিব্যাস্য রেতসঃ,

সংবিশ্বস্য ভুবনস্য রাজসি ।

ঋগ্বেদং বিশ্বং পরমানতে বশে,

সমিন্দো প্রথমোধামধা অসি ॥”

হে সোম ! তোমাতে যে দিব্য বীজ-শক্তি আছে, সেই বীজশক্তি হইতেই প্রজা সকল উৎপন্ন হইয়াছে। তুমিই এই পৃথিবী ভবনের সম্রাট। এই বিশ্ব সর্ব্বতোভাবে তোমারি অধীন—তোমারই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া এই বিশ্বের সমুদয় ক্রিয়া নির্বাহিত হইতেছে। তুমিই এ বিশ্বের আদি আশ্রয়-দাতা।

পাঠক দেখিবেন, এগুলি “ব্রহ্ম-লিঙ্গ”^{*} কি না ? এ সকল কথা কখনও জড় বস্তুতে প্রযুক্ত হইতে পারে না ।

(২) “বরুণ দেবতা” সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে :—

‘বনেষু বাস্তরীক্ষং ততান,
বাজমর্কং পয়ঃসিমান্বহ ।’

‘হংস ক্রতুং বরুণো অস্মু অয়িং,
দিবি স্বর্য্যমদধাৎ সোমমদ্রো ॥’

হে রাজা বরুণ ! তুমিই এ বন-রাজ্যের উর্দ্ধদেশে বিদ্যুত, বিপুল অন্তরীক্ষকে বিস্তারিত করিয়া রাখিয়াছ। দ্রুতগামী, বলবান অশ্ব সকলে তুমিই সামর্থ্য প্রদান করিয়াছ। তুমিই গাভী স্তনে ক্ষীর নিহিত করিয়াছ। মনুষ্য-হৃদয়ে বুদ্ধিবৃত্তি ও ক্রিয়া-প্রবৃত্তি তুমিই অর্পণ করিয়াছ। আকাশে সূর্য্যকে এবং জল মধ্যে তেজঃ-শক্তিকে, তুমিই স্থাপন করিয়াছ। পর্কতে সোম তোমা হইতেই উৎপন্ন হইতেছে ।

প্রিয় পাঠক ! উন্মাদ ব্যতীত, কে এই প্রকার বিশেষণ জড় বস্তুতে প্রয়োগ করিতে পারে ? ইহা ব্যতীত ব্রহ্মের পরিচায়ক চিহ্ন আর কি হইতে পারে ? পাঠক, আরও শুনুন :—

“অবুয়ে রাজা বরুণো বনস্য,

উর্দ্ধং স্তূপং দদতে পৃথদক্ষঃ ।

নীচীনাঃ সুরূপরি বৃধ এষাম্,

অস্মৈ অন্তনিহিতাঃ কেতবঃ স্ন্যঃ ॥”

অশেষ বলশালী রাজা বরুণ,—এই মূল-বৃত্তিতে অসীম আকাশের উর্দ্ধদেশে, সর্ব প্রকার তেজের সমষ্টি (স্তূপ) স্বরূপ সূর্য্যকে স্থাপন করিয়াছেন। সেই সূর্য্য হইতে বহির্গত হইয়া কিরণরাশি নিম্নদিকে অনবরত বিকীর্ণ হইতেছে। বাহিরে যাঁহা তেজঃ-শক্তিরূপে পরিচিত, তাহাই মানবদেহের

অভ্যন্তরে অর্ধরায়িরূপে, বুদ্ধিরূপে, প্রজ্ঞারূপে, নিম্নতঃ পরিণত হইতেছে ।

পাঠক, বাহিরে ও ভিতরে যে একই শক্তি ক্রিয়া করে, শক্তির এই একত্বের কথাও কি এই সূক্তে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয় নাই ? এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিত Herbert Spencer এর উক্তি শুনিবেন কি ?—

“How a force existing as motion, heat or light, can become a mode of consciousness—how it is possible for arial vibrations to generate the sensation we call sound,—these are mysteries which it is impossible to fathom.”

ঋগ্বেদ কি অসত্য কৃষকের গীতি ?

“অব তে হেলো বরুণ নমোতিঃ,

অব যজ্ঞেভিরীম হে হবির্ভিঃ ।

ক্ষয়ন্নস্বভানম্বর প্রচেতা,

রাজন্ এণাংসি শিশথঃ কৃতানি ॥”

হে রাজন্ ! হে বরুণ ! আমরা অজ্ঞানতা-বশতঃ তোমার যে নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছি, তজ্জন্ত নমস্কার দ্বারা, যজ্ঞদ্বারা, হবিঃদ্বারা, বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। হে বরুণ ! তুমি সর্বদা আমাদের অন্তরে বাস করিতেছ এবং আমাদের অন্তরে উদ্ভিত সমুদয় ভাবই পরিজ্ঞাত রহিয়াছ। হে সর্বজ্ঞ ! হে শক্তিমন্ ! আমাদের আচরিত পাপরাশিকে শিথিল করিয়া দাও ।

“বেদ মাসঃ ধৃতব্রতঃ দ্বাদশ প্রজাবতঃ ।

বেদ য উপজায়তে ॥”

হে বরুণ ! তুমিই জগতের যাবতীয় নিয়মের প্রভু। তোমার নিয়মে এ জগৎ পরিচালিত হইতেছে। তুমিই মাস, বৎসর, ঋতু প্রভৃতি কাল ও কালের সৃষ্টিবিদ্যার অর্চন্য সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত আছ। •যাহার এই কাল নিয়মে জন্মমরণগ্রহ করিতেছে, তাহাদের সকলের কথাই তুমি জ্ঞাত আছ ।

“ পাঠক ! এগুলি কি জড়ের উপরই প্রযুক্ত
স্বত্তি-গীতি ? জড়পদার্থ কি কাহাকেও
‘জানিতে’ পারে ?

(৩) “অগ্নিদেবতা” সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক
উদ্ধৃত হইতেছে :—

“অগ্নি রশ্মি জন্মনা জাতবেদাঃ,

স্বতঃ মে চক্ষুরমৃতং মে আসন ।

অর্ক স্তিধাতুঃ রজসো বিমানো,

জস্রো বর্ষোহবিরশ্মি নাম ॥”

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সায়নাচার্য্য যাহা
বলিয়াছেন, এস্থলে আমরা তাহার তাৎপর্য্য
উদ্ধৃত করিতেছি। এই শ্লোকে অগ্নি স্বয়ং
নিজের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া আত্মপরিচয়
দিয়াছেন। সূত্ররূপে অগ্নি কি পদার্থ,
তাহা বুঝিতে হইলে, এই শ্লোকটি অতীব
উপযোগী।

“এই বিশ্বের তাবৎ পদার্থ ছই ভাগে
বিভক্ত। এক, “অন্নাদঃ” অপর “অন্ন।”
(আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় অন্নাদ = Force
বা Motion এবং অন্ন = Matter)। অগ্নি
আপনার পরিচয় দিতে গিয়া, জগতে যে
তিনি ‘অন্ন’ ও ‘অন্নাদঃ’—এই উভয় রূপেই
অবস্থান করিতেছেন, তাহাই সুস্পষ্ট বলিয়া
দিতেছেন। অগ্নি বলিতেছেন—

হে মর্ত্যালোকবাসিগণ ! আমাকে অগ্নি
বলিয়া অবগত হও। আমার ছই রূপ।
‘একরূপে আমি অন্নাদ, আবার অন্তরূপে আমি
অন্ন। আমি অন্নাদ-রূপে, আপনাকে তিন
ভাগে বিভক্ত করিয়া, ভুলোকে অগ্নি নামে,
অন্তরীক্ষলোকে বায়ু নামে এবং দ্যুলোকে
সূর্য্য নামে জ্বলস্থান করিতেছি। অগ্নি, বায়ু
ও সূর্য্য—আমারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ভিন্ন
ভিন্ন নাম মাত্র জানিবে। আমি জগতে
প্রাচুর্য্য হইবা মাত্র, সকল তত্ত্ব জানিতে

‘পারিয়াছি। যত আমার অহভাসক। ‘আমি
স্বত-প্রক্ষেপে জলিয়া উঠি। স্বত—অগ্নেরই
রূপান্তর। আমি অগ্নের (Matter) আশ্রয়ে
অভিব্যক্ত হইয়া প্রকাশিত হই। আমার
আশ্রয়ে অমৃত বর্তমান আছে। অর্থাৎ, আমিই
অন্নাদ বা অগ্নের ভোক্তা; সূত্ররূপে আমি
ভোক্তারূপে অবস্থিত রহিয়াছি। আমি
প্রকাশ-স্বরূপ; আমার এই প্রকাশের
কদাপি ক্ষয় হয় না। আমি জীবহৃদয়ে
প্রাণরূপে অবস্থিত।”

প্রিয় পাঠক, ঋগ্বেদের অগ্নি কি জড়-
পদার্থ মাত্র ? এই মূল্যবান মন্ত্রটীতে যাহা
উক্ত হইয়াছে, তাহা কি অগস্ত্য বৈজ্ঞানিক
সত্য নহে ? ঋগ্বেদ কি আদিম অসভ্য-
মানবের অসত্যোচিত গ্রন্থ ?

“অগ্নিনেতা ভগ ইব ক্ষিতীনাং,

দৈবীনাং দেব ঋতপা ঋতাবা।

স বৃত্রহা সনয়ঃ বিশ্ববেদাঃ,

পর্বৎ বিশ্বাতি ছুরিতা গৃনস্তম্।”

পাঠক ! এই মন্ত্রটির বিশ্লেষণগুলিও
বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখুন :—

সূর্য্য-কিরণ যেমন ক্ষিতিতলস্থ যাবতীর
পদার্থের অন্তর্গামী ও নিয়ামক, অগ্নিও ঠিক
তদ্রূপ নিয়ামক। সূর্য্য, অগ্নিরই রূপান্তর
মাত্র। এই অগ্নিই (সূর্য্যরূপে) গ্রীষ্ম, বর্ষা
প্রভৃতি ঋতু সকলের প্রবর্তক। ইনি
“ঋতাবা”; অর্থাৎ ইহার নিয়ম অনুসরণবানী।
ইনি কেবলমাত্র বাহ্যজগতের নিয়ন্তা নহেন;
ইনি অন্তর্জগতেরও নিয়ন্তা,—ইনি পাপ-
হস্তা। ইনি সনাতন, ইনি অক্ষয়, অব্যয়।
ইনি বিশ্বের তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত আছেন।
ইনি উপাসকের চিত্তবৃত্তির মলিনতা ও কলুষ
রাশি অপনোদিত করুন।

প্রিয় পাঠক, আমরা এস্থলে একটি

অবাস্তব কথা বলিতে ইচ্ছা করি। সুপ্রাচীন ঋগ্বেদ যে স্বর্ষাকে ক্ষিতিলব্ধ বাবতীয় পদার্থের “নেত্র” বা নিয়ামক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, ইহারই ব্যাখ্যা স্বরূপ ইউরোপের বর্তমানকালের গর্ভিত বিজ্ঞান কি বলিয়াছেন, তাহা দেখুন :—

‘And while the decomposition effected by the plant is at the expense of certain forces emanating from the sun which are employed in overcoming the affinities of carbon and hydrogen for the oxygen united with them; the re-composition effected by animal is at the profit of these forces which are liberated during the combination.’ (First Principles, page 210).

ঋগ্বেদে নাকি উন্নত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নাই? পাঠক ইহার বিচার করিবেন।

অগ্নি সন্ধকে আরো, একটা মন্ত্র উদ্ধৃত করিব :—

“স ইৎতন্তং স বিজ্ঞানান্তি ওতুং,
স বক্তানি ঋতুখা বদাতি ।
য ইং চিকৈতং অমৃতশ্রোগোপা,
অবশচরন্ পরো অশ্রোণ পশুন্ ॥”

এই বিশ্ব-পট সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে। এই বিশ্ব-পটের স্রষ্ট্রের তত্ত্ব আমরা কেহই অবগত নহি। বস্ত্র দুই প্রকার স্রষ্ট্রের সজ্জা দ্বারা নির্মিত হইয়া থাকে। কতকগুলি স্রষ্ট্র ঈশ্বা দিকে এবং অপরগুলি প্রস্থের দিকে গ্রথিত করিলে, তবে বস্ত্র নির্মিত হয়। এই বিশ্ব-পটের কোন্ স্রষ্ট্রগুলি লম্বাদিকের এবং কোন্ গুলিই বা প্রস্থ-দিকের, তাহা মর্ত্য-লোকের কেহই জানে না। এই স্বপ্ন তত্ত্ব কেবল এক অগ্নিদেবই সম্যক অবগত আছেন। স্বপ্ন তত্ত্ব এবং স্থূল পঞ্চভূতই এই বিশ্ব-পটের স্রষ্ট্রস্থানীয়। কি কোশলে, স্বপ্ন ও স্থূল ভূতযোগে, এই সুবিস্তৃত বিশাল

বিশ্ব-পট বিনির্মিত হইয়াছে, তাহা অগ্নি-দেবতা সম্যকরূপে অবগত আছেন। যখন কালপ্রভাবে বৈদিকতত্ত্ব ধ্বংস হইয়া যায়; তখন আবার, পুনঃ-স্রষ্ট্রের প্রারম্ভে এই অগ্নিই, সেই বিনুগু বৈদিকতত্ত্ব সকলের পুনর্নির্মাণ করিয়া থাকেন। অগ্নি সকলের জ্ঞাতা, ইনি সর্বজ্ঞ। এবং ইনিই অমৃতকে রক্ষা করিতেছেন;—অর্থাৎ, অগ্নির মধ্যেই অবিনশী ব্রহ্মসত্তা অধুগত রহিয়াছে। ইনি যেমন স্বর্ষ্যরূপে বিশ্বের তাবৎ বস্তুর প্রকাশক, তেমনি ইনি এই বিশ্বের অতীত হইয়াও আপন মহিমায় নিত্য প্রকাশিত রহিয়াছেন।

প্রিয় পাঠক! এই অগ্নি কি কেবল ভৌতিক জড় অগ্নিমাত্র? এই বিশ্ব-বিভাসক, নিত্য, অমৃত, অগ্নিতেই বৈদিক ঋগ্বেদ যত-ধারা ঢালিয়া দিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। বেদান্তদর্শন যে “ব্রহ্ম-লিঙ্গের” কথা উত্থাপন করিয়াছেন, ঋগ্বেদের অগ্নির বিশেষণগুলি, আশ্চর্য্যরূপে, কেবল সেই ব্রহ্ম-বস্তুরই পরিচায়ক, ইহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি।

এখন আমরা “ইন্দ্রদেবতা” সন্ধকে দুই একটা মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াও, এই সিদ্ধান্ত সূদৃঢ় করিয়া লইব।

(৪) ইন্দ্রের পরিচয় এই প্রকার :—

ত্রিবিষ্টিধাতু প্রতিমানমোজসং,
ত্রিশো ভূমীর্নপতে ত্রীণিরোচনা ।
অতীদং বিশ্বং ভুবনং বিবক্ষিথ,
অশক্ররিম্ভ ! জম্বুবা সনাদসি ॥”

হে ইন্দ্র! তোমার শক্তির বীজভূত—
অগ্নি বায়ু জল প্রভৃতি পঞ্চভূত, সমগ্র বিশ্ব
উত্তম, মধ্যম ও নিকৃষ্টরূপে ব্যাপিয়া আছে।
এবং তুমি তোমার সামর্থ্যের অমূল্য
ভূগোল, অন্তরীক্ষলোক ও হ্যালোককে, অগ্নি,

নাথু ও সূর্য্য, এই তিন জ্যোতি দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছ। এই প্রকারেই হে ইন্দ্র ! তুমি এই বিশ্বকে বহন করিতেছ, কিন্তু এই বিশ্ব বহন করিয়াও, তদতিরিক্ত বিশ্বাতীত সামর্থ্য তোমার আছে। তুমি সনাতন, অবিনাশী কারণ-শক্তি হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া, বিশ্বের কার্য্য নিৰ্দ্ধার করিতেছ।

“প্রমাত্ৰাভঃ রিৱিচে রোচমানঃ,

প্রদেবেভিৱিশ্বতো অপ্রতীতঃ ।

অমজ্জুনা দিব ইন্দ্র ! পৃথিব্যাঃ,

প্রউরোমহো অন্তরীক্ষাং জজীষী ॥”

কোন মাত্রা বা পরিমাণ দ্বারা কদাপি পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। বিশ্বের কোন বস্তুই তোমার ইয়ত্তা বা পরিচ্ছেদ করিতে সমর্থ হয় না। তুমি সকল পরিচ্ছেদের অতিরিক্ত। ‘দেবলোক বা মর্ত্যলোকের কেহই তোমার সামর্থ্যেরও ইয়ত্তা করিতে পারে না। তুমি, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী হইতে আত্মসামর্থ্যে নিয়ত আতরিক্ত হইয়া, অবস্থান করিতেছ। ‘তোমার সামর্থ্য ও বল এই পরিমাণ,—কোন ব্যক্তিরই এপ্রকার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না।

“ধামনুতে বিশ্বং ভুবনমধিপ্রভং,

অন্তঃসমুদ্রে হৃদন্ত রায়ুৰি ।

অপামনীকে, সমিথে য আভূতঃ,

তমশ্চাম মধুমন্তং ত উশ্মিম্ ॥”

হে অগ্নিদেবতা ! এই নিখিল ভুবন তোমারই গৃহে বা আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছে। কোথায় কোথায় তোমার গৃহে অবস্থিত ? তুমি সমুদ্রে বড়বাগ্নিরূপে এবং অন্তরীক্ষে, বিদ্যুৎ বা সূর্য্যরূপে রহিয়াছ। প্রাণীবর্গের মধ্যে স্তম্ভরূপে ও জীবহৃদয়ে অগ্নিরূপে বা প্রাণশক্তিরূপে তুমি অবস্থান করিতেছ। ‘বারিদবন্দ্র মধ্যে তুমিই বিদ্যুৎ-

শক্তি। পরস্পর বিজিগীষু ব্যক্তিদিগের রণ-ভূমিতে তুমিই শৌর্য্য ও বিক্রম-বাহি রূপে প্রকাশিত হও। ‘কল্যাণময়ী’ তোমার উদ্ভি বা প্রবাহ। হে অগ্নে ! তোমার সেই মধুময় প্রবাহ আমাদিগকে সৰ্ব্বতোভাবে ব্যাপিয়া রাখুক।

প্রিয় পাঠক ! আর উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার বোধ হয় আবশ্যকতা নাই। এই সকল উদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা প্রচুর-রূপে ত্রক্ষের পরিচয় স্পষ্টক চিহ্ন বা বিশেষণ প্রাপ্ত হইতেছি। বেদান্তদর্শন এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অগ্নি, আকাশ, সূর্য্য প্রভৃতি কার্য্যবর্গে বহন “ব্রহ্মলিঙ্গ” আছে, তখন এই পদার্থ গুলি কোন জড়ীয় পদার্থ-বিশেষকে বুঝাইতে পারে না। এগুলির দ্বারা, এই সকলের মধ্যে অমুগত ব্রহ্ম-সত্তাই লক্ষিত হইতেছেন। আমরা ঋগ্বেদের অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র প্রভৃতির বর্ণনাতেও সেই “ব্রহ্মলিঙ্গ” প্রচুর পাইতেছি। স্তুরাং ঋগ্বেদের ইন্দ্র, সোমাদি শব্দ দ্বারা কোন জড়ীয় ভৌতিক পদার্থ বুঝিতে হইবে না ; এ সকল ব্রহ্ম-সত্তাকেই লক্ষ্য করিতেছে।

আমরা দেবতা সম্বন্ধে বেদান্ত-দর্শনের দুইটি সিদ্ধান্তের আলোচনা করিলাম এবং বেদান্ত যে চক্ষে ও যে অভিপ্রায়ে দেবতা-দিগকে দেখিয়াছেন, ঋগ্বেদের দেবতাবর্গকে ও সেই চক্ষে ও সেই অভিপ্রায়েই দেখিতে হইবে। এদেণে, বৈদিকযুগ হইতে দার্শনিক সময় পর্য্যন্ত, যে ভাবে দেবতাবর্গের স্বরূপের ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, আমরা বৈদেশিক সিদ্ধান্ত কেন গ্রহণ করিব ? কেনই বা দেবতাবর্গকে জড়ীয়-বস্তু বলিয়া, সিদ্ধান্ত করিব ?

যাহা হউক, আমরা ঋগ্বেদের দেবতা-

স্বরূপ-সম্বন্ধে বেদান্তদর্শনের দুইটি মাত্র
সিদ্ধান্ত দেখাইলাম। অতঃপর আমরা অল্প

প্রমাণগুলির যথাক্রমে উল্লেখ করিব। ক্রমশঃ
ত্রিকোণিকলেখর ভট্টাচার্য্য ।

গীতার অবতারবাদ ।

(ক) অবতারবাদের ঐতিহাসিকতা ।

গীতার মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে
গীতাত্ত্ব ধর্মের প্রবর্তন-কর্তা ভগবান্ শ্রী-
কৃষ্ণের মহত্ব প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন ।
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মহত্ব বুঝিতে হইলে অবতার-
বাদ সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত হওয়া উচিত,
কারণ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ অবতার বলিয়া
বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহাকে ঐরূপ অখ্যা
প্রদান করা হইয়াছে কেন, তাহা অবতার-
বাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে
পারিব।

অবতারবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার
পূর্বে উহার বিরুদ্ধে যে দুই একটি আপত্তি
উত্থাপিত করা হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা
উচিত। প্রথম আপত্তি খ্রীষ্টধর্মী-মিশনারিগণ
করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, অব-
তারবাদ পূর্বে হিন্দুধর্মে ছিল না। উহা
বিদেশ হইতে আমদানি করা হইয়াছে।
অবতারের কথা একমাত্র খ্রীষ্টধর্মেই আছে।
হিন্দুরা অবতারবাদ খ্রীষ্টানদিগের নিকট
হইতে পাইয়াছেন। এক মাত্র খ্রীষ্টই
অবতার ছিলেন, পৃথিবীতে পূর্বে আর কেহই
অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই।

অবতারবাদ যে অতি প্রাচীন বিষয়, তাহা
বলাই বাহুল্য মাত্র। এবং ঈশ্বরীশ্রীষ্ট যে
কিরূপ অবতার ছিলেন, তাহা পশ্চাৎ আলো-
চিত হইবে। অবতারের কথা আমরা বেদে
দেখিতে পাই। শতপথ-ব্রাহ্মণে মংস্ত,

কুর্খ ও বরাহ অবতারের কথা আছে। মংস্ত
অবতার সম্বন্ধে আমরা নিম্নলিখিত উপা-
খ্যানটি পাইয়া থাকি।

একদা বৈবস্বত মনু মান্নের জন্ত জলা-
শয়ের নিকট যাইলে, তিনি দেখিতে পাইলেন
যে, একটা অতি ক্ষুদ্র মংস্ত তাঁহার চতুর্দিকে
ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তিনি সেই মংস্তটিকে
ধরিয়া একটা পাত্রে রাখিয়া দিলেন। কিন্তু
উহা এমত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, উহা আর ঐ
পাত্রে ধরিল না। তিনি তখন সেই মংস্তটিকে
একটা বৃহৎ পাত্রে রাখিলেন, কিন্তু উহা
আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তখন তিনি উহা
এক নদীতে রাখিয়া দিলেন। কিন্তু যখন
উহা এমত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে আর নদীতে
ধরে না, তখন তিনি উহা সমুদ্রে রাখিতে বাধ্য
হইলেন। ঐ মংস্ত সমুদ্রের অপেক্ষা অধিক
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, উহা তখন মনুকে অবগত
করাইলেন যে, তিনি মংস্ত অবতার। শীঘ্রই
জলপ্লাবনে প্রলয় ঘটিবে, এইজন্ত তিনি
মনুকে তাঁহার পুত্রোপরি আশ্রয়গ্রহণ করিতে
বলিলেন। শতপথ-ব্রাহ্মণে আমরা এইরূপ
মংস্ত অবতারের কথা পাইয়া থাকি।

কুর্খ অবতার সম্বন্ধে আমরা উক্ত ব্রাহ্মণে
এইরূপ দেখিতে পাই। যথা,—“স যৎ কুর্খ-
নাম এতৎ বৈ রূপং কৃতা প্রজাপতিঃ প্রজা,
অনুজং।”

বরাহ অবতার সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে,
—“আপোবা হৃদমগ্রে সলিল আসীৎ। তস্মিন্

প্রজাপতি স ইমাং অপভ্রং । তাং বরাহ ভূত্বা
অবৎ ।”

বামন অবতার সন্ধিক্ষে উক্ত হইয়াছে যে,
—“তে (দেবাঃ) যজ্ঞমেব বিষ্ণুং পুরস্কৃত্য
ঈয়ুঃ । বামন হ বিষ্ণুরাস ।”

অনেকে হয়তো জিজ্ঞাসা করিতে পারেন
যে, কৃষ্ণ অবতারের কথা বেদে আছে কি না ?
ইহা উত্তরে বক্তব্য এই যে, বাসুদেব কৃষ্ণের
কথা তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম প্রপাঠকের
প্রথম অঙ্কবাক্যে দেখিতে পাওয়া যায় । যথা,
—“নারায়ণায় বিদ্বাহে, বাসুদেবায় ধীমহি
তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ ।”

বেদে আমরা অবতারের কথা পাইতেছি,
সুতরাং অবতারবাদ যে চার পাঁচ হাজার
বৎসরের পূর্বকার, তাহা অবগত হওয়া
যাইতেছে ।

অবতারের কথা ভারত সংহিতায় এবং
পুরাণগুলিতে বিশেষভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে ।
পূর্বের উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভারত-সংহিতায়
শ্রীকৃষ্ণ সন্ধিক্ষে আমরা নিম্নলিখিত শ্লোকটি
দেখিতে পাই । যথা,—

“যদা শ্রোষং কশ্চলো নাভিপন্নৈ
রথোপস্থে সীদমানৈহর্জুনৈ বৈ ।
কৃষ্ণং লোকং দর্শয়ানং শরীরে
তদানশংসে বিজয়ার সঞ্জয় ॥”

পূর্বে আমরা পুরাণের প্রাচীনতা সন্ধিক্ষে
আলোচনা করিয়াছি । বিষ্ণুপুরাণে অব-
তারের অনেক কথা আছে এবং শ্রীকৃষ্ণের
প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে,—“যত্র যত্বংশে
ভগবান্ অনাদি নিধনো বিষ্ণুরবতার । ভগবান্
অনাদিমধ্যো দেবকীগর্ভে সমবততার
বাসুদেবঃ ।” শ্রীমদ্ভাগবতেও উল্লিখিত
হইয়াছে । যে,—“কৃষ্ণস্তভগবান্ স্বয়ং”
(১-৩-২৯)—অর্থাৎ কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ ।

(খ) অবতার কাহাকে বলে ?

অবতার-তত্ত্ব সন্ধিক্ষে আলোচনা করিতে
হইলে, আমাদের প্রথমে দেখা উচিত যে,
অবতারের বিশেষ অর্থ কি ?—কাহাকে শাস্ত্র
অবতার বলিয়াছেন এবং কাহাকেই বা
বলেন নাই । অনেকে বলিয়া থাকেন যে,
এক হিসাবে আমরা সকলেই অবতার, কারণ
শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—“মমৈবাংশো
জীবলোকে জীবতঃ সনাতনঃ” (গীতা)
অত্র উল্লিখিত হইয়াছে যে—“হৃদি সর্বত্র
বিস্তৃতম্” (গীতা, ১৩।১৭), “সর্বত্রচাহং হৃদি
সন্নিবিষ্টঃ” (গীতা, ১৫।১৫), “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং
হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি” (গীতা) অর্থাৎ, ভগবান্
সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, সকলের হৃদয়ে সন্নি-
বিষ্ট, ঈশ্বর সকল ভূতের হৃদয়ে বিরাজিত ।
অত্র উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

“মনসৈতানি ভূতানি ঞ্জমেদ বহমানসনু ।
ঈশ্বরো জীব কলয়া প্রবিষ্টো ভগবান্ ইতি ॥
ভাগবত ।

এখানে ভগবান্ কলারূপে জীব প্রবিষ্ট
হইয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ।
অত্র আমরা দেখিতে পাই,—“প্রজ্ঞা
পুরুষংদেহে দেহিনং চাংশ রূপিনং ।”—
এখানে দেহিকে ভগবানের অংশরূপী
বলা হইয়াছে । কিন্তু তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য যে
সমুদয় জীব যদি ভগবানের অংশ হয়, তাহা,
হইলে আমরা তাহাদিগকে অবতার না বলিব
কেন ? কিন্তু শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে,
কেবল মনুষ্য কেন, স্থাবর (mineral) এবং
জঙ্গম (vegetable, animal ও men)
যাহা কিছু আছে, সকলেই ভগবান্ আছেন,
যথা,—

“যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাভিধি ভারতর্ভব ॥

(গীতা ১৩।২৬)

অর্থাৎ জগৎ স্থাবর জঙ্গম ক্ষেপিকছু বস্তু আছে, সে সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ, এই উভয়ের সংযোগজনিত জানিবে। ভগবান্ অত্ৰ বলিয়াছেন যে “ক্ষেত্রজং চাপি মাং বিদ্ধি সৰ্বক্ষেত্রেষু ভরত।” (গীতা-১৩২) অর্থাৎ আমাকে সকল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ বলিয়া জানিবে। স্তবরাং স্থাবর এবং জঙ্গমে যদি ভগবান্ ক্ষেত্ররূপে বিরাজ করেন, তাহা হইলে নাশ্বা উহাদিগকেই বা অবতার না বলিব কেন?

এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, আমরা স্থাবর অথবা জঙ্গমের ভিতর কাহাকে অবতার বলিতে পারি না। হিন্দুশাস্ত্রে অবতারের বিশেষ অর্থ আছে।

তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য যে, ভগবানের বাহা বিভূতি, বাহা শ্রী অথবা বাহা তাঁহার তেজের অংশসম্ভূত, তাহাদিগকে আমরা অবতার বলিতে পারি কি না? কারণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে,—

“যদ্ যদ্বিভূতিমং সত্ত্বং শ্রীমদুজ্জিহমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ স্ত্বং মম তেজোহংগ সত্ত্বম্॥”

(গীতা ১০।৪১)

অর্থাৎ বাহা বিভূতিসমন্বিত, শ্রীযুক্ত ও প্রভাব এবং বলাদি দ্বারা অতিশয়িত, তৎসমস্তই মদীয় তেজের অংশসম্ভূত জানিবে। যেমন আদিত্যদিগের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিষ্মানদিগের মধ্যে সূর্য্য, মরুতগণের মধ্যে মরীচি, নক্ষত্রগণের মধ্যে শশী, দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র, রক্ষসদিগের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ ও রাক্ষসদিগের মধ্যে কুবের, বহুগণের মধ্যে অগ্নি এবং পক্ষতের ভিতর মেরুই, তাংদি,—বাহা ভগবানের বিভূতি বলিয়া গীতায় উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাদিগকে আমরা অবতার বলিতে পারি কি না? ইহার উত্তরে শাস্ত্র বলিয়াছেন

যে, আমরা ইহাদিগকেও অবতার বলিতে পারি না।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তাহা হইলে বাঁহারা আদিষ্ট (inspired) হন, তাহাদিগকে আমরা অবতার বলিতে পারি কিনা? যেমন মোসেস, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ অথবা জোরাস্টার প্রভৃতি মহোদয়গণ, বাঁহাদিগকে ধর্ম্মবীর (prophets) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে, তাহাদিগকে আমরা অবতার বলিতে পারি কিনা? কিম্বা গ্রীকরা বাঁহাদিগকে Divine Afflatus বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদিগকে আমরা অবতার বলিতে পারি কিনা? ইহার উত্তরে শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, আমরা ইহাদিগকেও অবতার বলিতে পারি না।

তবে, বাঁহারা বুদ্ধপ্রাপ্ত হইয়াছেন, বাঁহাদিগের অন্তর ত্র্যক্ষের আলোকে (Illumination) আলোকিত, বাঁহারা জীবমুক্ত মহাপুরুষ, বাঁহাদিগকে শাস্ত্র ঋষি, মুনি প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে কি আমরা অবতার বলিতে পারি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, শাস্ত্র ইহাদিগকেও অবতার বলেন নাই।

শাস্ত্র বাঁহাদিগকে আবিষ্ট মহাপুরুষ বা ঈশ্বরের আবেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদিগকে অবতার বলিতে পারা যায় কিনা? ইহার উত্তর দিবার পূর্বে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে ‘আবেশ’ ও ‘অবতারের’ ভিতর কি পার্থক্য আছে। ঐশ্বরিক কার্য্যসমাধার হেতু সময়বিশেষের জন্ত বাঁহার ভিতর দিয়া ভগবানের প্রকাশ, হয়, তাহাদিগকে আবিষ্ট মহাপুরুষ বা সাধারণ কথায় আবেশ বলে। যেমন যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি। যীশুখ্রীষ্টের জীবনী পর্যাণোচনা

কনিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি একজন ধার্মিক মহাপুরুষ ছিলেন। সমগ্র বিশেষের জন্ত তাঁহাতে ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই কথা বুঝাইবার জন্ত রূপকে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি একদা নদীতে নান করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ স্বর্গ হইতে জ্যোতিঃ আসিয়া তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইল। এ জ্যোতিঃ আর কিছুই নহে, ভগবানের তেজ তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি যৌক্তিক বলিয়া পরিচিত হন এবং জন-সমাঙ্গে এইরূপ প্রচার করেন যে, তিনি ও তাঁহার পরমপিতা পরমেশ্বর একই সত্তা; তাঁহাদিগের ভিতর কোন পার্থক্য নাই। তাঁহার দ্বারা ভগবানের কার্য সমাধা হইলে ভগবানের ঐশ্বরিক সত্তার তিরোভাব (withdrawal of Divine Essence) হইয়াছিল। সেইজন্ত তাঁহাকে যখন ক্রূশে বিদ্ধ করিয়াছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে “Father! Hast Thou forsaken me?”—পিতা! আমাকে কি আপনি ত্যাগ করিলেন?—যখন তাঁহার ভিতর হইতে ঐশ্বরিক সত্তার তিরোভাব হইয়াছিল—যে ঐশ্বরিক সত্তার আবির্ভাবে তিনি নিজেকে এবং ভগবানকে এক বলিয়া অনুভূত করিয়াছিলেন, সেই সত্তার তিরোভাবে—তিনি নিজের ভিতর মহাশূন্য অনুভব করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে পিতা! আপনি কি আমাকে ত্যাগ করিলেন?

আবেশ সন্ধিক্ষণে আলোচনা করিয়া আমরা ইহা অবগত হইলাম যে, সকল সময়ে ঐরূপ আদিষ্ট মহাপুরুষে ঐশ্বরিক সত্তা বর্তমান থাকে না। স্বার্থ অবতারে ঐশ্বরিক সত্তা (Divine Essence) সকল সময়ে বর্তমান, কিন্তু আবেশে ঐ সত্তার সঙ্কোচন (with-

drawal) হইয়া থাকে। কিন্তু আবিষ্ট মহাপুরুষের স্থান যে অনেক উর্দ্ধে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আদিষ্ট মহাপুরুষ (Inspired Prophets) অপেক্ষা জীবনযুক্ত ঋষি অথবা বুদ্ধের স্থান উচ্চ এবং জীবনযুক্ত ঋষি অথবা বুদ্ধের অপেক্ষা আদিষ্ট পুরুষের স্থান উচ্চ।

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা আরও অবগত হইলাম যে, ভগবানের অংশ-সম্বৃত জীবলোক অবতার নহেন, ভগবানের বিতৃতি সকল অবতার নহেন, আদিষ্ট মহাপুরুষগণ অবতার নহেন, জীবনযুক্ত ঋষি অথবা বুদ্ধ অবতার নহেন এবং আবিষ্ট মহাপুরুষও অবতার নহেন। হিন্দুশাস্ত্রে অবতারের এক বিশেষ অর্থ আছে।

আমাদের মনে স্মৃতঃ এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে যে, তাহা হইলে অবতারের বিশেষ অর্থ কি? হিন্দুরা কাহাকে অবতার আখ্যা প্রদান করিয়াছেন? এখন এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে।

অবতার-ভব সন্ধিক্ষণে বৈষ্ণব গ্রন্থে যেরূপ আলোচনা করা হইয়াছে, এইরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী অবতারের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা,—“অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চেবতরণং অবতারঃ” অর্থাৎ অপ্রপঞ্চ হইতে যিনি প্রপঞ্চে অধঃতরণ করেন, তাহাকে অবতার বলে। জীবগোষ্ঠামীর মতে “প্রাকৃত বৈভবে অবতরণং ধন্বতরণঃ”—অর্থাৎ প্রাকৃত হইতে প্রাকৃত বৈভবে যিনি আসিয়া থাকেন, তাহাকে অবতার বলে। অবতারের উক্ত অর্থ (definition) মনে রাখিলে অবতারবাদ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হইবে।

এখন প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত—প্রপঞ্চ ও

অপ্রপঞ্চ কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে হইবে । সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলে আমরা অবগত হই যে ভগবান্ প্রাথমিক আদিতত্ত্ব* পরে অমুপাদক-তত্ত্ব † সৃজন করিয়াছিলেন ; তৎপরে তিনি পঞ্চতন্ত্রাঙ্ক সৃষ্টি করেন । পঞ্চতন্ত্রাঙ্ক হইতে পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে । আদি ও অমুপাদকতত্ত্বের পরিবর্তে অস্ত্রাঙ্ক শাস্ত্রে মহৎ ও অহঙ্কার তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে । পঞ্চভূত হইতে সত্যাদি সপ্তলোক এবং সপ্ত পাতাল বিরচিত হইয়াছে । সপ্তলোক ও সপ্তপাতাল লইয়া চতুর্দশ ভুবন গঠিত হইয়াছে । চতুর্দশ ভুবনের অস্ত্র নাম ব্রহ্মাণ্ড । ব্রহ্মাণ্ডকে প্রপঞ্চ বা প্রাকৃত বলা হয় । ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে বৈকুণ্ঠ অবস্থিত এবং তৎপরে গোলক অবস্থিত । শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে—

“পাতালাদ্ ব্রহ্মলোকাস্তং ব্রহ্মাণ্ডং পরিকীর্তিতম ।
ততউর্দ্ধং চ বৈকুণ্ঠো ব্রহ্মাণ্ডাদ্ বহিরেব সঃ ।
ততউর্দ্ধং চ গোলকঃ * * * * ।”

“ (দেবীভাগবত, ৯—৮—১০)

এই হইল লোক আদি ও অমুপাদক-তত্ত্বের রচিত । দেবীভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

“জলবৃদ্ধবৎ সর্বং বিশ্বসংঘমনিতাকম্ ।

নিত্যো গোলকবৈকুণ্ঠো প্রোক্তো শব্দকৃত্তিমৌ ॥

(দেবীভাগবত—৯—১২—১৬)

সকল বিশ্বসমষ্টি জলবৃদ্ধবৎ মতন অনিত্য । গোলক ও বৈকুণ্ঠ অকৃত্রিম ও চিরস্থায়ী । প্রতি প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের নাশ হইয়া থাকে, কিন্তু গোলক ও বৈকুণ্ঠের নাশ হয় না । ব্রহ্মাণ্ডকে প্রাকৃত বলে এবং প্রপঞ্চ বলে । বৈকুণ্ঠ ও গোলককে অপ্ৰা-

কৃত ও অপ্ৰপঞ্চ বলে । উহাদের অপর নাম পরমব্যোম । সেই পরমব্যোম হইতে—পূরণের ভাবায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে, বৈকুণ্ঠ ও গোলক হইতে—বিনি অবতীর্ণ হন, তাঁহাকে অবতার বলে ।

কাহার অবতার ?

কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য যে, কে অবতীর্ণ হন ? কে অপ্ৰপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে, অথবা ব্রহ্মাণ্ডের বাহির হইতে ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে, অবতরণ করিয়া থাকেন ? যদি বলি যে ভগবান অবতরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের মনে এই সন্দেহ উথিত হইয়া থাকে যে, ভগবান কি তাহা হইলে বিশ্বাতিরিক্ত (Transcendent) মাত্র, তিনি কি বিশ্বানুগ (Immanent) নহেন ? এই স্থলেই আমার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য Pantheismএর ভিতর পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া থাকি । পাশ্চাত্য মতে ভগবান্ বিশ্বানুগ (Immanent) মাত্র । কিন্তু হিন্দুদিগের মত ঐক্য নহে, তাঁহার কাহাকে ভগবান বলেন, তিনি বিশ্বানুগ (Immanent) বটে এবং প্রপঞ্চাতীত ও (Transcendent) বটে । তিনি যে কেবল মাত্র এই ব্রহ্মাণ্ডে অস্থায়ী হইয়া রহিয়াছেন, তাহা নহে, ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও রহিয়াছেন । পুরুষ সূক্তে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—“পাদো-হস্য বিশ্বাত্তানি ত্রিপাদস্তামৃতং দিবি ।”—তাঁহার এক পাদে জগৎ অবস্থিত, এবং অপর তিনটি পাদ অমৃত স্বরূপ স্বপ্রকাশরূপে অবস্থিত রহিয়াছে । তিনি সপ্তাণি নিগুণ ভেদে বিবিধ, তাঁহার চারি পাদ । তন্মধ্যে একপাদ লইয়া সপ্তাণি এবং অবশিষ্ট তিন পাদ নিগুণ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে । উক্ত তিন পাদে তিনি প্রপঞ্চাতীত (Transcendent) এবং অস্ত্র পাদে বিশ্বানুগ (Immanent) ।

* দেবীভাগবত—৭।৩২।২২—২৮

† অণববাদ ।

অগ্রগণ্য হইতে প্রাপ্তকে কে অবতরণ করিয়া থাকেন, তাহা অবধারণ করিতে হইলে ভগবৎ-সত্তার যে সকল বিকাশ আছে, তাঁহাদের স্বরূপ নির্ণয় করা উচিত। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, শাস্ত্রে কেবল একটা মাত্র সত্তার কল্পনা করা হইয়াছে। তাঁহাকে বলা হইয়াছে—“একমেবাদ্বিতীয়ং।” তিনি সকল প্রকার ভেদ রহিত, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। বোদাস্ত ও উপনিষদ তাঁহাকে ব্রহ্ম আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, এবং পুরাণ তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার দুইটা বিভাগ (aspects) আছে, সগুণ ও নিগুণ। নিগুণ বিভাগ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে পরব্রহ্ম বলা হয়। কিন্তু নিগুণ ব্রহ্মের দ্বারা জগৎ রচনা হয় না বলিয়া তাঁহার সগুণ ভাবের কল্পনা করা হইয়াছে। সগুণ ভাবে তিনি মান্নার আবরণে আবৃত। উপনিষদ তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, “মাগ্নিগন্ত মহেশ্বরন্” (খেতাস্থতর)—তিনি মান্নার অধীশ, তাঁহার নাম মহেশ্বর। তিনি সচ্চিদানন্দময়। তিনি সংবিতের মহা সমুদ্র। আত্রস্তস্য পর্য্যস্ত তাঁহার যত প্রকার বিকাশ আছে, তাঁহারা ঐ সমুদ্রের বুদ্বুদ মাত্র। অবতারতত্ত্ব বুঝিতে হইলে এই তত্ত্বটা বিশেষ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। সেই সগুণ ব্রহ্মের তিনটা রূপ শাস্ত্রে কল্পিত হইয়াছে। উক্ত তিনটা রূপ লক্ষ্য করিয়া ত্রীধর স্বামী সাব্বক-তন্ত্র হইতে নিম্নোক্ত শ্লোকটা উদ্ধৃত করিয়াছেন; যথা,—

“বিষ্ণোস্ত জীর্ণরূপাণি পুরুষাখ্যান্তথো বিদ্বঃ ।

প্রথমং মহতশ্চৈত্ৰী দ্বিতীয়ং স্বপ্ন সংস্থিতম্ ॥

তৃতীয়ং সৰ্বভূতস্থং তানি জাত্বা বিমুচ্যতে ॥”

ভগবানের পুরুষাখ্য তিনটা রূপ; প্রথম

পুরুষ মহতত্বের স্রষ্টা; দ্বিতীয় পুরুষ অণ্ডের মধ্যে অবস্থিত; তৃতীয় পুরুষ সকলভূতের অন্তঃস্থিত।

এই এক এক প্রকার কল্পনা অল্পসারে তাঁহাকে এক এক পুরুষ বলা হয়। প্রথম পুরুষ মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি, তত্ত্ব উদ্ভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার শক্তির দ্বারা তত্ত্ব সকল স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পুরুষের শক্তির দ্বারা ঐ সকল তত্ত্ব পরস্পর মিলিত হইয়া বিভিন্ন দেহ ও বিভিন্ন প্রকার লোক রচিত হইয়াছিল। ঐ সকল তত্ত্ব দ্বারা এক বিরাট দেহ রচিত হইয়াছিল, উহার আকার অণ্ডের ত্রায়। ঐ অণ্ডের নাম ব্রহ্মাণ্ড। দ্বিতীয় পুরুষ ঐ সমগ্র অণ্ডকে অহুপ্রাণিত করিয়া উহার মধ্যে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। পুরাণের ভাষায় ইহাকে বিরাট ও হিরণ্ময় পুরুষ বলা হয়। ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

“এষ হুশেষ সৰ্বানামাত্মাংশঃ পরমাত্মনঃ ।

আত্মাবতারো সত্রাদ্যো ভূতগ্রামো বিভাব্যতে ।”

৩৬/৮

অর্থাৎ এই বিরাট পুরুষই সকল জীবের আত্মা এবং পরমাত্মার অংশ। ইনি আত্ম অবতার। যাবতীয় ভূতগণ ইহাতেই প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় পুরুষ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের এবং সমগ্র জীবের আত্মা। যখন জীবসকল পৃথক পৃথক ভাবে প্রাকৃতভূত হয়, তখনই তিনি তৃতীয় পুরুষ হইয়া প্রতি জীবের আত্মা বলিয়া পরিগণিত হন। এই অত্ম উক্ত হইয়াছে যে, তৃতীয় পুরুষ “সৰ্বভূতস্থ।”

বিরাট অবতারকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে,—“এতান্নানাবতারাপাং নিধানং বীজমব্যয়ং”—অর্থাৎ তিনি অন্ত্যস্ত অবতারের কাৰ্য্যাবসানে প্রবেশ স্থান এবং তিনি

তীর্থাঙ্গের প্রবাস বীজ স্বরূপ । প্রথম পুরুষ এক হইলেও, বিরাট পুরুষ ব্রহ্মাও ভেদে বিভিন্ন । 'তীর্থাঙ্কে ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বলা হয় ।

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা অবগত হইতেছি যে, সপ্তম ব্রহ্মকে শাস্ত্রে মহেশ্বর আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে । তিনিই প্রথম পুরুষ । তিনি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ তাবৎ সৃষ্ট পদার্থের ঈশ্বর । আমরা কেবল মাত্র একটা সৌর জগতের কথা অবগত আছি, তাহাকেই আমরা ব্রহ্মাও বলিয়া জানি, কিন্তু শাস্ত্রে এইরূপ অসংখ্য সৌরজগৎ অথবা ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব দেখিতে পাই ।

যোগবশিষ্ঠে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—
“যথা তরঙ্গা অলম্বো তমেবা সৃষ্টয়ঃ পর ।
উৎপত্ত্যোপত্য লীয়ন্তে রজাংসীব মহানিলে ॥”
অর্থাৎ সমুদ্রে যেমন অসংখ্য তরঙ্গ সকল আছে, সেইরূপ সৃষ্টিও অসংখ্য প্রকার আছে । মহানিলে ধূলিকণা সমূহের দ্বারা উহাদের উৎপত্ত্যাঙ্গি হইয়া থাকে ।

বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—
“অণুনাং সহস্রাণাং সহস্রাণ্যুতানি চ ।
ঈদৃশানাং তথা তত্র কোটি কোটি শতানি চ ॥”
(২।৭।২৭)

• অর্থাৎ প্রকৃতিতে এইরূপ সহস্র সহস্র এবং কোটি কোটি ব্রহ্মাও অবস্থিত আছে ।

শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,
“দ্যুপ্তয় এব তে ন যয়ন্তমনস্ততরা ভূমপি
যদন্তরাণিনিচরা নহু সাবরণাঃ ।” (১০।৮৭।১১)
অর্থাৎ আপনি অনন্ত, অতএব ব্রহ্মাদি লোক-
পালগণও আপনার অন্ত প্রাপ্ত হন নাই;
এমনকি, আপনি ও আপনার অন্ত প্রাপ্ত
হন নাই । সপ্তাবরণযুক্ত ব্রহ্মাও-সমূহও

আকাশে ধূলিকণার দ্বারা আপনাতে মগ্ন
ভ্রমণ করিতেছে । ভাগবতের অন্তর্ভুক্ত
হইয়াছে যে, “স্বভতোহুণি কোটিশঃ,
(১০।১৬।৩৯), অর্থাৎ, ভগবান্ বলিতেছেন যে,
“আমি কোটি কোটি ব্রহ্মাও সৃষ্টি করিয়াছি ।”

এই সৃষ্টি-বৈচিত্র্য অনন্ত । আমাদের
এই ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দশ ভুবন আছে ; কিন্তু
আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, কোন
ব্রহ্মাণ্ডে বিংশতি, কোন ব্রহ্মাণ্ডে পঞ্চাশৎ,
কোন ব্রহ্মাণ্ডে সপ্ততি, কোন ব্রহ্মাণ্ডে
শত, কোনও ব্রহ্মাণ্ডে সহস্র, কোন
ব্রহ্মাণ্ডে অযুত এবং কোন ব্রহ্মাণ্ডে বা
লক্ষ ভুবন আছে । সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডবর্মে
ব্রহ্মাদি লোকপালগণ নানারূপে বিরাজমান
আছেন । আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডে ইন্দ্রাদি
লোকপালগণ এক এক কল্পজীবী, কিন্তু অপর
কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে ইন্দ্রাদি দেবগণ শত
মহাকল্পজীবী এবং ব্রহ্মাদি লোকপালগণ
পরাক্রম মহাকল্পজীব । সেই সেই ব্রহ্মেত্যাদি
লোকপালগণ ‘চিরলোকপাল’ বলিয়া খ্যাত
আছেন ।

চতুর্দশ ব্রহ্মা সম্বন্ধে এক অপূর্ব পৌরা-
ণিক আখ্যায়িকা শ্রীলঘুভাগবতামৃতে উকৃত
হইয়াছে । “শ্রীকৃষ্ণ একদা দ্বারকাধামে
সুধর্ম্মা-সভায় বিরাজমান আছেন, এমন সময়ে
দ্বারাদ্বার আসিয়া তাঁহাকে নিবেদন করি-
লেন, ‘প্রভো ! আপনার পাদপদ্ম দর্শনে
অভিলাষী হইয়া ব্রহ্মা দ্বারদেশে অবস্থান
করিতেছেন ।’ ‘কোন্ ব্রহ্মা দ্বারে আশি-
রাছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর ।’ ভগবানের
এই বাক্য শ্রবণ মাত্র দ্বারপাল দ্বারদেশে
আগমন পূর্বক ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া,
পুনর্বার শ্রীকৃষ্ণের পুরোভাগে সমুপস্থিত
হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ‘সনকাদির পিতা

চতুর্দানন আসিয়াছেন ।’ ‘আনন্দন’ কর’
 ত্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে, দ্বারপাল ব্রহ্মাকে সত্যের
 উপস্থিত করিলেন । ব্রহ্মা দণ্ডবৎ প্রণাম
 করিলে, ত্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন ‘তুমি কি
 নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ ?’ ব্রহ্মা তাঁহাকে
 বলিলেন ‘দেব । আগমনের কারণ পশ্চাৎ
 নিবেদন করিব । কিন্তু নাথ । অস্ত্র* আপনি
 যে বলিলেন ‘কোন্ ব্রহ্মা,’ অগ্রে তাহারই
 রহস্য জানিতে ইচ্ছা করি । যেহেতু আমি
 ভিন্ন অস্ত্র ব্রহ্মা নাই ।’ অনন্তর ত্রীকৃষ্ণ ঈশৎ
 হস্ত করিয়া সমস্ত লোকপালগণকে স্মরণ
 করিলে, তৎক্ষণাৎ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড
 হইতে লোকপালগণ দ্রুতবেগে দ্বারকায় সমা-
 গত হইলেন । তন্মধ্যে অষ্টবক্র, চতুঃষষ্টিবদন,
 শতমুখ, সহস্রানন, লক্ষবদন ও কোটিবদন,
 বিরিকিগণ, বিংশতি বদন, পঞ্চাশদানন,
 শতমুখ, সহস্র মুখ, লক্ষ বাহ এবং লক্ষ শিরা
 রুদ্রগণ ; লক্ষ গোচন এবং নিযুত নয়ন ইন্দ্রগণ,
 আর বিবিধাকৃতি ও বিবিধ ভূষণ অস্ত্রাস্ত্র
 লোকপালগণ, কৃষ্ণের অগ্রে উপস্থিত হইয়া
 তাঁহার পাদপীঠে প্রণত হইলেন । তখন
 তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া চতুর্দানন বিস্ময়ে
 ত্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উন্নত হইয়া উঠিলেন ।*

লিঙ্গপুরাণে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে,—
 “অসংখ্যাশচ রুদ্রাভ্যাঃ অসংখ্যাতা পিতামহাঃ
 হরয়শ্চ অসংখ্যাতা একএব মহেশ্বরঃ ॥”

অর্থাৎ রুদ্রাদি অসংখ্য আছেন, ব্রহ্মা
 অসংখ্য আছেন, হরও অসংখ্য আছেন,
 কিন্তু মহেশ্বর কেবল মাত্র একজন । সমুদয়
 সৃষ্টির অর্থাৎ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরের নাম
 মহেশ্বর ; এক একটা ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরের নাম
 মহাবিশ্ব এবং এক একটা পৃথিবীর (Globe)

* শ্রীনাট্যাদি পৌরাণী ও শ্রীমদ্ভগবত পৌরাণী
 সম্পাদিত শ্রীলভ্যভাগবতায়ত হইতে উদ্ধৃত ।

ঈশ্বরের নাম বিশ্ব । বিশ্ব এক একটা পৃথিবীর
 ঈশ্বর (Planetary Logos), মহাবিশ্ব এক
 একটা ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর (Solar Logos) এবং
 মহেশ্বর সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর (Central
 Logos) । এই মহেশ্বরের অপর নাম সপ্ত-
 ব্রহ্মা । সপ্ত ব্রহ্মের বিভিন্ন বিভাব (aspects)
 অমুসারে মহেশ্বর, মহাবিশ্ব এবং বিশ্ব আখ্যা
 প্রদত্ত হইয়া থাকে । মহেশ্বর প্রথম পুরুষ,
 মহাবিশ্ব দ্বিতীয় পুরুষ এবং পৃথিবীর বিশ্ব
 তৃতীয় পুরুষ । পৃথিবীর বিশ্বের অপর নাম
 খেতবীপের নারায়ণ ।

সপ্তমুসারে আবার দ্বিতীয় পুরুষকে
 (Solar Logos) তিন ভাগে বিভক্ত করা হই-
 য়াছে ; যথা,—ব্রহ্মা, বিশ্ব ও রুদ্র । যে বিভাবে
 তিনি সৃজন করেন, সেই বিভাবে লক্ষ্য
 করিয়া ব্রহ্মা বলা হয়, যে বিভাবে তিনি
 পালন করেন, সেই বিভাবে লক্ষ্য করিয়া
 তাঁহাকে বিশ্ব* বলা হয় এবং যে বিভাবে
 তিনি সংহার করেন, সেই বিভাবে লক্ষ্য
 করিয়া তাঁহাকে রুদ্র বলা হয় ।

শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যখন ব্রহ্মাণ্ডে-
 রই সংখ্যা হয় না, তখন ব্রহ্মা, বিশ্ব অথবা
 রুদ্রেরই বা কেমন করিয়া সংখ্যা হইবে ?

“সংখ্যাচেদু রজসামন্তি বিশ্বানাং নকদাচন ।
 ব্রহ্মাবিশ্বশিবাদীনাং তথা সংখ্যা ন বিজ্ঞতে ॥”
 (দেবীভাগবতে - ৯।৩।৭, ৮)

অর্থাৎ ধূলিকণার সংখ্যা হয়তো, বিশ্বের
 সংখ্যা হয় না । ব্রহ্মা, বিশ্ব ও শিবাদিরেও
 সেই প্রকার সংখ্যা হয় না । প্রতি, বিশেষ
 এইরূপ ব্রহ্মা, বিশ্ব ও শিবাদি বর্তমান
 আছেন ।

* ইনি পৃথিবীর বিশ্ব বা খেতবীপের নারায়ণ
 মহেশ্বর ।—লেখক ।

অবতারত্ব বৃদ্ধিতে হইলে পৃথিবীর বিষ্ণু (Planetary Logos), মহাবিষ্ণুর (Solar Logos) এবং মহেশ্বরের (Central Logos) ভিতর কি সম্বন্ধ আছে, তাহা সম্যকরূপে অবধারণ করা উচিত। আমাদের এই পৃথিবী গ্রহের বিষ্ণুকে শাস্ত্রে খেত-দ্বীপের নারায়ণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উত্তর মেরু বা North pole এর নাম খেত দ্বীপ। এই খেত-দ্বীপের নারায়ণের কথা মহাত্মার এবং রামায়ণে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণের ভাষায় বলিতে হইলে আমরা ইহাকে প্রজাপতি * বলিব। প্রজাপতিই এই পৃথিবীর অধীশ্বর (Planetary

Logos)। যখন অবতারের প্রয়োজন হয়, তখন দ্বিতীয় পুরুষ অর্থাৎ মহাবিষ্ণু (Solar Logos) স্বয়ং অথবা খেত দ্বীপের নারায়ণের দ্বারা (through the Planetary Logos) অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

এইজন্ত আমরা বৈষ্ণব গ্রন্থে অবতার সম্বন্ধে দুইটা কথা পাইয়া থাকি—“অংশেন” ও “দ্বারেন”। অর্থাৎ কোন কোন অবতার ভগবানের অংশ, তাঁহার মহাবিষ্ণু বা Solar Logos হইতে আসিয়া থাকেন এবং অজ্ঞাত অবতার অজ্ঞের দ্বারা অর্থাৎ যেমন খেত-দ্বীপের নারায়ণের দ্বারা অবতীর্ণ হন। (ক্রমশঃ)
 ত্রীআশুতোষ দেব।

শোক ও সান্ত্বনা।

ভাওয়ালের মধ্যম রাজকুমার রমেশ নারায়ণ রায় গত ৬ই বৈশাখ বারু পরিবর্তন জন্ত জয়দেবপুর হইতে সত্রীক দাঙ্গিলিং গিয়াছিলেন। হঠাৎ রক্তাভিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া সেই বন্ধু বাক্যবহীন বিদেশে বিড়ম্বিত বংশে বৈশাখ সূত্র্যমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার সেই শোচনীয় অকাল মৃত্যুতে এই

শোক।

কি হইল হায়!

কে কবে বিশ্বাস করে, বিনা মেঘে বাজ গড়ে,

*ও ত শুধু লোকে বলে কথার কথার!

প্রভাত যখন হাসে, তখন কি নিশি আসে?

দিনে ছ'পহরে কবে রবি অজু যায়?

সাগুর পর্বতে ভরা, এ বিপুল বহুধরা,

বিনা ভূমিকম্পে কাঁপে কে দেখেছে তায়?

ও ত শুধু লোকে বলে কথার কথার!

* উপনিষদের প্রজাপতি এবং পুরাণের প্রজাপতির ভিতর পার্থক্য আছে। উপনিষদের প্রজাপতি বিরাট পুরুষ বা Solar Logos এবং পুরাণের প্রজাপতি Planetary Logos,

কি হইল হায়!

সতাই গড়েছে আজ, ভাওয়ালের শিরে বাজ,

বিনা ঝড়ে বিনা মেঘে আকাশের গায়,

ডুবেছে সোণার ছবি, ভাওয়ালের নব রবি,

বিনা রাহ, বিনা নিশি, বিনা কোরাসায়!

সতাই কি অভিযোগে, আজ যে ভাওয়াল কাঁপে,

ভূমিকম্প বিনা এবে রগাতল যায়!

এ কি শুধু লোকে বলে কথার কথার?

এ নহে কথার কথা, হায়, হায়, হায়,

এই গেল রাজা রাণী, হৃদয়ে অশনি হানি,

এখনো কাতর প্রাণ শত বেদনার,

এখনো ভাদের তরে, ভাওয়াল কাদিয়া মরে,

এখনো চক্কর জলে বুক ভেসে যায়!

ভাদের কাহিনী বত, এখনো যে অবিরত,

কত বাস কত শোনে, তবু না ফায়,

আজিও ভুলেনি লোকে, কবে হায়, হায়!

ছ'দিশ বায়নি, লোকে'না ভুলিতে তাহা,
হায় কি গুনিরে আজ ফিরে পুনরায়,
তরুণ কোমল কাঁচা, সরল সোণার বাছা,
কুমার রমেন্দ্র নাকি নিয়াছে বিদায় !
কি যে সে মোহন রূপ, কি লাবণ্য অপরূপ,
সে যেন শোভিয়াছিল শত পূর্ণিমা,য়,
বিধাতা দিছিল খালি, করুণা মমতা'টালি,
হৃদয়ের তলে তলে দ্রব সুধা তার !
হায় সে সোণার শরী, ভাওয়াল করিয়ে মসী,
অকালে ডুবিল কই মহা ভমসায়,
কুমার রমেন্দ্র নাকি নিয়াছে বিদায় !

আজি এই রাজপুরী ঘোর অন্ধকার,
কাদিছে ভগিনী ভাই, যারে যারে—ঠাঁই ঠাঁই,
কাদিছে স্বজন বত দাস দাসী আর !
কাদে বৃদ্ধা রাজমাতা, হারে ভাগ্য হা বিধাতা,
এই কি নিয়তি আহা আছিল তাহার,
শুধু কাদিবার লাগি, বেঁচে আছে সে অভাগী,
আলাবে তাহার বৃকে কত চিন্তা আর ?
হায় রে বিধবা নব, শতদল শোকে দ্রব,
নীরব চেতনা হীন মুক্তকেশ ভার,
বেন শোকে এলোমেলো শৈবালে জড়ায় গেলো,
লুটিছে জন্মের মত উঠিবেনা আর !
আজি এই রাজপুরী শোকে অন্ধকার !

সমস্ত ভাওয়াল ভরা ঘোর হাহাকার,
কাদিছে ভাওয়াল বাসী, সদা অশ্রু জলে ভাসি,
শোকের সাগরে যেন দিয়াছে সাঁতাব !
কিবা হাটে কিবা মাঠে, যে শুনেছে গলে ঘাটে,
আকাশ ভাঙ্গিয়া শিরে পড়িয়াছে তার,
রমণী আনিতে জল, শুনে হেন অমঙ্গল,
কাকের কলসী ভাজে খাইয়া আছাড় !
কাদে মাতা ছেলে কোলে, জননী সন্তান ভোলে !—
শত পুত্র-পুত্রক যেন হইয়াছে তার,
কাদে বড় কাণা খেঁড়া, সমস্ত ভাওয়াল বোড়া,
কাদে বত দীন দুখী দীন পরিবার !
অনাথ হইল তারা, গেল আজ অন্ন মারা,

কোথা বাবে অভাগারা কে দিবে আহাঃ;
করুণ কাতর স্বরে, হাহাকার ঘরে ঘরে,
সমস্ত ভাওয়াল আর শোকে অন্ধকার !
বাঁদে তরু লতা বন, হাহা করে সমীরণ,
শোকে শুধু বেষ নাহি বর্ষে বারিধার,
শোকে শুধু হ'ল মাটা, বিদীর্ণ শতধা কাটি,
বিধাতা, ভাওয়াল সব ক'ত শোক আরণ

হে কুমার, হে রমেন্দ্র, হে ভাওয়াল-রাজ !
ছাড়ি প্রিয় পরিজন, অতুল ঐশ্বর্য ধন,
ছাড়ি রাধাসংহাসন ছাড় রাজ-কাজ,
ছাড়ি এই স্বর্ণভূমি, কোথায় গিয়ছ তুমি,
কোথা সে অজ্ঞাত দেশে রাহিয়াছ আজ,
কোথা সে দুর্জয়ালন্দ, হিমাদ্রির হিমশৃঙ্গ,
কোন সে কন্দর অথ গিরি গুহা মাঝ,
কোথা সেই চিতা তুমি রয়েছ একাকী তুমি,
কোন গিরি নদী তটে করিছ বিরাজ !
ফিরে না আনিলে দেশ, বল কিবা মনোক্ষেপে,
কিবা তব ছিল দুঃখ কিবা ক্ষোভ লাজ,
বিরত বিলাস কোঁঠে, কি সাধনা মহা যোগে,
বাহিরিলা শাক্যসিংহ শাক্য যুবরাজ,
নির্জনে সাথিতে কিহে, সে তপস্তা দরীগুহে
ছাড়িলে সংসার, পরি সন্ন্যাসীর সাজ ?
ভবে, দেখো উদ্ধারের পথ, ভাওয়ালের ভবিষ্যৎ
ভাওয়াল কপিলবাস্ত শোকে ভাসে আজ !

কিন্তু এতদিন পরে পড়িল কি মনে,
স্নেহ মমতার খনি, জননী বিলাসমণি,
আননে আনন্দে হাসি করুণা নয়নে ;
স্নেহের জনক মুখ, স্নেহ পরিপূর্ণ বুক,
স্নেহের ক্ষীরোদসিন্ধু খেলে সমীরণে ;
মনে কি পড়িল কহ, সে রাজর্ষি পিতামহ,
ভাওয়ালের চিরপ্রিয় কালী নারায়ণে ?
বাইতে তাদের কাছে, হিমালয়ে পথ আছে,
বে পথে পাওব গেল অমর ভুবনে,
তুমিও সে পথে হায়, গেলে নাকি অমরায়,
কেনে সে মায়ের কোলে স্নেহ নিকেতকে—
দেবতার প্রিয় দেশ জিহিবে—নন্দনে ?

বাও তবে দুটি কথা বলো গিয়ে যার,
বলো গিয়ে পিতৃমহে, কি পাপে ভাওয়াল বহে,
হতভাগ্য ভাওয়ালের কি হবে উপায় !
কত আর আছে বাকি, নাহি সীমা শেষ নাকি,
ভাওয়াল জলিবে নাকি চির যাতনায়,
ধাক্কিল উপায় তার, করে যেন প্রতিকার,
কমো ভাওয়ালের কথা তাহাদের পায়,
কহিও সকল কথা, প্রজার পালন প্রথা,
বা দেখিয়া গেলে তাহা করো সমুদায় !
আজিও তাদের তরে, ভাওয়াল কাঁদিয়া মরে,
আজিও ভাওয়ালবাসী করে হার, হার,
কমো এ সোণার দেশ রসাতলে যায় !

কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পত্নী
শ্রীযুক্তা বিভাবতী দেবীর প্রতি

সাস্তুনা ।

জন্মিলে মরিতে হয়, অমর কেহই নয়,
অবনার তাই মর্ত্য নাম,
হুই দিন আগে পাছে, যার যে নিয়তি আছে,
লভে শেষে অনন্তে বিশ্রাম !
আত্মার বিনাশ নাই, দেহ শুধু হয় ছাই,
'আত্মা চির অজর অমর,
পরম আত্মার সনে, মিশে জীব-আত্মাগণে,
• • • শান্তি মরণের পর !
অতি ক্ষুদ্র নদ নদী, সমুদ্রে মিশিল যদি,
নাহি থাকে ভিন্ন ভাব আর,
নাহি থাকে বিধা বিত্ত, অভেদ অনন্ত নিত্য,
সে হয় বিশাল পারাবার !
অগ্নি দেবী বিভাবতি, তেমনি তোমার পতি,
মিশিয়াছে বিশ্বপতি সঙ্গে,
আজি হতে বিশ্বপতি, তোমার সে প্রিয় পতি,
ভাব তাঁরে জীবনে মরণে !

তুমি ত বিধবা নহ, কেন অমর বল,
'কেন তুমি কর হাঁহাকার,
দেখ সে জগৎ পতি, তোমার সে প্রিয় পতি,
'হৃদয়েতে করেন বিহার !
সে তোমারে ছাড়া নাই, সেত নহে ভিন্ন ঠাই,
কেন গো বিরহ ভাব মনে,
সে যে গো তোমার লাগি, আছে নিশি দিন জাগি
তোমার সে নিদ্রা জাগরণে !
চরণ-কমলে তাঁর, দেও প্রীতি-উপহার,
নারীর জীবন সাধ যত,
বিলাস বাসনা আশা, যত আছে ভাসবাসা,
দেহ তাঁরে প্রেমিকার মত !
দেহ আত্মা—প্রাণ মন, কর তাঁরে সমর্পণ,
নিকাম সাধনা কর তাঁর,
পৃথিবী তোমার এত, হইবে কৃতার্থ ধন্ত,
কোটিগুল হইতে উদ্ধার !

২

নহ তুমি পুত্রহীনা, অভাগা দুর্ভাগা দীনা,
কেন ভেবে শোকে ম্রিয়মাণ,
এই বিশ্ব এ সংসার, তোমারি মা পরিবার,
মোর প্রাণ তোমারি সন্তান !
লহ জননীর মত, জগজ্জননী ব্রত,
কর সদা পর উপকার,
যে থাকে বিপদগ্রস্ত, বাড়িয়ে দয়ার হস্ত,
কর তারে বিপদে উদ্ধার !
উজলি করুণা-বিভা, ভাওয়ালে নূতন দিবা—
কর মা নূতন দিনমান,
আমরা ভাওয়ালবাসী, নিত্য অশ্রুজলে ভাসি,
আমরা যে তোমারি সন্তান !

৩

পিতৃ হার! মাতৃহার, অনাধ সন্তান যারা,
অর্থাভাবে শিক্ষার বঞ্চিত,

তুমি মা করুণ-প্রাণে, তাহাদের অর্থ দানে,
বিদ্যায় কর মা বিভূষিত !

উজলি জ্ঞানের বিভা, ভোর কর নবদিবা,
অজ্ঞানতা কর অবসান,

আমরা ভাওয়ালবাসী, হৃদশা-সাগরে-ভাসি,
আমরা যে তোমারি সন্তান !

৪

অন্নহীন বস্ত্রহীন, বাহারা দরিদ্র—দীন,
হৃৎক্লে করিছে হাহাকার,

যাহারা আতুর অন্ধ, নিতান্ত অদৃষ্ট মন্দ,
সংসারে কেহই নাই যার,

তুমি মা দয়ার দানে, তাদের বাঁচাও প্রাণে,
অন্নপূর্ণা কর অন্ন দান,

উজলি রেহের বিভা, হাসাও নূতন দিবা—
ভাওয়ালে নূতন দিনমান ।

৫

যেখানে মা অত্যাচারে, অবিচারে, ব্যভিচারে,
কাতরে কাঁদিছে প্রজাগণ,

শুনিবার কেহ নাই, বলিবার নাহি ঠাই,
রোধে ক্রোধে প্রাণের বেদন !

তুমি মা করুণ প্রাণে, সে কথা শুনিও কাণে,
পাপীরে করিও দণ্ড দান,

উজলি জ্ঞানের বিভা, ভাওয়ালে নূতন দিবা—
কর মা নূতন দিনমান !

৬

যাহারা মা শোকে রোগে, দারুণ বাতন্য ভোগে,
জলফোটা দিতে নাই কেহ,

তাদের লইয়ে তব্ব, দেওমা ঔষধ পধ্য,
মা হয়ে তাদের কর রেহ !

‘রেহ মমতীর বিভা, উজলি স্বর্গের দিবা,
কর মা নূতন দিনমান,
আমরা ভাওয়ালবাসী, আবার আনন্দে হাসি,
আমরা যে তোমারি সন্তান !

বাণিজ্যে নাহি মা মতি, কৃষি শিল্প অধোগতি,
হৃদশার নাহি সীমা শেষ,

উপায় কর মা এর, তোমার এ ভাওয়ালের,
তুমি লক্ষ্মী—তোমার এ দেশ !

উজলি ঐশ্বর্য্য-বিভা, হাসাও জ্বরগ দিবা,
কর মা নূতন দিনমান,

আমরা ভাওয়ালবাসী, আবার আনন্দে হাসি,
আমরা যে তোমারি সন্তান !

৮

যে দেশে সাবিত্রী লীলা, দময়ন্তী জনমিলা,
জনমিলা সীতা অক্লান্তী,

যাদের চরণ স্পর্শে, পবিত্র ভারতবর্ষে,
শত তীর্থে পূর্ণ্য বহুমতী !

যে দেশে জন্মিলা মীরা, রাজপুত-রাজ-ইন্দিরা,
ব্রহ্মচর্য্য তপস্যার বেশে,

পতিপদে রাখি মতি, পতি রূপে বিশ্বপতি,
চির প্রেমে পূজিলা উদ্দেশে ।

তুমিও তাদের মেয়ে, সে দেশে জনম পেয়ে,
তুমিও ত মহাপুণ্যবতী,

লহ মা তাদের মত, সে তপস্যা পুণ্যব্রত,
ভগবানে অনন্ত ভকতি !

যাবে হুঃখ যাবে শোক, পাবে সে বৈকুণ্ঠলোক,
চির সুখ চির শান্তি যাম,

বিশ্বের মঙ্গলে আশা, ঢাল বিশ্ব ভালবাসা,
ভজ বিশ্বপতি হরিনাম !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস ।



বিনাহের উপদেশ ।

২রা আষাঢ় বুধবার, ১৩১৬ ।

বারা * *, মা * *, তোমরা আজ বিধাতাকে সাক্ষী করিয়া অতি গুরুতর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলে । বিধাতা তোমাদিগকে আশীর্বাদ করুন, তাঁহার রূপায় তোমাদের জীবন যেন নধুময় হয় । তাঁহার রূপাকে সম্বল করিয়া তোমরা নির্ভয়ে সংসারে পদ নিক্ষেপ কর । তোমাদের জীবনে তাঁহার রূপার জয় হউক ।

নীরবে কর্তব্য পালনের জন্ত বিধাতা সকলকেই ইঙ্গিত করিতেছেন । তিনি যেমন নীরবে জগতের সেবাস্থান বহন করিতেছেন, তাঁহার ইঙ্গিতও, তেমনি, নরনারীকে সেবাস্থান পালনের জন্ত উদ্বুদ্ধ করিতেছে । মানুষের সৃষ্টি স্বার্থসাধনের জন্ত নয়, পরার্থ এবং পরমার্থ সাধনের জন্ত । পরার্থ এবং পরমার্থ সাধন, জীবনবৃক্ষের দুটি অমৃত ফল । আপনার ত্রায় ভাবিয়া যে পরের মঙ্গলসাধন করিতে পারে, সে-ই তাঁহার সুপুত্র ও সুকন্যা,—সে-ই পরমার্থ সাধনের অধিকারী । তিনি তোমাদিগের জন্ত তাঁহার অমূল্য সৃষ্টির কত কি ব্যয় করিয়াছেন, আজ বিশেষ ভাবে চিন্তা কর, এবং তাঁহার অমূল্যদানের কি প্রতিদান করিবে, আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে, তাহার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হও । এ দেশের কত নরনারী স্বার্থ সাধনে তৎপর, একবার চিন্তা কর । এদেশের কত নরনারী স্বদেশকে ভুলিয়া রহিয়াছে—তাঁহা স্মরণ কর । এদেশের কত শত নরনারী কুশিক্ষা ও অশিক্ষা নিমজ্জিত, একবার ধারণা কর । আজ যদি নবব্রত গ্রহণের জন্ত তোমরা উদ্বুদ্ধ

হইলে, তবে আনি আহ্বান করিতেছি, বিধাতার ইঙ্গিত আজ বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম কর,—তিনি বলিতেছেন, তোমরা দুয়ে মিলিয়া একাত্মক হইয়া কেবল জগতের সেবা করিবে,—পরকে আপনার করিয়া তাঁহাদের জন্ত জীবন দিতে প্রস্তুত হইবে ।

উপদেশ অনেকে শুনে, কিন্তু হৃদয় পরে অনেকেই ভুলিয়া যায় । ভুলিয়া গিয়া সাংসারিকতার পাশে নিমজ্জিত হয় । তোমাদের জীবনেও যদি তাহাই হয়, তবে বৃথা বিধাতার এই সুন্দর আয়োজন ! তিনি তোমাদিগকে কেন মিলিত করিতেছেন, তাহা কি শয়নে স্বপনে নিয়ত চিন্তা করিবে না ? তাঁহার নিগূঢ় উদ্দেশ্যের মর্মভেদ করিতে তোমরা কি চেষ্টা করিবে না ? আমি তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিতে চেষ্টা করিয়া ইহাই বুঝিয়াছি যে, তোমাদের মিলনের উদ্দেশ্য কেবল “রাজবাড়ী”র উন্নতি সাধন । পুণ্যলোক ৬ ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের পুত্র নাম আজ বিশেষ ভাবে মনে জাগিতেছে । তিনি একসময়ে রাজবাড়ীর নিকটবর্তী স্থানের উন্নতির জন্ত ৩০টি অবৃত্তিক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন । তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সে সকল কালের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে । সেই লুপ্ত-স্মৃতিকে জাগাইবার জন্ত বিধাতার এই আয়োজন । তোমরা এ কথা বিশেষ ভাবে আজ হৃদয়ঙ্গম কর । যদি তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিতে না পার, তোমাদের জীবন সাধারণ মানুষের ত্রায় হইবে, এবং সেই চির-বিশেষের বিশেষ অন্ধকারে লুকাই

দ্বিত হইবে, তাঁহার সুপ্রসন্ন মুখ আর তোমরা দেখিতে পাইবে না । সুতরাং তোমরাও মলিন ও নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িবে ।

এ দেশের সনাতন শাস্ত্র চিরদিন ঘোষণা করিয়াছে যে, ভক্তের অভ্যাদয় ভগবানের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত । ভক্ত কে ?—একবার উত্তরে শাস্ত্র বলেন, যাহাকে দেখিলে ভগবানকে মনে হয়, তিনিই ভক্ত । ভগবান কোথায় ? তিনি তাঁহার সৃষ্ট নর-নারী, জীব-জন্তুতে ওতপ্রোতভাবে বিমিশ্রিত, —অথবা অনন্তরূপিণী অনন্ত প্রকৃতিতে প্রসুটিত । সুতরাং প্রকৃত ভক্ত কে, একবার উত্তর এই, যে জীব ও শিবের একত্ব জ্ঞানে বিভোর হইয়া জীবের মঙ্গলের জন্ত দেহপাত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । যে এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—তাঁহার মুখে কথাটী নাই, ফল-নিরপেক্ষ হইয়া, নীরবে, নিষ্কাম ভাবে, সে কেবল খাটিয়া খাটিয়া চলিয়া যাইতেছে । সে অবি-রক্ত, সে অবিভক্ত, সে অবিচলিত, সে অহে-তুক কর্ম সাধনায় বদ্ধপরিকর । তাহার চরিত্রের কোনপ্রকার বাহ্য প্রকাশ নাই, তাহার কৃতকর্মের কোন বাহ্যভঙ্গ নাই—লোক-রঞ্জনের জন্ত সে উৎফুল্ল নয়, সে প্রশংসার তুরী ভেরীর নিনাদ শ্রবণের জন্ত সংবাদ-পত্রের পানে তাকাইয়া থাকে না, অথবা নির্লজ্জের ভ্রায় আপন প্রশংসা আপনি গাইয়া বেড়ায় না । সে আপনাতে আপনি গুপ্ত, অথবা অনন্ত জন-সংস্পর্শ লুপ্ত, অথবা সংসার-নিরঞ্জন-তটে দাঁড়াইয়া সে কেবল জীবের উদ্ধারের কল্যাণ-গীতা উচ্চারণ ও ছনয়নে অঙ্গ বর্ষণ করিতেছে । তিনি জীষ্টই হউন, বা বুদ্ধই হউন, চৈতন্যই হউন বা ম্যাট্‌সিনিই হউন, তিনি ডোরাই হউন বা জেনীই হউন, ১—চিরকাল নরনারী তাঁহাদের নাম ভক্তির

সহিত স্মরণ না করিয়া পারিবে না । তাঁহার মানবদেহে অমর ও অক্ষয় চিদাভাস—অথবা তাঁহার মানবদেহে চিরায়ত দেবলীলা । সে সব কথা মস্তিতে আমার রসনা বচন ভোলে, জিহ্বা আড়ষ্ট হয়, নয়নে অশ্রু ঝরে । আমার বড় সাধ হয়, আমি এই মর্ত্যধামে আবার সেই-রূপ ভক্তের অভ্যাদয় দেখি । কিন্তু কত কত স্থান খুজিয়া আসিলাম, সে দৃশ্য কোথাও দেখিলাম না । সে দৃশ্য চিরকাল আমার কল্পনাতেই রহিয়া গেল । আজি বার্কিকোর দ্বারে পৌছিয়াও, কিন্তু, সেই মনোমোহন দৃশ্য দেখিবার বাসনাকে একেবারে বর্জন করিতে পারিতেছি না । * * আমার বড় সাধ হয়, তোমাতে আমি সেই দৃশ্য দেখি । যাহাদের হৃদয়ের ঘরে অনেক বিত্তা বুদ্ধি আছে, তাহারা বিত্তাবুদ্ধির গৌরবে ক্ষীত, সেখানে ভক্তি ঠাঁই পায় না । যাহাদের দেহে রূপ আছে, তাহারা রূপের অহঙ্কারে মজিয়া থাকে, এই ধরাকে অবহেলার চক্ষে দেখে, সেখানেও জীব বা শিবভক্তি স্থান পায় না । আর যাহাদের অনেক ঐশ্বর্য্য আছে, তাহারা আত্মহারা, তাহারা মানুষকে পুত্তর অপেক্ষাও হেয় মনে করে, সেখানে মানবের কল্যাণ-কামনা কিরূপে স্থান পাইবে ? তাহা অসম্ভব । জানিও, প্রেয়ের রাজ্য ধ্বংস না হইলে প্রেয়ের রাজত্ব আরম্ভ হয় না । হায় অহঙ্কার, মাধবঘণা, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা এই বিশাল বিশ্বকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে—এখন পরসেবা কুসংস্কারে পরিণত, ভক্তি এখন ভণ্ডামিতে পরিসমাপ্ত । এহেন দুর্দিনেও আমি বড় আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি—* *, তোমার দ্বারা অসাধ্য সাধিত হইবে । কেননা, তোমার বাহ্যরূপ নাই, তোমার ভেমন বিত্তা-

বুদ্ধি নাই, তোমার ঐশ্বর্য্য নাই, বিলাসিতায় তোমার মন নাই,—গর্জিত মানুষের প্রিয় বাহা, তাহা কিছুই নাই। বুঝিবা এইজন্ত, তোমার হৃদয়ে হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি কিছুই নাই—আছে কেবল প্রেমের প্রভাব। তোমার মনে কামনা ও বাসনার উত্তেজনা নাই, বিলাসিতার স্পৃহা নাই,—আছে—নীরব সাধনা।—ভাল খাইব, ভাল পরিব বলিয়া কখনও ত একটুও আবদার কর নাই। আয়বর্জ্জনই তোমার স্বভাব—আমার পার্শ্বে বসিয়া বসিয়া, বুঝিবা, কেবল এই প্রার্থনাই করিয়াছ, খাটিয়া খাটিয়াই যেন জীবন পাত হয়। খাটিয়াছও ত তুমি অনেক !! সেই খাটুনির পুরস্কার—তোমাকে সীমা হইতে অসীমে, ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে, ক্রমে ক্রমে “রাজবাড়ী”র কথা ভুলিয়া, রাজ-রাজেশ্বরের “বাড়ীর”, কথা ভাবিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে তোমাকে “বড়কু” এবং “ছোটকু” কথা ভুলিয়া—অগণ্য নরনারীঃ জন্ত খাটিবার ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে;—তাই বিধাতার এই আয়োজন। তাই বলিতেছি, একবার প্রেনাঞ্জন চক্ষে লেপিয়া বিশ্ব-রাজবাড়ীর চতুর্দিকে চাহিয়া দেখ—কত “বড়কু”, কত “ছোটকু” তোমার সেবা পাইবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে। আজ ঐ নির্মল আকাশের দিকে চাহিয়া দেখ, সাক্ষী নিত্যবিনী আজ তোমাকে অগতের দ্বারে বিক্রম করিবার জন্ত দাঁড়াইয়া ইঙ্গিত করিতেছেন—আর আমরা তোমাকে কেবল সেবাভূষণে ভূষিতা করিয়া আজ সংসারের সেবার জন্ত উৎসর্গ করিতেছি।

চাহিয়া দেখ—জগজ্জননী আজ তোমাকে, নিরাভরণা * *, তোমাকে অপূর্ণ সেবাধর্মে ভূষিতা করিয়া দিতেছেন। আজ এবাড়ীর আর সকল শিক্ষা, সকল বিশেষত্ব পরিত্যাগ করিয়া জগজ্জননীর সেবাধর্মে ভূষিতা হইয়া সংসারে পদনিষ্কেপ কর। দেখিও—মায়ের আদেশ কখনও তুলিও না;—দেখিও কখনও নিজস্ব সাধনে মজিয়া মায়ের ইঙ্গিত তুলিও না। মা জগজ্জননী তোমাকে আজ বিশেষভাবে আশীর্বাদ করুন।

বাবা * *, তুমি আজ কি লইয়া ঘরে ফিরিতেছ, এতক্ষণ পর, বুঝিতেছ কি? রূপ নয়, বত্তা বুদ্ধি নয়, ঐশ্বর্য্য নয়—লইয়া চলিয়াছ এমন একখানি হৃদয়, বাহা ভরা আছে কেবল সেবা। সেবার রূপান্তরিত কথা কি তাহা জান কি? তাহাই ভক্তি। ভক্তিকে যখন ঘরে লইয়া যাইতেছ, তখন তোমাকে কি কঠোর সাধনা করিতে হইবে, তাহা বুঝিতেছ কি? অনেক সময় গেন—আর কোথায় দৈর্ঘ্য থাকা সম্ভব নয়। এক কথায় কর্তব্য বলিয়া দেই, শাস্তিতে থাকিতে হইবে; তোমাকেও সেবাধর্মে অল্প প্রাণিত হইতে হইবে। এ ব্রত বড় কঠোর ব্রত—কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে, মা * *, তোমাকে সাহায্য করিলে তুমি এই ব্রতপালনে সক্ষম হইবে। আমার বিশ্বাস আছে, জগন্মাতা তোমাকে বিশেষ রূপ সাহায্য করিবেন। আমার শেষ কথা এই,—* *-কে আদর করিও, যত্ন করিও, হাত ধরিয়া লইয়া চলিও, তোমার জীবনে অসন্তক সম্ভব হইবে। জগজ্জননী তোমাকেও আজ বিশেষভাবে আশীর্বাদ করুন।

ও শান্তি: শান্তি: শান্তি:।

গিরিজাপ্রসন্ন : (৪)

প্রকৃতই স্বধর্মরত, শাস্ত্রদর্শী, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয়ের রোগ মুক্তির চেষ্টার ফলে স্বর্গীয় গিরিজা প্রসন্নের হৃদয়ের একটা মহান ভাব পরিস্ফুরিত হইয়াছিল। উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের সংসর্গ লাভ করিয়া, তাহার ধর্ম জীবনের সংকথা শ্রবণ করিয়া, তাহার পুত্র চরিত্রের দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকি। গিরিজা-প্রসন্ন সেই উন্নত হৃদয়ের সুদীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া কেবলমাত্র কবিরাজ মহাশয়ের পরিবারবর্গকেই সুখী করেন নাই, তিনি স্থির করিতে পারিয়াছিলেন, কবিরাজ মহাশয় তাহার দেশবাসীকে সুখী করার ও গৌরবান্বিত করার উপযুক্ত পাত্র। তাই তিনি তাহার পীড়ার সময় সহোদর ভ্রাতাকে পাঠাইয়া তাহার দীর্ঘ জীবন লাভের জন্ত বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছিলেন। গিরিজাপ্রসন্নের সেই আত্মমানিক সিদ্ধান্ত কি তদ্বশে সত্য বলিয়া অব্যাহত হইতেছে না? কবিরাজ মহাশয় উপকৃত হওয়ায় গিরিজাপ্রসন্নের জন্মস্থান সিদ্ধাকাটা উপকৃত হইয়াছে। যিনি জন্মভূমিকে উন্নত করিতে চাহেন, তিনি প্রকৃতই মহৎ লোকের আশ্রয় স্বরূপ হইয়া থাকেন।

অধীনস্থ লোকের পদোন্নতির চেষ্টা।

লোকের উন্নতির পথ খুলিয়া দেওয়ার জন্তই বা তাহার কতদূর অক্লান্ত যত্ন ছিল! তাঁহার বাটীস্থ মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের নর-মাল-পরীক্ষোত্তীর্ণ ভূতপূর্ব হেডপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত মহাশয় উপযুক্ত বৈতন্য পাইতেন না। তাহার সাংসারিক

অবস্থা তখন বড়ই শোচনীয় ছিল, তাহাকে সেই সময় কতকগুলি যুবকের পড়ার খরচ ও গৃহব্যয় বহন করিতে হইত। গিরিজাপ্রসন্ন একদিন তাহার শিক্ষার পরিচয় ও অবস্থার অসচ্ছলতা বিদিত হইয়া কলিকাতা একটা চাকুরী স্থির করিয়া দিলেন। তাঁহার ষ্টেটের কয়েকজন কর্মচারী কার্যে যেরূপ দক্ষ ছিল, উদ্রপ অর্থোপায় করিতে পারিত না। গিরিজাপ্রসন্নও তখন তাহাদিগকে উপযুক্ত মাহিয়ানা দিয়া রাখিতে সমর্থ না হওয়ায়, অত্ৰ তাহাদিগের চাকুরী সংগ্রহ করিয়া দিলেন।

উক্ত পণ্ডিত মহাশয় ও কর্মচারী প্রভৃতির পদত্যাগে সিদ্ধাকাটার স্কুল ও গিরিজা প্রসন্নের ষ্টেট ক্ষতিগ্রস্ত হইল। গিরিজা-প্রসন্ন সে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাহাদের পদোন্নতির উপায় স্থির করিয়া দিতে পশ্চাৎ-পদ হইলেন না! স্বকীয় স্বার্থ হানির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যিনি পরের উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া দিয়া সুখী, তিনি কি যথার্থই উদার নহেন? আমাদের পুরাতন কর্মচারী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত রায় মহাশয় বলিয়াছেন যে, গিরিজা বাবু কলিকাতায় বাস করার সময় তিনি একটা চাকুরীর জন্ত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন। গিরিজা বাবু কিছু দিন পরে তাহার একটা চাকুরী স্থির করিয়া তাহাকে তথায় অবিলম্বে উপস্থিত হইবার জন্ত পত্র লেখেন। সে পত্র খানি গিরিজা বাবুর ৩য় ভ্রাতার হস্তগত হয়। তখন তিনিই জমিদারী কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন—

চন্দ্রকান্ত রায় চাকুরী পরিত্যাগ করিলে
ষ্টেটের কার্য ভাল রূপে নির্বাহিত হইবে না,
তিনি সে পত্র খুনি গোপন করেন। কিছু
দিন পরে উক্ত চন্দ্রকান্ত রায় সেই পত্র খানি
গিরিজা বাবুর ওয় ভ্রাতার বাসের মধ্যে
প্রাপ্ত হইলেন, তখন গিরিজা বাবুর ওয় ভ্রাতা
বলেন যে, “পত্র আমিই গোপন করিয়া-
ছিলাম। আপনারা সকলে ক্রমশঃ চলিয়া
গেলে ষ্টেটের কার্য চলিবে কিরূপে?”
গিরিজা বাবু যোগ্য লোকের পুরস্কারের জন্য
এইরূপই স্বার্থ বিসর্জন দিতে জানিতেন,
বৈষায়িক লোকের নিকট এইরূপ দৃষ্টান্ত
অমুকরণীয় না বোধ হইতে পারে, কিন্তু যিনি
বিষয়ে নিষ্পৃহ, নিঃস্বার্থপর, তিনি কি এইরূপ
মহৎ অমুষ্ঠানে মোহিত না হইয়া থাকিতে
পারেন?

গিরিজাপ্রসন্নের পাঠ্যঙ্গীবনের একটি
স্বজাতির প্রতি বাৎসল্য-স্বচক ঘটনার উল্লেখ
করিয়াই এই স্থলে তৎ সম্বন্ধে দুই একটি
কথা বলিয়া রাখা কর্তব্য মনে করিতেছি।

স্বপ্নের লোকের প্রতি অমুরাগ।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খান্দারপাড়া
গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার রায়ের বাস-
স্থান। তিনি তাহার আত্মীয় হাইকোর্টের
উকীল ৮ চন্দ্রকান্ত সেন এম্.এ, বি-এল
মহাশয়ের ব্যয়ে কলিকাতা ক্যাডেল মেডি-
কেল স্কুলে ডাক্তারী পড়িতেন। কোন
কারণ বশতঃ বসন্তকুমার আত্মীয়বর্গের
কেহ তাহাকে একটি নীচতামূলক কার্য
করিতে, অমুরোধ করেন! বসন্ত বাবু
তাহার আত্মীয়ের অমুরোধ উপেক্ষা করায়
তাহার আত্মীয় ক্রোধান্বিত হইয়া বিদ্যাভ্যাস
ধরচ বন্ধ করিয়াছেন। বসন্ত বাবু গিরিজা-
প্রসন্নের এক সমাজের লোক। বসন্ত বাবু

তাহার আত্মীয়ের হীন ব্যবহারে নিতান্ত
মর্দ্যাহত হইয়া উহা গিরিজাপ্রসন্নের কর্ণগোচর
করেন। এবং ঐ ব্যয় বন্ধ হওয়ায় তাহার
যে টিরকালের জন্ত পাঠ বন্ধ করিয়া জীবনের
অনুসরণীয় পথভ্রষ্ট হইয়া ভবিষ্যতে বিষম
বিপদে পড়িতে হইবে, তদাশঙ্কায় বিলাপ
করিতে থাকেন। গিরিজাপ্রসন্ন ঘটনাটি
শ্রুত হইয়া বসন্ত বাবুকে বলিলেন “আপনার
আত্মীয়দের অন্তায় অমুরোধে আমি আত্মরিক
হুঃখ অনুভব করিতেছি, আপনার কোন
শঙ্কা নাই। আমার এই বাসায় থাকিয়া
আপনি বিদ্যার্জন করুন, এজন্য আমি
যদি বাড়ী হইতে অতিরিক্ত ব্যয় গ্রহণ নাও
করিতে পারি, তাহা হইলেও আপনার
কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না,—আমরা
বিদ্যার্জনের জন্য যে ব্যয় পাইয়া থাকি,
তাহা দ্বারাই আপনার খরচ নির্বাহ
হইবে।

বসন্ত বাবু গিরিজাপ্রসন্নের এই মহৎ
উক্তি শ্রবণ করিয়া ভগ্ন হৃদয়ে আশাতীত
বল প্রাপ্ত হইলেন। এবং তাহার বাসায়
অবস্থান করিয়া জ্ঞানার্জন করিতে লাগি-
লেন। বসন্ত বাবু কিছুকাল ঐ বাসায়
বাসকরার পরই তাহার আত্মীয়গণ তাহার
সঙ্গে আপোষ করিয়া মনোমালিন্য দূর
করিয়া ফেলেন ও পূর্বের ভ্রাতৃ বিদ্যাভ্যাসের
ব্যয় বহন করিতে সম্মত হওয়ায়, বসন্ত
বাবু আর গিরিজাপ্রসন্নের বাসায় অবস্থান
সম্মত বোধ না করিয়া, অন্তত থাকিয়া পাঠা-
ভ্যাস করিতে লাগিলেন। গিরিজাপ্রসন্ন
পাঠ্যাবস্থায়ই পরোপকার করিতে গিয়া
এইরূপ স্বার্থ বলিদানে কৃতসংকল্প হই-
তেন! পরকে উন্নত দেখিয়া তিনি কি
আনন্দ অনুভব করিতেন, তাহা আদর্শ

কল্পনাও করিতে পারি না, ইহাইত প্রকৃত মহা !

বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয়ভাগ ।

সকল প্রকার সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র চাই, বরিশাল সাহিত্য সাধনার উপযুক্ত নহে, এই জন্ত বোধ হয় গিরিজাপ্রসন্ন স্থিরীকৃত পথে অগ্রসর হইতে কিছু বাধা প্রাপ্ত হইতেছিলেন। কবিবর মিস্টন বলিয়াছেন, মন স্বর্গকেও নরকে পরিণত করিতে পারে, নরকেও স্বর্গের অবস্থায় পরিবর্তিত করিতে পারে। বঙ্গসাহিত্যসেবী লোকান্তাবে বরিশাল তখন গিরিজাপ্রসন্নের নিকট কিরূপ অশ্রীতিকর বোধ হইতে পারে, তাহা সাহিত্যসেবী মাত্রেই অনুধাবনীয়। গিরিজাপ্রসন্নের তেজস্বী মন সাহিত্য-সেবা হইতে বিরত হইল না। তিনি আদালতের কার্যে অথবা কালক্ষেপ না করিয়া অধ্যয়ন ও পুস্তক রচনায় বিশেষ মনোনিবেশ করিতেন। এই সমস্ত দেশপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকৃত বাবু অখিনীকুমার দত্ত এম্-এ বি-এল মহাশয় ও পরলোকগত বরিশালের প্রধান উকীল প্যারীলাল রায় বি-এল ও গ্রন্থকৃত সারদাচরণ ঘোষ এম্-এ বি-এল মহোদয়গণের সঙ্গে গিরিজাপ্রসন্ন সুপরিচিত হইলেন। গিরিজাপ্রসন্ন বরিশালের সর্বশ্রেষ্ঠ উকীল ৬ প্যারীলাল রায়কে ভক্তি করিতেন। প্যারী বাবুও "তাহার অসাধারণ গুণে বিমোহিত হইয়া পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। গিরিজাপ্রসন্নের মৃত্যুপলক্ষে স্মরণার্থ সভায় প্যারী বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া যে হৃৎপূর্ণ শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই শোকোচ্ছ্বাসে গিরিজাপ্রসন্নের প্রতি তাহার স্নেহ বিশেষরূপ প্রকটিত হইয়াছিল। সারদা বধূর সঙ্গে গিরিজাপ্রসন্নের সৌহার্দ ছিল।

কলিকাতা বাস কালে গিরিজাপ্রসন্ন 'বৈরাগ্য' বহু শ্রেষ্ঠ ও শিক্ষিত লোকের সঙ্গে ভালবাসা স্থাপনের সুযোগ পাইয়াছিলেন, বরিশালে সেরূপ পান নাই, না পাওয়ার কারণও যথেষ্ট ছিল। সে সমস্তের বিস্তারিত উল্লেখ এখানে নিম্নপ্রয়োজন।

এই বরিশাল বাসকালেই বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়। এই দ্বিতীয় ভাগে "দুর্গেশনন্দিনী", "কপাল কুণ্ডলা" ও "স্বপ্নাধিনা" নামকোচিত ও বিস্তারিত হইয়াছে। তিনি দুর্গেশনন্দিনীর নারী চরিত্রের ৩টির সঙ্গে স্বভাবের যে সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন, তাহা অভিশয় হৃদয়গ্রাহী ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। গিরিজাপ্রসন্ন উহা কিরূপ সুন্দর শব্দ বিভাস পূর্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সাধারণের গোচরার্থ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

*বিমলা—প্রথর বুদ্ধিজালা-বিভাসিতা চিত্রা-নন্দময়ী রসিকগৃহিণী, আশেবা স্নেহশালিনী, জ্ঞান গভীরা, প্রোজ্জ্বলময়ী অপূর্বীভরুণী, আর তিলোত্তমা ব্রীড়াবিন্দিতা পরমরমণী নবীন। একের সহিত প্রথর দিবাংকর-কর-প্রোজ্জ্বলিত, মধুর মলয় হিলোলান্দোলিত বাসন্তী অপরাহ্নের পূর্বভাগ—অপরের সহিত মেঘ-বিনিমুক্ত শারদীয় ফুলেশধর-শোভিত আলোকময়ী যামিনীর মধ্যভাগ—আর তিলোত্তমার সহিত দ্বৈত মেঘাচ্ছাদিত জ্যোৎস্না-পরিবাপ্ত মনোমোহিনী শরদীর উষা সম্যক তুলনীয় ॥

গিরিজাপ্রসন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন ভাবের সঙ্গে যে বিমলা, আশেবা ও তিলোত্তমার সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন, উহা পাঠ করিয়া একটু কল্পনাবেশ সহকারে চিন্তা করিলেই বোধগম্য হইবে যে, গিরিজাপ্রসন্ন কেবল নরনারীর শ্রেষ্ঠ সমালোচক ছিলেন না, তিনি স্বভাব-সন্দোষেরও একজন বিশিষ্ট

উপাসক ছিলেন। যাহারা প্রকৃতির উপাসনা করিতে জানেন না, তাহারা কখনই সমালোচনায় শ্রেষ্ঠত্ব ও কাব্যরচনায় পটুতা লাভ করিতে পারেন না।

গৌর জীবনমলার চরিত্র যদি একবার চিত্তা করা যায়, তাহা হইলে প্রথমতঃ কেনা বলিবে যে, উহা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মবোধী রমণী চরিত্রের আদর্শে গঠিত হয় নাই। কতলুখার সঙ্গে বিমলার রসালাপ, তাহার সভায় বিমলার নৃত্যগীতি, তাহার প্রতি বিমলার বিলাল কটাক্ষ স্থাপন, তাহার মন হরণে বিমলার ঐকান্তিক যত্ন, আবার তাহার জীবন নাশেরই জন্ত বিমলার দুর্জয় সাহসিকতা প্রভৃতি কি অন্তঃপুরচারিনী হিন্দুর স্বভাব-বিরুদ্ধ ভাব নহে? ইহা কি বিমলা-চরিত্রের কলঙ্ক নহে? স্মরণশীল প্রবীণ সমালোচক গিরিজাপ্রসঙ্গ বিমলার চরিত্র নিকলঙ্ক প্রমাণ করিতে গিয়া যে সব সারত্ত্ব উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে আর আর বিমলার চরিত্রটী কলঙ্ক-স্পর্শ-ঘৃণ্য বোধ হইবে না। তিনি বলিয়াছেন :—

“প্রথমে বিমলার পূর্ণ পরিচয় স্মরণ করিতে হইবে। পূর্ণ পারচয়ে বিমলাকে বড় একটা আমরা শাসন-সংরক্ষিতা দেখিতে পাইনা। বিমলা বাল্যকালে কতকটা স্বাধীন ভাবেই ছিলেন। এই স্বাধীনতার ফলে তাহার বুদ্ধি, সাহস, চতুরতা প্রভৃতি কতকগুলি বৃত্তির বিশেষ বিকাশ হইয়াছিল। রসালাপের ক্ষমতা সকলের থাকে না। ইহা খানিকটা লোকের মৌলিক বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। বিমলাও এই মৌলিক ক্ষমতাটী স্বাধীনভাবে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। যৌবনকালের কথা জানি না,—প্রৌঢ় বয়সে বিমলা এই ক্ষমতাটী দ্বারা দুই একবার স্বার্থসাধন করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার ব্যবহারে আমরা বড় কুরুচি দেখিতে পাই, বিমলা তাহা দেখিতে পাইতেন না। তাহার কারণ

অনেক। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে, ইল্লিয়ের উপর যাহাদের আধিপত্য জন্মিয়াছে, ইল্লিয়ের আকর্ষণশক্তি তাহাদের নিকট বড়ই আমোদের ও ক্রীড়ার ভিনিষ। আমরা যৌবনে ইহাতে ভয় পাই, তাহারা ইহাতে সেরূপ ভয় পান না, বরং আবশ্যক হইলে তোমার আগার মত লোককে ভয় দেখাইয়া, ইহারা সেই শক্তির ক্ষমতা দেখিয়া আনন্দ লাভ করেন। এরূপ অবস্থায় যখন সে শক্তি দ্বারা অন্তরে অভিভূত করিতে পারিলে, কোন কর্তব্য কার্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তখন তাহারা সে শক্তি প্রকাশ করিতে পশ্চাত্তাপ হইরে কেন? বিমলা নিষ্করূপ বা রসিকতার ক্ষমতা জানিতেন, কিন্তু এক্ষমতা তাহার মনের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিত না। আবশ্যক মত তিনিই বরং উহাদের উপর কর্তৃত্ব করিয়া ইহাদ্বারা কার্য করাইয়া লইতেন। এরূপ লোকের কৃতিত্ব বা কি? এই সব কার্যে বাহ্যিক ক্রিয়ার সহিত ইহাদের অন্তরের মিল থাকে না।” *

আবার দেখ সমালোচক-শ্রেষ্ঠ গিরিজাপ্রসঙ্গ আশ্চর্য্যের পার্শ্বে তিলোত্তমাকে দেখিতে পাইয়া মহানন্দে বিবর্তন হইয়া কি বলিতেছেন :—

“নব প্রহৃত্তি নবজাত কন্তা কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। পার্শ্বে তাহার আর একটা ক্ষুদ্র কন্তা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অগ্রজ কন্তাটী সেই নবজাত শিশুকে মাতার স্নেহভাগিনী দেখিয়া মনঃপীড়ায় বড়ই কাতরা হইতেছে, তাহার কেশ ধরিয়া দুই একবার সঙ্গে টানিতেও ভুলিতেছি না, সমস্নেহভগিনীর এই বিবেচ্যভাব পাঠক অবশ্যই প্রত্যক্ষ করিয়াছে, প্রত্যক্ষ করিয়া ইহা নির্মলা বালিকা-হৃদয়ে কিরূপে প্রবেশ লাভ করিল, তাহাও স্থির করিয়াছে। কিছুদিন পরে আবার এই বালিকাহৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিনিষ্কপ কর, বড়টী কিছু বয়স্থা হইয়াছে, তাহার জৈশ্ব জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে। এই দেখ সেই

কনিষ্ঠার প্রতি দ্বেষভাবপূর্ণ জ্যোষ্ঠাই আজি কনিষ্ঠাকে কি ভাবে দৈখিতেছে। উল্লেখ্যই ক্ষুদ্র, কিন্তু জ্যোষ্ঠা কনিষ্ঠাকে ক্রোড়ে করিয়া মুগ্ধচূষন করিতেছে। এখন আর সে দ্বেষ নাই। এখন কনিষ্ঠা কান্দিলে জ্যোষ্ঠা তাহাকে মাতৃক্রোড়ে সহাস্যবদনে অর্পণ করে। এই জ্যোষ্ঠার ক্রোড়ে কনিষ্ঠা অপূর্ণ সুন্দর নয় কি ?”

এই উদাহরণটা বড়ই চিত্তহারী, বড়ই ভাবনয়। আমরা ইহা যতই চিন্তা করি, ততই তিলোত্তমার প্রতি আশ্রয়ভালবাসা আমাদের কাছে মোহিত করে। সমালোচক ইহা দ্বারা দুইটা কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। ১মটা—আয়েষা মুখে নিকাম প্রণয়ী বলিয়া গর্ব করিয়াছেন, বাস্তবিক তাঁহার প্রণয় নিকাম নহে। প্রণয়ীর কথা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। তাহার একান্ত সত্যপ্রিয় হইলেও এ সম্বন্ধে তাহারা ছই এক সময় বোর মিথ্যা-বাদী বলিয়া প্রমাণীত হয়, ইহা প্রণয়েরই অঙ্গুত প্রতারণা।

২য়টা—তিলোত্তমার প্রতি আশ্রয়ভালবাসা প্রগাঢ় স্নেহ যেন দিন দিনই তিলোত্তমাকে আশ্রয়দান করিয়া স্নানীত করিতেছিল।

সমালোচক গিরিজাপ্রসন্ন চরিত্রবিশ্লেষণ কালে যে সব দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন, তাহা সমালোচ্য চরিত্রটার সঙ্গে এতই সাদৃশ্য যে, দৃষ্টান্তগুলি স্বরণ করিয়া রাখিলেই চরিত্রটার গূঢ়ভাব সহজেই হৃদয়স্থ করা যায়। এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রয়োগে তিনি বড়ই দক্ষ ছিলেন। একান্ত তাঁহার সমালোচনার শক্তিটাও অনন্ত-সাধারণ হইয়া উঠিয়াছিল। কি প্রকৃতির স্নেহময়ী ছদ্মিতা কাপালিক-প্রতিপালিতা কপালকুণ্ডলার চরিত্র বিশ্লেষণকালে, কি দুঃখিনী গতিমিলন-বিরহিতা মনোরমার চরিত্র ব্যাখ্যাকালে তিনি এইরূপ সুন্দর সুন্দর

দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া চরিত্রগুলি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহারা গিরিজাপ্রসন্নের সমালোচনা পটু হইয়া নোহিত হইতে চাহেন, তাহারা “বন্ধিমচন্দ্র” দ্বিতীয় ভাগ আশ্রয় পাঠ করিয়া দেখুন। বন্ধিমচন্দ্র তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই দ্বিতীয় ভাগেই উপস্থাপিত চরিত্রগুলি, বিশেষতঃ নারী-চরিত্রগুলির সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির কি মনো-মোহন সাদৃশ্য, তাহা বেশই দেখান হইয়াছে। বন্ধিমচন্দ্র ১ম ভাগ ও ৩য় ভাগ অত্যন্ত কারণে এই ২য় ভাগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু এই ২য় ভাগের দৃষ্টান্ত-গুলি আমাদের নিকট অল্প ছই ভাগ অপেক্ষা অধিকতর স্পৃহনীয় বোধ হয়। আমরা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সে সব স্থান এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। সমালোচক সমাজের উচ্চ শিক্ষাদাতা। সাধারণের নিকট যে চিত্র অবোধ বা স্বর্ণা, স্বল্পদর্শী সমালোচক সেই চরিত্র হইতেই সার রত্ন উদ্ধার করিয়া মানবের হৃদয়পটে প্রতিফলিত করিয়া দিয়া থাকেন। যে দিন সমালোচকের অভাব হইবে, সেই দিন কাব্যসৌন্দর্য্য উপভোগের পিপাসা বা ক্ষমতা বিলুপ্ত হইবে। সৌন্দর্য্য প্রেমময় ভগবানের অভিভাবক গুণ, যিনি সেই গুণ বা সৌন্দর্য্য বাহির করিয়া দিতে সমর্থ—তিনি ভগবৎরাজ্যে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করিতেও ক্ষমতাপন্ন। সমালোচকের গুণ ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। গিরিজাপ্রসন্ন সেই সৌন্দর্য্য বাহির করিতে কত দূর দক্ষ ছিলেন, অমর কবি বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কলিকাতা রিভিউ-এর মন্তব্য দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত হইবে।

বন্ধিম বাবুর পত্র।

সাদর সম্ভাষণ,

আপনার পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি।

আপনি যে সংকল্প করিয়াছেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি হইতে পারে না। কেবল এই কথা যে, আমার প্রণীত নরনারী চরিত্রগুলি আপনাদিগের এতদূত পরিশ্রমের বোঝা কিনা সন্দেহ। তবে আপনি স্থলেখক এবং উৎকৃষ্ট বোদ্ধা, তাহার পরিচয় পূর্বেই পাইয়াছি। আপনার যত্নে আমার রচনা আশা-ভীত সফলতা লাভ করিতে পারিবে, এমন ভরসা করি। আমার পুস্তক হইতে যেখানে

যতদূর উদ্ধৃত করা আবশ্যক বোধ করেন, তাহা করিবেন, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

পুস্তকের নাম যাহা নির্ধারিত করিয়াছেন, তাহাতেও কোন আপত্তি হইতে পারে না।

আমি চন্দ্র বাবুর মতের অপেক্ষা না করিয়াই আপনার পত্রের উত্তর দিলাম, কেননা আপনার বিচারশক্তির পরিচয় পূর্বেই পাইয়াছি।”

শ্রীবক্ষিমচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

সাংখ্য-সূত্র।

ভূমিকা।

আজকালের বৎসর পূর্বে বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য এবং অনিরুদ্ধ কৃত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সাংখ্য সূত্র অথবা ষড়্‌াধ্যায়ী সাংখ্য প্রবচনের অনুবাদ ও টীকা লিখিয়াছিলাম। নিজের পাঠের সুবিধা ও অর্থ বোধের জন্ত সাংখ্য শাস্ত্র অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে এই অনুবাদ করিয়া গিয়াছিলাম। স্মরণ্য ইহা অসম্পূর্ণ, এবং এ অবস্থায় ইহা প্রকাশের অনুপযুক্ত বলিয়া, বিশেষ সংশোধন না করিয়া ইহা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় ছিল না। বন্ধুবর দেবী প্রসন্ন বাবু ইহা দেখিয়া প্রকাশের অভিপ্রায় করায় এই অবস্থায়ই ইহা নব্যভারতে প্রকাশিত হইল।

সাংখ্য সূত্রের পূর্বভাব স্বরূপ প্রথমে বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্যভূমিকা ও পণ্ডিত দ্বারকা নাথ বিদ্যাভূষণ প্রকাশিত সাংখ্য দর্শনের ভূমিকা মাত্র এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

বিজ্ঞানভিক্ষু ভাষ্যভূমিকায় বলিয়াছেন :—“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” প্রভৃতি প্রতিতে,

পরমপুরুষার্থ সাধক আত্মসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এই ত্রিবিধ উপায় বিহিত আছে। স্মৃতিতে আছে—

শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যোক্ত্যামন্তব্যোন্মোপপত্তিভিঃ।

মহা হি সত্যং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ ॥

যোগ শাস্ত্রোক্ত উপায়ে এই মনন, ধ্যান বা নিদিধ্যাসন করিতে হয়। এইরূপে শ্রবণাদি-দ্বারা পুরুষার্থ সাধন—শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে।

এই ষড়্‌াধ্যায়ী রূপ বিবেক-শাস্ত্রের দ্বারা কপিগমূর্ত্তি ভগবান, সেই পুরুষার্থসাধনের হেতুভূত জ্ঞান বিবয়ে শ্রুতির অবিরোধী বিবিধ উপপত্তি উপদেশ করিয়াছেন।

তত্ত্বমাসাখ্য যে সূত্র আছে, তাহার সহিত এই গ্রন্থের পুনরুক্তি নাই। তত্ত্বমাসে যাহা সংক্ষেপে বর্ণিত, এই গ্রন্থে তাহাই বিস্তারিত হইয়াছে। এইজন্ত যোগসূত্রের জ্ঞায়, এই গ্রন্থেরও সাংখ্যপ্রবচন আখ্যায় উপযুক্ত। তবে যোগসূত্র জৈমিনীর নিকটপন করিয়া ইহার নানতা পরিহার করিয়াছেন।

সাংখ্য শব্দের অর্থ কি?

সংখ্যাঃ প্রকৃতিঃ চৈব প্রকৃতিঃ চ প্রকৃতিঃ ।

তদ্বানি চ চতুর্দশিং তেন সংখ্যাঃ প্রকৃতিঃ ॥

ইতি ভারত ।

সম্যক্ বিবেচনাপূর্বক আত্মকথনই
সংখ্যা । ‘সম্যক্ খ্যায়তে’ ইতি সংখ্যা ।

সাংখ্য শাস্ত্র চতুর্বিধাঙ্গক । যথা,—(১)
হেয়, অর্থাৎ ত্রিবিধ হুঃখ । (২) হান, অর্থাৎ
বিবিধ হুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি । (৩) হেয়-
হেতু, অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের সংযোগজনিত
অবিবেক । আর (৪) হানোপায়,—বিবেক
খ্যাতি ।

সাংখ্যদর্শনের সহিত অগ্র দর্শনের অর্থাৎ
জ্ঞান, বৈশেষিক বা বেদান্ত দর্শনের বিশেষ
বিরোধ নাই । (বিজ্ঞান ভিক্ষু প্রথমে
বুঝাইয়াছেন যে, জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন
দর্শন শাস্ত্র ।)

অনিরুদ্ধও বলিয়াছেন, পরাতৈবরাগা
বুঝাইতে অতি কারুণিক মহামুনি কপিল
জগৎ উদ্ধার জন্ত এই মোক্ষ শাস্ত্র আরম্ভ
করেন । সুতরাং অনিরুদ্ধের মতেও এই
ষড়্বাঙ্গী সাংখ্য সূত্রই মূল সাংখ্য শাস্ত্র ।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যভূষণ মহাশয় যে
সাংখ্যদর্শনের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন,
তাহার ভূমিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

“সাংখ্য শাস্ত্র কপিল প্রণীত বলিয়া
প্রসিদ্ধ । কোন্ সময়ে ইহার সৃষ্টি, তাহা
নির্ণয় করিবার উপায় নাই ।

রাজতরঙ্গিনীতে আছে, কাশ্মীর-
গৌরীন্দ্রের সময়, অর্থাৎ কলির ৬৫৩ বৎসর
গত হইলে কুরুপাণ্ডবেরা উৎপন্ন হন,—

“শতেন্দ্র-মট-শকাঙ্কেষু অধিকেষু চ ভূতলে ।

কলেগতেষু বর্গানাং ভবন কুরুপাণ্ডবঃ ॥

এক্ষণে কলির ৪৯৬৯ বৎসর অতীত ।

অত্র এই যুগটির ৪৩১৬ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ
করেন ।

বরাহসংহিতা ও জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থে
আছে যে, সপ্তবিংশতিশ্লোক একশত বৎসর অন্তর
এক এক নক্ষত্রে গমন করে । যুগটির
রাজতরালে, সপ্তবিংশতিশ্লোক নক্ষত্রে ছিল ।
তাহা ধরিয়া গণনা করিয়া বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব-
কাল, ২৫২৬ যুগটির এক হয় ।

পূর্ব হিসাবের সহিত এই হিসাবে ১০০
বৎসর বিরোধ হয় মাত্র । এই যুগটির
সময় ব্যাসদেব ছিলেন । তাহার রচিত
শ্রীমদ্ভগবদগীতায় আছে—“সিদ্ধানাম্ কপিলো-
মুনিঃ ।” গীতায় সাংখ্যবোগ উল্লিখিত আছে ।
অতএব, কপিল ব্যাসের পূর্ববর্তী ।

বিষ্ণুপুরাণে আছে—

কপিলশির্ষগবতঃ সর্বভূতন্ত বৈ বিজ্ঞ ।

বিকোরং শোভগম্যোহনাশায়োকীমুপাগত ॥

বিষ্ণুপুরাণের সৃষ্টি প্রকরণে আছে—

“অবাক্ষরং যৎ সত্যং প্রধানমুষ্ণি সত্তমৈঃ ।

প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ স্তম্ভঃ নিত্যঃ সর্বসাম্বকঃ ॥

অক্ষরং নাশ্যনাশ্যমমেরং মজরং ধ্রুবং ।

শব্দ স্পর্শ বিহীনং তৎ রূপাদিভিরসংহতং ॥

ত্রিগুণং তৎ জগৎস্বয়মিহ অনাদি প্রভাবাপ্যরং ।

তেনাপ্রে সর্বমেবাদীতং ব্যাপ্তং বৈ প্রলয়াদমু ॥”

ভাগবতে আছে,—

“পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিকেশঃ কালবিপ্লুতঃ ।

প্রোবাচাহুরয়ে সাংখ্যাতত্ত্বগ্রাম বিনির্গমং ॥”

(কালবিপ্লুতঃ = কালক্রমে বিনষ্ট । সেই
বিনষ্ট সাংখ্যশাস্ত্র কপিল আশ্রয়িত বহিরা-
ছিলেন ; অথবা যে সাংখ্য শাস্ত্র এক্ষণে
কালক্রমে বিনষ্ট তাহা কপিল আশ্রয়িত
বলিয়াছিলেন ?)

মৎস্য পুরাণে আছে—

“সাংখ্যং সাংখ্যায়কত্বাদি কপিলাদিভিরুচ্যতে ।”

ভারতে আছে—

“সাংখ্যঃ প্রকৃতিঃ চৈব প্রকৃতিঃ প্রকৃতিঃ ।

তদ্বানি চ চতুর্দশিং তেন সাংখ্যঃ প্রকৃতিঃ ॥”

কালিদাস . কুমারসম্ভবে বলিয়াছেন,
“স্বাম্যনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থপ্রবর্তিনীং ।
তদ্বর্শিনমুদাসীনুং স্বাধেব পুণ্যং বিদুঃ ।”
মাঘেও সাংখ্যদর্শনের মতের উল্লেখ আছে ।
“বিজয়ন্তরি সেনায়াঃ সাক্ষিমাভ্রেহপদিশ্যতাং ।
ফলতয়ি সমীক্ষ্যোক্তে বুদ্ধেভোগইবাশ্মনি ।”
ফলতঃ ঋগ্বেদ বেদন বেদের প্রথম,
সাংখ্যও তেমনি সকল দর্শনের প্রথম ।”

সাংখ্য-প্রবচন ।

প্রথম অধ্যায়,—বিষয় নিরূপণ ।
“হেয় হানোঁতয়ো হেঁতু ইতিবাহা যথাক্রমম্ ।
চত্বারশাজ মুখ্যার্থা অধ্যায়ৈশ্চিন্ প্রপঞ্চিতাঃ ॥”

১। অর্থ ত্রিবিধ হ্রুৎথের অত্যন্ত নিবৃত্তিই
পরম পুরুষার্থ ।

অর্থ—মঙ্গলাচরণ জন্ম । ৫।১ সূত্র দ্রষ্টব্য ।
(অনিঃ) । অধিকার বুঝাইবার জন্ম (বিঃ) ॥*
অর্থাৎ আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহাতে
পুরুষার্থ নিরূপিত হইয়াছে ।

ত্রিবিধ হ্রুৎথ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক
ও আধিদৈবিক হ্রুৎথ ।

আধ্যাত্মিক হ্রুৎথ দ্বিবিধ,—শারীরিক,
যথা, রোগাদি, ইহারা শরীরে প্রথম উৎপন্ন
হয় বলিয়া শারীরিক । এবং (২) মানসিক,
যথা, কাম, ক্রোধাদি ; ইহারা কেবল মনেই
উৎপন্ন হয় ।

* আধিভৌতিক হ্রুৎথ—পশু, পক্ষী প্রভৃতি
ভূতজন্মিত । ব্যাঘ্র চৌর্যাদি জন্মিত ।

আধিদৈবিক হ্রুৎথ—গ্রহভূতাদিজন্মিত,
দাহ শূঁতাদিজন্মিত ।

অত্যন্ত নিবৃত্তি—ভবিষ্যতে সর্বজাতীয়
হ্রুৎথের নিবৃত্তি । নিঃশেষ রূপে স্থল* স্বপ্ন

* এই অনুবাদে (বিঃ) অথবা (বিঃ ভিঃ) অর্থ—
“বিজ্ঞানভিক্ষু মতে, এবং (অনিঃ) অর্থে অনিরুদ্ধ মতে ।

সর্ব হ্রুৎথের নিবৃত্তি । ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ
এই চতুর্কর্গ মধ্যে মোক্ষই পরম পুরুষার্থ ।

বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন,—প্রারম্ভ ভোগ
করিতেই হইবে, তাহার নিবৃত্তি সম্ভব নহে ।
সুতরাং অনাগত স্বপ্ন হ্রুৎথই হয় । চিত্তে
ভবিষ্যৎ হ্রুৎথের বে উপাদান বা বীজ থাকে,
তাহা নষ্ট হইলে হ্রুৎথ নিবৃত্তি হয় । চিত্তে
হ্রুৎথ বীজ থাকে । চিত্ত নিরোধ করিতে হয় ।

জীবমুক্তিতে প্রারম্ভ ব্যতীত অনাগত
হ্রুৎথের নিবৃত্তি হয় । বিদেহমুক্তিতে চিত্তের
সহিত সর্ব হ্রুৎথ নাশ হয় ।

সাংখ্য মতে, পুরুষে বস্তু বিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তির
প্রতিবিম্ব পতিত হয়, পুরুষ তাহা গ্রহণ করে ।
তবে বুদ্ধি যেমন বিষয়াকারে আকারিত হয়,
পুরুষ সেরূপ হয় না । সুতরাং উপরাগ বা
প্রতিবিম্ব রূপেই পুরুষের স্মৃৎথ হ্রুৎথ থাকে ।

পুরুষের এই প্রতিবিম্বরূপ হ্রুৎথাদি গ্রহ-
ণই ভোগ । এই গ্রহণ—স্নিকটস্থ কুসুমের
বর্ণ ক্ষটিকের গ্রহণের ত্যায় । এই প্রতিবিম্বকে
বৈদান্তিকেরা অধ্যাস বলেন । যথা,—

“তস্মিন্ চিদ্রূপে স্বারে সমস্তাবস্ত দৃষ্টং ।
ইমান্ প্রতিবিম্বস্তি সরসীং তটক্রমাঃ ॥”

এই প্রতিবিম্বরূপ হ্রুৎথ নিবৃত্তিই অত্যন্ত
পুরুষার্থ । স্মৃৎথ ভ্রান্তি মাত্র—নাশ্যৎ পুরুষার্থ
নহে ।

২। দৃষ্ট উপায় দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয় না ।
তাহাতে হ্রুৎথ নিবৃত্ত হইলেও, আবার তাহার
অনুবর্তন হইতে দেখা যায় ।

দৃষ্ট উপায়—লৌকিক উপায় । শরীরে
রোগ ওষধের দ্বারা উপস্থিত নিবৃত্তি হইলেও
পরে আবার রোগ হইতে পারে । ধন
দারিত্র্য হ্রুৎথ নিবৃত্তির এক উপায় হইলেও
ধনক্ষয় হইয়া সে হ্রুৎথ আসিতে পারে ।

ন হি ভগ্ন ভবেদুক্তি জন্মান্তর শতৈরপি ॥”

যে পদার্থ বিজ্ঞান থাকিতে যে ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে, কারণান্তরের অপেক্ষা করে না, সেই ধর্মই সেই পদার্থের স্বাভাবিক।

আত্মাতে চিত্তের প্রতিবিম্ব পড়ে। চিত্ত ত্রিগুণাত্মক। রজঃগুণ হেতু চিত্তের হুঃখ স্বাভাবিক। তবে সুখাত্মক সব গুণের দ্বারা যখন রজোগুণ অভিভূত হয়, তখন হুঃখের বিকাশ থাকে না। এইজন্য সর্বদা হুঃখের উপলব্ধি হয় না।

হুঃখ আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম—ইহা বোধ্যমত। বোধের চিত্তকেই আত্মা বলে। এক আত্মারই যখন বদ্ধ ও মোক্ষ অবস্থা অনুমিত, —তখন ‘আত্মা-নাশে মোক্ষ’—ইহা বলা যায় না।

৮। যাহা স্বভাব, তাহা অপায়ী (তাহা দূর করা যায় না)। তাহা দূর করিবার জন্য অনুষ্ঠান লক্ষিত হইতে পারে না, ও তাহা প্রামাণ্যও হয় না।

যাবৎ দ্রব্য থাকে, তাবৎ তাহার স্বভাবের অস্তিত্ব হয় না।

অতএব আত্মা স্বভাবতঃ বদ্ধ হইলে, বেদে তাহার মুক্তির উপদেশ থাকিত না,—থাকিলে বেদ অপ্রামাণ্য হইত। এতএব আত্মা স্বভাবতঃ বদ্ধ নহে।

৯। যাহা করা ঐসম্ভব, তাহা করিবার উপদেশ বিহিত নহে। থাকিলেও তাহা গ্রাহ্য নহে।

আত্মা স্বাভাবিক বদ্ধ হইলে, মোক্ষ উপদেশ সম্বন্ধে আর বেদের প্রামাণ্য থাকে না।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে,—

১০। যদি বস্তুর গুরুত্ব ও বীজের উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট করিবার উপদেশের দ্বারা এই উপদেশ হয়?

রঞ্জিত করিলে বস্তুর গুরুত্ব নষ্ট হয়। ভজিত বা দগ্ধ বীজের অকুর উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয়। সুতরাং এস্থলে স্বাভাবিক ধর্ম নষ্ট করিবার উপদেশ কিরূপে বার্থ বলা যায়?

ইহার উত্তরে উক্ত হইয়াছে—

১১। এ উপদেশ শক্তির উদ্ভব—অনুদ্ভব সম্বন্ধে। যাহা অশক্য বা অসম্ভব,—তাহা সম্বন্ধে নহে।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তে বস্তুর গুরুত্ব ধর্ম বা বীজের উৎপাদিকা শক্তি অভিভূত হইয়া উদ্ভব অবস্থা হইতে অনুদ্ভব অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আবার উপযুক্ত কারণ যোগে তাহার উদ্ভব হইতে পারে। উপযুক্তরূপে ধোত করিয়া বস্তুর গুরুত্ব আবার আইসে। যোগীর সংকল্প বলে ভজিত বীজের ও উৎপাদিকা শক্তি ফিরিয়া আসে। হুঃখ স্বাভাবিক হইলে, এইরূপে তাহার আবির্ভাব তিরোভাব হইতে পারে বটে। কিন্তু তাহার অস্তিত্ব নিবৃত্তি হয় না।

নৈমিত্তিক কামাদি যোগে আত্মা বদ্ধ নহে।

১২। আত্মা কালযোগে বদ্ধ হয় না—যাহা ব্যাপক ও নিত্য তাহা সকলের সহিত সর্বদা সম্বন্ধ থাকে।

আত্মা—নিত্য ও সর্বব্যাপী, এজন্য সর্বকালের সহিত তাহার সম্বন্ধও নিত্য। (জনিঃ)

কাল—নিত্য ও সর্বব্যাপী,—এজন্য (মুক্ত ও বদ্ধ) সকল আত্মার সহিত কালের নিত্য সম্বন্ধ। (বিঃ ভিঃ)।

অতএব গুরুত্বের বন্ধন সম্বন্ধে, কাল নিমিত্ত-কারণ নহে।

১৩। এই কারণে আত্মা দেশ যোগেও বদ্ধ হয় না।

দেশও ব্যাপক। তাহার সহিতও মুক্ত বদ্ধ সকল আত্মার সম্বন্ধ। অতএব নৈমিত্তিক দেশযোগে আত্মার বন্ধন কারণ হইতে পারে না।

(এই সূত্র অনিরুদ্ধ গ্রহণ করেন নাই।)

১৪। সেইরূপ অবস্থা যোগেও আত্মার বন্ধন হয় না। কেন না অবস্থা দেহের ধর্ম মাত্র।

অবস্থা—পরিণামী জড় দেহের ধর্ম। তাহা পঞ্চভূতের সংঘাত দেহরূপ। তাহা সচেতন আত্মাকে বদ্ধ করিতে পারে না। আর একের ধর্মে অন্ত্রে বদ্ধ হইলে, মুক্ত পুরুষও বদ্ধ হইতে পারে।

১৫। তাহা হইলে, “অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ” অর্থাৎ পুরুষ অসঙ্গ,—এই শ্রুতির বাধা হয়।

এজন্ত পুরুষের সহিত অবস্থার এবং কাল ও দেশের সঙ্গ স্বীকৃত হয় না।

১৬। কর্মদ্বারাও আত্মা বদ্ধ হয় না। কেন না কর্ম আত্মার ধর্ম নহে। একের ধর্মে অন্ত্রের বন্ধন হয় না। আর তাহা হইলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়।

অর্থাৎ তাহা হইলে মুক্ত বদ্ধ সকল পুরুষেরই বন্ধন হইতে পারে। আর আত্মা স্বকর্ম দ্বারা বদ্ধ, ইহা স্বীকার করিলে, মহা প্রলয় কালেও সে বন্ধন থাকিতে পারিত।

১৭। আর যদি একের ধর্ম অন্ত্রে মুক্ত হইত, তবে ভোগ-বৈচিত্র্য থাকিত না।

দুঃখ যোগ বিনা কেবল দুঃখ সাক্ষাৎকার যদি ভোগহেতু হইত, তবে, পুরুষ বিভূ বলিয়া, সকল পুরুষের চিত্তগত দুঃখের সঙ্গী সকল পুরুষ হইত, ও সকল পুরুষ তাহা ভোগ করিত। এবং পুরুষভেদে ভোগেরও তার-তম্য বা প্রভেদ হইত না। তাহা হইলে কেহ সুখী কেহ দুঃখী একরূপ ভেদ থাকিত না। একের সুখে সকলে সুখী হইত, একের দুঃখে সকলে দুঃখী হইত।

অতএব যে চিত্তের দুঃখ যে পুরুষে প্রতি-বিধরণে যোগ হয়, যে চিত্তের সাহিত যে পুরুষের স্বধানাভাব থাকে, সেই পুরুষই সেই চিত্তের দুঃখ ভোগ করে।

১৮। প্রকৃতি অনিচ্ছন একরূপ হয়, তাহাও বলা যায় না। কেন না প্রকৃতি পরাধীন।

প্রকৃতি আপনাই প্রবৃত্তিময়ী হইয়া পুরুষকে বদ্ধ করে, ইহাও বলা যায় না। কেন না তাহা হইলে মুক্ত বদ্ধ নির্বিশেষে সকল পুরুষকেই প্রকৃতি বদ্ধ করিতে পারিত।

সংযোগ বিশেষ হেতুই প্রকৃতি পুরুষকে বদ্ধ করিতে পারে। সে সংযোগ না থাকিলে পারে না। পরবর্তী সূত্রে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু ।

মানব সমাজ ১ (৫)

দেহের স্বাস্থ্য ও উপযোগীতা, দুই ই থাকার
চাই। কেবল সুস্থ হইলে হইবে না, সমা-
জের আবশ্যকীয় কর্মের উপযোগী হওয়া
চাই। কর্ম যদিও মন হইতেই আবশ্য ও
মন হইতেই নিষ্পন্ন হয়, দেহের বড় বেশী
অপেক্ষা করে না * ; তথাপি দেহকে উপেক্ষা
করা যায় না। কারণ দেহ সুস্থ না হইলে
মন উন্নত ও পবিত্র হইবে না, সুতরাং
কর্মও প্রতিহত হইবে। মনই কর্মের
সংকল্প করিবে, দেহ সেই কর্মসাধনের সহায়
হইবে। সামাজিক চতুর্নিধি কর্মই হওয়া
চাই, আর দেহ ঐ কর্ম করিবার যোগ্য
হওয়া আবশ্যক। দেহ বংশগত নিয়মের
অধীন ; মনও অনেক সংশ্লিষ্ট তাহাই। কিন্তু
বংশ যৌন সংস্কারের ফল। সুতরাং দেহ এবং
মনকে কল্পনামনোপযোগী করিতে হইলে
যথোপযোগ্য বংশের নরনারাদিগকে বিবাহিত
করিতে হয়। নতুবা যেমন তেমন করিয়া
একটা দায় উদ্ধার করিলে সর্বনাশেরই পথ
পরিষ্কার হয় ভিন্ন আর কিছুই লাভ নাই।

এস্থলে এতদ্বৈশিষ্ট্যগণের দেহ বর্তমান
সময়ে সে এক বিশেষ পরিবর্তনের অধীন
হইতেছে, যাহা উল্লেখ করা করিয়া পারিতেছি
না। কিছুদিন হইল এতদ্বৈশিষ্ট্য ভ্রান্তভ্রম

* The future struggles for supremacy
will be contested between minds, and
muscles will be at a discount !

Nature, 9 May, 1909, p 36.

† Purity of mind means health of
body * * * purity and health truly go
together. Annie Besant A study in cons-
ciousness. p 435.

‡ (১) অধ্যয়ন অধ্যাপন (২) দেশরক্ষা (৩) কৃষি
বাণিজ্য (৪) সেবা।

সকল শ্রেণীতেই দেখা যাইতেছে যে, অনে-
কের মূর্খ চিন্তার ভাগ কিছু অধিক নির্গত
হয় ; আর, কাহারও বা ফস্কেট, অক্-
স্যাগেট, কিছু বেশী পড়িতেছে। চিনি
অধিক নির্গত হওয়ায় বহুমুত্র এবং ফস্কেট
আদি অধিক নির্গত হওয়ায় নানাবিধ শিরো-
রোগ উৎপন্ন হইতেছে। সম্ভবতঃ এ সকল
ম্যালেরিয়ারই গোণ পরিণাম অথবা অনাহার
ও হুচিন্তার ফল ! যাহা হউক, এ সমুদয় বস্তু
দেহের বিশেষ আবশ্যক ; উহারা অতিরিক্ত
মাত্রায় পরিত্যক্ত হইলে দেহ নিশ্চয় ভাঙ্গিয়া
যাইবে। এ সকল প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা
সমাজের মধ্য হইতেই হওয়া চাই। আমরা
তাগার কি করিতেছি ! কেবল বর্ষে বর্ষে
১১১২ লক্ষ লোক মরিয়া যাইতেছি ; আর
কোটা কোটা লোক আধমরা হইয়া কেঁকা-
হইতেছি।

দেহের প্রতি সমাজের বিশেষ দৃষ্টি
রাখিতে হয়। ব্যক্তিগত ব্যায়াম, পরিবারগত
উৎসব, জাতীয় ক্রীড়া ও অঙ্গচালন ব্যবস্থা—
এ সকল অবশ্য থাকা চাই। এই সকল
উপলক্ষে যেমন দেহ পুষ্ট, তেমনই মনও প্রকুল
হয়। মন প্রকুল না হইলে দেহ সুস্থ থাকি-
তেই পারে না। দেহ দৃঢ়, নীরোগ, শ্রম-
সহিষ্ণু ও কষ্টসহিষ্ণু হওয়া আবশ্যক। সমা-
জের সকলেরই এইরূপ হওয়া সম্ভবপর নহে ;
কিন্তু নির্দিষ্ট শ্রেণীর জনগণের দেহে এইরূপ
না হইলে সে সমাজ উন্নত হইতে পারে না।
দেহ সুগঠিত, পুষ্ট ও কর্মক্ষম করিতে, বিবাহ
সম্প্রদান একটু বিবেচনা মত করিলেই

কালে অনেক ফললাভ করা যাইতে পারে । অনাহার ও পীড়ার কথা পৃথক । কিন্তু যে সমাজ দুর্বল ও পতিত হইয়া গিয়াছে, সেই সমাজের জনগণের পক্ষে সময় সময় সম্ভাব্য-পন্ন অল্প সমাজের সহিত যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করা অত্যাশঙ্কক, কারণ তাহাতে নবীন পরিবর্তনের সূচনা হইয়া শুভফল উৎপন্ন হইবার আশা করা যায় । *

মন ।

কিন্তু কি ব্যক্তিগত কি সামাজিক, উভয় দিক হইতে মনকেই সর্বপ্রধান স্বীকার করিতে হয় । মন প্রস্তুত না হইলে কোন কর্মই হয় না । সামাজিক মন কি ? তাহা কেমন করিয়া গঠিত হয় ?

শিক্ষা ।

মন দেহের অনুষঙ্গ । দেহ বংশানুক্রমের নিয়মানুসারে গঠিত হয়, সুতরাং মনও ঐ নিয়ম পালন করে । মনও অনেকাংশে উত্তরাধিকারস্বত্বে পাওয়া । কিন্তু এস্থলে কেবল ব্যক্তিগত উত্তরাধিকার দেখিলে হইবে না । সমাজগত একটা উত্তরাধিকার আছে । সমাজের জ্ঞান বৃদ্ধি ক্রমেই উন্নত হইতেছে ; ভাব ক্রমেই পরিবর্তিত ও বিগুণ হইতেছে । একপক্ষে যে সকল উন্নতি লাভ করিতেছে, তাহা গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছে । পরবর্তিগণ তৎপাঠে তাহার অবিকারী হইতেছে । আবার তাহাদিগের চিন্তা ও ভাব তৎপরিবর্তিগণ প্রাপ্ত হইতেছে । এইরূপে সমাজমধ্যে একটা সামাজিক উত্তরাধিকারের সৃষ্টি হইতেছে । অধ্যাপক টমসন্ ইহাকেই

'Social Heridity' বলিয়াছেন । 'ইহাই সমাজকে কালে জ্ঞানোন্নত করে । সমাজের চতুর্বিধ কর্ম, পূর্বেই' বলিয়াছি । মন ইহার প্রত্যেকটির উপযোগী হওয়া চাই । এ চতুর্বিধ কর্ম বলিতে যতর্বিধ 'কর্ম' নির্দিষ্ট শ্রেণী বিভাগ বলিতেছি না । তজ্জপ বিভাগ থাকে থাকুক, কিন্তু একশ্রেণী হইতে অল্প শ্রেণীতে উন্নত অবনত হওয়ার বিধান থাকা আবশ্যক । এ কথা পূর্বেও বলিয়াছি । সে যাহা ইউক, মন গঠিত করিবার উপায় শিক্ষা ও সংসর্গ । এই দুই উপায় সর্বত্রই কৃত-কার্য্য হয়, তাহা নহে ; তবে বংশ পর-স্পরাগত ভাব ও প্রবণতা, যাহা ব্যক্তির শরীরে প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহা জাগাইয়া দিবার এই দুই উপায় ভিন্ন আর নাই । ইহাতে সফল কুফল দুই-ই হইতে পারে । বরং অবোধে সর্ব শ্রেণীকেই সমান শিক্ষা দিলে সফল অপেক্ষা কুফলই অধিকতর সম্ভব ।

সকলেই দার্শনিক অথবা বৈজ্ঞানিক, কবি অথবা ঐতিহাসিক হইতে পারে না । কিন্তু শিক্ষা যদি মনকে সংযত, চরিত্রকে উন্নত করিতে পারে, তাহা হইলেই উদ্দেশ্য সফল হইল । এমন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক, কবি অথবা ঐতিহাসিক আছেন, যাহাদিগের চরিত্র দেখিলে মনে হয় যে, ইহারা অশিক্ষিত অপেক্ষাও অধম । প্রকৃতপক্ষেও ইহারা শিক্ষিত না হইলেই সৎপথে অধিক থাকিত, অন্ততঃ এতদূর কুপথে যাইত না । উচ্চ শিক্ষা সাধারণের জ্ঞান নহে ; চেষ্টা কবিলেও সাধারণে তাহা পাইবে না ; কেবল লীভের মধ্যে শিক্ষিত বদমায়েস সৃষ্টি হইয়া সমাজকে দুর্দশাগ্রস্ত করিবে । এতদ্দেশে বর্তমান বর্ষে ৫৮৯০টা বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে ; কিন্তু ২৫৮ জন মাত্র বি-এ এবং

*. The establishment of a successful race or stock requires the alternation of periods of inbreeding in which characters are fixed and periods of out-breeding (exogamy) in which by the introduction of fresh blood, new varieties are produced. Heridity, p 537.

১২৫ জন . মাত্র এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। সর্ব দেশেই এইরূপ। ইহার অর্থ কি ? উচ্চ শিক্ষা সাধারণের জন্য নহে। কিন্তু তাহাতে সাধারণের অধিকার থাকা চাই। নচেৎ গুণবান, প্রতিভাশালী ছুই একজন ব্যক্তির পথে কণ্টক আরোপণ করা হয়। উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞান চর্চা প্রধানতঃ অল্পেরই আয়ত্ব হইবে। কিন্তু যাহারা এই গুরুতর কার্যে ত্রুটি হইবেন, তাহাদিগের অসহায়তা সুলভ এবং জীবন নিরাপদ হয়, তৎপ্রতি একান্ত দৃষ্টি রাখা সমাজের অবশ্য-কর্তব্য। উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞানচর্চা যেদিক হইতেই কর, ফল একই। সকল পথই শিক্ষাথাকে শ্রীভগবানের পাদমূলে লইয়া উপস্থিত করিবে। জ্ঞান অর্থই ভগবৎজ্ঞান। সকল আলোচনারই সেই একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু সকল আলোচনা সেই ভাবে করা সম্ভব নহে। ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি ও উন্নত বিজ্ঞান শাস্ত্র বলিয়া মনে করি। কিন্তু ইহাদিগের আলোচনায় সামাজিক মানবের বিশেষতঃ পর-বশ সমাজের মন সমগ্র সময় লক্ষ্যভ্রষ্ট ও চঞ্চল, বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র হইতে পারে। তাহা হইলে আর জ্ঞানের সাধনা হইল না। গভীর প্রশান্ত মনে জ্ঞানের আলোচনা হওয়া আবশ্যক। তবে যখন বিবিধ কারণে কোন নির্দিষ্ট সমাজের অস্তিত্বই শঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে, তখন উন্নত জ্ঞান-লোচনা সফল হইতে পারে কিনা, এমন একি, সামাজিক ভাবে অল্পস্থিত হইতেই পারে কিনা, সে বিষয় বিশেষ সন্দেহ কবিবার কারণ আছে। তখন হয়ত ক্ষোভোৎপাদক শাস্ত্র আলোচনাই প্রশস্ত হইতে পারে। কিন্তু এ সকল বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও একটা বিষয়ে কোনই মত-

ভেদ থাকিতে পারে না যে, মানবের প্রধান শিক্ষার বিষয়ই মানব। একথা মনীষিগণ সর্ব দেশে সর্ব কালেই প্রচার করিয়াছেন। অল্প সকল শিক্ষাই এই শিক্ষার সহায় মাত্র। কারণ আপনাকে না বুঝিলে মানবের বন্ধ-মুক্তির অল্প উপায়ই নাই। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সময়ে বা নির্দিষ্ট সমাজে সকলেই এই শিক্ষা, এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে না। তাই সমাজের কার্য পরিচালনা করিতে কর্ম-প্রধান শিক্ষাই অবিকাংশের পক্ষে প্রশস্ত, ভাবময় শিক্ষা অল্পাংশের নিমিত্ত।

কর্ম-প্রধান শিক্ষাও ভাবের উপর নির্ভর করে। কারণ ভাবই কর্মের মূল। কর্ম-প্রধান উন্নত শিক্ষা উচ্চ বিজ্ঞানের অন্তর্গত। বিবিধ শিল্প, বাহা যন্ত্রাদি সাহায্যে অল্পস্থিত হয়, তাহা বিজ্ঞানের উপরই নির্ভর করে। সমাজের আবশ্যকীয় পদার্থ সকল এবং সুখ-বিধায়ক * উপকরণ সকল প্রয়োজনানুরূপ নিশ্চিত হওয়া চাই। যদি না হইতে পারে, তবে অল্প হইতে পাইবার সুবিধা থাকা চাই। কিন্তু সে সমাজে শিল্প শিক্ষা কেবল নব-প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সে সমাজে অল্প হইতে দ্রব্যজাত গ্রহণ করা স্বশিল্পের অহিতকর; সুতরাং শিল্প শিক্ষার প্রথম অবস্থায় সমাজ স্বশিল্প অনুসরণ করিবে। তৎপর স্বশিল্প যথাযোগ্য উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইলে যখন অল্পভাগত শিল্পের প্রতিযোগীতা সহ করিতে সক্ষম হইবে, তখন ঐ প্রতিযোগীতায় তাহার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ক্রমেই হ্রাস হইয়া যাইবে। যেক্ষণেই হউক, সমাজের আবশ্যকীয় শিল্পজ্ঞান সমাজ

* বিলাসের কথা বলিতেছি না। কিন্তু বিলাসোপকরণ সম্পূর্ণ বর্জনীয় নহে।

মধ্যে থাকা চাই-ই। 'নচেৎ সর্বদা' বিপদা-
শঙ্কা বর্তমান থাকে।' শিল্প শিক্ষা, কৃষি
শিক্ষা, এতদ্ব্যতীত দেশ ভেদে বিভিন্ন রূপে
অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। যে দেশের মাটি
যে প্রকার, যে দেশে জল প্রাপ্তির সম্ভাবনা
যেদূর, তদনুসারে কৃষিকার্য্য না হইলে
ফলদায়ক হয় না। কিন্তু এই কার্য্যও
বিশেষ ফল লাভ করিতে হইলে উচ্চ বিজ্ঞান
শাস্ত্রের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। সম্প্রতি
উচ্চ বিজ্ঞান-বলে আমেরিকা দেশে ১০/ বিঘা
জমি হইতে বার্ষিক ১২০০ টাকার উর্দ্ধ
উপার্জন হইয়াছে। সে বাহা হউক, শিল্প ও
কৃষি বর্তমান যুগে আর বিজ্ঞানের সাহায্য
ভিন্ন অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। হইলে
সমাজের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে সক্ষম
হইবে না। কিন্তু এক দিকে যেমন এ
সকলের উন্নতি, অন্য দিকে তেমনই বাণিজ্য,
এতদ্ব্যতীত একত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই।
নচেৎ উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রেতা না থাকায় উহা
অকর্ম্মণ্য ও ক্ষতিজনক হইবে। বাণিজ্যই
কৃষি শিল্পের শ্বাস প্রশ্বাস; উহা না থাকিলে
ইহারা সজীব থাকিতে পারে না, অথবা
মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। কিন্তু কিছুই অতি
রিক্ত মাত্রায় ভাল নহে। বাণিজ্যও অতিরিক্ত
মাত্রায় অনুশীলন করিলে সমাজ ধ্বংসের
পথে অগ্রসর হয়। ঐতিহাসিক জানেন,
পূর্বকালে কত সমাজ বাণিজ্যে অতীব উন্নত
হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও
ফিরিজি ও দিনামার এবং আরবীয়গণ
বাণিজ্যে বিশেষ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া-
ছিল। কিন্তু তাহাদিগের এখন কিরূপ
অধঃপতন হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন।
বাণিজ্যে অতিমাত্র ব্যাপৃত হইলে বংশ-
স্তমি হয়। স্তত্রাং সমাজ টিকিতে পারে

না। * বাহা হউক, বাণিজ্য ব্যতীতও সমাজের
উন্নতির আশা নাই, অথবা অতি 'অল্প।
স্তত্রাং কর্ম্ম-প্রধান শিক্ষা অধিকাংশের
পক্ষেই প্রশস্ত শিক্ষা হওয়া উচিত। অল্পাংশ
ভাবময়, জ্ঞানময় শিক্ষা লাভ করতঃ ঐ
অধিকাংশকে পরিচালন করিবেন। তাহা
হইলে কৃষি শিল্পের উন্নতিও যেমন হইবে,
অভাবের নিত্য সহচর দুঃখের সকলও
তেমনই নিবৃত্ত থাকিতে পারে। 'নিয়ন্ত্রিত
হইতে পরম্পরাগত দুঃখিত সকল, বাহা দেহে
প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা সাধারণ শিক্ষায় যতদূর
ব্যক্ত হইয়া পড়ে, কৃষি শিল্পাদি শিক্ষায় ও
শ্রমশীল কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে তাহা তাদৃশ
বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না। তাই
তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তির ভ্রায়, অশিক্ষিত-
গণ তত অধিক দুঃখাগ্রস্ত হইতে পারে না।

এস্থলে পুঁথিগত শিক্ষার বিষয়ে আর একটা
কথা উল্লেখ না করিয়া নীরব থাকিতে পারি
না। এই শ্রেণীর শিক্ষা সমাজকে অল্লাধিক
পরিমাণে অনির্দিষ্ট পথে যাইতে রাখা দিয়া
থাকে। অনির্দিষ্ট, অর্থাৎ বাহার পরিণাম ফল
সম্যক জ্ঞাত হওয়া যায় নাই, অথবা সম্যকজ্ঞাত
হওয়া অসম্ভব, তদ্রূপ কার্য্যের অনুপযোগী
করিয়া তুলে। ইহাতে সন্দেহ, দ্বৈধ এবং
ইতস্ততঃ বাড়িয়া দেয়। তথাকথিত বর্ণ-
মালা-শিক্ষিত ব্যক্তি পরিণাম ভাবিতে কিছু
অতিরিক্ত মাত্রায় অভ্যস্ত হইয়া পড়েন।
স্তত্রাং উত্তম, অধ্যবসায় ও সংসাহস হ্রাস
হইয়া যায়। ইহাতে আকস্মিক অনুষ্ঠানের
সহিত, আকস্মিক বিপ্লব নিবৃত্ত হইতে পারে,

* "Hustle", "hustle" is the cry of com-
merce, and of commerce only * * *
"Hustle," "hustle" may allow a company
to declare a 20 percent dividend, and to
rush up shares, but it steadily works for
sterility and other forms of degeneracy.
Race culture, p 82.

কিন্তু 'সমাজ সাহস ও উত্তম হার্নইয়া ক্রমে' জড়ত্বের দিকে চলিয়া যায়। মহাত্মা লক্ বলিয়াছেন, "খিনি 'নিশ্চয়' ফল না জানিয়া কোন কর্মে অগ্রসর হইবেন না, তাহাকে নিষ্কণ্টক হইয়াই বসিয়া থাকিতে হইবে; অবশেষে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া ধ্বংসের মুখে

পতিত হইতে হইবে।" এই শ্রেণীর লোক পতিত সমাজে যত অধিক থাকিবে, তাহার উন্নতির বিষয়ও ততই অধিক, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। সমাজের একটা জীবনীশক্তি চাই; সমাজের শিক্ষাও শুদ্ধপন্থী হওয়া আবশ্যক। শ্রীশ্রী বব রায়।

প্রেমের-ধর্ম ।

আমাদের দেশের কুশিক্ষিত এবং সঙ্কীর্ণচিত্ত লোকেবা যেমন মনে করে যে, পৃথিবীতে হিন্দুধর্মের মত আর ধর্ম নাই, গোঁড়া খ্রীষ্টানেরাও তেমনি যৌক্ত-প্রচারিত ধর্মকে একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া দৃষ্ট করিয়া থাকে। মানুষের স্থিতি এবং রক্ষার মূলে যে সকল নিগূঢ় প্রাকৃতিক নিয়ম কাজ করিতেছে, যে নিয়মগুলিকে আমরা 'সত্য' আখ্যা দিয়াছি, সেগুলি বৃষ্টিবার এবং পরিবার ক্ষমতা যে জাতিবিশেষে বদ্ধ আছে, একথা অল্প দান্তিক ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না।

যে কথা পাদ্রাদিগের মুখে হাট বাজারের মোড়োঁ অনেকই শুনিয়াছেন, এবং গম্ভীর ভাবে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, গ্রিয়ার্সন সাংহব সেই কথা বেশ সাহসে ভর করিয়া ছ-একবার বিলাতের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটিতে উত্থাপন করিয়াছিলেন। গ্রিয়ার্সন সাংহব যে বাঙ্গালা জানে না, তাহা আমরা "বন্দে মাতরম্" কথার ব্যাখ্যা হইতেই বুঝিয়া ফেলিয়াছি। তিনি সংস্কৃত ও পালিশকিছুমাত্র জানেন না; তবে অপরের সংগ্রহ দেখিয়া তর্ক করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। সম্ভবতঃ তিনি হিন্দিভাষা জানেন; এবং ঐ ভাষায়

লিখিত ভক্তমাল গ্রন্থ খানি পড়িয়াছেন। ভক্তমাল পড়িয়া গ্রিয়ার্সনের ধারণা হইয়াছে (না পড়িলেও হইত), যে যৌক্ত-প্রচারিত Religion of love এর অল্পকরণে বৈষ্ণবেরা প্রেমের ধর্ম স্থাপন করিয়াছেন। তিনি এ কথাও বলেন যে, বশোদার কৃষ্ণ মেরীর খ্রীষ্টের একটা চোরাই সংস্করণ। পণ্ডিতের সকল কথার বিচার করিতে গেলে পাঠকদের ধৈর্য্যচূতির সম্ভাবনা। প্রেমের ধর্ম সম্বন্ধে ছুটিটা কথা লিখিব।

বিচারের সুবিধার জন্ত না হয় কল্পনা করিয়া লওয়া যাক্, যে যৌক্ত ইংরাজি Love কথাটা ব্যবহার করিয়া ঈশ্বর বা Godকে Love করিতে শিখাইয়াছিলেন। এটা কি ভারি রকমের একটা নূতন আবিষ্কৃত তথ্য? Love শব্দটা ঠিক কি অর্থে ব্যবহৃত, সেটা বুঝিয়া লওয়া যাক্, তাহার পর দেখিব যে, ঐ ধর্ম যৌক্তর পূর্বেও ছিল কিনা। পিতার সঙ্গে পুত্রের যে সখ্যকের টান, সেইটাই দিয়া Love কথা ব্যক্ত আছে। অতি প্রাচীন ঋগ্বেদে যখন এই অল্পভূতি এবং 'এই ধর্ম পাই, তখন Love এর ধর্মটার জন্ত বৈষ্ণবদিগকে পাত্তীর শিখা করায় তাঃসাধ্য। . .

১. ঋগ্বেদের একেবারে গোড়ার হস্তটীর
নবম ঋকেই আছে,—

সনঃ পিতেব স্তনবে ।

অগ্নে স্থপায়নো ভব ।

স চন্দ্রা নঃ স্বস্তয়ে ॥

একটু দোষযুক্ত হইলেও রমেশচন্দ্র দত্ত
মহাশয়ের অনুবাদটুকুই দিতেছি। কারণ
তাঁহার অনুবাদ ইউরোপীয় অনুবাদের
অনুবর্তী :—

পুত্রের নিকট পিতা যেমন অনায়াসে
অধিগম্য, হে অগ্নি, তুমি আমাদের নিকট
সেইরূপ হও ; মঙ্গলার্থ আমাদের নিকটে
বাস কর ।

তাহার পর—১ম মণ্ডলের ৩১ স্তকের
১০ম ঋকে আছে,—

“ঋঃ অগ্নে প্রমতিঃ ঋঃ, পিতাসি নঃ ঋঃ,
বয়ঙ্কঃ, তব জাময়ো বয়ঃ ।”

ইহার অর্থ অতি সহজ । “তুমি আমা-
দের প্রতি প্রমতি বা প্রসন্ন (Kind কিন্তু
loving নয় ?) ; তুমি আমাদের পিতা
(তবুও loving নয় ?) ; তুমিই বয়ঙ্কঃ
(অর্থাৎ জীবন বাড়াইতেছ এবং রক্ষা করি-
তেছ) ; আমরা তোমার জাময়ঃ বা সম্বন্ধি-
বর্গ । জাময়ঃ অর্থে রমেশ বাবু ‘বন্ধু’
করিয়াছেন । আমার প্রতিপাত্ত কথায় সে
অর্থে বাধা নাই ; কিন্তু অনুবাদটা ভুল ।
জীলিঙ্গে ‘জামী’ অর্থ ছুঁহিতা ; কিন্তু এখানে
এটা প্রুংলিঙ্গে ব্যবহৃত এবং পদটা বহুবচনের ।
বন্ধু অর্থ হয় না । এত কথায়ও প্রেম খুঁজিয়া
পাওয়া যায় না ? আবার এই স্তকেরই
১৪শ ও ১৬শ ঋকেও ঐ পিতা পুত্র সম্বন্ধের
কথা ।

তাঁহার পরেই ৩৮ স্তকের প্রথম ঋকেই
পাই :—“করুন্মঃ কথাপ্রিয়ঃ পিতা পুত্রঃ ন

হস্তয়োঃ, ইত্যাদি । পিতা যেমন পুত্রকে
হাত দুখানি বাড়াইয়া ধরে, তেমনি করিয়া
ধরিতে বলাতেও কি ‘Love’ পাওয়া যায়
না ? তবে বাইবেলে আছে যে, সমগ্র
প্রাণ দিয়া ভালবাসিবার কথা । তাহাও
এই ঋগ্বেদেই পাই । ৬১ স্তকের ২য় ঋকে
“হৃদয় মন ও জ্ঞান দ্বারা” স্তুতি পাই ; তবুও
হইল না কি ?

বাইবেলের ধর্মের Love কেবল পিতা
পুত্র দিয়া বুঝান হইয়াছে বলিয়া এই দৃষ্টান্ত
গুলি দিলাম । প্রেমের গভীরতা দেখাইবার
জন্ত সতী স্ত্রীর স্বামী লাভের আকাঙ্ক্ষা
দিয়াও বর্ণনা আছে । এ দৃষ্টান্তও ৬২ স্তকের
একাদশ ঋকে অতি সুস্পষ্ট । Love কথাটা
যে ইহাতে বাইবেলের ভাষা অপেক্ষা পরিষ্কৃত
হইয়া পড়িল ।

পুরাণগুলিতে যাহা কিছু ভাল কথা
আছে, তাহা না হয় পাত্রীদের কাছে শিখিয়া
লেখা ; কিন্তু ঋগ্বেদ যে বড়ই প্রাচীন ;
তাহার উপায় কি ? বৈষ্ণব ধর্ম যদি বাস্তব
ধর্ম, তবে বাস্তব ধর্মের মূলমন্ত্র ‘পিতা পুত্র’
সম্পর্ক নাই কেন ? স্বামী-স্ত্রী, সখা এবং
কোলের ছেলের প্রেম দিয়া প্রেম বুঝান
হইল কেন ? এইরূপ সম্পর্কে প্রেমের কথা
বলাও খ্রীষ্টধর্মের বরং পাপ । অত্ৰ দিকে
বৈষ্ণব ধর্ম পিতা সম্পর্কে ভগবানকে ডাকা
ঠিক পাপ না হইলেও, ঐ সম্পর্কের কথা
একেবারেই যে পাওয়া যায় না ।

যীশু যদি কিছু নূতন কথাই না বলিয়াছেন,
তবে ঈশ্বর কেন যে একজাত পুত্রকে সংসারে
পাঠাইবেন, তাহার যুক্তি পাওয়া যায় না ।
সেই জন্ত খ্রীষ্টানেরা সার্বদাই বলেন যে,
প্রেমের ধর্মটা যীশুই ভবধামে নূতন ‘বলিয়া-
ছেন ; আর কেহ বলে নাই । ধর্ম লাভের

চেষ্টা অপেক্ষা নিজের নিজের দর্প জারি
করাই লোকের বড় কাজ ; তাই এই সকল
সঙ্গীর্ণ কথা লইয়া সমগ্র নষ্ট

উপনিষদ শুলিতে যে প্রেম এবং আধ্যা-

ত্মিকতা আছে, তাহার দৃষ্টান্ত দিবার কোন
প্রয়োজন নাই। একমাত্র সুপ্রাচীন বেদের
গোটা কতক দৃষ্টান্তেই প্রমাণিত হয় যে,
প্রেমের ধর্ম ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

জন্মান্তর, কর্ম ও আত্মোন্নতি । (২)

“দেহে পঞ্চম্ন মাপরে দেহী কর্ম্মানুগোহবশঃ ।
দেহান্তরমহুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ভ্যজতে বপুঃ ॥
ব্রহ্মস্টিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি ।
যথা তৃনাজলৌকিকং দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ।

দেহের পঞ্চম্ন হইলে দেহী (জীব) কর্ম্মানু-
গামী, সুতরাং অবশ্য হইয়া অল্প দেহকে
অবলম্বন পূর্বক পূর্ব দেহ ত্যাগ করে। ইহার
দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলিতেছেন, চলিতে এবং
দাঁড়াইতে লোকে এক পদেই চলে এবং
দাঁড়ায়। চলিতে এক পদ অগ্রে বাড়াইয়া
পশ্চাৎ অল্প পদ বাড়ায়। দাঁড়াইতে এক
পদেই তর থাকে, অল্প পদ কেবল উপলক্ষ
মাত্র। জলোকা এক গাছিত্ব অগ্রে ধরিয়া
পশ্চাৎ পূর্বস্থিত তৃণ ত্যাগ করে। জীব
ভেমনি আতিবাহিক দেহ ধারণ পূর্বক পূর্ব-
দেহ ত্যাগ করে। স্বপ্ন দেহই আতিবাহিকা-
দেহ। সেই দেহই দেহ হইতে দেহান্তরে
গমন করে, এটুকু নাই তাহার নাম আতি-
বাহিক দেহ। এই দেহই প্রেত দেহ।
মুক্তাঙ্গার আতিবাহিক দেহপ্রাপ্তি নাই।
স্মৃতি ত্রুটি অমুগারে এই দেহেরই স্বর্ণ
নরকাদি হয়। স্বর্ণ নরক “ভিত্তিশূন্য কথা
নয়।” পরে স্থানান্তরে ইহার আলোচনা
করা যাইবে।

“স্বপ্নে যথা পশ্যতি দেহমীদৃশং
মনোরথেনাভি নিবিষ্ট চৈতনঃ
দৃষ্ট শ্রুতাভ্যাং মনসামুচিস্তয়ন্
প্রপথতে তৎ কিমপিছপশ্বতিঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ।

মানুষ কোন দৃষ্ট শ্রুত বিষয় পুনঃ পুনঃ
চিন্তিত ও চিন্তন করিতে করিতে তাহাই
আবার স্বপ্নেও দেখে।

স্বপ্নে কেহ রাজা হয়, ইন্দ্র হয়, আরও
কত কি হয়। একবার কোন দৃষ্ট শ্রুত বিষয়
ভুলিয়া গেলেও বহু দিন পর তাহাই আবার
স্বপ্নেও দেখে। যেমন ধনি নষ্ট হয় না,
তেমনি দৃষ্ট শ্রুত বিষয়ও এককালে স্মৃতি
হইতে বিলুপ্ত হয় না। বহুকাল যাহা বিস্মৃতি
গর্ভে বিলীন হইয়াছে, আবার তাহা স্মৃতি-
পথবর্তী হইতে পারে। দৃষ্ট শ্রুত বিষয় মনে
মুদ্রিত হয়। মুহূর্ত্ত সময়ে কর্ম্ম বশতঃ জীবের
যে ধোনিতে জন্ম হইবে, সেই স্মৃতি উপস্থিত
হয়। স্বপ্ন দৃষ্ট বিষয়ের ভাষ্য সে সেই ধোনিতে
চিন্তা করে এবং মৃত্যুর পর সে সেই ধোনিতে
জন্মগ্রহণ করে।

“যতোযতো ধাবতি দৈব চৌদিতং
মনো বিকারান্মক মাপ পঞ্চমু ।
গুণেবু মায়া রচিতৈবু দেহ নৌ
প্রপত্তমানঃ সহভেন জায়তে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ।

বিকারায়ক মন মায়াব্রীত পঞ্চভূতের মধ্যে দৈবপ্রেরিত হইয়া বাহাতে বাহাতে ধাবিত হয়, দেহী তাহাকেই প্রাপ্ত হয় এবং তৎসহ জন্ম পরগ্রহ করে। দেহী এইরূপে কৰ্ম্মশূণ্যে তাহার পরজন্মের আয়োজন করিয়াই দেহ হইতে বহির্গত হয়।

কৰ্ম্ম অখণ্ডনীয় বটে, কিন্তু কৰ্ম্ম জড়, তাহার স্বাভাব্য সম্ভবেনা। যে নিজে অস্বতন্ত্র, সে অত্বে পারচালক ও নিয়ামক হইতে পারে না। কৰ্ম্ম কখনও কর্তা নয়। করণ হইতে পারে। কর্তাই কৰ্ম্ম-প্রয়োজক। শুভাশুভ কৰ্ম্মজনিত যে অদৃষ্ট, তাহার কর্তা স্বয়ং ঈশ্বর। নতুবা কিরূপ কৰ্ম্মের কিরূপ ফল বিহিত হইবে, কৰ্ম্ম স্বয়ং তাহার নির্ধারণ ও বিধানে অক্ষম।

“কৰ্ম্মাণি কৰ্ম্মভিঃ কুৰ্ব্বন্ সনিমিত্তানি দেহভূঃ।
তত্ত্বং কৰ্ম্মফলং গৃহ্ণন্ ভ্রমতীহ স্মৃতেতরং ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

সেই দেহী (জীব) কৰ্ম্মেজ্বর দ্বারা বাসনা সহিত কৰ্ম্ম সকল সম্পন্ন করত হুঃখাত্মক সেই সকল কৰ্ম্মফল ভোগ করিয়া এই সংসার-পথে ভ্রমণ করিতেছে।

“ইথং কর্ত্তগতী গচ্ছন্ বহুভববাহাঃ পুমান্।
আহুত সংপ্রবাং সর্গ প্রলয়াবশ্নুতেহবশঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

এইরূপে জীব বহু অমঙ্গল-বাহি-কৰ্ম্ম-গতিতে ভ্রমণ করত প্রলয় পর্য্যন্ত অবসন্ন হইয়া মরণ প্রাপ্ত হয়।

কৰ্ম্মানুসারিণী বুদ্ধিই জীবের উৎকৃষ্টপ-কৃষ্ট যোনিতে জন্ম লাভের নিয়ন্ত্রী, যেমন এঞ্জিন শক্তিতে গতি প্রাপ্ত হইয়া যন্ত্র সকল গতিশালী হয়, তেমনি কৰ্ম্মশক্তি হইতেই জীবের সদৃশ যোনিলাভ। পূর্বে উক্ত হই-
য়াছে, জড় নিবন্ধন কৰ্ম্মের স্বাভাব্য নাই।

‘যেমন জল ও তাপ সমুৎপন্ন’ বাষ্পশক্তি এঞ্জিন শক্তির জননী, তেমনি ঐশীশক্তি কৰ্ম্মশক্তি। সুতরাং ‘মৃত্যুকালে বাহাতে ঈশ্বরচিন্তা করিতে পারিতে মৃত্যু হইতে পারে, ঈদৃশ কৰ্ম্ম করিতে পারিলেই জীবের সদৃশগতি। ভগবান্ ঐকৃষ্ণ শ্রীমান্ অজ্ঞানকে কহিয়াছেন—

“অন্তকালো মামেব স্মরনমুদ্ব। কলেবরং।

যঃ প্রয়াতি স মদৃভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মৃত্যু সময়ে যে আমাকে স্মরণ করিয়া মরিতে পারে, সে নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হয়, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া মরিতে পারি, ইহারই আয়োজন সমস্ত জীবন ভরিয়া করিতে হয়। নতুবা মৃত্যুকালে কিছুতেই সেরূপ বুদ্ধি হইবে না এবং মনেও ঈশ্বরের চিন্তার ভাব আসিবে না। একজন মৃত্যুকালে কেবল আর্তনাদ করিতেছে। তাহার পুত্র বলিল, বাবা, হরি হরি বলুন। মুমূর্ষু বলিল “অত কথা যে বলতে পারি না” বস্তুতঃ সাধনহীন লোকের মনেও ঈশ্বারিক ভাব আসিবে না, মুখেও ঈশ্বরের নাম আসিবে না। স্ত্রী, পুত্র, বিষয় বিভব ইত্যাদি ছাড়িয়া যে যাইতে হইতেছে, এই চিন্তাই তাহাকে ঘোর যাতনা দিতে থাকে। সে মায়াপাশ ছিঁড়িতে পারে না। সাংসারিক মায়া তাহার অন্তরে সহস্র বৃত্তিক-দংশন-জালা দিতে থাকে। মৃত্যুভয়ে সে অত্যন্ত কাতর হয়। কৰ্ম্মানুসারিণী বুদ্ধি তাহাকে ভবিষ্য জন্মের স্মৃতি আনিয়া দেয়।

কৰ্ম্মই জীবের জন্ম মরণের, উৎকৃষ্ট-পকৃষ্ট যোনির, ‘সুখ দুঃখের এবং সম্পূর্ণ না হউক অনেকাংশে সদস্য প্রবৃত্তিরও বিজ্ঞ। এই জ নাই এক পিতার পাঁচ পুত্র মধ্যে

স্বভাবগত বৈষম্য দৃষ্ট হয়। শিক্ষা ও সঙ্গ-
গুণেও অনেক ইতর বিশেষ হয় বটে, কিন্তু
প্রাক্জন্ম-লব্ধ কৰ্ম-সংস্কারের প্রভূতা ও ইহাতে
কম নহে।

সুতরাপাশ্রী জীবগণের সত্ত্ব-প্রযুক্ত সন্তান
• তাহার মাতৃস্তন খুঁজিয়া লয়; ইহা সকলেই
সর্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ঐ স্থানে
তাহার খাদ্য আছে এবং ঐ সুতাই তাহার
খাদ্য, এ শিক্ষা সে কখন কিরূপে পাইল?
মাতৃস্তন পানের ত্রায় সত্ত্বোজাত জীব-
শিশুতে ঐরূপ অথ কোন জ্ঞান দৃষ্টিগোচর
হয় না। এ জ্ঞান তাহার সহজাত, তাহার
সন্দেহই নাই। স্মরণ্য পূৰ্ব সংস্কার ভিন্ন এ
জ্ঞান শিক্ষালব্ধ হইতে পারে না। আহার,
নিদ্রা, মল মূত্রত্যাগ প্রভৃতি দৈহিক কার্য-
গুলিতে জ্ঞানের কার্য্য নাই, ইহা দেহ ধর্ম্মের
ক্ষয়াকৃষ্ণ প্রসারণাদি ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন।
কিন্তু মাতাকে চেনা ও মাতৃস্তনের পরিচয়ে
শিশুর জ্ঞানের কার্য্য দেখিতে পাই, ইহা কি
শিশুর পূৰ্ব্বে জন্মের সংস্কার-জনিত জ্ঞান নয়?
সকলেই জানেন, দর্শন শ্রবণাদি ঐন্দ্রিয়িক
জ্ঞানেরও ঐ সনয় সন্মাক্ স্ফুরণ হয় না।
মাতা ও মাতৃস্তন সখ্যায় জ্ঞান বে সাহজিক
পূৰ্ব সংস্কারলব্ধ, তাহার সন্দেহ নাই।

অধিকক্ষণ প্রদাপালোক দর্শনের পর
অন্ধকারে গেলে ক্ষণকাল চক্ষুতে পূৰ্বদৃষ্ট
আলোকের ভাবটী একরূপ অস্পষ্টভাবে বিদ্য-
মান থাকে। তাহাতেই স্বাভাবিকী দৃষ্টি-
শক্তি নেন কিছু ক্ষীণা হয়। দৃশ্য বস্তু একটু
অস্পষ্টভাবে চক্ষুতে প্রতিভাত হইতে থাকে।
কিছুকাল পর ঐ ভাবটী থাকে না, চক্ষুর প্রকৃত
দৃষ্টিশক্তি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আলোক
দর্শনান্তে অন্ধকারে গেলে যেমন আলো-
আধারিয়া একটা অস্পষ্টজ্ঞানচক্ষুতে থাকে;

তেমনি মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিলে
মাতী ও মাতৃস্তন পরিচায়ক জ্ঞানটী একটু
অস্পষ্টভাবেই প্রকাশমান হয়; ক্রমে জ্ঞান
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অস্তিত্ব সংস্কার
গুলিরও অভিব্যক্তি হইতে থাকে। কোন
বালক চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করে না, কিন্তু সে
স্বভাবত: চিত্র করিতে ভালবাসে এবং সহ-
জাত সংস্কার-জনিত প্রসক্তি গুণে যে চিত্র
কার্য্যে অচিরেই নৈপুণ্য লাভ করে। সুপ্র-
সিদ্ধ চিত্রকর রাজা রবিবর্মা ঐরূপ একজন
স্বভাব-চিত্রকর। তাহার ঐরূপ চিত্রকার্য্যে
প্রবৃত্তি পূর্বাভিমুখিত সংস্কৃতি!

সিরাজগঞ্জের তারকনাথ কবিরাজ মহা-
শয়ের পঞ্চম বর্ষীয় শিশুপুত্র গানবাগ্ধে যেরূপ
অদ্ভুত নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা অতীব
বিস্ময়কর। সংবাদপত্র পাঠেও এ বালকের
আশ্চর্য্য ক্ষমতার বিষয় অনেকে পাঠ করিয়া
থাকিবেন। বালকটী পঞ্চমবর্ষ বয়সেই চোতাল,
ধামার, সুরফাক, তেওড়া প্রভৃতি রূপদাঙ্গায়
গান গাইতে ও বাজাইতে পারিত। পরা-
ক্ষার জন্ত কেহ তাল ভঙ্গ করিলে সে অমনি-
ধরিয়া দিত। কখনও বা হাসিয়া উঠিত,
কখনও বা গায়ক, কখনও বা বাদককে
থাপড়া দিত। বৈথুনাথে ঐ বালকের গান
বাগ্ধ গুনিয়া দ্বারভাঙ্গার মহারাজ বিস্ময়াভি-
ভূত হইয়াছিলেন। তারক কবিরাজ মহাশয়
নিজেও সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি শিশুপুত্রের ব্যব-
হারোপযোগী একটা ক্ষুদ্র মৃদঙ্গ (পাখোয়াজ)
প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ বালকের
গান বাজনা শুনিতে কোতূহল পরবশ হইয়া
কত লোকই যাইত। প্রাক্তন-জন্ম-বিদ্যা
ব্যতীত পঞ্চম বর্ষীয় শিশুর এরূপ অলৌকিক
শক্তি লাভ অসম্ভব। মহাশয়মণ্ডলী মধ্যে এই-
কণ উৎকণ্ঠাপকট-প্রবৃত্তি, বিদ্যা, জ্ঞান ও

কৃষ্ণের শত শত দৃষ্টান্ত পাওয়া বাইতে পারে, যাহা তাহার জন্ম, বয়স ও সঙ্গলক্ষ্য নহে, পরন্তু 'প্রাগজন্ম-সাক্ষ্য ও সংস্কার-লক্ষ্য'।

প্রহ্লাদ ভগবন্তজির বীজ লইয়াই জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে বাল-স্বভাব সুলভ ক্রীড়াসক্ত ছিলেন না। কৃষ্ণ-রূপ গ্রহণস্ত থাকায় জগতের কোন বস্তুতেই তাঁহার প্রসক্তি ছিল না, সুতরাং সর্বদাই উন্মাদস্থ থাকিতেন। কখনও উদ্ধবাহ হইয়া করতালি দিতে দিতে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেন, কখনও বা ভাবোন্মত্ততায় গড়াগড়ি দিতেন। কখনও কৃষ্ণ হে, গোবিন্দ হে বলিয়া চীৎকার করিতেন। কখনও এক দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকাইয়া থাকিতেন। ছই চক্ষু হইতে প্রেক্ষাপ্রবাহিত হইয়া ক্ষুদ্র বক্ষঃস্থল ভাষিয়া যাইত। 'ঠিক ভূতাবিষ্ট মনুষ্যের স্থায় তিনি নিজস্ব ব্যক্ত করিতেন।

“কৃষ্ণগ্রহগ্রহীতাত্মা ন বেদজগদীদৃশং”

শ্রীমদ্ভাগবত ।

কৃষ্ণরূপ গ্রহগ্রস্ত হইয়া এই বিচিত্র অনু-পম সৃষ্টি-চাতুর্য্য-বিশিষ্ট জড়জগতের কোন বস্তুতেই তাঁহার দৃষ্টি থাকিত না। তিনি অন্তর্জগতেই বিচরণ করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার শৈশব-জীবন এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বর্ণমালার প্রথমাক্ষর ক 'দেখিয়া তাঁহার প্রভু কৃষ্ণের নামের আশ্বক্ষর বলিয়া কাদিয়াছিলেন। শুকদেব গোস্বামী শৈশবকাল হইতেই অনাসক্ত। চৈতন্যপ্রভু কাঁদিলে হরিধ্বনি দিলেই হাসিতেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট শৈশবকাল হইতেই যুদ্ধ-ক্রীড়া ভালবাসিতেন। বাহিনীশ্রী করিতেন, 'ছই পক্ষ হইয়া বরফখণ্ড লইয়া পরস্পর ক্রীড়া যুদ্ধ করিতেন। থিওডোর পার্কার

'৪ বর্ষ বয়সে একটা কচ্ছপকে প্রহার করিতে গিয়া মনে মনে প্রশ্ন করিলেন "ইহারকৈ প্রহার করিব কেন? এ 'ত জীব', ইহারও তো আনাদের ভায় হুংখবোধ আছে।' চারবর্ষের শিশুর এজ্ঞান কোথা হইতে আসিল? পুস্তোক্ত মহাপুরুষগণ সকলেই পূর্ণজন্মজাত সংস্কারবশতঃ যে সাহজিক জ্ঞান বহির্ভা অর্জন করিয়াছেন, বাল্যে তাহারই 'আভাস' প্রকটিত হইয়াছে এবং যৌবনে 'তদনুরূপ' কর্ম্মদ্বারা জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। 'সকলেই অদৃষ্টের অনুবর্তী, পুরুষকার তাহার সাহায্যকারী। পুরুষকার-বিমুখ অদৃষ্টবাদী ভ্রান্ত। মহাভারতে ব্যাসদেব অদৃষ্ট হইতে পুরুষকারেরই প্রাধান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। পুরুষকারে দৈবও প্রসন্ন মন, সুতরাং পুরুষকার অদৃষ্টের উপরেও জয়লাভে সমর্থ। শ্রীমদ্ভাগবত এ বিষয়ে প্রতীপ-পথগামী। তিনি অদৃষ্টের এত অনুগত যে, এককালীন অজাগর-বৃত্তি অবলম্বনে পরামর্শ দিয়াছেন। এ বিষয় আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

সর্বধর্মী কাল সকল জীবকেই বিনাশের মুখে নিক্ষেপ করে। শুভ কিম্বা অশুভ অদৃষ্টের ফল যেকোনই হউক না কেন, প্রাগজন্মসংস্কার জীবনের গতি যেনিকেই পরিচালিত করুক না কেন, শিক্ষা, সঙ্গ ও সাধন শুণে তাহার গতি পরিবর্তিত হয়। চোরের ছেলে সাধু ও সাধুর ছেলে চোর হওয়া কিছু-নাড়ও আশ্চর্য্য নহে। মানবজন্মে আত্মার উৎকর্ষ সাধন করাই জীবনের লক্ষ্য, হওয়া উচিত। এই লক্ষ্যের অনুসরণ 'করিতে হইলেই, ভগবদ্ভজন একান্ত প্রয়োজনীয়। কেবল বাহ্য লইয়া থাকিলে এই প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, শুদ্ধপদার্থ উপায়ে জৈবের চিন্তা করিতে হইবে এবং পরজন্মে উৎকৃষ্টগতি

লাভের জন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে। পূর্বে বলিয়াছি, যত্নাকালে কল্যাণসারিণী বৃদ্ধি হয় এবং যেরূপ যোনিতে তাহাকে জন্মিতে হইবে, তাহার সেই চিন্তা উপস্থিত হয়। তবেই

ঈশ্বরচিন্তা করিতে করিতে যাহাতে মরিতে পারা যায়, মনুষ্য যাত্রেই সেজন্য জীবন তরিয়া সেই অভ্যাস করিতে হয়।

শ্রীজ্ঞানকীনাথ গোস্বামী।

দুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিমচন্দ্র।

আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা সাহিত্য পাঠ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। পূর্বে বাঙ্গালায় একখানি বই লিখিলে ভয় হইত, বই বিক্রয় হইবে কিনা। এক্ষণে কি বাঙ্গালা পুস্তক, কি বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা, সকলই আদরে পঠিত হইতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছে। কিন্তু অনেক বলিতেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা পুস্তক নির্বাচিত কবিতার সময় পুস্তকের দোষগুণ বিচার না করিয়াহ * পাঠ্যপুস্তক ঠিক করিয়াছেন। মুসলমান ছাত্রেরা বলেন যে, দুর্গেশনন্দিনী কখনই তাঁহাদের প্রিয় হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বলেন, দুর্গেশনন্দিনীতে তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে। এইরূপ নানা প্রকার অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। এই অভিযোগের যথার্থ্য নিরূপণ করিতে হইলে বঙ্কিম বাবুর দুর্গেশনন্দিনী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়। অবশ্য আলোচনা যত বিস্তৃত হয়, ততই ভাল। এইজন্ত আমরা এই প্রবন্ধে দুই একটা অবাস্তব কথাও সন্নিবেশিত করিয়াছি।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয়। (১) ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাট

সাহেবের চেম্বার বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে Vernacular Literary Society নামক একটা সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার বার্ষিক বিবরণী পাঠে জানা যায় যে, সে সময়ে শিক্ষিত বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষার চর্চায় প্রবৃত্ত করিবার জন্ত সুন্দর সুন্দর গল্প রচনা করাইয়া প্রকাশিত করাই সভার প্রধান কার্য ছিল। (২) সুতরাং এই সভা হইতে সুন্দর গল্প রচনার জন্ত পারিতোষিক দেওয়া হইত। বঙ্কিম বাবু এই পারিতোষিকের জন্ত প্রথম দুর্গেশনন্দিনী লিখেন। কিন্তু সভা ইহাকে পুরস্কার-যোগ্য বিবেচনা করে নাই। (২) ইহাতে সভার দোষ কতদূর, বলা যায় না, কারণ সঞ্জীব বাবুও বঙ্কিম বাবুর প্রথম লিখিত উপন্যাসকে প্রকাশযোগ্য মনে করেন নাই। বঙ্কিম বাবু ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া বিদেশে থাকিবার সময় এই পুস্তকের সংস্কার করেন; সংস্কার কার্য শেষ হইবার আগে, সঞ্জীব বাবু, যতদূর সংস্কৃত হইয়াছিল, তাহা দেখিতে পান ও বঙ্কিম বাবুকে ইহা প্রকাশ করিতে উৎসাহিত করেন। শেষভাগ প্রথমে ভাষ্যরূপে (৩) সংশোধিত হয় নাই। তারপর অনেকবার

(২) বিখ্যাত "বাঙ্গালা সাহিত্য-গল্পশাখা"।

(৩) গিরিজা বাবুর ঈশ্বরচন্দ্র, হিতবাদী সংস্করণ।

(১) গিরিজাবাবুর বঙ্কিমচন্দ্র।

পুস্তকখানি সংশোধিত হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু
বিবিধ প্রবন্ধের একটি প্রবন্ধে উপদেশ দিয়া-
‘ছেন যে, লেখক নিজের প্রবন্ধাদি লিখিয়া
কিছুদিন ফেলিয়া রাখিবেন ; পরে সংশোধিত
করিয়া প্রকাশ করিবেন। এই উপদেশ
তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতার ফল।

যে সময়ে দুর্গেশনন্দিনী প্রথম প্রকাশিত হয়,
সে সময় বাঙ্গালা গল্পসাহিত্য দুই প্রকার
ভাষায় লিখিত হইত—তত্ত্ববোধিনী বা বিজ্ঞা-
সাগরী ভাষা, এবং গ্রাম্য বা আলালী ভাষা।
বঙ্কিম বাবু প্রথমটিকে স্তবোধ্য এবং দ্বিতীয়-
টিকে সংস্কৃত করিয়া উভয়ের মিশ্রণে একটি
ভাষা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, যাহা বর্তমান
বাঙ্গালা গল্পসাহিত্যের ভাষা।*

দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হওয়ার সময়
বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগের আরম্ভ হইয়া-
ছিল। বঙ্গ সাহিত্যের ইংরাজি-
নবিশ মহারথিগণ তখন বঙ্গের ভাণ্ডারের
বিবিধ রতন খুঁজিয়া পাইয়াছেন। মধুসূদন
তখন বিলাতে। রঙ্গলাল বাবু, ভূদেব বাবু
ইত্যাদি মনীষিগণ তখন নিজকার্য্য আরম্ভ
করিয়াছিলেন। তখন ভূদেব বাবুর অস্মরীয়-
বিনিময় বাহির হইয়াছে। কিন্তু তখ-
নও শিক্ষিত বাঙ্গালী বৃত্তিতে পারে নাই
যে, বাঙ্গালায় তাঁহাদের পাঠ্য উপন্যাস লিখা
যাইতে পারে। যদিও, বঙ্কিম বাবু যখন
রিষবৃক্ষ লিখিয়াছেন, এমন কি, যখন তাহা
অনূদিত হইয়াছে, তখনও দুই একজন
লোক পাওয়া যাইত, যাহারা বাঙ্গালায় যে
তাঁহাদের পাঠ্য উপন্যাস লিখা যাইতে পারে,
তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই ; তথাপি
ইহা বলিলে অতিরঞ্জন করা হইবে না যে,

* বিষকোষ বাঙ্গালা সাহিত্য (ষট্টিশাখা)
জড়িয়া।

বঙ্কিম বাবুর দুর্গেশনন্দিনী বাহির হইবার পর
হইতে ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালী বাঙ্গালার মাটী ও
বাঙ্গালার জলের স্বাদ বৃত্তিতে পারিয়াছে।

বঙ্কিম বাবু সমালোচনার হস্ত হইতে
পরিভ্রাণ পান নাই। তাঁহার পুস্তকগুলির
দোষ ও কল্পিত দোষ লইয়া দলাদলি বাঁধিয়া
যায়। (সে দলাদলির এখনও শেষ হয় নাই)
চন্দ্রনাথ বাবুর “বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি”
নামী ক্ষুদ্র পুস্তিকায় এই দলাদলি সম্বন্ধে
জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই সংক্ষেপে লিখা আছে,
সুতরাং এ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন
নাই। বঙ্কিম বাবুর “পানিগৃহিণী” (৩০৪ পৃঃ
২২শ প ২০ খ), “সাক্ষাতের প্রার্থিতা”
(১৭৬ পৃ ৫ম প ২০খ) বঙ্গ ভাষায় গৃহীত
হইবে না, স্বীকার করি ; কিন্তু হীরেন্দ্র বাবু
বঙ্কিম সম্বন্ধীয় একটি বক্তৃতায় যাহা বলিয়া-
ছিলেন, তাহাও মধ্যার্থ যে, বাঙ্গালা ভাষাকে
বঙ্কিম যে খাদে ফেলিয়া দিয়াছেন, আজও
বঙ্গভাষা প্রধানতঃ সেই খাদে চলিতেছে।*
বঙ্কিম নিজে লিখিয়াছেন “এমন বলিতে
চাহি না যে, ভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে
বাঙ্গালা ভাষার কোন উন্নতি হইতেছে না
বা হইবে না। হইতেছে ও হইবে। কিন্তু
বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে জাতি হারাইয়া ভিন্ন
ভাষার অধিকরণ মাত্রে পরিণত হইয়া পরা-
ধীনতা প্রাপ্ত না হয়, তাহাও দেখিতে হয়।
বাঙ্গালা ভাষা বড় দোটারনার মধ্যে পড়ি-
য়াছে। ত্রিপথগামিনী এই স্রোতঃস্রবীর
জিবেণীর মধ্য আবর্তে পড়িয়া আশ্রয় ক্ষুদ্র
লেখকেরা অনেক দূর পাক খাইতেছি।”†

* Y. M. C. A. তে দীনেশ বাবু বঙ্কিম সম্বন্ধে
বক্তৃতা করিয়াছিলেন, হীরেন্দ্র বাবু সভাপতিত্ব করিয়া-
ছিলেন।

† বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ৩য় ভাগ (বহুমতী
সংস্করণ) ২৭২ পৃঃ।

সর্বলৌচিকগণ, বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থ ইংরাজি ভাব-পূর্ণ ও ঐতিহাসিক অসামঞ্জস্যতা-বিশিষ্ট বলিয়া বুঝিতে লাগিলেন।

বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থে ইংরাজি ভাব অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্কিম বাবু যে কতটা সমাজকে মুকুর ধরিয়াছিলেন, এবং কতটা সমাজকে তাঁহার নির্দিষ্ট পথে চালিত করিয়াছেন, বলা শক্ত; বোধ হয় অসাধ্য। প্রত্যেক সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য, লোকপ্ৰীতি অপেক্ষা উচ্চতর হওয়া উচিত। বঙ্কিম বাবুর উদ্দেশ্য সমাজকে শিক্ষিত করা।

বঙ্কিম বাবুর ঐতিহাসিক উপস্থাসেও এই ইংরাজি ভাববাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। হুর্গেশনন্দিনীতে ইংরাজি ভাবের অভাব নাই। একটা ক্ষুদ্র উদাহরণ, যথা—বঙ্কিম বাবুর বিমলা ও জগৎসিংহ উভয়েই পরিচয় জিজ্ঞাসা করা অভদ্রতা বিবেচনা করেন—অথচ যেখানে ইংরাজি শিক্ষা ও ইংরাজি ধরণ এখনও প্রবেশ করে নাই,—ভারতের একরূপ সকল স্থানে অত্ৰাপি পরিচয় জিজ্ঞাসা করা আলাপের প্রথম পদ্ধতি বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু ইংরাজের সবই যে দোষ, তাহা নহে। বঙ্কিম বাবু, তাঁহার নায়কাদিকে, যতদূর সম্ভব, বাহাতে আদর্শভাবাপন্ন করিয়া বর্তমান সমাজের নিকট আনয়ন করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিয়াছেন।

বঙ্কিম বাবু বিমলা, আয়েষা ও তিলোত্তমাকে অনেকটা স্বাধীনতা দিয়াছেন। শূদ্ৰের কন্যা, দাসী বলিয়া পরিগণিতা, তাহার কথা স্বতন্ত্র। § কিন্তু তিলোত্তমার কোর্টশিপ কেমন বিষদূষণ বোধ হইতে পারে। কিন্তু কবি পক্ষে কোর্টশিপ-দৃষ্ট্য সন্নিবেশিত

করিয়া পুস্তকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বিমলা, তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের হৃদয়ের পবিত্রতা জাজ্ঞ্যমান হইয়াছে। যে কারণে আমরা রবি বাবুর নোকাডুবির প্রশংসা করি, সেই কারণেই আমরা হুর্গেশনন্দিনীর কোর্টশিপ অংশ পছন্দ করি। কবিকে সকল সময় সত্যের নিগড় পরাইতে হইলে সেকপীর, কালিদাসের অনেকটা খ্যাতি নষ্ট করিতে হয়, আয়েষাকে পর্দা হইতে বাহির করা অন্ততঃ কবিত্বপক্ষে প্রশংসনীয় বলিয়াই আমরা বিবেচনা করি। কালানোচিত্য দোষ না থাকিলে প্রধান প্রধান কবির পুস্তক হইতে তাঁহাদের কালনিরূপণ করা যাইত না—এবং প্রায় সকল কবির গ্রন্থে কালানোচিত্য দোষ পাওয়া যায়। বঙ্কিম বাবু ইংরাজি মেয়েদের কথা পড়িয়াছিলেন ও শিক্ষিতা ব্রাহ্মমহিলাদের দেখিয়াছিলেন, এই উভয়ের সংমিশ্রণে, সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা মিশ্রিত একটা ছায়া তাঁহার মনের উপর পড়িয়াছিল। বঙ্কিম বাবু অনেক স্থানে সমাজকে সরাইয়া রাখিয়াছেন—অবজ্ঞা ভরে নহে, সমাজকে উন্নতহৃদয় করিবার জন্ত।

“সেই কবি নোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অন্তগামি-ভাঙ্গ-প্রভা-সদৃশ বিতর্ক
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ কিরণ।”

—মাইকেল মধুসূদন। *

হুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিম বাবু ইংরাজি ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি, ইংরাজ যে সম্পূর্ণ দোষপূর্ণ এবং আমরা যে গুণের একচেটিয়া করিয়া বসিয়াছি, ইহা বিশ্বাস করিতেন

* বৈকুণ্ঠ কবিদের গ্রন্থে অভিসার আছে। এবং অভিসার বর্ণনায় কবিও আছে।

* মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থালী (বহুমতী সংস্করণ) ১৭০ পৃষ্ঠা।

না। + ‘আনন্দমঠ’ প্রণেতা, ‘বঙ্গোপদ্রব’ রচয়িতার ছায় স্বদেশপ্রেমিক কল্পজন আছেন? আমাদের চক্ষে বঙ্কিম বাবু ও তাঁহার দুর্গেশনন্দিনীর মানসিংহ অনেকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়। মানসিংহ আকবরের বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসযোগ্য কর্মচারী, কিন্তু মানসিংহের হৃদয় স্বদেশপ্রেমহীন নহে। মানসিংহ জগৎসিংহের যোদ্ধাপতিত্ব গুণের পরিচয় প্রবণ করিয়া বলেন “বুঝি আবার কুমার হইতে রাজপুত নামের পূর্বগৌরব গুনরক্ষা পিত হইবে।” মানসিংহ জানিতেন যে, মোগল বলবান্, মোগল হিন্দু অপেক্ষা দেশশাসনে ও দেশরক্ষণে পটু। মানসিংহ সেই জন্তই মোগলের বাস্তবগুণাধিকার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। কিন্তু কুটবুদ্ধি এবং রাজ্যশাসন ক্ষমতায় মোগল সমকক্ষ কোন সেনাপতির অভ্যুদয় হইলে মানসিংহ হুটু ভিন্ন দুঃখিত হইতেন না; হয়ত তাঁহার বিরুদ্ধে অন্নভাতার পক্ষ হইতে যুদ্ধ যাত্রা করিতেন, কিন্তু নিশিদিন ঈশ্বর সকাশে শত্রুর জয়কামনা করিতেন। আজ যদি ঈশ্বর বঙ্কিমের শারীরিক জীবনরক্ষা করিতেন, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস (আমরা কি ভ্রান্ত বিশ্বাসে পতিত?) তিনি Moderate দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন (যে দলের নেতা রবীন্দ্রনাথ)। বঙ্কিম কি জানিতেন যে, ভারত আর্থ্যের নহে, অনর্থ্যেরও নহে, হিন্দুও নহে, মুসলমানেরও নহে, নেটিভেরও

+ বঙ্কিম বাবু পরে মত বদলাইয়াছিলেন, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাবলীর ভূমিকায় বঙ্কিম লিখিয়াছেন, “আমি অনেকবার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প শেখ, আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ।” (বহুমতী; সংস্করণ, বঙ্কিম চন্দ্রের গ্রন্থাবলী ৭৭ ভাগ ২৭৪ পৃঃ)।

নহে, ইংরাজেরও নহে; ভারত ভারতীয়? আমাদের বোধ হয়, দুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিম, ঘৃণাকাঁহাকে বলে, জানিতেন না। বঙ্কিমের সহানুভূতি তাঁহার আয়েষার সহানুভূতির ছায় জাতি ও ধর্ম বিচার করিত না। তবে এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র কোন সম্প্রদায় বিশেষকে তোষামোদ করিতে ঘৃণা করিতেন। তাই আনন্দমঠের শেষ অধ্যায়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজের ভারতীয়ের উপর রাজ্য শাসনশক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন এবং ভারতে ইংরাজ-শাসন ঈশ্বর-প্রেমিত বলিয়াছেন, আবার চন্দ্রশেখরে তাৎকালীন ভারতীয় ইংরাজের মানসিকাবনতি রোগ-ব্যাপার সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, “হাঁওলি মিণ্ডিলিতে যে বিশ্বাস করে, সে শালা।”

যাঁহারা দুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিমকে মুসলমান-ঘেবী বলেন, তাঁহাদের এই কথা মনে রাখা উচিত যে, বঙ্কিমের তাৎকালিক মুসলমান-রাজগণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ইংরাজ-রচিত পুস্তক হইতে গৃহীত। বঙ্কিম হিন্দু শাস্ত্রাদি, হিন্দু জ্যোতিষাদি আলোচনা করিয়া হিন্দু সম্বন্ধে ইংরাজের ভুল সংস্কারগুলি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। যদি তিনি বঙ্গের ইতিহাস লিখিবার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে পারিতেন, আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান-রাজগণ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অনেক পরিবর্তিত হইত। আমার বোধ হয়, বঙ্কিমের কলঙ্কীয় জন্ত তাঁহার ইংরাজ-লিখিত ইতিহাসাধ্যয়ন দায়ী; এবং ওসমান্ তাঁহার-পরিচিত মুসলমানের ব্যবহারের ফল। তবে ইহাও

* ভারত জন্ত লেখক “প্রতাপাদিত্য” “প্রণেতা” কীরোদ বাবুর নিকট গী। ভাবটী রবি কবুর একটা আধুনিক বক্তৃতা হইতে গৃহীত।

মনে রাখিতে হইবে যে, কবি-স্বাভাবিক অতি-রঞ্জন যে তাঁহার পুস্তকে থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। সুতরাং আমাদিগকে প্রথমে বঙ্কিমের কবিত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

‘দুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিমের’ কবিত্ব বুঝিতে হইলে তাঁহার জীবন-চরিত্র আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

নারীকা তিলোত্তমাকে আমরা প্রথম মন্দিরে দেখিতে পাই। তখন দেখি, তিলোত্তমা কোমলী, লজ্জাশীলা, মন খুলিয়া কথা কহিতে সঙ্কুচিত। পরে যখন বাতায়নে তিলোত্তমাকে দেখি, তখনও সেই ভাব; প্রভেদ এই যে, কন্দর্পশরাসাত-ক্ষত হৃদয়কে জর্জরিত করিয়াছে। বিমলাকে ভালবাসে, বিমলার সহিত ‘একটী মনের কথাও বলে, কিন্তু তাহা বিমলার ঞ্বেশলে। পরে তিলোত্তমাকে জগৎসিংহের সহিত একত্র দেখি, তখন তিলোত্তমা তন্ময় হইয়া রোদন করিতেছে, তিলোত্তমা জগৎসিংহ সমীপে বাক্যহারা, নিস্তদ্ধা। তিলোত্তমা নিরীহা হিন্দু বালিকা। তিলোত্তমার প্রাণের কথা মুখে ফুটে না। তিলোত্তমার কাঁরাগারেও সেই ভাব। তিলোত্তমা জগৎসিংহের বাক্যের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম। হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে, তথাপি বাক্য স্ফুরণ হয় না। তিলোত্তমা ধীরা, তাহাকে সহিষ্ণুতাশালিনী বলা যায় না; তিলোত্তমা অত্যন্ত আনন্দের পর হঠাৎ কোন শোক বা তাপ পাইলে মূচ্ছিত হইয়া পড়ে। যখন তিলোত্তমা শুনি, তাহার পিতা শত্রু হস্তে বন্দী, তখন সে পালকে মূচ্ছিত হইয়া পড়িল। আবার যখন কাঁরাগারে রাজপুত্র বসিলেন ‘বীরেন্দ্র সিংহের কস্তা এখানে কি অভিপ্রায়?’ তখন তিলোত্তমার মস্তক ঘুরিতে

লাগিল, ‘প্রভুত্তর দিবার শক্তি লোপ পাইল। যখন রাজপুত্র আবার’ বলিলেন “তুমি যন্ত্রণা পাইতেছ, ফিরিয়া যাও; পূর্বকথা বিস্মৃত হও।” ‘তখন তিলোত্তমা অকস্মাৎ বন্দীবৎ ভূতলে পতিতা হইল।’ এ ঘোর অন্ধকারে যে এক নক্ষত্র প্রাতি দৃষ্টি ছিল, সেও তাহাকে আর কর বিতরণ করে না; এ ঘোর ঝটিকায় যে লতায় প্রাণ বাধিয়াছিল, তাহা ছিঁড়িল; যে ভেলায় বুক দিয়া সমুদ্র পার হইতেছিল, সে ভেলা ডুবি, তিলোত্তমা মৃত্যুপথে চলিল—জগৎ সিংহের প্রেম* ফিরাইয়া পাইয়া আবার বাঁচিয়া উঠিল। তিলোত্তমা স্নেহ জানে না; জীবনের একবার মাত্র বিমলাকে স্নেহ করিয়াছিল। সে স্নেহোক্তি তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে উঠিয়াছিল—যবন-বিলাস-ভবনে কংলুখার জন্মোৎসবে বিমলাকে বেশভূষালঙ্কৃত দেখিয়া তিলোত্তমা হৃদয়ে বড় আঘাত পাইয়া বলিয়াছিল ‘আজ-কার দিনের জন্ত উপায় করিবার প্রয়োজন।’ বিমলা জগৎ সিংহ নহে; বিমলা তাহার মিত্র, সখী, মাতা। কিন্তু তিলোত্তমাও কথা কহিতে শিখিয়াছিল। আসন্ন মৃত্যুমুখে পতিতা কুন্দনন্দিনী একদিন কথা কহিয়াছিল, —নগেন্দ্রনাথের আদর পাইয়া; * মৃত্যুমুখ হইতে পুনরাগতা তিলোত্তমাও কথা কহিতে শিখিয়াছিল—জগৎ সিংহকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া। কংলুখার বিলাসভবনে তিলোত্তমা ব্রীড়াবিবশা বালিকা ছিলনা, ভয়সঙ্কুচিতা রমণীতে পরিণতা হইয়াছিল; এখনও তিলোত্তমা আর ব্রীড়াবিবশা বালিকা রহিল না, কোমলতাময়ী যুবতীর রূপ ধারণ করিয়াছিল। তাই তিলোত্তমা জগৎ সিংহকে

* ‘বিরত’ বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—দ্বিতীয় ভাগ (বহুমতী সংস্করণ)।

তাহার স্বপ্নের কথা বলিতে পারিয়াছিল। তাই তিলোত্তমা আগ্রহবাক্যে বলিতে পারিয়াছিল “আপনাকে ভুলিলে স্বরাজ আমার মুখ দেখিবেন না।” তিলোত্তমা কাদিতে জানে; কাদাইতে পারে না; হাসিতে জানে না, হাসাইতে পারে না।

তীব্র বুদ্ধিশালিনী বিমলা আগে কেবল কাদিতেই জানিত, কাদাইতে অল্পই পারিত। তাই বিমলা মানসিংহ-অন্তঃপুরে বীরেন্দ্র সিংহকে ধরা দিয়াছিল। তাই বিমলা দাসী-রূপে বীরেন্দ্র সিংহের অন্তঃপুরে আসিতে পাইয়া নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করিয়াছিল। বিমলা শিথিতে পারিয়াছিল যে সংসারে আমরা করদিন? কাদিবারই বা প্রয়োজন কি? একদিকে যেমন সংসারে দুঃখ আছে, অপরদিকে সুখও আছে। সন্তানহীনা সরল শিশু পাইয়া, পিতৃপরিত্যক্তা পিতার যত্ন পাইয়া, স্বামীপ্রেমবঞ্চিতা স্বামীর প্রেম ফিরাইয়া পাইয়া হাশুময়ী হইয়া পড়িল। একে একে বুদ্ধিবৃত্তি সকল পরিত্যক্ত হইতে লাগিল কিন্তু ‘বিমলা পুরন্দরী’; স্মৃতির অনেকে বলেন যে দিগ্গজ, সেখ রহিম, কল্লুখাঁদির সহিত যে নীচজাতীয়া রসিকতার ব্যাপ্তা ছিল, ইহা তাহার চরিত্রের কলঙ্ক এবং কবির অল্পপযুক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে গিরিজা বাবু যে নীমাংসা করিয়াছেন, তাহার উপর কলম চালাইলে খুঁটতার পরিচয় দেওয়া হইবে। তিনি তিনটি কারণ দেখাইয়াছেন, যাহাতে আমরা বিমলাচরিত্রের এই অংশে দোষ দিতে পারি না। প্রথমতঃ বিমলা বাল্যকালে কতকটা স্বাধীন ছিল; দ্বিতীয়তঃ বিমলার রসলাপ মৌলিক, তৃতীয়তঃ ইন্দ্রিয়জ্ঞানী বিজ্ঞপ করিয়া অত্যন্ত রূপ প্রলোভন দেখাইবে না কেন? বন্ধিমবাবু, আমাদের বিশ্বাস, বিমলা-

চরিত্রে সমাজের প্রতি এই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, ব্যক্তিসম্বন্ধে সমাজ যেন হঠাৎ কোন একটা সিদ্ধান্ত না করে। ‘হাশুময়ী, কোহুময়ী বিমলা যেমন হাসিতে ও হাসাইতে শিখিয়াছিল, সেইরূপ কাদিতে ও কাদাইতেও শিখিয়াছিল। তিলোত্তমার মনঃক্লেশ দেখিয়া বিমলা পুনরায় কাদিতে শিখিয়াছিল, কিন্তু স্বামিবিহীন না হওয়া পর্য্যন্ত এই ক্রন্দন-শিকার সম্পূর্ণ পটিলতায় হয় নাই। “স্বামি! প্রভু, প্রাণেশ্বর!” বলিতে বলিতে উন্মাদিনীর ত্যায় অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে বিমলা কহিতে লাগিল “স্বামি! কষ্টরত্ন! কোথা যাও! আমাদের কোথা রাখিয়া যাও?” কিন্তু বিমলার আর কাদা হইল না। বিমলা বুঝিতে পারিল যে, এই নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ লইতে বিমলা ভিন্ন আর কেহ নাই—বীরেন্দ্রের পুত্র নাই; একমাত্র সন্তান তিলোত্তমা; অমন মূর্ধ্ণিমতী কোমলতার পক্ষে পিতৃহত্যার পরিশোধ লওয়া অসম্ভব। বিমলা কান্না বুক চাপিয়া রাখিয়া গোলাপাভ্যন্তরস্থিত কীট হইয়া গোলাপাকৃতি ধারণ করিল। যে বিমলা একটা সামান্য দৈনিককে জগৎসিংহ হস্তে নিপতিত দেখিয়া ক্লেশ পাইয়াছিল, তাহার এই কার্য যদি অসম্ভব হয়? তাই বিমলা স্বামীর রুধিরে মনের সঙ্কোচ বিসর্জন করিল। বিমলা আরও বুঝিল যে, কাদিবার সময় সে অনেক পাইবে এবং পাইয়াছিল। কিন্তু অনেকে বলেন, বিমলার দারুণ প্রতিহিংসাবৃত্তি ও অমানুষিক কার্য পুষ্ক-ভাবব্যঞ্জক ও অস্বাভাবিক। আমরা উপরে গিরিজাবাবুর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া দেখাই-রাছি যে, বিমলার কার্য অস্বাভাবিক নয়। তাহার অপরাধের যুক্তির উল্লেখ করিয়া এই সম্বন্ধে আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

প্রথমতঃ বিমলা রাজপুত-রমণী, দ্বিতীয়তঃ বিমলার অপরিচীত সাহস। গিরিজা বাবু মাইকেল হইতে উদ্ধার করিরাছেন যে—

ভেবে দেখ বীর যে বিদ্বান্ধট।

রমে আঁধি, মরে নর, তাহার পরশে।*

• বিমলা-চরিত্রের উজ্জ্বল চিত্র তাহার তিলোত্তমা-প্ৰীতি। তিলোত্তমাকে বিমলা অঙ্গুরীর দিয়া তাহার পলায়নের উপায় করিয়া নিজে এক মহাবিপজ্জনক কার্যো চলিল। তিলোত্তমার স্ত্রুধে বিমলা স্ত্রুখী, তিলোত্তমার ছুঃখে ত্রিয়মাণ।

কিন্তু এই পরোপকারতৎপর। বিমলার চিত্র হইতে অধিক পরোপকারতৎপর। আয়েষার চিত্র আরও উজ্জ্বলতর। আয়েষা আদর্শ-রমণী, “যথার্থই দেবকল্যাপিনী”। আয়েষা হাসিতে চাহে না, হাসাইতে চাহে; কাঁদিতে চাহে না, কাঁদাইতে চাহে* না। পাঠক, তুমি কৃষ্ণগগনে স্বেতসৌদামিনীকে বাহির হইয়াই লুকাইতে দেখিয়াছ, কিন্তু ধবলাকাশে কৃষ্ণবিদ্যাতের ক্রীড়া দেখিয়াছ কি? তাহা যদি না দেখিয়া থাক, তাহা হইলে আয়েষার দিকে দৃষ্টিপাত কর। এ হৃদয়াকাশে শোক আছে, আবার তখনই লুকাইয়া পড়ে; কোথায় যায়? একেবারে কি ঢুকিয়া যায়? জানি না। তুমি বলিতে পার, ঐ নীলাকাশের সৌদামিনী কোথায় যায়? তাহা যদি না বলিতে পার, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিও না, আয়েষা নিরাশ-প্রণয়ী কি না।† কবি তোমায় উত্তর দিতে পারিবেন না। কবি আয়েষাকে আশ্র-যাতিনী করেন নাই, তাহার কারণ, বোধ হয়, পাছে কোন কবিরবিহীন শব্দব্যবচ্ছেদক

* মাইকেল মঃ দত্তের গ্রন্থাবলী, বৃহত্তম সংস্করণ ২৬ পৃঃ।

† গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়ও ইহার সম্যক মীমাংসা করিতে পারেন নাই। আমাদের দৃষ্টে তাহা নাই। “বঙ্কিমচন্দ্র” (হিতবাদী সংস্করণ)।

তাহার উপর অত্যাচার করে। আয়েষা জগৎ-সিংহকে লিখিয়াছিল “আমি তোমার প্রেমা-কাজিনী নহি। আমি যাহা দিবার, তাহা দিয়াছি”। তোমার নিকট প্রতিদান চাহিনা, আমার স্নেহ এমন বদ্ধমূল যে, তুমি স্নেহ না করিলেও আমি স্ত্রুখী। যদি কখন স্ত্রুখী হও, আয়েষাকে সংবাদ দিও, যদি কখন অন্তঃ-করণে ক্রেশ পাও, আয়েষাকে স্মরণ করিবে?” কিন্তু এই পত্র লিখিবার পর এক দিন আয়েষা তিলোত্তমাকে বলিয়াছিল “ভগিনি, এ সকলের প্রশংসা করিও না। তুমি আজ যে রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিলে, এ সকল তাহার চরণে গুলু নহে।” আয়েষা তিলোত্তমার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া এত যত্নগা পাইয়াছিল যে, অঙ্গুরীর বিবে তাহার অব-সান করিতে গিয়াছিল—কিন্তু পরে সেই লোভ সম্বরণ করিয়াছিল, ভাবিয়াছিল “যদি এ যত্নগা সহিতে না পারিলাম, তবে নারীজন্ম গ্রহণ করিলাম কেন? জগৎসিংহ স্ত্রিয়াই বা কি বলিবেন?” কেহ কেহ আছেন, যাহারা ঈশ্বরের বিধানের প্রতিবাদ করে না। আয়েষা জগদানন্দ চরণে আপনার স্ত্রুখুঃখ অপন করিয়াছে। আয়েষা হৃদয়ের কষ্ট যাহাতে আত্মাকে পীড়া না দেয়, তাহা করে, আয়েষা তিলোত্তমার সরল প্রেমপ্রতিম মুখ দেখিয়া বিধাতার চরণে এই ভিক্ষা করিয়া-ছিল যেন ইহার দ্বারার জগৎসিংহের চিরমুখ সম্পাদিত হয়। তীক্ষ্ণদৃষ্টি আয়েষা পূর্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহার পক্ষে জগৎসিংহ পাওয়া প্রায় অসম্ভব। জগৎ-সিংহকে পাইতে হইলে তিলোত্তমাকে কাঁদা-ইতে হয়, ওসমানকে কাঁদাইতে হয়। আয়েষা কাঁদাইতে চাহে না; আয়েষা হাসাইতে চাহে। তাই আয়েষা মুখ অবনত করিয়া কণ্ঠস্থ

ক্ষাণে কাণে (কংলুখাঁর মৃত্যুকালে) তিলোত্তমার পবিত্রতা প্রকাশ করিবার উপদেশ দিয়াছিল—ওসমান আয়েষাকে মনঃপীড়িত না করিলে আয়েষার হৃদয়ের তাপ কখনই প্রকাশ পাইত না। তাই আয়েষা জগৎসিংহের নিকট আয়েষার নাম উত্থাপন করিতে তিলোত্তমাকে বারণ করিয়াছিল। আয়েষা একবার ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিল—উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিল “শুন, ওসমান! আবার বলি, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর—বাবজীবন অল্প কেহ আমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। কাল যদি বধ্যভূমি ইঁহার শোণিতে আর্দ্র হয়, তথাপি দেখিবে, হৃদয়মন্দিরে ইঁহার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্তকাল পর্যন্ত আরাধনা করিব। এই মুহূর্তের পর, যদি আর চিরন্তন ইঁহার সঙ্গে দেখা না হয়, কাল যদি ইনি মুক্ত হইয়া শত মহিলার মধ্যবর্তী হন, আয়েষার নামে দিকার করেন, তথাপি আমি ইঁহার প্রেমাকাজিকিনী দাসী রহিব। আরও শুন; মনে কর, এতক্ষণ একাকিনী কি কথা বলিতেছিলাম? বলিতেছিলাম, আমি দোষ-রিকগণকে বাক্যে পারি, ধনে পারি বনীভূত করিয়া দিব; পিতার অশ্রুশালা হইতে অশ্রু দিব; বন্দী পিতৃশিবিরে এখনই চলিয়া যাউন। বন্দী দিগ্ধে পলায়নে অস্বীকৃত হইলেন।” কিন্তু আয়েষার উত্তেজন্য কারণ ছিল। আয়েষাকে ওসমান অবিশ্বাসিনী ভাবিয়াছে। আয়েষার হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিয়াছে, তাই আয়েষা ওসমানের নিকট ক্ষমা চাহিতে চাহিতে পুনরায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল—“কিন্তু তুমি আজ আয়েষাকে অবিশ্বাসিনী ভাবিয়াছ। আয়েষা অল্প যে অপরাধ করুক, অবিশ্বাসিনী নহে। আয়েষা যে-কর্ম করে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে।

এখন তোমার সাক্ষাৎ বলিলাম, প্রয়োজন হয় কাল পিতার সমক্ষে বলিব।” কিন্তু আয়েষা কান্দাইতে চাহে না। আয়েষা চিরানন্দ-দায়িনী হইতে চাহে। আয়েষা জগৎসিংহ ও ওসমান উভয়ের নিকট ক্ষমা চাহিল। একজন যদি তোমাকে জীবন দান করে, আর তার স্নেহের প্রতিদান দিতে যদি না পারে, তাহা হইলে কি তোমার মনে কষ্ট হয় না? জীবনদায়িনী আয়েষার প্রেমের প্রতিদান জগৎসিংহ কি করিয়া দিবেন—তাঁহার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে; কি করিয়া এই ক্ষত হৃদয়ে তিনি আয়েষার পূজা করিবেন, এইরূপ ভাবিয়া হত জগৎসিংহ কষ্ট পাইবেন, তাই আয়েষা জগৎসিংহের নিকট ক্ষমা চাহিল। আয়েষা ওসমানকে বলিল “ওসমান...যদি দোষ করিয়া থাকি, দোষ মার্জনা করিও। আমি তোমার পূর্বমত স্নেহপরায়ণা ভগিনী; ভগিনী বলিয়া তুমিও পূর্বস্নেহের লাঘব করিও না। কপালের দোষে সস্তাপ-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি, ভ্রাতৃস্নেহে নিরাশ করিয়া আমার অতলজলে ডুবাইও না।” আয়েষা আকাংক্ষাকে বিসর্জন দিল—স্বতি টুকু ফিরে দিল না। আয়েষার প্রেম জাতি ও ধর্ম বিচার করে নাই, তাহার দয়া জাতি, ধর্ম বা পাত্র ভেদ করে নাই। হিন্দু-বন্দীকে সেবা করিতে আয়েষার কত আগ্রহ; তিলোত্তমাকে যখন আয়েষা কৈালে লইল, জগৎসিংহ ও দাসী মনে করিল ‘আহা, কি সুন্দর!’ প্রতিবন্দিনী-প্রাণয়িনীর আয়েষা যে উপকার করিয়াছিল, তাহা এক ঈশ্বর ভিন্ন তাহাকে আর কেহ করে নাই—আয়েষা তিলোত্তমার প্রাণ বাঁচাইয়াছিল বলিলে অত্যাক্তি হয় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনির্মলচন্দ্র চন্দ্র।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর । (২)

পাঠক মহাশয়েরা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থে বিদেশী লোকের অবস্থান জন্ত সুবিধাজনক স্থান আছে কি? ইহার উত্তর সন্তোষজনক, সুতরাং সে বিষয়ে পাঠক নিশ্চিত হইতে পারেন। এমন ভুবনবিখ্যাত, সুপ্রাচীন ও সুপরিচিত তীর্থে—এমন অসংখ্যাসংখ্য ভক্তাদিক ভক্ত যাত্রীবৃন্দের আধ্যাত্মিক আশ্রমধামে—ভক্তের জন্ত কি স্থানের অভাব হইতে পারে? হিন্দু-শাস্ত্রের বিধি এই, অন্ততঃ ত্রিরাত্রি তীর্থ স্থানে বাস করিতে যাত্রীরা বাধ্য; প্রথম-বারের দর্শনে তিন দিন তিন রাত্রি বাস করিতেই হয়, দ্বিতীয় বা অষ্টবারে তিন দিন না থাকিলেও শাস্ত্র অমাত্য করা হয় না। তাড়া দিয়া রামেশ্বরে বাসারাত্রি পাওয়া যায়, কিন্তু ভাড়াটিয়া বাটীর সংখ্যা অল্প; যাত্রীরা ভাড়া দিয়া কেহ বাসা গ্রহণ করে না। অনেক রাজা, রাণী, জমিদার, বণিক ও বড় লোকের ধরাত্তী সুন্দর বাটি আছে, সেই সকল বাটিতে যাত্রী ও ভ্রমণকারিগণ বিনা পয়সায় থাকিতে পারে। বাটীসমূহ প্রস্তরে নির্মিত এবং সুবিধাজনক। জলাদির কষ্ট নাই। এই সমস্ত বাটি এক একজন পাণ্ডার অধীনে থাকে। এখানে পাণ্ডাদের জুলুম নাই। সুতরাং সর্ব প্রকারেই সুবিধাজনক। পরিবার সঙ্গে লইয়াও থাকা যাইতে পারে। তত্ত্বিগণ কয়েকজন ব্রাহ্মণ ও অগাধ জাতীয় লোকের দেশীয় হোটেল আছে। পয়সা দিয়া তুখায় ভোজনাদি হইতে পারে, কিন্তু অবস্থাসের বড় সুবিধা হয় না। রামেশ্বরে চাউল, ডাউল, ময়দা, ঘৃত, লবণ, লুচি, মণ্ডা, শর্করা প্রভৃতি সমুদয় দ্রব্যই খরিদ করিতে পাওয়া যায়। মাংসের পরিমাণ কম, সমুদ্রজ মৎস্য প্রভৃতি এবং খুব সস্তা, কিন্তু তীর্থ স্থানে আসিয়া প্রায় কেহই আমিষ ভক্ষণ করে না। এদেশে শূদ্রগণ ব্যতীত অপর কেহ মৎস্য

মাংস আদৌ স্পর্শ বা ব্যবহার করে না। আম, জাম, নারিকেল, তাল, তর্পুজ, লেবু, কদলী, বারমাস সকল ঋতুতে প্রচুর পরিমাণে স্থলে বিক্রীত হয়। আম খুব সস্তা। বার-মাসই আমগাছে আম থাকে। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, তীর্থধামের শোভা মনোমোহিনী।

এদেশের ভাষা তামিল, কিন্তু সহজে এত হিন্দুস্থানীর বাস যে, এখানে হিন্দুস্থানী ভাষা একপ্রকার সাধারণ ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খাস রামেশ্বর তীর্থে প্রায় বার আনা লোক হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা কয়। দোকানদার, পাণ্ডা, বাজারওয়াল, তত্ত্বাবধায়ক, ইহারা সকলেই হিন্দুস্থানী, অতি সমাজ সংখ্যার লোক তামিল ভাষা ভাষী। প্রধান প্রধান ধনবান পুরুষ হিন্দুস্থানী। অনেক বৎসর হইতে হিন্দুস্থানীরা পশ্চিম দেশ হইতে এখানে আসিয়া আড্ডা জমাইয়া বসিয়াছে। যাত্রীর সংখ্যাও অধিকাংশ বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, গুজরাটী ও মাদ্রাসারী। রামেশ্বরে ছোট স্কুল, ডাকঘর, তার-অফিশ, থানা, রেজিষ্ট্রী অফিশ, রামনাদের রাজার কাছারী, মন্দিরের কাছারী, হাট, বাজার, সুন্দর পথ, বলদশকট প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ঘোড়ার গাড়ী চলে না। শঙ্করলাল, গঙ্গা-রাম, বিশ্বনাথ প্রভৃতি রামেশ্বর তীর্থের মহা ধনবান ও ক্ষমতাশালী পাণ্ডা, ইহারা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। যাত্রীদের আনিবার জন্ত ইহাদের বেতনভোগী লোকেরা ভারতবর্ষে প্রায় সর্বত্র যাতায়াত করে। রামেশ্বর নগর সমুদ্র তটে অবস্থিত; মন্দিরটা সমুদ্রের কোলে প্রতিষ্ঠিত বলিলে বলা যায়। দ্রব্যাদি সস্তা এবং অধিবাসীদের ব্যরহীর প্রেমিকজনোচিত। ইহা স্থানমাহাত্ম্য-জনিত, সন্দেহ নাই। অধিবাসীরা শৈব, কিন্তু নিরামিষানী।

রামেশ্বরবাসীদের তামিল ভাষা অনার্থ্য

ভাষা। কতকগুলি বাঙ্গালা শব্দের এস্থলে তামিল প্রতিশব্দ দিলাম, আপনারা দেখিবেন, এই ভাষার সহিত ভারতবর্ষীয় অল্প কোন আত্মভাষার সম্পর্ক নাই।

বাঙ্গালা	তামিল
চাউল	আর্শী
ডাউল	পপ্প
লবণ	উপু
তৈল	এণে
স্বত	নেই
নিদ্রা	তুকম্
উপবেশন	মুক্কারম্
শয়ন	পড়িতকম
দধি	তায়ের
দুগ্ধ	পাল
জল	নীলু
ভোজন	সাপডম্
ভাত	চোর
অগ্নি	নিপু
তামাকু	পোয়লে
বাঘ	কাং

রামেশ্বর ক্ষেত্রে কোথায় কি কি তীর্থ আছে, এক্ষণে তাহার বিবরণ দিতেছি। এখানকার সর্ব প্রথম দর্শনীয় পদার্থ ভগবান রামেশ্বরের মন্দির ও সুরমা মূর্তি। ইহাই এখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ এবং ইহারই দর্শন জ্ঞাত রাশি রাশি মুদ্রা ব্যয় করিয়া, বিষম কষ্টে, অতি দূরদেশ হইতে হিন্দু নরনারী আগমন করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের সকল দেশের লোক এস্থলে যাত্রীরূপে উপস্থিত হয়। নেপাল, ভূটান, কাস্মীর, পঞ্জাব, রাজপুতানা, পেশোয়ার, করাচি, গুজরাট, বোম্বাই, হয়দ্রাবাদ প্রভৃতি সমুদায় প্রদেশের হিন্দুকে এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি দিন অগণ্য যাত্রী বারমাসে সকল ঋতুতে সমভাবে থাকে। বিশেষ পরীদি উপলক্ষে জনতা অবশ্য অত্যন্ত অধিক হয়, কিন্তু কখন কোন গোলযোগ হয় না। আমি দ্বিতীয় বারে রামেশ্বর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দুই জন বাঙ্গালী পুরুষ এবং কয়েকজন বাঙ্গালী রমণীকেও দেখিয়াছিলাম।

পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে সর্ব প্রথমে রাম-

কুণ্ডনামক সরোবরে স্নান করিতে বলে। এই সরোবর বহু কালের প্রাচীন, ইহার জল অত্যন্ত লবণাক্ত। 'চান্নিধাতু' স্নানর পাথর দিয়া স্নকটিন রূপে বাধান। স্নানের পর রামেশ্বর মন্দিরে যাইতে হয়, কেহ কেহ বা অপর কুণ্ডে কিম্বা কুপে অথবা সমুদ্রে স্নাত হইয়া থাকে। একটু দূর হইতে মন্দিরকে দেখিলে বোধ হয় যেন পর্বত-গহবরে প্রবেশ করিতে যাইতেছি; যতই নিকটে যাই, ততই বিশাল বোধ হয়; খুব নিকটে বা দ্বার দেশে গেলে ইহার সম্পূর্ণ বিশালত্ব দেখিয়া গালে হাত দিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। সমস্ত পৃথিবীতে এতবড় দেব মন্দির আজি পর্য্যন্ত কেহ প্রস্তত করে নাই। ইটালীর অন্তর্গত রোমের পোপু সাহেবের কুঠি কিম্বা অনেক রাজা বা সম্রাটের প্রসাদ এতদপেক্ষা বড় হইতে পারে, কিন্তু পোপের বাটী মন্দির নহে, ইহা তাঁহার আবাল গৃহ, রাজা বা সম্রাটদিগেরও তাহাই। রামেশ্বরের মন্দির সম্পূর্ণ দেব মন্দির। এই মন্দির দেখিলে পুণ্যকে ও বিশ্বয়ে স্তম্ভিত হইতে হয়, ইহার ভিতর ও বাহির ভাল করিয়া দর্শন করিলে মস্তমুগ্ধবৎ হইয়া যাইতে হয়। দুই চারি দিবসে ইহার কিছুই দেখা যায় না। মন্দিরের ভিতরে কোথায় কি আছে, তাহা সম্পূর্ণ রূপে জানিতে বা দেখিতে হইলে অন্ততঃ দুই সপ্তাহ কালাধিক পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। অসংখ্য স্তম্ভ, অসংখ্য প্রেকাষ্ঠ, অগণ্য কুঠরী, গণনাভীত ভাগ, বিভাগ প্রভৃতিতে এই মন্দির এক অত্যাশ্চর্য্য দর্শনীয় পদার্থ রূপে বর্তমান। ভিতরে কত দালান, আটচালা, নাটমন্দির, হল, চবুতরা, বারান্দা, গুপ্ত ও প্রকাষ্ঠ গৃহ, তাহার স্থির করা যায় না। মন্দিরের ভিতরে কুপ ও সরোবর আছে। কোথাও কাচারী, কোথাও সঙ্গীত-সম্প্রদায়ের আড্ডা, কোথাও হাতি, ঘোড়া, উষ্ট্র, হরিণ, অজগন্ত, পাকাগার, ধনভণ্ডার, অন্নালয়, হোম ও যজ্ঞের কুণ্ড, পূজার দ্রব্যাদির ভাণ্ডার, ভূত্যা ও সেবকাদির গৃহ, পুরোহিত প্রভৃতির আবাস, কর্মচারীগণের বাটী, পুস্তকালয়, বজ্রালয়, অলঙ্কার গৃহ, ইত্যাদি ইত্যাদি, কোথায় যে কি আছে,

তাহার প্রকৃত বা সম্পূর্ণ বিচরণ দেওয়া অসম্ভব। স্বচক্ষে না দেখিলে এই অত্যন্ত মন্দিরের ধারণা হয় না। ইহা ভূতলে অতুল। এই মন্দিরাভ্যন্তরে চারিশ সহস্র গোক অনার্যাসে শয়ন বা উপবেশন করিতে পারে। এক কোণে বা এক দিকে একটা লোক যদি চারি পাঁচ বৎসর কাল পর্য্যন্ত লুকায়িত থাকে, তাহা হইলে বোধ হয় তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এক একটা স্থান এমন নীতল যে বরফের ছায় ঠাণ্ডা, এক একটা স্থান আবার জ্যোষ্ঠের প্রচণ্ড রৌদ্রের ছায় উষ্ণ। কোন স্থান ভয়ানক অন্ধকারে পরিপূর্ণ, কেঁদে মারুয দেখা যায় না; আবার কোন স্থান এত আলোক পূর্ণ যে, আল্পিনটী পর্য্যন্ত অথবা মস্তকের একগাছি কেশ পর্য্যন্ত ভূমিতল হইতে উঠাইয়া লওয়া যায়। নানা প্রকার তপপ্রভাবী সাধু মহাত্মাদিগের ভজননিদানে, বৈদিক বিপ্রগণের বেদধ্বনিতে, যাজ্ঞিকদিগের শাস্ত্র পাঠে, ভক্তগণের প্রার্থনারবে সমস্ত মন্দির দিবা রাত্রি অপূর্ণ মাহাত্ম্য ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ থাকে। সে অনির্বচনীয় দৃশ্য লেখনী দ্বারা লেখা যায় না। মন্দিরের ভিতরের ও বাহিরের দেওয়ালে পক্ষী, পশু, কীট, পতঙ্গ, দেব, দেবী, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সর্প প্রভৃতি অগণ্য প্রকার জীব জন্তু প্রভৃতির মূর্ত্তি খোদা আছে। মন্দিরের ভিতরে জীবিত হস্তি, উষ্ট্র, হরিণ, ছাগ, অং, প্রভৃতি পশু দৃষ্ট হয়; তৎভিন্ন প্রস্তর, পিত্তল, স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ নিৰ্ম্মিত অগণ্য বড় বড় পশু-মূর্ত্তি স্থানে স্থানে প্রাক্ষণে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। রথ, গাড়ী, শকট, ভোজন-পাত্র, শয্যা, ঘণ্টা, বাজ্যন্ত্র, পাকী প্রভৃতির সংখ্যা নাই বলিলেই হয়। শস্যভাণ্ডার, অতিথি-আগার, সাধুর আশ্রম, বিপ্রগণের পূজার গৃহ, যোগী-জনের নিভৃত যোগাশ্রম, পাঠাগার প্রভৃতি কত যে কি আছে, তাহা বলা যায় না। ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য, সাধন, ভজ্ঞন প্রভৃতিতে যাহারা গণনীয়, তাঁহাদের জন্ত আবার স্বতন্ত্র স্থান আছে, তাহাও মন্দিরাভ্যন্তরে অবস্থিত। মহাশয়গণ! এমন অপূর্ণ স্থান আর কোথাও দেখিয়াছেন কি? এখানে

উপস্থিত হইলে পুলকে রোমাঞ্চিত হইতে হয়। সমস্ত রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি শাস্ত্রে যে সকল দেব, দেবী, যক্ষ, রক্ষ, পশু, পক্ষী, নাগ, কীট ইত্যাদির উল্লেখ আছে, বিশেষতঃ রামায়ণ মহাকাব্যে যাহা কিছু উল্লিখিত হইয়াছে, এই অত্যাশ্চর্য্য মন্দিরের ভিতরের বা বাহিরের দেওয়ালে অথবা স্তম্ভাদিতে তৎ সমুদয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। যেন সমস্ত রামায়ণ কাব্য, মন্দিরে খোদা। তত্ত্বিন্ন আরও অনেক ছবি দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেওয়ালে লতা, পাতা, ফল, ফুল, মূল, কন্দ, বৃক্ষ, কত যে কি আঁকা আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। পরী, সখা, সাধু মূর্ত্তি, শ্রীকৃষ্ণের গোপীদীপা, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, রাম রাবণের যুদ্ধের ছবি প্রভৃতি সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্ববৃহৎ মন্দিরাভ্যন্তরে বহু সংখ্যক দেব দেবীর ছোট বড় মন্দির দৃষ্ট হইয়া থাকে। শিবমূর্ত্তি ও শিব মন্দির প্রায় চারিদিকেই গোড়া পাইতেছে। মন্দিরের এক দিকে ময়ানেজারের অবিদ্যুত কাছারী, তাহার পার্শ্বে থাকাকীর ঘর, তৎপরে সিপাহী ও অহরীদিগের অস্ত্রাগার এবং তদনন্তর হাতীশালা, ঘোড়া, হরিণ, উষ্ট্র ইত্যাদির আস্তাবল। ময়ূর ও পালিত ছাগল যথেষ্ট। কোথাও “বলি” হয় না; “ভোগ” সম্পূর্ণ নিরামিষ। এই রামেশ্বর তীর্থ রামনাদের রাজার জমিদারী, কিন্তু প্রতি পরমাটী দেবতার মন্দিরের অস্ত্র ব্যতিত হইয়া থাকে। মাদুরা জেলার কলেক্টর সাহেবের ইহা এলাকাভুক্ত, কারণ ইহা ব্রটিশ রাজ্যভুক্ত। পূর্বেই বলিয়াছি, সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থ ভারতবর্ষের সীমার বাহির্দেশে অবস্থিত; ভারত মহাসাগরের সুপ্রশস্ত বক্ষে ইহা একটা রমণীয় দ্বীপ। এডেন ও রামেশ্বর ভিন্ন, ভারতের বাহিরে, দক্ষিণ দিকে, ভারতীয় গবর্ণর জেনারেলের আর কোন অধিকার নাই। সমুদয় মন্দিরটা নানা বর্ণের পাথর দ্বারা মনোহর রূপে নিৰ্ম্মিত। সম্প্রতি দেবীকোটা নামক স্থানের অনেক মহাদেব-বান বণিক লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রামেশ্বর মন্দিরের সংস্কার করিয়া দিতেছেন। এই সংস্কার বশতঃ অনেক পুরাতন ভিনিষ ও

স্থান নূতন হইয়াছে এবং অনেক নূতন জিনিষ ও গাঁথনি সংযোজিত হইয়া যাইতেছে। সুবৃহৎ মন্দিরাভ্যন্তরে গিয়া সর্বপ্রথমে ভগবান রামেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিলাম। ইহা শিবলিঙ্গ। মন্দিরের উপরে বিস্তৃত সুবর্ণ-নির্মিত চক্রাতপ ও সুবর্ণ-নির্মিত স্তম্ভ দৃষ্ট হইল। দ্বারদেশে রোপ্য ও স্বর্ণ-নির্মিত ফলক দেখা যায়, মন্দিরাভ্যন্তরে দুই এক-খানা হীরকও জলিতেছে। বহির্দেশে বহুমূল্যবান ও শোভাময় ঝাড়, লঠন, দেও-রালগিরি, ফাগুশ প্রভৃতির অভাব নাই। এখানকার চক্রাতপ রোপ্য-নির্মিত, তাহার মধ্যস্থলে অতি মূল্যবান মথমল। রামেশ্বর মহাদেবকে স্পর্শ অথবা তাঁহার খুব নিকটে যাইতে হইলে, মন্দিরের ম্যানেজারের অনু-মতি পত্রের প্রয়োজন। যেস্থলে দাঁড়াইয়া সাধারণতঃ দর্শন করা যায়, তাহাই যথেষ্ট। রামেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিয়া “চক্ৰিশ তীর্থ” দর্শন ও তাহাতে স্নান করা আবশ্যক। বাঁহারা স্নান করিতে না পারেন, কুণ্ডের জল লইয়া মস্তকে দেন অথবা তাহা স্পর্শ করেন। এই চক্ৰিশটী তীর্থের নাম এই—মাধব, গো, গবাচ্, নল, নীল, গন্ধমাদন, ব্রহ্মহত্যা মোচন, চন্দ্র, সূর্য্য, গঙ্গা, যমুনা, গয়া, শঙ্খ, গায়ত্রী, শাক্তী, সরস্বতী, মহালক্ষ্মী, অগস্ত, অগ্নি, চক্র, সতী, পার্শ্বতী, রামেশ্বর এবং কোটি তীর্থ। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক তীর্থের সম্মুখে দেবালয় আছে।

মাধবতীর্থ একটা সরোবর ; মাধব হইতে গন্ধমাদন কুণ্ড পর্য্যন্ত ছয়টা তীর্থ একই স্থানে অবস্থিত। এখানে অসংখ্য শিবমূর্তি আছে। গায়ত্রী, শাক্তী ও সরস্বতীতীর্থ একই স্থানে দেখা যায়। মহালক্ষ্মী সুবৃহৎ কুণ্ড। এখানে বহু কুণ্ড, পুষ্পবৃক্ষ ও নারিকেল গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। উপরে যে সকল তীর্থের নামোল্লিখিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই সুবৃহৎ রামেশ্বর মন্দিরাভ্যন্তরে অবস্থিত ; কেবল অগ্নি ও অগস্ত তীর্থ, মন্দিরের বাহিরে দেখা যায়। নীতাতীর্থ বৃহৎ কুণ্ড। কোটি তীর্থকে সমুদয় তীর্থ দেখিবার পরে দেখিতে হয়। রামেশ্বর হইতে যাত্রা কালে যাত্রীরা ইহা দর্শন করেন। প্রবাদ-আছে, ইহা দর্শনে

কোটি তীর্থ দর্শনের ফল হয়। এই তীর্থ দর্শনে নরজন্মের সমুদয় পাপ বিনষ্ট হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস। ইহা দর্শন করিয়া যাইবার সময় যাত্রীরা করজোড়ে কহিয়া থাকেন “হে প্রভো! পূর্বজন্মে ও ইহজন্মে যত অসংখ্য পাপ করিয়াছি, তাহা এবারে মার্জিত হউক, আর কখন পাপ করিব না, এই প্রতিজ্ঞায় এখন আবদ্ধ হইলাম।” প্রথিত আছে, ভগবান রামচন্দ্র তাঁহার বাণ নিক্ষেপ করিয়া এই স্থানে কোটি তীর্থের জল আনিয়া ছিলেন। রামেশ্বর কুণ্ড সম্মুখে প্রকাণ্ড “নান্দিকেশ্বর মূর্তি” ও একটা সুবৃহৎ বণ্টা দেখিতে পাইবেন। এই বিপুলাকায় বণ্টাটা নেপালের মহারানীমহোদয়া মন্দিরের উপরে দিয়া গিয়াছেন। ইহারই পরে সুবিখ্যাত “হরবোলা” মূর্তি। এই মূর্তির প্রবাদ কৌতুক-জনক। কথিত আছে, হনুমান যখন সেতু-বন্ধন করিতেছিলেন, তখন নিশাকালে কোন এক ব্যক্তি ঐ সেতু ভাঙ্গিয়া দিয়া যাইত। নিত্য নিত্য এইরূপ ঘটনা ঘটিতে থাকায়, হনুমানেরা পরিশ্রম করিয়া রাত্রে গোপনে পাহারা দিতে লাগিল। অপরাধী ধৃত হইলে দেখা গেল, সে ব্যক্তি ঠাকুর লক্ষণ। অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া মল ও নীল জিজ্ঞাসা করিল, “ঠাকুর! আপনি নিশিযোগে ধৈতু ভাঙ্গিয়া দেন কেন?” লক্ষণ বলিল, রাত্রিমত বাঁধা হইতেছে না, স্ততঃ তাল করিয়া বাঁধিবার বন্দোবস্ত করিতেছি।” হনুমানেরা তাহাই বিশ্বাস করিল, কিন্তু সে সময়ে লক্ষণ বাস্তবিক ঐ স্থানে আদৌ ছিলেন না, অস্তিত্ব ছিলেন। লক্ষণ প্রত্যাগত হইলে নল জানিতে পারিল, ইহা ঠাকুর লক্ষণের কার্য্য নহে, কোন চতুর রাক্ষসের ছুটামি। তখন কৃত্রিম-লক্ষণ-বেশ-ধারীকে ধরিয়া নল ও নীল হত্যা করিল। অনুসন্ধানে হনুমানেরা জ্ঞাত হইল, এই ব্যক্তি মায়াবী রাক্ষস এবং রাবণ কর্তৃক প্রেরিত। যাহা হউক, এই মূর্তির পার্শ্বে “কাশী বিশ্বনাথ মূর্তি” ও “নবগ্রহ মূর্তি” দৃষ্ট হইয়া থাকে। পার্শ্বতী মন্দিরে নেপালের মহারানীর উপহার প্রদত্ত বহুমূল্যবান হস্তিদন্ত-নির্মিত ফটক দেখিতে পাওয়া যায়। দেবীর মস্তকোপরে বহুমূল্যবান হীরক জলে। মন্দিরের একটু

দূরে জম্বু, বিকানীর, রামনাদ, জিবাকোড়, প্রভৃতি মহারাজাদিগের ছত্র আছে। মন্দিরের প্রথম ও বিত্তীয় গেটের সুদীর্ঘ প্রাঙ্গণে দোকানদারেরা বসিয়া মালা, শঙ্খ, ছবি, খেলানা, পুস্তক, সমুদ্র জীবের ককাল প্রভৃতি বহু দ্রব্য বিক্রয় করে।

আমি মন্দির দর্শন করিয়া মন্দিরের বাহিরে অগস্ত্য তীর্থ ও অগ্নিতীর্থ নামে দুইটা রমণীয় ও সুপবিত্র স্থান দেখিতে গেলাম। অগস্ত্যমুনি সমুদ্রতটে এই মনোহর আশ্রমে বাস করিতেন। মন্দিরের দ্বার হইতে সমুদ্রতটে বাঁকি মিনিট মধ্যে যাওয়া যায়। একটা সুপ্রাচীন অশ্বখ বৃক্ষের নিম্নে এই আশ্রম অবস্থিত, সম্মুখে একটা কুণ্ড এবং কতকগুলি দেবমূর্তি। আশ্রমে উপস্থিত হইলে রোমাঞ্চিত কলেবর হইতে হয়। একটা ক্ষুদ্র মন্দির অত্য়াপি সেই তপ-প্রভাবশালী মহামুনির দেবত্ব ঘোষণা করিতেছে। এই মন্দিরে বসিয়া মুনিবর সমুদ্র শোষণ করিতে গিয়াছিলেন।

“অগ্নিতীর্থ” স্মরণ হইলে এখনও শ্রদ্ধা, ভক্তি, আদর্শ নারীর সতীত্ব এবং সত্যের জয় মনে করিয়া হৃদয়ে অপূর্ণতাভাবের উদয় হয়। এই মহাপবিত্র স্থানে মহাসতী পরমেশ্বরী জ্ঞানকীর অগ্নি পরীক্ষা হইয়াছিল। একথা বর্ণনা করিতে করিতে এখনও রোমাঞ্চিত হইতেছি। প্রশান্ত ও অনন্ত ভারতমহাসাগরের শোভাময় তটে, মহাদেব রামেশ্বর মূর্তির সম্মুখে, এই পুণ্যপূর্ণ স্থানে দণ্ডায়মান হইলে, ভূতলে অতুল আনন্দের অমূল্যভূতি হইয়া থাকে। এখানে সমুদ্র স্থির এবং তটদেশ পর্যন্ত সলিলরাশি অতীব স্বচ্ছ ও সুন্দর। সমুদ্রের এই অনন্তস্রুগব্যাপী পবিত্র উপকূলে ভগবান রামচন্দ্র, সুমগ্র বিশ্বমণ্ডলকে মা জ্ঞানকীর পরমেশ্বরীত্ব দেখাইবার জন্য তাঁহার অগ্নি পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইলেও রোমাঞ্চিত হইতে হয়। অহো! যে দেশে এমন সতী রমণী জন্মগ্রহণ করিয়া জগতে আদর্শ সতীত্বের চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, আজি সেই ভারতুে এত বেশী!! ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

“সীতার অগ্নি পরীক্ষা”—কি মহারমণীর দৃষ্টান্ত! সমগ্র ভূতলে এই দৃষ্টান্ত অতুল।

অথবা কুসংস্কার, বুধা তর্ক বা বুধা সন্দেহ কাহারও হৃদয়ে পোষিত হউক, শ্রীরামচন্দ্রের ইহা চিরজীবনের নীতির বিরুদ্ধ ছিল। অকারণে কাহারও অপ্রীতি উৎপাদন কর তিনি আদৌ ভালবাসিতেন না, সর্বসাধারণ সতত সন্তুষ্ট থাকুক, ইহাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। লক্ষা বিজয় ও রাবণ নিধন করিয়া যখন তিনি সীতা সতীকে ভারতবর্ষে লইয়া আসিতেছিলেন, তখন অনেক নিকোষ ব্যক্তি পরমাত্মন্দরী সূবতী জ্ঞানকীর বহুকাল পতি-বিরহে লক্ষাবাস জন্য সতীত্ব সম্বন্ধে বুধা সন্দেহ মনোমধ্যে পোষণ করিতেছিল। সর্বজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া এক অপূর্ণ লীলা করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি মা জ্ঞানকীর অগ্নিপরীক্ষায় সম্মতি দিলেন। সাধবী সীতার অগ্নিতে পরীক্ষা হইবে, এই অপূর্ণ কথা স্বর্গে ও মর্ত্যে প্রচারিত হইল। সীতাদেবী একটুও কুণ্ঠিতা হইলেন না, সগোরবে মহানন্দে সেই বিষম পরীক্ষাভার মস্তকে গ্রহণ করিয়া ধার্মিক পতির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইলেন। সমস্ত লোক চমৎকৃত হইয়া তাহা দেখিবার জন্য দলে দলে সমাগত হইতে লাগিল।

পতিপ্রাণা পরমাত্মন্দরী সীতা মহাসাগরের বিমল সলিলে স্নাতা হইয়া তটদেশে উপস্থিতা হইলে সখিরা বিবিধ স্মরমা মালা ও রত্নমাণিক্য-খচিত সুবর্ণালঙ্কারে তাঁহাকে ভূষিতা করিয়া দিলেন। হিরণ্ময় পরিচ্ছদে সীতার দৈহিক ওজ্জ্বল্য শতগুণে বদ্ধিত হইয়া উঠিল। তদনন্তর পুষ্প, সুগন্ধি ও চন্দনাদি দ্বারা ভগবতীর পূজা সমাপন করিয়া রাঘবপত্নী পতিসম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কর-যোড়ে ও শাস্কলোচনে কহিলেন “হে নাথ, যদি আমি প্রকৃত সতী হই, তাহা হইলে আমার সতীত্বই আমাকে রক্ষা করিবে। তাহা হইলে আমার সতীত্ব ধর্ম্মই আপনাকে ও আমাকে কলঙ্কপবাদ হইতে মোচন করিবে।” পতির পদতলে প্রণাম করিয়া উর্দ্ধে নীলাকাশের দিকে নয়ন নিপাত পূর্বক সতী কহিলেন “হে দেবতাগণ! তোমরা সর্বজ্ঞ; তোমরা মনুষ্যের অন্তর ও বাহিরের ভাব জান। আমি যদি প্রকৃত সতী হই,

‘তাহা হইলে আমাকে ‘আশীর্বাদ করিও।’
অমন্তর পরব্রহ্মকে স্মরণ করিয়া সাধু ও ব্রাহ্মণ-
বর্গকে প্রমাণ করিলেন। তাহার পরে সম্মত
হুত্বং অগ্নিকুণ্ডে হত্যাশন জলিয়া উঠিল।
মহাকবি কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

লক্ষণ রামের বাক্যে সাধাইল কুণ্ড ।
বানর কটক বহি আনিল ত্রিখণ্ড ।
কাঠে পুড়ি উঠিল জলন্ত অগ্নি রাশি ।
প্রবেশ করেন তাহে শ্রীরাম-মহিষী ॥
সাতবার রামের চরণে প্রদক্ষিণ ।
প্রদক্ষিণ অগ্নিকে করেন বার তিন ।
কনক অঞ্জলি দিয়া অগ্নির উপরে ।
ঘোড়হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে ।
শুন বৈদ্যানর দেব তুমি সর্ব আগে ।
পাপপুণ্য লোকের জানহ সর্বযুগে ।
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী ।
তবে অগ্নি তব ঠাই পাব অব্যাহতি ।
শিরে হস্ত দিয়া কাঁদে লোকে সবিশেষ ।
সীতা দেবী অগ্নিমধ্যে করেন প্রবেশ ॥

প্রজ্জ্বলিত হত্যাশন অভ্যন্তরে সাধ্বী শুক্লী
জানকী উপবেশন করিবামাত্র অগ্নির উষ্ণতা
কোমলতার ও মধুরতার পরিণত হইল।
স্পর্শমণি স্পর্শে লৌহ যেমন কাঞ্চন হয়,
হিমালয়ের স্পর্শে সর্প যেমন বিষহীন হইয়া
যায়, অথবা মলয়পর্বতের হিল্লোলে শুষ্ক কাঠ
যেমন চন্দনে পরিণত হয়, পরমেশ্বরী স্বরূপিণী
সীতার স্পর্শবিদ্র দেহস্পর্শে প্রতপ্ত হত্যাশন
সুধময় কোমলভাব ধারণ করিল। স্বয়ং
ভগবান স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া অগ্নি-
রাশি মধ্যে সীতা মাতাকে কোলে লইয়া
সাঙ্ঘনা করিতে লাগিলেন। উকি মারিয়া
রাম দেখিলেন, হত্যাশন মধ্যে সীতা নাই!
কে যেন তাঁহাকে গোপনে লুকাইয়া রাখি-
য়াছে। রামচন্দ্র অধীর হইলে দেবতার
শ্রীরামচন্দ্রকে কহিলেন “হে রাম! তুমি স্বয়ং
পূর্বব্রহ্ম নারায়ণ, মা সীতা স্বয়ং নারায়ণী
লক্ষ্মী। সীতাকে অগ্নিদগ্ধ করিতে পারে,
ইহা কি সম্ভব? হে রাম! তুমি নরাকারে
নরলীলা করিতেছ, এইজন্ত নরের মত কথা
বলিতেছ, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও, মা জানকী
সর্ববিশ্ব ‘পরীক্ষার অতীতা, তিনি স্বয়ং
পরমেশ্বরী।”

তুমি ব্রহ্মা তুমি শিব তুমি নারায়ণ ।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমিই কারণ ।
যেই জন শুনে প্রভু তব অবতার ।
ইহ পরলোক তার উভয় ঠেকার ।
কে বুঝে তোমার মায়া তুমি লোকপতি ।
তুমি নারায়ণ; সীতা লক্ষ্মী স্তম্ভিতি ।
হেন লক্ষ্মী অগ্নিমধ্যে রাখ কি কারণ ?
মমুষ্যের কর্ম হেন কর নারায়ণ ॥

(লক্ষ্মীকাণ্ড রামায়ণ) ।

অতঃপর সেই প্রজ্জ্বলিত হত্যাশনের মহা
জ্যোতির্ময় দেবতা স্বয়ং বিরাটমূর্তি ধারণ
করিয়া মা জানকীকে ক্রোড়ে লইয়া দর্শক-
মণ্ডলী সম্মুখে মহানন্দে দণ্ডায়মান হইলেন।

ব্রহ্মার আজ্ঞায় অগ্নি উঠিল সত্তর ।
আপনি প্রবেশে অগ্নি কুণ্ডের ভিতর ।
আকাশ পাতাল বাড়ি অগ্নিশিখা জ্বল ।
আপনি উঠিল অগ্নি সীতা লয়ে কোলে ।
অগ্নি হৈতে উঠিলেন সীতা ঠাকুরাণী ।
যেমন বা ছিল অঙ্গে গাত্র বস্ত্র ধানি ।
মস্তকের ফুল, কেশ, মেও না আগরে ।
ঘোড়হস্তে কহিলেন রামের গোচরে ।
অগ্নি বলিলেন, আমি পাপপুণ্য সাক্ষী ।
লুকাইয়া পাপ করে তাহাও আমি দেখি ।
ভাঁড়হাতে আমারে না পারে কোন জন ।
না দেখি সীতার কোন পাপের কারণ ।
আজি হৈতে হলো মম পবিত্র জীবন ।
করিলাম আজি সীতা সতী পরশন ॥

(কৃত্তিবাস)

স্বর্গ হইতে দেবতার অসংখ্য পুষ্পবৃষ্টি
করিতে লাগিলেন, নরনারীরা “ধন্য ধন্য”
বলিয়া আকাশ পাতাল আমোদিত করিতে
লাগিলেন। পাঠক! সীতার অগ্নি-পরীক্ষার
স্থল একবার দেখিয়া ক্বাইস; এই মনোহর,
প্রাচীন, পবিত্র, প্রশস্ত ও পুণ্যময় স্থলে
একবার উপস্থিত হইয়া নয়নের সার্থকতা
সম্পাদন কর। ইহা স্বর্গভূমি, ইহা পুণ্যর
উৎস, ইহা পবিত্রতার আকর। অসত্যরা
এখানে আসিয়াও যদি অসত্যীচ বর্জন
করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার অস্ত
নুতন নরকের প্রয়োজন।

“অগ্নিপরীক্ষা” তীর্থ দেখিয়া অর্দ্ধক্রোশ
দূরে আমি “রামকরোকা” নামে এক বৃদ্ধতীর্থ

দেখিতে পেলাম'। এখানে, বিশেষ কিছু দেখিবার নাই। কয়েক জন সাধু বাস করেন এবং একজন হিন্দুস্থানী সাধুর একটা

ছোট্টরকমের অন্নছত্র আছে, কেহ কেহ এখানে ভাত ডাল খাইতে পার। (ক্রমশঃ)।
শ্রীধর্মানন্দ মহাত্মারতী।

ফ্রান্সের দেবী ।

ফ্রান্স জগতের পূজ্য স্থান। এই স্থানই নেপোলিয়নের অভ্যাদয়-ভূমি, এই স্থানই সাম্য (Equality, and Fraternity) ঘোষণার লীলাঙ্গন। ফরাশী বিপ্লবের ছায় বিপ্লব পৃথিবীর আর কুত্রাপি হয় নাই, ফ্রান্সের ভাষা আজও "Lingua Franca," ফ্রান্সের গৌরব আজও ধরায় অনিন্দিত। সভ্যতা বা সুশিক্ষার, ভদ্রতা বা শিষ্টাচারে—উন্নতি-পিপাসা বা শক্তিমত্তায় ফ্রান্স জগতেবু আদর্শ। আজিও, ওয়াটারলু বা সিদান সমরের পরও, সম্মানে ফ্রান্স পৃথিবীতে প্রতিলক্ষ্য। আজও পারী নগরী নোদুর্ঘা এবং পারিপাট্যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজধানী। ফ্রান্স জগতে অতুল সম্মানে সম্পূজিত।

প্রাচীন রোম এবং গ্রীস, ভারত এবং মিদরের পতন-স্বত্বিতে ইতিহাস-পিপাসু সকল ব্যঞ্জিত ব্যথিত। কিন্তু ফ্রান্স যেন চির নবীন—প্রতি পতনেই যেন ফ্রান্সের নবোদ্যান হইয়াছে—পড়িয়া পড়িয়া, পড়িয়াও সে পড়ে নাই,—ডুবিয়া ডুবিয়া ডুবিয়াও সে বিশ্বস্তিতে ডুবে নাই। ইহা বিধাতার এক অপূর্ণ কৃপার নিদর্শন। ফ্রান্স বিধাতার এক অপূর্ণ দেশ।

যদি বল, ফ্রান্স অপূর্ণ কি?—ইফেল টাওয়ার বা পারী নগরীর জন্ত নয়, নেপোলিয়নের অধিষ্ঠান, সাম্য-ঘোষণা বা ফরাশী বিপ্লবের জন্তও নয়,—অপিচ প্রজাতন্ত্র-

শাসনের প্রতিষ্ঠার জন্তও মোটেই নয়। ফ্রান্স অপূর্ণ—এক অপূর্ণ কল্পার প্রসূতি বলিয়া;—প্রায় ৫০০ বৎসর পর একথা অপ্রতিবাদে ঘোষিত হইয়াছে যে, এরূপ কল্পা জগতে আর কুত্রাপিও জন্মে নাই! ফ্রান্স জগতের পূজ্য—কৃষক-হ্রিতা জেনীর প্রসূতি বলিয়া। ফ্রান্স জগতে অনন্ত কাল এই এক কারণে সম্পূজিত হইবে।

আমেরিকা পূজ্য, এয়ারসন ও ওয়াশিংটনের জন্ত; জার্মেনী পূজ্য, গেটে ও বিখ-মার্কের জন্ত; চীন পূজ্য, কনফিউসাসের জন্ত; রুশিয়া পূজ্য টলষ্টয়ের জন্ত; ভারত পূজ্য শঙ্কর ও গৌতমের জন্ত; ইংলণ্ড পূজ্য মিল্টন ও কার-লাইলের জন্ত; আরব পূজ্য মোহম্মদের জন্ত; প্যালেসটাইন পূজ্য খ্রীষ্টের জন্ত; ইটালী পূজ্য ম্যাট্‌সিনির জন্ত; ফ্রান্স পূজ্য ভল্টেয়ার ও রুসোর জন্ত এবং চিরপূজ্য শুধু জেনীর জন্ত। জেনী বিধাতার এক অপূর্ণ সৃষ্টি। পৃথিবীতে বিধাতার এরূপ অপূর্ণ সৃষ্টি আর কোথাও হইয়াছে কিনা, জানিনা।

এই সব কথা পূর্বে লিপিবদ্ধ করিলে লোকে উদ্ভাদ মনে করিত। চির-সম্পদহীন কৃষক-হ্রিতা জগতের শ্রেষ্ঠা?—এ কথা লিখিতে কে সাহসী হইবে? কালের প্রবাহ অবিরাম গতিতে চলিল—সুতরাং জেনীর সম্মান সাড়ে চারিশত বৎসরের মধ্যেও প্রতিষ্ঠিত হইল না! বিশেষতঃ নবোদিত ইংলণ্ড

বিরোধী—জেনীর গুণকীর্তন করা কাহারও সাহসে কুলাইলনা ! কিন্তু বিধাতার অপূর্ণ সৃষ্টি জেনী চিরকালই কি অবহেলিতা থাকিবে ? বিধাতা এবার তাঁহার অপূর্ণ সৃষ্টির অপূর্ণ মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন—বিগত ১৮ই এপ্রেল (১৯০৯) রোমে জোয়ান-অব-আর্কের মহা-গৌরব মহা সম্মানে পোপ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে ;—ত্রীষ্টের পরবর্তী গৌরবে এতদিন পর, তাঁহাকে ভূষিতা করা হইয়াছে । *

* BEATIFICATION CEREMONY.

Immense throngs of people were present at St. Peters, Rome, on the 18th April (1909) when the ceremony of the beatification of Joan of Arc took place.

Thirty thousand French pilgrims gathered in the Eternal City from all parts of France, headed by all the French Cardinals, Archbishops and sixty-two Bishops.

The facade of St. Peters, says Reuter, was adorned by a large standard representing the Maid of Orleans in glory while in the interior of each side of the apse were others representing her miracles. Besides this, the immense building was hung with the famous red brocade reaching from capital to base of the immense pillars, while thousand of electric light cunningly interspersed with candles hung from the roof. The function was directed by Cardinal Rampolla, Archpriest of the Basilica, and by Cardinal Martinelli, Prefect of the Congregation of Rites, assisted by the Cardinals belonging to the Congregation.

They sat in rows having behind them the Archbishops, Bishops, and high dignitaries, of many countries, those from France occupying a conspicuous position. The Secretary of the Congregation of Rites presented the Prefect of the

এক সময়ে ইংরাজ চালিত নিষ্ঠুর ধর্মযাজকেরা বাঁহাকে অপমানের সহিত নৃশংসরূপে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশ-ধরেরাই আজ ঈশার পরবর্তী স্থানে তাঁহাকে বসাইলেন । ইহাও ইতিহাসের এক অপূর্ণ ঘটনা—প্রায় পাঁচ শত বৎসরের পর ইনি সেন্ট নামে অতিহিতা হইয়াছেন, ত্রীষ্ট জগৎ এখন দেবতার স্নায় তাঁহাকে পূজা করিতে-ছেন । এত দিন পর ইংরাজের মুখে চূণ কালাী ক্ষেপিত হইল ! ধিক—ইংরাজের নিষ্ঠর্ম ব্যবহারে শত ধিক !

পৃথিবীতে সর্বদাস্ত্রের কি ? স্বদেশের জন্ত জীবন ত্যাগই সর্বদাস্ত্রের । আমি আমার নই, স্বদেশের ; আমি সকল ত্রাতার পদরেণু-তুল্য—এই শিক্ষাই সকল শিক্ষার সার শিক্ষা । এই শিক্ষার জয় ঘোষণা করিবার জন্তই কৃষক-জুহিতা জীবন ধারণ ও জীবন পাত করিয়াছিলেন । বাঁহার স্বার্থত্যাগের উদ্ভাদিনী শক্তিতে একদিন ফ্রান্স মত্ত হইয়াছিল, বাঁহার আহ্বানে একদিন ফ্রান্সের অসংখ্য লোক ঘর বাড়ী ছাড়িয়া স্বদেশের জন্ত প্রাণ দিতে ধাবিত হইয়াছিল, সেই অপূর্ণ দেব-কর্ত্তা

same Congregation with the Apostolic Brief for the Beatification, asking permission to publish it, which was granted, the same permission being asked of Cardinal Rampolla, after which the Papal Brief, which extolled the virtues of the Pucelle "already venerable", was read declaring that she was numbered with the Blessed ones.

After this, while the vast multitude stood reverently, the relics of the Beatified were exposed.

In the afternoon the immense Basilica was again crowded when Pius X descended into the church to worship the relics of the new Blessed One. His Holiness, who

কাহিনী পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইল নখন হইতে অশ্রু ঝরে। পাঠক সংক্ষেপে জেনীর কাহিনী শ্রবণ কর। ভারতের এই ঘোর দুর্দিনে স্বার্থত্যাগের অপূর্ণ শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে।

জেনী (Jeanne Darc) ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ফ্রান্সের উত্তর পশ্চিম কোণে ডোমরেমি (Domremy) পল্লীতে জেনীর পিতা মাতা বাস করিতেন। জেনীর একমাত্র ভগ্নীর বালা কালেই মৃত্যু হয়, তিন ভাই জীবিত থাকিয়া জেনীর দুঃখস্বথের

অংশী হইরাছিলেন। সেই সময়ে ছাপাখানা ছিল না, সুশিক্ষা কেবল পুরোহিতগণেই আবদ্ধ ছিল। সুতরাং জেনী কোন শিক্ষা পান নাই; মাতার নিকট বাল্যে কেবল সেলাইর কাজ শিক্ষা করিয়াছিলেন। বালা হইতেই জেনীর হৃদয় দয়া ধর্মে ভূষিত ছিল। শৈশবেই লুকায়িত স্থানে তিনি সতত উপাসনায় ব্যাপ্ত থাকিতেন; গৃহকার্য্যে বড় মনোযোগ দিতেন না। বালাকালেই স্বদেশের দুর্দশার কাহিনী শ্রবণ করিতেন। দুর্দশা—৫০০ বৎসর পূর্বে ফ্রান্সের অনেক দেশ নানা

was clad in white and red, was carried in the Sedia Gestatoria, a kind of portable throne, by twelve men preceded, surrounded and followed by his lay and ecclesiastical courts, and was received by Cardinal Rampolla and all the Cardinals of the Congregation of Rites.

As the aged Pope humbly knelt in the Chapel of the Sacrament before the altar where the relics were exposed, a deep silence fell over the multitude. All the bells of the several hundred churches of Rome rang out to announce to the faithful the recognition by the Holy See of the virtues and miracles of The Maid.

Among the prelates who took part in the ceremonies was Archbishop Robert Seton, descendant of Sir Thomas Seton of Arbroath, captain of the Scottish Guards in France. He was conspicuous among the faithful followers of the Dauphin fighting beside Joan of Arc at Orleans, and standing near her when Charles VII was crowned in Rheims Cathedral.

COMMEMORATION IN PARIS.

Writing on the above date the Telegraph's Paris correspondent says:—

Today the Te Deum has been

sung in all the Paris churches on the occasion of the beatification of Joan of Arc. The Duc d'Orleans is being represented at all the ceremonies in Rome by his uncle the Duc d'Alencon, to whom he addressed from Wood Norton, on the 19th April, a letter concluding thus:—

I do this not only in the name of our house but in that of the French people, of whom Jeanne was a daughter. It is in her that were incarnated religious faith and fidelity to the monarchy, and it is by her that the country was saved.

There are as many as five statues of Joan of Arc in Paris, and visits were paid to them all to-day, a wreath of immortelles being laid before each by a deputation from the Patriotic League, while numbers of admirers have brought flowers. In some districts of Paris a fair amount of bunting is to be seen, and this evening some of the churches are being illuminated.

A few rather lively incidents have occurred in connection with the visits to the statues, but the only one really worth noting happened on the Boulevard St. Michel. A wreath bearing the inscription, "The defenders of Jeanne d'Arc who are prisoner at the Sante,"

কোশলে এবং উত্তরাধিকারী হুজ্রে ইংলণ্ডের হস্তগত হইয়াছিল। ফ্রান্সের যষ্ঠ চারল্‌সের এক কন্যা ইংলণ্ডের পঞ্চম হেনরীকে বিবাহ করে। চারল্‌সের মৃত্যুর পর (১৪২২ খ্রীঃ) চারল্‌সের পুত্র সপ্তম চারল্‌সের পরিবর্তে কোশলে পঞ্চম হেনরীই উত্তরাধিকারী হন। তাঁহার মৃত্যুর পর ৬ষ্ঠ হেনরী ফ্রান্সের অধিকাংশ প্রদেশের অধীশ্বর হন এবং পারী নগরীতে অভিষিক্ত হন। এই সময়ে ইংলণ্ডের রাজা ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের রাজা রূপে অভিহিত হইতেন। বৈদেশিক কঠোর শাসনে ফ্রান্সের নরনারী বড়ই অসন্তুষ্ট ছিল - সময়ে সময়ে

বিদ্রোহ উপস্থিত হইত। বালক ৬ষ্ঠ হেনরীর সিংহাসনারোহণের পূর্বে একবার খুব বিদ্রোহ হইয়াছিল। বালক ৬ষ্ঠ হেনরীর রাজ্যাশাসন-কার্য্য, বেড্‌ফোর্ড এবং গ্লুসেস্টারের ডিউকগণ নিরীহ করিতেন। ৬ষ্ঠ চারল্‌সের পুত্র ৭ম চারল্‌সের দলের লোকেরা শাসন কার্য্যে সময়ে সময়ে বিরূপ উপস্থিত করিত। তখন ইংরাজ-সৈনিকে ফ্রান্স পূর্ণ হইয়াছিল এবং বারগিউর ডিউক ফ্রান্সকে হুর্গমালার সজ্জিত করিয়াছিলেন। জেনীর ভাষা না হইলে ফ্রান্স, বুঝি বা, চিরদিন ইংলণ্ডের কায়ার্ড থাকিত।

ত্রয়োদশ হইতে চতুর্দশ বৎসর বয়সের

having been affixed to that particular statue a professor who was passing by cut it down, whereupon he was collied by one of the young men who had brought the wreath and led to off the nearest police station where he was promptly set free, his captor being soon afterwards conveyed to the Santo Prison.

POPE AND FRENCH PILGRIMS

Another interesting ceremony took place at St. Peter's on the following day when the Pope received the French pilgrims, and in reply to an address of homage read, on behalf of all French Catholics, by Mgr. Touchet, Bishop of Orleans, made a speech, in which he said that, without recalling the eloquent testimony of history to the unalterable fidelity of France to the chair of St. Peter, and without pointing to the spectacle of the immense crowd which has hastened to Rome to witness the solemn glorification of their beloved compatriot Joan of Arc, he had already had, in the course of the late painful events which had occurred in that country, an admirable proof of the obedience of Catholics, and of the union joining the people to the clergy, the clergy

to the bishops, and the bishops to their Supreme Shepherd. His Holiness exhorted the French to maintain this union, which constituted their strength in the struggle, and said that they would have besides the consolation of working for the welfare of their country, as religion was a guarantee for the order and prosperity of civilised society, and thus their interests were inseparable from it.

The Pontiff strongly repudiated the cowardly calumny which attempted to dishonour faithful sons of the Church with the infamous title of enemies of their country. On the contrary, love of country was stronger when united to love of the Catholic Church which dominated the world, being Christ's spouse and the depository of Truth. Therefore whoever rebelled against its authority was fighting against the Truth, and that Government which fought against the Truth outraged what was most sacred, for man and could not except veneration for love. Among the ranks of the sons of the church the country always found its saviours and defenders. The Pope ended by congratulating the French Catholics who were fighting under the

সময় জেনী ফ্রান্সকে উদ্ধার করিতে প্রত্যাশিতা হন। ক্রেভেন্ট এবং তারুলিনের যুদ্ধের পর সপ্তম ডফিন (Dauphin) চার্লসের রাজ্যপ্রাপ্তির আশা নির্মূল হয়। এই সময়ে জেনী ফ্রান্সের উদ্ধারের ব্রত গ্রহণের জন্য ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করেন। একদিন তাহার পিতার বাগানে বাণী শ্রবণ করেন। আর একদিন

flag of that true patriot Joan of Arc, bearing the moving words, "Religion and Country."

ENGLISH CATHOLIC BISHOPS' PANEGYRIC.

In connection with the beatification, an eloquent address was sent from the Roman Catholic Bishops of England to the Bishops of France.

"One more bright ornament," says the address, "has been added to your Church, and country, and that which all true and generous hearts had long wished to see has come to pass. After mature deliberation the Apostolic See has delivered judgment on Joan, the Maid of Orleans. It is recognised at length, by this supreme verdict—a verdict which must command the serious attention of all—how great was that pure maiden's trust in God, how strong her love of fatherland, how deservedly she is held up to the admiration of every age for her tenacity of purpose—more than man's—and a courageous endurance far in advance of her years.

"Time, which is wont to blot out the remembrance of kindly deeds, has enthroned her in the hearts of distant generations. Truth, albeit tardy, avenges the assaults of calumny, and her unending heavenly triumph wipes out the dishonour once done her. A crown more sacred than any which earth can bestow makes atonement for the iniquity of her death."

মুঠে গরু চরাইবার সময় সেন্ট মায়-গারেটের বাণী স্পষ্ট শুনিতে পান যে, "ফ্রান্স তাহার সাহায্যে ইংলণ্ডের হস্ত হইতে স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারিবে।" এই বাণী শ্রবণের পর তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, অবিবাহিতা থাকিয়া আজীবন দেশোদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তদীয় পরিবারের লোকেরা এই সকল আদেশকে সামান্য ঘটনা বলিয়া উপেক্ষা করিল। তাঁহার পিতা তাহাকে সৈন্ত-চালনার ব্রত হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে বহুপরিশ্রম করিলেন; প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই কার্যে অকৃতকার্য হইলে জেনীকে জলে ডুবাইয়া মারিবেন। ইতিমধ্যে জেনীকে বিবাহ করিতে জনৈক সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত হইলে পিতা মাতা প্রস্তাবে সন্মত হইলেন, কিন্তু জেনী কিছুতেই সন্মতি দিলেন না। বরং কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি ঘোষণা করিলেন যে, জেনী বিবাহে সন্মতি দিয়াছেন। আদালত পর্যন্ত ইহা গড়াইল—কিন্তু সেখানে জেনীর জয় হইল। এই ঘটনায় জেনীর দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা এবং সত্যানুক্রমণের পরিচয়ে সকলেই মুগ্ধ হইলেন।

বেড্‌ফোর্ডের ডিউক, এই সময়ে ফ্রান্সে উপস্থিত হইয়া, বারগণ্ডির সৈন্ত সাহায্যে এক প্রবল সেনার দল চার্লসের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। সলিস্বরির আরলের উপর এই সেনাদলের অধ্যক্ষের ভার অর্পিত হইয়াছিল। সারজন টাল্‌বট, সারজন ফাষ্টউফ ও সার উইলিয়ম গ্লাড্‌স্‌ডেল তাঁহার সাহায্যকারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সলিস্বরি, বামবুলেট, পিথিয়ারস, জারগো, সলি এবং অন্যান্য অরক্ষিত ছোট ছোট সহর গৃহীতর চার্লসের প্রধান আত্মা অরলিনস্ আক্রমণের উত্তোগ করিলেন। এই আক্রমণ সফল

হইলে চারলসের ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন হইত। ১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সলিসবরির কতক অরলিনস পরিবেষ্টিত হয়,— ফ্রান্সের লোকেরা পূর্বেরই অভিসন্ধি বুঝিয়া প্রতিরোধের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। প্রথম সংঘর্ষে ইংরাজের জয় হয়, কিন্তু সলিসবরির জীবনপাত হয়। সফোকের আরল তাঁহার পদে বরিত হন। তিনি দুর্জয় প্রতিরোধকারী-দিগের দুর্জয় ক্ষমতা দেখিয়া নগরের চতুর্দিকে দুর্গপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করিলেন এবং দুর্ভিক্ষ দ্বারা নগর বশীভূতের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। শীতকাল এই কার্যে শেষ হইল। যখন ইংরাজের সমস্ত কার্য সুদৃঢ়রূপে নিষ্পন্ন হইয়া আসিল, তখন সকলেই মনে করিয়াছিল, দৈব অনুকূল না হইলে অরলিনসের আর রক্ষা নাই।

জেনীর নিকট অরলিনস পরিবেষ্টিতের সংবাদ যথামময়ে আসিলে তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি অরলিনস উদ্ধার পূর্বক চারলসকে রিম্‌স্ (Rheims) নগরে বিধিপূর্বক অভিষিক্ত করিবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন। তিনি রাজ-সন্দর্শনের জন্ত চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু পিতা মাতা বাধা দিতে লাগিলেন,—গবর্ণর বাধা দিলেন। এই সময়ে তাহার মাতুল ডুরান্ড লকজার্ট (Durand Laxert) জেনীর পিতা মাতার সম্মতির জন্ত আসিলেন। কাহারও নিষেধ না মানিয়া, প্রত্যাদেশ শিরোধার্য করিয়া জেনী ডোমরেমির কুটীর চিরজীবনের জন্ত পরিত্যাগ করিলেন।

জেনী তাহার মামাকে খুব ভালবাসিতেন। মামার বাড়ীতে যে ৭ দিন ছিলেন, সেই ৭ দিনে মামার নিকট সমস্ত প্রাণের কথা বলিয়াছিলেন। সপ্তদশ বা অষ্টাদশ বয়-

সের কুমারী জেনী এতদিন পর কেবল তাঁহার মামাকে সাহায্যকারী পাইলেন। মামা তাঁহার প্রত্যাদেশের কথা বিধাস করিলেন এবং সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাহার মামা গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, কিন্তু গবর্ণর বাদ্রিকোর্ট (Baudricourt) সমস্ত কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন এবং জেনীকে তাহার পিতা মাতার নিকট পাঠাইয়া দিতে মামাকে উপদেশ দিলেন। জেনী কিন্তু ফিরিবার মহিলা নহেন, তিনি এই উপহাস অগ্রাহ করিয়া স্বয়ং গবর্ণর সন্দর্শনে যাইবেন, স্থির করিলেন। তাহার মামা সাধা হইলেন। তবু নিম্নম গবর্ণর তাহার প্রাণের কথা শুনিতে প্রস্তুত হইলেন না। তিনি অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন। একবার মামা বাড়ীতে ফিরিলেন, আবাস গবর্ণরের নিকট উপস্থিত হইয়া অনুরোধ করিতে লাগিলেন। একবার রাজসন্দর্শনের জন্ত গবর্ণরের পা পর্য্যন্ত ধরিয়াছিলেন। এই সময়ে জেনী ভ্যাঙ্কুলারসের (Vaucouleurs) লোকের সহিত হৃৎতায় আবদ্ধ হইলেন। তাহাদের ও জেনীর বহু দিনের অদম্য চেষ্টার পর চারলসকে এ সম্বন্ধে লিখিতে গবর্ণর সন্মত হইলেন। ইতিমধ্যে ভ্যাঙ্কুলারসের দুইজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জেনীর দলভুক্ত হইলেন। ইহারা দুইজন রাজসন্নিধানে জেনীকে লইয়া গাইতে সন্মত হইলেন। জেনীর অমাহুষী ক্ষমতার কথা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছিল, লরেনের ডিউক জেনীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি জেনী সে আহ্বান অগ্রাহ করিলেন। গবর্ণর পত্রের উত্তর পাইলেন কি না, অজ্ঞাত রহিল, কিন্তু জেনীর মামা অস্ত্রাঘ্র লোকের সাহায্যে জেনীর জন্ত একটা অথ ধরিদ করিলেন।

জেনী পুষ্কবেশ বেষ্মধারণ করিয়া রাজসন্দর্শনে যাত্রা করিলেন। গবর্ণর বড়িকোট যাত্রীদলের নিরাপদ গমনে সাহায্য করিতে প্রতিক্রমিত হইলেন।

জেনীর পিতা মাতা এই সংবাদে বড়ই বিচলিত হইয়া ভ্যাকুলারসে আসিলেন, কিন্তু জেনী কিছুতেই প্রতিনিবৃত্তা হইলেন না, পিতা মাতার চক্ষের জলে তাঁহার কোনই পরিবর্তন হইল না, তিনি পিতা মাতার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া ১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি যাত্রা করিলেন। ৬ জন বিশ্বাসী লোক কেবল সাধা ছিল। পথের দারুণ কষ্ট জেনী অগ্নানচিত্তে সহ করিতে লাগিলেন। প্রার্থনাই তাঁহার প্রধান সঙ্গ হইল। লয়ার নদী পার হওয়ার পর জেনী প্রকাশ্যে তাঁহার প্রত্যাদেশের কথা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। জেনীর প্রত্যাদেশ-কাহিনী* শুনিয়া সকল লোক নব আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এই সময়ে অতি কষ্টে চারলস্ কেবল ৩০০০ লোক সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্লারমন্টের ১০০০ লোক সহ মোট ৪০০০ লোক লইয়া ফাষ্টফের রসদবাহী দলকে আক্রমণ করিলেন। ফাষ্টফ ২০০০ লোক সহ বাধা দিলেন—ফরাসীগণ এত কাপুরুষ যে, ছত্রভঙ্গ হইল—৫০০ মৃত্যুখে পতিত হইল।

*সেন্ট ক্যামরিন-ডি-ফিরবইস নামক স্থান হইতে জেনীকে গ্রহণ করিতে পলায়িত রাজা চারলস্ পত্র দিলেন। চিনন(Chinon) নামক স্থান সংক্ষাতের জন্ত নির্দিষ্ট হইল। প্রথমতঃ জেনীকে বিবিধ প্রকারে পরীক্ষা করা হইল। রাজা ছদ্মবেশ ধারণ করিলেও জেনী তাঁহাকে বাছিয়া বাহির করিলেন এবং বলিলেন—“রাজন, ঈশ্বর আপনাকে অমূল্য জীবন দিয়াছেন।”

রাজা বলিলেন, আমি রাজা নহি, ঐ রাজা বসিয়া আছেন।

জেনী এই প্রত্যারণ্য না ভুলিয়া বলিলেন, আপনিই রাজা, আমি কুমারী জেনী, বিধাতার প্রত্যাদেশে আপনার নিকট আসিয়াছি এবং আমি ঘোষণা করিতেছি, আমি ইংরাজের হস্ত হইতে রাজ্যোদ্ধার করিয়া আপনাকে রিমসে (Rheims) বৈধ রাজা বলিয়া অভিষিক্ত করিব।

রাজা বিস্মিত হইয়া অরলিন্সের কুমারীকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। চিননের (Chinon) একটা সৈন্ত জেনার পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় জেনীর প্রাণ অপভাষা প্রয়োগ করায় জেনী বলিয়াছিলেন যে, তোমার মৃত্যু নিকট। সেই দিনই জলে ডুবিয়া ঐ সৈন্ত প্রাণত্যাগ করিল। জেনীর অনৌকিক শক্তিতে অনেকে বিস্মিত হইলেও রাজা পইটারস বিশ্ববিদ্যালয়কে জেনীর পরীক্ষার জন্ত নির্দিষ্ট করিলেন। বহু অহুসঙ্কানের পর এবং ধর্ম সঙ্কীর্ণ নানা পরীক্ষার পর ধার্য হইল যে, রাজা জেনীর সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন। নানা পরীক্ষায় ছই মাস অতিবাহিত হইল, এপ্রেল মাসে সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। ব্লইস (Blois) নামক স্থানে তিনি অপূর্ণ সাজে সজ্জিত হইয়া আবির্ভূতা হইলেন। তাঁহার অলৌকিক তেজ-পূর্ণ আবির্ভাবে সমস্ত সৈন্তের মধ্যে উৎসাহের বিদ্যুৎ সংক্রামিত হইল, এবং দেখিতে দেখিতে ৬০০০ লোক একত্রিত হইল। তিনি হুচরিত্র লোকদিগকে বিদায় দিয়া, প্রার্থনা এবং প্রত্যাদেশের অমাতুর্ঘ্য শক্তিতে সকলকে দীক্ষিত করিলেন। তিনি অরলিন্স আক্রমণকারী ইংরাজ কাপ্তেনদিগকে ঐ নগর এবং অন্তায় পূর্বক অধিকৃত সমস্ত নগর

তাহার হস্তে সমর্পণ করিতে পত্র লিখিলেন । সচরাচর যেমন হইয়া থাকে, এখানেও সেই প্রকার হইল, ইংরাজগণ ঘৃণার সহিত তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন । সুতরাং জেনী ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলেন । ১৪২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রেল জেনী অশেষ ক্লেশ এবং বিপদ অতিক্রম করিয়া অরলিনস্ নগরে সদর্পে উপনীতা হইলেন । পুরুষ রমণী, বালক বৃদ্ধ সকলে তাঁহাকে উদ্ধারকর্ত্রী বলিয়া অভিধান করিল । অরলিন্সের যে ঘরে তিনি বাস করিয়াছিলেন, অত্মপিও তাহা সকলকে প্রদর্শিত হইয়া থাকে । পর দিন প্রত্যবে অনেক পরামর্শ হইল ; সৈন্যসামগ্র্যগণের মধ্যে মতভেদ হইলেও, তিনি ইংরাজদিগকে প্রস্থান করিতে পুনঃ আদেশ করিলেন । পূর্বের ভায় তাহার ঘৃণার সহিত এবারও প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন । সুতরাং আক্রমণ করিলেন । প্রথম আক্রমণ সফল হইল । পর দিন প্রত্যবে ইংরাজের সেন্ট লুপ হর্গ (St.Loup) আক্রান্ত হইল ।—জেনী হঠাৎ উপস্থিত হইয়া সকলের মধ্যে অগ্নিতেজ প্রবাহিত করিলেন । ৩ ঘণ্টা বৃদ্ধ চলিল এবং ইংরাজগণ পরাজিত হইলেন । ৪০ জন কয়েদী ভিন্ন দুর্গমধ্যস্থ সমস্ত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল ; কেবল কয়েকজন পুরোহিত বেশধারী লোককে কুমারী জেনী ছাড়িয়া দিলেন । পর দিন, এই যে, স্বর্গারোহণের দিন বলিয়া আর আক্রমণ হইল না, জেনী উপাসনার সমস্ত দিন অতিবাহিত করিলেন । পর দিন পুনঃ আক্রমণ করা হইল, এবং একটা দুর্ভেদ্য দুর্গ ভিন্ন (Bastille des Tournelles) সমস্ত ফরাসীদিগের অগ্নিকারে আসিল । জেনী এই আক্রমণে একটু আহতা হইয়াছিলেন । ঐ দুর্গ গ্লাডস্-

ডেল (Gladsdale) বাহা বাড়া সাহসী সৈন্য সহ রক্ষা করিতেছিলেন । ফরাসীদিগের মধ্যে এই দুর্গ আক্রমণ করা সম্বন্ধে মতভেদ ছিল, কিন্তু জেনী তাহারও কথা না শুনিয়া অগ্রবর্তী হইলে সকলে আসিয়া যোগ দিয়াছিল । জেনীর আবির্ভাবে ফরাসী সৈনিকগণ যেরূপ সাহসে উদ্ভূত হইয়াছিল, ইংরাজগণ তেমনই ভীত হইয়াছিল । কেহই বাধা দিতে প্রস্তুত হইল না—গ্লাডস্‌ডেল ৫০০ দুর্দান্ত সাহসী সেনানী লইয়া এই দুর্ভেদ্য দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন । প্রাতে ১০ টার সময় আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল, ১২টার সময়, দুর্গ প্রবেশের জন্ত জেনী সিঁড়ি আরোহণ করিবার সময় একটা তীর তাহার গলদেশ ভেদ করিয়া যায় এবং তিনি একটা নালাতে পড়িয়া যান । ইংরাজগণ তাঁহাকে কয়েদ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ফরাসীগণ তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যায় । তিনি নিজ হাতে তীর নিক্ষেপিত করেন এবং ঘোষণা করেন যে, তিনি আবার প্রত্যাগমন করিয়াছেন । তিনি অব্যবহিত পরেই আবার সৈন্যগণের মধ্যে উপস্থিত হইলেন । তাঁহাকে দেখিয়া সকলে আবার উৎসাহে প্রদীপ্ত হইল । ইংরাজ সৈন্যগণ ভয়ে কম্পিত হইল এবং বালল বে, স্বর্গীয় ভূত ফরাসী পক্ষে যুদ্ধ করিতেছে । গ্লাডস্‌ডেল কিছুতেই মা পারিয়া দুর্গের মধ্যে অবশিষ্ট সৈন্যগণকে সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । এই সময়ে জেনী তাঁহাকে দোখিলেন এবং আত্মসমর্পণ করিতে বলিলেন । কিন্তু তিনি কথা না শুনিয়া যখন সৈন্যগণ সহ একটা সঙ্কীর্ণ সেতু ভ্রষ্ট হইতেছিলেন, তখন সেতু ভাঙিয়া সকলে প্রাণ হারায়েলেন । জয়লাভে চতুর্দিক পূর্ণ হইল—দুর্গের

সমস্ত বৈজ্ঞানিক নিহত হইয়াছিল, কেবল ২০০ আত্মসমর্পণ করিল। অরলিনসের নিকটে ৭০০০ ক্রি ৮০০০ ইংরাজ সৈন্য প্রাণ দিয়াছিল। ১৪২৯ খ্রীঃ ৭ই মে অরলিনস ফরাসীর হস্তগত হইল। জ্যো-
ল্লাসে নগর আনন্দ-নিকেতনে পরিণত হইল—
সমস্ত গির্জায় জয়-ঘণ্টা নিনাদিত এবং
জনগণের আনন্দোল্লাসে গগন বিদীর্ণ হইতে
লাগিল। ইংরাজগণ ৮ই মে, রবিবার, অগ্নি
প্রদান করিয়া নগর পরিত্যাগ করিতে
আরম্ভ করিল। পীড়িত এবং আহত সৈনিক-
দিগকে তাহারা পরিত্যাগ করিয়া চলিল।
এইরূপে জেনীর প্রথম প্রতিজ্ঞা প্রতিপালিত
হইল—অরলিনস উদ্ধার হইল। এই সময়
হইতে তিনি অরলিনসের ক্যারী (Pucelle
D'Orleans—Maid of Orleans) নামে
অভিহিতা হইতে লাগিলেন। সেই দিন
হইতে অষ্ট পর্যান্ত, ৮ই মে, অরলিনস
নগরে, পবিত্র দিনরূপে গণ্য হইয়া আদি-
তেছে।

বিত্তীয় প্রতিজ্ঞা—দ্বিতীয় চারলসের অভি-
যেকের আয়োজনে, তৎপর, জেনী বন্ধপরিকর
হইলেন। তিনি জ্যোলাসে প্রেমতা এবং
খরিশ্রম ও ক্লেশে দগ্ধিতা না হইয়া ১০ই মে
অরলিনস হইতে যাত্রা করিয়া ব্লুইস (Blois)
ঐ দিনই পৌঁছিলেন। চারলস রিম্স অভি-
যানে কিন্তু সম্মতি দিলেন না। সৈন্যগণও মত
না দিয়া জারগো (Jargeau) নামক স্কো-
কের আরম্ভ কর্তৃক সুরক্ষিত স্থান আক্রমণ
করিল এবং অকৃতকার্য হইল। জেনী এই
সংবাদ পাইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং
অনুয়াসে নগর অধিকার করিলেন। এখানে
জেনী বিতাড়িত হইয়া আত্মতা হন। তিনি সিঁড়ি
হইতে পড়িয়া যান এবং একখানি প্রস্তর

দ্বারা আহত হন। আহত হইলেও তৎ-
ক্ষণাৎ তিনি পুনরুত্থিত হইলেন এবং
সৈন্যগণকে নবোৎসাহে মাতাইয়া নগর
অধিকার করিলেন এবং আরলকে বন্দী
করিলেন। সমস্ত ইংরাজ সৈন্যের অধ্যক্ষ
তালবট এই পরাজয় দেখিয়া সিন (Seine)
নদীর দিকে পলায়ন-তৎপর হইলেন।
পশ্চিমদিকে, ৪০০০ লোক সহ ফাস্টক
তাহার সহিত যুক্ত হইলেন। ফরাসী
সৈন্যদলেও অনেক লোক আসিয়া জুটিল।
১৮ই জুন প্যাটে গ্রামে (Patay) পলায়িত
ইংরাজ সৈন্যগণ পুনঃ আক্রান্ত হইল।
ইংরাজ সৈন্যগণ ভয়ে অতিভূত হইয়া পলা-
য়ন করিতে লাগিল, ফাস্টকও পলায়ন
করিলেন। লর্ড কেলস, লর্ড হুয়ারফোর্ড
প্রভৃতি সম্রাট ব্যক্তিগণ ফরাসী হস্তে বন্দী
হইলেন। এই যুদ্ধে ৪০০০ হইতে ৫০০০
ইংরাজ সৈন্য হার হইয়াছিল। ২০০০ হইতে
৩০০০ মৃত্যু মুখে পড়ে, অবশিষ্ট বন্দী হয়।
ফরাসী পক্ষে কেবল একজন সৈন্য মৃত্যু
মুখে পড়ে, Count of Armagnac। যুদ্ধের
অবসানে ফরাসী সৈন্যগণ বখন পলায়ন-তৎ-
পর সৈন্যগণের পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছিল, তখন
জেনী দেবদূতের আয় আহতের সেবা এবং
মৃত্যুগ্রাসে পতিতদিগকে আশ্বস্ত করিতে-
ছিলেন। সে এক অপূর্ণ দৃষ্ট। তালবটও
এই যুদ্ধে কয়েদী হন। জেনী সলিতে
(Sully) প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কয়েদীদিগকে
এবং তালবটকে মুক্তি দিতে চারলসকে অমু-
রোধ করিলে সকলকে মুক্তি দেওয়া হইল।
এই অমাত্রণী দয়ার নিদর্শনে সকলে বিস্মিত
হইল। এ হেন দয়ার অবতারের প্রতি
শেষে ইংরাজের অত্যাচার স্মরণ হইল।
ইংরাজদিগকে শত দিকার দিতে ইচ্ছা হয়।

সন্দিগ্ধ চারলস্ অবশেষে রিমস্ অভি-
যানে সম্মতি প্রদান করিলেন।

দশ বারো সহস্র সৈন্যসহ জেনী সমতি-
বাহারে চারলস্ রিমস্ অভিযান আরম্ভ
করিলেন। পশ্চিমধ্যে নানা নগর অধিকার
করিলেন এবং ১৬ই জুলাই রিমসে পৌছি-
লেন। জেনীর দেবপ্রতিম মূর্তি দেখিয়া
সকলে বিমোহিত হইল। সেই দিনই রিমসে
চারলস্ বিদিপূর্বক অভিবিক্ত হইলেন।
এইরূপে প্রত্যাাদিষ্টা জেনীর প্রতিজ্ঞা প্রতি-
পালিত হইল। অভিষেকের দিনে জেনী
বারগণ্ডির ডিউকের নিকট যে বিস্থত পত্র
লিখিয়াছিলেন, তাহা অগ্রাবিধি লিলিতে
(Lille) যত্নে রক্ষিত হইতেছে। এই সময়ে
জেনীর পিতা এবং মামা গোরবের উচ্চড়ে
সমাক্রান্ত জেনীকে দেখিতে উপস্থিত হন।
জেনীর এই গোরবেও তিনি কিন্তু পূর্ব
বেশভূষা কিছুই পরিত্যাগ করেন নাই।
যখন কোন ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়াছিল—
জগতে এরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় নাই।
তত্বতরে তখন তিনি বলিয়াছিলেন, “বিধাতার
অবোধ্য শাস্ত্র কে বুঝিবে—আমি তাঁহার
প্রত্যাাদিষ্টা কত্যা মাত্র।” পিতা ও মামাকে
দেখিয়া তাহার স্মৃতিতে ডোমরেমির কথা
জাগিয়াছিল। তাঁহার জীবনের কার্য শেষ
হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্ত করিয়া তিনি
দেশে ফিরিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু
চারলস্ কিছুতেই তাহাতে কণপাত করি-
লেন না। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে চারলসের
স্বার্থ-সাধনে রত থাকিতে হইল। কিন্তু
তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবনের
কার্য্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এই সময়
হইতে তদীয় জীবনের পরিবর্তন আরম্ভ হয়।
পূর্বের তেজ, সাহস, অধ্যবসায় ও দৃঢ়-

প্রতিজ্ঞা ছিল বটে, কিন্তু ইহার পর বিধা-
তার আদেশে যে তিনি চালিতা, ইহা বিশ্বাস
করিতেন না এবং সৈন্তাধ্যক্ষদিগের বিরুদ্ধে
চলিতেন না। হায়, জেনীকে যদি স্বদেশে
ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দেওয়া হইত, তাহা
হইলে আর ইংরাজ-চরিত্র কলঙ্কিত হইত
না। বিধাতার ছরবগাহ বিধান কে বুঝিবে?

জয়ের পর জয় আসিয়া চারলসকে অভি-
বাদন করিতে লাগিল—নগরের পর নগর
অধিকৃত হইতে লাগিল। সে সকল কাহিনী
বিবৃত্ত করিতে আমরা বিরত রহিলাম। চাটো-
থেরিতে (Chateau-Thierry) অবস্থিতি
কালীন রাজা তাঁহাকে মহা সম্মানে ও নানা
উপহারে ভূষিত করিতে চাহিলেও তিনি
অস্বীকৃতা হইলেন, কেবল তাহার বাণ্য
লীলাস্থলকে করমুক্ত করিবার অধিকার
চাহিলেন। ১৪২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই
এই করমুক্তির আদেশ প্রাপ্ত হয়;—
ফরাসী বিপ্লবের পরেও এই আদেশ অক্ষুণ্ণ
ছিল।

জয়ের পর জয় অবশেষে রাজাকে পারী
নগর সরিধান উপস্থিত করিল। ইংরাজগণ
ভয়ে কম্পিত হইলেও, দশ সহস্র সেনানী
বেড্‌ফোর্ডের ডিউকের অধীনে প্রস্তুত হইল।
৭ই আগষ্ট ফরাসী সৈন্তের বিরুদ্ধে যাত্রা
করিলে চারলসের নিকট হইতে ডিউক এক
পত্র প্রাপ্ত হন। ফরাসী সৈন্তগণ, জয়ো-
ল্লাসে, ক্রমে ক্রমে হুর্সিনীত, অসংবত ও
চরিত্রহীন হইয়া উঠিয়াছিল, ইহা দেখিয়া
জেনী বড়ই নিরাশ হইয়াছিলেন। এই
হুর্সিনীত সৈনিকের একজনকে জেনী এক
দিন তাঁহার হস্তের সুবিখ্যাত তরবারির
দ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন, তাহাতে তরবারি
ভাঙিয়া যায়। এই কার্য্যে রাজা অসন্তুষ্ট হন।

সেন্ট ডেনিস হইতে রাজা তাহার প্রাচীন রাজধানী নিরীক্ষণ করেন এবং সেপ্টেম্বর মাসে আক্রমণ করেন। জেনী ইংরাজদিগকে রাজার বশীভূত হইতে আদেশ করেন—কিন্তু তাঁহারা যুগ্ম পূর্বক উপেক্ষা করে। তাঁহার পরিচর তাঁহার পার্শ্বেই প্রাণত্যাগ করিল এবং তিনিও পাদদেশে গুরুতর রূপে আহত হইলেন। তিনি এখনও সৈন্তগণকে অগ্রসর হইতে সাহস দিতে লাগিলেন—কিন্তু কোন ফল হইল না। জেনী নিরাশ হইয়া দেখিলেন, ফরাসী সৈন্তগণ পলায়ন করিতেছে। তিনি যুদ্ধ হইতে চিরবিদায় লইতে এবং জীবনের কার্য্যে জীবন ঢালিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু পদে পদে বাধা পাইতে লাগিলেন—রাজাকে পরিত্যাগ করিতে সকলেই নিষেধ করিল। চারলস্ নিরুৎসাহিত হইলেন, কিন্তু বেড্‌ফোর্ডের ডিউক্‌ অমিত-তেজে পারী নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। ফরাসী সৈন্তগণের মধ্যে নানা রূপ মতভেদ উপস্থিত হইল, পারী পুনঃ আক্রমণে অনেকে নিষেধ করিতে লাগিল—জেনীর প্রতিও অনেকে সন্দিগ্ধ হইল;—সৈন্তগণকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিতে সকলেই স্বীকৃত হইল। ইহার কিয়-

দিবস পরে, ১৪২৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, প্রকাণ্ডে রাজা জেনীকে ধন্যবাদ দিলেন—

“To testify and render thanks”, say the letters-patent, which bear the date of December, 1429, ‘to the divine wisdom, for the numberless mercies he has vouchsafed through the hapds of his chosen minister, and our, well-beloved maid, Joan of Arc of Demremy,”

রাজা নানা রূপে জেনীর ভ্রাতৃদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং জেনীকে বৈশ ভূষায় সাজ্জিতা ও সহচরীযুগ্মে পরিবেষ্টিত করিতে চাহিলেন—দৈবী রূপে তাহাকে সম্মান দিলেন,

—কিন্তু জেনীর চরিত্র ও বৈশ ভূষা পূর্ববৎ রহিল,—দেবদুল্লভ পুত্র চরিত্র জেনীকে অপূর্ব সাজে সাজাইল।

এ পর্য্যন্ত জেনী কোন সময়ে অকৃত-কার্য্য্য হন নাই, কিন্তু এখন তাহা পরিবর্তিত হইল। ওইস (Oise) নদীর তীরে কম্পেন্‌ নগরী (Compiègne) ইংরাজ সৈন্ত কর্তৃক আক্রান্ত হইলে জেনী কতিপয় লোক সহ তাহা প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হন। প্রথমত তিনি সকলকে বিভাতিত করেন, কিন্তু ক্রমাগত দলে দলে লোক আসিয়া বিভাতিত-দিগের দলপৃষ্ঠ করিতে লাগিল যখন, তখন তিনি আপন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং সৈন্তগণকে পলায়ন করিতে আদেশ করিলেন। জেনী এই দলে আছে ভাবিয়া ইংরাজগণ পশ্চাদ্ধাবিত হইতে লাগিল। জেনীর পোষাক তাহারা চিনিয়াছিল। ইংরাজগণের আক্রমণে অনেকে নদী গর্ভে পতিত হইল। অনেকে বন্দী হইল এবং জেনী সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, তিনি ইংরাজগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছেন। তিনি আশ্চর্য্যের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ফরাসীগণ আপন আপন প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল—অরলিনসের কুমারী, অভিমত্যুর স্ত্রায়, শত্রুব্যাধে নিপতিত হইলেন! অবশেষে তিনি জনৈক তীরধারীর (John of Luxemburg) দ্বারা ধৃত হইলেন। এই অবসরে অল্প একজন (Lionel of Vendome) তাঁহাকে নিরস্ত্র করিল। ইংরাজমহলে আন্দোল্লাসের রোল উঠিল—ফরাসীরা এই ঘটনায় যার পর নাই বিষাদে নিমগ্ন হইল!

তারপরের কথা বিষাদে পূর্ণ। সে সব বিষাদের কাহিনী লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। জেনীর প্রতি ইংরাজের নিশ্চয় ব্যবহার ইতি-

ধাসের চিরকলঙ্ক । কল্পিত অন্ধকূপহত্যার কথা লিখিবার সময় ইংরাজ-ইতিহাস-লেখক জেনীর প্রতি ইংরাজের নির্মম ব্যবহার কিরূপে বিস্মৃত হইয়াছিল, তাহা ভাবিতে পারি না ।* জেনী এই অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ২বার চেষ্টা করিয়াছিলেন, —দ্বিতীয়বার লক্ষ প্রদান করলেন গুরুতর রূপে আহত হইয়াছিলেন । আর লেখনী লিখিতে চাহে না । কিরূপে জেনীকে বিচার-বিদ্রোহে ফেলা হইয়াছিল, কিরূপে ষড়-যন্ত্রের উপর ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল, কিরূপে প্রতারকগণের প্রতারণায় তিনি অস্থির হইয়াছিলেন, কিরূপে ধর্মযাজকেরা ধনের বশবর্তী হইয়া জায় ধর্মকে বিসর্জন দিয়া জেনীকে অগ্নিদাহ করিতে আদেশ দিয়াছিল,

* Here she was confined in the great tower of the castle—the only tower which now remains, and which is yet shewn as her prison. She was now treated with the most determined cruelty. Heavily ironed, her feet in the daytime were fixed in iron stocks ; and at night a chain was passed round her waist, so that she could not move upon her wretched bed * * Not only from her coarse and brutal guards was she exposed to every species of insult ; even her captor, John of Luxemburg accompanied by Warwick and Strafford, did not blush to visit her in prison, and triumph in her misery. Yet this was the age of chivalry, and Joan was a woman, and a fallen foe !—one who, enduring the foulest wrongs at the hands of so-called Christian knights and nobles, would have received, among the pagan ancients, the honours due to the most devoted patriotism. Luxemburg gestingly told the poor captive he had come to release her, if she would promise never to take arms again. ‘Do not mock me,’ she replied with dignity ; ‘I know that you have neither the will nor the power. The English will kill me believing that, after my death, they will gain the Kingdom of France ; but were there a hundred thousand more of them than there are, they should not conquer. It is said that her words so irritated Strafford that he drew his dagger, and would have struck her, had not his hand been stayed by the Earl of Warwick.

ভাবিলে “ শরীর অবসন্ন হয়, নয়নে অশ্রু বরে । হায়, ধর্ম, ভূমি অর্প-লোলুপ ধর্ম-যাজকদিগের স্বার্থসাধনের সহায়রূপে কিরূপে মানব-সমাজের সর্বনাশ সাধন করিতে প্রস্তুত হও, আমরা সামান্য জীব, তাহা বুঝিতে অক্ষম । ফক্সের “বুক অব মার্টারস” পুস্তকে কত কত লোকের প্রতি খ্রীষ্টধর্ম-বিরোধীদিগের অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু জেনীর প্রতি খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বাসীগণ বেরূপ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার তুলনা মিলে না । কেবল খ্রীষ্টের ক্রুশে দেহত্যাগে তাহার তুলনা মিলে । খ্রীষ্টের দেহত্যাগে প্যালেষ্টাইন ধন্ত এবং জেনীর দেহত্যাগে ফ্রান্স পূজ্য । ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে তিনি বিচারিতা হন,—একজন উকীল বা এডভোকেটও তাহার পোষকতা করিতে অধিকার পায় নাই ! তাহার শেষ উক্তি তাহার জীবনের পবিত্রতার কাহিনীর স্পষ্ট অভি-ব্যক্তি—“Does God, then, hate the English ?” জিজ্ঞাস্য কি ইংরাজদিগকে ঘৃণা করেন, এ কথার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,

“Whether God loves or hates the English, I do not know ; but I know that all those who do not die in battle shall be driven away from this realm by the king of France.” আমি জানি না জিজ্ঞাস্য ইংরাজদিগকে ঘৃণা করেন কিনা, কিন্তু ইহা জানি, যাহারা যুদ্ধে মরিবে না, তাহারা ফ্রান্সের রাজ্য কর্তৃক এই দেশ হইতে তাড়িত হইবে ।

When questioned about her standard, she said :—I carried it instead of a lance, to avoid slaying any one ; I have killed nobody. I only said :—“Rush in among the English,” and I rushed among them the first myself.—“The voices,” she continued, ‘the voices told me to

take it without fear, and that God would help me.' With regard to assuming man's attire, she replied that she had worn it in obedience to the command of God.—ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে কাজ করিয়াছি, নরহত্যা করি নাই—ইত্যাদি কথা নির্ভীক চিত্তে বলিলেও তাঁহার প্রতি কঠোর দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল। কথিত আছে, একজন ইংরাজ বিচার দেখিয়া বলিয়াছিল—“A worthy woman, if she were but English” পূর্ণ একবৎসর পর—২৪শে মে, ১৪৩১ খ্রীঃ বিচার শেষ হইল। ৩০শে মে রোয়েনের (Rouen) প্রকাশ্য স্থলে তাঁহাকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া বধ করা হয়। যেমন জুডাস ইষ্কারিয়ট, তেমনি বিশ্বাসঘাতক L' Oiseleur পরে অন্ততপ্ত হইয়া ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। শেষ মুহূর্ত্তে তিনি যে মন্ত্রভঙ্গী প্রার্থনা করিয়াছিলেন—তাহা শুনিলে শ্রাবণও বিদীর্ণ হয়।* শেষ মুহূর্ত্তে যখন অগ্নিতে সমর্পণ করিবার আদেশ হইল, বিশ্বাসঘাতক বিসপ বোভাইস (Beauvais) and উইনচেষ্টারের কার্ডিনালের সমক্ষে তিনি জুস চুপন করিয়া প্রার্থনা করিলেন। তৎপর সকলের নিকট ক্ষমা চাহিলেন এবং সকলকে ক্ষমা করিলেন এবং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিলেন।† দেখিতে

* As she rode on, her prayers were so devout and she recommended her soul to the Almighty in such touching accents, that several of the spectators were moved to tears; and some of the assessors had not the heart to follow her to the last. “O Rouen! O Rouen!” she exclaimed as she came near the market-place, ‘is it here, indeed, that I must die.’

† She then declared that she forgave all those who had injured her, and concluded by entreating the prayers of the spectators. She spoke distinctly, and her words and resignation to the will of God drew tears and sobs from many who had come prepared to revile her. * * *

দেখিতে সব নিঃশেষ হইল! কিন্তু জেনীর চিত্ত-ভঙ্গ হইতে নব ফ্রান্স অগ্রহণ করিল।

এবং তারপর? যেমন খ্রীষ্টধর্ম খ্রীষ্টের মৃত্যুতে নবজীবন লাভ করিয়াছিল, ফ্রান্সও তেমনি, নব বলে বলীয়ান হইল। প্রমত্ত ফ্রান্সকে বশীভূত করিতে বেডফোর্ডের ডিউক অসমর্থ হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে দেশের পর দেশ, নগরের পর নগর ইংরাজ-হস্ত-বিচ্যুত হইতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে সমস্ত ফ্রান্স চারলসের করায়ত্ত—“This, with some subsequent movements, turned the balance so effectually against the English, that in a few years they were, with trifling exceptions, stripped of all their French possessions.” এবং প্রতিশোধের জর জরকার হইল।

১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রিমসের আর্কিবিশপ-প্রমুখ কোর্ট পুনঃ জেনীর বিচার করেন এবং তাঁহার নির্দোষিতা ঘোষণা করেন।‡ তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভে লিখিত আছে—

“The maiden's sword protects the
royal crown;
Beneath her sacred care, the lilies
safely bloom.”

Scarcely, however, was the frightful tragedy concluded, before there was a pity among the spectators. Some began to think they had committed a crime in burning a sinner; others wished their own persons had been burned in the place of hers. yet, notwithstanding these demonstrations of feeling, further indignities were heaped on her remains. The blackened corpse was shewn to the people, to convince them of her identity; then a second fire was kindled and her body, reduced to ashes, was thrown in the Seine.

‡ কংসী উদ্ধারণ না জানা থাকার নামের অনুবাদে ভুল থাকিতে পারে, তজ্জন্ত ক্ষমা চাই। ন. দ.

শিশু ক্রমঃ । *

মাঘ মাসের “প্রবাসী”তে ও জানুয়ারী মাসের Modern Reviewতে কারাগারে পিতৃসন্ধিধানে, মাতৃকোড়ে শিশু ক্রমের একটি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্র পরিচয়ে “প্রবাসী”তে Modern Reviewএ শ্রীযুক্তা ভগিনী নিবেদিতা (Miss Noble) মহোদয়ার “Cradle Tales of Hinduism” নামক গ্রন্থের উদ্ধৃত অংশের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

শিশু ক্রমের কথা বলিতে গিয়া সংকর্ষণ বলরামের কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। প্রবাসীতে এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, যথাঃ— “কংশ নিজ বন্ধু ও অমাত্য বাসুদেব ও নিজ ভগিনী দেবকীকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি এইজন্ত নিজ ভগিনী দেবকীর সহিত বাসুদেবের বিবাহ দিলেন। এবং বিবাহের পর এক রথে করিয়া নিজেই সারথি হইয়া তাঁহাদিগকে বাসুদেবের গৃহে লইয়া যাইবার জন্ত রথ চালাইয়া দিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে এই আকাশবাণী শ্রুত হইল “রে অত্যাচারী দুষ্ট রাজা এই দম্পতির অষ্টম সন্তান একটি বালক হইবে। সেই বালক বার বৎসর বয়সে নিজ হস্তে তোর প্রাণবধ করিবে।” ইহা শুনিয়া বাসুদেব ও দেবকীর প্রতি কংশের প্রীতি ঘোর বিদ্বেষে পরিণত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া আবার মথুরায় রথ লইয়া গেলেন এবং

সেখানে বাসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাঁহাদের প্রত্যেক সন্তানকে কংশ জন্মের পরেই বধ করিবেন। এইরূপ বার বার সাত বার সাতটা শিশু জন্মিল, কেবল বলরাম ছাড়া আর সব শিশুই কংশের নিষ্ঠুর হস্তে প্রাণ হারাইল। বলরামকে গোপনে কারাগার হইতে সরাইয়া ফেলা হইয়াছিল এবং কংশকে বলা হইয়াছিল যে শিশুটা জন্মিবার পরেই মারা গিয়াছে।”

বলরাম সম্বন্ধে যে কথা লেখা হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণব শাস্ত্রের ভক্তির সহিত মিলে না। শ্রীযুক্তা ভগিনী নিবেদিতা কোথা হইতে বলরাম শ্রীকৃষ্ণের সহোদর ভ্রাতা বলিয়া পাইলেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। বলরাম রোহিণীর গর্ভজাত সন্তান, শ্রীকৃষ্ণের বৈষ্ণব ত্রৈলোক্য ভাই বলিয়াই জানি। এবং বৈষ্ণব শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতে তাহাই পাওয়া যায়। ভাগবতে আছে—

পথি প্রগ্রহিণং কংসমাতাঘাত্যাহা শরীরবাক্ ।
অস্ত্রাস্ত্রামষ্টমো গর্ভো হস্তাঃ ষাং বহসেহবুধ ॥

রে মূর্খ! তুই আজ আনন্দে যাহাকে রথে করিয়া বহন করিতেছি, ইহারই অষ্টম গর্ভজাত সন্তান তোর জীবন সংহার করিবে। ইত্যুক্তঃ স খলঃ পাপোভোজানাং কুলপাংসনঃ । ভগিনীং হস্তমারকু খড়্গাপাণিঃ কচেহুর্গ্রহীৎ ।

সেই খল পাপী ভোজকুল-কুলজার এই

* এই প্রবন্ধটি প্রবাসীতে ছাপাইবার জন্য পাঠান হইয়াছিল। সম্পাদক মহাশয় ছাপাইবার কথা জানাইয়াও ছাপান নাই। “মনোনীত” হইয়াও কেন যে ভ্রমসংশোধনার্থ ইহা ছাপান হইল না, তাহা সম্পাদক মহাশয়ই জানেন। লেখক।

কথা শুনিয়া খড়্গ ধারণ পূর্বক ভগিনীকে বধ করিবার জন্ত উদযুক্ত হইয়া তাঁহার কেশ ধারণ করিল ।

তখন বহুদেব—বাসুদেব নয়, বহুদেবের পুত্র বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম বাসুদেব—বিনয় পূর্বক বলিলেন,

শ্লাঘনীয়গুণঃ শূরৈর্ভবান্ ভোজ যশস্করঃ

স কথং ভগিনীং হণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বাহ পৰ্বনি ॥

হে শূরগণের পুজনীয় ভোজ বংশ যশোবর্দ্ধক ! তুমি কি নিমিত্ত তোমার বিবাহিতা ভগিনীকে বধ করিবে ? এবং নানাপ্রকার উপদেশ দিয়াও যখন নির্দয় কংসকে এই পাপ কর্ম হইতে বিরত করিতে পারিলেন না, তখন বহুদেব বহু সন্মান পূর্বক মধুর হাশ্বে সেই নৃশংস পাপাচারী কংসকে বলিলেন—

ন হস্তান্তে ভয়ং সৌম্যং বৈ সাহাশরীরী বাক্ ।
পুত্রাণ সমর্পয়িষ্যে হস্তা যতন্তে ভয়মুখিতম্ ॥

হে সৌম্য ! দৈববাণী বাহা হইয়াছে, এই দেবকী হইতে তোমার সেরূপ আশঙ্কা নাই, দেবকীর সকল পুত্রকেই তোমার হস্তে সমর্পণ করিব ।

ইহাতে কংস সন্তুষ্ট হইয়া দেবকীকে আর বধ করিলেন না ।

'বহুদেবও কংসের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া গৃহ্যভিমুখে যাত্রা করিলেন ।

অনন্তর যথাকালে দেবী দেবকী অষ্ট পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করিলেন । সত্যপ্রতিজ্ঞ বহুদেব অতি কষ্টে প্রথম পুত্রটিকে কংসের হস্তে অর্পণ করিলেন । ধার্মিক বহুদেবের এইরূপ সত্য পালন দেখিয়া দুর্জিত কংসও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—
প্রতিযাতু কুমারোহয়ং নহস্তাদতি মে ভয়ং ।

অষ্টমায় যুবয়োর্গর্ভায় ত্যক্তে বিহিত কিল ॥

এই বালককে তুমি ফিরিয়া লইয়া যাও, দেবকীর অষ্টমপুত্র হইতে আমার মৃত্যু হইবে, এরূপ আকাশবাণী হইয়াছে ।

তাহাই হউক বলিয়া সানন্দচিত্তে বহুদেব পুত্র লইয়া প্রস্থান করিলেন ।

দেবর্ষি নারদ দেখিলেন, কংস শান্তি লাভ করিলে দেবকার্য্য উদ্ধারে ব্যাঘাত হয়, অতএব তিনি কংসের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ব্রজবাসী নন্দ প্রভৃতি যাবতীয় গোপ ও তাঁহাদের পত্নীগণ, বহুদেব প্রভৃতি সমুদয় বৃষ্ণিবংশীয়, দেবকী প্রভৃতি যাবতীয় যজ্ঞকুল কামিনীগণ এবং কুলের জ্ঞাতি বন্ধুবান্ধব সকলেই দেবতা । পৃথিবীর ভারভূত দৈত্যগণকে বিনাশ করিবার জন্ত ইহারা দেহধারণ করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ।

এই কথা শুনিবামাত্র কংস বহুদেব ও দেবকীকে গৃহে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিল ।* এবং যখনই দেবী দেবকী হইতে যে যে পুত্র ভূমিষ্ঠ হইতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ সেই সেই পুত্রকে বিষ্ণুবোধে সংহার করিতে লাগিল । ক্রমান্বয়ে দেবী দেবকীর ছয় সন্তান হয়, কংস তাহাদের সকলকেই একে একে নষ্ট করে । বিষ্ণুর অংশে দেবকীর সপ্তম গর্ভ সঞ্চারিত হইলে—

ভগবানপি বিশ্বাত্মা বিদিত্বা কংসজং ভয়ং ।

যদূনাং নিজনাতানাং যোগমায়াং সমাদিশং ॥

ভগবান বিশ্বাত্মা যোগমায়াকে আদেশ করিলেন—

গচ্ছ দেবী ব্রজং ভদ্রে গোপ গোভিরলঙ্কৃতম্ ।

রোহিণী বহুদেবন্ত ভার্য্যাণ্ডে নন্দ গোকুলে ।

অত্যাশ্চ কংসসংবিধা বিবরয় বসন্তিহি ॥

দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাধ্য ধাম সামকং ।

তৎসন্নিবৃত্ত্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয় ॥

* দেবকী বহুদেবক নিগূহ নিগড়ে গৃহে ।

হে দেবি ! তুমি গো গোপগণে' পরিত্রুত
হইয়া ব্রজে গমন কর । বসুদেবপত্নী রোহিণী
গোকুলে ও তাঁহার অশ্রুজ্ঞান পত্নীগণ কংসভয়ে
ভীত হইয়া গোপনে বাস করিতেছেন ।
অনন্ত নামে আমার অংশ দেবকীর উদরে
আবির্ভূত হইয়াছে, তুমি সেই গর্ভ আকর্ষণ
করিয়া রোহিণীর উদরে স্থাপন কর । ভগ-
বানের আদেশে মায়া পৃথিবীতে আসিয়া
দেবকীর গর্ভ লইয়া রোহিণীর উদরে স্থাপন
করিলেন । পুরবাসিগণ দেবকীর গর্ভ নষ্ট
হইল বলিয়া হাহাকার শব্দে মোদন করিতে
লাগিল—

গর্ভসঙ্কষণং তং বৈ প্রাহঃ সঙ্কষণং ভূবি ।
রামেতি লোকরমণাং বলবহুচ্ছ্রয়ং ।

দেবী দেবকীর গর্ভ সঙ্কষণ হওয়াতে
সন্তানের নাম সঙ্কষণ, লোকের মনোরঞ্জন
নিমিত্ত রাম এবং বলের আধিক্যবশতঃ বল-
ভদ্র হইবে ।

রূপক ছাড়িয়া দিলে এই কথাই দাঁড়ায়
যে, বলদেব বসুদেবের পত্নী রোহিণীর গর্ভ-

জাত সন্তান । শ্রীকৃষ্ণের বৈবনাশ্রয় তাই,
সহোদর নন । শ্রীকৃষ্ণা ভগিনী নিবেদিতা
যদি প্রকৃত শ্রীকৃষ্ণ শিশিরকুমার বোম মহা-
শয়ের Lord Gouranga * নামক গ্রন্থ পাঠ
করিতেন বা একটুকু অধ্যয়ন করিতেন,
তাহা হইলে একপ অসত্য এবং অপ্রিয় ঘটনা
প্রকাশিত হইত না । হিন্দুদিগের ইষ্টদেবতা
শ্রীকৃষ্ণের পিতাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রচার
করিতে হইত না ।

“বলরামকে কারাগার হইতে সরাইয়া
জন্মবার পরেই মায়া গিয়াছে” বলিয়া
কংসকে প্রবোধ দিবার কোনও অথবা প্রয়ো-
জন হইত না । কংস দুর্দান্ত পাপচারী
যোর নারকী হইয়াও বসুদেবকে সত্যবাদী,
সত্যপরায়ণ, সত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়া বিশ্বাস করিত,
কিন্তু হৃৎকথের বিষয়, কৃষ্ণভক্ত ভগিনী নিবে-
দিতা অসাবধানতা বশতঃ তাঁহাকে জগতে
প্রবঞ্চকরূপে প্রচার করিলেন । আশা করি,
সত্যায়ুরোধে তিনি এ ভ্রম সংশোধন করিয়া
লইবেন ।

শ্রীমুদ্রেন্দ্রনাথ মিত্র ।

বিবাহের সঙ্গীত ।

(১)

সাহানা—রাঁপতাল ।

ঘুরিতেছে মহাবিশ্বে এক মহা নিমন্ত্রণ,
ঢেলে দাও প্রাণমন, কর আশ্রয় বিতরণ ।
অণু পরমাণু কণা বলে একা রহিব না,
আপনার জন ভরে এত তাই অব্ধষণ ।
একা জীব কোথা যাও, ও পথ তোমার নয় ।
জীবনের মহালক্ষ্য অনন্তের প্রেমে লয়,
প্রেম-বন্ধ দেবী আজ আলো করে রাজ রাজ,
কে দিবে গো পূর্ণাহুতি, কে চায় মহামিলন ?

(২)

সিদ্ধু—কাওয়ালি ।

জীবনের মূল ব'লে কেগো সর্বমুলাধার
ঘুরাইছ সঙ্গোপনে মহাচক্র ঘটনার ?
কার দেখা কার সনে, কি থাকে তোমার মনে;
কি মন্ত্র শুনাও কাণে, পর হয় আপনকার ।
কুড়ারে কুড়ারে খণ্ড, পরশি ও প্রেমদণ্ড,
নব শোভা, নব স্বর্গ রচিছ হে বার বার ।
এ লীলা-রহস্য মাঝে সাজিয়া হে কত সাজে,
ধরা দিয়ে ধরা দিয়ে মিটেনা কি সাধ আর ?

(৩)

বেহাগ—একতালা ।

সুন্দর কর, উজ্জল কর, কর চির মধুময়,
ছায়ায় তোমারি প্রসাদ-ভিখারী

প্রণত ছুটি হৃদয় ।

ফুটুক মঙ্গল, ছুটুক সৌরভ,
উঠুক জীবনে তোমারি গৌরব ;
তোমারি প্রমাণ হ'ক ছুটি প্রাণ,

চির আনন্দ-আধার ।

তুমি না ধরিলে কেমনে যাইবে,
কঠোর ও ব্রত কেমনে লাইবে,
দুর্বলে বল কে সঞ্চারে বল,

কে হরে সংশয় ভয় ?

দাও গুরুদেব, নব শিক্ষা,
দাও যজ্ঞেশ্বর মহামন্ত্র-দীক্ষা,
ক'রে তোমাময় যুগল হৃদয় কর
মহা প্রেমে লয় ।

(৪)

ভৈরবী—একতালা ।

নবাই তুটিতে
ও অমৃত পরণ বধায় ।

হ'ক ক্ষুঃ বন্ধু সেও চায় নিছক,
নগণ্য কীটাত্ম অনন্তে ধায় ।

ফুটি বলে ফুল, ফুটিবে মুকুল,
ফুটিবার তরে জগত আকুল ;
ক্ষুদ্র প্রাণ তাই খুঁজিছে সদাই
কেমনে ফুটিয়া আপনা বিলায় ।

কি মন্ত্র দিতেছ হৃদয়ে হৃদয়ে,
তুট নয় প্রাণ আর সীমা ল'য়ে,
কি মধুর স্বরে ওই প্রেমপুরে
করিছ নিখিল প্রাণ আকর্ষণ ।
মহা কাম্বক্ষেত্র সম্মুখে ধরিয়া
ডাকিছ সম্মানে আদর করিয়া,
ছুটি প্রাণ নিয়ে, সেবা ব্রত দিয়ে,
রাখহে মাতায়ে মহা সাধনায় ।

৫

সুরটমল্লার—একতালা ।

হও তবে অগ্রসর ।

এক লক্ষ্য দায়ে, এক প্রাণ হ'য়ে
হাতে হাত রেখে, অন্তরে অন্তর ।
আসে স্বপ্ন হুংখ, আসে দিবারাত্রি,
নাহি নাহি ভয়, অনন্তের যাত্রী,
মায়ের প্রসাদে দেব আশীর্বাদে
হও চিরজয়ী, হওগো অমর ।

জীবন নহেত কল্পনা স্বপন,
জীবন যে শুধু আত্ম-বিতরণ
ধন্য সেই জন, ধন্য সে জীবন,
তাগ যার ব্রত, সেবা যার পণ,
সুখী হতে চাও আপনারে দাও,
আশীর্বাদ জেনে সব সয়ে যাও ;
(হ'ক) দুইটা জীবন ফুলের মতন
চির বিকশিত, চির সুন্দর ।

শ্রীকালীনাথ ঘোষ ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

৮। অক্ষ। ত্রিবিজয়কক ঘোষ প্রণীত, মূল্য দুই। (গীতিকাব্য) এই পুস্তকের কোন বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইল না। অধিকন্তু

বিলাতী কাগজে বিলাতী কালীতে ছাপা। এরূপ পুস্তকের আদর না হইলেই আশঙ্কা সুখী হইব।

৯। The Annual Report of the Sasipada Institute, Barahanagar, for the year 1908. জীবিত লোকের জীবন্ত কীর্তি। পূর্বে শুনিয়াছিলাম, ব্যক্তিহীন জুলিয়া সংকার্য করিতে হয়—কিন্তু এই ইনষ্টিটিউট সে কথাই স্পষ্ট প্রতিবাদ। বাচিয়া থাকিলে-বিধাতার রাজ্যে কত কি দেখা যায়!

১০। Annual Report of the Rajkumari Leper Asylum at Baidanath-Deoghur for the year 1908. বাঙ্গালীর অধ্যবসায়ের অপূর্ণ কীর্তি। ১২০৭—৩১ ডিসেম্বর ৩৮ রোগী ছিল, ১২০৮—৪২ জন ভর্তি হয়, মোট ৮৭ জন; তন্মধ্যে ২২ জন আরোগ্য হইয়া যায়, ২৫ জন পলায়ন করে, ২ জনের মৃত্যু; ১২০৮ ডিসেম্বরে ৩১ জন অবশিষ্ট ছিল। আর—পূর্নস্থিত ২২২৩০৮/০ সহ ৩৫২২০৮/২; ব্যয় ১৩৭৮/১০। পাই স্থিত ২২১৫২০/১০। পাই। শ্রীযুক্ত বরদা-প্রসাদ বসু দেববর্ণন মহাশয় বিশেষ সূখ্যাতির সহিত এই আশ্রম পরিচালিত করিতে-ছেন।

১১। অজ্ঞান। শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য ১০। এই গ্রন্থখানি পড়িয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। অজ্ঞানের অপূর্ণ জীবনকাহিনী বাঙ্গালা ভাষায় আর কখনও পড়ি নাই। ভাষা প্রাঞ্জল এবং বিগুঢ়। স্কুলে স্কুলে এই পুস্তক অধীত হইলে আমরা বিশেষ সুখী হইব।

১২। মায়াবাদ। শ্রীশ্রমথনাথ তর্কভূষণ কৃত। ইউনিভার্সিটি লেকচার। মায়াবাদ—আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ—এই পুস্তকে প্রাঞ্জল ও মিষ্ট ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। পণ্ডিতমহাশয়ের জটিল বিষয় সরল করিবার অপূর্ণ ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া আমরা বিমুগ্ধ হইয়াছি। পুস্তকখানি অতি সুন্দর হইয়াছে।

১৩। হিন্দু-বিজ্ঞান-মূত্র। শ্রীবিষ্ণু-নিন্দুক রায় ওরফে বি, এন রায় প্রণীত। গ্রন্থকার বলেন—“আমি আশ্রিত বা আমার তব লিখিয়াছি। কতকগুলি আমার সমষ্টি লইয়াই ভারত। আমাদের তব সমষ্টিই ভারতের তব। আমাদের হ্রাস বা পতনের কারণ বর্ণনার ভারতের পতনের কারণও নির্দেশ করিয়াছি।” ইত্যাদি। হিন্দুজাতির হ্রাস বা পতনের কথা পূর্বে বর্ণনা করিয়াছেন, নিবারণোপায়ের কথা এই পুস্তকে পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। গ্রন্থকার বহু ব্যয় ও ক্রেশ স্বীকার করিতেছেন—সাধারণের নিকট আদর না পাইয়া তিনি নিরাশ হইতেছেন। আমরা বলি, নিরাশের কারণ নাই—বিধাতার দিকে চাহিয়া তাঁহার আদেশানুসারে কাজ করিয়া গেলেই সকলে কর্তব্য শেষ হয়—ফল তাঁহার হাতে। গ্রন্থকারের চেষ্টা সফল হউক।

১৪। বলোবধি দর্পণ। ১ম খণ্ড—শ্রীবিরজা-চরণ গুপ্ত কবিত্বগণ দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত; ১৪২ বিডন ষ্ট্রীট, মূল্য ৫। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন মহাশয় উপক্রমণিকা লিখিয়াছেন। চরক, অশ্রুত, বাগভট, হারীত, সিদ্ধযোগ, চক্রদত্ত, বঙ্গসেন এবং ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে চিকিৎসা প্রসঙ্গে যে সকল উদ্ভিদ ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাতে কেবল সেই সকল উদ্ভিদের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। উদ্ভিদ সকলের সংস্কৃত নাম প্রভৃতি বিবৃতির পর বাঙ্গালা ও ল্যাটিন নামও প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকখানি সুবিস্তৃত এবং পারিপাট্য রূপে মুদ্রিত। প্রাচীন ও নব্য মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এতদসম্বন্ধে একরূপ সুন্দর গ্রন্থ এদেশে আর প্রকাশিত হইয়াছে কিনা, জানি না। বহু ছাত্রের ইহাদ্বারা বিশেষ উপকার হইবে। গ্রন্থের বহুল প্রচার আমরা প্রার্থনা করি। পুস্তকখানি বিলাতী কাগজে ছাপা হইয়াছে—দেখিয়া আমরা হুঃখিত হইয়াছি।

দানযজ্ঞ !

"The soul should delight in giving because the divine nature only gives."—

Annie Besant.

স্বর্গগত পিতৃদেব বলিতেন,—“কোন প্রকার প্রার্থনা লইয়া যখন কেহ তোমার দ্বারে উপস্থিত হইবে, তখন কোন দিকে না তাকাইয়া তোমার কর্তব্য তাহাকে সাধামত সাহায্য করা। সেস্থলে তোমার বিচার করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, অধিকার নাই,—লোকটা দুর্বল কি সবল, অক্ষম কি সক্ষম, বড় কি ছোট, সম্পন্ন কি বিপন্ন; কেবল ইহাই বুঝিবে যে, সে ব্যক্তি যখন একটা অভাব জানিবার জন্য তোমার দ্বারস্থ হইতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই, তখন সে তদ্বিষয়ে তোমা অপেক্ষা অনেক হীন; সুতরাং তাহার আদ্যশ শ্রবণ করতঃ যথা-সাধ্য সেবা সাহায্য দ্বারা, যতদূর সম্ভব তাহার অভাব পূরণ করা তোমার একমাত্র কর্তব্য; যে হেতু নিয়ন্তের প্রতি উচ্চ পদারূঢ় ব্যক্তির কৃপাদৃষ্টি ও আশুক্য ভগবানের অভিপ্রায় ও কঠোর আদেশ, তাহার অপালনে ঘোর প্রত্যাবার,—জীবজগৎ এক অখণ্ড সামগ্রী, সকলে মিলিয়া এক বিরাট দেহ।”

উক্তরূপ বিধানই বিধাতার অধীনে চরাচর চলিতেছে। স্বর্গাদেব যদি তন্মণ্ড-লাস্তর্গত গ্রহরাজিকে নিজশক্তিব্যয়ে ধারণ ও পোষণ না করিতেন, তাহাদের দশা আজ কি হইত? ধরিত্রী যদি তাঁহার ক্রোড়স্থ জীবোদ্ভিদাদিকে নিজের রসরক্ত দিয়া প্রতি-পালন না করিতেন, আমরা কোথায় থাকি-

তাম? মহৎ ক্ষুদ্রকে রক্ষা করিয়া না চলিলে বিশ্বসংসার এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারে না। জ্যেষ্ঠ করিষ্টকে, ধনী দরিদ্রকে, সম্পন্ন বিপন্নকে, জানী মূর্খকে, গুণাশ্রা পাপীকে, যদি হাত ধরিয়া না তুলিতেন, জগত্তের অবস্থা আজ অন্তরূপ হইত, সে অবনতি বিশ্বজ্বালায় কথা ভাবিতেও প্রাণ ব্যাকুল হয়।

সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে মনে হয়, যিনি দেন, তাঁহার যেন ক্ষতি হয় এবং যে লয় সে লাভবান হইয়া থাকে। কিন্তু সুস্থ স্বাস্থ্য আধ্যাত্মিক জগতে তদ্বিপরীত ফল প্রত্যক্ষ দেখা যায়, অর্থাৎ যে গ্রহণ করে, সে খাটো হইয়া শক্তি হারায়, পক্ষান্তরে যিনি দেন, তিনি আত্মপ্রসাদাদিজনিত বিপুল ক্ষুধা ও বল লাভ করিয়া উন্নত করেন। স্থূলজগৎ অপেক্ষা সূক্ষ্মজগতের ক্রিয়া যে অধিকতর সুদৃঢ় ফল-প্রসবিনী, তাহা একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা পাইব। জলের স্থূল স্বস্রাবস্থা সমূহের তারতম্য এ বিষয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এক টুকরা কঠিন বরফের অচল ভাবে এক স্থানে পড়িয়া থাকাই প্রকৃতির ব্যবস্থা, অপরকে নাড়া দূরে থাকুক, তাহার নিজেরই নড়িবার চড়ি-বার শক্তি ঘোটে নাই; কিন্তু উহাকে উত্তাপ কর্তৃক তরল জলের অবস্থায় আনিলে উহার যে শক্তি বাড়ে, তাহা বেশ দেখা যায়, তখন উহা সচল হইয়া সমুদ্রস্থ কঠিন পদার্থগুলিকে অনায়াসে ঠেলিয়া লইয়া বাইতে সক্ষম হয়; আবার ঐ জল তেজ দ্বারা হৃদয় বাষ্পাকারে পরিণত হইলে যে ক্লিষ্ট ও গ্লানক শক্তি

ধারণ করে, তাহা কলকারখানা, 'রেলগাড়ী' প্রভৃতি দেখিলেই সহজে বুঝা যায়। বাষ্পকে 'উত্তাপ দ্বারা সূক্ষ্ম ঐশ্বরিক অবস্থায় লইয়া যাইতে পারিলে উহার শক্তি যে কতদূর বৃদ্ধি পায়, তাহা বৈজ্ঞানিক মাঝেই অনুভব করিয়া থাকেন। এবশ্যকারণে তৈজসশক্তি প্রয়োগে উহাকে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মসত্তার নিকট লইয়া যাওয়া সম্ভব, যেখানে উহার শক্তির ইয়ত্তা থাকে না। বিভাদান, জ্ঞানদান প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বিষয়াদি সময়ে কিছু বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, কেবলমাত্র স্থূল জড়পদার্থ সমূহের দান সম্বন্ধেই এখানে আলোচনা হইতেছে। দান দ্বারা ইঞ্জিয়-গ্রাহ্য দ্রব্যাদি হস্তান্তর হইলে সূক্ষ্মরাজ্যে কিরূপ ক্রিয়া প্রকটিত এবং তদ্বারা দাতা ও গ্রহীতা দুই জনে আধ্যাত্মিক রাজ্যের কে কোন্ পথে কোথায় গিয়া উপনীত হন, তদ্বিষয়েই কিছু বলা হইতেছে।

শাস্ত্রাদিতে তাগদ্বীকার সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ আছে, দেখা যাউক :—

মহুসংহিতা ও ভগবদ্গীতা উভয়ে বলিতেছেন, “অন্নং কেবলং ভুঙক্তে যঃ পচতাংস্বকারণাৎ।” যে ব্যক্তি আপনাকে উদ্দেশ্য করিয়া অন্ন পাক করে, সে কেবল পাণবিষ ভক্ষণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ প্রত্যহ নিজের আহারীয় দ্রব্যের কিয়দংশ অভাবযুক্ত কোন ব্যক্তিকে না দিয়া থাইলে ভোজনটা পশুবৎ হইয়া “ভোক্তার শরীর ও মনের প্রতি বিব তুল্য ক্রিয়া করিয়া থাকে। ঘোর স্বার্থপরতা হেতু ঐক্লপ ব্যক্তি ইহকালে ছাং, পরকালে ক্লেশ ও পঞ্চজন্মে দণ্ড ভোগ করে।

যদি অভাবক্লিষ্ট ক্ষুধিত কোন মানুষ নিকটে না পাওয়া যায়, পশু পক্ষী কীটাদিকে দিয়া থাইলেও কাজ হয়। সাধুরা বলেন,

একটা মানুষকে তৃপ্তিপূর্বক খাওয়াইতে পারিলে সমগ্র মানবমণ্ডলীকে খাওয়াইবার ফল হয়, এবং একটা ইতর প্রাণীর ক্ষুধা শাস্ত করিলে নিকটে জীব সমূহের সেবা করা হয়। মনুবিহিত প্রাত্যহিক পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্তর্গত নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ ব্যবস্থাও তদ্রূপে। মানব শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রত্যেক গৃহস্থের কিরূপ অবশ্যকর্তব্য, তাহা নিম্নোক্ত অন্নশাসনবাক্য দ্বারা বুঝা যায়।

“দেবতাতিথিভূত্যানাং পিতৃণামান্নমচ যঃ।
ন নির্দপতি পঞ্চানামুচ্ছাসন ন সঙ্গীবতি॥”

দেবতা অতিথি, ভরণীয় পোষ্যবর্গ, পিতৃ-লোক ও আত্মা, এই পাঁচ জনকে যে ব্যক্তি পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা অন্নাদি না দেয়, সে নিখাস প্রত্যাশাবিশিষ্ট হইলেও জীবিত নহে।

“ভুক্তবৎস্বথ বিপ্রেশু শ্বেষু ভূত্যেষু চৈবহি।
ভূজীয়াতাং ততঃ পশ্চাদবশিষ্টন্ত দম্পতীঃ॥

ব্রাহ্মণ, আত্মীয়স্বজন ও দাস, এই তিন শ্রেণীর লোকদিগকে অগ্রে ভোজন করা ইয়া পশ্চাৎ যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, গৃহস্থ দম্পতী তাহাই ভোজন করিবেন।

এস্থলে “ব্রাহ্মণ-ভোজন” শুনিয়া অনেকে হয়ত মহুর উপর বিরক্ত হইবেন, কিন্তু বিরক্ত হইবার কারণ নাই। সেকালে ব্রাহ্মণ বলিলে কোন্ শ্রেণীর জীবকে বুঝাইত, দেখা যাউক। “জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ; সংস্কারাদ্বিজ উচ্যতে, বেদপাঠান্তবেদ্বিপ্রঃ, ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।” এই ব্যাখ্যানুযায়ী ব্রাহ্মণ বড় ছলভ সামগ্রী। যিনি ব্রহ্মকে জানেন, অর্থাৎ পরাবিশ্রুতিবিশারদ, এরূপ আত্মজ্ঞানী মহাজনকে ভোজন করাইবার ব্যবস্থা—বামুনকে নয়, ব্রাহ্মণকে, পণ্ডিতকে। সর্বপ্রায়ে ব্রাহ্মণকে খাওয়াইবার বিধি কেন? না, জ্ঞানধর্ম্মার্চনা ও ভগবদ্ভাসনার সঙ্গিত

যে মুহূর্ত্ত জীব, তাঁহার ভরণ পোষণ, রক্ষণ-
বেক্ষণের ভার লওয়া সাংসারিক লোক
সমূহের একান্ত কর্তব্য। শাস্ত্রে বলে,
“পণ্ডিতাঃ বনিতাঃ লভাঃ” আশ্রয় ব্যতীত
কখনও রক্ষা পায় না। পণ্ডিতকে কেন
পত্নী ও লতার সঙ্গে অসহায়ের দলে ফেলা
হইল? ভার্য্যা স্বামীকে এবং লতা কোন
মহীকরকে আশ্রয় না করিয়া জীবিত থাকিতে
পারে না সত্য, কিন্তু পণ্ডিত কেন পারিবেন
না? পণ্ডিত শব্দে এখানে স্কুল পণ্ডিত
বুঝিলে চলিবে না, পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ এখানে
একার্থবোধক। “পণ্ডিত” শব্দের অর্থ
“পণ্ডা. বুদ্ধিঃ সা জাতা অশ্রু—শাস্ত্রজ্ঞা।”—
যাঁহার বুদ্ধি জন্মিরাছে, যিনি শাস্ত্রজ্ঞ। এখানে
বুদ্ধি মানে টাকা রোজগারের বুদ্ধি নয়, ধান
চা’ল বেচাকেনার বুদ্ধি, নয়, বাহার নাম
প্রজ্ঞা, নিশ্চয়াদ্বিক অস্তঃকল্পবৃত্তি, বিজ্ঞান-
নয় কোণে বাহার অবিষ্টান, যে সাবিকী-
বৃত্তি দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হওয়া
যায়, কারণ উহাই আত্মার দেহ বা আধার।
মহাত্ম্যরূপে আছে—

“পঠকাঃ পাঠকাষ্টেব যে চাত্তে শাস্ত্রচিন্তকাঃ।
সর্বৈ বাসনিনো মূর্খা যঃ ক্রিয়াবান স পণ্ডিতঃ ॥

পঠক, পাঠক, শাস্ত্রচিন্তক সকলেই
বাসনাধীন বলিয়া মিথ্যাসংস্কারবিশিষ্ট মূর্খ,
যে ব্যক্তি ক্রিয়াবান অর্থাৎ পুত-চরিত্র আত্ম-
ষ্ঠানিক ব্রহ্মোপাসক তিনিই পণ্ডিত।” এবিধ
ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিগণকেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত
বলা নিম্নসঙ্গত এবং তাঁহারাই আমাদের
অবশ্য-প্রতিপাল্য; কারণ হনিয়াদারীর
পথানুসরণ করিয়া অর্থোপার্জন তাঁহার
সম্পূর্ণ অঙ্গপুষ্ট, সুতরাং অক্ষম। এই
শ্রেণীর সংসারবৈরাগী ব্যক্তি কাজেকাজেই
বনিতা লতার ভার একেবারে অসহায়।

শাস্ত্রাদিতে একথাও আছে যে, নিরক্ষর
অপেক্ষা গ্রহাধারী ভাল, তাহা অপেক্ষা যিনি
পণ্ডিত বিষয়ের ভাবগ্রহণে সক্ষম, তিনি উৎ-
কৃষ্ট, আবার যিনি অধ্যয়নাদি ক্ষুদ্র যোগ্য
হইতে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন, তিনি আরও
উৎকৃষ্ট, কিন্তু সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ সেই মহাজীব,
যিনি উপার্জিত জ্ঞানাত্মার জীবনযাত্রা-
নির্বাহ করিয়া থাকেন; ব্রাহ্মণ বা পণ্ডিত
নামের যোগ্য কেবল এই শ্রেণীর সমর্থ
পুরুষ, তাঁহার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হউক আর
না হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। ইহা
আমাদের কথা নহ, শাস্ত্রকর্ত্তাগণ ঐক্যপই
নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যথা ত্রৈলোক্যনামে
“ব্রহ্ম ব্রহ্মকণ্ঠং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যাজকং।
যদন্তত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥”

বর্ণাভিব্যাজক বাহার যে লক্ষণ বলা হইল,
তাহা অগ্রবর্ণসম্বৃত ব্যক্তিতে দেখিলে তাহা-
কেও তদ্রূপই স্থির করিবে। এবং মহা-
ভারতে—

“শূদ্রৈচৈতত্ত্ববেত্রক্যং বিজে তচ্চ ন বিগতে।

ন স শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রঃ ব্রাহ্মণঃ নচ ব্রাহ্মণঃ ॥”

শূদ্র যদি সদৃশ দেখিতে পাওয়া যায়,
আর ব্রাহ্মণে তাহা লক্ষিত না হয়, সে শূদ্র
শূদ্র নয়, সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়।”

“অন্নদঃ স্তম্ভমাপ্নোতি স্তূতপ্ত সর্ববস্তুবু।

ভূমিদানাৎ পরং নাস্তি বিত্তাদানাৎ ততোহধিকং ॥”

যিনি অন্নদান করেন, তিনি অল্প বস্তু
সকলের দাতা অপেক্ষা স্তূতপ্ত হইয়া স্তূতলাভ
করেন। ভূমিদানের পর আর দান নাই;
বিত্তাদান তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট।”

নিঃস্ব ব্যক্তিকে অর্থাৎ দেওয়া অপেক্ষা
কৃত্রিমতাকে অন্নভোজন করাইলে বেশী ফল
হয়, তদ্বারা গ্রহীতা যেমন অন্নাহার আশ্রয়
বিগতরূপ হইয়া ভূমিলাভ করে, দাতাও

তেননি তৎক্ষণাৎ স্মৃতি হইয়া বিমল অম্ম-
প্রসাদ ভোগে সমর্থ হইলেন । মানুষের পক্ষে
ক্ষমার ক্রেশ সহ করা বড়ই কঠিন । সকল
প্রকার জালা যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও মানুষ
জীবিত থাকে এবং জীবন ধারণ বাহুণীর
মনে করে, অম্মভাবে সেই প্রিয় জীবনের
নাশ সম্ভাবনা, একারণ নিরন্তরে অন্নদান
বিশেষ কর্তব্য । ভূমিদান তদপেক্ষা মহৎ,
কেন না তদ্বারা গ্রাহকের চিরকালের অন্ন-
সংস্থান হইয়া থাকে । পরন্তু বিজ্ঞানদান
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে হেতু ভূমিও কোন
कारणे কখন হস্তচ্যুত হইতে পারে, কিন্তু
বিজ্ঞান কিছুতেই অধিকার-চ্যুতি বা ক্ষয়ের
সম্ভাবনা নাই ; এবং বিজ্ঞানদান অন্নের
ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আবার গরাবিদ্যা বা ব্রহ্ম-
জ্ঞান দানাপেক্ষা দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের
পক্ষে ঐহিক পারিত্রিক অমূল্য ফলপ্রদ সংসারে
আর কিছুই হইতে পারে না ।

“সংবিত্ততা চ দাতা চ ভোগবান্ সুখবানরঃ ।
ভবত্যাহিংসকশ্চৈব পরমারোগামশ্নুতে ॥

যিনি ভিক্ষা পের দ্রব্য বিভাগ করিয়া
অন্নের সহিত পান ভোজন করেন, এবং
দানশীল ভোগবান্ ও অহিংসক হইলেন, তিনি
পরম আরোগ্য সম্ভোগ করিয়া থাকেন ।”

আমাদের যাহা কিছু অধিকারস্থ বলিয়া
আমরা আপনার নিজস্ব মনে করি, তাহা
সমস্তই ঈশ্বরের সম্পত্তি, আমরা কেবলমাত্র
কিছু দিনের জন্য তৎসমুদয় ব্যবহার ও ভোগ
করিতে আসিয়াছি । এই সকল ভোগ্য
বস্তু আমরা বিধাতার নিকট হইতে পাই-
য়াছি । কৃপণতা ও বিলাসিতা উভয়বিধ
দোষ পরিহার পূর্বক ধর্মসাধনোদ্দেশে
শরীর মনের পুষ্টি সম্পাদনার্থ উহা ভোগ
করিয়া যাওয়াই আমাদের একমাত্র অধি-

কার । অতএব পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী,
স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব,
দাস দাসী, অবশ্রপোষা, আশ্রিত, অভাব-
যুক্ত প্রতিবেশী, দুঃখভারাক্রান্ত দরিদ্রগণ
প্রভৃতি সকলের সহিত যথাযোগ্য রূপে
বিভাগ করিয়া ভোগ করাই কর্তব্য । সমু-
দায়ই যে কেবল নিজের জন্য, ইহা কদাচ
মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়, অস্বস্তিরতা
সর্বথা মহাপাপ ।

উদ্ধৃত ধনাদি যে সঞ্চয়ী নিজস্ব নর, ধনীরা
যে কেবল টুঙ্গীনাত্র, ভগবানের সম্পত্তি যে
টুঙ্গরূপে তাহাদের নিকট শুধু গচ্ছিত, তাহা
শ্রীমদ্ভাগবৎকার স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়া
গিয়াছেন :—

“যাবন্তি যতে জীবং তাবৎসংস্থং হি দেহীনাং ।

অধিকং যোহভিন্নন্তে ত সন্তেনো দণ্ডমর্হতি ॥

—যতটুকু দ্বারা জীবের ভরণপোষণ কার্য
নিম্পন্ন হয়, এতটুকুতেই তাহার সন্ত, তদধিক
যাহা তাহার অধিকারস্থ, তাহা যদি কেহ
নিজের সম্পত্তি মনে করে, সে চোর, চোরের
জ্ঞান দণ্ডার্থ ।”*

* কোন পাশ্চাত্য মহাত্মা লিখিয়াছেন :—“Men
are inclined to regard all that they have
as if it was their own possession, where as,
as a matter of fact, everything we possess
has come to us by the co-operative efforts
of all humanity.”, অর্থাৎ আমাদের হস্তগত
সম্পত্তিকে আমরা নিজস্ব মনে করিয়া থাকি, কিন্তু
প্রকৃতপক্ষে যাহা কিছু আমাদের অধিকারস্থ, সমস্তই
সমগ্র মানবমণ্ডলীর সমবেত চেষ্টা দ্বারা আমাদের নিকট
আসিয়াছে ।

অতএব একজন বলিয়াছেন :—“Rich people
should look upon themselves as stewards
and not as owners.”—ধনবানগণের উচিত আপ-
নাটিকে ধনের অধিকারী না মনে করিয়া ভাগ্যবান
মনে করা ।

মোহাপাশবর্জ সাধারণ সাংসারিক জীব-
গণের পক্ষে দান যে একটি মহাযজ্ঞ অর্থাৎ
দুষ্কর ত্যাগস্বীকার † তাহা পূর্বতন আচার্যা-
গণ বুদ্ধিগা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন :—
“দানান্ন দুষ্করং তাত পৃথিব্যামন্তি কিঞ্চন।
অর্থে চ মহতী তৃষ্ণা স চ হুঃখেন লভ্যতে ॥

হে তাত ! ভূমণ্ডলে দান অপেক্ষা দুষ্কর
কর্ম আর কিছুই নাই, যেহেতু অর্থেতে
লোকের মহতী তৃষ্ণা, এবং সেই অর্থ কষ্টে
লাভ হয়ন”.

দান দ্বারা পুণ্যোপার্জন বড় সহজ ব্যাপার
নয়। সংসারে একুপ ভাগ্যবান কল্পজন জন্মিয়া-
ছেন, যাহারা নিঃস্বার্থভাবে দানধর্ম অহুষ্ঠান
পূর্বক ছলত মানব জন্মের স্বার্থকতা সম্পাদন
করিতে সমর্থ হইয়াছেন ? অক্ষয় সম্পদ,
অভয় বৈরাগ্যধনে ধনী, অর্থসংগ্রহ যাহার
জীবনের উদ্দেশ্য নয়, অর্থের দ্বারা ঈশ্বরের
প্রিয় কার্য সম্পাদনই যাহারা বিশেষ কর্তব্য
মনে করিয়া থাকে, এবিধ মহাত্মা পৃথিবীতে
বিরল। কি ধনী কি নিধন, প্রায় সকলকেই
ধনতৃষ্ণায় ব্যাকুল দেখিতে পাওয়া যায়, ধনের
লালসা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইবার নহে,
ধনসংগ্রহ ও ধনরক্ষা যেন আমাদের জীবনের
প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য, আবার ধন বহু
ক্লেশে উপার্জিত হইয়া থাকে ; সুতরাং
যেস্থলে কোনরূপ বাধ্যতা বা স্বার্থ নাই,
সেস্থলে মোহমুক্ত আত্মবিস্মৃত জীবের পক্ষে
অর্থত্যাগ করা অসাধ্য না হইলেও হুঃসাধ্য
ব্যাপার, সন্দেহ নাই।

যাচকগণ উত্থাপ্ত করিতেছে বলিয়া কেহ
কেহ বিরক্তচিত্তে যাচকের, উত্থাপ্ত হইতে
বুজিলাভোদ্যে যৎকিঞ্চিৎ দান করিয়া
ছুটিপাইয়া থাকেন, তাহাতে কোনপ্রকার

†. Sacrifice.

পুণ্যসঞ্চয় হওয়া দূরে থাকুক, দাতার আত্ম-
ম্বিক অবনতিই নিশ্চয়, কারণ অপ্রেমের
উদয়ে প্রত্যাবার অনিবার্য। প্রশান্তচিত্তে
কর্তব্যবোধে প্রেমের বশবর্তী হইয়া ভগবানের
আদেশ বা ইচ্ছিত সহানুভবনে যে কেহ কোন
প্রকার ত্যাগস্বীকার করেন, তাঁহার নিশ্চয়
পরমার্থ লাভ হইবে ; কিন্তু দানকালে দাতার
যদি কষ্ট বোধ হয়, তাহা হইলে সফল ফলে
না। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, বিরক্তির
সহিত বা কষ্ট বোধ করিয়া যিনি কিছু নিজস্ব
ত্যাগ করেন, তিনি কি দান যজ্ঞ কোনই ফল
পাইবেন না ? তদুত্তরে বলিতে হয় যে, কর্ম-
শাস্ত্রানুসারে তাঁহারও কিছু লাভ হইবে,
সন্দেহ নাই, কিন্তু সে লাভ স্থূল বৈ সূক্ষ্ম
হইতে পারে না ; তিনি যেমন কোন একটা
সাংসারিক কার্যদাহুনের বশে বাধ্য হইয়া
হৃদয়ের অনিচ্ছাসম্বোধে কষ্ট বোধ করতঃ
জড়বস্ত ত্যাগ করিলেন ; কেন না দান বলিয়া
কোন শব্দ প্রকৃতির অভিধানে নাই, সমস্ত
দানই ঋণ ; গ্রহীতা এক্ষণে প্রত্যর্পণ না
করিতে পারেন, বা ফেরত দিলে দাতা লজ্জার
খাতিরে তাহা গ্রহণ করা ভদ্রতার বিরুদ্ধ মনে
করিতে পারেন, পরন্তু জন্মান্তরে তাহা চক্র-
বুদ্ধি অনুসারে বর্জিত হইয়া তাঁহার নিকট
উপস্থিত হইবেই ; এক পাই পরসার হিসাবও
প্রকৃতির ষাণ্ডায়া ভুলচুক হইবার নহে। ইহা
দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, দান যে প্রকারেরই
হউক, উহা একটা সুলভ ব্যবসার *—ইহজন্মে
খ্যাতিরূপ ফাউ এবং পরজন্মে বিশিষ্ট লাভ।

ইংরাজীতে বাহাকে মাইজার † (ব্যয়-
কুঠ, অদাতা) বলে, আমরাও সাধারণভাবে
তাহাকেই রূপণ আখ্যা দিয়া থাকি, কিন্তু
রূপণ শব্দের প্রকৃত অর্থ রূপাপাত ‡ :—বাঁস্ত-

* Investment. † Miser. ‡ Object of pity.

খিক জ্ঞানীর চক্ষে ব্যয়কৃত ব্যক্তিগণ নিত্যমুই কৃপার পাত্র, সন্দেহ নাই ; যে হেতু তাহারা ইহজন্মে দীনদুঃখীর মত জীবন কাটাইয়া সকলের ঘৃণার পাত্র হইয়া থাকে, পরে পর-লোকে ও পরজন্মে অর্থের সদ্যবহার না করা হেতু দণ্ডভোগ করে। ইহা অপেক্ষা সন্দ-ভাগা আর কি হইতে পারে ? কৃপণ সম্বন্ধে আনাদের শাস্ত্রকারদের প্রচারিত ব্যবস্থার অম্লরূপ কথা আধুনিক পাশ্চাত্য সুযোগও প্রকাশ করিতেছেন,—

“The rich man, who is barren of virtue, is, in reality, poor, and as surely as the waters of the river are drifting to the ocean, so surely is he, in the midst of all his riches, drifting towards poverty and misfortune ; and though he die rich, yet must he return to reap the bitter fruit of all his immorality. And though he become rich many times, yet as many times must he be thrown back into poverty, until by long experience and suffering he conquers the poverty within.”
— James Allen (From Poverty to Power.)

অর্থাৎ, নদী সমূহের জলরাশি যেক্রপ নিশ্চরতার সহিত সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান, ঠিক সেইরূপ নিশ্চিতভাবে, ধর্মহীন ধনীগণ, দারিদ্র্য ও হর্ভাগ্যের দিকে ছুটিতেছে। ঐশ্বর্যের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও নিশ্চয় জানিবে যে, তাহাদের দুঃখতির বিষময় ফল তাহারা পরজন্মে ভোগ করিবেই। এইরূপে যতবার তাহারা কোন কারণে

সমৃদ্ধিশালী হইবে, ততবার তাহদেরদিকে পাণ্টা হাতে আবার দারিদ্র্যপক্ষে নিমগ্ন হইতে হইবে,—যেমন কখন গাড়ীর উপরে নোকা, কখন নোকার উপরে গাড়ী—যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা সুদীর্ঘকালের বস্তুগোভোগ-জনিত অভিজ্ঞতা দ্বারা আভ্যন্তরিক দারিদ্র্য—নিবৃষ্ট স্বার্থপরতা-সমূহ অমুদারতা ও সমুচিত ভাব—জয় করিয়া চিন্তের প্রশস্ততা লাভ করিতে না পারে। অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত নিজে দারুণ হুঃখ দারিদ্র্য ভোগ দ্বারা দরি-দ্রের সহিত তীব্র সমবেদনা অনুভব করিতে সমর্থ না হয়। সংসারে কিছুই দেখিয়া বা শুনিয়া ঠিক শিক্ষা হয় না, ঠেকিয়া না শিখিলে সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। যে কখন তিক্ত খাদ্য নাই, তিক্তের বর্ণনা দ্বারা তাহার মনে তিক্তবাদের ভাব বসাইতে পারে একে-বারেই অসম্ভব ; ব্রহ্মা কখনই প্রসববেদনার ক্রেশ ঠিক বুঝিতে পারে না ; এই জন্তই পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে ভুক্তভোগী হওয়া প্রকৃতির নিয়ম, নতুবা পাকা অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভব নয়, এবং তদ্ব্যতীত উন্নতির দ্বার বন্ধ। ইহা দ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে, যতদিন পর্য্যন্ত ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার হৃদয়ের সহানুভূতি জন্মিয়া তদনুরূপ কার্য না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত জগতের সম্পন্ন বিপন্ন কাহারও কল্যাণ নাই।

কর্মশাস্ত্রানুসারে দানের ফলাফল বার-স্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

• সেতুবন্ধ রামেশ্বর । (শেষ)

পর দিবস প্রত্যুষে আমি “সেতু” দর্শন করিতে গেলাম। এই তীর্থেই অপর নামধ্বয় ধনুসতীর্থ, ধনুসকোটা, ইংরেজিতে ইহাই Adam's Bridge আখ্যায় প্রসিদ্ধ। রামেশ্বর মন্দির যেমন দর্শনীয়, এই স্থানও তেমনি দর্শনযোগ্য; ইহারই নামানুসারে তীর্থের নাম “সেতুবন্ধ রামেশ্বর” হইয়াছে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এই স্থানেই সমুদ্র বাধিয়া ছিলেন, স্মরণ্য ইহা অতীব প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক স্থান মধ্যে গণ্য। স্থানটা যেমন প্রাচীন, তেমনি পবিত্র। রামেশ্বর নগর হইতে ইহা প্রায় দশ ক্রোশ দূরবর্তী। নোকা, বলদ শকট কিম্বা পদব্রজে এখানে আসিতে হয়। * সমুদ্রের ধারে ধারে নোকা চালাইয়া আসা সকল সময়ে নিরাপদ নহে; বলদ-শকটগুলি রাশি রাশি বালুকা ভাঙ্গিয়া অতি কষ্টে বাতায়িত করে; পদব্রজে যাওয়া ততোধিক কষ্টকর। তথাপি প্রতি দিন সমভাবে অসংখ্য হিন্দু যাত্রী এখানে যাতায়াত করিয়া থাকে। ধনু হিন্দুর ধর্ম-স্পৃহা, ধনু হিন্দুর দেব-ভক্তি!!

আমি নোকা করিয়াই গিয়াছিলাম। নোকা লম্বা ও শক্ত। সঙ্গে নানা দেশের নানা প্রকৃতির যাত্রী ছিল। নোকায় আরোহণ করিবার পূর্বে পাণ্ডা কহিয়া দিয়াছিল,

* এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পরে ইংরাজি সমাচার পত্রে পাঠ করিলাম, রামেশ্বর তীর্থক্ষেত্র হইতে ধনুসকোটা পর্য্যন্ত রেলওয়ে তৈয়ারি করিবার জন্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট-বাহাদুর সা, ই, রেলওয়ে কোম্পানীকে হকুম-নানা প্রেরণ করিয়াছেন।

রামেশ্বর হইতে ধনুসতীর্থ (সেতু) পর্য্যন্ত কোথাও পানীয় জল পাওয়া যায় না। এই জন্ত আমরা তিনটা বড় মৃগায়ী কলস ক্রয় করিয়া, তাহা নির্মল কুপোদকে পূর্ণ করিয়া লইলাম। আহাৰ্য্য দ্রব্যও পাওয়া যায় না বলিয়া বিবিধ প্রকার ফল, শর্করা, চিপটক ইত্যাদি সঙ্গে লইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। সমুদ্রের কিনারা দিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত নোকা চালাইয়া সুদক্ষ তামিল মাঝির যিনি স্থানে প্রথমে নোকা থামাইল, তাহা ভারত-মহাসাগর-বক্ষোপরে ভাসমান একটা দ্বীপ। এই দ্বীপের নিকট হইয়া ধনুসতীর্থে যাইতে হয় না, কিন্তু এই দ্বীপ দেখিবার জন্ত মাঝিগণকে অধিক ভাড়া দিয়া পরামর্শ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা দ্বীপে উঠিয়া দেখিলাম, সমস্ত দ্বীপটা অসংখ্য নারিকেল বৃক্ষ ও অন্যান্য তরুলতার বনে পরিপূর্ণ। দ্বীপটা লম্বায় প্রায় এক ক্রোশ, প্রস্থে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ। ইহা মেশ্বর থানার এলাকাভুক্ত। সমুদ্র দ্বীপে একাদশ ঘর মাত্র লোকের বসতি। ইহাদের জন্ত একটা ক্ষুদ্র দোকান আছে, তাহাতে মুড়িমুড়কী, চাউল ডাউল ইত্যাদি সামান্য পরিমাণে ক্রয় করিতে পারা যায়। দ্বীপ দেখিবার পরে, মাঝিরা আবার নোকা ছাড়িল। অনেক দূর যাইবার পরে আবার একটা দ্বীপে পৌছিলাম, ইহার দৈর্ঘ্য একমাইল, প্রশস্ততা অর্দ্ধ মাইল প্রমাণ। এই দ্বীপে একটা ক্ষুদ্র মন্দির এবং একটা খয়রাৎ-খানা আছে। এই দাতব্য-ছত্র হইতে অতীব-

এক পথিকদিগকে চাউল, ডাউল, লবণ, কাঠ ও একটা মাত্র পরস্যা ভিক্ষা দেওয়া হয়। যে মহাধনবান ও সুবিখ্যাত বলিকের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রামেশ্বরের মন্দিরের সংস্কার হইতেছে, তিনিই এই দাওবা-ছত্রের প্রাতিষ্ঠাতা ও ব্যয়ভার-বহনকারী। আমরা এই দ্বীপ দর্শন করিয়া পুনরায় তরণীবোলে বহু দূরে গিয়া ধনুস্বতীরে পৌছিলাম। তরণী হইতে অবতরণ করিয়া খানিকটা পথ অতি কষ্টে, রাশি বাশি বালুকা ভেদ করিতে করিতে এবং কখন কখন জলে হাঁটিতে হাঁটিতে ঐ তীরে উপস্থিত হইতে হয়। এই অপূর্ণ স্থানের একদিকে মানার উপসাগর (Gulf of Manar) এবং আর এক দিকে পাকপুঞ্জ (Palk strait); মধ্যে ভূমিখণ্ড। ইহার আকার ধনুকের স্তায়, সুতরাং ইহা সেতুতীর এবং ধনুস্বতীর উভয় নামেই প্রসিদ্ধ। এই স্থানেই ভগবান রামচন্দ্র সেতু বাঁধিয়াছিলেন, ঐ ভূমিখণ্ড সেই সেতুর নিদর্শন। প্রস্তরাদির চিহ্ন নাই, গাঁথনি দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু এখানের জল কম (shallow) এবং কিছু দূরে দূরে বিপুলাকার প্রস্তরখণ্ড দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইংরেজেরা কহেন, এখানে গুপ্ত শৈল আছে; আমরা বলি, ঐ গুপ্তশৈলই রামচন্দ্রের সেতুর ভগ্নাবশেষ। জল ভয়ানক লবণাক্ত, অস্ত্রান্ত স্থানেও সাগরের জল অতিশয় লবণময়, কিন্তু এখানে যেন লবণের ভাগ অধিকতম বলিয়া বোধ হয়। আমরা কিছুক্ষণ পর্যন্ত এই সুপরিষ্কৃত স্থানে বসিয়া মহাসাগরের চিত্তানন্দদায়িনী শোভা-সন্দর্শন করিতে লাগিলাম; পাণ্ডবের পরামর্শ বা উপদেশ অনুসারে রাজীদের মধ্যে কেহ কেহ ভগবান জীরাচন্দ্রের পুজার নিযুক্ত হইয়া গেল।

ইত্যবসরে শুভরাত্রি দেশীয় রাজীদের সঙ্গিনী, নবদ্বীপ জেলাবাসিনী একবৃদ্ধা বাকালী বৈষ্ণবী কৃতিবাসের রামায়ণ খুলিয়া অতি মধুর স্বরে গান করিতে করিতে পড়িতে লাগিল—

উভয়েতে চুল বাঁধে বস্ত্র পরে টেনে ।
দক্ষিণেতে বসিলেন সাগর বন্ধনে ॥
কোটা কোটা সেনাপতি বৈসে নলপাশে ।
ছুঁইতে পাথর নল মলিলেতে ভাসে ।
পাথর পাথরোপরি করিয়া বিস্তারি ।
তাহার উপর পাড়ে পার্শ্বতীয় কাঁশ ।
রাখিল পাথর গাছ সাগরের কূলে ।
বড় বড় বাঁশ সে উপাড়ে ভালে মূলে ।
সেহাড়া কেহাড়া হরিতকী ও আমলা ।
পার্শ্বকীয় গাছ আনে সারঙ্গ কমলা ।
বকুল দীর্ঘল গাছ পিরাল তমাল ।
ধর্জুর ত্রিফল আনে রসাল কাঁঠাল ।
যত যত সেই বনে পাইল দীর্ঘল ।
আনে তাল তেঁতুল শুবাক নারিকেল ।
পৃথিবীর গাছ আনে নাম লব কত ।
গাছেতে ডাকিল সাগরের জল যত ।
সুগ্রীব অঙ্গদ ছিল পর্ত উপরে ।
সর্বস্ব ভাঙ্গিয়া ফেলে সাগরের নীরে ।
বড় গাছ আনে আর বড় বড় গোড়া ।
কোটা কোটা পর্ত হইল নেড়া মুড়া ।
আনিয়া পাথর গাছ করিল সঞ্চয় ।
স্বর্ণের পর্ত আনে শুদ্ধ স্বর্ণময় ।
বাছিয়া পাথর গাছ, আনে যুখে যুখে ।
সবে আনি দেয় নল বানরের হাতে ।
আড়ে দশ যোজন বাঁধিল রত্নাকর ।
দীর্ঘ শত যোজন বাঁধিল দৃঢ়তর ॥

সেই বৃদ্ধা ভক্তা বাকালী রমণীর স্নমধুর কণ্ঠস্বরে রাজীদল, পাণ্ডা ও মাধিগণ অবাক হইয়া বসিয়া গেল। বাহা হউক, আমরা ধনুস্ব-

তীর্থ হইতে নৌকা যোগে অনেক রাজ্যে পুনরায় রামেশ্বর তীর্থে আসিয়া পৌঁছিয়াম।

পর দিবস আমি রামেশ্বর তীর্থের পুরা-বৃত্ত-তত্ত্ব সংগ্রহে নিমগ্ন হইলাম। এখানে কঠিন ব্যাপারে হাত পড়িল। সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থের স্রব্ধ মন্দির দর্শন করিয়া পাঠকের মনোমধ্যে সহসা এক প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, তাহা এই, মন্দির কত প্রাচীন? ইহা কাহার দ্বারা নির্মিত এবং কোন সময়ে ইহা নির্মিত হয়? ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মাহুরা নগরীতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মনিচী (ভগবতী) দেবীর আরাধনা করেন, তথায় আরাধনাদি সমাপন করিয়া রামনাদ রাজ্য অতিক্রমপূর্বক স্রব্ধ সমুদ্র ভাটে উপস্থিত হইলেন। সেতুবন্ধন সঙ্কল্পে মহাসাগর-কূলের যে স্থলে উপবেশন পূর্বক রঘুপতি শ্রীরাম দেবাদিদেব কৈলাস-পতি মহাদেবের পূজা করিয়াছিলেন, এই সেই প্রাচীন ও পবিত্র স্থান। ভগবতী-পতি শিবকে শ্রীরামচন্দ্র “ঈশ্বর” বোধে পূজা করেন বলিয়া, এই তীর্থের “রামেশ্বর” নাম হইয়াছে। তখন এ স্থান পর্বত প্রমাণ বালুকা রাশি, উপল খণ্ড, প্রস্তর ও অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। সেতুবন্ধন হইবার পরে মহাসাগর পার হইয়া রামচন্দ্র এবং তাঁহার সেনাগণ ও সম্প্রদায়-ভুক্ত লোকবল অপার পারে গমন করিবার বহু বৎসর পরবর্তী সময় পর্যন্ত এই স্থান রামের শিবারাধনা বা তপস্যার স্থান বলিয়া সুপরিচিত ছিল। এইরূপে অনেক কাল গত হইলে পর, রামনা-দের শ্রীরাজ ভৈরবহৃৎ নামক নরপতির গুরু যোগীবার নিরলু কঙ্কন নামক ব্যক্তির উপ-দেশ, পশ্চাদ্ভ্রম ও অজরোধ মতে ঐ স্থানে রাজা ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করেন। এই সময়ে

অরণ্যের কিয়দংশ কৃষ্ণিত হয় এবং পথ প্রস্তুত হইয়া যায়। ক্রমে ক্রমে ছোট ছোট ও বড় বড় পাথর হটাইয়া, গাছ কাটিয়া, এই স্থানকে একটা ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত করা হয়। তদনন্তর রমানাথপুর রামনাদ রাজ্যের অধিপতি কীর্ত্তিকর নামক বুদ্ধিমান ও ভক্ত পুরুষ অত্যন্ত প্রবল ও দিগ্বিজয়ী বীর এবং ধনবান হইয়া উঠিলে, রামনাদের মহোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঐ রামেশ্বরের মন্দিরের উন্নতি হইতে আরম্ভ হয় এবং ঐ রাজ্যের সময় হইতে পর-বর্তী তিন জন রাজ্যের সময় পর্যন্ত এই স্রব্ধ মন্দির নির্মিত হইয়া উঠে। কালক্রমে সমুদ্র রামনাদ রাজ্যের অসাধারণ উন্নতি সংঘটিত হয়। পাঠকদিগের অবশ্য জানা আছে, যিশুখ্রীষ্ট জন্ম গ্রহণ করিবার প্রায় পঞ্চাশত বৎসর পূর্বে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব স্বয়ং ভারতমহাসাগর পার হইয়া লঙ্কা গমন করিয়া ছিলেন, তাঁহার অন্তর্ধানের প্রায় দুই শত বাষট্টি বর্ষকাল পরে বৌদ্ধ-প্রচারকেরা ধর্ম-প্রচার উদ্দেশে লঙ্কায় প্রথম উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা রামনাদের পথ দিয়াই সিংহলে গিয়া-ছিলেন। তখনও রামেশ্বরের মন্দির বর্তমান ছিল। বুদ্ধদেব স্বয়ং এই মন্দির দেখিয়াছিলেন কিনা, তাহার প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু ঐ প্রচারকেরা ঐ মন্দির দেখিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। যদি ইহা স্বীকার করা যায় যে, ঐ সময়ের কিছু পূর্বে ঐ মন্দির নির্মিত হইয়াছিল, তাহা হইলেও রামেশ্বরের মন্দি-রকে দুই সহস্র তিন শত বৎসরের পূর্ববর্তী কালের প্রাচীন বলিয়া গণ্য করিতে হয়। কিন্তু রামনাদের পূর্বোক্ত শ্রীরাজ ভৈরবহৃৎ নরপতির রাজত্বকাল ইহা অপেক্ষাও প্রাচীন। তাহার পরে আর একটা প্রমাণ প্রমাণ এই যে, মাহুরা নগরীর ভগবতী

মন্দির তিন সহস্র বৎসরের নূন কালের বলিয়া কেহ ভাবেন না; রামেশ্বরের মন্দির যে সকল রাজার সহায়তায় নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল, মাদুরানগরীর তগবতী মন্দির তাঁহাদেরই সাহায্য লাভ করিয়াছিল। মাদুরা তখন প্রবল খরাকান্ত, অসভ্য, ধনবান, শিক্ষিত এবং স্বাধীন হিন্দুরাজার রাজধানী ছিল।

ইংরেজরাও লিখিয়াছেন "Madura is one of the most ancient and celebrated cities in Ancient India." (Pictorial Tour Round India. 1898, Page 88. C. L. S. I. Madras. By J. Murdoch) অর্থাৎ প্রাচীন ভারতে মাদুরা নগরী অত্যন্ত প্রসিদ্ধা ছিল। ইহা অতীব প্রাচীন। "Madura is the Athens of South India." (India Past and Present, Trubner and Co. 1892) অর্থাৎ প্রাচীন কালে সমগ্র ইউরোপের মধ্যে এথেন্স নগর যেমন অসংখ্য দেব দেবীর মন্দিরের সম্মিলিত বিখ্যাত ছিল, দক্ষিণ ভারতে বর্তমান মাদুরা নগরী ঠিক তাই। মর্ডক সাহেব লিখিয়াছেন, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে পাক্ষা বংশীয় রাজারা মাদুরায় রাজত্ব করিতেন। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজত্ব চলিয়াছিল। শেব রাজা স্থলর পাক্ষা, জৈনদিগকে বিতাড়িত করিয়া চোলরা রাজ্যে অধিকার করেন, কিন্তু পরিশেষে তিনি উত্তর দিক হইতে আগত কোন আক্রমণকারীর হস্তে পতিত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে বিজয় নগর রাজ্যের ইহা অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বিখ্যাত নামে একব্যক্তি শাসনকর্তা পদে বসিত হইলেন। ইহার অধীনে ৭২ জন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ছিল, ইহাদের বংশধরগণ পালিগার,

পলয়করণ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিরুমল নামক নরপতি মাদুরা নগরীকে ধন, বিদ্যা, সভ্যতা, প্রভৃতি, রমণীয় মন্দির, প্রাসাদ প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ করেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে মাদুরা রাজ্য চান্দা সাহেবের হস্তগত হয় এবং ১৮০১ অব্দে কর্ণাটের নবাব এই রাজ্য ইংরাজ কোম্পানীকে সমর্পণ করেন। প্রাচীন মাদুরা নগরীর সংলগ্ন বিদ্যালয় (সাহেবদের মতেও) তুতুল অতুল ছিল। ইহা সেকালের বিশ্ববিদ্যালয়। তিরুবল্লভবর নামক শূদ্র আচার্য্য এই বিদ্যালয়ের অসাধারণ অধ্যাপক ছিলেন। দ্বিষ্মজয়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত এই আচার্য্যকে পরাজিত করিতে পারিতেন না। যাহা হউক, ইহাতে বুঝা গেল, মাদুরা খুব প্রাচীন; বুদ্ধদেবের সময় হইতেও পাক্ষাবংশ প্রাচীনতর। * এই বংশের নরপতিগণের সহায়তায় মাদুরা মন্দির ও রামেশ্বর মন্দির নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। তাহা হইলে রামেশ্বর মন্দিরকে প্রায় তিন সহস্র বৎসরের সমসাময়িক বলিতে পারা যায়। রমানাদ বা রমানাথপুরের প্রাচীন রাজারা মারাবার জাতীয় ছিল। আদি রাজাগণ অর্দ্ধ সভ্য বনারাজা বা সর্দার নামে ছিলেন। ইংরেজেরা লিখিয়াছেন,— "The Chief of Ramnad was the head of the Maraver or thief case." (Native states of India By J.

* মহাভারতের সভাপর্ব্বাভ্যন্তরিত দ্বিষ্মজ পর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, সহদেব দক্ষিণ দিকে দ্বিষ্মজগে গমন করিয়া পাক্ষা প্রভৃতি জাতিগণকে ধলন পূর্ব্বক কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শ্রীমৎভাগবতে লিখিত আছে, রাজা ভরত দ্বিষ্মজ করিতে গিয়া পাক্ষা প্রভৃতি জাতিকে ধলন করেন এবং অনেককে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিনষ্ট করেন। তাহা হইলে পাক্ষাগণক অতি পুরাতন জাতি কহা আবশ্যক। লেখক।

Murdoch, 1897. Madras C. L. S. Page 85.)

শিবপুরাণ, জামসইহিতার ৩৮ অধ্যায়ে কতিপয় স্থপ্রসিদ্ধ শিব মন্দিরের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে সেতুবন্ধের রামেশ্বর বিশেষ বিখ্যাত । সৌরাষ্ট্রে সোমনাথকুণ্ডে ঐশৈল্যে মল্লিকাঙ্কনম্ । উজ্জয়িনীতে মহাকাল মোক্ষার পরমেশ্বরম্ । কেদারং হিমবৎ পৃষ্ঠে ডাকিনীভাং ভীমশঙ্করম্ । বারাগনীতং বিশেষং ত্র্যম্বকং গৌতমী তটে । বৈদ্যানাথং চিত্রভূমী নাগেশং দাক্ষক্য বনে । সেতুবন্ধে চ রামেশং যুগ্মেশং শিবালয়ে । ষাট্টৈতানি নামানি প্রাকৃত্যায় যঃ পঠেৎ । ইত্যাদি ।

অর্থাৎ সৌরাষ্ট্রে দেশে সোমনাথ, ঐশৈল্যে মল্লিকাঙ্কন, উজ্জয়িনীতে মহাকাল এবং ওঙ্কার, হিমালয়ে কেদার, ডাকিনীপুর্বে ভীম-শঙ্কর, বারাগনীতে বিশেষ্বর, গৌতমী তটে ত্র্যম্বক, চিত্রভূমিতে বৈদ্যানাথ, দাক্ষক্য বনে নাগেশ, সেতুবন্ধে রামেশ্বর এবং শিবালয়ে যুগ্মেশ, এই বারটী প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ । চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ, উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর এবং তাড়কেশ্বরের মহাদেবও প্রাচীন শাস্ত্রে রীতিমত উল্লিখিত আছেন । সৌরাষ্ট্রে গুজরাট প্রদেশে ; শ্রীশৈল্য কুম্ভানদীর তীরে (দাক্ষিণাত্যে) ; নন্দাদী তটে (মধ্য ভারতে) ওঙ্কারনাথ ; রাজমহেন্দ্রী প্রদেশে ডাকিনীপুর্, নাসিক (পঞ্চবটী) তীরে ত্র্যম্বক, নাগেশ লিঙ্গ দাক্ষক্যবনে (অর্থাৎ প্রাচীন নাগর কোয়েল নগরে, ইহা জিবাকুর রাষ্ট্রের অন্তর্গত এবং কঙ্কাকুমারীক। হইতে হই কোণ দূরবর্তী ।

“পশ্চিম সাগরে তস্য বনং সর্বদমযুক্তিমং ।”

৫৭ অধ্যায়, ১৭ শ্লোক, শিবপুরাণ ।

• “শিবালয় নামক স্থান বর্তমান Ellora Caves অর্থাৎ দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ রাষ্ট্রের

অন্তর্গত ইলোরা পর্বত । মুহূর্ত-বার্ত্তাও গ্রন্থের শেষভাগে লিখিত আছে,—

শ্রীমৎ কৌশিক পাবনো হরিপদ স্বদ্বার্পিতান্মা হরিস্তজ্জো'নন্ত ইলাসুরোচস্তগো নারায়ণস্তং

খ্যাতং দেবগিরেঃ শিবালয় মূদক তস্মাদ্ধনক্, টাপর গ্রামস্তদ্বসতি মুহূর্ত ভুবনোদ্যাত্তং

মত্ৰা করোৎ ॥

অর্থাৎ হরিপদ স্বরে-অর্পিতান্মা কৌশিক পাবন শ্রীমান হরি, তাঁহার পুত্র অনন্ত ব্রাহ্মণো-চিত গুণে ভূষিত, তাঁহার পুত্র নারায়ণ । দেবগিরির উত্তরে বিখ্যাত শিবালয়, তাহার উত্তরে টাপর গ্রাম ; নারায়ণ টাপরে বাস করিয়া মুহূর্ত ভুবনোদ্যাত্তও গ্রন্থ রচনা করেন । আরজাবাদ প্রদেশে টাপর গ্রাম এখনও বর্তমান । এককালে ইহা স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের অধীনস্থ ছিল, এক্ষণে হায়দ্রাবাদের নিজামের অধিকার ভুক্ত । “পুরাণ প্রসিদ্ধম্ শিবালয়ম্ ধুগুণেশ শিবালয়ম্ ইতি প্রসিদ্ধম্ জ্যোতির্লিঙ্গ স্থানম্ অস্তি ।”

উপরে যে সকল শিবলিঙ্গ ও শিবমন্দিরের কথা লিখিত হইয়াছে, শোভা, সমৃদ্ধি, সৌরভ, গৌরব, বিশালতা ও প্রাচীনত্বে রামেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা কোনটাই শ্রেষ্ঠতর নহে, ইহা নিশ্চয় ।

“শিবস্বরূপ সংহিতা” নামক প্রাচীন সং-হিতার রামেশ্বরের উল্লেখ দেখা যায় । হস্ত-লিখিত পুরাতন পুঁথি হইতে কতকগুলি শ্লোক উঠাইয়া দিলাম । এই পুঁথি সেতুবন্ধ রামেশ্বরের মন্দিরে দেখিয়াছি ।

বাহ্যরূপে মহেশানি নানারূপধরো'হং ।
কৈলাসে জ্যোতিরূপেন কৈলাসেশ্বর সংজ্ঞকঃ ।
হিমালয়ে মহেশানি পার্শ্বতী প্রাপবল্লভঃ ।
কান্ধাং বিশেষ্বরশ্চৈব বাণেশ্বর তথৈবচ ।

শঙ্কুনাথশঙ্কুনাথশঙ্কুনাথের পর্কতে ।
 আদিনাথঃ সিদ্ধুতীরে কামরূপে বৃষধ্বজঃ ।
 নৈপালেচ পশুপতিঃ কেদারে পাবকেশ্বরঃ ।
 হিঙ্গুলিয়াং রূপানাথো রূপনাথস্তথোক্তঃ ।
 দ্বারকায়াং হরৈশ্চৈব পুষ্করে প্রমথেশ্বরঃ ।
 হরিদ্বারে মহেশানি গঙ্গাধর ইতি স্মৃতঃ ।
 কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবেশো দ্বন্দ্বারণ্যে চৈকেশ্বরঃ
 গোপালে গোপীভিঃপূজ্যো গোপেশ্বর ইতীরিতঃ
 মথুরায়াং কংসনাথো মিথিলায়াং ধর্মধরঃ
 অযোধ্যায়াং কুন্তিবাসঃ কাম্বীরে কপিলেশ্বরঃ
 কাশী নগর মধ্যে তুঁ মল্লম ত্রিপুরেশ্বর ।
 চিত্রকুটে চন্দ্রচূড়ো যোগীন্দ্রো বিদ্যাপর্কতে ।
 বাণলিঙ্গো নন্দনায়াং প্রভাসে শূলভং সদা ।
 ভোজপুরে ভোজনাতো গঙ্গারাক্ষ গঙ্গাধরঃ ।
 ঝাড়খণ্ডে বৈষ্ণবাতো বক্রেশ্বর তুথৈবচ ।
 বীরভূমৌ সিদ্ধিনাতো রাঢ়ে চৈতরকেশ্বরঃ ।
 ঘণ্টে পরশু দেবেশি রত্নাকর নদীতটে ।
 ভাগীরথী নদীতীরে কপালেশ্বর ঈরীতঃ ।
 ভদ্রেশ্বরশ্চ কংবেশি কল্যাণেশ্বর এবহি ।
 নকুলেশঃ কালীঘাটে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ ।
 অহং কোচধুপুরে জলেশ্বর ইতিস্মৃতঃ
 উৎকলে বিরজা ক্ষেত্রে জগন্নাথো হৃৎকলৌ ।
 লীলাচলারণ্য মধ্যে ভুবনেশ্বর ঈরিতঃ ।
 রামেশ্বরঃ সেতুবন্ধে লক্ষ্মায়াং রাধণেশ্বরঃ ।

অতঃপর আমি সুপবিত্র রামেশ্বর তীর্থ-
 পরিভ্রমণ করিয়া অস্ত্রত গমন করিবার জন্ত
 পাণ্ডাকে সম্বাদ দিলাম, পাণ্ডা কহিলেন,
 “রাজিবে রেলগাড়ীতে যাইতে পারেন, অসু-

‘বিধা হইনে না’; কিন্তু ঐ রাজ্যে ভ্রমণক
 শিলাবৃষ্টি ও ঝড় হওয়ার যাত্রা বন্ধ রহিল ।
 পর দিবস প্রাতঃকালে তবম ঘটিকার
 গাড়ীতে আরোহণ করিবার জন্ত ষ্টেশনা-
 ভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম । পথে দলে
 দলে যাত্রীরা যাইতে লাগিল । রামেশ্বর
 মন্দির হইতে ষ্টেশন পর্যন্ত সমুদয় পথ নর
 নারীর কণ্ঠ নিঃসৃত “জয় রাম জয় রাম”
 উচ্চরবে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল । বাস্পীয়
 শকটেও ঐ ধ্বনি অতি উচ্চ আকার ধারণ
 করিয়া দিকদিগন্ত আঘোদিত করিতে
 লাগিল । যে অসাধারণ বুদ্ধি ও সানর্থ্যশালী
 ইংরাজ বাহাদুরের রূপায় এই রেলপথ প্রস্তুত
 হইয়া অসংখ্যাসংখ্য ভক্ত হিন্দুকে সহজে ও
 নিরাপদে রামেশ্বর ক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়া
 দিতেছে এবং যে পরমারাধ্য পরম পূজনীয়
 পরমেশ্বরের চিরপবিত্র পদারবিন্দের রূপায়
 এই সুদূর সাগর তটে আসিয়াও আনন্দে
 দিধানিশি যাপন করিয়াছি, তাহাদিগকে
 ভক্তিভাবে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া প্রণামপূর্বক
 রেলওয়ে গাড়ীতে আরোহণ করিলাম ।
 আসল কথা এই, মানবের আত্মায় যিনি রমণ
 করেন, তিনিই প্রকৃত রাম । এই মহা সুখ-
 কর ও শুভকর রাম নাম জপিতে জপিতে,
 ভজিতে ভজিতে, স্মরণ ও উচ্চারণ করিতে
 করিতে যদি ভবসিন্ধু পার হইতে পারি,
 তাহা হইলেই মানব জীবন সার্থক হয়;
 নতুবা মনুষ্য জীবন অসার ও বৃথা, বৃথা এবং
 বৃথা ।

শ্রীধর্মানন্দ মহাভারতী ।

হিন্দুর অভিব্যক্তিবাদ ।

(সমুদ্র-মন্ডন, অবতার-তত্ত্ব ও কৰ্ম্মবাদ)

হিন্দুদিগের পৌরাণিক ও দার্শনিক সাহিত্যে যে একটি সুগঠিত অভিব্যক্তিবাদ পরিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদের সন্নিবেশ দাঁড়াইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। সমুদ্রমন্ডন, অবতারতত্ত্ব ও কৰ্ম্মবাদ, এই তিনটি পর্যায়ে হিন্দুর অভিব্যক্তিবাদ বিভক্ত হইয়াছে। যথাক্রমে আমরা তাহার পর্য্যালোচনা করিব।

সমুদ্রমন্ডন হিন্দুদিগের অতি সুন্দর একটি পৌরাণিক আখ্যান। বৈদিক কি পৌরাণিক, অনেক আখ্যানেরই অস্বরূপ বা রূপান্তরিত আখ্যান ভিন্নজাতির ধর্মসাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু সমুদ্রমন্ডন উপাখ্যান-টার এবিধ সাদৃশ্য অপর কোনও জাতির সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। এইটিকে সম্পূর্ণরূপে হিন্দুরই মৌলিক-সৃষ্টি বলিয়া আমাদের স্পর্শ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ইহার সম্বন্ধে সৃষ্টিতত্ত্বের প্রয়োগ করিতে বুঝিতে হইবে না যে, এই বিষয়টিকে আমরা কবির মনোহর করণা চিত্র বলিয়াই গর্ব করিবার কথা বলিতেছি। কিন্তু ইহার মধ্যে আধ্যাতিকতার যে গভীর অভিনব রূপ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমরা স্পর্শ করিবার কথা বলিয়াছি। সেই আধ্যাতিকতার স্রোতস্বতীতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে আমরা সমুদ্রমন্ডন উপাখ্যানটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি :—

“দেবাসুরের মধ্যে পরস্পর কলহ উপস্থিত হওয়াতে দেবগণ বিষ্ণুর শরণাগত হন—বিষ্ণু

তাহাদিগকে অসুরদিগের সহিত একযোগে হইয়া অমৃতলাভার্থ সমুদ্রমন্ডন করিতে উপদেশ দেন এবং আশ্বাস দেন যে, মন্বনোৎপন্ন অমৃত যাহাতে অসুরেরা না পাইয়া তাঁহারা পান, তিনি তাহাই করিবেন ও সেই অমৃত পান করিয়া অমর হইয়াই তাঁহারা অসুর-বিজয়ী হইবেন। দেবগণ বিষ্ণুর এই প্রস্তাবে অসুরদিগকে সম্মত করিয়া বিষ্ণুরদ্বারা অধিষ্ঠিত মন্দর পর্বতকে মন্ডনদণ্ড-বিষ্ণুর অবতার রূপকে দণ্ডাধিষ্ঠান—অনন্তকে মন্ডনরজ্জু করিয়া তাহা একদিকে অসুরদিগের দ্বারা ও অপরদিকে আপনাদিগের দ্বারা আকৃষ্ট করতঃ বিপুল ক্ষীরোদার্ণব মন্ডন করিতে আরম্ভ করেন। সেই মন্ডনের দ্বারা শম্ব, ঐরাবত, উকৈঃশ্রবা, সুরতি, পারিজাত, অম্বর, চন্দ্র, সুরা, লক্ষ্মী, ধনুঃ, কোস্তভমনি, হলাহলবিষ, অমৃতসহ ধনুস্তরি প্রভৃতি সমুদ্র হইতে উথিত হয়।

এইস্থলে সমুদ্রের নাম ও মন্বনোৎপন্ন বস্ত্র-জাত আমাদের বিশেষ লক্ষ্য। আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, ক্ষীরোদ-সমুদ্র মথিত হইয়াছিল। এই ক্ষীরোদ-সমুদ্রদ্বারা আমরা কোন সমুদ্র বুঝিব, তাহাই প্রথমতঃ আমাদের আলোচ্য হওয়া উচিত। হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাই, বিশ্বপ্রলয়ের পর সৃষ্টির প্রারম্ভে, ভগবান্ ক্ষীরোদ-সমুদ্রশায়ী হইয়া একমাত্র বিশ্বসত্তারূপে বিরাজিত ছিলেন। সূত্রমতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, এই ক্ষীরোদ-সমুদ্র আমাদের পৃথিবীস্থ সমুদ্র নহে, ইহা বিশ্বব্যাপী

সমুদ্র এবং ইহা আমাদের পৃথিবী সমুদ্রের
ভার বনজলময় সমুদ্র 'নহে, কিন্তু অতীত লবু
জলীয় দ্রবময় সমুদ্র। এই লবুজলীয়-দ্রব্য
অতীত স্বচ্ছ বাষ্প বহি আর কিছুই নহে।
ঋষেদের অনেকস্থলেই বাষ্পব্যাপ্ত আকাশ
সমুদ্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে।* বাষ্পাচ্ছন্ন
আকাশের প্রদেশবিশেষকে সংস্কৃতভাষায়
ছায়াপথ 'স্বর্গপথ' (আকাশপথ) প্রভৃতি
নাম দেওয়া হইয়াছে, ইংরেজিতে ইহাকে
milky way বলে। গ্রীকভাষায় Galaxy
শব্দেরও দ্ব্যর্থ ইচ্ছাই। এই milky way
দুগ্ধধবল (আকাশ পথ) কথাটা আমাদের
ক্ষীরোদ কথাটির অতি পরিষ্কার রূপে মর্ম-
জ্ঞাপক। অতএব অসীম বাষ্পরাশি পরিপূর্ণ
অনন্ত আকাশকেই যে হিন্দুরা ক্ষীরোদার্ণব
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এতক্ষণে
আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

আমাদের প্রাগুক্ত আলোচনা দ্বারা
সমুদ্র মন্বনের দৃশ্য পৃথিবী হইতে আকাশে
স্থাপিত হইতেছে। সুতরাং এক্ষণে আমা-
দের বুঝিতে হইতেছে যে, আকাশের বাষ্প
সমুদ্রই মণ্ডিত হইয়াছিল। সেই বাষ্পসমুদ্র
হইতে কিরূপে পূর্ববর্ণিত বস্তু সকল উদ্ভূত
হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য। পুৰোক্ত
সকল বস্তুই অলৌকিক স্বরূপ বিশিষ্ট বলিয়া
বর্ণিত আছে। সুতরাং পার্থিব সমুদ্র অপেক্ষা
স্বর্গীয় সমুদ্রের সাহিতই ইহাদের সম্বন্ধ স্বাভা-
বিক। একটু অনুধাবন করিলেই প্রাগুক্ত
মন্বন-সমুদ্র অলৌকিক বস্তু সকলে পার্থিব
রূপের স্বরূপ নিহিত রহিয়াছে, পরিদৃষ্ট

হইবে। ঋষিদিগের কারুনামুসঙ্গিত্সা একুপ
দূরপ্রসারিণী ও অন্তস্তলাবগাহিনী ছিল যে,
কোন বিষয়েই শেৰ্ষসাধা পূর্ণ্যন্ত না দেখিয়া
তাহার নিবৃত্তি হইত না। সুতরাং পৃথিবীতে
বস্তু সকলের কেবল গোপকরণই উপলব্ধি
হইতে পারে, মুখ্য কারণ উপলব্ধি হইতে
পারে না দেখিয়া মহর্ষিগণ স্বর্গের সহিত
তাহাদের সংযোগ বিধান করিয়া তাহাদের
মুখ্য কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন। সমুদ্র-
মন্বন সমস্ত কারণের মীন-রহস্য—মন্বন-
সমুদ্র সমস্ত বস্তু ব্যক্তরূপে স্বতঃপ্রসূত, সুতরাং
ইহার তত্ত্বঃ অনাদি হইয়া পার্থিব সমস্ত
বস্তুর আদিক্রম। পৃথিবীর রূপ বিকাশের
আদর্শ মহর্ষিগণ এই আদিক্রমে দেখিতে
পাইয়াছিলেন। সমুদ্র-সমুদ্র চতুর্দশটি বস্তু
চতুর্দশ রত্ননামে অভিহিত হইয়াছে। রত্ন
শব্দের অর্থ স্বজাতি শ্রেষ্ঠ বস্তু—“জাতৌ
জাতৌ যদ্বৎকষ্টং তদ্রত্নমিহ কথ্যতে।” সুতরাং
ইহার যে আদর্শ, তাহা এই রত্নশব্দ দ্বারাই
প্রতিপন্ন হইতেছে। পৃথিবীতে কি প্রকারে
এই আদর্শের প্রতিবর্ণ্য প্রতিলিপি হইয়াছে,
তাহাই আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব।

সমুদ্র-মন্বনে শব্দের উৎপত্তি হয়, এই
শব্দই জীবের প্রথম প্রকৃষ্ট পরিণাম। পৃথি-
বীর প্রথমস্তর শব্দক ও শব্দজাতীয় জীবের
দ্বারাই গঠিত, দেখা যায়। তৎপর পৃথিবীর
স্তরে হস্তি জাতীয় স্মৃতিকায় পশুর কঙ্কাল
পাওয়া যায়। কেবল তাহাই নহে, বিশ্বয়ের
বিষয় এই যে, পুরাণ-বর্ণিত ঐরাবতের লক্ষণ-
বিশিষ্ট চতুর্দশ মাঠোডন জাতীয় হস্তীর
কঙ্কালই পৃথিবী স্তরে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।
ইহারা যে জগৎচর ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।
সমুদ্র-মন্বনোদ্ভূত যে ঐরাবত ইহাদের আদি
পুরুষ, সেই ঐরাবত নামের যোগার্থই 'সমুদ্র-

* ১ম মণ্ডলের ৪৭ ও ৫৫ সূক্তের সাধারণার্থ্য
ঐষ্টব্য। ঐজুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের বর্ণনামুসারে ১ম
মণ্ডলের ১১০ সূক্তের ৮ম বকের পাদটীকা ঐষ্টব্য।
১-ম মণ্ডলের ১০ সূক্তের ১২ম বক ঐষ্টব্য।

জাত—কারণ ইহা * শব্দের অর্থ জল ও ইরাবৎ শব্দের অর্থ সমুদ্র। তাহা হইতে জাত অর্থে 'ঐরাবত' শব্দ সিন্ধু হয়। জলহস্তী নামক হস্তি সদৃশ + পশুজাতির নাম ও বিশেষ রূপে পূর্বোক্ত ভিত্তিই প্রমাণিত করে। পৃথিবীর অস্থ সকল উচ্চৈঃপ্রবাহই বংশধর, ইহারাও যে প্রথমে জলচর-সমুদ্র-জীব ছিল, তাহা ঘোটকের 'সৈন্ধব' † নাম হইতেই প্রমাণিত হয়। 'সিন্ধু ঘোটক' নামক জল-জন্তু বিশেষের নামও অতীতের প্রমাণ রূপে গৃহীত হইতে পারে। 'সুরভি' পৃথিবীর গোজাতির জননী। গো শব্দের এক অর্থ জল § হইতে অনেক নাইত গোজাতির সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছে। পশু জাতির মধ্যে গোজাতির দুইই মাতৃস্তন্যের তুল্য গুণ বিশিষ্ট ও অল্প সর্ক দ্রব্যাপেক্ষা অধিক শরীর রক্ষোপাযোগী। যজ্ঞ কার্যেরও গাভীই প্রধান সহায়—সুতরাং তিনি হবিধানী। তদীয় হবির দ্বারা দেবতাদিগের প্রতিনিধি অগ্নি পূজিত ও তৃপ্ত হন বলিয়া তিনি দেবলোকেরও পোষণকারিণী। মনুষ্যের উৎকৃষ্ট পুষ্টি ও দেবতাদিগের বিশেষ তৃষ্টি সম্পাদন করিয়া তিনি 'কাম-দুগা' হইয়াছেন। পশুদিগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে উদ্ভিজ্জাদির উদ্ভব হইয়াছিল। তাহাদেরই সর্বোৎকৃষ্ট পরিণাম রূপে 'পারিজাত' উদ্ভূত হইয়াছে। "পারিজাত" শব্দের যোগার্থ (পারি (সমুদ্র + জাত)। ইহাতেই ইহার সমুদ্র হইতে উৎপত্তি প্রমাণিত হয়।

* "ইরা ভুবাক্ হরাপ্ স্যাব" ইত্যমরঃ।

† রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড সমুদ্রে সেতুবন্ধন দ্রষ্টব্য।

‡ "বান্ধি বাহার্শ্ব গন্ধর্ব্ব হয় সৈন্ধব সপ্তরঃ।

§ "সর্গে পশুবাধস্ত দিগেহে ঘৃণীভূজলে লক্ষণ দৃষ্টা ব্রিহাং পুংসিগোঃ।" ইত্যমরঃ।

বৃক্ষের কল্লের দ্বারা আহার, বকলের দ্বারা বস্ত্র, শাখাদ্বারা বাস, কাঁঠের দ্বারা গৃহনিৰ্মাণ ও অগ্নিপ্রজ্জ্বলন, পুষ্পের দ্বারা অলঙ্করণ ও চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি সর্কবিধ প্রয়োজন নিম্পাদিত হওয়ার প্রথমজাত পারিজাত বৃক্ষ 'করতক' হইয়াছে। অম্বরসগণ, বোধ হয়, Mermaid (জলনারী) নামক যে একপ্রকার অর্দ্ধনর-কৃতি জলজীবের কথা শুনা যায়, তাহাদেরই প্রতিক্রম। অম্বরস নামই জলে ইহাদের বাসের কথা প্রকাশ করে। এই অম্বরস-গণের সহিত মনুষ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। অনেকে শাপভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অনেকের আবার জীবদিগের, কি রাজাদিগের সহিত সম্বাসে মনুষ্য-সন্তান জন্মিয়াছে, যথা মেনকা, রম্ভা, উর্কী প্রভৃতি। এই সমস্ত কারণে মনে করা যাইতে পারে যে, মনুষ্যজাতির উৎপত্তি মূলে এই অম্বরসদিগের বোগ রহিয়াছে। Mermaid নামক যে জল-মানুষ্যের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের সহিত মনুষ্য-সংসর্গের প্রাচীন ঐতিহাসিক-বৃত্তান্ত Dubois প্রভৃতি পর্যটন-কারাদিগের গ্রন্থে প্রাপ্ত হয়। মহাত্মার্তে ভাষ্যের গঙ্গা হইতে জন্ম পূর্বোক্ত সত্যেরই পৌরাণিক নিদর্শন বলিয়া বোধ হয়। সমুদ্র হইতে লক্ষ্মী পদ্মাধিষ্ঠিতা হইয়া উথিতা হন। ইহার 'হিন্দুরা' 'কনলা', প্রভৃতি নাম যেমন জলের সহিত তাঁহার সম্পর্ক জ্ঞাপন করে, তদ্রূপ জলজ-পুষ্পের সহিতও সম্পর্ক জ্ঞাপন করে। সৃষ্টিতে পুষ্পই সর্কোপেক্ষা অধিক সুন্দর, পদ্ম আবার সকল পুষ্পোপেক্ষা অধিক সৌন্দর্যের আধার। লক্ষ্মী মেই পদ্মাধিষ্ঠাত্রী হওয়াতে বিশ্ব-সৌন্দর্যের স্বরূপিণী হইয়াছেন। তিনিই সৃষ্টির আত্মা প্রকৃতি, তাহাতেই তাঁহার নাম "লোকমাতা" হইয়াছে। পৃথিবীর নারী-

জাতির, সুতরাং মনুষ্যজাতির, তিনিই আদি জননো, সুতরাং তিনি ‘মাস’, পৃথিবীতে জী-প্রকৃতির তিনিই মূলধার। যেখানে বিশেষ সম্পদের বিকাশ হইয়া থাকে, সেখানেই শোভার আবির্ভাব হয়, ইহাই লক্ষ্যীয় পদাশ্রয়। সুতরাং তিনি ভাগ্য-দেবীও হইয়াছেন।

সৃষ্টি-ক্রমে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী মধ্যে চন্দ্রই অগ্রে প্রকটিত হন বলিয়া, তিনিই সমুদ্র হইতে উৎপত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যখন সমস্ত বিশ্বই তমো-ভূত ছিল, তখন নক্ষত্র সকলের ক্ষীণ আলোক সেই যোরাঙ্ককার কথঞ্চিৎ উদ্ভাসিত করিতে-ছিল, কালক্রমে চন্দ্র প্রকাশিত হইয়া আপনার উজ্জ্বল আলোক দ্বারা অন্ধকার মধ্যে জ্যোৎস্না আনয়ন করিলেন। তাহাতেই তিনি নক্ষত্র-দিগের প্রধান হইয়া ‘নক্ষত্রেশ’ আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। তাহার আলোকপ্রভাবে পৃথিবীর প্রথমজাত ভূগুণ্যাদির পুষ্টি ও বর্দ্ধন হও-য়াতে তিনি ‘ওষধীশ’ বলিয়াও পরিচিত হই-লেন। মনুষ্যদিগের কালগণনাও তাহারই কলা-হাস বুদ্ধির সাহায্যে নির্বাহিত হইতে লাগিল, তাহারই নামানুসারে কালবাচক ‘মাস’ শব্দ রচিত হইল—‘তিথিরূপ’ কাল পরিমাণও তাহারই দ্বারা নিরূপিত হইল। এমন কি, বৎসরের দ্বাদশ মাসের নামকরণ তদধিশ্রিত নক্ষত্রের দ্বারা হইয়াছে। ঋষি-দিগের যোগাদি ধর্ম্ম কার্য্যেও তিনিই সময়-প্রদ-র্শক হইয়াছেন। তাহাতেই তিনি ‘বিজ্ঞানজ’ এই খ্যাতিও লাভ করিয়াছেন। * তৎপর স্বর্ঘ্য আবির্ভূত হইয়া জীক্স রশ্মি দ্বারা পৃথিবী

জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে নিশ্চিন্ত করিয়া দুরালোক সৃষ্টি করিলেন, এবং তৎসমক্ক হইতে রাজি দিন বিভাগ হইল।

সর্বশেষে ধ্বস্তরি উৎখিত হইয়াছিলেন। তিনি দেবাসুন্দের অক্লান্ত কঠোর পারিশ্রমের পুরস্কার, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠাভিষ্ট অমৃত লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই অমৃতই সৃষ্টির সার পদার্থ। ধ্বস্তরি বিমূর অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সুতরাং তিনিই যে এই অনির্বচনীয় অপরিমিত প্রভাবসম্পন্ন ঐশ্বরিক পদার্থের আশ্রয় হইবেন, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভা-বিক। তিনি স্বৈর্ভদ্যাক্রমে দেবতাদিগকে সজীবনীমুখা প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের আয়ুঃ, স্বাস্থ্য, সুখবিধান করিয়াছিলেন, মর্ত্যে ও সোমরসে অমৃত-গুণ উৎপাদন জন্ত তিনি যজ্ঞে আহুত হইয়াছেন এবং আয়ু-র্ক্সিজ্ঞানেরও প্রবর্তক তিনিই হইয়াছেন।

একুণে আমরা মন্থনোৎপন্ন আরও দুইটি বস্তুর উল্লেখ করিব। তাহার একটি ‘হলাহল’ ও অপরটি ‘সূরা’ বা ‘বারুণী’। প্রথমটা মহা-দেব গ্রহণ করেন ও দ্বিতীয়টি অসুরগণ গ্রহণ করেন। ‘হলাহলটা’ তাঁর বিষ ও সূরা, মত্ত। এই দুইটাই-অনিষ্টকর বস্তু। জগতে ইষ্টানিষ্ট উভয় প্রকার বস্তুই বিদ্যমান, সুতরাং ইহাদিগের উল্লেখের উদ্দেশ্য আছে, বুঝা যায়। মহাদেব সেই উগ্র বিষ পান করিয়া তাহা যে আপনারই প্রকৃতির উপাদান, তাহাই প্রমাণ করিলেন। দেব-প্রকৃতির প্রতিকূল বলিয়া সূরা দেবগণ গ্রহণ করিলেন না—তাঁহা অসু-রগণ গ্রহণ করিলেন।

এই সমুদ্র মন্থনোপাখ্যানে আমরা পৃথি-বীর উপনির্ভর হস্ত এই প্রকারে পাঠ করিতে পারি,—আদিতে পৃথিবী বাষ্পভূতা ছিল, এই বাষ্পরাশি প্রাকৃতিক বেগে আবর্তিত হইলে,

* Particularly as we know that it was the moon who first helped men to reckon time, without which no well-regulated social life was possible.” “Physical Religion by Prof. Maxmüller, P. 99.

একভাগ বিহীন হইয়া চক্ষুরূপে পরিণত হয়, অপর ভাগ ক্রমে বনীবৃত্ত হইলে পৃথিবী জল-ময়ী হইল। শব্দ, শব্দ প্রভৃতি জলপ্রাণী-দ্বারা ক্রমে তৃণের গঠিত হইতে লাগিল। কচ্ছপের উৎপত্তি দ্বারা তৎকাল-গঠিত স্থল-ভাগ বিশেষরূপে উন্নত হইয়া জলোপিত হইল। এই কচ্ছপাঙ্কি-বিরচিত তৃণের উৎকো-খিত হইয়া পর্বতাকারে পরিণত হইলে পূর্বোক্ত জলরাশি ইহারই চতুর্দিকে সবেগে ঘূর্ণিত হইয়া যেন মথিত হইতে লাগিল। এই সময়ে বৃহৎ নাগ-জাতি উৎপন্ন হইয়া পর্বতগাত্রে আশ্রয় লাভ করিল—তাহাকেই নাগ-মহন-রজ্জু বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকিবে। বে-বিষ নির্গত হইয়া প্রাণ নাশ করিতে পারে—সেই কালকূট পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য প্রভাবে বিষধর সর্প প্রভৃতিতে সাম্য করা হইয়াছে, ইহাই মহাদেবের বিষ ভক্ষণ। ক্রমে সেই জল হইতে ঐরাবত (Mammoth) জাতীয় অতিকার পশু সকল উদ্ভূত হইতে লাগিল; অথ জাতীয় উভচর পশু সকলও ইহাদের অমুবর্তী হইল। এই কালে জলজন্তু ও জলজ-পুষ্পাদি উল্লত হইল এবং পর্বতে তৃণ জন্তাদি সজাত হইল। সঙ্গে সঙ্গে গো জাতীয় পশু আসিয়া দেখা দিল। এদিকে অম্পরস জাতিও আবির্ভূত হইল। ইহারাই মনুষ্যের পূর্বতন জাতি। তৎপরই নারী-জাতি ভূতলে আগমন করিল। সৃষ্টির রমণীয় পুষ্পালঙ্কতা হইয়া ইহার লক্ষ্যরই সাক্ষ্য প্রতীকারূপে শোভা পাইতে লাগিলেন—তাহাতেই ইহাদের নাম ‘রমণী’, ‘রানী’, ‘অঙ্গনা’, ‘কাণ্ডা’ হইল। ইহাদের নারী নামই ইহাদের উৎপত্তির দ্বন্দ্ব সাক্ষ্যদান করে। ‘নার’ শব্দ জল-বাচক স্তম্ভরং ‘নারী’ শব্দের ‘জলজাতা’

এই অর্থই বাস্তবিক হয়,—ইহার লক্ষ্য পান্ডিত্য Nereid নামীয় রূপ ও অর্থে তুলনা করিলেও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়।** পৃথিবীতে নারীর বিকাশ প্রথম হয়—ইহাই বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া বোধ হয়। পুরাণে বে লক্ষ্য উৎপত্তির কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাতেও ইহার সমর্থন হয়। পুরুষ রূপে ধনুস্তরির উৎপত্তির পূর্বেই ইহার উৎপত্তি হয়। তাহাকে ‘লোকমাতা’ ‘মা’ বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। নারীও তেমনই নর-লোকমাতা, মনুষ্য জাতির মা। ধর্মবিজ্ঞানেও মাতৃভাবটি ঈশ্বর সত্ত্বকে প্রাথমিক ভাব বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য অভিযুক্তি-বাদের প্রমাণেও পুং জননেন্দ্রিয়ের বিকাশ জ্ঞী জননেন্দ্রিয় বিকাশের পরবর্তী বলিয়া মীমাংসিত হইয়াছে। আদিতে জ্ঞী-পুরুষ-লক্ষণ একত্র সম্মিলিত থাকিয়া জননকার্য্য নির্বাহিত হইত। এই মিশ্র রূপকে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা Hermaphrodite নাম দিয়া-ছেন। নিম্ন জাতীয় ইতর জীবের উদ্ভিচ্ছিন্ন মধ্যে এই মিশ্র রূপ এখনও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই মিশ্র রূপে আবার জ্ঞী চিত্তেরই অধিক প্রকাশ হইয়াছে—তাহা হইতে ক্রমে পুং চিত্তের গঠন হইয়াছে। বিকাশ-ক্রমের উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গেই উভয় লিঙ্গের বৈলক্ষণ্য

* "Nineteenth Century and after" নামক. হুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী মাসিক পত্রের গত এপ্রিল খণ্ডে "Are there men in other Worlds?" নামক প্রবন্ধে Dr. Louis Robinson মনুষ্য বিকাশের আলোচনা প্রসঙ্গে এই সম্বন্ধে যে অপরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—"As the great founder of the evolutionary theory pointed out man still retains in his physical framework, and in the functions of his body, traces not only of gills for obtaining air from water, but also of the regular periodic recurrence of lunar influence, April, 1908."

সংস্কৃতি হইয়াছে। পুরাণের সৃষ্টি প্রক্রিয়ায়ও আমরা আদিত্যে ‘অর্দ্ধ নারীনর’ রূপের উল্লেখ পাই, তাহাই বিভক্ত হইয়া স্বতন্ত্র জ্যোতিষ্ক আকারে পরিণত হয়। যথা—

“সনন্দাদয়ো যেত পূর্বং সৃষ্টাশ্চ বৈধসা।

নতে লোকেষসজ্যাস্ত নিরশেকাঃ প্রজামুতে ॥

সমুৎপন্নস্তদাক্রো মধ্যাহ্নাকী সমগ্রভঃ।

অন্ধনারীনরবপুঃ প্রচণ্ডোহিতি শরীরবান্ ॥

বিভজ্যাহ্নানমিত্যুক্তা তং ব্রহ্মাস্তদধে ততঃ।

তথোক্তোহসৌমিধাজীহ্নং পুরুষং তথাকরোৎ ॥’

শ্রীমদ্র পুরাণ—সৃষ্টি খণ্ড। ‘সনন্দ প্রভৃতি প্রজাপতি কর্তৃক যে সকল মানস পুত্র সৃষ্ট হইয়াছিল—তাহারা সন্তান-স্নাতে উদাসীন হইয়া সমাজে নির্লিপ্তভাবে অবস্থিত রহিগেন; তদর্শনে কোপাবিষ্ট হইলে ব্রহ্মা হইতে অর্দ্ধ নারীনর রক্ত মূর্তি প্রকটিত হইল। তাহাই ব্রহ্মার আদেশে বিভক্ত হইয়া জ্যোতিষ্ক ও পুরুষ আকার ধারণ করিয়াছে।

‘মনি’ সমস্ত জড় পদার্থের শ্রেষ্ঠ—তাহাদেরও শ্রেষ্ঠ কৌস্তভ মণির উৎপত্তি স্থান সমুদ্র, এই বর্ণনা দ্বারা সমস্ত জড় পদার্থেরও আকার যে জল, তাহাই স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। সমুদ্রের নাম “রক্তাকর”ও সেই অর্থ হইয়াছে।

শ্রেয়সী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র রায় তদীয় “রক্ত-পরীক্ষা” নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে ‘বৃহৎ সংহিতার’ মতে ‘আকাশে রক্তোৎপত্তি হয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং আধুনিক বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আকাশ হইতে পৃথিবীতে যে উৎপাত ও বজ্রপাত হয়, তাহাতে ‘হীরক’ আবিষ্কৃত হইয়াছে। (রক্ত পরীক্ষা ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক Sir

William Crookes সম্প্রতি North American Review নামক মাসিক পত্র The Romance of the Diamond (রক্ত-রহস্য) শীর্ষক প্রবন্ধে আকাশ হইতে উৎপাত রূপে সর্বত্র রক্ত বর্ষিত হওয়ার যে মত প্রচলিত আছে, তাহার সমালোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যেমন রাসায়নিক সংযোগে পৃথিবীতে রক্তোৎপত্তি হইতে পারে, তদ্রূপ আকাশ হইতেও উৎপাতের সঙ্গে রক্ত বর্ষণ হইতে পারে—এরিকোনা (Arizona) ও অন্তর উৎপাতে ইহার বিশেষ প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। যথা—But it is certain, from the evidence afforded by the Arizona and other meteorites, that similar conditions have existed among bodies in space, and that on more than one occasion a meteorite freighted with jewels has fallen as a star from the sky. (“Review of Reviews” April, 1908, দ্রষ্টব্য)।

রক্তাদ আবিষ্কার পুরুষদিগের প্রয়োজনই হইয়া থাকিবে—তাহাতেই কৌস্তভ-মণি নারায়ণ গ্রহণ করেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মহুনে ধনুসও উৎপত্তি হয়—আকাশের ইন্দ্রধনুতে আমরা তাহারই রূপ দেখিয়া থাকি। পৃথিবীতে মহুসা, ধনুস আবিষ্কার করিয়াই, হিংস্র জন্তু হইতে প্রথম আত্মরক্ষার সমর্থ হয়। ইহাই পাশ্চাত্য-দিগের Hunting-stage যুগ-যুগ।

পরিণেমে যখন পৃথিবী শীতলা হইয়া ওষধি বন-বৃক্ষাঢ্য হইলেন, তখন আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত হইয়া স্বর্গের অমৃত, রস-রূপে, উদ্ভিজ্জের মধ্যে সঞ্চিত হইল। ঋষিগণ সোমরসে এই অমৃতেরই আশ্বাদন পাইয়া বলিয়াছিলেন “অগাম সোমমম্বতা অভূমঃ।” আয়ুর্বেদ এই রসকেই সুজীবন (Elixir of life) রূপে পাইতে চেষ্টা করিয়াছে।

সমুদ্রমহনে যে সকল বস্তু উদ্ধৃত হইছে—সেই সকলই সৃষ্টির ইতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন বিকাশের নিদর্শন স্তররূপে বিব্রাজমান রহিয়াছে। চন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্ভিদ প্রাণী, জড়বস্তু প্রভৃতি যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থই সেই সমুদ্রের মধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সমুদ্রের ৩টা নায়ক সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য প্রকাশ করা বিশেষ আবশ্যক বোধ হইতেছে। যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বিশ্ব-নিয়ন্তা, তাঁহারা ই এখানে নায়ক। বিষ্ণু মহনের মন্ত্রণা-নাভা ও পৃষ্ঠ-পোষক, ব্রহ্মা উদ্ভোক্তা ও অধাক্ষ, মহেশ্বর অভয় ও উৎ-সাহদাতা। এই নায়কত্রয়ের সহিত যেমন পূর্বোক্ত রূপে সমুদ্র মহনের সম্বন্ধ রহিয়াছে—তদ্রূপ অল্প প্রকারেও সম্বন্ধ রহিয়াছে। জলই বিষ্ণুর আশ্রয়, সুতরাং তিনি ‘নারায়ণ’ তিনি পদ্ম ধারণ করিয়াছেন, সুতরাং পদ্ম-নাভ, তিনি শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী—শঙ্খ ও পদ্ম জলজবস্তু, তদীয় বাহন গরুড় পক্ষী, সুতরাং তিনি ‘গরুড়ধ্বজ’, ব্রহ্মা জলজপদ্ম হইতে উদ্ধৃত বলিয়া পদ্মমোনি, অব্যোহানি। জলপক্ষী হংস-রাজ তদীয় বাহন, তাহাতেই তিনি হংস-বাহন। মহাদেবের বাহন ‘বৃষভ’ সুতরাং তিনি ‘বৃষধ্বজ’, তিনি পশুদিগের পালনকর্ত্তা বলিয়া ‘পশুপতি’। কপর্দ (কড়ি) তাঁহার জটীভূষণ, তাহাতে তিনি ‘কপর্দী’। সমুদ্র মহনের সহিত এই সমস্ত বিষয়ের যোগ-সাধন করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, আৰ্য্য-দিগের অভিব্যক্তিবাদের সুন্দর একটা চিত্র আমাদের নিকট উন্মোচিত হইয়াছে। স্বচ্ছ বাষ্প হইতে জ্যোতিষ্ক চন্দ্র নির্গত,* ঘনী-

ভূত বাষ্প, জলাকারে পরিণত, তাহাতে জলের শব্দক শব্দোৎপত্তি, তৎপরে উত্তর কচ্ছপোৎপত্তি, হংসদের কঠিনাবরণে ভূতক গঠন। ভূতর ভীষণ হংসর পক্ষতাকার ধারণ। পর্তে নাগাদির বাস; জলে ভূগাদির উদ্ভব। জলীয় অতিকায় পখাদির আবির্ভাব, জলজ পুষ্পাদির বিকাশ—হংসাদি প্রবমান পক্ষীর-প্রাচুর্য্যব, অশ্বরাশি উচ্চজাতীয় জীব-জন্তু, স্থল-তৃণ-জল-পদ্মাদি সজ্জাত, গোষ্ঠাতীয় স্থলচর পশু প্রভৃতির সন্দর্শন—পারিজাত প্রভৃতি বৃক্ষোৎ-পত্তি; খেচর গরুড় প্রভৃতি বৃহৎ পক্ষীর উদ্ভব;—নারীজাতির সম্ভব—সমুদ্র-গর্ভে রত্না-দির উৎপত্তি, পুরুষজাতির আবির্ভাব—পৃথিবীপৃষ্ঠে মেঘবর্ষণের দ্বারা ওষধি ও উদ্ভিজ্জ প্রভৃতির সমৃদ্ধি ও তাহাতে শরীর পোষণ উপাদানের (কলাদির) সৃষ্টি ও সজীবন রসের সঞ্চারণ—এই সমস্ত বিকাশের একটা সুসম্বন্ধ শৃঙ্খল সমুদ্রমহন বর্ণনার আত্মোপাশ্রয় ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

চিস্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই বুঝিতে পারিবেন, এই অভিব্যক্তিবাদ পাশ্চাত্য অভিব্যক্তি-বাদের পার্থক্য স্থান পাইবার সম্পূর্ণরূপে যোগ্য। ইহাতে অভিব্যক্তির নিয়মে প্রকৃতি-রাজ্যে ভিন্ন ভিন্নরূপ বিকাশের সীমানির্দেশক একটা সুন্দর মান-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু এই প্রাচ্য অভিব্যক্তিবাদের ক্ষেত্র অপেক্ষা অধিক প্রসারিত। পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদ পৃথিবীর অভিব্যক্তিরই ব্যাখ্যা করিয়াছে,

“Very long ago, as Sir George Darwin has pointed out the moon was much nearer the earth than that is now and its attraction was much stronger. “Are there men in other Worlds?” by Dr. Louis Robinson in Nineteenth Century and after, April, 1908.

* চন্দ্র যে পৃথিবীর সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্বন্ধ ও পৃথিবীরই সহিত বিকাশ প্রাপ্ত, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাহা স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়াছেন—

কিন্তু প্রাচ্য অভিব্যক্তিবাদ সমস্ত বিশ্ব-রহস্যই উদ্ঘাটিত করিয়াছে । আমরা এখানে একটু বিস্তারিতভাবে তাহা বৃত্তিতে চেষ্টা করিব । আমরা প্রথমেই প্রমাণ করিয়াছি, ক্রীতদাস সমুদ্র দ্বারা মহাবিশ্ব আকাশস্থ বাষ্পরাশিই বৃষ্টিয়াছিলেন । নভোমণ্ডলে সেই বাষ্পরাশির জগৎ-মূলীভূত বেগবশে আবর্তনই সমুদ্রমহন । এই বাষ্পরাশির উর্দ্ধ ও অধঃ, উভয়দিকেই অসীম শূন্যদেশ—সেই বিরাট পুরুষেরই দেহ—সুতরাং এক ভগবানই কচ্ছপরূপে ইহার অধিষ্ঠান ও বিষ্ণুরূপে অধিষ্ঠাতা । সেই মণ্ডলাকার বাষ্পরাশি যে নির্দিষ্ট অক্ষের চতুর্দিকে ভ্রাম্যমাণ, ইহাই মন্দর পর্বত—যে অনন্তকাল ব্যাপিয়া এই আবর্তন চলিতেছে, তাহাই বায়ু-রূপে বর্ণিত । সূর্য্যাস্তের বিপরীত-দিকের আকর্ষণ কেন্দ্রাভিমুখ ও কেন্দ্রাভিগ-বলেরই রূপক । স্বচ্ছ বাষ্প এতাদৃশ আবর্তন দ্বারা ক্রমে ঘনীভূত হইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত বৈচিত্র্যের উৎপাদন করিতেছে । সুতরাং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরিণামেরই মূল—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি বেগ আবর্তিত নিখিল বাষ্পরাশি । ইহাতে লৌকিক অলৌকিক সমস্ত বিকাশই সম্ভবীভূত হইতেছে । এখানে প্রাচ্য অভিব্যক্তিবাদের অপর একটা বিশেষত্ব ও উল্লেখযোগ্য । যেখানে পাশ্চাত্য অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা বিকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে—সেখানে প্রাচ্য অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা মূলকারণ

হইতে আরম্ভ হইয়াছে । পাশ্চাত্যমত অধ-স্তনবিকাশ হইতে উর্দ্ধস্তন বিকাশ আলোচনা করিয়াছে—প্রাচ্যমত আদিরূপ হইতে বিকাশ আলোচনা করিয়াছে । এতৎপ্রসঙ্গে অপর একটা বিষয়ও বিশেষরূপে লক্ষ্য করা উচিত বোধ করি । প্রাচ্যাবাদীরা যে সমস্ত বিকাশ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটাই অল-রূপে আদি কারণের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে । ইহাতে প্রাচ্যাবাদী-দিগের অভিব্যক্তি পাশ্চাত্যাবাদীদিগের ত্যাক্ষ একটা অপরটা অলুগত নহে, কিন্তু সাপেক্ষ, এই মাত্রই বুঝা যায় । দ্বিতীয়তঃ প্রাচ্য-দিগের মহন বর্ণনায় যেমন সেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপতির সাক্ষাৎ দেখা যায়—তদ্রূপ প্রত্যেক বস্তুই স্বতঃ উৎপন্ন হয়, এই বর্ণনায় ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সেই চিৎশক্তির আবির্ভাব বৃত্তিতে পারা যায় । পাশ্চাত্য-বাদীরা এই চিৎশক্তিকে ধরিতে না পারিয়া জড়ত্ব সহায়ে সমস্ত বিকাশ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বিষম গোলে পতিত হইয়াছেন । আখ্যাদিগের অবতারবাদের সমস্ত বিকাশের মধ্যে পূর্বোক্ত চিৎশক্তির সম্প্রবেশ স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । এতদুপলক্ষে অবতারবাদের আলোচনা কর্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে । বারাস্তরে আমরা অবতারবাদ ও কর্মবাদের অবতারণা করিব ।

• ত্রিণীতলস্ত্রৈ চক্রবর্তী ।

নিবেদিত।

নব-বসন্ত-সুদিত
মলয়-বীজনে,
নব-উল্লাস-বন্ধিত
বিহগ-কুঞ্জে,
ত্রিভাবগুণিতা, বিনম্রা, কুণ্ঠিতা
কে সূতী অতিথি, কবির নিকুঞ্জে ?

পুণ্য-সৌরভ মণ্ডিত
বিনোদ মাধুরী,
মুক্ত-বন্ধন, লবিত,
শিথিল কবরী ;
নেত্র-নীলোৎপল, পূর্ণ-পরিমল,
শোভনে, মলিনে, কে আবণ্য-পুঞ্জে ?

পূত-প্রীতি-বিলসিত-
রুচির-হাসিনী,
• কুর-রাহ-কবলিত-
পূর্ণেন্দু-ভাসিনী,
সন্তাপ-বিধুরা, সংযম-মধুরা,
এস মা স্মরমা, মানসমোহিনী।

তব সত্তা নিবেদিত
দেব বিশ্বভূতে,
তব শক্তি নিয়োজিত
পর-সেবা-কৃতে ;
সফল জনম, ধ্রুপদ, করম,—
ধন্য পুণ্যশীলে, যৌবনে যোগিনী।
শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়।

সভাপতির অভিভাষণ ।

আমি যখন আপনাদিগের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়ের পত্র পাঠ করিলাম, তখন মনে হইল যে “কাহার পত্র খুলিলাম ?” তাই খাম খানি আবার পাঠ করিলাম, দেখি, সেই ফলা-বান্ধন-শুভ সহজ নামটা—আমারই নাম। তখন ভাবিলাম, সম্পাদক মহাশয় নাম লিখিতে ভুল করিয়াছেন। অথবা মৃত্যুঞ্জয়-লিখিতে অশক্ত বালক যেমন হলধর লিখিয়া বসে, তেমনি, বোধ হয়, বানানের ভয়ে সম্পাদক মহাশয় আমার সহজ নামটা শিরো-নামার লিখিয়া থাকিবেন। বাল্য হউক, তাহার পছন্দের চোব দেওয়া যায় না। কারণ গত বাৎসরিক অধিবেশনে স্বনামধাত্য এসিঙ্ক

ঐতিহাসিক শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার আপনাদিগকে যে পর্যাপ্ত সাহিত্যিক আহার দিয়া গিয়াছেন, তাহার পর একটু টক আপনারা সকলেই ইচ্ছা করিতে পারেন। তাই একটা টকীয় সভাপতি আপনাদিগের অসাময়িক হইবে না। কিন্তু এ টক করমতা; ইহা অতি কুদ্র, অতি হেয়; ইহাতে ত্তোন সার পাইবেন না।

এবার বড় ছদ্ম্বিনে আপনারা সাহিত্য-ক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছেন। কেবল যে মুক্ত বঙ্গের অবস্থা বিবেচনার ছদ্ম্বিন বলিতেছি, তাহা নহে। আমাদের পক্ষে ঐত. বৎসর বিশেষ ছদ্ম্বিন। সেই পুণ্যশ্লোক মহাশয়,

যিনি উত্তর বঙ্গের উজ্জ্বল নব্বত্র স্বরূপ আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতেছিলেন, সমস্ত বঙ্গের আদর্শ ভূম্যধিকারিক্রমে খন্যাত্মক অর্থের সম্ভাবনার শিখাইতেছিলেন, সেই মহিমাম্বিত রাজা মহিমারঞ্জন বঙ্গদেশ অন্ধকারে ডুবাইয়া অন্তর্মিত হইয়াছেন। তাই বলিতেছি, এ বৎসর আমাদিগের বিশেষ দুর্দিন। সাহিত্যামুরাগী পণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি, মহেশচন্দ্র সরকার, হরিশচন্দ্র রায়, খগেন্দ্রনারায়ণ দাস এবং মহেন্দ্রনাথ সরকার, ইংহারাও আমাদিগকে গত বর্ষ মধ্যেই একে একে পরিত্যাগ করিয়া অমর-ধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাই এই সভা সেই পরলোকগত মহাত্মাদিগের অভাবে আজি গভীর শোকাবুল। কিন্তু বিধাতার রাজ্যে কিছুই অমঙ্গল-জনক নহে। তাই আপনাদিগকে শোকের বেগ সংবরণ করিতে অনুরোধ করি। রাজা মহিমারঞ্জন যে সাহিত্যিক একাগ্রতা ও জীবন-ব্যাপী অনুশীলনের মহৎ দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, সেই স্মৃতি এতদ্দেশীয় ধনীদিগকে উৎসাহিত করিবে, সেই দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিবে, একের স্থলে শত শত জন্ম গ্রহণ করিয়া যুক্ত হস্তে সাহিত্যের উন্নতি বিধানে যত্ববান হইবেন, এই আশা হৃদয়ে পোষণ করতঃ আমরা গত বৎসরের গভীর শোকাবেগ সংবরণ করিব। বিধাতা এই আশা পূর্ণ করুন।

অতঃপর আমরা সাহিত্য-সভার মিলিত হইয়াছি। অলবিম্বু মিলিত হইয়া মহা-সমুদ্র গঠিত করে; ধূলি-কণা মিলিত হইয়া অত্যাচ্চ অচল রাজ্য প্রস্তুত করে। আমরা কি তাহা পারিব না? বাহার বাহা আছে, তাহা লইয়াই মিলিত হইব। “আমি সাহিত্যিক নহি, আমি পণ্ডিত নহি, এ সভার আমরা

স্থান নাই” এমন বেন কেহই মনে করেন না। যিনি ধনী, তিনি ধন দিয়া, যিনি জ্ঞানী তিনি জ্ঞান দিয়া, যিনি সবল তিনি বল দিয়া, যিনি গ্রহী তিনি গ্রহ দিয়া, যিনি যে ভাবে পারেন, সেই ভাবেই সাহিত্যের উন্নতি সাধনের সহায়তা করুন। সাহিত্য ভিন্ন মানব জাতির জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর নাই। যেমন ব্যক্তিগত উত্তরাধিকার আছে, ব্যক্তি যেমন পূর্ব পুরুষগণের নিকট দেহ ও মনের উপাদান সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তেমনই সামাজিক উত্তরাধিকারও প্রত্যেকসিদ্ধ। সমাজও পূর্বগামীদিগের নিকট হইতে জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। এক পুরুষে যে সকল জ্ঞান সঞ্চিত হয়, তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া পরবংশীয়গণকে সেই জ্ঞানের অধিকারী করে। পূর্ববর্ত্তিগণের জ্ঞানের উত্তরাধিকারী বেশতঃ পরবংশীয় এক ব্যক্তি নহে, দুই ব্যক্তি নহে, সমস্ত সমাজই মোটের উপর লাভবান হয়। এই সামাজিক উত্তরাধিকার না থাকিলে মানব আজি যে রূপে উন্নত হইয়াছে, তাহা কখনই সম্ভব হইত না। মানব, মানব নামেরই যোগ্য হইত না। সাহিত্য ভিন্ন এই সামাজিক উত্তরাধিকারিষ্য প্রতিষ্ঠিত হইতেই পারে না। তাই সাহিত্য মানব সমাজের উন্নতির প্রধান হেতু, সাহিত্যালোচনা মানবীয় উন্নতির প্রধান হেতু, সাহিত্যালোচনা মানবীয় উন্নতির প্রধান মণ্ডল।

কিন্তু সাহিত্য উপায় মাত্র; উন্নতিই উদ্দেশ্য। আমরা মানব, সুতরাং মানবীয় উন্নতিই উদ্দেশ্য। অতঃপর সকলই তাহার আনুকূল্যে অগ্রসর মাত্র। পরবর্ত্ততঃ দেখিতে হইলে বন্ধ-মুক্তিই মানব জন্মের একমাত্র লক্ষ্য, আর ভগবৎ জ্ঞানই বন্ধ-মুক্তির এক-

মাত্র পছন্দ। কিন্তু ভগবানকে চিনিক কেমন করিয়া? অনেকেই এ প্রশ্নকে বড়ই কঠিন মনে করেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে স্মরণ করা-ইয়া দিতে ইচ্ছা করি যে, তাঁহার আমাকে চিনেন কেমন করিয়া? আমার কথা শুনিয়া, আমার স্বার্থ দেখিয়া, আমার কথায় কার্য্যে তুলনা করিয়া। ভগবদ্ জ্ঞান সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই। ইহাতে নূতন পছন্দ কিছুই নাই। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, জেঙ্কাভেস্তা প্রভৃতি তাঁহার বাক্য, জগৎ ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার কার্য্য। তাই বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন, জগতের বিবিধ বিভাগের বৈজ্ঞানিক আলোচনা, এই দুই-ই ভগবদ্ জ্ঞান লাভের পথ। বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়নে মন সংবৃত ও পবিত্র হইবে, তৎপর ধূলি কণা হইতে জ্যোতিক পৰ্য্যন্ত, তৃণ হইতে মানব পৰ্য্যন্ত, সকলই বৃষ্টিতে হইবে, সকলই জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে। নচেৎ তাঁহার কার্য্যকে উপেক্ষা করিলে তাঁহার জ্ঞান লাভের পছন্দ সূক্ষ্ম হইবে না। অবশ্য, তিনি স্বীয় লীলাবশতঃ কাহারও জ্ঞান-পথে স্বয়ং আবির্ভূত হন, সেতো সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু সে সৌভাগ্য ক'জনের ঘটে? তাই মানব সমাজের পক্ষে আপ্তবাক্য ও বিজ্ঞানা-লোচনা ভিন্ন মানব জন্মের সফলতা নাই, ইহা নিশ্চিত।

ঐতিহাসিক উপনিষৎ বলেন,
কিন্তু সাধু অধ্যয়ন, * অধ্যয়ন অধ্যাপন
যেন ভব জীবনের হয় মহাব্রত,
তাহা হইতে চিত্তশুদ্ধি, হইলে মার্জিত বুদ্ধি,
তত্ত্বজ্ঞান তাহা হ'তে হইবে উন্নত। *

ভগবদ্বাক্যের সহিত তাঁহার কৰ্ম্ম, সার্থক
জগৎকে মিলাইয়া বৃষ্টিতে ঐ বাক্য বিশদরূপে
হৃদয়ঙ্গম হয়, জ্ঞান পরিকৃত ও নির্মূল হয়।

* উপনিষৎ গ্রন্থাবলী ১৩৯ পৃষ্ঠা।

তাই জগদ্ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা-অত্যাশঙ্কক। কিন্তু ইহা বলা যত সহজ, কার্য্যে পরিণত করা তদ্রূপ নহে। তথাপি নিরাশ হইবার কারণ নাই। অনন্ত জগৎ, অনন্ত জগদ্ব্যাপার। ইহার যিনি যতটুকু অধিকারী, তিনি যদি তাহাতেই মনোনিবেশ করেন, আর মূল উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আলোচনা করেন, তাহা হইলেই কিছু-না-কিছু ফললাভ অবশ্যই করিবেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহের কারণ নাই।

কিন্তু মূল উদ্দেশ্য কি? বন্ধ-মুক্তি, স্তত্রাং আত্মজ্ঞান। মানব, মানবকে চিনি-বার জন্ত সর্বদা চেষ্টা করিবে। যিনি যাহাই আলোচনা করুন, মানবকে চেনাই তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ভগবানের অকুল নির্দেশ সর্বদা নেত্রপথে স্থাপিত রাখিয়া মানবকে বৃষ্টিতেই বদ্বান হওয়া উচিত। নতুবা কোন আলোচনাই সফল হইবে না।

কিন্তু মানবকে বৃষ্টিতে হইলে তখন মানব-ত্বের আলোচনায় বিশেষ ফল লাভের আশা করা যায় না। মৃত্তিকা, জলবায়ু, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, গ্রহ নক্ষত্র, বৃক্ষ লতা, নদী, সমুদ্র—এক কথায় সমস্ত প্রকৃতিকে না বৃষ্টিতে মানবকে বুঝা যায় না। মানব সমস্ত প্রকৃতির সহিত একত্রে গ্রথিত। তাহা হইতে পৃথক করিয়া মানবকে বৃষ্টিবার উপায় নাই। দেখুন, পার্শ্বত্যা দেশের, সমুদ্রতটের, মরু প্রদেশের, হিংস্র-জন্তু-বহুল, অথবা কীট-পীড়িত, অথবা অঙ্গলাকীর্ণ স্থানের অধিবাসী-দিগের মধ্যে দেহগত, চরিত্রগত প্রভেদ কত! তাই বলিতেছি, মানবকে চিনিতে হইলে সমস্ত প্রকৃতিকে জানা চাই। যে সকল শাস্ত্র জীব ও জড় প্রকৃতির আলোচনা

করে, বধা বস্তৃত্ব, শক্তিত্ব, ভূত্ব, জীবত্ব, জ্যোতিষ ইত্যাদি, সেই সকল শাস্ত্রের আলোচনা ও তাহার অনুশীলন না করিয়া মানবতত্ত্বের আলোচনা করা যায় না। - মানবকে বুঝাও যায় না। আর সমাজবদ্ধ মানবকে বুঝিতে হইলে, তাহার জীবন-সংগ্রাম, তাহার বিভিন্ন শাখার সংঘর্ষ ও যোগ্যতমেব জয় লাভ, তাহার সামাজিক দেহ ও সামাজিক মনের বিবর্তন—এ সকল বুঝিতে হইল, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, এমন কি, কাব্যশাস্ত্রেরও আলোচনা না করিয়া মানবকে বুঝিবার আশা করা সঙ্গত হয় না। তাই এই সকল শাস্ত্র, এই সকল সাহিত্য আমাদিগের অনুশীলনীয়। কিন্তু সকল শাস্ত্রই মানবতত্ত্বের অর্থাৎ মানব দেহের ও মানব মনের বিবর্তনের ইতিহাস স্বরূপে আলোচিত হওয়া উচিত। অধ্যাপক রে ল্যাংকেষ্টার ইতিহাসের বিষয় বুঝাইতে গিয়া এই কথাই স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন।* - ইহা কদাচ বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। সাহিত্যকে কেবল সৌন্দর্য্য-উপভোগের লোয়াজিমা মনে করা অতীব অসঙ্গত; সাহিত্যকে উপকারীতার দিক হইতে মানব জাতির পরমবন্ধু মনে করা উচিত। তাই সাহিত্য আলোচনা আমাদিগের প্রধান লক্ষ্য হওয়া কর্তব্য, আর এই দিক হইতে আলোচনাই প্রকৃষ্ট আলোচনা, ইহা সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম করা অত্যাৱশ্যক।

কিন্তু এই উন্নত জ্ঞানের দিক হইতে সাহিত্যকে আলোচনা করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। পারমার্থিক দিক হইতে সাহিত্যকে অনুশীলন করা সকলের প্রকৃতির অঙ্গরূপ নহে, তাই অনেকের পক্ষেই দৈনন্দিন জীবন

ব্যাপারের, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুখবাহুন্দ্য আরাম বিরামের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াও সাহিত্যকে আলোচনা করা বিধেয়। সমাজকে ধন-ধাত্তে, সুখ-বাহুন্দ্যে, বল-বিক্রমে এবং গৌরব ও মহিমায় পূর্ণ করিয়া তুলিতেও সাহিত্য আমাদিগের প্রধান সহায়। বর্তমান সময়ে একথা বিস্মৃত করিয়া বলা নিশ্চয়মোহন। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বস্তৃত্ব, শক্তিত্ব, ভূত্ব, জীবতত্ত্বের জ্ঞান না থাকিলে কোন জাতই জগতে সু-প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। জ্ঞানই শক্তি। বস্তৃত্বের জ্ঞান লাভ করিয়া বিবিধ বস্তুর সমাজের প্রয়োজন সাধনোপযোগী করিয়া লওয়া যায়; শক্তি তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিয়া প্রকৃতির শক্তিকে আপন আয়ত্ত করতঃ জীবন ব্যাপারের অনুকূল করা যায়। এইরূপেই বর্তমান ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান বিবিধ বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়া ধনে বংশে বাড়িয়া উঠিতেছে, মীনব সমাজে সুগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ধরাতল ছাইয়া ফেলিতেছে। বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য, বিবিধ শিল্প বাণিজ্য, বিবিধশক্তিকালিত যন্ত্র, এ সকল নানারূপ অর্থাগমের ও সুখ বিধানের নিমিত্তও আবশ্যক। কিন্তু উহা বিজ্ঞানালোচনা ভিন্ন হয় না। তাই বিজ্ঞান যে মানবকে কেবল পারত্রিক মঙ্গলের পথই প্রদর্শন করে, তাহা নহে, ঐহিক উন্নতিরও প্রধান সহায়। ঘিন্, যেরূপ অধিকারী, তিনি সেই ভাবেই ইহার সাধনা করিবেন। সাধনা ভিন্ন সিদ্ধির আশা নাই। যদি নির্ধনকে ধনবান করিতে চাও, যদি দুর্জলকে সবল করিতে চাও, যদি কৃষকে সুস্থ করিতে চাও, যদি সুখে স্বচ্ছন্দে জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাও, বিজ্ঞানের পদাশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে, ইহাতে গত্যন্তর নাই। পৃথকই বলি-

রাহি, মনুষ্যের উন্নতিই আমাদের প্রধান লক্ষ্য আর বিজ্ঞান আলোচনাই তাহার প্রধান সহায়। তাহাচনা করিয়া কেবল সর্বদা পর-মুখাপেক্ষার থাকিলে কিছুই ফল নাই।

কিন্তু সাহিত্য সভায় বিজ্ঞান কেন? কেহ কেহ মনে করেন, কেবল কাব্য অলঙ্কারই সাহিত্য নামের অধিকারী। আমি তাঁহা-দিগের সহিত একমত হইতে পারি না। তাঁহা-দিগের মত সঙ্গত হউক বা অসঙ্গত হউক, আমি এই মত স্বীকার করিতে অক্ষম। আমার মনে হয় যে “কেবল কাব্যই সাহিত্য, আর সৌন্দর্য্য-সুউই কাব্যের উদ্দেশ্য” ইহা অপেক্ষা অমঙ্গলজনক মত আর নাই। এই মত দীর্ঘকাল হইল আমাদের অধঃপতনব-দিকে লইয়া যাইতেছে; ইহার পরিণাম কি, তাহা বুঝিতে আর বাকী নাই। যাহা হউক, আমি সাহিত্যকে মানবের “সর্বপ্রকার জ্ঞানের লিখিত বিবরণ,” বলিতে ইচ্ছা করি। সাহিত্য মানব মনের ভাব প্রকাশ করে। মনের সর্বপ্রকার ভাবই, জগতের সর্বপ্রকার সত্যই ইহার অন্তর্ভূত। তাহাও মধ্য হইতে কোন নির্দিষ্ট প্রকার ভাব কি নির্দিষ্ট প্রকার সত্যকে সাহিত্যের মধ্যে স্থান দিয়া অবশিষ্টগুলিকে বর্জন করিবার কোন অধিকার নাই। সর্ব প্রকার ভাবেরই লিখিত বিবরণকে সাহিত্য নামে অভিহিত করিয়া বৈজ্ঞানিক সাহিত্য-কেই আমাদের এই সভার প্রধান আলোচ্য করা হউক। ইহাই আমার বক্তব্য।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এজগতে সকলই ব্যয়সাধ্য। অর্থ ভিন্ন কোন কর্মই হয় না। সুদি হইতে বৈজ্ঞানিক পর্য্যন্ত সক-সেই সর্বদা হাত পাতিয়াই আছে। বিশে-ষতঃ বৈজ্ঞানিকের উন্নয়নের অতীব বিস্তীর্ণ, আর যেমন বিস্তীর্ণ, তেমনই গভীর। এই

দরিদ্র দেশে অর্থ ঘুটিবে কোথায়? এ-সেই বীজ-বৃক্ষের সমতা আবার উপস্থিত। বীজ হইতে বৃক্ষ, আবার বৃক্ষ হইতে বীজ, তজ্জগৎ। অর্থ সাহায্যে বিজ্ঞানালোচনা, আবার বিজ্ঞানালোচনার অর্থ লাভ। এ সমস্যার উপায় কি? উপায় সেই চিরপ্রচলিত উক্তির অঙ্গসরণ। নিরাশ্রয়ে ন জীবন্তি পাণ্ডিত্য বনিতা লতাঃ। একথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ ভাবে পরিষ্কৃত হইয়া বহিয়াছে। বিজ্ঞানদাতার আশ্রয়ে নবরত্ন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে ভারতচন্দ্র প্রভৃতি ইহারই দৃষ্টান্তস্থল। সাহিত্য-সেবীগণ চিরদিনই ধনবানের আশ্রয়ে পুষ্ট হইয়া আসিতেছেন। ধনীর ধনের উপর তাঁহা-দিগের দখলি স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে। কিন্তু ধনিগণ অনেকেরই এখন সে কথা বিস্মৃত হইতেছেন। পুণ্যলোক মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র, রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় রাও সাহেব এবং স্বর্গগত রাজা-মহিমারঞ্জন ও মহারাজ রাধাকিশোর দেব মাণিক্য বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ব্রজেনকিশোর রায় চৌধুরী, বাধা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত তাবকন্যথ পাণ্ডিত, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি গ্রহ চারি জন ব্যতীত এতদ্রোশে সাহিত্য-সেবার নিমিত্ত অকাতবে অর্থ ব্যয় করিতে আর প্রায় কাহাকেও দেখা যায় না। এখন বিলাসিতাই অনেকের প্রধান আলোচ্য হইয়াছে। ধনিগণ আমদারী, তেজারতী ব্যবসা হইতে যে অর্থ লাভ করেন, তাহার শতাংশের একাংশও যদি দেশের প্রকৃত হিতার্থে নিয়োগ করিতেন, তবে নিজেও হইতেন, দেশীয়-গণেরও প্রচুর হিতসাধন ক্রটিতে সক্ষম হইতেন। তাহার স্বহস্তে উঠাইয়া দূর দূর-স্তরে যে সকল অর্থ বর্ষে বর্ষে ছুড়িয়া ফেলি-তেছেন, তাহার এক মুষ্টিও যদি সাহিত্যকে

দিতেন, তবেই মানব জাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হইত। একজন ধনীর নিকট এক নবীন গ্রন্থকার গ্রন্থ প্রকাশের জন্য কিছু সাহায্য চাহিয়াছিলেন। এ ঘটনা আমি শ্রবণে জানি। গ্রন্থকারের প্রত্যাশা শত মুদ্রার অধিক ছিল না। ঐ ধনী অনায়াসেই সেই টাকা দিতে পারিতেন। তিনি দৈনিক ৫০০ টাকার উর্দ্ধ বিলাসিতায় অপব্যয় করেন; অর্থাৎ বার্ষিক প্রায় দুই লক্ষ মুদ্রা তাঁহার বিলাসের ব্যয়, তথাপি সামান্য এক শত টাকা তিনি এরূপে “অপব্যয়” করিতে সম্মত হইলেন না। বলিলেন “মহাশয় এবার হুর্ভিক্ষের বৎসর।” আমি গত বর্ষের বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে একটা ধন-কুবেরের দ্বারস্থ হইয়াছিলাম। তাঁহার ঘোড়ার মল মূত্র ত্যাগের স্থান ঐশ্বর্যের ব্যয় ৬০,০০০ মুদ্রা। তাঁহার Cigarette holder-এর মত পদার্থ আমি চন্দ্র চক্ষে কখন দেখি নাই। কি জানি কত টাকাই বা তাহার দাম হইবে! তিনি শত মুদ্রাও আমাকে দেন নাই, আর বলিলেন “বঙ্গীয় সাহিত্যের আমি কি ধার ধারি?” বলা বাহুল্য যে, তৎপূর্বে তিনি ২৫০০ হাজার টাকা ব্যয়ে কয়েক খানা মটর গাড়ীর “অর্ডার” দিতে বিস্মৃত হন নাই। কেহ বা বিড়ালের বিবাহে, কেহ বা স্ত্রী সেবায়, কেহবা লোমহীন ও লোমশ ছোট বড় কুকুরের পরিচর্যায় * এবং তদ্রূপ অপরাপর অত্যাবশ্যক কার্যে বহু অর্থ ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু যাহাদিগের হৃৎ-দারিত্র্য-জীর্ণ কল্পিত হস্তাশ্রয় হইতে ধন রাশি কাড়িয়া লইতেছেন, তাহাদিগের কথা কি একবারও মনে পড়ে না? হা বিধাতঃ! এ পাপের প্রায়-শস্ত্র কি? হা ধারার শক্তি থাকিতেও দেশীয় ইহার কুহর হাওয়া পরিবর্তন জন্ম দাঙ্গিলিং ব্যয়।

সাহিত্য সেবায় বিরত, দেশীয় সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিতে পরাস্থ, অর্থ সাহায্য করিতে অসম্মত, তাঁহার স্তম্ভ সনে লাইল যাইবেন বলিয়া বিশ্বাস করেন কিনা, জানি না, কিন্তু অনেকেই অর্থ রাখিয়া বাইতে পারেন না, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কি বলিব? কথা সেরে না। হায়! কতদিনে ইহাদিগের কর্তব্য জ্ঞান জাগ্রত হইবে?

উত্তর বঙ্গ চিরদিনই সাহিত্য আলোচনার জন্ত প্রসিদ্ধ। এইখানেই ভট্ট দিবাকরানন্দ কুল্লুক ভট্ট, মহামহোপাধ্যায় হল্লায়ুধ, অনিরুদ্ধ ভট্ট, নব্য জ্ঞানভণ্ড-বিকাশ-ভাস্কর গদাধর ভট্টাচার্য্য, উদীচ্য ভট্টাচার্য্য, রামকৃষ্ণ, রত্নমালা ব্যাকরণ-রচয়িতা পুরুষোত্তম, তামাবৃত্তিকার পুরুষোত্তম, জগদ্বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্য, ভক্স চূড়ামণি নরোত্তম দাস, গোবিন্দ মিশ্র * প্রভৃতি সাহিত্য আলোচনার জগৎকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান সময়েও এই প্রদেশেই ৮ শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত, ৮ হরিশচন্দ্র গোস্বামী, ৮ শ্রীশচন্দ্র তর্কালঙ্কার সাহিত্যালোচনার জীবন-পাত করিয়াছেন। আর এখনও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ বাদবেশ্বর তর্করত্ন, পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিত্তারত্ন, পণ্ডিত হারাগচন্দ্র চক্রবর্তী, কবিরাজ কুন্তীর ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, নলডাক্সার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী, শ্রীমান্ রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, দিব্যপাতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়, মৌলবী তসলিম উদ্দিন অমোঘদ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ অক্লান্ত

* ইনি কোচবিহারগতি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সময়ে (১৭৮০ খ্রীঃ) কোচবিহারে বাস করিতে; এবং বাঙ্গালা ভাষার গীতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রংপুর সাঃ পঃ পত্রিকা।

পরিপ্রয়ে সাহিত্যালোচনার অপভ্রংশ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। ইংলান্ড সকলেই উত্তর বঙ্গের লোক। আর এই উত্তর বঙ্গেই সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখা অতি অল্পদিন মধ্যেই সাহিত্যালোচনার এবং সাহিত্যিক অধ্যবসার ও প্রশ্ন স্বীকারে বশবী হইয়াছেন। উত্তর বঙ্গ প্রাচীন দেশ। ইংলান্ড উচ্চ ভূমি, ইংলান্ড সীমা-সংলগ্ন পর্বতমালা, ইংলান্ড বিভিন্ন শাখা-ভুক্ত মানব ও ইতর প্রাণী, ইংলান্ড উদ্ভিজ্জ,—এ সকলই এই প্রদেশকে নানা বিধে বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছে। এই প্রদেশে মানবজাতির “মংলয়েড্” শাখা-ভুক্ত জনগণের সহিত অতি প্রাচীন কাল হইতেই আবিগণ বসবাস করিতেছেন। এই প্রদেশের পার্শ্বভাগ “নিগ্রয়েড্” এবং সম্ভবতঃ ড্রাভিডিয়ান শাখা ভুক্ত। কখন বা শত্রুভাবে, কখনও বা মিত্রভাবে, এই বিভিন্ন শাখা-ভুক্ত মানবের সংগ্রহ, সংঘর্ষ ও নৈকট্য-বশতঃ উত্তর বঙ্গ উৎসাহে, অধ্যবসারে, দৃঢ়তার, ও কার্যকুশলতার এক বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে। সংগ্রহে ও নৈকট্যে পরস্পরের জ্ঞানের আদান প্রদানে পরস্পরকে জ্ঞানশালী করিয়া তুলিয়াছে, সংঘর্ষে পরস্পরকে আক্রমণে বা আত্মরক্ষায়, বিবিধ যুদ্ধ কোশলের উদ্ভাবনায়, শৌর্য্যে বীর্য্যে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। কখন বা সকলকে শান্তি সাম্রাজ্যের ছায়াতলে আনিয়া তাহাদিগকে শিল্প বাণিজ্য সাহিত্য প্রভৃতি কলা কোশলে তারতম্যবিখ্যাত করিয়া তুলিয়াছে। আমার বিবেচনায়, ইংলান্ড উত্তর বঙ্গের উন্নতির মূল কারণ। এ কারণ আমরা বিশ্বস্ত হইতে বলিয়াছি, তাই ইহাকে স্বতীর্ণবে জাগাইয়া দেওয়া অসম্ভব নহে। এই কারণ অস্বাধিক পরিবার্ণে সমস্ত বঙ্গদেশেই কিয়া উৎসাহ

করিয়াছে। কিন্তু সমস্ত দেশে ও পার্শ্বভাগে দেশে প্রভেদ অনেক, অপরাপর জাতির নৈকট্য ও দূরত্বে প্রভেদ অনেক,—তাহা পূর্বেও বলিয়াছি। তাই উত্তর বঙ্গ বাঙ্গালার ইতিহাসে বিশেষ গৌরব লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। এ গৌরব ইহাকে চিরদিন মহিমাযিত্ত করুক।

মানব জাতির বিবিধ শাখায় জনগণের সংগ্রহ ও সংসর্গের কল বাঙ্গালী বৈরাগ্য ভাবে উপভোগ করিয়াছে, তাহাতে প্রথম হইতেই ইহাদিগের একটা স্বাভাব্য উৎসাহ হইয়াছিল। শেষে তাহা সম্যকরূপে রক্ষিত হইতে পারে নাই, তথাপিও এই স্বাভাব্য বাঙ্গালীকে আবিগণের মধ্যে অত্যাধিক পৃথক ভাবাপন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাই বাঙ্গালী আবিগণ-বর্গের শৌর্য্যহীন। এই জাতির উদ্ভাবনী শক্তির কথা স্মরণ করিলে, ইহাদিগের সাহিত্যিক মৌলিকতা লক্ষ্য করিলে বিষ্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। নব্য জ্ঞান বাঙ্গালীর অমর কাণ্ডি, বৈষ্ণব সাহিত্য একদিকে যেমন ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালীর ধর্ম্ম বিষয়ক মৌলিকতার পরিচায়ক, অপর দিকে তেমনই বাঙ্গালী সাহিত্যের জন্মদাতা অথবা প্রধান প্রতিপালক। এই জাতি এক সময়ে কলা নৈপুণ্যে এসিয়ার সমগ্র পূর্বাঞ্চলে স্থাপত্য ভাস্কর্য্য ও চিত্র বিস্তার মূলতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া যে আদর্শের স্থাপনা করিয়াছিল, অধিগণ এখনও অসূর চীন জাপানাদি প্রাচ্য সাম্রাজ্যের শিল্প-সৌভাগ্যের মধ্যে তাহার প্রভাব লক্ষ্য করিয়া থাকেন। ফ্রাঙ্কল সাহেব সম্প্রতি বরেন্দ্র শিল্প গোষ্ঠীর পরিচয় প্রদানোপলক্ষে ইহা প্রমাণ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাজ্ঞান হইয়াছেন।

বাঙ্গালী বাহাতে হাত দিয়াছে, তাই-তেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

কর্তমান সময়ে এই জাতি বৈকল্পিক সময় মধ্যে বহু বিস্তীর্ণ বঙ্গ সাহিত্য গঠিত করিয়াছে, ও তাহাকে অভ্যন্তরীণ মধ্যেই বৈকল্পিক শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে, ইহা জগতের কোন জাতি পারিত কি না, সন্দেহ। এ সকল কথা নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালীর বিশেষত্ব: উত্তর বঙ্গের সৌর্য ও রাজহলিঙ্গা এ স্থলে উল্লেখ না করিয়া নীরব হইতে পারি না। উত্তর বঙ্গেই মহাস্থান গড়, উত্তর বঙ্গেই গোড় ও বারেন্দ্র ভূমি, উত্তর বঙ্গেই পাল-রাজধানী। উত্তর বঙ্গেই কোচবেহার। এই সকল জনপদের উত্থান পতনের ইতিহাস মানব তত্ত্বের অঙ্গীভূতরূপে আলোচিত হয় নাই; হইলে বঙ্গ সাহিত্যের এক বিশ্লিষ্টকর নবীন অধ্যায় উদ্ঘাটিত হইবে। যে সকল শিলালিপি ও স্তম্ভাদি বঙ্গ দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই উত্তর বঙ্গের। এ সকল পাঠে ও আলোচনায় বঙ্গ সাহিত্য লাভবান হইতেছে। কাব্য, অনঙ্গার, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব আলোচনার মানবের অশেষ উপকার, সন্দেহ নাই। কিন্তু যেরে আশ্রয় লাগিলে যেমন দ্রব্য সামগ্রী ছাড়িয়া গৃহস্থ দেহ রক্ষার জন্যই অধিকতর প্রয়াসী হয়, তেমনই অধঃপতিত মৃতপ্রায় মানবজাতিরও কর্তব্য যে অন্ত আলোচনা সংঘত করতঃ মানব তত্ত্বের ও শক্তিতত্ত্বের আলোচনাতেই বিশেষ ভাবে মনোযোগী হয়। উপরে যে সকল বিজ্ঞানের বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাই অধুনা আমাদিগের প্রধান আলোচ্য হওয়া উচিত। আমরা বলিতে বসিয়াছি। পেটে অন্ন নাই, দেহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জন্ম সংখ্যা হ্রাস হইতেছে, মৃত্যু সংখ্যা বাড়িয়া উঠিতেছে। এ অবস্থার পরিণাম কি? এই কি ব্রহ্মদার

সাহিত্যালোচনার প্রকৃত সময়? কৃত্তিক, শক্তিতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব আলোচনা ও তাহার উপদেশ সকল কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা না করিয়া যে আর ধরাতে টিকিতেই পারি না। অনন্তমানে এক লক্ষ্য ভাবে এখন ঐ সকলেরই অমূল্যলন করা বিধেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, বিজ্ঞাপতি কবছ' কি করছ' লিখিয়াছিলেন, এই পাঠ-দ্বৈধের মীমাংসা করিবার নিমিত্ত আমরা যতদূর ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ি, বৈজ্ঞানিক আলোচনার তাহার শতাংশের একাংশও উৎসাহ প্রদর্শন করি না। এই অবস্থা অতীব সর্বনাশকর। সুকুমার সাহিত্যের প্রতি অত্যাশক্তি একটু কমা-ইবার সময় আসিয়াছে, এ কথা বলিয়া এবং কখন কখন কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া তিরস্কৃত হইয়াছি, কিন্তু তথাপিও ইহার উল্লেখ না করিয়া নীরব থাকিতে পারিলাম না।

বৈজ্ঞানিক আলোচনা গুলিলেই ভীত হইবার আবশ্যক নাই। সকলেই সেই ক্ষণ-জন্মা জ্ঞানযোগী শ্রুজ্ঞচক্রে অথবা জগদীশ-চক্রে ভ্রম্য বিজ্ঞানের পদে আত্মোৎসর্গ করিয়া দিবার অধিকারী নহে। কিন্তু সকলেই সাধ্যমত ইহার অমূল্যলন করিতে অথবা উৎসাহ দিতে সমর্থ। তাহা হইলেই যথেষ্ট হয়। নচেৎ বর্তমান যুগে ধরাতে জীবিত থাকিবারই উপায় নাই, সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া তো পরের কথা। আমরা প্রেমিক ছিলাম, অধুনা রাজনৈতিক হইয়াছি; কখন কি জ্ঞান-পিপাসু হইব না?

আমরা একটা কথা না বলিয়া আসন গ্রহণ করা অসম্ভব এবং অসম্ভব। আমাদিগের মাতৃকর্ণিনী মহিলাবর্গের এই মহতী সাহিত্য-মভারত স্থান হয় নাই। আমাদিগের কোন

কিছুতেই তাঁহাদিগের স্থান নাই। *সাহিত্য মানবজাতির উন্নতির প্রধান সহায়। কিন্তু মানবের অর্দ্ধাংশেরও অধিক সংখ্যককে বাদ দিয়া অপর অর্দ্ধাংশ উন্নত হইতে পারে কিনা, তাহা আপনারা বিবেচনা করিবেন। আমার নিকট ইহা শশবিষাগরৎ অনন্তব বলিয়া প্রতী-
 রমান হয়। নারী সাহিত্যচর্চায় অধিকারিণী। নারীগণকে অগতের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে বঞ্চিত রাখিলে বহুস্তে জাতীয় উন্নতির মূলো-
 ছেদ করু হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অমর কবি হেমচন্দ্র বলিয়াছেন,—

“না আগিলে সব ভারত-ললনা

এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।”

এই মহাবাক্য আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে অঙ্কিত হওয়া উচিত। কিন্তু অনেকেই নারীগণের সাহিত্যালোচনা আমাদের হইতে পৃথক পথে চালিত করিতে ইচ্ছা করেন। এস্থলে এই দুই বিষয় লইয়া বিতণ্ডা করা নিম্নয়োজন বোধ করি। নারী-
 গণের প্রকৃতিগত পার্থক্য, আমি স্বীকার করি; পুরুষ ও স্ত্রী জাতির বর্তমান প্রভেদ তো প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু এতদ্ব্যতিরিক্ত মৌলিক প্রভেদ স্বীকার করি না। মূলতঃ, বোধ হয়, স্ত্রী মূর্ত্তিই আদি, পুং মূর্ত্তি তাহারই বিকার মাত্র, অর্থাৎ তাহা হইতেই জাত। এ বিষয় বিস্তৃত আলোচনা আমি অন্তর * প্রকাশ করিয়াছি। সে বাহা হউক, মূলতঃ স্ত্রী পুং ভেদ থাকুক আর না থাকুক, বর্তমান সময়ে প্রভেদ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, এই বর্তমান প্রভেদ সুদীর্ঘ কালের অধীনতা-
 বশতঃই অনেকাংশে উৎপন্ন হইয়াছে। এ অধীনতার পুংজাতির আপাততঃ কিছু সুবিধা

* নব্যভারতে “স্ত্রী পুং ভেদ” উল্লেখ।

না আছে, এমন নহে। আপনাদিগের মধ্যে নারী-সেবী কেহ আছেন কি না, জানি না; আশা করি, নাই; যদি থাকেন, তবে তাঁহাকে আমি একটা কথা অন্তর্ভুক্ত করে বলিতে ইচ্ছা করি যে, সেই সুবিধাটুকু একটু একটু করিয়া ছাড়িয়া দিলে, অধিক সুবিধা পাইবেন, সন্দেহ নাই। সুবিধা কেন, পারিবারিক এবং জাতীয় উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিবেন, বলিয়াই বিশ্বাস করি। কিন্তু অগ্রে তাঁহাদিগকে উন্নত সাহিত্যের অধিকারিণী না করিয়া এই কার্যে ত্রুটি হওয়া যায় না; আমরা ত্রুটি হইলেও অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। তাই বলিতেছি, সেই মাতৃরূপিনিগণকে সাহিত্যালোচনার অংশভাগিনী করুন; দেখিবেন, তাঁহার আপনাদিগের প্রকৃত সহায়তা* করিতে সমর্থ হইবেন, বরং আপনাদিগের অপেক্ষাও অধিক ফললাভ করিবেন। দৃষ্টান্তের জন্য বড় অধিকদূর অব্বেষণ করিতে হইবে না। তাহা সুপণ্ডিত তর্করত্ন মহাশয়ের গৃহাশ্রমকে নিয়ত অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যা তর্করত্ন-
 দায়িত্বের সুকুমার প্ৰচণ্ডাবলী পাঠ করিলে কে প্রকৃত প্রস্তাবে কবিপদবাচ্য, তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। স্ত্রীশিক্ষা প্রকৃত পথে পরিচালিত হইলে এইরূপই হইবার কথা। কারণ সাহিত্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা স্ত্রী-রূপিনী। নরনারী উভয়ের মঙ্গলেই মানব সমাজের মঙ্গল। আর, মানব সমাজের মঙ্গলই সাহিত্যালোচনার উদ্দেশ্য। ধরাতলস্থ জীববংশে যেমন জীব-দেহের ইতিহাস বিবৃত করিতেছে, সাহিত্যও তেমনিই মানব মনের ক্রম-বিকাশ দেখাইয়া দিতেছে। তাই, এই ভাবেই সর্ববিধ সাহিত্যের আলো-
 চনা হওয়া উচিত, নচেৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা করা সঙ্গত হইবে না।

বাহাতে বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেই সাহিত্য আলোচনার অধিকারী হয়, তাহা করিতেই হইবে। বাহাতে বঙ্গভাষায় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সং-কাব্যাদি বিবিধ শাস্ত্র রচিত হয়, এবং সৰ্ব্ব বয়সের সৰ্ব্ব শ্রেণীর লোকেরই পাঠোপযোগী হয়, তৎপ্রতি মনোযোগ করা সাহিত্য সভার বিশেষ কর্তব্য। যিনি সক্ষম তিনি মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়নে, যিনি অধ্যবসায়শীল তিনি অনুবাদ প্রচারে বা মৰ্ম্মার্থ প্রকাশক পুস্তক ও প্রবন্ধাদি রচনায়, বঙ্গসাহিত্যের গৌরব ও উপকারিতা বৃদ্ধি করুন। বিবিধ ভাষা হইতে উপযুক্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করা এখন অত্যাवश्यक হইয়াছে। বাহাতে কেবল মাত্র বঙ্গসাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াই এতদেশীয় নরনারী উচ্চ শিক্ষিত হইতে সক্ষম হয়, মানবীয় সৰ্ব্ববিধ জ্ঞান-ভাণ্ডারে প্রবেশ লাভ করিবার অধিকারী হয়, তাহা করিতেই হইবে। নচেৎ কখনই বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন হইবে না। বঙ্গ সাহিত্যকে অগতের সাহিত্য-সমাজে গৌরবান্বিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, বাহাতে কেবল মাত্র ইহারই সাহায্যে পাঠক

উন্নত জ্ঞানের অধিকারী হয়, তৎপক্ষে বিশেষ ভাবে বঙ্গবান হওয়া অত্যাवश्यक হইয়াছে। আর অনর্থক কালহারণ করিবার অবসর নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এক্ষণে, উপসংহারকালে, কি বলিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিব, তাহার ভাষা খাইতেছি না। আপনারা যে আসনে আমাকে বসাইয়াছেন, তজ্জন্ত বঙ্গসাহিত্যের ধন্যবাদার্থ হইবেন বলিয়া বিশ্বাস করি নু। কিন্তু আপনারা অতি ধীরতার সহিত এতক্ষণ যে কষ্ট সহ করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। অল্প অনেক বিষয়ের ভাষ সাহিত্য-ক্ষেত্রেও এক নব যুগ উদিত হইতেছে; আর আপনাদের এই রংপুর নগরই যে সেই যুগ-প্রবর্তক, তাহা কখনই বিস্মৃত হইবেন না। যে ক্ষুদ্র নিখ-রিণী এই সোভাগ্যবান নগর হইতে বহির্গত হইয়াছে, বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে তাহা কলনাদিনী মহা প্রোত্নিষনীরূপে বঙ্গদেশ পবিত্র করুক, আর আপনারা সমবেত শক্তিতে নবীন সাহিত্যের অবতারণা করতঃ সেই শুভ কার্যের সহায় হইয়া বঙ্গসাহিত্যকে পূর্ণতা প্রদান করুন। *

শ্রীশশধর রায়।

শিশু ক্রয় ।

(১)

মহাশয়,

আবারের "নব্যভারত" প্রকাশিত "শিশু-ক্রয়" শীর্ষক প্রবন্ধের পাদটীকার লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"এই প্রবন্ধটি প্রবাসীতে ছাপাইবার জন্য পাঠান হইয়াছিল। সম্পাদক মহাশয় ছাপা-

ইবার কথা জানাইয়াও ছাপান নাই।

"মনোনীত" হইয়াও কেন যে ভ্রমসংশোধনার্থ ইহা ছাপান হইল না, তাহা সম্পাদক মহাশয়ই জানেন।"

* সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর শাখার চতুর্থ বাৎসরিক অধিবেশন পঠিত।

আমার বক্তব্য মনে পড়িতেছে, এই

প্রবন্ধটা ছাপা হইবে; এরূপ কথা লেখক মহাশয়কে লিখি নাই। তাঁহারই মুদ্রিত পোষ্টকার্ডে প্রবন্ধের আশ্রিত সংবাদ জানাইয়াছিলাম। প্রবন্ধটা ছাপাইব, এরূপ লিখিয়া থাকিলে লেখক মহাশয় আপনার নিকট সেই পত্র পাঠাইলে * আমার ভ্রম দূর হইবে। প্রবাসীতে প্রকাশার্থ বিস্তর লেখা আসে। আমাকে একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রও সম্পাদন করিতে হয়। এইজন্য অনবসর প্রযুক্ত আমি নূতন লেখকগণের লেখা পড়িবার জন্য একজন শিক্ষিত সহকারী নিযুক্ত করিয়াছি। অনেক প্রবন্ধ তাঁহার মনোনীত হইয়াও পরে আমার মনোনীত হয় না। বক্ষ্যমান প্রবন্ধটা এইরূপে তাঁহার মনোনীত হইয়াও আমার অমনোনীত হইয়াছিল কি না, মনে পড়িতেছে না।

শ্রদ্ধেয় ভগিনী নিবেদিতার পক্ষসমর্থন করিবার কোন প্রয়োজন * নাই। কেবল লেখক মহাশয়কে ইহা জানান বাইতে পারে যে, তিনি তাঁহার Cradle Tales-এর ভূমিকার লিখিয়াছেন, ঐ গল্পগুলিতে অনেকস্থলে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ অমূল্য হইয়াছে। অনেকস্থলে লেখিকা লোকমুখে বাহা শুনিয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, মনোনীত লেখাও অনেক সময় স্থানান্তরে পড়িয়া থাকে। ইতি মধ্যে প্রকাশে বিলম্ব দেখিয়া লেখক ফেরত চাহিলে ফেরত দেওয়া হয়। কোন প্রবন্ধ কি কারণে ছাপিতে বিলম্ব ঘটে, কেনই বা ফেরত যায়, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর কোন সম্পাদক দিতে পারিলে তিনি নিশ্চয়ই ভাগ্যবান পুরুষ। আমার ততটা শক্তিসামর্থ্য নাই। ইতি— নিবেদক,

• ত্রিমানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী-সম্পাদক।

* প্রবন্ধের কোণে “মনোনীত” কথাটি লেখা ছিল, পাঠ করিয়াছি। ন, স,।

(২)

পত আবার মাসের নব্যভারতে ত্রৈমাসিক নাথ মিত্র লিখিত শিশুকৃষ্ণ শীর্ষক একটা কুজ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। মাস মাসের ‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত ত্রিমুখ ভগিনী নিবেদিতা-লিখিত শিশুকৃষ্ণ বিষয়ক চিত্র পরিচর সম্বন্ধে উক্ত প্রবন্ধে তিনি দুইটা আপত্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রথম আপত্তি এই যে, বলরামকে ত্রিকৃষ্ণের সহোদর ভ্রাতা বলা হইল কেন? দ্বিতীয় কথা, প্রকারান্তরে “হিন্দুদিগের ইষ্টদেবতা ত্রিকৃষ্ণের” পিতাকে মিথ্যাবাদী (ও প্রবঞ্চক) বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। হিন্দুসমাজ সুরেন্দ্রবাবু অবশ্যই অবগত আছেন, দুই একজন নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু ইতিহাসের গর্ভ শোষণ (গবেষণা?) দ্বারা যাহাই প্রমাণ বা অপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করুন না কেন, স্বয়ং ত্রিকৃষ্ণেরই মাথায় ভুরি ভুরি ঐ মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার চাপ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার ইষ্টদেবত্বের কোনই হানি হয় নাই। সুতরাং তাঁহার পিতার একটা মিথ্যা ধরা পড়িলে যে হিন্দুধর্ম হঠাৎ রসাতলে বাইবে, সে আশঙ্কার কোনই কারণ দেখা যাইতেছে না। তবে এ তর্ক উঠিতে পারে যে, ত্রিকৃষ্ণের নামে ওগুলি অপবাদ, সত্য ঘটনা নাই। উত্তর এই, যাহারা ত্রিকৃষ্ণকে ইষ্টদেবতা মনে করেন, তাহারা ওগুলি সত্য বলিয়া গ্রহণ করতঃই ইষ্ট দেবতা জ্ঞানে পূজা করেন এবং ভক্তির সহিত কিছু অমিল হইল বলিয়া মনে করেন না। যাক্ সে কথা। এখন ঐ দুই আপত্তি বিষয়ে বিচার করা যাক্।

সুরেন্দ্র বাবু নিজেই বলিয়াছেন, “দেবী দেবকীর গর্ভ সন্নিবৃত্ত হওয়াতে নাম সন্নিবৃত্ত হইয়াছে।” সুতরাং বলরাম সম্বন্ধে দেবী দেবকীর গর্ভটা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া

চলে না। দেবকীর গর্ভ হইতে সন্তান^১ আনিয়া রোহিণীর^২ গর্ভে স্থাপন,—ইহাই হইল আখ্যায়িকা। এই খানেই পুরাণের কাহানি। কিন্তু দেবকীর গর্ভের^৩ যোগ যাচতেছে না। কাজেই বলরামের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সহোদরত্ব মাথোচ করা চলিবে না। “রূপক ছাড়িয়া দিলে” এত সহজেই যদি বলরাম নিছক রোহিণীনন্দন হইতে পারিতেন, তবে পুরাণকার এত হাঙ্গামার প্রয়োজ্য হইতেন না। পুরাণে তো কত লোকেরই জন্ম বিবরণ আছে, কিন্তু গর্ভ হইতে গর্ভান্তরে প্রবেশ তো এই একটা। সুতরাং ইহার একটা অর্থ অবশ্যই আছে। শ্রীকৃষ্ণ যে অর্থে বশোদানন্দন, বলরামও সেই অর্থে রোহিণীনন্দন, উভয়েই দেবকী গর্ভজাত এবং উভয়েই কংসের^৪ অজ্ঞ মাতৃকোড়ে প্রতিপালিত। সুরেন্দ্র বাবু এখানে রূপক কোথায় পাইলেন, তাহা আমাদের বুদ্ধি বজ্র অগম্য। আমরা তো দেখিতেছি, একটা ঐতিহাসিক ঘটনার উপর পুরাণকার তাহার পৌরাণিক রংএর কিঞ্চিৎ কারুগিরি করিয়াছেন। পুরাণ হইতে ইতিহাস বাহির করিতে হইলে যে প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়, সেই প্রণালী অনুসারে আমরা বুঝি এই যে, বলরাম দেবকীর “মাটাসে” ছেলে, কংস-কারাগারেই জন্ম কিন্তু রোহিণী কর্তৃক^৫ প্রতিপালিত। বলরাম পূর্ণ মাসে জন্ম গ্রহণ করেন নাই বলিয়া গর্ভপাতের সংবাদ অবিখ্যাস্য হয় নাই। ইতিহাসকে পুণ্যে পরিণত করিবার জন্ত পুরাণকার বলরামকে রোহিণীর কোড়ে স্থাপন না করিয়া একেবারে গর্ভে স্থাপন করিয়াছেন। জইলে পুরাণ হইবে কেন ? তবে প্রশ্ন হইতে পারে, কারাগার হইতে বাহির করা হইল

কিন্তু—? উত্তর, শ্রীকৃষ্ণকে বেয়শে বাহির করা হইল। পুরাণ পাঠক যাহাই অতি সহজে বুঝিতে পারেন, যে, কংসের বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে আর্ষ্য অনাৰ্য্য লইয়া এক বিরাট বড়বস্ত্রের অমুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার ফলে কংসের বিনাশ। দেশভুক্ত লোক, ভাষায়া দেখিবার জন্ত একত্রিত হইয়াছে, তাহার মঙ্গ কর্তৃক মঙ্গ বধ, মঙ্গ কর্তৃক হাণ্ডী বধ প্রভৃতি কত কি ভাষায়া দেখিল, শেষে দেখিল, তাহাদের রাজার মাথা দেহচ্যুত হইল—সেই সভার মাঝখানে। কিন্তু প্রশ্নের সব ভাষায়া দেখিয়াই ঘরে গেল। এ যে বড়বস্ত্রের ফল, ইহা তো সহজেই অমুস্তের। এই বড়বস্ত্র কৃষ্ণ বলরামের জন্মের সময়েই আরম্ভ হইয়াছিল। যে পিতাকে কায়াক্ষক করিয়া সিংহাসনে বসিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে বড়বস্ত্র যেমন অনিবার্য্য, আরাজীবের ভ্রাতা তাহার নিজের পক্ষে সন্ধিগমনা ও নির্ভর হওয়াও তেমনি অবগুস্তাবী। রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়াই তো দেবকীর সন্তান বিনাশে কংসের এত আগ্রহ; তেমনি আবার প্রতিক্রিয়ায় সেই সন্তান রক্ষার জন্তই প্রজাগণের মধ্যে বড়বস্ত্রের সৃষ্টি। এই বড়বস্ত্রের ফলেই শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের জীবন রক্ষা। তবে আমরা চিত্র পরিচয়ের কোথায় বহুদেবকে মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক বলা হইয়াছে, ইহাব আভাস পাইলাম না। একরূপ কি অনুমান করা যায় না যে, বহুদেবের অজ্ঞাতসাধেই “বলরামকে কারাগার হইতে সরাসরি ফেলা হইয়াছিল এবং কংসকে বলা হইয়াছিল যে শিশুটা জন্মিবার পরেই মারা গিয়াছে।” তবে কথা, এই সভ্যের অমু-রোধে না হয় ভগিনী নিবেদিতা * বলরামের

* কেবল সুরেন্দ্র বাবুর সাক্ষ্যই আমরা ভগিনী নিবেদিতাকে চিত্র পরিচয়ের লেখিকা বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। প্রবাসীতে তাহার নাম নাই।

বেলায় ভ্রম সংশোধন করিয়া লইলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে যে নাগরাজ বাসুকীর সাহায্যে বসুদেব স্বয়ং যজ্ঞনা পীরে যশোদার ক্রোড়ে রাখিয়া বিনিময়ে তাঁহার সমুদ্রপ্রস্থতা কল্পাকে আনিয়া দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান বলিয়া ক্রসংকে উপহার দিলেন, এ ভ্রম সুরেন্দ্র বাবু সংশোধন করিয়া দিতে পারিবেন কি? আমরা সর্বদাই একটা মন্ত ভুল করি। সেটা এই যে, পাশ্চাত্য আদর্শের আলোকে পৌরাণিক চরিত্রের দোষ গুণ বিচার করিতে যাই। সেই জন্ত আমাদের পক্ষে ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধার করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। চরিত্র সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শ ভিন্ন। প্রাচ্য আদর্শে বাহ্য পূর্ণ বলিয়া মনে হয়, পাশ্চাত্য আলোকে তাহা নিখুঁত বোধ হইবে না। আমরা যদি নূতন আলোকে বিচার করিয়া বাদ সাধ দিয়া পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে নিখুঁত করিতে যাই, তবে এক পুরাণের স্থানে আর এক পুরাণ স্থাপন করিব, ইতিহাস আমাদের হাত ছাড়া হইয়া যাইবে। “মিথ্যা” ও “প্রবঞ্চনা” কথা দুটা বড়ই শক্ত। যে চরিত্রে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা দেখা যায়, তাহা যে অনেক পরিমাণে মূল্যহীন হইয়া পড়ে, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু কোন্ কার্য্য মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা দোষে ছুটে, তাহা লইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ইহা মনে না রাখিলে সত্য নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িবে। বসুদেবের যে কার্য্যে সুরেন্দ্র বাবু তাঁহার নূতন আলোকের সাহায্যে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার জ্ঞাতাস দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়াছেন, পৌরাণিক আদর্শে তাহা মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা নহে। স্মরণ্য উক্ত কার্য্য আরোপ করিয়া পুরাণ-

কার চরিত্রের খর্ব্বতা সাধন করেন নাই। পুরাণকারের আলোকে পৌরাণিক চরিত্র পাঠ না করিলে, আপন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে না। “আমি পৌরাণিক আদর্শ সমর্থন করিতেছি না। তাহা করিবার আমার অধিকার নাই। কেন না, আমার কাছে যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শ মিলাইয়া এক নূতন আদর্শের আবির্ভাব হইয়াছে, তখন আমি ব্যক্তিগত ভাবে এই নূতন আলোকের অনুসরণ করিতে বাধ্য। কিন্তু পৌরাণিক চরিত্র পাঠ করিতে যাইয়া যদি আমি এই নূতন আলো হস্তে উপস্থিত হই, তবে সব গুলাইয়া যাইবে। তাই আমার মনে হয়, যাহারা পৌরাণিক চরিত্রকে এই নূতন আদর্শের আলোকে খাঁটি বানাইতে যান, তাঁহারা ঠিক পথ অনুসরণ করেন না।

বহুদূর যাইতে হইবে না, চারিশত বৎসরের আগেকার একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝা যাইবে, এত সহজে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার অপবাদ দেওয়া চলে না, বৈষ্ণবগণ গৌর নিতাইকে কৃষ্ণ বলরামের অবতার মনে করেন। গৌর বৃন্দাবন-বাইবার জন্ত উন্নতপ্রায়, “গৌরান্দ্র যারে দেখে তারে পুছে বৃন্দাবন কত দূরে।” নিতাই পথের বালকগণকে শিখাইয়া দিলেন, “গঙ্গার রাস্তাকেই তোরা বৃন্দাবনের রাস্তা বল।” গঙ্গাকেই যমুনা বলিয়া পরিচয় দিয়া নিতাই চৈতন্তকে বৃন্দাবন লইয়া যাইতেছি বলিয়া সব্বদীপে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। ভক্তগণ কেহ কখনও নিতাইকে মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক ভাবিয়া ভক্তির বাধা অমুভব করেন নাই। যেহেতু, আদর্শ অশ্রুপু। রূপ পলায়ন করিয়া চৈতন্তের সঙ্গে মিলিত হইলেন। স্মরণ্য তনও পলায়ন করিবার জন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া

উঠিলেন এবং পীড়ার ভাণ করিয়া বাটীতে বসিয়া রহিলেন। বন্ধুদের দেখিলেন, বিষম বিভ্রাট। সনাতনকে ছাড়িয়া রাজ্য চলিবে না। যখন হলেন সা দেখিলেন, নিবারণ অসম্ভব, তিনি সনাতনকে কারারুদ্ধ করিলেন। রূপ বলিয়া পাঠাইলেন, কোনও স্থানে দশ হাজার টাকা রাখিয়া আসিয়াছি, সেই টাকার সাহায্যে মুক্ত হইতে চেষ্টা কর। সনাতন সেই টাকার সাহায্যে কারামুক্ত হইয়া গৌরের সঙ্গে মিলিত হইলেন। এদিকে দেখুন, সক্রটিস অভিযুক্ত, কিন্তু একেবারে শক্ত পাথর, কোন ওজর নাই, কোন ভাণ নাই। মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা পাইয়া এক মাসের জন্ত কারারুদ্ধ। কারাগার হইতে পলাইয়া জীবন রক্ষার সকল আয়োজন প্রস্তুত। অল্পমতি পাইলেই শিষ্ণুগণ এমন ব্যবস্থা করিতে পারেন, আর শত্রুগণ তাঁহাকে ধরিতে পারিত না। কিন্তু সক্রটিস কি বলিলেন? “এরূপ কার্য আমার

চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গত হইবে না” এবং অব্যাকুলিত-চিত্তে বিপদান করিয়া জীবন বিসর্জন করিলেন। এ বিষয়ে যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শে বিভিন্নতা আছে, তাহা অঙ্গীকার করিতেই হইবে, না করিলে ফল হইবে পদে পদে ভ্রান্তি।

এখন একটা অবাস্তব কথা বলিয়াই শেষ করিব। শ্রীকৃষ্ণই বহুদেবের পুত্র বলিয়া বাহুদেব, না বহুদেব শ্রীকৃষ্ণের পিতা বলিয়াই বহুদেব। একটা স্মৃতি আছে—

বহুঃ সর্বনিবাসচ্চ বিশ্বানি যন্ত লোমহুঃ ।

স চ দেবঃ পরব্রহ্ম বাহুদেব ইতি স্মৃতঃ ॥

স্মৃতাং দেখা যাইতেছে, পরব্রহ্মের কোন বাবা না থাকিলেও তিনি বাহুদেব। শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্মের অবতার ধরা হয় বলিয়া তিনি স্বাধীন ভাবেই বাহুদেব খেতাব পাইতে পারেন।

ত্রিধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

গীতার অবতারবাদ । (২)

(ঘ) অবতার ক্রমবিকাশের ফল ।

কাহাকে আমরা অবতার বলিতে পারি না, তাহা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। অবতীর্ণ হওয়া কাহাকে বলে, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে আলোচিত হইল।

পূর্ক্স আমরা অবগত হইয়াছি যে, দ্বিতীয় পুরুষ অশ্রুত অবতারের বীজ ও নিধান, তিনিই আত্ম অবতার। পুরাণে তাঁহাকে বিরাট পুরুষ বলা হইয়াছে এবং উপনিষদে তাঁহাকে প্রজাপতি আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে অবতারতত্ত্বের গুঢ়-রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। যথা,—

“আত্মবেদমগ্র আনীৎ পুরুষবিধঃ সোহমু-
বীক্ষ্যনাশ্রদানোহপশ্যৎ সোহমস্মীত্যগ্রে
বাহরততোহহং নামাভবৎ তস্মাৎ অপ্যেত-
র্হ্যামব্রিতোহহমব্রমিত্যেবাগ্ন উক্তাখাত্তনাম
প্রকৃতো যদন্ত ভবতি স যৎ পূর্ক্সোহস্মাৎ
সর্বস্মাৎ সর্বান্ পাণ্ডুন্ ওষৎ তস্মাৎ পুরুষ
ঐযতি হইব সতং বোহস্মাৎ পূর্ক্সো বৃত্তযতি য
এবং বেদ।” ১৪।১

অর্থাৎ এই পুরুষকার বিশিষ্ট আত্মাই পূর্কে ছিলেন। তিনি অমুবীক্ষণ করিয়া আপনা ভিন্ন অন্ত কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি “অহমস্মি” এই বাক্য

প্রথমে উচ্চারণ করিয়াছিলেন, •সেইজন্ত •অহং” নাম বিশিষ্ট হইয়াছিলেন। এখনও পর্য্যন্ত কেহ স্বেধধর্ম করিলে “এই আমি” এই কথা প্রথমে বলিয়া, লোক পরে পিতৃ-মাতৃদত্ত তাহার নির্দিষ্ট জন্ত নাম বলিয়া থাকে। যে হেতু তিনি অজ্ঞাত সকলের পূর্বে সকল পাপ দক্ষ করিয়াছিলেন, এই জন্তই তিনি পুরুষ বলিয়া অভিহিত। যিনি তাঁহার পূর্ববর্তী হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে দক্ষ করিয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত মূলের অর্থ স্পষ্ট বুঝিবার জন্ত নিম্নে শাক্তরীত্য হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

“জ্ঞানকর্মভ্যাং সমুচ্চিভাতাম প্রজাপতিত্ব প্রাপ্তিব্যাখ্যাতা”—অর্থাৎ সমুচ্চিত জ্ঞান ও কর্ম হইতেই যে প্রজাপতিত্ব প্রাপ্তি হয়, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। “আত্মবাস্তবোতি প্রজাপতিঃ প্রথমোহণ্ডজঃ শরীরী •অভিধায়তে”—আত্মা শব্দে প্রজাপতি অভিহিত হইয়াছেন, যিনি প্রথম, অণ্ডজ ও শরীরী। “বৈদিক-জ্ঞানকর্মফলভূতঃ স এব কিমিদং শরীরভেদ-জাতং তেন প্রজাপতি শরীরেণাবিত্তম্ভমায়ৈ বাসীং অগ্রে প্রাক্শরীরান্তরোৎপত্তেঃ”—বৈদিক জ্ঞান ও কর্মের ফলভূত সেই প্রজাপতি শরীরান্তর উৎপত্তির পূর্বে অবিভক্ত শরীরবিশিষ্ট ছিলেন। “পুরুষবিধঃ পুরুষ-প্রকরণঃ শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণে বিরটি”—তিনি পুরুষকার, মস্তক হস্তপদাদি লক্ষণবিশিষ্ট বিরটি। “পূর্বজন্মশ্রোতবিজ্ঞানসংস্কৃতঃ সোহহং প্রজাপতিঃ সর্বাঙ্গা”—পূর্বজন্মের শ্রোত বিজ্ঞানরূপ সংস্কারবিশিষ্ট আমি সেই সর্বাঙ্গা প্রজাপতি। “জ্ঞানকর্মভাবনাগুণান্বহিনা কেবলং জ্ঞানবলান্দোষতি ভয়াকিরোতি হবৈ গীঃ তং কং যোহস্মাদ্বিধ্বং পূর্বে প্রথমঃ প্রজাপতিত্বম্ বৃত্তবতি ভবিতুমিচ্ছতি তমিত্যর্থঃ।

তদর্শয়তি য এবং বেদেতি সামর্থ্যাৎ জ্ঞান-ভাবনাপ্রকর্ষবান্। নম্বনর্থায় প্রজাপত্য প্রতিপিত সৈবংবিদা চেদহতে। নৈব দোষঃ । জ্ঞানভাবনোৎকর্ষাভাবাৎ প্রথমম্প্রজাপতিত্ব-প্রতিপত্ত্যভাবমাত্রহাৎ দাহন্ত। উৎকৃষ্ট সাধনঃ প্রথমম্প্রজাপতিত্বম্ প্রাপ্লবন্ নানসাধনো ন প্রাপ্নোতীতি স তং দহতীতি উচ্যতে ন পুনঃ প্রত্যক্ষম্ উৎকৃষ্ট সাধনে নেতরো দহতে।”—অর্থাৎ সেই প্রজাপতি পূর্বজন্মে কর্ম জ্ঞান ও ভাবনার অনুষ্ঠান দ্বারা যাহারা প্রজাপতি হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের মধ্যে সর্বপ্রথমে আসক্ত ও অজ্ঞান লক্ষণ প্রজাপতিত্বের ইচ্ছুক অন্তকে দাহন করেন। কিন্তু তাহা হইলে এই সন্দেহ আসিবে যে, প্রজাপতি হইবার ইচ্ছা বড়ই অনর্থকর। কিন্তু সেইরূপ সন্দেহের কোন কারণ নাই। এখানে দহন শব্দের অর্থ উৎকর্ষণাত মাত্র।

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে কর্ম, জ্ঞান ও ভাবনা দ্বারা মনুষ্য যে সকল অধিকার প্রাপ্ত হয়, সেই সকল অধিকারের মধ্যে প্রজাপতিই সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। •উনিষদের প্রজাপতিকে পুরাণে বিরটিপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনিই দ্বিতীয় পুরুষ, তিনিই Solar Logos। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর। ভগবান্ এক হইলেও বিরটি পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডভেদে বিভিন্ন। এক এক করে এক একজন বিরটি পুরুষ হইয়া থাকেন। জীব ব্রহ্মাণ্ডের সীমা আতক্রম করিয়া ঈশ্বর লাভ করিলেও অজীবের উৎকর্ষসাধন জন্ত অবতার গ্রহণ করেন। কোনও ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এইরূপে যাহারা অবতার গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সকলের পূর্ববর্তী এই বিরটিপুরুষ। •এই জন্তই তাঁহাকে আত্ম অবতার বলা হয়। •

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা ইহা অবগত হইলাম যে, অবতার ক্রমবিকাশের (Evolution) ফল। জীব, সাধনার দ্বারা ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়া যখন ব্রহ্মাণ্ডের সীমা অতিক্রম করিয়া থাকেন, তখন বিশেষ কার্যের জন্ত অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেই বিশেষ কার্য হইতেছে অত্র জীবের উৎকর্ষ সাধন।

শ্রীমতী এনিবেসান্ট অবতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

“Fundamentally He is the result of evolution. In far past Kalpas, in worlds other than this, nay, in universes earlier than our own, those who were to be Avatars climbed slowly, step, by step the vast ladder of evolution, climbing from mineral to plant, from plant to animal, from animal to man, from man to jivanmukta, from jivanmukta higher and higher yet, up the mighty hierarchy that stretches beyond Those who have liberated themselves from the bonds of humanity; until at last, thus climbing, They cast off not only all the limits of the separated Ego, not only burst asunder the limitations of the separated self but entered Ishvara himself and expanded into the all consciousness of the Lord, becoming one in knowledge as they had ever been one in essence with that eternal Life from which originally they came forth, living in that life, centres without circumferences, living centres, one with the Supreme”

Avatar, pp 9, 10.

অবতার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন যে, “বিরাটপুরুষকেই আমরা ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বলিব। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে কত মহাত্মা ঈশ্বর হইবার প্রয়াস করেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ভার নিজ মস্তকে বহন করি-

বার জন্ত সমুৎসুক। সকলেই চাহেন যে, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। বিশ্বই সকলের ধ্যান। বিশ্বগত সকলের কর্ম। তাঁহাদের সত্তাও বিশ্বব্যাপী। তাঁহারা সকলেই বিভূ। সকলেই ষড়ৈশ্বর্য-পূর্ণ স্বতন্ত্র ঈশ্বর। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজনই বিরাটপুরুষের অধিকার প্রাপ্ত হন। অত্র সকলে সেই বিরাটপুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এবং বিশ্বের পালন জন্ত তাঁহারা সময়ে সময়ে ভূমণ্ডলে অবতারণ হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকেই বিষ্ণুর লীলাবতার বলে। তাঁহাদের নিজের কিছুই প্রয়োজন নাই। এইজন্ত অবতার গ্রহণ তাঁহাদের লীলা মাত্র। যদিচ বিরাট পুরুষ তাঁহাদের বীজ ও নিধান, তথাপি তাঁহারা বিরাট পুরুষ অপেক্ষা কোন অংশে নূন নহেন। যত্বপি এ ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহারা বিরাট পুরুষ হইতে সক্ষম হন নাই, অন্য ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহারা বিরাট পুরুষ হইবেন। যেমন নদ নদীর সমুদ্র জল মধ্যে পতিত হইয়া সমুদ্রের জল বলিয়াই পরিগণিত হয়, সেইরূপ লীলাবতার সকল বিরাট পুরুষে লীন হইয়া তাঁহার সহিত অভিন্ন ভাব ধারণ করেন। তথাপি তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা আছে।

সে স্বতন্ত্রতা কেবল বিশ্বকার্যে পরিলক্ষিত হয়। যখন তাঁহারা অবতার গ্রহণ করেন, তখনই তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা। তাঁহাদের করণায় জগৎ ব্যাপিত রহিয়াছে। তাঁহাদেরই রূপাবলে মহুঘোর মহুঘাত, জীবের মহত্ব। তাঁহাদেরই নির্দেশিত পথ অবলম্বন করিয়া জগৎ উন্নতির অভিযুগে ধাবমান হইতেছে এবং তাঁহাদের প্রভূত সত্ত্বশ্রোত জগতের মালিন্য ক্রমশঃ নষ্ট করিতেছে।”—পৌরাণিক কথা, পৃঃ ৩৫।৩৬।

প্রয়াগে যেমন গঙ্গা ও যমুনা মিলিত হইয়া পুনরায় ত্রিবেণীতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে,

অথবা প্রলয়ে যেমন সকল জীব ভগবানে নিমজ্জিত (merge) হইয়া পুনরায় সৃষ্টিতে বহির্গত (re-emerge) হইয়া থাকে, সেইরূপ সিদ্ধ যুক্তেরা ভগবানে নিমজ্জিত (merge) হইয়া তাঁহাদের সংবিতের কেন্দ্র (centre) অক্ষুণ্ণ রাখেন, প্রয়োজন হইলে অবতার হইয়া আবার বহির্গত (re-emerge) হইয়া থাকেন। সাধনার দ্বারা মুমুক্ষু যে ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যাইতে পারেন, ক্রমবিকাশিত হইয়া মুমুক্ষু যে বিভিন্ন প্রকার অধিকারী হইয়া অবশেষে প্রজাপতিত্ব অথবা বিরাট পুরুষ লাভ করিতে পারেন, অবতারত্ব বৃদ্ধিতে হইলে তাহা বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। অবতার ক্রমবিকাশের ফল, তাহা আমরা বৃহদারণ্য-কোপনিষদ হইতে অবগত হইয়াছি। যোগ-বাশিষ্টেও এই কথার প্রতীক্ষণি পাইমাছি। যথা—

পৌরুষেণৈব যত্নেন সহসান্তোরুহাস্পদম্।

কশ্চিদেব বিহুঃসো ব্রহ্মতামধিষ্ঠিতি ॥১৪

সারেণ পুরুষার্থেন স্টেনৈব গরুড়ধ্বজঃ।

কশ্চিদেব পুমানৈব পুরুষোত্তমতাং গতঃ ॥১৫

পৌরুষেণৈব যত্নেন ললনাবলিতা কৃতিঃ।

শরীরী কশ্চিদেবেহ গতশ্চন্দ্রার্কী চূড়তাম্ ॥১৬

(মুমুকু—৪)

অর্থাৎ কোন জীব বিশেষ পুরুষকার নামক প্রযত্নের ফলেই কমলাসনে ব্রহ্মপদে অধিষ্ঠিত। কোন পুরুষ স্বীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষকার বলেই গরুড়ধ্বজ পুরুষোত্তম হইয়াছেন। ইহ-সংসারে কোনও এক প্রাণী পুরুষকার প্রযত্ন ফলেই অর্ক নারীখর শিবরূপে বিরাজ করিতেছেন। অর্থাৎ সাধনার দ্বারা ই জীব ব্রহ্মা, বিষ্ণু অথবা মহাদেব হইয়া থাকেন। আমরা যাহাদিগকে এখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু অথবা মহাদেব

বলিয়া অবগত আছি, তাঁহারা যে কত কল্প ধরিত্রী সাধনা করিয়াছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সেই সাধনার ফলেই এই কল্পে তাঁহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং মহাদেবের পদে অধিষ্ঠিত। তাঁহাদের সাধনা স্বার্থের জন্ত নহে। তাঁহারা জীবন-মুক্ত। তাঁহাদের নিজের কিছুই প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য জীবের উৎকর্ষ সাধন। তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ভার নিজ মস্তকে বহন করিবার জন্ত সমুৎসুক।

মুমুক্ষু যেক্রপ সাধনা করিয়া থাকেন, তাহার কলে সেইরূপ অধিকারী হইয়া থাকেন। ব্রহ্মসূত্রেও (৪।৪।১৮) উক্ত হইয়াছে যে,—“অধিকারী মণ্ডলস্থোক্তেঃ।” ইন্দ্রাদি দেবগণ এখন যে সকল পদে অধিষ্ঠিত, তাহা তাঁহারা সাধনার দ্বারা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহারা যেক্রপ সাধনা করিয়াছেন, সেইরূপ মণ্ডলের অধিকারী হইয়াছেন। ঋষি, প্রজাপতি, মনু, দেব এবং মহাতেজস্বী মনুপুত্রগণ সাধনার দ্বারা সংবিতের যেক্রপ বিকাশ করিয়াছেন, সেই বিকশিত অবস্থায় আজ তাঁহারা স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত। মনুষ্যের সংবিৎ পুষ্প-কলিকাবৎ অপ্রস্ফুটিত অবস্থায় রহিয়াছে। ইহা যখন সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইবে, তখন ঐশ্বরিক সংবিতের পরিণত হইবে। সাধনার দ্বারা মনুষ্যের সংবিৎ ক্রমবিকাশিত হইয়া ঐশ্বরিক সংবিতের পরিণত হইয়া থাকে। এই ক্রমবিকাশের এক এক অবস্থার এক একটা নাম আছে। কোন অবস্থাকে ঋষি বলে, কোন অবস্থাকে প্রজাপতি বলে, কোন অবস্থাকে মনু বলে, কোন অবস্থাকে দেবতা বলে, এবং কোন কোন অবস্থাকে ব্রহ্মা বিষ্ণু বা মহাদেব বলা হইয়া থাকে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহা-

দেবাদি, পদ ভিন্ন আর কিছুই নহে । সিদ্ধ-
নির্মাণ প্রাপ্ত পুরুষেরই এই সকল পদ লাভ
করিয়া থাকেন ।

শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, যদি
কোনও কর্মে কোন জীব উপাসনা বলে
সৃষ্টির অধিকার গ্রহণ করিতে সমর্থ হন,
তাহা হইলে আর দ্বিতীয় পুরুষকে সে কর্মে
ব্রহ্মার কার্য্য করিতে হয় না । তিনি সেই
জীবে সৃষ্টির প্রকৃত শক্তি সঞ্চারণ করেন ।
যথা,—

“ভক্তি মিশ্র কৃতপুণ্যে কোন জীবো ভন ।
রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন ॥
গর্ভোদকশায়ীদ্বারে শক্তি সঞ্চারি ।
ব্যষ্টি-সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মারূপ ধরি ॥
কোন কর্মে যদি যোগ্য জীব নাহি পায় ।
আপনে ঈশ্বরে তবে অংশে ব্রহ্মা হয় ॥”

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যম খণ্ড, বিংশ
পরিচ্ছেদ ।

পদ্মপুরাণেও কথিত হইয়াছে,—

“ভবেৎকচিন্নহাকর্মে ব্রহ্মা জীবোহুপাসনৈঃ ।
কচিদত্র মহাবিশুঃস্বয়ং প্রতিপত্ততে ॥”

অর্থাৎ কোন কোন মহাকর্মে জীবও
উপাসনা প্রভাবে ব্রহ্মা হন । আর কোন
কোন মহাকর্মে মহাবিশুই ব্রহ্মা হইয়া
থাকেন ।

জীব যখন ব্রহ্মাণ্ডের সীমা অতিক্রম
করিয়া ঐশ্বরিক সর্বব্যাপী বা ঈশ্বরত্ব লাভ
করিয়া থাকেন, তখন তাঁহার চরম অধিকার
লাভ হইয়া থাকে । দ্বিতীয় পুরুষ জীবের
চরম অধিকার—তিনি জীব ও পরমপুরুষের
মিলন স্থান । জীব যখন সেই চরম অধি-
কার লাভ করেন, তখন তিনি অল্প জীবের
উৎকর্ষ সাধনের জন্য অবতার গ্রহণ করিয়া
থাকেন । কিন্তু এই চরম অধিকার লাভ

করিতে জীবের যে কত জন্ম জুতীত হইয়া
যায়, কত কর্ম যে কাটিয়া যায়, কত সাধনা
যে করিতে হয়, তাহার আর ইয়ত্তা নাই ।
শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বলিয়াছিলেন যে,—

“বহুনি সে ব্যাতিতানি জন্মানি”—গীতা
৪।৫—অর্থাৎ, আমি অনেকবার জন্মগ্রহণ
করিয়াছি । ঈশ্বরত্ব লাভ করিবার পূর্বে
তিনি যে কত জন্ম ধরিয়া সাধনা করিয়া-
ছিলেন, তাহার যদিও উল্লেখ নাই, কিন্তু
তজ্জন্ম যে তাঁহাকে অনেক জন্ম অতিবাহিত
করিতে হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ
নাই । সেই সাধনার বলেই তিনি ঈশ্বরত্ব
লাভ করিয়া অবতার হইয়া অবতীর্ণ হইয়া-
ছিলেন ।

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা
অবগত হইলাম যে, অবতার ক্রম-
বিকাশের ফল মাত্র । সাধকগণ জীবন মুক্ত
হইয়া যখন প্রজাপতিত্ব লাভ করেন, তখন
তাঁহাদের সংবিতের কেন্দ্র অঙ্গুল রাখিয়া
থাকেন । যখন অবতার গ্রহণের প্রয়োজন
হয়, তখন তাঁহারা অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে
অবतरণ করেন—অপ্রাকৃত বৈভব হইতে
প্রাকৃত বৈভবে অবतरণ করিয়া থাকেন ।

(ঙ) কে অবতার হন—ব্রহ্মা,

বিষ্ণু না শিব ?

পূর্বে আমরা আলোচনা করিয়া দেখি-
য়াছি যে, দ্বিতীয় পুরুষ কোনও এক ব্রহ্মা-
ণ্ডের ঈশ্বর । সেই ব্রহ্মাণ্ডে তিনি ব্রহ্মা,
বিষ্ণু এবং রুদ্ররূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন ।
বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

“সৃষ্টিস্থিতিত্যক্তকরণাদ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্ ।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান্ এক এব জনার্দনঃ ॥”

কেবল মাত্র এক জনার্দনই সৃষ্টি, স্থিতি অথবা প্রলয় করিয়া থাকেন বলিয়াই ব্রহ্মা, বিষ্ণু অথবা শিব বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন। এই তথ্যটি আমাদের বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু অথবা শিব পৃথক নন, তাঁহারা মূলতঃ (in essence) সেই এক জনার্দনই, কেবল জনার্দনের বিভিন্ন বিভাব (aspects) লক্ষ্য করিয়াই তাঁহাদিগকে আমরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু অথবা শিব বলিয়া থাকি। যে বিভাবে তিনি সৃজন করেন, সেই বিভাবকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মা বলা হয়, যে বিভাবে তিনি পালন করেন, সেই বিভাবকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে বিষ্ণু বলা হয় এবং যে বিভাবে তিনি সংহার করেন, সেই বিভাবকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে শিব বলে। মোটের উপর তাঁহাদের সত্তা একই (unity of existence)। কারণ বস্তু এক, দুই হইতে পারে না। একই বহু হইয়া প্রতিভাত। ঐ অদ্বিতীয় সমস্ত, অংশতঃ প্রণীত হইলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন। তাঁহাদের কার্য (functions) বিভিন্ন প্রকারের বলিয়াই তাঁহারা আমাদের নিকট পৃথক বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকেন।

কিন্তু তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য যে, তাঁহার কোন বিভাব হইতে অবতারগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে—অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু না শিব অবতার হইয়া থাকেন? আমরা শাস্ত্রে কেবল বিষ্ণুরই অবতারের কথা পাইয়া থাকি। শিব অথবা ব্রহ্মার অবতারের কথা পাই না। বিশেষ কার্যের জন্ত ইঁহারা দুই জনে সমস্ত সমস্ত বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া এই বিশ্বরূপ নাট্যশালায় অভিনয় করেন নাই। আমরা মহাভারতে দেখিতে

পাই যে, মহাদেব কিরাতের বেশ ধারণ করিয়া অর্জুনের বল পরীক্ষা করিয়াছিলেন। অন্তত উল্লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীশঙ্করাচার্য যখন কাশীধামে সশিষ্যে আগমন করিতেছিলেন, তখন তিনি চণ্ডালের বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার জ্ঞানের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা সম্বন্ধে এইরূপ অনেক উপাখ্যান দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ইঁহারা যে সকল আকার ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষণস্থায়ী, সময় বিশেষের এবং কার্য বিশেষের জন্ত ঐরূপ আকার উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রাদি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিষ্ণু অপেক্ষা ব্রহ্মারূপাদির নূনতা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

“অথাপি যৎ পাদনথাবস্থঃ
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতাংগান্তঃ।
সেশং পুনাতান্যতমো মুকুন্দঃ
কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ ॥”

—(১১৮১১)

অর্থাৎ ব্রহ্মদত্ত অর্হণোদক বাঁহার পাদ নথ দ্বারা বিস্তৃষ্ট হইয়া রুদ্রের সহিত সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, সেই মুকুন্দ হইতে আর ভগবৎ পদার্থ কি আছে। বরাহ-পুরাণ ঐরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

“মংস্ত কুর্ষ বরাহাণ্ডাঃ সমা বিষ্ণোরহুদতঃ।

ব্রহ্মাণ্ডাসমাসঃ প্রোক্তাঃ প্রকৃতস্ত সমাসমা ॥”

অর্থাৎ মংস্ত, কুর্ষ, বরাহ প্রভৃতি অবতার অভেদহেতু বিষ্ণুর সম বলিয়া, ব্রহ্মাদি দেবতা অসম বলিয়া এবং প্রকৃতি সমা ও অসমা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। পঞ্চ পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

“হরিরেব সদা রাধা: সৰ্বদেবেশ্বরেখরঃ ।

ইতরে এক রুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়া: কদাচন”

বিষ্ণুই সৰ্বদেবেশ্বরেখর, তিনিই সদা-
রাধা; কিন্তু তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ হইলেও
ত্রুকা রুদ্রাদি অবজ্ঞেয় নহেন।

পূৰ্বোক্ত শ্লোকগুলি হইতে প্রমাণ পাওয়া
যাইতেছে যে, শাস্ত্র বিষ্ণু অপেক্ষা ত্রুকা রুদ্রা-
দির ন্যূনতা করিয়াছেন।

বিষ্ণু জীব পালক। তিনি সৰ্বত্র ব্যাপ্ত
হইয়া আছেন। তাঁহার কার্য্য হইতেছে

পালন করা। তিনি জীবের অন্তর্যামীরূপে
বর্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার-করণায় জগৎ
উদ্ভাসিত। তিনি পালনকর্তা স্বামী বলিয়াই
অবতারগণের বীজ (source) স্বরূপ। তিনি
ভিন্ন জীবগণকে আর কে পালন করিবেন?
তিনি অবতার হইয়া এই পৃথিবীতে আসিয়া
জীবগণকে উন্নতির পথে লইয়া যান এবং
ক্রমবিকাশের (evolution) স্রোত বেগে প্রবা-
হিত করিয়া থাকেন। (ক্রমশঃ)

শ্রী আশুতোষ দেব।

মুক্ত ।

(১)

টোটার বোটার ধোলে ফুটে র'ঙ। হাসির ফুল;
আনি এসে পুষ্প চরনে,—
ভুলে খালি কুলের পানে চাই।
খলক্ ভরে তরল্ আলো ছাপিয়ে পাতার কুল
উজ্জ্বলে পড়ে উজল্ নয়নে;
সেই আলোকে নেয়ে-ধুয়ে বাই।
স্বরে দেদার স্বধার স্বরা গীতি-ধ্বনিতে;
স্বর্ণাকুলের বাতাস লাগে গায়,
ছিটে ফোঁটা মধু শুধু পাই।
ফুলে' ফুলে' জোয়ার ওঠে রূপের নদীতে,
ছলে ছলে তরী ভেসে যায়;
কুলে কুলে আনি ছুটে ধাই।

(২)

জালে পড়া পাখী আছি পাখা ছড়িয়ে;
কাঁটা-পাখা আটা-মাখা পাশ!
দাঁড়িয়ে দূরে দেখ্ ছ শিকারী?
যেতে হুহুন্ দিচ্ছ বাঁধন পায়ে জড়িয়ে?
এত বেজায় নিঠুর পরিহাস!
উড়তে নারি কচ্চি স্বীকাঃই।

টোপ্ গিলেছি লোভে প'ড়ে, উগ্নরে ফেলা দার;
দিটির জোড়া-বঁড় শি বিধেছে।
মজা তোমার, মাছের বেপারি।
হেঁচকা টানে মাছ খেলালে কঠা ছিঁড়ে যায়,—
বোঝেনা, যে খেলায় মেতেছে,
এই ছুনিয়ার এগ্নি বেতার-ই
প্রাণের দখল চাইনে, কেবল মুষ্টি ভিখারী,
তবু কেন দোর ফেলে যাও?
প্রেমনিধি থাকুক ভাড়ায়ে।
চাইনে প্রেমের জমীদারী; গরিব বেচারি—
খুসি হব, যদি মোরে দাও
ছুটি দানা অচল ষাড়ায়ে।
তৃপ্তি আমার, মুক্ত প্রাণে কাটিয়ে দেওয়া দিন;
মন্ মজাতে নেইক মনে সাধ।
জীবন্ ভরা থাকুক বাঁধা রে!
বসি রূপের সিংহাসনে, বাজিয়ে প্রেমের বীণ
—স্বরের নেশায় করে দিয়ে মাংস,
বিশ্ব রাধ মোহে বাঁধারে।
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

দুর্গেশনন্দিনীর বন্ধি মচন্দ্র । (শেষ)

আয়েষা দুর্গেশনন্দিনীর উজ্জলতম চিত্র । কালিদাস অননুগ্রহ ও প্রিয়বদাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, অথচ সখিপ্রেমে তাহার উদাসীনা, সর্বভাগিনী । * বন্ধি বাবু নায়িকা হইতে ; আয়েষাকে উজ্জলতম আঁকিয়াছেন । আয়েষা, তিলোত্তমা ও বিনলা, তিনই ভাস্কর-খোদিতা *মূর্ত্তি । আয়েষা বাস্তবজীবনে মিলে না । তিলোত্তমা মিলিলেও মিলিতে পারে ; কিন্তু তাহাকে লইয়া সংসার করা চলেনা—তুমি যদি তিলোত্তমার নায়কী পাপ, তাহা হইলে মহাবিপদে পড়বে । কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্রনাথ বিবর্তে পারেন নাই, তুমি তিলোত্তমাকে বিবর্তে পারিবেনা । বিনলা দেখিতেই ভাল ; এমন জ্ঞানানন্দী স্পর্শ করিলে পুড়িয়া যাইতে হইবে । ইংরাজী সাহিত্য পড়িয়া ও বাঙ্গালী চরিত্র দেখিয়া বন্ধি আমাদের সমক্ষে তিনটা আদর্শ স্ত্রী-চরিত্র স্থাপন করিলেন । এমধ্যে আয়েষা সর্বোচ্চে, কিন্তু এত উচ্চে যে দেবীও পদ অধিকার করিয়াছে ; তাহাকে নায়িকা করিলে উপজ্ঞাসেব মাধুর্য্য নষ্ট হয় ; তজ্জন্ত বন্ধি তিলোত্তমাকেই নায়িকা করিয়াছেন । সুতরাং আয়েষাকে বন্ধি তিলোত্তমাপেক্ষা হীন করেন নাই । তদপেক্ষা উচ্চে স্থান দিয়াছেন । বন্ধি বাবু যেমন চণ্ডী ও বিলাসিনী *কংলুর্গা-গৃহিণীগুলির চিত্র আঁকিয়া মুসলমানরাজ হারেদের কক্ষ দিক্ দেখাইয়াছেন, তেমনি আবার আয়েষাকে আঁকিয়া বন্ধি মুসলমানান্তঃপুরের উজ্জল দিক্ও দেখাইয়াছেন । বন্ধি দেখাইয়াছেন ‘রমণী রমণী’ হিন্দুই ইউন, আর মুসলমানই ইউন ।

ওসমান চরিত্রকেও তিনি জগৎসিংহ অপেক্ষা অধিক হীন করেন নাই । জগৎসিংহ বীর, কৌশলময়, যোদ্ধাপতি, গুণ সম্পন্ন ; ওসমানও । জগৎসিংহ সত্যপ্রিয় ; ওসমানও ।

জগৎসিংহ ধার্মিক, মন্দিরঘারে পদাব্যাত করেন না ; বিঘন মনোকষ্টে গুরুদেবকে স্মরণ করেন ; ওসমানও ধার্মিক, পীড়িত আততায়ীর গুণগণা করেন, তাঁহাকে যত্ন করেন । সত্য বটে, গড়মন্দিরগের ব্রাহ্মণ-গণকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করায় ওসমানকে আপত্তি করিতে দেখিনা ; বরং তাহাকে বলিতে শুনি, “মুসলমানের বিবেচনার মহিমণীষ ধর্ম্মই সত্যধর্ম্ম ; বলে হউক, ছলে হউক, সত্যধর্ম্ম প্রচারে আমাদের মতে অধর্ম্ম নাই ; ধর্ম্ম আছে ;” কিন্তু ওসমান প্রভুর কার্যের স্বাপক্ষীয় বৃত্তি দিয়াছেন নাই । তাঁহার হৃদয় উদার ছিল, তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে তিনি জগৎসিংহকে যখন যুদ্ধে আহ্বান করেন, তখন জগৎসিংহের মুহূর্ত্ত-আশঙ্কায় যথায়োগ্য সংকারের ব্যবস্থা কখনই করিতেন না । জগৎসিংহ সংঘর্ষচিত্ত, ওসমানও । একদিকে—আয়েষার কারণেই প্রেমস্বাকার জগৎসিংহকে বিশেষ টলাইতে পারে নাই, অন্যদিকে বিনলার কটাক্ষ ওসমানকে আদৌ বিচঞ্চল করিতে পারে নাই । জগৎসিংহ বাস্তবধূর্য্যানুগ ও রমণী-সম্মান-তৎপর । জগৎসিংহের মন্দিরে বিনলার সহিত কথোপকথন ইহার প্রমাণ । ওসমানও । ওসমান, বিনলা ও তিলোত্তমা রাজাধঃপুরে অবরুদ্ধা বলিয়া লজ্জিত । জগৎসিংহ কৃতজ্ঞ, যতক্ষণ না ওসমান তাঁহার অঙ্গে পদাব্যাত করিয়াছিলেন, ততক্ষণ তিনি ভীরুতাপবাদ স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ করেন নাই । আর ওসমানের কৃতজ্ঞতার ফলেই বিনলা স্বামীসহিত দেখা করিতে পারিয়াছিল এবং তিলোত্তমাকে কংলুর্গার বিলাস ভবন হইতে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিল । জগৎসিংহ হিরপ্রসাদ, যখন জরে অজ্ঞান, তখনও তিলোত্তমাকে স্বপ্ন দেখেন ; যখন জরে, অজ্ঞান, তখনও তাঁহার প্রথম চিন্তা

* রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী সংস্করণ) দৃষ্টব্য ।

তিলোত্তমা । তিনি তিলোত্তমার আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়াও স্মৃতিলোপ করিতে পারেন নাই । জগৎসিংহ মন্দিরে বিমলাকে বলিয়াছিলেন “লোকে আমার হৃদয় পাষণ বলিয়া থাকে, পাষণে যে মূর্তি অঙ্কিত হয় ; পাষণ নষ্ট হইলে তাহা আর মিলায় না ।” ওসমানও স্থিরপ্রসাদ, ওসমান্ সুবিবেচক হইয়াও আয়েষার প্রেমে অন্ধ ; তজ্জন্মই ওসমান গুণগ্রাহী ও জগৎসিংহ-গুণমুগ্ধ হইয়াও দোষ গুণ বিচার না করিয়া জগৎসিংহের বধাভিলাষী হইয়া উঠিয়াছেন, এমন কি, জগৎসিংহ তাঁহাকে জীবিত, ছাড়িয়া দিলেও বলিয়াছিলেন “তোমার বধাভিলাষী শত্রু জীবিত থাকিবে !” ওসমান্ নিজেই বলিয়াছেন, “আমরা পাঠান, অশ্রুঃকরণ প্রজ্জ্বলিত হইলে উচ্চিভাৱচিত্ত বিবেচনা করি না ।” ওসমান পাঠান এবং পাঠান বলিয়া গর্ষিত—“পাঠান বাক্সালী নহে ।” জগৎসিংহ রাজপুত এবং রাজপুত বলিয়া গর্ষিত । জগৎসিংহ প্রতিজ্ঞা-পালনে কখন বিরত হয়েন না । জগৎসিংহ শরীর পতন করিয়াও, বিধর্ম্মীর উপপন্নীর চিন্তা মন হইতে দূর করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন—যাহাকে তিনি বিধর্ম্মীর উপপন্নী মনে করিয়াছেন, সেই তিলোত্তমা তাঁহার সমীপে আসিলে তিনি নারী-সন্মান মাজ প্রদান করেন, হৃদয় ছিঁড়িয়া গেলেও সামান্য প্রেমজ্ঞাপক বাক্যোচ্চারণ করেন না । জগৎসিংহের এই অলৌকিক আত্মসংযমের সহিত তুলনায় ওসমানের প্রেমাক্রান্ত কুটিয়া উঠিয়াছে । কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, জগৎসিংহ নায়ক ; স্মৃতিরাজ জগৎসিংহকে ওসমান হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া চিত্রিত । জগৎসিংহে নায়ক লক্ষণ সকলই আছে—জগৎসিংহ “ত্যাগী কৃতী কুলিনঃ স্ত্রীকোরূপ যৌবনোৎসাহী, দক্ষোহুয়ক লোকস্তেজোবৈদগ্ধশীলবান্ নেতা ।”

অতএব বক্রিমচন্দ্র ওসমানকে অবধা হীন করেন নাই । বস্তুতঃ সাবিত্রীর যেমন বর জুটে নাই, সত্যবান্ ভিন্ন অস্তুর কেহ যেমন অমন তেজোময়ীকে জগৎ ধরিতে সাহস করে নাই, সেইরূপ, আয়েষার প্রেমপ্রতিদানক্ষম হইতে হইলে

হৃদয়ে এমনই এক উৎকট প্রেম-পোষণ করিতে হইবে, যাহা কেবল ওসমানেই সম্ভব । কিন্তু হৃতাগাক্রমে ওসমানকে আয়েষা ভ্রাতৃত্ব ভাবে চিরকাল দেখিয়াছে, সতী এখন অল্প ভাবে তাহাকে দেখিতে পারিতেছে না । তাই আয়েষার ভাগ্যে বিবাহ ঘটয়া উঠিল না । ভালই হইয়াছে, আয়েষার বিবাহ হয় নাই । জগৎসিংহ-প্রেম-বিষধর-রক্ষিতা আয়েষা জগৎকে তাহার সুগন্ধী কৌর্তি বিতরণ করিয়া স্মৃতিকর্তার মহিমা প্রচার করুক ও জগৎের আনন্দবর্ধন করুক—ওসমান্ কিম্বা জগৎসিংহের সহিত তাহার বিবাহ হইলে ঐ করুণাময় প্রাণে বিশ্বত্বাকাণ্ডের ঘেটুকু অধিকার আছে, সব লোপ পাইবে ।

এদিকে কবি জগৎসিংহকে যেরূপ আদর্শ হিন্দুরাজকুমার ও ওসমানকে আদর্শ মুসলমান রাজকুমার করিয়া গড়িয়াছেন, সেইরূপ বীরেন্দ্রসিংহ ও কংলুর্খাতে, তাঁহার জ্ঞানে সাধারণতঃ তাৎকালীন রাজপুত ও মুসলমান রাজগণ কিরূপ ছিল, দেখাইয়াছেন ।

বীরেন্দ্রসিংহ, ক্ষুদ্র রাজপুত রাজা ; তাঁহার সঙ্গুণের অভাব নাই—অপত্য স্নেহ, পত্নীর প্রতি বিশ্বাস, নির্ভীকতা এবং কথঞ্চিৎ পণ্ডিতভক্তি । কিন্তু তিনি বিলক্ষণ খামখেয়ালী এবং অসংযতচিত্ত । যার রূপে মুগ্ধ হইয়া পিতার সহিত কলহ করিয়াছিলেন, সেই তিলোত্তমা-জননী যখন নারী জীবনের এক সন্ধিস্থলে পতিতা, তখন বীরেন্দ্রসিংহ বিমলার রূপে মত্ত আছেন । বীরেন্দ্রসিংহের কুলগৌরব আছে, তিনি শূদ্রী কস্তাকে বিবাহ করিতে পারেন না, কিন্তু সেই শূদ্রী কস্তার নিকট প্রেমভিক্ষা করিতে লজ্জাবোধ করেন না—জগৎসিংহের কুলগৌরব আরও উচ্চ-দরের ; বীরেন্দ্রসিংহের ভয় লোকলজ্জাকে, জগৎসিংহের আপনার আত্মাকে । বীরেন্দ্রসিংহ জোষী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ, রাজা-মান-সিংহের প্রতি তাঁহার জাতক্রোধ, বিমলাকে তাঁহার নিজের মৃত্যুর প্রতিহিংসা লইতে সক্ষম করিতে দেখিয়া উল্লসিত ।

কংলুর্খার গুণ অপত্য-স্নেহ এবং নির্ভীকতা । কংলুর্খার চিত্র একান্ত আশ্চর্যজনক এবং ইঞ্জিরতৃষ্ণার অভিলাষী ।

প্রতিহিংসা—পাশবিক ; বীরেন্দ্র সিংহকে ক্লেপ দিবে বলিয়া তাহার অরোদণববীরা * বালিকা তিলোত্তমাকে ত্রিলাসভবনে অবরুদ্ধ করিয়াছে ।

পূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে, বঙ্কিম বাবুর মুসলমান-রাজ সঙ্কীর জ্ঞান ইংরাজ ঐতিহাসিকের নিকট হইতে লক্ষ । টডের রাজ-স্থান রাজপুত রাজগণকে উচ্চ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, কিন্তু মুসলমান রাজগণের পক্ষ-সমর্থনকারী লেনপুলের তখনও অভ্যুদয় হয় নাই । ইহা ভিন্ন যে সময় বঙ্কিম বাবু দুর্গেশনন্দিনী লিখিয়াছিলেন, তখন হিন্দু বাঙ্গালীর কল্পজন সাহুভ্যায় নিখিত বাঙ্গালা উপজাতি বৃদ্ধিতে পারিত বা বৃদ্ধিতে পারিলেও পড়িত ? মুসলমান বাঙ্গালীর মধ্যে সাধারণ বঙ্কিমের উপজাতি পাঠ করিতে পারিত বা ইচ্ছা করিত, তাহাদের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল । দুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিম জানিয়া শুনিয়া কখনই মুসলমান সুধারূপের মনোকষ্টের কারণ হইতেন না । চিন্তাশীল মুসলমানগণের দুর্গেশনন্দিনী সম্বন্ধে অধিকতর সদয় মত পোষণ করা উচিত বলিয়া আমাদের বোধ হয় ।

কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অভিযোগ কবেন, ইহাতে তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ আছে । এই অভিযোগ যথার্থ বলিয়া বোধ হয় । দিগ্গজ ও অভিরাম স্বামী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিদ্রূপ-চিত্র বলিয়া বোধ হয় । দীনবন্ধু বাবু সার্বভৌম পুস্তকে নবীন তপস্বিনীতে বাঙ্গা করিয়া ভালই করিয়াছেন ; কিন্তু হতভাগা দিগ্গজ ‘পিতৃনামে চ মধ্যমঃ’ হইবার চেষ্টা করে নাই, তাহাকে সমাজ সমক্ষে টানিয়া আনিবার ঠিক প্রয়োজন ছিল ? স্বীকার করি,

* পুস্তক লিখিত ঘটনা ১৮২০ সালে হইয়াছে বলিয়া লিখিত ; বিমলার বয়স এখন ৩৫ । বিমলা ৬ বৎসরে ওসমানের জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার পর চতুর্দশ বর্ষ কাটিয়া গেলে বিমলা পিতার সন্ধান পাই ; অর্থাৎ ১৮৩৫ (খ্রিঃ অঃ) সালে তিলোত্তমাকে বঙ্কিম বাবু কিশোরী, বালিকা ইত্যাদি বিশেষণ দিয়াছেন—স্মরণ্যঃ বিমলার পিতার সন্ধিত সাক্ষাৎ ও বীরেন্দ্র সিংহের সহিত প্রথম সাক্ষাতের মধ্যে দুই বর্ষ ব্যবধান রাখিয়া আমরা তিলোত্তমাকে অরোদণববীরা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি ।

অর্ধেকতিহাসিক গল্প চালাইয়া লইয়া বাইবার জন্ত বঙ্কিম বাবুর একটি গদ্যভূক্তি নোকেস আবশ্যকতা হইয়াছিল ; কিন্তু বাঙ্গালার বিভাদিগ্গজ ভিন্ন আরও অনেক গদ্যভূক্তি আছে । আর অভিরাম স্বামীকে অত পণ্ডিত অথচ অত অসংযতায়্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মনে ক্লেপ দিয়াছেন । হয়ত বঙ্কিম তখন সবে মাত্র কালেক্স * হইতে বাহির হইয়াছেন বলিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপর একটু বিতৃষ্ণা ছিল ; হয়ত অভিরাম স্বামী তাঁহার পরিচিত কোন এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চিত্র মাত্র । বঙ্কিমের আত্মজীবনী যতদিন না প্রকাশিত হয়, ততদিন এ বিষয়ে শেষ কথা বলা যায় না । তবে ব্রাহ্মণ + পণ্ডিতের উপর যে বঙ্কিমের পরে ভক্তি হইয়াছিল, চন্দ্রশেখর তাহার প্রমাণ ।

দোষশূন্য কাব্য নাটক বা উপজাতি হুস্তাপ্য, আমাদের বোধ হয় অপ্রাপ্য স্মরণ্য বঙ্কিমের প্রতিভা স্থানে স্থানে তেমন ক্ষুদ্র লাভ করে নাই । আসুমানির-রূপ-বর্ণনা সরস হইলেও রুচিকর হয় নাই ; ভারতচন্দ্র দাশরথি রায় ইত্যাদির প্রতি কটাক্ষ বঙ্কিমের নিকট আমরা আশা করি না । তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের প্রথম মিলন মন্দিরে, তিলোত্তমা ও বিমলা শিব পূজা করিতে গিয়াছিলেন ; আঘাত মাসের রাত্রে স্ত্রীলোকে শিব পূজা করিতে যায় না ; বঙ্কিমও মন্দির ভিন্ন অল্প কোথাও তিলোত্তমাকে বিমলার সহিত বস্তুতঃ একাকী পাঠাইতে পারেন না । বিমলার ক্ষুরে সঙ্গীর্ভানয়ন কখনই কাঁবর অভিপ্রেত নহে, যদি তাহা হইত, তাহা হইলে তিনি বিমলা দ্বারা কখনই জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার গোপন-মিলন সংঘটন করাইতেন না—অথচ বিমলা জগৎ-

* যদিও কালেক্স কথার অজকাল চলন নাই, আমরা ঐ কথাই ব্যবহার করিয়াছি । পুস্তকের আর ৩১ম মিত্র বাহাদুর একদিন বলিয়াছিলেন ‘তখন কালেক্স বলা হইত, কেননা, তাহা হইতে কালে এক আধ জন বি-এ জমাইত, এক্ষণে কলে বি, এ, জমায়—’

টীকা-কার মহাপ্রেরণা ধন্য ।

+ বিষকোবে ‘বঙ্কিমচন্দ্র উদ্যত ।

সিংহকে নংগেছে “মহাশয়, জীলোকের, জুলাম এমনি অপদার্ক বস্তু নে, বাতাসের ভর সছেনী, সাজিকার এ পনল নড়ে রঙ্গা পাওয়া ছুফর।”—বন্ধিম বলেন, বিমলাকে বাধ্য হইয়া এইরূপ বলিতে হইয়াছিল; তিলোত্তমা কন্দর্পরূপ হইয়া, জগৎসিংহ-সান্নিধ্যে আর কিছুক্ষণ থাকিলেই তাহার আরোগ্যের সম্ভাবনী লোপ পাইবে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই “কেহ বা উত্তর করিল ‘মহা-রাজ, রাজপুতপতির শত শত মহিষী। এখানে ‘রাজপুত পতি’ দ্বারা কাহাকে বুঝাইতেছে? যদি তিলোত্তমাকে রাজপুতপতির মহিষী ধরিয়া ‘রাজপুত পতি’ শব্দে ‘জগৎসিংহ’ অর্থ করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, জগৎসিংহ দক্ষিণ নায়ক হইলে প্রেম-প্রভাবে অল্পকাল নায়কে পরিণত হইলেন; আর যদি বিমলাকে রাজপুতপতির মহিষী ধরিয়া লইয়া ‘রাজপুত পতি’ শব্দে ‘মানসিংহ’ অর্থ করা যায়, তাহা হইলে কবিত্বপক্ষে আরও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। “উপভাস উপ-ভাস, হাঁহাস নহে।” জগৎসিংহের বয়স এক্ষণে ২০২৪ বৎসর, এতদিন মনোমত পাত্রী পান নাই বলিয়া অবিবাহিত। বলা বাহুল্য, আমরা ‘মানসিংহ’ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। বিমলাকে আমরা তিলোত্তমাকে কর্কণ সম্ভারণ করিতে দেখি না, অথচ মন্দিরে বিমলা বসিতেছে, ‘সে কথার উত্তর আমি তোমার পিতার কাছে দিব’—আমরা ‘তোমাকে বলিলাম না, কিছু মনে করিও না’ এই পদটি উছ করিয়া লইলাম। তিলোত্তমা মাতার বিবাহের কর বৎসর পরে জন্মিয়াছিল? তিলোত্তমার জন্মকালে তাহার মাতার বয়স অন্ততঃ ২২ হইয়াছিল। এক স্থলে দেখিতে পাই যে, জগৎসিংহ জানেন যে, বীরেন্দ্রের কন্ডার সহিত মানসিংহ-পুত্রের বিবাহ হইতে পারে না, তাহার কারণ যে অতি গুহ্য বৃত্তান্ত সম্বন্ধে পরিচারিকায় জানিতে পারে না, তাহাও জানেন। দেখিতে পাই, বিমলার জগৎসিংহকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দিবার কি অধিকার, তাহাও জানেন; অথচ বিমলাকে যে কেন কবি এক দীর্ঘলিপি লিখাইয়া ‘আত্মপরিচয়াদি দেওয়াইলেন, বুঝিতে পারি

নাই। . হিতবাদী সংস্করণে গিরিজা বাবুর বন্ধিমচন্দ্রের পশ্চাতে যে পরিশিষ্ট আছে, তাহাতে দুর্গেশনন্দিনীর একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আছে, সমালোচক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, অতিরাম স্বামী অন্তঃ-র্যায়ী না সর্বব্যাপী? বন্ধিম বাবুর জ্যোতি-র্গণনায় অত্যধিক বিশ্বাস ছিল—অথচ তিনি যোগল সেনাপতিকে আসরে নামাইয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রকে হাত্যাস্পদ করিয়াছেন। বাল্যকালে গল্প শুনিয়াছিলাম যে, এক জ্যোতিষী একটি লোককে, তাহার কাশীতে মৃত্যু হইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। পরে তাহাকে ফাঁসি কাষ্ঠ-লগ্ন দেখিয়া বলিয়া-ছিলেন যে ‘ক’ এর মতকটা বিভিন্ন হইয়া গিয়াছিল ও কীরোদ বাবুর ‘নন্দকুমারের অভিনয় দেখিয়া লেখকের ভ্রাতা বলিয়াছি-লেন যে, বামুদেব শাস্ত্রী নন্দকুমারের কপালে রাজদণ্ড দেখিয়াছিলেন, এক অর্থে এবং তাহার কপালে রাজদণ্ড ফলিয়াছিল আর এক অর্থে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও দুই চারিটা দোষ বাহির করা বাইতে পারে। কিন্তু সমালোচকের ক্ষুদ্র চক্ষুতে আমরা বতই কেন দোষ বাহির করি না, দুর্গেশনন্দিনীর বন্ধিম যে একজন প্রতিভাশালী কবি, * ইহা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। আমরা পূর্বেই বলি-য়াছি যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানকে কতকটা স্বাধীনতা দিয়া কেবল মাত্র সাহস দেখান নাই; কবিত্ব, মাধুর্য্য এবং নাটকীয় সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন। “যে দিন বিধাতা জীলোককে স্বামীও নাম মুখে আনিতে নিষেধ করিয়া-ছেন, সেই দিন আত্মপরিচয়েরও পথ বন্ধ করিয়াছেন।” বিমলার এই বক্তৃতা প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া কবি বন্ধিম মনোহর কোশল দেখাইয়াছেন। যদি জগৎ সিংহ উত্তর দেন, তবে তাহা কখনই ভাং হইবে না, এবং যদি উত্তর না দিতে পারেন, তাহা

* আমরা, বন্ধিমের দুর্গেশনন্দিনীর মৌলিকত্ব সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিলাম না। বতদিক না বন্ধিমের আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়, ততদিন গিরিজা বাবুর মতই শিরোধার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিব। “বন্ধিমচন্দ্র” (হিতবাদী সংস্করণ) ৪৪৭।

হইলে নারকের গোরব হানি হয়। এহেনস্ত
কবি বলিয়াছেন ‘যুবক এ কথা র উত্তর করিল
না, তাহার মন অত্যাধিক ছিল।’ শকুন্তলার
রাজনামাক্ত অশ্রুণয় দোষনা যখন শির-
ষদা ও অননুয়া সম্মানদশন-তৎপর হইল,
তখন দুয়ন্ত তাহাদিগকে দ্বার্থ-ঘটিতবাক্যে
ভুলাইলেন। তাহার পরচয় পাইয়া যখন
বিমলা ও তিলোত্তমা দণ্ডায়মান হইলেন, জগৎ
সিংহ তখন বাণ্ডানাধুষ্য তাহাদিগের সঙ্কেচ
দূর করেন। আনন্দ এসত বল না যে, বঙ্কিম
কালিদাস অপেক্ষা উচ্চ কবি; স্থানভেদে,
অবস্থাভেদে, ঘটনাভেদে দুর্গেশনন্দিনীতে যাহা
সাজে, শকুন্তলার তাহা সাজে না। বঙ্কিমের
কবিত্বের আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া বাইতে
পারে। তিলোত্তমা, আয়েষা ও বিমলার
সৌন্দর্য্য-বর্ণনা, আয়েষার চলন-মাধুর্য্য, জগৎ-
সিংহ-শুশ্রূষা, কংলুখার সভা-বর্ণনা, বীরেন্দ্র
সিংহের মৃত্যুদৃশ্য, তিলোত্তমা ও জগৎ সিংহের
তিলোত্তমার প্রণয়-বহু মিলনদৃশ্য ইত্যাদি
বারম্বার পড়িলেও পুরাতন হয় না।

বঙ্কিম বাবু সমালোচনী হইতে অনেক
উচ্ছে। তাহার দ্বারা প্রাতিভাশালী কবিকে
সম্যক বুঝা আমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য।
যেখানে আমরা কবিত্বের হানি হইয়াছে
বলিয়া বিবেচনা করিতেছি, হয়ত পরে কোন
প্রতিভাশালী সমালোচক প্রমাণ করিবেন
যে, সেখানেও বঙ্কিম কবিত্ব দেখাইয়াছেন।
তবে একথা আমরা স্পষ্টাকরে বলিতে পারি
যে, বঙ্কিম যদি দুর্গেশনন্দিনী ভিন্ন অন্য কোন

বই না লিখিতেন, তাহা হইলেও তিনি
বঙ্গভাষাভিত্তিকগণের মধ্যে উচ্চগণ লাভ
করিতেন।

বাংলাভাষায় তাহার দুর্গেশনন্দিনী নির্দো-
চন করিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। যে
পুস্তক অনংকৃতাবস্থায় Vernacular
Literary Societyর নিকট পুস্তক-
যোগ্য বিবেচিত হয় নাই, তাহাকে লংকৃত-
বস্থায় পাঠ্য-পুস্তক-নিষাচন-যোগ্য বলিয়া
স্বাকার কারয়া প্রতিভার আদর করিয়া-
ছেন এবং আপনাদের গুণগ্রাহিতার
পরচয় দিয়াছেন। বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী
উপজ্ঞাস সমূহের মধ্যে সঙ্গ প্রথমে লিখিত
এবং সহজবোধ্য, সম্প্রদায় বিশেষের উপর
একটু কটাক্ষ আছে বলিয়া এখানি কাব-
পুণ উপজ্ঞাসকে চাপিয়া রাখা উচিত বলিয়া
বোধ হয় না। মিলটনের লিপিডাস পদ্য
সকল কাব্যরসামোদী আনন্দ সহকারে
পাঠ করে। তবে আমরা এরূপ আশা
করি যে, যখন বঙ্গভাষার চর্চা আরও বিস্তৃত
হইবে, যখন শিক্ষিত বাঙ্গালী মাঝেই বঙ্গ
ভাষা বহুল পাঠ করিবে, তখন বঙ্কিমের
দুর্গেশনন্দিনী, মৃগালিনী, আনন্দমঠ ইত্যাদি
সহজবোধ্য পুস্তক সকল বি-এ পরীক্ষার
পাঠ্য না হইয়া মধ্য পরীক্ষার পাঠ্য নির্দো-
ষিত হইবে, এবং বিশ্ববৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের
উইল, সীতারাম, চন্দ্রশেখর ইত্যাদি বি,এ,
পরীক্ষার্থীগণকে একত্রে শিক্ষা ও আনন্দ
দান করিবে। শ্রীনিখিলচন্দ্র চন্দ্র।

গব্বী ।

“The best of men
That e’er wore Earth about him was sufferer ;
A soft, meek, patient, humble, tranquil spirit,
The first true gentleman that ever breathed.”

দস্ত-জাজি মৃতি ধরি তোমারি ভিতর
বাধিয়াছে নিম্ন নীড়, হে গব্ব-সত্ত্ব !
অঙ্গ-ভঙ্গি একাধিরা, উল্লাসি বচন,
কানকী জোনাকী দলে আপনার জ্যোতি,
হৃদয় কমতাজাজি করিছ জাপন ;
কুটম্বকে বশীভূত ছুছন্দরী রাজি ।
উপরে সোণালী সাজ ভিতরে বালুকা,

গোময়ে জোনাকী গোঁজা বুড়ির কিরণ ।
বংশ-মকহিত অহো, কৃষাও-সমত !
বুধা ভাব আপনারে ভেনাস (Venus) অহুজ ;
তুমি বাহা তাই যদি বুঝিতে বারেক,
উপেকার নিগীবন করিয়া নিবেপ
বাইতে না প্রতিভার করিতে নির্দোষ,
কেড়ে নিতে চাহিতে না স্বজন সম্মান।

• জীবনোদয়ালী পোষাবী •

সাধক চতুষ্টয় ।

যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, জন্ম—১৭ই অগ্রহায়ণ, ১২৬৪ সাল, ৩রা ডিসেম্বর ১৮৫৭ খ্রীঃ ।

মৃত্যু—৫ই আষাঢ়, বুধবার ১৩১৬, ২১শে জুলাই, ১৯০২ খ্রীঃ ।

গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত—জন্ম—৮ই আশ্বিন, ১৭৭৭ শক ।

মৃত্যু—২২শে আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৮৩১ শক, (১৩১৬ সাল) ।

যজ্ঞবিহারী বসু—মৃত্যু—৪ঠা জুলাই, ১৯০৯ খ্রীঃ, ২০শে আষাঢ়, ১৩১৬ সাল ।

কৈলাসচন্দ্র বাগচী—জন্ম—সেপ্টেম্বর, ১৮৪৯ খ্রীঃ, পাবনা গুনাইগাছা গ্রামে ।

মৃত্যু—৩রা জুলাই, ১৯০৯ খ্রীঃ, ১২শে আষাঢ়, ১৩১৬ সালে, কলিকাতায় ।

সর্বকালে, সর্বদেশে, সকল সম্প্রদায়ে এমন দুই চারি জন সাধু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহাদের পুণ্যের প্রভাৱ দেশ, কাল এবং জাতি ধ্বংস হইয়া রহিয়াছে। নানক, কবীর, তুকারাম, রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধুর আবির্ভাবে ভারতভূমি পবিত্র হইয়া রহিয়াছে।—তাহাদের কথা কখনও দেশ ভুলিতে পারিবে না। সাধুর গুণা কোন্ দেশে নাই ?

সময়ে সময়ে আমরা মনে করি, পৃথিবীতে এত সম্প্রদায়ের অভ্যাদয় হইল কেন ? ধর্ম ত সনাতন—সব ধর্মই মূলে এক, তবে এত ভেদ-বোধ কোথা হইতে আসিল ? সাধকেরা বলেন—সাধনার বিভিন্ন পথ, কিন্তু লক্ষ্য এক অবিনশ্বর। যাহারা সিদ্ধ, যাহারা ব্যক্তিত্ব বা দলের গতির উপর উঠিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কোন ভেদবোধ নাই। যে পথ ধরিয়াই যিনি অগ্রসর হউন, সাধনার চরম অবস্থায়, লক্ষ্য-ধামে পৌঁছিলে আর বিভিন্নতা-বোধ থাকে না। একে স্থিতি, একে গতি, একেই মুক্তি। বদ্ধাবস্থাতেই সব পৃথক পৃথক, মুক্তাবস্থাতে—সব একাকার। ব্রাহ্মসমাজ আধুনিক সমাজ। এ দেশে প্রচলিত অপ-বাধ এই—এই আধুনিক ব্রাহ্মসমাজ সংস্কার রূপে দণ্ডায়মান হইয়া সমাজ-বন্ধন শিথিল করিয়া দিতেছেন, কিন্তু গঠন-কার্য্যে কৃত্রিম দেখাইতে এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হন নাই। অপবাধ এই—মতে ব্রাহ্ম আদর্শ হইলেও চরিত্রে আজও এদেশের আদর্শ হইতে পান্নেন নাই। অপবাধ এই—ব্রাহ্ম-বাক্-সর্বস্ব, কাজে অপটু। একপার জীবন্ত প্রতি-

বাদ—ব্রাহ্মসমাজের যে সকল সাধক স্বর্গী-রোহণ করিয়াছেন, তাহাদের পবিত্র জীবন। কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, অবদারনাথ, কেশবনাথ, মহর্ষি, রাজনারায়ণ, রামতনু, উমেশ চন্দ্র, আনন্দমোহন চরিত্রালোকে যে সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, সে সমাজ শুধু বাক্-সর্বস্ব নয়। অগণ্য দোষ ত্রুটি থাকিবেও একথা নিবিবাদে ঘোষণা করা যাইতে পারে, ব্রাহ্মসমাজ বহু সাধকের পূর্ণ-পূত চরিত্রাদর্শে উজ্জ্বল হইয়াছে। এত দিন পর, ব্রাহ্মসমাজ এদেশের উপেক্ষার পরিবর্তে গৌরবের জিনিস হইয়াছে।

যে সকল মহাত্মা দেহধারী রহিয়াছেন—তাহাদের কথা আজ আমরা তুলিব না। যাহারা চলিয়া গিয়াছেন, তাহাদের কথা লিখিবার সময় কোন সঙ্কোচে কারণ নাই। যে সাধক-চতুষ্টয়ের নাম প্রবন্ধের শির্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা চরিত্রাদর্শে যে কোন সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন। এমন নীরব পবিত্র জীবন সর্ব দেশে সর্ব কালেই আদরের জিনিস। সত্যই লিখিতেছি, ব্রাহ্মসমাজ এখন আর উপেক্ষার জিনিস নয়।

বাক্যেও নয়, কর্মেও নয়—জীবনের শোভা কেবল সূচরিত্রে। কে কত বক্তৃতা করিয়াছে, বা কত প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়াছে, অথবা কে কত কাজ করিয়াছে, তাহা দ্বারা জীবনের প্রকৃত গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয় না। ঈশা বা মুশা, ম্যাটিসিনী বা জেনী, বুদ্ধ বা মহামদ, কেশব বা চৈতন্য, টলটল বা কনিষ্কউসস, এমায়সন বা কায়লাইল,

নানক ঋ কবীর, তুকারাম বা রামপ্রসাদ, দয়ানন্দ বা রামকৃষ্ণ—ইহারা এসংসারের মহৎ কেবল সূচরিত্রে চিদানন্দময়ের অক্ষয় শাস্তি-নিকেতন—মানব চরিত্র। চরিত্র-ধামে যে-
-অটল, অচল, অজয়ের, দুর্দ্বর্ষ, সে-ই শাস্তি-নিকেতনের অমর দেবশিঙ। আত্মক হুঃখ দাঙ্গিজ্য, শোক সম্ভাপ, নিন্দা তিরস্কার, বিদ্রোহ পরপ্রীকারতা, অপবাদ এবং নির্ধ্যাতন—দেবশিঙগণ নিত্য অবিচলিত;—প্রথল ঝটিকা ঝড়িয়া যাক্—তাহারা যেমন নির্ঝিকারচিত্ত আদিত, তেমনই নির্ঝিকার-চিত্ত ঝটিকার অন্তে;—মানব সবি-শ্ময়ে তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যায়। রিপূর উত্তেজনায় টলে কে?—সে ত তুমি, আমি এবং ঐ সংসারের দাসগণ। হুঃখ দারিদ্র্য, অথবা বৃথা নিন্দা তিরস্কারে বা অশাস্তি নির্ধ্যাতনে লক্ষ্য ভোলে কে? সে ত তুমি, আমি এবং ঐ বাহির-সর্বস্ব মানব-সমাজের কলঙ্কিতগণ? জেনী বা জেশা, দয়ানন্দ বা রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ বা মহম্মদ এবং আর আর সকল দেবশিঙগণ ভুলিতে পারেন না, কখনও ভোলেন নাই। তাহারা অমর, তাহারা অক্ষয় চরিত্র-সিংহাসনে চির-প্রতি-ষ্ঠিত দেবভাস বা চিদভাস।

আমরা অমর দেবশিঙদিগের কথা বলিতে-ছিলাম—সকল দেশে সকল সমাজেই এইরূপ দেবশিঙের আকর্ষণ হইয়াছে এবং হইয়া থাকে; এবং তাহাদের পুণ্যের বলেই সমাজ এবং দেশ রক্ষা পায়। ব্রাহ্মসমাজ বাহাদের সূচরিত্রে ধজ হইয়াছে, সাধু যোগেন্দ্রনাথ, গঙ্গাগোবিন্দ, বঙ্কবিহারী এবং কৈলাস চন্দ্র তাহাদের অজ্ঞাতর। এই সাধক-চতুষ্টয়ের নীরব এবং নিষ্কাম জীবনালেক্ষা দেখিয়া আমরা ধজ এবং কৃতার্থ হইয়াছি। তাহাদের চরিত্র দেখিয়া সময়ে সময়ে মনে হইয়াছে, ইহারা শাসন, না দেবতা? তাহাদের তিরো-ধানের পর বুঝিতেছি, তাহারা আমাদের বর্ণের আদর্শ দেখাইবার জন্তই যেন দেবভাস রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহাদের পুত চরিত্রাশোক দেখিয়া এদেশের নরনারী ধজ হইয়াছে।

যোগেন্দ্রনাথ — ডাক্তার এবং স্নলেখক

ছিলেন, তিনি আজীবন শিষ্ট,—বালা হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অদম্য জ্ঞান-শিপাসায় বিভোর ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—এরূপ না করিলে পাঠের শিপাসা বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু সে জ্ঞাত তাহাকে সম্মানের চক্ষে দেখি নাই। তিনি দরিদ্রের অকুজিব, স্নেহদ ছিলেন। অবসর পাইলেই বিনা ভিজতে বাইরা দরিদ্রের সেবা করিতেন। তাহার তিরোধানের দরিদ্রদের ঘরে হাহাকার উঠিয়াছে বটে, কিন্তু সে জ্ঞাত তাহাকে ভালবাসি নাই। তিনি প্রেমের কাঞ্চাল ছিলেন, সকলকে ভালবাসিতেন, কিন্তু ভালবাসায় অন্ধ হইয়া নাতি ও ধর্ম্ম ভুলিতেন না। দোষখাছি, ভালবাসিতে ভালবাসিতে তিনি বিভোর হইয়া আপনাকে ভুলিয়াছেন, কিন্তু তবুও ধর্ম্মকে ভোলেন নাই। বাহিরে কোন প্রকার আফা-লন নাই, অধিক বাহুফর্ত্তি নাই, কিন্তু ভিতরে জুবিয়া নজিয়া বিভোর হইয়া রহিয়াছেন কেবল জ্ঞানময় প্রেমে। সে প্রেম—সংসারের প্রেম নয়; সে—গভীর ভগবক্ত্তি। তিনি যে দিন প্রাণপ্রিয়া পত্নীকে শ্মশানের চিতায় তুলিয়া দিলেন, সেদিনও তাহাকে দেখি-য়াছি;—দেখিয়াছি, তিনি নির্ঝিকারচিত্ত;—শোকের অতীত চিদানন্দে বিভোর। শেষ জীবনে দারুণ বহুমাত্র রোগে বড়ই ক্লেশ পাইতেছিলেন, কিন্তু আত্মনাশ করিতে এক-দিনও দেখি নাই। কোন দুশ্চিন্তাই তাহাকে বিমর্ষ করিতে পারিত না,—হুঃখও আত্মহারা নহেন, সম্পদেও ক্ষীত নহেন, নিন্দায়ও কাতর নহেন, প্রশংসায়ও উৎফুল্ল নহেন। তিনি সকল অবস্থাকে জয় করিয়া সত্যিহারা মহাদেবের মহা জ্ঞান-প্রেম-যোগে যেন বিভোর হইয়া-ছিলেন। শেষে,—তাহার জ্ঞান-মূলক প্রেম—ভগবক্ত্তিতে পরিণত হইয়াছিল। এমন নিষ্কাম জ্ঞান-প্রেমমূলক যোগ ধর্ম্মের সমধর অতি অল্প জীবনেই দোষখাছি। তাহার দৃষ্টি সদা* লাভা-লাভ-গণনার অতীত ধামে ছিল। তুদীয় যোগ-ময় চরিত্রের অভিব্যক্তি—তাহার মৃত্যু শব্দ্যার-প্রকটিত হইল। নির্দম ডাক্তারগণ বিনা ক্লো-ফরমে পুষ্ঠের কারবকালে বহুবার অজ্ঞ চালনা করিলেন, তিনি একবারও ক্লেশ জ্ঞাপন

ফরিলেন না ! অপারেশনের এক ঘণ্টা পরেই তাঁহার নাকী ডুবিতে লাগিল,—আর কিছুক্ষণ পরেই মৃত্যুপ্রস্থান করিলেন;—কিন্তু দুঃখ ক্রমের পরিবর্তি হইল না;—মৃত্যুযোগী মৃত্যুনামে আত্মদম্পন করিলেন ! সে স্বর্গীয় দৃষ্ট কেবল তদীয় নিকার পুত্ৰচরিত্রেই যোগ্য। তিনি যে পবিত্র চরিত্রে আত্মস রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সন্তানগণ তাঁহার অধিকারী হউক, বিধাতার চরণে কেবল এই প্রার্থনা।

গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত ।—সাধু কালী নারায়ণের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণ কে, জি. গুপ্তের ভ্রাতা। নিজের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। স্বতরাং তিনি সম্পদ প্রেরণের মধ্যে লাগিত পালিত; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহার মাতৃদেবীর চরিত্রে কি এক অনিন্দিত চরিত্রাভাস পাইয়াছিলেন, তিনি আজীবন দরিদ্র-সহবাস এবং দরিদ্র-সেবাই ভালবাসিতেন। এমন অকপট সেবা-পরাণতা অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখা যায়। দরিদ্রের সেবার কথা বলিবার সময় তাঁহার নয়নের কোণে অশ্রুর সমাবেশ হইত,—তদীয় সদা-প্রকৃত বদন মলিন হইত। তিনি সদা প্রকৃত ছিলেন,—হাসিতেন এবং অন্তরে হাসিতে পারিতেন,—কিন্তু পর-দুঃখ-কষ্টের কথা শ্রবণ হইলেই কেমন হইয়া বাহিতেন। তিনি অকপট-চিত্ত ও সরলতার প্রতিমূর্তি ছিলেন—অচঞ্চল নামক যে একটা দক্ষা সংসারকে উচ্ছিন্ন করিতেছে, কি মন্ত্র সাধনায়, জানি না, তাহাকে তিনি সম্পূর্ণ রূপে ভয় করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন—

• জীষ্টের উপমিত—“মেষাশ্রু” গ্রায়;—
উঠিতে বসিতে, শুইতে বাহিতে স্বভাবের নিকলঙ্ঘনিত সঙ্গ ছিলেন। বে তাঁহার সংস্পর্শে একবার আসিত, সে ই মোহিত হইয়া ভাবিত—এমন বড় বরে এমন কোমল মুষ্টির বিকাশ কিরূপে হইল? তিনি আজীবন ছিলেন—কোমলতার প্রতিমূর্তি। সে ত মুষ্টি নয়—সে বেন কোমলতা ফুটিয়া জমাট হইয়া রহিয়াছে,—সংসারের উত্তাপে তাহা স্নান নয়, পৃথিবীর অহঙ্কার তাহাকে মলিন করিতে পারে নাই;—কুহুমনিভ দেবশ্যামর শরান

—সংসারের অস্পৃশ্য, অমিনিত দেখনিও। অধিক দিন দেখি নাই, কিন্তু যে কয় দিন দেখিয়াছি—তাহাতেই বুদ্ধিমাছিলাম, গঙ্গাগোবিন্দ কলুষিত সংসারের জীব নহেন। দারুণ বহুমুখ রোগের পরিণামে বিষম ক্ষতাহুর বহন পায়ে দেখা দিল, তিনি অতলে ডুবিবার ক্ষণ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

বলিয়াছি, গঙ্গাগোবিন্দ অকপট-চিত্ত ছিলেন। তাঁহার সরলতা, দেব-পুত্ৰ-সাধনার অহেতুক মন্ত্র। হাসিতে, খেলিতে, চলিতে—তিনি এই মন্ত্র সাধনার তম্বর হইয়া বাহিতেন। সংসার এবং তিনি—এ দুয়ের কখনও মিশ খাহত না,—তিনি সদা যেন এক জ্ঞানে, কি এক ধ্যানে বিভোর থাকিতেন। সে জ্ঞান এবং সে ধ্যান—নানকাম সেবা-ব্রত-পরাণতা। তিনি কল্যকার চিন্তা পরিহার পূর্বক, সর্ব্বথ পর-সেবার চালায়া দিতেন। চালায়া দিতেন, অথচ তাহার পারবাক্তি ছিল না। অনন্ত-সাধারণ সেবাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। এই মন্ত্র সাধন কীরতের কারণে তিনি মহেশ্বরে নিমগ্ন হইলেন।

বজুবাহারী বজু ই, বি, এস-রেল-ওয়ের কন্সটারা মাত্র, কিন্তু তাঁহার কথা লিখিতেছি কেন? চিরদারিদ্র্যে ক্লান্ত নার-চরিত্র মহাশয় ফুটিয়া উঠে, তাহার জীবন্ত নিদর্শন বজুবাহারী। তিনি যোগেশ্ব-নাথের ছাত্র, সাধারণ ব্রহ্মসমাজের কলিকা-তান্ত্র উপাসকমণ্ডলার অগ্রতর আচার্য্য ছিলেন, তাহাতেই কি প্রকাশ পায় যে তিনি চারজ-বান ছিলেন? না—তাহা মোটেই নয়। আচার্য্যগার—তাহা ত খোলাখুলি বা পদগেহন বা আত্মগতের অবশ্যগোচর ফল;—জানি, এখানে এবং সেখানে, এদেশে এবং সেদেশে কত আচার্য্য পুরোহিত আছেন, বাহারা, চরিত্র ত দুয়ের কথা, সংসারের সামান্য গুণ্ঠিতা এবং ভ্রষ্টতা রক্ষা করিয়াও চলিতে পারেন না। তাঁহারা লাভ-লোকসান-গণনায় সদা ব্যস্ত, এবং সম্মানের কাঞ্চাল,—তাঁহারা অর্থ বা বশ মান অর্জনের জন্ত না পারেন, এমন কাজ নাই। গণ্ডী বা দলের প্রভুত্বকার জন্ত তাঁহারা না পারেন, এমন জঘন্য কাজ নাই। আচার্য্য হইয়া যোগেশ্বনাথ এবং

বহুবাহিনী আচার্য্য নামের কলক দূর করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কখনও দলের সঙ্গীত-তার শোষণতা করেন নাই; কিম্বা তোমাকে বা তাহাকে দলে আনিবার জন্ত কখনও ব্যাপৃত হন নাই,—আরম্ভে শিষ্য,—পরিণতিতেও শিষ্য। বহুবাহিনী সুগায়ক ছিলেন,তিনি তাঁহার “সঙ্গীত-সঙ্গীতন”অত্বে উৎকৃষ্ট করিবার জন্ত গীত হইত না,—তিনি উৎকৃষ্ট হইবেন, নিজে সন্তোষ করিবেন, এই জন্তই প্রাণভরিয়া গাহিতেন। যে সকল গান অত্বে উৎকৃষ্ট করিবার জন্ত রচিত, তাহা তিনি প্রায়ই গাহিতেন না,—সন্তোষের চরম অবস্থায় বাহা গাঁওয়া যায়, তাহাই তিনি গাহিতেন। গানের সময় ভাবে তিনি বিভোর হইয়া যাইতেন,নয়নে অশ্রু ঝরিত,তখন স্বর-সম্পদ না থাকিলেও, তিনি অত্বে আপনার সাধনায় আশ্রয় করিয়া ফেলিতেন,—লোকেয়া বিমুগ্ধ হইয়া যাইত। তাঁহার গানে ফুটিয়া বাহির হইত তাঁহার সমগ্র হৃদয়খানি, যাহা সদা নিভৃত লুক্কায়িত থাকিত। সে হৃদয়খানি যোগীজনোচিত সাধনা-পূত চরিত্রের খনি;— তাহাতে চঞ্চলতা ছিল না, গভীরতা ছিল; তাহাতে আসক্তি ছিল না, বৈরাগ্য ছিল। তিনি গাহিতেন, বৈরাগ্যের গান;—মজ্জিতেন অনাসক্তির অতলে। ৫৪ বৎসরের অজিত সে চরিত্র সংসারের অতীত এমন কোন জিনিস, ভাবায় যাহা ব্যক্ত হয় না, কথায় যাহা নিবন্ধ হইবার নয়।

কৈলাসচন্দ্র বাগচী। আর এক জনের কথা বলা হইলেই অন্যকার কাহিনী শেষ হয়। তিনি চারিজনেরই বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রস্থানও করিলেন সকলের আগে;—আর বখিবা—সর্বশেষেই সকলের শ্রেষ্ঠ। যোগেন্দ্রনাথ জ্ঞানযোগী—কত সুন্দর প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়াছিলেন, কত কি করিয়াছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ সেবায়োগী—তিনিও কত দরিদ্রের অভাব মোচন করিয়াছিলেন, কত কি করিয়া গিয়াছেন। বহুবাহিনী গায়ক ছিলেন,—তিনিও কতরূপে কত জনের উপকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কৈলাসচন্দ্র

জ্ঞানযোগীও নহেন, সেবায়োগীও নহেন, গায়কও নহেন,—তিনি কেবল নীরব সাধক। তাঁহাতে যেন সকল প্রকার সাধনার সমাধি হইয়াছিল। তিনি যে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন,তাহার কোনই বহিঃপ্রকাশ ছিল না—কিন্তু তাঁহার সম্ভানগণে তাহা প্রতিকলিত। ঘোর দারিদ্র্যও তিনি নির্বিকার-চিত্ত, ঘোর অধ্যাচারেও তিনি অবচলিত,তিনি সংসারের সর্ববিধ দোষ ক্রুর যেন জীবন্ত প্রতিবাদ—নি চিরদিন অজ্ঞাত-শত্রু। গবর্ণমেন্টের কর্মচারীর অত্যাচার ব্যবহারে দরিদ্র কৈলাসচন্দ্রের সামান্য যে চাকুরী সম্বল ছিল, তাহাও যখন গেল, তিনি তখন নিশ্চিন্ত হইলেন—বলিলেন—“সব কাড়িয়া লইয়া বিধাতা বেশ করিলেন।”এরূপ না হইলে তিনি উদাসীন যোগী হইতে পারিতেন কি? ঘোর দারিদ্র্য মহাসাধককে চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করিতেছে,—কিন্তু তিনি নির্বিকারচিত্ত,—বিরূপ বা বৈলক্ষণ্য, বিক্ষোভ বা বিতৃষ্ণা কাহাকে বুলে, তিনি জানিতেন না। দারুণ ঋটিকা-তাড়িত জাহাজ অবিলচিত-গতিতে লক্ষ্য পথে চলিয়াছে—কিছুতেই বিচ্যুতি নাই। সাধক ত মহা সাধক;—জ্ঞানী ত মহাজ্ঞানী, সেবক ত মহা সেবক, গায়ক ত মহা গায়ক। তাঁহাতে কি ছিল না?—জ্ঞান ছিল, প্রেম ছিল, সেবা ছিল, পূজা ছিল, উৎসর্গ ছিল—নিষ্ঠা ছিল—বিশ্বাস ছিল, ভক্তি ছিল, সব মিলিয়া জমিয়া উঠিয়াছিল—একটা নীরব জীবন, যাহার তুলনা এ সংসারে বড়ই বিরল। কৈলাসচন্দ্রকে পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছিল, ভগবন্তক্তি। তিনি আপনা-হারী, সংসার-হারী;—চির উদাসীন,—অজপায় সিদ্ধ অদেহী মহাযোগী। কৈলাসচন্দ্রকে যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই ধন্ত হইয়াছেন। মনে হয়, যোগেন্দ্রনাথ, গঙ্গাগোবিন্দ এবং বহুবাহিনী—এই তিন কৈলাসচন্দ্রে জমিয়া পূর্ণ যোগের অভ্যাস হইয়াছিল। এই পূর্ণ যোগে ব্রাহ্মলোক ধন্ত হইয়াছে—বঙ্গপ্রদেশ কৃতার্থ হইয়াছে। সকলে প্রার্থনা করুন, এইরূপ পূর্ণাঙ্গ জীবন ঘরে ঘরে প্রকটিত হউক।

ঢাকার বিবরণ।

শাসন, বিচার ও রাজস্ব বিভাগ।

ঢাকার ১৫১৬ মাইল পূর্ব দিকে সোণারগাঁও অবস্থিত। মুসলমান শাসন কালে সোণারগাঁও একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত থাকিতেন। তিনিই এতৎপ্রদেশ শাসন করিতেন।

এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে কাজি ও কাননগুদিগের কার্যালয় ছিল। বোড়শ শতাব্দীতে এতৎ প্রদেশে ছাদশ ভৌমিকের প্রভুত্ব বিস্তৃত এবং কিছু দিন তাহাদের হস্তেই দেশ শাসিত হয়।

১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা নগরী স্থাপিত হইলে, এই স্থানে বাঙ্গালার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজধানীতে যথারীতি বিচার, শাসন ও রাজস্ব বিভাগের কার্য চলিতে থাকে। মফস্বলের বিচার ও শাসন ক্ষমতা তখনও কাজিদিগের হস্তে হস্ত ছিল। কাননগু জমা জমির বিচার করিতেন। কেন্দ্রে কেন্দ্রে ফৌজদারী প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরগণার জমিদারগণও নিজ নিজ “এলাকার” বিচার করিতেন। রাজস্বের জন্ত জমিদারগণ দায়ী ছিলেন। পরগণার জমিদারগণের রাজস্ব প্রদানের ক্রটির বিচার রাজধানীতে হইত। রাজস্ব প্রদানের ক্রটি বাতীত জমিদারদিগের অজ্ঞ কোন বিষয়ের ক্রটি, ক্রটি বলিয়াই গণ্য হইত না। ক্ষমতাবান জমিদারেরা সীতিমত রাজস্ব প্রদান করিলে “সাতখুন মাপ” পাইতেন। এরূপ অবস্থায় প্রজা-সাধারণ যমবাঁতনা ভোগ করিত।

ঢাকা হইতে বিভিন্ন সময় রাজধানী রাজমহল (১) ও মুসিদাবাদে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। ঐ ঐ সময় ঢাকায় নায়েব

নাজিরের কার্যালয় থাকিত; সুতরাং বিচার, শাসন ও রাজস্ব বিভাগের কার্য যথারীতি পূর্ববৎ পরিচালিত হইত।

ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে এ জেলার শাসন প্রথা কতকটা পরিবর্তন হয়। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে হট্টাইওয়া কোম্পানী বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণ করিয়া ঢাকায় হজুরি ও নিজামত বিকাগ প্রতিষ্ঠিত করেন। হজুরি বিভাগ মুসিদাবাদের দেওয়ান রেজা খাঁর অধীন থাকে। ঢাকায় উক্ত বিভাগের কার্য পরিচালন জন্ত একজন ডেপুটী দেওয়ান নিযুক্ত হন। ঢাকার ডেপুটী দেওয়ান কেবল এতৎ প্রদেশের রাজস্ব আদায় ও রাজস্ব সংক্রান্ত গোলযোগের মীমাংসা করিতেন। নিজামতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার হইত। নিজামতের নিজ থরচ ও কর্মচারীগণের বেতন ইত্যাদির জন্ত নিজামত নির্দিষ্ট পরিমাণে ভূমিকরও গ্রহণ করিতেন।

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে হজুরি ও নিজামত, এই উভয় বিভাগের তত্ত্বাবধান জন্ত একজন রাজস্ব-পরিদর্শক (Revenue Supervisor) নিযুক্ত হন।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত রাজস্ব-পরিদর্শকই কালেক্টর নামে অভিহিত হন। ঐ সনে কোম্পানী রেজাখাঁর নিকট হইতে দেওয়ানী বিভাগের কার্য হস্তান্তরিত করিয়া ঢাকায় এক দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠিত করেন। কালেক্টর দেওয়ানী আদালতের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হন।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানী আদালতের কার্যনির্বাহ জন্ত নায়েবের পদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্ত্রী সভা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির বিচার (আপিল) করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাদেশিক মন্ত্রী সভা

(১) মুলতান মজা ঢাকা হইতে রাজধানী রাজমহলে পরিবর্তন করেন। মীরজুয়া পুনরায় রাজধানী ঢাকায় আনয়ন করেন, অতঃপর মুসিদাবাদে তাহা মুসিদাবাদে স্থাপন করেন।

উষ্টিয়া গিন্নানুতন নিয়ম প্রবর্তিত হয়। এবং ঢাকা কালেক্টর ও দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকার কালেক্টর "চিফ" নামে অভিহিত হন।

মিঃ ডে, ঢাকার প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর এবং মিঃ ডানকেনসন প্রথম জজ নিযুক্ত হন।

এই সময় ঢাকা জেলার আয়তন ১৫৩৯৭ বর্গ মাইল ছিল। ক্রমে ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থান ঢাকা কালেক্টরী হইতে পৃথক হইয়া যায়। অতঃপর ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর * ও ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে বাকরগঞ্জ ঢাকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে ঢাকার কলেবর ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে।

ক্রমে শাসন-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে পুলিশ স্টেশন (থানা) আউটপোস্ট (ফাঁড়ি থানা) চৌকী প্রভৃতি স্থাপিত হয়। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে রেভিনিউ কমিশনারের কার্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথম প্রথম রেভিনিউ কমিশনার, কমিশনার অব সার্কিট (Commissioner of Circuit) নামে অভিহিত ছিলেন। পূর্বে কাছাড় এবং শ্রীহট্ট জেলাও ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অতঃপর মহকুমা বিভাগ প্রথা প্রবর্তিত হইলে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মুন্সিগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হইয়া জেলায় শাসন কার্য্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মানিকগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হয়। ঐ সময় মানিকগঞ্জ মহকুমা ফরিদপুরের অধীন এবং নাদারিপুরের কতক অংশ ও আটয়া থানা ঢাকা জেলার অধীন ছিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মানিকগঞ্জ মহকুমা ও নবাবগঞ্জ থানার কতক অংশ ফরিদপুর জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আটয়া থানা ঢাকা জেলা হইতে ময়মনসিংহ জেলায় পরিবর্তিত হয়।

১৮৬৬—৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এ জেলার কোন

* ফরিদপুর বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন কালেকটরী হইলেও ফরিদপুরের দেওয়ানী আদালত এখনও ঢাকাতেই স্থাপিত ছিল।

কোন স্থানে মহকুমা, চৌকী, থানা, ফাঁড়ি থানা ছিল, তাহা নির্দেশিত হইল।

মহকুমা	চৌকী
ঢাকা সদর	সদর, পলাশ
থানা	ফাঁড়ি থানা
ঢাকা	ফরিদাবাদ, লালবাগ, টকী
কাপাসিয়া	
রাঙ্গাপুরা	
রূপগঞ্জ	নরসিংদি
সাতার	
নবাবগঞ্জ	
মহকুমা	চৌকী
মুন্সিগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
	বহর
থানা	ফাঁড়ি থানা
নারায়ণগঞ্জ	বৈদ্যেরবাজার
	রোহিতপুর
রাজাবাড়ী	মুন্সিগঞ্জ
শ্রীনগর	—
মহকুমা	চৌকী
মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ
	লেখরাগঞ্জ
থানা	ফাঁড়ি থানা
মানিকগঞ্জ	বাণিয়াটী
জাফরগঞ্জ	—
হরিরামপুর	—

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পদ্মার গতি পরিবর্তিত হইয়া বিক্রমপুর পরগণার অর্দ্ধাংশ ঢাকা জেলা হইতে পৃথক হইয়া যায়।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুনের পূর্ববর্তে বিজ্ঞাপনা অনুসারে ঐ সনের ১লা আগষ্ট হইতে বিক্রমপুরের দক্ষিণ ভাগ সহ ৪৫৮ থানা গ্রাম বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১

(১) এই গ্রাম মুন্সিগঞ্জ মহকুমা থানার অধীন ছিল। ১৮৬৬ সনের পূর্বেই মুন্সিগঞ্জ থানার শাসন সংক্রান্ত কার্য্য বাধরগঞ্জ জেলায় ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে ছাড় করা হইলেও কাথ্যতঃ তাহা হয় নাই। ঐ থানার অধিবাসীগণ এই পরিবর্তনে আপত্তি উত্থাপন করিলে এককাল ঐ পরিবর্তন স্থগিত থাকে। মুন্সিগঞ্জ থানা সহ নাদারিপুর মহকুমা ১৮৭৪ সনে ফরিদপুর জেলায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট ও কাঁহাড় জেলায় দুই টাকা বিভাগ হইতে পরিত্যক্ত হয়। এবং ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা জেলা টাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরাও টাকা বিভাগ হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে নারায়ণগঞ্জ মহকুমা

স্থাপিত হইয়া জেলার কার্যভার চারি ভাগে বিভক্ত হয়।

বর্তমান সময় ঐ জেলায় চারিটা মহকুমা, ৪টা চৌকী ১৫টা থানা, ৫টা কাঁড়ি থানা ও ১৩টা সব রেভেন্যু ক্যাঞ্চালয় স্থাপিত আছে।

শ্রীকেশবনাথ মজুমদার।

ভট্টিকাব্য ও তাহার কবি।

‘দীপতুল্যঃ প্রবন্ধোহয়ং শব্দলক্ষণ চক্ষুযাম্।
হস্তামর্ষ ইবাক্ষান্যং ভবেৎ ব্যাকরণাদৃতে ॥’

ভট্টিকাব্য দ্বাবিংশ সর্গ। ৩৩ শ্লোক।

ভট্টিকাব্য সাহিত্য জগতে এক অপূর্ণ সৃষ্টি; কাব্য ভাণ্ডারের অতুলনীয় রত্ন। উক্ত মহাকাব্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলা অবলম্বন করিয়া লিখিত। রাবণ বধ পর্য্যন্ত দ্বাবিংশ সর্গে উক্ত গ্রন্থ খানি গ্রথিত। এমন সংস্কৃতাদ্যায়ী অধ্যাপক বা ছাত্র শিক্ষিত সমাজে কম আছেন, যাহারা ভট্টিকাব্যের কাছে খণী নহেন। ভট্টিকাব্যের অধ্যয়নে, ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে বলিয়া, প্রত্যেক সংস্কৃতাদ্যায়ী ছাত্র ব্যাকরণের পাঠ সমাপ্ত করিয়া ভট্টিকাব্য অধ্যয়ন করেন। উক্ত কাব্যের শ্লোকগুলি বড়ই নিকটায়ম। কাজেই ব্যাকরণাদ্যায়ী বালকের পক্ষে কিছু সহজগম্য। কিন্তু ইহার শব্দগুলি বড়ই কক্কশ ও কঠোর। এই সরলায়রের সঙ্গে শব্দ-কাঠিগ্রহী উক্ত কাব্যের বিশেষত্ব। ভট্টিকাব্যে, বালককে মধুর সহিত কুইনাইন খাওয়ানোর ভ্রাম, কাব্যের স্থূললিত রসের সহিত ব্যাকরণের কঠোর রসকে বালকদের পান করান হইয়াছে। ভট্টিকাব্যের মহত্বই এইটুকু। সত্য সত্যই ভট্টিকাব্যখানি যেন ব্যাকরণের দ্বিতীয় অবতারণা। কবি সত্যই বলিয়াছেন;—

‘দীপতুল্যঃ প্রবন্ধোহয়ং শব্দলক্ষণ চক্ষুযাম্।

হস্তামর্ষ ইবাক্ষান্যং ভবেৎ ব্যাকরণাদৃতে ॥’

অর্থাৎ যেমন অন্ধ ব্যক্তিরিগের হস্ত স্পর্শে বটপটারি জান হয়, তদ্রূপ ব্যাকরণ শাস্ত্রে

বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ না করিয়াও উক্ত কাব্য অধ্যয়ন করিয়াই ছাত্রবর্গ পদার্থ বোধে ও শব্দাদি যোজনায় সমর্থ হয়। বাস্তবিক, ব্যাকরণের সঙ্গে কাব্যের এমন সুন্দর সম্মিলন, এখন সমবায়-সম্বন্ধ বুঝি আর কোথাও দেখিতে পাইব না।

উক্ত কাব্যে, কবির কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য, উভয়েরই পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। এক দ্বিতীয় সর্গ ও একাদশ সর্গেই কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেই দ্বিতীয় সর্গে আবার—

‘প্রভাত-বাতাহতিকম্পিতা কৃতিঃ

কমুদতীরেণুপিশাঙ্গ বিগ্রহম্।

নিরাস ভ্রূঙ্গং কুপিতেব পশ্বিনী

ন মানিনীশং সহতেহন্ত সঙ্গমম্ ॥’

এবং—

‘নর্তজ্জগৎ যম সূচাক পঙ্কজং

ন পঙ্কজং তত যত্ লাণ যত্পদং।’

ন যত্পদোহসৌ ন জুগুঞ্জ যঃ ফলং,

ন জুজিতং তন্ম জহার যম্মনঃ ॥’

এই শ্লোক দুইটা কবির কবিত্বের চরমোৎকর্ষ। নবম সর্গে গজ ও বকের দৃষ্টান্ত এবং দশমে অলঙ্কার শাস্ত্রীয় শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার সমস্ত উদাহরণগুলি একত্র সম্মিলিত আছে। তারপর ত্রয়োদশ সর্গ হইতে দ্বাবিংশ সর্গ পর্য্যন্ত কবির আখ্যাভের সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। এই জন্তই বলিতেছিলাম, কাব্যখানিতে কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য, উভয়ের যুগপৎ সমাবেশ হওয়ার,

ভট্টিকাব্য সাহিত্য জগতের অতুলনীয় শিল্প-
হইয়া পড়িয়াছে।

এখন এই অতুলনীয় শিল্পের শিল্পী কে ?

এই অপূর্ণ কাব্যের প্রকৃত কবি কে ?

আজ অনেক দিন হইতেই এই ভট্টিকাব্যের কবি সম্বন্ধে মত-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় বার আনা লোকের বিশ্বাস যে, ভট্টিকাব্য কবি ভর্তৃহরির প্রণীত। অবশিষ্ট চার আনা লোকের মতও ভিন্ন ভিন্ন। এই কাব্যের প্রামাণিক টীকাকার দুইজন। একজন জয়মঙ্গল, অপর ভরত মল্লিক।

পাঁওঁতি শিরোমাণ ভরতমল্লিকের মতে ভট্টিকাব্য কবি ভর্তৃহরির প্রণীত। যথা তাঁহার টীকায় ভূমিকায় “ভর্তৃহরিনাম কবিঃ শ্রীরাম কথ্যশ্রয়ং মহাকাব্যং চকার।” প্রাচীন টীকাকার জয়মঙ্গল বলেন ;—“কবিভট্টিনামা রাম কথ্যশ্রয়মহাকাব্যং চকার।” উপরি উক্ত ভরত মল্লিকের মতকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়া, বঙ্গের “জীবনীকোষ”-প্রণেতা প্রভাত মনস্বিগণ, কবি ভর্তৃহরিকেই ভট্টিকাব্যের কবি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিকের মতের প্রতিপোষক প্রমাণ কিছুই পাই না। এবং বিপরীত পক্ষে তর্ক করিয়া ভরত মল্লিকের মতকে খণ্ডন করা যাইতে পারে। কাব্যকর্তা কাব্যের শেষে একটা মাত্র শ্লোকের দ্বারা আপনার যাহা পরিচয় দিয়াছেন, সেই শ্লোকের দ্বারাই ভরত মল্লিকের মত একেবারে অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়ে। সেই শ্লোকটি এই, যথা,—

“কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং

• শ্রীধর স্মৃনরেন্দ্র পালিতায়াং ॥” অর্থাৎ—

“আমি শ্রীধরপুত্র নরেন্দ্ররাজার রাজধানী বলভী নগরীতে থাকিয়া এই কাব্য রচনা করিলাম।”

• “ভক্তমাল” রচয়িতা ভট্টিকাব্যের সেই শেষ শ্লোকে “শ্রীধরস্মৃ” এই শব্দটি দেখা মাঝেই উহার প্রকৃত অর্থ বা অর্থ্য না বুঝিয়াই, বোধ হয়, কান্যকর্তৃকে প্রসিদ্ধ শ্রীধর স্বামীর পুত্র বলিয়া অনুমান করিয়া থাকিবেন। যথা—“ভক্তমালা” শ্রীধর স্বামীর চরিতাখ্যানে—

“জন্ম জন্ম শ্রীধর স্বামী ভুবনপাবন।

ভাগবত উপদেশে ভারে জগজ্জন ॥

• গৃহে এক মাত্র স্ত্রী পূর্ণ গর্ভবতী।

তাজিয়া যাইতে বন হৈল দৃঢ়মতি ॥

হেন কালে নাড়ী পুত্র প্রসব করিয়া।

কাল প্রাপ্ত হৈল তার বালক রাখিয়া ॥

সাধু উৎকর্ষাতে গৃহে রাখিতে না পারে।

চিন্তয়ে বালক এই কেবা রক্ষা করে ॥

• এতেক ভাবিয়া তাজি গমন করিল।

অনাথ বালক গ্রাম্য লোকেতে পালিল ॥

সেই শিশুকালে মহা পণ্ডিত হৈলা।

“ভট্ট” নামে রামলালা সাহিত্য বর্ণিলা ॥”

“ভক্তমাল” রচয়িতার বিরুদ্ধে এই পর্য্যন্ত বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, যাহার সামান্য মাত্র অল্প বোধ আছে, সেও “কাব্যমিদং” ইত্যাদি শ্লোক দেখিয়া কখনই শ্রীধর স্বামীর পুত্রকে “ভট্ট” কাব্যের কবি বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

সম্প্রতি ভরত মল্লিকের বিপরীত পক্ষে তর্ক এই যে ;—কাব্যকর্তা স্বয়ং লিখিয়াছেন, “আমি বলভীপতি নরেন্দ্ররাজার রাজধানীতে থাকিয়া এই কাব্য রচনা করিলাম।” এ কথা কি কখন ভর্তৃহরির উক্তিভেদে সম্ভব ? ভর্তৃহরি স্বয়ং রাজা হইয়া অপরের রাজধানীতে থাকিয়া গ্রন্থ রচনা করিবেন, একথা বাতুল ভিন্ন অপরে কেহ বিশ্বাস করিবে না। ভর্তৃহরি শেষে বিরাগী হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। সন্ন্যাস অবস্থায় রাজবাড়ীতে থাকিয়া কাব্য রচনা করিবেন, একথাও বিশ্বাসযোগ্য নহে।

ভর্তৃহরি একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন ; এবং কবি বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার “নীতিশতক” “শৃঙ্গারশতক” “বৈরাগ্যশতক” প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা তাঁহার নাম ধাম দেখিতে পাই। “ভট্টিকাব্যে” তাঁহার নামের গন্ধও নাই। পণ্ডিত-কুলপতি ভরত মল্লিকের কথা যেখানে অপ্রমাণ হইল, সে স্থলে এই ভট্টিকাব্যের প্রণেতা, কে ?

আমাদের প্রাচীন প্রামাণিক টীকাকার জয়মঙ্গল বলেন ;—ভট্টিকাব্য ভট্ট নামক

কবির বিরচিত। যথা তাঁহার কৃত টীকার ভূমিকায় “কবি ভট্টি নামা রাম কথাস্রব্ধ-মহাকাব্য চকার।” “ভট্টিকাব্য” নাম দ্বারাও আখ্যায়ের ইহা বিখ্যাত হইতেছে। পূর্বোক্ত “কাব্যমিমাংস বিহিতং” ইত্যাদি শ্লোকের টীকার শেষে জয়মঙ্গল লিখিয়াছেন;— “ইতি বলভীবাস্তবস্ত ভট্ট মহাব্রাহ্মণস্ত মহাবৈয়াকরণস্ত কৃতে” ইত্যাদি। এই টীকা অল্পসংখ্যক উক্ত কাব্য ভট্টি নামক কবির কৃত বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। এই “ভট্ট মহাব্রাহ্মণ” বোধ হয়, আমরা যাহাকে “ভাট ব্রাহ্মণ” বলি, তাহাই।

এদিকে পুরাকৃত পাঠে প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্যে যাইতেছে যে,—তথাকার রাজারাও, সেই সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র লবের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতেন। অতএব ইহা সম্ভব হইতে পারে যে, উক্ত কাব্যকর্তা ঐ রাজধানীতে বাস করিয়া ঐ রাজবংশের বীজপুরুষ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। এবং প্রাচীন

প্রামাণিক টীকাকার জয়মঙ্গলের মতানুসারে উক্ত কবির নামই “ভট্টি।” কবি নিজেই নামে কাব্যের নাম রাখিয়াছেন, “ভট্টিকাব্য।” কবির নামে কাব্যের নাম ‘আমরা অন্তর্য দেবিত্তে পাই; “যথা, “মাব” “ভারবি।”

নবদ্বীপের; পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অজিত নাথ শ্রায়র মহাশয়ের নিকটে প্রাচীন তাম্র-শাসন আছে। তাহাতেও “শ্রীধরহর্ষ নরেন্দ্র পালিত বলভী নগরীর কথা লিখিত আছে। এবং সেই বলভী বাস্তব্য ভট্টিকাব্যের কবি ‘ভট্টি’ নামেরও উল্লেখ লিখিত আছে। তাহা হইলে, ভট্টিকাব্যের কাল খ্রীঃ ১৭০০ বৎসরের অধিক।

পাঠক, যত দিন পর্যন্ত বিপরীত পক্ষের কোন প্রাতীকুল তর্ক প্রাচীন টীকাকার জয়মঙ্গলের মতকে নিরাকরণ না করিয়াছে, তত দিন পর্যন্ত আমরা জয়মঙ্গলের ভট্টি মহাব্রাহ্মণ মহাবৈয়াকরণ ‘ভট্টি’ কবিকেই ভট্টিকাব্যের কবি বলিয়া স্বীকার করিব।

শ্রীগোবিন্দগোপাল সেন।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১৫। ধূলি। কোষ-কাব্য—শ্রীললিত-মোহন দত্ত বিরচিত। মূল্য ১০। ২১ পৃষ্ঠা-ব্যাপী অতি ক্ষুদ্র পুস্তক,—সুতরাং মূল্য বড় অধিক ধরা হইয়াছে। বিলাতী কাগজে ছাপা। কিন্তু কবিতা কয়টি সুন্দর হইয়াছে।

১৬। ভারতীয় বিহুবি। শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় বিরচিত, মূল্য ১০/০। ৩৪টি ভারতীয় বিহুবীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই পুস্তকে সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। মণিলাল বাবুর এইরূপ চেষ্টার জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত।

১৭। Lessons from the Koran, Published by the Reform Publishing Society, মূল্য ৬০। কোরাণের যাবতীয় উপদেশ সংক্ষেপে সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। “পুস্তকখানি উপদেশ হইয়াছে। অল্প সময়ে অনেক অংশজ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়।

১৮। A Dying Race, by U. N. Mukherjee, Price As 4. এই সৃষ্টিস্থিত পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা গ্রন্থকারের নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ হইলাম। কিরূপে বঙ্গের হিন্দুজাতি তীব্রগতিতে বিনাশের পথে ধাবিত হইতেছে, অতি বিজ্ঞতা সহকারে গ্রন্থকার তাহা প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনার বঙ্গে ১৭১ লক্ষ হিন্দু ও ১৬৭ লক্ষ মুসলমান ছিল। অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান অপেক্ষা ৪ লক্ষ অধিক ছিল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনার হিন্দু সংখ্যা ১৭১ হইতে ১৭২২ লক্ষ হয়। মুসলমান ১৬৭ লক্ষ হইতে ১৭৯ লক্ষ হয়। অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান হইতে ৬ লক্ষ কম হয়। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনার—মুসলমান সংখ্যা ১৭৯ হইতে ১৯৬ লক্ষ হয়, হিন্দু সংখ্যা ১৮৫ লক্ষ হয়। হিন্দু হইতে মুসলমান সংখ্যা ১৫ লক্ষ অধিক হয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের লোক

গণনার 'মুসলমান' সংখ্যা ১৯৬ লক্ষ হইতে ২২০ লক্ষ হয়, হিন্দুসংখ্যা ১৯৪ লক্ষ হয়। অর্থাৎ ৩০ বৎসরের মধ্যে যে মুসলমান সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা ৪ লক্ষ কম ছিল, তাহা হিন্দু সংখ্যা হইতে ২৫ লক্ষ অধিক হয়। এই সব কথা ত্রীমুক্ত ত্রীনাথ দত্ত মহাশয় একবার অতি সুন্দর রূপে নব্যভারতে আলোচনা করিয়াছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই অত্যাশ্চর্য্য বিষয়টির আলোচনা করিয়া দেশের এক মহৎ কাঙ্গ করিয়াছেন। সকলেরই পুস্তকখানি পাঠ করা উচিত। স্বদেশী কাগজে সুন্দররূপে মুদ্রিত—মূল্য অতি সুলভ। ঘরে ঘরে এই পুস্তকের আদর হউক।

১৯। সার্কজনীন উপাসনা ও সাম্যবাদ। ত্রীমং সচ্চিদানন্দ স্বামী প্রণীত, বিনা মূল্যে বিতরণীয়। সূচিস্তিত প্রবন্ধ। সব মতের সহিত ঐক্য হইতে না পারিয়া থাকিলেও, এ পুস্তক পাঠে বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি।

২০। Modern India by Swami Bebekananda, মূল্য ১০। ১৯৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের উদ্বোধনে প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুবাদ। বিবেকানন্দের সমস্ত লেখা ব্যাপিয়া যে প্রতিভার স্ফুরণ রহিয়াছে, এই পুস্তকে তাহার অভাব নাই। "But, gradually, the idea is being formed in the minds of the English public, that the passing away of the Indian Empire from their sway will end in imminent peril to the English nation, and be their ruin. So, by any means whatsoever, the supremacy of England must be maintained in India. * * * Therefore, when such remarkable traits of character are still predominant in the English as a nation, it is utterly useless to spend so much energy and power for the mere preservation of the meaningless "prestige." If that power were employed for the welfare of the subject-people, that would certainly have been a great gain for both the ruling and the ruled races." বিবেকানন্দের প্রতি কথায় স্বদেশীয়রাগের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুস্তকখানি নানা প্রকার সূচিস্তিত কথায় পূর্ণ।

২১। রাজকাহিনী—মেবার। প্রথম খণ্ড। ত্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ৫০। শিলাদিত্য, গোহ, বাগাদিত্য ও পদ্মিনীর কাহিনী বিবৃত। ভাষা প্রাজ্ঞল। স্বদেশীয়রাগের এই অপূর্ণ কাহিনী, আশা করি, সকলে পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

২২। সনাতন সাধন তত্ত্ব বা তত্ত্ব-রহস্য,—ত্রীমং সচ্চিদানন্দ স্বামী প্রণীত। গ্রন্থকার সর্ব প্রথমে "আত্মশক্তি ত্রীশ্রীদক্ষিণা কালিকার" এক একখানি ছবি দিয়াছেন। পুরী ধামের ত্রীমন্দিরের যে সকল কুৎসিত চিত্র দর্শন করিয়া দর্শকগণ চক্কু অবনত করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, দক্ষিণা-কালিকা-চিত্রও সেই জাতীয়। কালিকা-তত্ত্ব হইতে দক্ষিণা কালিকার ধ্যান উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার সেই কুৎসিত ভারটিকে আরো প্রস্তুতি করিয়াছেন। কালিকা তত্ত্ব যে অতি আধুনিক গ্রন্থ, তাহার রচনা প্রণালী, কবিত্ব, শব্দ বিভ্রাসই তাহার প্রমাণ। "আমরা একথা অসঙ্কোচ বলিতে বাধ্য যে, যিনি মাতৃ মূর্তিতে ঐজিয়িক অভিনয় আনয়ন করিতে পারেন, সেই তত্ত্ব-রচয়িতা ভক্ত নহেন, কবিও নহেন।

লেখক সনাতন সাধন-তত্ত্ব বলিতে তত্ত্বোক্ত সাধন প্রণালী বুঝিয়াছেন এবং গাহারা লেখকের সহিত এক মত নহেন, তাহারাই ইংরাজী-শিক্ষিত ও ভ্রান্ত বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। হৃৎথের বিষয় যে, "ভারতবর্ষীয় রাজবৎস-প্রমুখ ঋষিবৃন্দ, ব্রহ্ম, শঙ্কর প্রভৃতি ধর্ম-গুরুগণ, নানক, চৈতন্য, কবির প্রভৃতি সাধকগণ, কেহই তত্ত্বের নাম উল্লেখ করেন নাই। ঐতিহাসিকগণ বলেন, ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের বিলোপ সময়ে অধঃপতনের অবস্থায় তাত্ত্বিক আচারের জন্ম হয়। তাত্ত্বিক সাধন অতি আধুনিক। লেখক পতঞ্জলির যোগ শাস্ত্রের তাত্ত্বিক সাধনায় ভিত্তি স্থাপন করিতে চাহেন। গাহারা পাতঞ্জল দর্শন বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহারাই বলেন, "পতঞ্জলি-প্রদর্শিত যোগ অর্থে সংযোগ নহে—বয়ং, বিরোগ বা উত্তোগ। ভোজ্য বৃত্তিতে উক্ত হইয়াছে—'প্রকৃতি পুরুষের যে বিরোগ বা বিবেক (পার্থক্য জ্ঞান) পাতঞ্জল শাস্ত্রে তাহাকেই যোগ বলে।" * * * "পাতঞ্জল শাস্ত্রে যোগ

শব্দে ঈশ্বরের সহিত জীবের সংযোগ বুঝায় না; কিন্তু চিত্ত নিরোধের উদ্যোগ বা ব্যাপার মাত্র বুঝায়।” এই পতঞ্জলি হইলেন ‘সনাতন যোগের’ গুরু ?

গ্রন্থকার পঞ্চ-মকারের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ এবং যুক্তি কোথায় ? তিনি পঞ্চ-মকারকে সমর্থন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—“প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া নিবৃত্তি করিবার ব্যবস্থাই পঞ্চ-মকারের তামসিক সাধনা।” পঞ্চ-মকারের জঘন্ত পথে—প্রবৃত্তির পাপময় পথে চলিতে চলিতে নিবৃত্তির উদয় হইবে ভাবিয়া এই পন্থার প্রশংসা দেওয়াও কি অজ্ঞান্য নহে ? যাহা পাপ, তাহা পরিত্যাগের আয়োজনেই ধর্ম প্রকাশিত হয়। নিবৃত্তিতেই ধর্মের জন্ম।

গ্রন্থকার জাতিভেদের সমর্থন করিতে গিয়া বলিয়াছেন, “এই ভাবে জাতিগত, সমাজগত সেবাই আর্থ্যের নিম্নস্তর নির্দিষ্ট শূদ্রহ। ইহার উপরে বৈশ্যহ।” * “সাধক মাত্রের বেদাচার হইতে বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করাই ব্যক্তিগত বৈশ্যহ বা বৈষ্ণবহ।” ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন এই, এইরূপ গুণগত বৈশ্যহ, শূদ্রহ, ব্রাহ্মণহ ইত্যাদি ভাব হিন্দু ভারতে কোথায় ? একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণের—ব্রাহ্মণহ-প্রাপ্ত ব্রাহ্মণের পাঁচটা পুত্র। সেই পাঁচটা পুত্র পাঁচ প্রকার গুণবিশিষ্ট হইতে পারে; কিন্তু সমাজে তাহারা ত সকলেই ব্রাহ্মণ। বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষার জন্য লেখক যে সকল কথা বলিয়াছেন, তিনি স্বয়ংই তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। যে ডালে বসিয়াছেন, সেই ডাল কাটিয়াছেন। তন্ময়ত্ব সন্ধেও লেখক “স্ববিরোধ দোষে” জড়িত হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—“তখন সংসারের” যে দিকে যাহা কিছু দেখেন, তাহাতেই তাঁহার ধ্যায় দেয়তার পূর্ণ বিকাশ পরিদর্শন করেন। তখন তাঁহার বিদ্যাদৃষ্টি বিস্ফারিত হইয়া জলে স্থলে, অনলে অনিলে মহামায়ার অনাদি ও অনন্ত সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের তত্ত্ব দেদীপ্যমান প্রত্যক্ষ করেন, অর্থাৎ সেই বিশ্ব প্রকৃতি মধ্যেই বিশ্বপ্রসবিনী

বিশ্ব প্রকৃতির লীলা রহস্ত দেখিতে দেখিতে সাধক প্রকৃতিময় বা আত্মহারা হইয়া যান।” লেখক এবিধ তন্ময়ের লক্ষণও বর্ণনা করিয়াছেন;—“তাঁহার ভাবে যিনি বতদূর আত্মহারা হইয়াছেন, তিনি তাঁহাতে ততদূর তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সত্তাসাগরে আমার আত্ম অস্তিত্ব সম্পূর্ণ রূপে ডুবাইয়া দেওয়াই, আমার তন্ময়ত্ব।”

যাঁহার চিত্ত তন্ময় হইবে, তাঁহার স্বরূপ কি ? লেখক চণ্ডী হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—“জড় ও অজড়, চেতন ও অচেতন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল তত্ত্বের মধ্যেই গুপ্ত ও ব্যক্ত ভাবে অবস্থিত। শক্তিরূপিনী দেবীকে আমরা বার বার প্রণাম করি।” * “যিনি সর্ব ভূতে চেতনা হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার পদে বার বার প্রণাম করি।” লেখক আরও অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত সেই অমর অমৃত মন্ত্রটা উদ্ধৃত করিয়াছেন,—“হে প্রভো, আপান রূপবিনীন হইলেও আমি আপনার ধ্যান রচনা করিয়া রূপবিশিষ্ট রূপে বর্ণনা করিয়াছি, আপনি সর্বব্যাপী হইলেও আমি মানবগণকে তীর্থ যাত্রার উপদেশ দিয়া আপনার সর্বব্যাপকতার অপলাপ করিয়াছি, আর আপনি অবাস্তনসোগোচর হইলেও আপনার গুণ রচনা করিয়াছি—অতএব হে অখিলেশ্বরো, আমার বিকলতারূপ এই দোষত্রয় নিজ গুণে ক্ষমা করুন।” লেখক এই অমূল্য তত্ত্ব, ঈশ্বরের গুণ চিন্তা, তাঁহাতে তন্ময়ত্ব ইত্যাদি কথা উত্থাপিত করিয়া নিজেই মূর্তি-পূজা, মূর্তি-ধ্যানের কি প্রতিবাদ করেন নাই ? তিনি স্বীয় মতসমর্থনের অস্ত্র এবিধে যে সকল কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ‘স্ববিরোধী’ নহে কি ? লেখক বারংবার এই মর্মে লিখিয়াছেন যে, গুরুর কৃপা, গুরুর উপদেশ, গুরুর সাহায্য ব্যতীত সাধন তত্ত্ব কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। এই রূপ হইলে গুরু প্রণয়ণেরই বা কি প্রয়োজন ছিল ?

সাংখ্যসূত্র । (২)

প্রথম অধ্যায় ।

১৯ । (অতএব) নিত্য শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত

স্বভাব পুরুষের সেই (প্রকৃতি) সংযোগ
ব্যতীত সে দুঃখযোগ (বা বন্ধন) হয়
না ।

সেই সংযোগ = অবিবেক । অবিবেক হেতু
বন্ধন অভিমান হয় । (অনিঃ)

অগ্নিসংযোগে যেমন জলের উষ্ণতা,
সেইরূপ সংযোগবিশেষ হইতে আত্মার
বন্ধন উপাধি হয় । এই সংযোগে প্রকৃ-
তির স্বাভাব্য নাই । প্রকৃতি নিজে পুরু-
ষের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না । পুরুষ
অবিবেক বশতঃ প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত বোধ
করে । এই সংযোগ হইলে, তবে প্রকৃতি
পুরুষকে বন্ধ করে । প্রসঙ্গক্রমে এই সূত্রে
সাংখ্য দর্শনের সিদ্ধান্ত ইঙ্গিত করা হইয়াছে ।

(বিঃ ভিঃ) ।

এই সংযোগ = প্রকৃতিপুরুষ যোগ ।

প্রকৃতিসংযোগেই পুরুষ বন্ধ হয় । যখন

সংযোগ থাকে না, তখন বন্ধনও থাকে না ।

এইজন্ত বন্ধন উপাধিক—স্বাভাবিক নহে ।

স্বত্বিতে আছে—

যথা জলদগ্ধগাল্লিষ্টগৃহং বিচ্ছিন্ন রক্ষ্যতে ।

তথা সদোষ প্রকৃতি বিচ্ছিন্নোয়ং ন শোচতি ॥

বৈশেষিকদিগের মতে, পুরুষের দুঃখযোগ
পারমার্থিক । তাহা ভ্রম । যেমন স্বভাবতঃ
বিশুদ্ধ মণি—জ্বাদির সংযোগ ব্যতীত স্নিজিত
হয় না, তেমনই নিত্যমুক্ত পুরুষে উপাধি-
সংযোগ হেতু দুঃখ ব্যতীত স্বাভাবিক দুঃখ-
দির সম্ভব নাই ।

“যথা হি কেবলো রক্তঃ ক্ষটিকো লক্ষ্যতে
জনৈঃ ।

রক্তকাত্তপধানেন তথঃ পরম পুরুষঃ ॥”

ইতি সৌরপুবাণ ।

নিত্য = কালাদি অনবচ্ছিন্ন ।

নিত্য শুদ্ধ = সদা পাপ শূন্য ।

নিত্য বুদ্ধ = অলুপ্ত চিদ্রূপত্ব ।

নিত্যমুক্ত = সদা পারমার্থিক দুঃখযোগ

বিহীন । পুরুষে দুঃখযোগ প্রতিবিধরূপ, ইহাই
বন্ধন । ইহা পারমার্থিক নহে ।

আত্মা নিত্য ও বিভূ, ইহা ত্রায়দর্শনেরও
সিদ্ধান্ত । ত্রায় মতেও অন্তঃকরণ যোগ ব্যতীত
আত্মার দুঃখযোগ সম্ভবে না । অন্তঃকরণই
আত্মার দুঃখভোগের নিমিত্ত কারণ ।……

“আমি স্থখী বা দুঃখী আমি কর্তা, “আমি
গোর” ইত্যাদি নানা ভ্রমাত্মক অহুত্বের
কারণ পুরুষ নহে, এই অন্তঃকরণ সহিত
সংযোগই তাহার কারণ ।

“তস্মাৎ তৎসংযোগাচেতনং চেতনাবদিব লিপ্তং
শুগকর্ভুত্বৈ চ তথা কৰ্ত্তেব ভবত্যা দাসীনঃ ॥”

ইতি কারিকা ।

“দ্রষ্টৃ দৃশ্যয়োঃ সংযোগঃ হেয়হেতুঃ”—

ইতি পাতঞ্জল ।

“পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙক্তে প্রকৃতিজান্

শুণান্ । ইতি গীতা ।

(প্রকৃতিস্থ = প্রকৃতি সংযুক্ত ।)

আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তে ত্যাহ্ মনীষিণ ॥

ইতি শ্রুতি ।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, কালাদির
সহিত সংযোগের ভ্রান্ন, মুক্ত ও অমুক্ত সকল

পুরুষের সহিতই প্রকৃতির সংযোগ হইতে পারে। তখন এ সংযোগ কিরূপে বন্ধন কারণ হইবে? ইহার উত্তর এই যে, অপর জন্মানামা স্ববুদ্ধি ভাবাপন্ন প্রকৃতির সহিত সংযোগই এস্থলে সংযোগ শব্দের অর্থ। ব্যাস যোগভাষ্যেও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বুদ্ধিবৃত্তি উপাধিধারাই পুরুষের হঃসংযোগ হয়।

বৈশেষিকেরা এ সম্বন্ধে ভোগজনকতা অবচ্ছেদকর দ্বারা অন্তঃকরণসংযোগের বিশেষ স্বীকার করেন। সাংখ্যেও সেইরূপ বিশেষ সংযোগ স্বীকৃত। একজ্ঞাত্ত্বস্থপ্তিতে ভোগ প্রসঙ্গ নাই।

নিজ নিজ ভূক্তবৃত্তি এবং বাগনা রূপ যে কিছু বৃত্তি থাকে, তাহাই সংস্কার প্রবাহ, তাহা অনাদীর্ণ সেই জ্ঞাত্ত্ব, তাহার সহিত আত্মার স্বস্বামিতাব ব্যবস্থিত আছে।

কেহ কেহ বলেন, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ অঙ্গীকার করিলে, পুরুষের পরিণাম ও সঙ্গ স্বীকার করিতে হয়। অতএব এই সূত্রে অবিবেকই সংযোগ শব্দের অর্থ। (অনিরুদ্ধও ইহাই বলেন)। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে। কেন না, অবিবেক এই সংযোগের হেতু, ইহা সূত্রান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে। (৩।১১ এবং ২৭ সূত্র)। পাতঞ্জলেও অবিজ্ঞাকে এই সংযোগ হেতু বলা হইয়াছে।

প্রলয়কালে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ থাকে, কিন্তু তখন ভোগ থাকে না। অতএব সংযোগই অবিবেক নহে। এই সংযোগ অবিবেক হইলে আত্মাশ্রয় দোষও হয়।

তাহা হইলে সংযোগ অবিবেকের হেতু, ও অবিবেক সংযোগের হেতু—ইহা বলিতে হয়।

অতএব এই সংযোগ অবিবেক হইতে ভিন্ন। এই সংযোগ সামান্য গুণাতিরিক্ত

শব্দের উৎপত্তিরূপে পরিণামও নহে। কুটস্থ বিভূ আত্মার পরিণাম হইতে পারে না। আর সংযোগ মাত্রই সঙ্গ নহে। পরিণামের হেতুত্ব সংযোগই সঙ্গ।

এস্থলে আরও প্রশ্ন উঠে যে প্রকৃতিপুরুষ উভয়ই বিভূ নিত্য। তবে কিরূপে তাহাদের মহত্ত্বাদির হেতুত্ব অনিত্য সংযোগ হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, ত্রিবিধ গুণসমুদয় রূপ প্রকৃতির পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন উভয় রূপ আছে। এই পরিচ্ছিন্ন রূপ বিশিষ্ট প্রকৃতি দ্বারাই পুরুষের সংযোগ উৎপত্তির সম্ভব হয়। (অর্থাৎ পুরুষ সংযোগে প্রকৃতি হইতে যে বুদ্ধি, অহঙ্কার মন ইন্দ্রিয়াদিরূপ তত্ত্বের পরিণাম হয়, তাহার অপরিচ্ছিন্ন (বা সমষ্টি) এবং পরিচ্ছিন্ন বা ব্যাপ্তিরূপ আছে। এই ব্যাপ্তিরূপে বহু বা অনন্ত অন্তঃকরণের পরিণাম হয়। যে পরিচ্ছিন্ন অন্তঃকরণের সহিত যে পুরুষের পূর্বজন্মান্বজিত সংস্কার হেতু স্বস্বামিতাব আছে, তাহার সহিতই সে পুরুষের সংযোগ হয়।)

কেহ কেহ ভোগ্য ও ভোক্তারূপ হেতুই প্রকৃতি পুরুষের নিত্য সংযোগ স্বীকার করেন। তাহা হইলে জ্ঞানদ্বারা তাহার নিবৃত্তি সম্ভব হয় না। তাহা ব্যক্তিসংকলন নহে।

অতএব পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ বিশেষই বন্ধনের কারণ। ইহাই সূত্রকারের অভি-
প্রেত।

২০। অবিজ্ঞা হইতেও বন্ধন হয়
২১। কারণ যাহা অবস্থ, তাহা দ্বারা
বন্ধনযোগ হইতে পারে না।

এই সূত্রে ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ ও মার্যবাদ নিরাশিত হইয়াছে। উক্ত মতে অবিজ্ঞা বন্ধন কারণ। তাহা সঙ্গত নহে।

অবিজ্ঞা,—বিজ্ঞান প্রাগভাবই হউক, আরও প্রচ্ছন্ন অভাবই হউক, তাহা অবস্ত। অবস্তর দ্বারা বস্তুর বন্ধন সম্ভব হয় না। (অঃ নিঃ)

ইদানীং এখানে নাস্তিকের অভিপ্রেত বন্ধনকারণ নিরাকৃত হইতেছে। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ ও অদ্বৈতবাদ মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। উভয়ই বিভিন্নরূপ বৌদ্ধমত মাত্র। যথা—

“ষড়ভিজ্ঞো দশবলোহৃদয়বাদী বিনায়কঃ ॥

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ মতে প্রকৃতি আদি কোন বাহ্য বিষয় নাই। সুতরাং উক্তরূপ সংযোগ অসম্ভব। ক্ষণিক বিজ্ঞানসম্মত মাত্রই দ্বিতীয় তত্ত্ব। সাংখ্যিক অবিজ্ঞা মিথ্যাজ্ঞান। তাহাই বন্ধন কারণ। যথা—

“অভিন্নোহপি হি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্যাস নিদর্শনৈঃ
গ্রাহ্য গ্রাহক সংবিত্তি ভেদবানি ব লক্ষ্যতে ॥

ইহাই ক্ষণিক বিজ্ঞান মত। সেইরূপ অদ্বৈতবাদীরাও অবিজ্ঞাকে অবস্ত বলেন। স্বপ্নদৃষ্ট রজুর দ্বারা তাহা বন্ধন কারণ হইতে পারে না। বন্ধন সাংখ্যমতে অসম্ভব নহে। অসম্ভব হইলে, তাহা নিবৃত্তির জন্ম বহু আয়াস সাধ্য। যোগাদি অলুপ্তান যথা।

২১। অবিজ্ঞা বস্ত হইলে সিদ্ধান্ত হানি হয়।

অদ্বৈতবাদীদের অবিজ্ঞা তাত্ত্বিক নহে, তাহা অবস্ত। তাঁহারা অবিজ্ঞাকে বস্ত বলিতে পারেন না। ইহাতে তাঁহাদের সিদ্ধান্তের হানি হয়। তাহা বলিলে আত্মাব্যতিরিক্ত অন্য বস্ত থাকার স্বীকার করিতে হয়—আর অদ্বৈতবাদ থাকে না। এজন্য উক্ত হইয়াছে—

২২। আর তাহা হইলে বিজ্ঞাতীয় দ্বৈত থাকার আপত্তি হয়।

বিজ্ঞাতীয়—অর্থাৎ ভিন্ন জাতীয়। বিজ্ঞা-

তীয় বস্ত স্বীকার করিলে অদ্বৈতবাদীরা দ্বৈত ভদ্র হয়। সুতরাং তাহা হইলে, ক্ষণিক বিজ্ঞান প্রবাহরূপ সম্মত ব্যতীত ভিন্ন জাতীয় দ্বৈতের আপত্তি হয়। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী ক্ষণিক বিজ্ঞান ভিন্ন আর দ্বিতীয় পদার্থ স্বীকার করেন না। ক্ষণিক বিজ্ঞানমতে ক্ষণিক বিজ্ঞানের বিষয় অনন্ত। এই মতে স্বজ্ঞাতীয় দ্বৈত স্বীকৃত। কেবল বিজ্ঞাতীয় দ্বৈত অস্বীকৃত। এই মতানুসারে জ্ঞান প্রবাহ রূপ অবিজ্ঞা—বন্ধের পরে উৎপন্ন হয়, তাহা বন্ধের কারণ নহে। বাসনাক্রমে আবিজ্ঞাই বন্ধের কারণ। কিন্তু তাহা জ্ঞান হইতে বিজ্ঞাতীয়। (অনিঃ) (বিঃ ভিঃ)।

এই সকল সূত্রে ব্রহ্ম-মীমাংসা সিদ্ধান্ত নিরাকৃত হইয়াছে, এরূপ ভ্রম হওয়া কর্তব্য নহে। ব্রহ্মমীমাংসায় কোন সূত্রেই অবিদ্যা মাত্রই বন্ধের কারণ, এরূপ উক্ত হয় নাই। “অবিভাগো বচনাৎ” ইত্যাদি ব্রহ্মমীমাংসার সূত্রে অবিভাগ লক্ষণ অদ্বৈত স্বীকৃত। অবিদ্যার বস্ত স্বীকার করিলেও তাহাতে বিরোধ হয় না। আধুনিক বেদান্তবাদ মায়াবাদ মাত্র। মায়াবাদী বিজ্ঞানবাদীদের অন্তর্গত। তাহাদের মত মূল বেদান্তের অভিপ্রেত নহে। তাহারা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ।

“মায়াবাদম্ অসচ্ছাত্তং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমেব চ।

মতৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ রূপিনা।”

“বেদার্থবদ্যহাশাস্ত্রং মায়াবাদং অবৈদিকম্।”

ইতি পদ্মপুরাণ।

আরও এক কথা। মায়াবাদীরা স্বজ্ঞাতীয় দ্বৈতও স্বীকার করে না। তাহাদের সম্বন্ধে বিজ্ঞাতীয় দ্বৈত বলা নিরর্থক। অতএব এই সূত্রে প্রধানতঃ বিজ্ঞানবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। (বিঃ ভিঃ)।

এই স্থলে বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক অবৈত-
বাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন ।

২৩। আর যদি অবিজ্ঞা—বিরুদ্ধ
উভয় রূপ হয় ?

এরূপ হইলে ত উক্ত আপত্তি বুঝা হইবে ?
ইহার উত্তর পরবর্তী সূত্রে দেওয়া হইয়াছে ।

বিরুদ্ধ উভয়রূপ = বস্তু ও অবস্তু উভয়-
রূপ । অবিদ্যা অনাদি হইলেও যদি নাশ
হয় বলিয়া তাহাকে প্রাগভাবরূপ বলা যায় ।

(অনিঃ ।

সং ও অসং এই বিরুদ্ধ উভয় রূপ, অথবা
সদসত্তের অতিরিক্ত রূপ । তাহা হইলে
পারমার্থিক অবৈত ভঙ্গ হয় ।

সাংখ্য যে প্রপঞ্চ জগৎকে সদসং বলেন,
সে সদসত্তের অর্থ ভিন্ন । ব্যক্ত যাহা তাহা
সং, আর অব্যক্ত—অসং । (বিঃ ভিঃ)

২৪। না, (তাহা বলা যায় না,
কারণ) কখন সেরূপ পদার্থের প্রতীতি
হয় না ।

আর অবিদ্যাই যদি বন্ধহেতু হয়, তবে
জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যা ক্ষয় হইলে তাহার পর
আর কিরূপে প্রারম্ভ ভোগ হইতে পারে ?
কারণ নাশে কিরূপে কার্য্য থাকে ? কিন্তু
জীবমুক্তির পরেও প্রারম্ভ ভোগ হয় । একারণ
সাংখ্যমতে সিদ্ধান্ত এই যে, সংযোগ দ্বারাই
অবিদ্যা ও কৰ্ম্মাদি বন্ধনকারণ হয় । এই
জন্মাখ্য সংযোগ প্রারম্ভ কৰ্ম্মের শেষ না হইলে
নাশ হয় না । সেইজন্য অবিদ্যা নাশ হইলেও
প্রারম্ভ ভোগ হয় । (বিঃ ভিঃ)

২৫। বৈশেষিকাদির ন্যায় আমরা
যট্ পদার্থবাদী নহি ।

বৈশেষিকগণ ছয় পদার্থ স্বীকার করেন,
নৈমগ্নিকগণ বোড়শ পদার্থ স্বীকার করেন ।

৫৮৫, ৮৬ দ্রষ্টব্য) সাংখ্যে এরূপ পদার্থের
সংখ্যা নিয়ম নাই । সাংখ্য পণ্ডিতগণ পঞ্চবিং-
শতি তত্ত্ব স্বীকার করেন বটে, কিন্তু পদার্থের
কোন সংখ্যা নাই । প্রত্যেক তত্ত্ব মধ্যে
পদার্থ সংখ্যা অনন্ত হইতে পারে ।

বৈশেষিক দর্শনে ষট্ পদার্থের নাম যথা—
দ্রব্য, গুণ, কৰ্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় ।
পরবর্তী বৈশেষিক পণ্ডিতগণ অভাব আখ্য
সপ্তম পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন ।

অবশ্য এই কারণে অবিদ্যাকে স্বতন্ত্র পদার্থ
বলিয়া স্বীকার করিতে সাংখ্য মতে আপত্তি
নাই । সে আপত্তির অন্য কারণ আছে ।
(বিঃ ভিঃ)

২৬। পদার্থের সংখ্যা নিয়ম না
থাকিলেও যাহা যুক্তিবিরুদ্ধ এরূপ
পদার্থ কেহ স্বীকার করে না । যে
স্বীকার করে, সে বালক বা উন্মত্তের
সমান ।

সদসত্যস্বক, বা সং নয় অসংও নয়,
এরূপ পদার্থ যুক্তিবিরুদ্ধ । তাহার অস্তিত্ব
স্বীকার করা যায় না ।

“নাসঙ্গুণা ন সঙ্গুণা মায়া নৈবোত্তরাঙ্গিকা ।

সদসত্ত্যামনির্বাচ্যা মিথ্যাত্বা সনাতনী ॥”

সৌরপুরাণ ।

“বিকারজননোঃ মায়ামষ্টরূপা মজাৎ ক্রবাম্ ।”

অতএব প্রকৃতি বা মায়া পরমার্থতঃ সং
বা অসং নহে । তাহা সদসং উত্তরাঙ্গিকাও
নহে । তাহা লগ্নাখ্য ব্যবহারে অসং, পরি-
ণামী নিত্যভাবরূপ ব্যবহারে সং । ইহা পরে
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । (বিঃ ভিঃ) “

(উক্ত যুক্তি দ্বারা আধুনিক মায়াবাদও
নিরস্ত হইল ।)

২৭। অনাদি বিষয়ে উপরাগ
নিমিত্তও ইহার (পুরুষের) বন্ধন হয় না ।

(উপরায় বা) বাসনার সহিত অসঙ্গ আত্মার সম্বন্ধ নাই। বাসনা হেতু আত্মার বন্ধন নহে। ঐক্যমতে স্থির আত্মা নাই। (আত্মা বিজ্ঞান প্রবাহ মাত্র)। কাজেই তাহার সহিত বাসনার সম্বন্ধ হইতে পারে না। শূন্যিক বাহ্য বাদী বোধনতে, প্রবাহ রূপে অনাদি যে বিষয়, বাসনা, তাহা দ্বারা পুরুষ দুঃখবদ্ধ হয়। ইহা সঙ্গত নহে।

২৮। বাহ্য ও অভ্যন্তর উভয়ের মধ্যে দেশ ব্যবধান থাকায়, উপরঞ্জ উপরঞ্জক সম্বন্ধ সম্ভব নহে। যেমন ফররদেশর কাহারও সহিত, পাটলিপুত্রস্থ কাহারও এরূপ সম্বন্ধ সম্ভব হয় না।

সূর্যের সহিত জলের উপরাগ রশ্মি সম্বন্ধ জন্ত হয়, তাহা উক্তরূপ দেশান্তর সম্বন্ধ নহে।

বাহ্য বিষয় দ্বারা অন্তরস্থ জ্ঞানধারা রূপ আত্মা উপরঞ্জিত হইতে পারে না। উভয়ের দেশ ব্যবধান আছে। ক্ষয়স্থ জবাকুক্ষম পাটলিপুত্রস্থ ক্ষটিককে উপরাজত করিতে পারে না। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধ সংঘটন সম্ভাবনা নাই। সেইরূপ দেশ ভেদ জন্ত বিষয়ের সহিত আত্মার সম্বন্ধ না হওয়ায় আত্মায় বাসনা বা সংস্কার সংযুক্ত হইতে পারে না। আর বোধনতে আত্মা ক্ষণিক। যে আত্মা বিষয় গ্রহণ করে, পরবর্তী মুহূর্ত্তে সে আত্মা থাকে না। সে আত্মার বাসনাও পরবর্তী আত্মায় আসিতে পারে না।

পাটলিপুত্র আধুনিক পাটনা। ক্ষয়—প্রাচীন নগর কোথায় ছিল, জানা যায় না।

ক্রমশঃ।

শ্রীদেবেশ্রবিজয় বসু।

বেদমন্ত্র ।

“পুনর্মর্নঃ পুনরায়ুর্ম আগন্
পুনঃ প্রাণঃ পুনরাত্মা ম আগন্।
পুনঃচক্ষুঃ পুনশ্রোত্রং ন আগন্॥”
আমাদের সেই আয়ু, আত্মা, প্রাণ, মন,
কিরিয়া আত্মক পুন শ্রবণ, নয়ন।
যাহা হইয়াছে নষ্ট—যাহা আর নাই,
কিরিয়া আত্মক তাহা—পুন তাহা পাই।
আত্মক বাহ্যর বল বুকের সাহস,
কিরিয়া আত্মক সেই বীরকীর্তি—যশ।

আত্মক বিশ্বাস ভক্তি আত্মক মমতা,
উদ্যম উৎসাহ বার্ঘ্য জিত-ইন্দ্রিয়তা !

আত্মক সে সত্যনিষ্ঠা সংঘম বিনয়,
সে তপস্তা ব্রহ্মচর্য্য স্তব শান্তিময় !
কিরিয়া আত্মক সেই আনন্দ মঙ্গল,
লইয়া পতাকা হস্তে জয় কোলাহল !
সেই বিদ্যা সেই বুদ্ধি আত্মক সে জ্ঞান,
বেদমন্ত্রে করে কবি আবার আবিস্কার !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

শ্রীভূকারণ !

বহুপুণ্যের ফলে শুভযুগে আমা-
দের মধ্যেও মহাপুরুষের অভাব হয় হইয়া
থাকে। মাটির গুণে, জলবাতাসের গুণে,
তাপশৈত্যের তারতম্য গুণে, পুণ্যভূমি পুণ্য
ফল প্রসব করে। দেশের। নর-নারীর রীতি
নীতি, জ্ঞানধর্ম, ভাবকর্ম, দেহপ্রাণ ও আত্মা
হইতে তিল তিল করিয়া উপাদান সংগ্রহ
করিয়া মহাজনের মহাজীবন গঠিত হয়।
সমগ্র দেশের পুতশক্তি পুতইচ্ছা। কেন্দ্রীভূত
এবং ঘনীভূত হইয়া কর্মবীর অথবা ধর্মবীর-
রূপে সাকারমূর্তিতে জনসমাজে প্রকাশিত
হয়। এই জগুই মহাপুরুষের ব্যক্তিবিশেষের,
পরিবার বিশেষের, গণ্ডীবিশেষের বা জাতি-
বিশেষের একমু নহেন—তাঁহারা সকলের
সাধারণ সম্পত্তি। প্রত্যেক স্বদেশবাসীর
তুল্যস্বত্ব তাঁহাদিগের উপর, জন্মভূমির পূর্ণস্বত্ব
তাঁহাদিগের উপর, বিশ্বজগতের সাধারণ স্বত্ব
ও অধিকার তাঁহাদিগের উপর। তাঁহাদের
মহত্বের পরিমাণ কেবল আমাদের দাবীর
গুরুত্ব ও পরিমাণ পরিচায়ক। বিধাতার
বিশেষ রূপায় মূর্তিমান মহাশক্তির চরণেণু-
স্পর্শ যে কুলে, যে সমাজে, যে জাতিতে এবং
যে দেশে হইয়াছে, সে কুল ধত্ত, সে সমাজ
ধত্ত, সে জাতি ধত্ত, সে দেশ ধত্ত।

ইহা দার্শনিক সত্য যে সৃষ্টিতা সদিচ্ছার
জনরাজী এবং সদিচ্ছা সাধুচেতার প্রসূতি।
মানব জগতে, ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি, সাধু-
চিন্তা, সাধুইচ্ছা এবং সাধুচেতা প্রকাশের
স্বাভাবিক ক্ষেত্র। জাতীয় জীবনের উন্মেষ
ঐক্যে এই জীবিত ক্রিয়াতে পরিণত হয়।

ধর্ম, সমাজ কিম্বা রাজনীতি উৎকৃষ্ট জাতির
জীবন প্রবাহের স্পন্দনরূপী এবং চেতনা-
শক্তির প্রতিবিম্বরূপী মহাপুরুষদিগের লক্ষ্য-
ভূত বিষয় ও কর্মক্ষেত্র।

ধর্মবিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব ও রাজনীতি-
বিপ্লব জাতীয় জীবনের সঞ্চার, প্রসার ও
পরিণতির স্বাভাবিক ক্রিয়ার বাহ প্রকাশ
মাত্র। ক্রমবিবর্তনের অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক
বিধানানুসারে ভূতবিষয় বর্তমানে মানব
ইতিহাসে, পৌনঃপৌনিক দশমিকের স্রাব, কত
শত জাতির উত্থান, পতন ও বিলয় হইতেছে—
কত কত ধর্মসংস্কারক, সমাজসংস্কারক, রাজ-
নীতিসংস্কারক আবির্ভূত হইয়া জাতীয়মত,
জাতীয়জীবন ও জাতীয় চরিত্র গঠনকার্য
সমাধা করিতেছেন। কিন্তু সর্বত্রই ঐ একই
নিয়ম, একই ক্রম, একই পরিণাম। আদি,
মধ্য ও অন্তস্তরে ক্রমে জাতির উদ্বোধন,
বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধির অবস্থা সূচনা করে।
পক্ষান্তরে উন্নতির পরাকাষ্ঠা কেবল ধ্বংসের
আগমন-বার্তাবহ।

যে কোন জাতির ইতিহাসে দৃষ্টিনিক্ষেপ
করিলেই আমরা এই স্বয়ংসিদ্ধ মহাসত্যের
ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। আমাদের
এই স্বর্গাদপি গরীয়সী বাঙ্গালা দেশেও চেতনা
সঞ্চারের পূর্বাভাস ধর্ম্মান্দোলন। মহাত্মা
রাজা রামমোহন রায় জাতীয় জীবনের উদ্বো-
ধন ত্রুত উদ্বাপন করিয়া তিরোহিত হই-
লেন। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রাতঃ
স্মরণীয় মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাম-
জিক আন্দোলনে জীবনপাত করিলেন।

বর্তমান যুগের বীর। বর্গীর কৃষ্ণদাস পাল, রামগোপাল ঘোষ ও পূজাপাদ সুরেন্দ্রনাথ রাজনীতিচর্চার কর্তৃক প্রজ্জলিত করিয়া এই পতিত জড়জাতির নব-জীবন-বিকাশ-বার্তা ঘোষণা করিয়াছেন। প্রতিকূল অবস্থা এবং ঘাত প্রতিঘাতের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে এ ক্ষীণ জাতির উন্নতির পরিমাণ এবং পরমায়ুর সীমা কতদূর, তাহা একমাত্র বিধাতা ভিন্ন অত্ৰ কেহ বলিতে পারে না।

যখন মোগল গৌরব-সূর্য্য ভারতগগনের তুঙ্গস্থানে মধ্যাহ্নের প্রথরকিরণে ভীষণরূপে দীপ্তি পাইতেছিল, যখন দিল্লীশ্বরের দোদাঁড় প্রতাপে বিক্রমকেশরী অভিমানী দুর্ধর্ষ শিশো-দীয় রাজপুত ভূপতিরাও মুকুটভূষিত মস্তক অবনত করিয়া কুর্নিস করিতেছিলেন, সেই সময়ে, পশ্চিমঘাটের অরণ্যানী উপরে একখণ্ড ক্ষুদ্র রক্তচৈরিক বস্ত্র নিঃশব্দে যুগ্মদল হিলোলে ধীরে ধীরে উড্ডীয়মান হইতেছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চবটীবনের নিরঞ্জন গিরিকন্দর মুখরিত করিয়া ‘হর হর দেব শঙ্কর’ গুরুগম্ভীর ধ্বনি বজ্রনির্বোধে নিনাদিত হইতেছিল। তখন কে জানিত যে সকল পাটল, দেশমুখ্য ও জায়গীরদার সনদ বগলে করিয়া নবাব দর-বারে সেলাম চুকিয়া কৃতার্থ বোধ করিত, তাহাদের দরিদ্রগৃহে এবং অম্লকর পার্কত্য-দেশে একটা বর্ণজ্ঞান-হীন কিশোর জায়গীর-দার-কুমার দুর্গম গিরিবক্ষে অসভ্য অনার্য্য তস্কর সংসর্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এমন মহাশক্তির বীজ সংগ্রহ করিতেছে, যাহা অকুরিত, পরি-পুষ্ট ও সম্বলিত হইয়া একদিন সমগ্র ভারত-ভূখণ্ড কম্পিত করিবে? তখন কে জ্ঞানিত, মহারাষ্ট্র দেশের নিবিড় অরণ্যে যে বর্গীর দলগণি ধুমায়মান হইতেছিল, তাহা একদিন সমস্ত ভারতীয় রাজশক্তি ভস্মীভূত করিয়া

ইন্দ্র শ্বহের রাজপ্রাসাদ গ্রাস করিতে উদ্যত হইবে এবং গান্ধারের উপত্যকা ও অধিত্যকা-মুক্ত খাইবার গিরিবক্ষ্য বাহী প্রবল আফগান-সামন্তশ্রোতকে কুরুক্ষেত্রের সমর-প্রাঙ্গণে স্পন্দার সহিত আহ্বান করিবে?

মহারাত্রীগৌরব জিজ্ঞাবাহি-স্বত শঙ্কর-অব-তার রাজর্ষি শিবাজী সপ্তদশ শতাব্দীতে যে হিন্দুরাজশক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে হইলে অনুসন্ধান আবশ্যক, জাতীয় জীবনের এই মহোচ্ছ্বাসের ভিত্তিমূলে কোন্ ধর্মোচ্ছ্বাস বিদ্যমান রহিয়াছে। এস্থলে পুনরাবৃত্তি নিম্নপ্রয়োজন নহে যে, ধর্ম জাতীয় জীবন উদ্বোধন, সমাজে তাহার প্রসার এবং রাজনীতিতে তাহার পরিণতি। যে জাতির ধর্মশক্তি যত প্রবল, তাহার উন্নতি ও ঐশ্বর্য্য তত উজ্জ্বল। রোমের এবং গ্রীসের, আরবে এবং মিশরের, ক্যালডিয়ায় এবং পুণ্যপঞ্চনদ ভূমে সর্বত্রই জাতীয় ইতিহাস এই মহা-সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সেদিস শিবরাত্রির পুণ্যদিনে নারদাঘাটের পরপারে পতিতপাবনী জাহ্নবী-পুলিনে সাহাবাদ জিলার সত্তজাত অনাবৃত সিকতাক্ষেত্রে মহা-তেজা ব্রহ্মচারী ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন, “যত দিন ধর্মজীবন ও ভগবদ্ভক্তি ফিরিয়া না আসিবে, ততদিন ভারতের দুর্গতি দূর হইবে না। এখনও বহু দূর।” যে ভগবদ্রুপে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, “তত্ত্ব অলভ্যম্ কিম্? কিমপি ন, কিমপি ন, কিমপি ন।”

মহাপ্রাণ শিবাজী মহারাষ্ট্র শক্তি আরাধনার পুরোহিত সত্য, কিন্তু এই মহাপ্রজ্ঞার, সঙ্কল্পে ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার ভার এক পর্ণকূটারবাসী দারিদ্র্যাক্রান্ত পুণ্যাত্মা সাধুর হস্তে ছিল। তিনি ভক্ত ভূক্যারাম বাবা। রামদাস স্বামী আপন ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া মহারাষ্ট্র শক্তির

নেতৃত্বেব জ্ঞাত শিবাজীকে সহস্বে গঠিত করিয়াছিলেন। তুকারাম ধর্ম, নীতি ও বিশ্বাসের মন্ত্রে সমগ্র জাতিকে দীক্ষিত করিয়া ক্ষুণ্ণ দেশে নবজীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন। রামদাস ও তুকারাম গৌর-নিতাই, হরি হর। তাঁহারা একে ছই, ছইয়ে এক—উভয় উভয়ের অমুপূরক। পতিত জাতির উদ্ধারের জ্ঞাত, হিন্দুর নষ্ট গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার জ্ঞাত, এই ছই দেবর্ষি ও মহর্ষি নালবার দেশে একযোগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীগোবিন্দের কাক্তন, দাম প্রসাদের পদাবলী, তুলসীদাসের দোহাবলী এবং তুকারাম বাবার অভঙ্গ গাথা অপূর্ণ সামগ্রী। তাহার ছত্রে ছত্রে ভাবলহরী ও ভক্তির উৎস, প্রতি শব্দে বীণার ঝঙ্কার এবং প্রতিবর্ণে অমিয়াকরণ। তুকারামের ভাবের টানে ও প্রেমের প্রাবনে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছিল, মরুদেশ উর্বর হইয়াছিল, রত্নাকর সাধু হইয়াছিল, শুকতরু মুঞ্জরিত হইয়াছিল। মহারাজ তুকারামের ভক্তি-প্রবাহ মরাঠা জাতির স্তরে স্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নবজীবন সঞ্চার করিয়াছিল, নবতেজ বিকাশ করিয়াছিল, শক্তির যোজনা করিয়াছিল, বাহার আলোকচ্ছটায় একদিন বিশ্বজগৎ বিস্তৃত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল। সেদিন বোধ হয় দূরে নহে, যেদিন কবির বিক্রার দোহাবলীর আশ্রয়ে ‘তুকারাম বাবাচা অভঙ্গাকী গাথা’ ভারতের প্রতিগৃহে গীত হইবে, প্রতি হৃদয়ে উদ্গাদনা আনিবে, প্রতি প্রাণে ভাঙিত শক্তি যোজনা করিবে, ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষৌণশক্তি ভক্তহৃদয়ের অমৃতলহরী বতটুকু মাত্র ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছে, তাহা আমাদের সাধারণ সম্পত্তি। আমরা মহাজন চরণে প্রণত হইয়া এই অলোক-সামগ্রী ভক্ত মহাপুরুষের জীবন-

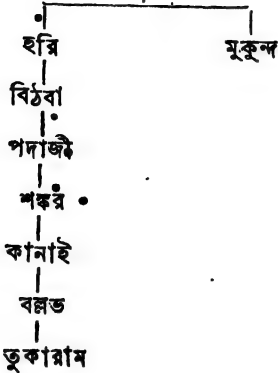
কাহিনী সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে ছই চারিটা কথা আলোচনা করিব।

মহারাজচক্রনাথক পেশবার রাজধানী পুণ্যা নগরীর বায়ু কোণে প্রায় ১৬ মাইল দূরে দেহ একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামের পিতৃহীন বালক বিশ্বম্ভরকে তাহার জননী অতি সাবধানে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর যৌবনে পদার্থপণ করিলে তাহার ধর্ম্মঃসুযোগ, ঠাকুর দেবভায় ভক্তি এবং আচার নিষ্ঠার কথা চারিদিক রাষ্ট্র, হইল। পবিত্র নন্দনদী এবং স্থাপিত দেবদেবী সম্বন্ধে লোক-পরম্পরাগত নানা অলৌকিক মাহাত্ম্যের গল্প শুনিয়া বিশ্বম্ভরের তরুণ হৃদয়ে ধর্ম্মবিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল। বিশ্বম্ভর তাহাদের কুলদেবতা পণ্ডরপুরের বিঠবা রঘুনাথ (লক্ষ্মীনারায়ণ) অলৌকিক মহিমা সম্বন্ধে বহু কিশদস্তী আশৈশব শুনিয়াছিল। এখনও তাহার ধর্ম্মপ্রাণা সাধবী জননী প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে আদেশ করিলেন ‘বাবা বিশ্বম্ভর তুমি প্রতি একাদশীতে উপবাস থাকিও, আর পণ্ডরপুরে গাইয়া কুলদেবতা বিঠবা ঠাকুরের পূজা দিও।’ লোকের নিন্দা বা প্রশংসায় কিছুমাত্র ক্রঃক্ষণ না করিয়া, অবিচলিতভাবে, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতার সহিত বিশ্বম্ভর মাতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। জনশ্রুতি আছে, এইরূপ ষোড়শ বার একাদশী ব্রত পালন করিবার পর এক দিন শুদ্ধা ষষ্ঠনী নিশিতে বিশ্বম্ভরের স্বপ্নাদেশ হইল। বিঠবা রঘুনাথ স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া ভক্ত বিশ্বম্ভরের নিকট তাহাদের ভূগর্ভস্থ মূর্তির কথা প্রকাশ করিলেন। বিশ্বম্ভর স্বপ্নে প্রাপ্ত দেবমূর্তি ইন্দ্রয়নী ভীরে যথাবিধি স্থাপনা করিলেন। তদবধি দেহগ্রামের বিঠবা দেব বিশ্বম্ভরের কুলদেবতা হইলেন। সাধু তুকারাম বিশ্বাসী বিশ্বম্ভর-

কুলে উজ্জল-কোহিনুর—পুরুষাশ্রয়ে দেব
সেবার মহাপ্রসাদ ।

তুকারাম বিশ্বস্তরের অষ্টম পুরুষ নিম্নস্তরে ।

বিশ্বস্তর



বিশ্বস্তরের ২ পুত্র—হরি ও মুকুন্দ ।

উভয়েই সেনাবিভাগের রাজ্যকার্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং প্রতুকার্যে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন । মুকুন্দের পত্নী পতিশোকে চিতারোগে করিয়া অমৃত্যু হইলেন । হরির সহধর্মিণী অন্তঃস্বা ছিলেন । তাঁহার গর্ভে বিঠবা জন্মগ্রহণ করেন । বিঠবার পুত্র পদাজী, পদাজীর পুত্র শঙ্কর, শঙ্করের পুত্র কানাই—কানাই বলভজীর পিতা । ইহারা সকলেই পরম ধার্মিক এবং বিঠবা দেবের উপাসক ছিলেন । বলভজী দেবানুগ্রহে ৩টা পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন—সাবজী (শ্রামজী), তুকারাম ও কানহোবা (কানাই) ।

বলভজীর মধ্যম কুমার ভক্তচূড়ামণি তুকারাম সন ১৫৩০ (১৬০৮ খ্রীঃ) শকাব্দায় দেহগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । কিন্তু তাঁহার আবির্ভাব সময় সর্ববাদী-সম্মত নহৈ । অভঙ্গ গাথার আভ্যন্তরিক প্রমাণে নিশ্চিত জানা যায় যে, ১৫১১ শকে (১৬৪২ খ্রীঃ) ২রা

শ্রাবস্তম, সোমবার, প্রাতঃকালে তুকারামের তির্যোভাব হয় । এবং সাধারণতঃ প্রবাদ আছে, তিনি ৪২ বৎসর বয়ঃক্রমে সংসার হইতে-অদৃষ্ট হইয়াছিলেন । ইহাতে স্বতঃই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় যে, ১৫৩০ শকই তাঁহার আবির্ভাব কাল । তুকারাম জাতিতে শূদ্র ছিলেন এবং অতি সামান্ত বণিকের (মুদীর) ব্যবসায় করিতেন—

‘জাতি শূদ্র বংশ কেনা বেবসার ।’

কিন্তু শাস্ত্রকার যথার্থই বলিয়াছেন,—
‘চণ্ডালোহপি বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ ।’
পাণ্ডবের টিটকারী গুনিয়া অস্থিতীর বীর কর্ণ সদন্তে উত্তর দিয়াছিলেন, “সুতোবা স্তপুত্রোবা যোবা কোবা ভবাম্যহম্ । দৈবায়তম্ কুলেজন্ম মমায়ত্তং পৌরুষম্ ।” তাই আজ শূদ্র তুকা চতুর্ধর্ষণের নমস্ত ।

বলভজী বার্ককাপ্রযুক্ত বিষয়কার্যে অসমর্থ হইলে জ্যেষ্ঠপুত্র সাবজীর উপর সংসারের ভারার্ণ করিয়া স্বয়ং অবসর গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন । বিষয়-বিমুখ ভগবৎপরায়ণ সাবজী এই গুরুভার স্বক্ষে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন । সুতরাং অদৃষ্টের ফেরে ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে তুকারামকে বিষয়জালে আবদ্ধ হইতে হইল । হয়ত এই ক্ষুদ্র ঘটনা আমাদের এই আধ্যাত্মিকার নায়কের ভবিষ্যৎ মহেশ্বর দ্বার মুক্ত করিয়া দিল । দারিদ্র্যের কষাঘাত, আত্মীয় বিয়োগের শোক-দাহ এবং কর্কশা গৃহিণীর পুরুষবাক্য ও নিশ্চয় তাড়না তুকারামের বিষয়বাসনা ঘূচাইয়া দিল । সংসারের মারাবন্ধন কাটিতে হইলে তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের প্রয়োজন । তুকারামের জীবনে তাহার অনুটন হয় নাই । বিষয়জল ঠাকুর চিন্তামণির দিকার-বাঁকো-ব্রহ্মজান লাভ করিয়াছিলেন, তুলসীদাসের

ব্রাহ্মণী রত্নাবলী উদ্ধৃতবাক্যে গৌসাইজীর
দিবাজ্ঞান জন্মাইয়া দিয়াছিলেন—

জিতমো হেত হরামসেী, হোতরামসেী জোয় ।
চলোজার বৈকুণ্ঠক, রোক ন রাথে কোয় ।

তুকাপত্নী জিজাইবাই প্রত্যক্ষভাবে স্বামীকে
তথোপদেশ না করিলেও পরোক্ষভাবে
বৈরাগ্য শিক্ষা দিতে ক্রটি করেন নাই ।

তাৎকালিক প্রথাযুগী তুকারাম রঘুমাট
ও জিজাবাই, এই দুই জীর পাণিগ্রহণ করিয়া-
ছিলেন । তাঁহার বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে প্রিয়-
তরা পত্নী রঘুমাই বহুকষ্টে ভোগের পর ইহ-
ধাম ত্যাগ করেন । ঐ বৎসরই তাঁহার
প্রাণের কুমার শন্ত অনন্তধামে চলিয়া গেল ।
ইতিপূর্বে তাঁহার পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-
বধূ পরলোক গমন করিয়াছিলেন । জ্যেষ্ঠ
ভ্রাতা সাবর্জী তীর্থযাত্রা উপলক্ষে গৃহত্যাগ
করিয়াছিলেন । শোকের উপর শোকে
তুকারামের মন ভাঙ্গিয়া গেল । এই সময়
দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়া ব্যবসায় অচল হইল,
দোকান দেউলিয়া হইয়া গেল । তুকারামের
হৃৎকথের মাত্রা পূর্ণ হইল, বিষয় বিড়ম্বনা ঘোল
কলায় পরিণত হইল । তুকা সকল জঞ্জালের
হাত এড়াইলেন—সংসারে উদাসীন হইয়া
গ্রামপ্রান্তে বিধবামন্দিরে যাইয়া দেবতার সেবা-
ইত হইলেন । কবি স্বয়ংই কহিতেছেন—

সংবসারে জালো অতিদুঃখে দুঃখী,

মায়বাপ সেখী ক্রমিলিয়া ।

হুকালে আটিলে এবো নেলা মান,

জী একী অন্ন অন্ন করিউ মেলী ।

লজা বাটে জীরা আসলোঁ বা দুঃখে,

বেবসায় দেখে তুটী যেতা ।

দেবারে দেউল হোতে তে ভঙ্গলে,

‘চিত্তাসী জে’ আলোঁ করা বেসে ।

পিতামাতা স্বর্গারোহণ করিলে সংসারে

আমি বহু কষ্ট ভুগিয়াছি । দুর্ভিক্ষ আমার
ধনমান সমস্ত লইয়া গেল, আমার জ্ঞা অন্ন
অন্ন করিয়া প্রাণত্যাগ করিল । আমি লজ্জার
ত্রিমাণ হইলাম, দুঃখে আমার শান্তি ধ্বংস
হইল, দেখিলাম দিন দিন আমার ব্যবসায়
মাত্রা হইয়া যাইতেছে । অদূরে দেবতার ভগ্ন
মন্দির ছিল—আমি তাহাই আশ্রয় করিতে
মনস্থ করিলাম । তুকারামের মর্ন্তভেলী কাত-
রোক্তিতে পাষণ গলিয়া যায় । কিন্তু তুকা
সংসারতাপে ক্লিষ্ট হইয়া কাপুরুষের স্তায় মহা
দেব ও বিঠবা, এই পুত্রদ্বয়ের ভার সমস্ত পত্নী
জিজাইবাইর দুর্দল স্বন্ধে চাপাইয়া ককীর্ষী
গ্রহণ করেন নাই । মানববুদ্ধির অগোচর
কি এক দৈবশক্তির হস্তে তিনি ক্রীড়নক মাত্র
হইলেন । কে যেন তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে
তাড়না করিল এবং সম্মুখে বিঠবা দেব
মোহনবংশী বাজাইয়া তুকার প্রাণমন হরণ
করিলেন । নারায়ণের শ্রীচরণশ্রেয় তুকার-
সকল জালা জুড়াইল । ভক্ত তুকা আনন্দে
উৎফুল্ল হইয়া আবার গাহিলেন—

‘বরে জালে’ দেবা নিঘালে’ দিবালে’,

বরী যা হুকালে’ পীড়া কেলী ।

(অমৃততাপে’ তুঝে’ রাহিলে চিন্তন,

জানা হা বমন সংবসার ।)

বরে জালে’ দেবা বাইল করুশা,

বরীহে দুর্দশা জনামধো’ ।

বরে জালে’ জণী’ পাবলে’ অপমান,

বরে গেলে’ ধন চোরে’ শুরে’ ।

বরে জালে’ নাই’ ধরিলী লোকলাজ,

বরা আলোঁ তুজ শরণ দেবা ।

বরে জালে’ তুঝে’ কেলো’ দেবাইল,

লোকরে’ বাইল উপেক্ষিলী’ ।

তুকাহরণে বরে’ ব্রত একাদশী,

কেলে উপবাসী’ আগরণ ।

হে প্রভো! ভালই যে আমি দৈউলিয়া
হইয়াছিলাম এবং ভালই যে তুর্ভিক্ষ আমাকে
পেষণ করিয়াছিল।

দারুণ সম্ভাপে আমাকে তোমার কণা
স্মরণ করাইয়া দিয়াছে এবং বিষয় ভোগ
আমার মিকট শ্রাকারজনক বোধ হইয়াছে।

হে দেব! ভালই হইয়াছে যে আমার জী
বকর্ষণভাবিণী এবং ভালই যে লোকসমাজে
আমার এরূপ হৃদিশা হইয়াছিল। ভালই যে
সংসারে আমার এত অপমান হইয়াছে,
ভালই যে আমি ধনবিত্ত সব খোয়াইয়াছি।
ভালই যে আমি লোকলজ্জা গ্রাহ্য করি নাই
এবং ভালই যে আমি তোমার শরণাগত
হইয়াছি। ভালই হইয়াছে যে, আমি জী-পুত্র
উপেক্ষা করিয়া তোমার মন্দিরে আশ্রয়
লইয়াছি। তুকা বলে আমি ভালই করি-
য়াছি যে, উপবাস ও রাত্রি জাগরণ করিয়া
একাদশী ব্রত পালন করিয়াছি। একদিকে
আত্মীয়স্বজনের অন্তরায়, অপরদিকে শ্রামনট-
বরের মুরলাধ্বনি, মীরাবাই উভয়শব্দে
পড়িয়া তুলসীদাস গোসাইজীর শরণাপন্ন
হইয়াছিলেন। ভক্ত উপদেশ দিয়াছিলেন—
প্রিয়নরামবৈদেহী, জিনহকৌ প্রিয়নরামবৈদেহী।
ভজিয়ে তিন্হৈ কোট বৈরীসম, বদ্যপি পরম সনেহী।
পিতাতম্বে প্রহ্লাদ বিভীষন বন্ধু ভরতমহতারা।
হরিহীতন্তকবলী ব্রজবনিতনপতি ভয়ে জগমঙ্গলকারী।

মীরা সকল ভাগ্যকরীয়া হরিতজন জীব-
নের সার করিলেন, তুকাও সকল ভাগ্য
করীয়া নিষ্কুপদে লীন হইলেন।

তুকারামের পারিবারিক সুখের মোহন
চিত্র এবং দাম্পত্য প্রণয়ের একটু স্নায়ুনা
এখানে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

করনেনেঁ হোতা-হাবেদার মেলা,
বৈরভো সাখিলা হোউনি গোহো।

• (এ কিতী সর্বকাল সোসারৈ হৈ দুঃখ,
কিতীলোকী মুখ বাহুঁ ভবী।

সবে আপুলী আইকার মাঝেঁ কেলেঁ,
ধড় যা বিধলেঁ সংসারোটে।

তুকারামে যেতী বাইলে অসড়ে,
কুন্দানিয়ঁ রড়ে হাঁসে কাহাঁ।

জানি না; এই হতভাগ্য পূর্বজন্মে আমার
বৈরী ছিল কিনা যে, এক্ষণে পতিরূপে প্রতি-
হিংসা সাধন করিয়াছে। (সর্বনা কত
দুঃখইবা আমি আর সহ করিব এবং লোকের
কাছেই বা কতবার সাহায্যের জন্ত যাইব?)
রসাতলে যাউক বিঠল—সে আমাদের কি
উপকার করিয়াছে? তুকা কহে বাইজী
এইরূপে ক্রোধ করিয়া কত হাসে কত ক্কা-
রিয়া কান্দে।

তুকারামের বদান্ততা আর তাঁহার
জবরদস্ত অভিভাবিকা জিজ্ঞাইবাইর ভাব
শাসন করুণরসস্বক।

গোণী আলী ঘরা, দাগে খউঁ নেদী পোরা।

এ। ভরী লোকাক্ষী পাটোরী মেলা চোরটা
থাণোরী)।

খবলনী পিসী, হাতা সোঁবে জৈলী লাসী।

তুকাহনপণে খোটা, রাঁড়ে সক্ষিতাচা সাঁটা।

দানার বোঝা ঘরে আসিলে ছেলেপিলে-
দিগকে খাইতে দেয় না। (মিলে ঘরের
চোর কেবল পয়ের খামা ভরিয়া সব বিলা-
ইয়া দেয়)। তুকা বলে, এই কুন্দানারী
অশ্বরের ভ্রাতা আমার হাত চাপিয়া ধরে।
'আ সর্বনাশী, তোর পূর্বজন্মের কত পাপই
সক্ষিত আছে!'

সময় সময় কোন্দল একটু অমীট বাধিয়া
উঠিত। তখনকার চিত্র বেশ করুণ হস্ত-
রসাস্বক।

ন করবে থল্লা, আইতা তেঁউপড়ে পোলা।

(৫। উঠিতে তেঁ কুটিলে টাল, অববা
মাড়িলা কোহলাল) ।

জীবন্ত চিমেল, লাজা বাটুনিয়া প্যালে ।
সংসারাকড়ে, ন পাহাতী ওস পড়ে ।
তলমলতী যাক্কা রাঁড়া, ঘানিতী জীবা নাবে
ধোঁড়া ।

তুকাঙ্গণে বরে জালোঁ, ঘেগে বাইলে লীহিলোঁ ।
কোন কাজ করে না, বিনা ক্লেশে
রাশি রাশি খাও আসিয়া পড়ে । (শয্যা
ত্যাগ করিবা মাত্রই করতাল বাজাইয়া এমন
অসহ কোলাহল করিতে থাকে যে কাণে
তালনাগে) । এরা সব বেঁচেও যেন মরে
আছে—লজ্জার মাথা জলে গুলে ধেয়েছে ।
সংসারের কিছুই দেখে না—সংসার জাহান্নমে
বাউক । এদের হতভাগিনী গৃহলীরা দুঃখের
জালায় অস্থির—তাহারা পোড়াশামীকে
অভিসম্পাত করে, আর মাথায় পাথর হানিয়া
মরে । তুকা বলে ‘বেশত ভালই, বাই,
তোমার অদৃষ্টলিপি তুমি ভোগ কর ।’

এ কোন্দল হরপার্কতীর কোন্দল—বহা-
ড়ব্বর লখুন্নিয়া । আমাদের সমাজে উৎকট
দাম্পত্য প্রেমের এক যুগতরঙ্গ গিয়াছে—
তখন এইরূপ বেকায় ভালবাসার অপূর্ণ
চিত্র অতি সাধারণ ছিল । প্রাচীন সাহিত্যের
প্রতি পৃষ্ঠা তাহার আলোকচিত্র ধরিয়া
রাখিয়াছে । বর্তমান যুগে নূতন মার্জিত
ভাবের চাকচিক্যে সে চিত্র মলিন হইয়াছে
সত্য, কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত হয়
নাই ।

তুকাঘরনী জিজাইবাই যখন দেখিলেন
যে, বিষপ্রয়োগেও রোগে ঔষধ ধরিল না,
তখন নিরুপায় হইয়া মনকে প্রবোধ দিতে
চেষ্টা করিলেন :—
বরে জালোঁ গেলোঁ, আজী অববোঁ মিলালোঁ ।

(৫। আতী খাইল পোটভরী,
ওল্যা কোরডা ভাকরী) ।
কিতী তরী তৌড়, যাক্কাঁ বাক্কাবুঁনী রাঁড় ।
তুকা বাইলে বান বলাচীখু কুন্নিয়া বোলা ।
গিয়াছে বালাই গিয়াছে, ভালই হই-
য়াছে ; আজ হইতে আমি সবই পাইলাম ।
(এখন মোটা ভাত পেট ভরিয়া খাইব) ।
ধিক আমার অদৃষ্ট, তাহাকে কতই না গালা-
গালি দিতে হইত । (তুকা বলে, “জিজিবাই
হুর্কাক্য প্রয়োগ করিলেও তুকাঁকে ভাল-
বাসে ।”

শেষ পংক্তি কত গভীর এবং হিন্দু পত্নীর
চরিত্র কিরূপ পরিষ্কৃত করিয়াছে !

যখন তুকারাম বৈরাগ্য বশতঃ সংসারের
মায়া বন্ধন ছিন্ন করিয়া গৃহত্যাগ করিতে
উত্তত হইয়াছিলেন, তখন জিজাই বাই
তাহাকে কতই না অশ্রুস্রব বিনয় করিয়া-
ছিলেন ! সাধুপতি পত্নীকে নানাপ্রকারে
উপদেশ করিলেন এবং বিষয়-মুক্তিকার
অনিত্যতা ও পারলৌকিক স্ত্রের মোহন
চিত্র উজ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন ।

“জড়িত বিমানে বৈসবিতী মানে”

গন্ধর্ব্বাচৈ গাণে নাম ঘোষ ।”

এবং “বিজাঁ পাচাকুনি শুক করী মন,

দেই বোহেঁ দান যথাবিধ ।

নকো চিত্তা করু বজ্জা যা পোটাটী,

মাউনী আয়ুটী পাওরুজ ।”

“সভা সম্মার্জন তুলসী বৃন্দাবন,

অতীত পূজন ব্রাহ্মণাচৈ ।

বৈষ্ণবাকী দাসী হৌই সর্বভাবে

মুখী নাম ধ্যাবে বিঠোবাচৈ ।” ইত্যাদি ।

তুকারাম কিছুদিন সংসারে থাকিয়াও
পদ্মপত্রের জলের স্নান অনাসক্ত ছিলেন ।
তিনি প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিয়া বিঠবা দেব

মন্দিরে শ্রণাম করিতে যাইতেন এবং সারা-
দিন দেহ হইতে মাইল চতুষ্টির দূরস্থিত
ভাণ্ডার পাহাড়ে ভগবচ্ছিতায় নিমগ্ন থাকি-
তেন । স্বর্ঘ্যাস্ত হইলে বিঠবা মন্দিরে প্রত্যা-
গত হইতেন এবং ভজন, কীর্ত্তন ও তাণ্ডব
নৃত্য করিয়া রজনী যাপন করিতেন । সম্ভবতঃ
মুষ্টি ভোজনের জন্ত অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসী বাইর
শরণাগত হইত । কেন না, ‘তুকাবাইলে
মানবলা, চৌথু করনিয়া’ বোলা ।’ সমস্ত
‘হুনিয়াদারী’ ছাড়িয়া দিয়া এবং একলক্ষ্য
হইয়া তুকারাম সাধন ভজনের পথে অগ্রসর
হইতে লাগিলেন । ভগবৎ কৃপা ব্যতিরেকে
হুর্দল মানব হুর্গম সাধনা পথে অগ্রসর হইতে
পারে না । বিধাতার বিশেষ করুণা ভিন্ন
পরম দেবতার চরণপ্রান্তে পৌছিবার শক্তি
সাধকের নাই, কিন্তু তাঁহার এমনই মহিমা,
ভক্তের প্রতি তাঁহার এমনই টান যে, আমরা
এক বিষত চলিতে পারি না, তিনি এক হস্ত
আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া লন । আমরা
আছাড় পড়িতে পড়িতে তিনি হাতে ধরিয়া
আমাদের স্থলিতপদ চালনা করেন । চলিতে
শূদ্রতপস্বী ভক্ত তুকারামের ঘোর সাধনার
বৈকুণ্ঠের আসন টলিল । তাঁহার অক্ষুট
কাতর ধ্বনিতে বিশ্বপতির টনক পড়িল ।
এক মাঘা শুক্ল দশমী নিশীথে স্বপ্নে কে যেন
বাবাজী মূর্তিতে দর্শন দিয়া তুকারামকে
‘রামকৃষ্ণ হরি’ এই ইষ্টমন্ত্র প্রদান করিলেন
এবং প্রকাশ করিলেন যে, রাঘব চৈতন্ত ও
কেশব চৈতন্ত তাঁহার গুরু ।

সদগুরু রারে কৃপামজ্জ কেলী,

পারে নাই বড়লী সেবা কুঁহী ।

(৫) সাঁপড়বিলে বাটে জাতি গঙ্গানানা,
মন্তকী তো জাগা ঠৈবিলা কর) ।

ভোজনা মাগতী তুপ পাবশের,

পড়িলা বিসর স্বপ্নামাজী ।

কাণী কলে উপজলা অন্তরান,

কাণোনিয়া কার স্বরা বাণী ।

রাঘব চৈতন্ত কেশব চৈতন্ত,

সাক্ষিতলী শূণ মানিকচী ।

বাবাজী আপলে সাক্ষিতলে নাম;

মন্ত্র দিলা রামকৃষ্ণ হরি ।

মাঘ শুক্ল দশমী পাহনি গুরুবারে,

কেনা অঙ্গীকার তুকাহুণে ।

সদগুরুরাজ আমাকে কৃপা করিয়াছেন ।

কিন্তু আমি তাঁহার কোন সেবা করিতে পারি
নাই । (স্বপ্নে গঙ্গানানের পথে তাঁহার
দর্শন লাভ হইল । তিনি আমার মস্তকে
হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন ।) ভোজ-
নের জন্ত এক পোয়া ঘৃত চাহিয়াছিলেন ।
কিন্তু আমার বিস্থতি হইয়াছে । তিনি অন্ত-
রায়ের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন, এই
জন্তই কি এত তাড়াতাড়ি অন্তর্ধান হইলেন ?
তাঁহার প্রভুর নাম রাঘব চৈতন্ত কেশব
চৈতন্ত বলিয়াছিলেন, নিজের নাম বাবাজী
বলিয়াছিলেন । মাঘ মাসে শুক্ল দশমী তিথিতে
বৃহস্পতিবার আমাকে রামকৃষ্ণ হরি মন্ত্র
দিয়াছিলেন । ‘সদগুরু পাবে, ভেদ বতাবে
জ্ঞান করি উপদেশ ।’ তুকার সদগুরু লাভ
হইল, এখন তিনি করতলগত আমলকীবৎ ।
জাহ্নবী যমুনা শৈলপতির রত্নভাণ্ডার লুটিয়া
আনিয়া যে পুণ্যদেশ রচনা করিয়াছিলেন,
তাঁহার কেন্দ্র স্থানে প্রেমের বাণ ডাকিয়া
‘শান্তিপুর ডুবু ডুবু’ হইয়া ‘নদে ভাসিয়া’
গিয়াছিল । তাঁহার বিপুল তরঙ্গ মলবারের
উন্নত বেলাভূমিতে আঘাত করিল । তুকা-
রাম গৌরান্দ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া বলি-
লেন—

বিখাসে মিলরে হুরি তর্কে বহদুর ।

পারমাণিক বিষয়ে মহারাষ্ট্রের সহিত বাঙ্গালার অদ্ভুত সম্বাবেশ এক অতি দুজ্জের রহস্য। সেতুবন্ধ তীর্থপথে নিত্যানন্দের সহিত মাধবেন্দ্রপুরীর মিলন, মাধবেন্দ্র শিষ্য দৈবপুরীর নিকট শ্রীচৈতন্তের দশাকর মন্ত্র গ্রহণ, পরমানন্দপুরী এবং স্বরূপদামোদরের নীলাচলে গোরাক্ষের সহিত মিলন রহস্য-বিজড়িত। তুকারামের স্বপ্নলব্ধ গুরু রাঘব-চৈতন্ত ও কেশবচৈতন্ত, ইহাও এক প্রহেলিকা। এই সকল ঘটনার অভ্যন্তরে বিধাতার যে দীপ্তি ও অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা বুঝিবার শক্তি মানবের নাই। রাঘব-চৈতন্ত প্রভু কেশবভারতী এবং সম্ভবতঃ পাণিহাটীর রাঘব পণ্ডিতের কথাই বলিয়া-ছেন।

তুকারামের জীবন-নাট্য তিনটী প্রস্ফুট গর্ভকে বিভক্ত। আদি অঙ্কে দোকানদারী, মুখরা গৃহিণীর হুকুমের ভয়ে কর্মকারের কুস্তকার ব্যবসায়ের জ্ঞান অতি সম্ভরণে গৃহ-ধর্ম পালন। পরিণাম ফল সমূলে বিনাশ—শিবের সমুদ্র মন্থনে অমৃতের পরিবর্তে গরল উৎপাদ। মধ্য অঙ্কে সংসারের ধূলি কাড়িয়া ফেলিয়া বিঠবা মন্দিরে এবং ভাণ্ডার পাহাড়ে সাধনা ও সিদ্ধি। ভজন, পূজন, কীর্তন ও ধ্যান, এই অবস্থার নিত্যক্রিয়া। এইখানে সাধু তুকা তাঁহার স্বভাব ও মনো-বৃত্তির অমুরূপ ক্ষেত্র পাইলেন—তাঁহার জীবনের ও প্রতিভার বিকাশ আরম্ভ হইল। প্রতিভার এবং বিশ্বাসী জীবনের সহিত দৈব-বাণী এবং আদেশের কেমন এক প্রহেলিকা-ময় নিকট সম্বন্ধ। তুকারামের ইষ্টমন্ত্র আদেশ হইল, ধর্মমতের ইঙ্গিত হইল, স্বপ্নে দেবদর্শন হইল—ইহাই তাঁহার সিদ্ধি ফল। তৃতীয় বা শেষ অঙ্কে তুকারাম প্রতিভার পূর্ণ

বিকাশ। ভাবের উন্মাদনায়, বিশ্বাসের দৃঢ়তায়, ভক্তির উচ্ছ্বাসে এবং সাধনার কঠোর-তায় যে জীবনের এবং প্রতিভার উন্মেষ হইয়াছিল, তাহার পরিণতি ভাবায় ও সাহিত্যে। ভাবোন্মান হইতে বাহিয়া বাহিয়া ফুল তুলিয়া মালী তুকা বিনাসুতায় মালা গাথিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার অমূল্য অভঙ্গ-গাথা। এই সাহিত্য-ভাণ্ডারের মহামূল্য রত্ন আজও মহারাষ্ট্রভাষার গলদেশে মণিময় কণ্ঠহারের জায় শোভা পাইতেছেন। তুকারামের কবি-জীবন অতি সুন্দর, অতি মধুর। তাঁহার সরল, সহজ, সুললিত রসাত্মিক আত্মগত কথা প্রবাহে তাঁহার নিজের জীবন প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে—মহারাষ্ট্র জাতীয় চরিত্রের চিত্র আঁকিত রহিয়াছে—ভক্তজীবনের উচ্চাঙ্গের ভাবলহরীর মুছমন স্পন্দন রহিয়াছে।

এই মহাত্রুট উত্থাপনে তুকারাম স্বয়ং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া প্রবৃত্ত হন নাই। আবার সেই আদেশ—আবার ঐশীশক্তির সঞ্চারণ। কিন্তু এবার বাবাজী বা চৈতন্ত প্রভু নহেন। কবিগুরু নামদেব স্বপ্নে দর্শন দিয়া তুকারামকে কাব্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন :—

নামদেবেঁ কেলোঁ স্বপ্নামাজী জাগোঁ,

সবেঁ পাণ্ড রজেঁ বেউনিয়াঁ।

ঐ। সাক্ষতলেঁ কাম করাবেঁ কবিত্ত,

বাউঙ্গে নিমিত্ত বোলোঁ। নাকো।

নামদেব পণ্ডরঙ্গ সঙ্গে আমাকে, স্বপ্নে জাগাইলেন এবং আদেশ করিলেন,—

“কবিতা রচনা করিও, বুঝা বাক্যে সময় নষ্ট করিও না।”

ভক্তি বিষয়ে শ্রীচৈতন্ত তুকারামের আদর্শ-গুরু, রচনা বিষয়ে নামদেব তাঁহার আদর্শ

ছিলেন। নামদেব মহারাষ্ট্র ভাবার অভঙ্গ
হলে এক অতিপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তিনি
জাতিতে সিম্পি (সাঁবনকার) এবং পণ্ডর-
পুরের বিঠবা দেবের উপাসক ছিলেন। তিনি
কবীরের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া
অনেকের বিশ্বাস। সম্ভবতঃ সমধর্মী বলিয়া
ভূকরাম তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।
প্রবাদ আছে, নামদেবের রচিত অভঙ্গ
সংখ্যা ৯৫ কোটির মাত্র কয়েক সহস্র
নূন। সুবশিষ্ট ৫ কোটি অভঙ্গ রচনা
করিয়া শতকোটি পূর্ণ করিতে ভূকরাম স্বপ্নে
আদিষ্ট হইয়াছিলেন। এই প্রবাদের মূলে
কতটুকু সত্য নিহিত আছে, জানিবার উপায়
নাই। এপর্যন্ত ভূকরামের রচিত প্রায়
৫ সহস্র অভঙ্গ সংগৃহীত হইয়াছে। প্রতি
অভঙ্গ কতগুলি শ্লোকের সমষ্টি। শ্লোকগুলি
বাঙ্গালা পয়ারের ভায়ে সরল হুন্দে রচিত।
ভূকরাম মুখে মুখে অভঙ্গ রচনা করিয়া
ভজন এবং কথকতা করিতেন। তাঁহার
শিষ্য গঙ্গাজী, মওয়াল ও সস্তাজী তেলী সঙ্গে
সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে অপেক্ষাকৃত
প্রয়োজনীয় শ্লোকগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া
রাখিতেন। শেষ জীবনে ভূকরাম অভঙ্গ
রচনার একরূপ সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি
প্রায় অভঙ্গ হুন্দেই কথোপকথন করিতেন।
সুতরাং তাঁহার রচিত শ্লোক যে সর্ব সাংকল্যে
৫ কোটি হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

অপ্নাদেশ ও দৈবশক্তি লাভ হইলেও
ভূকরাম 'হঠাৎ কবি' হইতে পারেন নাই
ধর্ম্মানুগামী এবং ভক্তির প্রাবল্য বশতঃ নাম-
দেব-রচিত বিঠবা স্তোত্র পাঠে তাঁহার একান্ত
আগ্রহ হয়। বারংবার আবৃত্তি করিয়া
নামদেবের অভঙ্গগাঁথা তিনি কণ্ঠস্থ করিয়া
ফেলিয়াছিলেন। উপাস্য দেবতা বিঠবা

ঠাকুরের সহিত অভঙ্গভক্তি ভূকরাম অপমান্য
হইয়াছিল। ভাবে তদ্ব্যবহা আসিলেই
স্বপ্নে দেবতার সাক্ষাৎ হইল, কাব্য রচনার
আভিষেক হইল। মির্টন বহু অধ্যয়নের পরও
প্রচুর সংগ্রহের পর স্বর্গবিচ্যুত (Paradise
Lost) লিখিবার শক্তিলাভ করিয়াছিলেন,
মধুসূদন বহু চেষ্টার পর এমন মধুচক্র রচনার
আভাস দিয়াছিলেন, 'গোড়জন যাহে' আনন্দে
'মধুপান' করিতে পারিবে। ভূকরামও বহু
সাধনার পর দেবদত্ত অমামুখী কবিত্ব শক্তি
লাভ করিলেন।

ভক্ত ভূকরাম আপনার ভাবে বিভোর
হইয়া অভঙ্গহুন্দে কথকতা করিতে আরম্ভ
করিলেন। এ কথকতা ব্যবসাদারী নহে,
দক্ষিণা ও উদরারের জন্ত কষ্টকল্পনা নহে।
ইহাতে ছিল 'সরস প্রাণের আগ্রহ,
নির্ম্মল ভক্তির ক্ষটিক উৎস, ভাবসিন্ধুর অনন্ত-
লহরী এবং বিশ্বাসের জলন্ত তেজ। যে
গুলিল, সেই মোহিত হইল, নাস্তিকের পাষণ
প্রাণ বিগলিত হইল, ভূকরামের ভাবের,
ভক্তির, বিশ্বাসের, এবং অমৃতশ্রদ্ধিনী ভাষায়
যশের হৃন্দুভি বাজিয়া উঠিল। চঞ্চল মলয়জ
ছুটাছুটি করিয়া সে সৌরভ দিগদিগন্তর ব্যাপ্ত
করিয়া ফেলিল। ধর্ম্মের পথ মর্ম্মরমণিত,
চন্দ্রাতপাচ্ছাদিত, অতি সুগম, সহজ নহে।
ভূকরামের স্মৃতি ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে
দারুণ নির্যাভন ও মহা পরীক্ষা আরম্ভ হইল।
ভূকরামের সারাজীবনই পরীক্ষাময়।

'যে করে মোর আশ, করি তার সর্সনাশ,
তবু যে না ছাড়ে আশ, হই তার দাসদাস।'

ইহাই জীবনের বিধি। ঈশ্বরের পরীক্ষা
হইয়াছিল, প্রহ্লাদের পরীক্ষা হইয়াছিল,
বিশ্বের পরীক্ষা হইয়াছিল, বুদ্ধের পরীক্ষা
হইয়াছিল, নানকের, পরীক্ষা হইয়াছিল;

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পরীক্ষা হইয়াছিল—
তুকারামের পরীক্ষা কেন চইবে না ? সুবর্ণ-
কার বিগুহ্র অষ্টাপদ পুনঃ পুনঃ তীব্র উত্তাপে
গলাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে। তুকারাম-
কাঞ্চন অগ্নিতাপে তপ্ত হইয়া আরো অধিক
শোভা পাইয়াছিলেন। হয়ত এই কঠিন
পরীক্ষা না হইলে তুকারাম তুকারাম হইতেন
না। হয়ত বা আমরা আজ বিগুহ্র সুবর্ণকে
গিণ্টি বলিয়া পলকের তরেও সন্দেহ করি-
বার অবসর পাইতাম।

তুকারাম, তুমি বৈরাগী হইতে পার, সর্ব-
ভাগী হইতে পার, দিনান্তে মুষ্টিভোজী হইতে
পার, জীর্ণ পর্ণকুটীরবাসী হইতে পার, বাদ-
নার অতীত হইতে পার, কিন্তু হিংসা, ঘেঘ,
ক্ষুদ্রতা, ষড়যন্ত্র, প্রভৃষপ্রিয়তা, পরত্নী-

কাতরতা ও অন্ধ স্বার্থপরতা তোমাকে সহজে
ক্ষমা করিবে না। সংসারের লোক যে স্নান-
মের জন্ত লালারিত, তুমি কেন তাহা নির্বি-
বাদে ভোগ করিবে ? সংসারের লোক যে
লোকের উপর আধিপত্যের জন্ত না করিতে
পারে, এমন পাপ নাই, তুমি কেন তাহা বিনা
বিসংবাদে লাভ করিবে ? সংসারের লোক
কত পরিশ্রম করিয়া, কত ফিকির করিয়াও যে
জ্ঞান, বিদ্যা এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে
পারে না, তোমার কেন তাহা বিনা চেষ্টায়
আপনা হইতে হয় ? তোমার এ অপরাধ
অমার্জ্জনীয়, এজন্ত তোমাকে শাস্তিভোগ
করিতেই হইবে—ইহাই সংসারের বিধি।

ক্রমশঃ

শ্রীরসিকলাল রায়।

হিন্দুর অভিব্যক্তিবাদ ।

(মনুদ্রমস্থান, অবতারতত্ত্ব, কর্মবাদ ।)

(পূর্বানুসৃত্তি ।)

মনুদ্র-মস্থানে আমরা সাধারণ বিশ্বাভি-
ব্যক্তির বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি—অবতারবাদে
পার্থিব বিশেষাভিব্যক্তির বিবরণ প্রাপ্ত হইব।
পৃথিবীতে মনুষ্য জাতির অধিবাস আরম্ভ
হওয়ার পর অবতার-লীলা প্রকটিত হইয়া-
ছিল। তখন মাত্র স্থলভাগ জলের উপর
উখিত হইয়াছে। সময় সময় তাহা জল-
প্লাবিত হইত। ইহারই মধ্যে প্রবল
প্লাবনে সেই স্থলভাগ গভীর জলে নিমগ্ন

হইয়া জীবকুল বিপন্ন ও বিনষ্ট হয়। মনুষ্য-
জাতির আদি পিতা মনু পূর্বেই একরূপ মহা-
প্লাবনের আশঙ্কা করতঃ একটা নৌকা প্রস্তুত
করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে নৌকাতে
আরোহণ করিয়া একটা বৃহৎ মৎস্তের শৃঙ্গে
নৌকা বন্ধন করতঃ রক্ষা পাইলেন। এই
মৎস্তই বিষ্ণুর মৎসাবতার। ইহা নর-মুখ ও
মৎস্তদেহ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই রূপটি
আমাদের নিকট এক্ষণে অদ্ভুত বলিয়া

প্রভীত হইলেন ও ‘মৎস্য ও মনুষ্যের মধ্যবর্তী’ কোন জাতীয় লুপ্তজীব হওয়া অসম্ভব নহে।* শিশুমার (walrus) জাতীয় জলজন্তুর সহিত মনুষ্য যুগ্মের সোসাদৃশ্য সকলেরই সুবিদিত। শিশুমার নামই যেন এবিষয়ে প্রমাণ প্রদান করে। ‘শিশুমার’ শব্দটির ব্যুৎপত্তি অভিধানে ‘শিশুকে মারে যে’, এইভাবে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বোধ হয় ‘মার’ শব্দটির সমুদ্রার্থ বিস্মৃত হওয়াতেই এইরূপ অর্থবিকৃতি ঘটিয়াছে। Mermaid শব্দে আমরা পুরোক্ত অর্থে এই মার শব্দের সংযোগ দেখিতে পাই। কোন কোন ভাষা-বিৎ পণ্ডিত এই merba mere শব্দে বারি শব্দেরই অপভ্রংশ দেখিতে পান। তাহাতেও পুরোক্ত ব্যুৎপত্তির সহিত বিশেষ পার্থক্য হয় না। উভয় ব্যুৎপত্তিতেই আমরা শিশু-মার শব্দের অর্থ সমুদ্র-শিশু বা বারি (জল) শিশু করিতে পারি। তাহা হইলে এই নরাকৃতি মৎস্যের মনুষ্যের সহিত সাদৃশ্যভূতি হওয়া অস্বাভাবিক নহে। গ্রীকপুরাণেও আমরা Arion নামক সুপ্রসিদ্ধবাদক* সমুদ্র পার হইবার সময় অর্থলোভী আততায়ী নাবিকদিগের হস্ত হইতে সঙ্গীতমোহিত ডল্ফিন্ নামক মৎস্যের পৃষ্ঠেবাহিত হইয়া পরিভ্রাণ পাইয়াছিলেন, এইরূপ কাহিনী পাঠ করি।†

* পাক্ষাঃ বৈজ্ঞানিকেরাও মৎস্য ও মনুষ্যের মধ্যবর্তী কোন জন্তু জীবের কল্পনা করিয়া থাকেন যথা—
“These fish ancestors of men were very different from any modern forms. The nearest approximation to them is to be found in the bichir of the Nile and in certain species of Africa, South America and Australia known as ‘dipnoians.’” Dr. Theodore N. Gill quoted in Popular Science Siftings—March 28, 1908.

† শিশুমার জাতীয় মৎস্যের চৰ্ম্ম মনুষ্যের পরিধেয় রূপে (Seelskin) ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়ও অবগত

মৎস্যাবতারে ‘হয়গ্রীব’ রূপে—হয়গ্রীব নামক বেদহর্ষা দৈত্যকে নিহত করা হয়, এরূপ আখ্যানও প্রচলিত আছে। এই আখ্যানটোতে অতি মূল্যবান ঐতিহাসিক সত্য নিহিত রহিয়াছে, আমরা দেখিতে পাইব। অশ্বমুক্তক ধারণ করিয়া হয়গ্রীব-রূপ গ্রহণ করা হয়, এইরূপ বর্ণনাপ্রাপ্ত হওয়া যায় যথা—

“সুনাসিকেন কায়েন ভূত্বা চন্দ্রপ্রভন্তদা।

কৃত্বা হয়-শিরঃ শুভ্রং বেদানা মালয়ং প্রভুঃ।”

মহাভারতম্।

সুতরাং তখন অশ্বজাতির উদ্ভব হইয়াছিল ও মনুষ্য যুগ্মগতে তাহাকে হনন করিত ও তাহার চৰ্ম্মদ্বারা সজ্জিত হইত, ইহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। দৈত্য হয়গ্রীব কিরূপ জীব ছিল ও কিরূপেই বা বেদাহরণ করিয়াছিল, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য। হয়গ্রীব অবতারের বর্ণনায় আমরা অশ্বযুগ্মের উল্লেখ পাই। এই হয়গ্রীব দৈত্যও তবে অশ্বযুগ্ম জীবই ছিল, বোধ হইতেছে। কিম্পুরুষ বা কিন্নর নামক জাতি বিংশের আকৃতির বর্ণনায় আমরা তাহাদের অশ্বযুগ্মের উল্লেখ পাই। সুতরাং হয়গ্রীব এই জাতীয়ই ছিল। কিম্পুরুষ ও কিন্নর উভয় শব্দেরই যোগ ও রূঢ়ার্থ কুৎসিত নর সুতরাং ইহাদিগকে মনুষ্যেরই (নরের) অসম্পূর্ণবিকাশ, অতএব মনুষ্যের অগ্রবর্তী জাতি বলিয়া বুঝা যাইতেছে।

হয়গ্রীব বেদ হরণ করে—এই বেদ কি ?

হওয়া যায়। মৎস্যজীবী ও জলবিহারী আদিম মনুষ্যের এই চৰ্ম্ম পরিধান করা অসম্ভব নয়। মহা প্রাচীন যে নাবিক মনুষ্য নৌকা পরিচালিত করিয়াছিলেন, তিনি এই মৎস্যের চৰ্ম্ম পরিহিত ছিলেন এবং তিনিই প্রাচীন হইতে নৌকাগৃহ সকলকে উদ্ধার করেন বলিয়া ভগবানের মৎস্যাবতাররূপে বর্ণিত হইয়াছেন, এরূপও হইতে পারে। •

জ্ঞান শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, যাহা দ্বারা জ্ঞান লাভ করা যায়। ভাষা দ্বারাই আমাদের জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। বেদ শব্দ-
 দ্বক সূত্রাং বেদকে শব্দব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে। সূত্রাং বেদ ও ভাষা যে অভিন্ন, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। ভাষার প্রথম উৎপত্তিতে তাহা ঐতিগতই মাত্র, সূত্রাং বেদের এক নাম ঐতি। বেদাপহরণোপা-
 খ্যানে আমরা ভাষার উৎপত্তিরই মূলতত্ত্ব আনিতে পারি বলিয়া বলিতে পারি। কিন্নর জাতিতেই প্রথম ভাষার স্ফূরণ হয়—ঈশ্বর হইতে বাক্শক্তি তাহারাই প্রথম প্রাপ্ত হয়—
 ইহাই ব্রহ্ম হইতে হরগ্রীব কর্তৃক বেদাপ-
 হরণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই ভাষা রহস্য সহজে কিন্নরেরা অন্তের নিকট প্রকাশ করিতে চাহেনাই। তাহাতেই আৰ্য্যানেতা অশ্বমুখ লাগাইয়া (পরিয়া) কিন্নর সাজিয়া কিন্নর জাতি হইতে ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহাকে সংশোধন করতঃ তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করেন ও ইহার নাম সংস্কৃত ভাষা রাখেন। তৎপর আৰ্য্যগণ প্রবল হইয়া কিন্নর জাতিকে বিনাশ করেন, ইহাই হরগ্রীব বধ। বরাহাবতার পর্য্যন্ত ভাষার সংস্করণ কার্য্য চলিয়াছিল বলিয়াই বরাহ বেদ উদ্ধার করেন, বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মৎস্তা-
 বতারে ভাষা প্রাপ্ত হওয়াতে তখন বেদ ধৃত হইয়াছে বলিয়া কথিত হইয়াছে। বরাহা-
 বতারে ভাষার সংস্করণ শেষ হওয়ায় তৎকালে বেদের উদ্ধার হইয়াছে। বেদ অর্থে পুরোক্ত প্রকারে ভাষা বুঝিলে বেদের সম্বন্ধে হিন্দু-
 দিগের অস্ত্র সকল প্রচলিত সংস্কারেরও পরিষ্কার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ভাষা স্বতঃ উৎপন্ন বলিয়াই ইহা অপৌরুষেয়—বেদও অপৌরুষেয় বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে।

ভাষা দ্বারা বস্তু সকলের নামকরণ হয়, তাহাতেই বেদ শব্দ হইতে বস্তু সকলের নাম দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত আছে। এই ভাষা ব্রহ্মার (ঈশ্বরের) শক্তি বলিয়া ব্রহ্মা বেদ ধারণ করেন উক্ত হইয়াছে এবং শব্দের ধ্বংস নাই বলিয়া বেদ নিত্য বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

কালে মৎস্ত-কুর্শ-কঙ্কাল দ্বারা ভূপঞ্জর গুল্লতা প্রাপ্ত হইলে, পৃথিবী পুনর্বার বাস-
 যোগ্য হইলেন—ইহাই কুর্শ, কুর্শাবতার লীলা। কুর্শ কঙ্কাল দ্বারা গঠিত হইয়াই যে পৃথিবী সমুদ্রোপরি ভাসমান হইয়াছিলেন—
 আমেরিকা মহাদেশের আদিম জাতির পুরাণে তাহার অতি স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়—

“The striking analogy between the tortoise myth of North America and India, is by no means a matter of new observation, it was indeed noticed by Father Latifan nearly a century and a half ago. The earth is supported on the back of a huge floating tortoise, the tortoise sinks under and causes a deluge, and the tortoise is conceived as being itself the earth floating upon the face of the deep.” “Early History of mankind”, by Tylor.

ক্রমে জলোখিত পৃথিবী মুক্তিকা সক্ষর দ্বারা বর্ধমান হইলেও তাহাতে আর্দ্রভূমি-
 মূলত মূলক জাতীয় উদ্ভিদ সঞ্চার হইলে বরাহ জাতি আদিয়া তাহাকে দস্ত দ্বারা উৎখনন করিতে লাগিল—তখন বুঝা গেল, পৃথিবী প্লাবন হইতে নিরাপদ হইয়াছেন। ইহাই বরাহের দস্ত দ্বারা সমুদ্র হইতে পৃথিবীর উদ্ধার। তাৎকালিক মহুয়ের বরাহের জ্ঞান কন্দমূলই একমাত্র আহার ছিল, সূত্রাং বরাহের জ্ঞান পৃথিবী খনন করিয়াই ইহার আহাৰ্য্য সংগ্রহ করিত এবং বরাহ চৰ্ণ দ্বারা

শরীর আচ্ছাদিত করিত। “এই মনুষ্যই নৃ-বরাহ (নররূপী বরাহ) অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছে।” এই নৃবরাহাবতার দ্বারা হিরণ্যাক দৈত্য নিপতিত হয়। এই দৈত্যের পিঙ্গল বর্ণ চক্ষু দ্বারা ইহাকে আত্মজাতির সহিত বৈরভাবাপন্ন অনার্য মন্থোদীয় জাতীর মনুষ্য বলিয়াই বোধ হয়। এই বরাহবতারের পর কোন কোন পুরাণে “যজ্ঞাবতারের” উল্লেখ পাওয়া যায়। এই অবতার মনুষ্য জাতির উন্নতির ইতিহাসে বিশেষ বিশেষ স্থান পাইবার যোগ্য। আমরা সকলেই “যজ্ঞ” বলিতে অগ্নিতে উপাসনা বলিয়া থাকি। স্মৃতরাং এই ‘যজ্ঞাবতার’ যে সেই অগ্নির প্রথম আবিষ্কার সূচনা করিতেছে— তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতেছে না। অগ্নির ব্যবহার মনুষ্যের মধ্যে যখন প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল, তখন ইহাতেই মনুষ্য উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বেদ বা ভাষা যেমন একদিকে মনুষ্যের জ্ঞানের অর্গল উন্মোচিত করিয়াছে, তদ্রূপ অগ্নিও অপর দিকে মনুষ্যের উন্নতি-মার্গের প্রদর্শক হইয়াছে। এই দুইটাই পৃথিবীর সর্বপ্রথম আবিষ্কার—এবং হিন্দুগণ “বেদ” ও “যজ্ঞের” প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া এখনও সেই স্মৃতি রক্ষা করিতেছেন।

এই অবতারের পরই নৃসিংহাবতার। তখন মনুষ্য অল্প মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। তিনি বলবান্ সিংহকে নিহত করিয়া আরও পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। বিজয়ের চিহ্ন স্বরূপ সিংহচর্ম পরিহিত হইয়া তিনি নরসিংহ মূর্তি শব্দের নিকট প্রকটিত করিয়াছেন। এই মূর্তিতে তিনি হিরণ্যকশিপু দৈত্য নিপাত করেন। গ্রীক পুরাণের Hercules কেও আমরা স্বকীয় বিক্রম-নিহত সিংহের

চর্ম পরিধান পূর্বক সিংহের মস্তক শিরো-ভূষণ করিয়া সিংহবিজয়ী রূপে পরিচয় দিতে দেখিতে পাই। আমাদের মহাদেবের বেশেও ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান ও হস্তিচর্ম উত্তরীয় হইয়াছে। ইহার পরই নরনারায়ণাবতার—এই অব-তারে দ্বিবিধ ভাবের বিকাশ দেখা যায়। এক ভাবে হিংস্র স্বভাব দ্রবীভূত হইয়া মনুষ্যের ধর্মভাব উৎপাদিত হইয়াছে। অপর ভাবে বীর ও ধর্ম ভাবের সংমিশ্রণ হইয়াছে। এক্ষণে উভয়েই ঋষিরূপে পরি-ণত হইয়াছেন। এই ধানেই আমরা প্রথম ধর্মভাবের স্ফূরণ দেখিতে পাই, তাহাতেই এই অবতাররূপী ঋষিধরকে ধর্মরূপ মাতার গর্তজাত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা: “তুর্যো ধর্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবুবা। ভূষা-ঘোপশমোপেত মকরোংহস্তং তাপঃ ॥” শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায়। চতুর্থী-বতারে ধর্ম ভাষ্যার গর্ভে নরনারায়ণ ঋষি হইয়া আঘোপশমাস্থিতহস্তর তপস্তা আচরণ করেন। অতঃপর ‘ঋষভ’ অবতারের আবির্ভাব হয়। এই সময়ে মনুষ্য গোজাতির সহিত পরিচিত হইয়া ইহাদিগকে প্রতিপালিত করিতে আরম্ভ করেন, এইধানেই মনুষ্যের পশুপালন-ধর্ম Pastoral stage প্রবর্তিত হয়। ইহাই মনুষ্যের সমাজ বন্ধনের প্রথম আয়োজন— তাহাতেই শ্রীমদ্ভাগবতে ‘ঋষভ’ অবতার আশ্রমধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া ‘বর্ণিত হইয়াছে। “অষ্টমে মেরু দেবাস্ত নাভেজাত উরুক্রমঃ। দর্শয়ন বজ্রধীরাগাং সর্বাশ্রম নমস্কৃতম্।” ১৩ শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় অধ্যায়। অষ্টমে অযীধু পুত্রের ঔরসে মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভ হইয়া অবতীর্ণ হন। এই অবতীরে: জীবীবর্গকে সর্বাশ্রয়নমস্তৃত বজ্র অর্থাৎ..

৭৪ম হংস সম্বন্ধীয় ব্রীতিনীতি প্রদর্শন করেন ।

এক্ষণে বামনাবতার আবির্ভূত হইলেন । এই অবতারে শাস্ত ব্রাহ্মণভাবেই ফুরণ হইয়াছে । পূর্বের পশুবলের স্থলে এই সময়ে বুদ্ধিবলের অমুশীলন ও উন্নতি হইয়াছে । এক্ষণে শারীর বলের প্রাধান্ত আর স্বীকৃত না হওয়ায় এই অবতারের শরীর অতি ধ্বংসরূপে বর্ণিত হইয়াছে । পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদের মতেও প্রথম মনুষ্য ধর্ম হইয়াই বিকাশলাভ করে । সভ্য মনুষ্যের মধ্যে মস্তিষ্কের অধিক বিকাশ হওয়াতে পূর্বের শারীরবিকাশের সঙ্কোচ দ্বারা তাহা সংশোধিত হওয়া আবশ্যক বলিয়া প্রকৃতির সামান্যকার জন্ত জন্মণ ব্যবস্থা হইয়াছে । মস্তিষ্কের উন্নতি হওয়াতে শত্রুপক্ষ কোশলের দ্বারা জয়েরই চেষ্টা দেখা যায় । হিরণ্য-কশিপু বংশধর দৈত্যরাজ বলির নিকট এই বামনাবতার জিপদা ভূমি যাক্রা করিলেন—

“প্রাহ সন্নিতগভীরং ভগবান্ বামনাকৃতিঃ ।
মমাগ্নি শরণার্থায় দেহিং ভূমিং পদত্রয়াং ॥”

বামন পুরাণে ৩১শ অধ্যায় ।

বলিরাজ বামনের তিনপদ পরিমিত স্থান অতি সামান্য মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রার্থনা পূরণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন । সুচতুর বামন তখন পদ শব্দের অর্থ স্থান করিয়া তিনটি স্থান বলির নিকট চাহিয়া বসিল । তাহাতে বলির জন্ত পাতাল ভিন্ন পৃথিবীতে আর স্থান রহিল না । সুতরাং প্রবল পরাক্রান্ত বিজয়ী এই দৈত্যরাজ একটা ক্ষুদ্রকায় মনুষ্যের বুদ্ধির নিকট পরাভূত হইয়া আমেরিকাতে নির্বাসিত হইলেন ও তথায় রাজ্য স্থাপন করিলেন । তাহার চিত্র ‘বলিভিয়া’ নামে এখনও বর্তমান আছে । পূর্বোক্ত

হিরণ্যাক্ষ বলির পূর্বপুরুষ হিরণ্যাক্ষিপুত্রই ভ্রাতা ছিল । উভয়ের নামের হিরণ্য শব্দ দ্বারা ইহার তাত্ত্বিক অনার্থ জাতীয় মনুষ্য ছিল বলিয়াই বোধ হয় । আমেরিকার তাত্ত্বিক আদিম অধিবাসীরা দৈত্যরাজ বলিরই বংশধর ছিল, ইহা বিশেষরূপে সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয় । এইরূপে শত্রু নিশ্চুলিত হইলে পর ধর্ম ও সমাজ সংস্থিতর জন্ত রাজ্যরূপে ‘পৃথু’ অবতারের আবির্ভাব হইল । তিনিই প্রথম ঔষধি বীজ হইতে শস্তোৎপাদন প্রণালী আবিষ্কার করিয়া লোকের খাদ্য শস্তের-প্রাচুর্য্য বিধান করেন । বীজ রোপণের নিয়ম প্রচারের দ্বারা পৃথিবীতে প্রভূত শস্তোৎপাদনের উপায় প্রদর্শন করেন বলিয়া তিনি পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে । ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি পৃথিবীর অধিক উৎপাদিকা শক্তি আবিষ্কার করেন । ক্রীমস্তাগবতে এই অবতারের এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়—“ঋষিভির্থা-চিতোভেজে নবমং পার্শ্ববংপুঃ । চুৎসেমা-মোষধীর্বিপ্রান্তেনায়ং স উসন্তমঃ ॥ ১৪ । ১ম স্বক্ষে ৩য় অধ্যায়ঃ । পরে ঋষিগণের প্রার্থনায় পৃথুরূপ রাজ-দেহ ধারণ করিয়া নবম অবতার হন । হে বিপ্রবর্গ ! এই অবতারে ভগবান্ পৃথিবী হইতে ঔষধাদি সকল বস্তু দোহন করিয়াছিলেন, এই কারণে এ অবতার সর্ব-জনের অতিশয় কল্যাণী ।”

এইরূপে শান্তিস্থাপিত হইল বটে, কিন্তু তাহা অধিক কাল স্থায়ী হইল না, আর্ধ্যঙ্গ এবার আত্মকলহে মত্ত হইলেন । পূর্বে যে শারীরিক বলের চর্চা ও আদর ছিল, তাহাতে আর্ধ্যদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয়জাতি অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল । এক্ষণে তাঁহারা রাজশক্তি পর্যন্ত হস্তগত করিয়া কেবল শারীর বলে

সমগ্র আধ্যাত্মিকের উপর আধিপত্য প্রতি-
 ঠিত করিতে প্রয়াসী হইল। কিন্তু তাহা
 নব-বিকাশোন্মুখ মানসিক ও নৈতিক-বলের
 পরিপন্থী হইল। সুতরাং এই ক্ষত্রিয় বলকে
 বিধ্বস্ত করিবার জন্যই পরশুরাম অবতীর্ণ
 হইলেন। তিনি পরশুরামহায়ে পৃথিবীকে
 একবিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয় করিলেন। এই
 সময়ে আমরা ব্রাহ্মণের দ্বারা পরশু নামক
 প্রথম অস্ত্রাবিকারের প্রমাণ পাই। পরশু-
 রামের প্রবলপরাক্রমের দ্বারা ক্ষত্রিয়গণ
 বিজিত ও বিনষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের নিকট
 মস্তক অবনত করেন। সুতরাং সেই প্রভাব
 দ্বারা ক্ষত্রিয়ের যে উন্নতি হয়, তাহারই নিদ-
 র্শনস্বরূপ বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র শিষ্য ধর্ম্মরূপধারী
 রামচন্দ্রে অবতীর্ণ হন। ইনি অস্ত্রের আরও
 উন্নতপ্রকার প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার
 লক্ষ্যবিজ্ঞাভিযান কেবল আধ্যাত্মিক বিস্তা-
 রের ইতিহাস নহে, কিন্তু আধ্যাত্মিকের সমুদ্র-
 যান নির্মাণে ও ইতিহাস। সৈন্তসহ সমুদ্র
 পারে আসিয়া ত্রীরামচন্দ্রে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার
 উপায় স্থির করিতে না পারিয়া বিশেষ চিন্তা-
 কুল হইলেন। তখন নল নামক বিশ্বকর্মা
 পুত্র পিতার শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া
 জানিতে পারায় তাঁহারই দ্বারা সমুদ্রে সেতু
 নির্মাণের পরামর্শ করা হইল। তজ্জন্ত নলের
 তত্ত্ববধানে অগণিত বৃক্ষসকল সমুদ্রতীরে
 বজ্রযোগে আনীত হইল। নলের অসাধারণ
 শিল্পকৌশলে সেই সকল বৃক্ষদ্বারা অর্গব্যান
 প্রস্তুত হইয়া তৎসমস্ত পরস্পর যোজিত হই-
 রাই সপ্তবতঃ সমুদ্রবক্ষে নৌ-সেতু গঠিত হইয়া
 ছিল। সমুদ্র-পোত নির্মাণ ও তৎসহায়ে
 সমুদ্রে আধ্যাত্মিক বিস্তারের অমুষ্ঠান এই
 অবতारेই প্রথম হয় বলিয়া ত্রীমত্যাগবতের
 ত্রীরামচন্দ্রে সমুদ্রকে বিশেষরূপে শাসন করেন
 বলিয়া উল্লিখিত হইরাছে, বলা—

• “নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্য চিকীর্ষয়।

সমুদ্রনিগ্রহানীচক্রোবীর্ণাণ্যাতঃপরম্ ॥”২২

১ম স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ঃ।

“অষ্টাদশাবতারে দেবকার্য্য কারিবার্”

বাসনায়া নরদেহে অর্থাৎ রাববরূপ ধারণ করিয়া
 মহা বীরত্বের কার্য্য সমুদ্রনিগ্রহাদি করিয়া-
 ছিলেন।” এই অবতারে আরও একটা নূতন
 স্মরণীয় ঘটনা সত্যটিও হয়, তাহা অনাধ্য-
 জ্ঞাতির মিলন। বানর ও ভরুক দ্বারা
 ত্রীরামচন্দ্রের পৈতৃগঠিত হস্ত। পক্ষীজটায়ু
 ও সম্প্রতিতে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিতে
 দেখা যায়। রাক্ষস বিভীষণ যুদ্ধের পূর্বেই
 ত্রীরামচন্দ্রের সহিত মিত্রতাবন্ধন করেন।
 যুদ্ধের পর তিনি রাবণেরই রাজ্যে ত্রীরাম-
 চন্দ্রের সামন্তরাজরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। বলা
 বাহুল্য যে, এই সমস্ত জাতিই অনাধ্যাত্মিক
 মনুষ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। পুরুষোক্ত
 পশুপক্ষীর নামে আত্মপরিচয়, জাতীয়বিশিষ্ট
 চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে। পশুবিশেষের
 চর্চ্চা কি পক্ষীবিশেষের পালক আপনার বেশ
 ভূষার জন্য নিয়ত ব্যবহার হইতে মনুষ্যজাতি
 বিশেষ যে তত্তৎ চিহ্নবাহার বিশেষরূপে নির্দিষ্ট
 হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। ঐতিহাসিক
 অনুসন্ধানে অসম্ভব অনেক জাতিকেই পুরুষোক্ত
 কারণে বা অন্তবিধ উপকারবশতঃ ইহাদের
 দ্বারা জাতীয় রক্ষার হেতুতে পশু বা পক্ষীর
 নামে আপনাদের সাধারণ জাতীয় নাম
 রাখিতে জানা গিয়াছে। ইহাকেই totem
 বলা হইয়া থাকে। হিন্দুসমাজে সিংহ, নাগ
 প্রভৃতি বংশ নাম বর্ত্তমানেও প্রচলিত রহি-
 রাছে। রাক্ষসগণের দ্বারা নরমাংসভুক মনুষ্য
 জাতি এখনও বর্ত্তমান দেখা যায়। সুতরাং
 ত্রীরাম অবতারে হিন্দুদিগের সহিত অনাধ্য-
 জ্ঞাতীদিগের প্রথম সন্ধি ও সমাজবন্ধন ইতি-
 হাসে অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা।

ইহার পর হৃলধর ও কৃষ্ণ এই যুগলাবতার হৃলধরই প্রথম ভূমিতে হৃলচালনা দ্বারা কৃষিকার্যের পথ প্রদর্শক হইয়া আৰ্য্যসভ্যতার উৎকর্ষসাধন করেন। কৃষ্ণাবতারও এই তত্ত্বই প্রচার করে। কারণ কৃষ্ণ শব্দ কৃষ্ণ (কর্ষণার্থক) ধাতু হইতে উৎপন্ন। তদীয় গোপালন, পশুপালন ধর্মেরই ঐতিহাসিক নিদর্শন। শ্রীরামাবতারে আমরা আৰ্য্য জাতির সমুদ্র বিজয়ের প্রমাণ পাইয়াছি— এই অবতারে আমরা আৰ্য্য-জাতির বৈদেশিক উপনিবেশ স্থাপনের প্রমাণ প্রাপ্ত হই। গ্রীক দেবতা Hercules যে বলরামেরই সহিত অভিন্ন, তাহা গ্রীক পুরাতত্ত্ববিৎ Diodorus ও Amian স্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ পাশ্চাত্য পণ্ডিত কর্ণেল টড পত্রিকারূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন—Hercules বলরামের ‘হরিকুলেশ’ নামেরই অপভ্রংশ—এবং Hercules বংশধর (Heraclide) দিগের গ্রীসে প্রত্যাবর্তনের যে ঐতিহাসিক কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা যদুবংশ ধ্বংসের পর গ্রীসে বলরাম কর্তৃক উপনিবেশ যাত্রার বিবরণ বই আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ এই বর্ণনাতে পূর্বোক্ত প্রত্যাবর্তন কাহিনীর মূল ঘটনার ও অমূল্যসন্ধান পাওয়া যায়। এতৎসম্বন্ধে কর্ণেল টড (Col. Tod) লিখিয়াছেন,—

“Both Krishna and Baldeo (Balarām) or Apollo and Hercules are esh ঈশ (lords) of the race (Cul-কুল) of Heri (Heri-cul-esh হরিকুলেশ) of which the Greeks might have made the compound Hercules. Might not a colony after the Great War have migrated Westward? The period of the return of Heraclide, the descendants of Atreus (Atri, the progenitor of

the Hericula) (হরিকুল) would answer. It was about half a century after the Great War.—Tod’s Rajasthan.

ইহার পর ক্রিয়-বহুল, হিংসা-কঠোর বৈদিক উপধর্ম হইতে পৃথিবীকে মুক্ত করিবার জন্য বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অহিংসা পরমধর্ম বলিয়া ঘোষণা করেন এবং বিগত উচ্চনীতির উপর ধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

তৎপর ধর্মের মানি হইলে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য কলিতে কদৌ অবতারের আবির্ভাব হইবে।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, অবতারবাদে মনুষ্যের উন্নতিক্রমের সহিত ইতরজীবের উন্নতিক্রমও প্রদর্শিত হইয়াছে। মৎস্ত, অশ্ব, কৃষ্ণ, বরাহ, সিংহ, বানর, ভল্লুক, পক্ষী, গো প্রভৃতি প্রাণিগণ বেক্রমে মনুষ্যের সংস্রবে আসিয়াছে, তাহার পুরাতত্ত্ব মনুষ্যের পুরাতত্ত্বের সহিত এইখানেই গ্রথিত হইয়াছে।

মনুষ্যের জীবন ক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া বর্তমান অবস্থা লাভ করিয়াছে, নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুসকলের কি প্রকারে আবিষ্কার হইয়াছে, উন্নতির বিবিধমার্গ ক্রমে প্রসারিত হইয়াছে—তাহার ধারাবাহিক স্থল বিবরণ এই অবতারবাদ হইতেই সঞ্চালিত হইতে পারে।

মৎস্তাবতারে মনুষ্য জলবিশারী ছিল—হয়গ্রীবাবতারে মনুষ্য ভাবার আবিষ্কার করিয়া প্রকৃত মনুষ্যজীবন আরম্ভ করে—বরাহকমে জলসান্নিধ্য মনুষ্যের প্রথম বাস ছিল এবং আর্য পৃথিবীতে বাস হেতু তখন কন্দমূলই খাদ্য হইয়াছিল ও বরাহ চর্মেই আচ্ছাদন হইয়াছিল। ইহার পর যজ্ঞাবতারে প্রথম

অধির আবিষ্কার হয়, তৎপর নৃসিংহাবতারে গভীর বনপ্রদেশের গুহাসমীপস্থ বৃক্ষাদি আশ্রয় হইয়াছিল—ফল মূল আহাৰ্য্য হইয়াছিল ও সিংহচৰ্ম্ম পরিধান হইয়াছিল। এই প্রকার অবস্থানই এই সময়ে নির্দিষ্ট হইত যেন জল সুপ্রাপ্য হয়—এই সময়ের অবস্থা বর্ণন করিয়া মন্ত্রপুরাণে লিখিত হইয়াছে—
“পর্য্যতাদধিবাসিস্ত্রোহনিকৈতাঃ পরস্তপ।

• রমোল্লাসঃ কালযোগাৎ ॥”

হে পরস্তপ! সে সময়ে কেহ গৃহে বাস করিত না। সকলেই পর্য্যত গুহায় বা সমুদ্র-তটে বাস করিত এবং ইচ্ছামুসারে জলের উদ্ভাবন করিতে পারিত।”

নরনারায়ণাবতারে ফল মূল ভক্ষ্য ও বৃক্ষের বকল পরিধেয় হইয়াছিল এবং বাসগৃহ ও ভূষণাদির প্রয়োজন ও (পত্র পুষ্পরূপে) তদ্বারা সংসাধিত হইত—কুর্ম পুরাণে লিখিত আছে, “সকৃদেব তয়া বৃষ্ট্যা সংযুক্তে পৃথিবীতলে প্রদুরাসংস্থতা তাসান্তেভ্যাবৃক্ষঃ প্রজায়তে। বর্জয়ন্তি তেভ্যস্তান্ত্রেভ্যায়ুগমুখে প্রজাঃ ॥”

সেই বৃষ্টিদ্বারা পৃথিবী একবার মাত্র সম্পৃক্ত হইলে, তাহাদিগের আশ্রয়স্বরূপ বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইয়াছিল এবং ঐ বৃক্ষ হইতে উহাদের আবশ্যক বস্তু সকল উৎপন্ন হইত। ‘ত্রৈতায়ুগের প্রথমে প্রজাগণ ঐরূপ বৃক্ষ হইতেই সংসারযাত্রা নির্বাহ করিত।

“প্রাচুর্য্যভূতাস্তা বৃক্ষান্তে গৃহসংজ্ঞিতাঃ।
বজ্রাণিতে প্রস্থয়ন্তে ফলাস্তাভরণানিচ।”

পুনর্বার সেইরূপ গৃহভূত বৃক্ষসকল প্রাচুর্য্য হইয়াছিল। সেই সকল বৃক্ষ, বজ্র, এবং অভরণরূপ ফল-প্রসব করিত।

• ইহার পর ঋষ্যভাবতারে পশুপালনকাল উপস্থিত হইল। এই সময়ে গবাদি পশু মনুষ্যের পালিত হইল। মনুষ্য ইহাদিগকে

‘চারণ করিয়া ইহাদের দ্ব্যুৎ পুষ্টি লাভ করিতে লাগিল এবং ওষধিশস্ত্রে জীবন ধারণ করিতে লাগিল। এই সময়ে গুহা, ওষধি ও বৃক্ষ-দির বিবিশেষ বৃদ্ধি হইল। মনুষ্য এক্ষণে পূর্ব্বের সংহতি (যৌথ) জীবন পরিহার করিয়া প্রকৃত পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করিবার উত্তোগ করিল। কুর্ম পুরাণে এই সময় এই-রূপ বর্ণিত হইয়াছে—

“যদা আলোবহতরা আপন্নঃ পৃথিবীতলে।

অপান্তুম্শচ সংযোগাদৌষধ্যস্তাস্তদাভবন্ ॥

অকালকৃষ্টাশ্চানুশ্চ। গ্রামারণ্যাস্তদুদর্শ।

ঋতুপুষ্পফলৈশ্চৈব বৃক্ষগুণ্যশ্চ জজিরে ॥

ততঃ প্রাচুর্য্যভূতাসাং রাগলোভশ্চ সর্ব্বশঃ।

অবশ্চাভাবিতার্থেন ত্রৈতায়ুগবশেনবৈ।

জন্তাঃ পর্য্যায়ুগুস্ত নদীক্ষেত্রাণি পর্য্যতান্।

বৃক্ষগুণ্যাদৌষধীশ্চৈব প্রসহতুবথাবলম্ ॥”

‘এইরূপে পৃথিবীতে যখন অধিক পরিমাণে জল উৎপন্ন হইল, তখন ঐ জল ও মৃত্তিকার সংযোগে ওষধি সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ ওষধির নিমিত্ত ভূমির কর্ষণ বা বীজ বপনের আবশ্যকতা হয় নাই। এইরূপে কতক গুলি আরণ্য, কতক গুলি গ্রাম্য, সর্ব্বগুণ চতুর্দশ প্রকার প্রত্যেক ঋতুতে বিভিন্ন পুষ্প ও ফল দ্বারায় শোভিত বৃক্ষ ও গুল্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। ভবিষ্যতাবতার অবশ্চাভাবিতা হেতু ত্রৈতায়ুগের প্রভাবে প্রজাদিগের বিষমায়ুরাগ ও লোভ সর্ব্বপ্রকারে প্রবল হইয়াছিল। সেই লোভবশতঃ তাহারা আপন আপন বলাহু-সারে নদীতীরস্থ ক্ষেত্র, পর্য্যত, বৃক্ষ, গুল্ম ও ওষধি সকল বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে লাগিল।

ইহার পর বামণাবতার। এই অবতারে জাতিভেদ উৎপত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত আধিকারস্পৃহা। ব্রাহ্মণের মধ্যে

এখনও তেমন প্রবল হয় নাই। ব্রাহ্মণ এখনও পূর্বেরই প্রাকৃতিক ভাবে জীবন পরিচালিত করিতে লাগিলেন—ভোগবাসনা অপেক্ষা ধর্ম চর্চাই তাঁহার অধিক অহুবাগের বিষয় হইল। তবে এক্ষণে তদীয় জীবন-পর্বে এই পরিবর্তন সন্দেহিত হইল যে তিনি বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া সামান্ত ভাবে ভূমিতে যজ্ঞীয়ায়ির সান্নিধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ পার্থিব সম্পদ এইরূপে উপেক্ষা করিতেই বামন বলির নিকট ত্রিপদ ভূমি যজ্ঞা করিয়াছিলেন। ইহার পর পৃথু অবতার। তাঁহা হইতেই পৃথিবীতে প্রথম রাজপদ ও রাজশাসন প্রবর্তিত হইল। পূর্বে ঐশ্বরি সকলের স্বভাবজাত শস্তই মনুষ্যের উপজীব্য ছিল। এক্ষণে পৃথু প্রথম বীজ-রোপণ কৌশল প্রচার করিয়া পৃথিবীতে শস্ত উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন করিলেন। এই আবিষ্কারটী জগতের এইরূপই হিতকর হইয়াছিল যে, ইহা জৈব যেন স্বয়ং পৃথুকে দিয়াছিলেন একরূপ বোধ হইয়াছিল—তাহাতেই কৃষি পূরণে উক্ত হইয়াছে—“পিতামহ নিয়োগেন হৃদোহ পৃথিবীং পৃথুঃ ॥”

পরশুরামাবতারে পরশু দ্বারা বৃক্ষাদি ছিন্ন হইয়া শাখা প্রশাখাদি দ্বারা গৃহাদি নির্মিত হইয়াছিল ও যজ্ঞায়িসংরক্ষিত হইয়াছিল। এই সময়েই অস্ত্রের ব্যবহার প্রথম আরম্ভ হয়। রামাবতারে ধর্মরূপ উদ্ভাবিত হইয়াছিল ও সমুদ্রপোতাদি প্রথম নির্মিত হইয়াছিল। বেদপ্রণেতা ঋষিদিগের অগ্রণী বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের প্রভাব এই অবতারের উপর বিশেষ রূপে প্রখ্যাপিত হইয়াছিল। সুতরাং এই সময়ে যে বৈদিক সাহিত্যের সবিশেষ ত্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল—তাহা সহজেই অস্বাভাবিক বোধ হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের খণ্ডের ক্ষত্রিয়

জনকরাজ উপনিষদ্-জ্ঞান প্রথম প্রচার করিয়া ব্রাহ্মণ সমাজে একরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি রাজর্ষি আখ্যা দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। হলধরাবতারে কুবী-কার্য প্রবর্তিত হইয়া শস্যাদি উৎপন্ন হওয়ার খাদ্যের প্রাচুর্য্য হইয়াছিল—শিল্পেরও সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এই অবতারে ঋষিদিগের মধ্যে মহর্ষি ব্যাসদেবের ব্যক্তিত্ব সর্বাপেক্ষা উন্নত। তিনি এই ব্যক্তিত্বের দ্বারা যেন সকলকেই অভিভূত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এত মহিমাধ্বিত হইলেও তিনি বৈদিক ঋষি নহেন। তাঁহার পূর্বেই বেদ সকল বিরচিত হইয়াছিল—এক্ষণে তিনি কেবল তাহাদিগের সঙ্কলন করিলেন, তাহাতেই তিনি ‘বেদব্যাস’ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তিনি বেদপ্রণেতা না হইলেও পঞ্চমবেদরূপ মহাকাব্য “মহাভারত” ও “পুরাণ” সকল প্রণয়ন করিয়াছেন এবং উপনিষদমূলক “বেদান্তদর্শন”ও তিনিই রচনা করিয়াছেন। ধর্মসংহিতা সকলও এই সময়েই রচিত হইয়াছিল এবং তাহাতেও তাঁহার হাত দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধাবতারে আর্য্য অনার্য্য সকলের মধ্যেই সভ্যতা ও ধর্মের বিস্তার হইয়াছিল এবং ধর্মনীতির সবিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। এই সময়ে নীতিশাস্ত্র, গল্প প্রভৃতি নৈতিক সাহিত্য ও কাব্য নাট্যাদির উৎপত্তি ও সবিশেষ পরিপুষ্টি লক্ষিত হয়। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পের সাতিশয় পারিপাট্যও এই সময়ে প্রদর্শিত হইয়াছিল। বৈদেশিক ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক বাণিজ্যও এই সময়ে সম্যক প্রকারে প্রবর্তিত হয়। পূর্বোক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা দেখিতে পাইলাম যে হিন্দুর অবতারবাদে মানব-বিকাশের

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের ‘মৃগয়া-যুগ’ (hunting-stage) ‘পশুচারণ-যুগ’ (pastoral stage) ‘কৃষি-যুগ’ (agricultural stage) ও শিল্প-বাণিজ্য-যুগ (industrial and commercial stage) প্রভৃতি সমস্তই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমরা আরও দেখিতে পাইয়াছি যে, মহুষ্যের বিশেষতঃ আৰ্য্য-জাতির শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আত্মিক সমস্ত বৃত্তির সমুচিত ক্ষুদ্রিত্বের একটি সুলক্ষিত ঐতিহাসিক-সূত্র এই অবতার-বাদের মধ্যে অল্পহৃত্য রহিয়াছে। এই অবতারবাদে আমরা আৰ্য্যধর্ম প্রতিষ্ঠার পূর্বাবস্থাও পাঠ করিতে সমর্থ হই। বেদই আৰ্য্যধর্মের মূল—তাহাতেই প্রথমাবতারেই বেদ-ধারণের কথা পাওয়া যায়। কৃষ্য আৰ্য্য-জাতিকে পৃষ্ঠে আশ্রয়দান করিয়া বেদ-রক্ষার সাহায্য করিয়া অবতার হইয়াছেন। বরাহ-কল্পে বৈদিকধর্ম পৃষ্ঠীলাভ করিতে আরম্ভ-করে—তাহাতে বরাহ বেদোদ্ধার-কর্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু আৰ্য্য-দিগের ধর্মচর্চা শীঘ্রই অনার্য্যদিগের নিকট হইতে বাধাপ্রাপ্ত হইল। ধর্ম লইয়া আৰ্য্য ও অনার্য্যের মধ্যে ভীষণ সজর্ষ উপস্থিত হইল। এই সজর্ষে আৰ্য্যগণই বিজয়ী হইলেন। অনার্য্য-নেতা হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্য-কশিপু নিহত হইল। এবং অনার্য্য রাজা বলি আৰ্য্যভূমি হইতে বিতাড়িত হইলেন। পূর্বোক্ত দৈত্যদিগের নামের হিরণ্য শব্দটি বিশেষ রূপে লক্ষণীয়। হিরণ্য শব্দের অর্থ সুবর্ণ। সুতরাং হিরণ্যাক্ষ শব্দের অর্থ পীত-চক্ষু; হিরণ্যকশিপুর অর্থও বোধ হয় পীত-দেহ। ইহার মধ্যে আমরা যেন মঙ্গোলীয় জাতির লক্ষণই পাইতেছি। এখনও ইহারা পীতবর্ণ জাতি (yellow race) বলিয়া

কথিত হইয়া থাকে। আমেরিকার Red Indian নামক আদিম জাতির তাম্রবর্ণ এই পীতবর্ণেরই রূপান্তর বলিয়া বোধ হয়। পূর্বোক্ত প্রকারে অনার্য্যজাতির প্রতিপক্ষতা বিদলিত হইল বটে, কিন্তু আৰ্য্যদিগের মধ্যে যোরতর আত্ম-কলহ বাধিয়া গেল। তাহা-দিগের মধ্যে এক্ষণে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এই দুই ভাগ হইয়া প্রাধান্তের জন্য প্রবল বিরোধ চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ধর্মের পক্ষ আশ্রয় করিলেন, ক্ষত্রিয় বলের পক্ষ আশ্রয় করিলেন। পরিণামে ধর্মেরই জয় হইল। এই জয়ের দ্বারা বেদ-চর্চায় নবোৎসাহ সঞ্চারিত হইল, এবং বৈদিক সাহিত্য অপূর্ব সমৃদ্ধি লাভ করিল। এই সময়েই বেদ সকলের পূর্ণ-পরিণতি হইল। ইহারই পর বেদ-বিভাগের কাল ও বেদানুগমনে পুরাণ ও সংহিতা-রচনার কাল আসিল। হিন্দুদিগের উচ্চ চিন্তা হইতে যে বৃহদর্শন প্রসূত হইল, তাহাতেও বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইল। বৌদ্ধধর্ম বৈদিক বিকৃত কর্ম কাণ্ডের বিকল্পে উদ্ভূত হইলেও সাত্বিক কর্ম-কাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ড কখনও বর্জন করে নাই। অতএব পূর্বোক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, হিন্দু আৰ্য্যদিগের সমস্ত উন্নতিরই মূলে বৈদিক ধর্মই জল-সিঞ্চন করিয়াছে।

এক্ষণে আমরা হিন্দু অভিব্যক্তির অন্য একটি দিক প্রদর্শন করিব। হিন্দুগণ সমুদ্র-মহুনে মৌলিক বা সাধারণ অভিব্যক্তি নির্দেশ করিয়াছেন, অবতারবাদে বিশেষাভিব্যক্তি নির্দেশ করিয়াছেন। আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম-রূপারে আমাদের জীবনের উন্নতি অবনতি হয়, ইহা একপ্রকার সর্ববাদিসম্মত। ইহাই কর্ম্মফল রূপে সুবিদিত হইয়াছে। আমরা

সাধারণতঃ শুনিয়া থাকি “বুদ্ধি: কৰ্ম্মাশু-
সারিণী।” কৰ্ম্মের অঙ্গুত হইয়াই বুদ্ধি
আমাদিগের বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ জীবনগতি
নির্ণয় করিয়া থাকে। সুতরাং ব্যক্তিগত
বিকাশের মূলে কৰ্ম্মই একমাত্র প্রবর্ত্তক।
হিন্দুর স্বর্গনরকের গোপান এই কৰ্ম্মধারাই
গঠিত। সখ, রক্ষা, ও ভয়, এই গুণত্রয়ের
বিভিন্ন মিশ্রণের দ্বারা কৰ্ম্মের আবার অনন্ত-
বৈচিত্র্য সাধিত হইয়াছে। হিন্দুর চৌরাশী
লক্ষ বা কোটি কোটি যোনি ভ্রমণ বা জন্মান্তর
এই কৰ্ম্মেরই বিপত্তিপাক মাত্র যথা—

• “নেহাভ্রুৎক্রমণকালো পুনর্গর্ত্তেচ সম্ভবম্।

যোনি কোটি সহস্রেষু গৃতীশাস্তান্তরায্মনঃ।”

মহুসংহিতা ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৬৩ শ্লোক।

‘দেহ হইতে জীবাত্মার উৎক্রমণ, পুনর্বার
গর্ত্তবাসে জন্ম গ্রহণ এবং কুকুর শৃগালাদি
কোটি কোটি নিকৃষ্ট জীবের গর্ত্তে গমনাগমন,
এই সকল আপন আপন কৰ্ম্মের ফল, ইহা
চিন্তা করিবে।

সুতরাং হিন্দুর ব্যক্তিগত বিকাশের সংখ্যা
গণনার সাধ্যাতীত। যেস্থলে পাশ্চাত্য
অভিব্যক্তিবাদ এখনও সমস্ত বিকাশের সংখ্যা
গণনার প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই, তৎস্থলে
সেই স্বরণাতীত কালেই হিন্দু সমস্ত বিকাশের
সংখ্যা গণনা করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা
অবশ্যই হিন্দুর দূর-লক্ষিণী প্রতিভার পরিচয়।
হিন্দুর এই অগণিত ব্যক্তিগত বিশেষের কিন্তু

মূল-রহস্ত ‘সেই এক কৰ্ম্মফল। ইহাকে
Natural selection (স্বতঃ নির্বাচন) বা
adaptation (সাম্যকরণ)’ যাহাই বলা
যাউক না কেন, সকলই সেই কৰ্ম্মফলেরই
অর্থাস্তর মাত্র। প্রাচ্য অভিব্যক্তিবাদের এই
বিশালতা দ্বারা পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদের
চমৎকারিত্ব যে অনেক পরিমাণে আচ্ছন্ন হইবে,
তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দু অভিব্যক্তিরাদের যে তিনটি পর্য্যায়
আমরা উপরে প্রদর্শন করিলাম, তাহার সহিত
হিন্দুর সাহিত্যবিকাশও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত
রহিয়াছে, তাহা নির্দেশ করিলেই আমরা
প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারি। বৈদিক
উপাসনার প্রধান লক্ষ্য অমৃত পান করিয়া
অমরত্ব (দেবত্ব) লাভ, তাই অমৃতকল সোম-
রস পান করিয়া ঋষিগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া
গাইয়াছিলেন—“অপাম সোমমমৃতা অভূমঃ,”
এই অমৃতই সমুদ্রমন্ধানের সার। সুতরাং
সমুদ্রমন্ধান বৈদিক অভিব্যক্তি। পুরাণেই
অবতারবাদের উৎপত্তি সুতরাং অবতারতত্ত্ব
পৌরাণিক অভিব্যক্তি। কৰ্ম্মফল ও জন্মা-
ন্তরবাদ দর্শনপ্রতিপাদিত সত্য, সুতরাং কৰ্ম্ম-
বাদ দার্শনিক অভিব্যক্তি। এইরূপে হিন্দুর
বেদ, পুরাণ, দর্শন, প্রধান তিন শ্রেণীর
সাহিত্যে অভিব্যক্তির তিন ক্রম পরিস্ফুট
হইয়া ইহা পূর্ণাবয়ব লাভ করিয়াছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শ্রীভান্ন অবতারবাদ : (৩)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর।)

(৬) . অবতরণের প্রণালী (modus) ।

অবতরণের প্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে মুক্তির পূর্বে এবং পরে সাধকের কিরূপ অবস্থা হইয়া থাকে এবং মুক্তিরই বা অর্থ কি, তাহা অবগত হওয়া উচিত ।

মুক্তির অর্থ স্বাধীনতা । জীব যে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ, কষ্ট প্রভৃতি ভোগ করিতেছে, তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার নাম মুক্তি । ইহাই মুক্তির সাধারণ অর্থ ।

বৌদ্ধদের মতে নিম্নোক্ত প্রকারে মুক্তি পাওয়া যায় । “অবিজ্ঞা হইতে সংস্কারের উদ্ভব হয় । সংস্কার হইতে জ্ঞানের উদ্ভব হয় । জ্ঞান হইতে নাম রূপের, এবং নাম রূপ হইতে ছয় ইন্দ্রিয়ের ছয় বিষয় উদ্ভূত হয় । ছয় ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে অমু-ভব, অমুভব হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে রাগ, রাগ হইতে সত্তা, সত্তা হইতে জন্ম, জন্ম হইতে জরা, মৃত্যু, শোক, রোদন, ক্লেশ, খেদ, ও হতাশ । আমাদের সমগ্র দুঃখই এইরূপে উদ্ভূত হয় । অবিজ্ঞান বিনাশের দ্বারা সংস্কার নষ্ট হয়, সংস্কারের নাশ দ্বারা নামরূপের নাশ হয়, নামরূপের নাশ দ্বারা ছয় ইন্দ্রিয় বিষয়ের নাশ হয় । এইরূপ পর পর নাশ দ্বারা জন্ম ও আত্মবৃত্তিক দুঃখের নাশ হয় ।” * বৌদ্ধ-দের মতে ইহাই নির্ণায়ক বা মুক্তি ।

• হিন্দুদের মতেও জন্ম জরা ব্যাধি প্রভৃতি হইতে মুক্ত হওয়ার নামই মুক্তি । কিন্তু

* পৃষ্ঠা ১৮১

সাধারণতঃ মানব আবর্তে (Human Evolution) ফিরিয়া না আসার নামই অনেক মুক্তি বলিয়া থাকেন ।

উপনিষদে আমরা দুইটা যার্গের কথা দেখিতে পাই।—দেবযান ও পিতৃযান । সাধারণ জীব মৃত্যুর পর পিতৃযানে গমন করিয়া থাকেন । এই যানের অপর নাম ধূম্যার্গ বা দক্ষিণায়ন । এই যানে ষাঁহার যান, তাহার আবার মানব আবর্তে ফিরিয়া আসিয়া থাকেন । আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, সাধারণ জীব জিলোকীর মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে । তাহার জিলোকীর মধ্যে—অর্থাৎ ভূ, ভুবঃ ও স্বর্লোকের মধ্যে—যাওয়া আসা করিতেছে । ইহারাই পিতৃযা - যানী ।

দেবযানের অপর নাম উত্তরায়ণ । যে সকল সাধক দেবযানে যাত্রা করেন, তাহার জিলোকীর স্বীমা অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ মহঃ, জন তপঃ ও সত্য লোকে উপনীত হইয়া থাকেন । সত্যলোকের অপর নাম ব্রহ্মলোক । সেখানে হইতে তাহাদের আর ফিরিতে হয় না । “এতেন প্রতিপত্তমানা ইমং মানবমাবর্তং নারজন্তে” (ছান্দোগ্য, ৪।১৫।৫)—অর্থাৎ, এ পথে গমনকারীকে আর মানব আবর্তে ফিরিয়া আসিতে হয় না ।

উপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—“ব্রহ্ম-লোকান্ গময়তি তে তেব ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবত্তো বসন্তি”—অর্থাৎ, তাহার ব্রহ্ম-লোকে দীর্ঘায়ুঃ ব্রহ্মার আয়ুঃ পরিমিত কাগ-বাস করেন । অতঃপর—“স খলু এবং

কর্কশং বাবদায়ুসং ব্রহ্মলোকনভিসম্পত্তে” (ছান্দোগ্য ৮।১৫।১), অর্থাৎ, তিনি এইরূপে থাকিয়া যত দিন ব্রহ্মার আয়ুঃ তত দিন ব্রহ্মলোকে থাকেন। কিন্তু গীতায় উল্লিখিত হইয়াছে যে- জীবের ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরাবর্তন ঘটিয়া থাকে। যথা,— “আব্রহ্ম ভুবনাম্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন” —(৮।১৬ অর্থাৎ, হে অর্জুন! ব্রহ্মলোক হইতেও জীব পুনরায় আবর্তন করিয়া থাকে। শ্রীধর-স্বামী লিখিয়াছেন যে, “ব্রহ্মলোকস্থাপি বিনা শিষ্যং তত্রত্যানাম্ অল্পপংজ্ঞানানাম্ অবশ্যং ভাবি পুনর্জন্ম”—অর্থাৎ, ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক যখন বিনাশী, তখন ব্রহ্মলোকগত জীবেরও অবশ্যই পুনর্জন্ম হইবে, যদি না তাহাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত সাধকের কল্পের মধ্যে আবর্তি হয় না, কিন্তু কল্প ক্ষয় হইলে, তাঁহাকেও ফিরিতে হয়, কারণ কল্পক্ষয়ে ব্রহ্মলোকাদিরও নাশ হয়।

পূর্বোক্ত দেবযান ক্রম-মুক্তির পথ। ইহারা এইকপ ক্রমমুক্তি-ফলদায়ী উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাহাদের ব্রহ্মলোক অবস্থান কালে যদি জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবেই তাঁহারা কল্পান্তে ব্রহ্মার সহিত মোক্ষ লাভ করেন। স্মৃতিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

ব্রহ্মণা সহ তে সর্বের সম্প্রাপ্তে প্রতীসংকারে ।
পরম্প্রাপ্তে কৃতাত্মানো প্রবিপত্তি পরং পদম্ ॥

অর্থাৎ কল্পান্তে যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মার আয়ুস্ অবসানে কৃতার্থ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হন। সুতরাং মানব আবর্তে না ফিরিলেই যে জীবের মোক্ষ হইবে, তাহা নহে। এ কল্পেই মানব আবর্তে না ফিরিতে পারে বটে,

কল্পান্তে তাহাকে ফিরিতে হইবে। কিন্তু যদি সে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয়, তাহা হইলে তাহার পরমপদ প্রাপ্তি হইবে।

উপাসনার তারতম্যে মুক্তিরও তারতম্য হইয়া থাকে। এই প্রকার মুক্তি সম্বন্ধে আমরা বায়ুপুবাণে দেখিতে পাই যে,—

“দশমমন্তরানীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকাঃ ।

ভৌতিকাস্ত শতং পূর্ণং সহস্রং স্বাভিমানিকাঃ ॥
বৌদ্ধা দশ সহস্রানি তিষ্ঠন্তি বিগতজরাঃ ।

পূর্ণং শতসহস্রন্ত তিষ্ঠন্ত্যাব্যাক্চিন্তক্যঃ ॥

নির্গুণং পুরুষং প্রাপ্য কালসংখ্যা ন বিত্ততে ॥

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়োপাসকগণের মুক্তিকাল দশ মন্তর, স্মৃভূত উপাসকগণের শত মন্তর, অহঙ্কারোপাসকের সহস্র মন্তর, বুদ্ধি অর্থাৎ মহত্ত্বের উপাসকের দশ সহস্র মন্তর এবং এবং প্রকৃতি উপাসকের লক্ষ মন্তর। নির্গুণ পুরুষকে পাইলে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করিলে কাল পরিমাণ থাকে না অর্থাৎ প্রত্যাবর্তি হয় না।

সুতরাং মানব আবর্তে ফিরিয়া না আসিলেই যে মুক্তি হয়, তাহা নহে। তাহা হইলে মুক্তির লক্ষণ কি? দার্শনিক পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে সংবিতের (consciousness) অনন্ত ও সার্বজনীন প্রসারণের (expansion) নামই মুক্তি। প্রসারিত সংবিতের উচ্চতম স্তরগুলিকেই ‘সাধারণতঃ’ লোকে ভূগক্রমে মোক্ষপদ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। ভগবান্ সংবিসম্বন্ধ—তিনি সংবিস্ত্রি আর কিছুই নহেন—তিনি চৈতন্তের মহাসমুদ্র। তাঁহাকে অবগত হইলে কেবল মাত্র সংবিতের দ্বারাই অবগত হইতে হইবে।

জীবও অগ্নির ফুলিঙ্গের ভায় সেই সংবিতের সামান্য কণা মাত্র ‘উপাধিক্রম’

গণ্ডির দ্বারা আয়ত্ব। তাহার ভিতর ঐশ্বরিক সংবিতের (Divine consciousness) ক্ষমতা সকল প্রকাশিত ভাবে বর্তমান রহিয়াছে। ক্রমবিকাশের দ্বারা ঐ সকল ক্ষমতা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইজন্য দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে, মনুষ্যের সংবিৎ কুসুমকলিকাবৎ অপ্রফুটিত কিন্তু উহা যখন সম্যগ্ প্রফুটিত সহবে, তখন ভগবান রূপ কুসুমে পরিণত হইবে। মনুষ্য সংবিতের সম্যগ্ প্রফুটিত অবস্থার নামই মুক্তি বা মোক্ষ। কিন্তু এই অবস্থার উপনীত হইতে হইলে মনুষ্যকে সংবিতের বিভিন্ন পর্ব পার হইতে হয়। এবং উক্ত পর্ব পার হইতে মনুষ্যকে এক এক লোক ভোগ করিতে হয়। মনুষ্য এক প্রকার সংবিত্তে ভূলোক ভোগ করিয়া থাকেন, তদপেক্ষা উচ্চতর সংবিত্তে ভুবল্লোক, তদপেক্ষা উচ্চতর সংবিত্তে স্বর্লোক এবং তদপেক্ষা উচ্চতর সংবিত্তে মহর্লোক ভোগ করিয়া থাকেন। এই প্রকারে উচ্চ হইতে উচ্চতর সংবিত্তে জন, তপ ও সত্য লোক ভোগ করিয়া থাকেন। এই থানেই ব্রহ্মাণ্ডের সীমা শেষ। আরও উচ্চতর সংবিত্তে জীব ব্রহ্মাণ্ড তৈদ করিয়া থাকেন। আমরা এইরূপ যোগীর কথা শাস্ত্রে পাইয়া থাকি। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এইরূপ যোগী এক ব্রহ্মাণ্ডে মুক্ত হইয়া বটে, কিন্তু অপর ব্রহ্মাণ্ডে মুক্ত নহেন, কারণ সকল ব্রহ্মাণ্ড এক প্রকারে গঠিত নহে। এই প্রকারে জীব যতই উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থায় যাইতে থাকেন, ততই সংবিত্তের প্রসারণ হইয়া থাকে। যখন তিনি উপাধিরূপ গণ্ডির বাহির হইয়া থাকেন, তখনই তিনি মুক্ত হইয়া থাকেন।

কিন্তু মুক্তির পরও মুক্তের আরও অবস্থা আছে। বোধের এই সকল অবস্থাকে যথা ক্রমে পর-নির্বাণ ও মহা-পর-নির্বাণ বলিয়া থাকেন।

মুক্তির পরেও দুইটি পথ আছে। সেই দুইটি পথের আলোচনা করিবার পূর্বে মুক্তের পরীর থাকে কিনা, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—“অভাবং বাদারম্যহেতবম্। ভাবং জ্যোতির্বিবিকল্পামননাম্। দাদশাহং উভয়-বিধং বাদিরাম্যগোহতঃ। তবতাবে সন্ধবহুচ পণ্ডতে। ভাবে জাগ্রদ্বৎ।”

(ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১০-১৪)

অর্থাৎ বাদির বলেন, থাকে না, জ্যোতির্বি বলেন, থাকে। বাদিরাম্যের মত এই যে, শরীর থাকা না থাকা, মুক্তের ইচ্ছাধান। যদি শরীর থাকে, তবে জাগ্রতবৎ ভোগ হয়; যদি না থাকে, তবে স্বপ্নবৎ ভোগ হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন যে,—“স একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি, পঞ্চধা, সপ্তধা”—তিনি এক হন, তিন হন, পাঁচ হন, সাত হন, অর্থাৎ মুক্ত হইয়াবশে কাম্যবাহ রচনা করিতে পারেন এবং তাহার সংবিত্তের প্রসারণ হওয়ারও সেই সমস্ত দেহে অনুপ্রবেশ করতে পারেন। মুক্ত সমস্ত বিষয়ে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বটে কিন্তু উক্ত হইয়াছে যে,—“জগদব্যাপার বর্জনম্” (ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১৭)—অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি লয়ে তাহার কোন কর্তৃত্ব থাকে না। আরও উক্ত হইয়াছে যে “প্রত্যক্ষোপদেশা-দিতি চেম অধিকারিমণ্ডলম্বেত্বে” (ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৮)—অর্থাৎ তাহার যে ভোগ হয়, তাহা এই সৌরমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ। কারণ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে; সকল ব্রহ্মাণ্ড সমান নহে, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে মুক্ত

হইয়াছেন, তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া থাকেন, অপর ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। শ্রীরামামুজ্ঞও এই কথা বলিয়াছেন যে,—“আধিকারিকা অধিকারেন্ নিযুক্তা স্তেবাং মণ্ডলানি লোকাঃ তৎস্বাভোগা মুক্তস্য ভবন্তি।”

এখন দেখা যাউক, মুক্তের কি কি ঐশ্বর্য্য ভোগ হইয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন যে,—“আপ্নোতি স্বারাজ্যম্ আপ্নোতি মনসম্পত্তিং সর্ব্বে দেবাঃ তস্মৈ বলিম্ অহরন্তি। সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুৎতিষ্ঠন্তে।” সর্ব্বে লোকেষু কামচারো ভবতি।—অর্থাৎ তিনি স্বরাট্ হন, তিনি মনের অধিপতি হন। সমস্ত দেবগণ তাঁহাকে বলি প্রদান করেন। সংকল্প মাঝেই পিতৃগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন। তিনি সমস্ত লোকে কামচর হইয়া থাকেন। ইহাকেই স্বারাজ্যসিদ্ধি বলে। বাদরায়ণ বলিয়াছেন যে, মুক্তের যে ঐশ্বর্য্য, তাহা সংকল্প মাঝে উপনীত হয়।

কিন্তু আনাদের মনে এইরূপ প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে যে, সকল মুক্তেরাই কি এইরূপ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া থাকেন? তাহা করেন না। এই জন্ত বৌদ্ধেরা মুক্তের ভিতর তিনটা শ্রেণী করিয়াছেন। যথা,—ধর্ম্মকায়-মুক্ত, সন্তোগকায়মুক্ত এবং নির্মাণকায় মুক্ত। যে সকল মুক্ত পূর্ব্বোক্ত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ বাঁহাদিগের স্বারাজ্য-সিদ্ধি হইয়াছে, তাঁহাদিগকে সন্তোগকায় মুক্ত বলে। বিদেহমুক্তদিগকে ধর্ম্মকায় মুক্ত বলে। তাঁহাদের শরীরের নাশ হইলে, তাঁহারা ব্রহ্মে নিমজ্জিত হইয়া থাকেন। “তস্য ভাবদেব চিরং যাবন্ বিবক্ষোহথ সংপ্ৰপ্যো”—অর্থাৎ জীবন্মুক্তের ততদিন বিলম্ব হয়, ততদিন না তাঁহার প্রায়শ্চক্কর হয়,

পরে তিনি ব্রহ্মে সংযুক্ত হন। তাঁহাদের আর তখন কোন পৃথক্ সত্তা থাকে না। বিদেহমুক্ত সম্বন্ধে বাসুদেব বলিয়াছেন যে—“বিদেহ-প্রকৃতিসমাস্তা মোক্ষপদে বর্ত্তন্তে, ন লোক মধ্যে স্ততা ইতি” (পা। সু বিভূতি পদ, ২৬)—অর্থাৎ বিদেহ ও প্রকৃতি লয় যোগীগণ মোক্ষপদে অবস্থিত, ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বাস করেন না, উপনিষদোক্ত দৃষ্টান্তের লবণের পুতলি যেমন অগ্নে মিশিয়া যায়, ধর্ম্মকায়মুক্তগণও সেইরূপ ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন। এই দুই প্রকার মুক্ত ভিন্ন আরও এক প্রকার মুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে নির্মাণকায় মুক্ত বলা হয়, ব্যাসভাষ্যে ইহাদিগকে ‘নির্মাণদেহ’ বলা হইয়াছে। তাঁহারা ব্রহ্মে নিমজ্জিত হন বটে, কিন্তু তাঁহাদের পৃথক সত্তা থাকে। তাঁহারা তাঁহাদের সংবিত্তের কেন্দ্র (centres) অক্ষুণ্ণ রাখিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করিলেই ব্রহ্মে নিমজ্জিত হন এবং মনে করিলেই বহির্গত (re-emerge) হইয়া থাকেন।

ধর্ম্মকায় ও নির্মাণকায় মুক্তগণ দুইটা বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই দুইটা পথ জীবন্মুক্তির পর পারে। এই দুইটা পথ সম্বন্ধে শাস্ত্রে ইঙ্গিতে আভাস দেওয়া হইয়াছে মাত্র। কিন্তু বাঁহারা আধ্যাত্মিক পথাবলম্বী, তাঁহারা এই দুইটা পথ সম্বন্ধে সবিশেষ অবগতি আছেন। Voice of the silence নামক গ্রন্থে এই দুইটা পথ সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। *

* The Shanga robe, 'tis true, can purchase eight eternal. The Shanga robe alone gives the Nirvana of destruction; it stops rebirth, but, O, Lanoo, it ~~also~~ kills compassion. No longer can the perfect Buddhas, who don the Dharma-kaya glory, help mans' salvation. Alas! shall selves be sacrificed to self; man-

“সংজ্ঞা (বোধি) অনন্ত জ্যোতিঃআহরণ করিতে পারেন সত্য, কিন্তু তাহার কলে যে নির্মাণ লাভ হয়, তাহা বিনাশের নামান্তর। তাহাতে গতাগতি নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা করুণা নিঃশেষিত হইয়া যায়। যে সিদ্ধ বৃদ্ধ ধর্মকারের মহিমায় আপনাকে মগ্নিত করেন, তিনি জীবের উদ্ধার সাধনে সহায় হইতে পারেন না। হায়! বাস্তব জ্ঞাত কি সমষ্টি উৎসন্ন হইবে? একের কল্যাণের জ্ঞাত কি সমগ্র মানবের কল্যাণ নিরুদ্ধ থাকিবে? এই নির্মাণের পথ আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতার পথ; ইহা অনাবৃত্ত (সাধারণ) পন্থা। রহস্য পথের পথিক বোধিসত্ত্বগণ, পরম কারুণিক বুদ্ধগণ, এই পথ পরিহার করেন। জীবের হিতার্থে দেহ বহন করা প্রথম সোপান। ছয় পরিমিতা আরম্ভ করা দ্বিতীয় সোপান। যিনি নির্মাণকারের দীনবেশে বিভূষিত হন, তাঁহাকে জীবের পরি-ত্ৰাণের জ্ঞাত আপনাত অনন্ত স্বপ্ন বিসর্জন দিতে হয়। নির্মাণের ভূমানন্দের অধিকারী হইয়া সে আনন্দ পরিবর্জন করা—ইহাই এই পথের সর্বোচ্চ শেষ সোপান। সেবার পথে ইহার উপর আর নাই। ইহাই জীবের হিতার্থে আত্মোৎসর্গকারী সর্বসিদ্ধ বুদ্ধগণের

kind unto the weal of units? Know, O, beginner, this is the open path, the way to selfish bliss, shunned by the Bodhi-sattvas of the Secret Heart, the Buddhas of compassion.

To live to benefit mankind is the first step. To practise the six glorious virtues is the second. To don Nirmankaya's humble robe is to forego eternal bliss for self, to help on man's salvation. To reach Nirvana's bliss, but to renounce it, is the supreme, the final step—the highest on renunciation's path. Know, O, disciple this is the secret path, selected by the Buddhas of perfection, who sacrificed the self to weaker selves.”

ঘনোদীত রহস্য পথ” (পন্থা, ৩য় ভাগ, ২য় সংখ্যা)।

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, জীবমুক্তির পরে কি কি দুইটা পথ আছে। একটি নির্মাণের পথ (Path of Emancipation) আর একটি সেবার পথ (Path of Renunciation)। “নির্মাণের পথ অনন্ত সুখময়। সে পথের পথিককে জরাজন্মযুগান্ত নখর সংসারে আর পদার্পণ করিতে হয় না। তিনি জগতের দুঃখ দহনের অতীত হইয়া কণ্ঠচক্রে নিপীড়িত জীবমণ্ডলীর সম্পর্ক হারা হইয়া, একান্তে নিশ্চিন্তে ভূমানন্দ অমৃতব করেন। কিন্তু যিনি সেবার পথের পথিক, যিনি জীবের হিতব্রত উত্তাপন করিতে উত্তত, যিনি সংসারের হৃদয় দুঃখভার নিঃসৃতকৈবল্য করিতে প্রস্তুত, যিনি হৃদয়ব্যাপী করুণার বশে অসংখ্য জীবের দুঃখের তুলনায় নিজের ক্ষুদ্র স্বপ্ন তুচ্ছ করিতে বদ্ধপথিকর, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সংসারে গতাগতি করিবার জ্ঞাত দেহবন্ধ স্বীকার করিতে হয়। আর জীবকে নানা দুঃখের অক্লুশ তাড়নায় নিপীড়িত দেহিয়া করুণাবসে আত্ম হইতে হয়। তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, যত দিন একটি জীবও সংসারজালে নিবদ্ধ থাকিবে, তত দিন আমি নির্মাণের স্বপ্ন তুচ্ছ করিব; যত দিন জগতে একটি প্রাণীরও উদ্ধৃষ্ণাস প্রবাহিত হইবে, একটি জীবেরও শুকনেত্রে অশ্রুবারি বিগলিত হইবে, তত দিন আমি মহিমামগ্নিত মুক্তির পথের পথিক হইব না।” *

এই দুইটা পথের মধ্যে সেবার পথই শ্রেষ্ঠ। বৌদ্ধধর্মে সেবার পথের বিশেষ প্রশংসা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল সাধক *

* পন্থা, ৩য় ভাগ, ২য় সংখ্যা।

লিঙ্গ হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহা-
দিগকে প্রথম হইতেই সাবধান করিয়া দেওয়া
হয় যেন তাঁহারা নির্বাণের পথ ত্যাগ করিয়া
সেবার পথ গ্রহণ করেন, আধ্যাত্মিক স্বার্থ-
পরতা ত্যাগ করিয়া যেন হৃৎকাতরক্তিষ্ট
জীবের জন্য নিজকে উৎসর্গ করিতে শিক্ষা
করেন। Voice of the Silence নামক
পুস্তকে এইরূপই উল্লিখিত হইয়াছে। *

কল্লকল্লাস্তর শরিয়্য ঐহার্য এইরূপে
নির্বাণকে তুচ্ছ করিয়া সেবার পথে ব্রতী
হইয়া থাকেন, তাঁহারাই পর-নির্বাণের অধি-
কারী হইয়া থাকেন। মহাপরনির্বাণের
অবস্থা ইহা অপেক্ষা উচ্চতর। না জানি
সেই অবস্থা পাইতে সাধককে আরও কত
সাধনা করিতে হয় ?

কৌরুদিগের মতে নির্বানী বুদ্ধদিগকে
“প্রত্যেক বুদ্ধ” বলে। “প্রত্যেক বুদ্ধ” নিম্না-
বাচক শব্দ; ঐহার্য জীবের হৃৎখে উদাসীন
হইয়া সেবার পথ পরিহার করিয়া, নির্বাণের
ভ্রমানে মগ্ন থাকেন, তাঁহাদিগকে “প্রত্যেক-
বুদ্ধ” বলে। হিন্দুধর্মে সেবার পথ সম্বন্ধে
এত পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই। স্থানে
স্থানে কেবল মাত্র ইঙ্গিত করা হইয়াছে।
জৈমিনি-মীমাংসাদর্শনের মতে সত্য সত্যই
কাহারও মুক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই।
কিন্তু অপর কোন কোন দার্শনিক এইরূপ
মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, একটী জীব বদ্ধ
থাকিতে অপর জীব মুক্ত হইতে পারে না।

* The open way, no sooner hast thou
reached its goal will lead thee to reject the
Bodhisattvic body, and make thee enter
the thrice glorious state of Dharmakaya
which is oblivion of the world and men
for ever.

The secret way leads also to Paranir-
vanic bliss—but at the close of Kalpas
without number; Nirvanas gained and
lost from boundless pity and compassion
for the world of deluded mortals.

স্বষ্টির আদি হইতে আজ পর্যন্ত কেহ মুক্ত
হন নাই। ব্যাগ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি কেহই
নহেন। তাঁহাদিগকে বদ্ধজীবগণের অনু-
রোধে অপেক্ষা করিতে হইতেছে। ঐ সকল
দার্শনিকগণের মত এইরূপ যে আত্মা এক
অখণ্ড বস্তু, উহার কোন অংশ যদি মায়া
দাগ থাকে, তাহা হইলে অপর অংশ কেমন
করিয়া মুক্ত পদবাচ্য হইবে? যখন একে-
বারে মায়া দাগ মুছিয়া যাইবে, যখন সমস্ত
জীব মুক্ত হইবে, তখনই জীবমুক্তগণ মুক্ত
নামের অধিকারী হইবেন। শরীরের এক
অংশ রোগগ্রস্ত থাকিলে তাহাকে সুস্থ বলা
যায় না। ফল কথা, নির্বাণ মুক্তি অতীব
দুর্লভ, “ভুকোমুক্তঃ প্রহ্লাদো বা”, উহা
কাহারও ঘটনাছে কি না, সংশয় স্থল।
সামুদ্রা, সালোক্য, সাক্ষ্য ও সাক্ষি প্রভৃতি
মুক্তি আপেক্ষিক মাত্র। উহাতে পুনরা-
বৃত্তি হইয়া থাকে।

হিন্দুধর্মের ভিতর অধুনা সেবার পথ যেন
চাপা পড়িয়া গিয়াছে। সকলের মুক্তির
উপরই ঝোঁক দৃষ্টি হয়। কিন্তু এই সেবার
পথ চাপা পড়িয়া যাইলেও স্থানে স্থানে ইহার
আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মসূত্রে
আমরা নিম্নলিখিত সূত্রটী দেখিতে পাই;
যথা—“ধাবদধিকারম্ অবস্থিত্যিমাধি কারি-
কাণাম্”। (৩৩৩২)—অর্থাৎ, অধিকারী
পুরুষগণ অধিকার সমাপ্তি পর্যন্ত অবস্থান
করেন। এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য এই-
রূপ লিখিয়াছেন—“ব্রহ্মবিদ্যামপি যেষাংচিৎ
ইতিহাসপুরাণয়োঃ দেহান্তরোৎপত্তি দর্শনাৎ।
তথাহি অপান্তরতমানাম বেদাচার্য্যোঃ পুরা-
ণ্যিঃ বিষ্ণুনিরোগাণ্য কলি দ্বাপরয়োঃ সঙ্কৌ
কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সংবভূবোতি স্মরণং। বশিষ্ঠশ্চ
ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রঃ সন্ নিমিষীপাদংগত

পূর্বদেহঃ পুনর্জন্মাদেশাৎ মিত্রাবরুণাভ্যাং সম-
ভূবেতি । ভূবাদীনাং অপিত্রক্ৰমএব মানসানাং
পুত্রাণাং স্বাক্ষেণ যজ্ঞে পুনরুৎপত্তিঃ স্মর্যতে ।
সনৎকুমারোহপি ব্রহ্মণএব মানসঃ পুত্রঃ স্বয়ং
রুদ্রায় বরপ্রদানাং স্বন্দত্বেন প্রাপ্তব্রহ্মণ । এব-
মেব দক্ষ নারদ প্রভৃতীনাং ভূয়সী দেহান্তরোৎ
পত্তিকথা তেন তেন নিমিত্তেন ভবতি । ***
এবমপাস্তুরতমঃ প্রভৃত্যোপি ঈশ্বরপরমে-
শ্বরেণ তেষু তেষু অধিকারেষু নিযুক্তা সমস্তঃ
সত্যপি সমাগু দর্শনে কৈবল্য হেতৌ অক্ষীত
কৰ্ম্মাণে যাবদধিকারমবতিষ্ঠতে । তদবসানে চ
অপবুধ্যন্তে ।”

অর্থাৎ, ইতিহাস পুরাণাদিতে দেখা যায়
যে, কোন কোন ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ (জীবমুক্ত)
দেহান্তর স্বীকার করেন । যেমন অপাস্তুর-
তমা নামে জনৈক পুরাতন বেদাচার্য্য ঋষি
ভগবান বিষ্ণুর নিয়োগে কলিধাপরের সন্ধি
সময়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়নবাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া-
ছিলেন । বশিষ্ঠ একজন ঋষি, তিনি ব্রহ্মার
মানস পুত্র, তিনিও নিমি রাজার শাপে গত-
দেহ হইয়া ব্রহ্মার আদেশে পুনর্বার মিত্রাব-
রুণ দ্বারা পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছিলেন ।
ব্রহ্মার মানস পুত্র ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ
বরুণের যজ্ঞে আবার উৎপন্ন হইয়াছিলেন ।
এইরূপ দক্ষ নারদ প্রভৃতির ভ্রাতৃত্বঃ দেহা-
ন্তর গ্রহণ শুনা যায় । ব্রহ্মার অপর মানস
পুত্র সনৎকুমার, তিনিও রুদ্রের বর উপলক্ষে
কার্ত্তিকেয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।
এমতে অপাস্তুরতমা প্রভৃতি ঈশ্বরগণ পরমে-
শ্বরের নিয়োগে বিশেষ বিশেষ অধিকারের
ভার গ্রহণ করিয়া নির্বাণ সাধুক কৈবল্য
লব্ধেও অধিকার সমাপ্তি পর্য্যন্ত কৰ্ম্মনিষ্ঠ
হইয়া অবস্থান করেন ; অধিকার শেষ হইলে
পরে নির্বাণ প্রাপ্ত হন । “এইরূপ অধিকারী

পুরুষের উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেবর্ষি নারদ । বই
মৃগযুক্তর পূর্বে নারদ অপূর্ব সাধনা বলে
নির্বাণ লাভের যোগ্যতা লাভ করেন । কিন্তু
তিনি জগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া
অতল নির্বাণ সাগরে নিমগ্ন হইতে সম্মত হন
নাই । সেইজন্ত আমরা দেখি যে, যদিও তিনি
দেব-ঋষি এবং স্বভাবতঃ মানবের সহিত
সম্পর্কহীন, তথাপি জীবের প্রতি অপার
করুণার বশবর্তী হইয়া তিনি জগন্ময় নিম্নত
হরিনামামৃতের উৎস খুলিয়া দিতেছেন ; আর
যেখানে যে সাধক আন্তরিক চেষ্টা সম্বন্ধে
সাধনপথে বিঘ্ন বিপত্তি অনুভব করিতেছেন,
নারদ বিধিমতে তাঁহার সাধন পথ সুগম
করিয়া দিবার জন্ত প্রয়াস পাইতেছেন ।
পঞ্চমবর্ষীয় অনাথ শিশুকে কে পদ্মপলাশ-
লোচন হরির সন্ধান বলিয়া দিয়াছিল ?
জননী-জঠর-স্থিত ভক্তাবতার প্রফ্লাদকে কে
ঈজের বজ্রাঘাত হইতে বাঁচাইয়াছিল ?
অধিকারী পুরুষ নির্বাণপরাশ্রুত দেবর্ষি
নারদ ।”

“অধিকারী পুরুষের অপর দৃষ্টান্ত মনু, *
সপ্তর্ষি প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায় । বিষ্ণু
পুরাণের ২য় অংশে কোন্ কোন্ মন্বন্তরে
কে কে মনু, সপ্তর্ষি প্রভৃতি হইবেন বা হইয়া-
ছিলেন, তাহার বিবরণ আছে । এ বিবরণ
অলৌক উপাখ্যান নহে । প্রত্যেক মনু ও
সপ্তর্ষিগণ পুরাকল্পের জীবমুক্ত সিদ্ধ পুরুষ ।

* মনুর সহিত অপর ১২ জন ধর্ম্মপাত্র প্রকা-
শক ঋষির নাম উল্লেখযোগ্য । যথা,—“মযত্রি
বিষ্ণুহারাতি বাজবল্যোমনহঙ্গিরা যম্মাপত্ত্বসম্বর্তঃ
কাতারনবহংপতী । পরাশর বাস কথ্য লিখিতা
দক্ষগোতমৌ শাতপো বশিষ্ঠশ্চধর্ম্মশাস্ত্র প্রমোজকঃ ।”
ইহারা সকলেই ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রকাশক ঋষি । ইহারা
সকলেই অধিকারী পুরুষ । লেখক ।

তাহারা স্বেচ্ছায় নির্মাণ তুচ্ছ করিয়া ভগবানের নিয়োগে জগৎ কার্যের ভিন্ন ভিন্ন ভার গ্রহণ করিয়া বিভ্রম আছেন ।”

“মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে এইরূপ একটি মহাপুরুষের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে । তিনি পরে সার্বণি মনু হইয়াছিলেন । ইনিই অষ্টম মনু । ঋষ্যোচিব মনুষ্যের (কোন পুরাকল্পে, বাহার বিবরণ আমরা কিছু জানি না) ইনি সুরথ নামে রাজা ছিলেন । কিরূপে কোন সাধনা বলে এবং কি উপায়ে মহামায়ার অর্চনা করিয়া তিনি সিদ্ধি লাভ করেন, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে তাহারই বর্ণনা আছে । তাহা পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে সুরথের এক বৈশ্ব বন্ধু তাহারই অমৃত সাধন প্রণালী অবলম্বন করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন এবং নিম্ন শ্রেণীর সাধক বলিয়া নির্মাণের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই । কিন্তু সাধক প্রবর সুরথ নির্মাণের ভূমানন্দ অরত করিয়াও ভবিষ্য মনুষ্যের মনুর অধিকাররূপ গুরুভার বহন করিবার জন্ত কাল প্রতীক্ষা করেন ।”

“আরও উচ্চ শ্রেণীর অধিকারী পুরুষ ইন্দ্রাদি দেবরাজগণ সৃষ্টি সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের পরিদর্শন রূপ অধিকার গ্রহণ করিয়া, পরমেশ্বরের নির্দেশ অনুসারে অবস্থান করিতেছেন । বিষ্ণুপুরাণ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, কল্পে কল্পে অধিকারী দেবতার পরিবর্তন হয় ; অর্থাৎ এ কল্পে যিনি ইন্দ্রের অধিকারে নিযুক্ত আছেন, কল্পান্তে তাহার অধিকার পরিসমাপ্তি হইলে, অপর একজন ইন্দ্রের ভার বহন করিতে নিযুক্ত হন । এইরূপ অগ্নি, যম, বরুণ প্রভৃতি অস্তিত্ব দেবগণের সম্বন্ধেও ঘটে ।”

“কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে বৈদিক

দেবতার গুণময় ভগবানের এক একটা গুণের কল্পিত মূর্তি ভিন্ন আর কিছুই নহেন । তাহাদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই । তাহারাই যে ঈশ্বরের প্রতিনিধি রূপে বিশ্বাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ পরিচালন করিতেছেন, একথা অনেকে অবগত নহেন । কিন্তু সত্য সত্যই দেবতার অধিকারী মুক্ত পুরুষ । অর্থাৎ মানব সাধকের মধ্যে কেহ কেহ যেমন জীবমুক্তি লাভ করিয়াও, মনু সপ্তর্ষি প্রভৃতির অধিকারে আপনাদিগকে নিযুক্ত করেন, সেইরূপ দেব সাধকের মধ্যেও কোন কোন দেবতা নির্মাণকে তুচ্ছ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অধিকারের ভার স্বীকার দ্বারা জগদীশ্বরের সহায়তার নিযুক্ত থাকেন । সাংখ্যসূত্রে “উপাসা বা মুক্তস্ত” এইরূপ একটি সূত্র আছে । সাংখ্যকারের মতে বৈদিক সূত্র দ্বারা ঈহাদের উপাসনা করা হইয়াছে, তাহারাই ঈশ্বর নহেন, মুক্ত পুরুষ ; অর্থাৎ সাধনার ফলে দেবতার পদবীতে উন্নত নির্মাণতুচ্ছকারী জীবমুক্ত মহাপুরুষ । ইহারাই বৌদ্ধ ধর্মোক্ত পরম কারুণিক সর্বসিদ্ধ বুদ্ধগণ, ঈহারাই জগতের হিতার্থে কল্প কল্পান্তর নির্মাণ-সুখ পরিহার করিয়া জীবের কল্যাণের জন্ত আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন ।” *

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা অবগত হইলাম যে, ঈহারাই নির্মাণে স্তব্ধ তুচ্ছ করিয়া সেবার পথে অগ্রসর হন, তাহারাই অধিকারী পুরুষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন । এই সকল অধিকারী পুরুষগণ নির্মাণকার্যের দীনবেসে সজ্জিত হন । ইহাদের সংবিৎ জীবমুক্ত ধর্মকার্যের সংবিৎ অপেক্ষা প্রশস্ত । ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পর-নির্মাণ এবং অপরে মহা-পরনির্মাণের অধিকারী হইয়া

থাকেন। অধিকারী পুরুষগণের মধ্যে দক্ষ নারদ প্রভৃতি অপেক্ষা মনু, মণ্ডারি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ এবং মনু, মণ্ডারি অপেক্ষা ইন্দ্রাদি দেব-রাজগণ শ্রেষ্ঠ—এইরূপে আমরা ক্রমোচ্চ-বিধানে সংবিতের প্রসারণ দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকি।

নির্মাণকারের দীন বেশে সজ্জিত, পরম কারুণিক সর্বসিদ্ধ বুদ্ধগণই অধিকারীগণের ভিতর শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই সকল অধিকারী পুরুষ-গণের ভিতর যিনি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর হইবার প্রয়াস করিয়া থাকেন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ভার নিজ মস্তকে বহন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত,—তিনি চাহেন যে সৃষ্টি, স্থিতি ও নয়ের সম্পূর্ণ অধিকার গ্রহণ করিবেন। এইরূপ প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে কত অধিকারী মহাপুরুষগণ ঈশ্বর হইবার প্রয়াস করিয়া থাকেন। ইহাদেরই সন্তা বিশ্বব্যাপী, ইহারা সকলে বিভূ এবং সকলেই বৈভবস্ব্যাপূর্ণ স্বতন্ত্র ঈশ্বর। ইহাদের মধ্যে যিনি সাধনার বলে সকলের অপেক্ষা অগ্রসর হইয়া থাকেন, তিনিই বিরাট পুরুষের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কলান্তরে তিনিই বিরাট পুরুষ হইয়া থাকেন। অতঃপর সকলে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা তাঁহাদের সংবিতের কেন্দ্র অক্ষর রাখেন। বিশ্বের পালন জন্য তাঁহারা সময়ে সময়ে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ইহাদিগকেই বিষ্ণুর লীলাবতার বলে। যদিও তাঁহারা বিরাট পুরুষে লীন হইয়া তাঁহার সহিত ঐক্য ভাব ধারণ করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা আছে। যেমন অসংখ্য কোষাণুর (cells) সমষ্টিতে জীব-দেহ নির্মিত হইলেও কোষাণু সকলের স্বতন্ত্রতা আছে, অর্থাৎ কোষাণুর সমষ্টি

জীবের একটি মহান সংবিৎ বহন করিলেও প্রত্যেক কোষাণুর যেমন ব্যক্তিগত এক একটি পৃথক সংবিৎ থাকে, সেই প্রকার উক্ত জীবন্ত মহাপুরুষগণ যখন ভগবানে নিমজ্জিত হইয়া ভগবানের ঐশ্বরিক সংবিতের সহিত এক হইয়াছেন, তখন কোষাণুর জ্ঞান তাঁহাদের পৃথক অস্তিত্ব থাকে। যেমন সুস্থ দেহের প্রত্যেক কোষাণু নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাভাবিক অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেহের পুষ্টি ও পরি-পতির জন্য আত্মসমর্পণ করে, সেইরূপ পূর্বোক্ত অধিকারী পুরুষগণ নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব ও স্বাভাবিক অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সর্বতোভাবে বিরাট পুরুষে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন। যখন বিশ্বের পালনের প্রয়োজন হয়, তখন তাঁহারা অবতার রূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যতপি তাঁহারা এ ব্রহ্মাণ্ডে বিরাট পুরুষ হইতে সক্ষম হন নাই, অতঃপর ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহারা বিরাট পুরুষ হইবেন।

আমরা এক্ষণে মুক্তির পূর্বে সাধকের অবস্থা জীবন্তুতির পরে অধিকারী পুরুষগণের অবস্থা এবং মুক্তি কাহাকে বলে, তাহা অব-গত হইলাম। কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য যে, ঐহিক সংবিৎ গতিপার হইয়া এতদূর বিস্তার হইয়াছে, তিনি আবার কেমন করিয়া সেই মুক্ত সংবিতকে গতির ভিতর আবদ্ধ করিয়া নিজেকে অবতার রূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই সম্বন্ধে পণ্ডিত সুবারাও (Subba Rao) মহাত্মার তের দুইটি শ্লোকে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছেন। সেই দুইটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে পারিলেই পূর্বোক্ত প্রশ্নের সহজতর পাওয়া যাইবে। প্রথমতঃ রাম অবতারকে লওয়া বাউক। রাম যদি ভগবানের অবতারই হন, তাহা হইলে সাধারণ জীবের জ্ঞান তাঁহার আর পুনর্জন্ম

হইবে না, স্মৃতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার আর কোন শরীর থাকিবে না, তিনি পূর্বে যে সচ্চিদানন্দময় ভগবান ছিলেন, পরে সেই ভগবানই হইবেন । কিন্তু আমরা সেইরূপ দেখিতে পাই না । মহাভারতে লোকপাল সভাখ্যানপর্বে নারদ যখন যমরাজের সভার বর্ণনা করিতেছেন, সেখানে তিনি বলিয়াছেন যে, অস্ত্রাশ্র রাজাদের সহিত দাশরথি রামও তথায় উপস্থিত ছিলেন ।

“রামো দাশরথিশ্চৈব লক্ষণোহথ প্রতর্দনঃ ।

অলকঃ কক্ষসেনশ্চ গম্যো গৌরশ্চ এব চ ॥”

(সভা—লোকপাল—৯—১৮)

কিন্তু আমরা রামায়ণে দেখিতে পাই যে, মৃত্যুকালে রামচন্দ্র “বিশেষ বৈষ্ণবং তেজঃ সশরীরঃ মহামুজঃ”—অর্থাৎ ভ্রাতৃগণের সহিত সশরীরঃ তাঁহার বৈষ্ণবতাজে প্রবেশ করিলেন । এবং তৎপরে তিনি “বিষ্ণুময় দেব” রূপ পাইলেন (রামায়ণ—উত্তর—১২৩—১২১৩) । যদি তিনি সেই বিষ্ণু অথবা Logosএ মিলিত হইলেন, তবে যমরাজের সভায় আবার আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই কেন ? নীলকণ্ঠ তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন—“রাম লক্ষণয়োবিষ্ণুশোষণরূপেণ স্বস্থান স্থরোপপি প্রতিমারূপেণ উপাসকামুগ্রহার্থং অজ্ঞাবস্থানং বেধ্যম্ ।” অর্থাৎ উপাসককে অমুগ্রহ করিবার জন্ত তিনি প্রতিমারূপে এখানে বর্তমান ছিলেন ।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণ সযজ্ঞেও আমরা এইরূপ দেখিতে পাই । মহাভারতের অন্তর্গত মৌষল গর্কে চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্যাধ কর্তৃক নিষ্কিপ্ত শরের দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছিল, তখন তিনি—“দুহুর্জাং রোদসী ব্যাপ্যলক্ষ্য”—আকাশ

স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ‘সেখানে দেবতারা তাঁহাকে কথোচিত বন্দনা করিলে পর, তিনি তাঁহার স্বকীয় অগ্রমের স্থান প্রাপ্ত হইলেন—“স্থানং প্রাপ স্বং মহাত্মাহ প্রমেরম্” (মৌষল ১৪২৬) । কিন্তু আমরা আবার স্বর্গারোহণ পর্বে দেখিতে পাই যে, মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির যখন স্বর্গে গমন করেন, তখন—“দদর্শ তত্র গোবিন্দং ব্রাহ্মণে • বপুষা-স্থিতং । তেনৈব দৃষ্টপূর্বেন সাদৃশ্যেনৈব স্মৃতিম্ ॥” (স্বর্গারোহণ—৪—২)—অর্থাৎ সেখানে তিনি দেখিলেন যে ভগবান বাসুদেব ব্রহ্মার আরাধ্য দেহ ধারণ করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পূর্বদৃষ্ট আকৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই ।

এখন আমরা এক সমস্তার পড়িলাম । রাম অথবা কৃষ্ণ যদি মর্ত্যলোক ত্যাগ করিয়া স্বকীয় ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা যে বিরাট পুরুষ হইতে উদ্ভূত হইয়া অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, মৃত্যুর পর যদি সেই বিরাট পুরুষেই পুনর্নির্মজ্জিত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতিমা অথবা মূর্তি আমরা কেমন করিয়া যথাক্রমে যমলোকে এবং স্বর্গলোকে দেখিতে পাই ? এই সমস্তার যবনিকা উন্মোচন করিতে পারিলেই অবতারের প্রণালী অবগত হওয়া যাইবে ।

মহাভারত ও পুরাণাদি পাঠে আমরা এই সমস্তা নিরাকরণের কিঞ্চিৎ আলোক পাইয়া থাকি । আমরা মহাভারতের নিম্নলিখিত স্থানসমূহে দেখিতে পাই যে, অর্জুন ও কৃষ্ণ নরনারায়ণ ঋষি ছিলেন ;—

(১) আদিপর্ব ১২ অধ্যায় ৬ শ্লোক,

(২) বনপর্ব ১২ = ৪৬ -

(৩) ঐ ৩৬ = ৩৩ -

(৪) ঐ ৪০ = ১ -

(৫) ঐ ৪৭ = ২ -

* “ব্রাহ্মণ ব্রহ্মণ আরাধ্যেন”—নীলকণ্ঠ ।

পূর্বেরই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এমন কি রামায়ণেরও নিম্নলিখিত স্থানে অর্জুন ও কৃষ্ণ যে নরনারায়ণ ঋষি ছিলেন, তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা,—

(৬) উত্তরকাণ্ড—৬৩ অধ্যায়, ২০ শ্লোক।

স্বপ্নপূরণেও ঐ কথা বলা হইয়াছে। যথা “ধর্মপুত্রৌ হরেরংশৌ নর-নারায়ণাভিধৌ।

চন্দ্রবংশমহাপ্রাপ্য জাতোকৃষ্ণাঙ্কনাবুভৌ।”

অর্থাৎ হরির যে অংশব্দ নারায়ণ ও নর নামে অভিহিত হইয়া ধর্মের পুত্ররূপে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারাই চন্দ্রবংশ প্রাপ্ত হইয়া, কৃষ্ণ ও অর্জুনরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ভাগবত পুরাণেও (৪, ১৪৯ ও ১০৬৯:১৬) পূর্বোক্ত নরনারায়ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্বোক্ত স্থানগুলির আলোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, কৃষ্ণ নারায়ণ নামক একজন পুরাতন বিখ্যাত ঋষি ছিলেন। তিনি অমৃত বৎসর উগ্র তপস্তা করিয়াছিলেন। তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাতে বিষ্ণু তেজ পরিপূর্ণ ছিল।

যিনি ভগবানের ভক্ত হন, তিনি ভগবানকে সকলই অর্পণ করিয়া থাকেন। নারায়ণ ঋষি উগ্র তপস্তার দ্বারা তাঁহার উপাধি সকলকে এমন পবিত্র করিয়াছিলেন যে, ভগবান যখন শ্রীকৃষ্ণ রূপে অবতরণ করিয়াছিলেন, তখন নারায়ণ ঋষির উপাধি সকলকে উপযুক্ত বোধে আশ্রয় করিয়াছিলেন। নারায়ণ ঋষির উপাধি সকল, ভগবানের বৈষ্ণব তেজ প্রকাশের উপযুক্ত আধার হইয়াছিল।

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা দুইটি বিষয় পাইতেছি। প্রথম যিনি অবতার হন, তিনি জন্মজন্মান্তরে বহু তপস্তা করিয়া ভগবানে নিমজ্জিত হন। এইজন্য শ্রীমতী বেণাট বলিয়াছেন যে “Fundamentally he is

“the result of evolution”—অর্থাৎ অবতার ক্রমবিকাশের ফল। কিন্তু ইহার ভিতর কিঞ্চিৎ গূঢ় রহস্য আছে। মনুষ্যই যদি ক্রমবিকশিত হইয়া অবতার হন, তাহা হইলে তাঁহাকে মনুষ্য না বলিয়া অবতার বলি কেন? ইহার উত্তরে জীব গোস্বামী তাঁহার “কৃষ্ণ সন্দর্ভে” বলিয়াছেন যে, ভগবান মনুষ্যত্ব অঙ্গীকার করেন বটে, কিন্তু উহা অপ্রসিদ্ধ মনুষ্যত্ব, উহা মানব-পুরুষত্ব, অর্থাৎ তিনি পুরুষ বটে, কিন্তু প্রাকৃতত্ব-রাহত। তিনি তখন আমাদের মতন সাধারণ মনুষ্য নহেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতরণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাতে আর নারায়ণ ঋষির ব্যক্তিত্ব ছিল না—নারায়ণ ঋষি তখন ব্রহ্মে নিমজ্জিত—যিনি অবতরণ করিলেন, তিনি বৈষ্ণব তেজ-রূপী স্বয়ং ভগবান নারায়ণ ঋষির উপাধিরূপ আধার লইয়া আসিলেন।

এই স্থলেই আমরা আবেশ ও অবতারের ভিতর পার্থক্য পাইতেছি। যাহারা আবিষ্ট হন, তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব থাকে, তাঁহাদের পৃথক সত্তা থাকে; কিন্তু ঐ পৃথক সত্তা সঙ্কেত, ভগবানের ঐশ্বরিক সত্তার আবেশ হইয়া থাকে। এইজন্য যখন ঐ ঐশ্বরিক সত্তার বিরোধান হয়, তখন উহা পূর্বে যে ব্যক্তির সত্তা ছিল, সেই ব্যক্তির সত্তাই থাকে। কিন্তু অবতারের আর পৃথক ব্যক্তিত্ব থাকে না। তিনি অপ্রসিদ্ধ মনুষ্য। তাঁহার ব্যক্তিত্ব অপ্রাকৃত ও ঈশ্বরত্বময়। কিন্তু ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁহার মূল-প্রকৃতি বৈষ্ণবী মায়াতে সঙ্কচিত করিয়া অর্থাৎ অবিজ্ঞান অধীনতা স্বীকার না করিয়া অবতরণ করেন। অবতার অবিজ্ঞানে গ্রহণ করিয়া কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন, কিন্তু অবিজ্ঞা গ্রহণ কর্তৃক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে

পারে না। এইজন্ত অবতরণ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ^{*} বলিয়াছেন যে,—

“অজ্ঞানপিসঙ্গবায়াদ্যা ভূতানামীশ্বরোহপিসন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাস্বামায়দা ॥”

গীতা—৪-৬।

অর্থাৎ আমি জন্মরহিত হইয়াও এবং বিনাশ-বিহীন সকল ভূতের ঈশ্বর হইয়াও স্বকীয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া নিজ মায়া দ্বারা আবর্তিত হই। *

এখন দেখা যাউক, আমরা কেমন করিয়া ভগবানকে নারায়ণ ঋষি বলিতে পারি। একটা সাধারণ উদাহরণ হইতে ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। যখন কোন ব্যক্তি ভূতাবিষ্ট হয়, তখন সে অনেক প্রকার আশ্চর্য্য কথা বলিয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ লোক যদি ঐ ব্যক্তি ভূতাবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া অবগত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার বলিবে যে, ঐ ব্যক্তিই কত আশ্চর্য্য কথা বলিতেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি উক্ত ব্যাপার অবগত আছে, সে বলিবে যে ঐ ব্যক্তি বলিতেছে না, ভূতে ঐ সকল কথা বলিতেছে। অবতার সম্বন্ধেও ঐরূপ হইয়া থাকে। যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি আর নারায়ণ ঋষি নহেন, তিনি অজ, অবায়, ঈশ্বর; কিন্তু নারায়ণ ঋষির উপাধি সকলকে আধার করিয়াছেন বলিয়া, লোকে বলিবে যে তিনি নারায়ণ ঋষি ভিন্ন আর কেহ নহেন। এই জন্ত সাধারণতঃ বলা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ ঋষি ছিলেন। এই জন্ত বৈষ্ণবেরা বলেন ‘যে, অবতারের দেহ “প্রাতিভাসিক দেহ” মাত্র; তিনি “মায়ামাহুসবিগ্রহ।”

* এখানে অনেকে “স্বাম্ প্রকৃতিং” অর্থে “দেবী প্রকৃতিং” অর্থাৎ জীব অর্থ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ, ভগবান্ আজমাতা দ্বারা জীব অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন।

“আবেশে” হইয়া পৃথক সত্তার অস্তিত্ব থাকে—এক ঐশ্বরিক সত্তায় অস্তিত্ব এবং যিনি আবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার ব্যক্তিত্ব। কিন্তু বাহারা অবতার বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের কেবল একটা সত্তার অস্তিত্ব থাকে—তাঁহারা স্বয়ং ভগবান্।

মূলভাবে দেখিতে গেলে অবতারকে ক্রমবিকাশের ফল বলিতে হয়। তিনি যখন বিরাট পুরুষে নিমজ্জিত হন, তখন তাঁহার সংবিতের কেন্দ্র সকল (Centers) অক্ষুণ্ণ রাখেন—জগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন না। যখন অবতরণ করেন, তখন এই সকল কেন্দ্র ধরিয়া কিরিয়া আসিয়া উপাধি গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হন। কিন্তু হৃদয় ভাবে দেখিতে গেলে আমরা বলিতে বাধ্য যে, যিনি অবতীর্ণ হন, তিনি স্বয়ং ভগবান্, অপরের উপাধি লইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন মাত্র। সেই জন্ত শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীরামচন্দ্র বাঁহাদের উপাধি আশ্রয় করিয়াছিলেন, মর্ত্যলোক ত্যাগ করিবার সময় তাঁহাদের উপাধি সকল উচ্চতর লোকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই হেতু শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পরও তাঁহার ব্রাহ্মদেহ আমরা স্বর্গলোকে এবং শ্রীরামচন্দ্রের তিরোধানের পরও তাঁহার দেহ যমলোকে দেখিতে পাই। এই সকল দেহকে শাস্ত্র “প্রাতিভাসিক দেহ” বলিয়াছেন।

ভগবান্ কি প্রকারে অবতরণ করেন, তাহার প্রণালী অবধারণ করা গেল। জগতের পালনের জন্ত ভগবান্ যে সময় সময় নির্মাণকার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা আমরা “কুহুমাজ্জলিতে” দেখিতে পাই। পাতঞ্জলোক্ত ঈশ্বরের বর্ণনা করিয়া উদয়নাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, “ক্লেশকর্ম্মবিপাকশয়েরপরামৃষ্টো নির্মাণকার্য্য অধিষ্ঠায় সম্প্রদায়প্রত্যোভকেহু-

গ্রাহকশ্চেতি*। অর্থাৎ তিনি ক্লেশ, কৰ্ম, বিপাক এবং আশ্রয় দ্বারা স্পৃষ্ট বা সযত্ন নহেন, তিনি নির্দোষকার্য * অধিষ্ঠান করিয়া বেদের প্রকাশক হন এবং ষট, পট ইত্যাদি কর্তব্য বিষয়ে তিনি অমুগ্রাহক বা শিক্ষক

রূপে গণ্য হইয়া থাকেন। যখন কোন বিশেষ কার্যের সাধনের প্রয়োজন হয়, তখন তিনি অবতারণ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআত্তোষ দেব।

পুরাতত্ত্ব।*

প্রাচীনকালে অনেক জাতি এই পৃথিবীতে সভ্যতা বিস্তার করিয়া কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কেহ বা আপনাদের জ্ঞান গরিমার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, কাহারও বা কোনই চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে না। গ্রীশ যুগ, তবুও বর্তমান সভ্যতা আপন দর্শন ও কলা বিজ্ঞার বুদ্ধিরে তাহাকে জীবিত রাখিয়াছে। রোম*আজ কোথায়? তবুও রোমের দান অগ্রাহ্য করিয়া বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা দাঁড়াইতে পারে না। অল্পাংশ প্রাচীন সভ্যতা কে কি করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখন অতীতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তবে পুরাতত্ত্ববিদগণ আজকাল মিসর ও আসিরিয়া সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অক্লান্তভাবে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন, তাহাতে মনে হয়, শীঘ্র উক্ত সভ্যতা সকলের ছাপও বর্তমান সভ্যতার গায়ে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। এ কথা ঠিক যে, সভ্যতা-মঞ্চের কে কত উজ্জ্বল উঠিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর, এবিষয়ে ভারতবাসী-গণ স্বয়ং অসময়ে ভারতের পক্ষ হইতে যে দাবী করিয়া বসেন, তাহা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়।

একথা বলা বাহুল্য যে, শত বর্ষের পুরাতন প্রাচ্যতত্ত্বের উপর যে দাবী প্রতিষ্ঠিত, তাহা আজ গৃহীত হইতে পারে না। আজ কাল নিত্য নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে, দশ বছরের পুরাতন কথাও আজ গ্রাহ্য নহে, একপস্থলে এ বিষয়ে কোন মত দেওয়া কত কষ্টসাধ্য, তাহা সহজেই অনুমেয়। মূল কথা, ভারত সম্বন্ধে পুরাতন প্রাচ্যতত্ত্ববিদগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, বর্তমান সময়ের পরিণতগণের গবেষণায় তাহা ভ্রান্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং প্রত্নতত্ত্ববিদগণের নব নব আবিষ্কারের আলোকে ভারতের একচেটিয়া দাবী অনুমোদনীয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তাহার সিদ্ধান্ত স্করিয়ান্নে যে, সভ্যতার পূর্ণতা ও উচ্চতার বিচারে ভারত ও গ্রীশ সমস্থানীয়। যদি বর্তমান সভ্যতার উপরে প্রভাবের কথা আনা যায়, তবে গ্রীশের দাবী সর্বগ্রাণ্য। কেন না, বর্তমান সভ্য জগতের উপর ভারতের যদি কোন প্রভাব থাকে, তবে তাহা পরোক্ষ এবং তাহার নির্ণয় অসম্ভব সাপেক্ষ। কিন্তু গ্রীশের হাত প্রত্যক্ষ ও সর্ববাদীসম্মত। তবে ভারতীয় সভ্যতা যে একদিন জাতিভেদ, মালমূল্য ও বৈষম্য-
* জ্যৈষ্ঠ মাসের 'দেবালয়ে' প্রকাশিত ভারত-বহিমা-পাঠে উদ্ধৃত।

* "নির্দোষকার্য" অর্থে দীক্ষাকার হরিদাস ভট্টাচার্য। "নির্দোষার্থঃ কার্যঃ" অর্থাৎ নির্দোষের জন্য শরীর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু "নির্দোষকার্যের" যে বিশেষ অর্থ আছে, তাহা আমরা পূর্বে অবগত হইরাছি।

দীর্ঘ জাতি সকলের উপর আপনাদের প্রভাব ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। আর যদি প্রাচীনতার কথা ধরা যায়, তবে তো ভারতের দাবী একেবারেই টিকিবে না। মিসর, আসিরিয়া, বেবিলোন প্রভৃতি ভারত অপেক্ষা বহুপ্রাচীন, ইহা সর্ববাদীসম্মত। কেহ কেহ ভারতীয় সভ্যতাকে গ্রীশ ও ইজিপ্ট অপেক্ষা প্রাচীন বলেন, কিন্তু এ বিষয়ে বহু মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে চীনকে ভারতের পূর্ববর্তী বলা যায়। অণচ একেবারে বিধিশূন্য হইয়া রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, চীন সভ্যতার মূল বুদ্ধধর্ম। যে জাতি খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে কংফুচের মত জ্ঞানীর জন্ম দান করিয়াছিল, সেই জাতি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মের প্রসাদে বুদ্ধিবৃত্তি সকল মার্জিত করিয়া সভ্যতা পাইয়াছিল বলাও যা, আর ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবাসী বিলাতি কাপড় পরিত বলিয়া ইংরাজাধম্বনের পূর্বে তাহারা উলঙ্গ ছিল বলাও তা। চীন ভারতের দ্বারা অসংস্কৃত হইয়া কংফুচের অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞানী আর কল্পজন উৎপন্ন করিয়াছে? রামপ্রাণ বাবু নির্দিষ্টারে একটি কথা ধরিয়া লইয়াছেন, সেটি এই—ভারতীয় সভ্যতা সর্বপ্রাচীন ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তার পর তিনি যে যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝান যায়। সিংহ ভারতে জন্মে। মিসরেও সিংহ দেখা যায়। উভয়েরই ঘাড়ের কেশর আছে। এ সাদৃশ্য কখনও দৈবাব্দীন নহে। মিসরীয় সিংহ যে ভারতীয় সিংহ হইতে উৎপন্ন, তাহা প্রমাণও করা যায়। আমাদের বোসের সার্কাস পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের সঙ্গে সিংহ আছে। এক কথা কিছু-

তেই বিবাস করা যায় না যে, তাহারা আপনাদের কৌশল প্রদর্শনের জন্য আলেকজান্দ্রিয়ার মত সহরে যান নাই। তাহাদেরই খাঁচা হইতে একজোড়া সিংহ জঙ্গলে গিয়া বংশবৃদ্ধি করিয়াছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে প্রমাণ হইল, আফ্রিকার সিংহ ভারতীয় সিংহবংশোৎপন্ন।

ম্যাক্সমুলার বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষেই মানব জাতির মানসিক বৃত্তি সমূহের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। এবং একথাও জানা গিয়াছে যে, ভারতের সঙ্গে এসি-রিয়ান জাতির বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল। সুতরাং প্রমাণ হইল, কি ধর্ম, কি সমাজ, কি বিজ্ঞা সর্ববিধেই এসি-রিয়ান জাতি ভারতবাসীর নিকট ঋণী। ইহারই নাম “মুখস্থ চোটাং” ॥ বাণিজ্য সম্বন্ধ থাকিলেই কি ঐ সব আদান প্রদান অবশ্য-জ্ঞাবী? এমন অনেক দেশ আছে, যার সঙ্গে ভারতের কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য চলিতেছে, কিন্তু ধর্ম সমাজ ও বিজ্ঞা সম্বন্ধে এক পয়সারও ঋণের আদান প্রদান চলিতেছে বলিয়া তো মনে হয় না। পূর্বেই বলিয়াছি, এসি-রিয়ান সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার পূর্ববর্তী, এরূপ স্থানে প্রদান না হইয়া আদানের সম্ভাবনাই বেশী। তারপর, ভারতের পূর্ণাঙ্গ সভ্যতাটা এক দিনে স্বর্ণ হইতে প্রস্তুত হইয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হয় নাই। ভারতেও সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে। সুতরাং ভারতে যখন পূর্ণবিকাশ সাধিত হইয়াছিল, তখন এসি-রিয়ান সভ্যতার অবস্থা কি? তাহার তখন অস্ত্রের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা ছিল কি না? এ সব বিষয়ের তথ্য নির্ণয় না করিয়া নিঃসন্দেহে এক ভরফা ডিক্রির নির্দেশটা নিতান্তই ভাড়াভাড়া হইয়া পড়িয়াছে। তারপর

গ্রীক দর্শন মধ্যকৈ একিথা বলা যায় যে, তর্কের
খাতিরে শিখাগেরিস্, প্লেটো বা নিউপ্লেট-
নিক মতের উপর হিন্দু দর্শনের প্রভাব
স্বীকার করিয়া লইলেও, এ সিদ্ধান্ত একটা
অপ সিদ্ধান্ত যে গ্রীক দর্শন হিন্দুদর্শনের
নিকট ঋণী। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা
আশ্চর্যের কথা নহে, না থাকিলেই বরং
আশ্চর্যের কথা হইত। কেন না, উভয়েই
মানব চিন্তার রূপ, তার উপর উভয়েই আর্ধ্য-
শাখা। শক্তি বিভিন্নতা সত্ত্বেও মানব প্রকৃতি
মূলতঃ এক। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা
যায় যে, মানব সমাজের বিকাশের বিশেষ
বিশেষ স্তরে, দেশ কালের ব্যবধান সত্ত্বেও,
বিভিন্ন দেশে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও স্বাধীন
ভাবেই, কেবল সত্য নহে, একই কুসংস্কার
আসিয়া হাজির হয়। সুতরাং বাহ্যিক
সাদৃশ্য ঋণ সাব্যস্ত করে না। বরং গ্রীক ও
হিন্দু দর্শনের উৎপত্তি, বিকাশ ও
প্রকৃতি এমন বিভিন্ন মার্গাবলম্বী যে, যদি
আমি গায়ের জোরে বলি, একটা অল্পটা
হইতে গৃহীত, তবে ইহাই প্রমাণ হয়,
আমি হিন্দু দর্শন জানি না, না হয় গ্রীক
দর্শনের ধার ধারি না, অথবা উভয়
সম্বন্ধেই অনভিজ্ঞ।

জাতি সকলের মধ্যে যে আদান প্রদান
হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা কোন্ চক্ষুমান
ব্যক্তি স্বীকার করিতে পারে? তবে
নবীন জাতিই যে কেবল প্রাচীন জাতির
নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে, তাহা নহে,
উন্টা ব্যবস্থাও হয়। এমন কি, উচ্চতর জাতিও
নিম্নতর জাতির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ
করে। ভারতীয় আর্ধ্যগণ কি এ দেশের
আদিম অধিবাসী দ্রাবিড়দিগের নিকট ঋণ
গ্রহণ করেন নাই? বৌদ্ধধর্মের ছাপ গ্রীক-

ধর্মের গায়ে আছে, তাই বলিয়া কি গ্রীক-
ধর্মের ঋণ ভারতীয় বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে
নাই? ভারত হইতে যেমন বৌদ্ধধর্ম চীনে
গিয়াছিল, তেমনি চীন হইতেও বহু জিনিষ
ভারতে আসিয়াছে—উনিয়াছি ঘ টাটা পর্যন্ত।
কে না জানে যে, ভারতীয় জ্যোতিষ যুবনা-
চার্য্যগণের ঋণ স্বীকৃতই রহিয়াছে। হিন্দুগণ
নক্ষত্র চক্রের আবিষ্কারী, একথা প্রমাণ হইয়া
গিয়াছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন
যে, রাশিচক্র বিদেশ হইতে গৃহীত হই-
য়াছে। ফলিত জ্যোতিষ নাকি একে-
বারেই ধার করা। সব জিনিষই ক্রমে ক্রমে
বিকশিত হইয়া পূর্ণাঙ্গ হয়। ভারতের
সর্বপ্রথম নাটক পূর্ণাঙ্গ। 'যবনিকা' কথাটা
এই ঋণেরই দলিল হইয়া রহিয়াছে। এই
যে সেদিন পেশোয়ারে বুদ্ধদেবের ভয়ানক
পাওয়া গিয়াছে, তাহা যে বৃহৎ কোটার
রক্ষিত, সেই কোটার গায়ে এক গ্রীক
শিল্পীর নাম পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতগণ
বহুদিন হইতেই অনুমান করিয়াছেন যে,
ভারতীয় স্থপতি ও ভাস্কর শিল্পের উপর
গ্রীকের প্রভাব রহিয়াছে। এতদিন অগ্নীহার
করিলেও এখন আর সে ঋণ অস্বীকার
করিবার পথ রহিল না। যাহা হউক, সব
সময়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া না গেলেও
এ কথা বলা যায়, তাহারা বৌদ্ধধর্মরূপ বিরাট
পাহাড়কে চেলিয়া সাক্ষ্য দেশের বাহির করিয়া
ছিল, তাহারা যে বিদেশের ঋণ বেমা-
লুন হজম করিবার শক্তি রাখেন না, তাহা
নহে। স্বদেশ-প্রীতি উত্তম। কিন্তু সত্য
আরও উত্তম। অসত্য-প্রতিষ্ঠা, বৃথা দস্ত
স্বদেশের কল্যাণ করিতে পারবে না। আরও
অন্ধকার বাড়াইবে।

এই আলোচনায় একটা কথা স্মরণ •

দ্বাধিতে হইবে। আৰ্য্যসভ্যতা ও ভারতীয় সভ্যতা এক নহে। ভারতবর্ষ আৰ্য্যগণের আদিম নিবাস নহে, উপনিবেশ মাত্র। তাঁহারা যখন ভারতে প্রবেশ করেন, তখন অসভ্য বর্বর ছিলেন না, সঙ্গে একটা সভ্যতা লইয়া আসিয়াছিলেন। সে সভ্যতার উপর ভারতের একচেটিয়া দাবী নাই। তাহার উচ্চতা কত, তাহাও নির্ণয় করা দুক্লহ। তাহা যত বড় বা যত ছোট হউক না কেন, তাহার উপর হিন্দুর সহিত জাতিগত গ্রীক ও পারসিক-গণের সমান দাবী। তিলক মহাশয় বলিতে-ছেন, আৰ্য্যগণ স্মেরু প্রদেশ হইতে আসিয়া-ছেন। খ্রীষ্ট পূর্ব দশ হাজার বৎসর পূর্বে তাঁহারা সেস্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেখান হইতে পঞ্চদশ প্রদেশে তাঁহারা ট্রেনে করিয়া হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হন নাই। মধ্যস্থিত এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে তাঁহারা আরও কত উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। আধি-ভৌতিক ও আধিদৈবিক দোরায়ে সব ছাড়িয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের এক শাখা এই ভারত সমুদ্রে আসিয়া ঠেকিয়াছেন। ইহার মধ্যে কত শত জাতির সহিত সাক্ষাৎ ও আদান প্রদান হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা, বোধ হয়, মানব সাধ্যের অতীত। সুতরাং ভারতীয় সভ্যতার কাল নির্ণয় ভারতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ সাপেক্ষ। ঋগ্বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থে যে জ্যোতিষিক প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে আৰ্য্য সভ্যতার কাল নির্ণীত হইতে পারে, ভারতের নহে। কেন না, তিলক মহাশয় প্রমাণ করিতেছেন যে, ঋগ্বেদে আৰ্য্যগণের স্মেরু প্রদেশে অবস্থানের কথাও আছে। ঋগ্বেদে এমন সব প্রাকৃতিক ঘটনার বর্ণনা আছে, যাঁহা ভারতের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। যেমন,

আকাশ মার্গে গ্রহ-নন্দ্রগণের পরিভ্রমণ বিষয়ক বর্ণনার আছে যে, ইন্দ্রদেব সমস্ত আকাশকে ছাতার জ্যার নগোপরি স্থাপন করিয়া ঘুরাইতেছেন। মাহুঘের মস্তকোপরি জ্যোতিষ্কগণের এইরূপে ভ্রমণ করিবার অভিজ্ঞতা, স্মেরু প্রদেশে অবস্থিতি না করিলে, প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জী বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের গ্রহ সন্নিবেশ গণনা করিয়া ভারতীয় সভ্যতার কাল নির্ণীত হইবে না। প্রমাণ চাই হাতে কলমে, প্রমাণ চাই খনকের সাহায্যে। অস্ত্রান্ত্র দেশে—মিসর বা আসিরিয়ায় এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ সে সব সভ্যতাকে খ্রীষ্ট পূর্ব ৫০০০-১০০০ হাজার শতাব্দীতে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু এ দেশের স্থপতি ভাস্করগণ কি প্রমাণ দিতেছেন? ভারতের মূল্যতত্ত্ব বা শিল্পের ভগ্নাবশেষ কিছুতেই এপর্যন্ত আমাদিগকে বোদ্ধব্যুগের ওপারে লইয়া যাইতে সক্ষম হয় নাই। একরূপ স্থলে ভারতবর্ষটাকে ঠেলিয়া লইয়া মানব সভ্যতার আদিতে স্থাপন করার চেষ্টা নিতান্তই পণ্ডপ্রম। একরূপ দাবীর দ্বারা অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত হিন্দু শ্রোতা বা পাঠকের নিকট সহজে করতালি লাভ হইলেও স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট উপহাস ছাড়া অস্ত্র কোনও লাভের সম্ভাবনা নাই।

শেষ কথা এই, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের অগ্নিসংস্থান, আবহাওয়া, ভূমি ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলির বিচিত্রতার যেমন, মূলতঃ এক হইলেও, বিভিন্ন প্রকার ধর্ম সমাজ ও বিভিন্ন আবির্ভাব অবশ্রুতাবী; তেমনই, আবার দেশের দূরত্ব থাকিলেও, ঐ সকলের একতায় মানব সমাজের বিকাশে সাদৃশ্যও অপরিহার্য। ইহা না বুঝিয়া

জগতের মান-চিত্র স্থানার উপর গৈরিক মাটি
আগাগোড়া লেপিয়া দিবার বাসনা যেমন
অনৈতিহাসিক, • তেমনিই অস্বাভাবিক।
ভারত মঙ্গোলীয়, দ্রাবিড়ীয় ও মালয় জাতি
সকলের উপকার সাধন করিয়াছেন, সন্দেহ
নাই। প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ
ভাবে প্রতীচ্য জগৎকেও স্বীয় জ্ঞানালোকে
প্রভাবিত করিয়াছেন, তাহাও সর্ববাদী-
সম্মত। কিন্তু ইহাতেই তাহার সমস্ত শক্তি
নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই। ভারত মাতার
বক্ষে এখনও বহুমূল্য নৈতিক ও অধ্যাত্মিক
সম্পদ লুক্কায়িত রহিয়াছে, বাহা না পাইলে
জগতের উদ্ধার নাই। তাহা বিশ্ব মানবকে

দিতে হইলে আমাদেরকে দাতৃত্বের পদবী
লাভ করিতে হইবে। ধর্মের পৌত্তলিকতা,
সমাজের জাতিভেদ এবং সর্বোপরি রাজ-
নৈতিক সর্বদ্রোণী অবসাদ হইতে মুক্তি লাভ
করিয়া দাতার আসন গ্রহণ করা আমাদের
সর্বোপরি প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, ভারত
ইতিপূর্বে জগৎকে বাহা দিরাছে, তাহা
অপেক্ষাও উচ্চতর, মহত্তর, অধিকতর মূল্য-
বান্ সামগ্রী দেয় রহিয়াছে। কিন্তু তাহা
সম্যক উপলব্ধি করিয়া কার্য্য পরিণত করি-
বার পথে—এই মহত্বদেয় সাধন করিবার
পথে আমাদের প্রাচীন গৌরবের মিথ্যা
আত্মস্তম্বিতাই সর্ব প্রধান অন্তরায়।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

বাণ ও শোণিতপুর।

১। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে জ্যোত্বের
নব্যভারতে প্রকাশিত "বাণ ও শোণিতপুর"
শীর্ষক প্রবন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন যে,
"মহর্ষি বেদব্যাস, মহাভারতের প্রধান নারিক
পঞ্চপাণ্ডব-পত্নী দ্রৌপদীও একদা মনে মনে
কর্ণের প্রতি অভিলাষিনী হইয়াছিলেন বলিয়া
উল্লেখ করিয়াছেন।" বেদব্যাস কোথায়
এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, উমেশ বাবু তাহা
নির্দেশ করেন নাই। সুতরাং সাহস করিয়া
আমরা তাহার প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ করিতে
পারিলাম না। কেন না, মহাভারত অকুল
সমুদ্র, ইহার কোন্ গর্ভে, কোন্ অমূল্য রত্ন
লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা এক
জনের সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহাতে আবার
মহাভারতে দশ হস্তের কারুগিরি রহিয়াছে।
সুতরাং কেহ কোন স্থলে এরূপ এক কথা
বে বসাইয়া দিতে না পারেন, তাহা একে-
বারে অসম্ভব নহে। তবে উক্তরূপ কোন

কারুগিরি যে ব্রহ্মবাদিনী দ্রৌপদীর চরিত্রের
সঙ্গে সঙ্গত হইবে না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা
যাইতে পারে। যে কবি, স্বরস্বর স্থলে কর্ণ
লক্ষ্যভেদ করিতে উদ্বৃত্ত হইলে, দ্রৌপদীর দ্বারা
বলাইয়া লইয়াছেন "আমি স্তম্ভপুত্রকে বিবাহ
করিব না" এবং এরূপ কার্য্য করিতে যাইয়া
যে মনস্বিনী রমণী সেই বিরাট স্বরস্বর স্থলে
স্বামী নির্বাচনে স্বীয় স্বাধীনতা বজায়
রাখার জন্ত পিতা ও ভ্রাতার অপেক্ষাও
করেন নাই, তাঁহাকে যদি বেদব্যাস আবার
একদা সেই কর্ণেরই অভিলাষিনী করিয়া
গড়িয়া থাকেন, তবে তাহা বেদব্যাসের
লেখনীর উপযুক্ত হইবে না, আমরা এই মাত্র
বলিতে পারি। আমরা তো জানি, "উহা
কাশিরামের কারুদাজি এবং বঙ্গভাষানভিজ্ঞ
কেহ দ্রৌপদীর এই কলঙ্কের কথা অবগত
নহেন। উমেশ বাবু আমাদের এ সন্দেহ
দূর করিবেন কি?"

২। উমেশ বাবু উষার সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের কোনই ওজর নাই। কেন না, সকলেরই স্বাধীন মত পোষণ করিবার অধিকার আছে। তবে তাহার মত পুরাণকার ও পৌরাণিকগণ সমর্থন করিবেন কি না সন্দেহ। হরিবংশে দেখিতে পাওয়া যায়, সাম্বীর্ণ মধ্যে গণ্য হইতে পারিবেন না বলিয়া উষা নিজেই কত আক্ষেপ করিতেছেন—

কথমেবং কৃত্য নাম কত্যা জীবিতুম্‌সহে ॥

কুলোপকোশনকরী কুলাঙ্গারী নিরাশ্রয়া।

জীবিতম্পৃহয়েন্নারী সাধবী নামগ্রতঃ স্থিতা ॥

৩। উমেশ বাবু বাণরাজা ও শোণিত-পুরের ইতিহাস নির্ধারণ করিতে প্রয়াস পাঠিয়াছেন। পুরাণ হইতে ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইলে প্রথমে একটা মহা সমস্তার পূরণ প্রয়োজন। পুরাণে যে সমস্ত আখ্যানিকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার কতকগুলির মূলে যে ঐতিহাসিক ঘটনা বিদ্যমান, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কতকগুলির মূল যে রূপক তাহাও তো অস্বীকার করিবার গো নাই। এই রূপক আবার কতকগুলি জ্যোতিষিক—যেমন দক্ষযজ্ঞ; আবার কতকগুলি আধ্যাত্মিক—যেমন চণ্ডীকাব্য। আর কতকগুলি আবার প্রাকৃতিক—যেমন বৃত্রবধ। আমরা তো জানিতাম, উষাহরণ একটা সূর্য্য সম্বন্ধীয় রূপক—solar myth. সহস্রবাহু বাণকুমারী উষা, আর সহস্র কিরণ রবিতনয়া উষা; দিবা আগমনে সে উষার তিরোধানই উষাহরণ। পৌরাণিক গল্পের উষাহরণ নাম খাটে না, কেন না, অনিরুদ্ধই বাণালয়ে আগমন করিয়াছিলেন, তাহাকেই হরণ করিয়া আনি হইয়াছিল, উষাকে তো কেহ হরণ করে নাই। কিন্তু দিনের আগমনে রবিক্রান্ত

উষা বাস্তবিকই অপহৃত হইলেন, তাহাকে কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। কোথা দিয়া অলঙ্কিতে চাঁদায়ায়—ইহাই তো হরণ। আবার দিন তো অনিরুদ্ধই বটে—তাহাকে কে রোধ করিবে—দিনকে তো কেহই ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। অনিরুদ্ধ দিন আসিলেই উষা অপহৃত হইলেন। শোণিতপুর তো সূর্য্যরশ্মিরই উপমা “অবাকুসুম সঙ্কাশম্”। তবে স্থান সম্বন্ধীয় জনপ্রবাদ অবশ্যই বিচার্য্য। কিন্তু উমেশ বাবু নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন যে, দুইটা স্থান উষাকে দাবী করিতেছে। এই বিভিন্ন দাবী ইতিহাসের পরিপন্থী। সকলেই পুরাণের ঘটনার সঙ্গে স্বীয় স্বীয় জন্ম-স্থানকে সংযুক্ত করিতে যান বলিয়া এই বিরুদ্ধ দাবী উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। কথা এই, এমন কি পৌরাণিক সম্ভব ও অসম্ভব ঘটনা আছে, যাহাও সঙ্গে জনপ্রবাদ কোনও না কোনও স্থানকে জড়াইতেছে না? বৃন্দাবনের কথা ছাড়িয়া দি, যেখানে পুরাণ বর্ণিত কৃষ্ণ-লীলার এমন অতি ক্ষুদ্রতম ঘটনাও নাই, যাহার সঙ্গে কোনও স্থানের সংযোগ দেখান যাইবে না। এখন পর্য্যন্তও লোকে সন্ধ্যা বেলা ফুলগায়া বিছাইয়া সকালে দলিত ফুল দেখিয়া মনে করে যে, রাধাকৃষ্ণ রাত্রিকালে এখানে বিহার করিয়াছেন। এমন কি, কৃষ্ণ মাখন খাইয়া কোথায় হাত মুছিয়াছিলেন, সেই মন্টন স্থান পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে স্থান বিশেষে এমন সুড়ঙ্গ আছে, যাহা দেখাইয়া বলা হয়, এই রাত্তায় শুনুমান একসঙ্গে কালী ও একসঙ্গে রাম লক্ষ্মণকে লইয়া মহিরাবণের পাতালপুরী হইতে উঠিয়াছিলেন এবং পার্শ্ববর্তী এক মন্দিরে সেই কালী আজও বিরাজ করিতেছেন! অথচ রামায়ণে মহিরাবণের নাম দৃষ্টও নাই।

কালীপূজার প্রাচীনত্ব ও মাহাত্ম্য কীর্তনের
জন্তই এ জনপ্রবাদের সৃষ্টি। সারদীর দুর্গোৎসবকে
তো জনপ্রবাদের শ্রীরামচন্দ্রের ঘাড়
চাপাইয়াছে, এমন কি, বিজয়ার কোলাকুলি

পর্যন্ত। কিন্তু রামায়ণে কিছুই নাই।
সুতরাং আমরা মনে করি না যে জনপ্রবাদের
আছে বলিয়া “এ সমস্তই অলৌকিক, একরূপ মনে
করা অসাধ্য।” শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

স্বদেশ প্রেম (৪)

সামাজিক।

৪র্থ অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

স্তান কেদার বাবুর শয়ন ঘর। কাল
রাত্রি। (কেদার বাবু ও তাঁহার স্ত্রী আসীন)।

কেদার বাবুর স্ত্রী। বিয়ে না দিলে
মেয়ে ত আর ঘরে রাখা যায় না।

কেদার বাবু। বিয়ের চেষ্টা ত সাধ্যমত
কচ্ছি।

স্ত্রী। লোকে যে বুড়ুই নিলে কচ্ছে।
আর কিছু কাল বিয়ে না হলে, না জানি
আরও কি কথা বলবে!

কেদার। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে)
সকলই ভগবানের হাত। বড় মেয়েটার বিয়ে
দিতে যে পৈতৃক বিষয় টুকু ছিল, তা বেচেছি।
এখন আছে এই ভদ্রাসন বাড়ী।

স্ত্রী। ভদ্রাসন বাড়ী আছে বলে বসে
থাকলে কি হবে?

• কেদার বাবু। আমি কি বসে আছি।
বাড়ী বন্ধক দিয়ে টাকা কর্জ নেবার জন্ত
আজ বোসের বাড়ী গিছিলাম। তারা বলেছে,
বাড়ী বাধা রেখে ১৫০০ দেড় হাজার টাকা
দেবে।

স্ত্রী। আর পাঁচ শ টাকা? দু হাজার
টাকা না হলেত হবে না। তাদেরইত নগদ
১৫০০ দেড় হাজার টাকা গুণে দিতে হবে।

কেদার বাবু। তাই ত ভাবছি।
আমায়ত আর কিছু নেই। তাত তুমি জান।
তবে বিক্রী করে দু হাজার টাকা পাওয়া
যায়।

স্ত্রী। বিক্রী কর্কে? বাড়ী বিক্রী
কর্লে— আমরা দাঁড়াব কোথায়?

কেদার। ধর, কর্জ নিলাম। শোধ
দেব কেমন কোরে? যা আয় আছে,
তাতে ত দুবেলা খাওয়াই হচ্ছে না।

স্ত্রী। কথাত সত্যি। উপায় কি?

কেদার। (দীর্ঘনিশ্বাস) উপায় বেচে
কিনে পথের ফকীর হওয়া। আমি একটা
টুকনি নেব, তুমি একটা টুকনি নিও,
স্বনীতির (মেয়ের) বিয়ে দিয়ে হুজনে
ঘারে ঘারে ভিক্ষা কর্কে। আর রক্তশোষক
পাত্র-পঞ্চদিপের গুণগান কর্কে।

স্ত্রী। তোমার হাতে পড়ে আমার তাই
হবে (ক্রন্দন) (অঁচল দিয়ে চোখ মুছিতে
মুছিতে) তুমি ধীরেন (ছেলে)কে বিয়ে
কর্কে, আর একবার, বল না কেন?
সে এন্ট্রান্স পাস দিয়েছে, রামস্বায় বাবু ত
বলছে, হাজার টাকা নগদ দেবে। কাল
কেনারাম বাবুর লোক এসেছিল, সে বলেছে
কেনারাম বাবুর মেয়ের সঙ্গে যদি ধীরেনের
বিয়ে দেও, তা হলে কেনারাম বাবু আড়াই
হাজার টাকা নগদ দেবেন। ঐ আড়াই
হাজার টাকা পেলে স্বনীতির বিয়ে দিয়ে
৫০০ টাকা আমাদের হাতে থাকবে। বাড়ী
বাধা দিতে হবে না।

কেদার। তুমি ধীরেনকে আর এক-
বার বুঝিয়া দেখো।

স্ত্রী। আমি অনেক বুঝিয়েছি। সে যে
কি গো ধরেছে! কি একটা দলে মিশেছে!
পোড়ারমুখো বিগুজ্ঞান নু না বিগুজ্ঞান নু তারে
কাণে কি মন্ত্র দিয়েছে, আমার কথা সে
আর মোটেই শোনে না। তুমি পুরুষ

মাগ্নুষ, তুমি যদি তাকে জোর কোরে বল, সে কি তোমার অবাধ্য হ'তে পারে ?

কেদার । জোর করলে (রামধন বাবুর ছেলে) বিজয়ের মত হবে; ধীরেন বাড়ী থেকে চলে যাবে। দেখছে সব ছেলেগুলো এখন কি রকম হচ্ছে। হাজার কষ্ট হলেও, এমন কি মর্ন্তে হলেও, ছেলেরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। আমি জেনেছি দু মাস হলো, তোমার ছেলে ধীরেন 'দেব-ভবনে' প্রতিজ্ঞা করেছে 'টাকা নিয়ে বিয়ে করো না'।

জী । কি ? দিবির করেছে, টাকা নিয়ে বিয়ে করো না ? ওমা ! টাকা কিনা বাড়ীতে উসলে পড়ছে। ভারি বড় মাগ্নুষের ছেলে। বিজয় জমিদারের ছেলে। সে টাকা না নিয়ে বিয়ে কর্তে পারে। আচ্ছা বিজয়ের সঙ্গে সুনীতির বিয়ের প্রস্তাবটা তুমি রামধন বাবুর কাছে আর একবার করে দেখলে হয় না ?

কেদার । নিরর্থক। কেবল অপমান। পাছে বিজয়কে আমি বিয়ের কথা বলি, তাই আমাকে তার বাড়ীর মাষ্টারি পর্য্যন্ত ছাড়িয়ে দিয়েছেন। আর দ্বারবানকে বলে দিয়েছেন "কেদার বাবুকে এ বাড়ীতে আসতে দিবে না"। কি অপমান ! কি লাজনা। অপরাধ আমার মেয়ে হয়েছে !

জী । অপমান বললে কি হবে ? যখন মেয়ে হয়েছে, তখন আর মান অপমান কি ? রামধন বাবুও গঙ্গার ধারে রোজ বেড়াতে যান, সেখানে কাল পায়ে জড়িয়ে ধরো—আর আমি ধীরেনকে বলবো, তুমি যদি কেনারাম বাবুর মেয়েকে বিয়ে না করো, আমি আত্মহত্যা করোঁ। আরও একটা মতলব আছে। তোমার ঘটেও বুদ্ধি নেই, কাজে আমাকে সব মতলব কর্তে হচ্ছে। তুমি এখন একটু বাহিরে বসগে—

(কেদার বাবুর প্রস্থান)

জী । সুনীতি, সুনীতি ?

(নেপথ্যে) ঠা, সুনীতির প্রবেশ।

জী । ওন মা তোমাকে আমি একটা কথা বলি। তোমার এখন জ্ঞান হয়েছে।

লজ্জা কর্তে চলেবে না, পড়েছোত মহাভারতে শাস্ত্র কথা,—

অনুচা কুমারী যদি হয় শূভ্রমতী।

উভয়ত সপ্তকুল হয় অধোগতি ॥

কুলেতে কলঙ্ক হয় সংসারেতে লাজ।

এ কারণে কত্তা দিতে না করিবে ব্যাজ ॥

তাই বলি, তোমার বাবা যেন শোনেন না।

সুনীতি কাণে কাণে কি বলিলেন, সুনীতি মাথা হেট করিল।

জী । মা লক্ষ্মী, কথা শোন, তোমারই ভাল হবে।

সুনীতি । মুখ নীচু করিয়া মাথা নাড়িল।

২য় দৃশ্য ।

স্থান ।

কেদার বাবুর বাটার অপরাধকক্ষ।

(সুনীতি একাকিনী বসিয়া)

সুনীতি । (স্বগতঃ) হা ভগবান ! কেন আমি জন্মেছিলাম ! আমি কি হতভাগিনী ! আমার জন্ম চতুর্দিকে বিপদ ও অপমান। মা আমাকে যা বলেছেন, তা আমি পারোঁ না। সে কত দিনকার কথা—তিনি—জ্ঞানি তিনি দেবতা। না আমার দ্বারা তা হবে না। কিন্তু এ দিকে এই হতভাগিনীর বিয়ের জন্ত বাবা রামধন বাবুর পায়ে পড়বেন,—দাদাকে টাকা নিয়ে বিয়ে কর্তে জেদ করলে, তিনি হয়ত বাড়ী ছেড়ে চলে যাবেন। মা হয়ত আত্মহত্যা করবেন। অথবা বাড়ী বাধা পড়ে বিক্রিয়ে যাবে—বাবা, মা ও দাদা আশ্রয়হীন হবেন—কি করি, সহজ উপায়, আমি আত্মহত্যা করোঁই ত সব চুকে যায়। আত্মহত্যা পাপ, নরকে যেতে হবে। যে দেশে মেয়ের বিবাহে এত লাজনা, সে দেশে কুমারীদের জন্ত কেন সন্ন্যাসিনী-মঠ নাই—দাদাকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করোঁ—আমাদের দেশে সন্ন্যাসিনীর মঠ আছে কিনা। যদি সন্ন্যাসিনীর মঠ না থাকে, বাড়ীতে সন্ন্যাসিনী কুমারী হয়ে থাকলে কি দোষ আছে ? লোকে পাগল বলবে—বলুক। কালকে থেকে আমি গেক্কা বসন

পন্নো, চুল বাঁধবো না, এক সন্ধ্যা আহার করো, আর জপ তপ করো। আর দাদা, মা ও বাবার সেবা করো। আর ভগবানের আরাধনা করো—(চক্ষু মুদ্রা)।

স্বঃ। (চক্ষু খুলিয়া) কাল কেন? আজই গেরুয়া বসন পরে দেখি না কেন, কেমন হয়।

(প্রস্থান ও কিছুকাল পরে তরুণী তাপসীর বেশে পুনঃ প্রবেশ। বাতায়ন পথে দণ্ডায়মান) (স্বগত) সন্ন্যাসিনী হয়ে চলে যাই না কেন? এই রাত্রিতে বড়ই অন্ধকার, একলা—ভা হোক, কিন্তু কুলের যে কলঙ্ক, লোকেত সন্ন্যাসিনী ভাববে না। মিছা হলেও কুলের কলঙ্ক আমার দ্বারা হবে না।

(ধীরেন্দ্রের প্রবেশ)

ধীরেন্দ্র। সুনীতি! সুনীতি।

(চমকিয়া) দাদা?

ধীরেন্দ্র। ও কি, ও বেশ কেন?

সুনীতি। কিছু নয়। সখ করে পরেছি।

ধীরেন্দ্র। এ সখ কেন সুনীতি?

সুনীতি। এ সখ কেন? তুমি কি সব জাননা, দাদা আমি বিয়ে করোঁ না। আমি ঘরে তাপসী হয়ে থাকবো।

ধীরেন্দ্র। সুনীতি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। বিজয় যদি তোমাকে গোপনে বিবাহ করে, তাতে তুমি রাজি আছ—গোপনে বিয়ে করোঁ কিন্তু তার বাবা তাকে, বোধ হয়, কিছু বিষয় দেবেন না।

সুনীতি। (লজ্জার মুখ লাল) আমার জন্তে তিনি অতুল ঐশ্বর্য ত্যাগ করে পথের ভিখারী হবেন—না? আমি যেখানেই যাব, সেখানেই কি অমঙ্গল? তা হবে না। (স্বগত) —হৃদয় শান্ত হও। যা হবার নয় তা কেন ভাবছো? না, দাদা। আমি তাতে রাজি নহি, আমি গৃহে তাপসী কুমারী হয়ে থাকবো।

ধীরেন্দ্র। হি! ও কথা বলা না।

সুনীতি। (কাঁদিতে কাঁদিতে) তুমি কি শোনোনি, আমার জন্ত কাল দ্বা বা গঙ্গার ধারে রামধন বাবুর পায়ে পড়বেন, আমার জন্ত তোমাকে হরত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্তে হবে, না হয় গৃহত্যাগী হতে হবে; আমার জন্ত মা হরত আত্মঘাতী হবেন, অথবা আমার

জন্ত এই বসতবাটা বিক্রী করে, তোমারী আশ্রয়শূন্য হয়ে পথে পথে বেড়াবে। আমার কেবল এই সব কথা মনে হচ্ছে, আর কান্না পাচ্ছে। আমার দুই পথের এক পথ। হয় আত্মহত্যা, না হয় গৃহে চিরকুমারী তাপসী হয়ে থাকা।

ধীরেন্দ্র। (সুনীতির চক্ষু মুছাইয়া) তোমার বিবাহের জন্ত, আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করোঁ—

সুনীতি। না, দাদা, তুমি যা মাকে বলছ, আমি তা শুনেছি। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করোঁ নরকগামী হতে হয়। আমার জন্ত দাদা, নরকগামী হবে? তা কোন মতেই হবে না।

ধীরেন্দ্র। হবেনাও কি হবে?

সুনীতি। হবে বা ভগবান কর্বেন।

এয় দৃশ্য।

স্থান—কৈলাসচন্দ্রের শয়ন ঘর।

কাল—রাত্রি।

কৈলাসচন্দ্র। (স্বগত) এক বৎসর হয়ে গেল বিয়ে হয়েছে। বোকে আনা হয়েছে। লোকে বলে আমার বৌ তাপসী হয়েছে। আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য—এত রূপ আমি কখনও চোখে দেখিনি। কখন স্বপনে ভাবি নাই, জীলোক এত সুন্দর হতে পারে! এমন রূপ—তার উপরে নগদ ১৫০০ টাকা। হবে না? “বিয়ে পাশ করেছি, তার ওপর একটু সম্পত্তি আছে, যদি একটা কাল মেয়ে বিয়ে কর্তাম তা হলেও ৩০০০। ৪০০০ টাকা পেতাম। যা হোক, এ বিয়েতে বার্গেন (Bargain) টা ঠকা হইনি। বাবা বার্গেনে খুব মজ্জুত। হবে না কেন, হোজের মুজ্জিদি। আমার জী শুনিছি বেশ লেখা পড়া জানে। বস্। What Bargain? Beauty plus money, plus learning. আমি বি-এ, আমার জী লেখা পড়া না জানলে কি সাজে?

উঃ আসতে এত বিলম্ব হচ্ছে কেন? ঘরের মধ্যে সেই নবোঢ়া রূপসী প্রবেশ করে। কি রূপের ডেউই উঠবে! আমি হাত ধরে

তাকে খাটে বসাব, জ্বাস্তে আস্তে তার ঘোমটা খুলবে, আমার কবিত্বময় ভাষার তাকে কত সন্তোষণ কর্ণো, তার মুখচন্দ্র চুখন কর্ণো ।

(সুনীতির প্রবেশ)

একি ! তাপসীর বেশ ? বন্ধুরা রহস্য কোরে বলতো, এক তাপসীর সঙ্গে কৈলাসের বিয়ে হবে—সত্যই তাই দেখছি । কিন্তু তাপসীর বেশে আমার জীব অপরূপ রূপলহরী আরও যেন উথলে পড়ছে—প্রিয়ে, প্রেমসী, চন্দ্রাননে, শকুন্তলাকে দেখে ছদ্মবেশে যা মনে হইছিল, আমারও তাই মনে হচ্ছে । সরসিজমগ্নবিজ্ঞ শৈবলেনাশির রম্য মলিনমপি হিমাংশোলঙ্ক লক্ষ্যো তনোতি । ইয়থথিক মনোজ্ঞা বন্ধেনাপি তদ্বা কিমিব হি মধুরানং মণ্ডনং নাকৃতীনাম ॥

বুঝলে কি ? বাজালা কোরে বলি—পদ্ম সুন্দর, সব্বাতোতাই সুন্দর, এমন কি, শৈবালের মধ্যে পদ্ম সুন্দর দেখায় । চন্দ্র সুন্দর, তাতে যে কালিমা আছে, তাতেও যেন তার শোভা বৃদ্ধি হয়েছে । শকুন্তলা সুন্দর, বকল পরে যেন তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে । ফল কথা, যাদের আকৃতি মধুর, স্বভাবতঃ যারা সুন্দর, তারা যা পরে, তাই তাদের অলংকার স্বরূপ হয়, তাতেই তাদের আরও সুন্দর দেখায় । এই গেরুয়া বসনেও তোমাকে, প্রিয়ে, তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে, আমি তা বর্ণনা কর্ত্তে পারি না । আমি বড়ই সৌভাগ্যশালী যে তোমার মত রত্ন লাভ করেছি (একদৃষ্টে নিরীক্ষণ কোরে) বোধ হচ্ছে যেন তুমি গোলাপকুসুম-সুতবক । সুন্দরি, তোমার নবযৌবন, বিকশিত কুসুমরাশির জ্ঞায়, তোমার সর্বাঙ্গ ব্যাপে রয়েছে । এস খাটের উপর বসো । তুমি আমার হৃদয়ের দেবী । আমি তোমার দাস, অমুগত ভৃত্য (হাসি) ভৃত্যকে অভয় দেও । তা হ'লে তোমার হাত ধোরে খাটে বসাই ।

(সুনীতি দূরে ওরাসনে বসিলেন)

কৈলাস । শুকি, ওখানে বসলে কেন ? তোমার স্থান আমার হৃদয়ে (উঠিয়া হাত ধরিবার উপক্রম)

তাপসী (সুনীতি) আমাকে ছোঁবেন না এখন ।

কৈলাসচন্দ্র । এখনি ও সকল কথা আর লোকে মানে না । স্পর্শ করাতে দোষ নাই ।

(তাপসী) । আপনি বুঝেন নাই । আমি যতদিন এই বেশে আপনার কাছে আসুব, ততদিন এই হতভাগিনাকে স্পর্শ করিবার আপনার অধিকার নেই ।

কৈলাস । তোমাকে স্পর্শ করার আমার অধিকার নেই ? আঁক কথা ?

তাপসী । আপনি আমার পিঠাকে ফুঁর কোরে আমাকে বিয়ে করেছেন । তিনি যে ১৫০০ টাকা দিয়েছেন, তা দিতে কাকে বাড়ী বাঁধা দিতে হইছিল । কাল খবর পেলাম যে একমাসের মধ্যে সে টাকা সুদ সমেত না দিতে পারলে বাড়ী বিক্রি হয়ে যাবে, ঢোল বাজিয়ে গিয়েছে । এই একমাসের মধ্যে ঐ টাকা ফেরত দিতে হবে ।

কৈলাস । এমন কথাত কখন শুনি নি যে বিয়ের টাকা খণ্ডরকে ফিরিয়ে দিতে হয় । An original girl ! । এক কথা তোমাকে কে শিখিয়ে দিয়েছে ? তোমার বাবা ? তোমার বাবা আচ্ছা খড়িবাজ ত ?

তাপসী । বাবা অত ছোট লোক নয় ।

কৈলাস । তোমার বাবা ছোট লোক নয়, আমিই ছোট লোক ।

তাপসী । আপনি আমার স্বামী, প্রভু । বিয়ের উপলক্ষে লোককে সর্বস্বান্ত করা, ছোট লোকের কাজ, না বড় লোকের কাজ, আমি আপনাকে তা কেমন কোরে বলবো ।

কৈলাস । বাজারে ভাল জিনিষ নিতে হলে অধিক দাম দিতে হয় । ফজলি আম, টাকায় আটটা । আর রসো দেশী আম টাকায় ১০০টা । তোমার বাবা বি-এ চেই-ছিলেন, সুতরাং দেড় হাজার টাকা দিতে হয়েছে : এফ-এ নিতেন, খুব সম্ভব ১০০০ টাকায় হত । এনট্রান্স পাশ নিতেন, পাঁচশো টাকায় হত । যেমন জিনিষ, তেমন হয় ।

তাপসী। বিবাহ কি একটা সুওনাগিরি কেনা বেচা? ধর্ম সঙ্কলন নয় কি?

কৈলাস। আমি তোমার কাছে বিবাহ সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনতে চাই নে। ও সব কাঞ্চলায় ছেড়ে দেও। আমার কাছে ও সব ফিকির খাটবে না।

তাপসী। ফিকির নয়। আমার কথা অতি স্পষ্ট। আমার বলছি, আপনি যে ১৫০০ টাকা নিয়েছেন, বতদিন সে ১৫০০ ফেরত না দেবেন, ততদিন আমাকে ছোবেন না। ততদিন আমার সঙ্গে আপনার ধর্মসঙ্কলন স্থাপন হবে না।

কৈলাস। ছি, ওরকম কথা বলা না। পাগলামি করো না। চূপ করে ঘাড় হেট কোরে থাকলে কেন—খাটের উপর এস।

তাপসী। (ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল)

কৈলাস। যদি আমি জোর করি?

তাপসী। আপনি বি-এ পাশ করেছেন, আপনি আমার উপর পশুর মত বলপ্রয়োগ করেন না।

কৈলাস। তুমি যদি আমার অবাধ্য হও, আমি পুনর্বার বিয়ে কর্তে পারি তা জান?

তাপসী। আপনি আর এক শতটা বিয়ে করুন, তাতে আমার আপত্তি নাই। আপনার তাতে লাভও হবে, প্রতিবারে দেড় হাজার টাকা পাবেন।

কৈলাস। আমি তোমাকে খত কিছু বলছি, ততই বাড়ছে?

তাপসী। কি বলবেন? কি বলবার আছে?

কৈলাস। বলবার আছে শুনবে? তোমার বিয়ের সময় যে কল বেনামি পত্র পেইছিলাম, এমন মনে হচ্ছে হয়ত তা সত্যি।

তাপসী। কি বেনামি পত্র?

কৈলাস। বিবাহের পূর্বে বিজয় নামক রামধন বাবুর পুত্রের সঙ্গে তোমার ভাব হইছিল। যে পরপুরুষকে আপনি দেখে, স্বামীকে পর দেখে, স্বামীর কাছে যেতে চায় না—

তাপসী। (ললাটে করাবাত কোরে)—

হা ভগবান! এই কথা আমার শুনতে হ'লে!—গরিবের মেয়ে টাকার অভাবে দুই এক বৎসর বিয়ে দিতে বিলম্ব হইছিল—আমার স্বামীর মুখে এই কথা—এই দারুণ বাক্য শেল—

কৈলাস। হাঁ হাঁ, আমি আরও অনেক কথা জানি। তোমার বাবা গঙ্গার ধারে রামধন বাবুর পায়ে পড়েন নি কি? তোমার দাদার সঙ্গে বিজয়ের সহিত তোমার গোপনে বিয়ে দিবার যুক্তি হইনি কি?—সব জানি গো—সব জানি—অত জারি করো না। বিজয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য তোমার বাবা ছুঁচোমির চূড়ান্ত করেছে। এখন বুঝতে পাচ্ছি, বদমায়েস বিজয় তোমাকে বিয়ে কর্কে, এই প্রলোভন দিয়ে ঘনিষ্ঠতা করোছিল—তারপর তোমাকে দূর করে দিয়েছে—আব সেই বদমায়েসটা সন্ন্যাসী বেশ নিয়ে ভগ্নানি করে বেড়াচ্ছে। ও! তাই তোমার সন্ন্যাসিনীর বেশ! বুকিছি।

তাপসী। আপনি যা খুসি বলুন, ভগবান জানেন—আট বৎসর বয়সের পর আমি বিজয় বাবুকে কখন দেখিনি। তবে তাঁর বিষয় সকলে যা বলে, তাতে আমি জানি, সত সহস্র বিত্যাধরী যদি তার পার কাছে গড়াইয়া পড়ে, তিনি একবার চেয়েও দেখেন না।

কৈলাস। শ্রী বিষ্ণু, তিনি ভীষ্মদেব।

তাপসী। তিনি ভীষ্মদেব হোন আর না হোন, তিনি বিয়েতে টাকার লোভ করেন নি। অত বড় জমিদারী, তা ছেড়ে সন্ন্যাসী হবার জন্য কাশী গিছিলেন। বাপ মা ছাড়ে না, তাই গৃহে আছেন। দেখুন, আপনি দেড় হাজার টাকার মায়া ছাড়তে পারছেন না।

কৈলাস। বিজয় আজও বি-এ পাশ করিনি। তবু তোমার চোখে আমি বিজয়ের কাছে নগণ্য, তুচ্ছ, তুই কলঙ্কিনী পানীয়সী—ফের যদি বিজয়ের কথা বলবি, জুতা মেরে তোর মুখ ছিঁড়ে দেব।

তাপসী। আমি গরিবের মেয়ে কেন জুতা মারবে না? তুমি বি-এ পাশ করেছ, আমার বাবার কাছে দেড় হাজার টাকা

নিম্নে আমাকে বিয়ে করেছে। কেন আমাকে জুতা মারবে না।

কৈলাস। বল্চি চুপ কর (হাত তুলিয়া) তা না তলে এখনি মা'র খাবি।

তাপসী। আমি দাসী, তুমি প্রভু—মার্কি না কেন? আমি অসহায় বালিকা, তুমি বলবান পুরুষ—তুমি আমাকে কেন মার্কি না। যে কাপুরুষরা বিয়েতে অর্থ শোষণ করে অগ্র পরিবারকে পথে বসাতে পারে, সে কাপুরুষরা তাদের অসহায় স্ত্রীকে নিরপরাধে মার্কি পারে।

কৈলাস। হারামজাদি, আমাকে কাপুরুষ বলি—(তাপসীর গালে জোরে চপটাঘাত) পাজি, ছুটো, বদমায়েস।

তাপসী। (হাত জোড় করিয়া) আমি স্ত্রী, আপনি স্বামী; স্ত্রীরাং আমি বদমায়েস। বাবা! আপনারা যে বসন্তবাড়ী বাঁধা দিয়ে, দেড় হাজার টাকা দিয়ে, আমার বিয়ে দিয়েছেন, দেখুন আমাকে বি-এ পাশ জামাইয়ের হাতে দিয়ে আমাকে কেমন স্ত্রী করেছেন, দেখুন সে—

কৈলাস। জুতা না হলে চুপ কর্কি নে।

তাপসী। (হাত ঘোড় করে)—এ দাসীকে আপনার যত জুতা মার্কির সাধ থাকে, আজ তা মিটিয়ে নিন, কাল এ জগতে আপনার নিকট জুতা খাবার কোন সৌক থাকবে না।

কৈলাস। (হাতে জুতা তুলিয়া) ভাল চামুত, এখনও চুপ কর।

তাপসী। হে বসুন্ধরে? বিদীর্ণ হও, তোমার উদরে আমি প্রবেশ করি—(চক্ষু মুদ্রিয়া উপর দিকে মন্তক তুলিয়া করঘোড়ে) মা দুর্গা, বঙ্গের অর্থগৃধ্রু কাপুরুষদিগকে স্মৃতি দেও—

কৈলাস। ফের “কাপুরুষ”? জুতা গ্রহণ ও তাপসীর মুচ্ছা ও পতন—

কৈলাস। যেমন কর্ম তেমন ফল, নেশামি করে পড়ে যাওয়া হ'ল। থাক ওখানে পড়ে।

(নেপথ্যে) কৈলাসের মা। কি বকাখকি হচ্ছে এতক্ষণ? আগেই বলেছিলাম, কেদার মাষ্টারের মেয়ে খ্যাপা—ব্যাপক।

কৈলাস তখন শুক্লো না। স্কন্দর মেয়ে দেখে ভুলে গেল। আমি বললাম, রাখাক্ষ বাবুর মেয়েকে বিয়ে কর, ২০০০ টাকা পাওয়া যাবে। তখন মার কথা শুনা হলো না। এখন, গুরুবাক্য না শুনায় ফল দেখুক।

৪র্থ দৃশ্য ।

স্থান—বহির্কীটা।

কাল—প্রভাত।

রামনাথ বি-এ ও তাহার পিতা রূপচাঁদ।
রূপচাঁদ। তুমি কি পাগল হয়েছ! বিয়ের টাকা তোমার স্বত্ত্বকে ফিরিয়ে দিবে?

কৈলাস। হাঁ, বাবা।

রূপচাঁদ। তোমার আইন পড়ার খরচ কোথায় পাবে?

রামনাথ বি-এ। আমি মাষ্টারি করে বি-এল দেব।

রূপচাঁদ। এ কুবুদ্ধি তোমার কেন হল? তুমি পাগল হয়েছ, আমিও আর পাগল হইনি। আমি তোমাকে ও টাকা দেব না। বিয়েতে কি আমার খরচ হই নি? তোমাকে এত দিন পড়িয়েছি—তাতে আমার টাকা খরচ হই নি? সে বার তোমার চিকিৎসাতে আমার কত টাকা খরচ হয়ে গেল। তোমাকে মানুষ কর্তে আমার দশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে।

কৈলাস। পরিবার থাকলে তা প্রতিপালন কর্তে খরচ হয়।

রূপচাঁদ। কিন্তু এই খরচের টাকা আসে কোথা থেকে? তুই এমনি কুলাঙ্গার পুত্র, ভেবেছিলাম আমি তোর বিয়ের টাকা নিয়ে বড়মানুষ হব।

কৈলাস। বাবা, আপনার কথার উত্তর দিতে আমার কেমন একটা আত্মশ্রম হয়েছে। আমার প্রাণ কেমন ছুঁ করে জলে যাচ্ছে। আমাকে মাফ কর্শেন। এই টাকাটা ফেরত দিতে না পারলে, আমার সংসারপ্রম করা অসম্ভব।

রূপচাঁদ। টাকা কি এখনি ফেরত

দিংত হবে? একটা ছুটা টাকা নয়—দেড় হাজার টাকা—যে টাকা বুকের রক্ত— তা ফেরত দেওয়া আর বুকের রক্ত চিরে দেওয়া সমান কষ্টকর ।

কৈলাস! আপনার আশীর্ব্বাদে বেঁচে থাকলে আমি উপার্জন করে যা পাব, আপনার চরণে এনে দেব। দেড় হাজার টাকার আমরা বড়-মালুম হব না। টাকাটা দয়া করে এখনি দেন।

রূপচাঁদ। (কুপিত হইয়া বাস্তব খুলিয়া দেড় হাজার টাকা ফলিয়া দিয়া) এই নেও তোমার টাকা, বাপু।

(টাকা নিয়ে কৈলাসের প্রস্থান)

রূপচাঁদ। ছেলেটা কি খেপেছে? না বোমা গুল করেছে? লোকে বলে বোমা “তাপসী”—তন্ত্র মন্ত্র জানে। টাকাটা বেরিয়ে গেল। উঃ আমার বুক যে ছঁ ছঁ করে জলছে। হে অর্থ! জগতে তুমি এক সার-পদার্থ—তুমিই সত্য। ধর্ম্ম মিছে, ঈশ্বর মিছে, পাপ-পুণ্য মিছে, টাকা, তুমিই সত্য। তাই টাকা আসিলে মুখ, টাকা চলিয়া গেলে দুঃখ। টাকা—টাকা—টাকা।

৫ম দৃশ্য ।

স্থান কেনারামের শয়ন-কক্ষ ।

(তাপসী ধরাতলে শয়না) ।

(রান্নাখোর টাকা হস্তে প্রবেশ)

কৈলাস। হাঁ। এখনও তেমনি শুয়ে, প্রিয়ে উঠ। টাকা এনেছি। ফেরত দেব, আমি সত্যি অতি কাপুরুষ। তাই টাকা নিছিলাম। আমি অতি পাষাণ, তাই দেব-কল্প। সদৃশী সহধর্ম্মীকে প্রহার করেছিলাম। প্রিয়তমে, স্নানীতি, আমায় ক্ষমা কর। তুমি এ অন্ধকে চক্ষু দিয়েছ, এত তর্ক কোরে বিবুদ্ধ বিবাহ সভার লোকে যা আমাকে বুঝাতে পারিনি, তোমার কথাতে আমি তা বুঝেছি—আমি নিতান্ত অপরাধী, আমাকে ক্ষমা কর।—নিরীক! নিশ্বাস পড়ছে না যেন। তাই—অসাড়—কি হলো! কি হলো—স্নানীতি—স্নানীতি—প্রিয়ে দেবি—তুমি অধ-মকে তাগু কোরে কোথায় গেলে—(দরজার দিকে দৃষ্টি করিয়া) মা, শীঘ্র এদিকে এস—শীঘ্র ডাক্তার আনতে বল, বাবু বাহিরে

আছেন, শীঘ্র খবর দেও—ইনি অচেতন—যেন মড়া—শীঘ্র এস।

কৈলাসের মা (প্রবেশ করিতে করিতে) কি হলো, বোমা মুছা গিয়াছেন। মুছা রোগ আছে বুঝি? ভাল বো হয়েছ। তখন বলেছিলাম ও বিয়ে কর না, বাবা—আরে মুখে জলের ছিটে দে—

কৈলাস। মা ধর, খাটের ওপর শোয়াই। (খাটের ওপর শয়ন করান হইল ও মুখে জল সিঞ্জন)

(রূপচাঁদের প্রবেশ)

রূপচাঁদ। হয়েছে কি? হিষ্টারিক্স (hysterics)?

কৈলাসের মা। আমার কথা কথাই নয়—তখন শোনা হল না—এখন দেখ মুছা রোগ।

রূপচাঁদ। আরে শ্রেনং সল্ট আনো। বাতাস কর। (স্বগত) মুছা কি? মৃত্যুর লক্ষণ যেন বোধ হচ্ছে। বোটা মলে বোধ হয় টাকাটা কৈলাস ফেরত দেবে না।

(ডাক্তারের প্রবেশ)

ডাক্তার। (নাড়ী দেখিয়া ও নিশ্বাস পরীক্ষা করিয়া) A case of suspended animation হোতে পারে। We will try electricity (তাড়িত বস্ত্র লাগাইয়া) Somewhat hopeful (তাপসীর একটা নিশ্বাস ছাড়িল) Yes, Breathing restored (আবার নাড়ী দেখিয়া) Scened, মহাশয় ভয় নাই। প্রেসক্রিপ্‌শন লিখছি, এই ঔষধ খাওয়াইবেন। তাহার আধ ঘণ্টা পরে একটু দুধ দিবেন, তার পরে আমাকে খবর পাঠাইবেন। (কৈলাস ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

(তাপসীর জ্ঞান লাভ)

(কৈলাসের প্রতি সন্মুখ দৃষ্টি)

কৈলাস। দেবি! আমাকে ক্ষমা কর, আমি পশু, আমি নরাধম, আমি কুলাঙ্গার। আমাকে ক্ষমা কর, আমি পিশাচ, আমি পাষাণ, আমার অপরাধ ক্ষমা কর—স্নানীতি, আমি দেড় হাজার টাকা অগ্নি ইকোলে, তোমার পিতাকে ফেরত দিব। এই টাকা এনেছি।

তাপসী। আরও কাছে আসুন। এখন

আপনি নহুণ্ড, এখন আমার স্বামী—
আমার মূর্তা নিকট, আমি মরে গেলে বাবা
ও টাকা ফেরত নেবেন না, তা আমি জানি।
আপনি ঐ টাকাটা ‘বিশুদ্ধ-বিবাহ-প্রণালী
প্রচলন সভায়’ দিবেন। আমার নিবেদন,
আমি মরে গেলে আপনি আবার বিবাহ
করেন, কিন্তু টাকা লইবেন না। আমি যে
কিছু হুঁস্কা বলেছি, তা কমা কমন, ভুলে
যান, আমার মাথায় আপনার চরণধূলি দিন।
(তাপনীর চরণধূলি গ্রহণ) আমাকে চুশন
কর প্রিয়তম! আমি নিতান্ত তোমারই
(কৈলাসের চুশন) প্রিয়তমে জীবিতেশ্বরী।

স্বনীতি। (কৈলাসের গলা জড়াইয়া
তঁাহাকে চুশন) প্রাণেশ্বর—এ হতভাগিনীকে
বিদায় দিন—হৃদয়েশ্বর, চণ্ডীমাম।

(চণ্ড মুদ্রিত—প্রাণত্যাগ)

কৈলাস। স্বনীতি স্বনীতি, দেবি,
প্রাণেশ্বর, কোথায় গেলে, তুমি কথা কও,
আবার একবার তাকাও—প্রিয়তমে যথার্থই
এ অধমকে ছেড়ে চলে গেলে, আমি ও
তোমার সঙ্গে আছি—(মৃতদেহকে জড়াইয়া
ক্রন্দন)

(ক্রন্দনঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ।

গিরিজাপ্রসন্ন । (৫)

পিতৃবিয়োগ।

১৩০০ শালে গিরিজাপ্রসন্নের পরম
ধার্মিক পিতা মথুরানাথ রায়চৌধুরী মহাশয়
৫২ বৎসর বয়সে মানব দেহ সম্বরণ
করেন। অসময়ে পিতৃবিয়োগে গিরিজাপ্রসন্ন
নিতান্ত ভগ্নমনোরথ হইয়া পড়িলেন।
মথুরানাথের চারি পুত্র, তন্মধ্যে গিরিজা-
প্রসন্নই জ্যেষ্ঠ, বিশেষতঃ সর্বাপেক্ষা গুণবান
ও ধার্মিক, কাজেই ধর্মপালনের জন্ত ও
লোকের অভিলাষিত আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের
জন্ত তিনিই বিষয় ভার গ্রহণ করিলেন এবং
প্রজাপুঞ্জের শাসন সংরক্ষণাদির জন্ত নূতন
নূতন ধর্মসঙ্গত ব্যবস্থা সংস্থাপিত করিলেন।
তঁাহার ষ্টেটের কাগজ পত্র পূর্বে ভালরূপে
প্রস্তুত ছিল না। বাহ্যতে ভবিষ্যতে কোন
রূপ সন্দেহ বা দোষের কারণ সমুপস্থিত না
হয় এবং বর্তমানে কার্যপ্রণালী ত্রাঘ্য ও
সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হইতে পারে,
তজ্জন্ত কার্যকুশল কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া
সকল প্রকার দোষ সংশোধন করিতে লাগি-
লেন! কিন্তু কয়েক মাস কার্য করার পর
ভ্রাতৃবর্গকেও কার্য-করিতার ক্ষমতা পরীক্ষা-
ক্রমে এক বৎসর প্রদান করা কর্তব্য মনে
করিলেন এবং ধর্মবিগর্হিত যেচ্ছাচার-মূলক
কার্য নিবারণের জন্ত কয়েকটা স্বন্দর নিয়ম

সংগঠিত করিলেন। গিরিজাপ্রসন্ন ১ম বৎসর
কর্তৃত্ব কালে সম্পূর্ণরূপে ঐ নিয়মের অনুবর্তী
হইয়া চলিলেন। তৎপর ভ্রাতৃবর্গকেও বিষয়
কার্য চালাইবার ক্ষমতা ঐ নিয়মের অনুবর্তী
হইতে পরামর্শ দিলেন।

সুপণ্ডিত Helps লিখিয়াছেন :—It is
more difficult to govern a family
than to govern a province. একটা
রাজ্য শাসন অপেক্ষা একটা পরিবার পালন
করা কঠিন। গিরিজাপ্রসন্ন ইহা জানিতেন,
তাই পূর্বে হইতেই ত্রাঘ্য পথ অবলম্বনের জন্ত
এত সতর্কিত হইতেছিলেন। অনেক সময়
ষ্টেটের কর্তৃত্ব পরিচালনকারীর কার্যে বহু
দোষ পরিলক্ষিত হয়, গিরিজাপ্রসন্ন ঐ সব দোষ
নিবারণের জন্ত প্রতি বৎসর কর্তৃত্ব পরিচালন-
কারীকে একটা বার্ষিক বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া
দিয়াছিলেন, কিন্তু তঁাহার মৃত্যুর পূর্বেই তঁাহার
প্রবর্তিত এই সব নিয়ম বিলুপ্ত হইয়াছিল!
সে যাহা হউক, গিরিজাপ্রসন্নের এই সব
সাধু ও নিঃস্বার্থ দৃষ্টান্ত দেখিয়া, ক্ষুদ্র নদী
যেরূপে অনুস্তবিস্তারী সাগরের উদ্দেশে
প্রধাবিত হয়, প্রজাপুঞ্জ ও তঁাহার মহানুভাব-
তা ও সত্যনিষ্ঠায় একান্ত সঞ্চালিত হইয়া
তঁাহারই আশ্রয়ে শান্তি লাভ করিতে লাগিল।
কয়েক দিন মধ্যে তঁাহার যশালোক বধ্যাহ

ভাষ্যের শ্রায় চতুর্দিক বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। গিরিজাপ্রসন্নের শ্রায় একজন সুপণ্ডিত সভ্য-শাসিত* মহাপুরুষ বিচারাসনে উপবিষ্ট হইলে, তাহার বিচার কার্যে শুধু শ্রায় জমিদারীর অধীক্ষণ প্রজাগণ কেবলমাত্র পরি-
তুষ্ট হইবে কেন, ভিন্ন স্থানের অধিবাসীগণও তাহার অসাধারণ অমুখাবন করিতে পারিয়াছিলেন। বহু ভূম্যধিকারী পরস্পর ঝগড়া বিরোধ করিয়া নিষ্পত্তির জন্ত মহানুভব গিরিজাপ্রসন্নের নিকট স্বরণ লইত। অনেক সময় বরিশাল আদালতে বিচারপ্রার্থী লোক আদালত হইতে মোকদ্দমা তুলিয়া গিরিজাপ্রসন্নের নিকট বিচারপ্রার্থী হইত। ইহা দ্বারাই, বোধ হয়, অমুমান করা যাইতে পারে যে, শ্রায় রক্ষার জন্ত গিরিজাপ্রসন্ন বিষয় রক্ষাকালেও কতদূর যত্নবান ছিলেন, এবং তজ্জন্ত প্রজাবর্গ ও বিভিন্ন স্থানীয় লোকের স্বয়ং কিরূপ আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন।

গিরিজাপ্রসন্নের কর্তৃত্বকালে তাহার অধীনস্থ লোক তদীয় প্রতিভার পরিচয় পাইবার ও দিবার যথেষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হইল। গিরিজাপ্রসন্ন উৎকৃষ্ট বোদ্ধা ও শ্রায়পরায়ণ, কাজেই কাহারও কার্যের দোষ গুণ তাহার অপরি-
ক্ষীত থাকিত না। যে প্রশংসার সহিত কার্য করিতে সমর্থ হইত, তাহাকে তিনি যথোচিত পুরস্কৃত করিতে ক্রটি করিতেন না। কর্মচারীদিগকেও তিনি কার্যকুশল করিবার জন্ত যথোচিত পরিশ্রম করিতেন। তাহার কোন একটা কর্মচারী কার্যদক্ষতার পরিচয় দেওয়ার, তিনি তাহার চরিত্রগুণে মুগ্ধ হইয়া একখানি সার্টিফিকেট প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সেই সার্টিফিকেট দর্শন করিয়া তাহার একজন বন্ধু তাহাকে একটি চাকুরী দেন। আমরা শুনিতেছি, গিরিজাপ্রসন্ন সার্টিফিকেটে ঐ লোকটির যে সব গুণ উল্লেখ করিয়াছিলেন, তিনি সেই সব গুণ তাহার চরিত্রে প্রত্যক্ষ করিতেছেন ও তৎপ্রতি যথোচিত শ্রীত হইয়াছেন। গিরিজাপ্রসন্নের শ্রায় গুণগ্রাহী লোকের অধীনে কাজ করা কতদূর সুখের হইত, তাহা গুণী ব্যক্তিগণ ইহা

দ্বারাই বলনা করিতে পারিবেন। কিন্তু পাঠ্য জীবনে, কি ওকালতী ব্যবসার সময়ে, কি বৈষায়িক কার্যে, যখন যে ভাবে জীবন-
যাপন করতেন, তখনই তিনি সেই কার্যের মধ্যে তাহার লক্ষ্য স্থির রাখিয়া বিশেষত্ব দেখাইতে পারিতেন। তিনি তাহার নিজের জীবন উন্নত করার জন্ত যেকোন প্রতিনিয়তই যত্নবান ছিলেন, তাহার জীবনের বিভিন্ন কার্যের সহচরগণ যাহাতে মহৎ হইয়া জগতের হিতসাধন করিতে পারেন, তাহার দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। শ্রয়ের উন্নতিতে তাহার কত উল্লাস, তাহা তাহার বন্ধুগণই জানেন। পাশ্চাত্য দেশীয় পালিগ্রামেটের কোন মন্ত্রী ডাক্তার জনসনকে গালি দিয়া বাণ্যাচ্ছেন যে, লেখকগণ রচনা ভিন্ন অল্প কোন কার্যের উপযোগী হয় না। সে দেশের লেখকগণকে সেরূপ দোষারোপ করা যাইতে পারে, কারণ তাহার কি অহুষ্ঠেয় কর্ম, কি অনহুষ্ঠেয় কর্ম, তাহার বিচার করিয়া কার্য করিতে শিখে না। যে কার্য তাহাদের প্রকৃতি বা প্রবৃত্তির অহুকুল, তাহারাই সেই কার্যই সম্পাদনীয় ও অহুষ্ঠেয় বলিয়া ধারণা করে। ভারতবর্ষের লোক প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায় না, তাহাদের কি অহুষ্ঠেয় কি অহুষ্ঠেয় নহে, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হয়, যে কার্য প্রবৃত্তির অহুকুল নহে, সে কার্যটি যদি অহুষ্ঠেয় হয়, তাহা হইলে তাহার প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিয়া অহুষ্ঠেয় কার্যে বিশেষত্ব দেখাইয়া থাকেন। বিষয় কার্য এই সময় গিরিজাপ্রসন্নের প্রবৃত্তির অহুকুল ছিল না, গিরিজাপ্রসন্ন তথাপি ইহা অহুষ্ঠেয় বোধ করিয়া যত্নপ এই কার্যে প্রতিভা দেখাইয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর।

গিরিজাপ্রসন্নের আর একটি জ্ঞানচরণ তাহার অধীনস্থ ও বিষয়-সম্পর্কীয় লোকদিগকে বড়ই উৎসাহিত করিত। সেটি পাওয়ানা ও দেনাদারদের প্রতি উচিত ব্যবহার। তাহার কর্তৃত্ব কালে যাহারা তাহার নিকট ঋণাবদ্ধ হইত, তিনি বিশেষ কারণ না থাকিলে নিয়মিত সময় ঋণ আদায়ের কোনরূপ ক্রটি করিতেন না। আর তিনি যদি কাহারও নিকট ঋণী থাকিতেন, তবে নির্দিষ্ট

দিনে ঋণ পরিশোধে কোনরূপ ঔদাস্য করিতেন না। যদি উত্তমৰ্ণকে ঋণ শোধ দিবার জন্য কোন সময় সঞ্চিত অর্থের অভাব অনুভব করিতেন, তাহা হইলে নির্দিষ্ট সময়ে উহা পরিশোধের জন্য এত ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন যে, তজ্জন্ত অপরের নিকট ঋণাবদ্ধ হইয়া এদনা শোধ করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। বিষয় কার্যের মধ্যে থাকিয়া নিয়মানুবর্তিতার প্রতি এত লক্ষ্য কি হুন্দর নহে ?

ক্ষমা ।

বাটাতে অবস্থান সময়ে একবার গিরিজা-প্রসন্ন অরোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার গৃহচিকিৎসক তাঁহাকে চিকিৎসা করেন। গিরিজাপ্রসন্ন তাঁহার অধীনে কিছুকাল চিকিৎসিত হইয়া ফললাভ না করায়, অন্ত একজন সূচিকিৎসক নিযুক্ত করেন। ভগবানের কৃপায় এই নবীন চিকিৎসক একদিন মাত্র চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে নিরাময় করেন, এবং বলেন যে, তাঁহার গৃহচিকিৎসক রোগ নির্ণয়ে দক্ষ নহে, তাই তাঁহাকে সুদীর্ঘকাল ভুগিতে হইয়াছে। যদি আরও কিছুদিন সে চিকিৎসা করিত, তাহা হইলে রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইত। গিরিজাপ্রসন্নের গৃহচিকিৎসক গিরিজাপ্রসন্নের অধীনস্থ লোক। তিনি গিরিজাপ্রসন্নের রোগ মুক্তি পের, একদিন দোষিতে আসিয়াছিলেন, গিরিজাপ্রসন্ন তাঁহার চিকিৎসা ব্যবসায়ে অদূরদর্শিতা ও অপারকতার কথা উল্লেখ করিয়া তিরস্কার করেন, কিন্তু নবীন চিকিৎসক ইহা শ্রুত হইয়া গিরিজাপ্রসন্নকে সরলভাবে বলেন, আপনার চিকিৎসায় পূর্ববর্তী চিকিৎসকও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ক্ষতি করে নাই, তবে রোগোৎপত্তির কারণ নির্ণয়ে সে অসমর্থ হইয়াছিল, এইজন্যই রোগ এতদিন আরাম হয় নাই। আমি যে ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, যদি উহা দ্বারা আপনি উপকৃত না হইতেন, তাহা হইলে আমি ও ত আজি নির্দার ভাজন হইতাম। গিরিজাপ্রসন্ন তখন আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া পূর্বচিকিৎসক তাঁহার গৃহে সমুপস্থিত হইলে তাঁহাকে অথবা কটুকির জন্য মুক্তকণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।^{১০} তাঁহার ভ্রাতৃ কেহ

প্রদর্শন করিয়া দিলে তিনি, তাহা স্বীকার করিয়া ভ্রাতৃ বা দোষ ফালনের জন্য এইরূপ নম্র হইতে জানিতেন। যে লোকের নিকট তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সে লোক কখনই গিরিজাপ্রসন্নের নিকট এতদূর নম্রতা প্রত্যাশা করিতে পারিত না। গিরিজাপ্রসন্ন নিরতিমান ও আত্মদর্শীপুরুষ, তিনি অগ্নানবদনে স্বকীয় দোষ উপলব্ধি করিয়া হৃদয়খান পবিত্র করিলেন। একরূপ মহৎস্বচক দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনে অনেক ঘটিয়াছিল, সে সব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া যে পাঠকবর্গের চিত্ত অধিকতর আকৃষ্ট করি, সে রূপ আমাদের সময় নাই। আমরা চাই, গিরিজাপ্রসন্নের নির্মল হৃদয়খান সাধারণের সম্মুখে ধরিতে। এইরূপ দুই একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমাদের সেই উদ্দেশ্য কি সফল হইতেছে না ?

ব্রহ্মচর্য্য পালন ।

পিতৃবিয়োগের পর গিরিজাপ্রসন্ন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিলেন। এতদিন তাঁহার ভগবৎপ্রেম ভস্মাচ্ছাদিত বহির জ্বালা অন্তরাভ্যন্তরে নিহিত ছিল—পিতৃবিয়োগ-বায়ুতে উহা প্রধূমিত হইয়া উঠিল। ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে হইলে সাত্তিক আহারের প্রয়োজন। আহারের সঙ্গে মন ও দেহের অতি নিকট সঞ্চল। স্নানিরা সাত্তিক ভাবের যে সমস্ত লক্ষণ লিখিয়া গিয়াছেন, গিরিজাপ্রসন্ন সেই সব লক্ষণ বর্দ্ধিত করাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য মনে করিলেন ও দেহ এবং মনের পুষ্টির জন্য সাত্তিক আহার গ্রহণ করিয়া অন্ত গুণবিপ্লব আহার পরিত্যাগ করিতে অভ্যস্ত হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মপানে কোন কারণবশতঃ বাল্যকালেই গিরিজাপ্রসন্নের অপ্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। ওঝা বেকর সর্পদষ্ট ব্যক্তির কত-মুখ হইতে বিব তুলিবার জন্য ক্রুর সর্পকে নিযুক্ত করিয়া তাহা ঘরী কার্য্য সাধিত করিয়া লয়, গিরিজাপ্রসন্নের অতি তেজস্বী মন, তজ্জন্যই, ব্রহ্মচর্য্য-নাশক দুগ্ধ-বৃত্তিকে তাহার অভীষ্ট সাধনের উত্তরসাধক করিয়া লইল। যে ব্রহ্মপানে তিনি বীতশ্রদ্ধ, সেই গোহৃদয় এখন তাহার প্রধান ও রুচিকর আহার হইল। গিরিজাপ্রসন্ন ক্রমাগত

সন্তোষ বিরোধীরা আহার পরিত্যাগ করিলেন, অন্তঃকল্পের জন্ত বহিরঙ্গ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্মসঙ্গত কোন আচারই তাহার উপেক্ষণীয় হইল না।

এই সময় তিনি ব্রাহ্মমুহুর্তে শয্যাভ্যাগ করিয়া প্রথম প্রাতঃপ্রসন্ন করিতে অভ্যাস করেন। তাঁহার বাটার পূর্ব ভাগের দীর্ঘ জম্বাশ্রেণে সন্ধ্যোপাসনা সমাপন করিতেন। সে সময় উহা তাহার প্রদীপ্ত কান্তিতে প্রফুল্লতা-শোভিত হইত। কি প্রাবৃটের অবিরল বারিধারায়, কি শীতের তুষার-শীতল শৈত্যে, কি অন্ধ স্নেহ প্রকার অনিবার্য প্রতিবন্ধকে তিনি এই দৈনিক নিয়মিত অনুষ্ঠান হইতে একদিনের তরেও বিরত হইতেন নাই। গিরিজাপ্রসঙ্গের বাটতে কতকগুলি দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। গিরিজাপ্রসঙ্গ সন্ধ্যোপাসনা সমাপনান্তে প্রতিদিন উপাসনার জন্ত মন্দিরস্থিত দেবতা দর্শন করিতে গমন

করিতেন, ও স্বহস্তে দেবাঙ্গণগুলি পরিকৃত করিয়া উহার শোভা সজ্জন করিতেন।

দেবালয়ের সম্মুখে কয়েকটি পুষ্পবৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। দেবতাদর্শন ও উপাসনাদি কার্য নিষ্পন্ন হইলে, তিনি স্বয়ং পুষ্প-বৃক্ষ হইতে পুষ্প চয়ন করিতেন। সংগৃহীত পুষ্পের কতক মন্দিরস্থিত দেবতাদের পূজার জন্ত পূজকের নিকট অর্পণ করিয়া উল্লাসিত হইতেন, কতক স্বীয় পূজার জন্ত গৃহে ফিরাইয়া আনিতেন। গৃহে প্রত্যাপন করিয়া তাহার নির্জন ভজন প্রকোষ্ঠে বসিয়া উপাসনাদি করিতেন ও একাগ্রচিত্তে তাহার প্রকৃতি-মূলভ গভীরস্বরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিতেন। সমস্ত গীতাখানি তাঁহার আত্মোপাস্ত কণ্ঠস্থ ছিল, তাহা একবার করিয়া প্রতিদিন আবৃত্তি করা তাঁহার নিত্যক্রিয়ার মধ্যে একটি ছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

অভিন্ন।

মুচ আমি, তাই তোমা ছাড়ি', প্রাণপণে
বাসনা মিটাতে চাই, আপনায় বলে
তুমি শুধু অন্তরালে দাঁড়ায়ে গোপনে,
হাসিছ কতনা হাসি মন কুতূহলে।
নিবেদিত ফুলবাশি কিসের হরষে—
ফল করে, তবু তার না ফুরায় হাসি ?
যত বিফলতা মোর, অমৃত পরশে
লভিছে জীবন নব, তোমা মাঝে আসি'
তানসুী হৃদয়াকাশে ফুটে ক্ষুদ্র তারা,
করুণা-সিক্তিতে তব ছায়া তার পড়ে ;
অমনি সহস্র দেহে হ'য়ে আত্মহার।
কাঁপিয়া উঠিছে তারা মৃত্যুক লহরে।
নিরাশার নীহারিকা করে ছু নয়নে
আঁধারি' ধরণী, বৃক্ষে বরে পত্র দল,
তুমি আসি' কোথা হতে বসন্ত পবনে
আবার ফুটাও ফুল সৌন্দর্য্যে বিমল।
সফল বাহ্যে মোর উঠে যবে ফুটে,
তোমার অরুণ রশ্মি পড়ে তারি' পর,
মলিন এ আঁধারি ছিল হেথা লুটে।
মুক্তা সম সেও হল কি সুন্দরতর।
বাক্যকালে তোমা হ'তে লয়েছি বিদায়,
পথ মাঝে তবু তুমি রহিয়াছ সাথী,

সঙ্গীতে সুরের মত, ফুলে গন্ধপ্রায়
আমাতে, আমারি বিখে ব্যাপ্ত দিবা রাত।
ভিন্ন ভিন্ন করি তায় চাই আনিবারে
ফুল হতে গন্ধ, আর সুর হতে গান,
কায়া হতে ছায়াটুকু, সে কি কেহ পারে ?
নাহি পাই ফুলফল, নাহি পাই ভ্রাণ।
যথা বাই, তথা তব অসীম করুণা
দিতেছ বিছায়ে নাথ ! পথের মতন,
তিলেক ছাড়িতে তাহা আর পারিব না,
প্রাপ্ত হ'য়ে সেই বৃকে লভিব পতন।

প্রীধারেঞ্জলাল চৌধুরী।

ছায়া রূপে।

কে তুমি রূপসি নিত্য নিশাকাল,
শিয়রে আসিয়া হাসি দাও দরশন।
ও মুখ-পঙ্কজ দেখি কেন মোর
হৃদয়ে জাগিয়া উঠে স্মৃতি পুরাতন ?
বিরলেতে বসি সারানিশি দিন,
যার তরে করিয়াছি কতই সাধন।
সেই কি সুন্দরি ছায়া-রূপ ধরি,
আসিয়াছ পুরাইতে অভাগা-বাসনা ?
কিন্তু কই তার স্মৃতিকণ কেশ,
উজ্জল সিন্দুর রাগ—দীপ্ত-শোভন।

মুক্তাদস্ত-পাতি বিশ্ব ওষ্ঠাধর,
নয়নের-প্রেম দ্যুতি—অমিয় বচন ॥
কোথা তার সেই হাসিভরা মুখ,
প্রেম ভরা হৃদি খানি—প্রেম-প্রসবণ,
কেশরী লাক্ষিত কটি-সুশোভিত,
গজ বিনিন্দিত কই মধুর গমন ?
নিরাখি যাহায় উঠিত ফুটিয়া,
অস্তর-নিহিত বত মনের বাসনা ।
দিত ভূলাইয়া যার সুধা বাণী
সংসারের নিদারুণ সহস্র যাতনা ;—
সেই কি গো তুমি ধরিয়াছ আজ
মানস-মোহিনী রূপ—অভিনব বেশ ।
কোটি ইন্দু সম, আনন সুন্দর
নবীন নীরদ সম—এলাইত কেশ ॥
কামধনু জিনি' নয়ন ক্রভঙ্গ,
অরুণ অধরে খেলে মুহু মন্দ হাসি ।
সুধার আধার বিশ্ব ওষ্ঠাধর,
শোভিত দশন তাহে মুক্তা ফল রাশি ॥
কোমুদী মিলিত গোলাপের রাগ,
অঙ্গের বরণ তব—অতি বিমোহন ।

ললাট-শোভিত • সুন্দর অলকা,
চরণ-সরোজ কিবা—মধুর গমন ॥
দয়াবতী সতী করুণা প্রকাশি',
শুনিয়া কি ব্যর্থিতের কহের রোদন,
এসেছ নামিয়া পূণ্যধাম হ'তে,
শান্তি-বারি হাতে ল'য়ে দিতে দরশন ?
কত নিশি দিন অশ্রু উপচারে,
করিয়াছি কার্যমনে তব উপাসনা ।
আঁখি জল সহ জীবন ফুরা'ল,
আইলে কি এত দিনে পুরা'তে বাসনা ?
হের তোমা তরে এ হৃদি-মন্দিরে,
রাখিয়াছি সযতনে আসন পাতিয়া ।
সে প্রেম-আসন শূন্য হৃদি মাঝে,
তব অধিষ্ঠান বিনা রয়েছে পড়িয়া ॥
জীবন-সঙ্গিনী গৃহলক্ষ্মী মোর
এস, হৃদে শান্তিবারি কর বরিষণ ।
যুচে যেন ব্যথা মিলি' তোমা সনে,
অস্তিমতে পাই চির শান্তি-নিকেতন ॥
শ্রী আনন্দগোপাল ঘোষ ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

২৩। রামকৃষ্ণ। শ্রীশশিভূষণ দাসগুপ্ত ।
মূল্য ১০। ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক । উদ্দেশ্য ভাল,
রচনাও ভাল । কিন্তু বিলাতী কাগজ ।

২৪। হোমিও-গাথা । শ্রীকুলচন্দ্র দে
প্রণীত, মূল্য ১। বিলাতী কাগজে বিলাতী
কালীতে ছাপা । কবিতায় হোমিও-চিকিৎসা-
প্রণালী সুলিখিত ।

২৫। সঙ্গীত-সুধাসার । শ্রীজানকী-
নাথ গোস্বামী কথক কর্তৃক বিরচিত, মূল্য
১। ধর্ম্মভাষে গ্রন্থখানি পূর্ণ । গানগুলি
অতি সুন্দর । সকলের আদরের একান্ত
যোগ্য ।

২৬। সমাজ-সংস্কার । শ্রীতারাকুমার
করিরত্ন প্রণীত, মূল্য ১০। যে মানব-দেব-
তার লেখনী হইতে এই অমূল্য প্রবন্ধ বাহির
হইয়াছে, সর্ব্বত্রই তাঁহাকে প্রণিপাত
করিতেছি ।

বঙ্গদেশ বাহাদুরের পুণ্যাধিষ্ঠানে ধন্য হই-

রাছে, এই গ্রন্থকার তাঁহাদের অন্তর । এতপ
নিকাম স্বদেশ-সেবক এদেশে অধিক নাই ।

গ্রন্থখানি আশুস্ত পড়িলাম । একরূপ
গ্রন্থের সমালোচনা আগা আঁর কি করিব ?
যে গ্রন্থের পংক্তিতে পংক্তিতে স্বদেশাভিরাগ,
মানবপ্রীতি এবং পুণ্য প্রস্তুত, সে গ্রন্থ মন্তকে
এবং বক্ষে সযত্নে ধারণ করিতে হয়, তাহার
সমালোচনা চলে না । আমরা একান্তে হিতান্ত
অসমর্থ । গ্রন্থখানিকে মন্তকে ধারণ করিয়া
কৃতার্থ হইলাম ।

প্রতিভা বা প্রেম, জ্ঞান বা গবেষণা,
কোন বিষয়ে গ্রন্থকার হীন, আমরা জানি
না । এ গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রতিভা, প্রেম,
জ্ঞান ও গবেষণার পরিচয় রহিয়াছে । একরূপ
গ্রন্থ পড়িবার অবসর পাইলাম, ইহাতেই কৃতার্থ
হইয়া বিধাতাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি ।

এই গ্রন্থখানি গৃহে গৃহে প্রচারিত হউক,
বিশ্বপতির চরণে একমাত্র প্রার্থনা ।

অবগুণ্ঠিত ভারতবর্ষ ।

“প্রজ্ঞাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেজস্রিঃ ।”

ভগবদ্গীতা ।

পুষ্প-সুন্দর দৌরভ এবং অমুদিত রূপ-প্রার্থার্থে ক্ষণস্থায়িত্ব অতিক্রম করিয়া উহার চতুরশ্রে-বেষ্টিত বক্ষে ধমনীস্পন্দন জাগ্রত করিতে পারেন না, এজন্ত প্রহরান্তে গুচ্ছ-কদম্বের মুদিত-শ্রী বিশ্বয় উৎপাদন করে না ।

যাহার সার্বকতা ক্ষণকালের জন্ত, তাহার পরিণতি হুঃখজনক নহে ।

কিন্তু আমরা অনেক কাজে হাত দিই, যাহা আমরা ঠিক হৃদিনের মনে করি না । এসব কাজে পাণ্ডের যদি সর্বাঙ্গ হয়, হৃদয়ের অফুরন্ত শক্তির সঞ্চয় অপেক্ষা আকস্মিক অমূল্য বাতাবর্ত্ত যদি আমাদের নেশা জন্মায়, তবে সাময়িক কার্যের ত্রুটি হোক না হোক, ভবিষ্যের কর্ম-প্রাক্কণের বিপুল জটিলতার মাঝে পথ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর হইবে ।

কিন্তু হৃদয়ের শক্তি আমাদের কোন্ খানে ? শক্তি জিনিষটা এমন নহে যে, হুকুম দেওয়া মাত্র আমাদের সম্মুখে করগোড়ে উপস্থিত হইবে—জীবন-নাট্যে শক্তি পদার্থকে কখনও কণ্ঠকীর জ্বালা হাজির করা যায় না ।

আমরা সহস্রাধিক বৎসর কাল যে নৈতিক চর্চার অশ্রান্ত প্রবাহিত স্রোতের মাঝে পুট হইতেছি, হৃদয়ের শক্তি-বিচারে কি তাহার কোন স্থান নাই ? কল টিপিলে সর্বত্র স্থান কাল এবং বিষয় নির্বিশেষে যদি শক্তির ফোয়ারা উৎসারিত হইত, তবে, কর্ম-ভগতে এত অসামঞ্জস্য দেখা যাইত না । সম্ভরণ-অনভিজ্ঞ ব্যক্তির জলে ঝাপ দেওয়ার

উৎসাহ, বা জলজীবীর স্থল-সম্ভরণ-স্পৃহা পদে পদে কণ্টকিত হইত না ।

তাহা ছাড়া কলেরও ত বিশিষ্টতা আছে যে কল টিপিলে উত্থানে ফোয়ারা ছুটে, সে কলের তাড়নার রেলগাড়ী ছুটিবে, এ বিশ্বাস কাহারও নাই ।

কাজেই শক্তির রুদ্ধ-মুখ উৎসের সন্ধান প্রয়োজন ; কোন্ গোপন-কক্ষের মোন-অবগুণ্ঠনে তাহা অমর আলোকে দেবী-প্রতিমার জ্বালা দীপ্ত হইতেছে, হৃদয়-নীলিমার কোন্ ছায়াপথে প্রবতারা জ্বালা তাহা অনিমেঘ নেত্রে অনন্তকাল জাগ্রত রহিয়াছে, সর্বাঙ্গে তাহার বিচার প্রয়োজন । ইহার উপর আমাদের কর্ম-প্রবাহের সফলতা এবং হৃদয়ের লুপ্ত শক্তির পরিধি নির্ণয় করা নির্ভর করিবে ।

এই পথ সন্ধানে নথ মশালের আলোক একমাত্র আশ্রয় নহে । রুদ্ধ শক্তির বপ্র-ক্রীড়া এই গুহা পথ নির্ণয় করিতে পারিবে না । আফ্রিকার মরুভূমী ঐজ্জ্বালিকের নিষ্ঠা ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আলাউদ্দিনের ক্রীড়া-লোলুপ বিভ্রম-মুগ্ধ অর্থহীন চেষ্টায় ধাবিত হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে হইবে । নচেৎ জীবন-উজ্জল প্রদীপের সন্ধান পাইব কিরূপে ?

নৌকা সঞ্চালনই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে জলের গভীরতা যে দিকে বেশী, সে দিকেই যাওয়া ভাল, নচেৎ স্বল্প জলের মাঝে মুক্তিকা-পাশবদ্ধ নৌযানকে দাঁড় টানিয়া অগ্রসর করা চলে না । যাহারা গভীর সলিল-বক্ষে সঞ্চরণ করিতেছে, তাহারা কখনও ভাসমান

শৈবালপুঞ্জের ক্ষণিক প্রতিঘাতকে প্রবল স্বীপের মারাত্মক সম্ভব বলিয়া মনে করে না।

স্থান কাল বিষয় নির্বিশেষে যখন লৌকিক শক্তির তারতম্য ঘটে, তখন কোন্ স্থানে, কোন্ কালে বা কি কি বিষয়-পথে তাহা তীব্রতর হওয়া সম্ভব, তাহার বিচার প্রয়োজন।

কোন স্থান-বিন্দু-পথে চেষ্টা করুক হইলে তৎপ্রতি কিছুমাত্র অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া কিম্বা ব্যাপারটির আপাততঃ প্রতীয়মান অবস্থাকে বিন্দুমাত্র মূল্যবান মনে করা মুঢ়তা মাত্র। যাহাদের দৃষ্টি অতীতের শোণিত-সোপান সঞ্চরণ করিয়া ভবিষ্যের প্রাণ-ধারার সহিত যুক্ত হইয়াছে, সাময়িক অস্থায়ী ঘটনা-বিপর্যয় তাহাদের নিকট প্রত্যা-শেষাভ্যুত্থানের অলীক পদার্থ রূপে প্রতীয়মান হয়। একজ্ঞ চারিদিকে আশার আলোক কখনও নিবে না, আনন্দের রাগিণী কখনও ডুবে না। সফলতার বৈজয়ন্তী কখনও ভূমি-লুপ্তিত হয় না। সাধনা-পথের ক্ষণিক পরাজয় নিবিড় পরিচয়ে মরীচিকার ছায়ামূর্তির স্তায় প্রতীয়মান হয় এবং প্রত্যেক ছায়ামরী বিফলতা সমুদ্রের সৈকতভূমে সহস্রদীর্ঘা উদ্ভি-ভঙ্গের স্তায় প্রতিপদে অনন্ত উৎসাহে সফল-তাকে আলিঙ্গন করিতে ছোটে।

এইজ্ঞ মুহূর্তমান ব্যক্তি-হৃদয়ের নিবিষ্ট চিন্তা প্রয়োজন; নচেৎ হাহাকার কোলাহল একের নহে, বহুর অশান্তির কারণ হইবে।

ব্যক্তিগত চিন্তেও দেখা যায়, এমন দুই একটা জায়গা আছে, যেখানে আবাত করিলে লোক বিশেষ একান্ত বিচলিত হয়, জীবনকে তাত্রপাত্রস্ত চন্দন-লিপ্ত পুষ্পের স্তায় ত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করে না। দুর্বল ও সহস্র

ধিরদের শক্তি লাভ করে। দৈনন্দিন জীবনে এইরূপ কত দৃষ্টান্ত বর্ণিতেছে।

ভারতীয় সভ্যতার 'মূল' প্রকৃতি হইতে আমরা এখনও নিজকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি নাই। তাহার সহিত আমাদের কর্ম-পুঞ্জের সামঞ্জস্য স্থাপন যিনি আবশ্যক মনে করেন না, তিনি এক মুহূর্তে ফলাফল প্রভূ-তিকে যুগপৎ আকাশে উত্তোলন কিম্বা পাতালে নিক্ষেপণ, এই উভয় কার্য্যেই ক্রতিত্ব দেখাইতে পারেন।

যিনি নিবিড়ভাবে ভারতের অন্তর্নিহিত সহস্র মহর্ষির আশীর্বাদপূত গুঢ় শক্তির সন্ধান পাইয়াছেন, তিনি ভারতবর্ষের পক্ষে কোনও কার্য্যই অসাধ্য কিম্বা দুঃসাধ্য মনে করেন না। তাহাদের চিন্তা প্রবাহে ঋষিজন-বন্দিত ক্সত্রধর্ম-সেবিত ভারতবর্ষের শক্তির সফল ধর্ম্মদে আস্থা প্রতি মুহূর্তে জোয়ার ভাটা খেলে না! তাহারা জানে, ভারতবর্ষ এক মহাসাগর-সঙ্গমে সহস্র বৎসর হইতে ছুটিয়াছে, উহার এই শক্তি কখনও কোনও ঐরাবত-রূপী বিপুল-বিষ-দ্বারা রুদ্ধ হইবে না, বরং লক্ষ ধারার দ্বারা গুট ও উপচিত হইয়া বিশ্বগ উৎসাহে বিধি-নির্দিষ্ট পথে ছুটিবে।

প্রশ্ন হইতে পারে, এই শক্তির প্রমাণ কি? এই অশ্রান্তবাহী শক্তি কোন্ পথে ছুটিয়াছে? দ্বিতীয়তঃ এই শক্তির দ্বারা আমা-দের বর্তমান কার্য্যপরম্পরার কি সহায়তা হইতে পারে?

এই প্রশ্নের বিচার কিছু অতিনিবেশ-সাপেক্ষ। বিশেষতঃ এই শ্রেণীর যুগ্ম অথচ অতিক্রম-সত্য আলোচনা অবি-স্থাসীদের পক্ষে যেমন বিপজ্জনক, বিশ্বাসীদের পক্ষেও ইহাতে ইতস্ততঃ করিবার নানা কারণ আছে।

কোন লোক-সভ্যের আন্তরিক মর্শ-কথা জামিতি দ্বারা মাপ করা চলে না, কিংবা কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে ওজন নেওয়াও চলে না। লৌকিক ঘটনাপুঞ্জ দেখিয়া যেমন-বিশ্বাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি শাক্ত কল্পিত হইয়াছে, তেমনি, বহু পরিমাণে দেশকাল-নিমিত্তের অবস্থা বিচার পূর্বক ভারতের অপরাধের, অনম্য, অময় এবং অজর শক্তির সন্ধান করিতে হইবে।

এই শক্তির সহিত সাময়িক রাষ্ট্রধর্মগত চেষ্টা-নিবহের সম্পর্ক কোথায়, এই প্রশ্ন যদিও আধুনিক কোলাহলে অপেক্ষাকৃত অধিক স্থান অধিকার করিবার স্পর্ধা করিতেছে, তবু মনে রাখিতে হইবে, সাময়িক কোলাহলে বাহ্য অনাবশ্যক রূপে বৃহৎ মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহা পারমার্থিক বৃহৎ নহে। আমার সম্মুখস্থ ইষ্টক-স্তূপকে যদি সুদূর আকাশ প্রান্তে বিগলিত শৈলছায়া অপেক্ষা বৃহৎ দেখায়, ঘন-পরিচয়ে উপলব্ধি হইবে, এই স্তূপ কখনও মহাকায় শৈলের চরণে পুঞ্জীভূত উপলব্ধ-সমূহের একতমের সহিতও তুলনীয় নহে।

ভারতের এই অপরিমেয় শক্তির বিচার আনন্দজনক, সন্দেহ নাই। ভারতের সাহিত্য যোগীর করস্পর্শে, ভাস্করের অশ্রুজলে, সেবকের স্বেদে, ক্ষত্রিয়ের রুধিরে এই কাহিনী অঙ্কিত করিয়াছে। বিশ্বাসী ভক্ত-পূজকের জ্ঞান অক-চন্দন-নত-নীরে এই সাহিত্যমন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হও, দেখিবে, অগুরু ধূয়ের অন্তরালে তাহা এখনও দেদীপ্যমান; কাল ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, ইহা প্রলয়-কর ঝঞ্ঝা বড় অতিক্রম করিয়া এখনও জ্যোতিষ্মতা হারায় নাই, ভারতের এই মর্শ-শক্তির সহিত সাময়িক কার্যপরিপূরার সম্পর্ক বিচারে আমরা যেন কিছুতেই জগতে

ভারতবর্ষ কর্তৃক প্রার্থিত চরম লক্ষ্যকে না ভুলি, কারণ ইহার প্রতিষ্ঠা জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিবে। বর্তমান যুগে ভারতবর্ষের উত্থান জগতরাজ্যে ঐ ভাববিপ্লবের পূর্ব-স্থচনা, সন্দেহ নাই।

এই প্রশ্নের বিচার কিছু গুরুতর, সন্দেহ নাই, তবু ইহার উল্লেখ না থাকিলে জগত রাজ্যে আমাদের কাম্পপরিপূরার সার্থকতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হইবে না।

সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বাহিরের আকার অভ্যন্তরের শক্তি-নির্ণয়ে সহায়তা করে না, কাজেই ভারতের মর্শের মাকে কোন্ কোন্ প্রণালীতে কি ভাবে কোন্ দ্রব্য সৃষ্ট হইতেছে, তাহা তত্ত্বাধেয়ী ভিন্ন অস্ত্র কাহারও উপলব্ধিগম্য নহে। কথিত আছে, ফরাসী-জর্জ-যুদ্ধে জর্জান সেনাপতি শত শত ক্রোশ দূরে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া সেই বৃহৎ সমর-বাহিনী পরিচালিত করিয়াছিলেন। তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যায় নাই; তাঁহার স্বন্ধে অঘ্যস্ত লঘিত হয় নাই; তাঁহার কর্ণে সমর-বাণ-ঝড়ার পৌছছে নাই। তাই বলিয়া একথা অস্বীকার করিলে কি করিয়া চলিবে, ক্ষুদ্র তাঁবুর ভিতর উপবিষ্ট, সংবাদ-স্তূপের মধ্যে মগ্ন, সেই মানবটীর মনোমগ্না-শক্তির তাড়নায় ঐ বিপুল অকোহিনীর পুলক-সঞ্চার হইয়াছিল।

ভারতের বহিঃপ্রক্ষুট যে কোন কার্যের আলোচনায় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহা অস্ত্রাস্ত্র কার্য-পরিপূরার সহিত নিবিড় ভাবে যুক্ত এবং সমগ্র ভাব-কর্ম-নির্ঘট এক মৌলিক ভাব হইতে প্রসবণের জ্ঞান নির্গত হইতেছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি একই মহান আদর্শের অধীন এবং শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জ্ঞান একটা অন্ত-

টিকে অস্বীকার করিয়া চলিতে পারে না।
জীবন, ভারতবর্ষে, স্বতঃই বিচ্ছিন্ন হইয়া
চলে না।

অবিস্বাসীদের একথা স্বীকার করিতে
হইবে যে, কোনও পদার্থ-বিচারে তাহাকে
যথাস্থানে রাখা চাই, নচেৎ তৎসম্বন্ধে জ্ঞান
অভ্রান্ত হইবে না। ইউরোপের বিজ্ঞান-
ক্ষীত ক্ষাত্রচতুর্থা-ব্রহ্ম এশিয়াবাসীর পক্ষে
জগতের যাবতীয় তত্ত্বই এই ব্রাহ্মণ্য-বর্জিত
ক্ষাত্র ঐশ্বর্যের কপাট-মরীচিকার আলোকে
বিচার করিতে হইবে, এমন চাপল্য বোধ
হয় শিশুর পক্ষেও সম্ভব নহে; ইহাতে পদে
পদে বিপদ আছে।

যে ব্যক্তি কিম্বা জাতির পক্ষে যাহা আদর্শ,
তাহার অনুরূপেই তাহার কর্মপ্রণালী গঠিত
হয়। তাহাকে বিচার করিতে হইলে তাহার
দিক্ হঠাতেই তাহাকে দেখিতে হয়। ভারত-
বর্ষের ভনৈক লোকমাত্র স্বামী এ সম্বন্ধে
একটা ঘটনা উল্লেখ করেন, তাহা এই :—

একদিন তিনি আনেকের কোন নগরের
মেলায় কতকগুলি পণ্যবিপণিতে ইতস্ততঃ
পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ
কেহ পশ্চাত হইতে তাহার সূদীর্ঘ উষ্ণীষাগ্র
সজোরে আকর্ষণ করে। স্বামী ফিরিয়া
তাহাকে এই অভদ্রোচিত ব্যবহারের কারণ
জিজ্ঞাসা করিলে সে ক্ষমা প্রার্থনাসূচক স্বরে
বলিয়া উঠে “আপনি ওভাবে পরিচ্ছদ পরিধান
করিয়াছেন কেন ?

এই সম্বন্ধে স্বামী বলেন :—“The sym-
pathies of these men were limited
within the narrow range of their
own language and their own fash-
ions of dress. That very man who
asked me why I did not dress as
he did and wanted to illtreat me
because of my very dress, is in all
probability a very good man ; he

may be a good father and a good
citizen ; but the kindness of his dis-
position died out when he saw a man
of different dress. The one point
we ought to remember is that we
should always try to see others
through their own eyes. I never
wish to judge the customs of one
race with a different standard.”

কাজেই আশা করা যায়, ভারতবর্ষের বিচারে
মোটোর-যানের দ্রুতগতি বা তারহীন টেলি-
গ্রাফকে নব্যবিচারক, গায়ত্রী, মন্ত্র রূপে
ব্যবহার করিবেন না।

অপর পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত দিই।

ভারতবর্ষীয় অনেক পর্যটককে ইউরো-
পের লণ্ডন ও প্যারীসগরে আসিয়া মুগ্ধ হইতে
শোনা যায়। তাঁহার! উহাদের অভভেদী
অট্টালিকা, পারিপাট্য, বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা,
সাধারণের কর্মদ-বিহীন পোষাক, দ্রুতগমন,
কর্ম ব্যস্ততা, বিপণি-সমূহের বিচিত্র শোভা,
উদ্ভানের বায়ুসঞ্চারী ফোয়ারা, কৃত্রিম বৃক্ষলতা
প্রভৃতির বিতান, বৈজ্ঞানিক আলোকের
ইন্দ্রজাল প্রভৃতি দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠেন
এবং ভারতের নব্য প্রণালীতে মুদ্রিত
পত্রিকা প্রভৃতিতে প্রবন্ধাদি লেখেন।

কল্পনা বড় সামান্য জিনিষ নহে, বিশেষতঃ
যে কল্পনার সহজ সত্যের আবিষ্কার সম্ভব,
তাহা না করিয়াও পারি না। বর্তমান লণ্ডন
কিম্বা প্যারীসগরী যদি ভারতের শঙ্কর-নান-
কের দৃষ্টিপথ গোচর করা যাইত, তবে তাঁহারা
স্বগিত-মূর্খা হইতেন, মনে করি না। তাঁহারা
কি লৌকিক জীবনপথে ঐ হর্ম্ম্য-সমূহকে
তৃণপুচ্ছ অপেক্ষা বেশী সমাদর করিতেন ?
ভারতবর্ষ এসব ছায়াবাজী ঘারা কখনও
বিভ্রান্ত হইতে পারে না।

টেমস্ বা সীন্ তীরশারী নর-নারীর
মনোজগতের উপর অমুখীকণ নিক্ষেপ করিলে

কি বিপরীত দৃশ্য দেখা যাইবে? একদিকে অলস্পর্শী প্রাসাদচূড়ার কীরিট-পর্যায়, অত্র দিকে বাসন-মুচ্ছিত মনোবৃত্তির অহুকুলগতি, তামসিকতার দীপালী! একদিকে কুবের-ভোগ্য কাঞ্চন-স্তুপ, অত্রদিকে দারিদ্র্যের আর্ন্তনাদ, প্রবৃত্তির শৃঙ্খল-বিহীন ভোগ-বিশাস! কস্তুরী-গন্ধ-বিভ্রান্ত মৃগশিশুর জায় ইতস্ততঃ-সঞ্চারী মানবপুঞ্জ বুটজুতার সংঘর্ষ, পক্ষীপুচ্ছ রচিত টুপীর বায়বগতি, সাক্ষ্য মেঘের বর্ষাবৈচিত্র্যে ভরপুর সিক্কের প্রাচুর্য্য প্রভৃতির মাঝে আনন্দ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে! সয়তান যেন কুহকজাল নিক্ষেপ করিয়া এই ক্রীড়ামন্দিরে বিহার করিতেছে।

দেখা যাইবে, একদিকে বহিরের পরিচ্ছন্নতার বাড়াবাড়ি, কর্দম ও ধূলি-বিহীন চত্বর, নিশ্চল খেত-মন্দির-গৃহ-সোপান, চর্চিক-সংঘর্ষ-উজ্জল পিত্তলের হস্তদণ্ড, মক্ষিকাতপ্ত ক্ষটিকদ্বার, নিঃকলঙ্ক অটোমেটিক স্ত্রীং, প্যারি গালিচার সুকুমার-স্পর্শ, কুশান-কেদারার স্ত্রীং মঞ্চের নৃত্য, ভূতা বালিকার মুহু হাস্য ও সম্ভাষণ, ইতর জনের স্রোতবেষ্টিত হস্তকম্পন প্রভৃতির মাদকতা, অত্রদিকে গৃহে গৃহে ক্ষুদ্রগজীর তুলিকায় অঙ্কিত কূটবুদ্ধিজালের প্রাকার বেষ্টন, হত্যাযজ্ঞের বাহুল্য, অর্থ ও শ্রমের হৃদয়হীন সংঘর্ষ, ব্যক্তিগত অদীনতা ও অবিনয় সংবাদ, পক্ষে প্রতিকলিত প্রতিদৈবসিক ক্ষুদ্রতার চরম দৃশ্য, এবং মত্তবিপণির হর্ষ কোলাহল প্রভৃতি। হিংসা হৃদয়ের লক্ষ্মণী শ্রান্তিহীন সংগ্রাম, দুর্ব্বল পীড়া ক্লান্তি এবং মানির আতিশয্য, অহরহ দাহকর রাক্ষসী ক্ষুধার প্রাহুর্ভাব, উহাদের হৃদয়রক্ত-রঞ্জিত। বহিরের পরিচ্ছন্নতা অনেকের চোখে পড়িবেই না। বিপণির বিলাস দ্রব্য তাহার নিকট অদৃশ্য হইবে; সে দেখিবে, একটা খ্রীষ্টানী কথার

উল্লেখ করিতে হইতেছে—একটা ছোট খাট পেণ্ডোমোনিয়াম।

ভারতবর্ষকে হৃদয়পথে এক মুহূর্ত্তের জন্যও যে অধিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে, তাহার পক্ষে ইউরোপ একমাত্র জগতের সেব্য পদার্থরূপে প্রতীয়মান হইবে না।

ইউরোপকে সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে এবং ঠিক বর্ত্তমান সময়ে আবশ্যকও নহে। দৃষ্টির বৈপরীত্য সম্ভব, একথার দৃষ্টান্ত দিতেছি মাত্র।

কাজেই দৃষ্টির প্রকৃতিভেদ রহিয়াছে। বহিদৃষ্টি পর্য্যাপ্ত নহে, ইহাতে যথার্থ জ্ঞান হয় না; আমরা শরীরস্থ রক্তসঞ্চালন দেখি না, বলিয়া আমাদের শিরায় যে কথিরের কাজ করিতেছে না, এমন নহে।

ভারতবর্ষকে বখ্যাকস্তপ-বেষ্টিত মানবের জায় অকর্ণ্য্য মনে করি ঠিক নহে। ঐ তাপসের হৃদয়ে যে ছতাসন জলিতেছে, তাহা ভবিষ্যতে কোন্ ভাবপ্রণয় উপস্থিত করে, তাহা কে জানে?

কোন্ দিক হইতে এই বখ্যাকাবৃত মৌনী মুনিকে বিচার করিবে? ক্ষাত্র ধর্ম্মের অভাব? সে তরবারীর দ্বারা বিক্রপকারীর দেহ ছিন্ন করিতেছে না? ষ্টীম এঞ্জিনের বয়লার সম্পর্কীয় নিগূঢ় তথ্য জানিবার সাধনা তাহার নাই? একথা ভুমি কি বিশ্বাস করিবে যে, ক্ষত্রিয়ের বাহুশক্তি অপেক্ষা তাহার বাহুশক্তি বেশী, শূদ্রের সেকা অপেক্ষা তাহার সেবা-ধর্ম্ম কম নহে? বৈজ্ঞানিক বিষয়বুদ্ধি অপেক্ষা তাহার বুদ্ধি আবিল নহে।

আমাদের বানপ্রস্থালদীর দৈহিক-ক্ষমতা কোথায়? মহুসংহিতাকার বলিতেছেন :—
“পুং মূলফলৈবাপি কেবলৈব বর্ত্তয়েৎ সদা ;
কালপটৈঃ স্বয়ং শীর্ষৈ বৈধানসমভেষিতঃ ॥

ভূমৌ বিপরিবর্তেতঃ তৈঠেষা প্রপদৈর্দিনম্ ।

স্থানামনাত্যাং বিহরেৎ সবনেন্থপয়রণঃ ॥

গ্রীষ্মে পঞ্চতপান্ত স্যাদ্বর্ষাবস্ত্রাব কামিকঃ ।

আত্মবাসান্ত হেমন্তে ক্রমশো বর্জয়ন্তপঃ ॥

মহু ৬—২১ হইতে ২০

“অথবা কেবল পুষ্প, মূল, ফল দ্বারা সর্বদা জীবিকা করিবে বা সহকারে পরিপক্ক ফল, যাহা বৃক্ষ হইতে আপনিই পতিত হয়, তদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে এবং বানপ্রস্থের অস্ত্র জীবিকা, যাহা শাস্ত্রে আছে, তাহাও ভোজন করিবে।”

“কেবল ভূমিতে লুটিয়া যাতায়াত করিবে অর্থাৎ নিয়মিত স্থানে ও আসনে একবার উখিত হইবে, একবার পর্যটন করিবে এবং পদাগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া দিন যাপন করিবে এবং কিছুকাল উখিত ও কিঞ্চিৎকাল উপবিষ্ট থাকিবে, মধ্যে পর্যটন করিবে না। সাংস্র, প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন সময়ে নান করিবে।”

“গ্রীষ্মকালে চতুর্দিকে অগ্নি, উর্দ্ধে সূর্য্য, এই পঞ্চ তাপে আত্মাকেও তাপিত করিবে, বর্ষাকালে অনাবৃত স্থলে গাত্ৰাবরণ ব্যতিরেকে বৃষ্টি ধারার দণ্ডায়মান হইবে এবং হেমন্তকালে আত্মবসন পরিধান করিবে, এইরূপে ক্রমে ক্রমে তপস্যা বৃদ্ধি করিবে।”

এইরূপ শারীর চর্চা কোন কল্পিতের বিভীষিকা জন্মাইবে না? তারপর মানসিক চর্চা? সাংখ্যিকার উল্লেখ করেন।—

“যমনিয়মান প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা-
ধ্যান সমাধয়োহষ্টাবঙ্গণি।—২১২২ছন্দঃ ।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, এইসকল বহিরঙ্গ, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অন্তরঙ্গ ভারতে তত্ত্বাধেবীর মানসিক চর্চা।

ঋগ্বেদের মানসচর্চামূলক এই অষ্টাঙ্গ-
যোগ ধর্মগ্রন্থ মাঝেই আছে, ইহা ভারতবর্ষের

চিত্ত-চর্চার একমাত্র উপায়। সকলেই এই সমস্ত ব্যাপারে অভিজ্ঞ, এমন বলি না, তবে তত্ত্বাধেবী কাহারও ভারতবর্ষে এই প্রণালী অবিদিত নহে। কাজেই বস্তুকে উপ-
বিষ্ট ব্যক্তি নিতান্ত উপহাসের বিষয়, এমন মনে হয় না।

বাহিরের চাকচিক্য দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মৌলিক ভাব-সম্প্রদায় বিস্থত হইলে চলিবে না। স্বামী বিবেকানন্দ এমেরিকার হারবার্ড ইউনিভারসিটিতে এক আলাপে কোন প্রশ্ন-
কারীকে বলিয়াছিলেন :—

“When I came to this country I found that the labourers were informed of the present condition of politics but when I asked them what is religion and what are the doctrines of this and that particular sect, they said: “We do not know, we go to church.” In India If I go to a peasant and ask him who governs you he says I do not know, I pay my taxes. But if I ask him what is religion he gives you a clear answer. He may not read or write but he has learnt all these from the monks and is very fond of discussing.”

বিলাতের লোক রাজা, মন্ত্রী, সভা, ইলেকসন লইয়া উন্মত্ত। আমাদের প্রজা-
সাধারণ এই সমস্ত চিনে না, জানিতেও চাহে না। তাহাদের পক্ষে শাক্ত-বৈষ্ণবের অধ্যাত্ম মতামত, রামদীতা রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতির জীবন-
লীলা, লক্ষ্মী সরস্বতীর পৌরাণিক চরিত্র প্রভৃতি, লাট সাহেবের গোলক-নৃত্যের ঘূর্ণি-
বাত্যা, লেডির মুষ্টিযোগ, ইলেকসনের কাড়াকাড়ি, উপাধির শিলাবৃষ্টি, ধর্মেটের ভোজবাজী অপেক্ষা প্রত্যক্ষতর এবং সত্যতর,
কারণ এই সমস্তের সহিত তাহাদের স্ব-
পিতৃগণ রক্তসঞ্চালন নিবিড়ভাবে যুক্ত। এই
সমস্ত চরিত্র-মূলক ভাবপুঞ্জ প্রতিমূর্ত্তে তাহা-

দেব দৈনন্দিন জীবনকে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে।

ত্যাগ তাহাদের পক্ষে বেশী কিছু নহে, ভারতবর্ষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ত্যাগ কোন জাতি জগতে দেখাইয়াছে কিনা; জানি না। ঐশ্বর্যের স্বর্ণতরঙ্গে ওতপ্রোত নৃপশিত ভারতবর্ষেই কেবল কমণ্ডলু-হস্তে কোপীনকণ্ঠে পথের ধূলি-লিপ্ত-ভিখারী হইয়াছে, কিন্তু এই খানে ত্যাগের লক্ষ্য ভিন্ন রাষ্ট্রীয় স্বাভিত্ত্য ও স্বাধীনতার জন্ত পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে যে সমস্ত আত্মবলি সম্ভব হইয়াছে, তাহা কখনও শুধু অধ্যাত্ম লক্ষ্য-বিরহিত পাশ্বে ক্ষাত্র প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ত নহে।

লোকচিত্তের মর্ম্ম কথার উপর তাহার কর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রকৃতি নির্ভর করে—কাজেই আমাদের দেশের হৃদয়বিরূপ আরাধ্য দেবতা কে?—এই বিচার করিতেই হইবে। এ দেবতার প্রাত্যহিক অর্চনা সনাতন কাল হইতে অখণ্ডভাবে ধ্বনিত হইতেছে। দেহ মন অকুণ্ঠিতভাবে ভারতবর্ষ এই চরম-লক্ষ্যের উদ্দেশে নিয়োগ করিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, সাময়িক উচ্ছ্বাস-জাত ক্ষণস্থায়ী শক্তি কাহারও লোভনীয় নহে, কিন্তু যে শক্তির শিকড় ও তন্তুজাল সহস্রবর্ষের জীবচিত্তের, ভক্তসাধকের, কর্ম্মাত্ম্যগীর হৃদয়-রূপে পুষ্ট হইয়া আজ অমর দেহ লাভ করিয়াছে, তাহার মূলচ্ছেদ করিতে কোন প্রগল্ভ নৃপতি সাহসী হইবে? কাহার কম্পিত হস্ত ধরিবার লক্ষ্য ধমনীযুত হিমাদ্রিকে স্থানচ্যুত করিতে চাপল্য প্রকাশ করিবে? এই জন্ত এই হ্রস্ব শক্তির অমোঘ সহায়তা লাভ করিতে হইবে। সমগ্র ভারতবর্ষকে দক্ষিণ সমুদ্রের বারিপ্রবাহে জল-প্লাবিত করিয়া পৃথিবী হইতে মুছিয়া না দিলে এই শক্তির

ধিনাশ সম্ভব হইবে না। হাইড্রোলিক প্রেস, বৈজ্ঞানিক-তরঙ্গ কিম্বা ধীর-ধ্রুৱের দ্বারা বর্ত্তমান নৃপতিবৃন্দ সেই চেষ্টা করিতে পারেন, তৎপূর্বে দুরাশা করা ভাল নহে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি নিবিড় প্রশ্ন উঠে।

গণ্ডু-জল-সঞ্চারী ঐতিহাসিকদের এবং আধুনিক সময়-বৃদ্ধদের কণায় ভাসমান রাজ-নৈতিকদের মুখে একটি কথা প্রায়ই উচ্চারিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর অপরাহ্নে তরল ইংরাজী বক্তৃতার দ্বারা ভাব প্রকাশ সুলভ হইলে ইহা যে কত শতবার উচ্চারিত হইয়াছে, জানি না। সে কথাটা বলিতে গেলে মুখই প্রদেশের তথাকথিত দেশপ্রেমে ভরপুর এক ব্যক্তির উক্তি মনে পড়ে—“The mass of India are sunk in the depth of ignorance and superstition” ইত্যাদি অর্থাৎ তাহারা অকর্ম্মণ্য, বিলাতের পলি-টিঞ্জের হিসাব রাখে না, অপরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করে, রেলগাড়ীতে চড়ে নাই, হৃর্ভিকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, দেশের কোন কাজ করে না, ভালমন্দ বোঝে না, নীতি-হীনতা পার্থক্য করে না, কুটারে বাস করে, গণ্ডমূর্খ, হয়ত পিতাকে পিতা, মাতাকে মাতা, কিম্বা ভ্রাতাকে ভ্রাতা বলিয়া জানে না। (Ignorant এর অর্থ ইহা ছাড়া আর কি?) দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্ম্মজ্ঞানহীন, আশ্রয়মানদীপ-সুলভ বস্ত্রজাতির ভ্রায় স্বভাববান্ কিম্বা গরিলা হইতে কিঞ্চিৎ উন্নততর অবস্থাবান।

ইহার অধিকাংশ উত্তর দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু যখন তাহাদের অকর্ম্মণ্য দেশের প্রতি, দেশের ধর্ম্মের প্রতি বক্তা . অপেক্ষা অপ্রেমিক বলিয়া কৃপা প্রকাশ করা : হয়, তখন নিতান্ত ধীর ব্যক্তিকেও বিচলিত।

হইতে হয়। নিজকে পণ্ডিত এবং সংস্কার-
হীন ঘোষণা করিয়া বিদেশী রাজপুরুষগণ
অথবা তাহাদের ভারতবাসী certified copy-
গণের স্তোক বাক্য লাভ করিবার কি অল্প
উপায় নাই ?

অকস্মণ্য জগতে কোন জীবই জীব নহে।
জীবের ধর্মই এই যে, কিছু কার্য্য না করিয়া
থাকিতে পারে না। প্রতিমুহূর্ত্তে মধুকরের
শ্রায় সে কর্ম্মচক্র রচনা করিতেছে। কত
দর্শনকার এই কার্য্যক্রম লইয়া আলোচনা
করিয়াছেন। উর্গনাভের তত্ত্বগঠিত রম্য
বৃত্তপুঞ্জের শ্রায়, মানবের প্রাত্যহিক চিত্ত
মূর্ছমূর্ছঃ কত জীবনকথা বুনিয়া তুলিতেছে,
ইয়ত্তা নাই। তবে কি ভারতবর্ষেই এই
অলভ্য নিয়মের ব্যতিক্রম রহিয়াছে ? এখানে
ইন্সপেক্টর বিদ্যুত-ডিনামো-শরীর আলোক-
পুলকিত দরবার-পুলিনে ইউরোপ হইতে
অপহৃত প্যাটিয়টিক্স রূপী সুরবাধান ক্লারি-
ঙনেটে নব্য-কঙ্কেরা ফুংকার দিলে “মাস”
(mass) নাচিয়া উঠে না, এই কি অপরাধ ?
ঐ রবে প্রাচীন ভারতের নবাইরাজী নাম
প্রাপ্ত নদ নদী উজান বহিয়া কুল ছাপিয়া
ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের খরচ বাঁচায় না, এই
কি দোষ ?

আজ এই পুস্তকিকাগণের নিকট সমগ্র
ভারতবর্ষ সুর বিহীন হইয়া গিয়াছে। কোন
সুর নাই, কোন গুণ নাই, কোন সৌন্দর্য্য
নাই, কিম্বা যাহা আছে, তাহা সামান্তমাত্র।
অতীতের ধূস্রোদ্য রহস্তময় সঙ্গীত-যন্ত্রের শ্রায়
জড়ীভূত হেমতারগুলি তাহাদের বাক-স্থানের
শ্রোত-মন্ডণ আঙ্গুলাগ্রে বাজিয়া উঠে না,
বিলাতী বড় বড় অর্গেন-ওয়ালারা যখন
ইহাকৈ শুক অলাবু-গুয়ের ক্রীড়নক বলিয়া
উপেক্ষা করিয়াছে, তখন তাহাদের শিখা

শিপীলিকাগুলি উহাকে আহাধ্য মনে করিয়া
উৎসাহে অগ্রসর হইবে না কেন ?

কিন্তু জিনিষটা ঠুবোধ্য হইলেই তাহা
অর্থহীন হইবে এখন কোন কারণ নাই।
পীরামিডের উপরে লিখিত অংকরগুলি বোঝা
যায় না বলিয়া তাহাকে শকুন্তলের চঞ্চু-অঙ্কিত
রেখাপুঞ্জ কল্পনা করিবার কোন কারণ নাই।

কাজেই মানবের কস্ম-চক্র-রচনা এখানে
হুগিত নহে—তবে এই কস্মচক্রটি কোন্
প্রণালীর এবং কোন্ লক্ষণ ও ধর্ম্মযুক্ত, তৎ-
সম্বন্ধে অজ্ঞতা ইহার অভাব অহুতবের অজ্ঞ-
তন কারণ হইতে পারে। কারণ যাহা বুঝি
না, তাহা বজ্ঞ আদরা কিছু নহে বলিয়া
পুলকিত হই।

কথামালার আছে, কতকগুলি ধন্ব এক-
বার এক হস্তোদেহ স্পর্শ করিয়া হস্তীকে
তাহার নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে কল্পনা করিয়া
লইয়াছিল, কারণ যাহাদের জ্ঞান যতটুকু
সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাহার যতটুকু মাত্র
উপলব্ধি করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল।

এই ক্ষুদ্রতার পক্ষিল দৃষ্টিপাতে ভারতের
বিরাট ও ব্যাপক ধর্ম্মাভুগত সমাজবন্ধনের
অচ্যুত শৃঙ্খলে বদ্ধ কস্ম-পরম্পরা চোখে
পড়িবে না। যে মস্ম-কেন্দ্রের ধ্রুব চৌম্বক
আকর্ষণে ভারতের পরিধির ক্ষুদ্রতম রেণু
পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইতেছে; প্রতি মুহূর্ত্তে যাহার
আগব-ধমনীতে ভারতের এই অবিচ্ছিন্ন
জীবনীশক্তি কাজ করিতেছে, তাহা চোখে
না পড়া আশ্চর্য্য কিম্বা অসম্ভব নহে। কারণ
যে তুলানশু লইয়া ওজন লওয়ার উৎসাহ
দেখা যায়, তাহা মেড-ইন জর্মনী বা “মেড ইন
ইংলণ্ড !” এই দীপস্নগত কাটাকাটি মারা-
মারি জাত দোহল্যমান সাময়িক চর্চার কদম
পষলে ডুব দিয়া নিজকে ব্রহ্মাণ্ডের বহুমুখী

অনন্তকাল প্রবাহিত আগ্রত দৈবী জীবন-ধারার রসান্বাদনে সমর্থ মনে করা অসম্ভব, সন্দেহ নাই। কিন্তু জগতের বিরাট ইতিহাস, ব্রিটিশ চ্যানেলের উত্তরস্থ এংলো-স্যাক্সন জাতির ক্ষীণ কলনাদ, করতালি বা স্তম্ভ দুঃখের উপর নির্ভর করে না, একথা না বলিয়া উপায় নাই।

তবে ভারতবর্ষ কোন জিনিষটাকে একান্ত কাম্য পরমার্থ বলিয়া মনে করিয়াছে? কোন দেবতা তাহার স্বদয়-পদ্মে সহস্রাধিক বর্ষ অধিষ্ঠিত রহিয়াছে?

ভারতের সাহিত্য তাহা মুক্ত-বক্ষে দেখাইবে। ভারতের যাবতীয় ললিতকলা, শিল্প ভাস্কর্য্য প্রভৃতি তাহা প্রমাণিত করিবে। ভারতের সমাজ, পরিবার এবং ব্যক্তি মাত্রই তাহা প্রতি মুহূর্ত্তে স্বপ্রকাশ করিতেছে।

ভারতে বিদেশীয় রাষ্ট্রপুঞ্জ কতটুকু স্থান অধিকার করিয়াছে? বিজ্ঞেতারূপে মোগল বংশ কতটুকু স্থান অধিকার করিয়াছিল? মানচিত্র হরিৎ বা লোহিতবর্ণ পূর্ণ করিলে অধিকার করা হয় না, অধিকার করা বড় শক্ত কার্য্য। বিশেষতঃ ভারতবর্ষকে অধিকার করা চিরকাল অসম্ভব ছিল, এবং অসম্ভব থাকিবে। তাহার নানা কারণ আছে।

সমুদ্রের উপর দু'খানি নৌকা ভাসাইলে ঐ বেলনে চড়িয়া হিমালয়ের স্থান বিশেষে উপনাত হইলে তাহাকে যেমন সাগর বা পর্বত অধিকার করা বলা যাইতে পারে না, তেমনি, ভারতের বহিঃস্থিতিকার উপর মোগল কয়েকটা তাঁবু ফেতিয়াছিল বলিয়া ভারত অধিকৃত হইয়াছে, বলা যায় না। ভারতবর্ষ মোগলের নিকট চিরকাল রহস্যময় ছিল। উত্তর মেসুর গ্রাম অনধিগম্য, দুর্দ্ব্যবস্থা, দুর্দৃষ্টি স্বেচ্ছা ভারতবর্ষ মোগলনেত্র হইতে বহু ক্রোশ

দূরে ছিল। কেবল সম্রাট আকবরই ভারত-বর্ষকে যথার্থভাবে অধিকার করিতে কলন করিয়াছিল; সে চেষ্টা বিশেষ সফল না হইলেও ভারতে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

মোগলের পক্ষে ভারত অধিকার করা যতটুকু সম্ভব ছিল, ইংরাজের পক্ষে ততটুকুও নাই। ইংরাজের নৌকা ভারতের কোথায়ও নোঙ্গর পর্য্যন্ত ফেলিতে পারিতেছে না। এজন্ত ইংরাজের প্রধান প্রতিনিধি আক্ষেপ করিতেছেন, ভারতবর্ষ এখনও পর্দাস্তরালে রহিয়াছে, এখনও তাহাকে বোঝা গেল না, দেখা গেল না। অবশ্য উহার এক শত একটা কারণ আছে।

এই সমস্ত জাতি স্তম্ভ ঐরাবতের লাসুলে উত্তীর্ণ মশকের অপেক্ষা ভারতের গ্রিণ কোটি কুটারের চিত্রালোক উজ্জল জীবনে অধিক স্থান দখল করে নাই।

তবে কি ভারতে মোগলরাজ্যের সম-সাময়িক আর কোনও গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল, কিম্বা এখনও আছে?

বস্তুতঃ রাজ প্রতিনিধির হতাশোক্তি মিথ্যা নহে। ভারতবর্ষ এখনও বহিঃগতের নিকট অবগুপ্তিত রহিয়াছে। ম্যাক্সিম গানের প্রাচুর্য্য, ডিনামাইটের ক্ষিপ্ত বেগ, টর্পিডো প্রভৃতি লইয়া ইংরাজ এখনও ভারতের উপকূলে শিরে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বসিয়া রহিয়াছে। ঐ বিরাট তলহীন সমুদ্রবৎ প্রতীয়মান পদার্থ এখনও অপরীক্ষিত, অলক, অজ্ঞাত, কুহেলিকাচ্ছন্ন-বৎ উদ্ভাসিত হইতেছে। বিংশ শতাব্দীর কামানের গোলক বৃষ্টি এখনও তাহার ক্ষুদ্র মসলিন-অবগুপ্তন খানি উড়াইয়া দিতে পারিল না।

বিদেশী রাজনীতিবেত্তা, পরিব্রাজক প্রভৃতি ভৌগোলিক ভারতের শাখা প্রশাখা

গৌলক বাঁধার রেখা সমূহের বিচিত্র গতিতে ঘুরিতে ফেরিতে ইতস্ততঃ করে নাই, কিন্তু প্রাণরূপী ভারতবর্ষ, অধ্যাত্মপন্থী, ব্রহ্মনিষ্ঠ ভারতবর্ষ, সহস্রাধিক বর্ষের সাধনা-উপলব্ধ স্বধর্মনিষ্ঠ ভারতবর্ষ, শত দার্শনিকের চিন্তাপুষ্টি সামাজিক ভারতবর্ষ, তাহার বিচিত্র ধর্মশ্রেণী-প্রবাহ এবং জটিল জীবন যাত্রার ঐকিক সম্পদ লইয়া এখনও হিমালয়ের শীর্ষ স্থান বা রত্নাকরের মহাহ' বক্ষেয় জায় অনাবিকৃত রাখিয়াছে।

ভারতের এই রুদ্ধ-মুখ সন্টার ফলে কত রকমের পাণ্ডিত্যমূলক কল্পনা-জল্পনা বর্ষিত হইতেছে, ইয়ত্তা নাই। সকলেই স্বকীয় খণ্ডোত-কিরণে ইহাকে বিন্বিত করিয়া অলীক উৎসাহ অমুভব করিতেছে, ইহাতে ব্যাপারটা অধিকতর অম্পষ্ট হইতেছে।

ভারতের কত ইতিহাস রচিত হইয়াছে—প্রতীচাদের উৎসাহ এক্ষেত্রে বেশী,—কত খ্রীষ্টান্ধ শকাব্দ প্রভৃতি জড়ীকৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের হস্তজনক পরিমাণ জ্ঞানের অভাব দ্বারা মুহূর্তেই প্রমাণিত হয়—ইন্দ্রধনু-বর্ণ-রঞ্জিত ভারতের দেহাংগুকের বিচিত্রতার মাঝে প্রবেশের অধিকার ইহারা পায় নাই। অপ্রেমিকের পক্ষে ইতিহাসের মাঝে সনাতন এবং সাময়িক এই দুই ব্যাপারের পার্থক্য নির্ণয় হুঃসাধ্য।

এজন্ত অধ্যাত্মনিষ্ঠ সামাজিক ভারতবর্ষ কাহারও চোখে পড়ে নাই। অথচ ইহার ইতিহাসই ভারতবাসীর পক্ষে একমাত্র সত্য পদার্থ—একমাত্র সনাতন ব্যাপার, যাঁহা অখণ্ডভাবে ভারতবাসীর জীবনস্থল কুহেলিকাচ্ছন্ন অতীতের নিভৃত আশ্রম হইতে বর্তমানের জটিল ধূলি-ধূসরিত মুহূর্ত পর্যন্ত ধারণ করিয়া আছে। ভারতবর্ষ অশ্রুখা হুঃবোধ, হুঃজের্য।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে ভারতবর্ষে ধর্মের একটা ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য আছে। ইহার সিংহাসন কখনও নৃপতি-বিহীন ছিল না—এখনও সে সিংহাসন শূন্য নহে; তাহাতে মহার্ষি মহিমায় নৃপতি উপবিষ্ট আছেন। ইহার গঠন, ইতিহাস এবং নীতিপর্যায় দ্বারা ভারতের দীনতম কৃষক পর্যন্ত চালিত হইতেছে। ভারতবর্ষের ব্যক্তি ও সমাজের জীবন-নিয়ামক এই নৃপতির সিংহাসন কেহ কাড়িয়া লইতে পারে নাই। সিংহদ্বারী কোথায়, তাহা পর্যন্তও শত্রু-সর্বস্ব মূর্খ তাতার নরমাণেরা বুঝিতে পারে নাই। আমরা সকলেই এই নরাধিপতির প্রজা। এইজন্ত গৌরব বোধ করা আশ্চর্য্য নহে। ভারতবর্ষ প্রতি পদক্ষেপে ইহা প্রমাণ করিতেছে। এই ধর্মের সাম্রাজ্য আমাদিগের নিকট কর আদায় করিতেছে।

সৌভাগ্যের বিষয়, ভারতবর্ষের ধর্ম-জনি-বটা religion বা ঐ রকম কিছু নহে—ভারতের “ধর্ম” বড় ব্যাপক জিনিষ, ইহা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, সাম্রাজ্য সব কিছুকে একই হৃদে ধারণ করিয়া আছে এবং ইহাদের অঙ্গাঙ্গের মাঝে এমন সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছে যে, ব্যক্তি মাত্রেরই কার্য্যে পরিবার, সমাজ, সাম্রাজ্য যুগপৎ সকলেই পুষ্ট হইতেছে। ইহা বিরোধ নিরাকৃত করিয়া সমগ্র শক্তিকে সংহত করিয়াছে।

ভারতবর্ষে মানবের বা সমাজের জীবনে কোন স্বতন্ত্র ডিপার্টমেন্ট নাই—স্বতন্ত্র আফিস, সেক্সন হাকিম বিরাগ করে না। এক কার্য্যের সহিত অত্র কার্য্যের তালুক-দেওয়া একাকীষ্ট নাই। “রিলিজিয়ান” এক “সীমানার মাঝে, স্টেট ভিন্ন সীমানার ভিতর, এই-

রূপ কোন নিভেদ নাই। ইউরোপ ডিপার্টমেন্টে বড় ভালবাসে, সেখানে শিল্পী হয়ত শিল্পবিশেষ লইয়া সীরা জীবন পরিশ্রম করে এবং তাহার পারিশ্রমিক পায়। ইহা ছাড়া তাহার বিশ্বজীবনের সহিত সম্পর্ক কোথায়, খুঁজিবার প্রয়োজন বোধ করে না। শ্রম-বিভাগের আভিমন্যে মানবজীবন বিশ্বয়কর ভাবে সঙ্কীর্ণ ও মূলহীন হইয়া উঠিতেছে।

সহস্রাব্দী বিচ্ছিন্ন জীবন চেপ্তার মাঝে মুদ্রিত পুস্তকে লিখিত “এটিকেট” এবং “গুড-ম্যানারস্”এর হুকুমই যা কিছু বন্ধন, এ সবে স্নায়ুতম খুঁটিনাটির প্রতি তাহাদের ধরতর দৃষ্টি। কোথায় ডিনারে কোন্ চাম্-চেটী কোন্ হাতে লইতে হইবে, কোন্ জিনিষের সঙ্গে সর্বপ্রথম কোন্ জিনিষ মিশ্রিত হইবে—আলাপ কিরূপ হইবে, কখন কে উঠিবে, কে বসিবে, ইত্যাদি ব্যাপার সম্বন্ধে একটা কোড্ প্রচলিত আছে। সেটা যদিও স্বসংস্কার বলিয়া কোলাহল উঠে না, তবু উহার নিয়মিত রক্ষায় প্রাণপণ চেষ্টা আছে।

ইহার প্রধান কারণ, সেখানে মানবের চেষ্টা-নিবহের মূলে কোন সংহত, ব্যাপক, বোজক অস্ত্র নাই।

কথোপকথন, চলাফেরা, কণ্ঠস্বর, হাস্য, দেখাসাক্ষাৎ, পরিচ্ছেদের প্রকৃতি ও প্রণালী, আতরাণ ‘লান্চন্’ ‘ডিনার’ ‘টি’ ‘স্নাপার’ ‘বল’ ‘লান্চপাটি’ ‘ক্রীড়া’ ‘রাজদরবার’ সম্বন্ধে সকলেই সেখানে একই নিয়ম মানিয়া চলিতেছে; ইহাই তাহাদের ‘সোসাইটি’। ব্যক্তি-নিবহ-রচিত এই ‘সোসাইটির’ মাঝে উপরোক্ত ব্যাপার লইয়া বাহা কিছু সাম্য; উহাই বলিতে গেলে ‘সোসাইটির’ ভিত্তি।

এই সময়ের উপর সেখানকার ‘সোসাইটি’ স্থাপিত।

যেখানে ডিপার্টমেন্টের রাজত্ব বেশী, সেখানে ইহা অস্বাভাবিক নহে। ইউরোপের মানব ইহা লইয়াই এমন বাড়ানাড়ি করে যে, নিতান্ত ইউরোপ-ভক্ত ছাড়া এ সব ভূমণ্ডলের অন্তান্ত জাতির পক্ষে বোঝাও কষ্টকর হয়। তাহাদের দৈনিক জীবনও নানাভাবে বিভক্ত, তাহাতে নানা প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে—‘মর্নিং ড্রেস্’, ‘ইভনিং ড্রেস্’, প্রভৃতির প্রাচুর্য্য বড়ির কাঁটার দ্বারা বিভক্ত দৈনিক কালবিভাগের দৃষ্টান্ত।

পূর্ণ মহুয়াবের মহাহুতবতা অপেক্ষা খণ্ড মহুয়াবের মত্ততা যেখানে কিছু বেশী—এজন্ত খণ্ডতা হিসাবে তাহার যতটা বাহবা প্রাপ্য, পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়া তাহার দৈন্ত ততটা প্রস্ফুট হইয়া উঠে।

ভারতবর্ষে এইরূপ আত্মবিরোধী সমাজ গঠিত হয় নাই—ভারতে ধর্মই সমাজকে ধারণ করিয়া আছে—ধর্মই মানবের প্রত্যেক কার্যকে অন্তর্ভূত করিয়া লইয়াছে। কথাটি অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিব।

ভারতবর্ষ মানবের গন্তব্য পথকে একটা মাত্র জন্ম এবং একটা মৃত্যুর মধ্যপ্রদেশস্থ কালে অবাস্তব মনে করে নাই। কাজেই এই সমাজের ভিত্তি হাঙের প্রকৃতি, ক্রীড়ার নিয়ম বা ডিনারের এটিকেটের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। মুক্তিযুদ্ধী অনন্তলগ্নে ইহা একটা পাছশালা মাত্র—কাজেই পাথের সঙ্কীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষে এই মুক্তিসঙ্কল্প, মনে করে। মানব সমাজেই মুক্তির আধিকারী, এজন্ত মানবের কর্মপরম্পরা এই ভবিষ্য লক্ষ্যকে অবহেলা করে নাই। আত্মাত্মিক চেষ্টাধর্ম.

নিবৃত্তি খুজিতে গিয়া ভোগবিলাসের তৃপ্তি-
হীন কূপে বাপ দেওয়া ভারতবর্ষে অসম্ভব
হইয়া উঠিয়াছিল ।

মানুষের প্রত্যেক কৰ্ম্মই তাহাকে মুক্তির
পথে লইয়া যায় এবং ক্রমশঃ শৃঙ্খল-মুক্ত
করিতে থাকে । ধনী, দরিদ্র, আসক্ত ও
উদাসীন, প্রত্যেকেই এই পথে অগ্রসর হই-
তেছে । মানবের প্রথরতা ও উগ্রতার
ভারতম্যে মানব স্বরূপের মাঝে, একই
জন্মে বা সহস্র জন্মান্তরে ঈশ্বরিচরিতম বস্তুর
সন্ধান পাইতেছে । এই জন্ম প্রত্যেক কৰ্ম্মই
এখানে ধর্ম্মের অঙ্গ, ধর্ম্ম সাধনের উপায়,
উর্দ্ধগমনের সোপান মাত্র । ব্যক্তিগত, পারি-
বারিক এবং সামাজিক কর্তব্য একই পথে
মানবকে অগ্রসর হইতে প্ররোচিত করিতেছে ।

কৰ্ম্মের ভিতর দিয়াই কর্তব্যবন্ধন প্রতি
মুহুর্তে ছিন্ন হইতেছে । যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা
আসক্তির বহুমুখী গতি সংযত হইয়া আসে ।
অভাবে অতিক্রম করিয়া চলা ভারতবর্ষের
ধর্ম্ম ; তাহাতে ইক্ষন দিয়া ভোগ লাগসা
বৃদ্ধি করিয়া নহে । তজ্জন্ম ইউরোপে উত্ত-
রোত্তর অভাব বাড়িয়া উঠিতেছে । ভারত-
বর্ষে তাহা সর্ব্ব প্রকারে সংক্ষিপ্ত হইয়া
আসিয়াছে । ইউরোপ অভাবে দূর করি-
বার জন্ম আরও দশটা অভাব সৃজন করি-
তেছে ।

বিলাতী দোকানের মূলা তালিকাগুলি
দেখিলে দেখা যাইবে, অশন-ভূষণ, আহার
বিহার প্রভৃতির জন্ম উপাদানের সংখ্যা
কিৰূপ, উত্তরোত্তর জটিল ও বিবৰ্দ্ধমান হইয়া
উঠিতেছে । কোন একটা কিছুতে তৃপ্তি
হইতেছে না, একটা হইতে অন্যটীতে অসংখ্য
পরিবৰ্দ্ধন দ্বারা সুখের মধুধারা বেশী করিয়া
আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা আছে ।

ভারতবর্ষ ঠিক বিপরীত প্রথা অবলম্বন
করিয়াছে । সুখের বৃদ্ধি অতাবকে সংক্ষিপ্ত
করিয়াই সম্ভব, একজন্ম যাত্রা ভোগবিলাসের
দ্বারা আকাজকা বাড়াইয়াছে, তাহা হইতে
মন সংহরণ করিয়াছে ।

একজন্ম ভারতে কোট, আলষ্টার, সার্ট,
বুট প্রভৃতি অস্বাভাবিক দানবী আকর্ষণ,
বক্তৃতা ও আন্দোলন ছাড়াও, স্বভাবতঃই
লুপ্ত হইয়া, ক্রমশঃ কোর্তী ও চট্টিজার
আসিয়া পৌছিতেছে । কিছুকাল পূর্বে হয়ত
জাপানের শ্রায় চেয়ার টেবিল প্রভৃতি কণ্টক-
মণ্ডিত গৃহে শুভ্র নির্মল ফরাস্ বিরাজ
করিবে ; অনেকের গৃহে ইতি মধ্যেই
করিয়াছে ।

প্রাচীন শিল্পকলা নবজাগরণে, শুধু
চিত্রে নহে—ভাস্কর্য্য প্রভৃতির মাঝেও নানাতন
ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিবে । তখন দেখা
যাইবে, আমাদের স্বল্প হইতে অনেক অনা-
বশ্যক বোঝা অন্তর্ধান করিয়াছে ।

ভারতবর্ষে উপরোক্ত অভাব-মূলক
আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, এই
ত্রিবিধ দুঃখ হইতে মুক্তিই যথার্থ স্বাধীনতা ।
এই স্বাধীনতার জন্মই ভারতে সামাজিক
বিধি বিধান, প্রভৃতি । সকলেই অজাত-
সারে বা জাতসারে এই স্বাধীনতা পথে ছুটি-
য়াছে—অন্ত কোন ক্ষুদ্র স্বাধীনতা ভারতব
লক্ষ্য হয় নাই ।

প্রত্যেক লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্ম যেমন সাধনা
প্রয়োজন, ইহার জন্যও ভারতবর্ষ সাধনা-
মগ্ন । কুস্তি-খেলোয়ার যেমন নানাবিধ
আহার প্রভৃতির দ্বারা দেহ পুষ্ট করে এবং
নানা কস্মর্মে দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাংসপেশী-
সমূহ দৃঢ় করিতে অভ্যাস করে, তেমনি,
বিক্ষিপ্ত-চিত্ত মানবের জীবনব্যাপী মনকে

লক্ষ্যানুসারে দৃঢ় করিতে বহু চেষ্টা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের ব্রহ্মচর্য্যবানপ্রভৃদি চতুরাশ্রমের প্রতিষ্ঠা লোকের চিত্তগঠনের জন্য—ইহা একরূপ এক্সারসাইজ্ (Exercise) বা ট্রেনিং—ক্ষুদ্র হইতে সহজে অজর্জ্বরিত চিত্তে মহতের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্ত জীবনের এই বিরাট শিক্ষাগারে এই সমস্ত শ্রেণীভাগ রহিয়াছে। ইহাও যেন এক শ্রেণীর-জিউজুংসু। অনেক চিন্তার, অনেক সাধনার পরে মনীষীরা এই উপায়ে প্রবৃত্তিকে সংযত করা সহজসাধ্য এবং এই পথে অগ্রসর হইলে অপেক্ষাকৃত স্বল্প কালের মাঝে হৃৎকেন্দ্র অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ সম্ভব মনে করিয়াছে। এতদসম্পৃক্ত অশুশীলনমূলক, ভারতের যাবতীয় আচার অর্চনা, ধ্যান ধারণা, আহার বিহার প্রভৃতি লোক চরিত্র গঠন করিয়াছে। অবশ্য অধিকারী ভেদে, জ্ঞান ও মননের তীব্রতা ও ব্যাপকতা ভেদে সকলের পক্ষে এক পথই অবলম্বনীয় নহে। কেহ অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মাঝে সন্ন্যাসের গৌরবে চিত্তকে অলঙ্কৃত করিয়াছে, প্রবৃত্তি-মুক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহা ক্ষমতাশালী পুরুষের পক্ষে সম্ভব—সাধারণের পক্ষে ধীরে ধীরে চতুরাশ্রমের চতুর্নন্দিরে অর্চনা করিয়া অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

যে জাতির বাহা লক্ষ্য, সে তাহারই অনু-রূপে আত্মগঠন করে। ইউরোপ compulsory military training এবং স্ত্রাণ্ডার ব্যায়াম পর্যায় প্রভৃতি দ্বারা প্রত্যেক মানবকে প্রস্তুত করিতেছে। বাহারি যেই লক্ষ্য, তাহার গঠন-প্রণালী সেই হিসাবে কল্পিত। কিন্তু বন্দুক ক্ষিপ্ততার সহিত গোলকসমূহ

স্থাপন ও সূন্দরে নিক্ষেপ মানব ইতিহাসের বোধ হ্রস্ব, চরম কথা নহে।

ক্ষয় আপান যুদ্ধের পরে আপানের “জিউ-জুংসু” নামক ব্যায়াম-প্রণালী ইউরোপে বড়ই আদৃত হইতেছে। কারণ “মারামারি” প্রভৃতির জন্ত এই প্রণালী উৎকৃষ্ট। ইহা আহার বিহার প্রভৃতি সংযত করিয়া মাংস-পেশী দৃঢ়কারী এবং হস্তকৌশলের ক্ষিপ্ততা বাড়ায়।

জানি না, কখনও মানব সমাজের চরম পরিণতি এবং লক্ষ্যের জন্ত মানব পার্থিব জীবনে ভারতের মহত্তর, ব্যাপকতর চতুরাশ্রম-মূলক বিরাট জিউজুংসু ব্যায়ামে মনোনিবেশ করিবে কিনা। এই নব জিউজুংসু তিন বৎসর বা পাঁচ বৎসরের মাত্র নহে। ব্রহ্মচর্য্য-গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস-মূলক বিরাট অশু-শীলন ঐহিক জীবনের সমগ্র সময়টা অধিকার করিবে। তবেই মানব ঈশ্বরিতম, প্রার্থিত-তম ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভের অনন্ত অমৃত-স্বাদের অনির্বাচনীয় অমলিন আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে।

এই জিউজুংসু কোন জাতিবিশেষের জন্ত নহে। ইহা সমগ্র মানব জাতির জন্ত, আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ভারতের সর্বশ্রেণীর সাধক ইহা সপ্রমাণ করিয়াছে। ভারত যে স্বাধীনতা চাহে, তাহার জন্ত উপরোক্ত চতুরাশ্রমিক জিউজুংসু সকলকে অধ্যয়ন করিতে হইবে। ভারতের বাহা আদর্শ, তাহার অনুরূপে অশু-শীলন-প্রণালীও নির্বাচিত হইয়াছে।

‘আশ্রম’ের নামেই সম্প্রতি আমরা চকিত হই এবং সংসার হইতে অস্বাভাবিকভাবে ছিন্ন এক সম্প্রদায়ের কথা মনে উঠে। নিবিড় ধর্ম্মপ্রাণতা আমাদের পক্ষে হস্তগত হইয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ ইউরোপের

আদর্শ অহরহ আমাদের চোখে ভাসিতেছে— তাহা হৃদয়বিশেষে ভারতের আদর্শকে বর্তমান সময়ে স্নান করিয়া তুলিয়াছে । ভারত-বর্ষে ধর্মের যে কোন স্বতন্ত্র ডিপার্টমেন্ট নাই, ইহা বাল্য কিশোর, যৌবন বার্কিক্য সর্ব-সময়েই যে আমাদের কর্মপুঞ্জকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, অন্তত আমরা এই চোখেই ভারত-বর্ষকে দেখি—তাহা আমরা ভুলিয়া যাই । একজন্মই বর্তমানে আশ্রম-বিভৌষিকা দেখা যায় । কেহ কেহ বলেন, বর্তমানের হোটেল-যুগে আশ্রম করা চলে না ।

তাঁহারা ভুলিয়া যান, আশ্রমকে যে অরণ্যের মাঝে করিতে হইবে, কিনা হিমালয়ের চূড়ার উপর কল্পনা করিতে হইবে, এমন কোন কারণ নাই । গৃহীর গৃহই আশ্রম, অর্থাৎ গৃহী গৃহকে মননের দ্বারা ধর্মকর্তৃক অনুমোদিত ও আদিষ্ট মনে করিবে, তবেই তাহার আসক্তি সংক্ষিপ্ত হইবে । সলিল-মগ্ন শতদল যেমন জলদ্বারা স্পৃষ্ট হয় না, তেমনি, আসক্তিশূন্য-চিত্তে গৃহকর্ম করিবে, উদ্দেশ্য হুছে, ভগবদ্ প্রাপ্তি ।

অবশ্য বাহারা মানবজীবনকে প্রজাপতির জীবন হইতে পৃথক্ করিতে পারে না— তাহারা উপরোক্ত কর্মপরম্পরা উপলব্ধি করিবে না ।

জাতিবিশেষে আদর্শের তফাৎ আছে— এখন পর্য্যন্ত ইংলণ্ড জাতীয় সঙ্গীতরূপে এই গান করিতে ইতস্ততঃ করে না :—

“Rule Britannia, Britannia rules the waves.”

—এই “রুল” করিবার প্রবৃত্তি, তৃষ্ণার্ত বাসনা লেখানে লক্ষ্য । আর কিছু চাহে না, কেবল “রুল” কর, “রুল” কর । জাহাজ ভৈরায় কর, আকাশ-মান হাওয়ার উড়াও ।

অন্ততঃ, অস্ত্র কোনও প্রবৃত্তি এই সমস্ত জাতীয় সঙ্গীতে ছায়াপাত করিতে সমর্থ হয় নাই ।

মানবের অক্ষুরন্ত শক্তি—“ডিনামো” যদি সব কিছু ছাড়িয়া একটা বিষয়ে ক্ষিপ্ত হয়, তবে সাময়িক অলৌকিক সফলতার উচ্ছ্বাস তাহাদের দ্বর্গভ হইবে না—কিন্তু তার পর ? সুরাসুর যুদ্ধে অসুরেরা কি কখনও ক্ষণিক জয়লাভ করে নাই ? মানবের ইতিহাস কি ইতিমধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছে ? যদি না হইয়া থাকে, তবে কোন প্রদেশে কি পরিমাণ ভাব-সম্পদ দ্বারা পার্থিব জ্ঞানকে অলঙ্কৃত করিবে, তাহা জানিবার এখনও বাকী আছে ।

ইউরোপে যে জ্ঞানের চর্চা নাই—এমন নহে । তবে তাহা সঙ্গীর্ণ আদর্শের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে হইতেছে—একথা বলিলে বিশেষ অন্তায় করা হয় না । কারণ উল্লেখ করিতেছি ।

ইউরোপে অসংখ্য বৈজ্ঞানিক এবং রসায়নজ্ঞ সুধী সাধনামগ্ন আছেন । কিন্তু কেন ? সে কি পৃথিবীর দুঃখতার লঘু করিবার জন্ত ? সে কি স্বার্থযুক্ত জ্ঞানের জন্ত ? প্রকৃতির কয়েকটা শক্তি আয়ত্ত করিবার জন্ত ইউরোপ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে । কোনও শক্তির অপচয় তাহার পক্ষে দুঃসহ । জলপ্রপাতের বেগ, বায়ুর গতি, উষ্ণ জলের বাষ্প, স্বর্ণ-জাত বিদ্যুত, অরণ্য-পাদপের দার্ঢ্য প্রভৃতিকে কোশলে নিজের কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছে । রাবণ কর্তৃক অবরুদ্ধ আদিভাগ্যের জ্ঞান পঞ্চভূতের শক্তিসম্পদ তাহার নৈজজাল-যষ্টির কম্পনে শিহরিয়া উঠিতেছে ।

কিন্তু ঐ সব শক্তি আয়ত্ত করিবার জন্ত তাহার প্রাণপণ চেষ্টা কেন ? একটা কথার উত্তর পাওয়া যায় । ঐহিক সম্পদ-বাড়াইবার

জন্ত—অর্থ সঞ্চয়ের জন্ত, অর্থ সঞ্চয় দ্বারা স্বথবাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্ত।—ইহাই তাহাদের হৃৎকথ নিবৃত্তির উপায়ের আদর্শ। যদি এই মুহূর্তে দেখা যায় যে, তাহাদের চেষ্ঠায় পাউণ্ড শিলিং (Pound-shilling-pence) নাই—তদ্বারা অর্থ বৃদ্ধি হওয়া সম্ভবপর নয়, তবে যে প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়কে আজ ইউরোপ পূজা করিতেছে, কল্যাণ তাহাকে পদাঘাত করা আশ্চর্য্য নহে।

এখনও উপরোক্ত ব্যাপারের দৃষ্টান্ত ঘটিতেছে। ইউরোপের মার্কনি এবং ভারতের জগদীশচন্দ্র বসু, উভয়েই একই সত্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মার্কনি ইউরোপের রক্তাশ্বযাত্রী সংস্কার ও শিক্ষাদ্বারা তারহীন টেলিগ্রাফের দ্বারা অর্থ উপার্জনের নানা পন্থায় ঘুরিয়াছে—কি করিয়া তাহার আবিষ্কারকে Pound-shilling-penceএ পরিণত করা যায়, তজ্জন্ত তাহার প্রাণপণ শ্রম। ভারতবর্ষে জগদীশচন্দ্র তাহার প্রথম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রকে প্যাটেন্টও করিলেন না—তবু বলিলেন—“আমি সেই সত্যের সন্ধান পাইয়াছি—এবং তাহাকে প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি—যাহা চারি সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতের তত্ত্বজ্ঞানীর মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছে—

“He who sees oneness of things in this universe to him alone belongs eternal knowledge and to none else...” জগদীশচন্দ্রের সম্মুখে স্বর্ণকুন্তলা, রৌপ্যাস্ত্রা, হীরকবলয়া অর্থদেবী স্নান হইয়া গেল,—অনন্ত জীবন-পথের এই পার্থিব পাছশালার আত্যন্তিক হৃৎকথ, নিরাক্ষরগাথ সহস্র বর্ষাধিক কালের তপস্ব্যাময় মনীষীমুণ্ডি ভাসিয়া উঠিল—বিনি বলিয়াছিলেন—“এক রূপেণ বাঁবস্থিতো যো অর্থঃ সঃ পরমার্থঃ।”

কিন্তু ভারতবাসী এই পরমার্থ সন্ধানে আত্ম-হারা হইবে না? সহজেই দেখা যাইতেছে, ভারতের ধর্ম বিচিত্র প্রকৃতির, ইউরোপের প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ভারতবর্ষের ধর্ম বড়ই ব্যাপক—ইহার লক্ষ্য অপেক্ষা বৃহত্তম লক্ষ্য কল্পনা অসম্ভব—ইহার সাধনা-প্রণালীও সর্বোপ বা সাময়িক নহে—হইতেও পারে না। ইহা ভারতবর্ষকে ওতঃপ্রোতভাবে বেঁধেন করিয়া আছে। বর্তমান যুগে ভারতের এই চুল্লীক্য গুপ্ত সাম্রাজ্য চূর্ণ করা অসম্ভব; ইহা হইতেই ভারতে শোণিত সঞ্চার হইতেছে—ইহার প্রাণরক্ত দ্বারা শব্দরাঢ্য হইতে আধুনিক যুগের রাজর্ষি রামমোহন পর্যন্ত পুষ্ট হইয়াছেন। তবু জ্ঞানবোগীর কথা নহে—ভারতের দীনতম মানব এই ভাবচক্রের উত্তরাধিকারীরূপে তাহা ভোগ করিতেছে।

এই আদর্শে ভারতবর্ষকে বিচার করিলে বিস্মিত হইতে হইবে।

যে ব্যক্তি বা সমাজ যাহাকে পরমার্থ মনে করে, তাহার জন্তই সে ত্যাগ করিতে অগ্রসর হয়। ইউরোপ অর্থসঞ্চয় দ্বারা ঐহিক হৃৎকথের নিবৃত্তি সম্ভব মনে করিয়াছে—এজন্ত তাহা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার (যাহা না হইলে অর্থ-সংগ্রহ অসম্ভব) জন্ত দলে দলে লোককে মৃত্যুমুখে পাঠায়, কামান গোলা প্রভৃতি প্রস্তুত করে। অস্ত্রাস্ত্র মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রাদিও কল্পনা করিয়া থাকে। এবং এইজন্ত বতটুকু একতার প্রয়োজন, তাহা তাহার পক্ষে একান্ত সহজে লক্ষ্য হইয়াছে। আজ একটা রণতরী ইংলণ্ডকে নখাগ্র দ্বারা স্পর্শ করুক—ইংরাজ-সমাজ আত্মকলহ এবং বিরোধ তৎক্ষণাৎ ভুলিয়া “যুদ্ধং দেহি” বলিয়া অগ্রসর হইবে, এইরূপ একতা বাহির হইতে উদ্ভ-

এরাতর সংঘর্ষ ও আক্রমণ দ্বারা তাহাদের
সংস্কারগত হইয়াছে । ইউরোপের সাম্রাজ্য
বাণিজ্যমূলক—রণসজ্জাও সেই জন্ত ।

অণ্ড অস্ত্রাস্ত্র বিষয়ে ইউরোপে পার-
স্পারিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বেচ্ছাচারিতা অত্যন্ত
অধিক । শুধু অর্থ ও আহারের জন্ত এই
সংহত চেষ্টার তুলনা শুধু প্রাণীতত্ত্ববিদের মতে
ইন্তর জন্তদের মাঝেই দেখা যায় । পিপী-
লিকার এই আত্মরক্ষামূলক একতা অত্যন্ত
অধিক—মধুমক্ষিকা অপেক্ষা অধিক আর
কাহারও নাই ।

ফ্রেডারিক বারবরোসা (Frederic Bar-
borossa) হইতে যখন ইতালীয় নগরগুলি
একত্র হইয়া সংগ্রাম পুরস্ক ১১৭৭ খ্রীষ্টাব্দে
প্রথম চার্টার (charter) করতলগত করে,
এরোদশ শতাব্দীতে Cologne এবং Brun-
swick যখন ব্যারণগণের বিরুদ্ধে Hansa-
tic league গঠন করে—তখন হইতে এই
প্রবৃত্তির উদ্ভব অনুভূত হয় । অবশ্য তখন
আরবদের সহিত সংঘর্ষে যুক্ত হইয়া ইউরোপ
সবে মাত্র বর্ধরতা অতিক্রম করিবার সূচনা
করিতেছিল ।

বস্তুতঃ ইউরোপ এখনও এই মধুকরের
বৃত্তি অতিক্রম করিতে পারে নাই । চারিদিক
হইতে মধু সঞ্চয় দ্বারা এবং মধু ভাণ্ড আক্রমণে
দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য পুচ্ছাগ্রে বিষাক্ত হন্
লইয়া আত্মরক্ষা করা—এই স্বার্থমূলক একতা
ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান কথা । তবে
সৌভাগ্যক্রমে ইউরোপকে এসিয়ার সংস্পর্শে
আসিতে হইয়াছে—এখানকার মৃত্তিকা
স্রোতাবেগে ভাসিয়া গিয়া সেখানে ক'একটা
অতি ক্ষুদ্র দ্বীপবিন্দু সৃজন করিয়াছে, এতদ্ব্য-
তী একটা লোক বিশ্বজনীন ভাবালোক হইতে
নিক্ত হয় নাই ।

একতামাত্রই শক্তিমূলক, চৌর্য্য, নরহত্যা
বা যে কোন কার্যের জন্তই হোক পাঁচজন
লোক এক উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হইলেই
একটা সংহত ক্ষমতা জন্মে । ইহাতে
করতালি দেওয়ার কিছুই নাই । তবে প্রশ্ন
এই—মধুকর বৃত্তির জন্ত একতাই কি শ্রেষ্ঠ
একতা ? তবে মানব ও মধুকর পিপীলিকা
প্রভৃতির মধ্যে তফাৎ কি ?

ভারতবর্ষে মানব দল বাঁধিয়া মধুকর
সাজিতে পারে নাই । মধু সঞ্চয়ই উদ্দেশ্য—
ইহার প্রতিবন্ধক হ্রঃসহ ঈর্ষা ও হিংসা জাগ্রত
করিয়া তুলিবে—এমন ব্যাপার ভারতে ঘটে
নাই ।

এখানে শাস্ত্রধর্ম চরম ব্যাপার ছিল না ।
তাহা ব্রাহ্মণ্যের অর্জিত জ্ঞানালোক, এবং
অগ্র বর্ণদিগের নানা বন্ধন-রজ্জুতে সংবত
ছিল ।

প্রাচীন সাহিত্যে ভারতের নৃপতিগণের
দিগ্বিজয়ের বিবরণ পাওয়া যায় । কিন্তু তাহা
মধু সঞ্চয়ের জন্ত নহে । কালিদাস নৃপতি
রঘুর দিগ্বিজয় ব্যাপারের অন্তে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ
বর্ণনা করিয়াছেন । ইহাতে স্পষ্ট বোঝা যায়,
এই বিশ্বজয়ের মূলেও ধর্মভাব ; রক্তলোলু-
পতা বা অর্থোদ্দেশ্যে শকুনিবৃত্তি চরিতার্থতার
জন্ত নহে । রঘু অনন্ত রত্ন সঞ্চয় করিয়া
বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সমস্তই দান করিলেন—তাহার
হস্তে “মুংপাত্রমাত্র রহিল—“মুংপাত্র শেবা-
মকরোংবিভূতিম্ ।” মানব ইতিহাসে এই-
রূপ দৃষ্টান্ত ও আদর্শ ভারতেই সম্ভব ।

বস্তুতঃ প্রাচীনকালে নিঃস্বার্থ ও ধর্ম
ব্যবস্থামূলক এই প্রণালীর দিগ্বিজয় পারম্প-
রিক সংযোগ এবং সংস্পর্শ দ্বারা সাহিত্য,
নীতি, জ্ঞান প্রভৃতি বিস্তার করিত ।

এমন কি, আধুনিক কালে দক্ষিণ ভারতে

এবং অন্যত্র 'বুর্জুয়াক্রমণের উচ্ছ্বাস ইত-
রতার পীড়ায় যে কয়েকটী স্বাধীন রাজ্যের
স্বত্বপাত হইয়াছিল, সেখানেও ক্ষুদ্রকীর্তি
চরম ব্যাপার হয় নাই। শিবাজী, রামদাস
এবং ভবানী মূর্তির অন্তর্সম্পর্ক তাহা প্রমাণ
করিতেছে।

পঞ্চাশতাব্দের নবম এবং দশম শতাব্দীতে
Hungarianগণ যে উৎপাতের দ্বারা
Constantinople হইতে স্পেন এবং ইতালী
পর্যন্ত জর্জরিত করিয়াছিল, জার্মানীর
Bavaria, Swabia লুণ্ঠন করিয়াছিল, দক্ষিণ
ফ্রান্সকে মরুভূমিতে পরিণত করিয়াছিল এবং
ইতালীকে জনহীন প্রায় করিয়াছিল; কিন্তু
Ruricএর অধীনস্থ সম্প্রদায় বা Bulgarian-
গণ, নর্মানগণ, ডেন্‌গণ ইউরোপকে যে
ভাব-প্রণোদিত হইয়াও বিধ্বস্ত করে, সে
ভাব আরবগণের সম্পর্কে আসিয়া কিঞ্চিৎ
বিশুদ্ধি লাভ করিলেও, যাহার পশ্চৎ একাদশ
হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী (১২৭০ খ্রী:)
পর্যন্ত উপলক্ষ্য-মাত্র ক্রশেন যুদ্ধ উন্মোচিত
হয়—যে ভাবের রক্ষার জন্য ত্রয়োদশ হইতে
চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দের (১২৭০ খ্রী: হইতে ১৪৮৫ খ্রী:)
মাঝে Feudalism অন্তর্ধান করে—Re-
formationএর যুগে, (১৪৮৫ খ্রী: হইতে
১৬৪৯ খ্রী:) যাহা Maximillian, Charles
V, Francis I, Gustavus Adolphus,
Cortez, Phillip II, Charles VIII,
প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া প্রস্ফুট হইয়াছে,
তাহা শেষযুগে আমেরিকার সম্ভব, Treaty
of Westphalia (১৭৪৮ খ্রী:) Treaty
of Aix Chapelle (১৬৬৮ খ্রী:) Peace of
Nymeguen (১৬৭৮ খ্রী:) Treaty of
Ryswick (১৬৯৭ খ্রী:) Treaty of
Utrecht (১৭১৩ খ্রী:) Treaty of

Paris (১৭৬৩ খ্রী:), Treaty of Car-
lowitz, "Pragmatic Sanction" প্রভৃ-
তির ইতিহাসের মাঝে মুকুলিত ও সম্ভবিক-
শিত, বোধ হয়। অপেক্ষাকৃত ভাবপ্রধান
ফরাসীজাতি এই মধুর বৃত্তি অপেক্ষা উচ্চ-
তর আদর্শ স্থাপন করিতে যাইয়া কুরুপ লণ্ড-
তও ও বিপর্যস্ত হইয়াছে, তাহাও কাহারও
অবিদিত নহে।* এই উচ্চ ভাব কর্তৃক সাম-
য়িক উচ্ছ্বাস লাভ করিয়া ইউরোপ মধুর
বৃত্তির জন্ত যতটুকু ভাব দরকার, ততটা গ্রহণ
করিয়া অবশিষ্ট উদ্যোগ করিয়া ফেলিয়াছে।
কল্পনা ও ভাবমূলক আদর্শ এই বৃত্তির অমু-
কুল আদর্শ নহে বলিয়া ইউরোপ তাহা পছন্দ
করে না।

এজন্য ইউরোপ প্রত্যেক বিষয়ে Historic-
al methodএর দোহাই দিয়া আশ্রয়লাভ
করে। ইউরোপ Historic হইতে চাহে,
Ideal নহে। অথচ কল্পনামূলক ভাব
অর্থাৎ 'Ideal'এর প্রভাব তাহার অস্বীকার
করিতে পারে না। কোন ইউরোপীয় পণ্ডি-
তের স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:—

"We have never seen in our genera-
tion—indeed the world has never
seen more than once or twice in all
the course of history—a literature,
which exercised such prodigious
influence over the minds of men
over every cast and shade of in-
tellect as that which emanated
from Rousseau between 1749 and
1762. It was the first attempt to
re-erect the edifice of human
belief after the purely iconoclastic
efforts commenced by Bayle and in
part by our Locke and Voltaire."

এ বিষয় আলোচনার স্থান এই ক্ষুদ্র
প্রবন্ধ নহে, তবে ইংরাজেরা আমাদের :

* ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস স্মরণ্য।

Ideal দিকটা একেবারে কেন উপলব্ধি করে না, তাহার কারণ ইহা ছাড়া আর কিছু নহে। ইউরোপের factএর উপর বড়ই আস্থা, কোন্ idealএর দ্বারা সমাজকে গঠন করা যায়, তাহা বিশ্বাস করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি হয় না। এই কারণেই ইংরাজ এবং তাহাদের শিষ্যগণ বর্তমানের ধর্মাদিষ্ট এবং ধর্মাহুরঞ্জিত বর্তমান ভারতের বিরাট ভাবময়ী উচ্ছ্বাস-বন্যাকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই।

ভারতের আদর্শের সহিত রাষ্ট্রনৈতিক চেষ্ঠা-পরম্পরার যোগ কোথায়, আমাদের 'মাস্' (Mass)-এর ত্যাগের ক্ষেত্র ও পরিধি

কোথায় এবং বর্তমান জগৎব্যাপী তাহার প্রয়োগ প্রতিষ্ঠা এবং অব্যর্থ শক্তি কোথায়, এবং সেই শক্তি প্রাপ্তির জন্ত আমাদের চেষ্ঠার স্বরূপ কি হওয়া উচিত, বিশেষতঃ ভারতের মহান আদর্শ অকলঙ্ক রাখিয়া সাময়িক পথে কি ভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন, তাহা পরে আলোচনা করিতেছি; কিন্তু ভারতের ভাবময়ী ইতিহাস (Psychological History) বিস্মৃত হইলে বর্তমানকে উপলব্ধি করা যেমন দুষ্কর হইবে, তেমনি, তাহার প্রতি-বিধানের পথ, হেমস্তের শিশিরাচ্ছন্ন অরণ্যানীর জায় হ্রগম ও হ্রলক্ষ্য বোধ হইবে। ক্রমশঃ।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

অদেহ-প্রেম ১. (৫)

৪র্থ অঙ্ক।

১ দৃশ্য।

স্থান—কেদার বাবুর অন্তঃপুর।

কাল—প্রভাত।

কেদার বাবুর জীর'দেহ উদ্ভবন-রঞ্জ-লবিত।

(বী দণ্ডারমান)

বী। ওগো! সর্বনাশ হোয়েছে। ওগো শীগগির এস গো। বাবু! বাবু! সর্বনাশ হোয়েছে—

(বেগে ধীরেন্দ্রের প্রবেশ)

ধীরেন্দ্র। কি হয়েছে? কি হয়েছে?

বী। আরে সর্বনাশ হোয়েছে।

ধীরেন্দ্র। বাবা, বাবা ছুরি নিয়ে আসুন।

বী। কি কোরেছেন দেখুন এসে।

(ধীরেন্দ্র তাহার মাতার লবিত দেহ উচ্ছে ধরিয়) বাবা! বাবা!—

(নেপথ্যে—কি কি!)

(বেগে কেদার বাবু ছুরি লইয়া প্রবেশ করিলেন, রঞ্জু 'কাটিয়া' দেখে নাশাইলেন)

কেদার বাবু। ধীরেন—ডাক্তার ডাক্তার—

(ধীরেন্দ্রের বেগে প্রস্থান)

বী। বাবু—কি হবে গো, কি হবে, পরাণ বেরিয়ে গিয়েছে বাবু। মা ঠাকুরপু সগেগে গিয়েছেন। গঙ্গা! গঙ্গা!

(প্রতিবেশিনীর প্রবেশ)

প্রতিবেশিনী। হায় হায় কি হলো!

কাল যে সুনীতির মা আমার বলেছিল—সুনীতির শোক সহ্য কর্তে পাচ্ছিলে। আমি মরোঁ। সত্যিই তা করোঁ! হায় হায়!

কেদার বাবু (লাফাইয়া) হোহো বহৎ আচ্ছা। কোথায় সুনীতি? ওই সুনীতি শুয়ে রয়েছে। মেয়ে এমন কোরে শুয়ে রয়েছে কেন গা?

(ধীরেন্দ্রের ডাক্তার লইয়া প্রবেশ)

"(ডাক্তারের প্রতি) তুমি কৈ রূপচাঁদ বৈবাহিক, পাঙ্কি, পাষণ্ড, আমার মেয়েটা গলা টিপে মেরে ফেলেছিস—হো হো (হাসি)

সুনীতি—মা তোমায়ে বিয়ের জন্ত যত টাকা লাগে, আমি খরচ করোঁ। ওগো

ভাত দেও—দীক্ষা বেরোবো। আজ যে বন্ধকো
খত রেজিষ্ট্রি কর্তে হবে। তা নলে ত
যেয়ের বিয়ে হবে না—হবে না—হবে না।

(আর দুই জন প্রতিবেশিনীর প্রবেশ।)

তুই কে? বাড়ী নিলাম কর্তে এসে-
ছিস্? টাকাটা যোগাড় কোরে দিচ্ছি—
শুনবিনে?—খুন কর্কো (যষ্টি গ্রহণ) খুন
কর্কো—কি করি—কি করি—দীয়েজ
(তাহার বাবাকে ধরিয়।) বাবা করেন কি?
বাবা আস্থন, আস্থন, এ ডাক্তার বাবু—

ডাক্তার। ভরসা নাই।

(ডাক্তারের প্রস্থান)

কেদারনাবু। ভরসা নেই? সুনীতির
বিয়ে হবে না? টাকা কর্ক পাওয়া যাবে না?
বাড়ী বন্ধক দেব—য়া, য়া—

৫ম অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

স্থান—রামধন বৃদ্ধের অন্তঃপুর।

কাল—রাত্রি।

জমিদার রামধন বাবু ও তাহার
স্ত্রী আসীন।

রামধন বাবু। তুমি জান, বিজয়ের মনে
মনে সুনীতিকে বিয়ে কর্তে ইচ্ছা ছিল—তাই
সে অশ্রু মেয়ে বিয়ে কর্তে অসম্মত ছিল। এখন
সুনীতি মারা গিয়াছে। এখন বোধ করি
বিজয় বকুলপুরের জমিদারের সেই মেয়েটী
বিয়ে কর্তে পারে। তারা কা'ল আবার
লোক পাঠিয়ে ছিল। শেষ জবাব চায়।

স্ত্রী। সে মেয়ের আজও বিয়ে হয়নি?
তবে মেয়ের কোন দোষ আছে বা।

রামধন। তা নয়। আমি আশ্বাস দিয়ে
তাদের এতদিন রেখেছি। আর তারা
রাখবে না। এদিকে দশহাজার টাকা দিতে
চেয়েছে। এই ফাস্তন মাসে বিয়ে দিতে
চায়।

স্ত্রী। বিজয় বিয়ে করে তরে ত।

রামধন। সুনীতি যখন মারা গিয়েছে,
তখন অশ্রু মেয়ে বিয়ে করায় বিজয়ের কেন
আপত্তি হবে?

স্ত্রী। সে যে প্রতিজ্ঞা করেছে, টাকা
নিয়ে বিয়ে কর্তে না, ভাত ভূমি জান।

রামধন। ও সব কিছু নয়। এমন
প্রতিজ্ঞা অনেকেই করে থাকে। কেদার
বাবুর সেই সুনন্দরী মেয়েটী বিজয়ের প্রতিজ্ঞার
কারণ ছিল।

স্ত্রী। আমার কিন্তু বোধ হচ্ছে, সুনী-
তির মৃত্যুর পর বিজয়ের মুখ আরও গম্ভীর
হয়েছে, ধ্যানে যেন পুকের অপেক্ষা মগ্ন।
এখন সংসারের কোন জিনিষই যেন আর
দেখতে পায় না। আমি দেখলাম, তার
চোখ হতে জলের ধারা পড়ছে।

রামধন। চোখের জপ পড়ছিল?

স্ত্রী। হাঁ—এ লক্ষণ ত ভাল নয়। সং-
সারের কোন বস্তুর পানেই নজর নেই,
কিন্তু আগের চেয়ে সকলের অধিক সেবা
করে। চাকর চাকরাণীদের প্রতি পূর্ণাঙ্গা
আরও দয়া—গরিব লোকদের আগের চেয়ে
আরও অধিক দয়া করে, তাদের দেখলেই
ছুটে গিয়ে, তাদের সঙ্গে আলাপ করে, খাও-
য়ায়, দাওয়ায়, কাপড় দেয়, তারপর তাদের
হাতে পরমা দিয়ে বিদায় দেয়। কখন কখন
নও তাদের হৃৎ দেখে আমার চোখে জল
পড়ে।

রামধন। এত কথা ত তুমি আগে
বলনি।

স্ত্রী। তুমি কি শোনো! তুমি বই আর
কাগজ নিয়ে থাক। বিজয় এখন আতপ
চাল খায়, এক সন্ধ্যা নিরামিষ খায়। রাত্রি
দশটায় ঘর বন্ধ ক'রে চোখ বুজে ধ্যান করে,
কোন কোন দিন ধ্যান কর্তে কর্তে রাত
পুয়ে যায়।

রামধন। ও সব ছেলেমি—অল্প বয়সের
পাগলামি শীঘ্রই যাবে। পাঞ্জীপক্ষকে বলেছি
২০ দিন পরে ঠিক ঠাক কর্কো। বুঝছো
না?—দশ হাজার টাকা!

স্ত্রী। এখনও তুমি টাকার কথা ছাড়।
আগে টাকার কথা ছেড়ে দিলেই বিজয় বিয়ে
কর্তে রাজি ছিল। এখন টাকার কথা ছেড়ে
দিলেও বিজয় হয়ত মোটেই বিয়ে কর্তে না।

রামধন। হাঁ, মোটেই বিয়ে কর্তে না,
ভারি বুক!

‘ জী । হা নাথ ! তুচ্ছ টাকার জন্ত’
ছেলেকে হারালে ! আমি বুঝি না ? আমি
দিন রাত্রি বিজয়কে চোখে চোখে রাখি ।
জাননা কি, নাথ, স্নেহ দিবাচক্ষু দেখে ।
অগাধ বিজ্ঞে যা ভেবে বুঝতে পারে না, স্নেহ,
বিশেষতঃ জননীর স্নেহ, তা অনারাসে
বোঝে । নাথ, আমি বলছি তুমি দেখে নিও ।
এ অভাগিনীর কথা সত্য হয় কিনা—বিজয়
গৃহে রয়েছে বটে, কিন্তু সে এখন আর আমা-
দের নয় ।

রামধন । সে এখন কাদের ?

জী । কাদের ? সে সেই জানে । তার
বৈরাগ্য, এখন যেন তার আর আমাদের
মধ্যে একটা ভারি বড় প্রাচীর হয়ে দাঁড়ি-
য়েছে । তা কি তুমি এখনও বুঝতে পাচ্ছ
না ? এখন আমার বোধ হয়, বিজয় যেন
কোন দেবতা, স্বর্গ হতে নেমে এসেছে, যেন
দয়া করে আমাদের গৃহে রয়েছে ।

রামধন । নিজের ছেলেকে সব মারই
দেবতা বোধ হয় । ও সব কথা যাক ।
কাজের কথা শোনো । তুমি যত পেলেই
বিজয়কে আবার বিয়ের কথা বলবে । ২৫শে
তারিখ তাদের ঋণটি জবার দিতে হবে ।
আমার কথা শুনো । বিজয়ের টুকটুকে বউ
হবে । তোমার ঘর সংসার কর্ণে, বিজয়
ঘরে থাকবে—আর দশ হাজার টাকা । দশ
হাজার টাকা ফাঁদ । তাতে বৌমার বেশ
এক প্রস্তুত জড়াও গহনা হবে । গাঙ্গুলিদের
বাড়ী যখন তুমি বৌ নিয়ে নিমন্ত্রণ খেতে
যাবে—বৌমার জড়াও গহনা দেখে গাঙ্গুলি-
দের চোখ টাটাবে—আর জমীদার বেহাই
হবে । নিত্য জাকাল জাকাল তব্ব আসবে ।
আমি কি বিজয়ের মন্দ কামনা করছি ?

জী । নাথ, তুচ্ছ টাকা ও লোক লোক-
তার জন্ত সোণার চাঁদ বিজয়কে হারিও না ।
আবার টাকা নিয়ে বিয়ে কর্তে বলে আমার
ব্রজবৈষ্ণব হয় এবার সরাসরী হয়ে যাবে,
আর ঘরে আসবে না । বড় ভয় হয় । তবে
আমি কখনই তোমার অবাধ্য নহি, কখন
অবাধ্য হব না । বলবো, যা করেন মধুসূদন ।

রামধন । হুঁ, বুঝিয়ে বল । ভয় নেই ।

২য় দৃশ্য ।

স্থান—“মেসের” বাসা ।

কাল—অপরাহ্ন ।

বিজয় ও কৈলাস আসীন ।

বিজয় । হাঁ ? আপনি যথার্থই তাঁকে
মেরেছিলেন !!

কৈলাস । আপনাকে সমুদয় ত বলেছি ।
আর সে পাপ-কাহিনী মুখে বলতে পারিনি ।
শুনেছি, আপনি অল্প বয়সেই সাধু হয়েছেন—
শুনেছি আপনি দেবতা—স্বনীতি বলেছিল
আপনি দেবতা (বিজয় আরও গভীর) তা
দেখছি । আপনি যদি দেবতা হন, এ
অধমকে শাস্তি দিন । আমার বুক দিন
রাত্রির জ্বলে যাচ্ছে—উঃ উঃ (নিজের বুক
হাত বুলাইয়া) কিসে শাস্তি পাই, বিজয়
বাবু, বলে দিন ।

বিজয় । আমরা সকলেই পাপী, ভগ-
বান, আমাদের একমাত্র ত্রাণকর্তা । তাঁর
স্মরণাপন্ন হোন, তিনি মহাপাপীকেও দয়া
করেন, তাঁকে আশ্রয় কর্ণে তিনি মহা পাত-
কীকেও উদ্ধার করেন ।

কৈলাস । (নিজের মাথায় হাত দিয়া)
সেই পবিত্র মুখখানি, সেই সাক্ষর দৃষ্টি মনে
করে, আমি কোন মতেই যে জন্মের দারুণ
শোক স্মরণ কর্তে পাচ্ছি নে । (ক্রন্দন
করিতে করিতে বিজয়ের পা ধরিয়া) বিজয়
বাবু ! আমি বড়ই পাপী, বড়ই পাষাণ,
আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই । আপনি
আমাকে রক্ষা করুন । কিসে আমার মনে
শান্তি হয়, বোলে দিন ।

বিজয় । মোহ প্রাপ্ত হবেন না । ভগ-
বানে ভক্তি করুন—আর ক্ষমা করুন—আর
গীতা পড়ুন—৬ র্মাক্ষর পরমহংসের কথা-
মৃত পড়ুন, আর লোকের সেবা করুন ।
পরমেশ্বরের উপাসনা করুন । তিনি সর্ব-
জনের একমাত্র গতি । তাঁর দয়ার সীমা
নাই ।

কৈলাস । আমি বুঝছি, আমার জী,
নিজের প্রাণের অপেক্ষা আমাকে ভাল-
বাস্তর্জন । তাই নিজের প্রাণ ত্যাগ করে,
আমাকে জ্ঞান দিয়ে গেলেন । বিয়েতে
টাকা নেওয়া যে কাপুরুষের কাজ, তা এ

মুখকে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। আমি নরকের পথে যাচ্ছিলাম। নিজের প্রাণত্যাগ করে, তা আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে, স্বর্গের পা স্বর্গে উড়ে গেল। আমি যে নরক, সে যে স্বর্গ; আমি যে পিশাচ, তিনি যে দেবকন্তা; আমি যে নিষ্ঠুর নীচতা, সে যে উদার দয়া; আমি মুক্তিমান পাপ, তিনি যে পুণ্যের মূর্তি; আমি যে অন্ধকার, সে যে জ্যোতি; আমি যে দুঃখের কণ্টক, তিনি যে আনন্দময়ী; আমি যে বিষ, সে যে অমৃত। নরকে আর স্বর্গে কি মিল হোতে পারে? পিশাচে আর দেব কন্তার রক্ত বিবাহ হতে পারে? যখন আমার হৃদয়ে অর্থ-পিশাচের ভাব ছিল, তখন সে আমাকে স্পর্শ করে নাই। যেই আমার অর্থ-পিশাচের ভাব চলে গিয়াছিল, তখনই, মৃত্যু-শয্যায় শয়ন কোরেও, আমার চরণধূলি নিয়েছিল, আমাকে ভক্তি ও ভালবাসা দিছিল। না না, আমি তার ভালবাসা ও ভক্তির যোগ্য নহি,—সে দয়া, ভক্তি নহে। আমি আঁত অধম, বিজয় বাবু—আমি কি কর্ণী, বলুন (ক্রন্দন)

বিজয়। দৈর্য ধরুন। ভগবানের আরাধনা করুন, গীতা পড়ুন, আর সেবা-ধর্মের অভ্যাস করুন—তাতেই শান্তি পাবেন।

কৈলাস। কারা আসছে বুঝ? এ কলঙ্কিত মুখ আর কাহাকে দেখাব না, এখন চললাম। পায়ের ধূলা দিন, (ধূলি মস্তকে গ্রহণ ও কৈলাসের প্রস্থান)।

(রমানাথ, হরগোবিন্দ, গণেশ ও ভূপেন্দ্রের প্রবেশ)।

রমানাথ। বিজয়, আমি আজ তোমার কাছে দুই নূতন ছাত্র এনেছি, হনি ভূপেন্দ্র বাবু, গণেশ বাবু এঁর নাম। বিজয়, তোমার শরীর আজ ভাল নাই? তবে আজ থাক।

বিজয়। (একটু হাসিয়া) সংসারের শরীর বা মন খারাপ করবার কারও অধিকার নাই।

রমানাথ। বেশ। তা হলে ভূপেন্দ্র বাবুকে Free Trade ও Protection সম্বন্ধে ভাল কোরে বুঝিয়ে দেও। তিনি Political Economy টা অনেক দিন পড়ে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, Free Trade জাতীয় আর্থিক

জীবনের এক মাত্র মুক্তির উপায়।

বিজয়। আপনি এখন কি করছেন?

ভূপেন্দ্র বাবু। আমি এইবার বি-এ দেব। Political Economy এবং Philosophy আমার পাঠ্য বিষয়। আমি শুনিছি আপনি বেশ Economics বুঝেন। Free Trade সম্বন্ধে আপনার সহিত আলোচনা কর্তে ইচ্ছা করি। Free Trade কি আপনার মতে ভাল নহে?

বিজয়। অবাধ বাণিজ্য, স্বৈচ্ছাধীন ক্রয় বিক্রয় ভাল।

ভূপেন্দ্র। তবে আপনার সঙ্গে আমার কোন তর্ক নাই।

বিজয়। কিন্তু Free Trade অর্থে দুইটা বুঝাতে পারে। (১) প্রচলিত অর্থ—প্রত্যেক দেশ অপর দেশে বাণিজ্য কর্ণে, (অর্থাৎ নিজেদের বস্তু বিক্রয় কর্ণে, অথবা অপর দেশের বস্তু বিক্রয় কর্ণে, অথবা অপর দেশের বস্তু ক্রয় কর্ণে) তাতে কেউ শুদ্ধ বসিয়ে বা অস্ত্র কোন উপায়ে বাধা দিতে পার্ণে না। এইরূপে প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক দেশের লোক স্বাধীন ভাবে বাণিজ্য কর্ণে। (২) এইটা প্রচলিত অর্থ*। কিন্তু এই স্থলে এক দেশের লোকের কর্ণ স্বাধীন ক্রয় বিক্রয় অপর দেশের স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধ হতে পারেনা কি?

ভূপেন্দ্র। সেটা কি রকম?

ভূপেন্দ্র। সেটা কি রকম?

বিজয়। যখন পণ্য বিক্রয়ের জন্ত সৈন্ত আবশ্যক হয়, তখন কেনা বেচাটা স্বাধীন ভাবে হয়, তা বলা যায় না। ধরুন, চীন রাজ্য বলে যে, আমাদের দেশে কাকেও মদ বা অহিফেন বিক্রয় কর্তে দেব না। কোন ইউরোপীয় জাতি বলল, আমরা জোর কোরে বিক্রয় কর্ণে। অর্থাৎ আমাদের পণ্য দ্রব্য তোমাদের দেশে বিক্রয় কর্তে না দিলে, সৈন্ত পাঠাব, যুদ্ধ কর্ণে। চীন রাজ্য যুদ্ধে ভয়ে, ইউরোপীয় পণ্য চীনদেশে বিক্রয় বন্ধ দিল। এখানে আপনি বাণিজ্যকে স্বাধীন বাণিজ্য বলিতে পারেন?

ভূপেন্দ্র। কিন্তু প্রত্যেক চীন ক্রেতা ত

Bounty কথা এখানে ছাড়িয়া দেওয়া গেল।*

স্বাধীন ভাবে স্বতঃ প্রবৃত্ত হ'য়ে ক্রয় করেন।
'চীন রাজ্য, প্রজাগণের স্বাধীন' বেচা
কেনার উপর, হস্তক্ষেপ কর্তার কি অধিকার
আছে ?

বিজয়। রাজা, প্রজাগণের, (অর্থাৎ
অধিকাংশ প্রজাগণের) প্রতিনিধি। অধিকাংশ
প্রজার যাতে মঙ্গল হয়, রাজা তাই করেন,
কর্তে পারেন। যে কাজে অধিকাংশ প্রজার
অমঙ্গল হয়, সে কাজ কি রাজা নিষেধ
কর্তে পারেন না ? Government আছে
কি কর্তে ? একদিকে, প্রজারা যাতে
নিজ নিজ প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষা কোরে, স্বাধীন
ভাবে কাজ কর্তে পারে, গবর্ণমেন্ট তা
কোরে থাকেন ; আর একদিকে, যাতে
অধিকাংশ লোকের অনিষ্ট হয়, তা নিষেধ
বা ছুট প্রজারা স্বাধীন ভাবে যাতে না কর্তে
পারে, তাই করেন। গবর্ণমেন্ট হিতকার্যে
স্বাধীনতার রক্ষক, অনিষ্ট কার্যে স্বাধীনতার
সঙ্কোচক। সুতরাং যদি গবর্ণমেন্ট মনে করেন
যে, কোন দ্রব্য দেশে বিক্রয় হ'লে দেশের
অনিষ্ট হবে, সেই জন্ত কি গবর্ণমেন্ট সেই
দ্রব্য বিক্রয় করা নিবারণ কর্তে পারেন না ?

ভূপেন্দ্র। অবশ্য পারেন।

বিজয়। তবে ধরুন, চীন দেশের গবর্ণ-
মেন্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চীনদেশে যদি
জার্মানী (Germany) জোর কোরে জিনিষ
বিক্রয় করে, সেই বাণিজ্যটাই Free Trade,
না Forced Trade ?

ভূপেন্দ্র। হাঁ এক দিকে দেখলে অর্থাৎ
চীন দেশের রাজার দিক দিয়ে দেখলে,
ওটা Forced Trade. আবার চীন দেশের
ক্রেতাদিগের অর্থাৎ consumersদিগের
দিক হতে দেখলে, সেটা Free Trade।
আপনি কী স্বীকার করেন, consumers-
দের স্বার্থ দেখতে হবে।

বিজয়। নিশ্চয়ই Consumers
দের স্বার্থ দেখতে হবে। কিন্তু আপনি বোধ
হয় এক শ্রেণীর Consumersদের কথা
ভাবছেন ; আর এক শ্রেণী Cons-
umersদের কথা মনে ক'চ্ছেন না। তারা
Producers। দেশের Consumersরা
জিনিষ যাতে সস্তা দরে পায়, রাজার দেখা

আবশ্যক। কিন্তু যাতে দেশের Producers-
রা খেতে পায়, (অর্থাৎ তাদের ব্যবসায় নষ্ট
হোয়ে তারা অন্নভ্রূবে মারা না যায়) তাও
কি রাজার দেখা উচিত নহে ? Producers-
রাও Consumers। বাহাদের সাধারণত
Consumers বলে, তাহারা ক্রেতা Cons-
umers ; বাহাদের Producers বলে
তাহারা বিক্রেতা Consumers। দেশে এই
উভয় শ্রেণীর Consumersরা যাতে অন্ন
পায়, রাজার তাহাই কর্তব্য। যদি এমন
হয় যে, ইংলণ্ডের উৎপন্ন শস্তে ইংরাজদিগের
খাতির অকুশল হয়, তাহা হ'লে অবশ্য
ইংলণ্ডে বিদেশীয় শস্য বিক্রয় নিবারণ করা
গবর্ণমেন্টের উচিত নহে, সেখানে Free
Tradeই ভাল। যদি অত্রদিকে এমন
হয়, ভারতের উৎপন্ন শস্তের কতক অংশ
ভারতবাসী শিল্পীগণের ঘরে না গেলে তারা,
অন্নভাবে মরুক, তা হলে ভারতবাসী শিল্পী-
গণ যাতে অন্ন পায়, গবর্ণমেন্টের তাই করা
উচিত, অর্থাৎ তাদের জীবন যাতে বিক্রয়
হয়, তাই করা 'কর্তব্য'। তাতে যদি Free
Trade ত্যাগ 'কর্তে' হয়, ত্যাগ করাই
কর্তব্য। আমার নিকট একথা অতি
সহজ।

ভূপেন্দ্র। তবে আপনি কি স্বীকার
করেন না যে, অবাধ বাণিজ্যের দরুন যে
দেশে যে বস্তু উৎপাদন কর্তার বিশেষ উপ-
যোগিতা আছে, সেই দেশে সেই জিনিষ
প্রস্তুত করা হয়। তাতে কি সকল দেশেরই
পরিণামে উপকার হয় না ?

বিজয়। Free Tradeই সাধারণ
নিয়ম, অর্থাৎ সাধারণত Free Trade মঙ্গল-
জনক, তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু
অবস্থা বিশেষে, এই সাধারণ নিয়মের ব্যতি-
ক্রম আছে, অর্থাৎ স্থল বিশেষে Protection
মঙ্গলজনক।

ভূপেন্দ্র। দেশে মূল ধন না বাড়লে
গবর্ণমেন্ট Protection চালালেও শিল্পের
উন্নতি হতে পারে না। মূল কথা মূলধন,
capital.

বিজয়। হ্যাঁ, অনেক Economist
বলিয়া থাকেন, Industry is limi-

ted by capital. উটাকে Wages Fund Theory বলে। কিন্তু আর একটা Theory আছে। সেটাকে Produce theory of wages বলে। পূর্বসংকীর্ণ মূলধন সাম্রাজ্য মাত্র থাকিলেও, যদি কোন শিল্প ব্যবসায় চলিবার সুবিধা পায়, অর্থাৎ জিনিষের কাটুতি অধিক হয়, তাহা হইলে উৎপন্ন জিনিষের মূল্য হইতে ক্রমেই মূলধন বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং ক্রমে অধিক শিল্পী বা শ্রমীর অঙ্গসংস্থান হয়।

তুপেন্স। কিন্তু যদি কোন শিল্পের উন্নতির জন্য বিদেশীয় কোন জিনিষের আমদানি বন্ধ করা হয়, তাহা হোলে দেশের রপ্তানি কমবে না কি? কারণ the great maxim of Free-traders এই যে, Imports must be paid for by exports. যে পরিমাণে দেশের আমদানি কমবে, সেই পরিমাণে দেশের রপ্তানি মালও কম উৎপন্ন হবে। সুতরাং কতকগুলি শিল্পী বা শ্রমীর কাজ যাবে, আর তাদের অন্নাতাব হবে। অর্থাৎ Protection দরুণ যে পরিমাণে বিদেশীয় মালের আমদানি কমবে, সেই পরিমাণে দেশী মালের রপ্তানি কম হইবে, সুতরাং দেশের ধন কমে যাবে।

বিজয়। এ কথাটা সকল স্থানে খাটে কি? ধরুন, ভারতে দেশী কাপড়ের চলন হোয়ে, বিলাতী কাপড়ের আমদানি ক্রমে বন্ধ হোয়ে পেল। ভারতের তাঁতিরা এ দেশীয় অন্ন কিনতে লাগলো। চাউল গমের রপ্তানি কম হতে লাগলো বটে। কিন্তু তাতে কোন ভারতীয় শিল্পী বা শ্রমীর কাজ গেল না, কারণ রুটী মারা গেল না। সুতরাং এখানে ভারতের রপ্তানি কমাতে ভারতের কোন অনিষ্ট হল না।

তুপেন্স। কিন্তু ভারতের কৃষকেরা বিলাতী কাপড় সস্তা দরে কিনলে অহাদের টাকা বাঁচত, তাতে অল্প কোন ভিনিষ কিনতে পারত, তাতে ভারতে কোন নূতন শিল্পের প্রচলন হতে পারত।

বিজয়। যদি কোন নূতন শিল্পের প্রচলন হতে পারত, একথা ঠিক হয়, তা হলে কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু ভারত-কৃষক-গণের কিছু কিছু টাকা বাঁচলে, তাতে ভারতে

কি নূতন শিল্প প্রচলন হতে পারে, বলুন।

তুপেন্স। বলতে পারি না।

বিজয়। আর বিলাতী কাপড় কিনে যে টাকা বাঁচে, ঐ দরের দেশী কাপড় কিনেও সেই টাকা বাঁচতে পারে। হয়ত তাতে কাপড় কিছু মোটা হবে। ভারতীয় তাঁতিদের একবারে অন্নাতাব হওয়া চেয়ে কৃষকদের একটু মোটা কাপড় পরা প্রের্য: নহে কি?

তুপেন্স। অবশ্য কতকগুলি লোক মরার অপেক্ষা আর কতকগুলি লোকের মোটা কাপড় পরা প্রের্য:।

আচ্ছা ধরুন, যদি এমন হয়, ভারতীয় তাঁতিরা তাঁত ছেড়ে কৃষি করলে অনায়াসে খেতে পারে, তাতে কি ক্ষতি আছে?

বিজয়। ক্ষতি আছে।

(১) তাঁতিদের বংশগত ও শিক্ষাগত যে কৌলিক নিপুণতা আছে, তা কৃষিকাজে লাগে না। (২) আর দেশের সকল লোকেই যে লাঙ্গল ধরে চাষ হবে, এটাও ইচ্ছনীয় নয়। কেবল মাত্র কাজের পরিমাণ দেখলে চলবে না; কাজের ভারতম্য গুণাগুণ, তাও দেখতে হবে। দেশের কতক লোকের বুদ্ধি ও কৌশলক্ষম কার্য ইচ্ছনীয়।

তুপেন্স। মানি। তবে Protection এ অনেক সময়, স্বার্থপর Capitalist শ্রেণী বিশেষের উপকার হয়, তা দেশের পক্ষে নজর-জনক নহে, তাহা কি আপনি স্বীকার করেন না?

বিজয়। করি।

তুপেন্স। বিদেশীয় জাতির শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা না থাকিলে দেশের শিল্পের উন্নতি হয় না।

বিজয়। ঠিক। তবে কোন শিল্প কার্য যদি নিতান্ত শৈশবাবস্থায়, বা শিক্ষার অবস্থায় থাকে, তখন সেই শিল্পের উন্নতির জন্য কিছুকাল তাকে বলবান পরিপক্ক বিদেশীয় প্রতিযোগিতার হাত হতে রক্ষিত হওয়া উচিত।

তুপেন্স। তাতে আমার আপত্তি নেই।

বিজয়। এই শিল্প শিক্ষার তরুণ অবস্থায়, গবর্ণমেন্ট যদি নিপুণ বিদেশীয় শিল্পী এনে কল কারখানা করে প্রজাদিগকে শিক্ষা দেন, তা হলে আরও ভাল হয়, আর

Protection এর দীর্ঘকালের অস্ত্র দখলকার হইল না।

ভূপেন্দ্র। ঠিক কথা। তবে Free Tradeয়ে প্রায়ই বাণিজ্যের উন্নতি হয়। বাণিজ্যের উন্নতি দেশের শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ।

বিজয়। কোন কোন স্থলে বাণিজ্যের প্রসারই দেশের অবনতি ও অন্নাতাবের কারণ হইতে পারে।

ভূপেন্দ্র। বলেন কি ?

বিজয়। কোন দেশে বাণিজ্যের বৃদ্ধি হইলে, অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানির বৃদ্ধি হইলেই লোকে ধরিয়া নেয় যে, দেশে ধনের বৃদ্ধি হচ্ছে। কিন্তু এমন হতে পারে, দেশের ধন বাড়ছে না, অথচ আমদানি রপ্তানি বাড়ছে।

ভূপেন্দ্র। অসম্ভব।

বিজয়। অসম্ভব নয়। ধরুন, যেন ভারতে পূর্বে বিদেশীয় বাণিজ্য ছিল না। ভারতীয় শিল্পীগণের দ্রব্যের সহিত ভারতীয় কৃষিজাত দ্রব্যের বিনিময় হতো। তারপর, ধরুন, সস্তা বিদেশীয় মালের আমদানিতে ভারতীয় শিল্পের লোপ হল। যে ভারতের অন্ন ভারতীয় শিল্পীগণ খেতো, বিদেশীয় শিল্পীগণ এখন সেই অন্ন খেতে লাগলো। তাতে বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানি ও ভারতীয় শস্যের রপ্তানি খুব বাড়ল। স্থানদর্শী ব্যক্তিগণ তাতে ভারতের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে মনে কর্তে লাগলেন। কিন্তু এই অসুস্থিত দৃষ্টান্তে ভারতের দুঃখ বৃদ্ধি হবারই কথা, অর্থাৎ শিল্পীকুলের অন্নাতাব হবারই কথা। তবে ভারতে প্রকৃত ঘটনা কি হচ্ছে, তা Statistics না দেখলে বলা যায় না।

ভূপেন্দ্র। কি আশ্চর্য্য! স্থল বিশেষে বাণিজ্য প্রসারও অবনতি হতে পারে ? তাইত !

বিজয়। আপনি যেন আমার কথা জ্বল বুঝবেন না। বাণিজ্যে দেশের উন্নতি

হচ্ছে কি না, বুঝতে হলে, দেখতে হবে, দেশের ধনের সমষ্টি বৃদ্ধি হচ্ছে কি না।

ভূপেন্দ্র। আর দেশে Free Trade ভাল না Protection ভাল, তা বুঝতে হলে, কি কর্তে হবে—সংক্ষেপে ?

বিজয়। কোন দ্রব্য সম্বন্ধে, অবাধ বাণিজ্য ভাল, না রক্ষিত বাণিজ্য ভাল, তা বুঝতে হলে, দেশের সমুদয় অবস্থা আলোচনা করে দেখতে হবে, কিসে দেশের সকল লোকের অন্ন সংস্থান হয়, অবাধ বাণিজ্যে, না রক্ষিত বাণিজ্যে। Economic এর মূল মন্ত্র হচ্ছে—Food for all। আমার বোধ হয়, এই কথাটা লক্ষ্য না করার দরুণই বড় বড় Economistsরা ভ্রান্ত হোয়েছেন। ধনতত্ত্বের ভিত্তি Food for all।

ভূপেন্দ্র। রমানাথ, গণেশ ও হরগোবিন্দ (সকলে এক সঙ্গে) Food for all—Food for all—

বিজয়। সমাজতত্ত্বেই হোক, আর ধনতত্ত্বেই হোক, অসংযত প্রতিযোগিতা অমঙ্গলজনক।

রমানাথ। বুঝলেন, গণেশ বাবু, Tradeয়ে যেমন অসংযত প্রতিযোগিতাকে সংযত করবার জন্ত অবস্থা বিশেষে “Protection” আবশ্যক হয়, তেমনি সমাজে বর্তমান অবস্থায় বিবাহে টাকার অসংযত প্রতিযোগিতা সংযত করবার জন্ত সামাজিক Protection আবশ্যক হয়েছে—আমাদের “বিশুদ্ধ বিবাহ-প্রচলন-সভার” প্রয়োজন হয়েছে।

গণেশ বাবু। আমি দেবতবনে উত্তমানন্দ স্বামীজীর বক্তৃতা শুনেছি। কিন্তু তবু আমার কয়েকটা সন্দেহ আছে।

বিজয়। আজ আর সময় নাই।

রমানাথ। আগামী রবিবারে এখানে আসবেন। আপনার সন্দেহগুলি ভেঙ্গে নেবেন। (সকলের প্রস্থান)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

আমর্য্যাম্বিদগের সৃষ্টিব্যাখ্যা :

আমরা "হিন্দু অতিব্যক্তিবাদ" প্রবন্ধে সমুদ্রমহন বর্ণনার স্তম্ভবাস্পদ্যে যে আখ্যা-
খবিগণ সৃষ্টির বীজ নিহিত দেখিয়াছিলেন,
তাহার বিশদ আলোচনা করিয়াছি। এই
তথ্যটুকি প্রকারে তাঁহাদের হস্তে পরিষ্কৃত
হইয়া বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিব্যাখ্যার এক সাধারণ
ভিত্তিভূমি গঠিত করিয়াছিল, বর্তমান প্রবন্ধে
আমরা তাহাই বৃদ্ধিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমে আমরা বৈজ্ঞানিক প্রতিভার
অবতার পাশ্চাত্য মনীষিগণ অগাধ গবেষণা,
বিস্তৃত পর্যবেক্ষণ ও স্তম্ভ বিশ্লেষণদ্বারা সৃষ্টি
ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া-
ছেন, তাহারই উল্লেখ করিব। সমস্ত সৃষ্টি
ব্যাপারের মূলভূমিকান করিয়া ইহারা দুইটি
অবলম্বনই ইহাদের মধ্যে সর্বত্র বিদ্যমান
দেখিতে পাইয়াছেন। সুতরাং এই দুইটি-
কেই তাঁহারা সৃষ্টিকার্যের নিত্যসত্য বলিয়া
গ্রহণ করিয়াছেন। সেই দুইটিকে তাঁহারা
জড় ও শক্তি (matter and force) নামে
অভিহিত করিয়াছেন। এই দুইটাই পরস্পর
সাপেক্ষ। ইহাদের একটি উপাদান যোগাই-
তেছে—অপরটি তাহারই সংযোগ বিরোগ
সাধনদ্বারা অশেষ পরিণামে প্রবর্তিত করি-
তেছে। ইহাতেই বিশ্ববৈচিত্র্যের উৎপত্তি
হইতেছে। ইহাই সৃষ্টিলা।

আমরা পূর্বে সমুদ্র মহন বর্ণনার যে
কীরোদগাগরূপ স্তম্ভ-বাস্প-রাশির উল্লেখ
করিয়াছি, তাহাই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকবিদগের
জড়োপাদান-স্থলীর হইতেছে এবং মহনবেগ-
টাই শক্তি স্থানীর হইতেছে। এই প্রকারে

বৃদ্ধিলে সৃষ্টিসম্বন্ধে পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত প্রাচ্য-
সিদ্ধান্তের অপেক্ষা কোন প্রকারেই অগ্রসর
বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কিন্তু প্রাচ্য
সিদ্ধান্তটী রূপকের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে
বলিয়া অনেকেই আমাদের কৃত ব্যাখ্যাতে
কষ্টকল্পনা দ্বারা স্বজাতির গৌরবধাপন
ব্যতীত আর কোন অর্থই দেখিতে পাইবেন
না। কিন্তু বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে
যে রূপভাবে এই সিদ্ধান্তটির বিস্তার ও প্রচার
হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিলে সৃষ্টি
সম্বন্ধে যে সুপ্রণালী-বদ্ধ একটি মতবাদ আখ্যা-
খবিদগের মধ্যে গঠিত হইবার চেষ্টা অতি
প্রাচীনকালেই হইতেছিল, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ
করিবার অল্প কারণই থাকিবে।

আখ্যাখবিগণ সমুদ্রমহনবেগে প্রথম স্তম্ভ-
ভাবে যে তথ্যটি উপলব্ধি করিয়াছিলেন,
তাহাকে ক্রমে স্থলভাবে বুঝাইয়া সাধারণ-
গোচর করাই তাঁহাদের লক্ষ্য হইল।
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও এই প্রণালীতেই
পরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারাই বৈজ্ঞানিক
সত্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করিয়া থাকেন।
আখ্যা মহাবিগণ স্তম্ভমহনবেগের ক্রমস্থল পরি-
ণাম অনুসরণ করিতে করিতে তেজের সঙ্গেই
ইহার যোগ দেখিতে পাইলেন—সূর্য্যকে
আবার এই তেজের আধার দেখিয়া ইহার
নাম সূর্য্য (স্ব—ক্যপ) 'সরতিঃসূর্য্য'—এই
অর্থে গতিশীল বা বেগশীল রক্ষিলেন।
পৃথিবীর অগ্নিতে এই সূর্য্যেরই যেন সূতি
ইহারা দেখিলেন। ইহার যে অগ্নি নাম
দিলেন, তাহাও ইহার উজ্জ্বলমন বা বেগই

বুঝাইতে লাগিল। ইহাকে শীঘ্রই তাঁহার জীবনের প্রধান উপাদান বলিয়াও বুঝিতে পারিলেন, তাহাতে ইহার এক নাম অনল হইল। বায়ু এই অনল বা উষ্ণত্ব সম্পর্কেই 'অনিল' নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। শ্বাস বায়ুও উষ্ণত্ব সংযোগে জীবনরক্ষাহেতু বিশেষ রূপে 'প্রাণ' নামে অভিহিত হইয়াছে। অপরদিকে সূক্ষ্মবাস্প হইতে অমৃতরসই উৎকৃষ্ট পরিণাম বলিয়া তাঁহার জানিতে পারিলেন। এই সূক্ষ্মরসের স্থানও তাঁহার চক্ষু বলিয়া জানিলেন, তাহাতেই চক্ষু সূক্ষ্মাকর নাম প্রাপ্ত হইলেন। এই সূক্ষ্মরস পৃথিবীতে বর্ষিত হইয়া পৃথিবীকে আর্দ্রা করিয়া থাকে। চক্ষু কিরূপ হইতেই এই সূক্ষ্মরস করিত হইয়া থাকে বলিয়াই চক্ষের 'সুধাংশু' ও 'ইন্দু' নাম হইয়াছে। চক্ষু এই সূক্ষ্মরসের দ্বারা উদ্ভিজ্জাদি পোষণ করেন বলিয়াই তিনি 'ওষধীশ' নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। উদ্ভিজ্জের মধ্যে এই সূক্ষ্মরস সঞ্চারিত হইয়া 'সোমরস' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। চক্ষু এই সোমরসের মূল উৎস বলিয়া ইহার এক নাম 'সোম'ও হইয়াছে। এই পার্থিব সোমরস আবার মৃতসঞ্জীবন রসরূপ যজ্ঞে পীত হওতঃ আৰ্য্য ঋষিদিগকে নবজীবন দান করিত। তাহাতেই তাঁহার এইরূপে ইহার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন যথা—“অপামসোমমমৃতভাজম্।” জীবনের মূলীভূত এই 'অগ্নি' ও 'সোম' দুইটি তত্ত্বকে ঋষিগণ জগতের সমস্ত সত্তার মূলেই আধাররূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিলেন।

তখন 'অগ্নীষোমাস্বকং জগৎ' বলিয়া ইহার প্রতিতে জগতের এই মূলতত্ত্ব প্রচার করিলেন। পুরাণ ইহারই অনুবাদ করিয়া আরও স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিলেন “অগ্নীষোমাস্বকং সর্বং জগৎ স্বাবর জন্মম্।” লিঙ্গপুরাণ ৩৪

অধ্যায়। বেদের যজ্ঞে এই অগ্নীষোমেরই সংযোগ। সূত্রায়ং যজ্ঞকে আমরা সৃষ্টিরই রূপক বলিয়া মনে করিতে পারি :—“Sacrifice is an imitation of the chief phenomena of the sky and the atmosphere.” Vedic India by Ragozin p 388. পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-মূলতত্ত্ব Matter and Force এর সহিত “অগ্নীষোমাস্বকং জগৎ” এই প্রতিতিতত্ত্বটি মিলাইলে কি প্রাচ্যমতটাই অধিক পূর্ণ ও বিশদ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না? এই তত্ত্বটি এরূপই সর্ববাদিসম্মতরূপে পরিগৃহীত হইল যে, এখন হইতে ইহাই সৃষ্টিব্যাপ্যার মূল সূত্র হইল। আধিতৌতিক ও আধিদৈবিক সমস্ত সত্তার এই বৈতভাবেই অনুপ্রবেশ লক্ষিত হইল। পুরাণ কিরূপ সরল ভাষায় যুক্তিপ্ৰয়োগ-সহকারে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পূর্বোক্ততত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়, যথা—

“বিবিধা তেজসোরুতিঃ সূর্য্যাস্মাচানলাস্বিকা ।
তথৈব রসরুতিশ্চ সোমাস্মাচজলাস্বিকা ॥৫
বৈদ্র্যস্তদ্বিদময়ং তৈজোমধুরাদি ময়োরসঃ ।
তেজোরস বিভেদৈস্তু তমেধুতচরাচরম্ ॥ ৬
অগ্নেরমৃত নিম্পতিরমৃতৈরগ্নিরেধতে ।
অতএব হবিঃ রূপ্ত মগ্নীষোমং জগদ্ধিতম্ ॥৭
হবিবে শস্ত্রসম্পত্তিবৃষ্টিঃ শস্ত্রাভিবৃদ্ধয়ে ।
বৃষ্টেচ হবিস্তদ্বাদগ্নীষোমধুতং জগৎ ॥ ৮
শিবপুরাণ—বায়বীয় সংহিতা, ২৪শ অধ্যায় ।

তেজের নানারূপ—সূর্য্য ও অগ্নিরূপ, তজ্জগৎ রসও, সোমরূপ ও জলরূপ। তেজ বিদ্যুৎপ্রকৃতিক ও রস মধুরপ্রকৃতিক। তেজ ও রস সংযোগেই চরাচর যুত রহিয়াছেন অগ্নি হইতে অমৃত উৎপত্তি। অমৃতদ্বারা অগ্নি বর্দ্ধিত হয়, অতএবই হবিঃ (অগ্নির জন্ত)

বিহিত হয়—অগ্নিবোম অগ্নের হিতজনক।
হবির অস্ত শত সমৃদ্ধি হয় (শতসমৃদ্ধি দ্বারা
হবিঃ বর্দ্ধিত হয়)। বৃষ্টিরদ্বারা শত প্রাচুর্য্য হয়।
হবিঃ আবার বৃষ্টির কারণ হয়, অতএব অগ্নি
অগ্নিবোমদ্বারাই বিধৃত রহিয়াছে।

আধিতোতিক সত্তার পূর্বোক্ত বৈত
ভাবে অমুপ্রবেশ আমরা আলোচনা করি-
য়াছি—একপে আধিদৈবিকসত্তার ইহার অমু-
প্রবেশ আলোচনা করিব। আমরা উপরে
স্থৌক্য তেজোরূপের উল্লেখ করিয়াছি।
'ব্রহ্মপুরাণে' ইহার দেবতাবের স্বরূপে যেখানে
কৃত হইয়াছে—সেখানে অগ্নি সোমই তাহার
সারভূত বর্ণিত হইয়াছে, যথা—“সমেতমগ্নী-
বোমাভ্যাং নমস্তস্মৈ শুণাক্ষনে।” ৩২।১৫।
শিব ব্রহ্মরূপী অগ্নিরই নামান্তর বলিয়া তাঁহা-
তেই পূর্বোক্ত অগ্নিবোমতাবের পূর্ণ সমাবেশ
দেখা যায়। তদীয় স্বরূপে আমরা দুইটি
ভাবে সমিশ্রণ লক্ষ্য করিয়া থাকি—একটি
উগ্ররূপ বা ভৈরব ভাব, অস্তটি শান্ত শিব বা
শঙ্করভাব। শিবের অষ্ট মূর্তির মধ্যে যেমন অগ্নি
একটি মূর্তি, তদ্রূপ চন্দ্র (সোম) এবং জলও
অপর মূর্তি। এই অগ্নি মূর্তিতে যেমন ভীষণ
সংহার ভাব প্রকটিত, তেমনই সোম ও জল-
মূর্তিতে মঙ্গলময় 'বরাভয়' ভাব প্রকটিত। এই
প্রকারে তদীয় স্বরূপের অর্দ্ধ অগ্নিময় ও অর্দ্ধ
সোমময় হওয়াতে তিনি 'অগ্নিবোমাত্মক'
হইয়াছেন। মহাতারক্তের অনুশাসন পর্বে
মহাদেবের এই বিবিধ প্রকৃতি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ
কর্তৃক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট অতি পরি-
কারকপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যথা—“বেদজ
ব্রাহ্মণেরা কহিয়া থাকেন যে, মহাদেবের মূর্তি
দুই প্রকার। তন্মধ্যে একমূর্তি অতি ভীষণ
ও অপর মূর্তি মঙ্গলময়। ঐ মূর্তিটির আবার
নানাবিধ মূর্তিতে বিভক্ত হইয়া থাকে।

তন্মধ্যে ভীষণ মূর্তি অগ্নি, বিদ্যা ও ভাঙ্কর
এবং সোম্য মূর্তি ধর্ম্ম, জল ও চন্দ্র স্বরূপ।
মুনিগণ উহার শরীরের অর্দ্ধাংশকে অগ্নি ও
অর্দ্ধাংশকে সোম বলিয়া কীর্তন করেন।
১৬১ম অধ্যায় কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।
এই বিবিধ ভাবের মধ্যে শান্ত ভাবটি হইতে
একটি অভিনব ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে।
ইহাতে যে একটি মধুর কোমল ভাবের
বিকাশ হইয়াছে, তাহাই 'উমার' ভাব। সোম-
ভাবই উমাতাবের মূল—তাহাতেই 'সহ
উমক্স' (উমার সহিত) গোম শব্দের এরূপ
ব্যাখ্যাও প্রচলিত আছে। এই উমাতাবে
একদিকে যেমন রমণীয়, কমণীয় স্ত্রীভাব-
স্থিতি, তদ্রূপ অপরদিকে স্নিগ্ধ বৎসল মাতৃ-
ভাবও স্থিতি। পৃথিবীতে আমরা দেখিয়া
থাকি, পিতা জন্মান করেন বটে, কিন্তু গর্ভ-
ধারণ ও পোষণের দ্বারা মাতারই সংশ্রব
সন্তানের সহিত সর্বদা ঘটিয়া থাকে, স্তন্যদান
মাতাতেই সন্তান সমস্ত কর্তৃত্বের আরোপ
করিতে অভ্যস্ত হয়—এমন কি, সন্তান সমস্ত
শান্তির আধারও মাতাতেই দেখিতে পায়।
তাহাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, কোন ভয়ের
কারণ উপস্থিত হইলেই শিশুসন্তান মায়ের
আঁচল আশ্রয় করিয়াই আপনাকে নিরাপদ
মনে করে এবং কোন অজ্ঞায়ের প্রতীকার
করিবার অল্প 'মাকে বলিয়া দিব' বলিয়া
অজ্ঞায়কারীকে শাসাইয়া থাকে। ইহা দেখা
যায় যে, যত দিন নারী সন্তানের মাতা না হয়,
তত দিন তাহার সন্তা স্বামীতেই নিমজ্জিত
থাকে—কিন্তু সন্তানের মাতা হইলেই তাহার
স্বাভাব্য প্রখ্যাপিত হয়—তখন তাঁনি শ্রুত
গৃহিণী হন—তখন সংসারে তাহারই আধি-
পত্য হয়। পূর্বে আমরা শিবতাবের মধ্যে
যে স্ত্রীভাবের অনুবন্ধ দেখিয়াছি, তাহার

রিকান ঠিক উপরে প্রদর্শিত আভাবিক ক্রমা-
নুসারেই হইয়াছে। প্রথম ‘গৌরী’রূপে উমা
শিবেরই অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়া শিবের ‘হরগৌরী’-
রূপে তাঁহার সহিত অভিন্নভাবে মিলিত
রহিয়াছেন। কিন্তু যখন তিনি কার্তিকেয়-
গণেশ-জননী হুর্গামূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন,
তখন দশপ্রহরণধারিণী হইয়া তিনি শিব
হইতে স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; শিব এখন
অলঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার কালী-
মূর্তিতে শিব একেবারে পদতলে শায়িত। এই
সকল মূর্তিতে আমরা সৃষ্টির এই গুঢ় মর্ম্মই
উপলব্ধি করিতে পারি যে, এই সমস্ত মূল তত্ত্ব
দ্বৈতীয় পরম্পর এরূপই অবিচ্ছিন্ন অঙ্গাঙ্গিতাব
রহিয়াছে যে, কোনটাকেই প্রধান বলা
বার না, উভয়টাই স্বয়ং প্রধান—সুতরাংই
কখন বা অগ্নি উপরে স্থান পাইতেছেন—
কখন বা সোম উপরে স্থান পাইতেছেন।
সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই অগ্নীধোমরূপে মূলতঃ
স্বারা ব্যাপ্ত হওয়ার যেমনই অগ্নিধারা সোম
অধিষ্ঠিত, তদ্রূপ সোমের দ্বারাও আবার অগ্নি
অধিষ্ঠিত। অগ্নি সোমের এই নিত্যসাপেক্ষ
তাবের উপরই যে উমামহেশ্বরের পূর্বোক্ত
নিত্য সষষ্ক ভাব ও পরম্পরাধিষ্ঠান ভাব
প্রতিষ্ঠিত, তাহা পুরাণকারের বর্ণনায় অতি
বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে যথা—

“অহমগ্নিমহাতেজাঃ সোমশ্চৈব মহাবিকা । ৭

লিঙ্গপুরাণ ৩৪শ অধ্যায় ।

‘আমি মহাতেজঃ সম্পন্ন অগ্নি আর মহতী
অধিকা (উমা) সোম ।’

“অগ্নিরূপে জলন্তোব যাবৎ সোম্যং পরানুভব্ ।

যাবদগ্ন্যাম্পদং সোম্যমভূতকং অবত্যাধঃ ॥ ৯

অতএবহি কালাগ্নিরগ্ন্যজ্জিহ্বাভিঃ ।

অবত্যা হীনকোদ্রবৎশ্যাবনং তবৎ ॥ ১০

আধারশক্তোব যুতঃ কালান্নিরমুদ্রগঃ ।

তথৈবনিমগঃ সোমঃ শিবশক্তিঃ সোম্যমঃ । ১১

শিবশ্চোদ্রবৎ শক্তিরূপঃ শক্তিরমঃ শিবঃ ।

তদিত্যং শিবশক্তিভ্যাং নাব্যাপ্তমিহকখন । ১২”

শিবপুরাণ—বারবীর সংহিতা ২৪শ অধ্যায় ।

ইহার মূল মর্ম্ম ইহাই ‘বুঝার যে অগ্নি
সোমের দ্বারা শিব শক্তি বা উমা মহেশ্বরের
দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হওয়ারই তাঁহাদের
পরস্পর উচ্ছাদিতাবের কারণ।

এখানে উমাকে শিবের শক্তি বলিয়া
বর্ণনা করা হইয়াছে। এই শক্তি ধর্ম্মাঙ্গিনী
হইয়া তিনি এক্ষণে অপূর্ণ ধর্ম্মাধার
করিয়াছেন—শিব একেবারেই নিম্নত হইয়া
পড়িয়াছেন। উমাই এক্ষণে কর্ত্রী হইয়াছেন
ও শিব উদাসীন হইয়াছেন। এই শক্তির
পূর্ণবিকাশেই এক্ষণে সৃষ্টি পূর্ণরূপে প্রবর্তিত
হইয়াছে। মহাদেবে যে সৃষ্টিশক্তির অতুর
ছিল, তাহাই এক্ষণে উমাতে পূর্ণ বিকশিত
হইয়াছে। মহাদেব এক্ষণে নিলিপ্তবৎ অব-
স্থিত রহিলেও শক্তি তাঁহারই বলিয়া, তাঁহা-
রই সাক্ষাতে ব্যতীত ইহার যে ক্ষুদ্রি হইতে
পারে না, তাহা দেখাইবার জন্যই যেন তাঁহা-
রই সম্মুখে নৃত্য করিয়া তিনি ‘নৃত্যকালী’
হইয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহাকে সৃষ্টিলালা প্রে-
মর্শন করিয়া চরিতার্থ হইবার জন্যই যেন
ইহার মূর্তি কেবল তাঁহারই প্রতি আবদ্ধ।
এই অসীম শক্তির উৎপত্তি যেমন মহাদেবে,
তাঁহার শেব বিশ্রামও মহাদেবে, তাঁহারও
প্রাণ এই যে, মহাদেবই সৃষ্টির সংহারকর্ত্তা।
তিনি যখন সৃষ্টি আপনাতে উপসংহত করি-
বেন, তদনুলীভূত শক্তিও যে সঙ্গে সঙ্গে
উপসংহত করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ
নাই। এই শক্তি তত্বেই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য
শক্তিতত্ত্বের আলোচনা করিলে ইহার সারবত্তা
আরও অধিক উপলব্ধি হইবে যদ্বিধা আদ্য:

দের বিধান ।) পাশ্চাত্য মতে শক্তির বৈজ্ঞানিক নাম Energy । সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই শক্তিই মূল—ইহারই প্রভাবে সমস্ত বিশ্বসৃষ্টির বিকাশ হইতেছে । এই শক্তি আবার বিখের, পরা শক্তি বলিয়া ইহার অলৌকিক লক্ষণ এই যে, যদিও ইহার নিত্য ক্রিয়া হইতেছে, তথাপি কখনও ইহার কোনও অপচয় হয় না—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ইহার নাম হইয়াছে Conservation of Energy । আমাদেরিগের বিশ্ব-সৃষ্টি বিধানিনী ‘শক্তি’ ও ‘আত্মাশক্তি’ নামে পরিচিতা, ইহাও পাশ্চাত্য-শক্তিরই জ্ঞান নিত্য ক্রিয়াশীল হইয়াও ‘অব্যয়’ । এই তুলনারা আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, পাশ্চাত্য নব্য-বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক সত্য আমাদেরিগের শাস্ত্রে বহু পূর্বেই ঋষিদিগের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে ।

উপরে শক্তিতত্ত্বের যে বিবরণ আমরা প্রদান করিয়াছি, তাহাই যে সাংখ্যদর্শন মতের আদি, একটু আশুধাবন করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব । শক্তিই সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি এবং মহাদেবই সাংখ্যদর্শনের ‘পুরুষ’ । প্রকৃতিতেই সমস্ত কর্তৃত্ব নিবদ্ধ * এবং তৎ সহযোগেই সংসার প্রবর্তিত, পুরুষ উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট । প্রকৃতি নাট্যাভিনয় নিযুক্তা পুরুষ প্রেক্ষক । পুরুষের চৈতন্য দ্বারা প্রকৃতির কর্তৃত্ব উপসংহত হইলেই সংসার নিবর্তিত হয়, সুতরাং পুরুষও মহাদেবেরই জ্ঞান সৃষ্টি সংহারকই বটেন । শক্তিকে আমরা ‘আত্মাশক্তি’ বলিয়াছি—প্রকৃতিও তেমনই ‘মূল প্রকৃতি’ বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাকে । শক্তিতত্ত্ব হইতেই যে সাংখ্যমতের উৎপত্তি হইয়াছে, পুরণ তাহারও প্রমাণ দিয়া থাকে—

* “একমোভীতি প্রকৃতিঃ ।” সম্পূর্ণরূপে কার্য করেন বলিয়াই ‘প্রকৃতি’ এই সোপানক তাহার প্রমাণ ।

‘যথা—“অহমশিষ্ট সোমশ্চ প্রকৃত্য। পুরুষঃ স্বয়ম্ ॥” ৭ লিঙ্গপুরাণ ৩৪শ অধ্যায় ।

‘অগ্নিও আমি, সোমও আমি; এবং প্রকৃতির সহিত স্বয়ং পুরুষও আমি ।’

কোণ পুরাণে মহাদেব স্পষ্ট সাংখ্যদর্শন-রূপে ও তদগ্রণী রূপে স্তব্ত হইয়াছেন, যথা—
“সাংখ্যায় সাংখ্যমুখ্যায় যোগাধিপত্যভে-
নমঃ ॥” ৩৬ ব্রহ্মপুরাণ ৪০ অধ্যায় ।

এ পর্যন্ত আমরা কেবল ত্রিমূর্তির একতম মহেশ্বরের সহিত সৃষ্টি ব্যাপার সংযোগ প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি । এক্ষণে আমরা অপর দুই মূর্তির সহিত সংযোগের বিষয়ও আলোচনা করিব । এই দুই মূর্তি বিষ্ণু ও ব্রহ্মার মূর্তি । বিষ্ণু সৃষ্টির রক্ষাকর্তা রূপে প্রসিদ্ধ । হরিবংশে বিষ্ণু সোম ও মহাদেব অগ্নিবরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন—যথা—“কৃত্ব অগ্নিময় এবং বিষ্ণু সোমাত্মক বলিয়া স্তব্ত হন, এই স্বাবর জগদাত্মক জগৎ সেই অগ্নিসোমাত্মক ।” বিষ্ণুপর্ক ১৮শ অধ্যায়—বঙ্গবাসীর অমুবাদ । সোমরসের দ্বারাই সমস্তের পোষণ হয়—সুতরাং বিষ্ণু রক্ষাকর্তা বলিয়া যে সোমরূপে বর্ণিত হইবেন, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই বোধ হয় । শাস্ত্রে আমরা বিষ্ণুর দুইটী রূপ দেখিতে পাই, একরূপে তিনি ‘হিরণ্যর বপুঃ,’ অত্ররূপে তিনি ‘নবহর্কাদলভ্রামতম্ ।’ তাঁহার স্বর্ণের রূপ হিরণ্যরূপ * আর মর্ত্যের রূপ নবজলধর ভ্রামররূপ ।† রসের দ্বারা যেমন জগতের পুষ্টি হয়, তেমনই আবার সূর্য্যরশ্মিদ্বারা জগৎ উজ্জীবিত হয়, তাহাতেই সূর্য্য ‘সবিতা’ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন,

* “যেসোদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী নারাকীঃ সরসিভাসন সরিষ্ঠিঃ । কেদুরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরাটীহারী হিরণ্যর বপুঃতপশ্চকঃ ॥”

† “সুদন বলবরকটের গোপবস্ত্রী হুতলৌকিকঃ ।

ভট্টমহাশয়ঃ কৃষ্ণানু সোমো নবীকৃত বীজার কৃষ্ণঃ ॥

কারণ তিনিই জগতের প্রকৃত প্রাণদাতা (‘জগৎ সবিভা’ যথা জগৎ সবিভ্রে শুচরে সবিভ্রে ইত্যাদি মন্ত্রে)। সুতরাং বিষ্ণু স্বর্ধাক্রমে স্বর্ধকান্তিধারী কিন্তু মর্ত্যে তদীয় রশ্মি সংযোগে রস হরিৎবর্ণতা * সম্পাদিত হইয়া পোষণোপযোগী হয় বলিয়া হরিৎবর্ণ বা শ্রামবর্ণ যেমন পুষ্টির চিত্তরূপে প্রকৃতির স্বাভাবিক রূপ হইয়াছে, তদ্রূপ জগৎ পোষণকারী বিষ্ণুরও রূপ হইয়াছে। এই বিষ্ণুর মধ্যে তেজঃ ও রস উভয় ভাবেরই সমাবেশ হইয়াছে, আমরা দেখিতে পাইলাম। যজ্ঞও এই উভয়রূপেই সম্মিলন হইয়াছে, আমরা দেখিয়াছি—সুতরাং বিষ্ণুও শাস্ত্রে ‘যজ্ঞমূর্ত্তি’ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, যথা—“যজ্ঞোবৈবিষ্ণুঃ” ইতি শ্রুতিঃ। অভিধনেও যজ্ঞ শব্দ বিষ্ণুবাচক পাওয়া যায়—যথা—যজ্ঞং স্যাদান্নানিমখে নারায়ণ-হতাশরোরিতি হৈমঃ।

একশ্রেণে আমরা ব্রহ্মামূর্ত্তির বিষয় আলোচনা করিব। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে বিদিত। তৎকৃত সৃষ্টি ব্যাখ্যার বর্ণনারও পূর্বকৃত অরীযোম তত্বই অনুসৃত দেখা যায়, যথা—“ব্রহ্মভোজোমরং শুকং বস্য সর্কমিদংরসঃ।

একস্যভূতং ভূতস্যহরং হরং স্বাবরজজন্মম্॥”

শব্দকল্পদ্রুমমণ্ডিত মহাভারত যোক্তব্যম্।

ব্রহ্মতেজই শুক্রস্বরূপ, এবং দৃশ্যমান সমস্ত রসস্বরূপ। উভয়ের যোগে চরাচর উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মা যে মূলে অগ্নি দেবতা, তাহা অগ্নি মূর্ত্তিরূপে তাঁহার পূজা হইতেই প্রমাণিত হয়। বেদে সৃষ্টির যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতেও তাঁহার অগ্নি প্রকৃতিই স্পষ্ট রূপে লক্ষিত হয়—যথা—“ঋতঞ্চ সত্য-

ঋতীহাঃ তপসোহিধ্যভারত যুক্তো রাজ্যভা-
রত, ততঃ সমুদ্রোহর্বণঃ সমুদ্রাধিবাদধিসংবৎ-
সরোহভারত—অহোরাত্রাণি। বিবধবিবস্যা
মিবতো বশী স্বর্ধাচজ্ঞমসৌ ধাতা যথাপূর্বম-
কল্পয়দ্বিবক পৃথিবীং চাণ্ডরীকমধোবঃ॥”
উক্ত বর্ণনাটী যে ব্রহ্ম সৃষ্টিবিষয়ক, তাহা
ধাতাশব্দ দ্বারাই প্রতিপাদিত হইতেছে।
কারণ ‘ধাতা’ শব্দ অভিধানে বিশেষরূপে
‘ব্রহ্মবাচী। এখানে উচ্ছগতপঃ হইতেই
সমস্ত সৃষ্টি প্রসূত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টরূপেই
নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই ‘তপঃ ধারা আমরা
অগ্নির স্ফুটাবস্থা তাপ বা তেজ বুঝিলেই
সুন্দর অর্থসঙ্গতি হয়। পাশ্চাত্য শক্তি
অর্থাৎ Energyর যে প্রকৃতি, ইহাও আমা-
দের নিকট সেই প্রকৃতির বলিয়াই মনে হয়।
“প্রথম এই তাপ প্রকাশিত হইলে তাহা হইতে
ঋত অর্থাৎ বিশ্বনিধান, তৎপর সত্য অর্থাৎ
সদ্বস্ত উৎপন্ন হইল, কিন্তু এই সমস্তই তখনও
তমসাচ্ছন্ন রহিল, এই অন্ধকারের মধ্যে বাষ্প-
সমুদ্র উৎপন্ন হইল, ইহার পর চক্ষু স্বর্ধা উৎ-
পন্ন হইয়া রাত্রি দিন কাল বিভাগ হইল,
তাহার পর পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ প্রকৃতি
উৎপন্ন হইল।” ইহাই পূর্বকৃত সৃষ্টি বর্ণনার
মর্ম্ম। আমরা সমুদ্র মন্থনে যে বাষ্প রাশির
আবর্ত্তন হইতে বিবিধ সৃষ্টির বর্ণনা পাইয়াছি,
—এখানের বর্ণিত ‘সমুদ্রে’ও যেন সেই বাষ্প
রাশিরই কথা পাইতেছি এবং আমরা বাষ্প-
রাশিতে যে বেগ সংযোগের উল্লেখ করিয়াছি
—এখানেও তাপই যেন বাষ্পরূপ সমুদ্রে
সেই বেগ সঞ্চালিত করিয়াই তাহা হইতে
চক্ষু, স্বর্ধা, পৃথিবীর সৃষ্টি করিবার কথা
বর্ণিত হইয়াছে।

বিষ্ণুর দর্শনও এই তত্ত্বটিকে নিত্য
জ্যোতিঃস্বরূপ বর্ণনা করিয়াছে, যথা—

* এই হরিৎবর্ণ রস Chlorophyl নামে পরি-
জ্ঞাত।

সাংখ্যো বহতি তংদেবং জ্যোতীর্ণগং
। লীচ ।

সনাতনম্।

যোগিনো বংধন্ত্যামং জ্যোতীর্ণগং

সনাতনম্ ॥*

শব্দকল্পদ্রুমমুত ব্রহ্মবৈবর্ত পূবাণ ১২৮ম অঃ।

এই ব্রহ্মজ্যোতিঃ সমস্ত জ্ঞানেরই আধার,
সুতরাং ইহা নিত্য চৈতন্য স্বরূপ। গায়ত্রীতে
ইহারই ধ্যান করিতে হয় বলিয়াই গায়ত্রীর
এত মাহাত্ম্য।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্তী।

স্বাধীনতা। *

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
ছিল নাকি ট্রান্সজালে, কোন দিন কোন কালে,
কিবাণী জোহান্সবার্গে হীরা সোণা ঢালি ?
নীরক্ত ব্যার বুক, নাহি তেজ একটুক,
জুগার আগার আজ প্রিটোরিয়া খালি !
সে দেশ ছাড়িলি তাই, সেখানে আদব নাই,
তোয় কি আদর জানি আমরা বাঙ্গালী ?
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হৈতে আলি ?

২

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
সে দিন লক্ষণ সেন, মুখে উঠে রক্ত-ফেন,
সতর সিপাই হাতে তোরে দিল ডালি !
খিলিজি দাসের দাস, সে দিল গলায় ফাঁস,
আজিও অগৎ যুড়ে দেয় গালাগালি !
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি !

৩

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
বুটে ক'টা বনমেঘ, বিসর্জিল অবশেষ,
পশুর স্থণিত হের ক'রে চতুরালী,
হার সে পাপীর লোভে, নরকে বাঙ্গলা ডোবে,
বাঙ্গলার ইতিহাসে মাখিয়াছে কালী !
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?

৪

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
নূতন আদ্যোক্ত মুখে, নূতন আনন্ড বৃকে,

নূতন নূতন ভাবে কুটীর ভাসালি !
নূতন নূতন আশা, নূতন নূতন ভাষা,
নূতন এ কাঁদা হাসা কোথা ইহা পালি ?
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?

৫

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
যুগ যুগান্তের পরে, আলি বাঙ্গালীর ঘরে,
চঞ্চল পতাকা খানি অঞ্চলে উড়ালি !
কোথা অমরিকা দেশ, সাগরের সীমা শেষ,
আনন্দে ত্রেজিল দেয় ত্রেতো—কবতালি ?
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?

৬

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
কোথা ছিলি এত দিন, তুরূফ পারস্ত চীন,
সবাধি ফিরেছে দিন দেখি আজি কালি !
যে দেশে আসিলি নেচে, সকলি উঠিল বেঁচে,
ফিলিপাইন কিউবা সে কত ভাগ্যশালী !
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি !

৭

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
আমবা নেশায় ভোর, কি বুদ্ধি সন্ধান ভোর,
দারোগা ডিপুটি ঘোরা পেশা আরদারী !
ক'—রে সে দেশের কথা, সে আদর সে সমতা,
কেমন জাফের জেঙ্গ বুটনু ইটালী !
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?

* বরস ও বৎসর : ইহার ভাক দান 'মাকী', সোহাগের দান 'সোখার হুটি' পোলাকী দান 'স্বাধীনতা'।

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
 ও মোর 'সোণার কুচি', পবিত্র সরল শুচি,
 ও মোর মণিক 'মাকো' মায়ের ছলানী,
 কোথা কোন্ রণভূমি, মাড়ারে আলিলি তুই,
 কোথায়ে কথির রাজা চরণে মাখালি !
 ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?

৯

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
 তুই ছুঁলে তুণ কুচি, সে বে হর সোণা মুঠা,
 দেখিনিরে তোমর মত হেন ইন্দ্রজালী !

তুই দিলে ভব-হাই, কোহিছর হাতে পাই,
 কাকন কোত্তত হর মুচি বুলা বালি !

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?

১০

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
 আবার নাচরে ছুটে, রঞ্জিনী সঙ্গিনী মুটে,
 নীলগিরি হিমকুটে কর কালাকালি !
 চরণের তলে শব, ভুলি মৃত্যু পরাভব,
 জাপক দৌনের দীন অধীন বাকালী,
 রণ রণ বন বন বন করতালি !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস ।

প্রাভঃস্বপ্নগীতা দয়াময়ী ।

স্বর্গীয়া দয়াময়ী চৌধুরাণী মহোদয়
 ঢাকাইল মহকুমার পরগণা কাগমারীর ।/০
 আনা হিতাব জমিদার ৬ কালীনাথ রায়
 চৌধুরী মহোদয়ের সহধর্মিণী ছিলেন । এই
 মহীয়সী মহিলা ফরিদপুরান্তর্গত ধীপু ব্রাহ্ম-
 বসৌ ৬ রামকান্ত বহু মহাশয়ের কন্যা ।
 জন্ম সময় নিশ্চয় নির্ধারণ করা কঠিন । ঘটনা
 পরম্পরা বতদূর অবগত হইতে পারা যায়,
 তাহাতে ১১২০—১২০০ সনের মধ্যে দয়াময়ীর
 জন্ম । অতি শৈশবে বিবাহ এবং ৯ বৎসর বয়-
 সেই বৈধব্য সংঘটিত হয় । দয়াময়ী নিরর
 পিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন নাই, এবং
 ভগবানের রূপায় মধ্যবিৎ পিতার গৃহ হইতে
 এক অতি উচ্চ প্রাচীন ধনী পরিবারে পতিত
 হইরাছিলেন । উচ্চবংশ ও বিভবে বাহা-
 দেব স্থান, সংসারে তাঁহার স্বভাবতঃ অতি
 উদার প্রকৃতি সম্পন্ন হইয়া থাকেন । ভগবান
 'দয়াময়ীকে যেমন এক বিপুল সংসারে অগাধ
 ধনের অধিকারী করিয়া পঠাইরাছিলেন, তেমন

তাঁহাকে ধনের যথোপযোগ্য ব্যবহারও
 শিক্ষা দিয়াছিলেন । দয়াময়ী বয়স্ক হইয়া
 জমিদারী এবং বংশরক্ষার জন্ত প্রথমতঃ শিব-
 নাম রায় মহাশয়কে দত্তক গ্রহণ করেন ।
 কিশদস্তী শিবনাথকে বিভিন্নচিত্তে চিত্রিত
 করিয়াছে । শিবনাথ অল্প বয়সেই চরিত্রহীন
 হইয়া উঠেন । মাতা নানা উপায়ে তাঁহার
 সংশোধনের চেষ্টা করিয়াও কোন ফল প্রাপ্ত
 হন নাই । মজাশক্তিই শিবনাথের কলক
 ছিল । যে স্থানে মদিরা, সেই স্থানেই নানা-
 রূপ অত্যাচার ও বাতিচার । কোন চেষ্টাতেই
 যখন শিবনাথকে সংপথে আনা গেল না,
 মাতা তখন নিরুপায় হইয়া, এহেন সন্তান
 বংশের কলক মনে করিলেন । বংশধারা ও
 সংসারের গোবর অক্ষুণ্ণ রাখিবার সঙ্কল্প মনে
 রাখিয়া 'দয়াময়ী ঢাকাহিত তদানীন্তন
 Provincial Courtএ শিবনাথ প্রকৃত দত্তক'
 ও ভূস্বামিকারী লেহন বলিয়া তাঁহাকে
 "নাকোচ" করিবার জন্ত প্রার্থনা করেন ।

এই সময় সুকুমার নিবাসী ৬০ ব্রহ্মরাম
শুণ্ড মহাশয় ১/০ আনী সরকারের মুচ্ছাদি
ছিলেন। এই মোকদ্দমার শিবনাথের তলব
হয়। মোকদ্দমা শুনানীর দিনও, কাছারি
বাইবার পথে, শুণ্ডিকালয়ে প্রচুর মতপান
করিয়া একরূপ জ্ঞানহীন অবস্থায় শিবনাথ
বিচারালয়ে উপস্থিত হন। বাদিনীর বর্ণনা
ও শিবনাথের তদানীন্তন অবস্থা দৃষ্টে বিচার-
পতিগণ একান্ত দুঃখিতচিত্তে শিবনাথের
বিরুদ্ধেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন। শিব-
নাথ ঢাকা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া
অল্পদিন মধ্যেই দেশত্যাগী হন। ইহার পর
তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।
কেহ কেহ বলেন, শিবনাথ ঘোর তান্ত্রিক
ছিলেন। পূজার্কনায় তান্ত্রিকোক্ত প্রথাবলম্বন
করায় শাক্ত মাতা শিবনাথকে “নাকোচ্”
করিতে প্রয়াস পান। যাঁহারা শিবনাথকে
বীরাচারী বলেন, তাঁহারা তাঁহাকে একান্ত
সাধক ব্যক্তি বলিয়া নির্দেশ করিতেও কুণ্ঠিত
হন না। ইঁহাদের মতে শিবনাথ অতি
সদাশয় দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন। যোগ্য ব্যক্তিকে
দান করা, বিপদের সাহায্য করা, অন্নহীনে
অন্নদান করা, তাঁহার জীবনের প্রধান এক
শুধ ছিল। সাধনাবলে তিনি নানারূপ বিষয়-
কর ঘটনা সংঘটন করিতে পারিতেন। একরূপ
শুনা যায়, একদিন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কন্তা-
দায়গ্রস্ত হইয়া শিবনাথের নিকট ভিক্ষার্থী হয়।
ব্রাহ্মণের সহস্র মুদ্রার প্রয়োজন। পুত্র
মাতাকে বলিলেন—“আমাকে হাজার টাকা
দিতে হইবে, আমি ব্রাহ্মণের কন্তা-দায় মোচন
করিব।” মাতা অস্বীকার করায়, শিবনাথ
নাকি অভিমানে জীবন পরিত্যাগের অছিলায়
এক পুত্রে ডুব দিয়া অনেক সময় অদৃশ্য
হইয়া থাকেন। শিবনাথ বুঝি এতদূর

জীবিত নাই, মনে করিয়া শোকাকুলিত
হইয়া মাতা তাঁহার অহুসন্ধান লোক নিবৃত্ত
করেন। পরে তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা প্রদান
করিয়া সন্তুষ্ট করেন এবং ব্রাহ্মণও কন্তা-দায়-
মুক্ত হয়। শিবনাথ দত্তক নহেন, প্রমাণিত
হইয়া, পেরুয়া চাক্নার জমিদারীতে গমন
করিয়াছিলেন। সে স্থানে কোন ব্যক্তির
অসঙ্গত ব্যবহারে রাগান্বিত হইয়া তাহাকে
হত্যা করেন এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত হন।
এ বিপদ হইতে শিবনাথ মাতা দয়াময়ীর
চেষ্টায় অব্যাহতি প্রাপ্ত হন। অব্যাহতি
প্রাপ্ত হইয়া শিবনাথ পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়া
যান। কালক্রমে দয়াময়ী যখন গৃহত্যাগ
করিয়া ৬ কাশীবাস করিতে গমন করেন,
তখন আবার শিবনাথ মাতৃ সকাশে আগমন
করিয়া তাঁহারি পাদমূলে বসিয়া সুপুত্রের
জায় অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। শিবনাথ
চিরদিনের জন্ত সন্তোষ পরিত্যাগ করিলে পর
দয়াময়ী অলোয়াভবানী গ্রামস্থিত জ্ঞাতি
নিয়োগী পরিবারের একটা সন্তানকে দত্তক
গ্রহণ করেন। ইনিই ১/০ হস্তার বর্তমান
জমিদার সুকবি এবং সুবক্তা শ্রীযুক্ত প্রমথ
নাথ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত মন্থনাথ রায়
চৌধুরী মহোদয়গণের পিতামহ—১/০ ভৈরব
নাথ রায়। সতীশাক্ষী মাতা পুত্র শিবনাথের
চরিত্রহীনতায় একান্ত বাথিত চিত্তে আদা-
লতে দত্তক অসিদ্ধ করিবার জন্ত যে বর্ণনা
দাখিল করেন, তাহাতেই দয়াময়ীর তাৎ-
কালীন হৃদয়ের ভাবের সম্যক আভাস প্রাপ্ত
হওয়া যায়। আবেদন পত্রে ছিল—“আমার
দত্তক গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। যে সময়
আমি বিধবা হই, সে সময় দত্তক গ্রহণ
করিবার অধিকার অন্নে নাই।” চৌধুরীগণ
মনে করিয়াছিলেন,—শিবনাথের জায় দত্তক

না থাকাই ভাল ; শিবনাথের জ্ঞান দত্তক দ্বারা বংশরক্ষা অপেক্ষা বংশলোপ সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর । পবিত্রতাতে দয়াময়ীর কত প্রজ্ঞা ছিল, পূর্বোক্ত কার্যেই আমরা তাহা বেশ বুঝিতে পারি । কিন্তু দয়াময়ীর এই কার্যে ফল ভবিষ্যতে শুভপ্রদ হয় নাই । শিবনাথের তাড়িত হইবার পর দয়াময়ী যখন ৬ ভৈরবনাথ রায় মহোদয়কে দত্তক গ্রহণ করেন, তখন ১৮০ হিস্তার তদানীন্তন জমিদার গোলকনাথ রায়চৌধুরী মহোদয়, দয়াময়ী দত্তক গ্রহণ করিতে পাঠেন না বলিয়া Supreme Courtয়ে আপত্তি উত্থাপন করিয়া দয়াময়ীর শিবনাথকে “নাকোচ” করিবার মোকদ্দমার বর্ণনা দাখিল করিয়া দিয়া নিজকেই ১৮০ হিস্তার জমিদারীর আসন্ন উত্তরাধিকারী বলিয়া দাবী করেন । এইবার দয়াময়ীর নিজ অপরিণামদর্শিতার ফল ফলিতে আরম্ভ করিল । কিন্তু দয়াময়ীর পূর্বোক্ত কার্যেও আমরা ভগবানের অঙ্গুলি-তাড়নাই দেখিতে পাইতেছি । মানব সমাজে লোক-শিক্ষার জন্ত মধো মধো মহাজনগণ জন্মগ্রহণ করিয়া দৃষ্টান্তদ্বারা সংসারের পঙ্কিলতার প্রতি সাধারণের ঘৃণার উদ্রেক করিয়া থাকেন । বর্তমান ঘটনায়ও ইহার এক অত্যাশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত সংঘটিত হইতে আমরা দেখিতে পাই । এক দিকে যেমন ৬গোলকনাথ,অন্তদিকে তেমনি ৬কমললোচন, স্বার্থ এবং পরার্থের দুইটি অত্যাশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন । এই বিপদের সময় সর্বনিম্নস্তা জগদীশ্বর এক অদ্ভুত “উপায়” কাগমারীর অন্ততর ভাবী উন্নতিস্থল ১৮০ আনীর ভবিষ্যৎশীঘ্র জমিদার মহোদয়দিগের সংসার রক্ষার উপায় বিধান করেন । দয়াময়ীর ভাগিনেয় কমললোচন চৌধুরী মহাশয় এই বিপদের সময় ব্যক্তি-

গত মহর্ষের যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, সংসারে তাহার তুলনা নাই । কমল যখন দেখিলেন, মাহামহ বংশ ও ঐশ্বর্য্য লোপ পাইতে চলিয়াছে, তখন আর তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না । তাহার সমক্ষেই কি তাহার মাতুল-গৃহে সাক্ষ্য প্রদীপ জালিবে না ? এ চিন্তা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল । তিনি Supreme-courtয়ে এক প্রতিদরখাস্ত দাখিল করিয়া স্বয়ং ১৮০ আনীর আসন্ন উত্তরাধিকারী বলিয়া দাবী করিলেন । ৬গোলকনাথের দাবী অগ্রাহ হইল । এদিকে আবার “মৃত্যুর সময় মাতুল তাহার বংশরক্ষার জন্ত আমাকে দত্তক রাখিয়া দিতে অনুমতি করিয়া গিয়াছেন,” বলিয়া কমল এক দরখাস্ত দাখিল করিয়া ভৈরবনাথকেই তাহার মাতুলের দত্তকরূপে স্থিরতর রাখিলেন । দয়াময়ী, ভাগিনেয়ের এক্ষণ উদার মহৎহৃদয়ের দৃষ্টান্তে বিস্মিত হইলেন, এবং কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে কমলকে জমিদারী পোগল-দিবী অঞ্চল দান করিতে অভিলাস প্রকাশ করেন । কিন্তু কমল সংসারে শরা থানার জ্বর সর্পিণ হৃদয় লইয়া জন্মেন নাই । তাহার হৃদয় আকাশের জ্বর অনন্ত উদার ছিল বলিয়া, তিনি এ দান প্রত্যাখ্যান করিলেন । বলিলেন,—“আমি আমার কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছি মাত্র । আমার মাতুলের গৃহে সাক্ষ্য-প্রদীপ জালিলে, তাহাতে আমি যত স্মৃখী, নিজে বড় লোক হইলে আমি তাহার শতাংশের একাংশও স্মৃখী হইব না ।” আমরা সামান্য ২১০ কথার কমললোচনের ত্যাগ-স্বীকারের কথা প্রকাশ করিলাম ৫টে, কিন্তু যখন মনে করি, বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা মুনাফার জমিদারী কমল নির্বিকার-চিত্তে অবাধে অগ্রাহ করিলেন, তখন মনে ইঁহ, কমল বুঝি এ সর্পিণ পাঁপ সংসারের

জীব ছিলেন না। এ ভাগ-স্বীকার পাশ্চাত্য জগতের হৃদয়-বোধিত Sir Sydney Smith এর ভাগ-স্বীকার অপেক্ষা উজ্জল দৃষ্টান্ত নহে কি? Supreme-court এর মোকদ্দমা নিষ্পত্তির সঙ্গে সঙ্গেই দয়াময়ীর বিপদ একরূপ কাটিয়া গেল। দয়াময়ী শাস্তি লাভ করিয়া তাঁহার দেবচরিত্রাকরূপ ধর্ম চরণে জীবন ও অর্থ নিয়োগ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। এই সময় দয়াময়ীর ব্যবহার প্রকৃতিই দয়াময়ীর নামের সার্থকতা সম্পাদন করে। দয়াময়ীর দেবচরিত্রে আন্তরিকতা এক বিশেষত্ব ছিল। তিনি যাহাই করিতেন, তাহাতেই তাঁহার আন্তরিকতা ফুটিয়া বাহির হইত। দেববিজে প্রীতি, দরিদ্রে অন্নদান, ধর্মোচরণ ও কৃষ্ণসাধন তাঁহার বৈধব্যের বিশেষত্ব ছিল। বঙ্গগৃহ সৌন্দর্য্য, পুণ্য এবং প্রেম মধুর ও পবিত্র করিবীর জন্যই ললনা-কুল-রাণী বঙ্গরমণীদিগের আবির্ভাব। ভারত-ললনা-কুলের স্ত্রীর গভীর প্রেম-ভক্তি-পুণ্য-পবিত্রতা ও আত্মবিসর্জনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে অল্প কোন দেশের মহিলা-সমাজ এ পর্য্যন্তও সক্ষম হন নাই। দয়াময়ীর জীব-প্রকৃতি গৃহে সঙ্গী শূভ্রাবাসে সজ্জি লাভ না করিয়া, সমস্ত সমাজ পুণ্য, প্রেম ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ করিয়া ধন্য হইয়া এবং ধন্য করিয়া গিয়াছেন। দয়াময়ী তদানীন্তন দুর্গম পথ পর্য্যটন করিয়া ভারতের সমস্ত প্রধান প্রধান তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। যে তীর্থেই দয়াময়ী যাইতেন, সেই স্থানেই পূজার্ত্তনা, দান-ধ্যানে লোকদিগকে সন্তুষ্ট করিতেন। শ্রীক্ষেত্রে, কামাখ্যায়, চন্দ্রনাথে এবং বারাণসী ক্ষেত্রে তিনি যেরূপ ব্যয় বিধান করিয়াছিলেন, তৎকালে সেরূপ আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। যে তীর্থে

তিনি গিয়াছেন, সেই স্থানেই দেবোদ্দেশ্যে বহুমূল্যবান ভূ-সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, দয়াময়ী শ্রীক্ষেত্রে তাঁর্থ পর্য্যটনে যাইয়া তথাকার তদানীন্তন পাণ্ডা-দিগকে বার্ষিক ৩৫০ টাকা আয়ের সম্পত্তি মাত্র ৬০ টাকা জন্মায় দান করিয়াছিলেন। অতঃপর দয়াময়ীর পুত্রবধু বর্তমান ভূম্যধিকারী মহোদয়দিগের পিতামহী ৮গৌরমণি চৌধুরাণী মহোদয়া যখন শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন, তখন উক্ত সম্পত্তির জমা ৬০ টাকার স্থলে ৬ টাকার ধাৰ্য্য করিয়াছিলেন। এই সম্পত্তির কিয়দংশ পাণ্ডাগণ বর্তমান ভূম্যধিকারীদিগের পিতা স্বনামধন্য জমিদার ৮দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী মহোদয়ের নিকট দশ সহস্র টাকা মূল্যে বিক্রয় করে। এখনও অবশিষ্টাংশ হইতে পাণ্ডাগণ বার্ষিক প্রায় ১৫০ দেড়শত টাকা উপস্বহ পাইতেছে। এই বিক্রয়-মূল্য হইতেই দয়াময়ীর দত্তা সম্পত্তির তায়দাদ ও ধর্মসম্বন্ধে আন্তরিকতা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কেবল ইহাই নহে—দয়াময়ী তাঁহার গুরুদেব শাস্তিপুর-নিবাসী গোস্বামী প্রভুদিগকে বার্ষিক সাত হাজার টাকা উপস্বহের জমিদারী দান করিয়া গিয়াছেন। এরূপ বৃহৎ দান, ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকিলেই সম্ভব, অল্পখা নহে। দয়াময়ীর দত্তা নাথোজ, পীড়পান, ইত্যাদির উপস্বহ হইতে আজও অনেক দেব দেবীর সেবার্চনা হইতেছে। কাংমারীবাসী অনেক ব্রাহ্মণদিগের গ্রাসাচ্ছাদন অল্প দয়াময়ী প্রচুর ব্রহ্মোত্তর প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানেও এই ব্রহ্মোত্তরই অনেক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের একমাত্র উপজীবিকা। দানে দয়াময়ীর কোন দিনও সাংশ্রয়িক ভাব ছিল না। বঙ্গদেশের মহিলাসমাজ

ধর্মজগতে অতুলনীয়। ইহাদের মত মীরল বিশ্বাদী প্রাণী জগতে ভূগুণ। বিশ্বাস বিষয়ে বঙ্গরমণীকুল সংসারে বরণীয়। প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলা-কুল রাণী দয়াময়ী তাঁহার দৈনিক পূজার্কনার কথঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য-প্রিয় ছিলেন। সমাজ-প্রচলিত শিবপূজা রত নিয়মাদিতে তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা বিশ্বাস থাকে। সবেও তিনি কেবল তাহাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া, ব্রাহ্ম-মূর্ত্তে প্রাতঃস্নান করিয়া পূতঃদেহ-মনে যখন প্রগাঢ় স্তব্ধের সহিত মনন করিতেন এবং ভগবৎ প্রেমে বিভোর হইতেন, তখন তাঁহার আকৃতি দেখিয়া কেহই বিস্মিত না হইয়া পারিত না। তাঁহার বদনমণ্ডলে কি এক স্বর্ণীয় জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইত, যে দেখিত, সে-ই স্তম্ভিত হইত। প্রায় এক প্রহর কাল মনন করার পর দৈনিক শিব পূজাদি নানা উপচারে সমাধা করিয়া তবে সংসারের কার্যে নিযুক্ত হইতেন। সাংসারিক কোন বাধা বিষয়ই দয়াময়ীর দৈনিক পূজা-র্চনার বিষয় ঘটাইতে পারিত না। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, দয়াময়ীর প্রত্যেক কার্যেই আন্তরিকতা ছিল। তাঁহার সময়ে প্রায়শই ১/০ আনীর জমিদার বাটাতে স্থানীয় ব্রাহ্মণ ও অপরাপর ভদ্র লোকদিগের আহ্বারের নিমন্ত্রণ হইত। নিমন্ত্রিতদিগকে কখনও বহির্ভবনে আহ্বার করিতে দেওয়া হইত না। চৌধুরাণী নিজে দেখিয়া শুনিয়া সকলকে পরিতোষ সহকারে আহ্বার করাইতেন। বাহাদিগের আহ্বারের নিমন্ত্রণ থাকিত, চৌধুরাণী মহোদয় তাহাদের নিকট উপস্থিত থাকিতে লজ্জিত হইতেন না, বলিতেন “ইহারা আমারই লোক।” পূর্বেই বলা হইয়াছে, অতি শৈশবেই দয়াময়ীর বৈধব্য ঘটে। এদিকে হিন্দুর ধর্ম-বিধবার প্রতি

সমাজের যেরূপ ব্যবস্থা, তাহা এখানে বলা নিম্নপ্রয়োজন। দয়াময়ী এই শৈশবেই প্রৌড় বিধবার জায় ব্যবহার করিতেন। অতি নিকটে চিত্তে ভবিষ্যৎ গ্রহণ, যুগ্মযায় শয়ন, মস্তক মুণ্ডন এবং পূজার্কনাদি করিয়া তিনি দিন কটন করিতেন। দয়াময়ী এক বিপুল সংসারের কর্ত্রী হইয়াও পূর্বোক্তরূপ কৃচ্ছ্র-সাধন করিয়া ধাতু মনে করিতেন। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, হিন্দুর চরিত্রে বর্ধমানী ও ভক্তিমতী বিধবা যতদিন আছে, ততদিন তাঁহাদের পুণ্যফলে হিন্দুত্ব-নাম লোপ পাইবে না। একরূপ শুনা যায়, দয়াময়ীর পূর্বে কাগমারী পরগণার যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক বাস করিতেন, জমিদার বাড়ীতে তাঁহাদের যথোপযুক্ত রূপ সম্মান রক্ষিত হইত না। এইজন্য বাজুহা পরগণার অধিবাসিগণ কাগমারীর ভদ্র লোকদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেন না, এবং তাঁহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতেও নারাজ ছিলেন। দয়াময়ী ইহা শুনিয়া যাহাতে “মাঝি মহাশয়, বামন বেটা” ব্যবহার না থাকে এবং বাজুহা পরগণার অধিবাসিগণ কাগমারীর লোকদিগকে স্তুতি করিতে না পারেন, তত্পর্য অবলম্বন করেন এবং বহুল নিষ্কর ভূমি দান করিয়া অনেক সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে কাগমারীতে বাস করিতে প্রলুব্ধ করেন। ১২৩২ হইতে ১২৩৪ সনের মধ্যে বেড়াবুচিনার নিয়োগী মহোদয়গণ নদী ভাঙ্গায় বাসস্থান পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন। টাঙ্গাইলের পাদরী সাহেবদিগের বর্তমান বাড়ীর দক্ষিণ ময়দানই পূর্বতন বেড়াবুচিনা গ্রাম ছিল। বর্তমানে যেস্থানকে বেড়াবুচিনা গ্রাম বলে, প্রকৃতপক্ষে তাহা অলোয়া-ভবানী—বেড়াবুচিনা নহে। নিয়োগী মহা-

শয়গণ, কোথায় বাড়ী করিবেন, চিন্তা করিতে ছিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল, নিজ নিজ তালুকের কোন স্থানে ভদ্রাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করিবেন। দয়াময়ী ইহা শুনিয়া নিয়োগী বংশের ৩টা প্রাচীন মাতব্বর ভদ্র লোককে আহ্বান করেন এবং অলোয়া-ভবানীতে বাড়ী করিতে অনুরোধ করিয়া প্রচুর নির্কর জমি প্রদান করিবেন, একরূপ মতপ্রকাশ করেন। নিয়োগী মহাশয়গণ ধর্ম বুদ্ধিতে কুর প্রদান না করিয়া বাস করিবেন না, বলিয়া জোর করার অগত্যাৎক্ষে ফি পাখী / ও জিয়াৎ / জমা নির্দ্ধারণে যথোপযুক্ত জমি প্রদান করিয়া সমস্ত নিয়োগী মহাশয়দিগকে ঐ গ্রামেই প্রতিষ্ঠা করেন। সুখের বিষয়, ১/ আনীর বর্তমান কর্তৃপক্ষীয়গণ এ পর্যন্তও উক্ত জমার কোন পুরিবর্তন করেন নাই। দয়াময়ী একবার মহা সমারোহে মহাভারত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হিন্দু সমাজে মহাভারত প্রতিষ্ঠার প্রচুর ফল-শ্রুতি আছে। এ কার্যে দয়াময়ী যেমন প্রচুর ব্যয় করিয়াছিলেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া পুণ্য ও গৌরব অর্জন করিয়া গিয়াছেন। একরূপ শুনা যায়, একদা জনৈক ব্রাহ্মণ কৃষ্ণ ব্যাধিতে ভোগিয়া ভোগিয়া কীটদষ্ট পুতিগন্ধময় কঙ্কালবশেষ দেহে মৃত্যুর ঐক্স অপেক্ষা করিতেছিলেন। একদিন রাজিতে হতভাগ্য ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখিলেন, “দয়াময়ী চৌধুরাণী ব্রাহ্মজ্ঞ, মহাভারত-প্রতিষ্ঠা ও সর্জজয়া ব্রত উদ্দাপন করিয়া যে অক্ষয় পুণ্যফল অর্জন করিয়াছেন, তাহার যে কোন একটীর পুণ্যফল যদি তিনি, লোভ-শূন্য মনে, তোমাকে দান করিতে পারেন, তবেই তোমার ব্যাধি নিরাময় হইবে, অন্তথা নহে।” ব্রাহ্মণ স্বপ্নে ভগবানের এই নিদাশন

প্রত্যাশেন জানিয়া নিরাশ হইলেন। মর্নে করিলেন,—“সংসারে লোকে কপর্দক ব্যস্ত করিয়া পুণ্যার্জন-লোভ ভাগ্য করিতে পারে না, আর চৌধুরাণী, করুণাময়ীই হউন না কেন, একরূপ কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া, তৎপুণ্যফল নির্লোভ হইয়া আমায় মত হতভাগ্যকে দান করিবেন? অসম্ভব। মা, জগত্তারিণী, এ হতভাগ্য সন্তানের একঠোর স্মরণ কেন মা? আমার প্রতি তবে আর তোমার দয়া হইলনা, মা? কোন্ পাপে আমি মানব-সমাজ হইতে বিতাড়িত হইলাম, মা? আর কি সে সমাজে আমার স্থান লাভ হইবে না? মা, পাপের শাস্তি কি আমার এখনও শেষ হয় নাই? করুণাময়ী, পতিত-পাবনী এ দীনে করুণা কর মা? আর তো লোকের ঘৃণা উপেক্ষা সহ্য করিতে পারিনা মা।—এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে আশার তাড়নায় ব্রাহ্মণ সন্তোষ দয়াময়ী সকাশে আসিয়া “দীন দয়াময়ী মা, তোর হতভাগ্য পাপী সন্তানের অবস্থা অবলোকন কর মা?” ইত্যাদি বলিয়া করুণ রোদনে বক্ষ ভাসাইতে লাগিল। তখন দয়াময়ীর কোমল-হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি নিজে আসিয়া রোগীর সমস্ত কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, “বাবা, যদি আমার অদৃষ্টে প্রকৃতই ফল লাভ হইয়া থাকে, এবং আমার ফলদান করিবার অধিকার থাকে, তবে অকপট চিত্তে তোমাকে আমি মহাভারতের ফলদান করিলাম। কিন্তু আমি কিরূপে জানিব, তোমার ব্যাধির উপশম হইয়াছে?” ব্রাহ্মণ তখন বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণের সৌভাগ্য—এক রমণী-শিক্ষারিণীর কৃপার উপর ভগবান তাঁহাকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। রমণী চিরদিন পুণ্যবতী—

প্রমণীর পুণ্যে তাঁহার স্বামীর সংসার পুণ্যময়।
এহেন রমণীর দ্বৈত পুণ্যফলে ব্রাহ্মণ এক
বৎসর পরে নিরাময় দেহে চৌধুরানী
মহোদয়াকে তাঁহার পুণ্যফলের কার্য্য-
কারিতা প্রদর্শন করিতে আসিলেন। সেই
পুণ্যগুণময় কুংসিং-দর্শন ব্রাহ্মণকে এক রূপ-
বান ব্যক্তি রূপে দেখিয়া, সন্তোষের আপামর
সাধারণ বিশ্বয়ে অভিভূত হইল, এবং সঙ্গে
সঙ্গে কি এক মহীয়সী দেবীর কার্য্যে তাহারা
দেহ পাত করিতেছে ভাবিয়া গৌরবান্বিত
মনে করিতে লাগিল। ধন্ত দয়াময়ী এবং ধন্ত
সেই সময়—যে সময় দয়াময়ীর জ্ঞান মহিলা-
রত্ন এ পাপ সমাজকে পুণ্যময় করিয়াছিলেন।
হায়, কোথায় সে সময়! দয়াময়ী উৎকল-
হৃদয়ে ব্রাহ্মণকে সান্ত্বিত প্রণাম করিয়া পদ-
ধূলি গ্রহণ করিলেন। “মা, তুই আমার
গর্ভধারিণী, আমি তোমার দীনতম সন্তান”
বলিয়া ব্রাহ্মণ কৃতজ্ঞ হৃদয়ের নয়নজলে বক্ষ
ভাসাইতে লাগিল। দয়াময়ী সেই দরিদ্র
ব্রাহ্মণকে তাঁহার আদার জমিদারী হইতে
উপযুক্ত পরিমাণ ব্রহ্মোত্তর প্রদান করিয়া
দীনতার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

দয়াময়ী ৮ কাশীধামে যাইবার পূর্বে
একবার ব্রহ্মযজ্ঞ সঞ্চয় করিয়া একদিনে বহু
সহস্র ব্রাহ্মণ-ভোজ্য করান ও প্রচুর দক্ষিণা
প্রদান করেন ও সর্ব্বজ্ঞা ব্রত সম্পাদন
কবেন। এই সর্ব্বজ্ঞা ব্রত সম্পূর্ণ এক
বৎসরে উদ্‌যাপন করিতে হয়। এ ব্রতের
জ্ঞান কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত হিন্দু শাস্ত্রে দ্বিতীয় আর
লেনে নাই। জীবন-যাত্রার সর্ব্বপ্রধান অত্যা-
বশ্যকীয় পদার্থনিচয় দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গ
করাই। এই ব্রতের প্রধান বিধি। দয়াময়ী
এই বিধানানুসারে একমাস জল, একমাস
অন্ন, একমাস বস্ত্র, একমাস শয্যা ইত্যাদি

রূপে অবশ্য-ভোগ্য বস্তুসমূহ পরিত্যাগ করিয়া
পূর্ণ বৎসর ব্রত উদ্‌যাপন করেন। এই সময়
যে ঘটনা হইয়াছিল, কেহ কখনো সেরূপ
দেখে নাই বা শুনে নাই। ব্রত উদ্‌যাপিত
হইলে, প্রচুর জিনিস উত্তর হয়। মুচ্ছদ্দি
৮ ব্রহ্মরাম দয়াময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
“উত্তর জিনিস কি করা হইবে?” দয়াময়ী
উত্তর দিলেন—“ব্যয়ের অল্প জিনিস সংগ্রহ
করিয়াছি, গৃহে আর গ্রহণ করিব না, দরিদ্র-
দিগকে বিলাইয়া দাও।” অনেক চেষ্টার
সেই জিনিস উপযুক্ত পায়ে বিতরিত হইয়া-
ছিল। দয়াময়ী ষত দিন ৮ কাশীধামে বাস
করিতেছিলেন, তত দিন ২৩ শত দরিদ্র
তাঁহার দ্বারে প্রতিদিন অন্ন পাইত। কাশীতে
তৎকালে এরূপ লোক খুব অল্পই ছিল, বাহারা
কোন না কোন রূপে দয়াময়ীর দয়ার অংশ
ভোগে বঞ্চিত ছিল। কাশীতে সকলেই
দয়াময়ীকে “অন্নপূর্ণা” বলিয়া ডাকত।
তাঁহার মৃত্যুতে কাশীক্ষেত্রে হাহাকার পড়িয়া
গিয়াছিল—যেন তাঁহাদের সকলেরই মাতৃ-
বিয়োগ ঘটিয়াছে। দয়াময়ী প্রকৃত পক্ষেও
দরিদ্রের জননীই ছিলেন। আমরা শুন-
িয়াছি, গৃহে কিবা ৮ কাশীধামে সর্ব্বজ্ঞা, দয়া-
ময়ী নিমজ্জিত অনিমজ্জিত, অত্যাধ, অত্যাগত,
দাস দাসীদগের আহার হহলে নিজে হবি-
য়াম গ্রহণ কারতেন। কোন দিনও এ নিম-
য়ের ব্যতিক্রম হইত না।

যেখানে শোক হুংখ, সেই স্থানেই দয়াময়ী
করুণাময়ী জননীরূপে বর্তমান থাকিয়া শোক-
গ্রস্তকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেন, অন্নহী-
নকে অন্নদান করিতেন, রোগীর দেহে
হস্ত বিলপন করিয়া রোগ-জ্বালা প্রশমন
করিতেন। এ হেন দয়াময়ীকে যে লোকে
“অন্নপূর্ণা” বলিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

দয়াময়ীর জীবদ্দশায় একবার এতৎ প্রদেশে ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। দরিদ্রের জীবন রক্ষার আর কোনও উপায় ছিল না। আশ্বের ক্রন্দনে দয়াময়ীর কোমল হৃদয় ব্যথিত এবং বিচলিত হইল। সম্মুখে কি তাঁহার প্রজাগণ হা অন্ন, হা অন্ন করিয়া জীবন দিবে? তিনি ঘোষণা করিলেন— “এ দুর্ভিক্ষের কাহাকেও কর দিতে হইবে না।” এ কি সামান্য দান? ধন্ত দয়াময়ী! ধন্ত তাঁহার মানব-দুঃখকাতর কোমল হৃদয়! দয়াময়ীকে এখন লোকে ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার কাশী প্রান্তির অনেক দিন পর পর্যাস্তও ঐকান্তিকতার সময় গোড়া হিন্দু স্ত্রী পুরুষগণ “দুর্গাকালী” নামের সঙ্গে সঙ্গে দয়াময়ীর পবিত্র নাম আকর্ষণ পূরিয়া লইয়া ধন্ত হইত। গৃহে কি প্রবাসে, রাত্রির পূর্বে সকলেই “অন্নপূর্ণা,” “রাণী ভবানী” ও “দয়াময়ী”র নাম লইয়া উল্লসিত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিত—না করিলে সেদিন আর আহার হইবে না, ইহাই সর্ব সাধারণের বিশ্বাস ছিল। দয়াময়ীর সময় কাগমারী ১/০ আনী হিন্দুর জমিদারীর রাজস্ব ১৩৪০৬ টাকা নির্ধারিত ছিল। আর এখন? গবর্ণমেন্ট তবুও বলেন, “জমিদারগণ অত্যাচারী;” কিন্তু বলিবার সময় ধাম মহলের কথা সম্যক ভুলিয়া যান।

১/০ আনীর বর্তমান জমিদার মহোদয়-গণের পিতা ৮ দারকানাত রায় চৌধুরী মহোদয় জীবনের নানাক্রমে বিব্রত ছিলেন। বলিতে কি, তিনি স্বাধীন শান্তিতে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে পারেন নাই। যখনই কোন বিপদ হইতে মুক্ত হইতেন, তখনই বালকের মত অকপট এবং ভক্তি গদগদচিন্তে বলিতেন, “আমার জীবন ও সংসার রক্ষা কেবল আমার পুণ্ড্রাবতী পিতামহী ৮ দয়াময়ী ঠাকুরাণীর পূণ্যফলে সাধিত হইতেছে।”

দয়াময়ী অনেক দিন হয় এ নম্বর সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয় কার্যাবলী ও নাম লোকে এখন প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে। ইহা বলা বোধ হয় অসম্ভব হইবে না, যে সমাজে দয়াময়ী বাস করিতেন, সে সমাজ যদি গুণগ্রাহী হইত, তাহা হইলে রাণী ভবানী, অহল্যাবাই ও রাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি মহিলারাণীদিগের সমশ্রেণীতে তাঁহার স্থান হইত। জননী সর্বদা এবং সর্বত্রই সন্তানের জননী; কিন্তু যিনি গর্ভে ধারণ না করিয়াও সকলের মাতা, ঐহার করুণাক্রপ স্তম্ভ পিতৃমাতৃহীনের জন্য সর্বদাই ক্ষরিত হয়, তিনিই প্রকৃত জননী। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই মা জগজ্জননী লোক-সমক্ষে চাক্ষুস হন এবং লোকও ধন্ত হয়।

শ্রীবিজয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ।

— — — — —

বিশ্ব-চিন্তা ।

(একটি শোকবিহ্বল লোক নির্ঝরিত-
মুঠে উপবিষ্ট এবং চিন্তাপরায়ণ। মানব-
হৃদয় কিরূপে একচিন্তা হইতে অপর চিন্তায়,
বিশ্বাস হইতে অবিশ্বাসে, অবিশ্বাস হইতে
বিশ্বাসে এবং বিশ্বাস হইতে ক্রমে গিয়া উপনীত
হয়, এই কবিতায় তাহাই দেখাইতে চেষ্টা
করিয়াছি।)

সংহারো সংহারো বিশ্ব হে দেব মহান!
স্বার্থের সংঘাতে পূর্ণ
এ সংসার হোক চূর্ণ,
বাজাও বাজাও তব প্রলয়-বিধাণ।

অগতের কোলাহল, বধির করিল ঘের,
ধামাও ধামাও ওগো, দাও ধামাইয়া!
সদীমে অসীম গীত কাজ নাই আর গেয়ে,
এ ভীষণ মরুভূমে কি ফল গাহিয়া?
এস এস শিব ঐশ্বর এস সত্য সনাতন
এস স্রীতি, মহাপ্রতি এস ভূমা, শাস্ত!
রচিয়া নূতন বিশ্ব মহান পবিত্র এস
সেই স্বপ্ন-শাস্ত-মাবে, এস হে অনন্ত!
কেহ চাহে অর্থ-ধন,
কেহ চাহে সে যৌবন—

কত আসে ফেরে সবে,
সরতান নাচে ভবে—
মহাপাপ হৃদে লয়ে
নরশ্রোত বায়ব'য়ে
কি কাজ থাকিয়া এই, পাপে ভরা বিধ !
হান হান বজ্র হান
ভেঙে কর থান থান,
সাগরে ডোবাও সব, হে দেব অশ্রুত !
জানি আমি এই বিশ্ব, নাট্যালা-প্রায় !
নব-নারী অভিনেতা,
গাহে গান, কহে কথা,
ভূমিকা হইলে শেষ, অনন্তে মিলায় !
কেহ ল'য়ে প্রণয়নী কাটার শরীরী দিবা
কম-হাসে, প্রেম-ভাবে, আর আলিঙ্গনে !
কেহবা নিরাশে কাঁদে, কেহবা স্নেহেতে দেখে,
পর ছব বুঝেনা সে, লয়ে নিজ জনে !
কোথা আজ বিশ্ব-প্রেম, পরার্থে আপন দান,
সর্বজীবে ভালবাসা, আপনা বিলানো !
এবে ঘোর নিষ্ঠুরতা, দয়া নাই, কামুকতা,
বিশাল-বহুধা-বুকে কালিমা-মাখানো !

এই যদি বিশ্ব-স্বীতি,
কোথা তবে পুণ্য নীতি,
কেন তবে দেব-প্রাণ
সব ভুলে আত্ম-দান,
মিছে যত শাস্ত্র-গাথা
ভগবান ? মিছে কথা—
এ ভুবন অরাজক, কোথা ভগবান ?
দাঁজ কর পুণ্য তান,
খেমে যাক বেদ গান,
ভগবান নাই বিধে. নাই তাঁর দান !
আছে ভগবান ? কোথা,--নাই—নাই—নাই !
দয়া-হীন ভগবান,
ক্রুর-সর্ব শরতান

কেবা ভাল, কেবা মন্দ বল-মোরে ভাই !
ওই যে বিধবা কাঁদে, শিরে করাঘাত করি
(আলু থালু খেত বস্ত্র) "স্বামী কোথা গেল ?"
ওই যে জননী কাঁদে, মৃত পুত্রে চাপি বক্ষে
"রে-মোর সোণার বাছা, নয়নের আলো !"
হের ওই পতি কাঁদে, মৃত-প্রিয়া-গণ্ড চুমি
"মোর ছদি বিধি, নিধি, কেন কেড়ে নিলে ?"
হের ওই পুত্র কাঁদে, মাতার চিতার পাশে
"মা আমার ! গেলি কোথা, ফেলি তোর ছেলে ?"

আছে যদি ভগবান—
কোথা তাঁর দয়া, দান ?
গৃহে গৃহে হাহাকার
কেন তবে অনিবার ?
এ ঘোর শোকের রব
পূর্ণ করে বিশ্ব-ভব
সৃষ্টি আজো আছে কিন্তু দয়া নাই তার !

কেবল পিশাচ সব—
করিতেছে হাহারব
তারি মাঝে কি ক্রন্দন উঠে উভরায় !

৪

ধাম,—
কি বলিছ মোহে ভুলে, নাই ভগবান ?
একি মোর পাপ কথা
ধামাও নিরয়-গাথা,

নাই যদি নিয়ামক, বিশ্ব, কার দান ?
বুদ্ধদেব শ্রীচৈতন্য শরর নানক আর
জীষ্ট, রামকৃষ্ণ তবে, কার আত্ম মুক্ত ?
এই বিশ্ব-ধর্ম ভূমি নেহে মাত্র পাপে ভরা
ধর্ম-পুত উৎস জলে, এ ভুবন-সিক্ত !
আছে বটে মহা পাপ, তার পাশে আছে ধর্ম
অন্ধতম আছে তাই, আলোক-আভাস !
কালের মহান চক্র ঘুরিছে ফিরিছে সদা
অবর্ণন-কলে স্নেহ, হৃৎথের বিকাশ !

আছে বুটে মহা'হুথ
তার পাশে আছে সুখ,
পাবাণে তটিনীশ্বায়
সুখ পাশে পাখী গায়,
পর্কতে কুসুম ফুটে
বন-ফুলে অলি জুটে
ভ্রমর সে, খেত পদ্মে, বিজলী অম্বরে !
ওই বসি মহাবীর
ফেলেনা শোকেতে নীর ?—
ভাঙা-মেঘে রবি-দীপ্তি, কোমল, কঠোরে !
• • •
বেদাভাস ঘটাকাশ,—তাহাতে মরণ !
পরমাত্মা-অংশ জীব
নিজে ধ্রুব সত্য শিব
অমঙ্গলে,—হে মঙ্গল ! লভো'গো জীবন !
ছোট শিশু পেয়ে খেলা, চাহেনা মাতার পানে,
পেয়ে বিশ্ব ক্রীড়নক, ভুলে' অর্চি শিব !

মুৎসারের নাগপাশ, বাঁধিল, মারিল যেরে
হা হা এ'নরক-মাঝে, কোথায় জিদিব ?
এস এ'হৃদয় মাঝে হে বন্ধ চৈতন্য জ্ঞান !
কোথা সে চিক্রপ-পুত ভূমি'র বিভাস !
পরাতত্ত্ব সত্যবেদ, গায়ত্রী-স্বরূপা শক্তি,
মহান ওঙ্কার কোথা,—হে দীপ্ত প্রকাশ !

আজ হেথা কত জল
কাল সেথা পা'বে তল,
চক্রে তারা নীলাধরা
শ্রামা-ধরা শোভা-ভরা,
সৃষ্টি পূর্বে কোথা হায়
প্রলয়ে মুছিয়া যায়,—
নিখিল জগত মিথ্যা,—ছায়াবাজী-প্রায় !
উজ্জলিয়া চিদাকাশ,
এস দীপ্ত বেদাভাস !
অমাসি-নাশী-বিভা কোথায়, কোথায় !
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ।

জন্মান্তর, কর্ম এবং আত্মোন্নতি । (শেষ)

“অজরা মরবং প্রাজ্ঞো বিজ্ঞানার্থং চিন্তয়েৎ ।
গৃহীত ইব কেশেণু মৃত্যুনা ধর্ম্য মাচরেৎ ॥”
প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ আপনাকে অজর এবং
অমর মনে করিয়া বিজ্ঞা এবং অর্থ চিন্তা
করিবেন । ধর্ম্য চিন্তার সময় মনে করিবেন
‘যে, মৃত্যু আমার কেশ আকর্ষণ করিতেছে,
গীর্ষাই আমাকে বিনাশের পথিক হইতে
হইবে। এই উপদেশ বাল্য, যৌবন কি
বর্দ্ধিকা কাল বিভাগানুসারী নয়। ইহা
প্রাত্যহিক কর্তব্যপদেশ ।

“নধর্ম্যকালঃ পুরুষস্ত নিশ্চিতো
নচাপি মৃত্যুঃ পুরুষং প্রতীকতে ।
সদাহি ধর্ম্যস্তক্রিয়ৈব শোভনা
যদা নরো মৃত্যুমুখে ভবিষ্যতি ॥

মাহুষের ধর্ম্যাচরণের কাল নিরূপিত
নাই। মৃত্যু কাহারও প্রতীক্ষা করে না।
ইহার সময় হয় নাই, এখন থাকুক, মৃত্যু এমন-
কোন বিবেচনা করে না। অতএব সর্বদাই
ধর্ম্যক্রিয়া শোভনা। মানব মাত্রকেই মৃত্যু-
গ্রস্ত হইতে হইবে। অতএব ইন্দ্রিয়গণ যে
পর্যন্ত সবল আছে, সেই পর্যন্তই সোনা।
বুদ্ধির বিকাশ হইতেই ঈশ্বর চিন্তা আরম্ভ
করিতে হইবে। প্রহ্লাদ তাঁহার ভ্রাতৃ-
গণকে উপদেশ দিয়াছিলেন ।

কোমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্যান্ ভাগবতানিহ,
হৃদভং মাহুষং জন্ম তদপ্যত্রবমর্থদং ।

শ্রীমদ্ভাগবত ।

প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ কোমার বরদেই ভাগবত

ধর্মাচরণ করিবেন। অর্থাৎ ঈশ্বরচিন্তা করিবেন। মানুষ জন্ম অক্ষয়, পুনরায় এই নর-জন্ম লাভ ঘটবে কিনা, তাহার নিশ্চয়তা নাই।

এই উৎকৃষ্ট নরজন্ম লাভ কবিয়া যদি মানুষ যের মত কাজ না করিলাম, তবে পুনরায় এই জন্ম হইবে, তাহার সম্ভাবনা কি? অল্প জীব-জন্ম হইতে মানব জন্মটা অর্থহ। যদি সাধনা করিতে পারি, তাব দেবতা হইতেও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হইতে পারে। পরম পুরুষার্থরূপ যে মুক্তি, তাহা মানুষ জন্মেরই লভ্য। সনকাদি ঋষি চতুষ্টয়, নারদ এবং বৃহস্পতি প্রভৃতি সাধনগুণেই দেবপুত্র। অতএব বালা বয়স বিবেচনায় সময় নষ্ট করিও না। বালাদি অবস্থা ভেদ দেহের, দেহীর নয়। সাধুসঙ্গ ও ঈশ্বরের শরণাগতি দ্বারা পরম শ্রেয়ো লাভ হয়। এক জন্মে কেহ ঈশ্বরে অহেতুকী অব্যবহিতা ভক্তি লাভ করিতে পারে না, ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে হয়। এ জন্মে অভ্যাস হইলে ঐ অভ্যাসই ভবিষ্য জন্মে তাহাকে উন্নতির দিকে টানিয়া লইবে।

অভ্যাস পরম হিতকারী—“পূর্বাভ্যাসেন তেনৈরহ্মিহিতে হ্যবশোহপি সঃ ॥ পূর্বাভ্যাস বশতঃ জীব অবশ হইয়া কার্য্য করে। সুতরাং বর্ত্তমান জন্মের অভ্যাসই ভাবী জন্মের শুভ-ফল-প্রসূ। ভগবান্ শ্রীমান অর্জুনকে কহিতোছেন—

“মযোব'মন আধংস ময়িবুদ্ধিং নিবেশয়,
নিবসিয্যসি মযোব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা ।

হে অর্জুন! তুমি আমাতে মন স্থির কর। আমাতেই বুদ্ধি নিবেশ কর। তাহা হইলে ইহার পরে আমাতেই থাকিবে, ইহাতে সংশয় নাই।

“অথ চিত্তং সমাধাতুঃ ন শক্নোহসি ময়িস্থিরং ।
অভ্যাস যোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তং জনঞ্জয় ॥

যদি আমাতে চিত্তস্থির রাখিতে না পার, তবে আমাকে পাইবার জন্য গুরুপদিষ্ট উপায়ে সাধনা অভ্যাস কর।

“অভ্যাসেহ্যাসমর্থোহসি মৎকর্ম পরমোভব,
মদর্থমপি কন্ম্যপি কুর্স্বন্ সিদ্ধি মবাপশ্যসি ।”

শ্রীমদ্ভগবদগীতা ।

যদি অভ্যাস করিতেও না পার, তবে যাহা কর, তাহা নিজের নিমিত্ত করিতেছ, এমন অহং জ্ঞান ত্যাগ করিয়া আমারই জন্য করিতেছ, এইরূপ ভাবে কর্ম করিলেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

‘অমৈতদপ্যশক্নোহসি কৰ্ত্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ ।
সৰ্ব্ব কৰ্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাস্ববান্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা ।

যদি তাহাতেও অক্ষম হও, তবে একমাত্র আমার শরণাগত হও তৎসংঘতচিত্ত হইয়া সমস্ত কর্মের ফল কামনা ত্যাগ কর। অর্থাৎ নিষ্কামভাবে কৰ্ত্তব্যজ্ঞানে কর্ম কর। ভগবান মানবের কল্যাণ সাধনার্থ এত উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু হায়! কয়জন লোকে সেই হিতগর্ভ উপদেশ গ্রহণে আগ্রহান্বিত? কামিনীকাঞ্চনের মোহিনী মায়ায় ‘মানব আত্ম-হিত দর্শনে অন্ধ। ভোগ-লালসাক্রপ হতাশন অন্তরে নিরন্তর প্রজ্জ্বলিত, তাহাতে কামিনীকাঞ্চন স্নাতাহতিপ্রায়। যতই দাও, ততই দীপ্তশিখা বিস্তার পূর্বক জ্বলিতে থাকিবে, কদাপি নির্বাপিত হইবে না। পরকালের চিন্তা-ক্ষণ তরেও মনে স্থান পায় না। তাই বিষয়-সর্বস্ব মানব ভোগকর বিষয়েই নিরন্তর মগ্ন থাকে। রজস্তম গুণ রূপ ধূমে জ্ঞান দৃষ্টি নিরুদ্ধ। সর্বের আবির্ভাব ব্যতীত দৃষ্টি

প্রতিবেদক ধর্মের তিরোধানের সম্ভাবনা কোথায় ?

পাশ্চাত্য জগতে অর্থ চিন্তা ভিন্ন পরমার্থ চিন্তা নাই বলিলেও অতুক্তি হয় না। পর-কালের জন্ত তাহাদের কোন ব্যাকুলতা নাই। ইহকালের সুখ চেষ্টাতেই তাহাদের চিন্তা ও শক্তির বিনিয়োগ। আবশ্যক বোধ করিলে তাহারা আত্ম বিনাশ করিতে অকুণ্ঠিত। হিন্দু শাস্ত্রমতে সহস্র পাপীর মুক্তি আছে, কিন্তু আত্মঘাতীর মুক্তি নাই। গলং-কুষ্ঠগ্রস্ত হিন্দুও আত্মহত্যা করে না। হিন্দুর বিশ্বাস এ জন্মে তো অশেষ ক্লেশ পাইতে হইতেছে, আত্ম-বিনাশ করিলে পরকালে এতদপেক্ষাও ক্লেশ পাইতে হইবে। পর-কালে অবিশ্বাসীদিগের এ আশঙ্কা নাই। বিলাতে একজন ধনী ক্রমে ৭৮টা স্ত্রী হত্যা করে। ধনী লোকের রূপ ঘোবনও আছে, স্ত্রীর মৃত্যুর কারণও অপকাশ; বিবাহ করিতে তাহার কোন বাধাই জন্মে নাই। শেষে তাহার প্রতি সাধারণের সন্দেহ জন্মে। তাহার এই বিষয় ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইলে সে তখন পূর্বকৃত সমস্ত পাপ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। বিচারক জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কিরূপে এইরূপ নরহত্যা করিতে যে, দেহে একটু চিল্ল মাত্রও থাকিত না ? সে তখন একটা শিন লইয়া দেহের স্থান বিশেষে বিদ্ধ করত বিচারালয়েই মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিল। ইংরেজী নভেল পড়িলে গুপ্ত হত্যা ও আত্ম-হত্যার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ভারতে ওরূপ হত্যা কাণ্ডের শতাংশের একাংশও দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নী। ইহার প্রকৃত কারণই পরকালে অবিশ্বাস। পর-কালে বিশ্বাস না থাকিলে কেবল রাজ-শাসন ব্যতীত আর কোন প্রতিবন্ধকই থাকে না।

তাই পাশ্চাত্য অপারমার্খিক জাতি সকল আদিম আমেরিক ও আফ্রিকার কাফ্রিকগকে পশুর ছায় বিনাশ করিয়া সমগ্র আমেরিকা এবং আফ্রিকারও অধিকাংশ আত্মদাস করিয়াছে। স্বার্থের বলবতী উদ্ভেজনাৎ স্বপভা ধর্ম্ম-প্রাণ ভারতবাসীর প্রতিও যেরূপ নৃশংসাতরণ চলিতেছে, পরকাল-বিশ্বাসী কোন জাতি কি ব্যক্তি ঐরূপ আচরণ করিতে পারে না।

মুসলমান শাস্ত্রে আছে, মৃত ব্যক্তির আত্মা প্রলয় পর্য্যন্ত গোর স্থানেই থাকে। প্রলয় সময়ে খোদায়তালা বিচার করিয়া যে যেরূপ দণ্ড পুরস্কারের যোগ্য, তাহার প্রতি সেইরূপ দণ্ড পুরস্কারের বিধান করেন। খ্রীষ্টানদেরও এই মত। সুতরাং মুসলমান কি খ্রীষ্টানদের মতে পাপ পুণ্যের ফল ভোগ অভ্যস্ত দূর ভবিষ্যৎ গর্ভে, একরূপ স্থলে যে পাপভীতি অপেক্ষাকৃত কম হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি ?

সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়াছি, আমেরিকার স্বত্বীগণের আত্মহত্যার এক গুপ্ত সমিতি ছিল। হয়ত এখনও উহার অস্তিত্ব থাকিতে পারে। রাজদণ্ড ভয়ে গোপনে উহার কার্য নিষিদ্ধ হইয়াছে, ঐশ্বরিক দণ্ডের তো কোন ভয়ই নাই। সুতরাং গোপনে গোপনে বহু আত্মহত্যা ঘটয়াছে। ভারতে এইরূপ পৈশাচিক সমিতি কল্পনাভীত ব্যাপার। আজ কাল ইউরোপে ও আমেরিকায় স্পিরিট (মৃত ব্যক্তির আত্মা) লইয়া খুব আন্দোলন চলিতেছে। আমেরিক পণ্ডিতগণ নাকি আত্মার কটো পর্য্যন্ত তুলিতেছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মণ্ডলী বোদান্তদর্শন ও শ্রীমদ্ভবদ্গীতার যথেষ্ট অগ্রগণ্য করিতেছেন। কালে হিন্দু জাতির চিরপরিচিত মহান সত্য সকল যে অতি ভক্তিভাবে পাশ্চাত্য জগতে পরিগৃহীত ও আচরিত হইবে, তাহার সংশয় নাই।

আজ কাল পদমন্দির ভারতবাসীর গৌরববাহ্য অস্তমিত। তথাপি ভারতের উপনিষদ, ভারতের ষড়দর্শন, ভারতের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি সমুজ্জ্বল রত্ন সকল সমগ্র সভ্য জগতের জ্ঞানভাণ্ডাররূপে পুঞ্জিত হইতেছে। ধর্ম-গৌরবে এখনও ভারত সমগ্র পৃথিবীর গুরু গুরু স্থানীয়, তাহাতে কাহারও আপত্তি করিবার যো নাই। ভারতের আধ্যাত্মিক চরমোৎকর্ষের সহস্র প্রমাণ এখনও দেদীপ্যমান। ভারতের যোগশাস্ত্র এখনও বিশ্ব-য়োৎপাদন করিয়া জ্ঞানপিপাসু পাশ্চাত্য জাতি মধ্যে নব নব সত্য প্রচার করিতেছে। আমাদেরই শিখা মেডামবল্যাভিটকী ও কর্ণেল অলকট সাহেব বৎকিঞ্চিৎ যোগাভ্যাস করিয়া পিওসফী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া আবার আমাদেরই গুরুর আসনে বসিতে পারিয়াছিলেন।

ক্রমে বিবয়ান্তরে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, এখন প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণে প্রবৃত্ত হই। যুত্থা সময়ে কৰ্ম্মানুসারিণী চিন্তাই যে মনুষ্যকে বিভিন্ন যোনিতে লইয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত জড়ভরতের প্রস্তাবটী বলিব।

মহারাজ ধর্ম্মাশ্রা ভরত রাজ্যস্থ পুরিত্যাগ পূর্বক বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বনে ক্রুদ্ধ সাধন করিতেছেন। একদা ভরত গণ্ডকী নদীতীরে গায়ত্রী-ধ্যান-মগ্ন। এমন সময়ে সিংহনাদ-সমস্ত্রা জল-পানোত্ততা পূর্ণগর্ভা হরিণী লক্ষ প্রদানে জগগর্ভে নিপতিতা। ভয়ে ও উল্লুখস্থান হইতে পতনে হরিণীর গর্ভ-প্রাব হইল। হরিণী নদী সন্তরণ করিতে করিতে যুত্থানুশ্রে নিপতিতা। গর্ভ-নিঃসৃত যুগ শিশুকে জলে খাষি খাইতে দেখিয়া রাজা তাহাকে উদ্ধার পূর্বক দগ্ধেঃ পালন করিতে লাগিলেন।

যুগ-শিশুর প্রতি অত্যাশঙ্কিত বশতঃ তাহার জপ তপের অন্তরায় হইতে লাগিল। প্রবল মমতা যুত্থা সময়ে তাহাকে হরিণ-শিশুর চিন্তায় তন্ময় করিল। সুতরাং তিনি যুত্থার পর হরিণ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেন। কিন্তু পূর্ব স্মৃতি বশতঃ তিনি জাতিস্মর হইলেন। মাতৃ জঠরে থাকিতেই তাহার অশ্লোগতি বৃদ্ধিতে পারিলেন। ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি মাতৃসঙ্গ পরিত্যাগের পর আর হরিণ-সঙ্গ করিলেন না। অনন্তর পুণস্ত পুণহাগ্রমে তীর্থজলে অর্দ্ধ দেহ এবং স্থলে অর্দ্ধ দেহ রাখিয়া হরিণ-দেহ বিসর্জন পূর্বক আঙ্গিরস গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণের গুহ্রসে অতি কদাকার দেহে জন্মিলেন। তিনি বস্ত্রতঃ জড় ছিলেন না, কিন্তু জড় প্রকৃতির ভাব ব্যক্ত করিতেন। অশেষ জ্ঞানের আধার হইয়াও জড়বৎ বুদ্ধি-হীনতা প্রদর্শন করায় লোকে তাহাকে জড় বলিয়া ডাকিত। অবশেষে সিদ্ধ সৌবীর পতি রহুগণ রাজার বান বাহক রূপে নীত হওয়ায় তাহার অন্তর্নিগূহিত প্রচ্ছন্ন জ্ঞান-প্রভা প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজাও তাহার প্রদত্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সংসার-কুপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বল্লভ যে স্থাবর বৃক্ষরূপেও পরিণত হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত আছে, নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

যক্ষপতি কুবেরের নলকুবর ও মণিগ্রীব নামে পুত্রদ্বয় ঐশ্বর্য্য মদমত হইয়া অস্পরাগণ সঙ্গে উল্লঙ্গ দেহে গঙ্গা সলিলে জল-কেলী করিতেছিল। এমন সময়ে দেবর্ষি নারদকে দেখিয়া অঙ্গিরাগণ সমস্ত্রমে গাভোত্থান পূর্বক বস্ত্র পরিধান করিল, কিন্তু যক্ষ যুবকদ্বয় সেদিকে দৃষ্টিপাতও করিল না। তদর্শনে দেবর্ষি উহাদের মদমত্ততা বৃদ্ধিতে পারিয়া

উহাদের ভাবী কল্যাণের জন্য অভিষাপ প্রদান করিলেন। নারদ বলিলেন যে, ধন-মদাক্ষ মন্দবুদ্ধি যুবকদ্বয়! স্ত্রী, দাত ও মন্ত্ৰের অধিকরণক ধনেই তোমাদের এইরূপ বুদ্ধি-ভ্রংশ জন্মাইয়াছে। এজন্ত আমি তোমা-দিগকে অভিষম্পাত দিতেছি, জমল অর্জুন বৃক্ষরূপে তোমরা এই ব্রজ ভূমিতে থাক। অবশেষে উহাদের কাকূতি মিনতিতে প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, দিবা শত বর্ষান্তে শ্রীকৃষ্ণের চরণরজঃ স্পর্শে তোমাদের মুক্তি হইবে। শ্রীকৃষ্ণের শৈশব সময়ে উহারা মুক্তি লাভ করিয়া স্বস্থানে গমন করে। কর্ম্মানুসারে জীবের স্থাবর জঙ্গম, উভয় গতি হইতে পারে। উদাহৃত প্রস্তাবটি অভিষাপের ফল হইলেও, জঙ্গম জীব যে স্থাবর জীবেও পরিণত হয়, তাহার প্রমাণ বটে।

কর্ম্মই যেমন জন্ম মৃত্যু নিদান, তেমনই কর্ম্মেরও বীজ। কর্ম্মজনিত ফল ভোগের জন্তই পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু।

“ভবায় নাশায় চ কর্ম্ম কর্ত্তুং

শোকায় মোহায় সদা ভয়ায়।

স্বধায় দুঃখায় চ দেহ যোগ

মব্যক্ত লিঙ্গং জনতাঙ্গ ধত্তে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

জন্ম, মৃত্যু, কর্ম্মকরা, শোক, মোহ, ভয়, সুখ, দুঃখ প্রকৃতি ভোগের জন্তই জীবকে দেহ ধারণ করিতে হয়। বর্ত্তমান জীবনেই ভাবী জীবনের বীজ সংগৃহীত হয়। এক্ষণে দেখা কর্ত্তব্য, এইরূপ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর কারণ ধ্বংস হইতে পারে কিনা? “কর্ম্মণো-জ্ঞানং জ্ঞানা মুক্তিঃ।” যে পর্য্যন্ত রজস্তমো-গুণ থাকে, সে পর্য্যন্ত আসক্তি নাশ অসম্ভব। আসক্তি থাকিলেই যশোলিপ্সা, কামিনী-কাঞ্চন ইত্যাদি কামনার বিষয় থাকিবেই।

“তমীদৃজ্ঞানজং বিদ্ধি” তমঃ অজ্ঞানজ, অতএব দম্ভ, অহঙ্কার, মাৎসর্ঘ্য প্রভৃতি আত্মার বন্ধন সকল ইহাতে নিত্য বর্ত্তমান। কর্ম্ম করিতে করিতে সাধু সঙ্গ, শাস্ত্রাচাৰ্য্যোপদেশ প্রভৃতির গুণে ক্রমে ক্রমে সম্বগুণ সঞ্চিত হয়।

“তএ সত্ত্বং নির্মলত্বাং প্রকাশক মন্যময়ং।

সুখ সন্তেন বদ্যতি জ্ঞান সন্তেন চাপম ॥”

সবগুণ মালিন্য বর্জিত, সুতরাং প্রকা-শক এবং অনাময়, ইহা হইতে বিশুদ্ধ সুখ এবং জ্ঞান জন্মে। মেঘব্যাশি বিদূরিত হইলে যেমন সূর্য্যারশ্মি প্রকাশিত হয়, অন্ধকার দূরে পলায়ন করে, তেমনি, সবগুণ রূপ সূর্য্যের তেজে অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হয়। তখন দুঃখ থাকে না, কেবলি আনন্দ। সুতরাং জীবের জন্ম মরণজনিত কষ্ট আর ভুগিতে হয় না। সবগুণে কামনা বিনষ্ট হয়, সুতরাং মানব তখনি নিকাম কর্ম্ম করিতে অধিকারী হয়।

“কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি

যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্যন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বান্ন শুক্রে।

যুক্তঃ কর্ম্মফলঃ ত্যক্তা শান্তিমাশ্নোতি নৈষ্টিকীং

অযুক্তঃ কামক্যেণ ফলেসক্তো নিবধ্যতে ॥

শরীর, মন ও বুদ্ধি দ্বারা এবং কর্ম্মাভি-নিবেশ-রহিত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যোগিগণ আত্ম-শুদ্ধির জন্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বথা কর্ম্মফলাসক্তি পরিহার করিয়া কর্ম্ম করেন। ব্রহ্মযোগ-যুক্ত ব্যক্তি কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিলেও ব্রহ্মনিষ্ঠা হইতে উৎপন্ন শান্তি লাভ করেন। অযুক্ত ব্যক্তি কামনা-প্রযুক্তি জন্ত ফলাসক্ত হইয়া নিয়ত বন্ধন প্রাপ্ত হয়। জিতেজ্যৈয় ব্যক্তি বিবেক-যুক্ত মন দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নবদ্বার বিশিষ্ট পুরবৎ দেহে স্বয়ং কর্ম্ম না করিয়া এবং না করাইয়া সুখে কাল

করেন। ঈশ্বর জীবের কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন নাই, কর্মফলও সৃষ্টি করেন নাই, এবং কর্মফল সংযোগও সৃষ্টি করেন নাই। জীবের স্বভাবই কর্তৃত্বাদি রূপে প্রবর্তিত হইয়া থাকে। স্বভাবের ঐরূপ স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে মানব জীবন পশু জীবন হইতে কোন অংশেই শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারিত না। “অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তৃত্বমিতি, মন্ত্ৰতে” অহংকার-বিমূঢ় ব্যক্তি আপনাকে কর্তা মনে করিয়াই বদ্ধ হয়। মানবের কর্তৃত্বাভিমান না থাকিলে তাহার পাপ পুণ্যও থাকে না। যশস্কর কি অশশস্কর কোন কার্য করিলে তাহার জন্ত তাঁহার প্রশংসা কি নিন্দার কোন অপেক্ষাই থাকে না। ঈদৃশ মানব সদৃচ্ছা লাভ, সম্বৃষ্টি-শীত-গ্রীষ্মাদি বন্দ্যাতীত হন। তাঁহার নিকটে সিদ্ধি অসিদ্ধি, সব সমান হইয়া যায়।

অহংজ্ঞানই অজ্ঞানতা বা মায়া। অহং জ্ঞান রূপ অজ্ঞানতা-মেঘ অন্তরিত হইলে নির্মূল জ্ঞান ভাস্কর প্রকাশিত হন। তখন সর্বভূতই তাঁহার নিকট সমান, আত্মা হইতে অভিন্ন। বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর, বিড়াল, চণ্ডাল প্রভৃতি সবই এক। এরূপ সর্বত্র সমদর্শী মানবের শোক মোহাদি থাকে না; কেবল আনন্দ, কেবল শান্তি। ইহারই নাম মুক্তাবস্থা। আত্মা সর্ব-বিধ বন্ধন মুক্ত হইলেই জীব মুক্ত হইলেন।

“তদ্বৎসর্য স্তদাত্মান স্তম্ভিষ্ঠান্তং পরায়ণাঃ,
গচ্ছন্ত্য পুনরাবৃত্তিং জ্ঞান নিধূত কন্ধ্যাঃ ॥

সেই পরমাত্মায় বাহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি আছে, সেই পরমাত্মায় বাহারা চিত্ত আছে, সেই পরমাত্মায় বাহারা স্থিতিলাভ করিয়াছেন, সেই পরমাত্মাই বাহাদের পরম পতি, এবং জ্ঞানস্বরূপ বাহাদের পাপ বিধোত

হইয়াছে, তাদৃশ ব্যক্তিই মুক্তলাভ করেন। তাঁহাদিগকে আর পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ ক্লেশ পাইতে হয় না। মুক্তি সৰ্ব্বক্ষে শাস্ত্রে এত কথা আছে যে, বিস্তারিতরূপে লিখিতে গেলে তাহাতেই একখানি পুস্তক হইয়া পড়ে। সংক্ষেপে মুক্তি সৰ্ব্বক্ষে আরও গুটিকতক কথা বলিব।

মুক্তি চতুর্বিধ, সালোক্য, সামীপ্য, সাক্ষ্য এবং সাযুজ্য বা নির্বাণ। শ্রীমদ্ভাগবত মতে সাত্ত্বিক ও একপ্রকার মুক্তি। স্ততঃ উত্তমতে মুক্তি পঞ্চবিধ। সালোক্য ভগবানের সঙ্গে এক লোকে বাস, সামীপ্য তৎ-সমীপে বাস, সাক্ষ্য তদ্রূপ রূপলাভ করা। সাযুজ্য তাহাতে যুক্ত হওয়া। অর্থাৎ জলে জল মেশার গ্রায় একত্বপ্রাপ্তি। সাত্ত্বিক সমান ঐশ্বর্য সম্পন্ন হওয়া। মুক্তি জ্ঞানীর বাঞ্ছনীয়, ভক্তের নয়। কর্ম্ম স্বর্গ, জ্ঞানী মুক্তি, এবং ভক্ত সেবার প্রার্থী।

“সালোক্য সাত্ত্বিক সাক্ষ্য সামীপ্যৈকমপ্যুত।
দীর্ঘমানং ন গৃহ্ণন্তি বিযামং সেবনং জনাঃ ॥

ঈশ্বর্যবতার শ্রীমৎ কপিলদেব তাঁহার মাতা দেবহৃতিকে কহিয়াছেন—আমি ভক্তকে প্রাপ্ত পঞ্চবিধ ভক্তি প্রদান করিলেও আমার সেবা ভিন্ন ঐ সকল মুক্তি তাঁহাদের বাঞ্ছনীয় নয়। সকামকর্ম্ম স্বর্গ, রাজত্ব, ক্ষমতা ইত্যাদি প্রার্থনা করেন। স্ততঃ তাঁহাদের আত্মার বন্ধন মোচন হয় না। কর্ম্মযোগী স্বর্গলাভান্তে পুণ্যক্ষয়ে আবার মর্ত্যে অপবর্তিত হয়। রাজত্ব ভোগাদিরও শেষে পুণ্যক্ষয়ে সাধারণকস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। স্ততঃ এ সকল অনিত্য ফল ভক্ত বা জ্ঞানী বাহা করেন না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমান অর্জুনকে কহিয়াছেন—

সাংখ্যযোগং পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ
একমপ্যবিহতঃ সম্যগ্ভবোহর্কিততে ফলং ॥

বালকগণই জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগকে পৃথক মনে করে । অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি অজ্ঞান-গণই ভেদদর্শন করে । *জ্ঞানিগণ দুইটিকে একই মনে করেন । একটা আশ্রয় করিলেই উভয়ের ফল লাভ হয় ।

“কর্মণ্য কর্মরঃ পশ্চে দ কর্মনি চ কর্মরঃ ।

স বুদ্ধিমান মনুষ্যো ব স যুক্তঃ ক্রম কর্মবিৎ ॥

যিনি কর্মে অকর্ম অর্থাৎ জ্ঞান, এবং অকর্মে অর্থাৎ জ্ঞানে কর্ম দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান, এবং তিনিই প্রকৃত যোগী ও কর্মাকর্ম তত্ত্বজ্ঞ । নিকাম কর্মও জ্ঞানে সমান ফল । অহং জ্ঞানশূন্য হইয়া নিকাম ভাবে কর্ম করাও বা, কর্মসংগ্রাস করাও তাই । কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে স্বয়ং বর্ণ-শ্রমালুবারী নিকাম কর্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

“কাম্যানাং কর্মানাং গ্রাসং সন্নাশং কবয়ো বিদুঃ সর্বকর্ম ফলত্যাগং গ্রাহন্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥”

পণ্ডিতেরা কাম্যকর্মের বে গ্রাস অর্থাৎ ত্যাগ, তাহাকেই সন্নাশ বলেন । এবং সমস্ত কর্মের বে ফল ত্যাগ, তাহাকেই ত্যাগ বলিয়া থাকেন । গার্হস্থ্যগ্রমে থাকিয়াই সন্নাশ হইতে পারে । কিন্তু সে বড় কঠিন সংযম । বিড়ালের সম্মুখে মাছ ছুঁ খািকিবে, অথচ বিড়াল তাহাতে দূক্পাতও করিবে না । জনক, অশ্বরীষ, তরত, ভীষ্ম প্রভৃতি এইরূপ কর্মযোগী ও কর্মসন্নাশী । সংসার ধর্ম সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ইহার যাজন সর্বা-পেক্ষা কঠিন । চারিদিকে প্রলোভনের বস্ত্র অথচ প্রলুব্ধ হইতে হইবে না । “ধর্মশ্রুত কামস্ত যজ যোগো যযোগিনাম্” এই ধর্মে অযোগী ব্যক্তিগণেরও ধর্ম অর্থ এবং কামের যোগ অবস্থিত । অশ্রুত ত্রিবিধ আশ্রমীই সংসারী লোকের দ্বারা জীবিত থাকে । গৃহ

পালিত জীবজন্তু বতি সন্ন্যাসী সকলেই গৃহীর প্রদত্ত অন্নে জীবন ধারণ করে । দান, ধ্যান, যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, নিয়ম, ক্ষুধিতে অন্ন, বস্ত্রহীনে-বস্ত্র, পীড়িতে ঔষধ, অজ্ঞানিকে জ্ঞান গৃহীর ধর্ম । সুতরাং গৃহীর কর্তব্য অনেক, দায়িত্বও অনেক । অনাসক্ত চিত্তে সমস্ত কার্যসম্পন্ন করিতে পারিলেই তিনি মহাপুরুষ ।

জ্ঞানে বা নিকাম কর্মসাধনে যেমন আত্মার বন্ধন মুক্ত হয়, ভক্তিতেও তেমন । ভক্ত ভক্তিবলে সেবার অধিকারী হইয়া ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারেন । এমন কি, তাঁহার পার্শ্ব পর্য্যন্ত হইবারও অধিকারী হইতে সক্ষম হন ।

ভক্তই ভগবানের সমধিক কৃপাভাজন হইবার অধিকারী । উদ্ধব, অর্জুন, ভীষ্ম, হনুমান, জনক, অশ্বরীষ, তরত, অক্রুর, যুধিষ্ঠির, নারদ, শুকদেব, বাসু, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি সাধু মহাজনগণ ভক্তিবলে ভগবানকে পাইয়াছেন । ভগবানকে পাওয়াই ভক্তের লক্ষ্য । ভক্ত সাধন বলে তাঁহাকে লাভ করিয়া অনন্ত সুখশান্তি লাভ করেন । ভক্ত সাধুজা মুক্তিকে ব্রণা করেন । উহা জলে জল মিশার আশি, তাহাতে জীবের সুখ কি ? চিনি হইলে চিনির কি সুখ ? কিন্তু থাইতে পাইলে সুখ আছে । তাই ভক্ত সেই প্রাণকান্তকে পাইবার জন্ত সমস্ত জীবন ব্যাকুলভাবে তাঁহার অন্বেষণ করেন । তাঁহাকে না পাইলে ভক্ত যখন আর বাঁচেন না, দিবানিশি হা হতাশ করিয়া বেড়ান, তখন ভক্তবৎসলের কৃপা হয় । তিনি দর্শন দিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন । তাঁহার আশ্রয় পর্য্যন্তও পালন করেন । ভগবানকে নিকটে ভক্তের আশ্রয় সর্বপ্রাণ শিশুর আশ্রয়ের স্থায় । তাহা কেবল কিছুক্ষণ ভাল বাসার আশ্রয় । তাঁহার সমস্ত ভালবাসা

ভগবানে নিবদ্ধ। পার্শ্বিক সমস্ত ভালবাসাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া ঐ পদপদ্মে অর্পণ করিয়া-ছেন।

“মম পিতা, মম মাতা, মম যৎ গৃহিণী গৃহং ।

এবংবিধ মমত্বং যদ্ মমোহ ইতি কথ্যতে ॥

আমার পিতা, আমার মাতা, আমার গৃহিণী, আমার গৃহ ইত্যাদি প্রত্যেক বস্তুতে যে মমত্ব, তাহাই মোহ। ভক্তের এই মমত্ব থাকে না। ভক্ত দমস্ত মমত্ব ভগবানেই অর্পণ করেন। এই মমত্বাতিশয়ে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া যান। আবার অভক্ত মমত্বাতিশয়ে মোহ-পাশ বদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর বশীভূত হয়। কেবল মাত্র ভগবানের নাম জপ কীর্তনেই জীবের কর্মপাশ ছিন্ন হয়। ব্রহ্ম হরিদাস ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তিনি দিবা-নিশি তন্ময়চিত্তে কৃষ্ণ নাম জপিতেন। তিন লক্ষ নাম তাঁহার দৈনিক নিয়ম ছিল। নামের সঙ্গেই তিনি বর্তমান। যিনি তাঁহার নাম করেন, তিনি তাঁহার নববিধা ভক্তিই করেন। নামের মহাজ্ঞান হরিদাস যেরূপে দেহত্যাগ করেন, তাহা অতি আশ্চর্য্য। তিনি জগা-জীর্ণ শরীরে নামের সংখ্যা পূরণ করিতে পারেন না, তাই দেহত্যাগে অভিলাষী। চৈতন্য প্রভু কীর্তনীয়া লইয়া উপস্থিত। হরিদাস অঙ্গনে বসিয়া প্রভুর চরণযুগল বক্ষঃ-স্থলে ধারণ পূর্ব্বক অনিমেঘ নয়নে তাঁহার বদন-কমলের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। চারিদিকে বেড়া কীর্তন চলিতে লাগিল। এমন সময়ে হরিদাস আত্মাকে উৎক্রামণ করিয়া দিলেন। যেচ্ছামুসারে এমন ভাবে হরিদাসের মত ভক্ত ভিন্ন আর কে আত্মোৎ-ক্রামণ করিতে পারেন? ভক্তই হউন, কি জ্ঞানীই হউন, বাহার মায়া বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, তিনিই মুক্ত। মুক্ত ব্যক্তিকে আর

জন্ম মরণ ক্লেশ ভুগিতে হয় না। আজ কাল মানবচরিত্রের এত পরিবর্তন ঘটয়াছে যে, মুক্তি কথটা বড় কাহারও চিন্তার বিষয় নয়। কেবল বাহ্য লইয়াই সকলে ব্যস্ত, কাজেই পারমার্থিক চেষ্টা দিন দিনই কমিয়া আসিতেছে। মানবের উন্নতি বলিলে কেহ আধ্যাত্মিক উন্নতি বুঝেনা। বাহ্যোন্নতিই এখনকার উন্নতি। এতদ্বারা ধর্ম্মবলের হীনতা ও পাপবলের উৎকর্ষই সাধিত হইয়াছে।

জীব জগতে এত বৈষম্য দেখি কেন? কর্মফলই কি ইহার কারণ নয়? একজন রাজা হইয়া কোটা কোটা লোকের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা হইয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ কোটা কোটা লোককে সুখস্বচ্ছন্দতা দান করিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করিলে অভ্যাচারে বোরুতর উৎপীড়িতও করিতে পারেন। আমরা ৩০ কোটা ভারত-সন্তান নিম্নত অশ্রদ্ধাশ্রমে এই পুণ্যভূমিকে বিধোত করিতেছি কেন? কেন ৩০ কোটা মানব মুষ্টিমের গোরক্ষের ভোগ্য বস্তু মধ্যে পরিগণিত হওত শোষণ-বস্ত্রে বিগুণ হইয়া হাশাকার করিতেছি? কেন গোরাক্ষের সবুট চরণা-ঘাতে কৃষ্ণাক্ষের প্রীতি বিদীর্ণ হয়? কেন দুর্গাচন্দ্র সার্যাল অশিক্ষিত সম্রাট বংশীয় সাধুশীল ব্যবহারাজীব হইয়াও চোর দস্যু-দিগের সহিত একত্র কারা যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন? হিন্দুশাস্ত্রে বণে এ সকলই কর্ম-ফল। কোটা কোটা ভারত-সন্তানকে কেন এরূপ কর্মফল ভুগিতে হয়? আমাদের চক্ষে যিনি পুণ্ড্র দেবোপম-চরিত্র, স্বদেশ-হিতৈষণারূপ মহাত্ম্যে দীক্ষিত হইয়া যিনি দেশবাসীর ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি পাইবার যোগ্য, তিনি কেন বিবিধ প্রকারে লাজিত, অপমা-

নিত ও দণ্ডিত হইতেছেন? ইহা কিরূপ কর্মফল? এ গুরুতর সমস্যার সমাধান মানব-বুদ্ধির দৃষ্টিগ্ৰস্ত। তবে ইহা সত্য যে, ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব-কলঙ্ক নাই। কিরূপ কর্মফলে একটা বিরাট জাতি পদমর্দিত হইতেছে, তাহা অনির্দেশ্য। তবে সার্বজনীন কাপুরুষতা যে একটা বিকর্ম, তাহার সন্দেহ নাই।

চারিদিকেই বৈষম্যের খেলা। ব্যাঘ্র শৃগালকে, শৃগাল বিড়ালকে, বিড়াল নংস্তা-দিকে, তাহার আবার তদপেক্ষা দুর্বলকে, ধরিয়া ভক্ষণ করে। মানুষ আবার সমস্ত ইতর জীবের উপরেই প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে এবং বহুবিধ জীবের প্রাণ হনন করিয়া উদর-পূর্তি করিতেছে। মানব মধ্যেও ঘোর-স্তর বৈষম্য। কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ শূদ্র, কেহ মেথর, কেহ ধনী, কেহ পথের কাঙ্গাল, কেহ প্রভু, কেহ দূতা, কেহ রাজা, কেহ প্রজা ইত্যাদি। বাহ্যিক সাম্যবাদী, তাহার একবার জগতের এই বৈষম্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন, সাম্যই স্বাভাবিক কি বৈষম্যই স্বাভাবিক। ঈশ্বরে দয়াময়, মঙ্গলময়, সন্দর্শী ইত্যাদি বিশেষণ দেই; যদি কর্মফল ঠেলিয়া ফেলি, তবে সমস্তই বিপর্যস্ত হইয়া যায়; তিনি বিষম পক্ষপাতি হইয়া পড়েন। তাহা হইলে তাঁহাকে ভক্তি করিবার কিছুই থাকে না। বস্তুতঃ ঈশ্বরে ওরূপ দোষারোপ করা যাইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন—
“সমোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তিন প্রিয়ঃ
যে ভজন্তীতুমাং ভক্ত্যা ময়িতে তেষু চাপ্যহং ॥

আমি সর্বভূতে সমান। কেহ আমার দ্বেষ্যও নাই, কেহ প্রিয়ও নাই। যে ভক্তি পূর্বক আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাতে এবং সে আমাতে বর্তমান।

তবে এ বৈষম্য কেন? এ নিরঙ্কুশ কর্মফল? “লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্য যথার্থকে।
তদ্বদেব মহেশস্ত নিয়ন্তুগ্ণ দোষয়োঃ ॥”

মা যেমন পুত্র কন্যাকে পালনও করেন, দোষ দেখিলে তাড়নও করেন, নিয়ন্তা ঈশ্বরও, তেমনি, তাহার সন্তানগণকে গুণ দোষাত্মক পুরস্কার ও দণ্ড দিয়া থাকেন। তাহাতে তাহার দয়া ভিন্ন পক্ষপাতিত্বের গন্ধও নাই।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, কর্ম ত্রিবিধ—প্রালব্ধ, সঞ্চিত ও আগামী। জন্মগত বৈষম্য প্রালব্ধ কর্মজনিত। কেহ জন্মান্বিত, কেহ জন্ম-বধির, কেহ কুষ্ঠগ্রস্ত, কেহ সুন্দর, কেহ কুৎসিত, কেহ বলবান, কেহ দুর্বল, কেহ বুদ্ধিমান, কেহ নির্দোষ, এ সকলের মূলে কি সুবিচার না অবিচার? আন্তিক মুক্তকণ্ঠে বলিবেন, সুবিচার! সুবিচার!

মানুষ স্ব স্ব প্রাক্‌সঞ্চিত কর্মফলে যেরূপ বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, দৈহিক শক্তি প্রভৃতির বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, শিক্ষা, লব্ধ ও কর্ম-গুণে তাহার পরিবর্তন হইয়া যায়। মানুষের অহং জ্ঞান (আগ্নি বোধ) আছে। এই অহং জ্ঞানই কর্ম-প্রয়োজক। বাহার অহং জ্ঞান নাই, তাহার শুভাশুভ সমস্ত কর্মই বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি পৃথিবীর জীব হইয়াও পৃথিবীর বাহিরে। যিনি কর্ম করেন, শুভাশুভ কর্মজনিত উন্নতি, অবনতি, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, সমস্তের ফলই তাঁহাকে ভোগ করিতে হয়। সাধনার তারতম্যানুসারেই ফলের তারতম্য। কর্মের কল কতক বর্তমান জীবনেই ভোগ করিতে হয়, কতক বা আগামী জীবনে। এই কর্মের বৈষম্যই জীব জগতে বৈষম্য ঘটয়া থাকে। কর্মফলে মানুষ ইতর জীব হয়, জ্ঞানবান ভোগান্তে

মধুসূদন লাভ করে । দেবতা হইয়া ভোগান্তে পুনর্বার মনুষ্য-গতি প্রাপ্ত হয় । বিশ্ব সংসারের সমস্ত বৈষম্য ও বৈচিত্র্য এই কর্মফল-মূলক ।

অড়বিজ্ঞান-বাদী বলিবেন, মনুষ্য তাহার পিতামাতার বুদ্ধি, প্রকৃতি ও শক্তি লাভ করে । তাহার বৈষম্যেই মানুষের বৈষম্য হয় । তাহার পর নিজকৃত কর্ম্মানুসারে তাহাদের মধ্যে অধিকতর বৈষম্য ঘটয়া পড়ে । সম্ভান তাহার পিতা মাতার ব্যাধি প্রাপ্ত হয়, আবার ঐরূপ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে দোষ গুণেরও অংশ ভাগী হয় । ইহাতেও কর্ম্মফলের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কি প্রয়োজন ? আমরা নাস্তিকের প্রস্তোতর দিতে প্রয়াস পাইব না, কেননা সে মিটার স্বতন্ত্র প্রকার । তাঁহারা আস্তিক, তাঁহারা ঈশ্বরকে দয়াময়, মঙ্গলময়, জ্ঞানবান ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেন । সুতরাং তিনি জ্ঞানার পিণ্ডী বৃন্দোর ঘাড়ে দেন না, ইহাও স্বীকার করিবেন । পিতা উপদংশাদি রোগে পীড়িত ছিলেন, পুত্র কেন বিনা দোষে জন্মকাল হইতে, পিতার পীড়ার অংশ-ভাগী হইবে ? একের পাপে অস্ত্রের দণ্ডনীয় হওয়া সুবিচার-সিদ্ধ নয় । অবশ্য বুঝিতে হইবে, পুত্রের কর্ম্ম দোষে দণ্ড ভোগের জন্যই ঐরূপ পিতার ঔরসে জন্মিতে হইয়াছে । এইরূপ সর্বত্রই জন্মগত ও কর্ম্মগত বৈষম্যে জগতে ঘোরতর বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে । প্রালব্ধ, সঞ্চিত ও আগামী এই ত্রিবিধ কর্ম্মফলে মানব কখনও-তিরিয়াগ্-ভাতি, কখনও স্বাবর জীব, কখনও মনুষ্য এবং কখনও দেবতা হইতেছে ।

ভোগে শক্তির খেলা । যেখানে শক্তি সাধনা নাই, সেখানে ভোগ তিষ্ঠিতে পারে না । লালসার আত্মসংকীর্ণতা মানুষকে পণ্ড

হইতেও অতি নিকৃষ্ট-স্বভাব ও ভয়ঙ্কর করিয়া তুলে । তাই কত চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা, সতীধর্ম্ম-নাশ প্রভৃতি পাপাচরণ হইতেছে । বলী দুর্ব্বলের উপর আধিপত্য করিতেছে, বিনাশ করিয়া তাহার দেহ ভক্ষণ করিতেছে । এখানেও ঐ কর্ম্মফলেই এক অপরের ভক্ষ্য । ভগবান্ শক্তির এই লীলা সর্বভূতে নিগৃহীত করিয়া বিশ্বব্যবহার বৈচিত্র্য উৎপাদন করত চরাচর বিশ্বের রক্ষণ পালন করিতেছেন ।

আজকাল একদল লোক আছেন, তাঁহারা বৈষম্য রাখিতে অনিচ্ছুক । 'এই বৈষম্য বিনাশের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র । কতকের লক্ষ্য, জাতিভেদের প্রতি । তাঁহারা ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলকে এক সমান্তরালের মধ্যগত করিতে চান । তাঁহারা বলেন, বর্ণাশ্রম মানব-সৃষ্ট । মানব সকলেই সমান, এক পরম পিতার সম্ভান, সুতরাং সকলেই সকল বিষয়ে তুল্যাধিকারী । কেনই বা শ্রেণী বিশেষকে ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহার চরণে মস্তকাবনত করিব ? কেনই বা একজনকে রাজা বলিয়া তাঁহার অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিব ? আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর শৃংখল ও ব্যাঘ্রকে ভক্ষ্য ভক্ষকরূপে সৃষ্টি করিলেন কেন ? এ বৈষম্যে যদি ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব থাকে, তবে ব্রাহ্মণ শূদ্র সৃষ্টিতেও তাহাই মনে করিবেন । যদি প্রাণ্ডক্স সৃষ্টিতে পক্ষপাতিতা না থাকে, তবে ব্রাহ্মণ শূদ্র সৃষ্টিতেও নাই । যদি বলেন, বর্ণবিভাগ মানব-কৃত, তাহাতেও ঈশ্বরকৃত নয় । মানিলাম, মানবকৃত ; শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"চাতুর্য্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ ।

আমিই গুণ এবং কর্ম্মবিভাগানুসারে চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি । ইহা যদি ঈশ্বরোক্তি না হয়, তাহাতেও আপত্তি নাই । ' আমাদের

বক্তব্য এই যে, বর্জ্যপ্রসিক বিভাগানুসারে যে উচ্চনীচ আছে, তাহাতে ঈশ্বরের অজ্ঞাত নয়, তবে জানিয়া শুনিয়া তিনি একজনকে ব্রাহ্মণ কুলে, অন্তজনকে শূদ্রকুলে সৃষ্টি করিলেন কেন ? অবশ্যই ইহার মূলে বৈষম্যের বীজ কর্মফল বিদ্যমান। ব্রাহ্মণ বিদ্যা ও তপো-শুণে শ্রেষ্ঠ। এখন ক্রমশঃ সেই গুণহীন হইয়া আপনা আপনি পূর্বগৌরব-চ্যুত হইতে-ছেন। এক কর্মফলেরই বিবিধ প্রকার লীলা খেলা। ইহাতে বৈষম্যই যে স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য, ইহা বুঝা যাইতেছে।

এক পিতার পাঁচ পুত্র পৈতৃক ধনে তুলা-ধিকারী হইল। কেহ সর্বস্ব বিনাশ করিয়া ফেলিল, কেহবা চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিয়া তুলিল। একপ ঘটনা সর্বত্রই প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। লাইকারগাস্ প্রজাবৃন্দের সমস্ত ধন সমভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। •লৌহখণ্ড মুদ্রা রূপে ব্যবহৃত হইত; অল্পদিন মধ্যে আবার বৈষম্য ঘটয়া গেল।

“শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগব্রহ্মেইভিজায়তে।
অথবা যোগিনা মেব কুলে ভবতি ধীমতাং ।

এতদ্বি দ্বর্লভতরং লোকে জন্ম যদৌদৃশং ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমান অর্জুনকে কহি-
তেছেন—কর্মযোগী মরণান্তর পবিত্রচেতা
ধনীর গৃহে অথবা ধীমান কর্মযোগীর গৃহে
জন্ম পরিগ্রহ করেন। মানবেব ধনীর গৃহে
জন্মাপেক্ষা সাধুচরিত্র যোগীর গৃহে জন্মলাভই
দুর্লভ, স্মরণ্য সমধিক বাঞ্ছনীয়। ধনীর
গৃহে জন্মিলে পুনঃ পতনের সম্ভাবনা খুব বেশী।
ধর্মপ্রাণ যোগীর গৃহে জন্মিলে সে আশঙ্কা
থাকে না। উত্তরোত্তর তাঁহার আধ্যাত্মিক
উন্নতির সম্ভাবনাই সমধিক। মনুষ্যজাতেরই
শ্রেষ্ঠজন্ম লাভের জন্ত সাধনা করা কর্তব্য।
সাধনার তত্ত্বতম্যেই জন্মের তারতম্য। বাহার

শুদ্ধতা শিল্পোদয়-পরায়ণ, কামিনী-কাকনু
সেবাই বাহাদুরের সমস্ত জীবনের কার্য,
তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া
দুঃখই ভোগ করে। শুদ্ধচিত্তে ভগবত্ত্বজন ও
ঈশ্বরার্পিত কর্মদ্বারা ক্রমে কর্মপাশ ছিন্ন হয়।
চিত্তশুদ্ধি না হইলে পাপের বীজ নষ্ট হয় না।
পাপের বীজ নষ্ট না হইলেও কর্মপাশ ছিন্ন
হয় না, স্মরণ্য পুনঃ পুনঃ গর্তযন্ত্রণা ও দুঃখ-
ভোগ অনিবার্য।

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, জনক,
অশ্বরীষ, ভরত প্রভৃতি প্রাক্তঃপর্য্য কর্ম-
যোগিগণ কর্মবলেই জ্ঞান ও তত্ত্বের উচ্চচূড়া
লাভ করিয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
মানুষ কর্মশুণে দেবত্ব ও পশু উভয়ই প্রাপ্ত
হয়। স্বর্গ ও নরক কর্মেরই ফল।

হিন্দুশাস্ত্রে স্বর্গ ও নরকের ছবি চিত্রিত
হইয়াছে। স্বর্গ পুণ্যস্মার, নরক পাপীর বাস-
স্থান। আমরা এই পৃথিবীতেও স্বর্গ ও নর-
কের চিত্র দেখিতে পাই। তবে কি স্বতন্ত্র
স্বর্গ নরক সম্ভবে না ? স্বর্গ নরক কথাটা কি
ভিত্তিহীন ?

বিশ্ব-নিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরের অনন্ত সৃষ্টিতে কত
প্রকারের জীব-লোক আছে, কে বলিতে
পারে ? আমরা এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর অতি-
রিক্ত কোন জীব জগতের তত্ত্ব অবগত নহি।
এমন কত কোটা কোটা জীব-জগত বর্তমান।
ইহার মধ্যে আমাদের অপেক্ষা উন্নত ও হীন
কত প্রকার জীব আছে, তাহার ইয়ত্তা করাই
অসম্ভব। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁহার এক
জগতের জীবকে অল্প জগতে প্রেরণ করিতে
পারেন না, কি করেন না—ইহাও যুক্তিসিদ্ধ
নয়। দেবতা মানব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব-
বোনি। যে জীব-লোকে তাঁহাদেব বসি,
তাহাই দেবলোক বা স্বর্গ। পুণ্যস্মারের

সেই সুখময় স্বর্গে বাস হওয়া অসম্ভব কি ? পুরাণে স্বর্গ সম্বন্ধে অনেক বিবরণ বর্ণিত আছে। সমস্তই কল্পনার সৃষ্টি, এরূপ প্রগ-
 হত বাক্য বলা আমাদের স্তায় সর্কারী জ্ঞানীর
 পক্ষে বাতুলতা। রাজা দশরথ দেবদ্রোহী
 অশুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন। অজ্ঞান
 ইন্দ্রের নিকটে অস্ত্র শিক্ষা করিতে গিয়া-
 ছিলেন। নারদাদি ঋষিগণ স্বর্গ হইতে
 পৃথিবীতে এবং পৃথিবী হইতে স্বর্গে গতয়াত
 করিতেন। এরূপ ভূরি ভূরি কথা পুরাণা-
 দিতে দৃষ্টিগোচর হয়। স্বর্গের সুখকারিতা
 সম্বন্ধে বহুল পরিজ্ঞাত বাক্য রামায়ণ মহা-
 ভারতাদি অতুল্য জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থে বিদ্যমান।
 কৰ্ম্মশূণ্যে ইন্দ্র এই স্বর্গস্থ দেবগণের রাজা।
 স্বর্গ আবার সপ্তলোকে বিভক্ত,—ভূ, ভুব,
 স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য। ইহারই মধ্যে
 ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ লোক হওয়া
 সম্ভব। এতৎ সম্বন্ধে বাহুলা বর্ণনা অপ্রা-
 সঙ্গিক। তবে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করিলে
 যে এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ জীব-লোক গমনের
 অধিকারী হইতে পারে, তাহাই মাত্র উদ্দেশ্য।
 'নরক এরূপ দুঃখ পূর্ণ কোন অপরিজ্ঞাত
 জীব লোক হওয়া অসম্ভব নয়। পুণ্যস্মার
 জন্ত সুখময় ভুবনের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলে
 পাপস্মার জন্য দুঃখময় নরকের অস্তিত্ব অস-
 ম্ভব কি ? পুরাণে চতুরশীতিঃ প্রকার নর-
 কের ভাষণ ত্রৈ চিত্রিত আছে। সে যাহা
 হউক, এ পৃথিবী হইতে সুখময় এবং দুঃখময়
 ভুবন যে থাকিতে পারে, তাহা কোন মতে
 বৃক্তিরুদ্ধ বলা যায় না।

পরী ও ভূত যোনির কথা সর্ব দেশেই
 আবাহমানকাল প্রচলিত। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞা-
 নিকগণ এবিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছেন।
 ইহাদের কটো পর্য্যন্ত তোলা হইতেছে।

কিছু দিন হইল, পাবনার, রণজিৎ লাহিড়ী
 নামে একজন উকীল তাঁহার স্ত্রীকৃষ্ণী
 তুলিতে তাঁহার মৃত্যু স্মৃতি ঐ সঙ্গে উঠিয়া
 যায়। তিনি কলিকাতায় গিয়া অনেকানেক
 শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ও বাঙ্গালীকে তাহা দেখাইয়া-
 ছেন। এ একটা অদ্ভুত ঘটনা। মহারাজ দশরথ
 মীতা দেবীর অগ্নি পরীক্ষা সময়ে দেবগণ সহ
 তথায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রাম লক্ষ্মণকে
 আলিঙ্গন ও রাম মীতাকে উপদেশ দিয়া-
 ছিলেন। এত দিন এ সকল লোকে বিশ্বাস
 করিত না, কিন্তু আজ কাল পাশ্চাত্য পণ্ডিত-
 গণ বিশ্বাস করেন জন্ত আমরাও বিশ্বাস
 করিতে শিখিয়াছি। আমি স্বচক্ষে পরীর
 কার্যকলাপ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছি।
 আকস্মাতা জীলোকটার মন্তক আমার জাহ্নব
 উপরে। কিল, বুবি, চপেটাঘাত, গল
 টিপিয়া ধরা ইত্যাদি বিবিধ প্রকারে প্রহার
 চলিতেছে, শব্দ শুনিতেছি, কিন্তু প্রহর্তাকে
 দেখিনা। এ বিবরণ সবিস্তারে লিখিতে গেলে
 অনেক হইয়া পড়ে, তাই ক্ষান্ত থাকিলাম।
 তবে এই স্বপ্ন শরীরী জীব-যোনি যে মানবা-
 স্মারই বিপরিণতি, তাহার আর সন্দেহ নাই।
 জড় শরীরধারী মানুষ বাহা কিছু ত্বরিতে
 পারে, এই অশরীরী যোনিও তাহা সবই
 পারে। পরন্তু মনুষ্য হইতে ইহাদের শক্তি
 অনেক বেশী। মানুষের অনেক অসাধ্য
 সাধন করিতে আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করি-
 য়াছি। যাহার অনির্বচনীয় সৃষ্টি-চাতুর্য্য এই
 অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত, তাহার সৃষ্টি
 রাজ্যে কত কি অত্যাদ্ভুত সৃষ্টি পদার্থ বর্তমান,
 ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব তাহা নির্ণয়ে অদমর্থ।
 পরিমিত-বুদ্ধি মনুষ্য বিজ্ঞান বলে বস্ত্ততত্ত্ব
 অবগত হইয়া আজ কাল নিত্য নূতন আবি-
 করণ দ্বারা লগৎকে যুদ্ধ করিতেছে। যার

শক্তিতে এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস হইতেছে, প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুতে ধীর অসীম জ্ঞান, অপূর্ণিত্ব* কোণল ও অপার মহিমা বিরাজমান, তাঁহার সৃষ্টি-চাতুর্য্য যে কত গুরুগভীর জ্ঞানের পারিচায়ক, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে ?

আমরা যে গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিলাম, স্থায়ী পাঠকগণ তাহী বিবেচনা করিবেন। উপসংহারে কৰ্ম্ম-ফল সম্বন্ধে আরও গুটিকতক কথা বলিয়া প্রস্তাবের শেষ করিব।

প্লেগ, ম্যালেরিয়া জ্বর, ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক পীড়া এবং যুদ্ধে এক যোগে বহুসংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হুর্ভিক্ষ, জলপ্রাধান, রাজপীড়ন প্রভৃতি আধি-ভৌতিক এবং আধিদৈবিক ঘটনায় বহু লোকে ক্লিষ্ট ও মৃত্যুগ্রস্ত হয়। বহু লোকের অদৃষ্টচক্র একভাবে আবর্তিত হয় কেন ? ঐ প্রশ্ন অনেকেরই মনে উদ্ভিত হইতে পারে। পাপ ত্রিবিধ, শারীর, মানস এবং কৰ্ম্মজ। হুঃখও ত্রিবিধ, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। অত্যাংকট পাপ ও অত্যাশ্রিত পুণ্যের ফল ইহকালেই অনেক ফলিয়া যায়।

ষাকী ভবিষ্যজীবনে ভোগ করিতে হয়। শারীরিক পাপগুলির ফল পীড়া ও রাজ-দণ্ডের দ্বারা, ও মানস পাপগুলি অমৃত্যুপ দ্বারা ইহজীবনেই ভোগ করিতে দেখা যায়। পুৰুষোক্ত ব্যাপক হুঃখগুলির কারণ নির্দেশ করা মানব বুদ্ধির দুরধিগম্য। ঐশ্বরিক সমস্ত কার্য্যগুলির কারণ অমূল্যব করিতে মানুষের সাধ্য থাকিলে মানুষ হুঃখের অম্পৃষ্ট হইত; মানুষের অপূর্ণতাও থাকিত না। ষাহার সৃষ্ট একগাছি দুর্ক্সার রচনা-চাতুর্য্য দর্শনে বুদ্ধি স্তম্ভিত হয়, তাঁহার কার্য্যকলাপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তাৎপর্য্য অবগত হওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব। জন্ম মৃত্যুর অন্তরালে ঈশ্বরের যে কি লীলা খেলা, তাহা তিনিই জ্ঞানেন। মানুষের প্রতি তাঁহার অপরিমীম দয়া, অব্যাহিতারিণী বিচারপদ্ধতি, অনন্ত মঙ্গলচ্ছা প্রভৃতি দর্শনে ভক্তিরসাত্মকিত্তে তাঁহার অর্চনা করা, তাঁহার আজ্ঞাবহভূতের দ্বারা আজ্ঞা প্রতিপালন করা, নির্ভয়ে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করা, তাঁহার সৃষ্ট সর্ব-ভূতে সমদর্শিতা ই প্রকৃত মানবত্ব। ইহাই আত্মোন্নতি এবং মানব জীবনের চরম লক্ষ্য।

শ্রীজ্ঞানকীনাথ গোস্বামী।

• কমলাকান্ত ।*

বহুকাল পরে কমলাকান্ত শর্মা প্রসন্ন গোয়ালিনী সমভিষাহারে বঙ্গের রঙ্গমঞ্চে নব কলেবরে অবতীর্ণ হইয়াছেন শুনিয়া,

তাঁহার সেই প্রাচীন কীটদষ্ট 'দগুন্নটী' এক-বার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখার ইচ্ছা হইল। দেখি, কীটদষ্ট হইলেও, তাঁহার পক্ষে পক্ষে,

* এ প্রবন্ধ 'কমলাকান্ত'র সমালোচনা নহে—Dodd's Beauties of Shakespeare-প্রদর্শিত পথে

• 'কমলাকান্ত'র সৌন্দর্য্য-প্রদর্শনের প্রয়াস মাত্র।

ছত্রে ছত্রে, এখনও ভাবের রস উচ্ছ্বসিত হইতেছে—সে রস অস্বাদনে ভাবুক মাত্রই এখনও তন্ময় হইয়া যান ।

De Quincey-শিষ্য কমলাকান্ত “আফিম-প্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ প্রাপ্ত হইয়া” কোকিলের ‘কু-উ’—ধ্বনি, ভোমরার ‘ভেঁ-ভেঁয়ানি’, পতঙ্গের ‘চৌও—বৌও,’ বিড়ালের ‘মেও-মেও,’ প্রভৃতি অমামুখী ভাষা বৃত্তিতে পারেন, এবং মামুখের ভাষায় এরূপ ভাব ব্যক্ত করেন যে, তাহা ‘মামুখ’ মাত্রেরই মর্শ্মস্পর্শ করে। তিনি “আফিমের একটু বেশী মাত্রা চড়াইলে” কখন “সংসার-বৃক্ষে মায়াবৃক্ষে” মামুখ-ফল খুলিয়া থাকিতে দেখেন, কখন সংসার-চৌকিশালে নানাগুণের মামুখ-চৌকির নানা সামগ্রী ভানিয়া বাহির করার পরিচয় দেন, কখন বা স-ভাষা উদর-দর্শন রূপ সূত্র-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি সমালোচনার মুখে কাহারও নিস্তার নাই—পুরুষ, রমণী, উকীল, হাকিম, দেশহিতৈষী, পরপ্রত্যাশী, অধ্যাপক ব্রাহ্মণ, বঙ্গীয় লেখক-গণ, প্রভৃতি সকলেই তাঁহার সর্বতোমুখী সমালোচনার অধীন। তাঁহার বিবেচনায় বিত্তা—তৃপ্তিবারিনী নহে, কেবল অন্ধ-কার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায়; এ সংসারের তত্ত্বজিজ্ঞাসা কখন নিবারণ করে না। স্বীয় উদ্দেশ্য-সাধনে বিত্তা কখন সক্ষম হয় না।

বাক্সালীর বিত্তা—স্বতঃসিদ্ধ, তজ্জ্ঞ লেখা-পড়া শিবিবার প্রয়োজন নাই,—গ্রন্থ লিখিতে, সংবাদ পত্রাদিতে লিখিতে জানিলেই হইল।

জীলোকের বিত্তা—কখন আধখানা বৈ পুরা দেখিতে পাওয়া যায় না। নারিকেলের মালার দ্বারা তাহা বড় কাজে লাগে না।

লিপিব্যবসায়ী—তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ

অন্তকে পড়িয়া শুনাইতে, বড় ভালবাসেন, আর যে ব্যক্তি তাহা বসিয়া শুনে, তাহার নিভাত্তই বশীভূত হয়েন।

বঙ্গদেশের লেখকগণ—চৈতন্য-বিশেষ। নিজের সম্পত্তি খোলা আর দিটে, কিন্তু দুহু-কেও স্পর্শ করিলে দধি করিয়া তোলেন। গুণের মধ্যে অল্প—তাও নিরুপ্ত; একগুণ—নীরস কাষ্ঠাবতার—সমালোচনার আঁগুনে পোড়েন ভাল। অমন কুসামগ্রী আর সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় না।

দেশী হান্দিবেরা—পৃথিবীর কুম্ভাণ্ড। অনেকগুলি রূপেও কুম্ভাণ্ড, গুণেও কুম্ভাণ্ড। তবে তাহা দেশী নহে—বিলাতী কুম্ভাণ্ড। [কিন্তু সুপক, কি অকাল পক, তাহা চক্র-বর্তী মহাশয় কিছু বলেন নাই।]

দেশহিতৈষীর দল—ঠিক বেনশিমুল ফুল। ফুল যখন ফুটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা,—বড় বড়, রাস্তা রাস্তা, গাছ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু নেড়া গাছে অত রাস্তা ভাল দেখায় না—একটু একটু পাতাঢাকা থাকিলে ভাল দেখাইত। ফুলে গন্ধমাত্র নাই—কোমলতা মাত্র নাই—কেবল বড় বড় রাস্তা রাস্তা। ফলেও বড় লাভ ঘটে না; অন্তর্লব্ধ ফল—রৌদ্রের তাপে ফটু করিয়া ফাটিয়া উঠে, তাহার ভিতর হইতে খানিক তুলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়িয়া পড়ে। তাঁহার মনে করেন, ঘ্যানঘ্যানানির চোটে দেশোদ্ধার করিবেন—সভাতলে ছেলে বুড়া জমা করিয়া ঘ্যানঘ্যান করিতে থাকেন।

বাহুসম্পদের পুজা—কল্পে তাত্ত্বশাস্ত্রধারী ইংরাজ নামে ঋষিগণ পুরোহিত। Adam Smith-পূরণ এবং Mill-তত্ত্ব হইতে এ পুজার মন্ত্র পড়িতে হয়। এ উৎসবে ইংরেজী সংবাদপত্র সকল ঢাক-ঢোল—

বাক্সালা সংবাদপত্র কাঁসীদার। শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য এবং জন্ম ইহাতে ছাগবলি। এ পূজার ফল ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত নরক।

আজকাল পলিটিক্সের খরস্রোতে পড়িয়া বাক্সালীর অবস্থা বিপর্যয় ঘটয়াছে,—Men-dicant policyর নিন্দাবাদে দেশের মধ্যে বিলক্ষণ দলাদলি বাধিয়াছে;—কমলাকান্ত চক্রবর্তী বহুদিন পূর্বে তৎসম্বন্ধে আপন মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বোর Moderate—তিনি বলিয়াছেন, “আমাদের ইচ্ছা পলিটিক্স—কিন্তু বোনা বাক্‌চাতুরীর কামনার মত * * * (উহা) হান্সাপদ। (বাক্সালী জাতির) পলিটিক্স নাই। “জয় রাধে কৃষ্ণ! তিফা দাও গো!”—ইহাই তাহাদের পলিটিক্স। তুষ্টি অল্প পলি-টিস্‌ যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এদেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই। * * * পলিটিক্স হই রকমের—এক কুকুর জাতীয়, আর এক বৃজাতীয়। অস্বদেশীয়গণের মধ্যে অনেকেই কুকুরের দলের পলিটিক্যাল।”

Socialism নামে আর একটা কথা আজ-কাল অস্বদেশে শুনা যাইতেছে।

• মাজ্জার-রূপিনী Socialistএর সাহিত্য তর্ক প্রসঙ্গে চক্রবর্তী মহাশয়, অনেক দিন হইল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস শুনাইয়া গিয়াছেন। বিভালী কমলাকান্তকে বলিতেছে—

“আমাদিগের দশা দেখ—আহার্যভাবে উদর ক্লশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান * * * দাঁত বাহির হইয়াছে, জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, অবিরত আহার্যভাবে ডাকিতেছি—“খাইতে পাই না।” আমাদের কাল চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না। এ পৃথিবীর মৎস্ত মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। * * * আমাদের কৃষচর্চ, শুক মুখ, ক্ষীণ সুকরণ

ধ্বনি শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? তোমার পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে? * * * আমার মত দরিদ্রের দুঃখে কাতর কে হইবে? * * * তৈলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার অল্প ভোজের আয়োজন কর—আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর। চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার-সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধর্মীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন?” এই বিভালীর বিতর্কে কমলাকান্ত শব্দকে পশ্চাৎপদ হইতে হইয়াছিল।

উকীল-কুলের উপর কমলাকান্তের কিছু স্বতিরিক্ত উগ্র দৃষ্টি। শেষ দশায়—খোশন-বৌশ জুনিয়ারের আমলে প্রসন্ন গোয়ালিনীর মোকদ্দমার সাফা দিতে আসিয়া তিনি তাহার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে (পূর্বপরিচিতি মাজ্জারীর নিকটে কুশিক্ষা পাইয়াই বোধ হয়) তাহার একটু Socialistic ভাবও দোঁষতে পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন, “যদি সভ্য এবং উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে। * * * সেকন্ড হইতে রণজিৎসিংহ পর্য্যন্ত সকল তরুরই ইহার প্রমাণ। Right of conquest যদি একটা right হয়, তবে right of theft কি একটা right নয়?”

এ সকল কথা শুনিয়া কমলাকান্তকে নিতান্ত ক্ষিপ্ত বোধ হইতে পারে, কিন্তু যখন তাহার মুখে শুনি—“শ্রীতি সংসারে সর্ব-ব্যাপিনী—ঈশ্বরই শ্রীতি। * * * অনন্ত-কাল সেই মহাসংগীত সহিত মনুষ্য-জন্ম-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক; মনুষ্য জাতির উপর যদি আমার শ্রীতি থাকে, তবে আমি অল্প সুখ

টাই না ;”—যখন তিনি বলেন, “পরের জন্ত আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্ত কোন মূল নাই ;”—যখন তিনি আকুল-কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, “তোমরা এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় বৃদ্ধির জন্ত কি একটা কিছু কল হয় না ?”—যখন তিনি উপদেশ দেন, “যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্ম প্রিয়তা লুপ্ত না হইয়া থাকে, যদি বিবাহ নিবন্ধন তোমাদের চিত্ত মার্জিত না হইয়া থাকে, যদি আত্ম পরিবারকে ভালবাসিয়া তাবৎ মনুষ্য জাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাকে, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ । * * * যদি বিবাহ-বন্ধনে মনুষ্য চরিত্রের উৎকর্ষসাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই । * * * বরং মনুষ্যজাতি ইঞ্জিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে শ্রীতি-শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই ।”—তখন তাঁহাকে মানব-জগতে একজন আদর্শ পুরুষ বলিয়া বোধ হয়, মহাশূন্য জ্ঞানে তাঁহার উদ্দেশ্যে বারবার প্রণিপাত করি ।

তারপর কমলাকান্তের সেই একটা মাত্র সঙ্গীত-সমালোচনা । বাঙ্গালা ভাষার সেই মোহমত্ত গুনিয়া ভাবুক কমলাকান্ত বগিয়া-ছিলেন, এই গীত “কখন ভুলিতে পারিলাম না ; কখন ভুলিতে পারিব না ।” আজ আমরাও (বোধ হয় সমস্ত বঙ্গবাসীর সহিত এককণ্ঠে) বলিতে পারি, প্রসন্ন গোয়ালিনীকে তিনি সেই গীতের যে ব্যাখ্যা শুনাইয়া গিয়া-ছেন, তাহা কখন ভুলিতে পারিলাম না,—কখন ভুলিতে পারিব না । সেই বিখ্যাপিনী মানব-শ্রীতিই ঐ গীতের মূলমন্ত্র—“মনুষ্য মনুষ্যের জন্ত হইয়াছিল । এক হৃদয় অস্ত্রের স্বপ্নের জন্ত হইয়াছিল । সেই হৃদয়ে হৃদয়ে

সংঘাত, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্যজীবনের স্বপ্ন । ইহা হৃদয়ে মনুষ্যহৃদয়ে একমাত্র তৃপ্তি—অন্ত হৃদয়কামনা ।” (তাই) মনুষ্য হৃদয় অনবরত হৃদয়াস্তরকে ডাকিতেছে—

“এসো এসো বন্ধু এসো ।”

“সুখহীন, আশাহীন, উদ্বেগশূন্য, আকাঙ্ক্ষাশূন্য” কমলাকান্ত ভাবিতেছেন, “আমি কেন দিবস গণিব ?” পরক্ষণেই বলিতেছেন, “গণিব । আমার এক হৃৎস্ব, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে । * * * যেদিন বঙ্গে হিন্দু নাম লোপ পাইয়াছে, সেইদিন হইতে দিন গণি । * * * হায় ! কত গণিব ? দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাত বার গণি কই

“অনেক দিবসে, মনের মানসে

বিধি মিলাইল, কই ?”

যাহা চাই, তাহা মিলাইল কই ? ঐক্য কই ? বিদ্वा কই ? গোরব কই ? ত্রিহর্ষ কই ? ভট্টনারায়ণ কই ? হলানুধ কই ? লক্ষণ সেন কই ? আর কি মিলিবে না ? হায় ! সবারই স্পৃহিত মিলে, কমলাকান্তের মিলিবে না ?”

“সুখের কথায় বাঙ্গালীর অধিকার নাই—কিন্তু দুঃখের কথায় আছে । কাতরোক্তি যত গভীর, যতই হৃদয়বিদারক হউক না কেন, তাহা বাঙ্গালীর মনোজ্ঞাতি ।”—তাই বাঙ্গালী কমলাকান্ত নৈরাশ্রজনিত মর্ষবেদনায় আক্কেপ করিতেছেন,—“আর বঙ্গভূমি ! তুমি কেন মণিমাণিক্য হইলে না, তোমার কেন আমি হার করিয়া কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না ? তোমায় যদি কণ্ঠে পরিতাম * * * তোমায় সর্বর্ণের আসনে বসাইয়া, হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম । ইউরোপে, আমেরিকে, মিশরে, চীনে, দেখিত, তুমি আমার কি উজ্জল মণি ।”

“বাহার নষ্ট সুখের স্মৃতি আগরিত হইলে

স্বপ্নের নিদর্শন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার স্বপ্ন একেবারে লুপ্ত হয় নাই। (কিন্তু) যাহার স্বপ্ন গিয়াছে, স্বপ্নের নিদর্শনও গিয়াছে, —বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—সেই হুঃখী অনন্ত হুঃখী।” সেই অনন্ত হুঃখের আবেগে চিরহুঃখী কমলাকান্ত বলিতেছেন,—
 “আমার এই বঙ্গদেশের স্বপ্নের স্মৃতি আছে— নিদর্শন কই? দেবপাল দেব, লক্ষ্মণ সেন, জয়দেব, ত্রীহর্ষ, প্রয়াগ পর্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গোড়ো রীতি—এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই? স্বপ্ন মনে পড়িল, কিন্তু চাহিব কোন দিকে? সে গোড় কই? * * * আৰ্য্য রাজধানীর চিহ্ন কই? আৰ্য্যের ইতিহাস কই? জীবন-চরিত কই? কীর্ত্তি কই? কীর্ত্তিস্তম্ভ কই? স্বপ্ন গিয়াছে, স্বপ্ন-চিহ্নও গিয়াছে?—বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—চাহিব কোন দিকে? চাহিবার এক স্থান ভূমি আছে,—নবদ্বীপ। * * * বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে আমি সেই স্থান-ভূমি(র) প্রতিচাই। যখন ঝেঁথি, সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে বেড়িয়া অদ্যাপি* সেই কলধোত-বাহিনী গঙ্গা তর তর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—ভূমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায়? যাহার পা ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায়? তুমি যাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সেই আনন্দরূপিনী কোথায়? তুমি যাহার জন্ত সিংহল, বালী, আরব, সুমিত্রা হইতে বৃকে করিয়া ধন বহন করিয়া আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায়? তুমি যাহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে, সে অনন্ত সৌন্দর্য্যশালিনী কোথায়? তুমি যাহার প্রসাদী ফুল লইয়া ঐ স্বচ্ছ হৃদয়ে মালা পরিতে, সে পুষ্পভরণ কোথায়? সে রূপ, সে ঐশ্বর্য্য কোথায় ধুইয়া লইয়া গিয়াছে? বিশ্বাসঘাতিনি! তুমি কেন আবার শ্রবণমধুর কলকলন্তরতর রবে মন ভুলাইতেছ? বৃষি, তোমারই অতলগর্ভ মধ্যে সেই লক্ষ্মী ডুবিয়াছেন—বৃষি, কুপ্ত্রগণের আর মুখ দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়াছেন। * * * যদি গঙ্গার অতল জলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথায় গেলেন?”

* শেষ কথা—কমলাকান্তের “হর্গোৎসব,” অহিকেন সেবনে বিকৃতমস্তিক কমলাকান্ত সপ্তমী পূজার দিন কুহক দেখিলেন,—তিনি দিগন্তব্যাপী কালস্রোতে নিতান্ত নিঃসহায় একা ভাসমান—ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে কাতর-কণ্ঠে ডাকিলেন,—“কোথা মা! কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গ-ভূমি! এ ঘোর কাল সমুদ্রে কোথায় ভূমি?” উক্তবৎসলা মা ভক্তের মনোবল পূর্ণ করিলেন—ঊঁহাকে দেখা দিলেন। কমলাকান্ত চিনিলেন—“দিগভূজা, নানা প্রহরণ-প্রহারিণী, শক্রমর্দ্দিনী, বীরেশ্ব-পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিনী, বামে বাণী বিভা বিজ্ঞান-মুর্তিময়ী, সঙ্গে বল-রূপী কার্ত্তিকেশ্বর, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ”—“এই সপ্তমীর শায়দীয়া প্রতিমা”—“এই আমার জন্মভূমি”—“এই স্ববর্ণময়ী বঙ্গ-প্রতিমা!” তখন তিনি প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আবার আকুল স্বরে ডাকিলেন—“সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলো! শিবে! সর্ব্বার্থ-সাধিকে! * * * এসো মা, গৃহে এসো।” কিন্তু হয়! মা আমার শুনিলেন না—“সেই অনন্ত কালসমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল।” তখন যুক্তকরে সজল নয়নে কমলাকান্ত আবার ডাকিতে লাগিলেন—

“উঠ মা হিরণ্ময়ী বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সংপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবাহু-গৃহীতে! এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম্ম, আলস্য, ইজিয়াভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা, একা সোদন করিতেছি, কাদিতে কাদিতে চক্ষু-গেল মা! উঠ উঠ মা বঙ্গজননী!”

“মা উঠিলেন না—আবাহনের স্রুথেই; বিসর্জন ঘটিল—হায়! আর উঠিবেন না কি?”

কমলাকান্ত-কাজিত এই মাতৃচরণে—
দেশেই সন্তানের দল গাহিরাছে—“বন্দে মাত-
রম্ !” কমলাকান্ত ও সন্তানসম্প্রদায় যে
এক মায়ের সন্তান—অতঃপর ইহার আর

কাহাকেও পরিচয় দিতে হয় না। বিভিন্ন
চক্রের সমস্ত গ্রন্থ নষ্ট হইলেও, এক ‘কমলা-
কান্ত’ই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

শ্রীপাচকড়ি ঘোষ।

বিধবার একাদশীর উপবাস ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের দিন, মধ্যাহ্নকাল, মস্তকো-
পরি নিদাঘের প্রচণ্ড সূর্য্য অগ্নিকণার দ্বারা
প্রথর করণ অজস্র বর্ষণ করিতেছে। দারুণ
গ্রীষ্মে তৃষ্ণার প্রাণ আই চাই করিতেছে।
একাদশী তিথি, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ উপবাসী
আছেন। তবে তাঁর পিপাসা শাস্তির জন্ত
ডাবের সুশীতল জল, সুমিষ্ট তরমুজ, মিছরির
সরবৎ পেয়ে। আর ঐ আধিব্যাধি-ক্লিষ্টা বৃদ্ধা
বিধবা নিদাঘের ছুর্কিসহ পিপাসার ছটফট
করিয়া মরিলেও একাদশীর দিন বিন্দুমাত্র
জল পাইবে না। ইহাই শুনিতে পাই
শাস্ত্রের নিয়ম। তুমি পুরুষ, একাদশীর দিন
যদুচ্ছা জল পান করিয়া পিপাসা শাস্তি
করিতে পারিবে—শাস্ত্রীয় অনুকল্পের দোহাই
দিয়া লুচি, সন্দেশ, ক্ষীর, ছানা ইত্যাদি
বর্হবিধ রসনা-তৃপ্তিকর ভক্ষ্যদ্রব্য আকর্ষণ
উদরসাৎ করিবার কথা ছাড়িয়া দেও। আর
তুমি নবমবর্ষীয়া বিধবা বালিকা, অথবা
অশীতিপর বৃদ্ধা বিধবা, পিপাসার মৃতকল্প
হইলেও, বিন্দুমাত্র গঙ্গা জলে পরিণত রসনা
সরস করিতে পারিবে না।

এই দ্রবস্ত গ্রীষ্মের দিনে পণ্ড, পক্ষী,
কীট, পতঙ্গ সকলেরই পিপাসার জল মিলিল,
—মিলিল না কেবল এই হতভাগ্য বঙ্গদেশের
বিধবা রমণীর ভাগ্যে। চাতকের আর্ন্তমুখে
অচেতন মেঘও বারিবর্ষণে বিরত থাকিতে
পারিল না, কিন্তু হার, বিধবার আর্ন্তমুখে ত

কেহ শুনে না! হে ইন্দ্র! তোমার আকাশে
বজ্রের কি এতই অভাব হইয়াছে যে, এই
শাস্ত্রকারগণের মস্তকের জন্ত একটাও নাই?
যাহারা এই নারকী শাস্ত্রের প্রণেতা, কিম্বা
যাহারা শাস্ত্রের একুণ গহিত অর্থ করিয়া
লোকের পাণ সঞ্চয়ের মহায়ত্ন করিতেছে,
অথবা শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম জানিয়া শুনিয়াও
যাহারা দেশাচারের বশবর্তী হইয়া এই নিষ্ঠুর
নিয়মের অনুমোদন করিতেছে, সেই ব্রাহ্মণ,
হৃদয়হীন ব্যবস্থাপকগণের মস্তক বজ্রে চূর্ণ
করিয়া তোমার ‘রাজধর্ম্মের’ মহিমা অক্ষুর
রাখ। দেব, আর ত সহ্য না!

আমাদের এই একটা বিষম রোগ—
যে রোগ আমাদের সমস্ত অনর্থের মূল এবং
ব্রাহ্মণের অধঃপতনের অনিচ্ছিত কারণ যে,
বালক যেমন “জুজুর” নামে ভয়ে আতকে
অজ্ঞান হয়, আমরাও তেমনি, শাস্ত্রশব্দ কর্ণ-
কুহরে প্রবেশ মাত্র হতজ্ঞান হই। আমাদের
বিশ্বাস, শাস্ত্র দেবতার সৃষ্ট—জগৎ সৃষ্টির সঙ্গে
সঙ্গে হিন্দুর সমুদয় শাস্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে;
সুতরাং এই শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিলে প্রত্যবার
আছে। বাস্তবিক শাস্ত্র কি তাই? শাস্ত্র
কি সত্যসত্যই দেবতার রচিত—মাতৃবের
রচিত নহে? এই শোচনীয় অধঃপতনের
দিনে কে বলিয়া দিবে—শাস্ত্র কি এবং তাহার
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই বা কি? নিজে শাস্ত্র পড়ি
নাই এবং পড়িবার ক্ষমতাও রাখি না, তবে

কেমন করিয়া ভবিষ্যৎ নির্ণয় হইবে? যে পড়ি-
রাছে, তাহার কথা শুন। তাও শুনিবে না;
আমি “সটীক” ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নহি, এই
অপরাধে আমার কথার অনাস্থা করিবে।
আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপর নির্ভর করিয়া
এত লাজনা পাইতেছ, সেও তোমার ভাল
হইল!! এই রোগই ত তোমার সমস্ত অন-
র্থের মূলভূত কারণ। যদি বুঝাইলে বোধ ত
তোমার এত দুঃখ হইবে কেন? বালককে
শত বুঝাও যে “জুজু” অবাস্তবিক ও কাল-
নিক, ইহা হইতে ভয়ের কোন কারণ নাই,
বালক কি তা শুনে? বালক “জুজু” নাম
শ্রবণ মাত্র অজ্ঞান হইয়া পড়ে।

এখন দেখা যাউক, হিন্দুধর্ম ও ধর্মশাস্ত্র
বলিলে কি বুঝি। যে কর্মের অনুষ্ঠানের
মহুষ্যের সম্যক ক্ষুতি ও বিকাশ হয়, তাহাই
মহুষ্যের ধর্ম; আর যাহা মহুষ্যের উন্নতির
প্রতিকূল—যাহাতে উন্নতি-স্রোত বাধা
প্রাপ্ত হয়—তাহা অধর্ম। যথাপি মহাবিগণ
লোক-হিত ও সমাজ রক্ষা একমাত্র লক্ষ্য
করিয়া বর্ণাশ্রমের বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্মের
উপদেশ দিয়াছেন। এই মহাবিগণোপদিষ্ট
ধর্মই হিন্দুধর্ম; এবং যে গ্রন্থে ইহার
উপদেশ আছে, তাহাই হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র।
এই স্থানে আর একটা কথা বলিয়া রাখা
উচিত মনে করিতেছি। শাস্ত্র যে অপরি-
বর্তনীয়, তাহার কোন প্রমাণ নাই। যখন
দেখিতেছি, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মশাস্ত্র
প্রচলিত ছিল, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে,
তত্ত্বসময়ের জন্য তত্ত্বশাস্ত্র উপযোগী না
হওয়ার নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইয়াছিল।
যথা :—

“কৃতো তু মানবোধর্ম জ্ঞেতায়াং গৌতমঃস্বতঃ।
যাপরে শব্দসিধিতৌ কলৌ পরাশরঃ স্বতঃ।”

অভিনিবেশ সহকারে ধর্মশাস্ত্র আলো-
চনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, সময়ের
পরিবর্তনের সহিত শাস্ত্রেরও পরিবর্তন হই-
য়াছে। বর্তমান সময়ে দেশের অবস্থার
যে বহুল পরিবর্তন হইয়াছে, একথা বোধ
কেহই অস্বীকার করিবেন না। এখন আর
ক্ষত্রিয়ের দ্বস্তে রাজদণ্ড নাই; ব্রাহ্মণ আর
ক্ষত্রিয় রাজার পার্শ্বে বসিয়া প্রজার মঙ্গলের
পরামর্শ দেন না। রাজকার্য্য, ব্যবসা,
বাণিজ্য ইত্যাদি নানাবিধ কর্মোপলক্ষে
আমরা নিত্য নানা বৈদেশিক লোকের
সংমিশ্রণে আসিতেছি। পূর্ব কালে বর্ণগত
যে ব্যবসা-পার্থক্য ছিল, এক্ষণে আর তাহা
রক্ষিত হইতেছে না। ব্রাহ্মণ স্নেহের দাসত্ব
করিতেছেন। শূদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানকে বিভা-
ভ্যাস করাইতেছেন। বৈদেশিকগণের সংমি-
শ্রণে ও পরস্পরের স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাতে
এবং ধর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীর ও বিভিন্ন
ধর্মাবলম্বী লোকের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যদি আমা-
দের যোগ্যতা ও জাতীয় জীবন রক্ষা করা
আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমাদের সমাজ-
নীতির ও জীবন গতির যথাসম্ভব পরিবর্তন যে
নিতান্ত অপরিহার্য্য, একথা কে অস্বীকার
করিবে? আজিকার দিনে যেরূপ দণ্ডবিধি
প্রভৃতি আইন কাহন ব্যবস্থাপিত হয়,
পুরাকালেও সেইরূপ মন্বাদি ধর্মশাস্ত্র-প্রয়ো-
জকগণ (Legislators) ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করি-
তেন, অথবা আবশ্যক মতে প্রচলিত শাস্ত্রের
পরিবর্তনও করিতেন। বিবিগণ আমাদের
মত হস্ত পদাদি ইঞ্জির বিশিষ্ট মাহুয ছিলেন—
দেবতাও নহেন অথবা এমনি একটা কোন
উদ্ভট জীবও নহেন; প্রতিভাশালী মাহুয
ব্যতীত আর কিছুই নহেন। জনসমাজের
উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লোকের সুবিধা

অনুবিধা, মঙ্গল অমঙ্গল পর্যালোচনা করতঃ
বিধিনিষেধ ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। একটা
উদাহরণ দিইঃ—

মহু, ৫ম অধ্যায়, ১৩০ শ্লোক,

“—ঋ মৃগগ্রহণে শুচিঃ।”

মৃগ বিনাশকালে কুকুরের মুখ শুচি।

কুকুরের মুখ সর্বদা অপবিত্র, কিন্তু শিকার
কালে শুচি। তবেই পাঠক দেখুন, আমি যাহা
বলিতেছিলাম তাহা সত্য কিনা। শিকারের
সময় কুকুর মানুষের প্রধান সহায়; কুকুরের
মুখ সর্বত্র অশুচি বলিলে কুকুরধৃত পশু
পরিভ্রাণ করিতে হয়, তাই বিধি হইল
“—ঋ মৃগগ্রহণে শুচিঃ।” নতুবা, এই নিয়-
মের কোন আধ্যাত্মিক ভাব নাই এবং ইহা
যে মহুর প্রত্যাদেশ বা যোগবল-লব্ধ নহে,
তাহা সহজেই অনুমেয়। এইরূপ আরও
ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।
ইহাতেও যদি তুমি না বুঝ যে শাস্ত্র আমাদের
মত হস্তপদাদিবিশিষ্ট মানুষের রচিত এবং
ইহাতে ভ্রমপ্রমাদ সম্ভবপর, স্মৃতরাঃ আবশ্যক
মত পরিবর্তন করা যাইতে পারে, তবে
তুমি অধঃপাত যাও, আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ
বা দুঃখ নাই। যে ইচ্ছায় আপন মঙ্গল ঘট
চূর্ণ করিবে, তাহার উপর দেবতা ও মানুষ, সক-
লেই নারাজ। এক সামান্য পরিভ্রাণের
বিষয় যে, অশুষ্কপৃষ্ঠে বিরচিত সংস্কৃত শ্লোক
মাজেই আমাদের নিকট শাস্ত্র বলিয়া সমাদৃত
হয়। এবং সেই ভ্রান্ত অশুষ্কপৃষ্ঠের উপর
ভিত্তি করিয়া একবার যে দেশাচার বন্ধন
হইল, কার সাধ্য আর তাহা উল্লঙ্ঘন বা
নষ্টাৎ করে? বুঝিতে পারি না কোন্ পাপে
এই হতভাগ্য দেশের লোক এত হতবুদ্ধি
হইল? যদি কোন মহাপুরুষ কালিদাসের
ভক্তবায়ের ভ্রাতা, কার্যক্ষেপে একটা অশুষ্কপৃষ্ঠ

রচনা করিয়া বলিলেন, এটা খটক পুণ্যশ্রেয়—
কি এমননি একটা কোন শাস্ত্রের বচন, তবে
তাহাই আমাকে বাউন্সিগ্গি নাই করিয়া
অবনত মস্তকে মানিতে হইবে। না মানিলে
আমি সমাজচ্যুত হইব—আমি অহিন্দু—
নাস্তিক—শাস্ত্র-বিশেষী। এইরূপে আমরা
ভ্রান্ত দেশাচার ও কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া
ধর্মের নামে অক্ষয় পাপরাশি সঞ্চয় করি-
তেছি। সত্যার্থ ভুলিয়া উপধর্মের রূপ-
কাঠে, আপন সুখ, শান্তি, পারলৌকিক
মঙ্গল বলি দিতেছি। দেখিতেছি না, আমা-
দের ও দেশের সর্বনাশ হইতেছে। অথবা
দেখিয়া শুনিয়া ও জাতীয় স্বভাব বলে তৎ-
প্রতিবিধানে একান্ত উদাসীন।

অনেক সময় আমরা দেশাচারকে শাস্ত্র
অপেক্ষা উচ্চতর স্থান প্রদান করি। কেন?
দেশাচার বিষয়টা কি? আজ যে আচরণ
আমাদের মধ্যে প্রচলিত হইল, দুদিন পরে
তাহাই ত দেশাচার বলিয়া পরিগণিত হয়।
আজ তুমি আমি দশজনে যে কার্য্য করিতে
লাগিলাম, আমাদের সম্মানসম্মতিও যদি
তাহার অনুষ্ঠান করিল, তবে কালক্রমে তদনু-
ষ্ঠান দেশাচারে পরিণত হইবে। যাহারা
কোন নির্দিষ্ট দেশাচার প্রথম প্রচলিত
করিয়াছেন, তাঁহাদের কি ভুল হইতে নাই?
অথবা হইতে পারে, তদনুষ্ঠান তৎকালের
উপযোগী ছিল; কিন্তু তাই বলিয়া বর্তমান
সময়ে যে উপযোগী হইবে, তাহার প্রশ্ন
কি? আর যদি না হয়, তাহা হইলেও যে
তদনুষ্ঠান পালনীয়, এমন কথাও কোন
শাস্ত্রে দেখিতে পাই না। দেশ কাল পাত্র
ভেদে যে শাস্ত্রের বিভিন্নতা হয়, আমরা
একেবারে বিস্মৃত হইয়াছি। দেশাচার
“জুজু” ভয় হইতে মুক্ত হইতে না

পারিলে আমদের মঙ্গলের আশা অতি বিরল।

পূর্বে বলিয়াছি, শাস্ত্র সমস্ত লগৎস্বষ্টির সমকালে ব্রহ্মা কর্তৃক রচিত হয় নাই; প্রতিভাশালী ঋষিগণ লোকহিত ও সমাজ-রক্ষার জন্য সময়ে সময়ে সে সকল বিধি ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাকেই আমরা শাস্ত্র বলি। যে শাস্ত্রে লোকহিতকর নহে, পরন্তু সমাজের অনিষ্টকারী এবং উন্নতির প্রতিকূল ও বিরোধী, তাহা গৃহদেবতা বধুগণের হস্ত-পরিচালিত *সম্মার্জ্জনী প্রেরিতা আবর্জ্জনার স্ত্রায় পরিত্যাগ করিব; নতুবা উন্নতির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

Sir Henry Sumner Maine তদ্বি-

রচিত Ancient Law নামক গ্রন্থে কি লিখিয়াছেন, তাহা একবার আপনারা দেখুন।—
“The usages which a particular community is found to have adopted in its infancy and in its primitive seats are generally those which are on the whole best suited to promote its physical and moral well-being; and, if they are retained in their integrity until new social wants have taught new practices, the upward march of society is almost certain. But unhappily there is a law of development which ever threatens to operate upon unwritten usage. The customs are of course obeyed by multitudes who are incapable of understanding the true ground of their expediency, and who are therefore inevitably to invent superstitious reasons for their permanence. A process then commences which may be shortly described by saying that usage which reasonable generates usage which is unreasonable. Analogy, the most valuable of instruments in the maturity of jurisprudence, is the most dangerous of snares in its infancy. Prohibitions and ordinances, originally confined, for good reasons

to a single description of acts, are made to apply to all acts of the same class, because a man menaced with the anger of the gods for doing one thing, feels a natural terror in doing any other thing which is remotely like it. After one kind of food has been interdicted for sanitary reasons, the prohibition is extended to all food resembling it, though the resemblance occasionally depends on analogies the most fanciful. So, again a wise provision for insuring general cleanliness dictates in time long routines of ceremonial ablution; and that division into classes, which at a particular crisis of social history is necessary for the maintenance of the national existence, degenerates into the most disastrous and blighting of all human institutions—caste.

বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন, বঙ্গদেশের বায়ুমণ্ডলীতে জলীয় বাষ্পের অধিক্য হেতু ও ভেজহানিকর ভাত আমাদের আহাৰ্য্য হওয়ার আমরা এত হীনবীৰ্য্য এবং কাণ্ডে উদ্যমহীন ও উদ্যোগ-পরিশূন্য। মুসলমান সেনা দ্বারে আগিয়া দাঁড়াইল, রাজা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ডাকাইয়া গণনা করিতে বসিলেন—ব্রাহ্মণ পাঁজি পুঁথি দেখিয়া বলিলেন যে, বৈজ্ঞানিক আর হিন্দুরাজ্য থাকিবে না—মুসলমান রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবে। শাস্ত্রের কথা রাজা স্বিকৃতি না করিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং পলায়ন করিয়া স্বর্গত জীবনরক্ষা করিলেন। শাস্ত্রের ভয় আমাদের হাড়ে হাড়ে বসিয়াছে। রাজার অট্টালিকা হইতে দ্বি-স্ত্রের কুটীর পর্যন্ত সর্বত্র সমভাবে আধিপত্য করিতেছে। কোন শাস্ত্রীর বিধির অর্থোক্তিকতা বা অনিষ্টকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে ও শাস্ত্রতরে একান্ত ভীত আমরা, উদ্যমশীলতা নাই বলিয়া, প্রচলিত মতেই বিব্রভে কার্য্য করিতে পারি না। আমরা পণ্ডের

ভায় উদ্যম ও চেষ্টা-বিহীন। প্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি, কর্তৃক্কেত্রে বেন উদাসান দর্শক মাত্র। আমাদের ভায় 'গোঁফথেকুরে' বোধ হয় জগতে আর দ্বিতীয় নাই। শবের ভায় নিম্পন্দ হইয়া থঙ্কুর বৃক্ষের নিম্নে পড়িয়া আছি, একটি সুপক থঙ্কুর বৃক্ষচূত হইয়া শুষ্ককেশে বাধিয়া রহিল, এমন চেষ্টাশূন্য যে জিহবা সঞ্চালনে গোঁফের খেঁজুর মুখে দিই, এমন ক্ষমতা নাই। ইহা দুর্বল বলিয়াই আমরা এত ভূত প্রোতে বিশ্বাস করি; কারণ অবিশ্বাস করিলে যদি সত্যসত্যই ভূত থাকে, তবে ভয়, পাছে ভূত মহাশয় রাগিয়া গলা টিপিয়া দেন। "ন চ দৈবাৎ পরং বলম্" ইতি বাক্যে এতই বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি যে, পুরুষকার বলিয়া যে একটা কথা আছে, তাহা একবারও মনে স্থান দিই না। আমরা শাস্ত্র মানি—আবার মানিও না। যেখানে শাস্ত্র আমাদের এই জাতীয় দুর্বলতার অঙ্কুল, সেখানে শাস্ত্র মানি। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া আমাদের উদ্যম ও চেষ্টাহীনতার জন্ত যে স্বাভাবিক আত্মমানি, তাহা হইতে মুক্ত হইবার প্রয়াস পাই। ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট একাদশীর ব্যবস্থা চাহিলে তিনি রঘুনন্দনের দোহাই দিয়া নিঃসঙ্কোচে বলিবেন যে, নবম বর্ষীয়া বিধবা বালিকা হইতে অশীতিপর বৃদ্ধা পর্য্যন্ত নিত্য অনন্ত বা প্রাণান্ত পর্য্যন্ত হইলেও একাদশীর দিন 'বিন্দুমাত্র গঙ্গাজলে গুরুকণ্ড আর্জ' করিতে পারিবে না। কিন্তু তুমি পুরুষ, তোমার বত ইচ্ছা অশীতল জল পান করিতে বাধা নাই। আমরা বাঙ্গালী—গড়লিকার জাতি; যাহা শাস্ত্র বলিয়া আমাদের 'দুর্বল' স্বক্কে চাপাইবে, আমরা নিঃশব্দে বহন করিব। গর্দুতের সহিতুতাও

আমাদের কাছে হারি মানিয়াছে। ধন্ত বাঙ্গালী, তুমি নিজ হস্তে ব্রহ্মশালিনী জননী, ভক্তিমতী আত্মজা ও -প্রীতিময়ী সহোদরা প্রভৃতি বধ করিতেছ! আর শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নিজেকে সাফাই হইতেছ। জী-হত্যা, মাতৃহত্যার ভয় উপেক্ষা করিয়া শাস্ত্র ও দেশাচারের প্রাধান্ত স্বীকার করিতেছ! কেন একবার বলনা, রঘুনন্দনের (যদি রঘুনন্দনের একুপ মত হয়) নারকায় শাস্ত্র মানি না। রঘুনন্দন যে শাস্ত্র হইতে নিজগ্রহ সঞ্চলন করিয়াছেন, সেই সকল শাস্ত্রে কি আছে, দেখিব—দেখিয়া যাহা উচিত হয় করিব। মধ্যদি শাস্ত্র ভাসিয়া গেল, এখন রঘুনন্দন আমাদের মুণ্ডপাতের হর্ত্তাকর্ত্তার পদে অভিবিক্ত হইলেন।

দুঃখের কথা কি বলিব, রঘুনন্দন ত পদে আছেন। তিনি পণ্ডিত ছিলেন, তবে নিত্যন্ত হৃদয়শূন্য লোক বলিয়া একটা কিস্কৃত-কিমাকার অমাহুযিক শাস্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি কতদূর দোষী, তাহা পরে দেখা যাইবে। আপনারা দেবীবর ঘটকের নাম শুনিয়াছেন ত? তিনিও এই অধঃপতিত দেশের শাস্ত্রকর্ত্তা। মহারাজ বল্লালসেন কি অশুভক্ষেণেই বঙ্গদেশে কোলীন্য প্রথার সূত্রপাত করিয়া যান। তাহা 'না হইলে বোধ হয় হতভাগ্য দেবীবর তদপেক্ষা হতভাগ্য বঙ্গদেশে কুলীনদিগের মেলবন্ধন ও তৎসংস্কীয় অগ্রাশ্রুত দুর্নীতি প্রচলিত করিয়া স্বদেশের সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করিতে পারিতেন না। দেবীবর ঋষি নন—মুনি নন—শাস্ত্রকার নন, এমন কি অপণ্ডিতও নন, তবে তাঁহার কথা শুনিয়া নিজের মঙ্গলঘট নিজ চরণে ঠেলিব কেন? তিনি কুলীনদিগের যে মেলবন্ধন করিয়াছেন, তাহাতে

- দেশের যে ভদ্রমানক্ অমঙ্গল হইতেছে, ইহা দেখিয়া শুনিয়াও যে আমরা তৎপ্রতিবিধানে সচেষ্ট ও যত্নবান হইতেছি না, ইহা কি সামান্য ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয় ? ইহা আমাদের জাতীয় উত্তমহীনতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, নহিলে দেবীবরের কথায় অনিষ্ট হইলেও যে সমাজ তাহা রক্ষা করিতে বাধ্য, এমন প্রমাণ ত হিন্দুর কোন শাস্ত্রে দেখি না। বল দেখি কোন্ বেদে, কোন্ পুরাণে, কোন্ স্মৃতিতে লেখা আছে যে ফুলে, ধড়দহ ইত্যাদির পরস্পর বিবাহ হইবে না ? বিষ্ণু বা শ্রীধরের সন্তান তাঁহাদের পালটা ঘর ব্যতিরেকে অল্প ঘরে আদান প্রদান করিতে পারিবেন না। কৌলীন্ত-বৃক্ষের বিষময় ফল ভক্ষণ করিয়া বঙ্গদেশ দিন দিন নিস্তেজ হইতেছে, তথাপি কি এই দেবীবরী ছাই পাশ ছাড়িতে পারিতেছি ? ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির জায় এই অনিষ্টের প্রতিবিধানের ক্ষমতা একান্তই লুপ্ত হইয়াছে। আমরা আবার মানুষ বলিয়া পরিচয় দিই, সভ্য বলিয়া গর্ব করি, স্বাধীন হইতে অভিলাষ করি ! তোমরাই নাকি স্বায়ত্তশাসন চাও ? ইংরাজের জায় আপন হস্তে রাজ্য শাসনের ভার লইতে চাও ? ধন্ত তোমার ধৃষ্টতা ! যে ভূত প্রেতের ভয়ে একান্ত অভিভূত হইয়া তাহার পূজা দেয়,
- মনুষ্য, শীতলা ও ওলাদেবীকে Health officer এর পদে নিযুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, ছেলেপিলের অমঙ্গল হইবে বলিয়া মা যজ্ঞীর বিড়ালের হিংসা করিতে বিরত, হাঁচি, টিক্-টিকি, শব-শিবা দি ছনিমিত্ত দর্শনে কার্য্য হইতে পরাশ্রয়, তার আবার স্বাধীন হইবার ইচ্ছা কেন ? তুমি নাকি ভলটিয়ার হইতে চাহিয়াছিলে ? ধর, ইংরাজরাজ তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। বাকালী ভলটিয়ার

সৈনিকদল শত্রুসেনার গতিরোধ করিবার জন্য লালদিঘির রাস্তায় বৃহিত হইতে আদিষ্ট হইয়াছে। শত্রুসেনা একপাল বিড়াল সংগ্রহ করিয়া তোমাদের সম্মুখে রাখিয়া অনারাদে তোমাদের বধসাধন করিবে। তোমরা মা যজ্ঞীর ভয়ে পাছে বিড়ালের গায়ে লাগে বলিয়া বন্দুক ছুড়িতে পারিবে না।

তাই বলিতেছিলাম—শাস্ত্র যেখানে আমাদের স্বাভাবিক উত্তমহীনতার অমূল, তখন শাস্ত্র মানি ; আর যখন দেখি, শাস্ত্র মানিলে স্বাভাবিক জড়তা ও উত্তমহীনতা পরিত্যাপ করিয়া কার্য্য করিতে হইতেছে, তখন শাস্ত্র মানি না। যে শাস্ত্র “দৈবেন দেয়মতি কাপুরুষাঃ বদন্তি” উপদেশ দেয়, সে শাস্ত্র শুনিয়াও শুনি না। কিন্তু কর্তব্য-বিমুখের আশ্রয়মানি অবশ্যস্তাবী। আর এই আশ্রয়মানি হইতে মুক্ত হইবার জন্য আমরা বলিয়া থাকি—শাস্ত্র আছে কি করিব, নাচার ! বেশ বৃষ্টিতেছি, একাদশীর দিন বিধবা এক গণ্ডুষ জলপান করিলে পতিত হইবে না, তথাপি এতই কুশাস্ত্র ও ভ্রান্ত দেশাচারের বশবর্তী হইরাছি যে, তাহার অশ্রুথচরণ করিবার ক্ষমতা নাই।

বড়ই আক্ষেপের বিষয়, আজকাল আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের মৰ্য্যো-দ্বাটনের চাবি হারাইয়াছেন—কেমন করিয়া শাস্ত্র পড়িতে হয়, ভুলিয়া গিয়াছেন। অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, শাস্ত্রবচনের বাক্যার্থ (letter) মাত্র গ্রহণ করার শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ও মৰ্য্যের (spirit) অহুদ্রে থাকিতে হয়। সুতরাং শাস্ত্রপাঠের বাহিত ফললাভ হয় না। নারিকেলের স্নমধুর জল ও তদধিক উপাদেয় শস্ত ভক্ষণ করিতে হইলে ছোবড়া পরিত্যাগ করিতে হয়, একথা শাস্ত্র

ব্যবহারীরা বিবৃত হইয়াছেন বলিয়া বোধ
অজ্ঞান হয়। শাস্ত্রের মর্ফোল্যাটনের বার্হ-
স্পত্য সার্বজনীন চাবি (Universal key)।
হারাইয়া যাওয়ার নানা ধনরত্নে শাস্ত্র পূর্ণ
থাকা সত্ত্বেও সটীক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দারিদ্র্য-
জ্ঞান মুখে বিরাজ করিতেছেন। বৃহস্পতি
যথার্থই বলিয়াছেন :—

“কেবলং শাস্ত্রমশ্রিতা ন কর্তব্যোবিনির্গয়ঃ ।
যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্মহানী প্রজায়তে ॥”

পাঠক, ক্ষমা করিবেন। হুঃখে, ক্ষোভে,
লজ্জায়, ঘৃণায় ও মনের আবেগে অনেক
কথা বলিয়া ফেলিয়াছি; হয়ত এত কথা
বলা আমার উচিত হয় নাই, হয়ত আমাকে
সম্প্রদায় বিশেষের কাছে নির্ধ্যাতন সহ্য
করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া কি সত্য
বলিব না ?

এখন দেখা যাউক, বিধবার পক্ষে, একা-
দশীত্রত সম্বন্ধে মন্বাদির স্বতিশাস্ত্র কি ব্যবস্থা
দেন।

মহু :—

“মৃত্তে ভর্ত্তরি স্বাধীত্ৰী ব্রহ্মচর্যো ব্যবস্থিতা ।
ঋগ্নঃ পঞ্চতাপুত্রোপি যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ ॥”

পরশুর :—

“মৃত্তে ভর্ত্তরি বা নারী ব্রহ্মচর্যো ব্যবস্থিতা ।
সামুতা লভতে ঋগ্নঃ যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥

—
“মৃত্তে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য তদেবগারোহণং বা ।”

ধর্মপাঞ্জকারগণ একবাক্যে বলিতেছেন,
স্বামী বিরোগান্তে ত্রী ব্রহ্মচারিণী হইবেন।
ব্রহ্মচারিণীর পক্ষে যে একাদশীত্রতের অজু-
কল্প নিষিদ্ধ, একথা মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রে কোথাও
দেখিতে পাই না। আর মানবাদি ধর্মশাস্ত্র
বাহা অবৈধ বলিয়া নির্দেশ করেন নাই, তাহা
যে নির্দোষ ও অজুষ্ঠের, ইহা কেমন করিয়া
অস্বীকার করিব।

এখন দেখা যাউক, রঘুনন্দনের মত কি ?
বিধবার নিরম্ব একাদশীর বৃণিত নিয়মের
দোষটা প্রায় সকলেই বেচারী রঘুনন্দনের
হৃদয়ে চাপাইয়া থাকেন। কিন্তু আমার বোধ
বিধাস, স্বয়ং রঘুনন্দন এবিষয়ে নিরপরাধ।
রঘুনন্দনের স্মৃতিগ্রন্থ আত্মোপাস্ত পাঠ করি-
লাম, এই নিষ্ঠুর ব্যবস্থার উল্লেখ কোথাও
দেখিলাম না। তবে বুঝিতে পারি না কেমন
করিয়া এই হতভাগ্য দেশে এমন অশাস্ত্রীয়
নিষ্ঠুর বিধি প্রচলিত হইল।

যে সকল বচন প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া
রঘুনন্দন বিধবার চক্ষে একাদশীত্রতের
নিত্যত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তৎসমুদয় নিয়ে
উদ্ধৃত হইল :—

তিথিতত্ত্বং । অথ একাদশী :—

“বিধবায়স্ত সর্বথা নিত্যত্বমাহ কাত্যায়নঃ ।”

“বিধবা বা ভ্রনেনারী ভুঞ্জীতৈকাদশী দিনে ।

তস্তাস্ত স্মৃকৃতং নশ্বেৎজগ্নহত্যা দিনে দিনে ॥”

স্মৃতিঃ—

“ঋষ্ট স্নাদধিকো মর্ত্যো হৃপূর্ণা নীতিবৎসরঃ ।

ভুঙ্কতে যো মানবো মোহাৎ একাদশ্যাং

সপাপকৃৎ ॥”

একাদশীত্রতং নিত্যং তদাহ ব্রহ্মবৈবর্ত্তঃ—

“ইতি বিজ্ঞায় কুবরীতাবশ্রমে কাদশীত্রতং ।

বিশেষ নিয়মাসক্তোহহোরাত্রঃ ভুক্তিবর্জিতং ॥”

ভবিষ্যে :—

“নিত্যমেতৎ ত্রতং নাস্তি কর্তব্যং সার্ববর্ণিকম্ ।

সর্বাশ্রমাণাং সামান্যং সর্ব ধর্মেষুহুতমং ॥

একদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষ্যরোহুভরোপি ॥”

রঘুনন্দন প্রথমতঃ দেখাইলেন যে “একা-
দশীত্রতং নিত্যং কাম্যঞ্চ ;” পরে দেখাইতে-
ছেন যে “বিধবারস্ত সর্বথা নিত্যত্বং ।” একা-
দশীত্রত যে বিধবার পক্ষে নিত্য পালনীয়,
রঘুনন্দন ইহাই এখানে প্রমাণ করিলেন ।

এবং ইহাই যে তাঁহার উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্য, তাহাধরে অণুমাত্র সন্দেহ নাই এবং থাকিতেও পারে না ।

এখন দেখা যাইবে “সর্বথা নিত্যং” ইতি বাক্যের তৎপর্য্য কি ? এবং স্থানান্তরে যে অমুক্লের ব্যবস্থা দিয়াছেন, ইহা তাহার বাধক কিনা ? রঘুনন্দন বলিতেছেন “যদ-করণে প্রত্যাবাসস্তত্ত্বিত্যমিত্যুক্তম্ ।”

তথ্যচ :—

• “নিত্যং সদা যাবদায়ুর্ন কদাচিদতিক্রমেণ উপেত্যতিক্রমে দোষঃ প্রত্যেরত্যাগ চোদনাৎ । ফলাশ্রতেবর্ষাঙ্গস্য চ তত্ত্বিত্যমিতি কীর্তিতম্ ।”

এখন স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হইবে যে, একাদশী ব্রত “বিধবারাস্ত সর্বথা নিত্যং” ইতি বাক্যের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় এই যে, বিধবা যাবজ্জীবন একাদশী ব্রত পালন করিবেন, কদাচিৎ অতিক্রম করিবেন না । ইহার অর্থ, কিন্তু কোন ক্রমেই এরূপ হইতে পারে না যে, বিধবার পক্ষে একাদশী ব্রতান্তত অমুক্ল নিষিদ্ধ । যিনি অভিনিবেশ সহকারে রঘুনন্দনের গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তিনিই স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিবেন যে, বিধবার পক্ষে একাদশীতে অমুক্ল রঘুনন্দনের মতের বিরোধী নহে । যদি অমুক্ল নিষেধ করা তাঁহার উদ্দেশ্য হইত, তবে এই নিষেধ বাক্য, বলপ্ৰাচল্য, তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে অমুক্ল ব্যবস্থা স্থলে নিশ্চয়ই দৃষ্ট হইত ।

পাঠক আরও দেখুন—রঘুনন্দন নির্দিষ্ট চারিটি একাদশীতে অমুক্ল নিষেধ করিতেছেন ; তথা :—

“মচ্ছয়নে মত্থানে মংপার্ষ্য পরিবর্তনে ।

কলমূল জলাহারী হৃদি শল্যং মমর্পণেৎ ॥”

এই কল্প একাদশীতে অমুক্ল নিষেধ করার স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, এতদ্বা-

তীত অস্ত্র সকল একাদশীতে অমুক্ল নিষেধ করা রঘুনন্দনের উদ্দেশ্য নহে । যদি সকল একাদশীতেই অমুক্ল নিষেধ করা উদ্দেশ্য হইত, তবে এই বিশেষ বিধি দ্বারা চারিটি মাত্র একাদশীতে অমুক্ল নিষেধ নিশ্চয়োজন ও নিরর্থক হইত ।

আবার যখন দেখিতেছি, উপবাস সম্বন্ধে শাস্ত্র জ্ঞী পুরুষের কোন বিভিন্নতা করেন নাই, তখন অমুক্ল বিষয়ে কোন ইতর বিশেষ করা যে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ও যুক্তি-বহির্ভূত । শাস্ত্রের যে বচন প্রমাণ দ্বারা বিধবার একাদশী ব্রতের নিত্য অবধারিত হইয়াছে, সেই একই বচন পুরুষের পক্ষেও একাদশী ব্রতের কর্তব্যতার প্রমাণ স্থলে গৃহীত হইয়াছে । অতএব বিধবার বেলা এক নিয়ম, আর পুরুষের বেলা অন্য নিয়ম, কোন ক্রমেই ত্রায়াঙ্গত হইতে পারে না । যদি উভয়ে একই নিয়মের অধীন হইল, আর বিধবার পক্ষে যখন নিয়মাত্তর নাই, তখন পুরুষের পক্ষে অমুক্ল ঠৈষ হইলে বিধবার পক্ষে কখনও ঐবিধ হইতে পারে না । তবে কোন্ যুক্তিবলে শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বিধবার বেলা অমুক্ল নিষেধ করেন, তাহা বুঝিতে পারি না ।

অতএব দেখা গেল,

(১) বিধবার পক্ষে একাদশীব্রত নিত্য অর্থাৎ আজীবন অমুক্লের ; আর

(২) এই নিত্য শাস্ত্রোক্ত অমুক্লের বাধক নহে ।

পাঠক মহাশয় এখন দেখিলেন, শাস্ত্র বলে কি, আর আমরা করি কি ! দেশাচারের মর্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থক যত্নবান হইয়া শাস্ত্রের মন্তকে—হরি হরি জেথনী কলঙ্কিত

করিলাম—পদাঘাত করিতেছি। যে “স্নেহ-ময়ী কস্তুর দণ্ডেক মাত্র আহারের বিলম্ব দেখিলে পিতামাতার আর কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকিত না, আজ সেই দ্বাদশবর্ষীয় বালিকা ভাগ্যদোষে বিধবা হইয়া একাদশীর দিন বিন্দুমাত্র জলের জন্ত প্রাণত্যাগ করিলেও ভোমার প্রাণে করুণার সঞ্চার হয় না। কস্তা পিণাসায় ছটকট করিতেছে, আর তুমি আকণ্ঠ আহার করিয়া স্নেহে নিদ্রা বাইতেছ। পিণা-চের দেশ আর কোথায়? আমার দৃঢ় প্রীতি হইতেছে যে, কস্মদেশের অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের দোষে বিধবার একাদশীর নিরম্ব উপবাসের নিত্য অশাস্ত্রীয় নারকী নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বালক টোলে গিয়া আট দশ বৎসর ধরিয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ভট্টিকাব্য, অমর-কোষ অভিধান মাত্র পাঠ করিয়া যিনি স্বতি পড়িবেন, তিনি রঘুনন্দনের সংগ্রহ গ্রন্থ পাঠ করিলেন ও স্মার্ত-চূড়ামণি উপাধি পাইয়া ব্যবস্থা দিতে লাগিলেন। কি ধৃষ্টতা! এই সংগ্রহ গ্রন্থমাত্র-সম্বল স্মার্ত-চূড়ামণি ঠাকুরেরা মন্ত্রবিষয় হারীতের মূল গ্রন্থ কস্মিন্ কালেও চর্চচক্ষে না দেখিয়া কেমন করিয়া স্বতির যথার্থ মর্ম গ্রহণে ও রহস্তোদঘাটনে সমর্থ হইবেন? সুদীর্ঘ কোঁটা, নামাবলী ও নস্ত্র কোটার আড়ম্বরে যতদূর সম্ভব, বিভ্রাশূন্যতা ঢাকিবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু মূর্থতা অগ্নির জ্বালা নামাবলীতে প্রচ্ছন্ন থাকিবার নহে, কাজেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। ব্যবস্থা শাস্ত্রাঙ্গুসারিণী হইল না। ফল হইল, তাঁহাদের ব্যবস্থা-বিভ্রাটে পড়িয়া দেশের এই শোচনীয় অধঃপতন ও বিবহার নিরম্ব উপবাসের ব্যবস্থা।

রঘুনন্দন অমুকল্পের যে ব্যবস্থা দিয়াছেন,

তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রস্তাবনার উপ-সংহার করিব। পাঠকগণ অভিনিবেশ সহকারে নিম্নোদ্ধৃত বচন প্রমাণ পাঠ করিয়া দেখিবেন, বিধবার পক্ষে অমুকল্প শাস্ত্রাঙ্গুসারিত কি না।

একাদশী তত্ত্বম্। অথোপবাসামুকল্পঃ।

আপং প্রতিনিধ্যামুকল্পনাং পর্যায়্যতা কাল বিবেক দ্বত বরাহপুরাণকোশতো।

“উপাবাসামর্থন্তু কিঞ্চিদ্ভক্ষ্যং প্রয়োজয়েৎ।”

তথা একাদশীমাধিকৃত্য স্থতিঃ—

একভক্তেন নক্তেন ভক্ষন্ বৃদ্ধাতুরঃ
কিপেং উপবাস নিবেধা সামর্থ্যম্বোৰ্ভক্ষ্য
প্রকারমাহ।

নারদীয়েঃ—

“অমুকল্পো নৃনাং প্রোক্ত ক্ষীণানাং বয়বর্ণিনি।

মূলং ফলং পয়স্তোয়মুপভোগ্যং ভবেচ্ছতং ॥

ন ত্বেবং ভোজনং কৈশিচিদেকাদশ্যাং প্রকীৰ্ত্তিতং।”
এবমমুকল্লাতিরিক্তং।

ব্রহ্মবৈবর্তঃ—

“উপবাসা সমর্থশ্চৈদকং বিপ্রস্ত ভোজয়েৎ।

তাবক্ষনানি বা দত্তাৎ যজ্ঞভাদ্বিগুণং ভবেৎ ॥

সহস্রসম্মিতাং দেবীং জপেবা প্রাণসংযমান্।

কুৰ্ঘ্যাদ্বাদশ সংখ্যকান যথাশক্তিং ত্রতেনরঃ ॥”

বায়ুপুরাণেঃ—

“উপবাস নিবেধেতু কিঞ্চিদ্ভক্ষ্যং প্রকল্পয়েৎ।

ন দ্রুত্যা উপবাসেন উপবাসফলং লভেৎ ॥

নক্ত হবিষ্যারমনোদনয়া ফলং তিলাক্ষীর।

যৎপঞ্চ গব্যং যদিবাথ বায়ু প্রশস্ত মন্ত্রোত্তর

মুস্তরঞ্চ ॥”

উপবাস নিবেধন্তু অসামর্থ্যাদপীতি। তত্রাপি

হবিষ্যাদিরমুকল্পঃ—

মার্কণ্ডেয়ঃ—

“একভক্তেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ।

উপবাসেন দানেন নৈবাহাদশিকৌ ভবেৎ ॥”

উল্লিখিত অমুক্ল ব্যবস্থা পাঠ করিলে অনায়াসে উপলব্ধি হইবে, একাদশীতে ভোজন-নিষেধের যুগার্থ. তাৎপর্য্য কি ? রঘু-নন্দন নানা শাস্ত্র হইতে বচন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন যে, ফলমূলাদি কিঞ্চিৎ ভোজনদ্বারা একাদশীর উপবাসব্রত ভঙ্গ হয় না । উপবাসের ফল পূর্ণমাজার প্রাপ্ত হওয়া যায় । প্রথমে, একাদশীর দিন বিধবার পক্ষে ভোজন-সাধারণতঃ নিষেধ করিয়া, পরে ব্যবস্থা করিতেছেন যে,—

“মূলং ফলং পরিস্তায়মুপভোগাৎ ভবেচ্ছুত্তমং ।

নত্বেবং ভোজনং কৈশ্চিৎ একাদশ্যাং

প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥”

আর একটি কথা বলিয়া আমরা বিদায় গ্রহণ করিব । বোধ হয়, অনেকে অবগত নহেন যে, বঙ্গদেশের অনেকস্থানে অমুক্ল প্রথা প্রচলিত আছে । শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন, পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সর্বত্র, বিক্রমপুর, চন্দ্রদ্বীপ, চাঁদ প্রতাপ এবং মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি প্রদেশে এই প্রথা বিশিষ্টরূপে প্রচলিত আছে ; কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন যে, বিক্রমপুর প্রদেশের ব্রাহ্মণেরা ব্রট্টাচার ও অহিন্দু ; আমাদের স্ত্রায় নিষ্ঠাবান ও স্বধর্ম্মনিরত নহেন । তাঁহাদিগের সহিত আমাদের আদান প্রদানাদি বৈবাহিক ক্রিয়া কল্যাপ বিলক্ষণরূপে প্রচলিত আছে । আমি

জানি, বিক্রমপুরের কোনস্থানে আমাদের দেশের কোন সম্রাট, স্বধর্ম্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মণের কস্তার বিবাহ হয় । ঐ কস্তা বিধবা হইয়া, যখন পিতৃহারায়ে বাস করিতেন, তখন একাদশীর দিন নিরম্ব উপবাস করিতে বাধ্য হইতেন, কিন্তু স্বশ্রাৱলয়ে অবস্থান কালে শাস্ত্রোক্ত অমুক্ল করিয়া একাদশীত্রত পালন করিতেন । সমগ্র দাক্ষিণাত্য প্রদেশ, মাজাজ, বঙ্গাই, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, উৎকল, সংক্ষেপে বঙ্গদেশের দুইটি একটি জেলা ব্যতীত অর্থাৎ নদিয়া, হুগলী, ২৪ পরগণা ও বর্দ্ধমানের কিয়ৎকংশ ব্যতীত, ভারতবর্ষের অন্য কোথাপি এই কুপ্রথা প্রচলিত নাই । বিধবার পক্ষে জগন্নাথ-ক্ষেত্রে অবস্থান কালে একাদশীর দিন উপবাস নিষিদ্ধ । ‘নিত্যত্ব’ শব্দে যদি ‘অমুক্লরহিতত্ব’ বুঝায়, তবে বিধবার একাদশীর নিত্যত্ব বজায় থাকে কৈ ? যে নিয়মের ব্যাভিচার দেশের নানাস্থানে দৃষ্ট হইতেছে এবং যখন সে সকল স্থান আমাদের সমাজের অন্তর্ভূত, তখন কেমন করিয়া বলিবে ‘নিত্যত্ব’ শব্দে ‘অমুক্লরহিতত্ব’ বুঝাইতেছে ?

পরিশেষে পাঠকগণের নিকট সাহসের প্রার্থনা যেন তাঁহারা নিজ নিজ অধিকারে এই গর্হিত নিয়মের পরিবর্তন করিতে যত্নবান হইয়েন । শ্রীমহেশ্চন্দ্র দেবশর্মা মৌলিক ।

জয়রামপুর—নদিয়া ।

গীতার অবতারবাদ । (শেষ)

(ছ) অবতারের প্রয়োজন কি ?

কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য যে কোন্ বিশেষ কারণের জন্য অবতারের প্রয়োজন হইয়া থাকে ?

অবতারের প্রয়োজন কেন হয়, সে সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে,—

“যদা যদা হি ধর্ম্মস্ত গানির্ভবতি ভারত ।”

অত্মাখানমধর্ম্মত তদাত্মনঃ সুজাহ্যহম্ ॥ ৭

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দ্রুততাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

গীতা—৪ঃ ।

অর্থাৎ যখনই ধর্মের মানি হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃজন করি । সাধুদের পরিভ্রাণ, দ্রুততাদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্ত আমি যুগে যুগে জন্মধারণ করিয়া থাকি ।

ইহা হইতে আমরা এইরূপ অবগত হইতেছি যে, প্রথমতঃ যখন ধর্মের মানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন সাধুদের পরিভ্রাণ এবং দ্রুততাদের বিনাশের প্রয়োজন হয় বলিয়া ভগবান অবতার হইয়া থাকেন । দ্বিতীয়তঃ ধর্ম সংস্থাপনের জন্ত অবতারের প্রয়োজন হয় । ইহা ভিন্ন অবতারের আরও একটা প্রয়োজন আছে, তাহা উপাস্য সিদ্ধির জন্ত । ঈশ্বরের অধিষ্ঠিত জগতে ধর্মের মানি কেন হয়, তৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে নিম্নে অবতারের পূর্বোক্ত প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে ।

(১) সাধুদের পরিভ্রাণ ও দ্রুততাদের বিনাশ :—আমরা শাস্ত্রাদি হইতে অবগত হইয়া থাকি যে, মনুষ্য হইতে ভগবান্ পর্যন্ত সৃষ্টির ক্রম আছে । এই সকল সৃষ্টিকে পৌরাণিক ভাষায় বক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অশ্বর, দেব প্রভৃতি বণে । ইহাদের মধ্যে সকলের প্রকৃতি সমান নয় । কেহ সৃষ্টির কল্যাণ কামনায় সাহায্য করিয়া থাকেন এবং কেহ অমঙ্গল কামনায় বাধা দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকেন । এইজন্য আমরা শাস্ত্রে প্রায় দেবাসুরসংগ্রামের কথা পাইয়া থাকি । অমঙ্গলাকাজী অশ্বরগণ সময় সময় মনুষ্যের কতিকরিবার জন্ত এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন । মনুষ্যের কথা দূরে থাক,

দেবভাড়াও ইহাদের নিকট পরাজিত হইয়া থাকেন ! পুরাণে আমরা দেখিতে পাই যে, কালানুগমে এবং অস্তিত্ব দৈত্যগণ কংশ এবং তাঁহার অশুররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । এই সকল দুষ্ট ব্যক্তিগণ যখন তাঁহাদের অত্যাচারে জগত্তেজস্বীকে প্রদীপ্ত করেন, তখন প্রদীপ্তিতের ক্রন্দন-ধ্বনি বৈকুণ্ঠে পৌছাইলে ভগবান কি আর স্থির থাকিতে পারেন ? তখন তিনি অবতার গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হন এবং দ্রুততাদের বিনাশ করিয়া ও সাধুদের উদ্ধার করিয়া পৃথিবীতে শান্তি বিধান করিয়া থাকেন । আমরা পুরাণে এইরূপ রাবণ ও হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারের কথা দেখিতে পাই ; তাঁহাদের দমনের জন্ত ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । তিনি সাধুদের কিরূপে পরিভ্রাণ করিয়া থাকেন, তাহা প্রহ্লাদের জীবনী হইতে অবগত হওয়া যায় ।

(২) ধর্ম সংস্থাপন :—ভগবান ধর্মসংস্থাপনের জন্ত অবতীর্ণ হইয়া থাকেন । এতদ্ সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু তাঁহার ‘কৃষ্ণচরিত্রে’ লিখিয়াছেন যে, “মনুষ্য কতকটা নিজ-রক্ষা ও বৃত্তি সকলের বশীভূত হইয়া স্বতঃই কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হয় । কিন্তু যে কৰ্ম্মদ্বারা সকল বৃত্তির সর্বাঙ্গীণ ক্ষুণ্ণ ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা ঘটে, তাহা দ্রুত । যাহা দ্রুত, তাহার শিক্ষা কেবল উপদেশে হয় না—আদর্শ চাই । সম্পূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর তিলক আর কেহ নাই । কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না । কেন না, তিনি প্রথমতঃ অশরীরী, শারীরিকবৃত্তি-শূন্য ; আমরা শরীরী, শারীরিক বৃত্তি আমাদের ধর্মের প্রধান বিষয় । দ্বিতীয়তঃ তিনি অনন্ত, আমরা সান্ত—অতিক্ষুদ্র । অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন

• দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হইতে পারে। এইজন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন। মনুষ্য কর্ম জানে না; কর্ম কিক্রমে করিলে ধর্মের পরিণত হয়, তাহা জানে না; ঈশ্বর স্বয়ং অবতার হইলে সে শিক্ষা হইবার বেশী সম্ভাবন।। এমত স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অসম্ভাবনা কি? বহুসংখ্যক বাবুর মতে ‘ধর্মসংস্থাপন’ অর্থে আদর্শ (Ideal) প্রতিষ্ঠা করা। মনুষ্য যখন আদর্শকে হারাষ্ট্র ফেলে, তখন ভগবান অবতীর্ণ হইয়া সেই আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন।

(৩) উপাস্ত-সিদ্ধি। ভগবান্ অনন্ত; কিন্তু সেই অনন্তকে আমরা ক্ষুদ্র হৃদয়-পিঞ্জরে পুরিতে পারি না। সান্তকে পারি; সেই জন্য ভগবান সান্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তখন তাঁহার উপাসকের ভক্তি ও প্রেমের স্রোত শতগুণ বেগে বর্ধিত হইয়া তাঁহাতে আসিয়া মিলিত হয়। এইজন্য উপাসকের উপাস্ত-সিদ্ধি অবতরণের অস্ত কারণ। এতদসম্বন্ধে শ্রীমতী এনিবেসান্ট লিখিয়াছেন যে,—

“In order to draw out devotion then, an object which is attractive must be presented to man and we find such objects presented most completely in the revelations of the Supreme Self made through human form in the godmen who appear from time to time—the Avatars or divine incarnations. Such beings are rendered supremely attractive by the beauty of character which they manifest, by the rays of the self which shine through the human veil, imperfectly concealing their divine loveliness. When, He, who is beauty and love and bliss shows a little portion of Himself on earth

enclosed in human form the weary eyes of man light up, the tired hearts of men expand with a new hope and a new vigour. They are irresistibly attracted to Him. Devotion spontaneously springs up. * * * They render Deity attractive by softening. Its dazzling radiance into a light that human eyes can bear, as it shines through a veil of humanity. They limit the divine attributes till they become small enough for the human intelligence to grasp. These stand as objects of devotion attracting love by their perfect loveableness; they only need to be seen to be loved; when they are not loved it is merely because they are not seen.”—

Theosophical Review.

আমরা পূর্বোক্ত বাক্যগুলির সত্য মহাত্ম্য হইতে উপলব্ধি করিয়া থাকি। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি যখনই শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তখনই তাঁহাদের ভক্তি ও প্রেমের স্রোত তাঁহার দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। অবতারেরা এইরূপেই উপাস্য সিদ্ধি করিয়া থাকেন। এই তিনটি কারণের জন্যই ভগবান অবতরণ করিয়া থাকেন।

ভগবানের অধিষ্ঠিত জগতে ধর্মের গ্লানি কেন হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে তিনটি বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথম, আমরা অবগত আছি যে, ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রগল। যখন গুণ সকল ক্ষুণ্ণ হইয়া, অর্থাৎ যখন, সেই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে, তখন সৃষ্টি আরম্ভ হইয়া থাকে। এই বিচ্যুতির কালে প্রথমে রজোগুণ প্রকাশ পায়। বীজে জল-সেচনের জায়, রজোগুণ প্রবর্তিত হইলেই সত্য ও তমঃ বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়া জল হইয়া উঠে। তাহা হইতে ক্রমশঃ সৃষ্টি হইতে

থাকে। সবঃ, রজঃ ও তমঃ সম্বন্ধে পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে—“প্রকাশ ক্রিয়া স্থিতিশীলং ভূতৈজিয়াস্বকং” পা ২। স্ব ৮—অর্থাৎ সর্বের স্বভাব প্রকাশ, রজের স্বভাব ক্রিয়া ও তমের স্বভাব স্থিতি; ভূতরূপে এবং ইন্দ্রিয়রূপে ইহাদের পরিণাম হয়। গুণত্রয়ের মধ্যে যখন যে গুণটি প্রধান হয়, তখন তাহারই বৃত্তি বিশেষ রূপে অভিযাক্ত হইয়া থাকে, যেমন দেবশরীর উৎপন্ন হইলে তাহাতে সৰ্ব-গুণ প্রধান, রজঃ ও তমোগুণ তাহার অঙ্গ; মনুষ্য শরীরে রজোগুণ প্রধান, সৰ্ব ও তমোগুণ তাহার অঙ্গ; পশু পক্ষীর শরীরে তমোগুণ প্রধান, সৰ্ব ও রজঃ তাহার অঙ্গ। ব্যষ্টি সম্বন্ধে বাহ্য বস্তব্য, সমষ্টি সম্বন্ধেও তাহা উল্লিখিত হইতে পারে। এই জগতে যখন তমোগুণ বৃত্তি পাইয়া রজোগুণের সাহায্যে সৰ্বকে চাপা দিয়া ফেলে অর্থাৎ যখন সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশশীল ধর্মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, তখন ক্রমবিকাশ (Evolution) স্থগিত থাকিবার আশঙ্কা হইয়া থাকে। ধর্মশ্রানির ইহা একটি কারণ। এই সময়েই ভগবান অবতীর্ণ হইয়া শক্তির সামঞ্জস্য করিয়া ক্রমবিকাশের গতি বর্দ্ধিত করিয়া দেন। প্রকৃতির গুণ সামঞ্জস্য রক্ষা করাকে ভগবানের অবতরণের প্রথম কারণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

ষষ্ঠীয়তঃ আমরা নিম্ন জৈবিক রাজ্যে দেখিতে পাই যে, উহার ক্রমবিকাশ নিয়মে আবদ্ধ। এই নিয়মের বাহিরে নিয়ন্ত্রণীর জীবেরা যাইতে পারে না। এই নিয়মের বাহিরে যদি তাহারা যাইতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাদের ধ্বংস অবশ্যজ্ঞাবী। কিন্তু মনুষ্যের ক্রমবিকাশ এইরূপ নহে। ভগবান তাহাকে পুরুষকার (freewill) বা স্বাধীন

ইচ্ছা দিরাছেন, তাহাকে সদস্য প্রকৃতি দিরাছেন। সং অথবা অসং পথে যাইবার তাহার তুল্য অধিকার। সে মনে করিলে ক্রমবিকাশের গতিকে বাধা দিতে পারে, অথবা ঐ গতির অন্তকূলে চলিতে পারে। অসংপথে যাইয়া ক্রমবিকাশকে বাধা দিতে যাইলে যে তাহার ক্রমোন্নতি স্থগিত হইয়া যাইবে, ইহা সে ঘাত প্রতিঘাত পাইয়া শিক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু এক এক সময়ে এমন হইয়া থাকে যে, অনেক মনুষ্যের অসং ইচ্ছার সমষ্টি প্রবল শক্তি ধারণ করিয়া মনুষ্যের ক্রমবিকাশকে বাধা দিবার উদ্যোগ করিয়া থাকে। এই সময়ে ধর্মের মানি হইয়া থাকে। তখন অবতারের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহার শক্তি তখন উক্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাভূত করিয়া মনুষ্যের ক্রমবিকাশের বেগ বর্দ্ধিত করিয়া দেন।

তৃতীয়তঃ, পৃথিবী যখন পাপের ভার আর সহ্য করিতে পারেন না, যখন জীবগণ পাপের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে, যখন ভক্তের আকুল ক্রন্দন বৈকুণ্ঠে পৌছায়, তখনই ভগবান অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাহাকে না ডাকিলে (without call) তিনি অবতীর্ণ হন না। দেবতার বৈকুণ্ঠে গিয়া ক্রন্দন করিয়া বলেন “হে জগদীশ! অসুরগণের হস্ত হইতে আমাদের রক্ষা করুন।” সুরও তাঁহার সৃষ্টি, অসুরও তাঁহার সৃষ্টি; দেবও তাঁহার সৃষ্টি, রাক্ষসও তাঁহার সৃষ্টি; সংও তাঁহার সৃষ্টি, অসংও তাঁহার সৃষ্টি; তাঁহার রাজ্যে উভয়েরই স্থান নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু যখন সং অসং কর্তৃক পরাজিত হয়, যখন সুর অসুর কর্তৃক, দেবতার রাক্ষস কর্তৃক পরাজিত হন, তখনই ধর্মের

মানি হয়, তখনই ভগবান অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ।

পূর্বোক্ত তিনটি কারণে ভগবানের অধিষ্ঠিত জগতে ধর্মের মানি হইয়া থাকে । ধর্মের মানি হইলেই ভগবান অবতীর্ণ হইয়া থাকেন । আমরা লৌকিক জগতে দেখিতে পাই যে, কোন স্থানে শান্তি নষ্ট হইলে যেমন লৌকিক রাজা শান্তি সংস্থাপনের জন্ত স্বয়ং মিত্রাদি সহ সেই স্থানে আবির্ভূত হইয়েন, সেই প্রকার আধ্যাত্মিক জগতেও ধর্মের মানি প্রভৃতি হইলে ভগবান সাক্ষাৎসহ আবির্ভূত হইয়া শান্তি সংস্থাপন করিয়া থাকেন ।

(জ) অবতারের সংখ্যা ।

শাস্ত্র কাহাকেই বা অবতার বলিয়াছেন এবং কাহাকেই বা অবতার বলেন নাই, সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি । এখন অবতারের প্রকার সম্বন্ধে নিম্নে আলোচিত হইল । চৈতন্যচরিতামৃতে পাঁচ প্রকার অবতারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—

“পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর ।

গুণাবতার আর, মনস্তরাবতার আর ।

যুগাবতার, আর শক্ত্যবেশাবতার ॥”

নিম্নে প্রত্যেক প্রকার অবতারের লক্ষণ উদ্ধৃত হইল ।

১। পুরুষাবতার —

“সেইত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার । * * *

সেই পুরুষ (প্রথম) বিরজীতে করেন শয়ন ।

কারণাক্রিয়াদি নাম জগত কারণ ॥

কারণাক্রি পাবে মায়ার নিত্য অবস্থিতি ।

বিরজার পাবে পরব্যোম নাহি গতি ॥ * * *

হিরণ্যগর্ভ অন্তর্যামী গর্ভোদকশাস্ত্রী ।

সহস্র শীর্ষাদি করি বেদে যারে গায়ী ॥

এই দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর ।

মায়ার আশ্রয় হয় তবু মারা পার ॥ ।

তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু গুণ অবতার ।

দুই অবতার ভিতর গণনা তাহার ॥

বিকট বাষ্টি জীবের তিহৌ অন্তর্যামী ।

কীরোদকশায়ী তিহৌ পালনকর্তা স্বামী ॥

২। লীলাবতার —

“মৎস্য কুর্ষ রঘুনাথ নৃসিংহ বামন ,

বরাহাদি লেখা যার না পার গণন ॥”

৩। গুণাবতার —

“ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণ অবতার ।

ত্রিগুণাদী করি করে সৃষ্টাদি ব্যবহার ॥”

৪। মনস্তর অবতার,—

“ব্রহ্মার একদিনে হয় চৌদ মনস্তর ।

চৌদ অবতার তাহা করেন ঈশ্বর ॥”

৫। যুগাবতার,—

“সত্য জ্যোতা স্বাপর কলি যুগের গণন ।

গুরু কৃষ্ণ রক্ত পীত ক্রমে চারি বর্ণ ।

চারি বর্ণ ধরি কৃষ্ণ করেন যুগধর্ম ॥”

৬। শক্ত্যবেশাবতার,—

“শক্ত্যাবেশ দুইরূপে গৌণ মুখ্য দেখি ।

সাক্ষাৎ শক্ত্যে অবতার আবাস বিভূতি লেখি ॥

সনকাদি নারদ পৃথু পরশুরাম ।

জীবরূপ ব্রহ্মার আবেশাবতার নাম ॥

বৈকুণ্ঠে শেষ ধরা ধরয়ে অনন্ত ।

এই মধ্যাবেশাবতার বিস্তারে নাই অন্ত ॥

সনকাত্মে জ্ঞানশক্তি নারদে শক্তি ভক্তি ।

ব্রহ্মার সৃষ্টি শক্তি অনন্তে ভূধারণ শক্তি ॥

শেষে স্বসেবন শক্তি পৃথুকে পালন ।

পরশুরামে দৃষ্ট নাশ বীৰ্য্য সঞ্চারণ ॥”

নিম্নলিখিত অবতার গুলিকে ভাগবত

লীলাবতার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ;

যথা—বরাহ, বজ্র, কপিল, দত্তাত্রেয়, কুমার

চতুর্দেব, নর-নারায়ণ, জব, পৃথু, ঋষভ, হর-

গ্রীব, মৎস্য, কুর্ষ, নৃসিংহ, হরি, বামন, হংস,

ধনুর্জয়, পরশুরাম, অীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বাসু,

বুদ্ধ এবং কাকি। অস্ত্রায় নারদকেও লীলা-
বতীরের ভিতর ধরা হইয়াছে। উক্ত পঞ্চ-
বিংশটি অবতারকে লীলাবতার বলে।

মহত্তর অবতারের মধ্যে আমরা নিম্ন
লিখিত নামগুলি পাইয়া থাকি। যথা—
যজ্ঞ, বিষ্ণু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত,
বামন, সার্কভোম, ঋষভ, বিষ্ণু সেন, ধর্মকেতু
সুধামা, যোগেশ্বর এবং ব্রহ্মহু। পূর্বে যজ্ঞ
এবং বামনের নির্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং
মহত্তরাবতারের সংখ্যা দ্বাদশটি মাত্র।

বর্ণ এবং নাম দ্বারা হিঃ সত্যযুগে শুরু,
ত্রৈতায় রক্ত, দ্বাপরে শ্রাম এবং কলিতে কৃষ্ণ
বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

কল্লাবতার পঁচিশটি, মহত্তরাবতার দ্বাদশটি
এবং যুগাবতার চারিটি। সমুদায়ে এক-
চত্বারিংশ অবতার কথিত হইয়াছেন।

অবতার সমূহকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবত
বলিয়াছেন যে,—

“অবতারা হুসংখ্যোহা হরেঃ সত্বনির্ধেদ্বিজ্ঞাঃ।

যথা বিদ্যাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যাহস্রশঃ।”

১. ৩২৬

অর্থাৎ যেমন ক্ষয়শূন্য সরোবর হইতে
সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র নালী নির্গত হয়, সেইরূপ
সত্বনির্ধেদ্বিজ্ঞা হরি হইতেও অসংখ্য অবতার প্রা-
ভূত হন। বিরাট পুরুষ এই সকল অবতারের
অব্যয় বীজস্বরূপ।

(বা) অসংখ্য অবতারের মধ্যে

দশটির নামোল্লেখের কারণ।

পূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, অবতারের
সংখ্যা অসংখ্য। কিন্তু সাধারণতঃ অবতার
বুলিলে মংস্ত কুর্ষ বরাহ প্রভৃতি দশটি অব-
তারকে বুঝাইয়া থাকে। এইরূপ বুঝাইবার
কারণ কি? অসংখ্য অবতারের মধ্যে অব-
তার বলিলে দশটিকেই বা লক্ষ্য করা কেন
হয়?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন।

শাস্ত্রে এতদস্বক্কে কিছু উল্লিখিত হয় নাই।

শ্রীমতী এনিবেসাক্টের মত এই যে—“They
mark stages in the evolution of the
world. They mark new departures
in the growth of the developing

life.” অর্থাৎ এই দশটি অবতার পৃথিবীর

ক্রমবিকাশের স্তরকে নির্দেশ করিতেছেন;

জীবের উন্নতিস্বরূপ নূতন পর্যায় নির্দেশ করিতে-

ছেন। কিন্তু অস্তান্ত শাস্ত্রবিদেরা বলেন যে,

মংস্তাদি দশটি বিষ্ণুর অবতার এবং কপিল,

ঋষভ, দত্তাত্রেয়, ব্যাস, প্রভৃতি অপর সকলে

সিদ্ধ নির্বাণ-প্রাপ্ত পুরুষ। যদি কোন কল্পে

কোন জীব উপাসনা বলে অবতারের অধি-

কার গ্রহণ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে

আর দ্বিতীয় পুরুষকে অর্থাৎ বিরাট পুরুষকে

(Solar Logos) অবতার গ্রহণ করিতে

হয় না। কপিল, ঋষভ, দত্তাত্রেয়, ব্যাস প্রভৃতি

অধিকারী পুরুষ ছিলেন বলিয়া প্রয়োজন

অনুসারে তাঁহারা অবতার হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পুরুষকে আর তখন স্বয়ং অবতার

হইতে হয় নাই। ইহাদিগকে কলাব-

তার বলা হইয়া থাকে। যখন যুগধর্মের

ইহাদের অপেক্ষা উচ্চ অধিকারীর প্রয়োজন

হয়, তখন দ্বিতীয় পুরুষ ঋষভদ্বীপের নারায়ণের

দ্বারা (through the Planetary Logos) অবতীর্ণ

হইয়া থাকেন। তখন তাঁহাকে

অংশাবতার বলা হয়। কিন্তু যখন যুগধর্মের

জন্ত বিশেষ কোন প্রয়োজন হয়, তখন দ্বিতীয়

পুরুষ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের

সময় তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

এইজন্য ‘শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ অবতার বলে। শাস্ত্রে

উল্লিখিত হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

এইজন্য অসংখ্য অবতারের মধ্যে কেবলমাত্র

দশটিকে বিষ্ণুর অবতার বলা হয়।

(এ) অবতার বহু কেন ?

অবতারের বহুত্ব সৰ্ব্বত্র বৈক্যবেরা নিরোক্ত প্রকারে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, ভগবানের রাজত্বে জীব-সকল বিভিন্ন রুচির। কেহ জ্ঞান ভালবাসে, কেহ ভক্তি ভালবাসে, কেহবা বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ ভালবাসে। সুতরাং ভিন্ন রুচিসিদ্ধার্থ এবং ভিন্ন প্রয়োজন সিদ্ধার্থ ভগবান বহু সংখ্যায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। বাঁহারা জ্ঞান ভালবাসেন, তাঁহারা দত্তাত্রেয়, ব্যাস অথবা বুদ্ধের উপাসনা করিবেন, বাঁহারা ভক্তি ভালবাসেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করিবেন, বাঁহারা পিতৃভক্তি প্রভৃতি সদগুণের আদর্শ ভালবাসেন, তাঁহারা রামচন্দ্রকে উপাসনা করিবেন। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ঐ সকল অবতার মূলতঃ এক। যেমন চতুর অভিনেতা বহুবিধ নৈপথ্য (parts) ধারণ করিলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বস্ত্ততঃ সে একই ব্যক্তি; অথবা যেমন বৈদ্যুতমণিতে (opal) বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি সকল অংশ দেখিতে পায়, সে বুঝিতে পারে যে সকল প্রকার বর্ণ তাহাতে সমন্বিত, সেই প্রকার অবতার বহু হইলেও উঁহারা মূলতঃ এক।

(ট) অবতারের লক্ষণ।

শাস্ত্রে অবতারগণের নিম্নলিখিত লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা,—
“অয়ং নেতা সুরম্যাজঃ সর্গসঙ্গলক্ষণাধিতঃ।
রুচিরন্তোজসা মুক্তো বলীমান্ বরদাধিতঃ।
বিবিধাভূতভাবাবিং সত্যবাক্যঃ প্রীর্ষদঃ।
বাবদুকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভাধিতঃ।
বিদগ্ধশক্তুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদূতব্রতঃ।
দেশকাল সুপাজ্জঃ শাস্ত্র চক্ষুঃ শুচির্দর্শী।

স্থিরেন্দ্রাঙ্গ ক্রমাশীলো গন্তরোত্ততিমান্ সমঃ
বদাভো ধার্মিকঃ শূরঃ করুণো মন্ত্রমানকঃ।
দক্ষিণো বিনয়ী হীমান্ শরণাগত পালকঃ।
সুখী ভক্তহৃদয়ঃ প্রেমবন্তঃ সর্বগুণভরঃ।
প্রতাপী কৌশিমান্ রক্তলোকঃ সাধু সমাশ্রয়ঃ।
নারীগণ মনোহারী সর্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্।
বরীমানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তত্মাকীর্তিভাঃ।
সদাস্বরূপ সম্প্রাপ্তঃ সর্বজ্ঞো নিত্য নূতনঃ।
সচ্চিদানন্দ সাক্ষাৎ সর্বসিদ্ধি নিবেদিতঃ।
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ।
অবতারাবলীবিজ্ঞং হতারি গতিদায়কঃ।
আত্মারাম গণাকর্ষ্যাত্মাক্ষেপে কলাভূতাঃ।
সর্বাভূতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ।
অতুল্য মধুর প্রেমমণ্ডিত প্রিয়মণ্ডলঃ।
ত্রিগুণ মানসাকর্ষ্য মুরলীকলকুঞ্জিতঃ।
অসমানোর্জরূপশ্চৈ বিশ্রামিতচর্যচরঃ।
লীলা প্রেমাপ্রিয়াধিক্য মাধুর্যে বৈকুণ্ঠপয়োঃ।
ইত্য সাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্ত চতুষ্টয়ঃ।
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদা শ্চতুঃষষ্টি রূদাশ্চতঃ।” *

ইহার অনুবাদ অনাবশ্যক।

(ঠ) দশ অবতারের বিবরণ।

আধুনিক কালে অনেকেরই অবতারবাদ মানেন না; কিন্তু বাঁহারা মানেন, তাঁহারা বক্রিম বাবুর সহিত বলেন যে, কেবল শ্রীকৃষ্ণই অবতার হইয়াছিলেন; মৎস্য, কুর্শ, বরাহ, প্রভৃতি রূপক মাত্র। এইরূপ বলিবার কারণ আর কিছুই নয়, তাঁহারা কেবল ভাবেন যে, ভগবান কখন ঐরূপ নিকট জীব অবতীর্ণ হইতে পারেন না। কিন্তু মহা অহঙ্কারে ক্ষীত হইয়া বিশ্বস্ত হইয়া যার যে, ভগবানের নিকট সকলই সমান। সামান্য তুণ হইতে উচ্চ দেবতা পর্যন্ত সকলই সেই ভগবানের বিকাশ। সুতরাং ভগবান যে কেবল এক

* লক্ষকরুণমঃ হইতে উদ্ধৃত।

জীবের আকার পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হইবেন এবং অল্প জীবের আকার পরিগ্রহ করিবেন না, ইহা ঠিক নহে। আমরা যদি অবতারের আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, ভূতত্ত্ব অল্পসারে (Geologically) অবতারের প্রণালী সম্ভবপর। সৃষ্টিপর্যায়ের আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রথমে মৎস্ত-যুগ (Silurian Age) ছিল। সেই সময়ে যদি কোন অবতার সম্ভব হয় তো মৎস্ত অবতার। কূর্ম অবতার ঐ প্রকারে Amphibian evolution এর এবং বরাহ অবতার Mammalian evolution এর পথপ্রদর্শক। পৃথিবীও ক্রমশঃ জলীয় অবস্থা হইতে কঠিন অবস্থা ধারণ করিতেছিল এবং এই সময়ে Lemurian মহাদেশ আবির্ভূত হয়। তখন অর্দ্ধেক পশু এবং অর্দ্ধেক নরাকৃতি নরসিংহ অবতার আবির্ভূত হন। তার পর বিকৃত মানব মূর্তি বামন অবতীর্ণ হন। তার পর Lemurian মহাদেশ ধ্বংস হইয়া Atlantic মহাদেশের আবির্ভাব হয়; তখন সৃষ্টির ক্রমবিকাশ অল্পসারে আমরা পরস্পরামকে মনুষ্যাকারে দেখিতে পাই বটে কিন্তু রামচন্দ্রে মনুষ্যাকারের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। তার পর Atlantic মহাদেশ ধ্বংস হইয়া যায় এবং পৃথিবী আধুনিক আকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং ভূতত্ত্ব অল্পসারে (Geologically) যে দশটা অবতার সম্ভবপর, তাহা অবগত হওয়া বাইতেছে। যে সময়ের যেরূপ অবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল, সেই সময়ে আমরা সেইরূপ অবতার দেখিতে পাই।

পূর্বোক্ত অবতারগুলির আলোচনা করিলে আমরা আরও অবগত হই যে, যে যুগের বাহা চরম উন্নতি, তাহা সেই যুগের অবতারে

কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে। কবি নবীনচন্দ্র কবির ভাষায় এইরূপ লিখিয়াছেন:—

“যুগউপযোগী

চরম উন্নতি অবতারণ যখন

ঘটিয়াছে, সে যুগের সেই অবতার।

প্রথম সলিলে, মৎস্ত। এই নীতি বলে

সলিল পঙ্কিল হবে, কূর্ম অবতার।

পক্ষ দৃঢ়তর হবে, আচ্ছন্ন উদ্ভিদে,

হইল বরাহ-সৃষ্টি। প্রাণীর শৃঙ্খল

ক্রমশঃ উন্নতিচক্রে হস্রে দীর্ঘতর,

নরসিংহ অবতার। বিশ্বয় মূর্তি!—

অর্দ্ধ পশু অর্দ্ধ নর, ক্রমে পশু ভাগ

তিল তিল যুগে যুগে হইয়া অন্তর

বিকৃত মানব মূর্তি জন্মিল বামন।

তিন পদ ভূমি নাহি মিলিল তাহার,—

জগৎ অরণ্যময়! হিংস্র-জন্তু-বাস।

ঘুরিল উন্নতি-চক্র,—সকুঠার কর

আসিলা পরস্পরাম। বাধিল সময়

বন, বনচর সহ; নাহি শরীরেতে

পশু ভাগ, পশু বৃত্তি হৃদয়ে প্রবল,—

পশু নির্বিশেষে নর! সেই পশু ভাব

যে দিন হইতে হ্রাস হইতে লাগিল,

সেই দিন জগতের যুগ বর্তমান

হইল সঞ্চার। সেই দিন মহাদিন।

প্রকৃত মানব জন্ম হইল সে দিন।

অভ্রান্ত উন্নতি পক্ষে আসিল কৈশোর,

কৈশোরের রামচন্দ্র গীতি অবতার,—

ত্রৈত্য চরমোন্নতি।”—রৈবতক, ষাটশ সর্গ।

এই প্রকারে আমরা ষাপরের চরমো-

ন্নতি ত্রীকোণে এবং কলির চরমোন্নতি বুঝে

দেখিতে পাই।

অবতারের সংখ্যা কীর্তন করিতে গিয়া

আমরা পূর্বে যে একচত্বারিংশ অবতারের

কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে মহাবতার

ও যুগাবতার ভিন্ন আর সকলেই প্রায় প্রতি
কয়েকই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। আমরা
পুরাণ হইতে অশ্বগত হই যে, সকল কল্পই এক,
তবে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় কখন বা কেহ কেহ
কোন অংশে বিভিন্ন হইয়া থাকেন।

পূর্বোক্ত দশটি অবতারের বিবরণ সক-
লেই অবগত আছেন, এই জন্ত সংক্ষেপে
তীহাদের বিষয় নিয়ে উল্লিখিত হইল।
শ্যাম পাঠে আমরা অবগত হই যে, চতুর্দশ
মহন্তরে এক কল্প হয়। উক্ত চতুর্দশ মহন্ত-
রের ভিতর সায়জুব মহন্তরে বরাহ এবং
মৎস্য অবতার হইয়াছিলেন। পরে চাক্ষুষী
অর্থাৎ ষষ্ঠ মহন্তরে বরাহ ও মৎস্যের পুনরা-
বির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণু ধর্মোত্তরে
প্রতি মহন্তরে মৎস্যাবতারের কথা আছে।
ষষ্ঠ মহন্তরে নৃসিংহ ও কুর্মেয় আবির্ভাব হই-
য়াছিল। ষষ্ঠ মহন্তরে সমুদ্র মন্থনের পূর্বেই
নৃসিংহ অবতার হইয়াছিল; সুতরাং চাক্ষুষ
মহন্তরীয় কুর্মাদি অবতারের পূর্বেই নৃসিংহের
অভিব্যক্তি হইয়াছিল। এখন সপ্তম মহন্তর
অর্থাৎ বৈবস্বত মহন্তর চলিতেছে। এই
মহন্তরের বাসনা দি ছয়টি অবতার। ইহার
যে সকলে একই চতুর্গে হইয়াছেন বা হইবেন,
তাহা নহে। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে,
বামনদেব এই বৈবস্বত মহন্তরে দুইবার
আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পরশুরামকে কেহ
এই মহন্তরের সপ্তদশ চতুর্গের এবং কেহবা
ষাণ্শ চতুর্গের অবতার বলিয়া থাকেন।
কিন্তু রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধদেব এবং কলি বর্ত-
মান চতুর্গেরই অবতার।

অবতারগণের আবির্ভাবের সময় সম্বন্ধে
বিশেষ মিল না থাকিলেও মোটামুটি হিসাবে
এইরূপ বলা হইয়াছে যে, মৎস্য, কুর্মা, বরাহ
ও নৃসিংহ সত্যযুগের অবতার, বামন, পরশু-

রাম ও রামচন্দ্র ত্রেতার অবতার। শ্রীকৃষ্ণ
দ্বাপরের অবতার এবং বুদ্ধ ও কলি কলির
অবতার।

মৎস্য অবতার সম্বন্ধে ভাগবতে উল্লিখিত
হইয়াছে যে,—“সেই পুরুষ চাক্ষুষ মহন্তরের
অবসানে সমুদ্র প্রাবনে, মৎস্যরূপের আবিষ্কার
পূর্বক পৃথিবীয়া নৌকাতে ভাবী বৈবস্বত
মহু রাজা সত্যযুগকে আরোহণ করাইয়া রক্ষা
করিয়াছিলেন।” (১।৩।১৫)।

কুর্মা অবতার সম্বন্ধে ভাগবতে উল্লিখিত
হইয়াছে যে,—“যৎকালে দেবাহুরে মিলিত
হইয়া সমুদ্র মন্থন করেন, তৎকালে ভগবান্
অজিত কুর্মরূপ পরিগ্রহ পূর্বক পৃষ্ঠদেশে
মন্দরাচল ধারণ করিয়াছিলেন।” (১।৩।১৬)

বরাহ অবতার সম্বন্ধে ভাগবতে এইরূপ
উল্লিখিত হইয়াছে যে,—“এই বিশ্বের মঙ্গলার্থ
রসাতল-গামিনী পৃথিবীর উদ্ধার করিবার
জন্ত, ভগবান্ যজ্ঞেশ্বর বরাহমূর্তির আবিষ্কার
করিয়াছিলেন।” (১।৩।১৭)

নৃসিংহ অবতার সম্বন্ধে ভাগবতে উল্লিখিত
হইয়াছে যে,—ভগবান্ অত্যাশ্চিত্ত নারসিংহ-
বপুঃ প্রকটন পূর্বক কটধারী (যে মাদ্র
প্রস্তত করে) যেমন এরককে (তৃণবিশেষকে)
বিদারিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ হিরণ্য কপি-
পুকে উদ্ধদেশে নিশাণ্ডিত করিয়া নথ দ্বারা
বিদারিত করিয়াছিলেন।

বামন অবতার সম্বন্ধে ভাগবতে উল্লিখিত
হইয়াছে যে,—“ভগবান্ বামনরূপ প্রকটন
পূর্বক স্বর্গের পুনগ্রহণ মানসে বলির নিকট
ত্রিাদ পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করিয়া তাঁহার
যজ্ঞে গমন করেন।” (১।৩।১৯)।

পরশুরাম সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—
“কলিযুগকে ব্রাহ্মণ বিশেষী জানিয়া, ভগবান্
পরশুরাম রূপে অবতীর্ণ হইয়া, ক্রোধভরে

একবিংশতিবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয় শূন্য করিয়া ছিলেন ।” (ভাগবতঃ—১।৩।১০)

রামচন্দ্র সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—
“ভগবান্ দেবকার্য্য-সামান্য রামরূপে নর-
দেবত্ব প্রকটন করিয়া সমুদ্র বহুনাদিক্রপ-
অসাধারণ প্রভাব দেখাইয়াছিলেন ।” (ভাগ-
বতঃ—১।৩।২২)

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচিত হই-
য়াছে ; হুতবাং এখানে বিশেষ কিছু উল্লেখ
করা নিম্নয়োজন ।

বুদ্ধসম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে । এতদ্
সম্বন্ধে শ্রীমতী এনিবেসান্ট লিখিয়াছেন যে—

“He was the first of our own
humanity who climbed upwards to
that point, and there merged in the
Logos and received full illumina-
tion. His was not a body taken
by the Logos for the purpose of
reverting Himself, but was the last
of myriads of births through which
he had climbed to merge in Nirvana
at last. That is not what is nor-
mally spoken of as an Avatar,
though, you may say, the result truly
is the same. But in the case of the
Avatar the evolving births are in
previous kalpas and the Avatar
comes after the man has merged in
the Logos and the body is taken
for the purpose of revelation. But
He who is Gautama Buddha had
climbed through birth after birth
in our own kalpa, as well as in the
kalpas that were before. * * *
Finally by his own struggles the
very first of our race, He was able
to reach that great function in the
world * * * The previous Buddhas
had been Buddhas who came from
another planet. Humanity had not
lived long enough here to evolve its
own son to that height. Gautama
Buddha was human born”—Avatar
p. 86.

বৌদ্ধধর্মের কি আছে এবং কি নাই,
তাঁহা অবগত হওয়া উচিত । “বৌদ্ধধর্মের
আছে অসংখ্য, নাই অসংখ্যসংকারিতা ।

আছে বাসনাভ্যাগ, ব্রহ্মাণ্ডনাশ, আছে
নির্কাম, নাই নির্কামের অবশেষ । আছে
প্রকৃতির উপর কটাক্ষ, নাই পুরুষের কেবলতা ।
আছে মায়্যা-ভ্যাগ, নাই স্বরূপাবস্থিতি ।
আছে পরিণাম-জ্ঞান, নাই অপরিণামী । ফল
—বাসনাভ্যাগ দ্বারা, ধর্ম আচরণ দ্বারা
ঐশ্বর্যালাভ ও উচ্চলোকে গমন । কিন্তু
উচ্চাদপি উচ্চলোক, ক্রমে ব্রহ্মলোক গমন
করিয়া, ব্রহ্মলোকেই বাসনা ভ্যাগদ্বারা
ব্রহ্মলোক হইতে মুক্ত হইলে ভবিষ্যৎ শূন্যময় ।
ফল, যোগমার্গের পুনরুদ্ধার, যোগের বিস্তৃতি-
লাভ, পরে যোগদ্বারা নির্কাম মুক্তি । কিন্তু
নিরীশ্বর ব্রহ্মজ্ঞান রহিত প্রকৃতির ক্ষণিক
বিজ্ঞান দ্বারা শূন্য চিন্তক ব্যক্তির বাসনা নাশ
কোথায় ? কিসের জন্ত বাসনা নাশ ? শূন্য-
দর্শীর প্রয়োজনই বা কি, অপ্রয়োজনই বা
কি ? বাসনার স্মৃতি কুঠারাবাত করিলে,
মল্লম্বের চরমলাভ হয় বটে, কিন্তু সে কি শূন্য-
লাভ ? বুদ্ধদেব যদিও শূন্য বলেন নাই,
তথাপি তিনি কিছুই বলেন নাই । তাঁহার
ধর্ম Metaphysics নাই, Absolute
Reality নাই, Thing-in-itself নাই ।
বাসনা ভ্যাগ তবে কিসের জন্ত ? কেবলমাত্র
হুংখনাশের জন্য ; আনন্দ প্রাপ্তির জন্ত নহে ।
হুংখময় জীবন বরং ভাল, নাশের চিত্র ভয়ঙ্কর ।
নির্কামের পর বুদ্ধদেব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করি-
লেন । তিনি পরম আনন্দ লাভ করিলেন ।
কিন্তু এক কথা ত শিকা দিয়া আসেন নাই ।
হুতবাং চিত্তের আবেগে তিনি পঙ্করাচার্য্য
হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন ।”*

গৌতমবুদ্ধের সাহায্য অবগত হইতে
হইলে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, বুদ্ধ
কাহার নাম নহে, উহা পদবী (title) মাত্র ।

বুদ্ধ কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইলে বোধিসত্ত্ব কাহাকে বলে, তাহা বোঝা উচিত। বোধিসত্ত্বের দুই প্রকার বিভাগ আছে — মানবীয় ও অমানবীয়। অমানবীয় বোধিসত্ত্বগণকে ধ্যানিবোধিসত্ত্ব বলে। তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন সংগ্রহ নাই। বোধিসত্ত্বের যথার্থ অর্থ হইতেছে যে, বাঁহ্যের সত্ত্বা বোধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যিনি কোন বুদ্ধের সংগ্রহে থাকিয়া পুণ্য কর্ম করিতে এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, জন্মান্তর তিনি বুদ্ধ হইবেন এবং উপস্থিত বুদ্ধ বাঁহাকে ভবিষ্যৎ বুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন, তিনিই বোধিসত্ত্ব। হীনযান বৌদ্ধদিগের মতে এই সময়ে কেবল মতে একজন বোধিসত্ত্বের অস্তিত্বের স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু মহাযান বৌদ্ধরা অনেক বোধিসত্ত্বের অস্তিত্বের স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু উভয় মতাবলম্বীরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, যিনি বুদ্ধের গৌতমবুদ্ধের উত্তরাধিকারী হইবেন, তাঁহার নাম মৈত্রেয়ী। কিন্তু অনেকে বোধিসত্ত্বের জন্ত চেষ্টা করিলেও, আমরা বোধিসত্ত্ব বলিলে তাঁহাকেই বুঝি, যিনি বুদ্ধের বুদ্ধ প্রাপ্তি হইয়া পরনির্বাণ লাভ করিবার পর হইতে নিজে যত দিন না বুদ্ধ প্রাপ্ত হইয়া পরনির্বাণ লাভ না করেন, তত দিন মহিমামণ্ডিত আধ্যাত্মিক পদে আকৃষ্ট থাকেন, তিনিই সেই সময়কার বোধিসত্ত্ব। এখন অনেকে বোধিসত্ত্বের বিবম ভাব মন্তকে বহন করিতেছেন বটে, কিন্তু বোধিসত্ত্ব বলিলে আমরা মৈত্রেয়কেই বুঝিয়া থাকি। গৌতম এই সময়কালে ৩৫ বৎসর বিচরণ করিয়া নির্বাণ লাভ করিবার পূর্বে বোধিসত্ত্ব ছিলেন। যেমন তিনি নির্বাণ লাভ করিলেন, অমনি তিনি বুদ্ধ হইলেন। বুদ্ধ দ্বিপাক্ষকের নিকট

ধনংগৌতম প্রতিজ্ঞত হইয়াছিলেন যে, তিনি ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবেন, সেই সময় হইতে বহু জন্ম ধরিয়া তিনি একজন বোধিসত্ত্ব হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর ধরিয়া (কোন পুরাকালে) তাঁহার পূর্ববর্তী বুদ্ধ কাম্পবধন এই পৃথিবী পরিত্যাগ করেন, সেই সময় গৌতম সেই মহিমা-মণ্ডিত পদে (mighty occult office) আকৃষ্ট হইলেন। সেই সময় হইতে তিনি বোধিসত্ত্ব বলিয়া প্রচারিত হইয়া থাকেন। তখন অনেক বোধিসত্ত্ব থাকিলেও বোধিসত্ত্ব বলিলে গৌতমকেই বুঝাইত। সেইরূপ এখন অনেক বোধিসত্ত্ব থাকিলেও এই সময়ের উপযোগী বোধিসত্ত্ব হইতেছেন মৈত্রেয়। তিনি মিত্রতার দ্বারা এই পৃথিবীকে বাধিয়া ফেলিবেন, ভালবাসার দ্বারা জগৎ হইতে ধরা-অর দূর করিবেন। চতুর্দিক হইতে এইরূপ ধ্বনি উঠিতেছে যে, তাঁহার আগমনের আর বেশী দেরি নাই।

আমরা লৌকিক রাজত্বে যেমন রাজা, অমাত্য এবং অন্তান্ত রাজপ্রতিনিধি কর্মচারীগণকে দেখিতে পাই, সেইরূপ, আধ্যাত্মিক জগতেও একজন ধর্ম নেতা (Minister of Religion) এবং তাঁহার প্রতিনিধিগণ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই অধিকারী পুরুষ; জন্মান্তর সাধনার দ্বারা অধিকার লাভ করিয়াছেন। নিজের নির্বাণের ভূষা আনন্দ তুচ্ছ করিয়া নির্মাণ-কার্য অবলম্বন করিয়া মহুগুণকে ক্রমবিকাশিত করিয়া উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছেন। যে সকল নির্মাণ-বিষয় সাধক মহুগুণের উন্নতির জন্য বহু-পত্রিকর হইয়া কার্য করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই ধর্মরাজ বা ধর্ম নেতা। তিনি ইহা লোকে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের উপযোগী

বিভিন্ন প্রকার ধর্ম প্রেরণ করিতেছেন। কখন তিনি স্বয়ং আসিয়া কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং কখন বা তাঁহার অমুচর প্রতিনিধিগণের মধ্যেও কাহাকে পাঠাইয়া নূতন নূতন ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বোদ্ধেরা এই ধর্ম-নেতাকে বোধিসত্ত্ব বলেন। এবং এখন যিনি ধর্মরাজ (Minister of Religion) রূপে বোধিসত্ত্বের আসনে বিরাজ করিতেছেন, তিনিই মৈত্রেয় বুদ্ধ। যিনি আধ্যাত্মিক জগতের আলোচনা করেন, তিনিই জানেন যে মৈত্রেয় বুদ্ধই,— সাধক যিশুর (Jesus) শরীর তিন বৎসর আশ্রয় করিয়া,—খ্রীষ্ট বলিয়া পরিচিত হইয়া খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এবং যাহারা আধ্যাত্মিক জগতের সংবাদ জানেন, তাঁহার বলিতেছেন যে, আর বেনী বিলম্ব নাই, মৈত্রেয় বুদ্ধ আবার এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন এবং একটী ধর্ম প্রচার করিবেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সাধকদের কাছেও এই কথা শুনা যাইতেছে যে, মহাপুরুষের অবতীর্ণ হইবার আর বিলম্ব নাই।

• পূর্বোক্ত আলোচনার দ্বারা বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের ভিতর কি প্রভেদ, তাহা আমরা অবগত হইলাম। যাহাকে আমরা গোষ্ঠম বুদ্ধ বলিয়া অবগত আছি, তিনি জন্মজন্মান্তর ধরিয়া বোধিসত্ত্বের পদে আসীন হইয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই পৃথিবীস্থ জীবের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথমে বুদ্ধ হইয়াছিলেন। এইজন্যই তাঁহাকে অবতারের মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে।

শেষ অবতার, কল্কি অবতার। যখন এই পৃথিবীর পাপের প্রবল স্রোত বহিবে, যখন ধর্মের মানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হইবে, তখন কল্কি' অবতীর্ণ হইয়া অধ-

র্মের নশ করিয়া পুণ্যের স্রোত প্রবাহিত করিবেন। তখন আবার পুণ্যময় সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। 'ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে—

“সুদর্শনোহগ্নিবর্ণ শীঘ্রন্তত মরুঃসুতঃ ॥

যোহসাবান্তে যোগসিদ্ধঃ কলাপগ্রামমাশ্রিতঃ ।

কলেরস্তে সূর্য্যবংশং নষ্টং ভাবয়িতা পুনঃ ॥”

(৯—১২—৬)

সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ; অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র। শীঘ্রের পুত্র মরু। এই মরু যোগসিদ্ধ হইয়া কলাপ গ্রামে অবস্থান করিতেছেন। সেইরূপ,—

“দেবাণিযোগমায়া কলাপ গ্রামাশ্রিতঃ

সোমবংশে কলৌ নষ্টে কৃতাদৌ স্থাপয়িষ্যতি ॥”

(৯—২২—১০)

দেবাণি যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া কলাপ গ্রামে বাস করিতেছেন। কলিতে চন্দ্র বংশ নষ্ট হইলে, তিনি আবার সত্যযুগের প্রারম্ভে ঐ বংশের পুনরুদ্ধার করিবেন।

“দেবাণিঃ শাস্ত্রনোভ্রাতা মরুশ্চেক্রাক্ষুবংশজঃ ।

কলাপ গ্রাম আগাতে মহাযোগ বলম্বিতো ॥

তাবিহত্য কলেরস্তে বাসুদেবানু শিক্ষিতো ।

বর্ণাশ্রমযুতঃ ধর্ম্যঃ পূর্ববৎ প্রথয়িষ্যতঃ ॥

(১২—২—৩৮)

অর্থাৎ, শাস্ত্রমূর ভ্রাতা দেবাণি এবং ইক্ষুক বংশজ মরু মহাযোগাবলম্বিত হইয়া কলাপ গ্রামে বাস করিতেছেন। স্বয়ং বাসুদেব ত্রীকূট তাঁহাদের শিক্ষক। কলির অন্তে তাঁহার আমাদের মধ্যে প্রকট হইয়া পূর্ববৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম স্থাপিত করিবেন।

তাঁহাদের মধ্যেই একজন কল্কি হইয়া অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহার নির্দেশিত পথ অবলম্বন করিয়া জগৎ উন্নতির অভিমুখে ধাবমান হইবে। তাঁহার করুণার এখন জগৎ ব্যাপিত রহিয়াছে।

এই সকল অবতারগণের উল্লেখ করিয়া ভাগবত কার লিখিয়াছেন যে—“এতে চাংশ-বলাঃ পুং সঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্।” শ্রীধর স্বামী ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—কোন কোন অবতার পরমেশ্বরের অংশ। কোন কোন অবতার তাঁহার বিভূতি। মৎস্য আদি অবতার সর্বত্র ও সর্বশক্তি-সম্পন্ন হইলেও, তাঁহারা কেবল মাত্র আত্মকার্য্যোপযোগী জ্ঞান ও ক্রিয়াক্ষমতার পরিচয়

দিয়াছিলেন। কুমার চতুর্দশ এবং নারদাদির মধ্যে যিনি যেরূপ অধিকারী, তাঁহার মধ্যে সেইরূপ ঈশ্বরত্বের অংশও কলারূপে আবেশ। কুমার আদিতে জ্ঞানের আবেশ এবং পৃথু আদিতে শক্তির আবেশ। কিন্তু ত্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ নারায়ণ। কারণ তাঁহাতে সকল শক্তিই আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

সমাপ্ত।

শ্রী আশুতোষ দেব।

মানব সমাজ। (৬)

সমাজের শিক্ষা সমাজের কর্মোপযোগী হওয়া আবশ্যিক। সমাজের কর্ম চতুর্বিধ। (১) অব্যয়ন, অধ্যাপন, (২) দেশরক্ষা, (৩) কৃষি বাণিজ্য, (৪) সেবা। এই সকল কর্মোপযোগী শিক্ষা না থাকিলে সমাজ টিকিতে পারে না। শিক্ষা ভাব-প্রধান ও কর্ম-প্রধান। এতদ্ব্যতীত শ্রেণীরই উচ্চ শিক্ষা এখন আর বর্ণমালার সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। আর, উচ্চ শিক্ষাও সমাজের অতি অল্পাংশ ব্যক্তিরই আয়ত্ত্ব।* সুতরাং বর্ণমালার সাহায্যে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্রূপ উচ্চশিক্ষা অল্পসংখ্যক ব্যক্তিগণই অধুনা গ্রহণ করিবেন। অপরে কর্ম-প্রধান শিক্ষার যে অংশ বর্ণমালার সাহায্য গ্রহণ করে না, তাহারই অমূল্যগণ করিবেন। অল্পাংশের নিমিত্ত ভাবময় উচ্চশিক্ষা; অধিকাংশের সম্বন্ধে কর্ম-প্রধান নিম্নশিক্ষা। ইহাই সমাজ শিক্ষার প্রকৃত বিধান, আর বোধ হয়, এতদ্ব্যতীত প্রাচীন বিধানও বটে। এ বিধানের

অগ্রদূত বর্তমান যুগে জগতে যে একটা স্বেচ্ছাচালিত সার্বজনীন শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার কু-ফল পাশ্চাত্য প্রদেশেও মনোবিগল এক্ষণে উপলব্ধি করিতেছেন, কিন্তু সংশোধন করিবার পথ পাইতেছেন না। সাধারণকে শিক্ষা দেওয়া অসাধ্য; তাহাদিগকে সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক কতিপয় বিধান সকল প্রতিপালন করিতে শিখাইলেই যথেষ্ট হইল। মনোবৃত্তিতে অমূল্য ও বালকগণের কথা বলিলে গিয়া সমাজতত্ত্ববিৎ ডাক্তার রেটুল বলিতেছেন যে “ইহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, এক কথা বলিয়া সমাজকে প্রভাবিত করা সাধুতার পরিচয়ক নহে।” ফলতঃ সাধারণকে উচ্চশিক্ষা তো দেওয়া যাইতেই পারে না, বর্ণমালার অধীন শিক্ষাও অধঃপতিত দেশে দেওয়া সম্ভব হইবে না। ভাব-প্রধান ও কর্ম-প্রধান শিক্ষার মধ্যে সমাজের নিত্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা বর্ণমালার সাহায্য

* জ্যোতিষাচার্য্য সংখ্যা নব্যভারত ১২৮—১২৯ পৃষ্ঠা ৩৫৫।

* It is not honest for us to gull the public into believing that these can be really educated. They may be taught to be clean and to recognise some of the moral and social laws * * * Race Culture p. 51

অতীতও দেওয়া বাইতে পারে এবং তাহাই প্রকৃত। আমি পূর্বে বলিয়াছি, পৃথিবীতে শিক্ষা সমাজের উত্তম ও সাহস ভাবিয়া দেয় পতিত সমাজে সাধারণে এই শ্রেণীর শিক্ষা প্রচলিত হওয়া অপেক্ষা সাংঘাতিক কৰ্ম্ম আর কিছুই হইতে পারে না।

যাহা হউক, সমাজের অস্তিত্বই সৰ্ব্বাগ্রে চিন্তনীয়, উন্নতি পয়ের কথা। সুতরাং পূৰ্ব্বোক্ত চতুর্বিধ কৰ্ম্ম-মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কৰ্ম্মই সৰ্ব্বাগ্রগণ্য। এই শ্রেণীর কৰ্ম্মী না থাকিলে অপর তিন শ্রেণীর কৰ্ম্ম নির্বিক্রে অসম্পন্ন ও পরিচালিত হইতে পারে না। যে সমাজে দেশ-রক্ষক নাই, সে সমাজে অল্প সৰ্ব্ববিধ কৰ্ম্মই প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাতে অণু-মাত্রও সন্দেহ নাই। জগতে এমন সময় কখন আসে নাই এবং এমন সময় কখনও আসিবেও না, যখন এক সমাজ নিঃস্বার্থভাবে অল্প সমাজের প্রকৃত উপকার সাধন করিবে। এ নিমিত্ত বিবিধ সমাজের স্বার্থ-সংঘর্ষ অনিবার্য। আর এই কারণ বশতঃই দ্বিতীয় শ্রেণীর কৰ্ম্মীও প্রত্যেক সমাজেই অত্যা-বশতক।

কিন্তু ইহাদিগের কৰ্ম্মও (অর্থাৎ দেশ-রক্ষা) এখন আর উচ্চশিক্ষা ব্যতীত সিদ্ধ হইতে পারে না। শুধু দৈহিক শক্তিতে এখন আর দেশ রক্ষা হয় না। ইহাতেও বিবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রের আশ্রয় লইতে হয়। তাই বলিয়াছি, বর্তমান যুগের সামাজিক প্রাধান্যের ইতিহাস মানসিক উন্নতির ইতি-হাসের সহিত জড়িত। তৃতীয় শ্রেণীর কৰ্ম্মও (অর্থাৎ কৃষি-বাণিজ্য) এক্ষণে বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতির উপর নির্ভর করিতেছে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। সুতরাং দেখা বাইতেছে যে, দেশ-রক্ষা ও কৃষি-বাণিজ্য, এই দুই গুরুতর কৰ্ম্ম

উচ্চ শিক্ষার উপরই নির্ভর করে। এই নিমিত্তই অধ্যয়ন অধ্যাপনকে সামাজিক চতুর্-বিধ কৰ্ম্মের মধ্যে প্রথম স্থান দেওয়া হই-রাছে। এই কৰ্ম্ম অল্প সংখ্যক ব্যক্তির; তাহারাই সমাজের চালক ও রক্ষক। তাহা-দিগের শিক্ষা প্রধানতঃ এই কয়েকটি বিষয়ে থাকাই চাই, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, বস্তুতত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব ও জীব-তত্ত্ব। * এই সকল বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা না থাকিলে কেহই সমাজ পরি-চালকের আসন গ্রহণ করিবার যোগ্য হইবেন না। বর্তমান সময়ে এ কথা স্বীকার করি-তেই হইবে।

সমাদের স্বাস্থ্যের কথা আলোচনা করিতে দেশের অবস্থা ও ব্যক্তির অবস্থা উভয়ই বিবেচনা করিতে হয়। সমাজ সুস্থ না থাকিলে কোন কৰ্ম্মই হইতে পারে না। কিন্তু সমাজকে অনন্তকাল সুস্থ রাখাও যায় না। ব্যক্তির যেমন একটা আয়ুষ্কাল আছে, সমা-জেরও তেমনই আছে। কেবল মনুষ্য সমা-জের নহে, জীবরাজ্যে সর্বত্রই এই নিয়ম। ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন জীবিত কাল; ভিন্ন ভিন্ন জন্তু সকলেরও ভিন্ন ভিন্ন আয়ুষ্কাল নির্দিষ্ট আছে। মানব সমাজেরও তাহাই। মানব সমাজেরও বাল্য, যৌবন, জরা আছে। জরা নানাবিধ সামাজিক দুরাচার বশতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়। এ সকলকে অনন্ত কাল প্রতিরোধ করা যায় না। কিন্তু তথা-পিও সামাজিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত প্রত্যেক ব্যক্তি লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ দায়ী। সমাজ ধ্বংসের প্রধান কারণ পরবশতঃ। ইহা

* "We desire to make the chief subject of education both in school and in college a knowledge of nature as set forth in the sciences which are spoken of as physic, chemistry, geology and biology." Ray, Lankester, Kingdom of Man p. 52.

হইতে মানসিক ও দৈহিক জড়তা আসিয়া উপস্থিত হয়; সুতরাং কর্ম্ম প্রতিহত হয়। আর কর্ম্মের অভাবে সমাজ কখনই টিকিতে পারে না। লোক-স্থিতির এক বিশেষ অন্তরায় পীড়া। দেশব্যাপী পীড়া দমন করিবার চেষ্টা কেবল ব্যক্তিগত হইতেই পারে না। উহা দেশব্যাপী রাজশক্তির কর্ম্ম। বঙ্গীয় সমাজে বর্তমান সময়ে বর্ষে বর্ষে বার লক্ষ লোক ম্যালেরিয়া, কলেরা ইত্যাদি রোগে জীবন বিসর্জন দিতেছে। ইহা প্রতিরোধ করিবার শক্তি ব্যক্তির আয়ত্ত নহে। যে শক্তি সমাজের সর্বত্র অনুভূত হইতে পারে, অন্যায়সে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে সক্ষম হয়, তাহা ভিন্ন, অর্থাৎ রাজশক্তি ভিন্ন, এক্ষণে দেশব্যাপী মহানারী কখনই নিবৃত্ত হইবার নহে। আর যথোপযুক্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকিলেও এই গুরুতর কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে না। দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি কোথায়ও সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। তারপর সামাজিক দুর্ভাচার ও দুর্নীতি—এ সকলও অনেক সময়েই রাজশাসন ব্যতীত নিবৃত্ত হওয়া সহজ নহে। অবশ্য ইহা স্বীকার করি যে, জনসাধারণের সহানুভূতি না পাইলে এ সকল বিষয়ে রাজশাসন কিছুই করিতে পারে না। আর রাজশাসন দেশীয় উচ্চ শিক্ষিত জ্ঞানীগণের হস্তে চ্যুত না থাকিলে বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না। এই নিমিত্তই জ্ঞানিগণ সমাজ শাসনোপযোগী স্বতন্ত্র রচনা করিবেন; আর দেশ-রক্ষকগণ তদীয় বিধান সকল পরিচালন করিবেন; ইহাই এতদেশীয় প্রাচীন আদর্শ। সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা আর একটা গুরুতর বিষয়ের প্রতি নির্ভর করে। উহা বংশ পরম্পরা। বংশ পরম্পরাগত পীড়া দুর্ভিক্ষংস। এই সকল স্থলে, বিবাহ

বিধির সংকোচ করাই একমাত্র উপায়। বংশপরম্পরাগত মারাত্মক পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির বিবাহ করা অনেক সময়েই অসম্ভব। কিন্তু তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবে কে? তাহাদিগের সং শিক্ষা এবং রাজবিধি—এই দুই উপায় ভিন্ন অন্য উপায় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সামাজিক স্বাস্থ্য জনসমাজের সং শিক্ষা ও রাজ বিধানের উৎকর্ষের প্রতি নির্ভর করে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক দুর্ভাচার, স্থানীয় অস্বাস্থ্য, এ সকল অপেক্ষাও গুরুতর বিষয় জনন-হীনতা। সমাজ-ধ্বংসের পক্ষে ইহার ভাষ্য কারণ আর নাই। আমি জননহীনতা শব্দে জন্ম মৃত্যুর অমুপাতও বোধ করিলাম। জন্ম সংখ্যা অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে সে সমাজ টিকিবে কেমন করিয়া? জন্ম সংখ্যার নানা কারণে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কতিপয় পীড়া জননশক্তির হানী করে। সুতরাং জন্ম সংখ্যারও হ্রাস করিয়া থাকে। জন্ম সংখ্যা প্রধানতঃ প্রাপ্ত বয়স্ক দম্পতির সংখ্যার উপর নির্ভর করে। এই শ্রেণীর দম্পতির দেহ ও মন সুস্থ ও প্রকৃত থাকি আবশ্যক। যে সমাজে সুস্থ ও প্রকৃত প্রাপ্ত বয়স্ক দম্পতির সংখ্যা কম, সে সমাজে জন্মের সংখ্যা হ্রাস হইবেই তো। জন্মের সংখ্যা কি বিজ্ঞান বলে বৃদ্ধি করা যায়? বোধ হয় যায়। জীবতত্ত্বের নিয়ম সকল প্রতিপালন করিলে ইহা একেবারেই অসম্ভব নহে। কিন্তু লোকস্থিতির সহজতর উপায় মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস করা। এই কার্য্য অতীব কঠিন নহে। ব্যক্তিগত আয়ুষ্কাল যদিও অনেকাংশে বংশপরম্পরাগত নিয়মের প্রতি নির্ভর করে, তথাপি শারীরতত্ত্বের এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের নিয়ম সকল সুপ্রতিপাদিত

হইলে মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস করা অসম্ভব নহে, বরং বিশেষ সম্ভব। কেবল তাহাই নহে, বাংলা বিবাহাদি কতিপয় সামাজিক দুরনীতি নিবৃত্ত করিলেও মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস হওয়া সম্ভব। ফলতঃ সমাজ-স্থিতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল কাল স্রোতে ভাসিয়া গেলে ধ্বংসের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই। মানব সমাজের সভ্যাবস্থায় অসভ্যাবস্থা অপেক্ষা উন্নত সংখ্যা কমিয়া যাইবেই, কিন্তু জ্ঞানোন্নত সভ্য মানব মৃত্যু সংখ্যা কমাইতে অবশ্যই সক্ষম হইবে। এই কার্য্য গুরুতর প্রযত্ন-সাধ্য; আর সে যত্নও কেবল ব্যক্তিগত হইলে চলিবে না, সমাজব্যাপী শক্তি অর্থাৎ রাজশক্তি কর্তৃক পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। যে দিক দিয়াই বিবেচনা করা যাউক, সমাজ-স্থিতির প্রধান বিষয় রাজশক্তির অভাব, ওদা-সিদ্ধ অথবা বিকৃতাবস্থা। সমাজের সর্বত্র যে ভাব স্পন্দিত হইতেছে, রাজশক্তি তাহা-রই বহু বিকাশ, আর কিছুই নহে। এই শক্তির ইত্যাকার লক্ষণ থাকিলেই সমাজের স্থায়িত্ব ও উন্নতির আশা করা যায়; নচেৎ সমাজ সূত্র খণ্ড হইয়া ভাসিয়া পড়িবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়। ব্যক্তির যেমন জীবাত্ম-শক্তি, সমাজের তেমনই রাজ-শক্তি। এই শক্তি সম্রাট নামক নির্দিষ্ট ব্যক্তির হস্তগত হওয়াই যে আবশ্যক, তাহা নহে; কিন্তু এই শক্তি-প্রসূত মঙ্গল বিধান সকল সর্বত্র পালিত হয়, এরূপ ব্যবস্থা থাকিলেই যথেষ্ট হইল। মানবসমাজ কেবল বর্তমান বংশীয় ব্যক্তি

সকলের সমষ্টি নহে। পূর্ব পুরুষগণের জ্ঞান ও সভ্যতার মানব সমাজ সর্বদাই অমু-প্রাণিত। সেই জ্ঞান ও সভ্যতা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সামাজিক বৃত্তিতে অলঙ্কৃত করা হইবে; নতুবা সমাজ রক্ষা হয় না। দেশ-হিতৈষিতা পৃথক কথা; আমি এস্থলে তাহার কথা বলিতেছি না। নির্দিষ্ট সমাজস্থ ব্যক্তি-গণ সেই সমাজের গঠন, চালন, বংশপরম্পরা-গত ভাব, সেই সমাজের বিশেষত্ব, অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রক্ষা করিবার নিমিত্ত যত্নবান হওয়া চাই। এই সকল বিষয়ের প্রবল ইচ্ছাই সামাজিক বৃত্তি। সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও আসক্ত না হইলে এ বৃত্তির ক্ষুরণ হয় না। আত্ম সমাজকে ঘণার চক্ষে দেখিলে সামাজিক বৃত্তি লোপ হয়; তখন আর সমাজকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব হয় না, ইহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। সামাজিক-বৃত্তি হইতেই সমাজনীতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ধর্ম নীতির কথা পরে বলিব। সমাজ বন্ধ জীব মাতেই সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন করে, নচেৎ সমাজ উচ্ছ-ন্নতার নামান্তর হইয়া উঠে। তখনই ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হয়। আর যদিও এই কার্য্যের সহায়তা করিবার নিমিত্ত মূর্থতা, জড়তা, হুঁচকার ও ধর্ম জ্ঞানের শিথিলতা আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে সে সমাজ অচি-রেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ অবস্থা হারী হইলে সে সমাজ কখনই জীবিত থাকিতে পারে না।

শ্রীশশধর রায়।

কেন ?

ওগো কবি ছিয়ে ছিয়ে হা ধিক্ হা ধিক্ !
আবার জাগিল ঈর্ষ্যা, ভৈরব হকারে,
অকোমল সাহিত্যের ললিত বিপিন,
বিকম্পিয়া, দম্ভভরে কেন দিলে সাড়া ?
'বিজয়' পশ্চাতে তব, সঙ্গে মতিমান্
বন্ধুবর্গ, প্রতিভার উজ্জ্বল অনলে
দম্ভের ইন্ধন রাশি করিয়া প্রক্ষেপ
তুলেছে করিয়া তোমা হেন আয়হারা ?
দম্ভ অত্র শিরোপরি গোরবে বসিয়া
দেখিতেছ সবে ক্ষুদ্র, সঙ্গীর্ণ, মলিন ।
ভঙ্গিকর হান্তকর দম্ভ বিকাশিয়া
Mathurin, Lucilius বাহা ইচ্ছা সাজি,
চিত্ত-উৎস হতে দেও ঢালি অকাতরে
অবাস্তিত মধুপ্রাণি, ভাঙ সন্দ্বন্দ—
যা হৃদয়ের মনোমাঝে, করিতে স্বজন
কাব্যের বিচিত্র লীলা, হাসি অকিঞ্চন
কল্পনার বাস্তবতা স্থল রঙ্গরাশি ।
শিখিপুচ্ছে প্রসাধিত বায়সের দল
তোমার মল্লার রাগে নাচিয়া বেড়াক ।

২

নীতিভ্রষ্ট, প্রেমপুষ্ঠ লাক্ষিত রবীন্দ্রে
নাই নাই কিছু নাই শুধু দ্বষ্ট-প্রেম,
শুধু হাসি অভিসার চকোর চূষন,
বাসিমীলা-কোলে-করি রজনী যাপন ।
স্বর্ণথালে "নৈবেদ্যের" মল্লার মঞ্জীর,
দৈবহ্রাস্তি বিকারিয়া ঢালিতে পীযুষ,
ঈর্ষা বিনিময়ে যদি হৃদয়-চষক,
সে অমৃত নিত ভরি, শিরাস শিরাস
প্রসন্ন সরল প্রেম বহিত মধুর ।

৩

গান ছেড়ে, হাসি ছেড়ে জগতের কবি •
মহিমায় মহীয়ান, বজ্রের গোরব
জ্যোতিষ্ক রবিরে চাও শিখাইতে রুচি !
পাখাণে গুটিয়া বণু সগর্বে সে মূসি
আপনারে দম্ভসহ করিছ প্রক্ষেপ •

চূর্ণ করিবারে ওই অদ্বির শিখর ।
রুচিশীলে ডাকিতেছ হইতে সহায় •
হুর্নীতি কণ্টক-দলে আবিল্লভারতী,
বেদনা উঠেছে বেজে হৃদয়ে তোমার,
তাই আজি প্রিয়নথা বাধিয়া কোমর
কবি-বীণা-দূরে ফেলি, গদাধারী হ'য়ে,
বিল্ল কণ্টকের দলে নিশ্চুল করিতে
উঠিতেছ গরজিয়া, বলিহারি যাই !!

৪

ওগো কবি ! প্রেম ! প্রেম ! চূষন-চয়ন !
অধরে মদিরা ঢালি, কবিতা স্বজন,
অসহ অশ্রাব্য, রক্ষ, কাব্যের ভাণ্ডারে
হেন কাব্য অবশ্যই পাইবে না স্থান ।
চণ্ডালের হাত দিয়া এসো 'মানসারে'
পুড়াইয়া ছাই করি, মাখাই রবিরে ।
গানে প্রেম, ধ্যানে প্রেম, রূপে প্রেম-ঝরা
রবিরে এসোহে করি চির নিরাসন ।
আমরা "আষাঢ়" নিয়ে হাসিয়া হাসিয়া
করিব শুভুক ফুঁকে ধীবন যাপন ।
হে কবি উজ্জ্বল রস রসশিখরীণী
পরশে কোকিল তার করে কুহরণ,
সমীর মলয় রূপ করিয়া ধারণ,
কলিকার বক্ষ মাঝে, সঞ্চারি যৌবন
বিলাস হিল্লোলে তারে রাখে মাতাইয়া ।
হৃদয়ে বাসনা বাস, ফুলে পরিমল,
অধরে ফুটিয়া উঠে, মণিয়ার হাসি,
প্রেম-স্নাত মন সদা ধায় অভিসারে
উল্লাস চঞ্চল পদে, ছনয়ন মেলি •
হেরিতে সে চাকুতায়, ডুবিতে তাহার,
অতল হৃদয় তলে তুলিতে রতন ।

আমরা সহায় তব, হেমেন্দ্র, রামেন্দ্র,
বিজয়, সুরেশচন্দ্র—এসো মিত্রগণ !
প্রণয় বিকীর্ণ বঙ্গ, অরুচি প্রবাহে • •
দেখ আজি পরিপ্লুতা । রবিচিত্র হ'তে
প্রবাহিত হইতেছে হুর্নীতি জীবন ।

ধর্ম নীতি সনাজের হিতকরে ভাই,
সমবেত বলরাজ্য করিয়া প্রয়োগ,
রবি হতে রবি-ছাতি লইয়া ছিনায়ে
মলিন করিয়া তারে এসো সবে রাখি ।
অতি দূরে দুর্গাদাস করিছে গর্জন
চিতোরের শৈলে শৈলে প্রতিধ্বনি তার
চীৎকারিয়া উঠিতেছে, শুধু দীর্ঘ করি
আকাশ-ইথর-ভরা গভীর পরাণ ।
প্রেম আনে অবসাদ ; খুব সাবধান
রবির প্রেমের আশো করিতে নির্বাণ ।
ভাবে ভরা শুভ্র স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য-মালায়
বিধেব তমিশ্রা রাশি করিতে মিশ্রিত
এই বার দীর্ঘ তব তৃতীয় প্রকাশ ।
জানি আমি বিষমিশ্র সুখা কণ্ঠে তব,
অনেকে উঠিবে মাতি, অনেকে আবার,
বিজনে বসিয়া দিবে ছই হাতে তালি,
বাখানিয়া উচ্চ-কণ্ঠে রবির লাঞ্ছনা ।
নম্রতায় অশ্লীলতা যে বলে বলুক,
নম্রচিত্র সৌন্দর্য্যের প্রকৃত আশ্রয়
সৌন্দর্য্য কিরণবাসে, সদা প্রকাশিত ।
সত্য, শিব, শ্রেয়ঃ, সবাই নগন
অশিব অসত্য চায়—শিষ্টের বসন ।
কত লোকে স্রুচির মাহাত্ম্য ঘোষিতে
ক্ষুদ্র গৌতমের কার্য্য করিল জাহির,
হায় হায় কি বলিব কপালের দোষে

Such 'and so various' are the
tastes of men.

হায় কবি রুচি তব ফণি ফণা ধরি
গরজিছে শিংকারিছে গরল গোরবে,
টুলাও আপন শির অদূরে রবির,
কণ্ঠ ধুরলীল তান কি আলাপে শুনি ।

৭

ডন জোয়ানের কবি ওই দেখ শোভে
উদ্ভাসিয়া সাহিত্যের নির্মল আকাশ ।
গর্জফাত জেফেরির পেচক চীৎকার
এখন গাজে না আর সৌন্দর্য্য বিপিনে ।
জেফেরির বিদ্রোহের বিবনয়ী ভাষা
সুপ্ত হ'য়ে এবে যেন কোথা আছে পড়ি ।

৮

স্নিগ্ধ-রশ্মি-রেখা দিয়া শরতের শশী
সাজাইবে প্রেম-মুগ্ধা কুমুদ বালায়,
বিধুরা রথাক্স-বধু, সৈকতে বসিয়া
চির নিশি মিলনের করিবে থিয়ান ;
মেঘ যে সে মেঘে চায় । শিখিনী শিখিনী,
নাহি থাকে কণ্ঠে তার কক্ষ কহ তান ।
রবিবে অরাবি কেন করিবার তরে
যুগিত মস্তক তব, উত্তম-পীড়িত ?
বিজনে বিজনে রবে, রবি রবে রবি,
কেন দীর্ঘ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হে হাসির কবি !

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী ।

তুকারাম । (শেষ)

তুকারাম শূদ্র হইয়া কথকতা এবং ধর্ম্মো-
পদেশ করিলেন, বেদমন্ত্র ব্যাখ্যাইলেন ; ব্রাহ্ম-
ণের সহিত একত্র ভোজন, পূজন ও উপবে-
শন করিতে সাহসী হইলেন, ধর্ম্মপ্রাণ, সরল-
হৃদয় সাধুলোকের প্রণাম ও নমস্কার গ্রহণ
করিলেন, ইহা বড় আশ্চর্য্যের কথা । এই
অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্ত, তাঁহাকে প্রায়-
শ্চিত্ত করিতে হইবে এবং দণ্ডভোগ করিতে
হইবে । বহুমূল কুসংস্কার, অন্তঃসারশূন্য
প্রথাতিমান, এবং প্রভু-দণ্ড-ও-ব্রাহ্মণের

অলস হিংসা তাঁহার বিরুদ্ধে সমরসজ্জা করিল ।
দেহর গোঁসাই ঠাকুর মধ্যাজী তুকারামের
প্রতিপত্তি দেখিয়া 'হিংসায় জ্বলিতে আরম্ভ
করিল । কিন্তু অন্তরের জুরভাব বাহিরে
প্রকাশ না করিয়া কপটী ব্রাহ্মণ প্রত্যহ তুকা-
রামের ভজনে যোগদান করিত । ঠাকুর
মন্দিরের 'শ্রাদ্ধভাগে তাঁহার একটা বাগান
ছিল । মধ্যাজী বাগানের চারিদিক কাঁটার
বেড়ায় ঘিরিয়া দিয়াছিল । একবার একা-
দশীর গর্জনে মন্দিরে বহুসংখ্যক বাকীর

সমাবেশ হইল। তুকারাম দেখিলেন, সেদিন কণ্টক বৃক্ষগুলি মন্দির পর্য্যন্ত ছড়াইয়া রহিয়াছে এবং মন্দিরপ্রদক্ষিণের পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য করুণহৃদয় তুকা সহস্রে কাঁটা গাছগুলি সরাইয়া পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। ইহাতে নিষ্ঠুর মহাজী ক্রোধোন্মত্ত হইয়া সেই কাঁটাগাছের দারুণ প্রহারে তুকারামকে জর্জরিত করিল। তুকারামের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তধারা বহিতে লাগিল। সুখ-দুঃখ এবং নিন্দা-প্রশংসায়-তুল্যভাব সাধু তুকা শারীরিক গ্লানিতে ক্রমোপেক্ষ করিলেন না, অপমান ও নির্যাতন উপেক্ষা করিলেন, কুটিল হৃদয় মূর্থ মহাজীর প্রতি কিছুমাত্র রোষ বা বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না। তিনি অটল অচল হিমাচলের স্তায় দৈনন্দিন দেবসেবা ও ভজন কীর্তন করিতে লাগিলেন। তুকা সুখে অবিকৃত-চিত্ত, হৃৎখে অহুদ্বিগ্ন-মন, বীতরাগ ভয়ক্রোধ, হিরণী মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি বুঝিলেন, এ তাঁহার বিশ্বাসের পরীক্ষা যাত্র—ভক্ত মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি সুখ দুঃখ, মান অপমান এবং আদর নির্যাতনের একমাত্র মূল কারণ হৃদয়-দেবতাকে যুক্তপ্রাণে ডাকিয়া কহিলেন :—

ন সোড়েঁ। ন সোড়েঁ। নসোড়েঁ।,

বিঠবাচরণ নসোড়েঁ।

(এ। ভলতেঁ জড় পড়োভারী,

জীবাবরী আগোজ।)

শত খণ্ড দেহ শত্রুধারী,

কিরীতি পরো ন ভোরেঁ।

তুকারামে কেলী আর্থে। • •

দৃঢ়বুদ্ধী সাবধ।

ছাড়িব না, ছাড়িব না, ছাড়িব না, বিঠবা
চরণ (আমি কিছুতেই) ছাড়িব না। যতই

ভার্য্যবিপদ আসুক, জীবন শতটাপন্ন হউক, শত্রুধারী আমার দেহ শত খণ্ড করুক, তথাপি ভয় করিব না। কারুণ্য তুকা বলে, আমি প্রথমেই দৃঢ়বুদ্ধি হইয়া মনকে প্রস্তুত করিয়াছি।

কি অলস বিশ্বাস, কি দৃঢ় পণ, কি আশ্চর্য্য নির্ভর! এই শক্তির ছায়াযাত্র শিবাজী ও পেশবাতে সংক্রান্ত হইয়া মোগল সাম্রাজ্য উচ্ছেদ করিয়াছিল। আর একজন ভক্ত কবি কহিয়াছিলেন—

যদি তুমি শিরে আঘাত অসি,

পিছু না হটিব রহিব বসি।

তব হেতু যদি মরণ হয়,

বেঁচে উঠা, সেত মরণ নয়।

এমন না হইলে কি ব্রহ্মাণ্ড-হ্রস্বত তুরীয় ব্রহ্মের সামীপ্য ও সাযুজ্য নমুদান করা যায়? মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রহারে জর্জরিত ও রক্তাক্ত-কলেবর হইয়াও ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, আর বাষ্পগদগদ-কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন—

মেরেহিস্ বেষ করেহিস্,

একবার ছরি বলে নাচ ভাই। •

সে অপূর্ণ দৃষ্ট দেখিয়া জগাই মাধাইর পাষণ্ড প্রাণ প্রবোভূত হইয়াছিল, যদিহামন্ত দম্য প্রেমমত্তে দীক্ষিত হইয়াছিল। তুকারামের অদ্ভুত ক্ষমা ও বিশ্বাসের গভীরতা দেখিয়া মহাজীর অভিমান ও ক্রুর প্রকৃতি পুড়িয়া থাক হইয়া গেল। ভক্ত তুকারামের সৌম্য মূর্তিতে গোঁসাই মহাজী জগন্নাথের মহিমা দেখিয়া মোহিত হইলেন—মহাজী তুকারামের ভক্ত হইলেন।

কিন্তু তুকারামকে কঠোরতর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। কীবীজীবন : কঠিন—নাইটিঙ্গেল, কণ্টকে কণ্ঠ রাখিয়া

কাকলী ধ্বনি করে। তুকারামের তর্জির কথা, কীর্তন ভজনের কথা, কবিতাশক্তির কথা ও কথকতার কথা, দেশদেশান্তরে প্রচারিত হইতে লাগিল। নানা দূরদেশ হইতে অসংখ্য পিপাসু তীর্থ যাত্রী দেহগ্রামে বিঠবা, মন্দিরে সাধুদর্শনে সমাগত হইতে লাগিলেন। ঈর্ষাপরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের প্রাণে শূদ্রের এতদূর প্রতিপত্তি সহ্য হইল না। রামের ধ্বংসের নিমিত্ত পুনরায় ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইল। ক্ষমতাক্ষ অভিমান-দৃষ্ট ‘জন্মগত’ ব্রাহ্মণেরা বুঝিলেন না যে, ব্রহ্মবিদ কৰ্ম্মগত ব্রাহ্মণ তাঁহাদের অপেক্ষা সর্বত্র সকল যুগেই শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ কোন নিষ্ঠাবান ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণ নিজবংশে আভিজাত্য স্থাপিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাই আজ তাঁহারা সম্মানের পাত্র।

পূণ্যা নগরীর ঈশান কোণে বাঘোলী একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম (খেড়ে)। সেই গ্রামে রামেশ্বর ভট্ট নামে একজন বিদ্বান এবং রাজদ্বারে সম্মানিত ব্রাহ্মণ বাস করিত। তুকারামের খ্যাতি তাহার স্বপ্নে হিংসার বিধ চালিয়া দিল। একজন বর্ণজ্ঞান-হীন শূদ্র দোকানীর এত যশও কি প্রাণে সয়? রামেশ্বর গ্রামাধিকের নিকট তুকারামের নানা দোষের কথা উল্লেখ করিল এবং তুকারামকে দেহগ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত ঐ গ্রামের পাটিনের নামে গ্রামাধিকের সহায়ক এক আদেশ-পত্র প্রেরণ করিল। তুকারাম নিরুপায় হইয়া রামেশ্বর ভট্টের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে গেলেন। রামেশ্বর বলিল, ‘তুই কথকতার বেদ ব্যাখ্যা করিস্। শূদ্র বেদ পাঠ করিলে পাঠক এবং শ্রোতা উভয়েই পাপ হয়। তুই কবিতা রচনা হইতে স্তব্ধ হ।’ তুকা সরল ভাবে উত্তর করিলেন,

‘আমি ইচ্ছায় কিছু করি নাই। যাহা কিছু লিখিয়াছি, দেবতার (পিতৃদেব) আদেশে। ব্রাহ্মণের বাক্যও অথব্যর্থ। অতএব আমি আর কবিতা লিখিব না। কিন্তু ফেণ্ডলি রচনা করিয়াছি, তাহার কি হইবে- অমুমতি করুন।’ দাস্তিক রামভট্ট হকুম করিল, “জলে ফেলিয়া দিস্।” তুকা যে আজ্ঞা চলিয়া আসিলেন। তাঁহার অপরাধ মাপ হইল। তিনি দেহগ্রামের ঠাকুরমন্দির হইতে তাড়িত হইলেন না। তুকারাম বিঠবা ঠাকুরের চরণে সকল কথা নিবেদন করিয়া স্বদয়ের ভার লঘু করিলেন এবং স্বহস্তে পুণিপত্র ইন্ড্রায়নী নদীর জলে ডুবাইয়া দিলেন। দ্বিজ রামেশ্বরের মনোবাহা পূর্ণ হইল।

আপদের শাস্তি এখানেই হইল না। গ্রামের যত ‘শ্রদ্ধানদের’ দল তুকারামকে বিনামূল্যে সমালোচনা বিতরণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা বিদ্রূপ করিতে লাগিল, “তুকা তুমি পূর্বে একবার দলিল-পত্র জলে ফেলিয়া দিয়া ইহলোকের আশাভরসা নিমূল করিয়াছিলে, এবার অভঙ্গগুলি জলে দিয়া পরলোকের আশা ভরসা হারাইলে। দিক্, তুমি ইতোব্রহ্মজ্ঞতানষ্ট হইলে।” এই বিদ্রূপ বাক্য তুকার প্রাণে শেলসম বাজিল। তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বিঠবা মন্দিরে ‘ধরণা দিয়া’ পড়িয়া রহিলেন। এই ভাবে ১০ দিন কাটিয়া গেল, তুকারামের মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। তবে কি তুকারামের সত্য সত্যই সব ফুরাইল! তবে কি ভক্তবৎসল মধুসূদন আশ্রিতের আত্মনাদ শুনিতে পান নাই? তবে কি সংসারে বিশ্বাসের পরাজয় এবং অবিশ্বাসেরই অমরজয়-কার হইবে? না, তাহা হইলে যে দৈবাময়ের

ভক্তবৎসল নামে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে ।
তুকারামের অশ্রুজল বৈকুণ্ঠের পথে বাণ
ডাকিল, তুকারামের দীর্ঘশ্বাসে অলকাপুরে
তুফান বহিল, তুকারামের অবাক্ত অক্ষুট
কাতর-ধ্বনিতে ত্রিঙ্কলোক কম্পিত হইল ।
ভক্তের ভগবানের ইচ্ছিতে অসম্ভব সম্ভব হইল,
বিশ্বপতির অনন্ত মহিমা প্রকট হইল । চতুর্দশ
দিবসের দিন দয়ার সাগর হরি স্বপ্নযোগে
শিশুবেশে দশন দিয়া ত্রিয়মান তুকারামকে
সাম্বনা দিলেন এবং কহিলেন, ‘কোম চিন্তা
নাই, তোমার পুখিনদীর জলে অকৃত ও অবি-
কৃত রহিয়াছে ।’ তুকা হাতে স্বর্গ পাইলেন
—ভক্তিতে এবং কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ
হইয়া গেল, নয়নে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল ।
বিধাসের জয়ডঙ্কা গভীরনাড়ে নিনাদিত
হইল ।

তুকা প্রাণের দেবতাকে বিবৃত্ত করিয়া-
ছেন বলিয়া লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া লিখি-
লেন :—

খোর অন্ডার কেলা তুঝা অন্ত ম্যাপাখিলা,
জনাচিয়া বোলাগাটা চিত্রকো ভবিলে ।
(ভাগবিলাসী কেলা সীল অধম মীয়া তহীন,
ঝাঁকুনি লোচন দিবস তেরা রাহিলে ।)
অবধে ঘালুনিয়াং কোড়ে তানভুকেটে
সাকড়ে ।

• যোগক্ষেম পুটে তুজ করণে লাগেল ।
উদকী রাখিলে কাগদ চুক্লিলা জনবাদ ।
তুকাহুণে ত্রীদসাচ কেলো আপুলে ॥

আমি বড়ই অন্ডায় করিয়াছি—তোমার
মহাপরীক্ষা করিয়াছি । লোকের কথা
তোমাকে বিরক্ত করিয়াছি । (আমি অশ্রম
জাতিহীন, ১৩ দিবস নয়ন মুদ্রিয়া থাকিয়া
তোমাকে অতিশয় বিরক্ত করিয়াছি ।) তুমি
দ্বিপদ হইতে ঐক্য করিবে আশার আমি

উপবাসে আত্মহত্যার তার তোমার উপর
চাপাইতে পিরাছিলাম । জলের ভিতর
তুমি কাগজ রক্ষা করিলে এবং লোকাণবাদ
বন্ধ করিলে । তুকা বলে, তুমি আপন ব্রত
(ভক্তবৎসল নাম) রক্ষা করিলে ।

আরও বলিলেন—

কাপো কোণী মাঝীমান সুখে পীড়োত দুর্জন ।
তুজ হোরগীণ তেঁমীন করে সবধা ।
(চুকীজালী একবেলা মজ পাহুনি চণ্ডালা ।
উতে করোনিয় । জলা মাণীবছা রাখিয়া ।
নাহী কেলাহা বিচার মাঝাকোণ অধিকার ।
সমর্থাসী ভার ন কলে কৈসা ঘালাবা ।

কোন দুর্জন যদি আমার গলদেশে ছেদন
করে এবং আমাকে বধেষ্ঠ পীড়ন করে,
তথাপি তোমাকে আর বিরক্ত করিব না ।
(আমি পাষাণ চণ্ডাল, একবার ভুল করিয়াছি,
তোমাকে জলের ভিতর অবতরণ করাইয়া
বহী রক্ষা করাইয়াছি ।) আমি এ বিচার
করিলাম না যে আমার অধিকার কি ?
কিন্তু মহতের নিকট রূপা যাচঞা করিতে
হয়, তাহাও আমি কিছুমাত্র জানিতাম না ।

তুকা-বিষেযী রামেশ্বর ভট্ট কোথায় ?
তাঁহার দুর্দশার সীমা নাই । ক্রুর-প্রকৃতি
দাস্তিক ব্রাহ্মণের গর্ষ খর্ব করিতে এবং
ভক্তের মহিমা প্রচার করিতে নারায়ণ অধিক-
তর অলৌকিক দৈবশক্তি প্রকাশ করিয়া-
ছিলেন । পুণ্যা নগরীতে নাগনাথ নামে এক
অতি জাগ্রত দেবতা ছিলেন । রামেশ্বর তাঁহাকে
অতিশয় ভক্তি করিত । একদিন রামেশ্বর
দেবতা দর্শনে গেল । সেখানে অনবত নামে
এক সাধু বাস করিতেন, তাঁহার ইন্দারায়
রামভট্ট স্নান করিল । কিন্তু কি আশ্চর্য্য !
কূপ জলে স্নান করিবারাত্র তাহার সমস্ত
শরীরে দাহ হইতে লাগিল । কেহ বলিল,

‘সাধু কুপজল বিবাক্ত করিয়া রাখিয়াছিল,
সুতরাং তোমার এ দুর্দশা।’ কেহ বলিল,
‘তুমি তুকারামের কবিতায় দোষারোপ
করিয়াছিলে, সেই পাপে তোমার এ দুর্গতি।’
রামেশ্বর উপাধ্যায়ের অভাবে অলকাপুরী
যাইয়া জানদেবের আরাধনা করিতে লাগিল
এবং তুকারামের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে
রামেশ্বরের স্বপ্নাদেশ হইল। এদিকে সলিল
হইতে তুকারামের প্রহোন্ধারের অঙ্কুত
কাহিনী লোক মুখে চারি দিক রাষ্ট্র হইয়া
ছিল। রামেশ্বর কালবিলম্ব না করিয়া তুকা-
রামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এক
শ্লোক রচনা করিয়া পাঠাইল। তুকা উত্তরে
লিখিলেন;—

চিত্ত শুদ্ধ তরী শত্রু মিত্র হোতী,
ব্যাত্ত হেন খাতী সর্প তরা ।

(ঋ। বিষতে অমৃত আঘাততে হিত,
অকর্তব্য নীত হোয় ত্যাসী ।)

দুঃখ তে দেইল সর্ব সুখ ফল,
হোতীল শতিল অগ্নিআলা ।

আবডেল জীবী জীবচিতরে পরী ।

সকল অশ্রুী একভাব ।

তুকাঙ্গণে কৃপা ফেলী নারায়ণে,
জানিজ্ঞেতে যেনে অমৃতবে ।

চিত্ত শুদ্ধ হইলে শত্রুও মিত্র হয়। এমন
কি, ব্রাত্তও ভক্ষণ করে না। এবং সর্পও
দংশন করে না। (বিষ অমৃত হয়, অনিষ্ট
ইষ্ট হয়, অস্ত্রায় স্ত্রায় হয়।) দুঃখ সুখের
হয়, অগ্নিআলা শীতল হয়, আয়বৎ সর্বজীব
দয়া এবং প্রেম হয়, যেহেতু সকলের অন্তরে
একরূপ ভাব। তুকা বলে, “তোমাকে
নারায়ণ কৃপা করিয়াছে, অমৃতবে তাহা
বুঝিতে পার।

এই অত্রান্ত বৈদিক সত্যের উপর টাকা

অনাবশ্যক। কথিত আছে, এই শ্লোক রামে-
শ্বরের সকল আলা নিবারণ করিয়াছিল। এই
রূপে মধ্যাজী ও রামেশ্বর মহারাষ্ট্রের অগাই
মাধাই ভক্ত তুকার শিষ্য হইলেন। রামে-
শ্বরের চক্ষের আবরণ খুলিয়া গেল—তিনি
বুঝিলেন, ‘বংশ কুল জন্মস্থান বিছুকিছু নয়,’
তিনি বুঝিলেন, ‘চন্দ্রালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ
হরিতক্তিপরায়ণঃ,’ তিনি বুঝিলেন, কেবল
উপবীত ধারণ করিয়া শুকবৎ ‘তৎসবিতুর্ভ-
রণ্যং ইত্যাদি’ আবার করিলেই ব্রাহ্মণ
হইতে পারা যায় না। বিশ্বাসের অগ্নিতে
উহার জন্ম, কৰ্ম্ম, বিভা, সকল অভিমান
ভস্মীভূত হইয়া গেল। তাহার বিবিত্তারনাশ
হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইল। তিনি অলস্ত
ভাষায় হরিতক্তি-মহিমার সাক্ষ্য প্রদান
করিলেন:—

বৈষ্ণবাঢী মাভাবাগী জো আপণ,
ভোগো ভো পতন কুন্তপাকী ।

(ঋঃ। ঐশী বেদ ঋতি বোলতী পুরাণে

নাহী তে ছষণ হরিতক্তা ।)

উট নিচ বর্ণ ন জাগাবা কোপী,

জৈ কা নারায়ণী প্রিয় জালৈ ।

চলু বর্ণাসী হা অসে অধিকার,

করিতা নমস্কার দোষ নাহী ।

জৈসা শালিগ্রাম ন জাগাবা পাষণ,

হোয় পূজ্যমান সর্বত্রাসী ।

গুরু পরব্রহ্ম লোবাচাতোদেব,

ত্যাসী তো মানব জগু নয়ে ।

জণে রামেশ্বর নামী জৈ রজলে,

স্বয়ে চি তে জালে দেবরূপ ।

যে ব্যক্তি বৈষ্ণবের জাতির বিচার করে,
তাহার কুন্তীপাক নরক ভোগ হইবে।
বেদঋতি ও পুরাণ নলিতেছে, হরিতক্তের
জাতিগত দোষ হইতে পারে না; ধাহাকে

নারায়ণ প্রিয়, বলিয়া জানেন, তাঁহার উচ্চ-নিম্নবর্ণ ভেদ করা উচিত নহে। চতুর্বর্ণেরই এইরূপ অধিকার আছে—তাঁহাকে নমস্কার করিতে কোন দোষ নাই। যেমন শালগ্রামকে প্রাণ বলি উচিত নয় এবং উহা সর্বত্রই পূজ্য হয়, সেইরূপ এই দেবাধিদেব শুরু পরব্রহ্ম, তাঁহাকে মানব বলি উচিত নহে। রামেশ্বর বলে, যাহারা সর্বদা (ব্রহ্ম) নামে রঞ্জিত, তাঁহারা স্বয়ং দেবই প্রাপ্ত হন।

এই ঘটনার পর তুকার ভগ্নাপবাদ দূর হইল। তাহার সরল ভক্তি ও সাধুত্বের কথা দেশময় বাপ্ত হইল। ছত্রপতি শিবাজী স্বভাবতঃ ধর্মপ্রাণ ছিলেন। তিনি রামদাস বাবাজীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং সমগ্র বিজিত রাজ্য তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিয়া স্বয়ং রাজ-প্রতিনিধিরূপে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। রামদাস স্বামীর পরিষেয় গৈরিক বস্ত্র মহারাষ্ট্রপতাকারূপে সুবিস্তীর্ণ রাজ্যে তাঁহার সহ ও অধিকার ঘোষণা করিত। ভক্ত তুকার অলৌকিক সিদ্ধি কাহিনীর বীণাঝঙ্কারে রাজর্ষি শিবাজীর হৃদয়তন্ত্রী নাচিয়া উঠিল। তুকারামকে মহা সমারোহে রাজধানীতে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে রাজদূত প্রেরিত হইল। তুকারাম ভোগবিন্যাসকে আবর্জনার ভায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সমাজে উপেক্ষিত নিগৃহীত কান্দাল শূদ্র 'তুকাবেণ'র নিকট ঐর্ষ্যা ও রাজসম্মানের প্রলোভন • উপস্থিত হইল। জৈশাকে শৈল-শিখর হইতে বিস্তীর্ণ রাজ্যের দৃশ্য প্রলুব্ধ করিতে পারিয়াছিল না, বিষয়-বিমুখ জ্ঞানবীর বুদ্ধকে সপ্ত দিবস সপ্ত রজনী প্রলোভনের সহিত অবিরাম সংগ্রাম • করিতে হইয়াছিল, সাধকাগ্রগণ্য মহাপুরুষ তুকাও বিষয়ের অতীত ছিলেন। তিনি প্রলোভনের অধাপরীক্ষাও উত্তীর্ণ হইলেন। ইষ্ট-দেবতাকে

স্বয়ং করিয়া রাজহুত, দেউটী, বোটক, সাজ, সজ্জা ও মানদণ্ড 'শুকরাচী' বিষ্টার ভায় দূর হইতে পরিত্যাগ করিলেন। তিনি পণ্ডর নাথের কাতর প্রার্থনা করিলেন—

ন করাবা সজ, বাটে দূরবাবে জগ।
মেবাবা একান্ত, বাটে ন বোলাবী মাত।
জন-ধন-তন, বাটে লেখাবে বমন।
এবং বিনয়ের সহিত মহারাজ শিবাজীর অহরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন—
'বার্তা হে ভেটীচী করুনকা।'
সাফাং করিবার কথাটা বলিবেন না।

যেহেতু—

তুমহাঁপানী আম্‌হী যেউনিয়া কায়,
বৃথাগীণ আছে চালগ্যাচা।
(মাগাবেহে' অন্ততরী ভিক্ষা গোর,
বজ্রাসীহে খার চিক্যা বিদী।)
নিদ্রেসী আসন উত্তম পাষণ,
বরী আবরণ আকাশাচে।

তোমার নিকট আমার বাইবার কি প্রয়োজন? কেবল পথ হাটার কষ্ট বহিত নয়। আমার অঙ্গের প্রয়োজন হইলে ভিক্ষা করিতে পারি, বস্ত্রের জন্ত যথেষ্ট চীর (ছিন্নবস্ত্র) পথে কুড়াইতে পারা যায়, নিজার জন্ত পাথরই উত্তম শয্যা এবং আকাশই আমার প্রশস্ত আচ্ছাদন।

গ্রীক দার্শনিকের কুটীরে হাজির হইয়া দেশপতি অহুগ্রহ প্রার্থনা করিতে অহরোধ করিয়াছিলেন। জ্ঞানবীর তাহার সংক্ষেপে উত্তর দিয়াছিলেন, 'আপনি দয়া করিয়া একটু সরিয়া বাউন, আমাকে হৃদ্যাতপ হইতে বঞ্চিত করিবেন না।' নবদ্বীপের অধ্যাপক • গৃহে বঙ্গাধিপ তাঁহার 'অভাবের' কথা জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ উত্তর করিয়াছিলেন, 'তিস্তিড় : বৃক্ষ থাকিতে আমার অভাব কি?' পবিত্র

আখ্যাত্বি ভারতবর্ষে দিগ্বিজয়ী বীর • যবন-
সম্রাট সেকেন্দর মণ্ডানিস (Mandanis)
মুণ্ডিত মস্তক (?)) আচার্য্য দণ্ডমীসের
(Dandamis দণ্ডী (?)) * অলৌকিক যোগ-
বল ও বিহুতির কথা শুনিয়া তাঁহাকে লোভ
কিছা ভয়প্রদর্শন পূর্বক পঞ্চনদের যবন
শিবিরে লইয়া আসিবার অল্প দূত ওনেসি-
ক্রেটিস (Onesikratis) কে প্রেরণ করিয়া-
ছিলেন। দূত যথারীতি রাজ্যাজ্ঞা নিবেদন
করিলে মহাযোগী দণ্ডমীস বিজয়ী বীরের
স্বাক্ষরকথা বা ক্রকুটি কিছুমাত্র গ্রাহ্য না
করিয়া তেজের সহিত উত্তর দিয়াছিলেন—
“সেকেন্দরকে যাইয়া বল, তাহার নিকট দণ্ডী-
মীসের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, সুতরাং সে
যাইবে না। যদি তাহার দণ্ডমীসের নিকট
কোন প্রয়োজন থাকে, সে আসিতে
পারে।”

ইহারই নাম ব্রহ্মতেজ। আমাদের সাধন-
হীন বিলাসজীর্ণ মৃতকল্প দেশে ব্রহ্মতেজ বুঝি-
বার সময় কি আসিয়াছে ?

তুকারাম শিবাজীর গুণরাজির স্তুতি
করিলেন এবং বিনীত ভাবে নিজের বক্তব্য
নিবেদন করিলেন। কিন্তু পাছে তাঁহার
বিনয় ও সম্মান ব্যবহার সম্বন্ধে শিবাজীর
ভ্রান্ত ধারণা হয়, পাছে তিনি মনে করেন,
মহারাজ চক্রবর্তীর ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্ব দেখিয়া
চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছিল বলিয়াই দরিদ্র তুকা
যে আজ্ঞা হুকুমের সুর ধরিয়াছিলেন, এজ্ঞা
স্পষ্ট কথায় তুকারাম তাঁহার ভ্রমনিরাকরণ
করিয়া বুঝাইয়া দিলেন :—

* Dandamis has no need of aught
that is yours, and therefore will not go to
you, but if you want anything from Danda-
mis come to him. Magasthenes, Frag.,
LV. B., Mc Crindle, 1872)

ঈশী মাঝী বাণী দীক্ষণ, পাছে,
হে ত্যা করণা আহে তদুদয়হাটী।
নহৌ কী'বিলবাণে' নাই' আক্ষীদীন,
সর্বদা শরণ পাণ্ডুরদী'।
পাণ্ডুরজ আক্ষাং পালিতাপোষিতা,
আগিকাঙ্কী কথা কার তেথৈ'।

আমার একপ দীন ভাষার কারণ সর্ব-
হৃদয়বিহারী পরমাশ্রয় তোমার উপর বিশেষ
অনুগ্রহ বলিয়া জানিবে। আমরা সর্বদা
পাণ্ডুরঙ্গের শরণে আছি, সুতরাং আমরা
দরিদ্র বা দীনভিখারী নহি। পাণ্ডুরঙ্গই
আমাদের প্রতিপালক, তিনিই আমাদের
পোষণ করেন। তাঁহার নিকট অল্প কার
কথা ?

যথার্থ সাধু এবং ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্ম্মোপদেষ্টা
ভক্ত তুকা দলপৃষ্ঠ করিতে এবং “কর্ত্তাভজার”
সংখ্যা বাড়াইতে লাগান্নিত ছিলেন না।
তিনি অসাধারণ দূতপ্রতিজ্ঞ মহারাষ্ট্র-বীর শিবা-
জীকে একটু অল্পমধুর ভৎসনা করিতে ও ক্রটি
করিলেন না।

সদগুরু শ্রীরামদাসাচৈ' ভূষণ,
তেথৈ' ঘানী' মন চলো' নকো।
বহুতা ঠাই বুদ্ধিচাবললীজেব'হাঁ,
রামদাস্ত তেব'হাঁ ঘরে টেকসে'।

তুমি সদগুরু শ্রীরামদাস আমীর ভূষণ
স্বরূপ। সেইখানেই মন দৃঢ় কর, চকল
হইতে দিও না। অনেকের প্রতি মন ধাক্কিত
হইলে রামদাস প্রভুর প্রতি অটল বিশ্বাস
কিরাপে রহিবে ?

একাগ্রচিত্ততা ও পল্লবগ্রাহিতার কত
পার্থক্য, শিখ মহাপুরুষ তাহার অভ্রান্ত সাক্ষ্য
প্রদান করিয়াছেন।

তুকা শিবাজীর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করি-
লেন এবং যাইতে অসম্মত হইলেন ‘নত্যা, কিন্তু’

স্নেহভাবে তাঁহাকে সহপদে' দিঙে বিরত
হইলেন না । অল্প কথায় সংক্ষেপে তাঁহাকে
রাজধর্ম বুঝাইয়া দিলেন এবং স্থনীতির সার
ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন ।

আত্মা একযোগ সাধা বা হা নীট,
ভল্যাচা তো বীট মান্ নয়ে ।
ক্লেণে যোগে তুকা ঘড়োঁপাহে দোষ,
ঐসা হা সায়াস কর্ নয়ে ।

• নিন্দক দুর্জনে সংগ্রহী অন্তী,
ভ্যাকীগুক্তী চিত্তী আনুনকা ।
পরীক্ষাবে কোণ রাজ্যাচে রক্ষক,
বিবেকাবাবেক পাহোনিয় ।

সাক্ষেণে ন লগে সর্কজ্জহঁ রাজা,
অনাথাক্ষা কাক্সা সাহস্রাবে ।
হেঁ চি ঐকোনিয়া চিত্ত সমাধান,
আণীক দর্শনে চাড় নাই ।

একণ একটা যোগ ভালরূপ সাধন
করিও ।

১। ঘাহা ভাল, তাহাতে অনাগ্রহ
প্রকাশ করিও না ।

২। এমন কাজ কখনও করিও না,
যাহাতে পরিণামে পাপে লিপ্ত হইতে হয় ।

৩। তোমার যদি কোন নিন্দুক এবং
দুর্জনে কর্মচারী থাকে, তাহাদের যুক্তি কদাচ
মনে স্থান দিও না ।

• ৪। কে রাজ্যের রক্ষক, তাহা ভালরূপ
বিচার ও অনুধাবন পূর্বক পরীক্ষা করিবে ।

৫। হে রাজন! তুমি সর্কজ্জ, আমার
বলা অতিরিক্ত যে অনাথের কাজে তুমি
সর্কদা যত্নশীল হইও ।

আমি তোমার সম্বন্ধে এই সঁকল কথ
শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিব । শুধু
দর্শন দিয়া লাভ কি ?

সমগ্র রাজনীতি শাস্ত্রের নিগূঢ়ত্ব এই

পাঁচটা বাক্যের অস্তিনিহিত রহিয়াছে ।
সরল, মধুর, অল্প কথায় জটিল রাজধর্মের
কি স্তম্ভের প্রাণম্পর্শী উপদেশ !

কারোদ-সাগর মন্থন করিয়া যে অমৃত
লাভ হইয়াছিল, তাহা পান করিয়া দেবতার
অমর হইয়াছিলেন । তুলসীদাস এক নাম-
নামে চারিবেদ, আঠার পুরাণ শুনাইয়া দিয়া-
ছিলেন । তুকা চারিবেদ, ষড়্বেদাঙ্গ ও
অষ্টাদশ পুরাণ মন্থন করিয়া শিবাজীকে ধর্ম-
তত্ত্ব বুঝাইলেন—

ভক্তিভাব তারাতাবি কঁানী ।

ভক্তিই ভাবুকের একমাত্র মুক্তি পথ ।

আর একজন ভক্তও করিয়াছিলেন—

‘মিঞা কহে বিনা প্রেমসে নাহিনিলে

নন্দলালা ।’

ধর্মবীর তুকা কর্মবীর শিবাজীকে আশী-
র্বাদ করিয়া কহিলেন :—

তুকাঙ্গণে রায়্য ধজ্জ জম্মকিতী,

জৈলোকী হে খ্যাতি কীর্তিতুয়া ।

কুটারবাসী তুকা রাজদরবারের কূট রাজ-
নীতি সম্পূর্ণ অপরিস্রাভ ছিলেন না । তাঁহার
শ্রদ্ধা-প্রদত্ত উপদেশের উদ্দেশ্য পও না হইয়া
যায়, এজন্য তিনি রাজমন্ত্রী ও পারিষাদবর্গকে
অনুন্নয় বিনয় করিয়া গিষিলেন, তাঁহারা যেন
কোন অংশ গোপন না করিয়া পজের যথার্থ
মর্ম মহারাজ শিবাজীকে বুঝাইয়া দেন ।
সঙ্গে সঙ্গে প্রধান অষ্টক কে—প্রতিনিধি,
মজুমদার, পেশবে, সুরনিস, চিটনিস, ডবীর,
রাজাজা, স্তম্ভ, সেনাপতি, পণ্ডিতবায়,
বৈজ্ঞানিক—সকলকেই বন্দনা করিয়া ঈশ্বারায়
কিঞ্চিৎ কর্তব্যবুদ্ধি প্রদান করিলেন ।

তুকাঙ্গণে তুঙ্গাং নমন অধিকাচ্যাং

সাক্ষেণে তেঁ স্বায়্য পজ মাঝে । ইত্যাদি ।

শিবাজী পজ শুনিয়া মোহিত হইলেন ।

তিনি তুকারাম বাবার আশীর্বাদ ও উপদেশ মস্তকে ধারণ করিলেন, সুরাটের ভাণ্ডার লুটিয়া যে সকল অমূল্যরত্ন সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া রত্নরাঞ্জি উপঢৌকনের জন্ত সঙ্গে লইলেন এবং সাধুচরণে প্রণত হইয়া কৃতকৃত্যার্থ বোধ করিতে স্বয়ং তুকা দর্শনে যাত্রা করিলেন । তুকারাম শিবাজীর মহামুখ্য উপঢৌকন স্পর্শ করিলেন না, কিন্তু মহাপুরুষের চরণস্পর্শে শিবাজীর অপূর্ণ পরিবর্তন হইল । কেহ কেহ বলেন, তাঁহার নির্বেদ ও বিষয়-বিতৃষ্ণা এত প্রবল হইল যে, তিনি রাজ সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্ঞান সাধনের জন্ত বনে প্রস্থান করিলেন । শিবাজী-জ্ঞাননী জিজ্ঞাসাইবাইর নির্বন্ধাতিশয়ে এবং তুকারামের উপদেশে তিনি পুনরায় সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন ।

এই প্রলোভনের পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলেও তুকারামের পরীক্ষা শেষ হইল না । তাঁহার ধৈর্য্য, জিতেন্দ্রিয়তা, নামে প্রীতি, ভগবদভূরাগ, কষ্টব্যানিষ্ঠা ও চরিত্র মাধুর্য্য বারংবার পরীক্ষিত হইয়াছিল ।

একটা পরমা সুলভী যুবতী তুকার কীর্তন শুনিয়া তাঁহার ভাষার লালিত্যে, ব্যবহারের মাধুর্য্যে এবং দৃষ্টির প্রদর্শিতায় আত্মহারা হইল । চিরদিনই প্রতিভা মৌল্যের জন্ত লালায়িত—কিন্তু রূপ প্রতিভার নিকট আত্মবিক্রীত । নষ্টা সাধু প্রতি কলুষিত ভাব পোষণ করিতে লাগিল এবং একদিন অবসর পাইয়া তাঁহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিল । শিশুর ছায় সরল, জিতেন্দ্রিয় তুকার মস্তকে আকাশ ভাঙিয়া পড়িল, তিনি ছুটা পর-নারীর অসঙ্গত প্রস্তাব শুনিয়া বজ্রহত হইলেন । কিন্তু তাহাকে

মিষ্টভাষার সহপদে দিয়া বিদায় করিলেন এবং বুঝাইয়া বলিলেন—

পরবিয়া নারী-রখুয়াই সমান ।

পর জী (আমার চক্ষে) মা লক্ষীর সমান ।

জঁইবো তু মাতে নাকটী সায়াস ।

যাও, মা, বুখা চেষ্টা করিও না । আমরা বৈষ্ণব, আমাদের এরূপ চরিত্র নয় ।

বিশেষতঃ—নসাহাবেঁ মজ তুখেঁ হেঁ পতন ।

তোমার পতন আমার সহ্য হইবে না, ছিঃ, এরূপ কুকা মুখে আনিও না ।

নকো হেঁ বচন ছষ্ট বদেঁ ।

কিন্তু মনে মনে মস্তব্য করিলেন—

জরী অগিজানা সাধু,

পরী পাবে বাধুঁ সংঘট্টে ।

অগ্নি সাধু হইলেও যাহারা সংস্পর্শে আসিবে, তাহাদিগকে দগ্ধ করিবে ।

একবার কোন শিশুপঙ্কীর বিষম ষড়যন্ত্রে তুকার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল । কিন্তু ভগবৎ রূপায় তিনি বিপদুক্ত হইয়া চরিত্র গুণে বিদ্যেধীকেও মুষ্টি মধ্যে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ।

দেহগ্রামের সন্নিকটে লোহাগাব গ্রামে তুকারাম প্রায়ই কীর্তন করিতে বাইতেন । সেই গ্রামের শিবাজী কাঁসারী নিতান্ত অর্থ-গ্নু ছিল এবং তুকারামের নিন্দা করিয়া বেড়াইত । কিন্তু কালক্রমে সে তুকারামের এরূপ ভক্ত হইয়া উঠিল যে, বিষয় কর্ম উপেক্ষা করিয়া যতদিন তুকা লোহাগাব থাকিতেন, মুহূর্তের তরেও তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিত না । শিবাজীর গৃহিণী অত্যন্ত প্রগল্ভা ও মুখরা ছিল । সে স্বামীর পরিবর্তনে মনে মনে অত্যন্ত কুপিতা হইল । পাপীন্দ্রনী একদিন সাধুকে তাহার গৃহে মধ্যাহ্নক্রিয়া করিতে নিমন্ত্রণ করিল । তুকা

বধাসময়ে উপস্থিত হইলে নিষ্ঠুর কাঁসারী-পত্নী উষ্মজলে স্নান করাইয়া দিবার ছলে তাঁহার মস্তকে এক পামলা ফুটন্ত জল ঢালিয়া দিল। তুকার সমস্ত শরীর জলিয়া গেল, তিনি আর্জুনাদ করিয়া মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন—

‘হে কেশব! আমার সর্ব শরীর জলিয়া গেল, শীঘ্র এস, তুমিই আমার মা বাপ।’

জলে মাকী কায়ালাগলা বোণ বা,
ধাব’ রে কেশবা মায়া বাপ।

তুকারামের অগ্নি পরীক্ষার ফল ফলিল। কাঁসারী-পত্নী তুকার ক্ষমা ও ভগবদভক্তি দেখিয়া অবাক হইল। তাহার স্বামী তুকারামের শিষ্টাচার গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিত্য অনুচর হইল।

সারনাথে গৌতমবুদ্ধ পঞ্চশিষ্য সমীপে যে জ্ঞানোপদেশ বলিয়াছিলেন, আজ তাহা ভূম-গুল ব্যাপিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এসিয়ার পশ্চিম প্রান্তে মরুসাগর ভীয়ে ঈশা দ্বাদশ শিষ্যমণ্ডলীতে যে অপূর্ব প্রেম ও বিশ্বাসের জীবন্তত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, আজ তাহাতে কোটি প্রাণ অনুপ্রাণিত হইয়া অলৌকিক কার্যসাধন করিতেছে। বঙ্গ-জননীর দীনকূটরে অধৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীধর, শ্রীবাস, হরিদাস প্রভৃতি মুষ্টিমেয় শিষ্যমণ্ডলীমাঝে মহাপ্রভু শ্রীগোরাঙ্গ যে দেব-দুর্লভ প্রেম ও ভক্তির উন্মাদনায় সংজাহীন হইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহার তরঙ্গায়িত উচ্ছ্বাসে ভারতের দূরদূরান্তর প্রান্তবিশেষ আত্মবিহ্বল হইয়াছে। তুকারামও ৮ জন মুখ্য শিষ্যের নিকট অভ্যাস ছন্দে ‘জীবে দয়া ও নামে রুচি প্রচার করিয়া-ছিলেন, তাঁহার রামেশ্বর ভট্ট, কাঁছোবা, গঙ্গাজী শবাল কড়ুর, কোণ্ডোবালোহো-

কহে, সত্যজী তেলী, জগ লাভে, নাবজীমালী এবং সিবাজী কাঁসারী এতদ্ব্যতীত তুকারামের বহু শিষ্য ছিলেন। শিষ্যদের মধ্যে ১৪ জন এককালে তাঁহার মহাশয় ছিলেন। রামেশ্বর এবং সিবাজী কাঁসারের বৃত্তান্ত পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রধান শিষ্যদিগের মধ্যে ৩ জন ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব ছিলেন, কানাই (কল্‌হোবা) তুকার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মহাপুরুষ-দিগের জীবন ও প্রতিভা বুঝিবার জন্য মহাপুরুষ-কল্প ভক্তের প্রয়োজন। ইঁহার অসাধারণ মহাপুরুষের প্রতিভা এবং লোকসাধারণের ক্ষুদ্রশক্তির সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সমন্বয় এবং সামঞ্জস্য রক্ষা করেন। এই জন্যই পুরাণকার রূপকভাবে বলিয়াছেন, নারায়ণ ধরাধামে অবতীর্ণ হইলে সান্দোপাঙ্গ দেবগণ সঙ্গে সঙ্গে মর্ত্যলোকে অবতরণ করেন। মহাপুরুষ জীবন ঘটনা-বৈচিত্র্যময়। নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও স্ফাল্ন্দ্য-প্রবাহে মানবজীবনের বিকাশ হইতে পারে না। এই জন্যই বিশ্বপতির বিধান তাঁহার বিশেষ রূপার পাত্র প্রতিভার অবতার মহাজন জীবন বিপদ ও দুঃখের ভীষণ ঝড়বাত ৩৩ উত্তাল তরঙ্গের ভিত্তি দিয়া প্রবাহিত হইবে। দুঃখের ঘোরাবর্ত এবং বিপদের কঠোরতা প্রতিভার অন্তর্নিহিতা সুসুপ্ত শক্তিকে জাগাইয়া তুলে। ইহারই নাম জীবন-পরীক্ষা। ইহারই নাম প্রহ্লাদের বিষপান, ঈশার ক্রুশ ও কণ্টক-মুকুট, দ্রোণ-দীর বস্ত্র হরণ, সীতার অনল প্রবেশ। ইহারই নাম শিবের সাগর-মন্ডন, দাতাকর্ণের নয়ন-পুত্তলি বুঝকেতু মাংসে অতিথি-সংস্কার।

মহাপরীক্ষার নকল উড়িয়া যায়, আসল ফুটিয়া উঠে; কৃত্রিম মলিন হইয়া যায়—খাটি আরো অধিক উজ্জল হয়। তুকার জীবন: পরীক্ষা-সমষ্টি। কয়েকটা মহাপরীক্ষার কথা

উল্লেখ করা হইয়াছে। নিখুঁত ব্রহ্মবাদী বেলান্টী ব্রাহ্মণের দর্পচূর্ণ, শোহগাঁব-নিবাসী সন্ন্যাসী-পণ কর্তৃক মহারাজ শিবাজীর শিক্ষক দাদোজী কোণ্ডদেবের নিকট অভিযোগ আনয়ন প্রভৃতি আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরীক্ষা প্রতিপদে তাঁহাকে বেঁটন করিয়া রাখিয়াছিল। পরীক্ষার অনলে দগ্ধ হইয়া তুকার ষশোভাতি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়াছিল। মহারাজ গিরিকন্দর তাহার আলোকচ্ছটার উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সে আলোকে বালবুদ্ধবিনিতা বিস্মারিতলোচনে চাহিয়া দেখিল—তুকার তাগ, তুকার বৈরাগ্য, তুকার প্রেম, তুকার ভক্তি, তুকার ক্ষমা, তুকার ধৈর্য্য, তুকার সাধনা, তুকার সিদ্ধি, তুকার সম্ভাব, তুকার সাধুতা, তুকার জিতেন্দ্রিয়তা, তুকার নিষ্ঠাকতা, তুকার মঠি অথচ স্পষ্টবাদিতা, তুকার স্বাধীনতা-প্রিয়তা, তুকার বালমূলত সরলতা,— আর দেখিল, তুকার হিমাচলের জায় অচল বিশ্বাস।

বাল্যকালে বৃদ্ধা পাংগলিনীর গান শুনিয়া কি যেন এক উন্মাদ নেশায় প্রাণ নাচিয়া উঠিয়াছিল, আজও তাহার অক্ষুটনাদ অহঃরহ কাণে বাজিতেছে—

ঠিক রেখ মন, গুরুর চরণ,
নিরিখ ছেড় না।

নিরিখ ছাড়লে পরে, পড়বারে কেরে,
অধরচাঁদকে পাবানা।

ওতার সাক্ষী দেখ, ভক্ত প্রহ্লাদ,
বিষপানেও সে ম'ল না।

তুকা 'গুরুর চরণ' ঠিক রাখিয়াছিলেন, 'ভিলেকের তরে 'নিরিখ' ছাড়েন নাই, তাই তিনি 'অধরচাঁদ'কে পাইয়াছিলেন। এই 'বিশ্বাসেই' প্রহ্লাদের বিষভাও মৃতসঞ্জীবনী অধার ভরিয়া গিয়াছিল। ইহাকেই বিশ্বা-

সীরা অলৌকিক দৈবশক্তি (Miracle) বলেন।

আবহমান কাল হইতে শিদ্ধি ও সাধনার সহিত অলৌকিক দৈবশক্তি ও যোগবল এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত হইয়া আছে যে, কোথাও কোন সাধুভক্তির আগমন-বার্তা প্রচারিত হইবামাত্র চতুর্দিক হইতে দলে দলে নরনারী রোগ, শোক, তাপ, জ্ঞান হ্রাসী-দারীর কাননা লইয়া তাঁহাকে বেঁটন করে। অন্ধের দৃষ্টি, মূকের বাক্শক্তি, কুষ্ঠাতুরের রোগমুক্তি, থগের চলচ্ছক্তি, বক্ষ্যার পুত্র লাভ, জ্ঞানাত্ম্য মকদ্দমার জয় প্রার্থনা, উসেদারের চাকরী, বন্দীর বন্ধন মোচন, দরিদ্রের ধনলাভ, ভূতভবিষ্যৎ ও মনোভাব গণনা এবং বিদ্যার্থীর পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা, আবেদন নিবেদনের দার্ষ তালিকায় স্থান লাভ করে। এই সকল ক্ষুদ্র 'স্বার্থ' সিদ্ধিই সাধুত্বের পরীক্ষা। ভবজালা শান্তির নিমিত্ত, সংসঙ্গ সম্ভোগের মানসে, হৃদয়ের টানে, তবজিজ্ঞাসু হইয়া করজ্ঞন সাধু সন্নিধানে বাইয়া থাকেন? ধর্ম্মের জন্ত আকাজ্জ। ও ব্যগ্রতা লইয়া বিজয়-কৃষ্ণ গয়াধামে রামশিলা ও ব্রহ্মযোগী পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়াছিলেন, তাই তিনি আকাশ-গন্ধার শিলাতলে মহাপুরুষ-প্রসাদ লাভ করিয়া ধন্ত হইয়াছিলেন।

জৈস, মুসা, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি সেকালের সাধুরা 'অলৌকিক যোগবল ও বিভূতির পরিচয় প্রদান করিয়া অবতারে পরিণত হইয়াছিলেন। শঙ্কর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি মধ্যযুগের সাধুরা অমাত্তরিক শক্তির আভাস দিয়া ধর্ম্মনেতৃত্বে বরিত হইয়াছিলেন। ত্রৈলোক্যস্বামী, গোবিন্দ স্বামী, বারদির ব্রহ্মচারী, মঙ্গলনাথ বাবাজী প্রভৃতি সাধুভক্তগণ অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন বলিয়াই একালে 'মহাপুরুষ

বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। দেবতাদের পর্য্যন্ত এই মহাপরীক্ষার হস্ত হুইতে নিস্তার নাই, কণির নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত কিনা, তাহা প্রমাণ করিবার জন্ত লোকের ভয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধার যোগ্য হইবার জন্ত তাঁহাদিগকেও দৈবশক্তি প্রকাশ করিতে হয়। বিশেষতঃ এই ভারতে, এই দৈববাণীর দেশে, এই যোগৈশ্বর্য্য ও বিহুতির দেশে, এই যাহ্মমন্ত্র ও ইন্দ্রজালের দেশে, সাধু সাধুই নহেন, যদি তাঁহার অসম্ভব সম্ভব করিবার শক্তি না থাকে। সাধু আপনাদের ভাবে বিভোর থাকিলেও লোকে তাহা মানিবে কন? তাঁহার অসম্পূর্ণ বাণী, অব্যক্ত হাসি, অর্থহীন ইঙ্গিত, অনন্ত শাখা প্রশাখাবৃত্ত হইয়া, নানা রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া, নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া জনসমাজে প্রচারিত হয়। তাঁহার অমূল্য শিষ্য অমূল্য শিষ্যমণ্ডলী তাঁহাতে অর্থযোজনা করেন এবং দৈবশক্তি আরোপ করেন।

জীবনীকার মহোপতি গ্রন্থে তুকারামের ঐশীশক্তি সম্বন্ধে অনেকানেক অলৌকিক ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। তুকার অভঙ্গ গাথায় সে সকল বিবরণের কোন সংশ্রব পরিকার-ভাবে অহুসন্ধান করিতে পারা যায় না। কিন্তু ছইটা ঘটনা সম্বন্ধে তুকা স্বয়ং কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছেন। ভক্ত তুকা বিশ্বাস করিতেন, নারায়ণের কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে।

কথিত আছে, লোহগাঁব গ্রামে কীর্তনের সময় একদা কোন পুত্র-শোকাতুরা জননী তাহার সন্তানের মৃত দেহ বাবাজীর সম্মুখে রাখিয়া প্রাণের আবেগে কহিল, “বাবাজী তোমার যদি ভগবানে যথার্থ প্রেম ও ভক্তি থাকে, আমার সন্তানের জীবন দান কর।” বিশ্বাসী তুকা ইষ্টদেবতাকে ডাকিয়া কহি-

লেন—“হে নারায়ণ! নিজীবের চেতনা আনয়ন করিতে তুমি ত অক্ষম নও।”

অশক্য তাঁ তুঝী নাই! নারায়ণা, নিজীবা চেতনা অণোবরা।

এবং প্রার্থনা করিলেন—“হে দেব! তোমার শক্তি ও মহিমা প্রকাশ করিহু আমা-দের চক্ষু সার্থক কর।”

তুকাঙ্গাণে মাঝে নিববারে ডোলে, দাচুণি সোহালে সামর্থ্যাঁচে।

মহীপতি বলেন, জনমণ্ডলী বিশ্বাসে দেখিল, ভক্তের আস্থানে অসম্ভব সম্ভব হই-য়াছে, মৃতশিশু জননীর স্তন্যপান করিতেছে।

আর একবার চিকণড় গ্রামের চিস্তামণি দেব নামক এক অতি প্রসিদ্ধ গাণপত্য ব্রাহ্মণ তুকাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন এবং উভয়ের ভোজনের জন্ত পরিবেশন করাই-লেন। মহীপতি বলেন, তুকার স্বরণে উভ-য়ের ইষ্টদেবতা নারায়ণ ও গণপতি আসিয়া নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করিলেন। চিস্তামণি ও তুকা স্বচক্ষে দেবলীলা দেখিয়া চরিতার্থ হই-লেন। তুকা গাহিলেন—

বাজা গাই ছুথতী, দেবা ঐশী তুঝী খ্যাতি।

কিন্তু সময়ে জনসমূহ কিছুই বুঝিল না, কেবল দেখিল অন্নপাত্র শূন্য হইয়াছে। ঋগ্বেদ পদ্মপাশলোচন ঋগ্বেদ দেখিতেন, অজ্ঞে কি বুঝিবে?

তুকা লীলা করিতে আসিয়াছিলেন, অমৃত লীলা সাজ করিয়া তিরোহিত হইলেন। হিমালয়-মুতা জাহ্নবী দীর্ঘপথ বহিয়া অবশেষে প্রাণের বঁধু সাগরবক্ষে আপন্যা ঢালিয়া দিয়া তাহার অস্তিত্বে আপন অস্তিত্ব মিশাইয়া চিরশান্তি লাভ করে। উম্মাদিনী পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া দেশ দেশান্তর ঘুরিয়া, তুকা-কর্তৃক বারিদান কুন্দিয়া, বৃদ্ধবৃদ্ধকে উর্ব্বরা,

করিয়া, শুক দেশকে আর্দ্র করিয়া বৃহস্কৃতকে অন্নদান, করিয়া নীরসকে সরস করিয়া, মলিনতা আবর্জনা দ্বিত করিয়া, চরণরেণুতে লোহকে কাঞ্চনে পরিণত করিয়া, জোড়া-ভূমিকে সূক্ষণা সূক্ষণা শস্ত্রশ্রামলা করিয়া আপনার লীলা সমাপন করে। তুকার জীবন ঐ প্রকৃতিনন্দিনী কুলকুলনাদিনী শ্রোতবিনীর জায়। তুকা জন্মিয়াছিলেন—দেবতা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, গন্ধর্ব্ব হ্রস্তুতি বাজ করিল, অম্বরী নৃত্য করিল, কিম্বর গান করিল, মণয়জ বহিল, বিহঙ্গ কলরব করিল, চন্দ্রমা হাসিল, তারা জাগিল, প্রকৃতি মধুর হাসি হাসিয়া নবমাজে সজ্জিত হইল। স্বভাবের শিশু তুকা লীলা করিলেন—নিন্দা স্তুতি হইল, অশুভ শুভ হইল, শুকতরু মুঞ্জরিত হইল, নাস্তিক-আস্তিক হইল, রত্নাকর সাধু হইল, পাবাণ গলিয়া তরল হইল, মরুতে উৎস ছুটিল, অসম্ভব সম্ভব হইল, ভীমা ইজ্ঞায়াপী উজান বহিল, মৃত সঞ্জীবিত হইল, মহারাষ্ট্র জাতিতে জীবন সঞ্চার হইল, মহারাষ্ট্র অজি গৌরবে মস্তক তুলিয়া গগনস্পর্শ করিল, প্রেম, ভক্তি, পুণ্য ও আনন্দের তরঙ্গ ছুটিল। তুকা লীলা সাঙ্গ করিলেন—আবার ত্রিদিবে হ্রস্তুতি বাজিল, পারিজাত বৃষ্টি হইল, বৈকুণ্ঠ হইতে রথ নামিয়া আসিল, দেবকভাগব বরণডালা সাজাইয়া আনিলেন, তুকা মহা-পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে সশরীরে অন্ত্যধামে প্রিম সমাগমে চলিলেন, জগৎ রোদন করিল।

“তুম্ হাঁসো জগরোর।”

পুণ্যলোক হরিস্তম্র অসাধারণ ত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা ও সাধনার বলে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতেছিলেন। কিন্তু অতীত সদহুষ্ঠানের গৌরব ভুলিতে পারেন নাই, আত্মপ্রসাদ

বিস্মৃত হইতে পারেন নাই,—এরূপ তাঁহাকে অর্দ্ধ পথে ত্রিশঙ্কর জায় অবস্থান করিতে হইল।

আর তুকা? মান অপমান, পাপ পুণ্য, সুখ দঃখ, ভাল মন্দ, ব্যক্তির ও স্বতন্ত্রতা সমস্তই জ্বাকেশ চরণে সমর্পণ করিয়া তুকা, ফকীর হইয়াছিলেন। তাই তিনি দিব্যাধানে আরোহণ করিয়া অলঙ্কারহীন প্রয়াণ করিলেন। এ মহা প্রয়াণ কেহ দেখিল না। কেহ জানিলও না। নীলাধরুর্ধ্বতে জগন্নাথ-ক্ষেত্রে ত্রিচৈতন্তের তিরোভাব কেহ দেখিয়া-ছিলেন, নানকের সংজ্ঞাহীন দেহের তিরো-ধান কেহ জানিয়াছিল না, তুকারাম ও লোক-চক্ষুর অগোচরে নীরবে যোগস্থ হইয়া কোথায় কি ছলে অন্তর্দ্বান হইলেন, তাহা শরীরী মানব বুঝিল না। ভক্তমণ্ডলী ঘোষণা করিলেন:—

১৫৭১ শকে বিরোধী নামা বঙ্গের ফাস্তান মাসে কৃষ্ণ দ্বিতীয়া তিথিতে চন্দ্রবাসরে দিব্যভাগের প্রথম বামে স্বর্ণ হইতে বিষ্ণু দূত অবতরণ করিয়া তুকারামকে বৈকুণ্ঠের রথে দিব্য লোকে লইয়া গেল, তিনি সশরীরে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন।

তুকা বৈসলা বিমানী সন্ত পাহাভীলোচনী।
দেব ভাবাচা তুকেলা, তুকা বৈকুণ্ঠানী বেলা।

তুকা স্বর্গীয় রথে উপবেশন করিলেন, সাধুরা চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, দেবগণ ভক্তির জন্ত ক্ষুধিত হইয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেলেন। দেহ গ্রামে সম্ব-রক্ষিত হস্তলিখিত তুকাচরিত ও অভয় গ্রন্থের অন্তে লিখিত আছে—

“সর্কে ১৫৭১ বীরাধিগাং সংবছরে: সীমগা (ফাগুন) বন্ত (কৃষ্ণ) দ্বিতীয়া: বার সোমবার: বে দীবসী: প্রাঃখ কালী: তুকাবানী: তীর্থাস

প্রয়াণে কৈলেন তত ভবতুঃ মঙ্গলং ।”

তুকা তীর্থ প্রয়াণ করিয়াছিলেন । এই তীর্থ প্রয়াণই তাঁহার মহাপ্রয়াণ, যেহেতু তাঁহাকে আর কেহ কখনও দেহগ্রামে ফিরিয়া আসিতে দেখে নাই । এইরূপে তুকার তিরাভাবের অদ্ভুত গ্রহেলিকার রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে । এইখানে তুকার জীবন-নাট্যের যবনিকা পতন হইল ।

তুকার সশরীরে ব্রহ্মপ্রাপ্তি একেবারে অমূলক করনা নহে । তিনি জীবনের শেষ ভাষে নির্লিপ্তভাবে ব্রহ্মপদে নীল হইয়া-ছিলেন । ভক্তিমার্গে লাধনা আরম্ভ করিয়া তুকা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । তখন তিনি ভ্রম্য হইয়া পরমায়ার সামোপ ও সাযুজ্য সম্ভোগ করিতেন এবং সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতেন—জলে বিষ্ণু, স্থলে বিষ্ণু, বিষ্ণু সর্ব-ঠাই ।

তুকা বলিতেছেন—

তুচ্ছাণে আক্ষা একান্তাকাবাস,
ব্রহ্মা ব্রহ্মরস সের্ব সদাণ ।
তুকা বলে মোর নির্জনেভেবাস,
ব্রহ্মে ব্রহ্মরস সেবি সদা ।

অন্তঃ—ধন্ত তে হী ভূমী ধন্ত তরুণ,
ধন্ত তে সরোবর তীর্থরূপ ।
ধন্ত ত্যা নরনারী মূল্যো নামধ্যান,
আনন্দে ভবন গর্জতসে ।
ধন্ত পশু পক্ষী কীটক পাষণ,
অববা নারায়ণ অবতরণ ।
তুচ্ছাণে ধন্ত সংসারান্তে আলী
হরিরঙ্গী রঙ্গনী সর্বভাবৈ । ইত্যাদি ।

কথিত আছে, একদা অনন্দীরদেব-মন্দিরে অর্জুনবৃক্ষতলে একদল পক্ষী তুকাকে দেখিয়া উড়িয়া গিয়াছিল । ইহাতে তুকার প্রাণে দাক্ষণ আঘাত লাগিল । তিনি ভাবিলেন, ‘কি আমার এখনও চিত্তভক্তি হয় নাই—এখনও আমার মধ্যে পশুপক্ষীর ভয়ের কারণ আছে ।’ তুকা সমাধিস্থ হইয়া বৃক্ষতলে দুগুণ-মান হইলেন, স্থাপুর ভায় নিশ্চল তুকার মস্তকে পাখীরা নির্ভয়ে উড়িয়া আসিয়া বসিল । এই অবস্থাকেই আমরা সশরীরে ব্রহ্মত্বলাভ বলিতে পারি ।

ইসলাম ও হিন্দুধর্মের বিষয় সংঘর্ষে ভারত

এক আগরণের যুগ আসিয়াছিল । আরবের বিখাসদণ্ডে ভারতের প্রেমমাগর মন্থিত হইয়া যে সকল মনি-মুক্তা-প্রবালের উদ্ভব হইয়াছিল, তন্মধ্যে নানক, কবির, চৈতন্য ও তুকারাম কোস্তভর ।

তুকারাম বিঠবা সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন । রামানন্দ, রামাহজ, কবির, চৈতন্য, তুঙ্গসীদাস ও তুকারাম সকলেই বৈষ্ণব—কেবল ইষ্ট দেবতার রূপভেদমাত্র । রেতাযুগে ভক্ত গন্ধ-ডের জন্ত দেবতাকে ধর্মরূপ ছাড়িয়া শব্দ চক্র গদাপন্ন ধারণ করিতে হইয়াছিল, যাপরে ভক্তকুলনারক মহাবীর পদ্মনন্দনের মনরূপ করিতে দেবকী-সুতকে বাঁশরী তাগ করিয়া তীরধর্ম করে লইতে হইয়াছিল, ভক্ত তুঙ্গসীদাস বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ-মন্দিরে সীতারামরূপ নিরীক্ষণ করিয়া নয়নের পিপাসা মিটাইয়া-ছিলেন । কিন্তু চৈতন্য হরিশ্চন্দ্র গুনিয়া উন্মত্ত হইতেন, গোরা ‘রা—রা’বলিয়া চেতনা হারাইতেন, তিনি আঠারো নানা ইহাতে জগ-রাখদেবের ধ্বজা দেখিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া-ছিলেন, সাগরের নীলজল দেখিয়া ভাবাবেশে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলেন । তিনি দেখি-য়াছিলেন, তাঁহার রাধা কৃষ্ণ, হবি, রাম, গোবিন্দ ব্রহ্মাণ্ডময় এবং তিনি বিশ্বিয়াছিলেন—এজগৎ ব্রহ্মময় । তাঁহার স্বপ্নশিখা তুকারাম বিঠবা নাম জাবনের সার করিয়াছিলেন সভ্য, কিন্তু তাঁহার চিত্ত সাম্প্রদায়িক সন্ধীর্ণতার কলুষিত ছিল না । তুকা জানিতেন, তাঁহার উপাস্তদেবতা বিঠবাই পণ্ডরনাথ এবং পাণ্ডুরঙ্গ, রানকৃষ্ণ হরি এবং গোবিন্দ নারায়ণ—পরমাত্মা পর-ব্রহ্ম । তাই তুকা ‘হরিরহাং ভেদ নাহা’ কার্কনন্দে বাদ উপদেশ দিয়াছিলেন । চিন্তামণি দেবের ইষ্টদেবতা গণপতিকে স্বয়ং আস্থান করিয়া আনিয়াছিলেন, ‘বিঠবাচরণ ন মোড়ে’ । কহিয়া করুণ আর্তনাদ করিয়া-ছিলেন, ‘রূপেচা সাগর পাণ্ডুরঙ্গ’ বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ‘কোণামুখে ঐশী একেন মীমতে, চালতু পক্ষিনাথ বোলবিতো’ বলিয়া ‘গোপি কাঞ্চ্যাপতী’কে পত্র লিখিয়াছিলেন । তিনি রঘুনাথকে স্বরণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

রাম কহে সৌ ভলায়ে,

বিন রামসে বীথ ।

এবং আরো কহিয়াছিলেন,—

কৃষ্ণ মাঝী মাতা, কৃষ্ণ মাঝা পিতা,
বহিনী বন্ধু চুলতা কৃষ্ণ মাঝা ।

কৃষ্ণ মাঝা গুরু কৃষ্ণ মাঝে তাক
উত্তরী পৈল পার ভবনদীচী ।

কৃষ্ণ মাঝে মন কৃষ্ণ মাঝে জন
সোইবা সজ্জন কৃষ্ণ মাঝা ।

তুকা 'মেঘশ্রামবর্ণ হরি,' 'শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-
ধারী পুরুষোত্তম'কে স্তুতি করিয়াছিলেন এবং
বাবাজীর নিকট স্বপ্নে রামকৃষ্ণ হরি ইষ্টমন্ত্র
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি 'গোবিন্দাচী
আবড়ীজীবা গাঠিয়াছিলেন, নিজীবের চেতনা
আনিতে নারায়ণের স্মরণপত্র হইয়াছিলেন,
এবং সদা ব্রহ্মী ব্রহ্মরস সেবন করিয়া সিদ্ধ
হইয়াছিলেন। স্মৃতরাং বিঠবা-সেবক তুকা-
রামের সার্বভৌমিক উদার ধর্মমত ছিল,
তিনি দেহ গ্রামের বিষ্ণু মন্দিরে সাত্ত্ব ও
অনন্তের অপূর্ব মিলন-মাধুরী দেখিয়া মুগ্ধ
হইতেন। তুকারামের অভঙ্গ গাথা বিঠবা
সম্প্রদায়ের একমাত্র কবি এবং ধর্মোপদেষ্টা
ছিলেন না। ধবলগিরি ও কাকনজ্জবা বেনন
গৌরীশঙ্করের অস্তিত্বের আভাস দেয়, সেই-
রূপ পূর্ববর্তী মহাপুরুষেরা বিশেষ প্রতিভার
আগমনবার্তা ঘোষণা করেন। দ্বাদশমহু
বৈবস্বত মহুর আবির্ভাব সূচনা করিয়াছিলেন,
সলোমন, ডেভিড, মুশা, জন প্রভৃতি ঋষিগণ
মেশিয়া ঈশার জন্মবার্তা প্রচার করিয়াছিলেন,
কত সাংখ্যবাদী বুদ্ধ তীর্থঙ্কর মহাবীর ও মহা-
বুদ্ধের আভাস দিয়াছিলেন, নিত্যানন্দ,
অম্বৈত ও কেশব ভারতী প্রেমের হকার
করিয়া প্রতিভার পূর্ণাবতার ত্রীগোরাঙ্গের
পূর্বপরিচয় দিয়াছিলেন। জ্ঞানদেব, নামদেব,
একনাথ প্রভৃতি তুকার পূর্ববর্তী সাধুগণও
বিঠবা মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন। তুকা
এই সম্প্রদায়ের অত্যাশ্চর্য—বিবর্তনের
চরম পরিণতি ।

মহাপুরুষ প্রতিভার আবির্ভাব কোন
যুগেই অকস্মাৎ হয় না। প্রাকৃতিক বিধান
এবং বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের নিয়মামুসারে
স্তরে স্তরে শক্তি পুঞ্জীকৃত ও ঘনীভূত হইয়া
একজন বিশিষ্ট নরপুংস্বত্রমপরিণতির লীমা

নির্দেশ করিতে অবতীর্ণ হন। তিনিই পূর্ব-
শক্তি,—মানব রূপী দেব, লোকপূজ্য, লোক-
শিক্ষিত মহাপুরুষ। এই মহাপুরুষেরা হিত
সংরক্ষণ করেন, লুপ্তবেদ উদ্ধার করেন, সাধু-
দের পরিভ্রাণ করেন, পাশাশ্বাদের বিনাশ
করেন, অতি মানীর দর্প ধ্বংস করেন, দুর্নীতির
বিনাশ করিয়া সুনীতি প্রতিষ্ঠা করেন, এবং
ধর্ম সংস্থাপন করেন।

মহুর সমাজ ও ধর্মনীতি লোক-শাসন
করে, ঈশার নবসংহিতা ত্রীষ্টবাদীদের বেদ,
পরেশনাথ ও বুদ্ধের জ্ঞান উপদেশ, জৈন ও
বৌদ্ধদিগের মহানির্বাণতত্ত্ব, মহম্মদের অলস্ত
বিশ্বাসের কথা, মুসলমানের আল কোরাণ,
নানকের অমুশাসন গ্রন্থ তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী
সচন্দন পুষ্পে ভক্তিভরে অর্চনা করে এবং
মাধুলী করিয়া শিরে ধারণ করে। গোরাঙ্গের
প্রেম-গদগদ ভাষ বৈষ্ণবের চৈতন্ত-ভাগবত,
এবং তুকারামের ভক্তি বিশ্বাসের অভঙ্গ গাথা
বিঠবা-উপাসকদিগের ধর্ম পুস্তক ।

ভাবুক কবি তুকার নির্মল, স্বচ্ছ, সরল,
সরস, প্রাণম্পর্শী অভঙ্গ মহারাষ্ট্র জাতির আদ-
রের ও গৌরবের সামগ্রী। সরল ভাষায়,
সহজ কথায়, ভাবের অনাবিল স্বতঃপ্রবাহে
তুকা প্রেমভক্তি ও বিশ্বাসের গান গাহিয়া-
ছেন, নীতি উপদেশ করিয়াছেন, ধর্মের পূর্ব-
সমস্তা মৌমাংসা করিয়াছেন এবং জীবনের
পরীক্ষিত সত্যের প্রমাণ দিয়াছেন। তাহাতে
স্বার্থের পুতিগন্ধ নাই বা সংসারের আবি-
লতা নাই। সে মুক্ত প্রাণের জীবনবেদ,
নিসর্গের নির্মল-স্বচ্ছ-স্ফটিক উৎস, ভবতাপ
শাস্তি করে। তাহার ছজে ছজে ভক্ত কবির
বিশুদ্ধ পুণ্য জীবন প্রতিবিম্বিত এবং শিশু-
মূলভ সারল্য উদ্ভাসিত। তাহার কঠোর
সত্যের অমুশাসনও কেমন এক রকম ললিত
মাধুরীমাধা এবং উপদেশ—বেন সন্তপ্ত প্রাণে
নবনীত-বিনিমিত কোমল ও হৃদয়-কর-
ম্পর্শ। সে সহজ-সরল-সংক্ষিপ্ত-মধুর ভাষার
কোমল-এক রকম টান বে, তাহা অস্তিমজ্জা
ভেদ করিয়া প্রাণ মন কাড়িয়া লইয়া না
আনি কি এক অজ্ঞানিত নন্দনকাননে ছাড়িয়া
দেয়। তাই সিদ্ধিয়া ও হোলকারের রাব-
প্রাসাদে, 'হরিদাসের' (কথক) বেদীতে এবং

দরিদ্রের পৰ্বকুটীরে আজ মুখে মুখে তুকার অভঙ্গ গীত হইতেছে ; রামদাস ও তুকারাম স্বামী মহারাষ্ট্রদেশে দেবতার স্তায় গৃহে গৃহে আদৃত ও পূজিত। এমন দেবতার হস্তে যে জাতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ভার ছিল, সে জাতির জাগরণ-অলীক কল্পনা নহে।

তুকার কবিতা বিষয়-বৈচিত্র্যে গুরু—ভাষার মাধুর্য্যে গুরুতর। ভাঙ্গা সংস্কৃত ও তাঁহার নিজস্ব প্রাকৃত তুকারচিত অভঙ্গের বিশেষত্ব। বিরাগা, কোড়ে, ফুগত্যা, লখোটা, চম্বরী, হমামা, গাই, দলগ, হাল, অতুহ, বাহুদেব, জোগী, মুঁতা, মলঙ্গ, গোন্ধন, কণ্ডে, বাঘা, ললিত, আশীর্বাদ, দসরা, নাট, ধুবক, পাইক, সাখা, আরতী প্রভৃতি বহু বিষয়িনী অভঙ্গ গাথা তুকার কবিত্বের পরিচয় দিতেছে এবং তাঁহার ধর্ম্ম-মত, নীতি উপদেশ ও সরল প্রাণের আবেগ-ধর্ম্মী ভাষা স্তরে স্তরে ধরিয়া রাখিয়াছে। শাক্তাবর অভঙ্গে শাক্তদিগের ধর্ম্ম ও প্রাণহীন পঞ্চমকার সাধনে তীব্র কটাক্ষ আছে। এতদ্ভিন্ন ভাগীরথীর নিকট ও পট্টননাথের নিকট পত্র তুলসীদাসের বিনয় পত্রিকা স্মরণ করাইয়া দেয়। রাম চরিত্র ও হনুমন্তস্ততি তুকার রামভক্তির সঙ্গে সঙ্গে কোশল রাজ-কুমারের দাক্ষিণাত্যে প্রতিপত্তির আভাস দেয়। ‘দরবেশ’ অভঙ্গ হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষ ও সম্মিলন যুগের ভাষার একটু নমুনা। ‘লোহর্গাব’ গ্রামে চক্রবেড়া (seize) সম্বন্ধীয় অভঙ্গের ঐতিহাসিক মূল্য তুচ্ছ করিবার নহে। ব্রহ্মচারীদিগের রাজস্বারে অভিযোগ, মহাজী গোঁসাই, সঙ্গুরু রূপা, জীর কর্কশ ভাড়া, উচ্চ জলে শরীরে জালা, নাথদেব ও পাণ্ডুরঙ্গের স্বপ্নাদেশ, সপ্তদিগের প্রলোভনে নিজের বৈরাগ্যের ইতিহাস কখন, ব্রহ্মকায় লাভ, সিবাঙ্গী প্রসঙ্গ, জীর প্রতি উপদেশ, অলকাপুরী, ত্রয়োদশ দিবস অনশন ও অনিদ্রা প্রভৃতি অভঙ্গে তুকার জীবন দর্পণের স্তায় প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। তুকারাষের ভাষা বিচার করিবার শক্তি আমাদের নাই। জাতীয় সাহিত্যে তাঁহার কাব্য ও ছন্দের স্থান নির্দেশ করাও এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। নবদীপে শতীদেবীর

‘গৃহে’ যে প্রেম ও ভক্তির অনল ধুমায়মান হইয়া প্রদীপ্ত হইয়াছিল, পললাবৃত বঙ্গের আর্দ্র-ভূমিতে ও তৃণক্ষেত্রে তাহা জ্বালায়া উদ্ভাবন হইয়া গেল। কিন্তু তাহার একটি বাত্যা-বিভাদিত ফুলিঙ্গ মহারাষ্ট্রীয় পার্বত্য অরণ্যে কি ভীষণ দাবানল উৎপাদন করিয়াছিল! আমরা বিশ্বাসে তাহার প্রকাশ, প্রসার ও পরিণতি অনুসরণ করিয়াছি। তুকার নৈসর্গিক ধর্ম্মবৃত্তি কিরূপে মুকুলিত ও বিকাশিত হইয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিবার, ভাবিবার ও বুঝিবার বিষয়। অরণ্যের ফুল আপনি ফুটিয়া সুবাস বিলাইয়াছিল। সে সৌরভে মহারাষ্ট্রের পশুপক্ষী মাতিল, বৃক্ষলতা মাতিল, অলিকুল মাতিয়া গুল্লন করিল। এই সেদিন দক্ষিণেখরে আমাদের গৃহকোণে আর একটি বনকুসুম আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রাণ-মাতোয়ারা সৌরভ মলয়-হিল্লোল বহন করিয়া সাগর মহাসাগরের পরপারে বিলাইয়া দিয়াছিল। সে পারিজাতের আশ্রা-নেশায় বিভোর হইয়া স্বরপুং, নরপুং, নাগপুং এখনও বিহ্বল নৃত্য করিতেছে।

মহীপতি তুকারামের জীবনী লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহা অতিরঞ্জিত ও কল্পনাময়। দেখ গ্রামে তুকার পরিবারে তুকার জ্যেষ্ঠপুত্র মহাদেব বাবার হস্তলিখিত পুথি সমস্ত রক্ষিত আছে। বিঠবা-ভক্ত-জীবনীকার ত্রিবেঙ্কর হস্তলিখিত পুস্তকেও তুকারামের জীবনী পাওয়া যায়। পণ্ডুরপুরেও তুকারামের চিত্র অভঙ্গগাথার হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছিল। তুকারামের অন্ততম শিষ্য গঙ্গাজী মবাল তুকার অভঙ্গ লিখিয়া রাখিতেন। মুম্বই সহর হইতে সরকার বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতার “ইন্দু প্রকাশ” মুদ্রাঘরের সহায়িকারী মহোদয়-গণ ১৮৬৯ খ্রীঃ তুকার অভঙ্গগাথা দুইখণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। মাননীয় বার-ণেট সার আলেকজান্ডার গ্রাণ্ট ১৮৬৭ খ্রীঃ অঙ্গের জাহাজারী মাসের পার্শ্বিক সমালোচনী Fortnightly Review-তে তুকারাম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় কোন জীবনীই সম্পূর্ণ অবিকৃত নহে। তুকারামের স্বরচিত অভঙ্গেই তাঁহার জীবন, নীতি ও ধর্ম্মমতের অবিকৃত চিত্র প্রচ্ছন্ন

রহিয়াছে। যে কয়েকটা অভঙ্গচরণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেই তুকারাজীবনের আভ্যন্তরীণ স্রোতের স্পষ্ট অনুমান করিতে পারা যায়।

তুকা সংসারের খরতাপে সন্তপ্ত ও ক্লিষ্ট হইয়া শান্তির আশায় বিঠবাচরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন। ‘চুরত ব্যাকুল হোই’—নহিলে প্রথমদ লাভ ভাগ্যে ঘটে না। বহিঃরঙ্গ সাধনেই তাঁহার ধর্মজীবনের পরিসমাপ্তি হয় নাই। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কেমন এক রকম বিষয়তৃষ্ণা ও নামে রুচি ছিল। ধর্মের বহিঃরঙ্গ নির্জীব অসার বৃথা কর্মকাণ্ডের অর্থহীনতা উপলব্ধি করিয়া তিনি ব্যথিত হইতেন। যোগসাধনের কোন নির্দিষ্ট প্রণালীতে তিনি আবদ্ধ রহিলেন না, গণ্ডাবিশেষের সীমাত্ত্ব রহিলেন না, শাস্ত্রোক্ত অষ্টবিধ ভাবের কোন একটিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া সাধন অনুষ্ঠান করিলেন না। প্রাণের টানে, ভগবৎ রূপায়, বিধাতার বাণী তাঁহাকে যেরূপ চালাইল, তিনি স্বাধীনভাবে চলিলেন। ধর্ম পুস্তকেব এবং সমাজ শাসনের কঠিন নিগড়ে তিনি বঁধা পড়িলেন না, জীবন-বেদে যে সকল অমোঘ সত্য প্রকাশিত হইল, তাহা কার্য্যে প্রতিপালন করিলেন। বিনয়ে ও দীনতায় তিনি লবু হইতেও লবুতর হইলেন—মতের স্বাধীনতায় তিনি মহৎ হইতেও মহত্তর হইলেন। প্রতিভার অবতার তুকারাম জীবনের পরীক্ষিত সত্য প্রচার করিলেন—শূদ্র হইয়াও ধর্মোপদেশের আসন গ্রহণ করিলেন। প্রাণের আকর্ষণে প্রাণ ছুটিয়া আসিল—জীবন্ত সত্য পাষণ ভেদ করিয়া হৃদয় দ্বারে আঘাত করিল। আভিজাত্যের আসন টলিল, বৃথাভিমानी গর্বশ্রীত অন্ধ ব্রাহ্মণ, নিরঙ্কর শূদ্র, তুকার উপদেশে, কথায়, জীবনে ও অভঙ্গে ঋষি-প্রচারিত বৈদিক জ্ঞান ও সত্যের প্রকাশ দেখিয়া স্তম্ভিত

হইল, ধর্মের নামে অধ্যাত্মস্থান করিল। অত্যাচারে ও নির্যাতনে তেজস্বী তুকা দমিলেন না। তুকা ‘তুকা’ (পরীক্ষা) পার হইলেন। অগ্নি পরীক্ষার তুকার প্রতিভা ও নিকলঙ্গ ধর্মজীবন অবিকতর উজ্জল ভাবে দীপ্তি পাইতে লাগিল। রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, আপামর সাধারণ সকলেই তুকার চরণে মস্তক অবনত করিল। নারায়ণের মহিমা দেখিয়া তুকার প্রাণ গলিয়া গেল। তুকা প্রেমোন্মত্ত হইয়া দেখিলেন, তিনিই পিতা, তিনিই মাতা, তিনিই বন্ধু, তিনিই সর্বস্ব। তুকার ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইল, তিনি ব্রহ্মজ্যোতি দর্শন করিয়া ধস্ত হইলেন। সাধনা সিদ্ধি লাভ করিল—ভক্ত ওন্নয় হইয়া সচ্চিদানন্দ রূপে মগ্নিয়া গেলেন, ঐক্যত্বের অপূর্ণ লীলা-মাধুরী সন্তোগ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তুকা বুঝিলেন, তাঁহাকে আর সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াতের ক্লেশ পাইতে হইবে না—তিনি বৈকুণ্ঠের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছেন—জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া ব্রহ্মরও নির্বাণ লাভ করিতেছে।

ভক্তমণ্ডলীর নিকট আনন্দে বিদায় গ্রহণ করিয়া তুকারাম মহা যাত্রা করিলেন—আর মর্ত্যালোকে ফিরিলেন না। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত সত্য, তাঁহার রচিত অভঙ্গ গাথা, তাঁহার ধর্ম ও নীতি উপদেশ, তাঁহার প্রাণ-শক্তি, ভেদব্রীতা ও স্বাধীনতা-সুখ প্রচারিত ও অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সমগ্র মহারাষ্ট্র জাতিতে ওতপ্রোত ভাবে আজও জীবন্ত রহিয়াছে। যতদিন জগতে ভাষা ও মানব জাতির আন্তর্য থাকিবে, ততদিন ভক্তকবি তুকারাম অমর। এক তুকা সহস্র অংশে বিভক্ত হইয়া সহস্র মূর্তিতে চিরজীবী রহিবেন।

সম্পূর্ণ।

শ্রীরসিকলাল রায় ।

• গিরিজাপ্রসঙ্গ : (৬) •

গীতাশাস্ত্রে গিরিজাপ্রসঙ্গের প্রগাঢ় অঙ্গ-
রাগ ছিল, তিনি গীতার অমৃতময় শ্লোকগুলি
আবৃত্তি করিতে করিতে তন্ময় হইয়া পড়ি-
তেন। কোন কোন দিন প্রেমাত্মক তাঁহার
গণ্ড বাহিয়া ধারায় নির্গত হইতে থাকিত।
এই ব্রহ্মচর্য্যই তাঁহার শরীর সৰল ও স্নদূঢ়
করিয়াছিল, মনে তেজ জন্মাইয়া দিয়াছিল,
ভগবৎ রাষ্ট্রের প্রবেশ দ্বার তাঁহার নিকট
মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়াই
গিরিজাপ্রসঙ্গ এক স্বর্গীয় জ্যোতি লাভ
করিয়াছিলেন। সে জ্যোতি দর্শন করিলে
নয়ন রঞ্জিত হইত, হৃদয় আনন্দে উৎফুল্লিত
হইত। দর্শনের পিপাসা যেন কিছুতেই
নিবৃত্তি হইতে চাহিত না। বলা বাহুল্য যে,
গিরিজাপ্রসঙ্গের সহধর্ম্মিণী গিরিজাপ্রসঙ্গকে
সর্ব্ববিধ ধর্ম্মাঘূর্ত্তানে সাহায্য করিতেন।
গিরিজাপ্রসঙ্গ এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালনের
জন্ত আর একটি গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,
সেটা প্রাচীন কালের ঋষিদের প্রতি অমুরাগ।
বলিতে কি, এই ব্রহ্মচর্য্যই তাঁহাকে স্বদেশ-
প্রেমে উত্তেজিত করিতে ও উহা কি গুণে অপর
দেশ অপেক্ষা অধিকতর পূজ্য, তাহা বুঝাইয়া
দিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই ব্রহ্মচর্য্য পালনের
সময়ই গৃহলক্ষ্মী ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়, তাই
গিরিজাপ্রসঙ্গ উহার উপসংহারে দেশের বর্ত্ত-
মান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত
হৃদয়ে বলিয়াছেন—

“—স্বর্গীজ আমাদিগের দেশের যেরূপ
হৃদশা দেখিতেছ, পূর্বে কিন্তু এরূপ ছিল না।
সে অতীত কাহিনী স্মরণ করিলে যেমন এক
ভাবে আনন্দে হৃদয় উৎফুল্ল হয়, তেমনই
আবার কিম্বাদে অন্তর আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।
এই কি সেই দেশ, যেখানে বাস, বিশিষ্ট,
ফালিদাস, ভবভূতি, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম,
শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? এই কি সেই
দেশ, যে দেশে আশু ঋক্য বেদসংহিতা—

* গৃহলক্ষ্মী ২য় ভাগ।

যজু, যাজ্ঞবল্ক্য, ইতিহাস—রামায়ণ, মহাভারত,
দর্শন—সাংখ্য, পাণ্ডুলক্ষ্য? এই কি সেই দেশ,
যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞানকে গীতা
শুনাইয়াছিলেন, বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে
পুরাণ শুনাইয়াছিলেন? এই কি সেই
দেশ, যেখানে প্রভাত প্রারম্ভে প্রাক্তর
কানন কম্পিত করিয়া মধুর ওকারধ্বনি
লক্ষ লক্ষ ভ্রমর অকারবৎ দিক দিগন্তর
ভাসিয়া বেড়াইত? এই কি সেই দেশ—
যেখানে ভগবান শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈত
তবাদ প্রচার করিয়া জ্ঞানালোকে জগৎ
উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন? এই কি সেই
দেশ—যেখানে শিশু ঋষি মাতার নিকট
মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া একাকী অরণ্য মধ্যে
সেই মহাপুরুষের আরাধনা করিয়া ভক্তি বলে
তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন? এই কি সেই
দেশ—যেখানে পুতান্না প্রহ্লাদ ভক্তিভরে
ভগবানকে ডাকিয়া বিবিধ বিপত্তর হইতে
পরিজ্ঞাপাইয়াছিলেন? এই কি সেই দেশ—
যেখানে রামচন্দ্র পিতার প্রতিজ্ঞা পালনার্থ
রাজ্যত্যাগ করিয়া চতুর্দশবর্ষ বনে
প্রবাস করিয়াছিলেন? এই কি সেই দেশ—
যেখানে শ্রী সৌমিত্র সৌভাত্র ভাবে
সেবকের জায় সহোদরের সেবা করি-
য়াছিলেন? এই কি সেই দেশ, যেখানে পরম
জ্ঞানী সংযমী শুকদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন?
এই কি সেই দেশ, যেখানে ঋষি বিশিষ্ট
পুঞ্জ-হত্যা-শোক বিস্তৃত হইয়া ঋষি বিখা-
মিত্রকে ক্ষমা করতঃ জগৎবাসীকে বিস্মিত
করিয়াছিলেন? এই কি সেই দেশ—যেখানে
রাজা ঔশীনর আশ্রিত রক্ষার্থ ঋষি
শরীর পর্যন্ত শ্রেন পক্ষীকে সানন্দে সমর্পণ
করিয়াছিলেন? * * সত্য সত্যই কি আমরা
ভারতে আছি? তবে কেন সেই ওকার-
ধ্বনি আর শুনিতে পাই না? তবে কেন
লোকে এমন অরা ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া
অকালে কালগ্রাস্তে পতিত হইয়াছে?

“ভারতের অভাব অন্তরের—বাহিরের নহে। ভারত সুখী হইবে সংযম শিখিয়া—সম্পদ পাইয়া নহে। মনের বল পাইলেই ভারত উথিত হইবে, শরীরের বলে তাহার কিছু হইবে না। বিজ্ঞা-শিক্ষায়, শাস্ত্র চর্চায় মনের বল হয় না, মনের বল হয়, সংযম শিখিয়া—ধর্ম্মাচুষ্ঠানে।”

গিরিজাপ্রসন্নের এই কল্পণ উক্তি শ্রবণ করিলে হৃদয় বড়ই ব্যথিত হয়। ইহাতে যেমন তাহার অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেম, তেমনই অসাধারণ বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন কালের ঋষি-কল্পিত মহাত্ম্য-গণ যে সব অলৌকিক দেখাইয়া আমাদেরকে মোহিত ও তন্ত্রিত করিয়াছেন, তাহার মূলে কি দোষেতে পাই ?—মানসিক বল। গিরিজাপ্রসন্ন অমুভব করিয়াছিলেন, এই বল শাস্ত্রালোচনায় সঞ্চিত হইবে না,—হইবে সংযম শিখিয়া। যিনি প্রকৃত সংযমী নহেন, সংযম অভ্যাঙ্গে মনের তেজঃ কতদূর বর্ধিত হয়, তদ্বিবয় নিরূপণে অনভিজ্ঞ, তিনি কি সাহস করিয়া আজকার দিনে সংযম শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে এত সার বাক্য বলিতে উদ্ভেজিত হইতেন ? এই সংযম শিখিয়া গিরিজাপ্রসন্ন আর একটা উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—তাহা “বতোধর্ম্মন্ততোজয়” এই বিশ্বাস। এই ভৌতিক জগৎ যেমন কার্য কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তদ্রূপ মানবজীবন ও মানব সমাজ ধর্ম্মনিয়মে শাসিত। যিনি সেই ধর্ম্ম নিয়মাবলী হইয়া চলেন, তাহার জয় অনিবার্য। গিরিজাপ্রসন্নের এই বিশ্বাসটা যেন হাড়ে মাংসে জড়াইয়া গিয়াছিল, তাই তিনি ধর্ম্ম নিয়মের মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া অনাস্বাদে দৈহিক সুখের লালসা বিসর্জন দিতে পারিতেন। এই নিয়ম রক্ষা করিয়াই আমাদের দেশের মহাপুরুষগণ প্রকৃত বীরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। গিরিজাপ্রসন্নের মানসিক তেজঃ এই জ্ঞান হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিল।

যে পুস্তকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের যতদূর আলোচনা পবিত্র হয়, সেই পুস্তক শ্রেষ্ঠ লোকদের নিকট ততদূর আদরনীয়। গিরিজাপ্রসন্ন তাহার গ্রন্থাবলীতে যে এতদূর

আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অবতারণা করিতে পারিয়াছিলেন, ইহার মূল কারণ কি ব্রহ্মচর্য্য পালনোদ্ভূত দিব্য জ্ঞান নহে ? দার্শনিক পণ্ডিত বাকী ঠিকই বলিয়াছেনঃ—True Knowledge comes from the living root of the thinking soul. অর্থাৎ চিন্তাশীল আত্মার জীবন্ত মূলদেশ হইতে দিব্যজ্ঞান বিকশিত হইয়া থাকে। এই জ্ঞান অভ্রান্ত, কোন ব্যক্তি প্রমাণ দ্বারা ইহা বিলুপ্ত করা যায় না। গিরিজাপ্রসন্নের চিন্তাশীল আত্মার জীবন্ত মূলদেশ হইতে এই দিব্যজ্ঞান পূর্ণ “গৃহলক্ষী” ২য় ভাগ উদ্ভূত। গ্রন্থকার এই সুধার সাগর গৃহলক্ষী ২য় ভাগ বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরমা সাধবী স্ত্রীর পাদপদ্মে উৎসর্গ করিয়া কৃতকাতার্য্য হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখকগণ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—“সেদিন আপনার পুস্তকের কতক অংশ পাঠ করার অবকাশ পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতেই যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিয়াছি এবং প্রধানতঃ যাহাদের পাঠের জন্য এই পুস্তক প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাদিগকে উহা সবিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অহুরোধ করিয়াছি। ফলতঃ বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্বে এ প্রকৃতির পুস্তক পাইলে অধিকতর উপকৃত হইতাম। তথ্যচ উপদেশ-গ্রহণের-সময় কখনও উত্তীর্ণ হয় না। আপনার এই গ্রন্থাঙ্ক উপদেশ-নিচয় যেমন স্বাস্থ্যকর, তেমনই উপাদেয়। ইহা অধ্যয়ন কালে উপদেশ-গ্রহণ-জনিত ক্লেশ কিছুমাত্র অমুভব করিতে হয় না; প্রভূত প্রচুর পরিমাণে চিন্তাকৃতি জন্মে।

“গৃহলক্ষী”র অনেক অংশের মধ্যে এই গুণটা বড় কম নহে এবং আমার বিবেচনায় উহা উপদেশের কেবল সূচ্যাত্মক কথা নহে, সবিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়ও বটে, বস্তুতঃই আপনি যারপর নাই অটল বিষয়গুলিও জলের মত তরল ও স্বচ্ছ করিয়া লোকের সম্মুখে ধরিতে সমর্থ হইয়াছেন।”

পূর্ববঙ্গের উজ্জল রত্ন চিত্তাশীল জ্যেষ্ঠক
শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর লিখি-
য়াছেন :—

আপনার “গৃহলক্ষ্মী” উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

বিখ্যাত সমালোচক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়-
চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন :—

“আপনার পুস্তক পড়িয়া প্রীতিলাভ করি-
য়াছি। ইহার শেষ অংশ পড়িয়া আমি
কাদিয়াছি।…………গৃহলক্ষ্মী, গৃহলক্ষ্মী-
গণের হস্তে দ্বিগুণ উজ্জল হইবে।”

আরও বহু লেখকের প্রশংসা পত্র আছে,
তাহাঁ উল্লেখ নিম্নয়োজন মনে করি।

• ছুটের দমন।

একবার বলিয়াছি, কেহ অজ্ঞায় ভাবে
উৎপীড়িত হইলে গিরিজাপ্রসঙ্গ তাহাকে
রক্ষার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন, গিরিজা-
প্রসঙ্গের বাটীর বহুদক্ষিণাংশে কোন দুরাচার
পাপিষ্ঠ মুসলমান বাস করিত। ঐ মুসল-
মানটী এতদূর পতনের দিকে অগ্রসর হইয়া-
ছিল যে, পরের অনিষ্ট করিতে গিয়া সে
লোকের অভিসম্পাত কি গবর্ণমেন্টের শাসন
গ্রাহ্য করিত না। একবার ঐ মুসলমানটী
কোন হিন্দু-মহিলার প্রতি নিদারুণ অত্যাচার
করে। গিরিজাপ্রসঙ্গ শাস্তিরক্ষার্থ ঐ মুসল-
মানটীকে শাস্তি দিতে সচেষ্ট হইলেন। এমন
কি, উহার ক্রুরভাবের বিষয় তিনি ম্যাজিস্ট্রেট
ও পুলিশ সাহেবের কর্ণগোচর করেন। কিন্তু
তাহাতে বিশেষ ফললাভ হয় না। ঐ
মুসলমানটার বাটীর নিকটে গিরিজাপ্রসঙ্গের
কাছারী বাড়ী ছিল, কিন্তু সে প্রজা ছিল অপর
এক ভূম্যধিকারীর। গিরিজাবাবুর সেই
কাছারীতে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্তী মহা-
শয় তহশীলদারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এক
নিশীথে পূর্বোক্ত মুসলমানটী স্বেচ্ছাচারিত্বে
বাধাপ্রাপ্ত হইয়া গিরিজাপ্রসঙ্গকে তহশীল-
দারের সম্মুখে বুঝা কটুক্তি প্রয়োগ করে এবং
সে যথেষ্টাচারিত্বে বাধাপ্রাপ্ত হইলে আরও
ভীষণ কাণ্ড ঘটাইবে, এইরূপ আশঙ্কন করে।

গিরিজাপ্রসঙ্গ উক্ত তহশীলদারের নিকট
হইতে ঐ নীচমনা মুসলমানটার হুজুতসন্ধির
বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া তৎক্ষণাৎ একটা পিস্তল
ও একটা বাস্তুপূর্ণ কতকগুলি বারুদসহ গুলি

আনিয়া তাহার নিকট সমর্পণ করেন ও বিশেষ
ধমকাইয়া বলিয়া দেন যে, “ঐ মুসলমানটী যদি
কোন নিরীহ লোকের প্রতি অকারণে গুলি-
তর অত্যাচার করে এবং তাহাতে বাধা দিলে
তোমাদিগকে পুনরায় অজ্ঞায়ভাবে অভ্য্রো-
ষিত ভাষায় গালি দেয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ
এই পিস্তলের গুলির আঘাতে তাহাকে ধরা-
শাস্তি করিও। এজন্য যদি আমার সর্বস্ব
বিসর্জন দিতে হয়, তজ্জন্যও আমি মনঃক্লম্ব
হইব না।” গিরিজাপ্রসঙ্গের এই তেজঃপূর্ণ
বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ মুসলমানটী আর
তাঁহার কর্তৃক কাল পর্যন্ত ন্যায় বিরুদ্ধ
কার্য্য করিতে সাহসী হইল না।

অর্থ থাকিলেই কি মনের বল হয়? অর্থ-
শাশী লোক ত অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু অর্থ-
শাশীদের মধ্যে এরূপ তেজঃপুঞ্জ লোক আমা-
দের চক্ষে আর পড়িয়াছে কিনা, স্মরণ হয়
না। তুমি এ জগতে ছোট হইতে কি শ্রেষ্ঠ
স্থান অধিকার করিবে, ইহা অনেকটা তোমা-
রই উপর নির্ভর করে। যিনি আত্মার মর্যাদা
বুঝিয়া কার্য্য করেন, আত্মার অসীমত্বে
বিশ্বাসী হয়েন, তিনি যে এ জগতে উচ্চস্থান
লাভ করিতে পারেন, তাৎক্ষণ্য সন্দেহ কি?
গিরিজাপ্রসঙ্গের চরিত্রের আর এক উপাদান—
আত্মমর্যাদা-জ্ঞান, তাঁহার তেজের কথা
যখন স্মরণ হয়, তখন মনে হয়, বিভ্রাতের
নিকট খদ্যোৎ যেরূপ, আমরা তাঁহার নিকট
তদ্রূপই হীনতেজঃসম্পন্ন।

• আমাদের পূজনীয় পুরোহিত শ্রীযুক্ত
উমাকরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় গিরিজাপ্রসঙ্গের
জ্ঞানপরায়ণতা ও হিন্দুধর্মের প্রতি অগাঢ়
প্রকার বিষয় বাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার
ইচ্ছা ক্রমে নিয়ে লিখিত হইল।

“গিরিজা বাবু কর্তৃক ভার গ্রহণ করিয়া
বিচারাসনে উপবিষ্ট হইলে কেহ তাঁহাকে
কোনরূপ অজ্ঞার অমরোধ্য করিতে সাহসী
হইত না। তিনি যথাপুরোধের দণ্ড-দাতা
ছিলেন। এমন কি, প্রজাগণের সঙ্গে যদি কোন
সময় তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীর সঙ্গে মনোবাদ
হইত, তাহা হইলে বিচার কালে তিনি কর্ম-
চারীর প্রতি ক্রুপা করিয়া প্রজাগণের বিপ-
কভাচরণ করিতে বাধ্য হইতেন না। বরং

প্রজারঞ্জনব জ্ঞাত তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারী
ও তহশীলদারগণকে যথা দণ্ড প্রদান করি-
তেন। আমি ও আমার কোন সঙ্গিক জ্ঞাতি
পরম্পর কোন এক সময় বিবাদ করিতে
প্রবৃত্ত হই, আমার জ্ঞাতি আমার সঙ্গে
বিবাদে অসমর্থ হইয়া অবশেষে গিরিজাবাবুর
নিকট বিচারপ্রার্থী হয়েন। আমার ধারণা
ছিল যে, আমি পুরোহিত বলিয়া অন্ততঃ
আমার প্রতিদ্বন্দী অপেক্ষা একটু অগ্রগৃহ
লাভে সমর্থ হইব, কিন্তু গিরিজাবাবু আমার
মনোগত ভাব অনুধাবন করিতে পারিয়া
স্পষ্টই আমাকে বলিয়াছিলেন, “তুমি আমার
নিকট যেক্রম আশা করিতেছ, সেক্রম আশা
তোমার ক্ষমতায় স্থান দেওয়া উচিত নহে,
বিবাদের দীমাংসা করিয়া ফেল, নতুবা তুমি
অপরাধী সাব্যস্ত হইলে আমি জায়া পথ অব-
লম্বন না করিয়া থাকিতে পারিব না” তখন
তাঁহার একজন ঘনিষ্ঠ আশ্রয় বলিয়াছিলেন
যে, আমাদের গুরু পুরোহিত কর্মচারী প্রভৃতি
যদি সময় বিশেষে আমাদের দ্বারা একটু
উপকৃত না হয়, তাহা হইলে উঁহার সকল
সময় আমাদের মঙ্গলকামনা করিতে স্নীকৃত
হইবেন কেন? গিরিজাবাবু তাহাতে অসন্তুষ্ট
হইয়া অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।
কলতঃ তাহার কর্তৃত্ব কালে তাহার অধীনস্থ
লোক কোন সময়ের জ্ঞাত অস্তায় কার্যের
প্রশংসা পাইত না।”

স্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ।

“গিরিজাবাবুর স্বধর্মের অপরিণীম শ্রদ্ধা
ছিল। আমি অল্প বয়সে পিতৃহীন হই, তজ্জন্ত
যাজনিক ব্যবসায় যথোচিত দক্ষতা লাভ
করিতে পারি নাই। গিরিজাবাবুর মাতা
প্রতিদিন ভোজ উৎসর্গ ও পুরোহিত ভোজন
করাইতেন। আমি সেই কার্য নিরীক্ষার
জন্ত তখন প্রত্যহই তাঁহার বাটীতে
উপস্থিত হইতাম। গিরিজাবাবু একদিন
আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি
বিশুদ্ধভাবে যাজনিক কার্য নিষ্পন্ন করিতে
পার? ক্রিপণভাবে আচমন করিতে হয়, এক-
বার আমাকে দেখাও। আমি যাহা জানি-
তাম, তাহা দেখাইলাম। তিনি তখন বলি-
লেন, ঠিক ওরূপ করার নিয়ম ন্যূন, আলম্বা-

রিয় ভিত্তি হইতে “বেদমাতা গরুড়া” খান।
নিষে এস, আমি মন্ত্র বাহির করিয়া দিতেছি,
তুমি কর্তৃত্ব করিলেই নিম্নলিখিত ক্রমঃ অভ্যাস-
গত হইবে। আমি তদনুযায়ী তাঁহার কৃপায়
আচমনের মন্ত্রও কর্তৃত্ব করিয়া নিরীক্ষণ
আচমন করিতে শিখিলাম। তাঁহার জীবিতা-
বস্থায় আমরা যাজনিক কার্যে যথেষ্ট সাহায্য
লাভ করিয়াছি। আমি যাহাতে এই সব কার্য-
ক্ষম হই, তজ্জন্ত তিনি অনেক পুস্তক ক্রয়
করিয়া আমাকে দিয়াছেন। গিরিজাবাবুর
জ্ঞান শাস্ত্রের পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান গৃহীর পুরো-
হিত্য করিতে হইলে যে সব শিক্ষার দরকার,
আমার মধ্যে তাহার কিছুই ছিল না। অপরে
এইরূপ স্থলে হয়ত পুরোহিত ত্যাগ করিয়া
নূতন কার্যদক্ষ পুরোহিত নির্বাচিত করেন,
গিরিজা বাবুর যে স্থলে পুরোহিত-ত্যাগের
সম্মত ত দূরের কথা—আমার জ্ঞান একজন
অশিক্ষিত অযোগ্য পুরোহিতকে পুরোহিত্য
কার্যের উপযোগী করার জন্ত যে চেষ্টা ছিল—
তাহা অত্যন্ত প্রশংসার্হ। যাহারা গুরুপুরোহি-
তের অযোগ্যতা দর্শন করিয়া তৎপদে নূতন
লোক নিযুক্ত করিয়া ধর্মোন্নতি করিতে চাহেন,
তাঁহারা শাস্ত্রদর্শী গিরিজা বাবুর এই দৃষ্টান্তটী
দর্শন করিয়া কি কোন শিক্ষা লাভ করিতে
পারিতেছেন না?”

উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় আরও বলেন যে,
গিরিজাপ্রসন্ন যখন কলিকাতা অবস্থিত
করিতেছিলেন, তখন কয়েক দিবস তিনিও
তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার সে বৎসর
পিতৃবিয়োগ ঘটিয়াছিল! গিরিজাপ্রসন্ন সেই
সময় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমার পিতার
আত্মকৃত্য করার কি সম্বন্ধ করিয়াছ? তাহাতে
পুরোহিত ঠাকুর প্রভৃতির করিয়াছিলেন,—
গঙ্গায় বসিয়া তাহার কার্য করা চলিবে না,
যেহেতু তখন তাঁহার নিকট যথোচিত অর্থ
ছিল না। ধর্মপ্রাণ গিরিজাপ্রসন্ন অপরের ইহ-
জীবন ও পর জীবনের মঙ্গলকামী। তিনি
নিতান্ত সন্তুষ্টভিত্তে বলিলেন, যে সব জিনিষ
প্রয়োজন, তাহার কর্ত্ত্ব প্রস্তুত কর, আমিই
উহার ব্যয়ভার বহন করিব। অতঃপর
পুরোহিত ঠাকুরকে লইয়া তিনি কালীঘাট
সমুদ্রস্থিত হইলেন, ও আশাতীত পরিশ্রম

করিয়া প্রয়োজিত ঠাকুরকে তাহার পিতার স্বর্গীয় কার্যে সহায়তা করিলেন। যিনি হিন্দু ধর্মের প্রতি আস্থাহীন, জন্মান্তরে অবিশ্বাসী, তিনি কি পরকে শাস্ত্রীয় নিয়ম পালনে এতদূর উৎসাহ দিতে পারেন? গিরিজাপ্রসন্ন এই জন্তই গৃহলক্ষ্মীতে লিখিয়াছেন:—

“গৃহস্থ ধর্ম প্রতিপালন করিয়াই লোকে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পাপক্ষয় করিয়া থাকে। গৃহস্থপ্রমে যে সকল কর্তব্য বিহিত রহিয়াছে, —সে সকল ক্রিয়া গৃহস্থের নিত্যকর্ম, যথা সঙ্কোচপালনা, পঞ্চমহাযজ্ঞ, অতিথিসেবা, পরিজন পালন ইত্যাদি। তাহাতে মনুষ্য বিকাশ পায়, এই সকল অলুসকানে লোকের নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলি সংবৃত হয়, উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলির ক্ষুদ্রি হয়, এইজন্ত ইহাকে গৃহধর্ম বলে।

গৃহস্থপ্রম ধর্মচর্চার জন্ত,

পরোপকারের জন্ত।

একদিকে এই অমৃতময় বাক্যগুলি যেমন সুন্দর, অপর দিকে এই বাক্যগুলি প্রতিপালনে গিরিজাপ্রসন্নের জ্ঞানপ্রাহাতিশয্য তেমনি সুন্দর। এ সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করিতে গেলে অনেক দার্শনিক কথা বলিতে হয়, আমাদের সে ক্ষমতা কই? তবে যদি কেহ এই কথাগুলির সঙ্গে “অতুলীন” ধর্মের কি সম্বন্ধ রহিয়াছে, চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে অবশ্য তাঁহাকে বলিতে হইবে, ইহা দার্শনিক মতেও অধিকতর সুন্দর !!

বঙ্গোপসাগরে বিপদ।

পটুয়াখালী মহাকুমার অন্তর্গত আমড়াগাছিয়া নামক স্থানে গিরিজাপ্রসন্নদের জমিদারী আছে। বিষয়ভার গ্রহণ করিয়া ১৩০১ সালের ফাল্গুনমাসে তিনি একবার মফঃস্বল পরিদর্শনের জন্ত বাহির হইলেন। ক্রমান্বয়ে ছই একস্থান পরিদর্শনের পর কয়েকজন কর্মচারী ভৃত্য ও পাইক সমভিব্যাহারে আমড়াগাছিয়াভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

আমড়াগাছিয়ার সন্নিকট বঙ্গোপসাগর। গিরিজাপ্রসন্ন অনন্তবিস্তারী, ভাবুকচিত্ত-প্রদানকারী অতলস্পর্শ বঙ্গোপসাগর দর্শন-লোভ সঞ্চার করিতে পারিলেন না, তিনি একখানি প্রকাণ্ড গ্রীন বোটোরোহণে মফঃস্বল গিরি-

ছিলেন। ঐ বোটোরোহণেই বঙ্গোপসাগরের নরনরজন দৃষ্ট হইতে অবলোকন করিতে কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। সঙ্গের লোক তাহার ব্যগ্রতা দেখিয়া অহুগমন করিতে ইচ্ছাপরবশ হইল। সকলেই সাহস করিয়া বলিল যে, ইহাতে চড়িয়া তরণীগমন-সীমা পর্যন্ত অগ্রসর হইলে কোন বিপদপাতের আশঙ্কা নাই। গিরিজাপ্রসন্নের স্মরণে তরণী বিশাল নদী-বক্ষের উপর দিয়া ভাসিয়া গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হইল। গিরিজাপ্রসন্ন প্রশান্ত নদী-হৃদয়ের বিচিত্রতা, বিশ্বময়র ফেনীল আবর্তময় বারিরাশির অপূর্ণ সঞ্চালন, মনোরম দৃশ্যাবলীর স্ফূর্তি বিভাস প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। গিরিজাপ্রসন্নের বোটখানি এই প্রকার পূর্বকল্পিত স্থানের সম্মুখ-বর্তী হইল। সে স্থান হইতে বঙ্গোপসাগর দৃষ্টিপথান্তবর্তী।

গিরিজাপ্রসন্ন এই সময় স্নানাদিক্রিয়া সমাপন করিয়া বিস্থত সাগরের মনোমোহন দৃশ্যাবলী কিছুকাল প্রাণ ভরিয়া অবলোকন করিলেন, অনন্তর নিতান্ত ভুক্তিবিহ্বলচিত্তে হিন্দুধর্ম-সার গীতাখানি মধুরকণ্ঠে পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে বিপদের একটা করালছায়া আসিয়া উহাদের প্রাণ-হরণে উদ্ভত হইল। বোটখানিকে অপ্রতিহত জলপ্রোত সাগরের ভিতর টানিয়া লইয়া চলিল। মাঝি মাস্তারা অচিন্তনীয় বিপদ সম্মুখীন দেখিয়া তাহাদের যথাশক্তি, বোট বাঁচাইবার জন্ত, প্রয়োগ করিল। কিন্তু তাহাদের শক্তি তৃণবৎ সাগরের প্রোতে ভাসিয়া গেল। এখন সকলের ভ্রাস হইল যে, জীবনরক্ষার বুঝি আর কোন উপায় নাই; এই অপরিচিত অদৃষ্টপূর্ব উভাল-তরঙ্গ-বিকুল অকূল সাগরগর্ভে সকলের জীবন মুহূর্ত্ত মধ্যে অবসান হইবে। ২৩টা লোক তাহাদের কোমলমতি অল্পবয়স্ক বালক সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল, তাহারা তখন স্বীয় পুত্র-গণকে নিজের বক্ষের মধ্যে ধরিয়া হৃদয়বিদারক চীৎকার করিয়া কান্দিতে লাগিল। পুত্র কান্দিতে লাগিল, অতলজলে জীবন হারাইতে হইবে, এই আশঙ্কায়। পিতা কান্দিতে লাগিল প্রাণাধিক পুত্রকে কোন

সময় করূপ অবস্থায় কোন্ প্রাণে চির রিদায় দিবে, এই ভাবিয়া । তখন বেলা প্রায় অবসান, কিছুকাল মধ্যেই রজনীর গাঢ় অন্ধকার, ভীষণ সাগরের ভীষণ হৃদয় ভীষণ ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে ।

ধর্মপ্রাণ গিরিজাপ্রসন্ন তখন প্রমাদ গণিয়া সেই 'বোটের এক কামরায় বসিয়া বীর ও 'অবিচলিতভাবে গীতাখানি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । তাঁহার বজ্রগম্ভীর-স্বর যেন নির্জন স্থানের নির্জনতা ভেদ করিয়া কাহার কর্ণে পহুছাইবার জন্ত দিকদিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল । ভগবানের আরাধনার তিনি এত তন্ময় হইলেন যে, জীবন-নাশের আশঙ্কা, সঙ্গীর লোকের মর্ম্ম-গ্রহিচ্ছন্দী আত্ননাদ, কিছুই তাঁহার ভগবৎ-প্রেম ক্ষুরিত হৃদয়ের পটাবরণ ছিন্ন করিতে পারিল না । পথহারা নাবিক যেমন ঞ্চব নক্ষত্র দেখিয়া সমুদ্রবক্ষে জাহাজ চলাইয়া লইয়া যায়, গিরিজাপ্রসন্ন তেমন ভগবানের প্রতি অত্রান্ত লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার জীবন-তরি ভাসাইয়া দিলেন । সে তরি লক্ষ্য-পথ-ভ্রষ্ট হইয়া অকূল ও অতল সাগর গর্ভে বিলীন হইল না ! রাত্রি প্রায় ৩:৪ দণ্ডের সময় বোটখানি গিয়া সাগরের নিকটবর্তী কোন এক চরে থাকা লাগিল । তখন সকলের ভরসা হইল, কূল পাইয়াছি, জীবন রক্ষার বৃদ্ধি উপায় হইল । মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে পথ-হারা পথিক যেমন সৌদামিনীর ক্ষণস্থায়ী প্রভা দেখিয়া হৃদয়ে বল পায়, মুমূর্ষু যেমন সূচিকিৎসকের আশাপূর্ণ বাক্য পাইয়া শরীর

অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করে, বিপদাপন্ন আরোহিণ, তরুণ, সেই অকূলপাথারে চর প্রাপ্ত হইয়া জীবনের উপর আশ্রয় হইল । যে স্থান হইতে ক্ষিপ্র জলপ্রোত বোটখানিকে ভাসাইয়া আনিয়াছিল, সে স্থানে উপস্থিত হইতে উহাদের সাত দিন সময় লাগিয়াছিল ।

সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গ বিকোভে বিচলিত হইয়া একদিন স্বাধীনতার উপাসক ধর্ম্মাত্মা রামমোহন রায়ও ক্ষীণকণ্ঠে গাহিয়াছিলেন:—
কোথায় আনিবে আমার পথ ভূলায়ে,
আনিবে ভব জলধিজলে তরঙ্গে তরি ডুবায়ে ।
চারি দিকে অন্ধকার, নয়নে না হেরি আর,
এবার বৃষ্টি যার গো জীবন ঘূর্ণিত্র জলে,
কোথা র'ল পিতা মাতা, কে করে স্নেহ মমতা,
প্রাণপ্রিয়ে র'ল কোথা বন্ধু সকলে ।

গিরিজাপ্রসন্ন সেইরূপ বিপদে অভিভূত হইয়া অবিচলিত, অবিকম্পিত, স্থির, ভগবৎ-প্রেমে তন্ময় ॥ প্রাণান্তকর বিপদের মধ্যে এইরূপ স্থিরভাবেই হিতপ্রজ্ঞ তাপসের

গিরিজাপ্রসন্ন ! এই স্মরণাতীত বিপদ-রাশির মধ্যে তুমি মঙ্গলময় ভগবানের উপর যে অবিচলিত বিশ্বাস ও অচলা ভক্তির পরিচয় দিয়া একটা সুন্দর ঘটবার সৃষ্টি করিলে, তাহা ঋষিদেরও বিস্ময়কর । আমরা ক্ষুদ্র নর, তোমার ভগবৎ-প্রেমের পরিমাণ করিতে পারি, এমন সাধ্য কি ? তোমার পাদপদ্মে আমাদের সহস্র প্রণাম !

ত্ৰিহুরেকেনাথ রায়চৌধুরী ।

স্বাবলম্বন ।

সে অনেক দিনের কথা । আমার এক জন দরিদ্র বন্ধু বিস্তালয়ে পণ্ডিত করিতেন । স্বাবলম্বন ভিন্ন জীবনে সুখ শাস্তি নাই, এই-রূপ ভাবিয়া, তিনি সাধের চাকরি পরিত্যাগ করিয়া সংসার-সমুদ্রে বাঁপ দিয়াছিলেন । স্বাবলম্বনের জন্ত আজীবন কঠোর তপস্বী এবং

পরিশ্রম করিয়া জীবনে যে শাস্তি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি বলিতেন, তাহার তুলনা নাই । এখন স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন । তাঁহার জীবন, আদর্শজীবন ; বিশ্বাস ভক্তির পুণ্যময় নিকেতন ।
বহুবার লিখিয়াছি, 'এদেশের সর্বপ্রধান সমস্যা—দারিদ্র্য । এই দারিদ্র্য-সমস্যার সু-

নীমাংসা না-হইলে কিছুতেই এদেশের মঙ্গল নাই। এদেশের লোকের আর গড়গড়ায় বার্ষিক ১৮, কেহ বলেন ২৪, কেহ বলেন ২৭, ১৮ই হউক, বা ২৭ টাকাই হউক, কোন সংখ্যাতেই অসামান্য হইয়া যায় না। ইহার উপর বিবিধ প্রকার লুণ্ঠনের তাড়না আছে। আদমশুমারী বলে পণ্ডিতেরা গণনা করিতেছেন,—এদেশের উচ্চশ্রেণী ক্রমেই ধ্বংসের পথে চলিয়াছেন,—দিন দিন তাঁহাদের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে। আমাদের মনে হয়, দারিদ্র্যই এই সংখ্যা হ্রাসের কারণ। দারিদ্র্যের নিম্নে পণ্ডিতেরা জীবন-শীর্ণ হওয়ার, রোগের আধিপত্য, অল্পেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে; জনন-শক্তি হ্রাস হওয়ার জন্মসংখ্যা হ্রাস হইতেছে—প্রাচীন বংশ কালের করালগ্রাসে পতিত হইতেছে। মৃত্যুর করাল মূর্তি চতুর্দিকে প্রকটিত হইতেছে।

দারিদ্র্যের মূল কারণ পরাধীনতা। পরাধীন যে, সে সর্বপ্রকারে অস্ত্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। এইরূপ নির্ভর করার তাহার মনের ক্ষতি চলিয়া যার,—ক্রমে ক্রমে অলসতা আসিয়া সংক্রামিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে বিলাসিতা আসিয়া ইঞ্জিয়-পরিপুষ্টি সাধন করে—ক্রমে ক্রমে উঠিতে, বসিতে, বাইতে—সর্বপ্রকারে সে জড়প্রকৃতি-সম্পন্ন হইয়া উঠে; —কার্য্যকরী ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়, সে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। নিজের অকর্ম্মণ্যতা স্বরণে সে তখন পরাধীনতার ও নিম্নুক হইয়া উঠে। এইরূপে, ক্রমে ক্রমে, সংসারের বহু লোকের কার্য্য বিলুপ্ত হইয়া যায়—কৃষি, বাণিজ্য, কৃষি সকল অস্ত্রের হাতে বাইয়া পড়ে। বাঁহারা কার্য্য বিভাগে বড়, তাঁহারা সর্ববিভাগে বড় হইয়া উঠে। আর বাঁহারা কার্য্যবিভাগে ছোট, তাহারা সকল বিভাগে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়া নগণ্য হইতে থাকে। শেষে মুহূর্ত্ত আসিয়া সর্ব দ্রব্য ধ্বংস করে। কার্য্য করিতে করিতে আজ ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান, পৃথিবীর মধ্যে প্রেষ্ঠ হইতেছেন; আর ভারত আজ অলস ও বিলাসী, ইঞ্জিয়-পরতন্ত্র, বধূর অক্ষা-সক্ত,—ভিক্ষাপ্রার্থী, —পরাধীনতার, —পর-নিম্নুক;—সর্বপ্রকারে পরাধীন হইয়া দুর্বল হইতেও দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। ভারতের

অবনীতির আর বাকী কি আছে? Division of labour-হীনতার আমরা ক্রমে ক্রমে সর্বপ্রকারে পরাধীন হইয়া পড়িতেছি। স্ব-জন, স্ব-গৃহ, স্ব-জাতি, স্ব-দেশ, স্ব-ধর্ম্ম, স্ব-ভাব, স্ব-রূপ, স্বাধিকার, স্বরাজ—এসকলই স্বাধীনতার রাজ্যের মূল মন্ত্র। এসকলের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, বীরের জ্ঞান আপনায় পায়ের উপর দাঁড়াইয়া অবিশ্রান্ত খাটিতে হয়। তাহাতে শারীর শক্তির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে মনের বল বাইসে। অস্ত্র-দিকে, মনের বলই শারীর বলের নিয়ামক। রাজধর্ম্ম পাইলেও নিজের চেষ্ঠা থরস করা উচিত নয়, অস্ত্র-প্রদত্ত তৃপ্তিতে পরিত্যাগ করিয়া ষোণাঙ্কিত শাকায় গ্রহণ করা উচিত। প্রকৃত মহাপুরুষের ইহা মূল মন্ত্র। “ব”—সাধন এলগতের প্রেষ্টসাধন—বৈষ্ণবের পথ, চরমোন্নতির মুখা উপায়। এখন আমরা “ব” পরিত্যাগ করিয়া পরানুসন্ধানে ও পর-পদ-গেহনে নিযুক্ত, নিজের চক্ষের তৃণ কান্না ফেলিয়া অস্ত্রের চক্ষে কেশ দেখিয়া শিহরিয়া উঠি; —নিজের যাহা কিছু কর্তব্য, তাহা ভুলিয়া পরের দিকে চাহিয়া সময় ক্লেপণ করিতেছি। আমরা আত্ম-সম্মান ভুলিয়া পরদোষ কীর্ত্তন করি, পরাধীনতার সেবা করি, পরাধীনতার আত্মসমর্পণ করিয়া মহানন্দে বিভোর হই।

পরবশতার কি শোচনীয় ফল, পাঠ্য ডাউন-প্রণীত Descent of man হইতে, জাতীয় বিলোপ একবার পাঠ করিলে বুঝিবেন।

জাতীয় বিলোপের ইতিহাস এত আশ্চর্য্য প্রহেলিকা। সর্বপ্রকার পরাধীনতাই জাতীয় বিলোপের প্রধান কারণ। ট্যাসম্যানিয়া, মাউরি, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, স্যাণ্ডউইচ দ্বীপে যাহা ঘটনা, ভারতবর্ষেও অচিরে তাহাই ঘটবে। “১৭৭২ খ্রী: কুক স্যাণ্ডউইচ দ্বীপ আবিষ্কার করেন, তখন অধিবাসী সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ। কিন্তু ১৮২০ খ্রী: যখন তাহা-দিগকে গণনা করা হয়, তখন তাহার প্রায় ১৪২, ০৫০ জন মাত্র হইয়া গিয়াছিল।

১৮৩২	১০৮,৫৭৯	১৮৫০	৭১,৬১৯
১৮৬০	৬৭,৩৮৪	১৮৬৬	৫৮,৭৫৫
		১৮৭২	৫১,৫৩১*

* পরবশতা ২৭, ২৮, ২৯ শতাংশ।

কিন্তু অধিবাসীগণের চালচলন, আচার ব্যবহারের পরিবর্তন হওয়াই এই অবস্থার প্রবলতর কারণ । * * ইউরোপীয়গণের অগ্রকরণ করিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়ায়, ইহারা অল্পকাল মধ্যেই পোষাক পরিবর্তন করিয়াছিল এবং মত্তপান করিতে আরম্ভ করে । তাহাতেই উক্ত বীপবাসীদের জননশক্তি হ্রাস হইবার প্রচুর কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে ।”

যাহারা নিজকে ভুলিয়া অল্পকে ভাল হইবার উপদেশ দেয়, তাহাদের অপেক্ষা মূর্খ আর কে? যাহার আত্মসম্মানবোধ নাই, সে-ই অস্ত্রের নিন্দা করে । পরাধীন ভিন্ন পরনিন্দুক কেহ হইতে পারে না । যে অবস্থায় যে ভাবে ভারত পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া এখন পরনিন্দা এবং পরশ্রীকাতরতাকে জীবন-সর্বস্ব করিয়াছে, তাহা ভাবিলেও শরীর রোমাজিত হয় । নিজের অবস্থা যখন শোচনীয় হয়, তখনই অস্ত্রের অবস্থা ভাল দেখিলে কষ্ট হয় । তখনই মানুষ পরশ্রীকাতর হয় । নিজে যে হীন ভাবে রাজ্যে পরিভ্রমণ করে, সে-ই অস্ত্রের দোষ কীর্তনে লালায়িত । নিজের দোষ ঢাকিবার অস্ত্র উপায় আর সে পায় না । আমরা যে এত পরনিন্দুক এবং পরশ্রীকাতর হইয়া উঠিতেছি, তাহার একমাত্র কারণ পরাধীনতা । আপনার দোষ সংশোধন লইয়া যে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকে, সে-আর অস্ত্রের ছিদ্র অন্বেষণে সময় পাই না । সে আপনা লইয়া সর্বক্ষণ মজিয়া থাকে । কিসে নিজে ভাল হইব, তাহার সর্বক্ষণ কেবল এই চিন্তা । এদেশে এতরূপে যে অস্ত্রের নিন্দা প্রচারিত হইতেছে, তাহার একমাত্র কারণ আত্মাদর-হীনতা ও পরাধীনতা ।

সকল সাধনার সার সাধনা—যশ নিন্দার অতীত হওয়া । রিপু জয় করা অতি সোজা—কিন্তু মন জয় করা সোজা নয় । যশ নিন্দার অতীত কে হইতে পারে? আমি যদি বিধাতার নিকট অপরাধী হইয়া থাকি, তুমি প্রশংসা করিয়া আমাকে স্বর্গে তুলিতে পার না ; আর যদি ভিতরে ভাল থাকি, তুমি আমার নিন্দা করিয়াও কোন অনিষ্ট করিতে পার না । “রাগে হরি মাগে কে, মারে হরি

রাগে কে?”—এই দেশের চির প্রবাদ । যে আত্ম-সাধনায় সিদ্ধ, কেবল সে-ই যশ নিন্দার অতীত হইতে পারে । আত্ম-জয়, আত্ম-সম্মান সাধনার মূল মন্ত্র । চিত্ত-শুদ্ধি বা আত্মজয় একই কথা । কবি বলেন,—

“ইন্দ্ৰিয়ের বশ যে বা বারমাস,
স্বদেশ-উদ্ধার তার কাজ নয় ।”

আত্ম-শুদ্ধি ও জিতেনিয়তা ভিন্ন কে কবে মানুষ হইতে পারিয়াছে ?

সাধনার মূল বীজ আত্মার মূলে নিহিত । প্রেম বল, জ্ঞান বল, পুণ্য বল বা নীতি বল,—সকল আপনাকে লইয়া । আপনাকে জয় করিতে পারিলে, তবে পরে জগৎ জয় হয় ।

সুতরাং সার কথা এই—আত্ম-সাধন, আত্মদর ও আত্মসম্মান অর্জন । আপনি মানুষ হইতে পারিলে আর কোন ভদ্র নাই । আপনাকে ভুলিয়া যাহারা “বিশ্ব” লইয়া প্রমত্ত হইতে চায়, তাহারা সাধনার মূলমন্ত্র কিছুই বুঝিতে পারে না । “স্ব”—সাধনই চরম সাধন ।

“স্ব” কথার অপেক্ষা মিষ্ট কথা আর কি কিছু আছে । স্বদেশ, স্বজন, স্বগৃহ, স্বভাব—কি মধুর কথা । এই সকলকে জয় কর, তোমার আর কোন অভাব থাকিবে না ।

আমি এই বাক্যে উপনীত হইয়া আমার স্বর্গগত সেই বালাবদ্ধুর কথাই দিবারাজি ভাবিতেছি । “স্বাবলম্বন”—কথা বলিবার সমস্ত তাঁহার নয়নে অশ্রু বরিত, তিনি ভাবে বিভোর হইতেন এবং বলিতেন—“স্বাবলম্বন” ভিন্ন ভারতের আর গত্যন্তর নাই ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিতেন—সকল চিন্তার সার চিন্তা—আত্মচিন্তা ; সকল সাধনার মূল সাধনা—আত্ম-সাধন । তিনি বলিতেন, চিন্তা করিতে করিতে যে জন আত্মার মূলে ডুবিয়া যাইতে পারে, সে-ই কেবল পরমাত্মাকে চিনিতে পারে । আত্মার মূলেই পরমাত্মা ।

উপনিষদকার বলেন, এক শাখার দুই পাতা, এক অস্ত্রকে দিবানিশি দেখিতেছে ; দেখিয়া দেখিয়া ভাবে বিভোর হইয়া তন্ময় হইয়া যাইতেছে । শেষে—দুই মিলিয়া একাকার হইতেছে,—একের স্বভাবে অস্ত্র অল্প-প্রাণিত বা নিমজ্জিত হইতেছে । আত্মর

সুখি নির্বাণপ্রাপ্ত হইতেছে, কেবল দেবশক্তি জাগিয়া উঠিতেছে । নিরঞ্জন-তটে শাকাগ্নিঃ নির্বাণের পথ ধরিয়া শেষে অমরত্ব লাভ করিতেছেন ।

আত্মসাধনে সিদ্ধিলাভের পর প্রচারের ইচ্ছা অন্তরে প্রবল হয় ; পরচিন্তনে ইচ্ছা হয় । আত্মাদর জন্মিলে পরকে আদর করিতে অভ্যাস হয়, যখন আত্মার মূলে পরমাত্মার সহ তাঁহার সজ্জিত মানবের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তখন নিজ প্রতিবিম্ব বিধে দেখা যায়, তখন জগৎব্যাপী ঈশ্বরকে দেবিত্বের জন্ত দ্বারের সার্থক বিচরণ করেন । বুদ্ধ তখন ভিক্ষু-বেশে দ্বারে দ্বারে বিচরণ করেন,—খ্রীষ্ট তখন নিভৃত স্থান পরিত্যাগ করিয়া নগরে নগরে প্রচারার্থ বহির্গত হন । সাধনার চরমোৎকর্ষে সাধক জগতের দ্বারে তখন আত্মবিক্রীত হন । তখন আর কেহ পর থাকে না, সব পর আপন হইয়া যায় । তখন আত্মার

ভিতরে অগং পরিচ্ছূট হয় ;—তখন বিশ্ব-জ্ঞান মানবশ্রেয়ের উদয় হইয়াছে, পরনির্বাণ বা পরতীকান্তরতা উড়িয়া গিয়াছে—সাধক তখন জগন্ময় বিশ্বরূপ দেখিয়া একাত্মিক প্রেমে দীক্ষা লাভ করিয়াছেন । তখন আত্মাদর-পূরে পরের ভালবাসা জমাট বাঁধিয়াছে—তখন “স্ব”—জগৎ ছাইয়া ফেলিয়াছে । তখন স্বর্গ ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছে ।

মহা সাধনার মহা প্রয়োজন । সাধনা কথার কথা নয়—নিভূতে, গভীরে ডুবিয়া বাইতে হইবে । “স্ব” সাধনে সিদ্ধিলাভ না করিতে পারিলে কিছুই হইবে না ; নিশ্চয় জানিও । অতএব এস-তাই—স্বাবলম্বনের জন্ত সকলে বন্ধপরিকর হই । এই পঞ্চ ধরিয়া “স্বদেশের” “স্বজনের” সেবা করিতে করিতে চরনোন্নতির পথে উন্নীত হইয়া যাই ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা ।

বিভূরের ক্ষুদ্র ।

(দেবি,) তোমারে বরণ করি ।
এই মধু-নিশি-শেষে,
আমি ঘুমের আবেশে,
আকুল পরাণে, তোমারি সন্ধানে
এসেছি ছুটিয়া হৃদয়ে তোমারি ।
২
ওগো জানিনা কি আশে,
কোন্ অতৃপ্ত পিয়াসে,
মুষ্টি ভিক্ষা তরে, আসি তব দ্বারে,
ডুকিছে কাঙ্গাল, ‘রাজরাজেশ্বরি’ !
৩
হের নবীন পুলকে,
চাক্র স্নিগ্ধ উবাগোকে,
তোমারি লাগিয়া, উঠেছে হুটিয়া,
কত বনফুল,—বিচিত্র মাধুরী !

৪
ওগো বন, উপকন,
কত পুষ্পিত কানন,
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া, অধীর হইয়া,
এসেছে অনিল, নিকুঞ্জবিহারী ।
৫
বাহি কুমুদ-স্ববাস,
কেলি সুরভি নিশ্বাস,
তোমারে খুঁজিয়া, বাউল হইয়া
তোমারি নিকুঞ্জে ভ্রমিছে গুঞ্জরি ।
৬
হের গুণ-গুণ করি,
কত মত্ত মধুকরী
মকরন্দ আশে তোমারি উদ্দেশে,
এসেছে উড়িয়া আপনা পাশুরি ।
৭
ওগো হ’রে উন্মাদিনী,
কত বন-বিহঙ্গিনী,

মধুর কুঞ্জে, ঘোহের অপদে,
গাইছে কাননে বন্দনা তোমারি ।

চ
আমি যে গো অতিদীন,
হুখী তাপী গৃহহীন;
নাহি জিজ্ঞাসে কেহ কোন খানে
আমি যে একেলা পথের ভিখারী ।

৯
ওগো এনেছি তুলিয়া,
সাথে কৌচড় ভরিয়া,
প্রীতি-স্বরভিত— চন্দন-চর্চিত,
যুঁথি, সেকালিকা, চম্পক-মঞ্জরী ।

১০
মোর আছে শুধু তাই
আর যে কিছুই নাই,
তাই প্রভাতে এসেছি সঁপিতে,
বিহ্বলের ক্ষুদ্র চরণে তোমারি ।

১১
তুমি ওঠ, খোল দ্বার,
লহ তুচ্ছ উপহার,
নগিন-নয়নে চাহ মোর পানে,
দাঁড়াও সন্মুখে তোমারে নেহারি ।

১২
ওই দৃষ্টি নিঃশব্দ,
হৃদে ফুটার কমল;
পূরণ জড়িয়া থাকুক আগিয়া,
পুণ্যগন্ধ তার দিবস শরীরী ।
(আমি) তোমারে বরণ করি ।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায় ।

শরতে ।

১
কে আজি এমন বেশে, বসেছ ধরায় এসে,
বিশ্ববিমোহিনি !
যে দিকে নয়ন যায়, তোমার রূপের ভায়
চমকি, জননি !
আকাশ গগন ঢাকি, একি মা ! তোমার একি
বিরাট আসন !
মেঘলোক পরশিছে তব, সিংহাসন !

বিশ্বময়, বিশ্বরাশি ! মেহের আঁচল খামি
পাতিয়াছ তুমি ;
শিরসে কুসুম-হাস, বক্ষে চারু শ্রাম-বাস,
আছে পদ চুমি' !
অনন্ত গোরবে তুমি রাজিছ ; এ বিশ্বভূমি
লুটাইছে পায় !
কে তুমি জননি ! দেবি ! চিনি কি তোমার ?

৩
আজি শুধু নহে, বুঝি, কোটি জন্মে তোরে খুঁজি'
ফিরেছি মা ! আমি !
অস্থির বিছাৎ সম, চক্ষের সন্মুখে মম
কত দিবা, যামী,—
এসেছ, গিয়েছ সরি, 'আমারে চকিত করি ।'
আকুল ভাষায়—
আমি শুধু স্বধারেছি—“চিনি কি তোমার ?”

৪
ও মৌন হাসির পাছে অসীম রহস্য আছে
লুকা'য়ে গোপনে !
এ ব্রিঞ্চ দৃষ্টির মাঝে অনন্ত সঙ্গীত বাজে
অধীর মুর্ছনে !
চকিতে ঘুমের ঘোরে, জননি ! দেখেছি তোরে !
শুনেছি সে গান !—
মুগ্ধ এ হৃদয় মা গো, মুগ্ধ এ পরাণ !

৫
অজ্ঞাতে, চকিতে, কবে, আমার হৃদয়-নভে
ঋত-তারা প্রায়,
দেখা দিয়ে, সারাৎসারে ! কি বলেছ, বুঝিবারে
পারিনি ত, হায় !
বুঝি, বা না বুঝি কথ্য, কি হৃদয় অধীরতা
জ্বগেছে পরাণে !
উন্মাদ-আবেগে গেছি ছুটি' তোমা পানে ।

৬
স্বতির মোহন-যন্ত্রে অবৃত অধীর তব্ধে
উঠেছে ঝঞ্ঝার—
যুগ যুগান্তের কত বিশ্বত-কাহিনী শত
তোমার আমার !
স্বষ্টির প্রথম, কবে, জননি ! বিদায় হবে
লইছ চরণে,
সে দিন কি কথা ছিল পড়ে যেন মনে !

কথা ছিল হে শুভদে! আবার কিরিত পদে
সাধনার শেখের!
কই মা! কিরিত কই? আমি যে আমারি নই!
শ্রোতে যাই ভেসে!
শত জন্ম পুণ-হারি, আমি যে পাগল পারি
ছুটেছি কোথায়!
তবুও ত ব্রহ্মময়ি! ভোলনি আমার!

কণিক পরশে তবু, যদি বা আমার, কভু,
ভাঙে ঘুম-বোর,
স্নেহ বশে বুঝি তাই, যত আমি দূরে যাই,
কাছে এস মোর!
আছ তুমি এত কাছে, তবু যেন মাঝে আছে,
কত ব্যবধান!
আমি যে মোহেতে অন্ধ, আমি যে অজ্ঞান!

করি' বিশ্ব বিপ্লাবিত, ঢালো ঢালো উচ্ছ্বসিত
করণার ধারা!
হে দেবি! হে ব্রহ্মময়ি! হে জ্ঞাননি! হে চিন্ময়ি!
ওগো সারাৎসারা!
হ'ল না হেন না আর, আমি হ'তে মা! আমার
হবে না উজ্জ্বল!
তোমার করুণা শুধু ভরসা এবার!

কি সুন্দর এ জগত! কি সুন্দর এ শরত!
বিচিত্র স্বপ্নন!

কি উদার নভঃতল! কিবা বিন্দু নদী-জল,
নির্মল, পাবন!
আমি কেন নাহি তৃপ্ত! এ দেহ কানিমা-লিপ্ত,
অশান্ত পরাগ!
পবিত্র জগতে কেন নাহি মোর স্থান!

কে আজি মেঘের পরে বসিয়া, গভীর স্বরে
"শান্তি: শান্তি:" কয়!
কত শান্তি, নাহি জানি, ওগো অশরীর বাণি!
তব দেশে রয়!
মা হারা হৃদয় তায় বুঝি গো ভাসিয়া যায়
শান্তির জগতে,
মায়াবী এ মরতের কারা-কন্ড হ'তে!

নীল আকাশের গায়, উড়ে উড়ে কোথা যায়
মেঘ ধরে ধর!
তাহার পশ্চাতে, দূরে, উদার অনন্ত পুরে
কে বেঁধেছে ঘর!
সেখানে বসিয়া, অগ্নি! কে তুমি রহস্যময়ি!
বাক্সাইছ বীণ!
সে স্বর, অবশ প্রাণে, কত সুরে, কত তানে,
বাজে নিশি দিন!
যেন দূর স্বপ্ন-গীতি,—কোন যুগান্তের স্মৃতি—
মনে পড়ে যায়!—

মুখ যদি ছুটে যায়—কোথায়! কোথায়!
ত্রিগুণেন্দ্রনাথ গুহাইত।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

২৭। ভাষা ও আদিরস এবং পরবশতা;—
শ্রীশশধর রায় প্রণীত, মূল্য কাগজ
৮০, কাগড় ১। ভাষা ও আদিরস ৩২ পৃষ্ঠা,
পরবশতা ২১৩ পৃষ্ঠা, ডিমাই ৮ পেজি।
মূল্য কত মূল্য! স্বদেশী ভাল কাগজে
ছাপা। সাহিত্যকে বিজ্ঞান-মূলক করি-
বার জন্য গ্রন্থকার যে অদম্য চেষ্টা করিতেছেন,
এই গ্রন্থ তাহার উদাহরণ। এই গ্রন্থ প্রণয়নে
গ্রন্থকার যে গবেষণা ও বিজ্ঞতার পরিচয়
দিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। গ্রন্থখানি
এত উপাদেয় হইয়াছে যে, বর্তমান স্বদেশী
আন্দোলনের দিনে ইহা ঘরে ঘরে আবৃত

হওয়া উচিত। "জাতীয় বিলোপ" প্রবন্ধটি
সকলের পাঠের ও চিন্তার বিষয়। স্থানান্তরে
উহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম। পুস্তক
খানির বহুল প্রচার আমার প্রার্থনা করি।
গ্রন্থকারের লেখনীতে পুস্তকচন্দন বর্ষিত হউক।

২৮। রামায়ণের ছবি ও কথা। শ্রীযোগী-
জ্ঞাননাথ বসু প্রণীত, মূল্য ১। এই সুন্দর
পুস্তকে সুন্দর সুন্দর ১৬ খানি ছবি আছে।
এই পুস্তকখানি একরূপ সরল, স্থলিভিত্তিক, সংক্ষিপ্ত
ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে পড়িলে অকাক্ষ
হইয়া ভাবিতে হয়, যোগীজ্ঞাননাথ ৪০ পৃষ্ঠার মধ্যে
সমগ্র রামায়ণ খানিক রূপে শেষ করিলেন?

আজ কাল অনেকেই সুন্দর বাঙ্গালা লিখিতেন বটে, কিন্তু যোগীন্দ্রনাথের জ্ঞান সুমিষ্ট বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতে অতি অল্প লোকেই পারেন। একটু স্থান উদ্ধৃত করিলাম, ইহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, রচনা কেমন স্মিষ্ট।

বালক বয়সে রাম, বিখ্যামিত্র সনে,
মুনি-যজ্ঞ-রক্ষা হেতু যান তপোবনে।
তাড়কা নামেতে পথে ছিল নিশাচরী
জীবহিংসারতা তুষ্টা, মহাভয়ঙ্করী,
শিরে তাম্র-জটা তার, অস্থি-বিভূষণ,
সন্ধ্যামেঘ-সম-বর্ণ মুরতি ভীষণ।
পশুচর্য পরিধানা, বিকট-দশনা,
বিপুল-শরীরা ক্রুদ্ধ মাতঙ্গ-গমনা।
শ্রীরামে দেখিয়া ক্রোধে তুষ্টা নিশাচরী
ধাইয়া আইল হই বাহ উদ্ধ করি।

এই সুন্দর পুস্তকখানি গৃহে গৃহে প্রচারিত হউক।

২৯। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত।
তৎকর্তৃক লিখিত হস্তলিপি হইতে মুদ্রিত।
মূল্য কাপড়ে বাঁধা ১৮/০, কাগজের মলাট ১৮/০।
যে সময়ে ঋষি রাজনারায়ণ জন্মগ্রহণ
করিয়াছিলেন, সে সময়ে দেশের উন্নতিকামী
বহুগণক ছিল না। যে কয়েকজন মহাপুরু-
ষের চেষ্টায় বঙ্গে উন্নতির স্রোত প্রবাহিত
হইয়াছিল, এই মহাত্মা তাঁহাদের অগ্রতর।
এই আত্মচরিতখানি বঙ্গের একসময়ের ইতি-
হাস বিশেষ। সরল ভাষায়, অনাড়ম্বর ভাবে
এই জীবনকাহিনী বিবৃত হইয়াছে। পাঠ
করিয়া আমরা বড়ই উপকৃত হইলাম। যিনি
এই পুস্তক পাঠ করিবেন, তিনিই উপকৃত
হইবেন, আমাদের বিশ্বাস।

৩০। রামানুজ-চরিত। শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
প্রণীত, মূল্য ১৮/০। শাস্ত্রী মহাশয়ের শঙ্করা-
চার্যের জীবনী যেমন বঙ্গে আদৃত হইয়াছে,
এই পুস্তকখানিও সেইরূপ আদরের যোগ্য।
প্রাচীন কালের ইতিহাস ও কাহিনী সংগ্রহ
করা বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। শাস্ত্রী মহাশয়
গভীর গবেষণা, প্রভূত পরিশ্রম, অল্পশ্রম অর্থ
ব্যয় করিয়া এই সুন্দর জীবন-চরিতখানি লিখিয়া-
ছেন। সংগ্রহ এত সুন্দর হইয়াছে যে,
আমরা সাহস পূর্বক বলিতে পারি, যিনি

ইহা পাঠ করিবেন, তিনিই 'বিমুগ্ধ' হইবেন।
বিশেষতঃ এই পুস্তকের অবতরণিকা এক
অপূর্ব জিনিস হইয়াছে, বৈদিক ধর্মের উৎ-
পত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শঙ্করের অবৈতবাদ
ইহাতে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শাস্ত্রী
মহাশয়ের ভাষা বিশুদ্ধ, প্রাজ্ঞ, এবং সরল—
পড়িতে বসিলে পুস্তক শেষ না করিয়া উঠা
যায় না। সাহিত্যাহুরাগী ব্যক্তিগণ এই
পুস্তকের আদর করিবেন, আমরা আশা
করি।

৩১। The Sixteenth Annual
Report of the Calcutta Deaf and
Dumb school, Session 1908.

বোবা এবং কালো স্কুল সাধু শ্রীনাথ এবং
উমেশচন্দ্রের এক অপূর্ব কীর্তিঃ—সামাজ্যে
ইহার আরম্ভ, অসামাজ্যে ইহার পরিণতি।
আমরা এই কার্য্যবিবরণখানি পড়িয়া যারপর
নাই আনন্দিত হইলাম। বিধাতার বিশেষ
কৃপা বশিত হউক।

৩২। মাধুরী। শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী
প্রণীত। সাধু-প্রতিদেবকুমারের কথা
এদেশের কে না জানে? অনিন্দিত
চরিত্রের অধিকারী হইয়া এই দেবশিশু
আপন প্রতিভায় দেশ মোহিত করিতে-
ছেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতিভা আরো
কুটিয়া উঠিতেছে। এই "মাধুরী" তাঁহার
পরিচয়। শিল্পনৈপুণ্য এবং ভাব-সম্পদে
দেবকুমার অমরত্ব লাভ করিবার যোগ্য
হইয়াছেন। ইচ্ছা হয়, অনেক কবিতা
তুলিয়া দেই,—কিন্তু স্থান নাই, এই দুঃখ।
কবির "প্রার্থনা" কবিতাটা পড়িতে পড়িতে
আমরা অশ্রু সঞ্চরণ করিতে পারি নাই।
বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ কবিতা আর কোথাও
পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। মাধুরী
কবিতাটা কত সুন্দর, পাঠক দেখুন,—
"গান গাহি। কেন গাহি?—গাহিয়ার কিছু নাহি,
আজি বিধে শুধু হেরি—

"মাধুরী অপার!

তবে, বুধা হাহাকার, কেন আর—কেন আর?

ডুবে' ঘা'রে এ অমৃতে

পর্যায় আমার।"



অনভিজ্ঞাত কাব্য-সাহিত্য ।

বাঙ্গালা “ব্যাণেড্” সাহিত্য সংগ্রহকার্যে অনেকগুলি অচর্চিত ও অননুযায়িত কাব্য-কথা পাওয়া যাইতেছে ।

- কথিত আছে, প্রাচীন কালে বর্ষাক্রিষ্টে অরণি-কাষ্ঠ হইতে সহসা অগ্নি উল্লীর্ণ হইয়া হোমশিখা গঠন করিত । আমাদের পরী-প্রান্তরের নানী কোণে কত অরণির সন্ধান আকস্মিকভাবে পাওয়া যাইতেছে, বাঙ্গালার বিপুল প্রাচীন সাহিত্য তাহার প্রমাণ—এবং ইহার শতমুখী আলোক-শিখা তাহার দৃষ্টান্ত ।

ভারতের কুসুম-রক্ত প্রভাব, হীরকশুভ্র দীপ্ত মধ্যাহ্ন, ধূসর-পিঙ্গল প্রদোষ, বর্ণে, গন্ধে কত গীতিকথা স্বজন করিয়াছে, অমলিন প্রকৃতির জাগ্রত হরিৎ অঞ্চলে তাহা কি প্রতিদিন শিহরিয়া উঠিতেছে না ?

বর্তমান প্রবন্ধে যে শ্রেণীর সাহিত্য আলোচিত হইবে, তাহার চর্কা সাময়িক সাহিত্যে হয় নাই । ইহার প্রধান কারণ, এতকাল ইহা নেপথ্যে ছিল ।

- ইহাকে ঠিক প্রাচীন সাহিত্যও বলা যায় না, বিশ্বাসের বিষয়, ইহা প্রচলিত সাহিত্য, তবে ইহা প্রাচীনকালের ভাব, ভাষা, ছন্দ প্রভৃতি সগৌরবে বহন করিয়া, সনাতন ভাবকুল্যার খরস্রোতের সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে । শরতের বিপুল ভূবার-শুভ্র ছিন্ন মেঘান্তরালের সীমাহীন শীলিমা-কোণে ইহা যেন ক্ষুদ্র নাল্যের স্থান অধিকার করিতে পারে ।

কালেড গীতির, ঠিক বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দেওয়া বিশেষ দুষ্কর—একটা বিশেষ নিবিড় আদকতা আছে, তাহা স্ফলিকার জ্বা

নয়ভাবে আয় প্রস্ফুট হয় না, তাহা বকুল-কিঞ্জকের আড়ালে নিহিত গন্ধের জ্বা অস্ত-রানে থাকিয়া মহিমা লাভ করে ।

সৌন্দর্য্য বহুকাল আয়গোপন করিয়া থাকিতে পারে না । এই সমস্ত ব্যাণেড-গীতির ঘন আকর্ষণে প্রবল তুফানের উন্নততা নাই, গ্রীষ্মের সমুদ্র-শীকর-সিক্ত মধ্যাহ্নবায়ুর তৈর্য্য ইহাকে অবিনশ্বরতা দান করিয়াছে । ইহাকে শ্রদ্ধা করিতেছি, কারণ মানবের হৃদয়-বোঝার বিধকর্য্য যে কয়খানি সুকুমার হেম-তার ঝুলাইয়া দিয়াছে, বাহার অঙ্গুলাগ্র-স্পৃষ্ট আলোকে তাহা নিবিড় উদ্ভিত্তে বন্ধা-রিয়া উঠিবে, তাহারই কণ্ঠে ফুলমালা পড়িবে ।

বাঙ্গালা দেশের ভট্টসঙ্গীত-সমূহকেও এই শ্রেণীর সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করা যাইতে পারে ।

এই ব্যাণেড গীতিগুলি আশ্চর্য্যরূপে চিত্ত-বিমুক্তকর । Allan Ramsay এর “Ever-green” কথা Percy's Reliques প্রকাশ দ্বারা একসময়ে পশ্চিম ইউরোপে যে উত্তেজনা দেখা গিয়াছিল, Madame de Cherie এর গ্রীস্ প্রদেশের ব্যাণেড সম্বন্ধে চেষ্টা, কথা Herder Goethe বা Walter Scott এক্ষেত্রে যেক্রপ উজোগ প্রকাশ করে, তাহা কিরূপ ফলপ্রসূ হইয়াছিল, কাহারও অজ্ঞাত নহে ।

কোন অভিজ্ঞ লেখক “ব্যাণেড গীতি” সম্বন্ধে বলেন :—

“A simple tale told in simple verse.....The beauty of these purely popular ballads, their directness and freshness made them admired .

even by the artificial critics of the most artificial periods in literature".

এজন্যই ব্যালেড গীতিগুলি কবিগুরু গেষ্টের বড়ই প্রিয়বস্তু ছিল। তিনি স্বয়ং পাণ্ডিত্যের বোঝা বন্ধ হইতে নিষ্কপ করিয়া এই শ্রেণীর সরল গ্রাম্যগীতি রচনা করিতে কুষ্ঠা বোধ করেন নাই। তাহার রচিত "Ballad" (বৃদ্ধ ও শিশুগণ বিষয়ক) এবং "Happy couple" বিষয়ক ব্যালেডটি বিশেষ ভাবে তাহার প্রিয় ছিল। শেষোক্তটি সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

"The poem of the Happy Couple is likewise rich in motives ; whole landscapes and passages of human life appear in it warmed by the sunlight of a charming spring-sky which is diffused over the whole"*

বলা যাউতে পারে, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে কথা সাহিত্য রচনা সর্বপ্রকারে বিফল হইয়াছে। "Popular" বা লোকরঞ্জক সাধারণের পাঠ্য বা গেষ্য কথা সাহিত্যে নাই বলিলেও অতুক্তি হয় না। কবি-বংশ-প্রার্থীদের লক্ষ্য সংস্কৃতভক্ত বা ইংরাজী অভিজ্ঞ কলেজ-বোঁবা যুবক—অজ্ঞ সাধারণ তাহাদের দৃষ্টিপথে পড়ে না। আমাদের দেশে আক্ষরিক শিক্ষা বিস্তৃতির অভাব সত্ত্বেও সুরসংযোগে পঠিত ভট্টগীতি, বার-মাস, বা ব্যালেড প্রভৃতি শ্রোতার অভাব কখনও হয় না। "মাস" সম্বন্ধে আমরা নানা মতামত প্রকাশ করি, অথচ "মাসে"র (mass) মাঝে ভাব প্রচারের পদ্ধতিলিকে ঘৃণার চক্ষে দেখি। ইহা কি সামান্ত পরিভাষের বিষয় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্য হইতে কয়েকটা সঙ্গীত বাদ দিলে ভাষাতিরিক্ত একটা

কবিতা বা গীতিও সাধারণের হৃদয়ে স্থান পায় নাই? এজন্য জাতির মাঝে একটা অস্বাভাবিক বৈষম্য সৃষ্ট হইতেছে। সরল সহজবোধ্য গ্রাম্যগীতি রচনা কি বাস্তবিক অবহেলার বিষয়? বার্ণসের গ্রাম্যগীতি ও ব্যালেডের কি তুলনা আছে?

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য 'ব্যালেড' গুলির সহস্র সহস্র কাপি চট্টগ্রামে প্রতি বৎসর বিক্রীত ও পঠিত হয়। হিন্দু, মুসলমান, ব্যবসায়ী, দোকানদার, নোকার 'মাঝি', হোটেলওয়াল, স্টেট মুজুর, ফিরিওয়াল, জাহাজের খালাসী, গাড়ীওয়াল প্রভৃতির এই শ্রেণীর রচনা বিশেষ ভোগ্য। চট্টগ্রামে ইহাকে এক বিশেষ অর্থে (Technical sense) "কবিতা" বলা হয়। তাহার ইংরাজী প্রতিশব্দ অনেকটা "ব্যালেড" বলিলে ঠিক হয়।

অতি মধুর, স্বচ্ছ, উজ্জল সুরে কোন সুপাঠক অধ্যয়ন করিতেছে এবং মধুসূদন মক্ষিকার স্তায় কুহেলী, উচ্ছ্বসিত শ্রোতৃবর্গ মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট। এই দৃশ্য হাতে মাঠে দূর্লভ নহে। মনে হয় যেন রৌদ্রতপ্ত হৃদয়গুলিকে এই গ্রাম্য স্বরালাপ স্পষ্ট কবিতায় শীকর-সিক্ত করিয়া তোলে; যেন দৈনন্দিন কঠোর জীবন-মরুর শুষ্কপথে মরৌচিকা-গ্রস্ত গ্রাম্য হৃদয় হঠাৎ শ্লিষ্ট পল্লকুল লাভে আকুল হইয়া উঠে।

এ শ্রেণীর ব্যালেড হইতে পাঠকদিগকে কয়েকটা উপহার দিতেছি। কিন্তু এই "কবিতা" গুলি চট্টগ্রামের হিন্দু মুসলমান সাধারণের সাময়িক জীবনের সহিত নিবিড় ভাবে যুক্ত, এজন্য কিছু ভূমিকা সংলগ্ন করিয়া সাময়িক জীবনের কিছু বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন, নচেৎ ব্লগবোধ হইবে না।

* "Conversations with Eckermana." Bohn's Series.

• চট্টগ্রাম সমুদ্রতীরবর্তী বন্দর—আলবালের

ভাষ্য বর্ণকুলী নদী ইহাৎক বেষ্টন করিয়া
প্রবাহিত হইতেছে। বঙ্গোপসাগরের দিগন্ত-
পারী সীমাহীন কুলবরের ব্যাপকতা, অনন্ত-
নীৰ্ঘা শৈলমালার কঠিন ক্রোড় এবং উচ্ছ্রিত-
কেতু অৰ্ণবধান-জাল-জড়িত বর্ণকুলী নদীর
কল্লোল, উচ্ছ্রাসের মাঝে অস্বস্ত্য সাধারণ
মানব-লিপ্ত নানা আকাঙ্ক্ষা কল্পনার মাঝে
বর্ধিত হইয়া উঠে। এমন লোক পাওয়া দুষ্কর

• যে, এই সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া বন্দরান্তরে পদক্ষেপ
করে নাই। সাধারণ লোকের মাঝে দেশান্তরে
বাওয়ার, দিকে দিকে বিস্তৃত হওয়ার অতি
ভীত পিপাসা রহিয়াছে। গৃহ-পলাতক কত
তরুণ যুবক দক্ষিণ ভারতের বন্দর প্রভৃতিতে
প্রস্থান করে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সাধারণ নিম্ন শ্রেণীর লোকের মাঝে ব্রহ্ম
প্রদেশের রাজধানী রেঙ্গুন বড়ই প্রিয়বস্তু।
সেখানে প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জন সম্ভব
বলিয়া নহে, স্বপ্নমূলভ ব্রহ্মদেশীর জীবনের
ঐচ্ছল্য, নূতনত্ব, এবং বৈচিত্র্যের মাদকতা,
ইহারা কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারে না।
ভ্রমৃত্য রমণী-সম্প্রদায়ের অবরোধ-বিহীন
অবাধগতি, পুরুষদের জীবনের প্রতি সরল
ঐদ্যন্ত, এবং এতদ্ব্যতিরিক্ত রহস্যময় জীবনযাত্রা,
বাঙ্গালার বন্ধ-বায়ু গবাঙ্ককোণ হইতে আগত
মানুষের বড়ই অভিনব বোধ হয়। রাশি
রাশি প্যাগোদার (Pagoda) ঐশ্বর্য্য,
বিশ্রাম-গৃহের কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মঞ্চ, বৌদ্ধ ভিক্ষুর
হরিদ্রা-রঞ্জিত পরিচ্ছদ বস্তুতই নয়নাভিরাম,
সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বোক্ত ব্যালেভ্ণুলি চট্টগ্রামের এই
বহিজীবনের স্রব্ধ হৃৎক, বিপদ ভয়, শোক তাপ
প্রভৃতি অতি বিচিত্র কল্পণ ভাবে অঙ্কিত
করিয়াছে।

“আহু-কানুর কবিতা” হইতে কিছু উদ্ধৃত
করিতেছি :—

“চট্টগ্রাম সাতকানীয়া খানার অন্তর।

ছওয়ারী শিক্দার ছিল আহু নগর বর ॥

ধনে মানে রূপে গুণে রাজ্যের প্রধান।

একে একে পঞ্চপুত্র বরে ছিল তাঁর ॥”

এই কবিতায় যে পরিবারের ছবি ফুটিয়া
উঠিয়াছে, তাহা দুলভ নহে। অনেক পরি-
বারের হৃদয় ইহার অঙ্কিত চিত্রের দ্বারা অক-
ল্লিভভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। এই ‘কবিতা’টি
হইতে আরও কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

পঞ্চপুত্রের মধ্যে তান ছই পুত্র প্রধান।

আহুমিঞা; কানুমিঞা যেন পূর্ণিমার চাঁদ ॥

... ..

আহুরে করাইল বিবা বহু যত কথি।

যুবদার সিকদারের মায়া অবলা কুবারী ॥

উদ্বাহের পরই অন্তর্নিহিত প্রাকৃতিক
প্রবৃত্তির তাড়নার আহুমিঞা সমুদবাহী
অর্ণবধান বন্ধে রেঙ্গুন চলিয়া গেল, নববিবা-
হিত বধুর আকর্ষণও তাহাকে গৃহের মাঝে
নোঙ্গর-বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না।
গৃহের সর্ববিধ স্নেহরাজ্য হইতে নিজেকে
বিচ্ছিন্ন করিয়া রেঙ্গুনের বিচিত্র পরীরাগ্যে
সে উপনীত হইল।

তারপর এ সমস্ত নাটকের যেক্রপ অঙ্ক-
চিত্র জীবনপথে ঘটে, তাহাই হইল। আহুর
কনিষ্ঠ কালুও রেঙ্গুন বাইতে ছটফট আরম্ভ
করিল, গৃহত্যাগী হইল ও জ্যেষ্ঠের অহুগামী
হইল।

অবশেষে উভয়ে পত্তপাঠের “বণিকের
পুত্রের” ভাষ্য গোপন বিক্রয়-ব্যবসা, আরম্ভ
করিল, কিন্তু যেখানে বিধি বিরূপ, সেখানে
মানবের শত কল্পনা ব্যর্থ হয় :—

তান—তাহার।

“কিছু আছিল গুরু ছাগল অনেক ছিল টকা,
ব্রহ্মার ডাকাইতের হাতে মৃত্যু আছিল লেখা ॥
আহুনিঞা উঠি’ বলে কালুরে সোদর,
চতুরদিকে আইসেয়ে ঘিরি ডাকাইতের লঙ্কর ॥
কালুমিঞা উঠি’ বলে, আহুনিঞা ভাই।
হাতের চাতিয়ার লওনা, করিতাম লড়াই ॥
আহু লৈল শেল বন্দুক কাহু লৈল রোল।
ব্রহ্মার ডাকাইতের সনে বড় গুণ্ণগোল ॥
কেহর কাটিল হস্ত পদ কেহর কাটিল নাথ।
কত জন বান্দি রাখিল কালীগিলার লতা * ॥
চল্লিশজন ডাকাইতের মধ্যে ত্রিশ জন কাটিল।
আচম্বিতে ছেল আসি আহুর বৃকে পৈল ॥
আহুনিঞা মারা গেল, কালু একেত্তর।
চারিদিকে আইসেয়ে ঘিরি ডাকাইতের লঙ্কর।
... ..

এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে উভয়ই মৃত্যু-
মুখে পতিত হইল, তারপর এই সংবাদ দেশে
পৌঁছিলে পর—

“মায়ে কান্দে, বাপে কান্দে, কান্দে ভগ্নীপতি
ছই ভায়ের ছই বধু কান্দে করি গলাগলি ॥
ইত্যাদি।

যে প্রদেশ হইতে প্রতি বৎসর পঞ্চ সহ-
স্রাধিক লোক ব্রহ্মদেশে গমন করে, সেই প্রদেশ-
শেব কুটীরবাসী সাধারণ এই মুক্ত আড়ম্বরহীন
গীতি-কথায় বিষয়জনকভাবে আকৃষ্ট হয়।
নানা সুরে ইহা পাঠিত হয়, উপরোক্ত ব্যালেড্-
টার ধূম্য এই :—

“নছিবেরে কঁহি শুন গুণিগণ শুন পরস্তাপ
পুত্রণোকে মা জননী করন্ত বিলাপরে।
হায় হায় রে ও নছিব রে ॥”

দোহারেরা কবিতায় এই ধ্রুবক দ্বারা সুর
রক্ষা করে।

বাণিজ্য, ব্যবসা, কৃষি, কুশীদজীবী

* লতা বিশেষ।

প্রভৃতি ‘সামাজিক’ নানানিষয়িণী ব্যালেড্
আছে। সংগৃহীত কবিতা হইতে ছ’ একটা
পাঠক-বর্গকে উপহার দিব। পাঠক গ্রাম্য
কবির চিত্রাঙ্কণ-প্রতিভা দেখিয়া পুলকিত
হইবেন, সন্দেহ নাই।

“গোলমণি মাঝির নৌকাভাসা” নামক
গীতি কথ্যটি বড়ই চিত্তাকর্ষক।
“বলি পরম্পরে, রাজা বলি চরে কিরূপ হইল।
সেই কথা কহিতে ভাই, মনে ধন্দ হইল ॥
কবু আর দেখি নাই, শুনি নাই, এমন আকার,
আগ্রাণ মাসের আট তারিখে হইল

মেউলার * সমাচার ॥

পড়ে ঝড় বৃষ্টি, নাই দৃষ্টি, মন হইল হতাস।
পূর্ষ কোণে হইতে জল, ছুটাইল বাতাস ॥
করে হহ শব্দ, হইল স্তব্ধ, দেখি নদির জল।
ভাবে বৃষ্টি, এই বার রাজ্য, হবে রসাতল ॥
ছারি জীবনের আশা, সকল বাসা যত লোকছিল,
জলের বলাবল, দেখি কাঁদিয়া উঠিল।

ইত্যাদি।

এই প্রবল প্রাকৃতিক ঝটিকার মাঝে
“গোলমণি মাঝির” শিরশায়ী অভিসম্পাত
স্বস্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে।

... ..

“শুক্রবারে উবাধাত্রা কবিয়াছেন ধারে
হারে গোলমণি মাঝি, বিধি রাজি নাই
তোমার উপর ॥

ফার মার জাল, বসাইল, প্রথম শনিবার।
রবিবার উপস্থিত হল দেখা গেল মেউলার ‡
আকার ॥

উত্তর কোণে পূর্ষভাগে হইল আকার
বলে গাউর ‡ জলে, প্রাণপণে শুন মাঝি ভাই—
মাছে জালে, নৌকা সহ, চরে চলি যাই ॥

* মেঘল—মেঘযুক্ত—মেঘাভবন যুক্ত।

† কীতি।

‡ মেঘল (মেঘযুক্ত) গানের অপভ্রংশ।

¶ গাবুর—শ্রমজীবী বলিষ্ঠ লোক।

গোলমণি বড়ই গোলে পড়িল, তাহার
মংগল-সঞ্চয় নিষ্ফল হইল। কেহ কেহ নোকা
হইতে সঞ্চিত মুৎসাদি নদী জলে ফেলিয়া
আগ্নয়ক্ষয় তৎপর হইল। তার পর—

“দৈল রাজিকাল” এই জঞ্জাল পৈল চলিল।
খরতর হইল বুঝি পবন ঝিল্লোল ॥

টেট উঠে ফুটি ফুটি, পরিপাটি, সাগর হইল ভাটা,
এইবার কালী, কা কর, দিব তোমায় পাঠা ॥
মাঝিরে উঠিল কাঁদি, অরে বিধি, তুই হলি বিমুখ।
আমি না দেখিব, আমরা চটগ্রামের মুখ।

তার পর এই ক্ষুদ্র নাটো যবনিকাপাত
হইল, গোলমণি মাঝিকে আর পাওয়া
গেল না।

উপরোক্ত গীতিটা সম্পূর্ণ “গোলমণি
মাঝির বিলাপ” নামক আরও একটা ব্যালেড
আছে। এই শ্রেণীর কবিতার মাঝে “গোলক
বহরদারের যশঃকীর্তি” খানসিরাম সর্দারের
কবিতা” বড়ই কোতুলজনক, বাহলা ভয়ে
উদ্ধৃত করিতেছি না।

সামাজিক ব্যালেডের মাঝে “রেঙ্গুনের
আসল কবিতা” নামক গীতিতে রেঙ্গুনের
নানা বিবরণ, বিশেষতঃ নারীজাতির সৌন্দর্য,
আকর্ষণ, প্রলোভন, ফাঁদ প্রভৃতি, বাজারের
বিপণি সমূহ, ব্যবসায়ী, উকীল, সদাগর
প্রভৃতির নানা বিচিত্র কথা আছে।

“সুদখোরের কবিতায়” মহাজনের প্রতি
বহু ধিকার আছে। বিশেষতঃ মুসলমানদের
প্রতি অনেক ধর্ম উপদেশ দিবার প্রলোভন
গ্রাম্য কবি অতিক্রম করিতে পারে নাই।

“শয়তানের ফেরেব ভাষি, ইমান কাড়ি
নিবেঞ্জনেন জন।

ভাবি চাহ আদমেরে করিল কেমন ॥
আমরা কিবা জানি, কতগুলি চিহ্ন করিয়াছে।
দিবানিশি শয়তান বসি থাকে লোকের কাছে।

ছনিয়াই ভোজের বাজি সয়তান পাখি

জানে নানা কন্দি।

দেখাই লাভ, কত পাব, লোক করে বলি
ইত্যাদি।

এই গীতি কথায় গ্রাম্য কবি “ছনিয়াকে”
“ভোজের বাজি” আখ্যা দিয়া দার্শনিক উপাধি
লাভের প্রায় যোগ্য হইয়া উঠিয়াছেন। যাহা
হউক, স্ত্রদের আভ্যন্তিক ভায়ে প্রসিদ্ধিত
মানব ইহা পাঠ করিয়া কণিকের তরে হইলেও
উৎসাহ লাভ করিবে।

কবিতাবীর পক্ষে বিশেষ উপভোগ্য
ব্যালেডও কয়েকখানি হস্তগত হইয়াছে।
তন্মধ্যে “গরুর দুঃখে”র কবিতাটা বড়ই করুণ
রসাত্মক এবং রাবাল ছন্দয়ের প্রিয়, সন্মোহ
নাই।

প্রভাত হইতেই ভূমিকর্ষণার্থ আহত গরুর
“দ্বিপ্রহর” পর্যন্ত লাঙ্গল বহন, বেত্রাঘাত লাভ
প্রভৃতি সমাপনান্তর শৈলমূলে তৃণগুচ্ছ খাই-
বার জন্ত ক্লমক হইতে গরুটা ছুটি লাভ করে।
কিন্তু নূতনতর! আধিভৌতিক বিপদ বায়ুমূর্তি
ধারণ করিয়া উপস্থিত। তাহাকে নিম্নলিখিত
ভাবে স্তব করিতে হইল :—
“খাবি” “খাবি” ও বাবা খাবিত আনারে।
গৃহস্থের ছাবাল পোলা তুয়াই* মরবে মোরে ॥
কোথায় লই যাই খাবি মোরে কহ
যে আমারে।

ব্যান্স বলিল—
“খাব ত” “খাব ত” গরু না ভাবিও ডর।
তোরে লই যাই খাব আমি কল্লকের ভিতর।
হঠাৎ এই অবিচ্ছিন্ন দুঃখ-পীড়িত গোথ-
নের প্রতি ভগবান প্রসন্ন হইলেন, কারণ—
“হেনকালে আইল ছ’জন শীকার করিবারে।
সেই জনেরে দেখি বাবা গেল ডরে ॥

* তালাস করিয়া বুজিয়া।

† অর্ধ দশমুহূর্ত হইয়া নাই।

এই বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াও গো-
বেচারীর পরিজ্ঞান নাই, গরু বলিতেছে :—
“সেখানে তুন + আইলুম ধাইয়া গৃহস্তের ডরে
যোরে লই যাই বাক্সি রাখিল ঐ গোয়ালের
ভিতরে ।”

তারপর এক ব্যক্তি গরুর গাড়ী হইয়া
উপস্থিত । গোদন পুনরায় তথায় যুক্ত হইয়া
কাদিয়া বলিতেছে :—

‘হুঃখের উপরে হুঃখ না যায় সহন
কাটা ঘায়ের মধ্যে যেন মাখিল লবণা’

গরুর বাগ্মিতার প্রশংসা না করিলেও স্বদয়-
হীন সাধারণ লোকের গীতি শ্রবণার্থ উন্মুক্ত
করুণতা-বিহীন চিত্র এই ব্যালেডে কিঞ্চিৎ
বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে, এই বিশ্বাস আমার
আছে ।

কৃষকের ধাত্ত রোপণ সঙ্কল্পে এক ব্যালেড
পাইয়াছি । ১৩১২ বাঙ্গলায় চট্টগ্রামে প্রথ-
মতঃ অনাবৃষ্টি, পরে অতিবৃষ্টি হইয়া কি অনর্থ
ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণিত হইয়াছে । নানা
গ্রামে অনতিদীর্ঘ ধান্যশুষ্কা দি জল প্রাণিত
হইয়া ক্রিপে নষ্ট হইয়াছিল, বিশেষতঃ শরৎ
বাবু নামক একব্যক্তি “দুধ কমল” নামক
ধাত্ত রোপণে, ক্রিপে সাফল্য লাভ করিয়া-
ছিলেন, তাহা বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে ।
ত্রিপুর, ফটকছড়ি, হাটহাজারী, ইছামতী স্বর্বা-
ধোলা, ফরফরিতলা, চরন্দীপ প্রভৃতি গ্রামে
ধাত্তের অবস্থা কি হইয়াছিল, তাহাও গ্রাম্য
কাব্যের দৃষ্টিপথগোচর হইয়াছে । পরিশেষে
কবি সাংসারিক হুঃখের অবশ্যজ্ঞাবিতা বিষয়ে
বক্তৃতা করিয়াছেন :—

“প্রতি সনে, হুঃখে বসে, জ্ঞান ধ্বংসে

রচনা না সরে

পদে পদে লোকের কষ্ট আছর সংসারে ।

† হইতে ।

কবি বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন :—

“বিদ্যার সমুদ্র জলে জ্ঞান মুক্তার বাস
না সুদিন পাই মুক্তা হইয়া দিনাশ ॥”

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবার ভয়ে, বিশেষতঃ পাঠ-
কের ধৈর্য্য লেখকের নিকট অপরাধীকৃত
থাকাতে, আর একটী মাত্র নমুনা দিয়া প্রব-
ন্ধের উপসংহার করিব, ওয়ালটার স্কটের—
“Merry it is in the good green wood,
When the navis and marlet are
singing”.

প্রভৃতি যদি বিরক্তিকর না হয়—তবে
বাঙ্গালার নিভৃত গ্রাম্যচিত্তের আড়ালে বিক-
শিত এই শ্রেণীর কাব্যগ্রন্থ অপ্রীতিকর নাও
হইতে পারে ।

ব্যালেড গীতির মাঝে “বারমাস” ই লোক-
প্রিয়, তন্মধ্যে “গোলজান কত্তা” ও বেন
মাক্সির “বারমাস” নামক কয়েকটী হস্তগত
হইয়াছে । “মা বাপের বার মাস” হইতে কিছু
উদ্ধৃত করিতেছি :—

“বৈশাখ মাসেতে মা বাপ হইল নিধন,

পুনর্বার মা বাপের না হৈব দরশন ।

নানা পুষ্প ফুটিয়াছে, গরু বায় দূর ।

আমারে ছাড়িয়া মা বাপ গেল স্বর্গপুর ॥

স্বর্গপুরে যাইয়া মা বাপ সব পাশরিলা,

এবে সে বুঝিলাম মা বাপ নির্মায়া হইলা ।

জৈষ্ঠল মাসেতে মা বাপ, রবির বড় জালা

মা বাপের কারণে শরীর কল্যাম কাল ।

মা বাপের কৰ্ম করতে ভাল লেখা নাই ।

হেলার হারালাম মা বাপ কাদিয়া না পাই ॥”

অনুতপ্ত স্বদয় এইরূপে বার মাসে পিতা
মাতার অভাব অনুভব করিয়া ক্রন্দন
করিয়াছে ।

“আষাঢ় মাসেতে মা বলে দেব দেব কারে ।

কেমনে রহিয়াছে মা বাপ আন্দার, মাওপ ঘরে ॥

চতুর্দিকে জলস্থলু প্রাণী কল্লো ডরে।

কেমতে রহিছে না বাপ উচু পানি ঘরে ॥”

অপেক্ষাকৃত প্রৌঢ়বয়সে বিধানেরও পিতৃ মাতৃ বিরোধে যখন অশ্রুসঞ্চার দেখি, তখন করুণ স্বর উচ্ছ্বসিত ওই গ্রাম্য কবির হৃদয়-রাগ-রঞ্জিত কথা, পিতৃমাতৃহীনের বেদনা-কিরূপ জাগ্রত ও পূর্ণ করিয়া তোলে, সহ-জেনেই কল্পনা করা যায়।

৪. পরিশেষে বলা প্রয়োজন, সঙ্গীতের ভ্রাম্য ইহার অল্প নির্দিষ্ট বিশেষ সুরের সহিত যুক্ত না হইলে ইহার ভ্রূয়িষ্ট সৌন্দর্য্য লুপ্ত হইবে— ব্যাশেড্ গীতির ইহাই বিশেষত্ব।

অন্তঃসারহীন, স্বাক্ষরপুষ্ট নব্য গৌরব্ধ্য কবিতা কি বার্ষসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই পথে জনসাধারণের হৃদয় মর্দনান করিয়া তুলিতে পারে না? শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

প্রফুল্ল-প্রশান্তি ।

প্রশান্ত অন্তরে বসি হে ঋষিপ্রবর,

অ ফুরন্ত ক্লাস্তিহীন উত্তত উত্তমে

কি ফুল্ল জ্ঞানের পুষ্প বিকশি স্নানর

সে দলে অমৃত পান করিছ সংযমে।

ভোগ স্বধ তুচ্ছ করি, নিত্য চিত্ত ভরি

অক্ষর অ মূল্য রত্ন করিছ সঞ্চয় !

সে নিধি যতনে তুলি দিলে উপহার

• জন্মভূমি পদে তুমি। তুমি বিখ্যময়

ঘোষিলে দেশের খ্যাতি, আলোকি করণে

অতীত বিশ্বত তার গৌরব অমল।

ক্ষুদ্র এই স্ততি-পুষ্প লবে কি চরণে?

এ নহে সুরভি-স্নাত প্রফুল্ল কমল;

রূপা করি উপহার লইলে, বহুব

অসীম আনন্দ প্রাণে; চরণে নমিব।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

মানব সমাজ । (৭)

সমাজের চতুর্দিক কক্ষ মধ্যে সেবার কথা এক্ষণে বলা আবশ্যক। কাহার সেবা? কিরূপ সেবা? সেবার অর্থ প্রয়োজন সিদ্ধির সহায়তা করা; যাহাকে সেবা করি, তাহার কোন না কোন প্রয়োজন সিদ্ধির সহায়তা করি। সুতরাং সামাজিক কক্ষের চতুর্থ বিভাগ সেবাও সমাজের সেবা, অর্থাৎ সমাজের প্রয়োজন সিদ্ধির সহায়তা করা। “অপর ত্রিবিধ কক্ষ বিভাগও তাহাই। কিন্তু আমার

মনে হয় যে, উহার যেরূপ উচ্চ জ্ঞান বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। সেবা তদ্রূপ নহে, সেবা অনেকাংশে ভক্তির উপর নির্ভর করে। যিনি অপর তিন কক্ষের, অধিকারী নহেন, তিনিও এই চতুর্থ কক্ষের অধিকারী। সেবা বড়ই মধুর ধর্ম, যিনি প্রকৃতপক্ষে সেবা করিতে জানেন, তিনি ধর্ম। সমাজের সেবার জ্ঞান উচ্চ ধর্ম বোধ হয় আর নাই। “মুদ্রকে নীচ বলিবে কে? মানব জন্মের সকলতা

সেবকের যেমন সহজ সাধা, অধ্যাপক, দেশ-
সেবক, অথবা ধনোপার্জক ইহাদিগের কাহা-
রই যেমন নহে। কিন্তু সেবা প্রকৃতপক্ষেই
সমাজের সেবা হওয়া চাই; তাহাতেই
মানবকে ভক্তিমার্গে উন্নত করতঃ মুক্তির
অধিকারী করে। সমস্ত নীতির মূলই সামা-
জিকতা; সমাজ-রক্ষাই নীতি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য,
সুতরাং যিনি সেবারত সুসম্পন্ন করিতে
পারিলেন, তাহার স্তায় সমাজের উপকারী
আর কে আছে?

এক হিসাবে দেখিতে গেলে, সকল
সেবাই সমাজ সেবা। যে স্বার্থপর নিজের
সেবা করিতেছে, সেও প্রকারান্তরে সমাজেরই
সেবা করে। তবে তাহার কর্ম মধ্যে কিয়দংশ
এরূপ হইতে পারে যে, তাহা সমাজের অনিষ্ট-
কর। সুতরাং স্বার্থ-সেবা সমাজের মঙ্গল-
জনক এবং অমঙ্গলজনক, উভয় প্রকারই হইতে
পারে। মঙ্গলজনক সেবাকেই প্রকৃত সেবা
বলিতেছি। তাহাতেই মানবকে ভক্তি পথে
অগ্রসর করে এবং ক্রমে সে মানব-জন্মের পূর্ণ
সফলতা লাভ করে। সফলতা কি? বন্ধ-
মুক্তি। সেবা প্রকৃতই মুক্তিবাতা; কিন্তু ফল-
নিরপেক্ষ সেবাই একাগ্র সেবকের প্রধান
চিহ্ন। ফল যাহা হয় হউক, সেবাই আমার
কর্ম; আমি সেবাই করিব—এই বুদ্ধিতে
যিনি সেবায় প্রবৃত্ত হন, তিনিই প্রকৃত
সেবক। নিষ্ফলতা তাহার কর্মকে রোধ
করিতে তো পারেই না, বরং কর্মের প্রব-
র্ত্তকও হইতে পারে। নিষ্ফলতা তাহার স্বপ্নে
জড়ত্ব জ্ঞানিতে পারে না; আশঙ্কা তাহাকে
দমিত করিতে সক্ষম হয় না। কারণ তিনি
কর্ম করিবেনই। কর্ম করাই সেবকের ধর্ম,
সেবাই তাহার উদ্দেশ্য, সুতরাং কিছুতেই
তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে না, একথা
সহজেই বুঝা যায়।

কিষ্ট এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, নিষ্ফল
কর্মীর পরিণামে একবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়া
সম্ভব। আমি বলি, কখনই না। এক সমাজ
অপর সমাজের সহিত সংশ্রব-যুক্ত হইয়া বাস
করা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে ধ্বংস-তাহার
পরিণাম নহে। সে সমাজ স্বাভাবিক নিয়-
মামুসারেই ধনে বংশে বাড়িয়া উঠে। তাহার
বিপক্ষতা করিবার কেহই নাই; কেবল এক-
মাত্র প্রকৃতি-বিরুদ্ধ হওয়া সম্ভব। কিন্তু
জীব মানব পদে উন্নত হওয়ার পর এবং
মানব নামের যোগ্য হওয়ার পর, প্রকৃতির
বিপক্ষতায় কখনও ধ্বংস হয়ও নাই, হইতে
পারেও না। সে এক দিকে যেমন প্রকৃতির
দাস, অন্য দিকে তেমনি প্রকৃতির প্রভু।*
প্রাকৃতিক নির্বাচন বিধি মানবের নিকট ব্যর্থ
হইয়াছে। যাহা হউক, প্রায় সকল মানব
সমাজই অপর সমাজের সহিত সংশ্রব যুক্ত।
সমাজে সমাজে সংঘর্ষ একরূপ অনিবার্য।
তাহা হইলেও কেবল সংঘর্ষের ফলে ধ্বংস কথ-
নই আসিতে পারে না। কোন সমাজ অপর
সমাজকে টিপিয়া মারিতে পারে না। পারে
কেবল পরবশতা, যদি তাহার ফলে জনন-
হীনতা আসিয়া উপস্থিত হয়। এ সকল কথা
পূর্বেও বলিয়াছি এবং আমার নব প্রকাশিত
“পরবশতা” নামক গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত আলো-
চনা করিয়াছি, তাহার পুনরুক্তি নিম্নয়োজন।

সমাজ সেবার যদি কোন সার্থকতা থাকে,
তবে তাহার অর্থই এই কুফল নিবারণ করা।
যে বনে সিংহ বাস করিতেছেন, তথায় মৃগকুল
নির্মূল হয় নাই, সে নদীতে কুস্তীর বাস
করিতেছে, তথায় সফরীকুল বিনষ্ট হয় নাই।
কেবল বল প্রয়োগ দ্বারা এক সমাজ অপর

* Man is nature's rebel ** her in-
surgent son. Kingdom of man.

সমাজকে নির্মূল করিতে কখনও পারে নাই। আহাের সভাব ও বংশ বিস্তৃতি, এতদ্ব্যতীত থাকিলেই জীব টিকিয়া গেল; সুতরাং সেবার প্রধান লক্ষ্যই এই দুইটি। সেবাব্রতে এই দুইটি লক্ষ্য থাকিবেই।

কিন্তু সমাজের যে চতুর্বিধ কর্মের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটিরই চরম উদ্দেশ্য মুক্তি। মুক্তিই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, সুতরাং ধর্মপথই মানবের একমাত্র অবলম্বনীয়। ধর্ম শব্দ আমি প্রচলিত বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করিতেছি। ধর্মহীন সমাজ টিকিতেই পারে না। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দেশরক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য এবং সেবা, এ সকলই ধর্ম সাধনের অঙ্গ। সেবাকেও ধর্ম সাধনের অঙ্গরূপেই গ্রহণ করা আবশ্যক। তাহাতে হৃদয়ের বল বৃদ্ধি হয়, কর্মে উৎসাহ হয়, অদম্য তেজে কর্ম সুসম্পন্ন হয়। সেবার প্রবর্তক ভক্তি, তাহা পূর্বেও বলিয়াছি। কিন্তু এহলেও জ্ঞান বিজ্ঞানের একেবারেই আবশ্যকতা নাই, এমত নহে। বিজ্ঞান বলে, সেবার পথ সহজ করিয়া লওয়া যায়। কষ্টসাধ্য সেবা অনায়াসে এবং কালব্যাপী সেবা অল্প কালেই সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং সমাজের চতুর্বিধ কর্মেই জ্ঞানের অদুশীলন আবশ্যক হইতেছে। সেবকেরও জ্ঞানদুশীলন কর্তব্য, নতুবা ধর্ম হানি হয়। তাই সমাজ রক্ষার বিষ উপস্থিত হয়।

সমাজের উৎপত্তি ও পৃষ্টি ব্যক্তির সহিত তুলনীয়। ব্যক্তির দেহ ও সমাজের দেহ আর একই নিয়মে পরিচালিত। ব্যক্তির বিভিন্ন দেহাংশ আপন আপন কর্ম সম্পন্ন করিতেছে, কিন্তু সমষ্টি জীবন ব্যাপারেরও অঙ্গরূপ হইতেছে। সমাজেরও তাঁতাই হওয়া আবশ্যক। সমাজের প্রত্যেক অংশ

আপন কর্ম সম্পন্ন করুক; কিন্তু সমষ্টিতে সমাজ স্থিতির অঙ্গরূপ হওয়া চাই। নচেৎ সমাজ রক্ষা হয় না। যে সকল জীব সমাজ বদ্ধ হয় নাই, তাহারা কেবল আপনান্ন প্রয়োজনের দিকেই লক্ষ্য রাখে। কিন্তু সমাজবদ্ধ জীবের তদ্রূপ করিলে চলেই না। পরস্পরের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তই সমাজ। মানব বোধ হয় কোন দিনই সমাজ শূন্য ছিলনা। সমাজ-বন্ধন যতই মৃদু হউক, মানব বোধ হয় কখনই অপরের প্রয়োজনের দিকে একবারে লক্ষ্যহীন ছিল না। উচ্চশ্রেণীর বানরগণের ব্যবহার হইতে একরূপ অনুমান করা বাইতে পারে। ক্রমে মানবের প্রয়োজন বহু বাড়িতে লাগিল, সমাজবন্ধনও তত দৃঢ় হইতে লাগিল। পরে অসাধারণ বংশ বৃদ্ধি হেতু এবং আহাের অসম্ভাব বশতঃ মানব ইতস্ততঃ বিকিপ্ত হইয়া পড়িল। তখন বিভিন্ন ভূভাগের বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া মানব বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়া গেল। কালক্রমে প্রত্যেক জাতি মধ্যেও বিভিন্ন সমাজ বন্ধন প্রবর্তিত হইল। জীবের একটা ক্ষুদ্র বংশরক্ষক কোষ যেমন অপর বংশরক্ষক কোষের সহিত মিলিত হইয়া শতধা সহস্রা বিভক্ত হয় এবং ক্রমে জীব দেহ গঠিত করেন, ঐ জীব দেহ যেমন নানা অংশে বিভক্ত হইয়া নানা কর্ম সম্পন্ন করে, সমাজও তাহাই। কিন্তু যত দিন দেহ জীবিত থাকে, তত দিন সেই সকল অংশ পরস্পরের সহায়তা করে। আর, দেহ যখন মরিয়া যায়, তখন সেই পূর্ণগঠিত দেহ পচিয়া যেমন নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়, সমাজও তাহাই। সমাজ দেহ পূর্ণ গঠিত হইলে যত দিন সজীব থাকে, তত দিন তাহারও প্রত্যেক অংশই সমাজ স্থিতির অঙ্গরূপ, কিন্তু

সমাজ জীবন শূন্য হইলে এরূপ ভাবে খণ্ড খণ্ড ও বিভক্ত হইয়া যায় যে, কোন অংশ অপর অংশের অঙ্গকূল হয় না। ভিন্ন ভিন্ন অংশের অঙ্গকূলতা রক্ষা হইলেই সমাজের জীবন রক্ষা হইল; নচেৎ সমাজ ধ্বংস মুখে পতিত হয়। এই অঙ্গকূলতা রক্ষা করাই প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। এ কর্তব্য এড়াইবার উপায় নাই। এই কর্তব্য সাধনের মূল মন্ত্রই, ত্যাগ। ত্যাগেই সমাজের প্রতিষ্ঠা, ত্যাগেই তাহার পুষ্টি, ত্যাগেই তাহার রক্ষা। যে জীব সমাজবদ্ধ নহে, সে আপনার ইচ্ছামত সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারে। কিন্তু সমাজবদ্ধ জীব পরার্থ সাধনের নিমিত্ত সেই স্বাধীনতা অল্লাধিক পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইহারই নাম ত্যাগ, ইহারই নাম সংযম। ইহাই সকল ধর্মের মূল, ইহাই সমাজ সেবার আদি, মধ্য ও শেষ।

সমাজের উন্নতি ও পুষ্টি সম্বন্ধে দুইটি মত আছে। এক মতে মানব পূর্ণ সভ্যাবস্থায় নৃষ্ট হইয়াছে; অল্পমতে মানবের প্রথমাবস্থা অসভ্যাবস্থা। প্রথম মতকে অবনতিবাদ এবং দ্বিতীয় মতকে উন্নতিবাদ বলা যাইতে পারে। মানব-তত্ত্ব শাস্ত্রের বর্তমান অবস্থার অবনতিবাদ স্বীকার করা যায় না। মানব অনুরক্ত অবস্থা হইতে কালসহকারে উন্নত হইয়াছে, এই সিদ্ধান্তই এক্ষণে প্রকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। বিবর্তনবাদ উন্নতিবাদেরই নামান্তর। নিম্ন প্রাণী হইতে বিবর্তিত হইয়া মানবের আবির্ভাব। উহা এক স্থানে অথবা একাধিক স্থানে হইয়া থাকুক, মানব প্রথমতঃ পশু ভাবাপন্নই ছিল। অপর পশুর মত দেখে তাহার দেহ পোষণ হইত। কখনও বা যুগ্মালঙ্ক জীব-দেহ অপেক্ষ কবচহাতেই আহা

করিত। এই সময়কে যুগ্ম-যুগ্ম বলা যাইতে পারে। যুগ্মার নিমিত্ত একাধিক ব্যক্তি মিলিত হইয়া ঐ বর্কর অরহাতেও একটা মোটামুটি সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছিল। যুগ্মকালে যিনি সর্বাধিক বীর্য দেখাইতে পারিতেন, তিনি ঐ সমাজের অধিপতি হইতেন; অন্তেরা তাঁহার অঙ্গুগত থাকিত। সে সময়ে ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন সমাজ মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত না হইত, এমত নহে। এই সংঘর্ষের ফলে অনেক সময় উত্তর সমাজ একীভূত হইয়া যাইত। তাহাতেও বীর্য ও কোশল অল্পসারে অধিপত্য স্থাপিত হইত। অধিপতি দৈহিক ও মানসিক শক্তির প্রাধান্য বশতঃ স্বীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। কিন্তু মানসিক শক্তি অপেক্ষা দৈহিক শক্তিরই অধিক প্রয়োজনীয়তা ছিল। সুতরাং ঐ সমাজে তাহারই আদর অধিক হইত। অত্যা-পিও বীরের আদর সর্বাধিক অধিক। সমাজ অতীব জ্ঞানোন্নত না হইলে মানসিক শক্তির আদর হয় না। এই যুগে যুগ্মাই দেহ ধারণের উপায় ছিল। কিন্তু এই উপায় অতি অনিশ্চিত। সুতরাং কালক্রমে ভূমিকর্ষণ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করার প্রথা আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইল। এই সময়কে কৃষি-যুগ বলা যাইতে পারে। এই সময়ে মানব সভ্যতার অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছিল। এবং বিভিন্ন সমাজে-বংশ বৃদ্ধি হওয়াতে মানব সমাজ বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া আপনাপন সুবিধা মত সমাজ পরিচালিত করিয়াছে। এই সময়ে সমাজে অল্লাধিক শক্তি স্থাপিত হইয়াছে, এবং সভ্যতার উন্নতি সহকারে ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। জ্ঞান-চর্চাও এই সময়েই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি মধ্যে ও সমাজ মধ্যে অভাব

সুস্বার্থ যে . বিনিময়-প্রথা প্রচলিত হয়, তাহাতে আর সামাজিক প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় না। সুতরাং মুদ্রা প্রচলিত হয়। কৃষিজাত দ্রব্যাদি আবশ্যকের অতিরিক্ত পরিমাণ-উৎপন্ন হওয়ার ক্রমে অল্পবাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়কে বাণিজ্য-যুগ বলা বাইতে পারে। উপরে বেরূপ জীবিত যুগ-বিভাগ করা হইল, তাহা ক্রমোন্নতিবাদের পরিচয়-সূচক। তাহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, পূর্বোক্ত যুগের অবসান হইবার পর শেথোক্ত যুগ প্রবর্তিত হয়, কারণ পর যুগেও পূর্ব যুগের লক্ষণ বিद्यমান থাকে। বর্তমান সময়কে বাণিজ্য-

যুগ বলা বাইতে পারে; কিন্তু এক্ষণেও কৃষি এবং যুগের পূর্ণ ভাবেই চলিতেছে। বাণিজ্য যুগের ইতিহাস এক দিকে যেমন সভ্যতার পরিচায়ক, অপরদিকে তেমনি বর্বরতার পরিচায়ক। এ যুগে বিভিন্ন সমাজের সংঘর্ষ প্রধানতঃ বাণিজ্য উপলক্ষেই হইয়া থাকে। অতিরিক্ত বাণিজ্যালিপ্সা সংঘর্ষ-জনিত লোক-ক্ষয় করিতেছে; আবার বাণিজ্যে অতিমাত্রায় লিপ্ত হইলে যে সামাজিক চকলতা উপস্থিত হয়, তাহাতে জননহীনতা উৎপন্ন করে। এই হেতু সমাজ ধ্বংস মুখে পতিত হয়। অতিরিক্ত বাণিজ্যে ধর্মহীনতা আনয়ন করে, সুতরাং সমাজ টকিতে পারে না।

শ্রীশশধর রায় ।

ব্রাহ্মসমাজ ও তাহার কার্য ।

ভূমিকা ।

যে ভগবান খ্রীষ্ট মঙ্গল করণাবর্ষণে মুক-
কেও বাচাল করিয়া তুলেন, সেই ভগবানই
আমাকে ব্রাহ্মসমাজের কার্য লিপিবদ্ধ করি-
বার জন্ত প্রেরণ করিয়াছেন, তাই এবিষয়ে
হস্তক্ষেপ করিয়াছি, নতুবা এবিষয়ে আমার
অক্ষমতার গভীরতা আমি যতদূর জানি, তত
আমি কে জানিবে? আজ প্রায় পনেরো
বৎসরের উর্দ্ধকাল হইবে, আমি যখন আদি
ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক পদে অধিরূঢ় ছিলাম,
সেই সময়ে এই ইতিহাস লিখিবার সংকল্প
হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছিল। সেই সময়ে যে
কয়েকখানি গ্রন্থ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস নামের
গর্ভিত্ত অধিকার বিন্দুমাত্র দাবী করিতে
পারিত, সেইগুলির প্রত্যেকটাই বলিতে
পেলে ইতিহাসের ইতিহাস-নাশক বোর

পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট। সহসা নিরপেক্ষভাবে
ব্রাহ্মসমাজের কাব্যবিবরণ লিখিবার জন্ত
ভগবানের আদেশ প্রাপ্ত হইলাম।

ব্রাহ্মসমাজ এখনও শতাব্দী পার হই-
নাই, ইহার মধ্যে আবার তাহার ইতিহাস
কি? অত্যাশ্চর্য প্রচলিত ধর্মসমাজ-সমূহের
সহিত বয়স তুলনা করিলে ব্রাহ্মসমাজ নিতান্ত
শিশু বলিলেও অতুক্তি হইবে না; কিন্তু ব্রাহ্ম
সমাজের কার্যের পরিমাপ করিলে তাহা
অত্যাশ্চর্য যে কোন ধর্মসমাজের সহিত সমান
দাঁড়াইতে পারিবে, তাহা সন্দেহ নাই।
বঙ্গের এবং সুতরাং সমগ্র ভারতের বর্তমান
জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রত্যেক অংশের মূলে
যে ব্রাহ্মসমাজ, তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই
জানেন, বোধ হয়। এই কারণে ব্রাহ্মসমাজ
তাহার কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করাইবার অধি-
কার প্রার্থনা করিতে পারে।

আদেশ লাগিল কালেই আমি এই হুঁ-বুহু কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম এবং অচিরে ইতিহাসের একটি কদল রচনা করিয়া পিতামহ দেবকে শুনাইয়াছিলাম। তিনিও তাহা অমুমোদন করিলে তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকাতে তাহা সবেমাত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, ইতিমধ্যে ভগবানের হস্ত নানা ঘটনা উপলক্ষে তৎপ্রকাশ থকা করিয়া দিলেন। সেই সময়ে তাঁহার মঙ্গলহস্তের স্পর্শ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কিছু হুঃখিত হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে, তাহা প্রকাশ হইলে পক্ষপাত-দোষ অতিক্রম করিতে পারিত না। তাহার পর এই ইতিহাস নিরপেক্ষভাবে লিখনবিস্ময়ে সময়ে সময়ে ভগবান আমাকে যেভাবে পরিচালিত করিয়াছেন, আমি সেই ভাবেই তাঁহারই প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সাধারণ নিরপেক্ষভাবে এই ইতিহাস সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

আমার এই প্রবন্ধে নিঃসঙ্কোচে আমার হৃদয়ের কথা বলিয়া গিয়াছি, তজ্জন্ম যাহা কিছু ত্রুটি বলিয়া বিবেচিত হইবে, আশা করি, পাঠকবর্গ সেগুলি ক্ষমা করিবেন। ব্রাহ্ম সমাজের নেতাদিগের মধ্যে অনেককেই আমার আত্মীয় বা বন্ধু। তাঁহাদিগের কার্য্য সত্বকে যদি প্রশংসা বা নিন্দা করিয়া কোন কথা বলি, আশা করি, তাঁহারা তাহা ব্যক্তিগত ভাবে গ্রহণ করিবেন না। আমি নিজেকে জনসাধারণের একজন এবং তাঁহাদিগকে আত্মীয়তা ও বন্ধুতার বহিঃস্থিত সাধারণের মানুষ ধরিয়া তাঁহাদের কার্য্যের আলোচনা করিয়াছি। এবিষয়ে আমার মন্তব্য :—

“ওঁ ঋতং বদিস্যামি সত্যং বদিস্যামি তন্মামবতু
বক্তারং বক্তারমবত্যাভুমাং।”

অবশেষে সঙ্কল্প, পাঠকবর্গের নিকট

বিনীত প্রার্থনা যে, যদি আমার প্রবন্ধসমূহে কোন ভুলত্রুটি দৃষ্ট হয়, তাহা তাঁহারা যেন অবিলম্বে পৃথক পত্রের দ্বারা লেখবা এই পত্রিকা-সাহায্যে সেই ভ্রম প্রদর্শন করেন। তাহাতে যে তাঁহাদের নিকটে বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব, তাহা বলা বাহুল্য।

প্রবন্ধগুলির কয়েকটি মাত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু পাঠকবর্গের নিকট গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ আকারে ধারণ করিবার জন্য আমরা সেগুলিও পুনরায় প্রকাশ করিতে দ্বিধা করিব না।

মুখবন্ধ ।

প্রথম অধ্যায়—রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতা ।
রক্ষণশীলতা—উন্নতিশীলতা—সামঞ্জস্য ।

রক্ষণশীলতা ।

সাধারণ মনবর্ষের স্বভাবই এই যে পুরাতন কোন কিছুর কিছুমাত্র পরিবর্তন দেখিলেই তাহারা অস্থিরতা প্রকাশ করে। পরিবর্তনটা ভাল কি মন্দ, তাহা বিবেচনা করিবার প্রয়োজনই অনুভব করে না। পরিবর্তন মাত্রকেই প্রথম হইতেই মন্দ বলিয়া সাধারণ লোকে ধারণা করে। এমন কি, মন্দ অভ্যাসও কালক্রমে চিরপরিচিত বন্ধুর জায় হইয়া উঠে—তখন যাহারা তাহার কুফল ভোগ করে, তাহারাও তদ্বিকল্পে পরিবর্তন সংঘটনের দোর বিরোধী হইয়া উঠে। এই রক্ষণশীলতা অবশ্য ভগবানের সৃষ্টির রক্ষার এক অপূর্ব কোশল। ইহার অভাবে সৃষ্টি ধ্বংস হইয়া যাইত। মনুষ্য-সমাজে এই নিয়ম কার্য্য করিতে বিরত থাকিলে মানবের সমাজরক্ষণ এবং তৎসঙ্গে সামাজিক উন্নতি প্রভৃতি কিছুই সম্ভাবনা থাকিত না, প্রত্যুত মানবজুলের অভাবই দেখিতে পাইতাম কিম্বা সন্দেহ।

রক্ষণশীলতা একমিকে ভেঁড়েরও স্বাভাবিক ধর্ম, অপরদিকে ইহা জীবদ্ভিগেরও জীবনরক্ষার এক প্রধান সহায়ক। ইহারই ফলে যখন কেহ আমাদের সঙ্গে আসিতে আসিতে আসে, জ্ঞান-প্রদায়ক, তখন আমাদের নিকট হইতে ঠিক তত জ্ঞানের প্রতিদান পাইরা থাকে। এই রক্ষণ-শীলতার গুণেই আমাদের জীবনের প্রতি এত মায়ামমতা ও মৃত্যুর প্রতি এত গুরুতর ভয়।

এই রক্ষণশীলতা ও প্রত্যেক জীবজন্তুর কর্মবেষ্টনের মধ্যে একটা সীমা আছে। মনুষ্যও এই নিয়মের ব্যতিরেক-স্থান নহে। রক্ষণশীলতার সেই সীমা অতিক্রম করিলেই মনুষ্য নিজীব জড়পদার্থে পরিণত হয় বলিলেও চলে। এই প্রকার নিজীব মানব নিজের মনুষ্যত্বের কেন্দ্রভূমি হারাইয়া পরি-ধিক্ষেপে হাতড়াইতে থাকে। সে নিজের মঙ্গলামঙ্গল স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারে না, নিজের উন্নতি কিসে হয়, জানে না, কেবল অপর পাঁচ জনের মুখাপেক্ষা করিয়া স্তব্ধে দেহযাত্রা নিম্পন্ন করিতে পারিলেই কৃতার্থ হয়। এই সকল মানবের মূলমন্ত্র “আপনারা পাঁচজনে যাহা করেন।” এই সকল অতি-রক্ষণশীল ব্যক্তি মানব নামের অমূল্যবস্তুর সামাজিক জীবমাত্র। ঘোড়ার উপর দেখা যায় যে, বাহারা যত রক্ষণশীল, তাহারা ততটা অপর পাঁচজনের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়, ততটা সামাজিকতার বশীভূত হইয়া পড়ে। তাহার কারণ এই যে, নিজেকে কোন বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতে হইবে, ইহা ভাবিলেই তাহারা স্তম্ভমান হইয়া পড়ে। এই কারণে সামাজিকতা বা অপর পাঁচজনের অনুমতি বা উপদেষ্টা আচারব্যবহার রক্ষা করিবার অপর নামই রক্ষণশীলতা।

এই প্রকার সামাজিকতার যে বেষ্টন নোর্বল্য প্রকাশ পায়, তাহা বলা বাহুল্য।

অতিরিক্ত সামাজিকতার ফলের দ্বাৰা-মান দৃষ্টান্ত আমাদের এই ভারতবর্ষ। সে স্বাধীনতার বলে প্রাচীন ভারত উন্নতির পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই স্বাধীনতা হারাইয়া শত শত বৎসর পরাধীনতার পেষণ-বস্ত্রের নিম্নে পড়িয়া ভারত-বাসী একরূপ নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে যে, এখন তাহাদিগকে জড় সামাজিক জীব বলিলেও অত্যাধিক হইবে না। ভারতে ইংরাজ অত্যা-দয়ের পূর্বে ভারতবাসীগণ, বিশেষত বঙ্গ-বাসীগণ, এই জড়ত্বের চরম সীমায় উঠিয়া-ছিল—তখন তাহারা নিজের মঙ্গলামঙ্গল, অগতের হিতাহিত চিন্তা করিয়া কার্য্য করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। কথায় কথায় পিতৃ পিতা-মহ ও অপর পাঁচজনের দোহাই দিয়া গড-লিকা প্রবাহের জ্বার চিরপ্রচলিত আচার ব্যব-হার, কার্য্যকলাপ, ভাল হউক মন্দ হউক, অনুষ্ঠান করিয়া নিজেকে সুখী বোধ করিত। জৈবের নিয়মে মানব রাজ্য যেমন স্বৈরাচার চিরাধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না, সেইরূপ চিরজড়ত্বও স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। মঙ্গলময় পরমেশ্বর মনুষ্যকে কেবল জড় পদার্থ করিয়াই গড়েন নাই যে, সে কেবল রক্ষণ-শীল ও সামাজিক জীবমাত্র হইয়া স্থির থাকিবে। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে আজ মানব জাতি সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইত না—বল পু-ত্রিণীর জলের জ্বার সেই রক্ষণশীলতা ক্রমশঃ অস্বাভাবিক হইয়া মানবকুলের ধ্বংস সাধন করিত। যখন ভারতবাসীগণ জড়ত্বের চরম সীমায় উঠিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তে ভারতের পূর্ব গগনে জড়ত্ব নাশের দৃশ্যটি বাকিয়া

উঠিল—শুভকণে ইংরাজজাতি ভারতে, প্রাক-
পদে অভিযুক্ত হইলেন—স্বাধীনতার, আত্ম-
নির্ভরের, অস্বহিত স্রোত, কোথা হইতে
আসিয়া পুনঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল।
কোথা হইতে এক দরিদ্র বঙ্গবাসী রাজা রাম-
মোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া
সেই নূতন প্রবাহিত স্বাধীনতার অমরকতু-
রূপে ভারতবাসীর হস্তে সমর্পণ করিয়া
গেলেন ।

উন্নতিশীলতা ।

রক্ষণশীলতার বিপরীত হইল উন্নতি-
শীলতা । উন্নতিশীল ব্যক্তি অপর পাঁচজনকে
কথার উপর নির্ভর না করিয়া আপনার উপর
নির্ভর করত নিত্য নূতন বিষয়ের প্রতি ধাব-
মান হয় । প্রাচীনের প্রতি ভক্তি অপেক্ষা
নবীনের আস্থা ইহা তাহাকে অধিকার
করিয়া থাকে । সে নিজের বাহ্য ভাল মনে
করে, তাহাই সম্পন্ন করিবার চেষ্টা পায় ।
আত্মনির্ভরশীল বলিয়া সে সামাজিকতার
অপেক্ষা রাখে না । উন্নতিশীলতার সর্ব
প্রধান অঙ্গই হইল আত্মনির্ভর । কিন্তু
রক্ষণশীলতার জ্ঞান উন্নতিশীলতারও একটা
সীমা আছে । সেই সীমার বাহিরেই স্বেচ্ছা-
চার । অতিরিক্ত সামাজিকতা বা রক্ষণ-
শীলতায় যেমন দৌরল্য প্রকাশ পায়, সেই-
রূপ অতিরিক্ত উন্নতিশীলতার স্বেচ্ছাচার
আসিয়া পড়ে । সীমার ভিতরে আত্মনির্ভরের
জাব ছদ্মে এক অভূতপূর্ব বল প্রদান করিয়া
থাকে, এই বল প্রভাবেই উপনিষৎকার ঋষিরা
ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়া-
ছিলেন ।

অতিরিক্ত উন্নতিশীলতার ফলের আভ্যাস-
মান হুঁস্কৃত করা সিবিগ্নবের সময় ফ্রান্সের
অবস্থা । সেই এক কাল, যখন ফ্রান্সের

অধিবাসীরা সকলেই সম্মাজিকতার দ্বারা
সম্পূর্ণ তিরোহিত করিয়া একেবারেই উন্নতির
চরম শিখরে অধিরোহণ কুরিবার অভিলাষ
করিয়াছিলেন । কলে দাঁড়াইল, অক্রতপূর্ব
স্বেচ্ছাচার । ভগবানের রাজ্যে সেরূপ ভীষণ
স্বেচ্ছাচার চিরস্থায়ী হইতে পারে না । ইহার
প্রতিবিধানের স্বত্র ধরিয়া রক্ষণশীলতা
আসিয়া সামঞ্জস্যের পথ দেখাইয়াছিল । স্বেচ্ছা-
চারী ফ্রান্স বলিয়াছিল, “ধর্ম চাহি না,”
কিন্তু সেই ধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তবে
ফ্রান্স স্বেচ্ছাচারের হস্ত হইতে বহল পরিমাণে
নিষ্কৃতি লাভ করিল ।

সামঞ্জস্য ।

রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার সামঞ্জস্য-
পথই প্রকৃত উন্নতির পথ, প্রকৃত মঙ্গলের
পথ । উপযুক্ত কাল ও ক্ষেত্র বুঝিয়া যিনি
এই সামঞ্জস্য দেখাইতে পারেন, তিনিই জগ-
তের প্রকৃত উপকারক । ঐহারা রক্ষণ-
শীলতার মোহে পড়িয়া আত্মার স্বাধীনতা
বিসর্জন দিয়া বিলাস মোহে আকর্ষিত
থাকেন, অথবা ঐহারা উন্নতিশীলতার
দোহাই দিয়া স্বেচ্ছাচারকে বন্ধ বোধে আলি-
ঙ্গন করেন, তাঁহাদের কেহই এই সামঞ্জস্য
পথের আবিষ্কারে সমর্থ হইবেন না । যে সকল
মহাপুরুষ রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতা, উভয়-
কেই আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, উভ-
য়েরই মর্যাদা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া-
ছেন, তাঁহারা এই সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিতে
সক্ষম এবং ইহাতেই তাঁহাদের মহাপুরুষত্ব ।
তাঁহারা নিজের স্বর্গকে গগনার মধ্যে স্থান
না, জুতরাও তাঁহাদিগকে পরের মুখাপেক্ষা
করিয়া থাকিতে হয় না, প্রতি কথার সামাজি-
কতার নিকট অবনত-মুগ্ধ হইয়া চলিতে
হয় না । তাঁহারা পুরাতন প্রথা প্রভৃতির

যথো ভাষ্যটুকু রক্ষা করিয়া নূতন বাহা কিছু ভাল, বাহাও বিচার পূর্বক অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। তাঁহার। যেমন একদিকে রক্ষণশীল, অপরদিকে সেইরূপ আত্মনির্ভরশীল ও স্বাধীনতার মূর্তিমান অবতারণ।

মহাপুরুষগণ মঙ্গলের পথ দেখাইয়া দিলে ক্রমে জনসাধারণ তাহা ধীরে ধীরে গ্রহণ করিতে থাকে। সাধারণত এক একটা মহা পুরুষের এক একটা মূলভাব থাকে ; সেই মূল ভাব বহন অপর কোন ব্যক্তির হৃদয়ে প্রতি-
 খনিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি সেই মহাপুরু-
 ষের পথাবলম্বী হয়। এইরূপে যখন অনেক
 গুলি ব্যক্তি কোন মহাপুরুষের মতামুসারী
 হয়, তখন সেই মহাপুরুষের পরিধিস্বরূপে
 একটা সমাজ গঠিত হইল বলা হইয়া থাকে।
 সূর্য্য হইতে পৃথিবী প্রভৃতি সকল উৎপন্ন
 হইয়াছে বলিয়া তাহার। যেমন ন্যূনাধিক
 পরিমাণে সূর্য্যের সচিৎ সমধুর্ম্মী, সেইরূপ
 যখন মহাপুরুষের ভাবকেন্দ্র হইতে ভাবকণা
 বাইয়া তাঁহার সমাজস্থ ব্যক্তিগণের ভাব সকল
 গঠিত করিয়া দেয়, জীবনকে নূতন হাঁচে
 ঢালিয়া নবতর শক্তি প্রদান করে, তখন বলা
 বাহুল্য যে, প্রত্যেক সমাজ তাহার কেন্দ্রস্থল
 মহাপুরুষের সহিত ন্যূনাধিক পরিমাণে সম-
 ধর্ম্মী হইবে।

৪ রাজা রামমোহন রায় একজন মহাপুরুষ,
 কারণ তিনি রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার
 মধ্যে সামঞ্জস্যের পথ আবিষ্কার করিয়া জন-
 সাধারণের অন্তঃতাহা উপযুক্ত করিতে পারিয়া-
 ছেন। এই সামঞ্জস্যই হইল তাঁহার প্রতি-
 ঠিত ব্রাহ্মসমাজের মূলপ্রাণ। বলা বাহুল্য
 যে, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ তাঁহারই ভাবে
 অনুপ্রাণিত হইয়া ন্যূনাধিক পরিমাণে তাঁহারই
 মতামুসরণ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। রাজা
 রামমোহন রায় হইতেই ব্রাহ্মসমাজের উৎ-
 পত্তি, সুতরাং সাধারণত ব্রাহ্মসমাজ মাঝেই
 তাঁহার ভাবচ্ছায়া প্রভাব বিস্তার করিবেই।
 কেবল রামমোহন রায় কেন, যে সকল মহা-
 পুরুষের অভ্যুদয়ে ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি ও
 স্থিতি, তাঁহাদের সকলেরই ভাবচ্ছায়া ব্রাহ্ম-
 সমাজকে গঠিত করিয়াছে এবং করিবে।
 ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত লিখিতে গেলে এই
 সকল মহাপুরুষগণের ভাবকেন্দ্রে বাইয়া
 দেখিতে হইবে যে, তাঁহাদের জীবন কি ভাবে
 গঠিত ; তবে তাঁহাদের পরিধিস্বরূপ ব্রাহ্ম-
 সমাজের প্রাণ এবং তাহার উন্নতি ও অব-
 নতির কারণ বুঝিতে পারিবার সম্ভাবনা
 থাকে। ইতি—প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। •

ত্রিভুক্তীস্বনাথ ঠাকুর।

হিন্দুধর্ম্মের সমন্বয় ভাব ।

হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা, অসংখ্য
 ধর্ম্মসম্প্রদায়। সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম বিরোধের
 ভাবছাড়া আর কি থাকিতে পারে ? ইহাই
 হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকের বন্ধমূল ধারণা। এই
 ধারণাটা দূর করিতেই যে আমরা বর্ত্তমান
 প্রবন্ধটার অবতারণা করিতেছি, তাহা ইহার
 • নামকরণের দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে।

আমরা যে হিন্দুর তেত্রিশকোটি দেবতার
 উল্লেখ করিতেছি—অনেকে বেদেই তাহার
 মূল দেখিতে পান—সুতরাং বেদ হইতেই যে
 ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভিন্ন মতের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা
 পরিকারই বুঝা যাইতেছে। বেদের পর স্মৃতি-
 তেও সেই ভিন্ন মতেরই প্রতিধ্বনি—উৎপন্ন
 ঋষিদিগের মুখেও তাহারই অনুবাদ। এই

সমস্ত প্রকাশ করিবারই অস্ত্র নিম্নোক্ত ১৫
প্রসিদ্ধ বাক্যটির প্রচার হইয়াছে—

“বেদা ভিভিন্না স্বভরো ভিভিন্না নাসৌমুনির্বক্ত
মতঃ ন ভিন্নম্ ।”

সুতরাং ঋষিগণ যে পুরাকাবেই বিরো-
ধের ভাবটী হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাহা
আমরা বুঝিতে পারিতেছি। ইহা হৃদয়ঙ্গম
করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহাতে একটি সাম-
ঞ্জস্যের ভাব আনয়ন করিবার অস্ত্র ইহাদিগকে
প্রথম হইতেই বিশেষ চেষ্টাবিত দেখিতে
পাই। এই চেষ্টা কোন পথ অনুসরণ করিয়া-
ছিল, এখানে আমরা তাহা প্রদর্শন করিবারই
প্রয়াস পাইব।

বেদে অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বহু দেব-
তাই পূজিত হইয়াছেন, ইহাদের মধ্যে
কাহাকে প্রাধান্য দিতে হইবে, এই সন্দেহ
স্বতঃই আমাদের মনকে আন্দোলিত করিতে
পারে। মহর্ষিগণ তাহা পূর্বেই বুঝিতে পারিয়া
তাহার নিরাকরণ করিয়া গিয়াছেন। যে
বেদে পূর্কোক্ত দেবতা সকল ভিন্ন ভিন্ন ঋষি
দ্বারা স্বত্ব ইষ্টদেবরূপে পূজিত হইয়াছেন,
‘মৌ বেদেরই মহর্ষি পূর্কোক্ত বৈষম্যের মধ্যে
সাম্য বিধান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রচার
করিয়াছেন :—

“একং সৎবিপ্রা বহুধা বদন্তি ইন্দ্রং যমঃ
মাতরিশ্বানমাহঃ ।” ঋগ্বেদ । বস্তুতঃ বেদের
প্রকৃত মন্ত্রাধিবাদন করিলে বেদে বহুবাদ
নির্দেশিত হইয়াছে বলিয়া কখনও ধারণা
হইবে না, বরঞ্চ একত্ববাদ নিবদ্ধ হইয়াছে
বলিয়াই নিশ্চিত ধারণা জন্মিবে। পণ্ডিত-
প্রবর আচার্য্য মোক্ষমূলর বেদের এই মূল
ভাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়াই ইহাকে Heno-
theism অর্থাৎ বহুত্বসংস্কৃষ্ট একত্ববাদ, এই
নামে বিশেষিত করিয়াছেন। তিনি ইহার

যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহার সংক্ষেপার্থ এই যে,
কেহ বহু দেব স্তত্ব হইলেও, যখন যে দেবতা
স্তত্ব হইয়াছেন, তিনি পরম দেবতা স্বরূপে স্তত্ব
হইয়াছেন—পরম দেবতার সমস্ত মাহাত্ম্যই
ঐহাতে আরোপিত হইয়াছে। সুতরাং
নামতঃ ভিন্ন হইলেও মূলতঃ ঐহাদের কোন
ভেদই নাই। গ্রীসের বহু দেববাদে এই
সাম্যভাব না থাকায় তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে—
বেদের বহুদেববাদ এই সাম্য ভাবের দ্বারা
এখনও জীবিত রহিয়াছে।

বেদের পর উপনিষদে এই একত্ববাদ
আরও পরিষ্কৃত। বেদে যে একত্ববাদ স্থল
বিশেষে মাত্র ব্যক্ত, উপনিষদে তাহা সর্বত্রই
পরিব্যক্ত। বেদে যে একত্ববাদ বিক্ষিপ্ত,
উপনিষদে তাহাই একত্রভূত। বেদে যে একত্ব-
বাদের মাত্র প্রসঙ্গ—উপনিষদে তাহাই প্রধান
প্রতিপাদ্য। বেদের সত্যকে বিশদ করিয়া
উপনিষদ পুনঃ পুনঃ জগৎ সমক্ষে অমূল্য
অপূর্ব্ব এই সার সিদ্ধান্তের ঘোষণা করিয়া-
ছেন “একমেবাদ্বিতীয়ম্” বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটী
মাত্র তত্ত্ব ব্যতীত আর তত্ত্বান্তর নাই। এই
তত্ত্বটী কি, তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ
করিবার অস্ত্র ঋষিরা দৃঢ়তাসহকারে জ্ঞাপন
করিয়াছেন—“সর্বং ঋষিদং ব্রহ্ম”—এই সম-
স্তই ব্রহ্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই। বেদান্ত-
দর্শনে উচ্চবিচার প্রণালীতে উপনিষদেরই
সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা
মুক্তিই হিন্দুর দর্শন সকলের প্রধান লক্ষ্য।
বেদের মতবাদই যে দর্শন সকলের অবলম্বন
—বেদের প্রামাণ্য স্বীকার দ্বারা— তাহা
স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। বেদের অবিরোধিতাবে
দর্শন সকল মুক্তি প্রয়োগ করিয়াছে বলিয়াই
সমস্ত ‘হিন্দুধর্মে’ দর্শন, সকলের প্রভাব একগুণ
বিস্তৃত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম-শাস্ত্রের সহিত এই

জ্ঞান দর্শন মত সকল সম্পূর্ণরূপে অস্থায়ী হইয়াছে। দার্শনিক সামন্ত্য আমাদের উপাসনার ঐক্যভাবের অক্ষুণ্ণ বলিয়াই অনেক সময় দার্শনিক সংজ্ঞার সহিত আমাদের ইষ্ট-দেবতার অভেদ দেখিতে পাই—যথা বেদান্তের ‘ব্রহ্ম,’ ‘মায়ী’ আমাদের ধর্মশাস্ত্রের ‘পরব্রহ্ম,’ ‘মহামায়ী’—সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ—আমাদের পার্শ্বতী, পরমেশ্বর, শিব ও শক্তি এবং জ্ঞানের পরমাত্মা আমাদের ‘পরমেশ্বরের’ সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন।

পুরাণে ‘ব্রহ্ম,’ ‘বিষ্ণু’ ‘মহেশ্বরই’ সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাদের মধ্যে যেন আমরা সমস্ত দেবভাবেরই বিশ্লেষণ প্রাপ্ত হই। তাহাতেই ইহার ‘ত্রিমূর্তি’ বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন। তিনের নামের দ্বারা যেন ইহাদের অভেদভাবই প্রত্যাখ্যাত হইতেছে—ইহার তিনই এক এবং একই তিন। স্বস্ত্যঃ পুরাণে এই অভেদবাদ প্রতিপাদিত করিবার বহুল প্রয়াসই দৃষ্ট হয়। পুরোক্ত তিন দেবতার উপাসকদিগকে পুরাণে আমরা তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত দেখিতে পাই এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলে ইহাদের মধ্যে ঘোরতর বিরোধের ভাবও বর্তমান দেখিতে পাই। “লিঙ্গ” ও “শিবপুরাণ” পাঠ করিলে বুদ্ধিতে পারা যায় যে “ব্রহ্মবাদী” ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এক সময়ে প্রাচীণ লইয়া বিষম শত্রুভাব উপস্থিত হয় এবং বিরোধ মীমাংসার জ্ঞাত্তা হাদিগকে মুছে প্রবৃত্ত হইতে হয়, কিন্তু এই সময়ে শৈবধর্মের প্রাচীণ হওয়ায় তন্মধ্যবর্তিতায় বুদ্ধের নিবৃত্তি হয়। এখানে আমরা শিবপুরাণ হইতে একটু বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—
এবমেষ বিবাদোহভূৎ ক্রবিক্ষোঃ পরস্পরমু।
অভবচ্চ মহাযুদ্ধং তৈরবং রোমহর্ষণম্ ॥৩১
মুষ্টিভিন্নগতৌত্তীত্রং রজসা বদ্ধবৈরয়োঃ।

তয়োর্দর্শাপহারায় প্রবোধায় চ দেবয়োঃ ॥ ৩২
মধো সনাবিরতবল্লিঙ্গ মৈশ্বরং তু ভূম্।
আলামালা সহস্রাভায় পমেয় মনোপমম ॥ ৩৩
শিবপুণ্য বায়বীয় সংহিতা উত্তরভাগ ২৭শ অধ্যায়।

বৈদিক ধর্মের প্রকৃত মর্ম বিদ্যুত হইয়াই ব্রহ্মবাদী ও বৈষ্ণবগণ সাম্প্রদায়িক বিরোধে মত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে শৈবধর্ম আসিয়া বৈদিকধর্মের প্রকৃত মর্ম ব্যাখ্যা করিয়া দিলে উভয় সম্প্রদায়ই আপনাদের জন বন্ধিতে পারিয়া, ধর্মের উদারভাব উপলব্ধি করতঃ বিবাদ হইতে নিরস্ত হইলেন। শিবপুরাণের নিম্নোক্ত বর্ণনা হইতে ইহা আরও স্পষ্টীকৃত হইবে :—

“তয়োস্তত্র প্রবোধায় তমোহপনয়নাচ।
লিঙ্গেশপিমুদ্রিতং সর্বং যথাবৈদে কদাচিতম ॥৩৬
তদ্ধৃষ্টা মুদ্রিতং প্রসাদাদ্ভিনিন্দদা।

প্রশান্ততমনো দেবো প্রবুদ্ধৌ সস্বভূতঃ ॥ ৩৭
শিবপুণ্য বায়বীয় সংহিতা উত্তর ভাগ, ২৭ অঃ।

কাগে বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিষম বিরোধ দৃশ্যমান হয়। বিরোধ-মূলে পূর্ববর্তী উভয়পক্ষ সংগ্রামের দ্বারা পরস্পরনিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। এখানে ব্রহ্মবাদী ও বৈষ্ণব হইয়া শৈব ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিরোধ-ভঞ্জন করিয়া দেন। হরিবংশের অনি-রুদ্ধ ও উমা সংবাদে শ্রীকৃষ্ণের শোণিতপুরে বাণ-নির্যাতন-বাতায় বাণের পক্ষাবলম্বী শিবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে যুদ্ধ কর্তৃত্ব হইয়াছে, তাহাতেই পুরোক্ত বিরোধ ও তত্ত্ব-জ্ঞানের বিবরণ পাওয়া যায়। তাহাতে ক্রিপণ উদার ও স্পষ্টভাবে প্রাপ্ত তিনটি বর্ষমতের সাম্যবাদ প্রদৃষ্ট হইয়াছে, তাহা অনেরা হরি-বংশের ঐ স্থলটি উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিতেছি :—“মার্কণ্ডেয় বলিগেন, শিব বিষ্ণুরূপ এবং বিষ্ণু শিবরূপ, জ্ঞান ইহাদের

লোন বিশেষ দেখিতে পাই না । **যিনি বিষ্ণু তিনিই রুদ্র, এবং যিনি রুদ্র তিনিই পিতামহ, বিষ্ণু, রুদ্র ও পিতামহ, এই তিন দেবই এক মূর্তি ।” বিষ্ণুপূর্ব ১৮১ অধ্যায় বঙ্গবাসীর অম্ববাদ ।

এখানে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, শৈব ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ধর্মের সারতত্ত্ব বিস্তৃত হইয়া বিকৃতভাবাপন্ন হওয়াতেই “তাঁহাদের মধ্যে নতভেদ উপস্থিত হয়, তাহাতেই উভয়-ধর্মই যে বৈদিক ধর্মেরই শাখামাত্র, তাহা বৈদিক-ধর্মের উদার মতেঃ ব্যাখ্যা দ্বারা এখানে বুঝান আবশ্যক হইয়াছে। বৈদিক ধর্মের মূলদেবতা ব্রহ্মই এখানে মধ্যস্থ মার্কণ্ডেয়, তাঁহারই উক্তি প্রদান করিয়াছেন। এই উদারতাবের দ্বারা অম্বপ্রাণিত হইয়াই বদ্ধ-বৈর উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের সহিত প্রীতি-স্বত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন ।

কেবল যে শাস্ত্রগ্রন্থেই এই সাম্যভাব নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু শিব ও বিষ্ণুর বিগ্রহে পর্য্যন্ত ইহা প্রকাশিত হইয়া প্রকৃত কাখ্যাহুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। উভয়ের রূপ একই মূর্তিতে অঙ্কিত হইয়া এক নব-রূপের স্রষ্টি করিয়াছে, ইহাই “হরিহর” মূর্তি । এই মিলন ভাবটী এমনই অগুরু মিলনভাব যে “হরিহরাখ্যা” ঘনিষ্ঠতম সৌহার্দের প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছে। যে শ্রীক্ষেত্র বৃন্দাবনের পরই বৈষ্ণবদিগের প্রধান তীর্থ স্থান, সেখানেই এই অপূর্ণ মিলন সজাটি হইয়াছে। তথাকার সুপ্রসিদ্ধ ‘ভুবনেশ্বর’ বিগ্রহ এই-পুণ্যতর্ম মিলনস্বৃতি এখনও বহন করিতেছে। আমরা ব্রহ্মপুরাণ হইতে ইহার অপূর্ণ ইতিহাস কথা সকলন করিয়া দিলামঃ—

“এবমেবমহং নাথ ইচ্ছয়ঃ স্বঃপ্রসাদতঃ ।

লোকানাঞ্চ হিতার্থায় নানা প্রশান্তয়ে ॥ ৬৩

শৈবভাগবতানীক বাঁদার্থ প্রতিবেদকম্ ।

অগ্নিন্ ক্ষেত্রবরে পুণ্যে নির্ম্মলে পুরুষোত্তম ॥ ৬৪

শিবস্তায়তনং দেব করোমি পুরমং মহৎ ।

প্রতিষ্ঠেয়ং তথা তত্র তবস্থানেচ শঙ্করম্ ॥ ৬৫

ততোজ্ঞাত্তি লোকেহরিন্মেকমূর্তৌ হরীশ্বরৌ ।

প্রভাবাচ জগন্নাথঃ সপুনস্তং মহামুনিম্ ॥ ৬৬

শ্রীভগবাহুবাচ যদেতৎপরমংদেবং কারণং

ভুবনেশ্বরম্ ।

লিঙ্গমারাদনার্থায় নানাভাব প্রশান্তয়ে ॥ ৬৭

ননাদিষ্টেন বিপ্রেন্দ্র কুরুশীঘ্রং শিবালয়ম্ ।

তৎপ্রভাবাস্থিবে লোকে তিষ্ঠত্বঞ্চ তথাক্ষয়ম্ ॥ ৬৮

শিবো সংস্থাপিতে বিপ্র মমসংস্থাপনং ভবেৎ ।

নাভয়োরস্তয়ং কিঞ্চিদেকভাবৌ দ্বিধাকৃতৌ ॥ ৬৯

যোরুদ্রঃ সস্তয়ং বিকূর্গোবিষ্ণু সমহেশ্বরঃ ।

উভয়োরস্তয়ং নাস্তি পবনাকশয়োবিব ॥ ৭০

৪৬ অধ্যায় ।

“হে নাথ ! তোমার প্রসাদে লোকের

হিত ও নানাভাব (বহুভাব) প্রশমনের

জন্ত এই পুণ্য-নির্ম্মল পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শৈব ও

ভাগবতদিগের বিবাদ প্রতিবেদক একটী

শিবায়তন নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

এই ভবদায় ক্ষেত্রে শঙ্করমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলে

লোক সকল তখন জানিতে পারিবে যে ‘হরি-

হর’ ভিন্ন নহেন, উহার উভয়েই এক মূর্তি।

তখন জগন্নাথ, মুনি মার্কণ্ডেয়কে প্রভাত্তরে

বলিলেন, “হে বিপ্র ! আমার আদেশক্রমে

নানাভাব প্রশমন ও আরাধনার জন্ত পরম

কারণ ভুবনেশ্বর দেবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া

সস্তর শিবালয় নিৰ্ম্মাণ কর । হে বিপ্র !

শিবকে সংস্থাপন করিলে আমাকেও স্থাপন

করা হইবে। হরি ও হর উভয়ের কোনই

পার্থক্য নাই, আমরা একই মূর্তি দ্বিধাকৃত

হইয়াছি। যিনি রুদ্র, তিনিই স্বয়ং বিষ্ণু,

আর যিনি বিষ্ণু তিনিই মহেশ্বর। পবন ও

আকাশের স্তায় উভয়ের কোনই ঐভদ

নাই ॥”

বঙ্গদেশে যে এই উদার সাম্যভাব প্রকৃত

১৮৭১খ্রীষ্টাব্দের সহিত ঐধন সংযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গদেশও গৌরবান্বিত হইয়াছে।

উপরে আমরা লব্ধ স্বতন্ত্র ভাবে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের একত্ব প্রতিপাদক প্রমাণ সকলের আলোচনা করিয়াছি—এখানে আমরা তিনেরই অভেদ বিষয়ক যে একটি সুন্দর শাস্ত্রোক্তি এক স্থানে পাওয়া যায়, তাহাই উদ্ধৃত করিব :—

“ন ব্রহ্মাভবতোত্তির ন শত্বব্রহ্মণ্ডপা।
মিচাহং যুবয়োত্তিরোহ ভিন্নং সনাতনম্ ॥
একত্বং ব্রহ্মবৈকুণ্ঠ শত্বনাং পদপতং কুরু।
শিরোদগ্ৰীবাভিভেদেন যথৈবৈকস্য ধাম্মিণঃ ॥

অঙ্গানি যেতপৈকস্য ভাগব্রহ্মমিদং হর।
যজ্ঞোত্তিরগ্ৰ্যং স্বপরপ্রকাশং কুটুম্বন্যাক্ত
মনস্ত রূপম্ ॥

নিত্যক দীর্ঘাদি বিশেষণাটুহিংসং পরং
তচ্চ বয়ং নভিন্নাঃ ॥”

ইতি শব্দকল্পদ্রুমমুত কালিকা পুরাণে ১১শ অঃ
‘ব্রহ্মা ভব (মহাদেব) হঠতে ভিন্ন নহেন—শত্ব তদ্রূপ ব্রহ্মা হইতে ভিন্ন নহেন। আমিও তোমাদের উভয় হইতে ভিন্ন নহি। আমাদের অভেদভাব নিত্য। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের একত্বভাব হৃদয়ঙ্গম কর। মন্তক গ্ৰীবাভিভেদে যেমন একজনেরই অঙ্গ সকল হইয়া থাকে, তদ্রূপ হে হর! আমার একেরই এই তিন ভাগ। যে জ্যোতিঃ প্রথমভূত, আয়ুপ্রকাশশীল, কুটুম্ব (নির্লিকার) অবাক্ত, অনন্ত (বিশ্ব) রূপে, নিত্য, দীর্ঘাদি বিশেষণ-রহিত (অনির্লচনীয়), সেই পরম জ্যোতিঃও আমাদের মধ্যেও, কোন ভেদ নাই।”

এখানে কেবল যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মধ্যেই অভেদভাব উক্ত হইয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু সৃষ্টির অতীত পরব্রহ্মের সহিতও ইহাদের এক্য উক্ত হইয়াছে।

শৈব ও বৈষ্ণবস্মিগের মধ্যে আমরা যেরূপ সন্নিগনের ভাব দেখিয়াছি, শৈব ও

শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও তদ্রূপ সন্নিগনের ভাবই দেখিতে পাই। ‘হরিহর’ মূর্তিতে যেমন আমরা শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একান্ত সম্ভাব সংস্থাপিত হইতে দেখি—তেমনই শৈবশাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে তদ-পেক্ষাও আত্মরিক সম্ভাব স্থাপনের প্রমাণ আমরা পোষ্ট হই। তাহা ‘হর গোবী’ মূর্তিতে অক্ষতভাবে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। ‘হরিহরে’ বক্ষুরনের পরস্পর আত্মীয়তার প্রীতি কিন্তু ‘হর-গোবী’তে স্বামিন্যার অতীত হৃদয়ের প্রীতি। ‘শক্তি’ সহিত যে কেবল শিবেরই নির্লিকার ভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার সহিত বিষ্ণুর নির্লিকার ভাবেরও পরিচয় পাওয়া যায়। ‘শক্তি’ প্রকৃতপক্ষে শিবেরই বলিয়া ‘শিবা’ নামে সর্বদাই অভিহিত হইলেও তিনি শিবকপী বিষ্ণুরও শক্তি বলিয়া ‘নারায়ণী’ নামেও পরিচিতা হইয়াছেন—এই জন্তই ‘হরগৌরী’রূপে যেমন তিনি হরের সহিত নিত্য সংযুক্ত হইয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহার নিজের নন-দ্বার মন্ত্রেও তিনি বিষ্ণুর সহিত নিত্যসংযুক্ত রহিয়াছেন, বখা—

“সর্বমঙ্গল মঙ্গল্য শিবে সর্গার্থসাধিকে।

শরণোহিত্রাধকে গৌরী নারায়ণি নমস্ততে ॥”

হরিহর এবং গৌরী ও তাঁর পরস্পর অভেদভাব শাস্ত্রে কেমন পরিষ্কার ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমরা দুইটি পুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিতেছি :—
“অয়ং নারায়ণো গৌরী জগন্নাথ সনাতনঃ।
বিভজ্য সংস্থিতো দেবঃ স্বাত্মানং বহুবৈধর ॥
নমে ব্রহ্মঃ পরং তত্ত্বং দেবজ্ঞা ন মহর্ষত্বঃ।

একোহয়ং দেবদেবত্বো ভবানী বিষ্ণুরেব চ ॥

অহং হি নিক্রিয়ঃ শাস্ত্রঃ কেবলো নিম্পরিগ্রহঃ ॥

মামেব কেশবং দেব মাহর্দেবীমপাধিকারী ॥”

ইতি শব্দকল্পদ্রুমমুত কুর্পুর্নাম্ ১৪শ অধ্যায়ঃ ৭

“নিকুর ভাৱতঃ কুরাৎ যঃ শ্রীগৌর্যাস্তুরং তথা।
তদ্ব্যক্তিকং ত্র্যম্বকং বাক্যং শাস্ত্রবিগহিতম্ ॥”

শ্রীমুক্ত পূর্ণচন্দ্র বহুর ‘হিন্দুধর্মের প্রমাণ’ নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হৃদপুরাণ কাশী খণ্ড, পূর্বভাগ ২৭ অং ১৮১ শ্লোক ।

‘যাহারা বিষ্ণু ও কৃষ্ণের এবং শ্রী ও গৌরীর প্রভেদ জ্ঞান করে, তাহারা নিত্যন্ত মুগ্ধ, তাহাদের বাক্য সর্বদা শাস্ত্র বিগহিত ।’

“দুর্গা” দেবীতাই শক্তিরূপের পূর্ববিকাশ । অতরাং এই মূর্তিতেই আমরা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, এই তিন’ রূপেরই পূর্ণ সম্মিলন দেখিতে পাই । ইহা যে বহু পূর্বেই স্বীকৃত বিষয়, তাহা আজকার ইহার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়, যথা:—

‘কং ত্যাম্বকানু প্রবক্ষ্যামি রূপং দশভূজং তথা ।
জগদানাম পদেবানামগুণানুকারিনীম্ ॥’

ইতি শঙ্করকল্পসমুদ্র তৎস্য পুণ্যং বচনম্ ।

শাক্ত ও শৈবদিগের মধ্যে ঐক্য বন্ধনের চেষ্টা ত্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মোৎপত্তির সঙ্গেই দেখা যায়—তাহাতেই গোকুলে ত্রীমূর্তিকে কাদীকরূপ ধারণ করিতে দেখিতে পাই । শাস্ত্রেও এতৎসম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়, যথা:—

“স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্ ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণঃ কালীরূপো ভবেৎব্রজে ।”
ইতি মুণ্ডালা-তত্ত্বম্ ।

শ্রীরাধা শক্তিরূপো দুর্গারই বিকাশ—তজ্জ-
তাই রক্তবৈবর্তপুরাণ দুর্গা ও রাধিকার একত্ব
প্রতিপাদক বর্ণনা আছে—যথা—

শুদ্ধঃ প্রতি পার্শ্বতীবা ক্যাম্—বৈকুণ্ঠেহং
মহালক্ষ্মীগোলোকে রাধিকা স্বয়ম্ ॥”

অপরঞ্চ কৃষ্ণঃ প্রতি পার্শ্বতী বা ক্যাম্—
“একঃ রাধিকারূপা গোলোকে রাসমণ্ডলে ।

পঞ্চকল্পমুদ্রিত কৃষ্ণবৈবর্তপুরাণ ।

বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্ম কিরূপে আত্মসাৎ
করিয়া লইয়াছে, আলোচনা করিলে হিন্দু
ধর্মের অদ্বৈত সমীকরণ, শক্তির পরিচয় পাইয়া
বিস্মিত হইতে হয় । বৌদ্ধধর্মের দুইটী প্রধান
সম্প্রদায় । এতদ্বার নাম ‘মহাযান’—অপর-
দ্বার নাম ‘হীনযান’ । আমরা দেখিতে পাই
যে, তান্ত্রিক ধর্ম মহাযানে সংক্রান্ত ও বৈষ্ণব
ধর্ম ‘হীনযানে’ সংক্রান্ত হইয়া উভয়কে আপ-
নাদের প্রকৃতিতে একরূপই সম্পূর্ণ রূপান্তরিত
করিয়াছিল যে, ইহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব ভারত-
বর্ষ হইতে একেবারেই তিরোহিত হইয়াছে ।
‘বুদ্ধদেবকে’ অবতারের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া,
হিন্দুগণ তাঁহাকে আপনাদের উচ্চতম আরাধ্য
দেবতার অসান প্রদান করিয়াছেন । জগ-
ন্নাথ ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের দাক্ষত্রকরূপ প্রতিষ্ঠিত
করিয়া এবং জাতিভেদ প্রথার শিথিলতা
বিধান ও অপূর্ববিধ বৌদ্ধচারের প্রবর্তন
পূর্বক বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হিন্দুগণ অকুণ্ঠিত
চিত্তেই স্বীকার করিয়াছেন । উৎকলে
দাক্ষত্রক সম্বন্ধে যে গাঁথা প্রচলিত আছে,
তাহা বুদ্ধদেবই যে তদ্রূপ পরিগ্রহ করেন,
তৎসম্বন্ধে স্পষ্ট কিম্বদন্তীর প্রমাণ দিয়া
থাকে :—

“দেখিলে সিংহাসনোপরে । বিজয় বউজ রূপেরে ।
পদ অঙ্গুলি নাহি হাত । শ্রীদাক্ষত্রক জগন্নাথ ॥

দাক্ষত্রক—৫ম অ ৩২।৩৩ শ্লোক ।*

আমরা ধর্মশাস্ত্রের অবিরোধিতাব সম্বন্ধে
যথাসাধ্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, এক্ষণে
এতৎ সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ নিদর্শন রহিয়াছে,
তাহারও উল্লেখ করিব । জগন্নাথক্ষেত্রে যে
জগন্নাথাদি বিগ্রহের সন্নিবিশিষ্ট ‘ভুবনেশ্বর’
শিব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহা আমরা
পূর্বেই বলিয়াছি । বৈষ্ণবধর্মের প্রধান তীর্থ

* শ্রীমুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহের “শ্রীদাক্ষত্রক ।”

স্থান বারাণসীতে স্তম্ভপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের প্রভাব সমানভাবে বিরাজমান। দশাশ্বমেধ ষাট প্রভৃতির সহিত এখনও বৈদিক স্মৃতি বিজড়িত। গয়া হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের তুল্যরূপ প্রসিদ্ধ তীর্থ। কানীর পার্শ্বেই সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থ ‘সারনাথ’।

হিন্দুর নিত্য-নৈমিত্তিক কৰ্ম্মাশুষ্ঠানে শিবাদি পঞ্চদেবতার পূজা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিহিত আছে। এই শিবাদি পঞ্চদেবতা যথা—‘গণেশক দিনেশক বহ্নিঃ বিষ্ণুঃ শিবঃ শিবাং। দেকষ্টকং চ সম্পূজ্য ইত্যাদি ॥’

‘গণেশ সহ এই ছয়টি দেবতা সর্ব-কার্য্যেই সর্বাগ্রে সকলেরই পূজ্য, যথা, গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব, শিবা। এইখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি, কিরূপে উদার শাস্ত্রকার বৈদিক (অধ্যাপাসক) শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, প্রভৃতি সর্ব-সম্প্রদায়ের অভীষ্ট দেবতাকেই তুল্যরূপে সকলের পূজার পাত্র করিয়া সম্প্রদায় বিরোধ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিবার উৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবিত করিয়া গিয়াছেন। এই উদার ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হওয়াতেই আমরা সম্প্রদায় নির্বিশেষেই প্রধান প্রধান ধর্ম্মকাৰ্য্য সকল অহুষ্টি ও হওয়ার প্রশস্ত ব্যবস্থা দেখিতে পাই, যেমন শাক্ত দোণোৎসব করিয়া থাকেন, আবার বৈষ্ণবও তেমনই দুর্গোৎসব করেন। শাক্ত দেবতার অর্চনার স্তম্ভও বে হিন্দুগণ ‘দুর্গাপ্রীতে বল হরিবল’ বলিয়া ‘হরিশ্রবণ’ করেন, তাহা শাক্ত ও বৈষ্ণবের মিলনেরই ফল।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য শ্রীরাধিকাজীবন্ত মধ্য দিয়াই শ্রীকৃষ্ণ সাধনা করিয়াছিলেন। তিনি রাধিকা সাজিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নারকভাবে আরাধনা করিতেন। সুতরাং রাধিকারূপে শক্তি

দ্বায়েই তিনি চৈতন্যরূপে শ্রীকৃষ্ণকে আকৃষ্ট ও লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা শাক্ত ও বৈষ্ণব ভাবেরই মিলন। এতৎ-প্রসঙ্গে প্রজ্ঞানন্দ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় যে স্তম্ভের মন্তব্য তদীয় ধর্ম্মানন্দ গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন— তাহা এখানে উদ্ধৃত করা একান্ত কর্তব্য মনে করি,—‘বাঙ্গালী বৈষ্ণবের আরাধ্য “শ্রীচৈতন্য”, আর বাঙ্গালী শাক্তের আরাধ্য “শক্তি,” কিন্তু হে শাক্ত ও বৈষ্ণবমণ্ডলি! আপনারা কি জানেন না, শক্তি না হইলে চৈতন্য নাই এবং চৈতন্য না হইলে শক্তি নাই।’

বৈষ্ণবগীতি সঙ্গীতের প্রধান কবি গোবিন্দ অবিকারী আপনার “তুক সারি-সংবাদে” এই মিলনভাবটী কেমন মধুর করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন—

“তুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল,

সারি বলে আমার রাধা শক্তি সফারিল,

নইলে পার্কে কেন ?

হিন্দু এই সাম্যভাব শিক্ষার ফলে তাহার আশ্রয় এমনই প্রশস্ততা অর্জিত হয় যে, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। ভক্তের আদর্শ দেবর্ষি নারদের প্রকৃতিতে এই সাম্যভাব কিরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল, সাধকবর মহাত্মা রাম কৃষ্ণের সরল বর্ণনার তাহা প্রকাশিত হইবে, যথা—‘অস্তর শাক্ত, বাহির শৈব, মুখে হরি হরি’ নারদের এই ভাব ছিল।’ ‘শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস’ (জীবনী ও উপদেশ) শ্রীসুত্যাচরণ মিত্র প্রণীত।

সাধক রামপ্রসাদ এই সাম্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াই ‘কালী ও কৃষ্ণ প্রভেদ নাই’ তাহার অমর সঙ্গীতে গাইয়াছেন—

নাচ দেখি শ্রামা • ।
 তেমনি, তেমনি, তেমনি ক'রে,
 নাচ দেখি শ্রামা ।
 ব্রজে যেমন নেচেছিলে
 হয়ে বনমালী, '
 যশোদা নাচাত তোমার দিগে করতালি
 নাচ দেখি শ্রামা ॥”

মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস এই গানটা
 গাইতেন ।

ভক্তপ্রবর কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রের
 একত্বভাবের দ্বারা অল্পপ্রাণিত হইয়া হিন্দুর
 সমস্ত দেবতার মধ্যে, সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে,
 কিরূপে একই মহাত্বের বিকাশ প্রত্যক্ষ
 করিয়াছিলেন, তাহা তদীয় উদার সঙ্গীতের
 বর্ণে বর্ণে প্রতিধ্বনি হইতেছে:—

“জাননারে মন, পরম কারণ,
 শ্রামা কভু মেয়ে নয় ।
 সে যে মেয়ের বরণ, করিয়ে ধারণ,
 কখন কখন পুরুষ হয় ।
 বৃন্দাবনে তিনি হন বনমালী,
 আয়ানের ঘরে হন কৃষ্ণকালী,

“ নদীরাতে আদি হরি হরি বলি,
 গৌরাঙ্গ নামেতে বিখ্যাত হয় ।
 কখনও বৈষ্ণব, কখনও শাক্ত,
 কখনও সৌর, কখনও গাণপত্য,
 কে বুঝবে তাহার মহত্ব তত্ত্ব,
 মূর্খেতে কেবল প্রভেদ কম ॥”

এই একত্ব ভাব সিদ্ধিধারা জাতি ধর্মের
 ভেদ তিরোহিত হইয়া সার্বভৌমিক উদার-
 ভাব বিকশিত হওয়ায় যে সাধকের দিব্যজ্ঞান
 উৎপন্ন হয়, আধুনিক হিন্দু সাধকের * সঙ্গী-
 তেও তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ।
 যথা :—

“জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান ভোজের বাজি ।
 তোমায় যেভাবে ডাকে তাতেই তুমি হও না রাজি ॥
 মগে বলে ফারাতারা, গড় বলে ফিরঙ্গী দারা ।
 বদর বলে তোমায় যত নামের মাখি ॥

* * * * *
 * * * * *
 এক ব্রহ্ম বিধা ভেবে মন আমার হয়েছে পাঞ্জি ॥
 শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্তী ।

“নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা এবং বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার প্রভাব ।”†

(চৈতন্য লাইব্রেরির বার্ষিক অধিবেশনে “বিশ্বম্ভর-সেন পদক” প্রাপ্ত রচনা) ।

প্রথম অধ্যায় ।

“ অবকাশরঞ্জিনী ।

কবির নবীনচন্দ্র কাব্য জগতের কোন্
 স্থান অধিকার করিয়া আছেন ? তাঁহার স্থান
 কোন্ কবি অপেক্ষা কত দূরত্ব আছে বা নিম্নে,
 আমরা প্রথমে তাহা প্রদর্শন করিতে আদৌ
 চেষ্টা করিব না । প্রথমে আমরা তাঁহার
 কবিতা ও কবিত্ব বিষয়ে আলোচনা করিব ।

আশা করি, তাহাতেই বাঙ্গালী সাহিত্যে
 তাঁহার স্থান, অধিকার বা স্বত্ব প্রকাশিত
 হইবে । আমরা মনে করি যে, কোন্ ব্যক্তি
 গুণে কত বড়, তাহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করা-
 পেক্ষা তাঁহার দোষ ও গুণ সর্ব সমক্ষে উপ-

* মহাত্মা রামহুলাল মুন্সী ।

† প্রথম পুরস্কার পদক ইহার প্রাপ্য ।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত । ২০১১।০২ ।

স্থাপিত করিলে স্বতঃই তাঁহার প্রভাব ও
স্থান প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

অবকাশরঞ্জিনী কাব্য কবির চতুঃষষ্টি
সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন কবিতা সমবাসে গঠিত।
ইহাতে বঙ্গসাহিত্য-কানন-জাত নবীন পিকের
নবীন মধুর উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হইয়াছে।
কবি বালাকালে যখন যাহা দেখিয়াছেন,
তাহাই কবিতা-হারে সজ্জিত করিয়া বঙ্গ-
সাহিত্য-ভাণ্ডারে উপহার দিয়াছেন। কখন
তিনি জন্মভূমির হৃদঙ্গ দেখিয়া বিলাপ করি-
য়াছেন, কখন বা বাণবিধবার নিরাশবদন
দেখিয়া হৃদয়ের গভীরতম উচ্ছ্বাস ত্যাগ
করিয়াছেন। কখন স্বদেশবাসীর সুশৃংগ
দেখিয়া আফ্লাদিত হইয়াছেন। কখন বা
স্বদেশবাসীর ভীকৃত্য ও ব্যাসন দেখিয়া ঘৃণা
ও লজ্জায় হতাশ-উচ্ছ্বাস ছাড়িয়াছেন।

কবির সেই বালা তরল হৃদয়ে যখন যাহা
পড়িয়াছে, তাহাই প্রতিফলিত হইয়াছে, তখন
তাঁহার ভাবের গাড়র না হইলেও তাঁহার
কোন কবিতারই কবিত্বের অভাব লক্ষিত হয়
না। তিনি কোথাও দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া
দুঃখিত হইয়াছেন, কখন শোকসন্তপ্ত হৃদয়
দেখিয়া নিজে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছেন।
কখন জন্মভূমির ও স্বজাতির হৃদঙ্গ দেখিয়া
তাঁহার হৃদয় একেবারে দ্রবীভূত হইয়াছে
এবং শোকের উচ্ছ্বাস ছাড়িয়া নিজ হৃদয়ের
গভীরতম সন্তাপ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং
বঙ্গবাসী সমক্ষে তাহা অত্যন্ত অলসভাবে
প্রকটিত করিয়াছেন।

অর্থলোভে লোভী পিতার অপাত্রে কল্যা-
দান দেখিয়া তাঁহার বালাহৃদয় দ্রবীভূত
হইয়াছে, সেই জন্তই তিনি আবেগী গভীর-
ছেন :—

কুৎসিত উদ্বাহ দোবে শতেক যুবতী,
মুক্তা যৌবন ধন, করিয়াছে সমর্পণ,
অযোগ্য পাত্রের করে—নিষ্ঠুর নিয়তি!

পীড়িত উদ্বাহ-স্বত্র হয়েছে এখন,
অর্থগ্রাহী পিতৃ দোবে বিধের বন্ধন।

তাঁহার হৃদয় দেশ ও দেশবাসীর দশা
দেখিয়া কাদিয়াছে, সেই জন্ত তিনি সেকাল ও
একালে তুলনা করিয়া নিরাশ হৃদয়ে কাদিয়া-
ছেন। তাঁহার সেই বালা-হৃদয়ের অগ্নিবর্ষা
হকার শুধুন:—

না, না—এ যে অসম্ভব!
অসম্ভব,—এই সেই আর্ধ্যাবর্ত নহে,
কুকক্ষেত্রে মহারণ,
হ'ল যথা সংঘটন,
সেই আর্ধ্যাবর্ত—কেন করিব প্রত্যয়—
একটি ইংরাজ ভয়ে কম্পিত হৃদয়।

অথত্র :—

সৌভাগ্যের উচ্চতম রত্ন সিংহাসন,
বিরাজি বীরদর্পে তব পুত্রগণ,
আমরা অভাগাগণ, হারাইয়া সিংহাসন,
হারাইয়া নৈসর্গিক স্বাধীনতা ধন,
কাদিতেছি অনিবার বিদেশি চরণে।

বান্ধালীর হ্রবস্থা দেখিয়া কবির হৃদয়
কাদিয়াছে, তাই তিনি দুঃখ-মিশ্রিত শ্লেষে
বলিয়াছেন :—

বান্ধালীর বীর মুক্তি থাকিবে তাহাতে।

হৃৎস্পন্দে রাইকল,

জিহ্বাতে দুর্জয় বল,

কামান “সংবাদপত্র”—শত্রু গ্রহকার,

যুগল চরণে পাশ-মস্ত্র বনংকার!

বারাণসীতে “বুড়ামঙ্গলের” জল-বিহার
দেখিয়া, জলোৎসবে বিজয়নগরের মহা-
রাজের সেই তামসিক বিলাসে বিভোর
দেখিয়া, তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ আঘাত লাগিয়া-
ছিল, তাহা আশ্চর্য্যগিরির অগ্নি উদ্গীরণের
জায় কি গভীর উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসিত হইয়াছে;—

ছি ছি মহারাজ, কি বর্ণিব হাঁয়!

খেদে এই বুক বিদরিয়া যায়,
তোমাকে নৃপতি কিসে শোভা পায়,
এসব আমোদ, বলনা ক্রামায়?

ও পাষণ্ড মুখে হাসিছ কেমনে
সহিছ কেমনে ও পাষণ্ড মনে ?

যাহার প্রথম হৃদয় যৌবনে ব্যাপনের তরঙ্গ
ও কর্তব্যের অবহেলায় একরূপ বিচলিত হয়,
তাঁহার হৃদয় কত মহান ।

প্রেমের চক্ষে সমস্তই কি যেন এক মধুর
সৌন্দর্য্য পূর্ণ বলিয়া বোধ জন্মে । সেই জন্তই
স্কটলণ্ডের মহাকবি Scott সেই পার্শ্বতীয়
স্কটলণ্ডেকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

Oh Caledonea ! stern and wild,
Meet nurse for a poetic child.

আবার আমাদের নবীন কবিও চট্ট-
গ্রামে পাছাড়, বাড়বানল, পার্শ্বতীয় নদী ও
সমুদ্র-তরঙ্গ-বিশোধিত উপকূল দর্শন করিয়া
বিমোহিত হইয়াছেন ও আপ্নত হৃদয়ে গাই-
য়াছেন :—

বাড়বেতে হুহুকার,

‘লবণাখ্যো’ মহামার,

সীতাকুণ্ডে গিরি, বারি, অনল সকল,
কত সবে, প্রভু রমণী হর্ষল ?

“অবকাশ-রঞ্জিনী” মহাকবির কবিত্বের
প্রথম বন্ধার এবং মহাকবিত্বের প্রাথমিক বা
জর্বিগ্ণ পূর্ণ ভাতি । এই কবিতার পর
কবিত্ব ও ভাবে জড়িত “পলাশীর যুদ্ধের”
আবির্ভাব ও শেষে কবিত্ব ভাবের পূর্ণ উচ্ছ্বাস
“কুরুক্ষেত্র” ও “প্রভাস ।”

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

পলাশীর যুদ্ধ ও রক্তমতী ।

“অবকাশ-রঞ্জিনীতে” আমরা নক্ষত্রের
ক্ষীণ স্নিগ্ধ রশ্মিবৎ মধুর কবিত্বের প্রথম বিকাশ
দেখিতে পাই । আর “পলাশীর যুদ্ধে” কবিত্ব
চন্দ্রের প্রাথমিক ভাতি অম্লভব করি । বাস্তব-
বিক পলাশী কাব্যেই নবীন কবির নবীন
প্রভা প্রকাশিত ।

এই কাব্য অনতিদীর্ঘ পাঁচটি সর্গে
বিভক্ত । প্রথম সর্গ হইতে কবির গান্ধীর্ষ্য
ও রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় ।
এমন গান্ধীর্ষ্যময়ী রচনা বাংলায় বড় দুর্লভ ।
‘এক মেঘনাদবধ কাব্য ভিন্ন আর কোথায়ও
এমন গভীর ভাব দৃষ্ট হয় না । অন্ধকারময়ী
রজনীর কি তরঙ্গর ভীতি-উৎপাদক অথচ
বিস্ময়কর বর্ণনা করিয়াছেন :—

ভয়ানক অন্ধকার ব্যাপ্ত দিগন্তর,
তিমিরে অনন্তকায় শূন্য ধরাতল ।
বিনাশিয়া যেন এই বিশ্ব চরাচর,
অবিধাদে, অন্ধকার বিরাজে কেবল ।
কত বিভাষিকা মূর্তি হয় দরশন ;—
সমাধি করিয়া যেন বদন ব্যাদান
নির্গত করিছ সব বিকট দশন ;
বারেক খুলিবে নেত্র ভয়ে কাঁপে প্রাণ ।
ধরা যেন বোধ হয় প্রকাণ্ড অশ্বান,
নাচিছে ডাকিনী করে উলঙ্গ-কৃপাণ ।

এইরূপ স্থলে বঙ্গের অস্ত্র প্রসিদ্ধ কবি
গাইয়াছেন :—

সহসা মেঘ আঁবরিল চাঁদে
নির্ঘোষে । বহিল বায়ু হুহুকার স্বনে ।
‘চমকিল ক্ষণপ্রভা শোভিল আকাশ,
দ্বিগুণ আধারি দেশ ক্ষণ-প্রভা দানে !
কড় কড় করে বজ্র পাড়ল ভূতলে
মুহূর্ন্তুঃ ! বাহ বলে উপাড়িল তরু
প্রতঙ্গন ! দাবানল পশিল কাননে ।

প্রত্যেক কাব্যই কোন না কোন বিশেষ
ঘটনাসূত্র অবলম্বন করিয়া রচিত হয়, তাহাতে
নায়ক থাকে, নায়িকা থাকে । তাহাদের
প্রেম থাকে, বিচ্ছেদ থাকে, স্ত্রের হাসি
থাকে, দুঃখের নিঃশ্বাস থাকে, নয়নের
কটাক থাকে, আরও কত কি থাকে ; অর্থাৎ
একদেয়ী লোকের রুচির অনুরূপ সমস্ত
উপকরণই থাকে । “পলাশীর যুদ্ধে” তাহার
কিছুই নাই, কিন্তু যেন এক অদ্বীত মাদকতা
শক্তি আছে যে, পাঠক একবার এই কাব্য

পড়িতে আরম্ভ কর, উহা শেষ না করিয়া
যেন হৃদয় শাস্ত হইবে না। অদৃষ্টের অদ্ভুত
বিচিত্রতা, পাপের ভীষণ প্রতিমূর্তি ও তাহার
ভীষণতর পরিণাম দর্শনে পাঠক-হৃদয়ে কি
যেন এক অপারিষদ সৌদামিনী চমকাইয়া
যায় এবং তাহার কি যেন একটা লহরী-লীলা
হৃদয়ে রাখিয়া যায়।

প্রায় অধিকাংশ কাব্যেই কবি পূর্ববর্তী
কোন প্রতিভাশালী কবির কোন না কোন
সুত্র অবলম্বন করিয়া নূতন নূতন পুষ্প-মালে
উহা সুশোভিত করিয়া থাকেন, সেট ভুলই
কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস রঘুবংশ রচনার প্রাক-
কালে কবিকর্তে গাইয়াছেন :—

অথবা কৃতবাগ্‌দ্বারে বংশেহ্মিন্ পূর্ণ সুরিভি।
মনৌ বজ্র সমুৎকীর্ণে স্ত্রুতস্তে বাস্তি মে গতিঃ ॥

আমাদের নবীন বাবু “পলাশীর যুদ্ধ”
রচনা কালে কোন রত্ন বা মণিবেশ যন্ত্র পান
নাই। তিনি নিজেই স্তুতি হইতে মুক্তা
সংগ্রহ করিয়াছেন এবং স্বহস্তে রত্নকারী যন্ত্র
প্রস্তুত করিয়া মণিবেশ পূর্বক রত্নহার রচিয়া
মাতৃকর্ত অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এই
বিষয়ে তাঁহার আবেগময়ী অভিমান দর্শনে
মন বিচলিত হয় না, পরং তিনি এষ্টরূপ অভি-
মানের অধিকারী বোধ হইতে বোধ হয়। কবিত্ব
হিসাবে তাঁহার এই অভিনান রূপ দোষ, গুণে
পরিণত হইয়াছে :—

কোন পুণ্য বলে সেই থলির তিতরে।
প্রবেশি, গাখিয়া মালা অবিক্র রতনে
দোলাইব মাতৃভাষা কন কলেবরে,—
সুকবি সুকরে গাঁথা মহাবাক্য ধনে
সজ্জিত সে বরবপু! কিবা অসম্ভব
নহে কিছু, হে ছরাশে! তোমার মায়ায়,
কর্তৃ ক্ষুদ্র নর, ধরি পদছায়া তব,
লভিয়াছে অমরতা এন্মর ধরায়।

• পলাশীকাব্যের সূচনা অতিশয় গাভীর্বা-

ময়ী ও মনমুগ্ধকারিণী, এক মাইকেলের মেঘ
নাদ বধের সূচনা ভিন্ন বাঙ্গালার অন্য কোন
কাব্যের প্রথম ভাগেই এরূপ গাভীর্বা ও
মনোহারিত্বের সমাবেশ দৃষ্ট হয় না। আমরা
এই স্থল হইতে পাঠকদের কয়েকটা কবিতা
উপহার দিব :—

দেখিতে বঙ্গের দশা সুরবালাগণ,
গগন গবাক্ষ যেন চাঁকতে থুলিয়া
অমনি সিরাজ ভয়ে করিতে বন্ধন
চমকিছে রূপ জ্যোতি; নয়ন ধাঁধিয়া।
মূর্ত্তেক হাসাইয়া গগন প্রাদুর্গ,
সভয়ে চপলা মেঘে পশি যে তখন।

* * * *

ধরিয়া বঙ্গের গলা কাল নিশীথিনী,
নীরবে নবাব ভয়ে করিছে রোদন;
নীরবে কাঁদিছে আঁহা! বঙ্গ বিবাদিনী,
নীহার নয়ন জলে তিত্তিছে বসন।
নীরব ঝিল্লির বন, শুক সমীরণ,
মাতৃবুকে শিশুগণ, দম্পতি শয্যায়,
পতি প্রাণ ভয়ে, সতী সতীত্ব কারণ,
ভাবিছে অনন্ত মনে কি হবে উপায়।
বিরামদায়িনী নিদ্রা ছাড়ি বঙ্গালয়
কোথায় গিয়াছে ডরি, নবাব নিদ্রায়।

এমন অল্প কথায় অগচ্ছ হৃদয়স্পর্শী ভাষায়
তাৎকালীন কথিত বঙ্গের অবস্থার বর্ণনা অতি
সুন্দর হইয়াছে, এরূপ বর্ণনা অতি উচ্চ কবির ও
প্রশংসার কথা। এমন কবিত্ব ও গাভীর্বাশ্রম
ভাবের সুন্দর সমাবেশ বাঙ্গালা ভাষায় কতিং
দৃষ্ট হয়। বর্ণনাটা পাঠ করিলেই যেন মনে
একটা ভীষণ চিত্রের সমাবেশ হয়। তাহা
নিবিষ্ট-চিত্র পাঠক ভিন্ন অন্তের অল্পভবনীয়
নহে।

ইহার পরই বঙ্গপ্রথিত শেঠ ভবনের
মন্ত্রণা-গৃহের বর্ণনা। এই স্থলে মন্ত্রণার অধি-
নায়কদের যেরূপ চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাহা
স্বাভাবিক ও উপাদেয়। প্রথমেই খল মীর-
জাফরের উক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। মীর-

জাফর কেবল নিজ স্বার্থসিদ্ধির পথ খুঁজিয়া-
ছেন ? তিনি বিষকৃত্ত পন্নমুখবৎ প্রথমে ধাৰ্মি-
কতার ভাণ ও কৃতজ্ঞতার প্রকটন এবং তাহার
সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থের বিকট বিকাশও গোপন
করিতে পারেন নাই :—

যেই তরু ছায়া তলে জুড়াই জীবন,
কেমনে সে তরুমূল কাটিব আবার ?
অথবা নিষ্ঠুর মনে, ভূজঙ্গ যেমন,
কোন্ প্রাণে, যে গাভীর করি স্তম্ভ পান,
হৃদয় বিনিময়ে তারে করি বিষ দান ?

* * * *

কৃত্ত হৃদয় স্বাহা ! নরক সমান !
সামান্য যে উপকারী, তার অপকার
করিলে পাপেতে আত্মা হয় কলুষিত !
একে রাজদ্রোহী তাহে মন্ত্রী হয়ে তার,
কেমনে কুমন্ত্রে তার করিব অহিত ?

ইহার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন স্বার্থপরতার
আভাস প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে ?
একে রাজ-বিদ্রোহিতা ! তাহে অনিশ্চিত
এই পাপ পরিণাম—হিত, বিপরীত !

তাহার পর অপরের প্রতি অত্যাচার
ভুলিয়া যাওয়া নিজ ভাগ্যের প্রশংসা :—
রাজপদে, মন্ত্রী পদে, আছি বিরাজিত,
অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দাও সমুচিত ।

তাহার পরই যখন রাজা রাজবল্লভ মির-
জাফরকে নবাব পদে বরণ করার প্রস্তাব
উত্থাপন করিলেন, অমনি বিশ্বাসঘাতক, খল
জাফর আলীর সমস্ত পূর্ব কথিত সাধুবাদ
কোথার উড়িয়া গেল, অমনি তাঁহার হৃদয়
হরু হরু করিয়া নাচিয়া উঠিল :—

সৈন্তাধ্যক্ষ সাধু মিরজাফরের করে,
সমর্পণ এরাঙ্গা ভার । তা হ'লে নিশ্চয়
নিদ্রা যাবে বঙ্গবাসী নির্ভয় অন্তরে ;
হইবে সমস্ত রাজ্য শান্তি সুধাময় !
নীরবিলা নৃপমণি উঠিল কাঁপিয়া
হৃদয় করি মিরজাফরের হিয়া ।

কেন এক কথায় মিরজাফরের পরিচয়

প্রকটিত হইয়াছে ।

তাঁহার পরই জগৎশেঠের সেই অগ্নিস্পন্দী
বাক্যাবলী, শেঠবরের হৃদয়ে ভয়ানক আঘাত
লাগিয়াছে, জীবাংসার অমলমুখিক বিষে তিনি
উত্তেজিত । তাঁহার সেই বাক্যাবলী অগ্নি-
বর্ষা গিরির স্রাব ভয়ানক, উহাতে তীব্র প্লেথ
ও ভয়ানক মনোবেদনা প্রকাশিত হইয়াছে :—

কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা মম—সমস্ত পৃথিবী
সিরাজদৌলার যদি অমূল্য ;
অথবা মানুষ ছার তুচ্ছ ক্ষীণজীবী,
করেন অভয় দান যদি দেবকুল,
তথাপি—তথাপি এই কলঙ্কের কালী
সিরাজদৌলার রক্তে ধুইব নিশ্চয় ।
সম্ভব হইবে লুপ্ত শারদ চন্দ্রিমা,
অসম্ভব হবে লুপ্ত শেঠের গরিমা ।

* * * *

সাধিতে প্রতিজ্ঞা যদি হয় প্রয়োজন,
লইব ইজের বজ্র পাতি বক্ষঃস্থল !
যদি পাপিষ্ঠের হয় সহস্র পরাণ,
সহস্র হলেও তবু নাহি পরিত্রাণ ।

তাহার পরই রাজা রাজবল্লভের উক্তি ।

তিনি যেমন সন্ধি-হৃদয় ও স্বার্থপর, তাঁহার
বাক্যাবলীও সেই প্রকার । তিনি যেন, যাহা-
দের সহিত এই গুপ্তমন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত,
তাহাদেরও বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না ।
অপরের প্রতি যে অত্যাচার হইতেছে, সেজন্য
তিনি ভত চঞ্চল নহেন, কিন্তু নিজের প্রতি
অত্যাচার জ্ঞানই তিনি বাস্তব :—

কলিকাতা জয় কালে যদিও পামর,
পেয়ে গ্রাসে ছাড়িয়াছে পুত্র কৃষ্ণদাস,
যেদিন হইবে আপী নির্ভয় অন্তর,
সেদিন আমার হ'বে সবংশে বিনাশ ।

ইহার পর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন ।
তাঁহার বাক্য স্থির অখণ্ড গম্ভীর । তিনি
নিজের প্রতি অত্যাচারের কথা বড় তুলেন
নাই । তিনি যেন পরহৃৎখে কাতর, আবার
আলিবিদ্রির প্রতি কৃতজ্ঞতার এখনও তাঁহার
হৃদয় প্রণত । সকলেরই মতিভ্রম আছে ।

সেই জন্ত তিনিও ইংরাজ সাঁহায্যে কার্য্যোচ্চার
করিতে সম্মতি প্রদান করিলেন। ভারতব
জন্ত নূতন পিঞ্জরের বায়না-নামা লিপিবদ্ধ
হইল। কৃষ্ণচন্দ্র কুটনীতিপরায়ণ নহেন,
স্পষ্টবাদী, তাঁহার বাক্যে তাহাই প্রকাশ
পাইয়াছে। শেষে তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী
ভবানীর মত জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ বক্তব্য
শেষ করিয়াছেন।

পলাশী কাব্যে পরম পূজ্যা রাণী ভবানীর
উক্তির স্থায় উপাদেয় অংশ আর নাই। সেই
স্বর্গীয় রাণী-কথিত বাক্যগুলির কবি গ্রন্থিত
কবিতাগুলি স্বর্ণাক্ষরে সমস্ত বঙ্গবাসী হৃদয়ে
বিরাজিত রাধিব্যার যোগ্য। যিনি সেই দেবীর
উক্তি পাঠ করিবেন, তিনি নবীন বাবুর হৃদয়,
আশা ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অনুভব করিয়া কবি-
বরকে সর্বোচ্চ করণে সাধুবাদ দিবেন। এই-
রূপ উক্তি বাঙ্গালী কবিদের গ্লেথনী হইতে
এই নূতন নিঃসৃত হইয়াছে। কবির কবিত্ত,
ভূয়োদর্শন ও স্বদেশ-বাৎসল্য একাধারে বির-
জিত। পাঠক মহারাজী নাট্যরঞ্জনীর বাক্য-
গুলি পাঠ করুন, আর মুক্তহৃদয়ে নবীন বাবুর
কবিত্তশক্তির জন্ত সাধুবাদ করিতে থাকুন।
মহারাজীর বাক্যাবলী পাঠ করিলেই চিত্র-
পরায়ণ বাঙ্গালী হৃদয়ও যেন কি এক অদ্ভুত
আশায়ন্তৃত্য করিতে থাকে, কি এক ভাবম্বা
দর্শনে উৎফুল্ল হয় ও সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গীয়
রাণী ও নবীন বাবুর চরণে প্রণত হইতে যেন
স্বতঃই প্রবৃত্তি জন্মে। কবিকৃত বঙ্গমাণ্ড
ভবানীর বর্ণনা পড়িলেই যেন কি একপ্রকার
মাতৃপ্রেমেশ্বরীর অবশীকৃত হইয়া উঠে :—

একটা রমণী মূর্ত্তি বসিয়া নীরবে,
গৌরাজিনী দীর্ঘজীবী, আকর্ণ নয়ন,
শুকতারা শোভে যেন আকাশের পট,
শোভিছে উজলি জ্ঞান-গর্ভিত বদন।

• আবার পলকে সেই নয়ন চপল

• দ্বৈহের সনিলে হয় কোমলতা যয় ;
এই বর্ষিতেছে ক্রোধ গতিমা গরল,
অমনি দয়াতে পুনঃ জ্বলিত হয় !
বিশ্বব্যাপী সেই দয়া, জাহ্নবী যেমন,
সমস্ত বঙ্গেতে করে সুখা বন্নিষণ।

• মহারাজী সকলের মন্ত্রণার সম্ভাব লাভ
করিতে পারেন নাই। এই কাপুরুষোচিত
মন্ত্রণায় তাঁহার মনে ঘৃণা ও ক্ষোভের উদয়
হইয়াছিল, সেই জন্তই তিনি মনের আবেগে
বলিতেছেন :—

কাপুরুষ যোগ্য এষ্ট হীন মন্ত্রণার
কেমনে দিলেন সার এক বাক্যে সবে,
বুঝিতে পারি না আমি।

লক্ষণ সেনের সেই কাপুরুষতায়
সহি এত ক্রেশ। তবে জানিলে কেমনে
তোমাদের ঘৃণাস্পন্দ এই মন্ত্রণা
ফলিবে কি ফল পরে ? ভেবে দেখ মনে,
সেনাপতি সিংহাসনে বসিবেন যবে,
তিনি যদি এতাদিক হন অত্যাচারী,
ইংরাজ সহায় তাঁর,—কি করিবে তবে ?
বঙ্গভাগো এ বীরকে ফলিবে তখন,
দাসত্বের বিনিময়ে দাসত্ব স্থাপন।

তাহার পর মহারাজীর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির
পরিচয় কেমন স্বাভাবিক ও অল্প কথায়
প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালার অতুলনীয়
দেবী কস্তুর সহিত বঙ্গকানন হৃদয় যেন
একাধারে সূচিত্রিত। এমন নিপুণ চিত্র-
করের চিত্র পাঠক নিজে না বুঝিলে আমাদের
বুঝাইবার শক্তি নাই।

মহারাজ একবার মানস-নয়নে
ভারতের চারিদিকে করুণদর্শন,
মোগল-গোরব রবি আরঙ্গজিব সনে
অন্তুহিত ; নহে দূর দিল্লীর পতন।

• সিরাজদৌলার
করি রাজ্যচ্যুত, শস্ত্র হবৈ না ইংরাজ।

বরঞ্চ হইবে মত্ত রাজ্য-পিপাসায় " ১
সেই শক্তি টলাইবে বঙ্গ-সিংহাসন,
থামিবে না এইখানে, হবে উগ্রতর,
শোণিতের স্বাদে-মত্ত, শাঙ্গীল যেমন
প্রবেশিবে মহারাজু সৈন্তের ভিতর ।
হ'বে রণ ভারতের অদৃষ্টের তরে
কি ভীষণ ! তেবে মন শরীর শিহরে ।

* * *

জানি আমি যবনেরা ইংরাজের মত
ভিন্ন জাতি, তবু ভেদ আকাশ পাতাল ।
যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত
সান্নি পঞ্চাশত বর্ষ, এই দার্যকাল
একত্র বসতি হেতু, হস্তে বিদুরিত
জ্ঞেতাজিত বিষভাব, আর্য্যসুত সনে
হইয়াছে পরিণয়, প্রণয় স্থাপিত
নাহি বুঝা দ্বন্দ জাতি-ধর্ম্মের কারণে ।

আবার :—

আমাদের করে রাজ্য-শাসনের ভার !
কিবা সৈন্ত, রাজকোষ, রাজ্য মন্ত্রণায়,
কে!পায় না হিন্দুদের আছে অধিকার ?
সমরে শিবিরে, হিন্দু প্রধান সহায় !
অচিরে যবন রাজ্য টলিবে নিচয় ;
উপস্থিত ভারতের উদ্ধার সময় ।

আবার ইংরাজ সঙ্কে রাণীর উক্তি অতি
বিজ্ঞোচিত ও স্বাভাবিক :—

ইংরাজেরা নব্য পরিচিত ;
ইহাদের রীতি নীতি আচার বিচার
অনুমাত্র নাহি জানি ।

তাহার পর রাণীর শ্রীমুখ হইতে যাহা
বাহির হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে
দুর্লভ । বাঙ্গালীর হৃদয়ে ইহা বেদ বাক্যের
ত্ৰায় প্রতিধ্বনিত হউক, বাঙ্গালী মানুষ
হউক, মাতার বাক্য পুত্র উদ্বোধিত হউক ।
আহা ! তখন যদি বঙ্গের কৃতি-সন্তানগণ
মাতার বাক্য অবহেলা না করিতেন, তাহা
হইলে, বোধ হয়, ভারতের অদৃষ্টাকাশে এইরূপ
ঘন মেঘের আবির্ভাব হইত না । হয়তঃ
ভারতবর্ষে স্তম্ভ প্রকার অভিনয় দর্শন করি-
তাম ।

আমার কি মত ? তরুণ, মহারাজ !
অসহ্য দাসত্ব যদি, নিক্ষেপিয়া অসি,
সাক্ষিয়া সমর সাঙ্গে নৃপতি-সমাজ
প্রবেশ সমুদ্র রণে ; যেন পূর্ণ শলী
বঙ্গ স্বাধীনতা ধ্বজা বঙ্গের আকাশে—
শত বৎসরের ঘোর অমাবস্তা পরে
হাস্যক উজলি বঙ্গ । এই অভিলাষে
কোন বঙ্গবাসী রক্ত ধমনী ভিতরে
নাহি হয় উষ্ণতর ? আমি যে রমণী,
বহিছে বিদ্যুৎ বেগে আমার ধমনী ।

ইহার পরই বঙ্গজননীর হৃদয়ের যে গভীর
উচ্ছ্বাস বহির্গত হইয়াছে, তাহা সমস্ত বঙ্গ-
বাসীর গোরবের অপূর্ণ সামগ্রী, এই বাক্য
বঙ্গবালার, না রাজপুত্র-রমণীর, না গ্রীক
রোমীয় ললনার ?

ইচ্ছা করে, এই দণ্ডে ভীমা অসি করে,
নাচিতে চামুণ্ডা রূপে সমর ভিতর ।
পরদুঃখে সদা মম হৃদয় বিদরে,
সহি কিসে মস্ত-দুঃখ ?

এই-অগ্নি উদগারিণী বাক্যাবলীর সঙ্গে
সঙ্গেই কবি মাতৃবাক্য অবহেলার যে কি
বিষময় পরিণাম, তাহা যেন জলদ অক্ষরে
প্রদর্শন করাইতেছেন ।

আবার মোহনলালের বাক্যেও কবি
কেমন ভবিষ্যৎ জ্ঞান ফুটাইয়াছেন । সেই
বৈরাগ্য-মিশ্রিত আক্ষেপোক্তি স্বর্ণাক্ষরে
বাঙ্গালী-হৃদয়ে লিখিয়া রাখা কর্তব্য :—

অদৃষ্টচক্রের কিবা বিচক্ষণ গতি ।
দেখিতে দেখিতে কত হয় আবর্তন ।
কাহার উন্নতি হইবে, কার, জনবতি,
মুহূর্ত্তেক পূর্বে আহা বলে কোন জন !
কালি যেই স্থান ছিল বৈজয়ন্ত ধাম,
আজি দেখি সেই স্থান বিজন কানন ।

আবার :—

সেই সে ইংলণ্ড আজি হইল উদয়,
ভারত অদৃষ্টাকাশে স্বপনের মত । "
এই রবি শীঘ্র অস্ত হইবার নয়,
কখনো হইবে কি না, জানে ভবিষ্যৎ ।

অন্ততঃ :—

এই নহে ভারতের রোদনের শেষ
পলাশী যুদ্ধের নহে এই পরিণাম,
যেই শক্তি শ্রোতবৃত্তি ভেদি বঙ্গদেশ
নিগত হইল আজি, অবিগ্রাম
হিম্মলয় হতে বেগে করিবে গমন
কুমারিকা লঙ্কাদ্বীপে লজ্জি পারাবার।

পলাশীর যুদ্ধের যে প্রধান বা একমাত্র
অভিনেতা, সেই ক্লাইবকে কবি কেমন কোণে
কাটোয়া শিবিরে তরুতলে হঠাৎ বাহির করি-
য়াছেন, কেমন সামান্য কথার বিনা আড়ম্বরে
তাহার চরিত্র চিত্রন করিয়াছেন। যে কবির
লিখনী হইতে এমন স্বাভাবিক ভাবে ও স্নদ
কথার কাহারও হৃদয়ের গভীরতম রহস্য
প্রকাশিত হয়, তিনি কি দরের কবি, তাহা
পাঠকই একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।

শিবির অনতিদূরে বসি তরুতলে
নীরবে ক্লাইব মগ্ন গভীর চিন্তায়।

* * * প্রশস্ত ললাট
বীরব্রতের রঙ্গভূমি, জ্ঞানের আধার।
বক্ষঃস্থল যেন যমপুরির কপাট,
প্রশস্ত, সুদৃঢ়, বহে তাহার ভিতর
ছুরাকাজ্জ্বা ; ছঃসাহস শ্রোত ভয়ঙ্কর।

আবার কবিতাচ্ছলে মহাকবি কতদিন
ইংরাজ রাজ্য দূরতর থাকিবে, তাহাও নির্দেশ
করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যখন রাজ্য পত-
নের কারণও নির্দেশ করিয়াছেন :—

. ধর বস ? এই জ্ঞানপরতা দর্পণ
বিধিকৃত, বৃটিশের রাজ্যে নিদর্শন !
যতদিন পূর্ব রাজ্যে বৃটিশ শাসন
থাকিবে অপক্ষপাতী বিশদ এমন,
ততদিন এই রাজ্য হইবে অক্ষয়।
এই মহারাজ নীতি মোহান্ব-যবন
ভুলিয়াছে, এই পাপে ঘটিছে নিরয়।

বিলাসিতা জাতীয় ধ্বংসের প্রধান কারণ,
এই বিলাসিতার জন্তই যখন রাজ্যধ্বংস হই-
য়াছে। সেইজন্ত নাদেবসাহ একদিন দিল্লীর

ষ্টাদসাহের বিলাসের পূর্ণাহতি-স্বরূপ উপাদেশ
খাওয়ার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্বক অন্ধসিঁদ্ধি
মেঘমাংস অতি আচ্ছাদনের সহিত ভক্ষণ
করিয়াছিলেন। কবি দেখাইয়াছেন, সে সময়
যখনো বিলাসের তরঙ্গে দেহ ঢালিয়া দিয়া
ছিলেন। তাহার বিলাসের আবর্তে মোহিত
ছিলেন। সেইজন্ত বীরবাহিত যুদ্ধক্ষেত্রেও
নর্তকীর বিলাস কটাক্ষ। যেখানে বিলাস,
সেখানেই কাপুরুষতা। আবার নিষ্ঠুরতা
কাপুরুষতার প্রসূতি। যে কাপুরুষ, সেই
নিষ্ঠুর। বীরহৃদয় নিষ্ঠুরতা-বিবর্জিত। সিরাজ
কাপুরুষ, সে নিষ্ঠুর। সেই জন্তই পলাশী-
ক্ষেত্রে আমরা নবাবশিবিরে বীরব্রতের ধ্বনি
শ্রুতে বিলাসিতার বিপুল তরঙ্গ দেখিতে পাই।
কিন্তু সে বিলাসে সুখ নাই। সেইজন্তই
কবি দেখাইয়াছেন যে, এই বিলাস-তরঙ্গ
মধ্যেও সিরাজ সুখী নহে।

আমি ত সমরক্ষেত্রে, প্রাণান্তে আমার,
যাইব না, পশিব না বিষম সংগ্রামে,
অরিবৃন্দ নখাগ্রেও দেখিবে না যার
কেমন অলক্ষ্যে তারে বধিবে পরাণে ?
তবে যদি তুনি রণে হারিব নিশ্চয়,
রাজহরণে একবারে লইব আগ্রহ। . .

যে মুসলমানের প্রতাপে পূর্বের বঙ্গদেশ ও
পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরভূমি
পর্যন্ত প্রকম্পিত হইয়াছিল, একি তাহা-
দেরই বংশধর ? ধন্ত বিলাসিতা, তোমার
প্রতাপে সিংহ-শাবকও মেঘশাবকে পরিণত
হয়। তোমার মত জাতি-উচ্ছিন্নক ব্যাধি
ইহসংসারে আর নাই। কবি যেন বাঙ্গালী
জাতিকে অঙ্গুলি প্রদর্শন পূর্বক প্রত্যক্ষ দেখা-
ইতেছেন, আর বলিতেছেন, হে বাঙ্গালী
সম্মানগণ, বিলাসিতার পরিণামফল অবলো-
কন কর, আর শিক্ষা কর যে, তোমরা দিনে
দিনে যেমন বিলাসতরঙ্গে গা ঢালিয়া দিতেছ,

‘তাহার পরিণাম কি ভীষণ! এই বিলাসিতার; জন্তই তোমরা পর-পদ-দলিত। এই বিলাসিতা পরিত্যাগ কর, দেখিবে, তোমরা যে অবনতির নিম্নস্তরে পতিত হইয়াছ, অচিরে তোমাদের উদ্ধগতি হইবে। তোমরাও আবার জগতের মধ্যে একটা গণনীয় জাতিক্রমে পরিণত হইবে। হায়! কবির এই নীরব ইঙ্গিত কি বাঙ্গালী-জন্মে স্থান পাইবে?’

পাপী যখন পাপের নিম্নতম সোপানে উপনীত হয়, তখন তাহার জ্ঞানচক্ষু শেষবার ফুটে, কিন্তু তখন নিম্নতির কলে তিনি আবদ্ধ, সেইজন্যই কবি সিরাজের মুখ হইতে শুনাইয়াছেন :—

পাপপুণ্য কার্য্যকালে সমান সরল,

অশ্রুশোচনাই মাত্র পরিচয় স্থল ।

কবি সিরাজ-পত্নীর যে চরিত্র চিত্রণ করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়, নরকের নিকট এমন স্বর্গীয় অল্পপম সৌন্দর্য্য, আমার পার্শ্বে এমন চন্দ্রিমার অল্পপম কোমুদী খেলা দেখিয়া পাঠকের হৃদয়ে কি অল্পপম ভাবের উদয় হয়, তাহা অবর্ণনীয় ।

‘মানব-চরিত্রের কি বিমোহন গতি, কল্যাণে মহারাজ, আজ সে পথের ভিখারী! আবার কল্যাণে পথের ভিখারী, আজ সে সমাগরা পৃথিবীর অধিপতি। সিরাজউদ্দৌলার পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব পরের অবস্থার তুলনা কর, জাগতিক নিয়মের কি ভীষণ নিরতি! কবি তাহা অতি বিশদভাবে আমাদের উপহার দিয়াছেন।

দুই দিন আগে এই হৃদ্যন্ত সিরাজ,

চাহিত না মুখ তুলি যেই অশ্রুচরে;

আজ সে নবাব আহা! বিধির কি কাজ?

কাঁদিয়াছে চরণে তার জীবনের তরে!

শত নরপতি পড়ি যাহার চরণে

কাঁদিত,—অদৃষ্ট আহা কে দেখে কখন।

অনেকে বলেন যে, কবি, এই পলাশীর

যুদ্ধের ভার জাতীয় ‘কলঙ্কের ঘটনা কাব্য’-কারে সাহিত্য-ভাণ্ডারে চিরতরে স্থাপিত করিলেন কেন? এই প্রশ্ন যে কোন কালেই আর বিধোত হইবে না। আমরা ঠাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যদি কবি এই কাব্য না লিখিতেন, তাহা হইলেই কি একলঙ্ক লোপ পাইত? সেই খেত সিংহ হস্তে—এ চিত্র যে ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহা কি ভাগীরথীর সমস্ত জলেও কোন কালে বিধোত হইবে? তাহার পর পলাশীক্ষেত্র ভারত অঙ্গের একটা চিরস্থায়ী ক্ষত চিহ্ন। এই চিহ্ন বিলোপের আশা স্বদূরপর্য্যন্ত। এক দিন ভারতভূমির সমুদ্র গর্ভে নিমগ্ন হওয়া সম্ভবপর, কিন্তু এ চিহ্ন দাত সমুদ্র তেরনদীর পরপারে জলদাক্ষরে বিরাজিত থাকিবে। পলাশীর অভিনয় যদি না হইত, তবে হয় ত আমরা এই ভারতকে অল্প প্রকার দেখিতে পাইতাম। হয়ত ভারতের অপূর্ণ স্বাসলইয়া গন্ধবহ ভারতভূমে আবার নির্ভয়ে নৃত্য করার অবকাশ পাইত, কিন্তু বিধির বিধান অল্প প্রকার। যে পলাশীর জন্ত ত্রিশ কোটি মানবের ভাগ্য অল্প পথে প্রাবলিত, সে পলাশীর কালিমা কি এই কাব্য না লিখিলে অন্তিমিত হইত?

বিপথগামী মানবকে দুই প্রকারে সংপথে আনয়ন করা যায়। একপ্রকার সংকার্য্যের, পুরস্কার বা সফল দেখাইয়া, আর এক প্রকার অসংকার্য্যের দণ্ড বা কুফল প্রদর্শন করাইয়া। প্রথম প্রকার পথই আমাদের মতে সমীচিন। কিন্তু যখন প্রথম প্রকৃত পথ দেখাইবার উপায় নাই, তখন শেষ পথ অবলম্বনই প্রকৃষ্ট উপায়, সেই জন্তই আমাদের পুরাণকারেরা নরক বর্ণনা করিয়াছেন। সেই জন্তই মাইকেল মেঘনাদ বধে এই চিত্রের

একবার আরও উন্মোচন করিয়াছেন এবং এই জন্তই কবির হেমচন্দ্র ছায়ায় লিখিয়াছেন। কিন্তু সে সকলগুলিই কাল্পনিক, কবির নবীনচন্দ্র সেই জন্তই কথামালার গম্ভীর কাল্পনিক পথ পরিত্যাগ পূর্বক সত্য ঐতি-

হাসিক পথ অবলম্বন করিয়াছেন, এবং ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হওয়া কেমন অবিবেচকের কার্য্য, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। পাপ কার্য্যে কেহই সুখী হইতে পারে না। পাপে ইহকাল ও পরকালের কি ভীষণ অবনতি। তাহার পর বিলাসিতার কি ভয়ানক ক্ষমতা। মানব জাতির এমন সাম্প্রতিক পীড়া আর নাই। হিন্দু বল, খ্রিস্ট বল, রোমক বল, আর নৈশ্বরী বল, সকলেই এই বিলাসিতা রূপ ভীষণ পীড়ায় কেহ মৃত, কেহ মৃতবৎ। একজন বাঙ্গালীরও যদি এই কাব্য পড়িয়া পাপ ও বিলাসিতার প্রতি বৃণা জন্মে, তাহা হইলেই বলিব, কবির লিখনী ধারণ সফল হইয়াছে। একাধারে অপূর্ণ কবিতা ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোক শিক্ষা। ইহা মানবের হৃদয় প্রতিভা। আমবা বলিব, কবির পলাশী কাব্য লিখা সফল হইয়াছে। বিনা উপকরণে এমন নৈবিশ্ব নীচন বাবু ভিন্ন অজ্ঞ কেহ এপর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে কৃতকার্য্য হন নাই। এ বিষয়ে নবীন বাবুর সিংহাসন মনস্ত কবির শীর্ষস্থানীয়।

রঙ্গমতী।

রঙ্গমতীকে আমরা এক প্রকার বিয়োগান্ত কাব্য মধ্যে—(Tragedy) গণনা করি, কারণ যদিও—বীরেন্দ্রের সহিত কুম্বিকার মিলন শেষে সংঘটিত হইয়াছে, সে কিন্তু মৃত্যু সময়ে। ছইটি কুম্ব এক বৃন্তে মুক্লিত, একের গন্ধে অজ্ঞ মুগ্ধ, কিন্তু কঠোর অঙ্গুরোধে, যখন উভয় কুম্ব প্রফুটিত,

তখনই স্থানান্তরিত। কিন্তু কি এক চমক আকর্ষণে পরস্পর বাধা যে, মিলনের জন্ত উভয়েই চেষ্টিত, কিন্তু নিয়তি চক্রের ফেরে, শেষে উভয়ের যেই মিলন, অমনি উভয় কুম্ব বৃন্তচ্যুত।

ইহারই নাম প্রেম। ইহা জগতে বড়ই হৃদয়—এ প্রেম স্বর্গীয়। ইহা এই মরু জগতের উভযোগী নহে। কবি এই জন্ত এই পৃথিবীতে তাহাদের মিলন সংঘটন করিলেন না। এই মরু জগতে কিছু অক্ষুণ্ণ নহে, কাজেই এ মরু জগতে এই পতি-পত্নী-প্রেম থাকি অসম্ভব। সেই জন্ত কবি এই প্রেমিক প্রেমিকার মিলন—যেখানে কুম্বের কীট নাই, অমৃতে মাদকতা শক্তি নাই, আলোকে দাহিকা শক্তি তাই,—তথায় সংঘটন করিয়া কবির চরম আদর্শ প্রদর্শন করাইয়াছেন।

রঙ্গমতীতে কবির ভূয়োদর্শন প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই সুদূর মহেন্দ্র পর্বত হইতে সাগর উদ্গিরিত চটগ্রাম পর্য্যন্ত অনেক স্থানের সুন্দর চিত্র পাঠক সঙ্গীতে উপস্থিত করিয়াছেন। এমন প্রকৃতির সুন্দর সৌন্দর্য্য-বর্ণন বাঙ্গালা কাব্যে অতি বিরল। সেই জন্তই বলি, রঙ্গমতীর জায় কাব্য বাঙ্গালার এই নূতন। হেম বাবু যে উদ্দেশ্যে বীর বাহু কাব্য লিখিয়াছেন, নবীন বাবুও সেই উদ্দেশ্যে রঙ্গমতী লিখিয়াছেন। ইহার মধ্যে কে অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা নির্ণয় করার ভার আমরা পাঠকের উপরই অর্পণ করিলাম।

রঙ্গমতীর শব্দ এক অপূর্ণ সরল্যাপূর্ণ বিখ্যাতী সেবকের চিত্র। এমন সরলতাপূর্ণ বাৎসল্য ভাব অতি মধুর। সেই যৌর ঝটিকা পূর্ণ নদী-তরঙ্গে তাহার নিজ জীবনের ভয় নাই। এক চিন্তা বীরেন্দ্র। সেই সঙ্গে

সঙ্গে বীরেন্দ্র মাতার সেই শেষ বিদায় স্মরণ
পথে উদ্ভিত হওয়ায় তাহার সেই কাতর-
ভাবে বড়ই মধুর হইয়াছে। সেই স্থান উদ্ধৃত
না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না :—

কাঁদিল জননী তোর! কাঁদিলি আপনি ।
সেই দিন হতে তোর, কত যত্নে, কত
কষ্টে পালিয়াছি আমি, দেশ দেশান্তরে,
দেখিতে কি এই দশা এ বৃদ্ধ বয়সে ?
অভাগিনী মাতা তোর ফিরিল না ঘরে,
বুকের বাছনী আর, লইল না বুকে !

শঙ্করের স্নেহ যেমন, বীরেন্দ্রের ভাল-
বাসাও তেমনি। সে ভাসবাসায় প্রাণের
মমতা বিস্তৃত। শঙ্কর জন্মগ্রহণ প্রায়, তাহাকে
বাঁচাইবার জন্ত বীরেন্দ্র নিজের বস্ত্রাদি দ্বারা
তাহাকে বন্ধন করিয়া সস্তরণ করিতেছেন।
নিজের প্রাণের প্রতি লক্ষ্য নাই। শঙ্করের
প্রাণ রক্ষার চেষ্টা :—

দেখিলা বীরেন্দ্র, মৃত্যুর বক্ষেতে শঙ্কর,
নক্রবেগে সাঁতারিয়া ধরিলা তাহারে ।
‘ছাড় ছাড়’—উচ্চৈঃস্বরে বলিল শঙ্কর,
“না-না”—বলিল বীরেন্দ্র । আবার ভাসিয়া
উঠিল তরঙ্গ শিরে মুহূর্তেক পরে ।

শঙ্কর যুবকের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিল,
শঙ্কর দেখিল, দুই জনকে লইতে হইলে বীরে-
ন্দ্রের বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। সেই জন্ত হস্তের
বস্ত্রের বন্ধন খুলিয়া নিজ জীবন জল মধ্যে
বিসর্জন দিয়া বীরেন্দ্রকে রক্ষা করিলেন ;
এ কিরূপ স্বার্থ ত্যাগ, এ যে দেবতার কার্য্য ।
যিনি রূপ, চরিত্র চিত্রন করিতে পারেন,
তাঁহার কাব্য কত উচ্চ ও মহান ।

“রসধর্মীকাব্য” পতি-পত্নী প্রেমের অক্ষয়
ধনি । একস্থানে কবি বলিয়াছেন :—

পত্নী-মৃত দেহ-শিরে,
উন্নত উমেশ হায় ! ভ্রমিতে লাগিলা
পতিপরায়ণা পত্নী বিরহে বিহ্বল ।
মরি কি পবিত্র চিত্র ! হেন পতি ভক্তি,
পত্নীপ্রেম, সতীত্বের আদর্শ ছলিত,
আছে কি জগতে ! কোথা সুসভা ব্রীটন ।

প্রকৃত প্রেমিকার কয়েকটা উচ্ছ্বাস
এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই কাব্য
সমালোচনা শেষ করিব ।

নাহি হইতাম যদি ঐশ্বর্য্য আঁকর,
বিদীর্ণ হতনা আজি হৃদয় আমার ।
কিন্তু পিতৃ ধনে মম নাহি আকিঞ্চন,
জগতের যত রত্ন, যত সুখ আশা,
সকলি চরণে ঠেলি, পাই যদি দেবি,
আমার হৃদয়-রত্ন, হৃদয়ে আমার ।
এমন দ্বস্তর স্থান নাহি এই বনে,
যথা নাহি কুমহিকা ভূঞ্জিবে ত্রিদিব
সেই রত্ন লয়ে বুকে ।

পাপের ভয়ানক পরিণাম। তাহা কবি
মক্‌ট রায়ের শেষ অঙ্কে প্রদর্শন করাইয়া-
ছেন। তপস্বিনীর অসি ফলকে তাহার পাপ
হৃদয় বিদীর্ণ এবং দম্ভ্য কর্তৃক সর্ব্বস্ব লুপ্তিত।
করির ইচ্ছা পাপীর পরিণাম দর্শনে পাপীর
হৃদয় কম্পিত হইবে এবং বীরেন্দ্র ও কুমহি-
কার পদানুসরণ করিয়া আমাদের যুবক
যুবতীরা স্বর্গীয় প্রেম, ভক্তি, বীরত্ব ও সতীত্ব
প্রভৃতি সংগুণ শিক্ষা করিবে ।

শ্রীকবিতাধর্ম্মজুগদার ।

নিব্বানন্দে !

নিম্নলিখিত কবিতাটি আমার জ্যেষ্ঠতম স্মৃতিস্মিত নাবিকী লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত পোবিন্দ্রলাল দত্তের একমাত্র পুত্র ফ্রনলাল দত্তের মাত্র ২০ বৎসর বয়সে অকাল বিয়োগে লিখিত। দাদা আমার গত বৎসর (১৩১৫ সালের) ১০ই জ্যৈষ্ঠ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন ও দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কবিতাটি গত বৎসর শ্রাবণ মাসে লিখিয়াছিলাম।* ভাবিয়াছিলাম, পবিত্র শোকগাথার পুতলাব লোকচন্দ্র গোটের করিলে ইহার গান্ধীর্ষ্যে, ইহার নির্দলতার আঘাত লাগিবে। তাই এত দিন সাধারণে প্রকাশ করি নাই। কিন্তু যিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিলে কেবল প্রাচীনত্বের অঙ্গুর দত্ত মহাশয়ের বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন হইতেন না, বঙ্গসমাজেরও একটি উজ্জ্বল রত্ন হইতেন, তাঁহার শোকগিতিতে সাধারণেরও দাবী আছে। তাঁহার “নিজ্জাতক্কে” কবিতার মত-প্রকৃত, প্রশান্ত স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক কবিতা অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি কবির প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়, সে কবিত্বশক্তি, সে প্রতিভা মকুলিত না হইতেই থরিয়া পড়িল! তিনি ১২ বৎসর হইতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন; গত সালের আঘাতের “জাহ্নবী” প্রতিকার প্রকাশিত তাঁহার “অনন্ত-অননা” কবিতা পড়িলেই বুঝা যায়, তাঁহার মধ্যে কি মহাশক্তি নিহিত ছিল। হৃদয়ের গদ্যও তিনি লিখিতে পারিতেন; একবারি উপ-ছাসও লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফ্রনলালের চরিত্রের বিশেষত্ব তাঁহার ধর্মপ্রাণতায়; নামেও তিনি ধর্ম ছিলেন, কাজেও সেই ধর্মোদ্ভাবিক ধর্ম ছিলেন,—আচারে, অনুষ্ঠানে, দৈনিক প্রতিকার্যে তাঁহার ধর্মপ্রাণতা, তাঁহার নিষ্ঠা সকলকে ধোহিত ও শুদ্ধিত করিত। ১০ বৎসর বয়স হইতে তিনি পূজাহিক আরম্ভ করিয়াছিলেন। মনে পড়ে, শিবপূজার উপকরণাদির অঙ্গহানি হওয়াতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন; তাঁহার নয়ন হইতে যেন স্বর্গের মল্যাকিনী ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। পূজার সময় তাঁহার ত্বপাঠ শুনিলে নাবিকেরও চিত্ত ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া যাইত, দূর হইতে বোধ হইত যেন সামাধ্যায়ী সামবেদগান করিতেছেন। তাঁহার সম্পূর্ণ ভাবার উচ্চারণ পণ্ডিতগণকেও বিস্মিত করিত। দত্তবংশে গায়ক বড় একটা জন্মেন নাই; বিনা শিক্ষায় তিনি স্বকণ্ঠ ও স্বগায়ক ছিলেন; দাদা আমার রূপে শুধু অতুলনীয় ছিলেন। সব জিনিষ হৃদয়ের সাজাইতে, নিজে হৃদয়ের সাজিতে, অশনে, বসনে, উপবেশনে সকল বিষয়ে হৃদয়ের ছিলেন; তাঁহার মত সৌন্দর্যের উপাসন অতি অল্পই দেখা যায়। তিনি কবি ছিলেন, গায়ক ছিলেন, সকল বিষয়ে হৃদয়ের ছিলেন, ত্রুটি এমন পবিত্র, নির্দল স্বভাব সংসারে কয়টি মিলিবে? জমীদার পিতার একমাত্র বংশধর (চলিত ভাষায় বাহাকে আত্মরে ছেলে বলে) হইয়াও তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার ধর্ম সকলের আদর্শ ছিল। তাঁহার অমায়িকতা, তাঁহার সরলতা, তাঁহার মিষ্টভাবিতা, তাঁহার শিষ্টাচারিতা সমস্ত আত্মীয় পরিজন, বন্ধুবান্ধব, কুটুম্বদিগকে মন্ববৎ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; তাঁহার বিয়োগে বিশেষ পরিতাপ হন নাই, এমন কেহ পরিচিত নাই। দাদা ফ্রনলালের বিয়োগে সংসার হইতে একটি অমূল্য রত্ন অপহৃত হইয়াছে।

(১)

আজি যে হয়েছে ধরা সকলি আঁধার,
মোর প্রাণে আগিতেছে শুধু হাহাকার!
চারিধারে হা হতাশ, বহে শুধু তপ্ত শ্বাস,
তোমার বিহনে দাদা শূন্য ঘর ঘর!
দিলে কি অল্পজ্ঞে নিত্য বেদনের ভার!!

(২)

এক বৃন্তে ছটা ফুল ছিহ্ন যোরা ফুটে,
কালের পরশে ভূমি কোথা গেলে টুটে?
তোমাহারা হ'য়ে প্রাণ, মোর সদা স্মরণ;
ভাবি রাত্টি দিন মান ভূমি যে নিকটে,
কিন্তু হায় তব মুখ নী পাই দেখিতে!!

(৩)

ধরা মাঝে তুমি সখা ছিলে প্রাণসম,
একাধারে ভ্রাতা বন্ধু কোথা তোমা সম !
আর কি গো এ সংসারে সাধীহারী পারাবারে
মিলিবে মিলিবে দাদা তোমার মতন !
জীবন-সর্বস্ব-দেব ত্রিদিব-রতন !!

(৪)

তোমাহারা ধরনীতে হ'য়ে আজি একা,
তোমাহারা গৃহ দ্বার সকলি যে ফাঁকা ;
তোমা হারা জন-সত্ত্ব সে শুধু শূন্যের অঙ্গ !
(বসুন্ধরা) মম আত্মা-চাতকীর মরুভূমি প্রায় !
'বারিদে' 'বারিদে' বলি বৃথা ডাকি হায়

(৫)

তোমার মুরতিখানি হৃদে আঁকা আছে,
অশ্রু-আবরণে ঢাকা স্নান হয় পাছে ;
বসায় হৃদয়াসনে পূজা করি সবতনে
নিত্য প্রীতি-অর্থ্য দানি ভক্তিপুষ্প সাজে ;
স্নেহভরে লয়ো দাদা অলুপ্ত সকাশে ।

(৬)

পিতামহীতা জীবনের তুমি ধ্রুবতারা,
আছিলে গো এ ভুবনে নয়নের তারা ;
হৃদয়-আকাশ হ'তে, সে তারা ধসিয়া গেছে !
সে ব্যুৎ হৃদয় এবে অন্ধকারে হারা !
নন্দন কানন হায় আশানের পারা !!

(৭)

কত যে বাসেন ভাল পিতা মাতা তব,
লেখনী অক্ষয় দাদা, বর্ণিতে সে সব !
তাজি গেছ এ ধরনী, মনে তাহা নাহি গণি,
সাজাইয়ে খালাখানি উদ্দেশে গো তব
দেন ধরি ;—মনে করি খাবে চাঁদ ধ্রুব ॥

(৮)

পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি তরে ধন্ত এ ধরায়,
নহ তুমি স্তম্ভ দাদা গিয়ে অমরায় ।
কান্নাহীন, ছায়াহীন তব এস প্রতিদিন,
নৈবেদ্যে রাখিতে চিহ্ন, জনক হিয়ায়
দিতে শাস্তি ; নাস্তিকে করে ভক্তি দিতে হায় !!

(৯)

মুখ্য হোতা ছিলে ভাই নব কর্মধাগে,
কামনা-সাধনা-ধন লক্ষী মহাভাগে ;
বারিজ্যে বসতি লক্ষী, সিদ্ধ্যাগে দেয় সাক্ষী ;
কুহকী ছলনে তাহা ভগ্ন মনে লাগে !
সুসজ্জিত অর্হণার দশা হেরি বাজে ॥

(১০)

নবীন পল্লবা-নবমঞ্জরী ভূষিতা
আছিল লতিকাঁ আঁহা তোমারি আশ্রিতা !
সংসার-কাননে স্নেহে হাসি-বিকশিত মুখে,
লজ্জানম্র লতাবধু এবে সে লুটিতা !
কালের কুঠারে ছিন্ন হয়ে মুকুলিতা !!

(১১)

প্রাণ না জুড়াবে আর স্থললিত তানে,
গৃহ যে বন্ধুত সদা হ'ত তব গানে ;
থেকে গেছে সে বন্ধুর, ছিঁড়েছে সুরের তার,
পশিবে না ভেরী সম "নিদ্রাভঞ্জে" কাণে ;
পিতে কাব্য-সুধা-ধারা বিধির-বিধানেন ।

(১২)

নিরাশা হ'ল গো সাধী এবে অমুখন,
ছন্দ্যার মাঝে ছিলে চুষকাকর্ষণ ;
আকর্ষণ গেছে সরে, নিরাশারে বুক ধরে,
তুমি নাই বলে (যে গো) নিরানন্দ প্রতীখন
হাহাকার ভরা শুধু হল (মোর) এ জীবন !

(১৩)

অচলা ভকতি ছিল তব বিভূপদে,
তাই যে লভেছ স্থান পুণ্য সত্যপদে ;
স্বরগ মরত মাঝে সন্ধিস্ত্র সম আছ ;
স্বর্বাঙ্গী বহু ভাই বাস যথা বাসদে ;
মন্দাকিনী দেবারণ্যজাত পারিজাতে ॥

(১৪)

শয়নে স্বপনে অশনে বা জাগরণে
সম সুরে হুটী প্রাণ বাজিত ভুবনে ;
শুধু দেহে ছিল ভেদ, মনে প্রাণে নাহি ভেদ ;
মিলন প্রভাতে (হায়) ভেদনিশা আগমনে
থেকে গেল মর্ম্মকথা সজল নয়নে !!

(১৫)

বড় সাধ ছিল মনে র'ব চির তোমাসনে !
করে কর বেঁধে দৌড়ে উজলি ভবনে !
সাধ না পূরিল হায় কেঁদে মোর দিন যায় !
মরণ না পরশিবে ভেবেছিহু মনে ;
চলে গিয়ে ভেঙ্গে দিলে স্নেহের স্বপনে ॥

(১৬)

নিধতিত পাশে বাঁধা মানব জীবন,
সহিতে বহিতে হ'বে বিধির শাসন ;
জ্ঞাতহীন, স্পন্দহীন, অভিযোগ বাক্যহীন,
জীবন রহিল শুধু মুহুর্তে নয়ন ;
কর্ম্মফলগতি কেবা করে নিরূপণ ?

(১৭) . . .
জন্মান্তরে পাপবৃক্ষ রোপিত জন্মানে
এ জনমে ফলু তার ঐড়াব কেমনে !
জনক গাভীবধারী, মাতুল যে চক্রধারী,
অভিমত্যা তাজে প্রাণ সমর অধর্ষে
কৃষ্ণলতা পুত্রহারা আপন করমে !!

(১৮)
কি ছার মানব মোরা ভুজিব না ফল !
ফলভোগ তরে শুধু আসি ধরাতল ;
রোধিতে প্রলয়বাত অক্ষম মানবহাত ;
শবির পুরুষকার মোরা যে দুর্বল
কোথা পাব লভিতে গো সেই তপোবল ?

(১৯)
কবে গো করমফল হবে অবসান !
মিশে যাব তাঁর দেহে লভিয়া নির্বাণ ?
কিছুই না জানি তাঁর স্ফূটাইতে জন্মান্তর !
তাঁহারি চরণে শুধু সঁপি মনপ্রাণ,
ফলাফল নাহি ভাব কর্মে আগুয়ান ॥

(২০)
বায়ুর হিল্লোলে তব স্মৃতি বিজড়িত,
প্রাতি ঘরে ভ্রমে সদা ভাবি বিরাজিত ;
সেই বায়ু সেই ঘর, সমুখেতে নিরস্তর,
কপূর চেয়ে বরা পলকে অন্তহিত ?
প্রাণহীন নিরানন্দ সব অধুমিত !!

(২১)
বুকফাটা তব দ্রুখে যাপিব জীবন,
জীবনমৃত্যু হ'য়ে দিব স্মৃতি বিসজ্জন ;
কত মনে উচ্চ আশা, সাধিতে ছিল গো আশা
মিলে দ্রুতি ভাই মোরা করেছিনু পণ,
ভাঙ্গাবুকে সেই পণে রাখিব কেমন ?

(২২) .
হে মহান, হে তাপস, হে গুরু আমার !
তব তরে করিয়াছি অঁখি জলসার !
ভুজি দাদা স্বর্গমুখ হও পুনঃ ধরামুখ ;
তোমা ছাড়া দাদা ধরা আঁখার আধার !
মিহির যে জ্যোতিহীন অভাবে তোমার !
শ্রীমিহিরলাল দত্ত বন্দ্য ।

পুরাতত্ত্ব । (২)

বা আশ্বিন কার্তিকের “আষাঢ়ে” গল্প ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিজ্ঞারত্ন মহাশয়
আশ্বিন মাসের “দেবালয়ে” লিখিয়াছেন যে,
অন্য লক্ষ বৎসর হইল সামবেদের উৎপত্তি
হইয়াছে। বিজ্ঞারত্ন মহাশয় যাহা ইউক লক্ষ
বৎসরের মধ্যেই নির্বাহ করিয়া দিয়াছেন।
কিন্তু কার্তিকের “সুপ্রভাত” শ্রীযুক্ত সত্য-
বজ্র দাস রামায়ণ রচনার কালই পোনের
লক্ষ সতের হাজার দশ বৎসর পূর্বে নির্দেশ
করিয়াছেন। অবশ্য মহর্ষি বান্মাকি যখন
ত্রৈতাঁর মধ্যখানে জন্মিয়াছিলেন, তখন ত্রৈতাঁর
অর্ধেক সাড়ে ছ লক্ষ বৎসর ও সত্যের আরও
কয়েক লক্ষ যোগ করিয়া তবে ভারতীয় সভ্য-
তার কাল নির্ণয় করিতে হইবে। কিম্বাচর্য্য-

মতঃপরম্ !! এই বিংশ শতাব্দীতেও মানুষ
গম্ভীরভাবে সত্যের নামে এমন আষাঢ়ে
গল্পের অবতারণা করিতে পারে, ইহাই
আশ্চর্য্য ! ইহারা কেহই মূর্খ নহেন। ইহা-
দের লেখা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে,
কোন কোন বিষয়ে ইহাদের অগাধ পাণ্ডিত্য
রহিয়াছে। তবে কেন ইহারা একরূপ হান্ত-
জনক কথার অবতারণা করিয়াছেন ? ইহা-
দের উদ্দেশ্য হিন্দুসভ্যতার-গৌরব বৃদ্ধি।
উদ্দেশ্য মহৎ, সন্দেহ নাই। কোন কোন
পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কথায় ইহাদের মনে হই-
য়াছে যে, তাঁহারা ভারতের গৌরব ধ্বংস করি-
বার জন্য ব্যস্ত। এই জন্য ঐ গৌরব রক্ষা

বিসয়ে ইহাদের উৎসাহও অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে। উৎসাহ এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে, গৌরব রক্ষা করিতে যাইয়া গৌরব নষ্ট হইতেছে কি না, তাহাও ইহারা দেখিবার অবসর পাইতেছেন না। উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু উৎসাহের আবেগে গড়িতে যাইয়া ইহারা ভুলিতেছেন মাত্র। অন্ততঃ শিব গড়িতে বানর গড়িয়া ফেলিয়াছেন। শতাব্দীকে সহস্রাব্দী বা লক্ষাব্দীতে পরিণত করিলেই হইল না, সময়ের অনুপাতে কার্যের হিসাব দিতে হইবে, নতুবা জগতের পাঠশালায় “গাধার টুপী” মাথায় দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। বিজ্ঞানরত মহাশয় যে কাজের হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই আর্থগণ বেদের মন্ত্র রচনা করিতেই ২৫ হাজার বৎসর কাটাইয়াছেন! কথাটাতে কি অর্গাজ্যতির খুব গৌরব হইল? ভারতেরই যেন ইতিহাস নাই? জগতের তো আছে। ইতিহাস নাই বলিয়া কি, ইতিহাসের মাল মন্ডাও নাই, মাল মন্ডা ভারতে যেমন আছে, পৃথিবীর আর কোথায়ও নেইমন আছে কিনা সন্দেহ। অবশ্য গ্রীষ্ম ছাড়া। ‘সুতরাং বর্তমান বিবর্তনবাদের যুগে যা তা বলিলে গৌরব বৃদ্ধি পাইবে না। ভারতে একটা সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল, আকাশ হইতে পড়ে নাই, ভারতের জল মাটিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। সে জিনিষটা কি, তাহা আমরা ভারতের আবাহমান-প্রচলিত সাহিত্য হইতে প্রাপ্ত হই। ক্রম-বিকাশের নিয়ম অনুসারে সেটা বিকশিত হইতে কত সময় লাগিবার কথা, তাহা বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ নিরূপণ করিতে সমর্থ। সুতরাং যেখানে হিসাবে হাজার পাওয়া যায়, সেখানে বার শত হইলে কিছু মারাত্মক হয় না। কিন্তু

লক্ষ বলিলে নিতান্তই হাত্তাস্পন্ন হইতে হয় এবং গৌরবের হানি হয়। বিজ্ঞানজ্ঞের একজন ছাত্র বাহা এক বৎসরে শিখে, আর এক জনের সম্বন্ধে যদি বলা যায় যে, সে উহা এক শত বৎসরে শিখিয়াছিল, তাহা হইলে পশ্চাত্তম ব্যক্তির যেমন গৌরব করা হয়, দশ লক্ষ বিশ লক্ষ বৎসরের আমদানি করিয়া ভারতেরও সেইরূপ গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা না বুঝিতে পারিয়া আমরা প্রাচীন আর্থজ্যতির গৌরবের হানি করিতেছি।

ভারতের ইতিহাস সঙ্কলনের উপকরণের অভাব নাই। তবে ইতিহাস হয় নাই কেন? ইতিহাস সঙ্কলন করিতে গেলেই আঘাট-গল্প-প্রসিদ্ধ লক্ষ্য কোট্যক্সের সন্ধান করিতে হয়। অথচ এই লক্ষ্য কোট্যক্সের বহুবারস্ত স্বারাই অজ্ঞলোকের বিশ্বাস উৎপাদন করতঃ জীবিতা অর্জন বাহাদের ব্যবসায়, তাহাদেরই হাতে ইতিহাস লিখিবার ভার ছিল। তাই ভারতে ইতিহাস হইল না। কিন্তু উপকরণ সঞ্চিতই রহিয়াছে। এই উপকরণের সাহায্যেই বিজ্ঞান আমাদিগকে বলিয়া দিবে, ভারতীয় সভ্যতার গড়ন বা ভাঙ্গনে কত সময় লাগিবার কথা। বিজ্ঞান কাহারও জীবিকার দিকে তাকাইবে না। আর এক কথা এই যে, কেবল ভারতেই সভ্যতার বিকাশ হয় নাই, জগতের আরও নানা দেশে সভ্যতা সূর্য্যের আবির্ভাব হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে একটা ঐক্য সভ্যতা—প্রাথমিক কোনও ক্রমেই হিন্দু সভ্যতা অপেক্ষা হীন-প্রভ নহে। সভ্যতা সকলকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করিয়া ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্ণয় করিবার যে প্রথা (Historico-comparative method) আছে, তাহার সাহায্যে এখন সভ্যতা নির্ণয় করা যাইতে পারিবে।

তদ্বৎসে আমরা আম হিন্দু সভ্যতাকে গ্রীক সভ্যতার সহিত তুলনা করিয়া হিন্দু সভ্যতার কাল নির্ণয় করিবার চেষ্টা পাইব।

সভ্যতার বিকাশে সব দেশেই কতকগুলি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তরগুলিকে যুগ শব্দে অভিহিত করা হয়। হিন্দু সভ্যতারও এই যুগ বিভাগ আছে, গ্রীক সভ্যতারও এই যুগ বিভাগ আছে। এই সব যুগে কে কি কার্য সাধন করিয়াছেন, তাহা তাহাদের যুগ সাহিত্যে অক্ষর অক্ষরে খোদিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা অনুমান করিতে হইবে না। যাহার দৃষ্টি আছে, তিনিই তাহা দেখিয়া জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ। অন্ধ ধরিয়া ভারতে এই যুগ নির্ণয় হয় না, কেন না, ভারতে ইতিহাস নাই। কিন্তু গ্রীশে ইতিহাস আছে। সুতরাং গ্রীক ও হিন্দুর কার্য-কারিতার পরিমাণ তুলনা করিয়া ভারতের কোন্ যুগ গঠনে কত কাল লাগিয়াছিল, তাহার নোটামুটি হিসাব বাহির করিতে কোনই কষ্ট হইবে না।

ভারতের ইতিহাসে বৈদিক যুগ বলিয়া একটা যুগ আমরা দেখিতে পাই। আর্য্যগণের ভারত প্রবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধদেবের আবির্ভাব পর্য্যন্ত কালকে বৈদিক যুগ বলা যাইতে পারে। তারপর বৌদ্ধযুগ বা উপনিষদ যুগ, কেন না, উভয়েরই উৎপত্তি বৈদিক যোগব্রজের প্রুতিবাদ করিয়া। এই বৈদিক যুগেই আর্য্যগণ একটা সভ্যতার বিকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিজ্ঞারত্ন মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন যে, আর্য্যগণ ভারতের আদিম অধিবাসী নহেন, তাঁহারা ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা ভারতে উল্লঙ্গ অবস্থার প্রবেশ করেন নাই, সন্তো করিয়া সামবেদ লইয়া আসিয়াছি-

লেন। সুতরাং ভারত প্রবেশ কালে তাঁহারা অসভ্য বর্কর ছিলেন না। আমাদেরও ইহাই বিশ্বাস এবং বেদাদি গ্রন্থে আর্য্যগণের কাল। আদিমদের মত যে সব লড়াইয়ের বর্ণনা আছে, তাহা যে কেবল ভারতেরই কথা, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। তাঁহারা কোন দূর দেশ হইতে আসিয়াছিলেন এবং পথে কত উপনিবেশ গড়িয়াছিলেন এবং কত দস্যুকর্ক উপক্রম হইয়াছিলেন, তাহা কে নির্ণয় করিবে? কিন্তু ভারতে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা স্থায়ী বাসভূমি পাইয়াছিলেন এবং বিশ্রাম করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, তাই এইখানেই তাঁহাদের সভ্যতা পরিপক্ব লাভ করিয়াছে। তাঁহাদের আর এক শাখা তেমনই গ্রীসে যাইয়া সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল। ঐতিহাসিক-তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইলে এই ভারত প্রবেশ হইতে আরম্ভ করিতে হয়। এই বৈদিক-যুগের সভ্যতার বিষয় বর্ণনা করিতে হইলে বেদসংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগে যে সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাই বিচার করিতে হইবে। বেদের মন্ত্র রচনা করিতে যদি ২৫ হাজার বৎসর অতিবাহিত হইয়া থাকে, তবে ব্রাহ্মণাদিতে তাহার ব্যাখ্যায় আর কত হাজার বৎসর লাগিল, তাহা কে বলিয়া দিবে? তা যাই হোক, এই সময় মধ্যে ভারতীয় আর্য্যগণ আপনাদের বিজ্ঞাবুদ্ধি, জ্ঞানধর্ম, শিল্পকলা, সাহিত্য-বিজ্ঞানে যে উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, সামাজিক নীতি, বিধিব্যবস্থা, আচার ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য, আহার-বিহার, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতির মধ্য দিয়া যে সভ্যতার বিকাশ করিয়াছিলেন, যাহার “অলঙ্কৃত প্রমাণ” বেদমন্ত্রে ও “ব্রাহ্মণ” ভাগে বিস্তারিত রহিয়াছে, তাহা আর্য্যজাতির আর এক শাখা হিন্দুর

সভোদয় ভ্রাতা গ্রীকগণের হোমরয়গের সভ্যতা; অপেক্ষা কদাচিৎ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। অণ্ড এই Homeric age-এর পরিমাণ কিঞ্চিদধিক পাঁচ শত বৎসর। যেমন আৰ্য্যগণের ভারত প্রবেশ হইতে বুদ্ধদেব পর্য্যন্ত বৈদিকযুগ, তেমনই হোমার হইতে এথেন্সের প্রাচুর্য কাল অর্থাৎ স্মার্টিক (Attic) বা ক্লাসিকাল (Classical) যুগ পর্য্যন্ত হোমরয়গ—খ্রীষ্ট পূর্ব ১০০০ হাজার হইতে খ্রীষ্ট পূর্ব ৫০০ পাঁচ শত বৎসর পর্য্যন্ত। এখন বিচার্য্য এই যে, হিন্দুর বৈদিকযুগের পরিমাণ কত? গ্রীকের যেখানে ৫০০ বৎসর লাগিয়াছে, হিন্দুর না হয় ৭০০ বৎসর লাগুক—অবশ্য যদি বেশীর দিকে ঝোঁক থাকে, বিজ্ঞান-সম্মত কল্পনা ইহার বেশী উঠিতে পারে না। আৰ্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া কি করিতেছিলেন? বিশ্রাম ও শান্তি লাভ করতঃ যথেষ্ট পরিমাণ গব্যস্বতের সাহায্যে বাগ যজ্ঞের অমুষ্ঠান করিতেছিলেন এবং বৈদিক মন্ত্র সকলের চুলচেরা অর্থ করিয়া “ব্রাহ্মণ” সকল রচনা করিতেছিলেন, আর মুখস্থ করিতেছিলেন এবং জাতিভেদটাকে এমন পাকা-ইচ্ছা তুলিয়াছিলেন, যাহার চাপে দেশ “ব্রাহ্ম মধুসূদন” বলিয়া ডাক ছাড়িয়াছিল। তাই বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইলেন। এই মহাকাব্য সাধনের জন্ত আৰ্য্যজাতির মত একটা মনস্বী জাতির পাঁচ শত বৎসরের বেশী কিছুতেই লাগিতে পারেন না। ইহার বেশী লাগিয়া থাকিলে আৰ্য্যজাতির আৰ্য্যত্বের গৌরব নষ্ট হইবে। কেন না, মন্ত্র ও “ব্রাহ্মণে” যে বিভাবুদ্ধির পরিচয় আছে, তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হয় এবং আৰ্য্যজাতির আর এক শাখা ঐ-সময়ের মধ্যেই এই কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। আজও বিগম ছাড়িয়া যদি আৰ্য্য-

গণের ভারত প্রবেশের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বাহ্য আছে, তাহার দিকে দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলেও বুঝা যায় যে, তাহাদের ভারত প্রবেশ কাল খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর ওপারে বাইবে না। প্রত্যক্ষ বৈজ্ঞানিক অনুমান যখন একই কথা বলে, তখন তাহা অগ্রাহ করিয়া গৌরবের হানিকর কোনও আঘাতে সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করিতে বাধ্য নই। তার পর, সমগ্র গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে সমগ্র হিন্দু সভ্যতার তুলনা করিলেও এক কথা প্রমাণিত হইতে পারে। কোন কোন বিষয়ে হিন্দু সভ্যতা গ্রীক সভ্যতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, একথা যেমন ঠিক, আবার এমন কোন কোন বিষয় আছে, যাহাতে গ্রীক সভ্যতা হিন্দু সভ্যতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, একথাও তেমনই ঠিক। মোটের উপর উভয়কে সম শ্রেণীর ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, যদিও জগতের পক্ষে উপকারিতা ও কার্য্যকারিতার গ্রীকো-রোমান সভ্যতা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, ইহাই পণ্ডিতগণের মীমাংসা। আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত গ্রীকো-রোমান সভ্যতার পূর্ণপরিণতিতে নানাধিক বার শত বৎসরের বেশী লাগে নাই; আর হিন্দুর লাগিল কত? শতকে লক্ষ নিলেও কুলায় না। সত্যবদ্ধ বাবুর কথা ছাড়িয়া দিয়া বিজ্ঞান মহাশয়ের কথা ধরিলেও লক্ষের কাছাকাছি। যাহারা এইরূপ ভাবে হিন্দুর গৌরব রক্ষা করিতে ব্যস্ত, তাহারা হয় মনে করেন, আৰ্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া পঞ্চদশকূলে নিশ্চিন্ত মনে ভেরেণ্ডা ভাজিতেছিলেন, মাঝে মাঝে এক আধটা খই বা সুড়ী ভাজিয়া উঠিতেছিল, যুগ যুগান্তর ধরিয়া তাই কুড়াইয়া তাহারা একধামা সভ্যতা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন; না হয় তাহা, হিন্দুরা কুস্তকর্ণের জাত, ইহাদের ছ মাসে একদিন, তাই এত সময় লাগিয়াছে,

নতুবা বলিতে হয়, গ্রীকের তুলনায় হিন্দুর মস্তিষ্ক অতি ক্ষুদ্রাদৃশ্য ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক! তাই গ্রীকের যেখানে লাগিল পাঁচ শত, হিন্দুর লাগিল পাঁচ হাজার, দশহাজার, বিশ হাজার, পাঁচ লক্ষ, দশ লক্ষ, বিশ লক্ষ !! হিন্দুসভ্যতার বয়স বুঝির চেষ্টারূপ সমুদ্র মন্থনে ইহাই হিন্দুর পুরস্কার! "O Lord! Save us from our friends."

উপরে যে বিচার-প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে একটা আপত্তি এই উঠিতে পারে যে, হিন্দুগণ গ্রীশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং গ্রীক হিন্দুর পুত্র, তাই তাহার উন্নতি ভাড়াভাড়ি হইয়াছে— বাপকে যাহা অর্জন করিতে হইয়াছিল, পুত্র তাহা উত্তরাধিকার স্বত্রে পাইয়া সমস্ত কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। প্রমাণের ভার আপত্তিকারীর উপর যে, গ্রীশ হিন্দু উপনিবেশ। অবশ্য বিদ্যমণ্ডলীর মধ্যে এ সত্য কখনও গৃহীত হয়ও নাই, হইবার সম্ভাবনাও কম। কেন না, কোন দিক হইতেই ইহার কোন প্রমাণ নাই। বিনা প্রমাণে একটা কথা কখনও গ্রাহ্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ লক্ষ লক্ষ বৎসরের যে লম্বা চোড়া ফর্দ বাহির করা হয়, তাহার দোষ ইহাতেও আলিত হইবার নহে। বিখ্যাত মহাশয়ের লক্ষ বৎসরের ফর্দই বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ, তাহাও সত্যবন্ধু-সমুদ্রের এক কণিকা-মাত্র। তা যাক, গ্রীশে হিন্দু উপনিবেশ, সেই সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। এ মতের সপক্ষে তো প্রমাণাভাব, কিন্তু বিপক্ষে অসংখ্য প্রমাণের অসম্ভাব নাই। হিন্দুগণ কবে গিয়াছিলেন? যাইবার সময় কোন ভাষা লইয়া গিয়াছিলেন? সে সময়ে লিখন-প্রণালীর আবিষ্কার হইয়াছিল কি? অবশ্য সংস্কৃত ভাষাই লইয়া গিয়াছিলেন এবং

লিখন প্রণালীও লইয়া গিয়াছিলেন। তবে সংস্কৃত ও গ্রীকে এত বিভিন্নতা কেন? যখন কোন সভ্য জাতি উপনিবেশ স্থাপন করে, তাহার ভাষা কখনও এত বিভিন্ন হইতে পারেনা, প্রাচীন গ্রীক ও সংস্কৃতে যে বিভিন্নতা। গ্রীকেরাও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদের ভাষা গ্রীক, ইংরেজও উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে, তাহাদের ভাষা ইংরাজী। পরিবর্তন অতি সামান্য। "গ্রীশ যদি হিন্দুর উপনিবেশ হইত, তবে গ্রীক ভাষার আশ্চর্য মজ্জার সংস্কৃতির ছাপ থাকিত, প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির একটা প্রাদেশিক ভাষা হওয়া উচিত ছিল। তাহাতো নয়ই, বরং সাদৃশ্য যাহা, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। সংস্কৃতির সঙ্গে জেনের (পারসীক ভাষা) যে সম্বন্ধ, গ্রীকের সঙ্গে তাহা হইতেও দূরতর। সাদৃশ্য উন্টা দিকে ইহাই প্রমাণ করে যে, গ্রীক ও সংস্কৃত উভয়ে কোনও প্রাচীন ভাষার বিভিন্ন শাখা। পূর্বে আর্য্যগণ সেই ভাষায় কথা বলিতেন। পরে ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন ও ভাষা ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উৎপত্তি স্থান এক বলিয়া কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য রহিয়া গিয়াছে। গ্রীক-গণ পৃথক হইবার পরে পারসিকগণ পৃথক হইয়াছেন, তাই জেনের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্বন্ধ বেশী, কিন্তু তখনও সংস্কৃত জন্মে নাই এবং লিখন প্রণালীর আবিষ্কার হয় নাই। যাহা হউক, ভাষার দিক দিয়া বিচার করিলে গ্রীশ হিন্দুর উপনিবেশ, এ সিদ্ধান্ত কিছুতেই পাওয়া যায় না। বরং এই সিদ্ধান্তই হয় যে, উভয়ে এক আর্য্য শাখাভুক্ত, বহু প্রাচীন কালে বিভক্ত কিন্তু এক জন আর এক জন হইতে উৎপন্ন নহে। তাই তাই সম্বন্ধ, পিতা পুত্র সম্বন্ধ নহে। জোর করিয়া বলিলে চলিবে না: যে, লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে যাইয়া হিন্দুরা উপ-

নিবেশ করিয়াছিল, কেন না, তোমার 'যেন' ছ মাসে দিন, গ্রীসের যে ইতিহাস আছে । 'তারপর, উপনিবেশে যে সভ্যতা বিস্তারিত হয়, তার একটা প্রণালী আছে । সে প্রণালীর সঙ্গেও মিলিতেছে না । গ্রীশও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল । গ্রীশের গোরব-মুকুটের অনেক মণি উপনিবেশ হইতেই সংগৃহীত । যুরোপীয়গণ উপনিবেশ করিতেছেন । কিন্তু তাহার দেশ ছাড়িয়া গিয়া অর্কাটীনের মত উপনিবেশে সভ্যতা গড়িয়া তুলিতেছে না । যাইবার সময় বেকন' বা ডেকার্ট, গ্যালিলিও বা কোপার্নিকাশ্, কেপ্লার বা নিউটন পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতেছে না । বাহ্য দেশ হইতে লইয়া গিয়াছে, তাহাই মূলধন করিয়া অগ্রসর হইতেছে—যুবক যেমন এক হিন্দু হইতে গৃহান্তরে যাইয়া বাস করে, তেমন করিতেছে, শিশুর মতন বাড়িতেছে না । তাই ইংলণ্ডে কেল্ভিন আর আমেরিকায় এডিসন্ । তাই ইংলণ্ডে সলি, ষ্টাউট আর আমেরিকায় জেমস্ ল্যাড্ (Sally, Stout, James Ladd) । ভারতেও যুরোপীয় বিজ্ঞানের উপনিবেশ হইয়াছে, ফল—ঈগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র । কিন্তু গ্রীশে হিন্দু উপনিবেশের তো একরূপ কোন চিহ্ন দেখি না । প্রৌঢ় যাইয়া পৈতৃক সম্পত্তি লইয়া ঘরকরা করিতেছে, তাহাভো

নহেই । বঁয়ঃ দেখি শিশু খেলনা লইয়া খেলা করিতে করিতেই অগ্রসর হইতেছে । অর্থাৎ ভারতেও যেমন সভ্যতায় ক'খ হইতে আরম্ভ হইয়া হ'ক্ষ হইয়াছে, গ্রীশেও তাই, গ্রীশেও সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে, ভারতবৃক্ষের ফল সেখানে ঝরিয়া পড়ে নাই বা কলমের গাছে এক বছরেই ফল ফলে নাই । গ্রীশ ভারতের উপনিবেশ হইলে গ্রীক দর্শন থেলিস্ (Thales) হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত অবস্থার মধ্য দিয়া নব প্রত্ননীয়া মতে আসিয়া পরিণত হইত না, কিন্তু প্লতিনাস্ (Plotinus) বা ফাইলো (Philo) হইতেই আরম্ভ হইত—হিন্দুর নাটক যেমন প্রথম হইতেই পূর্ণাঙ্গ হইয়া আরম্ভ হইয়াছে, ফাইলো-প্লতিনাস্ দর্শন খ্রীষ্টোত্তর শতাব্দীতে গ্রীকোপনিবেশ আলোকজ্যোতিতে উৎপন্ন না হইয়া খ্রীষ্ট-পূর্ব সহস্রাব্দে হিন্দু উপনিবেশ (!!!) গ্রীশে আভিভূত হইত । ইতিহাসের এই সামান্য হের ফের যদি অধিগম্য না হয়, তবে বিচার পণ্ডশ্রম মাত্র । যদি কেহ একথা বলেন যে, হিন্দুগণ ভারতে মরিয়া গ্রীশে যাইয়া জন্মগ্রহণ করিতেন এবং পূর্বার্জিত সংস্কার বলে শীগ্গির শাগ্গির সভ্যতার সৃষ্টি করিতেন, তবে আমরা হার মানিয়া বিচার খতম করিলাম, যেহেতু আঘাটে কল্লনার পশ্চাতে উড়িবার শক্তি আমাদের নাই । শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ।

পৃথিবী ।

‘হে ধরণি সর্বসহা—হে শ্রামসুন্দরি !
মানবের তুমি চির আকাজকার স্থল !
তব আলো—অন্ধকার, দিবা বিভাবরী,
কঠোর সমস্যাপূর্ণ—রহস্য কেবল !

সুনীল সাগরান্বরা দীপ্ত তারাকেশ ;
চিরদিন সৌন্দর্যের সৃষ্টি অভিনব,
পলে পলে বেড়ে শোভা চারু অঙ্গদেশ,
তৃণ, তরু, লতা, শুভে কামরূপী ভব !

আনায়ে বেরিয়ে আছ হে স্বয়ম্ভবুরি,
 • তব তম্বু বিস্মৃতি সৌন্দর্য্য-বেষ্টনে ;
 তারা, শশী, ফুল, ফল হেরি মনে করি,
 সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির সার এ মরু জীবনে ।
 হেরি মহানীল-সিন্ধু—বাড়ব অনল,
 বিশাল অরণ্য, মরু, উত্তর অচল ! (১)
 অজি বহু বর্ষ গত এ নর-জীবনে,
 নজিয়া তোমার তব্বি আছি অচেতন ;
 আলোকের আধারে কিষা শয়নে, স্বপনে ;
 চিরমুগ্ধ হেরি তব শ্রামল বরণ ;
 যায় যত মাস বর্ষ, তত মনে হয়,
 শোভার উপরে শোভা ঘনাইয়ে রবে ;
 কুহুম-কুন্তলা তব রূপ মধুময় !
 চিরদিন ভাবকের প্রাণ কাড়ি লবে ।
 এমনি রবে গো তুমি অনন্ত-যৌবনা,
 সুধা ভরা কবিত্বের চিরপূর্ণ খনি,
 এমনি মধুর ভাবে রবে গো মগনা,
 বিধের ললাটে স্নিগ্ধ তারারূপ মণি ।
 তোমার হৃর্ভেদ্য দৃঢ় মোহের বন্ধন,
 খুলিতে হুর্লল জীব অন্ধ অচেতন । (২)
 সেই কোন্ গত্যুগ—নহি জ্ঞাতীয়র,
 অকুরিত নররূপে অজ্ঞান জীবন ;
 যুগ যুগান্তর গত জন্মজন্মান্তর,
 কোথা অতীতের স্মৃতি চির স্মৃশোভন !
 নিঃশব্দে নিশীথে মৃদু শিশির বর্ষণে,
 প্রভাতে পাবাণ বুক হয় স্মৃশীতল !
 অলক্ষ্যে সন্ধারে তব দেহরস বনে,
 যে অমৃতে বাঁচে এই মর্ত্য-জীবদল !
 কোথা সে লুকান মর্ম্মস্পর্শী শক্তিকণা,
 পর্কিত পাষাণে হয় ঘন ভূকম্পন !
 নিশ্চল শবের সম বিগত চেতনা,
 লতে কোন্ অহুত্ব—নব জাগরণ !
 রসরক্ত প্রবাহিত অগ্নি নজ্জা মেদে,
 ও জড় মৃত্তিকা বাঁধি আছি কি অভেদে ! (৩)
 বিলোল লহরীময় সিদ্ধ বিলোড়িয়া,
 উজ্জ্বল শৃঙ্গ তুলি উঠে শৈলরাজ ;
 সে জড় চৈতন্যরূপী অনন্ত মথিয়া ;
 ক্রভঙ্কে গণিছে নিত্য জ্যোতিক সন্মাজ !
 ভেদী স্বচ্ছ সরবসু নথর যুগালে,
 মুহূর্ত্ত সমীর স্পর্শে দোলে শতদল ;
 কি কিপ্র তড়িত-লজ্জা সৌন্দর্য্যের আলো,
 আলোকে উজ্জল করে বিমান অকল !

• তরুকা স্বপ্ন নভে বিতরি কিরণ,
 • শোভে দীপ্তরূপে সন্ধ্যার কুন্তলে ;
 লইয়ে অরুণকান্তি—বাস বিমোহন,—
 গোলাপ কুমল কত ফোটে দলে দলে ।
 সূর্য্যের কিরণ যথা ব্রহ্মাণ্ড কায়ায়,
 তেমতি সৌন্দর্য্য-জাগ বেষ্টিত তোমায় ! (৪)
 জীবন্ত সৌন্দর্য্য কত—সংখ্যা নাহি তার,
 সময়ে সকলি ভবে হয় জ্যোতিমান ।
 সুন্দর সে প্রজাপতি—ইন্দ্রবরু হার,
 ঋপদ স্নিগ্ধ দেহ সবি দীপ্তিমান !
 প্রান্তরে শ্রামল শম্প বনশ্রমণ,
 মরি কি সৌন্দর্য্যে ভাসে হয়ে স্মৃশময় !
 তাজ গভবাস বিধে রাই এক পল,
 মোহি আঁখি কাঁট কত হয়ে যায় লয় !
 হরন্ত আকাক্ষা লয়ে মর্ত্য-জীবগণ,
 মুহূর্ত্তের সজীবনী গতিতে উদ্যম ;
 অনন্ত জড়ের রাজ্যে গিরি নদা বন ;
 সৌন্দর্য্য মরিতে বৃকে গণিছে প্রমাদ !
 সূর্য্য পুলির নত দেহেরে গুহার,
 দিতেছে ছড়ায়ে সবে অস্তে আপনার । (৫)
 অগীম শক্তি তব হিয়া কেন্দ্রে হ'তে,
 উজ্জ্বলিত শতধারে জীবের হিয়ার,
 প্রতি দেহে প্রতি রূপে কতশত নভে,
 প্রজ্জ্বলিত তেজবহু মতা-আকাক্ষায় !
 নাহি বিধে অবসাদ—শুধু কক্ষরত,
 বিধির বিশাল সৃষ্টি নিজ নাহিমায় ;
 কেন তবে মম ছাদি চিরসংজ্ঞা হত !
 আমি কি কোথাও গোহ তাজিয়ে তোমায় ?
 কোথায় অতিহু—কিছু নাহি নিদর্শন,
 লুপ্ত স্মৃতি অতীতের বিস্মৃত আঁধারে ;
 আছে কি লুকান কোন নিহিত ভূবন,
 শৃঙ্খলিত জীব-আত্মা রুদ্ধ-দাদাগারে ;
 চূর্ণ বণ, চূর্ণ স্মৃতি, অজ্ঞাত চিন্তার,
 কি সংযোগ লয়ে গ্রাহি তোমার নামায় ! (৬)
 কোথা উবা কোথা সন্ধ্যা কোথা দল পল,
 পৃথিবী ! আমার কোথা চিন্তার বিভ্রাম !
 সত্য-চিন্তার তাপে মরম বিকল,
 চিন্তায় ভূবেছে মোর স্মৃতি অভিরাম !
 কেমনে চিন্তার চিতা হবে গো নির্দীপ,
 চিন্তায় বিগত বুক—মহা মরুময় ;
 ধরেছি হুর্লল ছেদে কি মহাশয়ান,

জীবন, যৌবন, মন সবি ভ্রমময় ;
বৃদ্ধ ও আত্মার তব নিগূঢ় প্রকৃতি ।
অপূৰ্ণ মানবত্ব রহস্ত-জড়িত ;
ঐতিক স্রবের তৃষ্ণা—মর্ত্যবাস-স্বতি,
নখর জীবনে চির বন্ধ, আলি-স্থিত !
পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ, হর্ষ ও বিষাদ,
নির্ণয় করিতে সদা গণি যে প্রমাদ ! (৭)

ও তব প্রভাত নাহি হেরিলে নয়ন,
খুলি শত রুদ্ধ উৎস চিয়া উচ্ছ্বসিত !
হে আত্মা'জ, আত্মকাস্তি-নেত্র-বিমোহন !
জুড়ায় জীবন তাপ—এ ব্যথিত চিত ।
মোর পূৰ্ব্ব জনমের স্মৃতি সমুজ্জ্বল,
রহেছে জড়িত তব মধুনঃঅধরে ;
শোভিছে সরসে কিবা নলিনী কোমল
চিৎর চ—কিবা কাস্তি কদম্ব-কেশবে !
যেন কোন মধ্য বিশ্ব বক্ষ বিদারিয়া,
কক্ষ-ভ্রষ্ট তারা কোন অর্থ সন্ধানে,
লইয়ে বিদগ্ধ তুষা পড়ে আছাড়িয়া ;
তেমতি টেঁচে প্রাণ চাহি তব পানে ;
কোন দ্রাক্ষাচাত রস—এ তীব্র মদিরা !
মানব অীর চির—মানবী অধীরা ! (৮)

যথা রক্ষে তন্তুজালে গুটিকার গতি,
লভিয়ে চেতনা পুনঃ রুদ্ধ হয়ে ক্ষণ,
বাহিরায় নববেশে হ'য়ে প্রজাপতি,
তেমতি কি লোকান্তরে মানব জীবন ।

আবার কি ধরাযুগ হেরিবে নয়ন,
আবার ফুটিবে কি এ স্মৃতি-শতদল !
আবার কি স্মৃতিভরা হেরিব স্বপন !
বহাইয়ে উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ ঢকল !
জীবন কি জন্মমৃত্যু ঋতু আবর্তন !
কর্ম্মশূণ্যে স্রব্ধে দুঃখে আলোকে ছায়ার !
মর্ত্যপথ পাছশালে আগম নির্মম,
কেন হায়-নিরন্তর লয়ে জড়কার !
হে বরমোহিনী কোন মোহমন্ত্র বলে,
ভূলায়ে রেখেছ এই মানব মণ্ডলে ! (৯)

তুমি বাহুকরী আমি ক্রীড়ার পুতলী,
বা' ইচ্ছা কর গো মোরে ধরি' অবহেলে ;
মম আত্মা-বীন কালতড়াগে কেবলি,
ও স্রব্ধে গ্রথিত হ'য়ে অবিরাম খেলে ;

কি ছিহু কোথায় আছি ভ্রমবিরা না পাই,
ভ্রমি শুধু অন্ধকারে লয়ে এ জীবন ;
উত্তাল জ্ঞানের সিঁদু' আদি অন্ধ নাই,
তরঙ্গে যেতেছি ভেসে তুণের মতন ।
ধরিণি ! ধরেছ মোরে, নাহি দাও ধরা,
দেছ শুধু বিষভরা মরম বেদন ;
করেছ সাথের সাথী আধি ব্যাধি জরা,
নিবিড় আধারে ভরি' আত্মা-নিকেতন !
আশানৈকিতে শেষে মোর ভ্রমস্বপ্নে,
কি শক্তি বিকাশ নব হবে কোন রূপে ! (১০)

আশার জীবন-সরে সোণার নলিনী ;
দীপ্ত-রোদ্র করে স্নান মাধুর্য্য বিমল,
কভু দেবীরূপা কভু কাল চণ্ডালিনী,
কভু সুধামুত লভি কভু হলাহল !
কভু বরষার নীল ঘন বোরঘটা,
কভু শরতের হাসি—জ্যোৎস্না স্তম্ভর ;
বসন্তের স্বর্ণপত্রে সিন্দূরের ছটা,
সমুজ্জ্বল স্নিগ্ধ কাস্তি আনন্দ লহর !
কত স্মৃতি বিজড়িত তোমার মাঝারে,
রহিল আমার এই নখর জীবনে ;
রব যবে অতীতের বিস্মৃতি আধারে !
হেরিব প্রেমতে তোমা তুষিত নয়নে !
বুকভরা প্রাণভরা এত ভালবাসা,
লভেছি তোমাতে বাঁধি দু'দিনের বাসা ! (১১)

আমি ভুলিবনা কভু থাকিতে জীবন ;
ও দীপ্ত অরুণরাগ করুণ অধরে ;
লতাপুষ্পজজালে অঞ্চল শোভন !
তারকা হীরকদাম সুনীল অধরে !
কানন কুসুম মুখে মৃত মৃদ হাসি,
নিশ্খলা নদীর গতি মন্থর গমনে ;
জীবনে মরণে আমি কত ভালবাসি
পিককণ্ঠে মধুগীতি প্রভাত কুঞ্জে !
রেখো স্মৃতি সৌন্দর্য্যের মেদিনী স্তম্ভরি !
রেখো প্রেমমুখা বৃকে চির নিরমল ;
রেখো দীপ্তি জ্যোতির্ময়ি ! দিবা বিভাবরী,
জন্মে জন্মে জীববৃকে আশার সঞ্চল !
ধরিত্রি ! বিশ্বের শক্তি তব মৃত্তিকায়,
নখর জীবন-স্মৃতি জাগ্রত আত্মায় ! (১২)

ত্রীনগেন্দ্রনাথ সোম ।

বঙ্গের গৌরব ও অনাভিষিক্ত নেতা রমেশচন্দ্র ।

আগমন—কলিকাতা, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ, ১৩ই আগষ্ট ।

ছুড়িক-সেবা—১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ, নদীয়ার ভীষণ ছুড়িক ।

প্রাবন-সেবা—১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ, বরিশালের অন্তর্গত দক্ষিণ সাহাবাজপুর ।

তিরোধান—বরোদা, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ, ২২শে নবেম্বর ।

কেহ আসেন হাসিতে ও হাসাইতে, কেহ আসেন কাঁদিতে ও কাঁদাইতে, কেহ আসেন চলিতে ও চালাইতে এবং এই জগতে কেহ আসেন উঠিতে এবং উঠাইতে । জগতে যাহা, ভারতেও তাহার আভাস পাওয়া যায় এবং ভারতে যাহা সম্ভব, এই বঙ্গে তাহারই প্রদীপ্তি । জগতে এবং ভারতে চিরকালই মহাপুরুষের অভূতখান হইয়াছে । এবং এই বঙ্গে ? শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামমোহন কি যুগ-প্রবর্তক মহাপুরুষ নহেন ? আবার বিজ্ঞানাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ ? ইতিহাস এ কথাব প্রকৃত উত্তর রচনা করিতেছে ।

বঙ্গের যে যুগ-প্রবাহ আমাদের চক্ষের সম্মুখ দিয়া চমকিয়া চলিয়া গেল, এ যুগ-প্রবাহ সামান্য নহে । এই বঙ্গে এমন সর মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন, যাহারা আজীবন নিজকে, দেশকে ও দশকে উঠাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । জীবিতদের কথা বাদ দিলেও, যে যুগে মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র মহাকবি; দীনেশচরণ, নিত্যকৃষ্ণ ও বিহারী-লাল গীতি-কবি; রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র ধর্ম-প্রবর্তক; রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ ভক্ত ও সাধক; রসিককৃষ্ণ, রামদেব ও রাজনারায়ণ সমাজ-সংস্কারক;

বিজ্ঞানাগর, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র গল্প-লেখক; দীনবন্ধু, রাজকৃষ্ণ, উপেন্দ্রনাথ নাট্য-লেখক; রাজকৃষ্ণ, রাধেচরণ, রামদাস ঐতিহাসিক; ধর্মমতা, বিদ্যাসাগর, তারক-প্রামাণিক দাশ; রামগোপাল, হরিশচন্দ্র, কৃষ্ণদাস রাজনীতিজ্ঞ; আনন্দমোহন, উমেশচন্দ্র, মনোমোহন স্বদেশ-সেবক; কালীচরণ, প্রতাপচন্দ্র ও লালমোহন বক্তা; শম্ভুচন্দ্র, লালবিহারী, নগেন্দ্রনাথ ইংরাজি-লেখক; সে যুগ অসামান্য নয় কি ? বঙ্গের উপর দিয়া যে যুগ-প্রবাহ চলিয়া যাইতেছে, তাহাই তাহার তুলনা নাই ।

আমরা ভাবিতেছিলাম—তিনের মিলন, তিনের কাহিনী, তিনের অনিন্দিত বাংলা-চরিত্রের কথা । সহ, রজঃ, তমঃ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া তিনের কথা ভাবাই এদেশের চিরন্তন প্রথা । তিন তিন করিয়া ভাবিতে ভাবিতে বঙ্গের আরও তিন আমরা উপনীত হইলাম । এক পথে তিন পথিক, এক শাখায় তিন পাখী, এক রথে তিন সারথী, এক ক্ষেত্রে তিন কৃষক । পাখীরা অপূর্ণ সঙ্গীত গাহিল, সারথীরা অপূর্ণ ভাবে রথ চালাইলেন, কৃষকেরা কণ্ঠক্ষেত্রে অপূর্ণ কার্য সম্পন্ন করিলেন । বঙ্গ এবং সেই বঙ্গে ভারত নব-সঙ্গীতে মাতিয়া উঠিল, নৃতন

সেপান প্রচীত হইলে, বঙ্গ ও ভারত ধনধান্যে
শোভিত হইয়া উঠিল। তিনের একজন
Judas Iscariotএর স্থান Lost Prophet,
কিন্তু আর দুইজন মহামহিমায়িত স্বরে “মাতৃ”
নাম উচ্চারণ করিলেন, আর দেশ জাগিয়া
উঠিল। সে স্বর শুনিয়া আমরাও ঘুমের ঘোর
হইতে জাগিয়া উঠিলাম,—চাহিয়া দেখি,
তাঁহাদের একজন “বর্গে”—প্রয়াণ করিতে-
ছেন ! কি জানি কেন, আমাদের জনমনে ধারা
বহিতে লাগিল। হার বিধাতঃ, এ কি হইল !

সেই একজন কে ? লিখিতে চাই, কিন্তু
আজ অর লেখনী সরে না। তিনি এমন
একজন, যাহার তুলনা এ বঙ্গের কুরাপি
একাধারে মিলে নাই। তিনি এক কথায়
এদেশের সফল নেতার সার-চুষক, তিনি
বঙ্গাঙ্গীর গোঁরব, মাতৃসেবার অপ্রতিদ্বন্দ্বী
সম্রাট, অমলভিত্ত নেতা রমেশচন্দ্র।

বনোদী ভারতের সুখ-স্বপ্ন। মল্লার রাও
শুইকোয়াড় যখন নির্ধারিত হইলেন, ভার-
তের সর্বপ্রণয়ী লোক সাশ্রমেত্রে বিধাতার
দিকে চাহিয়া প্রার্থনার লিপি প্রেরণ
করিল। সেই অগণিত এবং অলিখিত প্রার্থ-
নার ফলে এক অজানিত শিশুর পরিণতিতে
দেবতার আবির্ভাব হইল। রাজার বেশ
ঠেলিয়া ফেলিয়া সে স্বদেশ পেম ভূষণে ভূষিত
হইল। সে কি বলে, কি করে, ভারত আজ
দিবারাত্রি তাহাই জানিবার জন্ত লালায়িত।
আর অন্তেরা ? তাহারা নাকি কত কি হু-
স্বপ্ন দেখিতেছে ! দেখিতেছে, দেখুক,—
দেখিতে দেখে।

বরোদা—ভারতের নব আশা। সেই
আশার বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিতে-
ছিলেন, অসেচক রমেশচন্দ্র ! হায়, তাঁহার
উত্তরোপানে আজ যে বর্ষে, শুধু বঙ্গ কেন,

ভারতে যে হাহাকার-ধ্বনি উখিত হইবে,
কিছুই বিচিন্তন নহয়। ভারতের যে সর্বনাশ
হইয়াছে,—তাহা কখনও নিরাকৃত হইবার
নয়।

রমেশচন্দ্র কে ছিলেন এবং কি ছিলেন,
নানা জানে, নানা কথায়, নানা ভাষায়, নানা
গাথায় তাহা ঘোষণা করিতেছে। ভারতের
কত জাতি, কত জাতির কত ভাষা—সব
জাতির সব ভাষা আজ হাহাকারে পূর্ণ !
ভারতের বহু ঘটনার সহিত যে জীবনী বিজ-
ড়িত, সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে তাহা নিবন্ধ হইবার
নহে, কালে তাহা অভিব্যক্ত হইবে। রমেশ-
চন্দ্রের বাহিরের পোষাক দেখিয়া ইংরাজ
ব্রহ্মে পড়িয়া ভাবিত—তিনি বুঝি তাহা-
দেরই সহচর—গোলাম, পদলেহক। ভাবিত
এবং উৎফুল্ল হইত ! কিন্তু কর্জন বুঝিয়া
গেলেন—এ শীমান্ত বিষধর নয়—এ বৈরী
অসাধারণ ! ইংরাজগণ বুঝিয়া শেষে গাহি-
লেন—“Mr. Romesh Chandra Dutt
belonged to the best type of the
Indian gentleman, steadfast in
loyal service to the State,—giving
freely of his best both to the
Government to which he owed so
much, and to his race of which he
was so proud.” 1. D. Dec., 1909.

রমেশচন্দ্রের বাহিরের পোষাকের মধ্যে
লুক্কায়িত ছিল, এমন একখানি খাঁটি স্বদেশ-
প্রেম-পূর্ণ হৃদয়, যাহা নিত্য স্বদেশের হৃৎথ দারি-
দ্র্যের কথা চিন্তনে ত্রিমাণ থাকিত। তিনি
মৈমনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট—সীমারে উঠিয়া এক
মুন্সেফ সহযাত্রী পাইলেন। মুন্সেফ বাবু
ইংরাজীতে কথা বলিতে লাগিলেন—রমেশ
বাবু বলিলেন—“দেখুন—আমরা বাঙ্গালী,
আমাদের একটা ভাষা আছে, আফিসে
ইংরাজি বলিতে হয় বাধ্য হইয়া, ঘরে, পথে,
বাজারে কেন আমরা ইংরাজী বলিব ?” মুন্সেফ

বাধু সে কথা শুনিয়া অবাক্ । চাহিয়া দেখিলেন, রমেশ বাবুর চক্ষু জলে ভাসিয়া গিয়াছে । বুঝিলেন—“স্বদেশ” এবং স্বজাতি-প্রেম দেহ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট । তিনি মোহিত হইলেন ; মুখে আর কথা সরিল না, লজ্জায় মুতবৎ হইলেন । ইহা ত একটা সামান্য ঘটনা । এইরূপ কত ঘটনা জানি । কিন্তু সে সকল লিখিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে বা ব্যক্তি-জড়িত-সম্বন্ধ প্রচার করিতে ইচ্ছা করি না । ঐ একটা ঘটনায় প্রকাশিত হয়—তাঁহার স্বদেশ-প্রেম কত গভীর, কত উজ্জবগাহ । এই স্বদেশপ্রেমই রমেশচন্দ্র বাঙ্গালার গৌরব ।

বাস্তবিকই রমেশ চবিত্র—প্রহেলিকাময়—ছবগাহ । কোন্ কাব্য কি জন্ত করিয়াছেন, তাহা কখনও ব্যাখ্যা করেন নাই—শুধু করিয়াই গিয়াছেন । উল্লঙ্ঘন বা উৎকম্পন তদীয় জীবনে কেহ কখনও দেখে নাই—যেন অবাত-কম্পিত প্রদীপ । এক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অমূসরণ করিতেই ভালবাসিতেন । সমুদ্র-যাত্রার সপক্ষে মত প্রচার করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে অনন্ত-দাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, ঘোর প্রতিবাদ আন্দোলন সত্ত্বেও, ঋণেদের অমূবাদ করিয়া রমেশচন্দ্র, তেমনি, অলস তেজ-স্কুরিত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন । তিনি যেন অবাত-কম্পিত প্রদীপবৎ ছিলেন । তিনি আদর্শ সমাজ-সংস্কারক—এই কার্যে তিনি কাহারও অপেক্ষা হীন নহেন । তিনি কায়স্থ হইয়াও একটা মেয়েকে বৈদ্যের সহিত ও আর একটিকে জনৈক আসামী উদ্রলোকের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজে পুত্রের বিবাহ দিয়া, এই গুণের চরম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন ।

দ্বয়ার তিনি ছিলেন যেন দ্বিতীয় বিজ্ঞা-সাগর । বড় ঘরের ছিলে, বড় চাকরী করেন, তবুও গরীক কাকালের জন্ত ব্যাধিত, চিন্তিত । কোথায় কোন্ লোক জলে ভাসিয়া যাইতেছে, রমেশচন্দ্র রক্ষার জন্ত ছুটিতেছেন ; কোথায় কোন্ লোক দ্রুতগতি প্রাণ দিতেছে, রমেশচন্দ্র ধাবিত হইয়া সেখানে যাইতেছেন । আমরা মহীয়শ্বের প্রধান নিদর্শন মনে করি, দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি । এই এক গুণে বিবেকানন্দ এদেশে অমর হইয়াছেন । তিনি বলিতেন, “তোমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম সব তুচ্ছ, যদি দরিদ্র কাকালদের জন্ত তোমাদের প্রাণ না কান্দে ।” দরিদ্র কাকালগণ যে বিশ্বপতির নিভৃত কঙ্কের একমাত্র সাধনা । খ্রীষ্ট বলিতেন, খ্রীষ্টী-ছিন্নের ভিতর দিয়া উষ্ট্রের গমন সম্ভব, কিন্তু ধনীদের স্বর্গে যাওয়া সম্ভব নয় । খ্রীষ্ট ছিলেন কাকাল-সখা, চৈতন্য ছিলেন দরিদ্র-বন্ধু, এবং বিবেকানন্দ ছিলেন, কাকালের ভাই । আমরা দুঃখেননিভ শয্যায় আরামে দিন কাটাই, আর কত কত দরিদ্র অনাহারে প্রাণ বিসর্জন করে ! এখানে কয়জন দরিদ্রের বন্ধু পাওয়া যায় ? অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠিতা, ভারতের জর্জমূল্য সাধু প্রাণকৃৎ দত্ত * স্বর্গে গিয়াছেন, অনাথগণ আজ কাঁদিয়া বক্ষ ভাসাইতেছে, কে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে ? ভারতের বার্ণারডো, আত্মরাত্রের সাধু আনন্দ মোহন বিশ্বাস শিশুদের ক্রন্দনে কর্ণপাত করেন । যেখানে সম্মান ও যশের কুহক, সেখানে অনেক লোক ছুটিয়া থাকে, কিন্তু কাকালগণ চির অস্পৃশ্য, সদা ঘৃণ্য, নিত্য-পরিভ্যক্ত ! রমেশচন্দ্র এদেশের দারিদ্র্য সমস্ত ।

* আগমন—দরজিগাড়া, ১৮৫১ খ্রীঃ, কেক্সারি, তিয়ো-
ধান—অনাথালয়, ২৬শে নবেম্বর, শুক্রবার, ১৮৫১ ।

বীমাংসার জন্ত আজীবন খাটিয়াছিলেন; দক্ষি-
ত্রদেশের রক্ষার স্বত্ব চেষ্টা করিয়াছেন,* এই জন্ত
আজ আমরা তাঁহার তিরোধানের চক্ষের জল
ফেলিতেছি। রমেশচন্দ্র দত্তের প্রকট মূর্তি—
যেন দ্বিতীয় বিজ্ঞানাগর এবং বিবেকানন্দ।
এই জন্তই, বুঝিবা, তিনি বরোদার দেওয়ানী
লাইয়াছিলেন।

গ্রন্থকার রূপে রমেশচন্দ্রের যে প্রতিভার
ক্ষুরণ হইয়াছে, তাহাও তুলনা রহিত। তুলনা-
রহিত এই জন্ত যে, তিনি একাধারে বাঙ্গালা
ও ইংরাজি ভাষার সুলেখক। তাঁহার জ্ঞান
অধ্যয়নশীল লেখক এদেশে আর অভূদিত হয়
নাই। তুলনা-রহিত এই জন্ত যে, তিনি ব্যবসার
খাতিরে সাহিত্যের পরিচর্যা করেন নাই, দেশকে
তুলিবার জন্ত সাহিত্য-সেবা করিয়া গিয়াছেন।
বাঁহারা সাহিত্যকে অর্থ্যাগমের উপায় স্বরূপ
অবলম্বন করেন, তাঁহা বা চুটকী সাহিত্যের
চর্চা করেন, স্কুল-পাঠ্য পুস্তক লেখেন, লোক-
সাধারণ যে পথে যাইয়া মরিতেছে, সেই পথেই
তাঁহাদিগকে চালিত করেন, চতুর্দিকে বাহা বা
পড়িয়া যায়—গ্রন্থকারের বাস্তব অর্থের পূর্ণ হয়।
তিনি ভারতবর্ষের স্কুলপাঠ্য একখানি ইতি-
হাস লিখিয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রম বুঝিয়া তাহা
পরিত্যাগ করেন। “শতবর্ষ”—তাঁহার বৃকের
রক্ত দ্বারা রচিত,—উঠিতে বসিতে শুইতে
তিনি যে চিন্তা করিতেন, উহার পক্ষে পক্ষে
তাঁহার প্রতি-ছায়া। আর Ancient India ?
আর Economic History of India ?
আর History of Bengalee Literature ?
আর The slave girl of Agra.

* In his earlier years in his well-known book “The peasantry of Bengal,” Mr. Dutt had taken up the cause of the ryot of Bengal, and the introduction of the Bengal Tenancy Act of 1885, is ascribed to the cogency with which he set forth the necessity of giving the tenant protection against the cupidity of the Zemindar. U.M. 5th, Dec, 1909.

এসকলই তাঁহার প্রদেশ-প্রেমের জলন্ত কীড়ি।
এদেশ কি আর জাগিবে না? পূর্ব কথা
স্মৃতি-পথে-তুলিলে যদি কুন্তকর্ণের জাতির
নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই জন্ত কত পরিশ্রম ও কত
যত্নে প্রাচীন কথা লিপিবদ্ধ করিলেন। কি
গভীর গবেষণা—যেন দ্বিতীয় রামমোহন।
কিন্তু পড়িল কয়জন? পড়ুক বা না পড়ুক—
সাধকের সাধনার পথ পরিবর্তিত হইল না।
জ্ঞেতা-জিতের সম্বন্ধকে হৃদয় ভিত্তির উপর
প্রতিষ্ঠিত করিতে নিয়ত সচেষ্ট রহিলেন।
তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে অকাটা যুক্তিতে যে
সকল প্রস্তাব লিখিয়া গিয়াছেন, ভারতের
উদ্ধারের কথাতে তাহা পরিপূর্ণ। সে সকল
পড়িতে বসিলে মনে হয়—এদেশে এমন অপ্র-
তিদ্বন্দ্বী নেতার আর অভূদয় হয় নাই। কৃষ্ণ-
দাস, রামগোপাল, হরিশ্চন্দ্র—সকলকে তিনি
পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে সকল
বিশৃঙ্খল কথার স্থান এ নহে।

ইংরাজ জানিতেন, রমেশচন্দ্র বিপক্ষে
থাকিতে আর স্বেচ্ছা-সাধনের উপায়
নাই। উপাধি বর্ষণ দ্বারাও যখন তিনি
হস্তগত হইলেন না, তখন ইংরাজ বিলাতে
মহা সম্মানের কাজ দিলেন; কিন্তু সিংহ-শিশু
তাঁহাতেও বাঁধা পড়িল না। ফিরিয়া আসিয়া
আবার ভারতের উদ্ধারের চিন্তায় জীবন
ঢালিয়া দিলেন। ভাবিলেন, একটা দেশও
যদি দেশের মত হয়, ভারতের জাগরণের
পথ খুলিয়া যাইবে। ভাবিলেন, একটা দেশের
প্রজাকুলেরও যদি দারিদ্র্য ঘুচে, দৃষ্টান্তের দ্বারা
দেশ জাগিবে। ভাবিয়া আবার বরোদায়
গেলেন। কিন্তু হায় বরোদা, হায় ভারতবর্ষ—
তোমাদের চিন্তা-জরে পীড়িত হইয়া মদো-
সারথী আজ প্রাণ বিসর্জন দিলেন! আর শুই-
কোরাড়?—ভারতের আশার স্বপ্ন, নিভৃতের

চিন্তা, সকল দৃষ্টির সম্বর দৃষ্টি—রমেশচন্দ্রের কল্প-বৃক্ষের অমৃত ফল আজ কি অবস্থায় রহিয়া-ছেন ? চক্ষের জল-পূত-বিশালব্যাপী নীরবতা আজ সে কথার উত্তর দিক্ ।

তিত্তি কল্পেদের সভাপতিরূপে যে স্থবি-স্থত বক্তৃতা দিয়াছিলেন, এদেশের আদর্শ বক্তাদেরও তাহা অযোগ্য নয়। তবে একথা ঠিক যে, কেশবচন্দ্র, লালমোহন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বক্তাদের সমতুল্য যশ তিনি পান নাই । কিন্তু গবেষণায় তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ।

আর একটা কথা বলিবার আছে—এই নিদারুণ শোকের দিনে, আপাততঃ তবেই আমাদের সকল কথা শেষ হয় । কৰ্ম্মক্ষেত্রে তিনি যে আজীবন খাটিলেন, তাঁহার সঞ্চল ছিল কি ? ইংরাজের ক্রকুটীকে তিনি যে অগ্রাহ করিলেন, তাহার সহায় ছিল কি ? লোকেরা বলে, সহায় ছিল সন্দেহ । আমরা বলি, সহায় ছিল তদীয় পুত্র চরিত্র । বিশ্বাস-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া তিনি যে অনিন্দিত চরিত্র-রত্ন পাইয়াছিলেন, সেই চরিত্র বলে তিনি, রামমোহনের ছাত্র, অভিভাবকের অমতে, দেশত্যাগ করিয়াছিলেন—চরি-ত্রই তাঁহাকে প্যারিসে রক্ষা করিয়া-ছিল, এই চরিত্রগুণেই তিনি পরীক্ষার অসাধারণ কৃতী হইয়াছিলেন, এই চরিত্রগুণেই তিনি কৰ্ম্মক্ষেত্রের জটিল পথে, অশেষ বাধা বিঘ্নের মধ্যগত, অটলভাবে

সধীন করিতে পারিয়াছিলেন,—চিরকাল গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে চলিয়াও রাজসন্মান এবং ভীষ্মনের শেবে—সমগ্র ভারতের অনতিবিকৃত নেতৃত্ব পদ পাইয়াছিলেন । রাজার এমন মহাদু এবং প্রজার এমন বন্ধু—এদেশে আর কোন্ চরিত্রবান ? আমা-দের মনে হয়, এমন নিফলক চরিত্র এদেশের নেতাদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকই পাইয়া-ছেন । এমন মিষ্টভাষিণী, এমন অমায়িকতা, এমন নিরহঙ্কার মূর্তি, এমন সরলতা যোগী-জন-যোগ্য । তদীয় দেবোপম পুত্র চরিত্রই তাঁহাকে নির্ভীক করিয়াছিল, চরিত্রই তাঁহাকে বিষমসঙ্কল সংসারে রক্ষা করিয়াছিল এবং এই এক চরিত্রই তাঁহাকে ভারতের অগণিত, অজানিত প্রজাপুঞ্জের হৃদয়ের রাজা করিয়া তুলিয়াছিল । তাঁহার দেহ গিয়াছে, কিন্তু স্থিতি যাইবে না ;—তাঁহার হৃদ-স্পন্দন থামিয়াছে, কিন্তু কৰ্ম্মক্ষেত্রে অগণ্য মানস-পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে ;—এক কথায় চির-দিনের জন্ত তিনি এদেশে অমর হইয়াছেন । ভারতের জাগরণের ইতিহাসে রমেশচন্দ্রের দেবচরিত্র চিরকাল সম্পূজিত হইবে, ইহাই আমাদের একমাত্র সাধনা । আজ এই নিদারুণ শোকের দিনে, দেবলোকের দেব-চরিত্রের পুত্র স্মৃতি ভস্ম সর্বোদে লেপন করিয়া, সকলে একবার গগন কাঁপাইয়া বল, বন্দে মাতরম্ ।

রমেশচন্দ্র ।

বজ্রের গৌরব-রবি ভারত অশ্বরে
সহসা পড়িল ঢলি, অস্তাচলে গেল ঢলি,
বিবাদ-কালিমা ঢালি দিগদিগন্তরে !
হস্তিম মহিমা-রেখা গগনে রহিল লেখা,

ধবল প্রতিভা-রাগে উদ্দীপ্ত ভুবন ;
কীৰ্ত্তিমান, জ্যোতিমান, নিজ তেজে দীপ্তিমান,
বিদ্যা-অর্থ-বশোভাগ্যে নরে অভুলন ।
প্রতিভা-মনীষালাকে আলোকিয়া ধরালোকে,

সবার অন্তর-খনি পশিরাছে চিনে ;
জ্ঞান-হিত-আচরণে, মিষ্ট শিষ্ট আলাপনে,
বঙ্গের জন-রাজ্য লইয়াছে কিনে ।
বঙ্গের গৌরব-রবি অন্ত এত দিনে !

অথো কি দুর্দিন হেরি ভারত-মাতার,—
তার পুত্র প্রিয়তম, কর্ণে গুণে অমূল্য,
একে একে গত হয়, জগৎ আঁধার !
উমেগে অনন্দ ছুটি, মনো-লাল ভাই দুটি,
যতীন-নগেন, আদি কর্ণবীরগণ
কালের করাল গ্রাসে পশিরাছে কালবশে,
জনে জনে মাতৃ-বক্ষ করি বিদারণ !
এবে পুনঃ অকস্মাৎ মাতৃ-হৃদে বজ্রাঘাত
করিয়া রমেশ-চন্দ্র পলাইয়া যায়,—
রোগ-শোক-জরা-জীর্ণা, অত্যাচারে অতি শীর্ণা
কাঁদিছে ভারত-মাতা শোকে মৃত-প্রায় !
অন্ত গেল বঙ্গ-রবি এত দিনে হয় !!

ভারতীর প্রিয় পুত্র ভারত ভিতরে
সাহিত্য-উদ্ভানে পশি, কলত্র-মূলে বসি
রচিলা অপূর্ণ-মালা, গন্ধে প্রাণ ধরে ।
সমাজ-সংসার দুটি সমাজে সংসারে কুটি
শোভিছে, মোহিছে বস মাধবী-কঙ্কণ ;
যে বঙ্গ-বিজেতা তাঁর, বর্ণনার চমৎকার,
জীবন-প্রভাত-সন্ধ্যা স্মৃতি-সংরক্ষণ ।
বাঙ্গালার ঋগ্বেদে বাঙ্গালীর নাশে বেদ ;
ইতিহাস, রামায়ণ অপূর্ণ রচন !
তুষ্ট করি জনে জনে, আজি কর্ণ-সমাপনে,
হাসিতে হাসিতে গেল ভারতী সদন !!
অমর বাণীর পুত্র,—তবু পোড়ে মন !!!

রাজনীতি-খনি-মধ্যে উজ্জল-রতন !
যাহার আলোকে হয়, অশ্রু-দীপ্তি লোপ পায়,
থাকুক অস্ত্রের কথা বিজিত কর্জন !
কি শাসনে, কি বিচারে, সবাই প্রথমে যারে,
রাজা-প্রজা তুষ্ট সবে তায়-আচরণে ;—
কর্ণবীর, ধর্মবীর, সুবী, জ্ঞানী, স্থির, ধীর,

কি করিতে পারে তাঁরে শমনে মরণে !
লেখক, ভাবুক, কবি, বঙ্গের গৌরব-রবি,
সেবক, সাধক, বক্তা, পুরুষ-প্রধান
অগাধ পাণ্ডিত্য-প্রভা, গভীর প্রতিভা আভা,
প্রভূত প্রভুত তাজি সন্ন্যাসী সমান
অনায়াসে গেল চলি ভারত-সন্তান !

ভারত, বাঙ্গালা তাই শোকেতে আকুল ;
প্রথম বনুগ-বানী শোক-স্রোতে যায় ভাসি ;
শোকেতে বনোদা-রাজ্য কাঁদিয়া ব্যাকুল !
বরিশাল, মালদহ, কাঁদে তারা অহরহ,
চাটিগাঁ, ময়মনসিং শোকেতে বিহ্বল,
প্রেসিডেন্সি, বর্ধমান মহাশোকে মুহমান,
বিহার, পাবনা, ঢাকা, নদীয়া, উৎকল !
অই শুন কাদে চাষা, কাঁদিছে বাঙ্গালা ভাষা,
কাঁদে শিশু, কাঁদে বৃদ্ধ, যুবক-প্রবীণ ;
শোকাভূত পরিষৎ, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—
সন্তান কাঁদিবে কত তরুণ নবীন !
পঞ্জাব, বোম্বাই, বঙ্গ ভারতের জন-সজ্জ,
সুরেন, বিহারী আদি বাণ্যবদ্ধগণ,
বাঙ্গালী, মুসলমান শোকে মগ্ন খ্রীষ্টিয়ান ;
গায় তব শেখ-গাঁপা ইংলণ্ড—লণ্ডন !
ধন্য তুমি বঙ্গ-মৃত, ভারত-ভূষণ !!

যাও এবে নররাজ যাও স্বর্গধাম !
স্বর্গের দেবতা তুমি, এসেছিলে মর্ত্যভূমি
বিধির বিধানে, লভ অনন্ত ধিরাম !
ভূলে যাও তুল ভ্রান্তি, সংসারের ক্লেশ ক্লান্তি
ভুল্ল মৃত, ভুল্ল শান্তি—অনন্ত জীবন ।
রমেশ, রমেশ-সঙ্গে বিহর বৈকুণ্ঠে রঙ্গে ;
হটুক পরম ব্রহ্মে আত্ম সম্মিলন !
পবিত্র ভারতভূমি, তোমারি আদর্শ ভূমি,
আদর্শ পুরুষ-সংহ, পাত্ত মহাজন,
ধর্ম, কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি একাধারে সর্লশক্তি,
বঙ্গের অমূল্য ধন, অমূল্য রতন,
পুরিবে না হয় তব অভাব কখন !
তাই আরি অশ্রু ফেলে দীন অকিঞ্চন !
কবি কহে মৃত্যু নহে—অনন্ত জীবন !!

শ্রীকেশবলাল দাস ।

দেশীয়া শিক্ষা-প্রণালী ।

গত ১৮৬৩ সালের নবগাঁও জিলা সমিতির অধিবেশনে শঙ্কর-প্রবর্তিত মঠ স্থাপনের যে প্রস্তাব আমি উপস্থিত করিয়াছিলাম, প্রক্কা-স্পদ শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়ের অনুগ্রহে তাহা নবভারতে মুদ্রিত ও সাধারণের গোচরে উপস্থিত করা হইয়াছিল। প্রস্তাব-টার গুরুত্ব সত্ত্বে আমার দৃঢ় বিশ্বাস; এবং এ প্রস্তাবটা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বিশেষ বিবেচনার বিষয়। তজ্জন্তই ঐ বিষয়টার পুনরালোচনা করা আবশ্যক মনে করিয়া পুনরায় ইহা সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে সাহসী হইলাম।

আমি যাহা বলিতে চাই, তাহা এই :—লোক-শিক্ষাই সভ্যতা-সোপানে অগ্রসর হইবার সর্ব প্রথম উপায়। আমার মনে হয়, ভগবান ভগবদ্বীতায় গুণকর্ম বিভাগ দ্বারা চারুর্ক্য সমাজ প্রতিষ্ঠার যে কথা বসিয়াছেন, তাহা সভ্যসমাজ মাত্রেই প্রযুক্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে সভ্য সমাজকে বিভাগ করিতে হইলে প্রথমতঃ চারি ভাগ দেখিতে পাই—দাস-বাসায়ী অথবা শূদ্র, ধনোপার্জন অথবা কৃষি-জীবী ও ব্যবসায়জীবী, ধনরক্ষক অথবা ক্ষত্রিয় এবং সংযমী-পরহিতব্রত-লোক-শিক্ষা-নিরত আত্মত্যাগী শিক্ষক বা ধর্মব্রাজক অথবা ব্রাহ্মণ। যাহারা এই চারি জাতির শীর্ষ স্থানে থাকিয়া, সকলের ভক্তি আকর্ষণ করিয়া, সকল শ্রেণীর লোককে শিক্ষিত, দীক্ষিত ও উচ্চভাবে অণুপ্রাণিত করিবেন, অথচ নিজেরা নিলোভী, পরায় সংযমী ও পরহিতে রত থাকিবেন, তাহারাই ব্রাহ্মণ। যাহারা

যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া প্রাচীন ৭ সভ্যতম জাতির বংশজাত বলিয়া আশ্রয়-গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, অথচ দৈনন্দিন কার্যে লোভ-পরায়ণতা, দাস-বৃত্তিতে ঐকান্তিকতা প্রভৃতি অধম কার্যেই ব্যাপ্ত থাকেন, তাহাদিগের সহিত আমার কোন বিবাদ নাই, কিন্তু তাহাদিগকে ভারতের আদর্শ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ী বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। এইরূপ ব্রাহ্মণস্বাভিমानीরা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার এই উক্তিতে তাহাদের জাতি যাই-বেনা বা থাকিবে না; কিন্তু যে বংশে তাহার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সমাজ-পুঞ্জিত প্রাচীন আদর্শের কতটুকু তাহার রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহাদের প্রাচীন গৌরব তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে অক্ষম হইবেন, তাহা তাহার চিন্তা করিয়া দেখেন, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

জনশ্রুতি আছে, কুব্জনগরের মহারাজা তাৎকালিক নবদ্বীপের সর্ব প্রধান নৈয়ামিককে এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “গুরুদেব! আপনার অভাব কি?” তিনি অগ্নানবদনে উত্তর করিলেন “মহারাজ! আমার ত কোন অভাব দেখিতে পাই না, শাস্ত্রার্থের সুন্দর মীমাংসা হইয়া যায়।”—অর্থাৎ তিনি আর্থিক অভাবের কথা লক্ষ্যই করিতে পারিলেন না। মহারাজ দেখিলেন, গুরুপত্নীকে জিজ্ঞাসা না করিলে ইহার উত্তর পাইবেন না। গুরুপত্নীর নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “মা! আপনার অভাব

কি ?” তিনিও সহাস্তে উত্তর করিলেন “বাবা । আমার এই লোহার খাড়ু গাছা থাকিতে আমার অভাব হইবে কেন ?” মহারাজ ভাড়াভাড়ি বলিলেন “আমি আর্থিক অভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি ।” তিনি ঠিক সেই ভাবে উত্তর করিলেন “না, কৃষ্ণচন্দ্র, আমি যে চাউল পাই এবং বাড়ীতে যে তেঁতুল গাছ আছে, তাহাতেই চলে, ছাত্রদিগকে খাওয়াইয়া আমি পরিতোষ পূর্বক তাঁহার প্রসাদ পাইয়া থাকি, আমার কোন অভাব নাই, বাবা !” মহারাজ দেখিলেন, উভয়েই সমান । পুনরায় গুরুদেবের নিকট ষাইয়া বলিলেন “আমি আপনাকে কিছু হুমি সম্পত্তি দিতে চাই ।” সহাস্তে তিনি উত্তর করিলেন “না মহারাজ, আমাকে সঞ্চয়ী করাইয়া আমার পরলোক নষ্ট করিবেন না ; আর কয়টা দিন বাকী আছে, স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইবে ।” এই আদর্শ ত্যাগীই প্রকৃত ব্রাহ্মণ ছিলেন ।

উচ্চপদস্থ জনৈক রাজকর্মচারীর নিকট শুনিয়াছি, স্বাধীন ত্রিপুরার বর্তমান মহারাজার পিতামহ বা প্রপিতামহ অত্যন্ত ধনী হইয়া পড়িয়াছিলেন, এমন কি, মান সম্মান রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল । তাঁহার গুরুদেব রাজবাটীতেই থাকিতেন । তিনি গৃহী ছিলেন না । মহারাজা প্রতিদিন তাঁহার চরণ পূজার সময়ে একটি স্বর্ণ মোহর দিয়া প্রণাম করিতেন । গুরুদেব ঠাকুর ইচ্ছামত তাহা গ্রহীত্ব ছুঃখীর অভাব মোচনে ব্যয় করিতেন ; সঞ্চয়ের তাঁহার কোন প্রয়োজন ছিল না । সকলেরই তিনি বিপদের বন্ধু ছিলেন, সকলেই গুরুর শ্রায় তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিত । এক দিন তিনি মহারাজাকে বলিলেন “মহারাজ, আমাকে স্বর্ণ মোহর দিলে হইবে না, আমি অন্য কিছু চাই ।” মহারাজ জানিতেন, কিছু

তেই তিনি আসক্ত নহেন । স্তব্রাঃ তাঁহাকে অদেয় কিছুই ছিল না । তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন “আপনি বাহা ইচ্ছা করিবেন, তাহাই দিব ।” গুরুদেব বলিলেন “আমি আপনার সমস্ত সম্পত্তি চাই ।” মহারাজা ব্যাকুল হইয়া বলিলেন “আমি কোথায় যাইব ?” গুরুদেব বলিলেন “তুমি আমার প্রসাদভোজী হইয়া রাজবাটীতেই থাকিবে ।” মহারাজ বিরক্তি না করিয়া তাঁহার চরণে সর্বস্ব দান করিলেন । গুরুদেব বলিলেন “তুমি এদানের বিষয় এখন কাহাকেও কিছু বলিতে পারিবে না ; কেবল আদেশ কর যে সমস্ত কার্য্য আমারই হুকুম অনুসারে হইবে ।” মহারাজা তাহাই করিলেন । গুরুদেব ঠাকুর সদর দরজার পার্শ্বে নিজের বসিবার স্থান করিলেন । বাহার যে কার্য্য, যে দরবার, তাহা নিজে শুনিয়া সুবাবস্থা করিতে লাগিলেন এবং প্রার্থীদের নিকট মহারাজার জন্ত যথেষ্ট নজর উপঢৌকন সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । আরও তিনি প্রজার ঘরে ঘরে যাইয়া মহারাজার দায় জানাইয়া তাহাদের ইচ্ছামত সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । প্রজারা তাঁহাকে পিতার শ্রায় দেখিত ; সমুদ্রটিতে সাধামত সকলেই যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতে লাগিল । সর্বদাই বলিতেন “আমার * * * অত্যন্ত ধনী হইয়াছে, তাহার ধন শোধ করিয়া দিয়া তোমরা তাহাকে রক্ষা কর, আমি কৃতার্থ হইব ।” অনেক সময় তিনি এই সকল কথা বলিতে বলিতে নয়নজলে ভাসিয়া যাইতেন । তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া সকলে অধীর হইত এবং অকাতরে সাধামত অর্থ দানে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিত । এইরূপ দিবারাত্রি পদিশ্রম করিয়া গুরুদেব ঠাকুর, অল্পসময়ের মধ্যে সমস্ত দেনা শোধ করিয়া রাজকোষে প্রচুর অর্থ

সকল করিলেন এবং একদিন বিবরণে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি আশীর্বাদ স্বরূপ দান লিখিয়া মহারাজকে আশীর্বাদ করিলেন। মহারাজা বলিলেন “আমি দত্তাপহারী ও গুরু-সম্পত্তি হরণকারী হইতে পারি না।” গুরুদেব বলিলেন “তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণে অসম্মত হইতে পার না। ইহাতে কোন পাপ নাই; তুমিই আমার সর্বস্ব, তোমার সম্পত্তি নিজের জন্ত লই নাই; এখন আমার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পূর্ববৎ ধর্ম্মপথে থাকিয়া রাজধর্ম্ম পরিচালন কর।” ইহাই ব্রাহ্মণের আদর্শ। পুনরায় সেই পরহিত-ব্রত স্বার্থত্যাগী ব্রহ্মচর্যাবলম্বী ব্রাহ্মণকুলের আবির্ভাব করান আবশ্যক হইয়াছে। যাহারা অনাসক্ত, স্বার্থশূন্য, এমন ব্রহ্মচর্যীর আবশ্যক হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের জায় চিরকুমার মেবাত্রাধারীর অভাবে দেশ নিদ্রিত রহিয়াছে। প্রতি পল্লীতে এই শ্রেণীর সেবকের অভাব অস্বীকৃত হইতেছে। লোকশিক্ষার প্রথম স্থান পল্লীগ্রাম। প্রতি জেলায় অনুমান পাঁচ হাজার পল্লীগ্রাম থাকা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রতি দশ গ্রামের জন্ত অন্ততঃ একজন এইরূপ শিক্ষকের প্রয়োজন; অতঃপ্রতি জেলার জন্ত গড়ে পাঁচ শত জন শিক্ষকের আবশ্যক। আমার মনে হয়, ভিক্ষাজীবী এক একজন চিরকুমার ব্রহ্মচারী এইরূপ এক এক কেন্দ্রে স্থায়ী হইয়া নিজ জীবনের অলস্ত আদর্শদ্বারা লোকশিক্ষা বা চরিত্র গঠনে নিযুক্ত থাকা আবশ্যক হইয়াছে। ইহারা বালক বালিকাদিগের নিজ নিজ ব্যবসায় ও অবস্থার উপযোগী শিক্ষকতা করিবেন; রোগীর চিকিৎসা ও সুশ্রাব্য করিবেন; সংসারীদিগের আপদ বিপদে বন্ধুতার কার্য্য ও সংপরাশ্রম দান

কুরিবেন; কৃষিকীবীদিগের কৃষি শিক্ষা ও গবাদি পালনের উপদেশ দান, স্বাস্থ্যরক্ষা ও নানারূপ হিতজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন; বিবাদ-বিসম্বাদ আপোষে মীমাংসা করিয়া দিবেন। আরও এইরূপ বিবিধ লোকহিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবেন। তবেই দেশের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে। জাতীয় শিক্ষা-সমিতির নিকট আমার এই প্রার্থনা, তাঁহারা এইরূপ শিক্ষক উপস্থিত করিয়া পল্লীতে পল্লীতে প্রেরণ করেন। বহুলক্ষ লোকের মধ্যে দাসত্বজীবী হই চারি শত লোকের জন্ত ব্যস্ত হওয়া অনাবশ্যক। যাহাদিগকে মানুষ করিতে পারিলে আমরা মানুষ হইতে পারিব, তাহারই চেষ্টায় তাঁহারা প্রবৃত্ত হউন। সংসার-ত্যাগী চরিত্রবান শিক্ষক পাইলে আমাদের জড়তা দূর হইবে।

পল্লীতে পল্লীতে সেই শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিতে না পারিলে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা হইবে না। মানুষ মানুষের মত চিন্তা করিতে শিখিলে নিজের প্রকৃত অভাব সহজেই স্বপ্ন-সম করিতে পারিবে। দেশকালের যোগ্য ভাব জন্মাইতে পারিলেই মানুষ আপনায় পূর্ণ আপনাই দেখিয়া লইবে, তৎকৃত ব্যস্ত হইতে হইবে না, ইহা হইবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। শিক্ষার মূল চরিত্রগঠন এবং চারিত্রগঠনের মূল আদর্শ চরিত্রের দৃষ্টান্ত। জাতীয় ভাবে ইহার প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। প্রাচীনকালে মুনিঋষিদিগের এইরূপই ছিল; তাঁহারা সর্বত্যাগী হইয়া সর্বসম্মত নেতা ও উপদেষ্টা ছিলেন; সকল বিষয়েই শিক্ষা দিতেন, অথচ কোন বিষয়েই লিপ্ত হইতেন না। বুদ্ধযুগে শ্রমণেরা সেই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নৈতিক অবনতির সুযোগে শঙ্করাচার্য্য মঠ স্থাপন করিয়া চরিত্রবান ত্যাগী অথচ কর্ম্মীয়

সাহায্যে পুনরায় হিন্দু-যুগের অবতারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গৌরান্দেবের আশুড়া এই নিয়মেই প্রবর্তিত। কিন্তু পরে জীলোক-সংসর্গে ইহা কলুষিত হইয়া সমাজের নানারূপ অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। ইউরোপে ধর্ম-যাজকেরা এই স্থান অধিকার করিয়া দেশের প্রকৃত নৈত্ব পদ লাভ করিতেছেন। সভ্য

জগতের এই আদর্শ হারাওয়া আমরা পথহারা হইয়াছি, অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া আছি। বর্তমান সময়েও সকলিই একপ্রাণ হইয়া এই সাধনায় কৃতসঙ্কল্প হইলেই আবার আমরা মাহুষ হইয়া সভ্যজগতে স্থান লাভ করিতে পারি, ইহাতে অসুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীকিশোরীমোহন শর্মা ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

৩৩। কুঙ্গুম। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস প্রণীত, তৃতীয় সংস্করণ। এই সুন্দর পুস্তকখানি বহুদিন অমুদ্রিত অবস্থায় ছিল। সম্প্রতি তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। গোবিন্দ দাসেব কাবতা ঘরে ঘরে আদৃত হইবার যোগ্য।

৩৪। বিভাসাগর। শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য ৩।

এই পুস্তকখানির পূর্ব সংস্করণ বহুদিন পূর্বে নিঃশেষিত হইয়াছিল; নানা ঘটনায় সুদীর্ঘকাল বাজারে এই পুস্তক পাওয়া যাইত না, এজ্জ কত লোককে কত আক্ষেপ করিতে শুনিয়াছি। এত দিন পরে ইহার তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে দৌধর্য! আমরা আনন্দিত হইলাম।

নগেন্দ্রনাথ রায়মোহনের ও যোগীন্দ্রনাথ বেনন মাইকেলের জীবনচরিত লিখিয়া অমর হইয়াছেন, চণ্ডীচরণ, সেইরূপ, বিভাসাগরের জীবনচরিত লিখিয়া অমর হইয়াছেন। চণ্ডীচরণের কৃষ্ণভৈরব কথা নিত্য শ্রবণের বিষয়—কেন না, তিনি বঙ্গের উন্নতির আদি যুগের সর্বপ্রধান ব্যক্তির কাহিনী ঘরে ঘরে প্রচার করিয়াছেন। বিভাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় সহোদর শ্রীগুরু শম্ভুচন্দ্র বিহারী মহাশয় ভ্রম-নিবাস নামক এক পুস্তক লিখিয়া চণ্ডীবান্ধকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। উক্ত কার্য্য পূর্ত্ণচরিত্র বিভাসাগরের ভ্রাতার যোগ্য হয় নাই। চণ্ডী বাবু তাহা ক্ষমার চক্ষে দেখিয়া

ছেন, ইহাতে আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি। বিভাসাগরের জীবনী যে ভাষায় চণ্ডী বাবু লিখিয়াছেন, তাহা এদেশের বর্তমান ভাষার আদর্শ, যেমন প্রাজ্ঞল, তেমননি বিস্তৃত; যেমন সরস, তেমননি ভাবপূর্ণ। নিখুঁত জীবনের এই নিখুঁত জীবনালেখ্য যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই মুগ্ধ হইবেন। যে দিন এই জীবনী ঘরে ঘরে অর্জিত ও পূজিত হইবে, সেই দিন বুঝিব, ভারতের দিন ফিরিয়াছে। তাহা কি হইবে না?

৩৫। ভারতে অলকসন্দর। শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত, মূল্য ১।০। সচিত্র। পুস্তকের নামকরণ সম্বন্ধে গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—“আমাদের সম্রাট অশোক, এই নাম যে ভাবে উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এবং পরন্তগাত্রে যে ভাবে উচ্চারণ করিয়াছিলেন, আমরা তাহাই অনুকরণ করিয়া, আমাদের চিরাভ্যন্ত আলেকজান্ডার এই নামের পরিবর্তে অলিকসন্দর নাম ব্যবহার করিলাম।”

নামে কিছু আসিয়া যায় না—বিষয় বিবৃতির পারিপাট্য, সত্যানুসন্ধিৎসা ও গবেষণাই ইতিহাসের প্রাণ। শাস্ত্রী মহাশয় অনিন্দিত ভাষায় সত্যকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন কোন প্রকার পক্ষপাতীত্বের পরিচয় এ পুস্তক পাওয়া যায় না। আমাদের বিশ্বাস, শাস্ত্রী মহাশয়ের অমূল্য পুস্তকের ভায় ইহাও বিশেষরূপে আদৃত হইবে। কিন্তু লিখিতে লজ্জা হয়—পুস্তকখানি বিলাতী ক্যুগজে ছাপা।

৩৬। আখ্যানারী। দ্বিতীয় ভাগ (ঐতিহাসিক) শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম-এ ও শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত, মূল্য ১।০। উভয় গ্রন্থকারই লক্ষ-প্রাণে। যা তা না লিখিয়া এখন ইঁহারা প্রকৃত আদর্শ ধরিয়া আশাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। ভাষা এবং লিপিত্রুটি অতি প্রশংসাহ। ২৪ জন আদর্শ মহিলার কথা ইহাতে আছে। পুস্তকখান সকলের চিত্ত হরণ করবে। বিলাতী কাগজে ছাপা।

৩৭। গাথা। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস, এম-এ, বি-এল প্রণীত, মূল্য ৮।০। অবিনাশ বাবু আদর্শ গল্প-লেখক; কিন্তু তাঁহার পঞ্চ লেখাও অগ্রাহ্যের যোগ্য নয়। স্থানে স্থানে স্পষ্ট অনুকরণ-ছটা থাকিলেও পুস্তক খান বড়ই সুমিষ্ট হইয়াছে।

৩৮। সাবিত্রী। শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত, বি-এ প্রণীত মূল্য ৮।০। সুন্দর বিলাতী কাগজে, বিলাতী কালীতে ছাপা। ৫ খান কাল্পনিক ছবি আছে। পুস্তক খানি শোভা সৌন্দর্য্যে সকলের প্রাণ হরণ করবে, একটুও সন্দেহ নাই। ব্যবসার খাতিরে একপ কাল্পনিক ছবি প্রচার করা আমরা সঙ্গত মনে করি না। ইহাতে মিথ্যা প্রশংসা পায়। অতি অল্প কথার, কেবল ৪১টা ক্ষুদ্র পৃষ্ঠায়, বড় বড় অক্ষরে, সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। মনোযোগসহ পড়িলাম, কিন্তু এত অল্প কথা পড়িয়া সুখী হইতে পারিলাম না। ভাল জিনিসকে একপে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে মোটেই বুঝিলাম না। পঞ্চ হইলে বরং ক্ষমার যোগ্য ছিল, গল্প লেখা এত সংক্ষিপ্ত? লেখা ভাল হইলেও, আবার বলিতেছি, আমরা সুখী হইতে পারি নাই। সাহিত্য লইয়া ব্যবসাদারী করিতে কার্ত্তিক বাবুর জ্ঞান সাধু লোককে দেখিলে বড় ক্লেশ পাই।

৩৯। ফরিদপুরের ইতিহাস। এম এণ্ড— ভোগেশুলক তত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত। শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত। একধর্ম্ম ম্যাপ ও একখানি ছবি আছে। আমরা বহুদিন এই গ্রন্থের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। যদিও কতকাংশ গাইলাম বটে, কিন্তু সংক্ষিপ্ত, বলিয়া তুষা মিটিল না। গ্রন্থ-

, কায়ের গবেষণা অসাধারণ। তাঁহার লেখা, 'বারভূঞার কথা চুরি কারয়া আজ কাল কত লেখক প্রবৃত্তাবৎ হইয়া উঠিয়াছেন। সে কথা থাকুক। আনন্দনাথের বাঙ্গালা প্রাজ্ঞ। আশা করি, ফরিদপুরের প্রাতি হিতৈষীর নিকট এই পুস্তক বিশেষ আদর পাইবে। স্বদেশী মিলের কাগজে ছাপা।

৪০। কেশব-জ্যোতি। শ্রীনিহারিকী দেবী। বিলাতী কাগজে, বিলাতী কালীতে ছাপা। আমরা দোষতোহ, স্বদেশী আন্দোলনটা কেবল বাক্য-কণ্ঠ্যনের ব্যাপার হইয়া উঠিতেছে। সাহার দিকে তাহাই, সে-ই বিলাতী কাগজ ব্যবহার করিতেছে। তবে আর "স্বদেশী" আন্দোলনের জয়যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? ছি, এমন করিয়া কি লোক হাসাইতে হয়? গ্রন্থকারগণই দেশের আদর্শ নেতা, তাঁহারাও কি একটু সতর্ক হইবেন না? বড় ক্ষোভে এই অপরিণত কথা লিখিলাম। লেখা মোটের উপর বেশ।

৪১। সপ্তপর্ণী। শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৮।০। দেশী মিলের কাগজে ছাপা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প। ইন্দুপ্রকাশের লিখিবার প্রণালী অতি সুন্দর। সংক্ষিপ্ত অথচ মিষ্ট ভাষায় গল্পগুলি বেশ কুটিয়াছে।

৪২। ব্রহ্ম-প্রবাসীর পত্র। শ্রীকালচাঁদ দালাল প্রণীত। মূল্য ৮।০। ব্রহ্মপ্রদেশের অনেক জীব্য কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কয়েকখান ছবিও আছে। লেখাও সুন্দর। কিন্তু ইহাও বিলাতী কাগজে ছাপা!

৪৩। সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। শ্রীবিবেকানন্দ দাস বি-এ সম্বলিত। ছাত্রগণের জন্য লিখিত। কিন্তু জানবুদ্ধ ও এ পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন। বিলাতী কাগজে ছাপা না হইলে আমরা খুব সুখী হইতাম।

৪৪। দম্ভজদলন। শ্রীউমেশচন্দ্র বসু মজুমদার প্রণীত, মূল্য ৮।০। চণ্ডীকাব্য অবলম্বনে লিখিত। মিত্রামিত্রাকর উভয় ছন্দে রচিত। এই গ্রন্থখানি পড়িয়া আমরা বিমল আনন্দ পাইলাম। ভেব-জ্ঞানের চরম অবস্থায় এই কয়েকটি কথা আমাদের প্রাণে শাস্তি-ধারা ঢালিল। গ্রন্থকারের লেখনীধারণ সার্থক হইয়াছে। একটু উদ্ধৃত করিলাম—

“স্নেহের স্মৃতি মাতা স্থাপি প্রতি ঘরে, “
 মাতৃদম্ম শিলা দেই দেবাসুর নরে,
 দেবও অসুর হয় আমার নয়নে,
 মানব দানব সত্য নিজ অংগেরে ।
 আত্মপূর করিওনা কভু ভেদজ্ঞান,
 ধরামাঝে হের সবে আপন সমান ;
 পরহিতে সদা সবে হও ধাবমান,
 পরহিত মহাযজ্ঞ আমার বিধান ।
 বিশ্ব-প্রেমে হুয়ে সবে নিত্য আত্মহারা,
 ভাসাও প্রেমের স্রোতে এবিশাল ধরা ;
 স্বার্থ বলি দিয়া, চাও জ্ঞান-আশি মেলি,
 দৈতবাদ নাশি লও সবে কোলে তুলি ;
 নিস্বার্থ উদার প্রেমে দীক্ষাঃদেও সবে,
 নারায়ণ আসিবে স্বর্গ অবশ্যই ভবে ।

৪৫। চিকিৎসক। (আদর্শ হোমিও-
 প্যাথিক গ্রন্থ) ডাক্তার এ, সি, মজুমদার,
 এল-এম-এস প্রণীত, মূল্য ২৮। সুবিখ্যাত
 বিচক্ষণ ডাক্তারের চিকিৎসার ফল এই গ্রন্থে
 সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। হোমিও-
 প্যাথিক-চিকিৎসা-প্রণালী এখন এদেশে
 বিশেষ রূপে আদৃত হইয়াছে। এই সুন্দর
 পুস্তক খানি, গৃহপঞ্জিকার শ্রায়, ঘরে ঘরে
 রাখা উচিত।

৪৬। হাত-দেখা। শ্রীপরেশনাথ মহলা-
 নবীস প্রণীত, মূল্য ১। সামুদ্রিক শাস্ত্রাসু-
 সারে এই পুস্তকখানি সরল পদ্যে সুলিখিত।
 সামুদ্রিক শাস্ত্র বাহারা বিশ্বাস করেন, তাহারা
 এই পুস্তক পাঠে প্রভূত উপকার পাইবেন।
 প্রাণধানের বিষয়।

৪৭। বৈজ্ঞানিক-কথা। মূল্য ৮/১০। বৈজ্ঞা-
 নিক ভাষ্যের বাবর্তীয়া জ্ঞাতব্য কথার বিবৃতি।
 সুলিখিত।

৪৮। শিশু-সখা। ১ম ভাগ। সচিত্র।
 শ্রীমতী সরলা দেবী প্রণীত, মূল্য ৮/০। প্রথম
 পাঠ্য পুস্তক। লেখা মন্দ নহে।

৪৯। স্বর্গীয় বলেজ্ঞনাথ ঠাকুরের গ্রন্থা-
 বলী। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর জিবেদী কর্তৃক
 ভূমিকা লিখিত। বলেজ্ঞনাথ ঠাকুরের প্রতি-
 কৃতি সম্বলিত ; মূল্য ৫।

আমরা এই পুস্তকখানি উপহার পাইয়া
 খুঁজি উপকৃত হইয়াছি। পড়িয়া যারপর নাই
 সুখী হইলাম।

ঠাকুর পরিবার বাঙ্গালার গৌরব—বাঙ্গালী
 ভাষার ঐশ্বর্য্য সাধনের কল্প এই পরিবার
 বাহা করিয়াছেন, জাতীয় ইতিহাসে তাহা
 অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত থাকিবে। ৬ বলেজ্ঞ
 নাথ দেব-পরিবারের দেব-দূত। তিনি আজী-
 বন বাঙ্গালী ভাষার পরিচর্যা করিয়া গিয়া-
 হেন। হায়, এমন প্রতিভাশালী ব্যক্তির
 অকাল-তিরোধান বড়ই মর্শ্বস্পর্শী।

আমাদের বড় দুঃখ যে আমরা সংক্ষিপ্ত
 সমালোচনা করিতে বাধ্য ;—কেন না, বড়ই
 স্থানান্তর। বলেজ্ঞনাথের প্রাতঃভা-স্মরণ এই
 পুস্তকের পত্র পত্র, ছত্রে ছত্রে, সংক্ষেপে তাহা
 ব্যক্ত করিতে পারে, সে সাধ্য কাহার আছে ?
 অশেষ গুণালঙ্কৃত রামেন্দ্র সুন্দর লিখিয়াছেন
 যে,—“তাহার রচনায় যে কোমল, মিষ্ট,
 প্রশস্ত শ্রী ছিল, তাহার চোখে ও কথা-
 বার্ত্তায় তাহা আরও স্পষ্ট দেখা যাইত।
 এখানে যেন তাহা সমস্ত তারল্য ও চাকল্য
 ত্যাগ করিয়া আরও ঘনাইয়া আসিয়াছিল।”
 এই পুস্তকখানি বলেজ্ঞনাথের জীবন-ব্যাপী
 সাধনার অমৃত ফল। আমরা পড়িয়া উপকৃত
 হইলাম, আশা করি, যিনি পড়িবেন, তিনিই
 উপকৃত হইবেন। কার-শিল্পের এরূপ উজ্জল
 চিত্র অতি অল্প স্থলেই দেখা যায়। ধন্য ঠাকুর
 পরিবার, ধন্য বলেজ্ঞনাথ। এই গ্রন্থ বাঙ্গালী
 ভাষার অক্ষয় স্মৃতি-মান্দরে স্থান লাভ
 করুক।

৫০। চট্টল বিলাপম। সাহিত্যাচার্য্য
 শ্রীরজনীকান্ত কাব্যার্থ কৃতম্। ৬ নবীনচন্দ্র
 সেনের উদ্দেশ্যে তাহার কার্য্যাবলীর উল্লেখ
 করিয়া চট্টলজননীর ক্রন্দন। বাঙ্গালী অসু-
 বাদ সহ। কবিতাগুলি হৃদয়স্পর্শী।

৫১। ভারত-শিল্পী। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
 প্রণীত, মূল্য ৮/০। গ্রন্থকার বলেন “স্বর্ঘ্য যে কি
 পদার্থ, তাহা দেখিতে পূর্বমুখ হউন। যে
 শিল্প-স্বর্ঘ্য সমস্ত প্রাচ্যজগৎ সৌন্দর্য্য-করণে
 ডুবায়ে পশ্চিম সাগরে এক দিন অন্ত ‘গিয়া-
 ছেন, আবার নিশ্চয়ই কোন সুপ্রভাতে
 তাহার দর্শন পাইবেন।” শিল্প সম্বন্ধে অর্থ-
 নীজনাথের সূচিন্তিত ও স্থগিহিত কথা পাঠ
 করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম।

• ৫২। জাতীয়-মঙ্গল। মহম্মদ মোজা-
য়েল হক প্রণীত, মূল্য ১/০। এই নূতন
শিরী কে, আমরা মানি না। এট পুস্তক
খানি স্বজাতি-প্রেমের অপূর্ণ নিদর্শন।
একটি কবিতা তুলিয়া দিলাম—ইহাতেই
পাঠক তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন; বুঝিতে
পারিবেন, মুসলমান-ভ্রাতৃগণ আজ কাল
কেমন সুন্দর বাঙ্গালা লিখিতেছেন। পুস্তক-
খানি বিলাতী কাগজ ও কালীতে যদি ছাপা
না হইত, স্বদেশ-প্রেমের অমৃত ফল ফলিত।

• কন্ঠের শৃঙ্গে তুমিই একা
প্রেম-গীতি আব গেয়োনা,
অমন করে' পরের দ্বারে
'দাও' বলে হাত পেতোনা!

বহুদিন ত এমনি করে
মান সম্মম রেখে' ওরে,
পরের দ্বারে গিয়ে গিয়ে
পাছ কত লাঞ্ছনা!
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

মরবে মর ক্ষুধার আগার,
একটি প্রাণও কাঁদবে না তায়!
অলস বাঁচা বেঁচে থাকায়
লাভ হ'বে কি বল না?
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

মরবে তুমি দুঃখ কি তায়,
দুঃখ কেবল হস্তপাতায়,
অমন করে নিঞ্জের গোরব
ধ্বংস তুমি কবোনা।
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

জন্ম তোমার উচ্চ ঘবে,
কেবল আপন দোষের তরে
ভরের মাঝে তুচ্ছ হ'য়ে
স'চ্ছ কত গঞ্জনা!
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

একদিন তব অতুল তেজে
দীপ্ত ছিল ধরা এ যে,
সকল বিশ্ব সন্ধ্যা সকাল
করতো তোমায় বন্দনা!
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

• বিবে ছিলে শিকাদাতা,
সবাই তখন রাখতো মাথা
হর্ষে তোমার চরণ তলে,
করতো তোমার অর্চনা!
'দাও' বলে হাত পেতোনা।
জ্ঞান-বিজ্ঞান, কাব্য, নীতি,
খগোল, ভূগোল, ত্রিকোণ-মিতি,
জ্যোতিষ, দর্শন—তবের সার
'সবি তোমার রচনা!
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

তোমার বিশাল পণ্য-তরী
ঘুরতো সাগর বক্ষোপরি,
তোমার সাথে বাগিছাতে
কা'র হ'ত আর তুলনা?
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

নিত্য নব দেশের ভূমি
হাসতো তোমার চরণ-চুমি!
ধরণীময় অতুল নাম
নিত্য হ'ত ঘোষণা!
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

রত্ন-মাণিক তুলবে বলে'
ডুবতে জানতে সাগর-জলে,
সাগর, গিরি, আকাশভরে
ছিল তোমার সাধনা!
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

চাকু শিল্পে তোনার মত
বিশ্বের কোন শিল্পী, অত
সফল হ'তে জগত-মাঝে
স্বপ্নেও করতো কল্পনা?
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

বিশ্বপুষ্ঠে আজো কত
নিদর্শন তার আছে শত—
'জুমা-মসজিদ', 'আলহাম্বা', 'তাজ'
কে করে তার গণনা?
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

জন্ম লভে' অমন কুলে,
গিয়েছ আজ সকল ভুলে'!
গর্ভে নিতে তোমায় ধরা

হয় না কেন দু'খানা ?
'দাঁও' বলে হাত পেতোনা ।

বৈঃ তোমার ফল কি আছে ?
মাহুষ যারা মরে বাঁচে ;
তোমার মত 'কাঠের পুতুল'
আর আছে ভাই ক'জন ?
'দাঁও' বলে হাত পেতোনা ।

আজ হ'তে ভাই কর এ পণ,
মরো যেন দেশের মতন—
অধম লোকের সরায় যে হার
হয় না কারো বেদনা ।
'দাঁও' বলে হাত পেতোনা ।
নিজের পায়ে দাঁড়াও নিজে,—
রোদে পড়ে', জলে ভিজে,
আপন আহার আপনি গৌজ,
পরের দ্বারে যেয়োনা ।
'দাঁও' বলে হাত পেতোনা ।

৩০। চিত্র-শিল্প সোপান । শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র দেব-বর্মা-প্রণীত । যে রাজ্যের রাজভাষা বাঙ্গালা, সেই রাজ্যের নবীন রাজার নামে গ্রন্থখানি উৎসৃষ্ট হইয়াছে । ড্রয়িং, ওয়াটার কলার-পেন্টিং, অয়েল পেন্টিং শিক্ষা-প্রণালী পুস্তক । সরল বাঙ্গালায় সুলিখিত পুস্তক । এই পুস্তকখানির দ্বারা একবিভাগেই বিশেষ অভাব বিদূরিত হইল । গ্রন্থকারকে আমরা এজ্ঞা বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি ।

৩১। চাক্ষুসজাতি । জাতীয় চিত্র ও ইতিবৃত্ত । শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত । এই গ্রন্থকার চাক্ষুসজাতির ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রের বিশেষ উপকার করিয়াছেন । এই সকল আদি নিবাসীদিগের বিবরণ না জানার দরুণ ইতিহাস সম্বন্ধে লিখিবার বা ভাবিবাব সময় আশাদিগকে বিশেষ কষ্টে পড়িতে হয় । সরলতা এবং স্বাভাবিকতা আদিমজাতি সকলের নিজস্ব ধন । জুমিগা কাহিনী লিখিবার সময় কবিবর নবীনচন্দ্র ভাবে বিভোর হইয়া 'যাইতেন' । গ্রন্থকার বিশেষ অক্লান্তকরিয়্য এই সুবিস্তৃত পুস্তকখানি লিখিয়াছেন । এই সুন্দর গ্রন্থখানির দ্বারা, বাঙ্গালা ভাষার

বিশেষ এক অভাব পূর্ণ হইল । পূর্ববঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার কৃত্রী লেখক-সংখ্যা বড়ই অল্প । পূর্ব বাঙ্গালার অধিকাংশ লোক কেবল ধার আর বেড়ায়, আর মামলা নকদমা করে, দেশের স্বাণ পরিশোধের একতম উপায় জাতীয় ভাষার পরিচর্যা করে না ! 'এজ্ঞা আমরা বড়ই দুঃখিত । বিধাতা এই অভাব দূর করুন । দুঃখের বিষয়, এই পুস্তকখানিও বিলাতী কাগজে ছাপা ।

৩২। পূর্ববঙ্গ ও আসাম । দ্বিতীয় খণ্ড, স্মরণীয় উপতাকা ও পার্শ্বত্যা প্রদেশ বিভাগ । শ্রীকৃষ্ণমোহন ধর বিরচিত, মূল্য ১। শ্রীহট্ট ও আসামের পার্শ্বত্যা প্রদেশ সমূহের যাবতীয় বিবরণ বিস্তৃত ভাবে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । সংগ্রহ মোটের উপর বেশ হইয়াছে । লুসাইনিগের এবং কামরূপ জেলার বিবরণ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে । অনেক জ্ঞাতব্য কথায় গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ । সর্বত্র আদৃত হইবে, আশা করি ।

৩৩। বিক্রমপুরের ইতিহাস । শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ২।। প্রাচীন ও বর্তমান বিক্রমপুরের দুই খানি মাপ, এবং আরো ৪০ খানি ছবি প্রস্তুত, কান ছবিই কাল্পনিক নহে, প্রতিকৃতি সংগৃহীত । ইতিহাস বিভাগ খুব বিস্তৃত নহে, সাহিত্য-সেবী এবং সুবিখ্যাত ব্যক্তিগণের জীবন-বিবৃতি খুব বিস্তৃত । বিক্রমপুর পূর্ব বাঙ্গালার গৌরব, যে সকল মহাজন এই বিস্তৃত প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা, শুধু বঙ্গ নহে, ভারতের আদর্শ । এই সকল ব্যক্তির জীবনী প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার সকলের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন । নিরপেক্ষ ভাবে পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে । বিক্রমপুরের ইতিহাস বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অধ্যায় বিশেষ । গভীর গবেষণা ভিন্ন এ কার্য্যে কাহারও কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই । বর্তমান পুস্তকখানি "থসডা" রূপে গৃহীত হইতে পারে—কালে এই ইতিহাসে অনেক বিষয় সংযুক্ত হইলে ইহা একখানি আদর্শ ছবি বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে । মহা ব্যাপারের এই প্রারম্ভিক হুচনার জ্ঞান আমরা গ্রন্থকারকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি ।

সাংখ্যসূত্র ।

তৃতীয় পর্যায় ।

২৯। উভয়ের একদেশলক্ষ উপ-
রাগ হইতেও এ ব্যবস্থা হয় না । (এ
ব্যবস্থা = মোক্ষ ব্যবস্থা) ।

একাদ্বাবাদীর মতে আত্মা সর্বব্যাপী ।
সুতরাং তাঁহার সহিত বিবয়ের সম্বন্ধ নিত্য ।
তাহা হইলে সেই সম্বন্ধজ বাসনা নিত্য হয় ;
তাহা হইলে আত্মাব বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থা থাকে
না। যে মুক্ত হয়, সে আবার বন্ধ হয় ।
নানাদ্বাবাদেও অত্যা দিভু বলিয়া সকল
আত্মার সহিত সকল বিষয়ের সম্বন্ধ থাকায়,
এই বন্ধন মোক্ষ ব্যবস্থা হয় না ।

অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, বিবয়ের সহিত
আত্মার সম্বন্ধ হয়—ইন্দ্রিয়াদি করণ দ্বারা ।
ইন্দ্রিয় বিষয়ে মুক্ত হয়। বুদ্ধি ইন্দ্রিয় দ্বারা
উহা গ্রহণ করে,—বুদ্ধি বিষয়াকার হয় ।
সেই বিষয়াকার বুদ্ধির প্রতিবিম্ব আত্মায়
পড়িলে, আত্মা বিষয় গ্রহণ করে, সুতরাং
আত্মা ও বিষয় একদেশ স্থিত নহে ।

কোন কোন মতে আত্মা বিষয়দেশে
গমন করিয়া বিষয়ে সংযুক্ত হন । ইহা এস্থলে
আলোচ্য নহে ।

উভয়—অর্থাৎ বন্ধ ও মুক্ত উভয় আত্মা ।
উভয় আত্মার এক বিষয় দেশে উপরাগ হইলে
বন্ধ মুক্ত অবস্থা থাকিত না । মুক্ত আত্মাও
আবার বন্ধ হইত ।

৩০। যদি বলা যায় যে, অদৃষ্ট
বশে ইহা সিদ্ধ হয় । (অর্থাৎ অদৃষ্ট
বশে কেবল বন্ধ আত্মারই বিষয়ে উপ-
রাগ হয় ।)

যাহার অদৃষ্ট যে জ্ঞানের উৎপাদক, সেই
অদৃষ্টই সেই জ্ঞানের কারণ । অদৃষ্ট অতাবে
মুক্ত আত্মার বাসনা থাকে না । ইহা বলা
যায় ।

এক দেশ সম্বন্ধ জ্ঞান সকল আত্মার বিষয়
সংযোগ সমান হইলেও, অদৃষ্ট বশতঃ বন্ধ
আত্মারই বিষয়ে উপরাগ হয়, যদি ইহা বলা
যায় । (বিঃ ভিঃ)

৩১। (তাহা বলা যায় না ;—কারণ)
উভয়ের এক কালে যোগ না হওয়ায়,
উভয়ের মধ্যে উপকারী উপকারক ভাব
হইতে পারে না ।

বিষয়ের ক্ষণিক স্বীকার করিলে, কর্তা
ও ভোক্তা উভয়ের এক কালে বিদ্যমানতা
সম্ভব হয় না । ক্ষণিকবাদ মতে পদার্থ
ক্ষণেক্ষণে অস্তিত্ব হয় । সুতরাং অদৃষ্ট
বশতঃ আত্মার বিষয়ানুভোগ সম্ভবে না ।
কর্তৃ-নিষ্ঠ অদৃষ্টের দ্বারা ভোক্তৃ-নিষ্ঠ বিষয়ো-
পরাগ সম্ভব নহে । (বুদ্ধ মতে আত্মাও
ক্ষণিক বিজ্ঞান মাত্র । (বিঃ ভিঃ)
যে ক্ষণে আত্মা কর্ম করিয়া অদৃষ্ট সঞ্চয়
করিল, পরক্ষণে আর সে কর্মফল ভোগ
করিবার জ্ঞান থাকে না । অতঃ আত্মা তাহা
ভোগ করে । সুতরাং একের অদৃষ্ট অতঃকে
বন্ধ করে ।

ক্ষণিকবাদ স্বীকারে এই সিদ্ধান্ত হয় ।

৩২। যদি পুত্র কর্মের দ্বারা ইহা
হয়,—

পিতৃনিষ্ঠ পুত্র কর্ম দ্বারা পুত্রের উপকার
হয়, পুত্রের জ্ঞান পিতা পুত্রেরই দ্বারা গর্তাধা-

নাদি সংস্কার কৰ্ম্ম করিয়া পুত্রের উপকার করেন। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ মতে সেইরূপ পূৰ্ণকণের আত্মাকৃত কৰ্ম্ম দ্বারা পরকণের আত্মা উপকৃত হন। অতএব পিতা গৰ্ভাধানাদি যে কার্য্য করেন, তাহা দ্বারা যদি পুত্র সংস্কৃত হইতে পারে, তবে এক আত্মা যাহা করে, পরকণের আত্মা তাহা ভোগ করিবে না কেন?

৩৩। (তাহাও হয় না। যেহেতু এই মতে) স্থির এক আত্মা নাই, যে গৰ্ভাধানাদিকৰ্ম্মের দ্বারা সংস্কৃত হইতে পারে।

(সাংখ্য মতে আত্মা অনাদি নিত্য স্থির। সেই ঋত পুত্রোষ্টি কৰ্ম্মে সন্তানের উপকার হইতে পারে। কিন্তু ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ মতে, এরূপ এক স্থির আত্মা নাই। সুতরাং এই মতে, গৰ্ভাধান হইতে জন্ম পর্য্যন্ত স্থায়ী এক আত্মা নাই—যে পুত্রোষ্টি প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত হইতে পারে। গৰ্ভাধান কৰ্ম্মে যে আত্মা সংস্কৃত হয়, জন্মকালে আর সে আত্মা না থাকায় জন্মকালীন আত্মা তাহার ফল ভোগ করিতে পারে না।

৩৪। কার্য্যের স্থিরত্ব সিদ্ধি নাই, এহেতু ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্ত হয়। তাহার অর্থক্রিয়াকারিত্ব আছে।

যখন কার্য্য মাত্রেই ক্ষণিক, তাহার স্থিরতা নাই, তখন বন্ধনও ক্ষণিক। তবে তাহাদের অর্থক্রিয়াকারিত্ব আছে। [সূত্রের এই শেষ অংশ বিজ্ঞান ভিক্ষুর ভাষ্যে নাই]। ইহার অর্থ—কার্য্য ক্ষণিক হইলেও দীপশিখার তায় প্রবাহরূপে ইহার ব্যবহার সিদ্ধ।

৩৫। তাহাও নহে। কেন না তাহাতে প্রত্য্যভিজ্ঞার বাধা শূন্য হয়।

ঈশ্বরের প্রত্য্যভিজ্ঞা উল্লিখিত সিদ্ধান্তকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করে। প্রথমোক্তপন্ন যথার্থ জ্ঞান = অভিজ্ঞ। তাহা পরে জ্ঞানগোচর হইলে তাহার প্রত্য্যভিজ্ঞতা হয়। কাল যে দেবদত্তকে দেখিয়াছি, এক্ষণে ওই সেই দেবদত্ত—ইহা প্রত্য্যভিজ্ঞা। ইহার অবাধিত অর্থ—সত্য। ইহার অধিকরণ স্থায়ী না হইলে এই প্রত্য্যভিজ্ঞা হইল না। সুতরাং ক্ষণিক বিজ্ঞান প্রবাহ আত্মবাদ প্রমাণ বিরুদ্ধঃ।

ঘটাদিও ক্ষণিক নহে। তাহা হইলে যে ঘটকাল দেখিয়াছি—সেই ঘট আজ্ঞাপ্রশ্ন করিতেছি—এরূপ জ্ঞান হইত না। যাহা আমি দেখিয়াছিলাম, তাহাই প্রশ্ন করিতেছি—এই জ্ঞানও প্রত্য্যভিজ্ঞা। ইহাতে কার্য্যের স্থিরত্ব সিদ্ধ হয়। স্বপ্ন স্বপ্ন অনেক কালের সম্যক বোধ হইতে পারে না। এজন্ত দীপ শিখার ক্ষণিকত্বও ভ্রম। এজন্ত বন্ধনও ক্ষণিক নহে। * (বিঃ ভিঃ)

৩৬। তাহা ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞানের বিরোধী।

ঐশ্বর্য্য মতে জন্মান্তর ফলভোক্তা পুরুষ আছে। “সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ” “তম এবদমগ্র আসীৎ” ইতি ঐশ্বর্য্যঃ। ইহার দ্বারা ও যুক্তি দ্বারা কার্য্যাকারণাত্মক এই প্রপঞ্চ জগতের ক্ষণিকত্ব অনুমানের বিরোধ হয়। ক্ষণিক হইলে, স্থষ্টির পূর্বে ও স্থষ্টির সময়ে পূৰ্ণ পদার্থের উল্লেখ সম্ভাবনা থাকিত না।

৩৭। তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারাও সিদ্ধ হয় না।

* অভিজ্ঞা = cognition। আর প্রত্য্যভিজ্ঞা = recognition, apperception. ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ স্বীকার করিলে, তাহা cognition হয়, পর মুহূর্ত্তে তাহার স্বপ্ন হওয়ার তাহার recognition হইতে পারিত না।

• ক্ষণিকত্ব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে। এজন্ত তাহার দৃষ্টান্ত নাই। দৃষ্টান্ত না থাকায় তাহার অনুমান হয় না। ক্ষণিক হইলে অর্থ ক্রিয়ার সম্ভাবনা নাই।

প্রাণীপের শিখাও ক্ষণিকত্বের দৃষ্টান্ত নহে। (বিঃ ভিঃ)

৩৮। যাহারা যুগপৎ জন্মে, তাহাদের মধ্যে কার্য্য কারণ ভাব নাই।

বস্তু ক্ষণিক হইলে অর্থক্রিয়া বা ব্যবহার চলে না। সকল বস্তু ক্ষণিক হইলে সকলেই এককালে উৎপন্ন। পরবর্তী ক্ষণে পূর্ববর্তী ক্ষণের সমুদায় ধ্বংস হইয়া যায়, আবার সকল উৎপন্ন হয়। এইরূপে প্রতি মুহূর্ত্তে যাহারা যুগপৎ উৎপন্ন হইতেছে, তাহাদের মধ্যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। তাহা না থাকিলে উৎপত্তি বিনাশ উৎপন্ন হয় না। যদি একদাই দুই পদার্থ উৎপন্ন হয়, তবে কে কাহার কারণ হইবে?

৩৯। আর পূর্ববর্তী দ্রব্য ধ্বংস হইলে পরবর্তী দ্রব্যের সহিত তাহার যোগ হইতে পারে না।

যাহা কার্য্যের নিয়ত পূর্ববর্তী, তাহা সে কার্য্যের কারণ। পূর্ব সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যাহারা এক সময়ে জন্মে, তাহাদের মধ্যে পূর্ণা-পন্নীভাব থাকিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে কার্য্য কারণ ভাব থাকিতে পারে না। এস্থলে প্রশ্ন হয় যে, ক্রমোৎপন্ন পদার্থ যথো-কার্য্য কারণ ভাবত থাকিতে পারে। কিন্তু ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ মতে যাহা পূর্বক্ষণে দ্রব্য, তাহা নষ্ট হইয়া তবে পরক্ষণে দ্রব্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং যাহা নষ্ট হইল, তাহার সহিত পরক্ষণে দ্রব্যের আর সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। সেই সম্বন্ধ বা সংযোগ না থাকায়

তাহাদের মধ্যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।

কার্য্যমাত্রই উপাদান কারণের অমুগত। তাহা পূর্বে বর্তমান না থাকিলে কার্য্য হইতে পারে না।

৪০। তাহার (পূর্ববর্তীর) ভাবে (বা বিচ্যমান কালে) তাহার (বা পরবর্তীর) যোগ না হওয়ায়, এবং উভয়েব ব্যভিচার হওয়ায়, কার্য্য কারণ ভাব থাকিত না।

তাহার ভাবে—কারণের অস্তিত্ব কালে, তাহার = পরবর্তী কার্য্যের। উভয়েব কার্য্য কারণ এ উভয়ের (অনিঃ) অম্বয় ব্যতিরেক, এ উভয়ের (বিঃ ভিঃ)

যোগ—কার্য্যের সহিত কারণের যোগ। যখন কারণ থাকে, তখন কার্য্য থাকে না। যখন কার্য্য থাকে, তখন কারণ থাকে না। কাজেই কার্য্য কারণের অর্থক্রিয়াকারিত্ব থাকে না। কার্য্য কারণ ব্যবহার নিরর্থক হয়।

যেহেতু পূর্বোৎপন্ন পদার্থের ভাব কালে, উত্তরকালীন পদার্থের সম্বন্ধ হয় না, সেই জন্ত কার্য্য কারণ ভাব সম্ভব নহে। অম্বয় ব্যতিরেক এ উভয়ের ব্যভিচার হইলেও এই কার্য্য কারণ সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না। উপা-দেয় = কার্য্য; উপাদান কারণ। উপাদান থাকিলে উপাদেয় হয়, উপাদান না থাকিলে উপাদেয় হয় না। কাজেই অম্বয় ব্যতিরেক অনুসারে, উপাদান উপাদেয় মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়। যদি উপাদেয় উৎপত্তি কালে উপাদান নষ্ট হয়, তবে এ কার্য্য কারণ সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না।

৪১। কেবল পূর্বে থাকিলেই যে কারণ হইবে, এমন নিয়ম নাই।

• ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ বলেন, পূর্বক্ষণের পদার্থ ধ্বংস হউক, তাহা পূর্ববর্তী থাকতেই কারণ হইতে পারে । এ সিদ্ধান্তও যুক্ত নহে !

একজন বাণ নিষ্কেপ করিয়াই মরিয়া গেল, তাহার পরক্ষণে অন্তে বাণ বিদ্ধ হইল, ও তাহার পর সেই সরসিত ব্যক্তিও মরিয়া গেল । এস্থলেও পূর্বে কারণের ধ্বংস হয় নাই ।

নিমিত্ত কারণ সম্বন্ধে এই নিয়ম হইতে পারে না ! হইলে, উপাদান ও নিমিত্ত কারণ প্রভেদ থাকে না । (বিঃ ভিঃ)

৪২। বাহ্য বিষয়ের প্রতীতি হয়, একজ্ঞ বিজ্ঞান মাত্র তত্ত্ব নহে ।

জগৎ কেবল বিজ্ঞান মাত্র নহে । স্বপ্নে যেমন বিষয়ের বিজ্ঞান মাত্র সত্য, বিষয় মিথ্যা ; সেইরূপ জাগ্রতেও বাহ্য বিজ্ঞান মাত্র সত্য, বাহ্য বিষয় মিথ্যা, ইহা বলা যায় না । তাহা হইলে “আমি ঘট” এই প্রতীতি হইত, ‘ইহা ঘট’ এরূপ প্রতীতি হইত না । বাসনা হেতু এরূপ হয়, তাহা বলা যায় না । বাহ্য ঘট অভাবে ঘটবাসনাই হইতে পারে না । অবয়বী না থাকিলে বাহ্যার্থ থাকিতে পারে না, অবয়ব থাকে না ! অবয়বী না থাকিলেও বাহ্য পদার্থের অপলাপ করা যায় না । অবয়বী ও অবয়ব এক নহে ।

অন্তরস্থ বিজ্ঞান বাতীত বাহিরেও বিজ্ঞেয় থাকা অসম্ভব হয় । (বিঃ ভিঃ)

বহিবর্ন্ত অন্তরস্থ বিজ্ঞানের আলম্বন, বা বিষয় । একজন তাহারা বিজ্ঞেয় । বিজ্ঞেয় ও বিজ্ঞান এক নহে ।

এই মতে যখন অন্তরস্থ বিজ্ঞান বাতীত কোন পদার্থ নাই, তখন বন্ধন বা আত্মার বন্ধন-অবস্থা জ্ঞান ও বিজ্ঞান মাত্র ; অতএব তাহা মিথ্যা ও অকারণ । এ কথা বলা যায় না । কেন না বিজ্ঞানবাদ মিথ্যা ।

৪৩। যাহার (অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ের) অভাব হইলে, তাহারও (অর্থাৎ বিজ্ঞানের) অভাব হয় । তাহাতে শূন্যবাদ আসে ।

যদি স্বপ্নের দ্বারা বাহ্য বিষয়ের বাধ হয়, বলা যায়, যদি ঋতি স্মৃতি অল্পসারে এই সমুদায় চিন্ময়, বিজ্ঞানই সত্য, এ প্রপঞ্চ মিথ্যা— ইহা সিদ্ধান্ত হয়, তবে বিজ্ঞানই সত্য ইহা স্বীকার করিতে হয় বটে ।

কিন্তু জাগ্রত বাহ্য অবস্থায় বাহ্য বিষয়ের এরূপ বাধ হয় না ! যাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, তাহার অপলাপ হইবার সম্ভাবনা নাই । তাহাকে স্বপ্ন-বৎ অসত্য বলা যায় না । আর বাহ্য অসত্য হইলে, শূন্যবৎ সিদ্ধ হয়, বিজ্ঞানবাদ সিদ্ধ হয় না । তাহাতে বিজ্ঞান প্রতীতি অবস্ত বিঘ্নক হয়, তাহার প্রমাণ থাকে না । যে প্রমাণ দ্বারা বিজ্ঞানের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতে হয়, তাহাও বর্জ্য । তাহাও অস্বীকার করিতে হয় । যদি বিজ্ঞান অসম্ভব সিদ্ধ হইত, তবে সর্বত্র ইহা সিদ্ধ হইত ; শূন্যবাদী তাহাতে আপত্তি করিত না । কাজেই ইহাকে প্রমাণ-সিদ্ধ বলিতে হয় । অসৎ প্রমাণ কার্য সাধক নহে । আর প্রমাণের ও বাহ্য বিষয়ের ব্যবহারিক সম্বন্ধ স্বীকার করিলে, আর শূন্যবাদ থাকে না,—বিজ্ঞানবাদও থাকে না । কোন বিজ্ঞানবাদ সিদ্ধ হয় না ।

আধুনিক বৈদান্তিক ও বিজ্ঞানবাদী । তবে তাঁহারা ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী নহেন, নিত্য বিজ্ঞানবাদী । এতদ্বারা সে মতও খণ্ডিত হইল । ঋতি স্মৃতিতে যে বিজ্ঞান মাত্রের, সত্যতা প্রতিপাদন করিয়া বাহ্য পদার্থের অসত্যতা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে বাহ্য পদার্থ কুটস্থ পরমাণ্বার ভাষায় সত্য নহে । তাহা পরিণামী, ব্যবহারিক ভাবে সত্য । তাহা ঈশ্বরের সংকল্প রচিত ।

৪৪। যদিও বল শূন্যই তত্ত্ব; কেন, না, যাহা ভাব পদার্থ তাহার বিনাশ হয়— কারণ বিনাশই বস্তুর ধর্ম্য!

ভাব বা যাহা এখন আছে, পরে তাহার অভাব হইবে। অতএব বিনাশই বস্তুর স্বধর্ম্য। বস্তু যেমন আদিতে শূন্য ছিল, তেমনই শেষেও শূন্য হইবে। কেবল মধ্য কিয়ৎকাল থাকে।

অতএব বিনাশের পর আর বন্ধন থাকে না। শূন্য হয়,—মুক্তি হয়।

অতএব বন্ধনকারণও শূন্য।

ভাবরূপ তত্ত্ব হইলে তাহার নাশে তদ্বনাশ হইবে বলিতে হয়। (অবিঃ)

৪৫। ইহা অল্পবুদ্ধিদের অপবাদ মাত্র।

ভাব অসং হয়, ইহা কথার কথা। যাহা আগে ছিল না, তাহা পরে নাশ হইল, এইরূপ দেখা যায় বটে। কিন্তু সৎকার্য্যবাদ মতে ভাব আবিনাশী। নাশের অর্থ তিরোভাব মাত্র। প্রকৃতি পুরুষ অবিনাশী। প্রশ্ন এই যে যখন অভাবই নাই, তখন নাশ চিন্তার কি প্রয়োজন? মৃত্তিকার ঘট অবস্থা হয়। মৃত্তিকা ঘটবান হয়। সেই ঘট নাশের কেবল মৃত্তিকা জ্ঞান থাকে। ঘট জ্ঞানের অভাব হয়। ঘটজ্ঞান মৃত্তিকা এই জ্ঞান ব্যবহারিক। কেবল মৃত্তিকা জ্ঞান—এক। বিষয় বৈলক্ষণ্যে বিজ্ঞান বৈলক্ষণ্যহীন না। তথাপি প্রশ্ন হয় যে, যদি ভাব ও অভাব মধ্যে সম্বন্ধ না থাকে, তবে কিরূপে অভাব জ্ঞান হয়? ইহার উত্তর এই যে অভাব জ্ঞানও সাকারণ।

ভাব পদার্থে যে বিনাশী, ইহা মূর্খদিগের প্রলাপ। কোন কার্য্যেরই বিনাশ নাই, তাহার অতীত অবস্থাই প্রসিদ্ধ। তাহাই অব্যক্তাবস্থা। (বিঃ ভিঃ)

কৈহ কৈহ এই, স্বত্রের অর্থ করেন— শূন্যই তত্ত্ব ইহা মূর্খের প্রলাপ। কারণ ইহার কোন যুক্তি নাই। ইহাতে প্রমাণকেও শূন্য বলিতে হয়। না বলিলে শূন্যবাদে দোষ হয়।

অর্থ শূন্য নিরালম্ব স্বরূপ যম চিন্তাতে।

অভাব যোগঃ সপ্রোক্তে যেনোন্মত্ত প্রপঞ্জতি ॥

ইহা শূন্যবাদ নহে। ইহাতে পরমাত্মাই তত্ত্বরূপে গৃহীত।

“ত্ৰৈলোক্যং গগনাকারং নভঃ স্তম্বা বপুঃ স্বকং বিষংগামী মনোধ্যায়ন্ যৌগী ব্রহ্মৈব গীয়তে ॥

এস্থলে আকাশ ও শূন্য একার্থক।

৪৬। উক্ত উভয়পক্ষ নিরাশের মুক্তি দ্বারা এই শূন্যবাদও নিরাশ করা যায়।

উভয়পক্ষ = ক্ষণিক পক্ষ ও বিজ্ঞান পক্ষ। যে মুক্তিতে ক্ষণিকবাদ ও বিজ্ঞানবাদ নিরাকৃত হইয়াছে, সেই মুক্তিতেই শূন্যবাদ নিরাকৃত হয়। প্রত্যক্ষ ও প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা ক্ষণিকবাদ নিরাকৃত হইয়াছে, ও বাহ্য-বস্তু প্রত্যক্ষ দ্বারা বিজ্ঞানবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। সেইরূপ প্রত্যক্ষাদি দ্বারাই শূন্যবাদ নিরাকৃত হয়।

৪৭। উভয়রূপে তাহার অপূরুষার্থ সিদ্ধ হয়।

শূন্য তত্ত্ব হইলে কে আপনার অভাব জ্ঞত যত্ন করিত? তাহা হইলে মোক্ষ অপূরুষার্থ হইত। শূন্য—সৎ অসৎ ব্যতিরিক্ত বলিলে, ইহার উত্তর এই যে এরূপ তত্ত্ব নাই।

শূন্যতা স্বতঃ পরতঃ পূরুষার্থ নহে। সর্ব্ব শূন্য হইলে, হ্রঃখও শূন্য হয়। তাহা হইলে হ্রঃখ নিবৃত্তি পূরুষার্থ হয় না।

৪৮। গতি বিশেষ হইতেও, তাহা সিদ্ধ হয় না।

গতি দেখা যায়, শূন্য—গতি নহে। স্তব্ধতা—শূন্য—তব্ব নহে। “পুণ্যেন ব্রহ্মলোকং যাতি” “পাপেন নরকং যাতি”—ইত্যাদি ক্রটি এই গতি বিষয়ক।

শরীর প্রবেশাদি গতি দ্বারা পুরুষ বদ্ধ হয় না। (বিঃ ভিঃ)

দেহ পরিণাম আত্মা—ইহা-রূপণক মত। এস্থলে ইহা নিরাকৃত হইয়াছে। (অনিঃ)

৪৯। যে নিজস্ব, তাহার গতি অসম্ভব।

পুরুষ—সর্বব্যাপী; বিভূ বলিয়া তাহার গতি অসম্ভব। পুরুষ ক্রিয়াহীন বলিয়া, তাহার শরীর প্রবেশাদি গতি অসম্ভব।

৫০। তাহা ঘটাদির স্থায় মূর্ত হইলে তাহার ঘটাদির সমান ধর্মের আপত্তি হয়; ইহা অপসিদ্ধান্ত

ঘটাদি ক্রিয়াবান, বিনাশশীল! আত্মা সেইরূপ মূর্ত হইলে বিনাশী হইত। আত্মা ক্রমি হস্তী প্রকৃতি দেহ প্রাপ্ত হয়। স্তব্ধতা অত্যা কোন দেহের পরিমাণ যুক্ত নহে। শ্রুতিতে আছে, অক্ষুণ্ণমাত্র পুরুষোত্তরাত্মাঃ।” ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আত্মা স্থূল শরীরের পরিমাণ যুক্ত নহেন। অক্ষুণ্ণ মাত্র পুরুষ লিঙ্গ দেহবদ্ধ আত্মা।

৫১। তবে আকাশের স্থায় আত্মার উপাধিযোগে, গতির কথা শ্রুতিতে আছে।

ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ পরিমাণযুক্ত ও ঘটের

গমনে গমন করে বোধ হয়। ইহা উপাধিক। সেইরূপ স্থূল শরীর অবস্থিত আত্মার গতিও শ্রুতিতে উক্ত আছে, তাহাও উপাধিক।

“ঘটনং বৃত্তমাকাশং নীয়মানেন ঘটে যথা।

ঘটো নয়েতমাকাশং তদ্বজ্জীবো নতোপমঃ॥”

বুদ্ধি বা আত্মার গুণে অতি স্থূল আত্মাকে স্থূল বোধ হয়। আত্মা—“নিত্যঃ সর্বগতঃ স্বাহুঃ।” ইতি গীতা। অতএব আত্মা বিভূ। তাহার মধ্যম বা অণু পরিমাণ হইতে পারে না।

৫২। কর্ম দ্বারাও আত্মা বদ্ধ হইত না। কারণ কর্ম অণুর ধর্ম।

আত্মার কোন ধর্ম নাই। বিহিত নিষিদ্ধ কর্ম দ্বারা, বা তজ্জনিত অদৃষ্ট দ্বারা পুরুষ বদ্ধ হয় না। (পূর্বে ১৬ সূত্রে, কর্ম দ্বারা আত্মার বন্ধন হয় না, ইহা বলা হইয়াছে। বর্তমান সূত্রে কর্ম অর্থ—কর্মজনিত অদৃষ্ট বা ধর্ম-ধর্ম। স্তব্ধতা পুনরুক্তি নাই।

৫৩। অণুর ধর্ম দ্বারা আত্মার বন্ধন হয় বলিলে, অতি প্রশংস্য দোষ হয়।

তাহা হইলে মুক্ত আত্মারও বন্ধন সম্ভাবনা থাকে। ধর্মধর্ম—চিন্তের। তাহা সাক্ষাৎ আত্মার বন্ধন কারণ নহে।

৫৪। আর পুরুষ নিশ্চল ইত্যাদি শ্রুতির সহিত ইহার বিরোধ হয়।

“অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ” “সাক্ষী চেতো কেবল নিশ্চলগচ্চ”—ইত্যাদি শ্রুতি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

বঙ্গের উপজাতি-সঙ্কট ।

মানব-সন্তান যখন জনগ্রহণ করে, তখন প্রকৃতিতে অনেক বস্তু ভাগ করিতে হয়। কিন্তু যখন প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়, তখন মানুষ বেদনার কথা ভূগিয়া সোৎসুকনেত্রে সন্তানের আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকে। কিরূপ সন্তান জন্মিবে, সেজ্ঞা যেমন চিন্তা-ভারাক্রান্ত না হয়, তাহা নহে, অনিশ্চয়তার জ্ঞান মনে যে সন্দেহে দোলায়মান হয় না, তাহা নহে, কিন্তু নূতন কিছু আসিতেছে, এজ্ঞা মনে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে এবং সুসন্তান জন্মিবে, এই আশাই সকলের মনে জাগিতে থাকে। এই কথা কেবল ব্যক্তির নহে, জাতির সম্বন্ধেও খাটে। জাতীয় জীবনেও যখন কোনও নূতন তত্ত্বের আবির্ভাব হয়, তাহার জ্ঞান এই প্রসব বেদনার আবশ্যক হয়। যখন কোন নূতন আদর্শ আসিয়া পুরাতনকে পিটিয়া নূতন করিয়া গড়ে, তখন কিছু দিন জাতীয় জীবনকে এক কষ্টকর যাতনাময় পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া আসিতে হয়। নূতন আদর্শ পুরাতনকে স্বস্তীনে থাকিতে দিতে চায় না, অথচ পুরাতনকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিলে যে স্থান পাওয়া যাইবে, তাহা শঙ্কিত হইবে কি অশান্তির হইবে, এই চিন্তা জীবনকে অস্থির করিয়া তুলে। নূতন পুরাতনকে স্বস্থানচ্যুত করিবার জ্ঞান স্ববেল সম্মুখের দিকে টানিতে থাকে, পুরাতনও অতি স্বাভাবিক স্ত্রিয়মেই আপনার স্থান ছাড়িতে চায় না। নূতনের মধ্যে যদি উচ্চ ও মহৎ এমন কিছু থাকে, যাহা পুরাতনেরই পরিণতি, পূর্ণ বিকশিত নহে,

কিন্তু বিকাশোন্মুখ, তাহা হইলে, পুরাতনের এই নূতন ভাবে জনগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী। নূতন ও পুরাতনের মধ্যে যে এই টানাটানি, ইহাট জাতীয় জীবনের প্রসব বেদনা। এই বেদনা সময়ে সময়ে অতি গুরুতর আকার ধারণ করে, এমন কি, সময়ে সময়ে অজ্ঞ প্রয়োগও প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু নূতনের জন্ম ঠেকাইয়া রাখা মানব সাধারণ অতীত। নূতন কিছু দিকে মন ধাবিত হইলে মানবসমাজে যে যন্ত্রণার আবির্ভাব হয়, আমাদের বর্তমান অবস্থাতাহার জাঙ্ঘল্যমান প্রমাণ। আমরা নূতনকে কায়মনোবাক্যে ধরিতেও সমর্থ হইতেছি না, অপ্রাণ চেষ্ঠায় তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জ্ঞানও আগ্রহ দেখাইতেছি না। কেমন একটা সংশয়াচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে পতিত রহিয়াছি। কিন্তু নূতনের মধ্যে এমন একটা শক্তি দেখা যাইতেছে, যাহাতে মনে হয়, সে স্ববেলেই সকলকে টানিয়া লইয়া যাইবে, পুরাতনকে তাহার কাছে মাথা হেট করিতে হইতেছে। ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গের উপজাতি (caste) সকলের অভ্যর্থন তাহার দৃষ্টান্ত। যে সমস্ত উপজাতি লইয়া মহা হিন্দুজাতির পতন, তাহারা সকলেই এমন ভাবে অঙ্গ সঞ্চালন করিতেছে, যাহাতে সমগ্র জাতির জীবনে এক প্রবল আলোড়ন সমুখিত হইয়াছে। হিন্দু সমাজ এত দিন যাহাকে যে স্থানে রাখিয়াছিলেন, সে আর সে স্থানে থাকিতে রাজী হইতেছে না। এই আলোড়ন উচ্চ নিম্ন সকল শ্রেণীর মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেই এই

সঞ্চালন বেশী, তাহাতে সন্দেহ নাই, কেন না, "যেখানে অস্ত্রের লেখা, বাখা ও তথ্য।" তাহার। নিম্ন শ্রেণীর এই অপবাদ যুগ যুগান্ত ধরিয়া অস্মানবদনে বহন করিয়া আসিলেও আজ নুতনের অস্থানে তাহা তাহাদের কাছে অসহ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। তাহার। ইহাঙ্গ প্রতিকারের জন্ত বন্ধপরিকর হইয়াছে—তাহাদিগকে যে স্থানে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার। সে স্থানে আর থাকিবে না। অত্র দিকে খাবার যিনি অতি উচ্চ—

সহস্রমিছতি শতী সহস্রী লক্ষমিহতে ।

লক্ষাধিপো ততো রাজ্যং রাজ্যস্থঃ সর্গমিহতে ॥—

এই নিয়মায়ুসারে আরও উচ্চে আপনার লক্ষ্য স্থাপন করিতেছেন। বঙ্গের জাতি বিভাগে কায়স্থের স্থান সর্বোচ্চ বলিলেই হয়। কেন না, একজন সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত কায়স্থের ও একজন সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্রাহ্মণের প্রাপ্য সম্মান শিক্ষিত সাধারণের কাছে একই। * তবুও কায়স্থ কি এ আলোড়ন পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন? যদিও কায়স্থ ব্রাহ্মণে বিভিন্নতা এই যে, একজন এক দিন আপনাকে শূদ্র মনে করিয়া আসিয়াছে, এই মাত্র। এখন কায়স্থ এই মনে করার হস্ত হইতেও উদ্ধার পাইবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আর উপরে উঠিয়া বসিবার স্থান নাই, আর জয় করিবার পৃথিবী নাই, কি করা যায়? তাই তিনি জিত পৃথিবীর মধ্যে অঙ্গ সঞ্চালন

* অবশ্য আমার জানা আছে যে, শিক্ষিতাভিমাত্রী এমন অ-ব্রাহ্মণ এখনও দেশে আছেন, যিনি শূদ্রের বাড়ী আহাৰ করি না বলিয়া অহঙ্কার করেন এবং নাসিক্য কখন করতঃ কায়স্থের নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করেন।

করিতেছেন। আলোড়ন এমনই সর্বাঙ্গ-ব্যাপী হইয়াছে। ব্রাহ্মণও নিশ্চিন্ত নহেন, তিনিও ভাবিতেছেন। এখন কি কর্তব্য। একপ স্থলে, যাহাদিগকে নিম্নশ্রেণী বলিয়া এত দিন চাপিয়া রাখা, হইয়াছিল, তাহার।ও যখন ঐ একই নবাত্মাদিত শিক্ষা দীক্ষায় অত্যন্ত হইয়াছে, তখন তাহার। কেন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে? একপ আশা করাই বিড়ম্বনা। তাহাতে আবার পশু বলে চাপিয়া রাখিয়া দিবার অধিকার সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাই বিপুল আলোড়নে সমাজ-অঙ্গ আলোড়িত হইতেছে, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নুতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা সকল হৃদয়েই জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই চাহিতেছেন, আবার নুতন করিয়া শ্রেণী বন্ধন করা হউক। এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটুও কুসংস্কার নাই, একটুও অস্বাভাবিকতা নাই। যাহা যুগ পরিবর্তনের সময় সর্বকালে সর্বদেশে হইয়াছে, তাহাই এদেশে ও একালে অভিনীত হইবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে। ইংলণ্ডের যে (civil war) আন্দোলন ও ফ্রান্সের যে মহাবিপ্লব, (French revolution) তাহার।ও মূলে এই যুগ পরিবর্তনের অভিনয়। এই সকল বিপ্লবের কেবল রাষ্ট্রীয় দিকই আমাদের চক্ষে পড়ে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ সকলের মূল উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিবাদ। যখন নিম্নশ্রেণী আপনাদের অবস্থার শোচনীয়তা অনুভব করিয়া পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষা করে, তখন উচ্চশ্রেণী সেই আকাঙ্ক্ষায় বাধা দেয়, সুতরাং বিপ্লব সংঘটিত হয়। বিপ্লববিহীন পরিবর্তন সংশোধন করিতে হইলে উপর হইতে চাপ তুলিয়া লইতে হয় এবং নিম্ন

হইতে উপদ্রোহ-উত্তীর্ণ হইয়া অবাধ করিয়া দিতে হয়। ইতিহাস শিক্ষা দিতেছে, ইহার অন্তথা হইলেই বিপ্লব ঘটে। কেন না, ইতিহাসে দেখা যায়, নিম্নশ্রেণী যখন জাগ্রত হইয়াছে, তখন কেহই তাহাদের পথ বোধ করিতে এ পর্য্যন্ত সমর্থ হয় নাই। বাধা যতই শক্ত হয়, বিপ্লব কেবল ততই গুরুতর আকার ধারণ করে। ফরাসী-বিপ্লবে ব্যক্তি সকল অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। আমাদের দেশের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের এই বিভিন্নতা যে, আমাদের দেশে জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে উপজাতি রহিয়াছে। সুতরাং এখানে উপজাতিবই অভ্যর্থন হইয়াছে, বাধা পাটলে ফরাসী বিপ্লব অপেক্ষাও গুরুতর বিপ্লবের সম্ভাবনা। এই ইতিহাসের শিক্ষা শিরোধার্য্য করিয়া আমাদের দেশের নেতা ও সমাজপতিগণকে অগ্রসর হইতে হইবে। নতুবা বিপ্লব অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে এক্ষণে পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে, সমাজের নেতৃবর্গের বুদ্ধিমত্তায় বিপ্লব ঘটে নাই। গুরুত্ব বিভাগে অবস্থার পরিবর্তনে আবেষ্টনের নিষ্পেষণে কত উচ্চ নীচ হইয়া গিয়াছে। আবার অবস্থার আনুকূল্যে শিক্ষা দীক্ষার সহায়তায় কত নীচ অতি সহজে উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছে। যাহারা আজ বঙ্গদেশে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছেন, তাহাদের কাহারও কাহারও ইতিহাস নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিলে ইহার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় যে জাতিভেদের তালিকা আছে, তাহাতে “কায়স্থ” জাতির কোনই উল্লেখ নাই। কিন্তু একস্থানে এক্ষণে কথিত আছে যে, রাজা চোর ডাকাতের হস্ত হইতে, যেমন প্রজাদিগকে রক্ষা করিবেন, কায়স্থের হস্ত হইতেও তেমনই

রক্ষা করিবেন। বরং কায়স্থের হস্ত হইতে বিশেষভাবে রক্ষা করিবেন*। ইহাতে বুঝা যায়, সে সময়ে কায়স্থ জাতির সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু “কায়স্থ” নামধের একদল প্রতাপশালী রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, যাহারা সময়ে অসময়ে প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিতেন। তাহাদের সাহায্য রাজার পক্ষে এমন প্রয়োজনীয় ছিল যে, তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া রাজকর্ম্ম চালাইয়া অসম্ভব হইত। তাই তাহাদের উপর বিশেষ নজর রাখিবার জন্ত শাস্ত্রকার রাজার উপর আদেশ জারি করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত বর্তমান সময়েও মিলিয়া যাইবে। পুলীশ ছাড়া রাজকর্ম্ম চলে না, ইহা সহজেই বুঝা যায়, কিন্তু সময়ে সময়ে ঘটনা বিপ্লবের দ্বারা উত্থাপিত হইয়া আমরাও কি বলিয়া উঠিতে বাধা হই না যে, চোর ডাকাত অপেক্ষা পুলীশের হস্ত হইতে প্রজাকুলকে রক্ষা করা সরকার বাহাদুরের সর্ব্বাঙ্গে কর্তব্য? অবশ্য এটা মনে রাখিতে হইবে, ব্যক্তি বিশেষের দোষের জন্য সকলকে দোষী করা যায় না। কিন্তু এমন সময় কি উপস্থিত হয় না, যখন মনে হইতে পারে যে, দোষটা সাম্প্রদায়িক, ব্যক্তিগত নহে। যখন বঙ্গদেশে স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হইল, তখন কি ইহা মনে হইল না যে, যদিও পুলীশ দেশের লোক, তবুও তাহারা দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে আপনাদের শক্তি নিযুক্ত করিতেছে এবং উহা পুণ্ড্রিশের সম্প্রদায়গত দোষ দাঁড়াইয়াছে, ব্যক্তিগত নহে। তখন কি অনেকে রাগের মাথায় প্রস্তাব করিয়াছিলেন না যে, পুলীশকে সামাজিকভাবে বন্ধ কর এবং পুলীশ ডিপার্টমেন্ট বয়কট কর। ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে পুলীশকে বাধা

* চাই তব্বর হুর্ক, তমহাসাহসিকাদি ভিঃ ।
পীড়মানাপ্রজা, রুদ্ধে কায়স্থ-বিশেষতঃ ।

হইয়া কি আপনাদের আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে সকলকেই এক সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে হইত না? এবং গবর্ণমেন্টকে কি বাধ্য হইয়া পুলীশের পুত্র পুলীশ, এই নিয়ম অবলম্বন করিতে হইত না? ইহা দ্বারা কি পুলীশ একটা স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইত না? সুতরাং যাহারা একদল রাজকর্মচারী মাত্র ছিলেন, তাহাদিগকে সমাজে একটা স্বতন্ত্র উপজাতিতে পরিণত হইতে হইত। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, প্রথম প্রথম এই নবজাতি অত্যন্ত হেয় বলিয়াই পরিগণিত হইত। কায়স্থ সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। “কায়স্থ যখন” জাতিতে পরিণত হইয়াছে, তখন তাহাকে ক্ষত্রি হেয় অন্ত্যজ জাতি বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। বাস্তবিক্য-সংহিতায় কায়স্থের নাম আছে, কিন্তু কায়স্থ জাতি নাই। ব্যাসসংহিতায় কায়স্থ জাতির নাম আছে, তবে তাহাকে গোখাদক অন্ত্যজ জাতি সকলের সঙ্গে এক পর্যায়ভুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে,* ক্রমে ক্রমে কায়স্থ যে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা এখন সকলের চোখে সম্মুখেই দীপ্যমান। রাজকর্মচারিত্ব হইতে কায়স্থ যে জাতিতে পরিণত হইয়াছে, ইহা আমার স্বকপোল কল্পিত নহে। দুইজন কায়স্থ কুলগৌরব এইরূপ ভাবের মত প্রকাশ করিয়াছেন। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত বলিয়াছেন, হয়তো কায়স্থগণ এসেসরদের মত একদল রাজকর্মচারী ছিলেন। জটীস সারদাচরণ মিত্র বকায় ও পশ্চিমাঞ্চলস্থ কায়স্থগণের মধ্যে যাহাকে আদান প্রদান প্রচলিত হয়, এইমত সমর্থন করিয়া গত সেপ্টেম্বর মাসের Hindus-

stan Reviewতে যে ইংরাজী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে একস্থানে লিখিয়াছেন—

“The true origin of the Indian caste system has frequently been discussed and no final conclusion has been arrived at. One of the theories (and I need hardly add there are stray passages in our ancient texts to support this theory) is that profession originally gave birth to the caste system Those who performed clerical, financial and ministerial duties of courts were the kayasthas. In course of time, offices and names became hereditary, as is common in india.

এই দিক্ হইতে বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীর মধ্যে অবশ্যই সত্য আছে। অনেকে হয়তো ব্রাহ্মণত্বেরও দাবী করিতে সমর্থ। কেননা, ও সকল কার্যে যে ব্রাহ্মণ একেবারে নিযুক্ত হইবে না, তাহা বলিতে পারা যায় না। আবার অনেক আছেন, যাহাদের কোন দাবীই নাই। কেবল কায়স্থগণের উপাধি গ্রহণ করিয়া কায়স্থ লাভ করিয়াছেন এবং এক দপ্তরে কাজ করিতে ন বলিয়া কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন। বাহা ইউক, কায়স্থ জাতির উন্নয়নে আমরা বেশ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছি, কিন্তু ধীরে ধীরে জাতি উন্নীত যার। বৈজ্ঞানিক ইতিহাস হইতেও, বোধ হয়, আমরা এ শিক্ষাই লাভ করিব। চিকিৎসা ব্যবসায়ীকে শাস্ত্রে অত্যন্ত স্বর্ণার চক্ষেই দেখা হইয়াছে। * মহাভারতে বৈজ্ঞকে চণ্ডালের সঙ্গে এক পর্যায়ভুক্ত দেখিতে

* চিকিৎসকত্ব যুগেরো: কুরুস্তোচ্ছিষ্ট ভোজিনঃ ।

... ..

বিবদন্তঃ নগর্য্যন্তঃ পতিতান্নমবকুতম্ ।

* নৃপিক ক্রি়াতকায়স্থ মালাকারকুটুম্বিনঃ ।

এতদন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্তেচ গবাসিনাঃ ।

ব্যাস ১।১২

মহু । ৪।২১২ এবং খাণ্ড, ১।১৩২

পাওয়া যায়†। অথচ সংখ্যায় অত্যন্ত কম হইলেও বৈজ্ঞগণও বঙ্গসমাজে শীর্ষস্থানেই অবস্থিতি করিতেছেন। ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, একবার যিনি যে স্থানে আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহাকে যে সেই স্থানেই চিরদিনই থাকিতে হইবে, তাহা নহে, গুণ কর্ম্মানুসারে তাহার উপরে উঠা ইতিহাস একাধিক স্থলে স্পষ্টভাবে সমর্থন করিতেছে। অন্যদিকে আবার ইহাও বিবেচ্য! যে নীচ হইতে যখন উপরে উঠা হইয়াছে, তখন উপর হইতেও অনেককে নীচে নামিয়া আসিতে হইয়াছে। উত্থান ও পতন জগতের নিয়ম। সুতরাং আজ বাহাদিগকে নিম্নশ্রেণী বলা হইতেছে, তাহাদের মধ্যে হয়তো কত অবনীত উচ্চশ্রেণী রহিয়াছে, অবস্থা বৈশিষ্ট্যে তাহাদিগকে হ্রদশাগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। এখন তাহাদিগের উদ্ধগমনে বাধা দিলে সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে না। একদিকে যেমন চিরপ্রচলিত প্রথা(Tradition) বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে, অন্যদিকে সময়ের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া সমাজকে বিপদাপন্ন করা হইবে। বাহার মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আসে, তাহাকে কখনও নীচু করিয়া রাখা যায় না। বঙ্গের উপজাতি সকলের মধ্যে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া কোনও চক্ষু-মান্ব্য ব্যক্তিই বলিতে পারেন না, যে যে যেখানে আছে, তাহাকে আর সেইখানে রাখা যাইতে পারে। অন্য কোনও বিচার নিরপেক্ষ হইয়াই ইহাদের পথ খুলিয়া দিতে হইবে। *অপরপক্ষে জাতীয় জীবনের দিক হইতে বিচার করিলেও এই সিদ্ধান্ত জাতীয়

জীবনে আজ যে সমস্ত আসিয়াছে, তাহার পূরণের জন্যও সকলকে পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে। অ্যুপেক্ষিক ও নিরপেক্ষ উভয় বিচার যেখানে এক পথ নির্দেশ করিতেছে, সে পথে না যাইয়া অন্য পথে যাইতে চাহিলে যে বিপদকেই ডাকিয়া আনা হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং নুতন করিয়া শ্রেণীবন্ধন এখন অবশ্য কর্তব্য।

ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, নুতন অবস্থায় নুতন সমস্তায় নুতন করিয়া শ্রেণীবন্ধন যুগে যুগে হইয়াছে। বর্তমান যুগের সমস্তা পূর্বকাল কোনও যুগের সমস্তা অপেক্ষা জাতীয় জীবনের পক্ষে কম প্রয়োজনীয় নহে। প্রথম সমস্তা উপস্থিত হয়, যখন আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া অনার্য্যগণকে বশীভূত করতঃ সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। এরূপক্ষেত্র এখনও বাহা ঘটিয়া থাকে, তখনও তাহাই ঘটিয়াছিল। আর্য্যগণ সংখ্যায় অল্প ছিলেন, সুতরাং বাধা হইয়া দস্যুগণকে আপনাদের সেবার নিযুক্ত করিলেন। আর্য্যসমাজে তাহাদের অস্ত্র অধিকার রহিল না, কেবল সেবার অধিকার। একজন সেবা করিবে, অস্ত্র জন সেবা গ্রহণ করিবে, উভয়ের মধ্যে এইমাত্র সম্বন্ধ। এখনও তাহাই হয়। এদেশবাসী শ্বেতকার্য্যগণ সেবা গ্রহণ ছাড়া অস্ত্র কোনও সম্বন্ধে দেশীয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ হইতে প্রস্তুত নহেন। আমেরিকায় শ্বেতকৃষ্ণের ভেদও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কৃষ্ণকার্য্যের সেবা ছাড়া জীবন ধারণ সম্ভব নহে, কিন্তু সেমাত্র তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। কৃতজ্ঞ হওয়া দুয়ের কথা, উহাকে মানুষ বলিয়াই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। অতি সামান্য দোষই বিনা বিচারে প্রাণদণ্ড। একটা মহা ভয়ে

† চাণালো ভ্রাতৃবৈজ্ঞোচ ব্রাহ্মণ্য্য করিয়াছেন।

বৈজ্ঞায়াংশ্বেব শ্রুত লক্ষ্যস্বত্বপদার্থঃ :

উপর সকল আইন কাহুন প্রস্তুত হইয়াছিল, যদি অনার্য্য সংশ্লিষ্টে আর্থের অবনতি ঘটে। ইহা হইবে বৈদিকযুগের সমস্তা—ঈশ্বর ও দাসের মধ্যে যেখা টানিয়া এ সমস্তার পূরণ হইল। দাস্যগণ সমতল ছাড়িয়া পক্ষিতে আশ্রয় লইল। ফল ভাগ হইল না, তাহারা এখনও সেই বর্ক-রই সহিয়াছে। অনেকে ইচ্ছার অনিচ্ছায় দাসত্ব গ্রহণ করিয়া সমতলেই রহিল এবং আর্গাসম্পর্শে দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়া দ্বিজশূত্রের মধ্যস্থত বাধা ত্যাগিয়া দিলেন। সব একাকার হইয়া গেল। আর্থ্য অনার্য্য মিলিয়া এক মহা জাতির সূচনা হইল। বৌদ্ধ ধর্ম পাঁচ শত বৎসর অপ্রতিহত প্রভাবে ভারতে রাজত্ব করিল। তারপর ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণাধর্ম মণ্ডক তুলিতে লাগিল—প্রধুমিত বহি বারে ধীরে জলিয়া উঠিল। আবার নূতন করিয়া শ্রেণীবন্ধনের প্রয়োজন হইল। এবার আর দ্বিজশূত্রের ভেদ নহে, ব্রাহ্মণ-শূত্রের ভেদই মূলমন্ত্র। ব্রাহ্মণ ও শূত্রের মধ্য হইতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য যেন মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা হইয়াছে। আর কোথায়ও না হউক, বঙ্গদেশে সে চেষ্টা সফল হইল। বঙ্গদেশেই বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী বিস্তারিত হইয়াছিল এবং অধিক দিন স্থায়ী হইয়াছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণের ক্রোধ বঙ্গদেশের উপর যে অধিক মাত্রায় পতিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এ সময়ে যে শত্রু দি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্মণের ক্ষমতাকে সর্বতো-মুখী করিবার চেষ্টা হইয়াছে! বৌদ্ধপ্রভাবে শূত্র যে দ্বিজজাতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল, ব্রাহ্মগণ এ আক্রমণে জলিয়া মরিতেছিলেন, এখনও প্রতিশোধ লইবার সময় আসিল। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা আর প্রতিরোধ করা

যায় না। কিন্তু কুরুক্ষত্রকারিগকে (lynch) লিঞ্চ করা গেল না বটে, তাহাদের বংশধর-গণের উপর যত চোট, পড়িল। প্রতিলোম বিবাহোৎসব জাতি সকলকে বাহিয়া বাহির করিয়া তাহাদিগকে চেয়ে স্থগিত করিয়া দেওয়া হইল। এক্ষণে কিঞ্চদস্ত্রী আছে যে, বঙ্গদেশ এতই বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, কে ব্রাহ্মণ, কে শূত্র, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর হইল। সুতরাং বিদেশ হইতে পক্ষ ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রবাদ রচিত হইল। এ প্রবাদ সত্য কি মিথ্যা, সে বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়াও এ কথা বেশ বুঝা যায় যে, বঙ্গের নূতন শ্রেণীবন্ধনে ব্রাহ্মণের ক্ষমতাই অপ্রতিহতরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল, কাহারও পূর্বেতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা হইল না। কায়স্থগণের উন্নয়নের প্রবাদও এই কথারই সাক্ষ্য দিতেছে। যিনি নিঃ-সঙ্কোচে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ, আর যিনি তাহা করিলেন না, তিনি নিকৃষ্ট। বঙ্গদেশও তো হিন্দুদেশ? তবে এখানে ক্ষত্রিয় বৈশ্য একেবারেই নাই কেন? নব শ্রেণীবন্ধনে ব্রাহ্মণ স্বীয় প্রাধান্য সম্পূর্ণ বজায় রাখিবার জন্য যজ্ঞযজ্ঞ কেবল নিজের জন্য রাখিয়া আর সকলকে একেবারে শূদ্রে নামাইয়া দিয়াছিলেন। যাহারা প্রাধান্য স্বীকার করিল, তাহাদের তো এই দশা, যাহারা স্বীকার করিল না, তাহাদের কি দশা হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ক্ষত্রিয় সহজেই স্বাধীনচেতা, বৈশ্যেরও জীবিকা স্বাধীন বলিয়া সে সহজেই দাসত্ব স্বীকার করে নাই। এইজন্য বৌদ্ধবিপ্লবের পরে যে সমাজ হইল, তাহা হইতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য একে-বারে লোপ পাইল। ব্রাহ্মণ ইহাদিগকে হাত না পাইয়া রাজার সাহায্যে ইহাদের উপর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন—ইহাদিগকে

সমাজে অতি নীচ করিয়া দিলেন। পরে যখন ইহার ব্রাহ্মণ প্রাধান্য স্বীকার করিলেন, তখন নীচ আর গেল না। প্রথম প্রথম martyr-গণের যে সম্মান হয়, পরে আর তা হয় না, আমরা তো ইহা স্বচক্ষেই দেখিতেছি। প্রথমে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করিলে হয়তো যাহারা অতি উচ্চস্থান পাইতেন, তাহারা ই অবস্থার বৈচিত্র্যে নীচ জাতি বলিয়া ঘৃণিত হইতেছেন। স্তত্রায়ং আবার নূতন অবস্থা আজি যাহারা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য দাবী করিতে ছেন, তাহাদের সে দাবী উপেক্ষা করা যুক্তি যুক্ত হইবে না। সময়ের চিত্র দেখিয়া মনে হইতেছে, আবার নূতন বন্ধনে সমাজকে বাধিতে হইবে, প্রাচীন বন্ধন আর কেহ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। জাতিভেদ সংস্কারের প্রথম উত্তম যাহারা পশ্চাৎ ফিরিয়া ছিলেন, এখন দেখা যাইতেছে, ঘুরিয়া ফিরিয়া সোজাভাবে না হউক, বক্রভাবে তাহারা আবার এই দিকেই আসিতেছেন। জটিল মন্ত্রের প্রস্তাব ইহারই ফল। বঙ্গের কায়স্থের সঙ্গে এক নাম সাদৃশ্য ছাড়া পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের আর সাদৃশ্য কোথায়? বঙ্গের উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও উচ্চশ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে সাদৃশ্য কি ইহা অপেক্ষা শত গুণ বেশী নহে? দেশের এক অংশে বাসহেতু একই আচার পদ্ধতির অধীন বলিয়া এবং একই শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবে যুগের উচ্চশ্রেণী মধ্যে পার্থক্য একেবারেই চলিয়া গিয়াছে। আদান প্রদান ইহাদেরই মধ্যে কি সর্বোত্তম প্রচলিত হওয়া অধিকতর সমীচীন নহে? জাতিভেদের বাহা বিষদন্ত, তাহা শো ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যাহাদিগকে নিম্নশ্রেণী বলা হয়, তাহারাও যে আপনাদিগকে নীচ মনে করিত, ইহাই ছিল জাতিভেদের বিষদন্ত। যখন

জাহ্নবী আর আপনাদিগকে নীচ মনে করে না, উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে সমান আসন পাইবার জন্য আকাজক্ষা করিতেছে, উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে একাসনে বসিবার যে স্বাভাবিক বাধা ছিল, তাহা যখন দূরে পরিহার করিতেছে, তখন জাতিভেদেরাতিভিত্তিমূল একেবারেই আলগা হইয়া গিয়াছে। এখন উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণীর দিকে ঐ ভাবে তাকাইলেই হয়। তাহা হইতেও বেশী দেয়ী লাগিবে না। এক শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়া, এক আকাজক্ষা হৃদয়ে ধরিয়া, এক সাধনায় যাহারা অগ্রণের হইতেছেন, তাহাদের মধ্যে একজন আর একজনকে অধিক দিন নীচ মনে করিয়া থাকিতে পারিবেন না, সমান বিভা বুদ্ধিসম্পন্ন স্বায় উপজাতির মধ্যে সমান সম্ভ্রান্ত হই জন জন্ম যখন একাসনে বসিয়া সর্বসাধারণের কাছে একই সমান লাভ করেন, তখন তাহারা আর বেশী দিন আপনাদিগকে উচ্চ নীচ ভাবিতে পারিবেন না। স্তত্রায়ং অচিরে নূতন আদর্শে নূতন শ্রেণী বন্ধন অবশ্য প্রয়োজন হইবে। ইহার মূল ভিত্তি কি হইবে? বৈদিক যুগের শ্রেণীবন্ধনের মূল ভিত্তি ত্রিভুজ শূদ্রের ভেদ, খেত কৃষকের মধ্যে প্রাচীর তুলিয়া পরস্পরকে ভাগ করিয়া রাখা হইয়াছিল। যাহারা সকল লাঞ্ছনা সহ করিয়া রহিল, তাহারা আৰ্য্য সংস্পর্শে মনুষ্য লাভ করিল, আর যাহারা রহিল না, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জঙ্গলে গেল। তাহারা আজও পশুত্ব অতিক্রম করিতে পারে নাই। বৌদ্ধ-যুগের পরে যে সমাজের পতন হইল, তাহার মূল মন্ত্র সর্বোপরি ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, যে সে প্রাধান্য স্বীকার করিয়া “দাস” আখ্যা গ্রহণ করিল, সে শুদ্ধ হইল, নীচ হইলেও উচ্চতা লাভ করিল। যে স্বাধীনতার গৌরবে

ব্রাহ্মণ-প্রাধিক্ত মন্তক পাতিয়া গ্রহণ করিল না, স্বতন্ত্র রহিল, ব্রাহ্মণের ক্রোধাধি তাহাকে ভয়ভূত করিল। সে কোপে ক্রুদ্ধ বৈশ্য ও শূদ্রাধম হইয়া গেল। তবে এখন এ যুগের স্মরণ কি হইবে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া উচ্চ নীচের ভেদ কল্পনা করা যাইবে? এ যুগের স্মরণে সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থ থাকিবে না। এ যুগে স্বদেশ নামক একটা বস্তু আমাদের দৃষ্টিপথান্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এ বস্তুটা যে আমরা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা নহে, আয়ত্ত হইয়া থাকিলে আজ “স্বদেশী” অস্ত্র আকার ধারণ করিত— কিন্তু সে বস্তু যে দৃষ্টিরেখার মধ্যে আসিয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। পূর্ণিমোজ্জ্বল নিখিল আকাশে তাকাইয়া থাকিলে যেমন অতি দূরে পাখীর ক্রীড়া দেখা যায়, পাখী কখনও বা দৃষ্টিপথে পড়ে, কখনও বা অনেক-দূর তাকাইয়া থাকিতে হয়, দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ আধুনিক শিক্ষা-বিধৌত ভারতের নিখিল আকাশে “স্বদেশ-পাখী” উড়িয়া বেড়াইতেছে, কখনও চোখে পড়ে, কখনও বা পড়ে না! কিন্তু পাখী যে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই। পাখী ধরা দিবে বলিয়াই আসিয়াছে। তবে সময়ে সময়ে আমাদের অভিসন্ধি সম্বন্ধে

সন্দেহান ‘হইয়া পালাইয়া যায়, আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু পাখীর স্তম্ভুর সঙ্গীত আমাদের কর্ণকুহরে ইতিপূর্বেই প্রবেশ করিয়াছে। এমন দিন দূরে নয়, যেদিন পাখীর স্তম্ভুর-লহরীতে আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণ সুবরিত হইয়া উঠিবে। স্বদেশ পাখী আমাদের কাছে ধরা দিবার জন্তই আসিয়াছে। এই স্বদেশের মঙ্গল চিন্তাই এযুগের মহত্ব লাভের সোপান স্বরূপ হইবে। এ যুগের শ্রেণীবদ্ধনের ভিত্তিমূলে থাকিবে শিক্ষা ও স্বদেশ-সেবা। যিনি এ কার্যে যত অগ্রসর, তিনি তত বেশী মহত্ব লাভ করিবেন। যে ব্যক্তি বা যে সম্প্রদায় স্বদেশের মঙ্গল কার্যে যত বেশী আত্মোৎসর্গ করিবেন, তিনি তত বেশী উচ্চাঙ্গ লাভ করিবেন। এ যুগে অস্ত্র সকল ক্রটিম ভেদ বিলুপ্ত হইবে। এক মাত্র ভেদ থাকিবে, স্বদেশ-সেবা ও স্বদেশ-ক্রোধের মধ্যে। যিনি ‘ব্যক্তিগত বা উপজাতিগত স্বার্থের জন্ত জাতীয় স্বার্থের বিঘ্ন উৎপাদন করিবেন, তাহাকে এ যুগের “পারিষা” সাজিতে হইবে—তিনি ব্রাহ্মণই হউন আর চণ্ডালই হউন। নব যুগের নব ধর্মশাস্ত্র স্বদেশ-পুণ্যে লিখিত হইবে—

‘চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ দেশভক্তি-পরায়ণঃ’।
দেশচর্যাবিহীনস্ত দ্বিজোপি অপচাধমঃ’।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

প্রতাপাদিত্য ।

(ভগ্নানন্দের প্রতি প্রতাপাদিত্যের উক্তি)

কি দেখিছ দ্বিজবর, লোহার পিঞ্জরে
বন্দী সে পারীক্ষ যবে, কৃতার্থ হৃদয়ে
আসে যথা নেহারিতে নিষাদ কোশলী !
প্রতাপের রক্তে স্নানি যাও হারা করি
লইবারে রাজটীকা—বাহিত্ত গোরব ।
লুটিয়া স্নেহের পদে দিও উপহাব
প্রতাপের ছিন্ন শির—কতু যাহা নত
হয় নাহি দেশ অগ্নি যবন-চরণে ।
“জননী জনম ভূমি” শিখিলু কৈশোরে
মহামন্ত্র, দেহ প্রাণ সঁপিছ অমনি
মাতৃ পদে ; দেখিয়াছে আক্ৰমণে দেবতা,
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ—দেখিয়াছে ভবে
নর নারী ; মানবের যা’কিছু সম্বল
ভক্তি, শক্তি, ইচ্ছা, সাধ সঁপিছ সকলি ।
একই কামনা চিতে, একই সাধনা,
তাড়াইয়া সিদ্ধ পারের অধর্ম্ম যবনে
যুচায়ে বন্ধন দশা সাজাব আবার
রাজ রাজেশ্বরী মা’রে ! হইবে সহায়
ভাতৃ ভাবে হিন্দু যত, সহধর্ম্মী মম ।
তখন জানি না হায়, ক্ষত্র কুলান্দার
মানসিংহ-অর্থ লোভী স্বার্থপরতায়
বিক্রীত স্নেহের পদে ! নাহি বহে আর
ক্ষত্র রক্ত দেহে তার—তা’হলে কি কতু
রাণা প্রতাপের বাণী—দৈববাণী সম,
—কহিলা যা’ রাজরথী মুমূর্ষু দশা
উদ্দেশি ক্ষত্রিয়গণে, অগস্ত্য সে শ্রম,
সেই কথা, নরাদম পারিত ভুলিতে ?
কহিলেন মহারাণা “চিতোর আমার
পুজনীয়, বরণীয়, দেবতা, জননী ।

তাহারি উদ্ধার তরে পথের কাঙাল
সাজিয়াছি, অনশনে পুত্র কন্তা জারা
কত দিন মৃত প্রায় দেখেছি নয়নে !
দেব-আশীর্বাদ সম বরিয়াছি সদা
নিদাকণ দরিদ্রতা—মাতৃ-সেবা-কালে
কোন্ ক্ষোভ হুখে ক্লাস্ত সন্তানের হিরা
তোমরা রহিলে আজি—বিধির আদেশে
চলিলু অভাগা আমি—চিতোর আমার
রহিল বন্দিনী হয়ে স্নেহ-কারাগারে !
বীর-কূলে জন্মিয়াছ ক্ষত্রিয় তনয়
তোমরা, স্মরিও সবে শেষ ভিক্ষা মম ।—
উদ্ধারিতে মাতৃভূমি (ভোগ স্মৃৎ ছাড়ি)
দিও ঢালি তুমুন ; কুমারে আমার
শুনাইও, জাগাইও, এ অবনী-তলে
চলে যেন অনুসরি পিতৃ পথ তার ;
যেখানে যে হিন্দু আছ করিও স্মরণ,
জননী জনমভূমি পর-পদানতা,
যত দিন নাহি হয় তাঁহার উদ্ধার
তত দিন ধিকারিত সন্তান-জীবন ;
একতা শক্তির বলে অবশ্য পারিবে
বিচূর্ণিতে দম্মাদলে, পূর্ণ সাধনার ।”
হায়, নীচ স্বার্থপর বিশ্বিত সাগরে
ডুবাইল সে নিদেশ !—বদেশ-সেবক
আমারে বধিতে, মৃত তোমার সহায়ে
আসিল নিভৃত দেশে, স্মরণ যেমতি
সকরে রোগের সাথে মানব-শরীরে ।
যা’ ছিল শক্তি মম বৃথিছ সময়ে
স্নেহ সেনাপতি সহ—হায়রে নিরতি ;
যুগেন্দ্র পিঞ্জরে বন্দী জঘন্য কোশলে !

ভাবিছ, প্রসন্ন মুখে দিবে উপহার
জীবন্ত প্রতাপে লয়ে যবন সকাশে ।—
কতু নহে ! মৃত দেহ লয়ে যাবে তহি
গৃধ্রিনী কুক্কুর শিবা শকুনির সম !

প্রাপ নিধনে দৌড়ে পাবে পুরস্কার
জাহাঙ্গীর সন্ন্যাসনে, সেই ধন মান
ভূজিবে সহস্র বর্ষ পুত্র পৌত্র সহ ।
রবি শশী যত দিন রহিবে জগতে —
সমস্ত জগত ভরি জাগিবে কাহিনী ।

নাহি দিক্কারিব আমি, দিকৃত যেজন
চরাচরে, তারে কিবা কহিব কুবাণী ?
এই ক্ষোভ—এত তুষা যদি ছিল মনে,
ভবানন্দ ! মনানন্দে না মাগিলে কেন
মম সহ রণ, হয়ে যবনের দাস
কেন প্রবেশিলে হেন কাপুরুষ রূপে ?
ভারতের ইতিহাস কলঙ্কিত করি
লিখিলে যে পাপ নাম চিরকাল তরে,
যমুনা জাহ্নবী পদ্মা সব বারি দিলে
সে কলঙ্ক-পঙ্ক তবু নারিবে ধুইতে !

জননী জনমভূমি যশোহর মম !

নাকানি কে ভাগ্যবান্ কোন সুপ্রভাতে
খুলিয়া বন্ধন তব, রাজ-রাজেশ্রী
সাজাইবে, মধু যথা সাজায় যতনে
হিমালীর জরাজীর্ণ বহুগা জননী ।
কতই রহিল আশা—পাবক যেমতি
আগ্নেয় গিরির বক্ষে ; অলক্ষ্যে দেখিছে
মহাশক্তি মহাকালী অভীষ্ট দেবতা ।
অকপট ভক্ত আমি, সমস্ত জীবন,
জীবনের বাহা কিছু সঁপেছি তোমারে !
আজি সে আশার মনে ত্যজিছ—দেবতা !
সাক্ষী তুমি, সাক্ষী হও রবি, শশী, তারা,
অনল, অনিল, ব্যোম, দিকপালগণ,
সাক্ষী এই প্রতাপের উদ্দাম হৃদয়,
আজি সে আশার মনে ত্যজিছ সকল
জীবনের প্রয়োজন—প্রিয় যত তব ।
উন্নত কামনা-ভঙ্গ্য মাথিয়া পরাণে
ত্যজিলাম অম্লতল পার্থিব বাসনা !*
এখন কোথায় তুমি প্রাণ প্রিয়তম !
হে মরণ ! তরা আসি বাঁচাও প্রতাপে ।

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী

ভারত-সংস্কার

বর্তমান বর্ষের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের
নব্যভারতের ৬০ পৃষ্ঠার “প্রকৃতির পরিশোধ”
নামক প্রবন্ধ লেখক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ
চৌধুরী মহাশয়, ক্ষত্রিয়চ'ব গৃহীত কায়স্থ
সমাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উক্ত প্রবন্ধের
ফুট-নোটে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,
তাছাড়া নব্যভারতের পাঠকবৃন্দের মনোযোগ

প্রতাপ-আদিত্য রাজা মেল অনাহারে ।

বৃত্তে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে ।

ভারতচন্দ্র ।

আকর্ষণ করিতেছি । সেই ক্ষুদ্র মন্তব্যটাই
এই—

“বঙ্গদেশে এক দল ক্ষত্রিয় লাতের জন্ত
উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন । তাঁহাদের মনের
ভাব এই যে, তাঁহারা নিতান্তই ক্ষত্রিয়, তবে
গায়ের জোরে অস্ত্রেরা তাঁহাদিগকে শূদ্র
করিয়া রাখিয়াছে । সুতরাং কলমের জোরে
শূদ্র ঘুচাইয়া ক্ষত্রিয় স্থাপন করিতে হইবে ।
বাহার এক দিন স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া
দাস আখ্যা গ্রহণ করতঃ শূদ্র বরণ করিয়া-
ছিলেন, কেবল বরণ করিয়াছিলেন, এমন নহে,

কিন্তু লক্ষ্য-শূন্য হইয়া সেই দাসকেই কোলীভ
রূপ বর্ণে উত্তিবার সিঁড়ি বানাইয়াছিলেন,
তাঁহার। এখন অস্ত্রের ঘুড়ি ঘোষ চাপাইলে
চলিবে কেন? বরং যিনি প্রকৃত ক্ষত্রেজ
দেখাইয়া মস্তব্য বজায় রাখিয়াছিলেন,—দত্ত
ভূতা নহে সঙ্গে এসেছে—তাহাকে ত সমাজে
হীন করিয়া রাখা হইয়াছে; বাহা কর্ষ ঘোষে
গিয়াছে, তাহা গুণকর্ষ বলে লাভ করিতে
হইবে। নতুবা গলায় একটা দড়ী ঝুলাইলে
ফল কি? ফল সময় বিশেষে দরকার হইলে
কেতুল কলসীতেই চলিবে।”

এই মন্তব্যটি আত্মোপাস্ত অসত্যের উপর
প্রতিষ্ঠিত, এবং ইহার ভাষা গ্রামা ও অভদ্রো-
চিত। একজন শিক্ষিত ব্যক্তির লেখনী এই
প্রকার ভাষায় কলঙ্কিত হইতে পারে, আগে
আমরা জানিতাম না। যদি জনসমাজে আদর-
নীর নবভারতের স্তায় পত্রিকার ইহা প্রকা-
শিত না হইত, তবে আমরা ইহাকে উপেক্ষা
করিতে পারিতাম। বিষয়াস্তর আলোচনার
সময়ে হঠাৎ নিন্দারূপে প্রাসঙ্গিক রূপে
কতকগুলি ত্যাগশীল সমাজ-সংস্কারকদিগকে
এই প্রকার আক্রমণ করা কতদূর স্মারসঙ্গত,
তাহার মীমাংসার ভার কৃতাব্য বীরেন্দ্র
বাবুর হস্তেই অর্পণ করিলাম।

আজ সপ্তবর্ষব্যাপী যে আন্দোলন-তরঙ্গ
বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজকে আলোড়িত করি-
তেছে, তৎপ্রতি প্রবন্ধ-লেখক যে আদৌ লক্ষ্য
করেন নাই, একরূপ হইতে পারে না; তবে
উক্ত আন্দোলনের “প্রয়োজনানিবেশ সম্বন্ধাঃ”
তিনি প্রবণ মননাদি দ্বারা বিশেষ রূপে অব-
গত হন নাই। কায়স্থ সমাজের প্রণী চতুর্দশের
বীজপুরুষগণ কোন্ সময়ে কি ভাবে বঙ্গে
আগমন করিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া-
ছিলেন, তাহার ইতিহাস তিনি নিশ্চয়ই অধ্য-
য়ন করেন নাই, নচেৎ আদিশুরের সভার
বজ্র ও দক্ষিণরাষ্ট্রীয় বীজপুরুষগণের যে
পরিচয় হইয়াছিল, তাহার প্রায় ৪ শত বৎসর
পরে বঙ্গালী কুলবন্ধনকে সমসাময়িক সংস্কার
সংস্কৃত করিয়া বীরেন্দ্র বাবু একটা অদ্ভুত
মীমাংসার উপনীত হইবেন কেন? উপ-
নিবেশিক কায়স্থদিগের ইতিহাস কুলাচার্য-
গণের লিখিত ভিন্ন ভিন্ন কুলপত্রিকার বিবৃত

হইয়াছে। কায়স্থ বীজপুরুষগণের জন্মভূমি
নামা ১ম আদিশুরের সময় হইতে আরম্ভ
করিয়া বল্লাল সেনের সময় পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন
সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজস্বক কর্তৃক বৈদিকাতার
প্রবর্তন ও বজ্রকার্য্য সুসম্পন্ন করিবার অভি-
প্রায়ে গোড় বঙ্গে আনীত হন। তৎপূর্বে ও
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে ত্রিঐতিহ্যগুণ
দেবের ত্রিগোড় শাখার আদিম মৌলিক
কায়স্থগণ বঙ্গে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন।
ধীরেন্দ্র বাবু যদি এই সমস্ত ইতিহাস মনো-
নিবেশ পূর্বক অধ্যয়ন করিতেন, তবে তিনি
জানিতে পারিতেন যে, তাঁহার মন্তব্যটি সমগ্র
বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের ঘোর অপবাদ ঘোষণা
করিতেছে। অবশ্য আমি এ কথা বলি না
যে, তিনি জ্ঞাতসারে এই অপবাদ (Libel)
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার ভ্রান্ত ধারণা
অপনোদন মানসে আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির
অবতারণা করিতে বাধ্য হইলাম।

কায়স্থ একটা যুগান্তরীয় অতিশুণ্ড
জাতি। পৌরাণিক যুগে এই জাতির, অন্ততঃ
“চিত্রগুপ্ত বংশান্যং ব্রাহ্মণত্বমাপদন্তে” ভবিষ্য
পুরাণে আমরা পাঠ করিয়া থাকি। কাল-
নেমীর পরিবর্তনে কায়স্থ ব্রাহ্মণ হইতে
শূদ্রে পতিত হইয়াছেন। আমরা কি ছিলাম,
কি হইয়াছি। এই যুগে, মহাজাগরণের যুগে,
আমরা কি একবার উত্তিবার চেষ্টাও করিব
না? আমরাদিগের জাতীয় ধর্ম ও অধিকার
পুনঃগ্রহণ করিতে একবার চেষ্টাও করিব
না? যদি উচ্চ জাতির উচ্চ আদর্শ (ideals)
হয়, তবে প্রকৃতির ক্রমবিকাশমুসারে
নীচত্বের জাতিবৃহ উর্ধ্বে উঠিতে না পারিলে
অবনতির দিকেই প্রধাবিত হয়। হয় উন্নতি,
না হয় অবনতি, এই সত্যের নিয়ম। কিছুই
স্থায়ী স্থায় স্থিরভাবে থাকে না। সেই নিয়মমু-
সারে বঙ্গের সমস্ত জাতি আজ বহুকাল
সংস্কারভাবে শূদ্রের দিকেই প্রধাবিত হই-
তেছে। শূদ্র শব্দের অর্থ বাহাই হউক না
কেন, আচার্য্যগণ জঘন্য শব্দকে পরিবর্তন
উহা সর্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভগ্নানু
মস্ত্র নিয়লিখিত শাসন বাক্য উদ্ধৃত করিয়া,
হলায়ুধ ভদ্রীর ব্রাহ্মণসর্বস্ব জিহ্বায়েছেন—

বোহানবীণা বিজ্ঞা বেদমন্ত্রজ কুরুতে ত্রয়ং।
স জীবন্তেব শূদ্রমশ্রুতগচ্ছতি সাধরঃ ॥

২ অঃ ১৬৮।

ইতি বদতা মনুনা বেদোহধোতর্থা ইত্যনেন
বেদার্থ জ্ঞান পরাশ্রুত ব্রাহ্মণশ্রুতম্বেব
প্রতিপাদিতম্ ॥

অর্থাৎ যে বিজ্ঞ বেদাধ্যয়ন না করিয়া
শাস্ত্রান্তর অধ্যয়ন করেন, তিনি জীবদ্দশাতেই
সবংশ শূদ্র প্রাপ্ত হন। মনু এই শাসনানু-
সারে ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়ন করিতেই হইবে,
অতএব বেদার্থ জ্ঞানবিহীন ব্রাহ্মণদিগের
শূদ্র প্রমাণিত হইল। এই হিসাবে বঙ্গের
৫৮/১৫ আনা ব্রাহ্মণই শূদ্র প্রাপ্ত হইয়াছেন।
কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজের রাজা, তাঁহার হস্তে
শাস্ত্র, তিনি উহাতে যথোপ্ত পূরিবর্তন উৎ-
ক্ষিপ্ত এবং প্রক্ষিপ্ত করিতেছেন। কার্য
রাজা প্রতাপাদিত্যের তিরোভাবে ব্রাহ্মণ ভবা-
নন্দ নবদ্বীপের সিংহাসন অধিকার করিলেন।
সময় পাইয়া স্বার্থ রত্নবুলন্দ উট্টাচার্য শিরো-
মণি তার শ্বরে ঘোষণা করিলেন—

“যুগেন্মন্ত্রে ধ্বজাতি ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এবচ।”

অর্থাৎ নিকট কশিযুগে ২টী মাত্র জাতি
আছে, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, বঙ্গের কত্রিয় কি বৈশ্য
জাতি নাই। এখন ধীরেন্দ্র বাবু দেখিবেন,
কলমের জোরে কার্য শূদ্র হইল, না
কার্য শূদ্র যুটাইয়া কত্রিয় স্থাপন করিল,
ইহার কোনটী সত্য। যেমন রাজনৈতিক
বিভাগে কলমের জোর লর্ড মরলী ও মিন্টোর
হস্তে ক্ষুদ্র রহিয়াছে, তদ্রূপ হিন্দুদিগের
সামাজিক ক্ষেত্রে কলম ত ব্রাহ্মণের হাতেই
রহিয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে যে সাত
হাজার কার্য কত্রিয়াচার্য গ্রহণ করিল, ইহা
কি কলমেই জোরে না গুল বিভাগে? বঙ্গ
ব্রাহ্মণ বিজ্ঞাচারী, আমি জিজ্ঞাসা করি,
কার্যগণ ব্রাহ্মণ হইতে কোন্ বিষয়ে হীন বা
অবনত যে, তাঁহারা ব্রাহ্মণের ভায় বিজ্ঞ
অধিকার করিতে পারিবেন না? আজ যদি
শূদ্র কার্য অধিকারে ভারতে বিজ্ঞ বিতরিত
হয়, তবে আমার বোধ হয়, ব্রাহ্মণ ও অসি-
জীকী- কত্রিয়ের সহিত কার্যের দাবি অগ্রণী
হয়। প্রজাদিত্য হইতে উৎপলাপীড় পর্য্যন্ত
বাল জন কার্য নৃপতি ২৬১ বৎসর পর্য্যন্ত

কাম্বীরে রাজ্য করিয়াছিলেন। দিঘিজয়ী
মহাপ্রজ্ঞা গোনন্দ বংশীয় কত্রিয় রাজা
বালাদিত্য তাহার একমাত্র কন্যা অনন্ড
লেখাকে অশ্ববোষ বংশীয় কার্য দ্বর্জ
বর্জনের সহিত বিবাহ দেন। কেন না দ্বর্জ
বর্জন সকল বিষয়ে বালাদিত্যের সমকক্ষ
ছিলেন—

‘হেতুং স্বরূপতামাত্মং কৃত্বা জামাতরং নৃপঃ।

অশ্ববোষ কার্যদ্বর্জকে দ্বর্জ বর্জনম্ ॥

প্রজয়া দ্যোতমানতং প্রজাদিত্য ইতি প্রথান্
রাজতরঙ্গিনী।

আবুল ফজেল, সাড়ে তিন শত বৎসর
পূর্বের কার্য সমাজের যে চিত্র তাঁহার
‘আইনি আকবরি’ গ্রন্থে অঙ্কিত করিয়া
রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠে আমরা
জানিতে পারি—

“The Zemindars are mostly
Kayasthas, their troops number
23330 cavalry, 801159 infantry,
1170 elephants and 4260 boats”
(Col. Jarrets Ani-in-akbari, Asiatic
Society's Edition, Vol II, page 129).

অর্থাৎ—তাৎকালিক ভূমাধিকারীরা প্রায়
সকলেই কার্য। তাঁহাদিগের সৈন্য সংখ্যা
২৩৩৩০ অশ্বারোহী, ৮০১১৫৯ পদাতিক,
১১৭০টা হস্তী, এবং ৪২৬০ নৌকা। ষাঠা-
দিগের ৮ লক্ষ সৈন্য ছিল, সেই জাতির
দুর্দশা আজ এতদূশ কেন? যে মসীজীবী
জাতি গোড়বঙ্গে প্রধান অসিজীবীর আসন
গ্রহণ করিয়াছিল * তাহার শক্তি লোপের
প্রধান কারণ, ধর্মের মানি, উট্টাচার, হেতু

* আইনি-আকবরিতে লিখিত আছে যে, কার্য
ভোজ বংশজাত ২ জন, নৃপতি ৫২০ বৎসর বঙ্গদেশে
রাজ্য করিবার পর অষ্ট কুলজাত কার্য জয়ন্তপুর,
যাঁহাকে আদিশুর বলিত, তৎবংশীয় ১১ জন নৃপতি
১১৪ বৎসর রাজ্য করেন। তদনন্তর পাল বংশীয়
ভূপাল রাজা হইতে দশ জন নৃপতি ৬৯৮ বৎসর রাজ্য
করেন। পাল বংশীয় নৃপতিগণের অবর্ত্তানে কার্য
ওকাসন হইতে সেনবংশীয় ৭ জন নৃপতি ১০৬ বৎসর
রাজ্য করেন। এই সময়ে মোট ২০২৮ বৎসর বঙ্গ-
দেশে, কার্য রাজাদিগের শাসনাধীন ছিল। ব্রীটির
যোড়ণ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ বাহন ভৌমিকের
(১২তুইয়ারা) শাসনাধীন ছিল, তদন্তে প্রতাপাদিত্য-
এম্ব ৩ জন কার্য রাজা ছিলেন।

একতার অভাব, স্বার্থপরতা, ইঞ্জিরপর-
রণতা, পরশ্রীকাতরতা ও বিবেচনাবুদ্ধি।
কায়স্থ ভারতে প্রায় অন্ধ কোটী, যিনি সামান্ত
ভাবে কায়স্থ জাতির বর্তমান অবস্থা পর্য্য-
লোচনা করিয়াছেন, তিনি দেখিবেন, বঙ্গীয়
দশলক্ষ কায়স্থ ব্যতীত আর চল্লিশ লক্ষ
কায়স্থ বিজ্ঞাচারী। যজ্ঞোপবীত গ্রহণ না
করিলে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী দারাদগণ সহ
আমরা মিশ্রিত হইতে পারিতেছি না।
আমরা এক পিতার সন্তান হইয়াও আর কত
কুল ধর্মভেদে ভাই ভাই ঠাই ঠাই হইয়া
রহিব? আমাদের মিলনের দিন প্রত্যাসন্ন।
যজ্ঞোপবীত অর্থাৎ ক্ষত্রিয়তার গ্রহণ না
করিলে আমাদের মিলন অসম্ভব। বঙ্গীয়
শ্রেণী চতুষ্টয়ের মধ্যে সমীকরণের একমাত্র
উপায় যজ্ঞোপবীত গ্রহণ। যিনি চক্ষুমান
হইয়াও অন্ধ থাকিতে ভালবাসেন, তাঁহাকে
কেমন করিয়া বুঝাইব? ভারতীয় সূর্য্য
বংশীয় মসৌজীবী কায়স্থ ক্ষত্রিয় বঙ্গে আসিয়া
শূত্রাচারী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের স্বধর্মের
সহিত জাতীয় সমস্ত গৌরব অস্ত্রহিত হই-
য়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ প্রকার জাতীয়
অধঃপতন আর কতরাপি দৃষ্ট হয় না। ভগবান
মহু লিয়াছেন—

“বরং স্বধর্মো বিপুলঃ ন পারক্য স্বহুষ্টিতঃ।

পর ধর্মেণ জীবনহি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ ॥

অর্থাৎ—অন্ত বর্ণের ধর্ম সর্বাঙ্গসুন্দর
হইলেও অন্নহীন স্ববর্ণোচিত ধর্ম পালন
করিবে, কেননা পরবর্ণের ধর্মায়ুষ্ঠানে সন্-
কাল মধ্যেই জাতি-পাত অবশ্যজ্ঞাবী।
গীতার শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

“শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিপুলঃ পরধর্ম্যাং স্বহুষ্টিতাং।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥

অর্থাৎ—স্ববর্ণোচিত ধর্ম সর্বাঙ্গসুন্দর না
হইলেও সম্পূর্ণরূপে অহুষ্টিত পরবর্ণের ধর্ম
হইতে শ্রেয়। নিজবর্ণ ধর্ম পালনে মৃত্যুও
বাহুনির্য, কেননা পর ধর্ম ভয়ানক। এই
সকল আশু বাক্য আর্ধ্যগণ চরম সত্যরূপে গ্রহণ
করিয়াছিলেন। আশু অর্থেক্ষম প্রমাদাদি
পরিশুদ্ধ পুরুষ, বাহারা অপূর্ণ বীণকর্তা বলে
চরম সত্যগুলি অবলোকন করিতেন। পরধর্ম
গ্রহণ করিলে জাতি বিশেষের কত দুর্ অনিষ্ট

হয়, তাহা বঙ্গীয় কায়স্থ জাতিতে বিভ্রম।
কায়স্থ ক্ষত্রিয় বৌদ্ধ উৎপাতে বজ্রহত্যাদি
ত্যাগ করিয়া কি বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছিলেন;
তাহা ধর্মবান্ধব মিশ্র তদীয় বঙ্গ কুলগণি-
কায় এইরূপে চিত্রিত করিয়াছেন :—

গৃহীত্যাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থাবিপ্রমানধাঃ।

ততাজ্ঞানং বজ্রহত্যং গায়ত্রীকং তথা পুনঃ ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সম্মান রক্ষার্থে কায়স্থগণ
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতঃ বজ্রহত্য ও গায়ত্রী
ত্যাগ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ রাজার অত্যা-
চার হইতে নিরুত্তি পাইবার জন্য ও ব্রাহ্মণ
সমাজের মান রক্ষার্থে অতি মনস্কণে কায়স্থ
বৌদ্ধ পুরুষগণ ক্রমে ক্রমে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ
করিয়াছিলেন। আজ সময় পাইয়া অমুকুল
রাজ্য শাসনে যখন কায়স্থগণ তাঁহাদিগের
পুণ্ড্র গৌরব ও জাতীয় চিহ্ন উদ্ধার করিতে
ছেন, তখন সেই ব্রাহ্মণ সমাজ, বাহা-
দিগের মঙ্গলার্থে উহা পরিত্যক্ত হইয়াছিল,
কায়স্থের প্রতি খড়্গহস্ত! ইহা অপেক্ষা
পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে ॥

এহাঙ্গণে, ৭৩০ খ্রিষ্টাব্দে আদিশূর রাজার
সভায়, বঙ্গ ও দক্ষিণ রাষ্ট্রীয় বৌদ্ধ পুরুষগণ,
পঞ্চ ব্রাহ্মণের যে দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি-
লেন, তাহার একটা চিহ্ন পাঠকগণের সমীপে
উপস্থিত করিতেছি। এতৎ সম্বন্ধে ধীরেন্দ্র
বাবুর উক্তি—“বাহারা এক দিন বেচ্ছাপ্রপে-
দিত হইয়া দাস আখ্যা গ্রহণ করতঃ শূদ্রত্ব
বরণ করিতেছিলেন, কেবল বরণ করিয়া-
ছিলেন, এমনত নহে, কিছু লজ্জাশূন্য হইয়া
সেই দাসত্বকেই কোলীনা রূপ স্বর্গে উত্তি-
বার সিড়ি বানাইয়াছিলেন, তাহারা এখন
অন্তের ঘাড়ে দোষ চাপাইলে চলিবে কেন?
বরং যিনি প্রকৃত ক্ষত্র তেজ দেখাইয়া মহাব্য-
রজার রাখিয়াছিলেন—দত্ত ভৃত্য নহে সদ্ধে
এসেছে—তাঁহাকে ত সমাজে হীন করিয়া
রাখা হইয়াছে; বাহা কর্তৃক দোষে গিয়াছে,
তাহা গুণকর্তৃক বলে লাভ করিতে হইবে।”

ইংরেজ কবি পোপ বলিয়াছেন—Little
learning is a dangerous thing.
অর্থাৎ অল্প বিজ্ঞা প্রলয়ঙ্করী। ধীরেন্দ্র বাবু
পৃথক পৃথক তিষ্ঠতি ঘটনার উল্লেখ করিতে-
ছেন, ১ম বেচ্ছার দার্শন্য গ্রহণ, ২য় শূদ্রত্ব

গ্রহণ, তৃতীয় দাসত্ব রূপ সোণান 'ঘায়া' কোলীনা রূপ স্বর্গে আরোহণ। তাঁহার ধারণা এই যে, কার্যস্থ বীজপুরুষগণ দাসাখ্যা গ্রহণ করতঃ শূদ্রত্ব বরণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ উভয় ঘটনা সমসাময়িক ও কার্য্য কারণ শৃঙ্খলে সমাবদ্ধ এবং কোলীনা মর্যাদা পাইবার জন্যই দাসাখ্যা গ্রহণ ও শূদ্রত্ব বরণ করিয়াছিলেন। যিনি সামান্য ভাবে কার্য-স্বেতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, এই সমস্ত বিবরণ ধীরে ধীরে বাবুর কল্পনা প্রসূত। এবং ইহার সহিত সত্য ঘটনার কোন সংশ্রব নাই। দাসাখ্যা

গ্রহণ, হ'র আদিশূর (বিজয় সেনের) সমুদ্র হর; কার্যস্থ বীজ পুরুষগণ, কি তাঁহাদিগের বংশধরগণ কেহই কোন কালে শূদ্রত্ব গ্রহণ করেন নাই। যিনি এই প্রকার কার্যস্থ সমাজের অপবাদ ঘোষণা করিতে পারেন, তাঁহার বিরুদ্ধে আইনতঃ লাইবেলের অভিযোগ হইতে পারে। যাহারা দাসত্ব কি শূদ্রত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, বল্লালের কুলবন্ধনে কোলীনা মর্যাদার অতিদূরে তাঁহাদিগকে রাখা হইয়াছিল। ফলতঃ বল্লালের কুলবন্ধন গুণ কর্ম্ম বিভাগে সম্পাদিত হইয়াছিল।
ক্রমশঃ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার।

মহাপ্রাণ ।

১
যে জন কাঁদিয়া গেল এই মর্ত্যবাসে,
আপনার কেহ যার কাঁদিবার নাই,
আজি তার জন্মশোধ অন্তশয্যা পাশে,
নীরবে নীড়ায় তুমি কে পথিক ভাই ?

২
সুধাই তোমারে ভদ্র, আজি নিরালস্য,
সেকি গো একেলা হেথা বিজন কান্তারে ?
ভবিষ্য সর্গের এই পুত ভূমিকায়,
নাই কি গো কেহ কোথা সম্ভাবে তাহারে ?

৩
এই পুণ্য জাহ্নবীর করুণ কল্লোল,
কুপ্তম-নিশ্বাস-বাহী আকুল সমীর,
কলকণ্ঠ বিনিস্তত বিবাদ-হিজোল,
যামিনীর জ্যোৎস্না-সিক্ত শিশিরাশ্রুণীর,

৪
হরিং বিটপি-লবী স্নিগ্ধ পুষ্পাসার,
মাধবী-মাধুরী-ভরা শ্রামলা ধরণী,—
এরা যে করিছে সবে অন্ত্যেষ্টী সংকার !
মরণ হয়েছে তার বিশল্যকরণী !

৫
এই পুত-তীরোখিত যুগান্তর কত,
তপোবন-উজ্জ্বলিত তন্ত্র সাব্ধান,

কোটি মুক্ত-আত্মা সহ হ'য়ে একজিত,
করেনি কি আজি এই শয্যা তীর্থস্থান ?

৬
অতীতেরা ফেলেছিল তপ্তদীর্ঘধাস,
আজি কে জেগেছে সবে শীতল বীজনে !
এ নহে কি তবে তার কুলশয্যাবাস ?
সে যে গো স্মৃতিশ্রুতিকোলে রম্য জাগরণে !

৭
সংসারের প্রেম ছিল স্বার্থাধানময়,
জদয়ে জদয়ে ছিল কত ব্যবধান—
মরণ-সমাধি-গর্ভে পেয়েছে বিলয়,
সকল হৃৎশব্দে আজি হয়েছে নির্বাণ !

৮
অনাবিল, মুক্ত প্রেম হ'য়ে আগুমান,
সম্ভাবনায় উৎপলিছে আজি চারিভিতে ;
অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য প্রাশি করিছে আব্ধান
মরতের 'নীলকণ্ঠে' শ্রীতি-সিক্ত গীতে !

৯
বাণ ভদ্র, গৃহে ফিরে ; বলিও সবারে—
নিবেদিয়া অশ্রু-অর্থ্য বিভূর চরণে,
আর্জ, শ্রদ্ধ-বিবর্জিত, মৃত্যু-পর-পারে,
চলে' গেছে দিব্যধামে প্রেম-নিমগ্ননে !

১০ শ্রী ব্রীহস্পতি রায়।

২. ব্রাহ্মসমাজ ও তাহার কার্য ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

(ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন—ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পূর্বে দেশের অবস্থা, ব্রাহ্মসমাজের মূল প্রতিষ্ঠা)

ঈশ্বরের এমন আশ্চর্য্য নিয়ম যে, কোন কিছুর তীব্র প্রয়োজন পড়িলেই তাহার সৃষ্টি হয়, বিনা প্রয়োজনে কিছুই সৃষ্টি হয় না—অনেক সময়ে আমরা সেই প্রয়োজন উপলব্ধি নাও করিতে পারি। ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন পড়িয়াছিল, ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি হইল। যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি, সে সময়ে ভারতের প্রশান্ত গগন মন্দীলিপ্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবার উপক্রম হইতেছিল এবং সম্বরেই নানা ঝগড়াবাতের সম্ভাবনা ছিল। একদিকে প্রাচীন পন্থার ব্যক্তিগণ প্রাচীন প্রথা সকল, ভাল হউক বা মন্দ হউক, আঁক-ড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, কিছুমাত্র পরিবর্তন করিতে দিবে না; অপরদিকে পলাশি যুদ্ধের পর অবধি নবীন আশায় উৎফুল্ল, নূতন রাজকার্য্যের ভারপ্রাপ্ত ইংরাজজাতির সংস্পর্শে আসিয়া অনেক নবীন যুবকের হৃদয় নূতন নূতন ভাবে আলোড়িত হইতেছিল, তাহারা বিকৃত প্রাচীন প্রথার দুর্গন্ধরাশির মধ্যে বাস করা বড়ই কষ্টকর বোধ করিতেছিলেন। কিন্তু তখনও তাহারা সামাজিকতার বাধ ভাঙিতে পারেন নাই। সেই এককাল গিয়াছে, যখন বহুবিবাহ ও সতীদাহ, এই উভয়ের মধ্যে কে দেশের অধিকতর সর্বনাশ সাধন করিত, তাহা বলা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। কোথায় এক কুলীন পাবও, বিভিন্ন গ্রামে শতাধিক বিবাহ করিয়া প্রাণত্যাগ

করিল, আর শতাধিক গ্রামে সতীদাহের আত্মরিক আয়োজন হইল এবং শতাধিক গ্রামে সতীগণের মর্শ্বেভেদা অভিশাপ তপ্ত অশ্রুজলের আকারে স্বদেশের উপরে নিপতিত হইল। অর্ধচ বহুকাল অবধি চলিয়া আসিতেছিল বলিয়া প্রাচীনপন্থীগণ প্রাণপণে এই সকল কুপ্রথা রক্ষা করিবার যত্ন করিলেন, অপরদিকে ধর্ম্মপ্রাণ ইংরাজ-জাতির সংস্পর্শপ্রাপ্ত অনেক নবীন যুবকের হৃদয় এই নিষ্ঠুরতা দেখিয়া প্রাচীন প্রথাসমূহ ভাঙিয়া ঘোরতর সামাজিক বিপ্লব আনয়নে সমুৎসুক হইয়াছিল।

এইরূপ নানা বিষয়ে তখন প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে এক তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। বিপ্লব-বজ্রা আসিয়া ঋষি-সেবিত এই ভারতবর্ষের কতকগুলি অনিষ্টকর প্রাচীন প্রথার সঙ্গে মঙ্গলজনক অনেক প্রাচীনতর প্রথাসমূহও ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল। এই বিপ্লবের পরিবর্তে প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করিয়া ভারতগগনে শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক হইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলময় পরমেশ্বর ব্রাহ্মসমাজকে সেই সামঞ্জস্য সাধনের উপায় করিয়া পাঠাইলেন। বাধা নাই পাইলে কোন প্রকার স্রোতেরই বল অনুভূত হয় না। ঈশ্বরের প্রেরিত ব্রাহ্মসমাজ যে কি ঐশ্বরিক বল লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠাতাগণ প্রতি পরে বাধা পাওয়াতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। মহাত্মা ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলসাধন

যথেষ্ট পরিগ্রহ করিতে হয়, কঠোর তপস্যা অবলম্বন করিতে হয়। তাঁহাদিগকে অলস স্বরূপশীলদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট বিক্রম অত্যাচার প্রভৃতি সহ্য করিতে হয়, কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা ত্রক্ষেপ না করিয়া অবিচলিতচিত্তে স্বীয় কর্তব্যপথে অগ্রসর হইলেন।

এখানত ব্রাহ্মসমাজেরই কল্যাণে ইং-রাধশাসন ও শিক্ষাবিস্তারের ফলে কোন প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া উন্নতিসাধন করিতে গেলে সেকালে যে কি ভয়ানক অত্যাচার লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা বর্তমানে কল্পনাতেও আনিতে পারি না; ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণের উপর সেকালের অত্যাচার সমূহ উপভাসের মত বোধ হয়। এইরূপ অত্যাচার নির্যাতন প্রভৃতির দূরীকরণও ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়ের অগ্রতর প্রয়োজন। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণের নির্যাতন প্রাপ্ত কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তখনও ইংরাজ রাজত্ব ভারতে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ইংরাজ গবর্ণমেন্ট তখনও অনেক বিষয়ে সম্বোধে চলিতেছিলেন, বৈদেশীদিগের উপর অনেক সাহায্যের প্রত্যাশা রাখিতেন।* তখন চারিদিকেই কুসংস্কারের রাজত্ব; কেবল দলাদলি ও গালাগালি।

ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পূর্বে

দেশের অবস্থা।

সেই সময়ে এখানকার কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা তাঁহারা এক অমুগত শিষ্য সুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা নান্য পুস্তকে উদ্ধৃত হইলেও এখানে উদ্ধৃত করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

“রামমোহন রায় ‘বে সন্ময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সমুদয় বঙ্গ-ভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; পৌত্তলিকতার বাহাড়ম্বর তাহার সামান্য হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল; বেদের যে সকল কৰ্ম্মকাণ্ড, উপনিষদে যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার এখানে কিছুই ছিল না; কিন্তু হর্ষোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীৰ্ত্তন, দোলযাত্রার আবীর ও রথযাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকেরা মহা আমোদে মনের আনন্দে কাঁল হরণ করিত। গঙ্গানান, ব্রাহ্মণবৈষ্ণবে দান, তীর্থভ্রমণ, অনশনাদি দ্বারা তীর্থ পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণ্য অর্জন করা যায়, ইহা সকলের মনে একেবারে স্থিরবিশ্বাস ছিল, ইহার বিপক্ষে কেহ একটীও কথা বলিতে পারিতেন না। অম্নের বিচারই ধর্ম্মের কাটাভাব ছিল, অন্নভিক্ষার উপরেই বিশেষরূপে চিত্তগুচ্ছ নির্ভর করিত। স্বপাক হাবিষ্য ভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিত্রকর কৰ্ম্ম কিছুই ছিল না। কলিকাতায় বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ইংরাজদিগের অধানে বিষয়কৰ্ম্ম করিয়াও স্বদেশীয়দিগের নিকটে ব্রাহ্মণজাতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্ত বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহারা কার্য্যালয় হইতে অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিয়া অবগাহন স্নান করিয়া স্নেচ্ছ সম্পর্জনিত স্নানোৎসব হইতে মুক্ত হইতেন এবং সন্ধ্যা পূজাঙ্গ শেষ করিয়া দিবসের অষ্টম ভাগে আহার করিতেন। ইহাতে তাঁহারা সর্বত্র পূজ্য হইতেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহাদের যশ সর্বত্র ঘোষণা করিতেন। বাহারা এত কষ্ট স্বীকার করিতে না পারিতেন, তাঁহারা কার্য্যালয়ে বাইবার রাতারাতি বড়লোক হইলেন না; তাঁহাদিগকে

পূর্বে সক্ষ্যাপূজা হোম সর্বলই। সম্পন্ন করিতেন এবং নৈবেদ্য ও টাকা ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেন; তাহাতেই তাঁহাদের সকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তখন সংবাদপত্রের অভাব অনেক পূরণ করিতেন। তাঁহারা প্রাতঃকালে গঙ্গানান করিয়া পূজার চিহ্ন কোশাকুলী হস্তে লইয়া সকলেরই ঘারে ঘারে ভ্রমণ করিতেন এবং দেশবিদেশের ভালমন্দ সকল প্রকারই সংবাদ প্রচার করিতেন। বিশেষতঃ কে কেমন দাতা, প্রাক্তন দুর্গোৎসবে কে কত দান করিলেন, ইহারই সুখ্যাতি ও অখ্যাতি সর্বত্র কীৰ্ত্তন করিতেন এবং ধনী দাতাদিগের যশ ও মহিমা সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা বর্ণন করিতেন। ইহাতে কেহ বা অখ্যাতির ভয়ে, কেহ বা প্রাণশ্রম লাভের আশাসে, বিদ্যামুগ্ধ ভট্টাচার্যদিগকেও যথেষ্ট দান করিতেন। শূদ্র ধুনীদের উপরে তাঁহাদের অধিপত্যের সীমা ছিল না। তাঁহারা শিশুচিত্তঃপহারক মন্ত্রদাতা গুরুর ভায় কাহাকেও পাদোদক দিয়া, কাহাকেও পদধূলি দিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন। ইহার নিদর্শন অত্য়াপি গ্রামে নগরে সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ভাগ্যশাস্ত্রে ও স্মৃতিশাস্ত্রে অধিক মনোযোগ দিতেন এবং তাহাতে বাহার যত জ্ঞান ও অমূল্যলভা থাকিত, তিনি তত যাত্রা ও প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেন; কিন্তু তাঁহাদের আদিশাস্ত্র বেদে এত অবহেলা ও অনভিজ্ঞতা ছিল যে, প্রতিদিন তিনবার করিয়া যে সকল সক্ষ্যার মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহার অর্থ অনেকে জানিতেন কি না সন্দেহ। বিষয়ী ধনীদেহু মধ্যে স্তো কোন প্রকারই বিজ্ঞান চর্চা ছিল না। চলিত বাঙ্গালা ভাষারও ব্যাকরণ জানি দূরে থাকুক, কাহারাও কাহারো বর্ণওচ্ছিন্ন ছিল

না।^{*} বিষয় কর্মের উপযোগী পত্র লেখাও অসম্ভব জানা থাকিলেই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত। তাঁহাদের মধ্যে বাহার পারদর্শী পণ্ডিতে ও ইংরাজী অক্ষর ভাল করিয়া লিখিতে পারিতেন, তাঁহারা বিজ্ঞান গরিব আর মনে ধারণ করিতে পারিতেন না। তখনকার বাঙ্গালা পুস্তকের মধ্যে কেবল চৈতন্যচরিতামৃত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, আর ভারতচন্দ্রের মনোমোহন ও বিদ্যাহন্দর প্রশিদ্ধ। এ সকলই পাণ্ডে লিখিত, গল্পের গ্রন্থ তখন এক খনিও ছিল না। বুলবুলি ও বুড়ির খেলা, কুম্ভাগারী ও কবির লড়াই, বীণসেতার ও তবলাতেই তখনকার কলিকাতার যুবকদিগের আমোদ ছিল এবং তাঁহারা দোলের আবার খেলার ভায় নন্দোৎসবে গোলা হরিদ্রা লইয়া পথে ঘাটে দলে দলে মাতামাতি করিয়া ফিরিতেন ও দেবকীপ্রসূতি প্রসাদ ঝালের লাড়ু ভক্তিপূর্বক খাইতেন। তথাপি অনেক রক্ষা এই ছিল যে, তখন পানদোষ তাহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই এবং ইউরোপ দেশের বিজাতীয় সভ্যতার কলক তাহাতে লিপ্ত হয় নাই। তখন তাঁহারা বড় বড় পূজাতে ইংরাজদিগকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন বটে, কিন্তু আপনারা সেই আহারে তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিতেন না।^{*}

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা চতুর্দয়।

গীতা বলিয়াছেন—

যুক্তাহারবিহারস্ত যুক্তচেষ্টস্ত কর্মসু।

যুক্তস্বপ্নাববোধস্ত বোগো ভবতি হুঃখহা॥

সামঞ্জস্যই যোগ। উপরে সে কালের বেকার অবস্থা বর্ণিত দেখিলাম, তাহাতে বোধ হয় যেন তখন আলস্য ও কপটতার রাজ্য ছিল।

লোকের মনে যাহাই কেন থাকুক, কুহিয়ে।

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৭৭ শক, শ্রাবণ।

ধর্মের বেশ ধারণ করিলেই তাহার সমস্ত অপরাধের মার্জনা হইত। আশ্চর্য্য এই যে, জনসাধারণ এইরূপ কপটতার রাস্তা ক্রমে সন্তোষের সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। তবে বোধ হয় যে ছাত্রক ও চিন্তাশীল লোকের, একেবারে অতাব হয় নাই এবং তাঁহাদের প্রাণ, কপটতা ও আলস্যের বাধ ভাঙ্গিয়া মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক প্রকৃত ধর্মের মর্যাদা ঘোষণা করিবার জন্য অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের প্রাণের তীব্র আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গ সকল বঙ্গদেশের আকাশ

ব্যাপ্ত করিয়া কেলিয়াছিল। সেই আন্দোলনের ফলে বিশ্রাম ও কর্মের, প্রাচীন প্রথা ও নবীন সংস্কারের এবং ধর্মের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইল। ব্রাহ্মসমাজের মূল প্রতিষ্ঠাতা বীর চরুচর রাজা রামমোহন রায়, বনাম-প্রসিদ্ধ ষারকানাথ ঠাকুর, সুরিখ্যাত স্মার্তচূড়ামণি রামচন্দ্র বিজ্ঞাবাগীশ এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দুটা তত্ত্বকথা ।

(যোগ বা আত্মবিজ্ঞান)

ইদানীং চারিদিকে শ্রীমত্তগবদীতা সম্বন্ধে যেমন একটা হৈ চৈ শুনিতে পাওয়া যায়, “যোগ” “যোগ” বলিয়াও তরুণ হজুকের জ্ঞান দেখা যায় না। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কত রকম যোগের গুরু আবির্ভূত হইয়াছেন ও যোগের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা গণনা দ্বারা ঠিক করা কঠিন। কেবল যে আমরাই যোগ সম্বন্ধে অসুসন্ধান আলোচনার প্রবৃত্ত, এমন নহে;—ভারতের হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান ত আছেনই; ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেরও বহু শিক্ষিত ব্যক্তি তদ্বিষয়ে সম্যক গবেষণা ও চর্চা আরম্ভ করিয়াছেন।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বকার কথা স্মরণ করিলে যেখানে পাওয়া যায়, সে সময়ে আমাদের মধ্যকার “শিক্ষিত” ইংরাজীভাষীগণ গীতা পাঠ ও যোগশিক্ষা নিতান্ত মূঢ় অপদার্থ লোকের কাজ বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। পঁচিশ বৎসরের উপর

হইল ব্রাহ্মসমাজের নববিধান শাখায় আচার্য্য মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন প্রণীত ইংরাজী ভাষায় “যোগ”^{*} নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হয়। প্রথমে উহা আমেরিকার লোকদিগকে উপদেশ দিবার জন্য তৎকাল “New York Independent” নামক পত্রিকায় বাহির হয়; তৎপরে এদেশে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া আমাদের হস্তগত হয়। কেশব তখন স্নর্গে।

ব্রাহ্মসমাজের নিকট আমরা বহু বিষয়ে বিশেষ ঋণী; সুতরাং তথায় আমরা কিরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলাম, সে সম্বন্ধে দুই এক কথা এখানে বলিলে দোষের হইবে না। জীবনের শেষ ভাগে কেশবচন্দ্র তাঁহার প্রচারক শিষ্য-দিগকে যোগ সম্বন্ধে ও ভক্তি বিষয়ে যে সকল মৌখিক উপদেশ প্রদান করেন, তাহা “ব্রাহ্ম-গীতোপনিষৎ” নামে পুস্তকাকারে বাহির

হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ সংযম, স্বৈর্য সাধন, বৈরাগ্য প্রভৃতি নানাবিধে অনেক উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও উক্ত ব্যাখ্যা-দিতে যোগের বিজ্ঞানাত্মক সম্বন্ধীয় কোন কথা পাওয়া যায় না, অর্থাৎ মানবাত্মা কি? মন কি পদার্থ? চিহ্নিত কি প্রণালীতে কার্য্য করিয়া থাকে? ইত্যাদি গূঢ়ত্বের মীমাংসক কোন কথা দৃষ্ট হয় না, কিন্তু মোটামুটি চিত্ত স্থির করিবার ব্যবস্থা বেশ বিবৃত। ব্রাহ্ম-সমাজের গ্রন্থাদির মধ্যে উহা যে একখানি অত্যাশ্চর্য্য পুস্তক, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই অমূল্য উপদেশাবলী প্রচারের পূর্বে সাধনমার্গের কথাবার্তা ব্রাহ্মসমাজে শুনিতে পাওয়া যায় নাই। বিজ্ঞানসাগর মহাশয়ের “বোধোদয়ে” পড়িয়াছিলাম “ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যরূপ,” “ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মসমাজে কেবল মাত্র ঐ কয়টা কথা উপনিষদের ব্যাখ্যার সাহায্যে ডালপালা দিয়া আমা-দিগকে শুনাইয়াছিলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের “শিশুশিক্ষায়” উপদিষ্ট হইয়াছিলাম, “নিথ্যা কথা কহিও না” “চুরি করিও না” “কাণাকে কাণা বলিও না” ইত্যাদি। ব্রাহ্মসমাজ অবতারণা হইয়া ঐ সকল নীতি বাক্যই সালঙ্কারে স্থূললিত ভাষায় শুনাইলেন নাত্র। চুরি করা কেন উচিত নয়? নিথ্যা বলা কেন অকর্তব্য? যদি এরূপ কার্য্যসমূহ ঋষিধর্ম্মবিরুদ্ধ হয়, তবে আবহমানকাল এই সকল পাপ সংসারে কি প্রকারে চলিয়া আসিতেছে? পাপ পুণ্যই বা কি? যদি ঈশ্বর পুণ্যময় হ'ন, তবে পাপের জন্মই বা কি প্রকারে হইল? ইত্যাদি প্রশ্নের কৌশলসম্মিত বৈজ্ঞানিক উত্তর ব্রাহ্ম-সমাজের নিকট পাওয়া যায় নাই। চিন্তার অবিকশিত অবস্থায় আদিম মানুষ

যেই স্বাধীনতার বশীভূত হইয়া নানাবিধ অভ্যাস অভ্যাস করিবেই; উহা তাহার ব্যক্তির গঠনের প্রথমাবস্থায় নিত্যস্বই আবশ্যক। শুদ্ধত্বের প্রাকালে জীব সর্ব্বথা আপনার যোগ-আনা বুদ্ধি লইতে চেষ্টা করিবেই, তদ্ব্যতিরিক্ত পরের সম্পত্তিও যথা-সম্ভব নিজের কোলে টানিয়া আনিতে সম্যক প্রয়াস পাইবে; আপনার বিষয়াদি দ্বারা সর্ব্বদা সুখস্বচ্ছন্দতা ভোগে তৎপর থাকিবেই, উপরন্তু সুখপ্রদ বাহ্য কিছু যেখানে দেখিবে, তাহা যেন তেন প্রকারে নিজের আয়ত্তাধীনে আনিবার যত্ন ক্রটি করিবে না। তদবস্থায় আমিষ গড়িয়ার উহা এক মাত্র উপায়। জীব এইরূপ পথে চলিতে চলিতে জন্মজন্মান্তরের ঐতিকর অপ্রীতিকর উভয়-বিধ অভিজ্ঞতাসমূহ দ্বারা নানাবিধ শিক্ষা লাভ করতঃ বিবর্তসোপানে + ক্রমে প্রকৃত মহত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে। মানুষকে যে “কুদ্রবিশ্ব” † বলা হয়, তাহা শুধু কথার কথা নয়। গর্ত মধ্যে ক্রণের আবির্ভাব অবধি দেহান্ত পর্য্যন্ত মানুষ যে যে অবস্থার ভিতর দিয়া গমন করে, তদ্বারা স্বাব-জন্মাদির দশা হইতে দেবত্বের নিকট উপনীত হইবার ক্রমবিকাশ-পথটাই প্রদর্শিত হয়। সুতরাং উন্নত মানবের শিশু ও প্রৌঢ়-বস্থায় অসভ্য বর্ষের একই প্রকৃতি বিশিষ্ট জানিতে হইবে, মানবের আদিম অর্ধাচীনতা আমাদের শৈশবে পুনঃপ্রকটিত হইয়া থাকে। § এই নিমিত্ত প্রাথমিক ‡ অবস্থাতে জন্মের মানুষ যেমন কেবল আপনার গণ্ডা

* Individuality.

† Ladder of evolution.

‡ Microcosm.

§ Repetition of the process of evolu-

tion. ¶ Primitive.

ব্যতীত আর কিছু বুঝে না, এবং তাহা বন্ধ।
করিবার জন্য বশ্যশক্তি উপায় অবলম্বনে
পরায়ুখ হয় না। আধুনিক সভ্যতার মধ্যে
লালিত শিককেও তজ্জপই করিতে দেখা
যায়। তার পর পাপ পুণ্য সম্বন্ধীয় গুরুতর
প্রশ্নের কথা। শুভাশুভ, উত্তমাত্মম, সদস্য,
উচিতাশুচিত প্রভৃতি বাক্য দ্বারা যাহা যাহা
বুঝায়, সে সকল কি আপেক্ষিক নহে?†
ঐ সকল কি সংসারে বাস্তবিক চিরনির্দিষ্ট?‡
অবস্থান্তরে কি একের উপাধি অপরের প্রতি
প্রযুক্ত হয় না? যাহা কোন ব্যক্তির পক্ষে
এক সময়ে উচিত, উহাই আবার তাহারই
পক্ষে অন্য সময়ে অশুচিত; একজনের পক্ষে
যাহা ভাল, অপরের পক্ষে তাহা মন্দ†;
এরূপ বলিলে কি দোষের হয়? প্রকৃত
প্রস্তাবে জগতে নির্ভীক মন্দ বলিয়া কিছুই
নাই, যাহা আমাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিতে
আপাততঃ এরূপ বলিয়া বোধ হয়, তাহা
বিকাশোন্মুখ ভাল বৈ আর কিছু নয়।§
শীত উষ্ণ, দিবা রজনী, আলোক অন্ধ-
কার, স্বপ্ন জাগ্রত প্রভৃতি বিরুদ্ধতাবাপন্ন পরার্থ-
শব্দ লইয়াই জগতের ব্যক্তাবস্থা; এই বন্দ
তাবই সৃষ্টির ভিত্তি; এবিধি অল্পকূল প্রতি-
কূলের জোড়া জোড়া না থাকিলে বিশ্বের

* Relative.

† “Two things” says the memorable
Kant, deepest and most logical of metaphy-
sical thinkers. “Two things strike me dumb:
the infinite Starry Heaven and the sense
of Right and Wrong in man.” Visible In-
finities, both; say nothing of them, do’nt
try to account for them, for you can say
nothing wise.—Thomas Carlyle.

‡ What we speak of as evil in one
place may be not evil in another; for evolu-
tion implies this changing character, and
what is good at one stage may be evil at
another.—Annie Besant.

§ Evil is good in evolution; what we
call evil is often only a veil of evil and
beneath it a future good.—Ibid.

অস্তিত্ব থাকিত না; দেবাত্মের সংগ্রাম
অর্থাৎ বিপক্ষ বা প্রতিকূলের বাধা ভিন্ন সংসা-
রের বিকাশ বা উন্নতি অসম্ভব।‡ এই
শ্রেণীর গুরুত্ব বিষয়ক কথাবার্তা ব্রাহ্মসমাজে
কখন তুনা যায় নাই। ইহার কারণ বোধ
হয় এই যে, কর্মশাস্ত্র ও জন্মজন্মান্তরবাদ
তথ্য আদৌ গ্রাহ্য হইত না। চতুর্ধর্ম-কিছুই
নয়, মানুষের কলনামাত্র; সমস্ত জীব প্রথম
এইবার সংসারে আসিয়াছে; ধামধেন্যলী
ঘটনাচক্রে জীবের জন্ম এবং উন্নতি অবনতি
এবম্প্রকার মত পোষণ করিলে মানব জীব-
নের বিজ্ঞানানুশেষ দিকে মোটেই দৃষ্টি পতিত
হয় না। পৃথিবীর নিরাকার জীব সমূহের
মধ্যে ভ্রম্যনক বৈষম্য দেখিয়াও যাহারা জন্ম-
জন্মান্তরের পথে মানুষের ক্রমবিকাশ মানিতে
চাহেন না, তাহাদিগকে বিশ্বরহস্য বুঝাইবার
কোন উপায় দ্রুতিতে পাওয়া যায় না।

কেশবচন্দ্র প্রণীত উল্লিখিত যোগের
পুস্তকখানি প্রকাশ হইবামাত্র আমরা বিশেষ
আগ্রহের সহিত পাঠ করি, কিন্তু তাহাতে
আশাহরূপ কথাবার্তা পাই নাই, কারণ
তখন যোগ শব্দে মোটামুটি যাহা বুঝিতাম,
তাহার মত কিছু ঐ গ্রন্থে দেখি নাই। কেশ-
বের মতে যোগের অর্থ পুনর্মিলন,—সৃষ্ট
জীবাত্মা স্রষ্টা পরমাত্মা হইতে পৃথক ও দূরস্থ
হইয়া ইহ সংসারে পাপময় জীবন অতিবাহিত
করিয়া থাকে, সেই জন্ত পুনর্মিলন আবশ্যক—
পুনর্মিলন অপেক্ষা কিছু বেশী মধুরভাবে বক্তৃ-
হওয়া আবশ্যক। * এই মত প্রকাশ করিয়া

‡ For the development of all positive
qualities it is necessary that they should be
exercised against opposition. Without
opposition no development is possible;
without opposition no growth is possible.
All growth and development result from
the exercise of energy against something
which opposes.—Ibid.

* The created soul, in its worldly and

গ্রন্থকার বলিতেছেন, উহাকে আধ্যাত্মিক একীকরণ বলিতে হয়;—হইয়ের সম্বন্ধ একেতে, একেই বৈতাবস্থা। * অতঃপর একথাও দেখিতে পাওয়া যায়:—দার্শনিক ও চিন্তাশীল হিন্দুর মতে উহাই সর্বোচ্চ স্বর্গ, অস্ত্র প্রকার মুক্তির জন্ত তিনি লাগায়িত নন; বিচ্ছেদ, বিয়োগ, দূরতা, ভেদ জ্ঞান, বৈতাব, অহঙ্কার তাঁহার পক্ষে সর্ববিধ পাপ ও দুঃখের মূলীভূত কারণ; তন্মুক্ত ঈশ্বরের সহিত সম্ভাবনায় যুক্ত বা একীভূত হওয়া তাঁহার একমাত্র প্রার্থনীয় স্বর্গ। † শ্রষ্টার সহিত সৃষ্ট পদার্থের যোগকে পুনর্মিলন বলা যায় কিরূপে ?

এখন দেখা যাউক “সৃষ্ট জীবাত্মার” কথা হিন্দু শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত কি না, আমাদের দার্শনিক বৃদ্ধগণ কোথাও এবিধ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন কিনা। * আর্ঘ্য ঋষিদের দ্বারা প্রচারিত গ্রন্থাদিতে এমন কথা পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না যে, জীবাত্মা পূর্বে আদৌ ছিল না, পরমাত্মা কর্তৃক কোন নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্ট হয়। বিশ্ব

sinful condition, lives separate and estranged from the Supreme Soul. A reconciliation is needed, nay, more than mere reconciliation. A harmonious union is sought and realized.”

* It is spiritual unification; it is a consciousness of two in one; duality in unity.

† To the philosophical and thoughtful Hindu, this is the highest heaven. He pants for no other salvation he seeks no other *mukti* or deliverance. Separation, disunion, estrangement, a sense of distinction, duality, the pride of ego, this is to him the root of all sin and suffering and the only heaven he aspires to is conscious union and oneness with Deity. বোধ হয় ইংরাজী ভাষায় শব্দের অভাব জন্ত লেখক এখানে heaven কথাটা ব্যবহার করিয়াছেন, heaven এখানে স্বর্গ নয়, কারণ স্বর্গ ত করিছ বাগ্‌পার “কীণে পুণ্যে” আবার সেখান হইতে মর্ত্যলোকে নামিতে হয়।

বা অড়ৈতেভ্রমর এই জগৎ সম্বন্ধে “সৃষ্টি” শব্দ যে কোন প্রাচীন পণ্ডিত ব্যবহার করিয়াছেন, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহ; অবশ্য এখানে সৃষ্টি* অর্থে বুঝিতে হইবে—সম্যক অভাবের ভিতর হইতে সত্তার সৃজন। † গীতাবাক্য এরূপ কথার স্পষ্ট প্রতিবাদ করে:—

“না সতো বিদ্যাতে ভাবো নাভাবো বিত্ততে সতঃ।” বাহা কখন ছিল না, তাহা কখন হয় না; বাহা বিত্তমান, তাহার কখন অভাব হয় না।

বিশ্বের প্রকাশ † সম্বন্ধেও প্রতিতে উক্ত
“ * * * * * যথা পূর্বমকল্পয়ৎ।”

অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব কল্পে জ্ঞান এবারও জগৎ কল্পিত বা রচিত হইল।

অনাদিকাল হইতে এই সংসার-প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে, অনন্তকাল এইরূপে চলিবে; ইহার আরম্ভ বা শেষ কল্পনাতেও ভাবা যায় না। লীলার সময় হরি লীলা ব্যতীত থাকিবেন কি প্রকারে? তিনি নিজে যেমন অনাগন্ত, তাহার লীলাকেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। স্মৃদ্র হুতে, যখন কোথাও কিছু ছিল না, হঠাৎ তিনি একদিন সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করিলেন, আবার কোন স্মৃদ্র তবিত্তে পাজপুঁথি জুটাইয়া সৃষ্টি লোপ করতঃ চূপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন, ইহা অসম্ভব কিছতেই আনা যায় না। তবে কল্পান্তে প্রলয়, পুনরায় যথাসময়ে নূতন কল্পের আরম্ভ, এই ভাবে আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে ও চিরকাল চলিবে।

এক কল্পের অবসানে প্রলয়াবস্থা, কিছু কাল পরে আর এক কল্পের পত্তন, ইহা কিরূপ

† ইংরাজীতে বাহাকে out of nothing (Ex-nihilo) বলে।

* Manifestation.

ব্যঙ্গ্য, তাহা একটা সাধারণ স্থল দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। মফঃস্বল-জেলার কাছারীর কাণ্ডটা একটু জ্ঞাতিবিশেষ পূর্বক দেখিলে কতকটা ভাব পাওয়া যাইতে পারে। নগরের বাহিরে লোকালয় হইতে দূরে একটা বিশাল প্রান্তর মধ্যে কতকগুলি বড় বড় অট্টালিকা। প্রাতঃকালে দেখিলে বোধ হয় যেন সম্পন্ন ব্যক্তিগণের আবাস ছিল, অল্প দিন হইল তাঁহারা স্থান ত্যাগ করিয়াছেন, তাই পরিত্যক্ত জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমে দুই এক জন করিয়া লোক জমিতে লাগিল। শেষে দিবা দুই প্রহরের পূর্বেই ইন্দ্রজালের ত্রায় একটা বিরাট ব্যাপারের বিচিত্র অভিনয়। হস্তাগুলির নানা প্রকোষ্ঠে জম্‌কাল এজ্‌লাসে খেত-কৃষ্ণ-ধূসর বিবিধবর্ণের হাকিম পুঞ্জবেরা ধন্দ্বাবতারের আসনে সমাসীন, কখন সবাক্, নির্বাক্, কখন কখন তুট, কখন রুট; তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান উকীল মোক্তার ধুরন্ধরেরা আপনাপন পক্ষসমর্থনার্থ বহুপ্রকার অজ্ঞভঙ্গি সহকারে বাক্‌যুদ্ধ দ্বারা বিচারকের জ্ঞান হরণ কার্য্যে প্রাণ ঢালিয়া দিতেছেন; বাহিরে অসজ্জিত পেরাদাগণ পক্ষদ্বয়ের অর্থী, প্রত্যর্থী, সাক্ষী প্রভৃতিকে আহ্বান করিতেছে; মাঠে গাছতলায় কত রকম আহারীর এবং অজ্ঞবিধ দ্রব্য সামগ্রীর হাটবাজার বসিয়া গিয়াছে; যে সকল বাদী প্রতিবাদীর মোকদ্দমা আরম্ভ হয় নাই, তাহারা হয় ওকালতখানায় উকীল বাবুদের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছে, না হয় বৃক্ষ-তলে বসিয়া মোক্তার মহাশয়দের সাহায্যে সামান্য তালিম করিতেছে; দালালেরা কাক চিলের মত মকেলদের পশ্চাতে ঘুরিতেছে কিরিত্তেছে; বহুজনের কোলাহলে-চটুর্দিক মুগ্ধরিত, যেদিকে তাকও, একটা জম্‌জমাট

কারখানা। এই মধ্যাহ্নের বাহারা যাজী, বাহাদের জন্ত এই বিশাল আয়োজন, একমাত্র বাহাদের রুধিরে এই ভোজবাজীর সমস্ত ব্যয় নির্বাহিত, বাহাদের দ্বারা মঠদারীবর্গ তাঁহাদের সহচর অগ্নুচরণ পাণ্ডাসমূহ প্রভৃতি সকলের উদর পূর্ত্তি হইতেছে, তাঁহাদের কাহারও পৌষ মাস আগিতেছে, কাহারও সর্বনাশ ঘটতেছে, কেহ জাল-ফেরেব্‌ দ্বারা মোকদ্দমা জিতিয়া হঠাৎ বিপুল ধনের অধিকারী হইলেন, কেহ যোর অবিচারে ন্যায্য দাবী হারিয়া পথের কাঙ্গাল হইলেন; এক জনের আনন্দের সীমা নাই, দুই হাতে বক্‌শিশ্‌ বিতরণ করিতে করিতে সহাস্যবদনে বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়া যানারোহণে গৃহে ফিরিতেছেন; অপর ব্যক্তি একাকী মলিনমুখে হেঁটমুণ্ডে পদ-ব্রজে, মৃদুন্দগাভিতে শ্মশান-ফেরতের ত্রায় হায় হায়! করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থানো-চ্ছত। ক্রমে দিবাবসানের সঙ্গে আপনাপন দৈনিক কার্য্য কতক শেষ করিয়া কতক বাকী রাখিয়া হাকিম আমলা ব্যবহারাজীব, মকেল, ক্রেতা, বিক্রেতা প্রভৃতি বাহারা কায়মনোবাক্যে এতক্ষণ এখানকার ব্যাপারে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন, সবাই তিরোহিত হইয়া অন্তঃ সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত; অথচ আদালতের সূত্র তাঁহাদিগকে অলক্ষিত ভাবে বাঁধিয়া রাখিতে ছাড়ে নাই, যথাকালে আবার সেখানে লইয়া গিয়া নাটাইবে। এদিকে নিশাগমে কাছারি-প্রান্তর কর্তৃক পুনরাগ্নি উজাড় মূর্ত্তি পরিগৃহীত;—গৃহাদি রুদ্ধ, কোথাও একটা মানুষ নাই, সাড়া নাই, শব্দ নাই, বাহিরে যেমন অন্ধকার, ঘরগুলির ভিতরে তত্বেদিক। যেন বাজীকর তাঁহার শক্তি সংহার করতঃ স্থানান্তরে গমন করায় সমস্ত কারখানা অস্তিত্ব, কেবল ঠাট্‌মাত্র

পুড়িয়া রহিয়াছে, আর কখনেও এ স্থানে
ওরূপ ভেঁকি দেখা যাইবে না। কিন্তু বাস্ত-
বিক তাহা নয়, গৃহাবতীর অভ্যন্তরে যে সকল
অচেতন কাগজপত্র সময়ে রক্ষিত, তাহাতে
এমন এক অনিবার্য মায়াশক্তি সঞ্চারিত, যাহা
পরদিন ঠিক ঐরূপ অভিনয়ের জন্ত সব
লোককে টানিয়া আনিবে, যথা সময়ে পুনরায়
যে য'র তানতোব্‌ড়া লইয়া সাগ্রহে অবিকল
পূর্ব দিনের স্থায় কাছারিতে হাজির হইয়া
নানামূর্তিতে নানাভঙ্গিতে নানাপ্রকার রঙ্গ
দেখাইতে ক্রটি করিবে না। এই লোক-
সমাগণ ও নৃত্যকূর্দ্দের আবির্ভাব তিবোভাব
যেমন প্রত্যাহ নৃতন সৃষ্টি নহে, পূর্বদিনের
কর্মসূত্র দ্বারা পরদিন রঙ্গভূমিতে পুনরাকৃষ্ট
হইয়া সকলে প্রাচীন প্রথায অভিনয় কার্য
আবার সম্পাদন করিতেছে মাত্র, ঠিক তদ্রূপ
এক কল্পের পর প্রলয়ান্তে আর এক কল্প
অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে;
কারণ কর্ম অনাদানন্ত, কর্মসূত্রের কোথাও
আরম্ভ নাই, কোথাও শেষ নাই, কর্মের
বিধিব্যবস্থা ঈশ্বরত্বের অভিব্যক্তি মাত্র।
বিধাতা ও তাহার বিধানে কোনই পার্থক্য
লক্ষিত হয় না, সুতরাং ঈশ্বর যেমন অসীম,
কর্মেরও তেমনি অগ্রশেষে সীমা নির্ধারণ
করিতে পারা যায় না। এই নিমিত্তই বৌদ্ধ
দর্শনে ঈশ্বরের কথা উল্লেখ না করিয়া কেবল
“স্বয়ং” বা কর্মেরই মঞ্চায়ী বর্ণিত * হই-
য়াছে; এবং তৎসঙ্গে বিশ্বের “মঙ্গলময়
বিধান” পূজা বলিয়া প্রচারিত। আমাদের
শাস্ত্রানুসারেও অনেক স্থানে “ফলপ্রদ কর্মঃ
ফলপ্রদোজঃ?” প্রশ্নের উত্তরে ঐজ বা ঈশ-
্বরের পরিবর্তে কর্মকেই ফলদাতা বলা হই-
য়াছে। কোন দার্শনিক সম্প্রদায় কর্মের

* Good Law.

মুহুর্তি বর্ণনা করতঃ অবশেষে “কর্মোভ্যা
নমঃ” বলিয়া কর্মকে বারবার নমস্কার করিয়া
গিয়াছেন।

ব্রাহ্মপ্রধান কেশবচন্দ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি
স্বাকার করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং তৎসঙ্গে
আবাস্যার স্বত্বও তাহাকে মনিতে হইয়াছে।
ব্রাহ্মসমাজের মতে—

“না ছিল এসব কিছু,

“আধার ছিল অতি

“ঘোর দিগন্ত প্রসারি।

“ইচ্ছা হইল তব,”

“ভায় বিরাঙ্কিল

“জয়! জয়! মহিমা তোমারি।

“গ্রহ চন্দ্র পরে,

“জ্যোতি তোমার হে,

“আদি জ্যোতি কল্যাণ!”

এই প্রকারে পরিদৃশ্যমান জগতের আরম্ভ,
তৎপূর্বে কখন কিছু ছিল না। এই মত
খ্রীষ্টানী মতের ছায়া মাত্র! ইংরাজী সূত্রাং
খ্রীষ্টানী শিক্ষা হইতে যখন ব্রাহ্মসমাজের উৎ-
পত্তি, খ্রীষ্টানী গির্জায় হুবহু নকল যখন ব্রাহ্ম-
ভজনালয়, তখন কতকটা খ্রীষ্টানী নীতি
বিশ্বাস যে ব্রাহ্মসমাজে গৃহীত হইবে, তাহাতে
আর বৈচিত্র্য কি? পরন্তু অবশ্যকার মতে
আস্থা স্থাপন করিবার পূর্বে যদি একটু
ভাবিয়া দেখা যায় যে, এবারকার এই বিশ্বের
আরম্ভ যদি প্রথম সৃষ্টি হয়, তাহার পূর্বে
অনাদিকাল পর্যন্ত দিগন্তব্যাপী প্রগাঢ় অন্ধ-
কার ব্যতীত কখন কোথাও কিছু ছিল না,
যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে অনাত্ত-
নন্ত সর্ব শক্তিমান পরমেশ্বরের সম্পূর্ণভাবে
বিলক্ষণ দোষ স্পর্শে। কল্পনাভীত সুদীর্ঘ-
কাল চুপু করিয়া বসিয়াছিলেন, হঠাৎ এক
দিন জগৎ সৃজনের, ইচ্ছা হইল; তৎপূর্বে

জ্ঞানই ছিল না যে তাঁহার সৃষ্টিশক্তি আছে, কারণ সেরূপ জ্ঞানের উদয় হইবামাত্র সৃষ্টি হইয়া আসিবেই । এবারকার লালুকে প্রথম সৃষ্টি বলিলে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া উপায় নাই, সুতরাং বিশ্বেশ্বরকে আমাদের মত অসম্পূর্ণ করিয়া দেখিতে হয়, কারণ ইচ্ছা অভাবেই পূৰ্ণবর্তী ভাব ; ইহা নাই, ইহা করিতে হইবে বা পাইতে হইবে, মনের এই অবস্থাকেই ইচ্ছা বলে ; উচ্চার উদয় যেখানে অভাব অসম্পূর্ণতা, সেখানে অবশ্য-বিদ্যমান ইহা মানিতেই হইবে ।

পূর্বে কোথাও কিছু ছিল না, দিগন্ত-ব্যাপী রিক্ত অন্ধকার রাশির ভিতর হইতে হঠাৎ এই জগৎ সৃষ্ট হইল, এ কথা যেমন সম্ভব বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, তেমনি শূন্য হইতে কোন প্রকার উপাদান বিনা, ঈশ্বর একটা গোটা জীবাত্মা স্বজন করতঃ পূৰ্ণ-গঠিত মানবদেহে প্রবিষ্ট করিলেন, এই মত-কেই বা সমীচীন বলি কি প্রকারে ? যেরূপ ক্রমবিকাশের * প্রণালীতে উদ্ভিদাদি চৌরাসী লক্ষ যোনি ভ্রমণান্তর বর্তমান মানবদেহ পাইয়া গিয়াছে, সেইরূপ আমরা যাহাকে সাধারণতঃ জীবাত্মা বলিয়া থাকি, অর্থাৎ স্রুতিতে হ্রস্বতির ফলভোগী ভিতরকার মানুষ†—যে ব্যক্তি জন্মজন্মান্তরের চক্রে ঘুরিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে—তাহাও এক প্রকার সংজ্ঞাহীন অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে বিকাশ প্রাপ্ত, জানিতে হইবে । বস্তু বা তৎপূৰ্ণতাব হইতে যুগযুগান্তরের কর্মফলে এতদূর আসিয়া পৌঁছিয়াছে ; কিন্তু এখনও রিস্ত পথ বাকী, যে হেতুক ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি ভিন্ন তাঁহার মুক্তি নাই । সেই জরাব্যাবি-

মরণসঙ্কলন* কষ্টকালীর্ণ দুর্গম, দুঃস্থ পথে ছুটাছুটি যাহাতে শীঘ্র সমাধা হয়, তাহারই প্রকৃষ্ট উপায়ের নাম যোগ । আমরা ত এইরূপ বুঝি ।

শ্রীমন্তগবদীতাম কোথাও জীবাত্মা পরমা-ত্মায় প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না, এক-মাত্র আত্মা শব্দই প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত । সেই আত্মা কেমন ?

“নিত্যঃ সর্বগতঃ স্বাহুরচলোৎস্বং সনাতনঃ ।”
—নিত্যঃ স্থিরস্বভাব, অচল ও অনাদি । এই আত্মা পরব্রহ্ম* হইতে চরাচরের সমস্ত পদার্থে ও তপ্রোতভাবে বিস্তারিত, অণু পরমাণু বা তদ-পেক্ষা সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্মতর অবস্থায় বাহ্য কিছু স্বতন্ত্র ভাবে ভিত্তিতে পারে, তাহাতে যে প্রকারে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাতেও ঠিক সেইরূপে বিরাজিত । প্রস্তরে দেখিয়া প্রস্তরাত্মা, উদ্ভিদে উদ্ভিদাত্মা, নিকৃষ্ট জীবো নিকৃষ্ট জীবাত্মা, উৎকৃষ্ট জীবো উৎকৃষ্ট জীবাত্মা, দেবতায় দেবাত্মা, ব্রহ্মে ব্রহ্মাত্মা, পরব্রহ্মে পর-মাত্মা, ইত্যাদি নাম দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আসলে জিনিস এক । এবিধি আত্মা, বাহ্য দ্বারা সকল পদার্থের সঙ্গে আমরাও অস্থ-প্রাপ্তি, তাঁহাকে সম্যক উপলব্ধি করতঃ সং-গহ একত্ব সম্পাদন যোগের উন্নয়ন ফল । ইহা কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না, জানি না ।

পঞ্চকোষের শেষ কোষে যে ‘আমি,’ সেই

* ইহার সম্বন্ধে যোগমার্গে অগ্রসর কোন মহাত্মা প্রকাশ করিয়াছেন :—

It is an eternal principle known only through its effects. No words can describe it, for words imply discrimination, and this is All. We murmur, Absolute, Infinite, Unconditioned—but the words mean naught. ** Space is the only conception that can even faintly mirror it without preposterous distortion, but silence least offends in these regions where the wings of thought beat faintly, and lips can only falter, not pronounce.”

“তৎসৎ” বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকি উচিত ।

* ‘Evolution.

† Inner man or permanent ego.

আমিই প্রকৃত আমি; অতীত কোঁসহ ছোট
বড় আমি গুলি সবাই নব্বর, স্মৃতরাং আমি
নামের যোগ্য নহে। এষ্ট সত্যের শুধু বৈজ্ঞা-
নিক উপলব্ধি হইলে চলিবে না, প্রকৃতরূপে

উহাকে প্রাণগত করা চাই। এই স্বকণ্ঠিন
ব্যাপার যোগ ভিন্ন অত কোন উপায়ে সম্ভবে
না।
শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

যোগ।

এইতো জীবন! হায়, এইতো চরম পরিণতি!
ছ'নগের দীপ্তি শুধু! ক্ষণপরে জীবনের জ্যোতি
সহসা ভুবিয়া যায় ঘন অন্ধকারে! তার পর,
পঞ্চভূতে জীন হয় এই দর্পী দেহ, বিনশ্বর!
তবে, আর কেন ওগো, কেন এই দীপ্ত কোলাহল?
কেন তবে এত হিংসা, এই দেহ-দ্বন্দ্ব, —এ সকল
জীবনের অনর্থ বিক্ষেপ? কেন সবে শুধু হায়,
আনন্দে সম্পূর্ণ রহি', নিরন্তর নাহি হাসে গায়;

ভালবাসে পরস্পরে অনিবার? আত্ম-পর ভুলি
কেন নাহি স্নেহ প্রেমে করে নিত্য শুদ্ধ
কোলাকুলি?
অমৃত-পাণ্যের সদা কেন নাহি হিয়া মজি'রয়?
কেন নাহি করে প্রাণ স্নস্তের মাঝারে বিলয়?
বিধময় পঙ্কতির ঠুঙ্গুগিছে আকুল আত্মনা;
আপনা বিশ্বাসি' তাহে, চল মন কর যোগদান!
শ্রীদেবকুমার রায়

দেশ ভ্রমণ ও তীর্থ পরিদর্শন।

মান্দাজের পথে।

ইষ্ট-কোষ্ঠ-রেলপথ খুলিবার পূর্বে বাঙ্গালা
হইতে মান্দাজ যাঁতে হইলে হয় সমুদ্র পথে,
অথবা রেলপথে প্রায় অন্ধতারত প্রদক্ষিণ
করিয়া মনমার ও রাইচুর হইয়া যাঁতে হইত,
আমি ছইবার মান্দাজ যাই, প্রথম বার, তখনও
ইষ্টকোষ্ঠ রেলপথ খোলে নাই, আমি অতীত
কংগ্রেস-বাগ্মিনের সঙ্গে কলিকাতা হইতে
সমুদ্রপথে মান্দাজ রওয়ানা হই। বাঙ্গালা,
ঐহাতে বাঙ্গালার একটা নিভৃত ক্ষুদ্র পল্লীবাসী,
আমার মনে সমুদ্রযাত্রার নামে ভয় হইবার
কথা বটে; কিন্তু অনেকে এক সঙ্গে থাকায়
অথবা যে কারণেই হউক, ভয়ের পরিবর্তে এক
অনির্বচনীয় উৎসাহ আনন্দ অন্তর করিয়া-
ছিলাম। কলিকাতা হইতে সাগর সঙ্গম পর্য্যন্ত
গঙ্গার উভয় তীর এতই দৃশ্যবৈচিত্র্য পরিপূর্ণ
যে, দেখিতে দেখিতে মন আত্মহারা হইয়া
পড়ে। রতই সমুদ্রের নিকটবর্তী হইতে-

ছিলাম, ততই গঙ্গাবক্ষের প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে
আমার জগৎ ও আনন্দে প্রসারিত হইতেছিল।
গঙ্গা ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের অপূর্ব দৃশ্য যেতঃ
সলিলা গঙ্গার সহিত নীলাবু-স্বামী সঙ্গমের
ক্রমবিকাশ ও তত্পরি সেই সময় অন্তগামী
সূর্য্যের লোহিত কিরণ সম্পাত ও সম্মুখে সমা-
গত সান্নাছায়া, দুসর সাগর দ্বীপের বেলাভূমি
ও তন্মধ্যস্থ হরিৎঘন বনভূমির অপূর্ব দৃশ্য-ব-
লীর বর্ণনা আমার সাধ্যাতীত। উহা মানব
বর্ণিত ভাষার বহু উচ্চে অবস্থিত। সমুদ্রের
দৃশ্য মহাভাব-ব্যঞ্জক। সেই সীমান্ত অনন্ত
প্রসারণ, উর্দ্ধে খণ্ড খণ্ড মেঘমালা-শোভিত
নীলাধর, নিম্নে তরঙ্গোচ্ছাসস্রব যেত ফেনপুঞ্জ-
বিক্ষিপ্ত নীলাধুরাশি, চারিদিকে দৃষ্টিবর্ধার
শেখ সীমা পর্য্যন্ত নীলাবু-চূড়িত নীল নভো-
মণ্ডল। এদৃশ্যে মন এক অপূর্বভাবে পরিপূর্ণ
হয়, আর এই অনন্তের সৃষ্টিবর্দ্ধা মহান জগদী-

স্বপ্নের সঙ্গী স্বপ্নের অমৃতত্ব হয়। স্বপ্নপথে ভ্রমণে যেরূপ দৃশ্যবৈচিত্র্যে মন আকর্ষিত হয়, সমুদ্রে সে প্রকার বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় না। কেবল চারিদিকে সৌন্দর্য্য ভ্রমণে মনোহর দর্শন ও শ্রবণ পথে পতিত হয়। প্রথম প্রথম হই একদিন সমুদ্রের এই মহান দৃশ্যে মন বড়ই আকর্ষিত হয় বটে, কিন্তু পরে আর ভাল লাগে না। তাহাজে যদি অল্পপ্রকারে আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত না থাকিত, তাহা হইলে দীর্ঘকাল জলপথ ভ্রমণ অত্যন্ত কষ্টকর হইত। আমরা চারিদিন মাত্র সমুদ্রমধ্যে লিলাম, গান, বাজনা, খেলা প্রভৃতি নানা প্রকার আমোদে দিন কটন করিয়াছি; সমুদ্রে এক প্রকার সামুদ্রিক পৌড়া হয়, তাহাতে সর্বদা গা বমি বমি করে, মাথা ঘোরে, খাইতে ভাল লাগে না। আমাদের সহযাত্রীগণের অনেকে এই পৌড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সোভাগ্যের বিষয়, আমার কোন অসুখ উপলব্ধি হয় নাই। বরং দোলায়মান জাহাজের আন্দোলনে আমার বড়ই আরাম বোধ হইত। সমুদ্রের আর একটি প্রধান দৃশ্য সূর্য্যোদয় ও সূর্যাস্ত। সেই উদয় ও অস্তকালীন তপনের তপ্তকাক্ষনাভ লোহিত রাগের যে অপূর্ণ আলোকচ্ছটা স্থলীল নভোমণ্ডল ও জলরাশির উপর বিকীরণ করে, তাহার অনির্বচনীয় সুখময় বর্ণনাত্মক। সে বারে আমরা কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইয়া চারিদিনে মান্দ্রাজে উপস্থিত হই। বিতীয় বার আমরা ইষ্ট-কোষ্ট রেলওয়ে মাদ্রাজ যাই। কলিকাতা হইতে সন্ধ্যার পর মান্দ্রাজ মেল ছাড়ে, তৎপর দিবস সমস্ত দিবারাত্রি রাস্তায় থাকিতে হয়, তৃতীয় দিবস সন্ধ্যাকালে মান্দ্রাজ পৌছে। কোথাও না নামিয়া বরাবর যাইতে গেলে, যাহাদের কেলনারের হোটলে খাইতে আপত্তি নাই, তাহাদের কোন অসুবিধা নাট, কিন্তু আমাদের মত কুসংস্কারপন্ন পল্লীবাসীর পক্ষে বড়ই কষ্টকর। মান্দ্রাজের দক্ষিণ-ভারত-রেল-পথের বড় বড় ষ্টেশনে যে প্রকার হিন্দুদের জন্ত ভোজনাগার প্রতিষ্ঠিত দেখি-
রাছি, হৃৎপথের বিষয়, ইষ্ট-কোষ্ট রেল পথে সে প্রকার বন্দোবস্ত পাই নাই। একজ্ঞ আমরা

মধ্যে ভুবনেশ্বরে অবতরণ করি। কলিকাতা হইতে সে সময় রাত্রে রওয়ানা হইলে পর দিবস প্রত্যুষে ভুবনেশ্বর পৌছা যায়। আমরা এক দিবস ভুবনেশ্বরে থাকিয়া তৎপর দিবস প্রত্যুষে মান্দ্রাজ অভিমুখে রহনা হইলাম। উড়িষ্যার স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরি-মাণ্ডার সমিবেশ থাকার দৃশ্য বৈচিত্র্যের অভাব নাই। আমরা ক্রমে ক্রমে চিক্কা স্থানের সমীপ-বর্তী হইলাম।

চিক্কা।

চিক্কা হ্রদ উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজের গঙ্গান জেলার মধ্যবর্তী, ইহা দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশ মাইল, প্রস্থে গড়ে বিশ মাইল। মনো অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। ঐ দ্বীপগুলি এক একটা দেশীয় রাজার রাজ্য। অনেক রাজা আমাদের দেশে একটা ক্ষুদ্র জনাদারের চেয়েও ছোট; তথাপি তাহারা স্বল্প স্বাধীন বা করদ রাজা। এই হ্রদটি এক সময় সমুদ্রের অংশ বিশেষ ছিল, পরে সমুদ্রে চড়া পড়িয়া হ্রদে পরিণত হইয়াছে। জল কৃষ্ণাভ ঘোর লবণাক্ত। রেল লাইন বরাবর হ্রদের ধার দিয়া গিয়াছে। চলন্ত রেলগাড়ী হইতে হ্রদের দৃশ্য পরম রমণীয় দেখায়। ঈষৎ বাত্যান্দোলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদালা-শোভিত বিস্তীর্ণ কৃষ্ণ জলরাশি ঠিক যেন উদ্ভাসমান বিহঙ্গকুল-সমাকুল নাল নভোমণ্ডলের স্তায় প্রভাসমান হইতে থাকে। ইহার ধারে রম্ভা একটি প্রধান ষ্টেশন। সেই স্থানে হ্রদের দৃশ্য সর্বাপেক্ষা মনোরম। রেলের একধারে পর্বতমালা, অপর ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাচমালা-শোভিত প্রশস্ত জলরাশি। এখানে হ্রদের জল পর্বতের ছায়া সম্পাতে আরও কৃষ্ণবর্ণ দেখাই-
তেছে। হ্রদের উপরে অসংখ্য জলচর পক্ষী রেলের শব্দে উড়য়মান হইয়া বিচিত্র কল-রবে স্থানটী মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। হ্রদের ঘাটে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোট বাঁধা আছে দেখিলাম; যাহারা চিক্কা ভ্রমণে আনন্দ উপভোগ করিতে চান, তাহাদের এইখানে নামা উচিত। অনেকে এইস্থানে আঁসিয়া হ্রদে ভ্রমণ ও পক্ষী শিকার করিয়া থাকেন।

আমরা দোঁধিতে দেখিতে চিক্কার সহিত

উড়িয়ায় শেষ সীমা ছাড়াইয়া গজাম জেলার প্রবেশ করিলাম। গজাম জেলার লোক-
 ৩*বেশভূষার প্রতি লক্ষ্য করিলে উত্তর ইতে মান্দাজীর ক্রমপরিবর্ত-
 নের মধ্যম পথে প্রচায়মান হইতে থাকে।
 এখানেকার অধিবাসীরা বহুক উড়িয়া, ক
 মান্দাজী। দেহরামপুর গজামের বর্তমান সদর
 স্থান। বেলা ১২ টার সময় পাচোঁ এই স্থানে
 পৌঁছিলাম। আসিয়া ভূবনেশ্বর হইতে লওয়া
 হইয়া এক রাস্তাতে মধ্য বাতীত আব
 কোথাও, বাদ্যাদীত খাবার উপযুক্ত কিছুই পাই
 নাই। মনে করিমছিলাম, বেরহামপুরে
 অবশ্য লুচি তরকারি পাওয়া যাইবে। কিন্তু
 খাবার মধ্য ও বরফি মাত্র
 দেখিলাম। আশ্চর্যের সহন্যনিগণ মন্যে অনেক
 বাজারী ইউরোপীয় ভোজনাগারে প্রবেশ
 করিতে লক্ষ্যবোধ করিলাম না, কিন্তু আমরা
 অনন্তোপায় হইয়া নিষ্কিন্ত নিষ্ঠান কদলী
 সংযোগে ভোজন করিয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুধাবরণে
 বাধ্য হইলাম। ইহার পরে গজাম ষ্টেশনে
 মেল ধরে। তথায়, নৌভাগ্যের বিষয়, আমা-
 দেব দেশের স্থানিক গোকূদপঠকের ছায়
 ক্ষীরের পিঠক বিক্রয় হইতে দেখিলাম।
 তাহার স্নানও আমাদের সেই রসনা-তৃপ্তিকর
 চিরপরিচিত পিঠকের ছায়। খেপা বাছল্য,
 দেউকু কসুর ছিল, তাহা ইহাতেই পূর্ণকরা গেল।
 একদিকে পূর্ববাটের গিরিমালা, অপর
 দিকে সমুদ্র, ইহার মধ্যস্থ ভূমিখণ্ডের উপর
 দিয়া রেলপথ ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর
 হইতেছে। স্থানে স্থানে দৃশ্য-বৈচিত্র্যের
 অভাব নাই, কোথাও শস্য-জানল সমতলক্ষেত,
 কোথাও তরঙ্গায়িত গৈরিক প্রান্তর।
 কোথাও অনতি-উচ্চ পর্বতমালা, কোথাও
 ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শস্যক্ষেত্র-পরিবেষ্টিত সূর্য
 প্রাচীরাত্মক তৃণাচ্ছাদিত কুটার বিশিষ্ট
 কৃষকপন্নী। কচিং তরুচ্ছায়া অন্তরালে উচ্চ
 সৌধ-শির পরিদৃশ্যমান। সমৃদ্ধিশালী নগরী,
 রত্নালয়ের দৃশ্য পরিবর্তনের ছায় যুগপৎ
 আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল।
 আমরা রাত্রি ৮ টার সময় ওয়ালটারারে
 আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ওয়ালটারার

রেঙ্গল নাগপুর রেলও টার্মিনাস্ ষ্টেশন।
 এস্থান হইতে মান্দাজী ইষ্ট-কোষ্ট-রেলওয়ে
 আরম্ভ হইয়াছে। আসানের ওয়ালটারারে
 নাগিরা বিপ্রস্ন করিবার কথা। কিন্তু গাড়ী
 আসিতে অনেক বিলম্ব হওয়ায় ও বিজিগা-
 গন্তন না গেলে দাঙ্গা হি হি উপযুক্ত বাস-
 স্থান পাওয়া কঠিন ওয়া, এ সময়ে
 ওয়ালটারার দর্শন বাসনা ত্যাগ করিতে
 বাধ্য হইলাম। আশ্চর্যের বিষয়, এখানেও
 লুচি তরকারি পাওয়া মেল না। পর দিবস
 ব্যাপাটিনা ষ্টেশনে পুনঃ ইতে উড়িয়া দেখি-
 লাম, বেশ রোজ উটগাড়ে, আজ আর আমরা
 পাহাড়ের রাজ্যে নাই, বেগের উভয় পার্শ্বে
 অবলোকনে ঘোষ হইতেছে সেন আমরা
 বাঙ্গলা দেশেই চলিয়াছি। সেই ভ্রমপরিচিত
 ধাতু ক্ষেত্র, কোথাও হরিদ্রা, অড়হর বা ইকু
 ক্ষেত্র, সর্বত্রই কৃষিপূর্ণ সমতল-ভূমি। আমরা
 রাতেই গোদাবরী ও কৃষ্ণা পার হইয়া আসি-
 য়াছি। দেখিতে দেখিতে কেরাট্টা ষ্টেশনে
 উপস্থিত হইলাম। এখানে সাহেবেরা খান
 খাইয়া থাকেন। কিন্তু নিষ্ঠাবান হিন্দুর জন্ত
 সেই মিষ্ট আর কদলী ভিন্ন আর কিছুই নাই।
 এখানে নারিকেল অতি সস্তা। মালা ছাড়া
 জলপূর্ণ কচি নারিকেল এক পয়সায় একটা
 বা দুইটা ষ্টেশনে বিক্রয় হইতে দেখিলাম।
 আমার সঙ্গে চিড়া ছিল, আজ নারিকেল-
 উদকে চিড়া ভিজাইয়া, কচি নারিকেল, কদলী
 ও মিষ্ট সংযোগে এই চিড়া ফলাহারে পরিতৃপ্ত
 হওয়া গেল। বাটী হইতে চিড়া আনিবার
 সময় আমার একজন সঙ্গী কিছু বিক্রপ করি-
 য়াছিলেন, এক্ষণে তিনিও এই চিড়ার সঙ্গে
 বিক্রপ পর্য্যন্ত পরিপাক করিয়া লইলেন।
 আমরা ক্রমেই সমুদ্রের অতি নিকট দিয়া
 চলিতেছি। সমুদ্র উপকূলস্থিত ভাল তমাল
 নারিকেল বৃক্ষের ব্যবচ্ছেদে স্থানীয় তরঙ্গ-
 সঙ্কুল সমুদ্রের বলক দর্শনে আমরা সেই অমর
 কবি কাশিদাসের—

“হরাদয়শ্চক্র নিভস্য তরী”
 তনালতালী বনরাজী নীলা।
 আভাতি বেলা লবণাসুগাশি,
 ধারা-নিবন্ধের কলঙ্ক রেখা ॥”

বীচিমালা, 'এক' দিকে মহোদ্যায় বিশাল বিরাট তাণ্ডব আফালন, ও অল্প দিকে পিঞ্জরাবদ্ধ সাগর-বালার ক্ষুদ্র তরঙ্গমালায় নয়নাভিরাম আন্দোলন, এই রোদ্র ও মধুরের অপূর্ণ সম্মিলন দেখিতে দেখিতে আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলাম। চন্দ্রালোক সন্ধ্যার পর এই স্থানে আসিলে চন্দ্রালোক-প্রতিফলিত নীল সমুদ্রের মনোহারী দৃশ্য আরও অধিকতর বিমোহিত হইতে হয়। কিন্তু নবাগতের পক্ষে সন্ধ্যার পর সেখানে একাকী যাওয়া নিরাপদ নহে। এখানে প্রলোভনের দালাল নূতন লোক দেখিলে ঠিক চিনিয়া ধরিবে ও নানা প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিবে। সেই প্রলোভনের মোহে আরুণ্ট হইলে পরিশেষে সর্বস্বান্ত হইয়া ফিরিতে হয়।

২। অবজারভেটরি ও লাইট হাউস—
দেখিবার উপযুক্ত, আমরা অবজারভেটরির সর্বোচ্চ তলে উঠিয়া একদিকে নিম্নের চিত্রবৎ নগরী এবং অপর দিকে মহান সমুদ্রের অপরূপ দৃশ্য মোহিত হইয়া পড়িলাম। লাইট হাউজের পরিবর্তননশীল (Revolving) আলো সমুদ্রের মধ্যে ২০ মাইল দূর হইতে দেখা যায়।

৩। ফোর্ট-সেন্ট জর্জ, — ভারতবর্ষে ইং-রাজ-নির্মিত প্রথম দুর্গ। ইহা সমুদ্রের উপর একরূপ ভাবে অবস্থিত যে, ইহার এক দিকের ভিত্তিমূল সমুদ্র-তরঙ্গে প্রাতিহত হইতেছে, দুর্গের সুদৃঢ়তার সঙ্কে আমাদের বলিবার কিছু নাই। তবে ইহা কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম অপেক্ষা অনেক ছোট বলিয়া বোধ হইল এবং টিপু সুলতানের কয়েকটা কামান ব্যতীত আর দৈর্ঘিবার নূতন কিছু নাই।

৪। হাইকোর্ট, পোষ্ট অফিস, সমস্তই সমুদ্রের ধারে অবস্থিত ও দেখিতে সুন্দর কিন্তু ইহার একটাও তুলনায় কলিকাতার, সমকক্ষ হইতে পারে না।

৫। কলিকাতার ইডেন গার্ডেনের জায় এখানে পিপলস পার্ক অবস্থিত। এখানে নানা দেশের নানা প্রকার বৃক্ষ লতাাদি আছে।

ইহা কলিকাতার ইডেন গার্ডেনের জায় স্থান ও অপেক্ষাকৃত বড় বলিয়া বোধ হইল।

৬। মিউজিয়ম ও লাইব্রেরী সহরের মধ্যে অবস্থিত। মিউজিয়মটা ছোট হইলেও দেখিবার উপযুক্ত, এখানে নানাবিধ প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র ও প্রাচীন শিল্প কলা দেখিলাম। নানাবিধ জীবজন্তুর শারীরিক তত্ত্ব শিথি-বার আদর্শ (comparative anatomical model) ও বিবিধ খনিজ ও ত্বক্ক সংগ্রহ রক্ষিত আছে। মিউজিয়মের পার্শ্বে লাইব্রেরী অবস্থিত। এখানে পাঠকগণ বিনামূল্যে বসিয়া পড়িতে পারেন।

৭। মান্দ্রাজ নূতন সহর বলিয়া এখানে প্রাচীন হিন্দু কাষ্ঠ তেমন নাই। নূতন কার্ত্তির মধ্যে ত্রিমূর্ত্তি পাথ্র সাগাথর মন্দির ও মাইলাপুরে দৈবর আদীর মন্দির সর্ব প্রধান। উভয় মন্দিরই প্রায় এক রকমের, উভয়ের সম্মুখেই পুষ্কনী আছে। প্রণামোক্তী বিষ্ণু মন্দির ও শৈবোক্তী শিবের মন্দির।

৮। এখানে একটা কৃষি বিদ্যালয় ও মডেল ফার্ম আছে; আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু বড়দিনের ছুটিতে বন্ধ থাকায় দেখিতে পারি নাই।

৯। মান্দ্রাজের ছয় মাইল দূরে আধিয়ার নামক স্থানে থিয়সপিকাল সোসাইটির প্রধান আড্ডা। আধিয়ার নামক একটা নদী উপর অবস্থিত। নদীর সেতুপার হইয়া সমুদ্রের একটা প্রকাণ্ড উদ্যানে মধ্যস্থিত গুপ্ত অট্টালিকা থিয়সপিকাল সোসাইটির প্রধান কার্যালয়। এখানে কর্ণেল অলকট সাহেব বাস করিতেন। এই স্থানের লাইব্রেরীতে বিস্তর সংস্কৃত ও পালি ভাষার হস্তলিখিত পুস্তক সংগ্রহ আছে।

উত্তর ভারত ও বাদ্শালা দেশ বহুকাল অধি মুসলমানের অধীন থাকায় অপর গাটি প্রাচীন আর্গ্যভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে গত ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে বিজয়নগরের রাজবংশের পতনের পূর্বে পর্যন্ত ও মুসলমান সেরকম প্রবেশাধিকার পায় নাই এবং বিজয়নগরের পতনের পর বিজাপুর, আহম্মদনগর প্রভৃতি ৫টা মুসলমান

রাজ্য স্থাপিত হইলেও সেই সকল রাজ্যে হিন্দু-প্রাধাত্য লোপ হইয়াছিল না। পরন্তু প্রায় ১০০বৎসরের মধ্যেই মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রবল হইয়া উঠায় পুনরায় হিন্দু-প্রাধাত্য জাগ্রত হইয়া উঠে। এই জগৎ দাক্ষিণাত্যে এপর্য্যন্ত প্রাচীন আর্য্য আচার পদ্ধতি গাবনিক মিশ্রণে বিশেষ রূপান্তর প্রাপ্ত হইতে পারে নাই।

মান্দ্রাজে মুসলমানের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে আদৌ মুসলমানের বাস নাই। মান্দ্রাজে হিন্দুরা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, আর্য্য Ayar ও নার্য্য Nayar। ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রাচীন কালে উত্তর ভারত হইতে যে সকল আর্য্যগণ দাক্ষিণাত্য বিজয় সম্পন্ন করেন, তাহাদের সম্ভ্রতিগণ আর্য্য নামে এবং তদ্দেশ-বাসী আদিম অদিবাসীগণ নার্য্য নামে পরিচিত ছিল। পরে কালক্রমে অনেক শঙ্কর জাতি নার্য্য নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে ও বিন্দুক আদিম অদিবাসীগণ আমাদের দেশের কোল ভীল সাঁওতালের জায় পেরিয়া প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতিতে পরিণত হইয়াছে। মান্দ্রাজে প্রায় শঙ্করচাচ্যের প্রাচুর্য্যেব শৈব ধর্ম্মের প্রাচুর্য্য খুব বেশী। আযাগণের অধিকাংশ শৈব। কিন্তু শেঠী (আর্য্যবৈজ্ঞ) ও নার্য্য (নার্য্য)গণের অধিকাংশ বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। প্রত্যেক বড় বড় নগরে শিবের ত্রিবিম্বর মন্দির দেখা যায়। তবে শৈব মন্দিরের সংখ্যাই বেশী। মান্দ্রাজের শৈবগণ শাক্ত ও লিঙ্গায়ত প্রভৃতি নানাপ্রকারে ও বৈষ্ণবগণ রামানুজ মাক্ষ প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত। আমাদের বাঙ্গালা দেশেও শাক্ত বৈষ্ণবের শ্রেণীভেদ আছে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে আহার বিবাহাদির বাধা নাই; মান্দ্রাজে শৈব ও বৈষ্ণব গ্রাম্যের মধ্যে বিবাহ দূরে থাকুক, কেহ কাহারও অন্ন গ্রহণ করিতে পারে না। আমাদের দেশে রাঢ়ি বারেকের মধ্যে বিবাহ হয় না বটে, কিন্তু পরস্পরের হাতে খাওয়ার বাধা নাই। মান্দ্রাজে কোন সম্প্রদায়ের হাতে অপর সম্প্রদায় থাইতে প্রস্তুত নহে।

মান্দ্রাজ হিন্দুদের মধ্যে স্বীজাতির অব-

স্থিতি প্রচলিত নাই। সেখানে 'সধবা ও কুমারী' গণ মন্তকে অবগুঠন দেয় না। কেবল মাত্র বিধবারা অবগুঠন ব্যবহার করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণের বিধবারা অধিকন্তু কেশ পর্য্যন্ত মুণ্ডন করে। আমাদের দেশের সধবারা যেমন হাতে লোহ শাঁখা ও কপালে সিন্দূর ধারণ করে, সেখানে সধবার লক্ষণ স্বরূপ গলায় তালিবন্ধন ও পদের বুদ্ধাঙ্গুলিতে রোপ্য বা পিত্তল নির্ম্মিত কড়া ধারণ ও কপালে কুম্ভের টাপ পরিয়া থাকে। গলায় তালিবন্ধনে সধবা ও কুমারীর প্রভেদ বন্ধিতে পারা যায়। বিবাহের সময় স্বামী কর্তৃক অবস্থা বিশেষে স্বর্ণ রোপ্য বা পিত্তল নির্ম্মিত হরতনের টেকার আকারে একখানা কবচ, স্বর্ণ বা রোপ্যনির্ম্মিত চেইন অথবা স্ত্রীদ্বারা গলদেশে প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহাকে তালী বুলিয়া থাকে। উহাই সধবার চিহ্ন। বিধবা হইলে ঐ তালী ভিন্ন করিয়া ফেলিতে হয়। এখানে বালিকা বিবাহের প্রচলন নাই। বাগদান ক্রিয়া অল্প বয়সেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু অনেক সময় পাতুমতী না হইলে বিবাহ হয় না। সম্প্রদায় বিশেষে বালিকাবিবাহ প্রচলিত থাকিলেও, যে পর্য্যন্ত বালিকা পাতুমতী না হয়, সে পর্য্যন্ত সে ভবুগৃহে বাইতে পারে না। গর্ভধারণ সংস্কার বালিকার পিতৃগৃহে সম্পন্ন হইলে স্বামী স্ত্রীকে স্বীয় গৃহে লইতে পারেন। এই ব্যবস্থা অতি সুন্দর। বাঙ্গলাদেশে এই প্রথা প্রচলিত হইলে আর বাঙ্গালী বালিকাগণের অপরিস্রব অবস্থার গর্ভধারণ কারয়া অন্তর্য্যমুখে বুদ্ধি সাজিতে হয় না। তবে সোভাগ্যের বিবরণ আজকাল শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা দেশ হইতেও বালিকা বিবাহ উঠিয়া গাইতেছে। এদেশে 'স্ত্রীলোকাদিগের যথেষ্ট স্বাধীনতা' আছে। রাস্তাঘাটে, দোকানে বাজারে, রাজপথে বা দেবমন্দিরে সর্বত্রই ভদ্র-সিমন্তনীগণ নির্বিবাদে নিঃশঙ্কোচে যাতায়াত করিয়া থাকেন। সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে সদর ও অন্তর বলিয়া দুইটা মহল থাকে না। প্রত্যেক গৃহে গৃহস্বামীগণই সর্ব্বের সর্ব্বকা পুরুষগণ জীবনোপায় আহরণে নিযুক্ত, তন্নিম্ন অল্প সমস্ত কার্য্য গৃহস্থলীগণকে সম্পন্ন

করিতে হয়। কোন গৃহদ্বারে গেলে দেখিতে পাইবে যে, দ্বারের সম্মুখে লেপন ও তক্তপরি আলিপনা দিয়া সমুদ্র কয়েকটি পুষ্প ও ধাতু রক্ষিত হইয়াছে। প্রতিদিন গৃহে মঙ্গলের শুভাগমন দ্রষ্ট প্রত্যেক গৃহদ্বারে এই মঙ্গলিক সজ্জা অত্যাবশ্যক মনে করে। মান্দ্রাজী জীলোকেরা অশ্রান্ত পরিগ্রমী, বিশেষ ধনবানের গৃহ বা গীত দাসদাসীর ব্যবহার নাই। জাক্কা গৃহে দাসদাসীর কার্য বেশী থাকে না, কারণ তাহারা অত্র কোন জাতির স্পৃহা কোন দ্রব্য ব্যবহার করে না। এমন কি, ধোপা বাড়ার কাপড় পর্য্যন্ত জলে না ধুইয়া ছুইতে নাই। নাপিত স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়। এইজন্ত জাক্কা কজাগণের, গৃহস্থালীর সমস্ত কার্য, এমন কি, তৈজস পত্রাদি ও পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত নিজেদের পরিষ্কার করিতে হয়। ইহা ছাড়া রক্ষাদি সমাপন, ও পবিবারের সমস্ত লোকের পরিবেশন, বলনাগণের নিত্য অবশ্যকর্তব্য। আবার প্রত্যেক কুলকামিনীর, কি বালিকা, কি যুবতী, কি প্রৌঢ়া, প্রতিদিন সায়াহ্নে বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া গ্রামে বা নগরে দেবমন্দিরে দেবদর্শনে যাওয়া নিত্যপ্রতিপাল্য ধর্ম বলিয়া গণ্য। পূর্ণহই বলিয়াছি, এদেশে অবরোধ প্রথা প্রচলিত নাই। প্রাচীন আর্য্য-রমণীগণ যে প্রকার বাধানতা উপভোগ করিয়া আসিয়াছেন, এখনও এখানে সে প্রকার জী স্বাধীনতা বর্তমান আছে। আর্য্যাবর্তের জায় মহাক্কাীয় পুথি আমাদের সনাতন আর্য্যপ্রাথমিক দৃষ্টিভূত করিতে পারে নাই। এইজন্ত এদেশে হাটে, ঘাটে, বাজারে, দেবমন্দিরে ভদ্রকুলকামিনীগণ, পুরুষ অভিভাবক ব্যতীত, নিঃসঙ্কোচে বিচরণ করিয়া থাকে। আমাদের দেশে কুলকামিনীগণ তীর্থ স্থানে বা দেবমন্দিরে অনেকটা স্বাধীনতা উপভোগ করে, কিন্তু সেই স্বাধীনতার মধ্যেও শৈশবাত্মক অবরোধজনিত সঙ্কোচ ও কুষ্ঠার ভাব স্পষ্ট বিদ্যমান দেখা যায়। এই উত্তর দেশে রমণীগণের চাল চলন বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে বঙ্গ রমণীর স্বিক্ত মধুরী পূর্ণ রমণীর কাস্তি—আর মঙ্গলবার দাপ্ত তেজপূর্ণ

সহিমান্বর স্ত্রী; একজনের লাজনত্ব সচল কোমল নয়ন, অপরের শঙ্কশূন্য উজ্জল চল চল লোচন; একের অদ্বাবৃত লাজড়-জিত অমিষ্ট সুন্দর বদনমণ্ডল, অপরের অনাবৃত হস্ত মধুর প্রফুল্ল আনন; কেমন একটি পার্থক্যের সুস্পষ্ট সুন্দর ছায়া দ্বয়-দর্পণে প্রতিফলিত করে। প্রভাত-শিশির-সিক্ত কুসুমের ও মধ্যাহ্ন রবিকরদীপ্ত প্রহনে যে প্রভেদ, বাঙ্গালী ও মান্দ্রাজী রমণীতে সেই প্রভেদ। এক কামিনী সেকালিকা, অপর চম্পক চন্দ্রমল্লিকা। উভয়েই মৌল্য নয়ন-তৃপ্তিকর, সুগন্ধে প্রাণ প্রফুল্ল করে; কিন্তু একজন প্রভাত সন্ধ্যারের সুকোমল স্পর্শে বরিয়া পড়ে, অপর মুক্ত বাতাসের কোলে হেলিয়া ছলিয়া স্বীয় মৌল্য অধিকতর বিকাশ করে।

মান্দ্রাজ রমণীগণের পোষাক পরিচ্ছদও বঙ্গ কামিনীগণের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ মনে করি। আমি অবশ্য আমাদের দেশের নব্য-শিক্ষিতা বা আলোকপ্রাপ্তা রমণীগণের পোষাকের সহিত তুলনা করিতেছি না, আমাদের দেশের পল্লীবাসিনী নিরক্ষরা রমণীগণের সহিত মান্দ্রাজের সমাবস্থাপন্ন পল্লীবাসিনীদের বেশভূষার তুলনা করিলে, মান্দ্রাজ রমণীগণকে এ বিষয়ে অনেক উচ্চে অবস্থিত বলিয়া বিশ্বাস হয়। বাঙ্গালী পল্লীবাসিনী রমণীগণের জ্ঞান নয় গাত্র—অদ্বাবৃত দেহ বা অতিসূক্ষ্ম-বস্ত্র-পরিহিতা কোন রমণী মান্দ্রাজের কোথাও আমায় নয়নপথে পতিত হয় নাই। এদেশে অতি দীনা কুলি-রমণীও গায়ে অক্ষরাখা পরিধান না করিয়া কখনও বাহিরে যাইবে না। অথচ মান্দ্রাজ বাঙ্গালী অপেক্ষা উষ্ণপ্রধান দেশ। মান্দ্রাজী রমণীগণকেই মহারাষ্ট্রীয়দের মত কাছা দিয়া, কেহবা পশ্চিম দেশীয় জীলোকের ন্যায় ফেরতা দিয়া মাটি পড়িয়া থাকে। ইহাদের পরিধেয় বস্ত্র সচরাচর বার হাতের নীচে হয় না এবং নিত্য সূক্ষ্ম নহে। যাহারা কিছু অবস্থাপন্ন, তাহারা নানাবর্ণের রেশম-মিশ্রিত, যাহারা অপেক্ষাকৃত হুস্থ, তাহারা রেশম ও সূত্র মিশ্রিত ও নিত্যস্ত নিম্ন রমণীগণ মোটা

জুতার রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে । প্রায় সকলেই কতিদেশে সাতীর উপরে একটি বেঠনী পরিধান করিয়া থাকে । সেই বেঠনী অবস্থানুসারে স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল বা সূত্র নির্মিত হইয়া থাকে । ঐরূপ বেঠনী পরিধানের ফলে ক্ষণ কটির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কতিদেশ হইতে বসন স্থলিত হইবার আশঙ্কা দূরীভূত করে । মান্দ্রাজী রমণীগণের অলঙ্কার-প্রিয়তা আমাদের দেশের রমণীগণের অপেক্ষা অনেক কম বোধ হইল । সৌভাগ্য-ক্রমে, পরিদর্শনীর জন্য, আমাদের অনেক বড় ঘরের মেয়েদের দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল, তাহাতে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, বস্ত্র রমণীগণের ন্যায় অলঙ্কার-পারিপাট্য তাহাদের নাই । তবে তাহাদের কবরী-ভূষণের বৈচিত্র্য আছে । সকল রমণীই সচরাচর দীর্ঘকেশী ; সেই কেশ নানা ভাবে বিন্যস্ত করিয়া কবরীবন্ধন ও তাহাতে নানাবিধ অলঙ্কার ধারণ যেন তাহারা সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা মনে করে । আমাদের দেশে অবগুণ্ঠন প্রচলিত থাকার অনাবৃত মস্তকে বাহিরে যাইবার প্রথা নাই বলিয়াই, বোধ হয়, অতদূর কবরী ভূষণের পারিপাট্য প্রয়োজন হয় না ।

শিক্ষা বিষয়েও মান্দ্রাজী রমণীগণকে তাহাদের বস্ত্র ভগিনীগণের নীচে অবস্থিত বলিয়া মনে করি না । তথাকার ব্রাহ্মণ কুমারীগণের অন্ততঃ কিছু লেখাপড়া ও সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হয় । তাহা না হইলে ভাল সম্বন্ধ হয় না । অনেকে একটু সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া থাকেন । শুনিয়াছি, মান্দ্রাজে অনেক ব্রাহ্মণ কুমারী সমগ্র গীতা খানি মুখস্ত বলিতে পারে । আমরা কুন্তকোনমে অবস্থিতি কালে একটি ভক্ত পরিবারের মেয়েদিগকে শিক্ষকের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতে দেখিয়াছি । সেখানে মেয়েদের জন্য একটি সংস্কৃত চতু-পাঠী আছে । শুনিলাম, তাহাতে প্রায় পতাধিক কুমারী সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া থাকে ।

মান্দ্রাজে জীলোকদের বেশভূষা ধেরূপ স্থলন্দর, ও সুরচিসঙ্গত, পুরুষদের বেশভূষা তেমন নহে । অনেকে কাছা দিয়া কাপড়

পরে না । এক খণ্ড বস্ত্র বহির্কাসের ভিত্তি কোমরে জড়াইয়া রাখে । অনেক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ যুবকও পারে, চন্দ্রপাত্রকা ব্যবহার করে না । আমি অনেক অফিসারকে নগ্ন পায়ে কোটে যাইতে দেখিয়াছি । শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় সকল মান্দ্রাজী মস্তকে লম্বা চুল রাখে, ও পশ্চাত্মদিকে একটি স্থল বেণীর আকারে জড়াইয়া বাঁধে ।

মান্দ্রাজে সামাজিক আচার ব্যবহারে বাঙ্গালা হইতে অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয় । এদেশে মামা ভাগিনেয়ী বিবাহ হইয়া থাকে । আমরা প্রথমে যেবার মান্দ্রাজে যাই, সেবারে এই প্রকার একটা বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম । মান্দ্রাজের মালাবার প্রদেশে আরও অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত আছে । তথায় নোম্বুত্রী ব্রাহ্মণ বলিয়া এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ আছে । তাহাদের মধ্যে মাত্র জ্যেষ্ঠপুত্রের শাস্ত্রানুসারে বিবাহ হইয়া থাকে, অজ্যেষ্ঠ পুত্র বিবাহ করিতে পারে না । তাহারা নার্য্য রমণীদের সহিত গান্ধর্ব্ব বিবাহে আবদ্ধ হইয়া দিন যাপন করে । তাহাদের ঔরসজাত পুত্রও উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না । এইজন্ত ঐ শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও বহু রমণীকে চিরকুমারী অবস্থায় অভি-বাহিত করিতে হয় । মালাবার দেশের নায়ার (নার্য্য) দিগের বিবাহ প্রথা আরও অদ্ভুত । তাহাদের কন্যাগণ ক্ষতুমতী হইবার পূর্বেই উক্ত নোম্বুত্রীর ব্রাহ্মণ অথবা স্বজাতির উচ্চ-শ্রেণীর যুবকের সহিত তালীবন্ধন ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া উদ্ধাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় ও তিন দিবস একত্রে বাস করিয়া চতুর্থ দিবসে তালীবন্ধন ছিন্নকরতঃ বিবাহসম্বন্ধ পরিত্যাগ করে । উক্ত যুবকবর কিছু 'পণ গ্রহণ করিয়া জীবন স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়া যায় । তদবধি কন্যা পিতৃগৃহে বাস করে ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নিজ পছন্দ মত যুবকের সহিত গান্ধর্ব্ব বিবাহে আবদ্ধ হইয়া পিতৃালয়ে বাস করিতে থাকে, ইহাতে কিছুমাত্র দোষ বা লজ্জার কারণ মনে করে না । যতদিন উভয়ের মনের মিল থাকে, ততদিন উভয়ে একত্রে স্থখে বাস করে । যুবকটী কন্যাগৃহে আসিয়া রাজি যাপন করে,

যুবক ব্রাহ্মণ হইলে জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করে না আর স্বজাতীয় হইলে রাত্রি কত্কার গৃহে সময় সময় আহার করিয়া থাকে। যুবক যতদিন বাস করে, ততদিন কত্কাকে পরিষেয় বস্ত্রাদি ও অবস্থা ভাল হইলে অলঙ্কারাদিও প্রদান করিয়া থাকে। যুবতীর মনের অমিল হইলে সহজেই সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া অন্য পুরুষের সহিত ঐ প্রকারে বাস করিতে পারে, তাহা সে সমাজে কোনরূপ নিন্দার কারণ হয় না। পূর্বে একই সময়ে বহুজনের সহিত বাস করিলে দোষের বলিয়া গণ্য হইত না; কিন্তু আজ কাল শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সে পদ্ধতি উঠিয়া যাইতেছে। এক্ষণে একজনের সহিত বসবাস কালে অন্য পুরুষের সঙ্গ করিলে নিন্দনীয় হইতে হয়। নায়ার রমণীগণের গর্ভজাত সন্তান মাতুলের উত্তরাধিকারিণী হয়। অনেক সময় তাহাদের পিতৃনিরূপণ অসম্ভব বলিয়া তাহারা পিতৃপরিচয়ে পরিচিত না হইয়া মাতুলের পরিচয়ে পরিচিত হয়। এইজন্য মালাবারের আইন স্বতন্ত্র। আজকাল অনেক উচ্চশিক্ষিত নায়ারগণ এই আইন পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করিয়াও কৃত-কার্য্য হইতে পারেন নাই।

মালাবারে খিওর বলিয়া একজাতি আছে, তাহাদের মধ্যে তিব্বতদেশের ন্যায় সকল লাতা মিলিয়া এক পল্লী গ্রহণ করিয়া থাকে। একজন্ত তাহাদের মধ্যে অনেক কত্কা অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য হয়। সেই সকল অবিবাহিতা কত্কাগণ পিতৃগৃহে বাস করিয়া স্বেচ্ছামত ভিন্ন জাতীয় বা ভিন্ন দেশীয় পুরুষের সহিত বসবাস করিতে পারে, তাহাতে সমাজে নিন্দনীয় হয় না। তাহাদের পুত্র-গণও তাহাদের মাতুলগণের প্রতিপালিত হইয়া থাকে। বহুকাল হইতে ইউরোপিয়া-গণ বাণিজ্য ব্যাপদেশে মালাবার দেশে বাস-কালে খিওর উপপত্নী গ্রহণ করিয়া থাকিত; সেইজন্য আজকাল মালাবার দেশে অজ্ঞাত জাতি অপেক্ষা খিওরদের মধ্যে অধিকাংশ রমণী ইউরোপীয় শব্দর জন্ত দেখিতে পরমা সুন্দরী। আমি ইতিপূর্বে মান্দ্রাজী রমণীগণের বেশভূষার প্রশংসা করিয়াছি। কিন্তু মালাবার

প্রদেশে সকলই অদ্ভুত। এদেশে খিওর প্রভৃতি রমণীগণ বক্ষাবরণ ব্যবহার করে না। তবে রাস্তায় চলিতে আজ কাল একখানি রুমাল কণ্ঠদেশে ঝুলিয়া রাখা যায়। মান্দ্রাজী যাত্রা কালে রেল গোড়ীতে জনৈক প্রাচীন মান্দ্রাজী ভদ্রলোক মাদুরা দেবমন্দিরে এইরূপ অনাবৃত বক্ষ ললনাগণের সাক্ষাৎকারের আশঙ্কা আমাদের মনে জন্মাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্যের বিষয়, বলিতে পারি না, মাদুরায় কামাখ্যা দেবীর এইরূপ স্বভাবের নথ দৃষ্ট আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। তবে মালাবার প্রদেশের অনেক স্থানে, বিশেষত জিবাঙ্কুর ও কোচীনে এইরূপ নথ দৃষ্ট সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায় ও শুনিয়াছি, কত্কা-কুমারীতে ইহার সর্বাঙ্গীন পরিণতি হইয়াছে। মালাবারে এরূপ অনেক নীচ জাতি আছে, তাহাদের স্পর্শও উচ্চগণ অশুচি মনে করে, এইজন্য তাহাদের রাস্তার মধ্য দিয়া চলা নিষেধ। তাহাদের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়া এরূপ ঘৃণার হস্ত হহতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। বোধ হয়, এইজন্যই মালাবার প্রদেশে অনেক দেশী খ্রীষ্টানের বাস।

মান্দ্রাজে তামিল, তেলুগু, কান্নারী ও মালয়ালম্, এই চারিটা ভাষা প্রচলিত। ঐ ভাষা চতুষ্টয়ের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে, সকলগুলিই মূল তামিল হইতে উৎপন্ন, যেমন বাঙ্গালা ভাষার সহিত আমাদের ও উড়িয়া প্রভৃতির বিভিন্নতা, ইহাদের মধ্যেও প্রায় এরূপ তারতম্য লক্ষিত হয়। মান্দ্রাজের অনেকেই তামিল ভাষা বুঝিতে পারে। বাঙ্গালা, হিন্দী, মারহাট্টী, গুজরাটী, প্রভৃতি যেমন সংস্কৃত-মূলক, তামিল বা তেলুগু ঠিক সেরূপ নহে, কিন্তু তাই বলিয়া যে সংস্কৃত ভাষা একেবারে প্রবেশাধিকার লাভ করে নাই, এরূপ কথা বলা যাইতে পারে না। নিম্নে কতকগুলি তামিল শব্দ ও তাহার প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইল।

তামিল	বাংলা
আরিসি	... চাউল
আয়েই	... তৈল

পরাপু	ডাইল
তারি	}	...	জল
নিলু		...	মধি
ভায়েয়	পান
বিটেল	মাছ
মনিবান	গাড়ী
ভাণ্ডি	পায়খানা
কক্কণ	না।
ইয়ে	কর।
সেই	স্বত
লেই	কলা
ভালুইপালম্	লবণ
উন্নু	ছদ্ম
পালু	অপারি
পকু	তামাক
পোরলে	জীলোক
মানুষী	গাড়োয়ান
ভাণ্ডিকোরম্	হাঁ
অম্	যাও
পো	এক
অন্নু	দুই
রও	চারি
লালু	ছয়
আরু	আট
এই	দশ
পঞ্চু	তিন
মিঙ্গু	পাঁচ
আই	সাত
ইয়ালু	নয়
অধু	

মাল্লাজ অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গেলে হিন্দি জানিলে চলে না। তবে অনেকটা ইংরাজীতে কাজ চলে। বড় বড় নগরে মটর মজুর গাড়োয়ান পর্যন্ত ইংরাজী কথা বুঝিতে পারে। তবে নিত্য পল্লীগামে তামিল বা তেলুগু ভিন্ন কোন কথা বুঝাইবার উপায় নাই।

বাঙ্গালা অপেক্ষা মাল্লাজে শীত কম। শীত কালে রাত্রে একখানি মোটা চাদর বা আলো-য়ান গায় দিয়া থাকি যায়। গ্রীষ্মকালে গরম কিছু বেশী হয়, তবে সমুদ্র তটবর্তী স্থানগুলি প্রায়ই নাতি শীতোষ্ণ। এদেশে মধ্যে মধ্যে শীতকালে বৃষ্টি হইয়া থাকে। গত ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মাল্লাজ কংগ্রেসের সময় যে প্রকার তিন দিন ব্যাপী অধিগ্রাণ্ড মুদলদ্বারে বৃষ্টি হয়, সেরূপ বৃষ্টি বাঙ্গালা দেশে বারি কালেও কদাচিৎ দেখা গিয়া থাকে। আমরা বৃষ্টি ধরিয়া গেলে অপরাহ্নে বাহির হইয়া বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারি নাই। সমস্ত রাজপথ তখনও নদীর আকার ধারণ করিয়াছিল। দেখিলাম, রাস্তার উভয় পার্শ্বে নিম্নতলার দোকান ও ঘরের মধ্যে জল প্রবেশ করিয়াছে। রাস্তার উপর নৌকা চলিতেছে। ২৪ খানা গাড়ীর ঘোড়া আকর্ষণ নিমজ্জিত হইয়া যেন সাঁতার দিয়া যাইতেছে। বৃষ্টি বন্ধ হইবার প্রায় ২৪ ঘণ্টা পরে আমরা নগর দেখিতে যাই। তখনও মাল্লাজের মত সমুদ্র তীরবর্তী স্থানের এই দশা।

এই অতি বৃষ্টি নিবন্ধন দক্ষিণ ভাগ রেল পথ অনেক স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; আমরা পর দিবস প্রাতে ত্রিচিনপল্লী যাইবার উদ্দেশ্যে এগনোর ষ্টেশনে গিয়া শুনিলাম যে, চিরাড়পট্ট পর্যন্ত মাত্র গাড়ী যান্ত্রায়াত করিতেছে। তাহার পরে ৩৪ স্থানে রাস্তা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় রেল চলাচল বন্ধ হইয়াছে। তবে মাল্লাজ রেলপথে ইরোড জংসন হইয়া গুরিয়া গৌলে ত্রিচিনপল্লী বা তাহার দক্ষিণে সর্বত্র যাওয়া যায়। কারণ সেদিকে বৃষ্টি হয় নাই। আমাদের প্রথমে এই পথে মহীশূর দেখিয়া যাইবার কল্পনা ছিল, কিন্তু প্লেগের ভয়ে মহীশূর না গিয়া, বাধ্য হইয়া এই রাস্তার অনেক গুরিয়া, সেতুবন্ধ রানেধর যাইতে হইয়াছিল।

শ্রীকুঞ্জলাল সাহা।

মা ।

তুহার-ঢাকা তুঙ্গ পাহাড়
মুকুটরূপে মাথায় যার,
বক্ষে শুভ ব্রহ্মপুত্র,
মনাকিনী স্বধার ধার ;
উপরে যাহার স্বৰ্ণ ফলে,
মাটির তলে হীরার খনি,
কেবলি নহে ভারতবাসীর ;—
বিশ্ব ধরার মাথার মণি ;
শৈল-পাহুকা চুমিয়া যার,
চরণ-ধূলি সাগর বহে,
রাজার রাজা সে মারে মোর
দীন দরিদ্র কে আজ কহে ?
জননি মোর, দেবতা মোর,
গৰ্ব আমার সার্থকতা,
পাগলে কত কি(ই) না বলে,
কে শোনে মা তাদের কথা ?

বুকের রক্তে পুত্র যাহার
করেছে সিন্ধু শ্রামল বুক,
বুকের রক্তে পুত্র আবার
করবে যাহার উজল মুখ ;
লক্ষ অসি যাহার তরে
উঠেছে নাচি' লক্ষ বার ;
তীর ধনুকে মুক্তি-মন্ত্র
কামান ভজন গাইল যার ;
যাহার তীরে মরণ নিয়ু
নিত্য লুফালুফি চলে,
শক্তি রূপা সে মারে মোর
শক্তিহীনা কে আজ বলে ?
জননি মোর, দেবতা মোর,
গৰ্ব আমার সার্থকতা,
পাগলে কত কি(ই) না বলে,
কে শোনে মা তাদের কথা ?

শিবজী প্রতাপ পুত্র যাহার,
পুত্র যাহার রণজিৎ,
ভক্তি ধর্ম্মে হৃদিত যার
শক্তি-সৌধের অচল ভিত্তি ;
যাহার শৈল রক্তে রক্তে
লুপ্ত অযুত ধাম পেলি,
লক্ষ 'ওয়াটালু' যাহার
কক্ষে কয়ে রক্ত কেলি ;
মোগল পাঠান বাদসা যাহার
দ্বিধ চরণ ধূলয় সাজি,
পূজ্য আমার জন্মভূমি
কেবলে তারে তুচ্ছ আজি ?
জননি মোর, দেবতা মোর,
গৰ্ব আমার সার্থকতা,
পাগলে কত কি(ই) না বলে
কে শোনে মা তাদের কথা ?

শঙ্কা কি মা, লজ্জা কি মা !
দেখমা চেয়ে নয়ন মেলি',
উঠেছে তোর পুত্র আবার
হৃদগের এ আঁধার তৈলিণী
ভবিষ্যতের বিপুল পক্ষে
শোন মা শত স্বনংকার,
উর্ধ্বরী তোর করবে আবার
তপ্ত তরল হৃদয়-ধার ।
জলের তিলক সূর্য্য ভালে
ক' দণ্ডই বা বুলনা থাকে,
জ্যোতির্ময়ী মায়েরে মোর,
মুহুমলিন কে আজ ডাকে ?
জননি মোর, দেবতা মোর
গৰ্ব আমার সার্থকতা,
পাগলে কত কি(ই) না বলে
কে শোনে মা তাদের কথা ?
ঐহেমেন্দ্রনাথ রায় ।

সংসার ও সন্ন্যাস

জগৎপিতা জগদীশ্বরের এই জগৎরূপ গৃহে যে সকল গৃহকর্ম লইয়া আমরা গৃহী হইয়াছি, তাহা আমাদের অবশ্য সম্পাদনীয় ; কোন প্রকারে কখন তাহাতে অবহেলা করা স্বাভাবিক বা সম্ভবপর নহে ; কিন্তু উহাতে আমাদের স্বামিত্ব বা কৃতিত্ব না থাকায় কর্ম-ফলেও কোন অধিকার নাই ; যেহেতু আমরা উহা সম্পাদনে উপলক্ষ্য মাত্র, কর্ম-শক্তি সেই সর্বশক্তিমান কর্মকর্তা হইতেই বিকীর্ণ হইয়া আমাদের পরিচালন করিতেছে। এই আশ্চর্য-কর্ম্যাচরণের মূলে ধারণা বদ্ধ থাকিলে কোন প্রকারে তাহা স্বাভাবিক নিয়মের বহি-ভূত বা সেই 'কর্মনিয়ন্তার' নিয়োগের অপ-ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু দ্রুত বশতঃ অজ্ঞানতা বা অবিচার ক্হকে মহাত্মমে পতিত হইয়া, সেই কর্তব্য পালনে আমরা কর্মকর্তা বা নিয়ন্তাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বরণ পূর্বক তাঁহার অনন্ত শক্তি পরিচালনের অনুভব-জ্ঞান হারা হইয়া, স্বীয় স্বামিত্ব ও কৃতিত্ব কল্পনায় কর্মফল স্বীয় ভোগ্য, এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়া বিপরীত পথগামী হইয়া থাকি ; সুতরাং ঐ প্রকারের কর্ম্যাচরণ সকাম ভাবা-পন্ন হইয়া তাহা হইতে নিকাম কর্ম স্বতই পৃথক হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই পার্থক্যই সংসার ও সন্ন্যাসের ব্যুৎপত্তি সাধন করি-তেছে।

সাধারণতঃ লোক সমাজে এইরূপ ধারণা আছে যে, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রাদি রূপ কর্ম্যাংশী-বেষ্টিত হইয়া যিনি লোকালয়ে বাস পূর্বক কর্ম্যাচরণ করেন, তিনি 'সংসারী' ; আর যিনি সেরূপ কর্ম্যাংশী ও কর্ম ত্যাগ

পূর্বক গৈরিক বসন ও জটাতার ইত্যাদি 'ঐদাসিত্ব-প্রকাশক বেশ ধারণ করিয়া 'লোকা-লয়ের বহিভূত স্থানে অবস্থান করেন, তিনি সন্ন্যাসী। সুতরাং সংসার ও সন্ন্যাস-বিচার এক প্রকার বাহ্য দর্শন দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ সংসার বা সন্ন্যাস-যে বাহ্য দর্শন দ্বারা আদৌ নিষ্পন্ন হয় না, উহা সম্পূর্ণরূপে আভ্যন্তরিক বা আন্তরিক ভাবে নিহিত, তাহা আমরা চিন্তা করিয়া দেখিতে প্রায়ই প্রস্তুত হই না এবং কিরূপ লোক বিশেষকে সংসারী অথবা সন্ন্যাসী বলা যায়, তাহাও স্থির সিদ্ধান্ত হয় না। এইরূপ স্থলে হয় ত প্রকৃত সন্ন্যাসীকে ঘোর সংসারী এবং ঘোর সংসারীকে সন্ন্যাসী বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকি। একজন পরম সন্ন্যাসী, যিনি পরি-বার রূপ কর্ম্যাংশী বেষ্টিত হইয়া নিকামভাবে এই জগৎ গৃহের গৃহকর্ম সম্পাদন করিতেছেন, তাঁহাকে ঘোর সংসারী ব্যতীত সন্ন্যাসী বলিয়া নির্দেশ করিতে কখনই প্রস্তুত হই না। এবং একজন ঘোর সংসারী, অর্থাৎ বাহার হৃদয়ে সংসার সম্পূর্ণরূপে জাজ্বল্যমান রুহি-রাছে, তাঁহাকে নির্জন বাস ও বাহ্য কর্মের আংশিক ত্যাগ হেতু নির্লিপ্ত স্থির পূর্বক পরম সন্ন্যাসী বলিয়া নির্দেশ করিতেছি ; কিন্তু তাহাতে যে তাঁহার কর্তব্যে অবহেলা বা সেই সর্বনিয়ন্তার নিয়োগের অপব্যবহার সংসাধিত হইতেছে এবং সেরূপ স্থলে সন্ন্যাসাচরণ আদৌ সম্পাদ্য নহে, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি না। বস্তুতঃ 'সংসার ও সন্ন্যাস, এই দুইটী বিষয়ের পার্থক্য মীমাংসা করিতে হইলে, প্রথমেই আচার্য্য কর্মের রূপ বা প্রকার ও

জাহার বিচার জ্ঞান থাকি। প্রয়োজন এবং উভয়ের পার্থক্য নীমাণুসার আনয়ন পূর্বক স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারিলে, বিচার ও নির্দেশ সহজসাধ্য হইতে পারে ।

কৰ্ম্মই দেহীর ধৰ্ম্ম, কৰ্ম্মাচরণই দেহীর একমাত্র কর্তব্য এবং কৰ্ম্মাচরণ জন্তই দেহাশ্রয় ; সুতরাং কৰ্ম্ম সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত দেহের অস্তিত্ব এবং কৰ্ম্মক্ষেত্রেই দেহান্ত সংঘটিত হইয়া থাকে । দেহী মুহূর্তকালও কৰ্ম্মশূন্ত হইয়া থাকিতে পারে না ; জাগরণেই হউক বা নিদ্রাবস্থায়ই হউক, বিচরণেই হউক বা স্থির ভাবে অবস্থানাবস্থায়ই হউক, অঙ্গ সঞ্চালন দ্বারা হউক বা অঙ্গাদির নিশ্চল্যাবস্থায়ই হউক, কেহ কখনই কৰ্ম্মশূন্ত হইতে পারে না । যদি কখন কাহাকে বাছে কোন কৰ্ম্মে লিপ্ত থাকা লক্ষিত না হয়, সে নিশ্চিতই কোন না কোন আভ্যন্তরিক কৰ্ম্মে লিপ্ত থাকিবেই থাকিবে, যেহেতু কৰ্ম্ম দুই প্রকার, বাহ্য ও আভ্যন্তরিক । বাহ্য অবয়ব অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির দ্বারা যে সকল কৰ্ম্ম সাধিত হয়, তাহাকে বাহ্যিক কৰ্ম্ম এবং মে সকল কৰ্ম্ম মনে মনে বা চিন্তার দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহাকে আভ্যন্তরিক কৰ্ম্ম বলে ।

এস্থলে এ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি কেহ ক্ষণমাত্রও কৰ্ম্মশূন্ত হইতে না পারে, তবে এ জগতে কাহাকেও সন্ন্যাসী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না, যেহেতু সন্ন্যাসী অর্থ ত্যাগী ; যদি কাহারও কৰ্ম্মত্যাগ সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে দেহত্যাগী হইল না, সুতরাং তাহাকে কিরূপে সন্ন্যাসী বলা যাইতে পারে ? পূর্বে বলা হইয়াছে, কৰ্ম্মই দেহীর ধৰ্ম্ম, সুতরাং ধৰ্ম্মত্যাগ কাহারও পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে ; কারণ ধৰ্ম্মের দ্বারাই বস্তুর বস্ত্ব প্রদর্শিত হয় । ধৰ্ম্মের সাধারণ নাম

গুণ, গুণই বস্তুর বস্ত্ব প্রতিপাদক ; বাহ্যর গুণ অর্থাৎ ইহ, তাহাতে আর বস্ত্ব থাকে না । যেমন অগ্নির ধৰ্ম্ম তাপ প্রকাশ, তাহার দ্বারা নিয়তই তাপ প্রকাশ সম্পাদিত হইতেছে, তাপ প্রকাশ রহিত হইলে অগ্নিরও অস্তিত্ব রহিত হয় । সুতরাং কৰ্ম্মই যখন দেহীর ধৰ্ম্ম, তখন কৰ্ম্মশূন্ত হইলে দেহীরও অস্তিত্ব রহিত হয় ।

সংসার বা সন্ন্যাস, এ দুইটি কৰ্ম্মের রূপ বা প্রকার মাত্র এবং দেহীর অবশ্য আচার্য্য । তবে কিরূপ কৰ্ম্মাচরণ সংসার-বোধক বা কিরূপ কৰ্ম্মাচরণ করিলে দেহীকে সংসারী বলা যায় এবং কিরূপ কৰ্ম্মাচরণ সন্ন্যাস-বোধক বা কিরূপ কৰ্ম্মাচারীকে সন্ন্যাসী বলা যায়, ইহাই এস্থলে সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়োজন হইতেছে ।

সাধারণ অর্থে সংসার দ্বারা ভোগ এবং সন্ন্যাস দ্বারা ত্যাগ বুঝায় ; অর্থাৎ যে কৰ্ম্মাচরণের মূলে ভোগাকাজ্ঞা বদ্ধমূল থাকে, তাহাই সংসার-বোধক সকাম কৰ্ম্ম এবং সেইরূপ কৰ্ম্মাচারীকে সংসারী কহে । আর যে কৰ্ম্মাচরণের মূলে ভোগাকাজ্ঞা আদৌ থাকে না, তাহাই সন্ন্যাস-বোধক নিকাম কৰ্ম্ম এবং সেইরূপ কৰ্ম্মাচারীই সন্ন্যাসী । সুতরাং সন্ন্যাস অর্থে কৰ্ম্মত্যাগ না বুঝিয়া কৰ্ম্মকল ভোগ বা ভোগাকাজ্ঞা ত্যাগ বুঝিতে হইবে । এ স্থলে সংসার ও সন্ন্যাসের বিশদ ব্যাখ্যার জন্ত সকাম ও নিকাম কৰ্ম্মের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইতেছে ।

যে কৰ্ম্মে আমি বা আমিহ বদ্ধমূল থাকে এবং বাহা ভোগাকাজ্ঞা সহ আচরিত হয়, তাহাকে সকাম এবং যে কৰ্ম্মে আমি বা আমিহেত্ব কোন সংস্রবই নাই এবং জাহার আচরণের মূলে ভোগাকাজ্ঞা আদৌ থাকে

না, তাহাকে নিষ্কাম কৰ্ম্ম কহে। আমি কৰ্ত্তা, আমি ভৰ্ত্তা, আমি পিতা বা আমি পালক ; আমার জী, আমার পুত্র, আমার পরিজন, আমার বাটী ইত্যাদি ; বাহা হইয়াছে, বাহা হইবে, সে সমস্ত আমার কৰ্ম্ম এবং আমার রাজ্য, আমার ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি বোধক ধারণাকে আমিষ কহে। আর স্তম্ভর ভবনে বাস, ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি, সুখাদ্য ভোজন, সুবশ লাভ, অতুল কীর্ত্তি স্থাপন ইত্যাদি মূলক বিবিধ আকাঙ্ক্ষা ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রতিপদক এবং এইরূপ ধারণা-সকল কৰ্ম্মই সকাম কৰ্ম্ম ; অর্থাৎ কোন না কোন প্রকারে স্বীয় আমিষ বা কৃতিত্ব থাকা জ্ঞানে কৰ্ম্মফল কামনা পূৰ্ব্বক এ কৰ্ম্ম আচরিত হয়। আর সেই সৰ্কনিয়ন্তা সৰ্কেষ্মরের কৰ্ম্ম এবং তাঁহারই নিয়োগে ও শক্তিতে সম্পাদিত হইতেছে, এইরূপ ধারণা পূর্ণভাবে যে কৰ্ম্মাচরণের মূলে জাগরুক থাকে এবং যাহাতে আমি কৰ্ত্তা বা আমার কোন কৃতিত্ব আছে, এরূপ ধারণা আদৌ উদ্ভিত না হয়, তাহাই আমি বা আমিষ-শূন্য কৰ্ম্ম এবং যাহার ফল ভোগে আদৌ আকাঙ্ক্ষা না থাকে, অর্থাৎ যে কৰ্ম্ম আত্ম-সুখ ভোগার্থ, আত্মশক্তি প্রকাশার্থ বা আত্ম-কীর্ত্তি স্থাপনার্থ, এ ধারণা বর্জিত ভাবে কেবল ভগবানেই তাহার ফল অর্পণ পূৰ্ব্বক আচরিত হয়, তাহাকেই ভোগাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত কৰ্ম্ম বা নিষ্কাম কৰ্ম্মনহে। কারণ এরূপ কৰ্ম্মাচরণের মূলে কোন প্রকার কামনাই থাকে না। সুতরাং সংসার ও সন্ন্যাস কৰ্ম্মের রূপ বা প্রকার মাত্র এবং কৰ্ম্মাচরণেই তাহাদের বিচার বীমাংসা সাধ্য।

এ কৰ্ম্মময় জগতের যেদিকে নয়নপাত করা যায়, যে সকল কৰ্ম্মাচরণ চতুর্দিকে পৰি-
ভ্রমিত হয় এবং সৰ্কক্ষণ বাহার বিষয় আলো-

চনা ও বিচার করা যায়, সে সমস্তই প্রায় সংসার ভাবাপন্ন। সংসার সহজেই উপলব্ধি করা যায়, সংসার-বোধক কৰ্ম্মের অনায়াসেই সিদ্ধান্ত হয় এবং সংসারীর পরিচয়ের অল্প কোন প্রকার আয়াস স্বীকার করিতে হয় না ; কিন্তু সন্ন্যাস বা সন্ন্যাসবোধক কৰ্ম্ম সংসারময় জগৎ হইতে বাছিয়া লওয়া এক-প্রকার মানব জ্ঞানের সাধ্যাতীত বলিলে অসঙ্গত হয় না।

আমরা সচরাচর যে সকল দীর্ঘ জটা ও কোপীনধারী জ্ঞাপুত্রাদি-শূন্য ব্যক্তিদিগকে সন্ন্যাসী কহি, তাঁহারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম পালন করা দূরে থাকুক, বরং বাছে বা বাহুভাবে কৰ্ম্ম-ত্যাগ প্রদর্শন পূৰ্ব্বক সন্ন্যাস প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া সেই কৰ্ম্মনিয়ন্তার উদ্দেশ্য বিস্মৃত ও তাঁহার মহাশক্তি-বিকিরণ-জ্ঞানহারা হইয়া দেহীর একমাত্র কর্তব্য হইতে স্থলিত হন। তাঁহারা আপনাদিগকে সংসারাতীত প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া বরং ঘোর সংসারী বলিয়াই প্রমাণিত করেন; যেহেতু এরূপ বাহুভাব প্রদর্শনের মূলে ঘোর স্বার্থ বা ভোগাকাঙ্ক্ষা নিহিত থাকা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং তাঁহারা সন্ন্যাসী না হইয়া বরং সংসারীরও অধমতর শ্রেণীতে উপনীত হইয়া থাকেন ; কারণ প্রকৃত সংসারীরা সংসারী নহেন, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা দূরে থাকুক, কখন তাঁহাদের সেরূপ ধারণাও উদয় হয় না। কিন্তু ইহারা ঘোর সংসারী হইয়া কোন কামনা-বশে লোক সমাজে আপনাদিগকে সন্ন্যাসী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। এই ভ্রমের লোক ছই একটা ছঃসাধ্য কৰ্ম্মে বিশেষ শিক্ষা দ্বারা ক্ষমতা লাভ করিয়া সমাজের চক্ষে খুলি নিক্ষেপ পূৰ্ব্বক মহত্ব লাভ করিতে চেষ্টা করেন এবং আমরাও সেই আপাত

প্রতিভা-সম্পন্ন কার্য্য দেখিয়া জনৈক পতিত হইয়া প্রকৃত তথ্য বিস্তরণ পূর্ব্বক অনায়াসেই সেই সকল ব্যক্তিকে পবিত্র সন্ন্যাসাসন দান করিয়া থাকি। বস্তুতঃ যে মহাজন সন্ন্যাসী বা ষাঁহার প্রকৃত সন্ন্যাস লাভ সংঘটন হইয়াছে, তিনি লোকসমাজে সম্পূর্ণভাবে অপরিচিতই থাকিয়া যান; কারণ আশ্চর্য্যপ্রকাশ তাহার সম্পূর্ণরূপে স্বভাব বা সংস্কার বহির্ভূত। সুতরাং সন্ন্যাসীর প্রতিভা বহির্জগতে আদৌ প্রতিভাত হয় না, বা প্রতিভাত হইলেও তাহা সংকীর্ণহৃদয় স্থূলদর্শী সংসারীর জ্ঞানগোচর হইতে পারে না।

সংসার ভাবের বিরোধানে সন্ন্যাস ভাবের আবির্ভাব বাহ্যজগতের গোচরীভূত হওয়া অসম্ভব; ইহা অন্তর্জগতে আবিস্কৃত হইয়া অজ্ঞাতভাবে সংসারাবদ্ধ ও অভ্যাস-সাধ্য হইয়া সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মের অবলম্বনস্বরূপ হইয়া থাকে। ইহা লাভ করিবার জন্ত কোন স্থান বিশেষ বা কোন বেশভূষা বিশেষের প্রয়োজন হয় না। ইহা লাভ করিবার জন্ত যে সাধনা বা শক্তির প্রয়োজন, তাহার প্রণালী সম্পূর্ণ পৃথক্, বাহ্যজগতের সহিত তাহার কোন প্রকার সম্বন্ধই নাই; অন্তর্জগতের ছায়া বাহ্যে প্রতিভাত হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া কিছু কিছু বাহ্যজগতে প্রকাশ হইলেও তাহা প্রায়ই জ্ঞানগোচর হইতে প্যুরে না এবং ইহার উদয়-ও অবস্থান সম্পূর্ণরূপে অন্তর্জগতের ব্যাপার বলিতে হইবে। সুতরাং অন্তর্জগতের বিশেষ জ্ঞানলাভের শক্তি থাকা ব্যতীত কর্ম্মের নিকামত্ব কিছুতেই সিদ্ধান্ত করা যায় না। এইরূপে নিকাম কর্ম্ম বিচার একপ্রকার অসাধ্য হইলেও সাকাম কর্ম্মচারীর পক্ষে আপন কর্ম্মের সাকামত্ব অজ্ঞাত থাকে না; নিকাম কর্ম্মচারীর স্বকর্ম্মের নিকামত্ব কখনই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে

না। বেহেতু স্বকৃত কর্ম্ম যদি নিকাম বলিয়া অনুভূত হয়, তাহা হইলে কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বতই মনে উদয় হইয়া আমি শ্রেষ্ঠকর্ম্ম করিতেছি; এ ধারণার উৎপত্তি স্বাভাবিক বিধায় তাহার নিকামত্ব দূর হয়, কারণ স্বকর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞান আশ্চর্য্যপূর্ণ বা আশ্চর্য্য দ্বারা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম সাধিত হইতেছে, এই ভাব-জ্ঞাপক; সুতরাং তাহা নিকাম হইতে পারে না, কারণ সেক্ষণ হইলে কর্ম্মফল কামনা অজ্ঞাতসারে তাহার মূলদেশ অধিকার করিবেই করিবে।

সন্ন্যাস কর্ম্মচারীর স্বাধুষ্টিত কর্ম্মের রূপ বা প্রকার জ্ঞান হওয়া দূরে থাকুক, তাহার বিচারেও কখন ধারণা উৎপন্ন হয় না, সে কেবল কলচালিত পুত্তলিকার মত সংস্কারবশে কর্ম্ম করিতে থাকে। সংসার কর্ম্মের জ্ঞান উহাতে কোন কামনা থাকেই না, কেবল সর্বদা নিকামভাবে সম্পূর্ণরূপে সমস্ত ফল সেই কর্ম্মকর্ত্তাতে অর্পিত হইয়া সাধিত হইতে থাকে। বস্তুতঃ কর্ম্মের প্রকৃত তথ্য ষাঁহার সংস্কারাবদ্ধ থাকিয়া সর্বদা কর্ম্মাচরণের আশ্রয়ীভূত হয়, তিনিই সন্ন্যাসী এবং যিনি তাহা ধারণা স্বরিতে না পারিয়া ফলভোগ কামনামূলক কর্ম্মাচরণ করেন, তিনিই সংসারী।

সংসারের যে দেহের ভোগের জন্ত কর্ম্মফল কামনা করা হয়, সে দেহ আশ্রয়ের প্রকৃত তথ্য এবং তাহার অনিত্যত্ব জ্ঞানগত থাকিয়াও গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের অন্তিম জ্ঞান নয়নান্তরালে অবস্থান হেতু যেমন পরিষ্কৃত থাকে না, সেইরূপ অজ্ঞানতা হেতু বা অবিজ্ঞার বশে হৃদয়গটে পরিষ্কৃত হইতে পারে না; সুতরাং কর্ম্মফল স্বভোগার্থ, এই ভ্রমমূলক কামনাবশে কর্ম্ম আচরিত হয়। কিন্তু দেহের অনিত্যত্ব ও দেহ আশ্রয়ের প্রকৃত তথ্য

ধার্মণ্যগত করিতে পারিলে হৃদয়ে ইহা নিশ্চিতই জাগরুক থাকে যে, এই জগৎ সম্পূর্ণরূপে বাহার অন্তর্ভূত, সেই কর্মকর্তার কর্ম লইয়াই দেহাশ্রয় এবং সেই কর্মনিয়ন্তার কর্মশক্তির পরিচালনে উপলক্ষ্য স্বরূপে দেহীর কর্মাচরণ এবং কর্মের ফল সেই ইচ্ছাময়ের কোন অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণার্থে উৎপাদিত হইয়া তাঁহারই কর্ম নিষ্পন্ন ও প্রতিপাদন করে; উহা দেহীর অবিদ্যা-প্রদত্ত, কোন কামনা-জাত কোন প্রকার ভোগার্থে নহে। দেহী কর্মাচরণার্থে নিযুক্ত, সে আচরণই করিবে, কর্মফলে তাহার কোন অধিকার নাই; ইহা বিস্মৃত হইয়া এই অনধিকার বস্তু লাভার্থে অনর্থক প্রয়াস পাইলে দিন দিন ঘোর সংসারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে হয়।

পরিবাররূপ কর্মাংশীগণে বেষ্টিত হইয়া কর্তব্য ও আচরণীয় কর্মে লিপ্ত থাকা যখন সেই ইচ্ছাময় কর্মনিয়ন্তার ইচ্ছা বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছে, তখন সংসার বা সন্ন্যাস, এ

উভয়ই সেই কর্মাচরণে নিহিত আছে, ইহাতে কর্মত্যাগ কোন প্রকারে সম্ভবপর বা কর্তব্য নহে এবং কর্মত্যাগে সংসার ত্যাগ বা সন্ন্যাস প্রাপ্তি হয় না; কেবল কর্মের সকামত্ব ও নিকামত্বই সংসার ও সন্ন্যাস-জাপুক। ইহা কোনপ্রকার বেশভূষা বা বাহ্যভাবে প্রতিপন্ন করা যায় না।

সন্ন্যাস স্নগভীর খনি-গর্ভস্থ বিগুহ মগ্নির উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ প্রভা সদৃশ, ইহা সম্পূর্ণরূপে বাহ্যজগতে গুহ্য ও অননুমিত্যে রূপে বর্তমান থাকিয়া, অল্পময়ে অলৌকিক আলোকে অন্তর্জগৎ আলোকিত করে। ইহা বাহ্য হইতে নির্গত হয়, তাহাতেই প্রতিভাত হয়, তাহারই আশ্রয়ীভূত থাকিয়া গুহ্যভাবে তাহাকেই আলোকিত করে, তাহারই শোভা বর্ধন করে, তাহারই পবিত্রতা সংরক্ষণ করিয়া দিন দিন তাহাকে উন্নত হইতে উন্নততর মার্গে আনয়ন করে।

ত্রীপূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী।

নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা। (২)

তৃতীয় অধ্যায়।

অমিতাভ, ত্রীষ্ট, ত্রীমস্তপবদ্যতা ও

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

“অমিতাভ

অমিতাভ ভগবানের নবম অবতার বুদ্ধদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী। এই কাব্যে উনিশটি বিভিন্ন অমৃতবর্ষী কবিতা আছে। বুদ্ধদেব আমাদের ভগবানের নবম অবতার। যে বৌদ্ধ ধর্মের ছায়া আমাদের ধর্ম, কর্ম ও হৃদয়ে ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত, তাঁহাকে

আমরা চিনি। তাঁহার প্রতিভা আমরা জানি না। সেই জন্ত কবি তরল কবিতায় বুদ্ধদেবের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। ইহাতে বাঙ্গালী বুদ্ধদেবকে চিনিবে, সেই মহাপাদবের আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং সেই মহাদেবের পদে ভক্তি ভাবে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলী অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

বাঙ্গালার বুদ্ধদেবের আরও ২৩ খানা জীবনী বাহির হইয়াছে, কিন্তু সেগুলি গুহ্য। সম্প্রদায় বিশেষ ভিন্ন প্রায় অপর সাধারণ সমস্ত বাঙ্গালী ঐগুলি পাঠ করেন না।

বিশেষ আমাদের সমস্ত ধর্ম গ্রন্থই পঙ্খাকারে
গ্রন্থিত, সেই জন্যই গুণ্ড কাব্যে সাধারণ বঙ্গ-
বাসীর হৃদয়ে যেন উন্মির উদয় হয় না।
আমাদের কবি সে অভাব দূর করিয়াছেন।
এখন কৃতিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের
মহাভারতের ন্যায় এই ‘অমিতাভ’ও অনেক
স্থলে সাধারণ লোক মধ্যে ধর্ম গ্রন্থের আসন
গ্রহণ করিতেছে। এবং লোকে বুদ্ধের নিঃস্বার্থ
ভাব ও স্বার্থত্যাগের মহা উদাহরণ দেখিয়া
তাঁহাকে ভক্তির সহিত প্রণিপাত করিতেছে।
পৃথিবীর অর্ধেক লোক যাঁহার অমৃত-
নিঃসরিণী ধর্মোপদেশ লাভে কৃতার্থ, আর
আমরা, যে হতভাগাদের দেশে সেই মহা-
পুরুষের জন্ম হইয়াছিল—তাঁহার সেই বৈজ-
য়ন্তী স্রাব-পানে বঞ্চিত থাকিব, ইহা অপেক্ষা
আর আমাদের দুর্ভাগ্যের নিদর্শন কি আছে?

মহামায়ার মৃত্যুতে কে অমিয় উৎসব
নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা কোন বাঙ্গালীর
আকাঙ্ক্ষিত বা অদয়গত বাসনা নহে :—
যাও না করুণাময়ী, জরা-মৃত্যু দুঃখ ভরা
এজগত নহে তব স্থান,
আছে মানবের আশা, আবার আসিবে তুমি
নর দুঃখে কাঁদিলে পরাণ।

জুজুরেই বৃক্ষটী কি প্রকার হইবে, তাঁহার
আভাস পাওয়া যায়। যে মহাপুরুষ মানবের
হিতার্থে বিহ্বত রাজ্য, দেব দেবী সম পিতা
মাতা, গুণ ও রূপবতী স্ত্রী, অতুল ঐশ্বর্য
অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন,
তাঁহারই শিশু-হৃদয় একটা আহত হংস
দেখিয়া কিকরুপ কাঁদিয়াছিল,—

আবাতের ব্যথা ভাই, আজি বুঝিয়াছি আমি
হংসের ব্যথায় প্রাণ হয়েছে বিকল।
তোমারোত আছে প্রাণ, পাখাটার ক্ষুদ্র প্রাণে
বুঝ না কি, যে ব্যথা পেয়েছে বিষম।

অন্যত্র কবি বিরাগের কি মনোহর মাল্য
গাঁথিয়া আমাদের উপহার দিয়াছেন :—
অনন্তমানব জাতি, জন্ম জন্মান্তরে
সবে জরা-মরণের দুঃখ বোরতর
কেমনে সহিব বল? নাহি অশেষিয়া
নরের উদ্ধার পথ, পুড়িব স্বজন
আলি বিলাসের বাহু এত নহে প্রেম?
প্রেম শিব, প্রেম শান্তি, প্রেম নিবারণ।
আহা! ইহা যদি আমরা বুঝি, তবে কি এমন
বিলাসমগ্ন হইয়া আমাদের এত অধঃপতন
হয়!

কে বল কখন কামা বস্ত্র উপভোগে,—
কামিনী কাঞ্চনে, রাজ্য-তৃপ্তি-কামনায়
পাইয়াছে এ জগতে হায়? এ সম্বোধনে
যুগ-তৃষ্ণিকার মত বাড়ায় পিপাসা
অতৃপ্ত কামনানলে দহে নিরবধি।

প্রকৃত কবি ভিন্ন এমন সরল হৃদয়গ্রাহী কবি-
তার সমাবেশ কি সম্ভবপর? গৌতমী যখন
গোপার সন্ন্যাস অবলম্বনে বাধা দ্বিহতছিলেন,
তখনকার গোপার উত্তর অতুলনীয়। প্রকৃত
আর্য্যানারী ভিন্ন অন্ত্র ইহা অসম্ভব :—

বনে বনে কিবা কঠোর সন্ন্যাস
সাধিবেন মম স্বামী।
বিলাস ভবনে এই বেদীমূলে
সাধিব সন্ন্যাস আমি।

বুদ্ধদেবের উপদেশের ২১১ স্থল হইতে কিছু
কিছু উদ্ধৃত না করিয়া আমরা কান্ত থাকিতে
পারিলাম না :—

সুখ যদি ফলে গৃহ সাথে,
কে যায় খুঁজিতে তাহা বন বনান্তরে।
নাহি কামে সুখ ভূপ! বৃক্ষফল মত
হয় কাম বৃন্তচাত, অস্পৃশ্য, গন্ধিত।
উড়াইয়া মানবের পরম মঙ্গল—
ঝটিকার মত কাম যায় মিশাইয়া
করি দেহ জরাজীর্ণ, মৃত্যু কবলিত।
অন্যত্র—

কর্মফলে জন্ম,

‘কৰ্ম ফল নাশের জন্ম রূপ হবে দূর
জীবন সমুদ্র পার হবে ধর্ম বলে।

গিনি বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক বলেন,
তিনি ইহা গীতার কর্মবাদের সহিত মিলাইয়া
দেখুন, যে ভগবানের গীতোক্ত ধর্ম ও গোত-
মের ধর্ম এক কিনা। কবিও প্রকারান্তরে
দেখাইয়াছেন যে, গীতোক্ত ধর্মের সহিত
বৌদ্ধধর্মের পার্থক্য অতি সামান্য। দেশ,
কাল ও পাত্র ভেদে উহাতে বাহ্য স্বাতন্ত্র্য
মাত্র ধারণ করিয়াছে।

আমাদের কবির হৃদয় অতি মহান। তিনি
জগতে বিভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন
না। ঐশ্বরিক বিভূতি ভিন্ন কেহই নূতন
ধর্ম বিস্তার করিয়া জরা-জীর্ণ-প্রাপ্ত মানব-
হৃদয়ে শাস্তিবারি সেচন করিতে সমর্থ নহেন।
সেই জন্য আমাদের উদার-হৃদয় নবীন কবি
গাইয়াছেন :—

এসেছিলা তুমি

একবার যমুনার তীরে পুণ্যবতী,—
দেখিয়াছি সেই লীলা কোমল কঠোর।
আসিলে আবার তুমি কপিল নগরে
শৈলপতি হিমাদ্রির পুণ্যপাদ মূলে
দেখিয়াছি সেই লীলা আশ্রয় বিসর্জন,—
রাজপুত্র মহাযোগী। আসিলে আবার
সরল মানব শিশু জর্দানের তীরে,—
দেখিয়াছি সেই লীলা আশ্রয়-বলিদান।
আরবের মরুভূমে, অমৃত-নিবর
আবার আসিলে তুমি * *
* * * আসিলে আবার
পতিতপাবনী তীরে পতিতপাবন
পাষণ করিলে দ্রব প্রেম অশ্রু-জলে।

খ্রীষ্ট।

বলিও অজন্মা আমি অব্যাহা, সর্বেশ্বর,
আপন মারার জন্ম আপন প্রকৃতি পর
বধন বধন-ঘটে ভারত! ধর্মের মানি,
অধর্মের অভ্যুত্থান, আপনাকে স্থগি আমি।
বধন যেখানে ধর্মের মানি, তখন সেখানেই

ভগবান কোন না কোন রূপে তাহার প্রতি-
বিধান বা পুনঃধর্ম সংস্থাপন করিয়াছেন।
আমাদের ধর্মপ্রাণ কবি সেই জন্তও খ্রীষ্ট
জীবনী কাব্যাকারে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং
‘দেখাইয়াছেন যে, খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও মহম্মদ,
একই অতিপ্রায়ে জগতের বিভিন্ন দেশে প্রাচু-
ত্ব হইয়া কাল ও পাত্রানুসারে বিভিন্ন
উপায়ে ধর্ম পুনঃ সংস্থাপন করিয়াছেন।
সকীর্ণ-হৃদয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট জগতে
বিভিন্ন ধর্ম; কিন্তু উদার বিশ্ব-জ্ঞানী ব্যক্তির
নিকট জগতে একই ধর্ম। ভগবানের একই
শক্তি, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে অবতীর্ণ
হইয়া ধর্ম সংরক্ষণ করিয়াছেন ও করিতে-
ছেন। কাজেই তাহার নিকট বুদ্ধ, খ্রীষ্ট,
বুদ্ধ ও মহম্মদ, একই ঐশ্বরিক শক্তির বিভিন্ন
বিকাশ মাত্র। বাহ্যতে ভগবানের এই অব-
তারের ক্রিয়া ও কার্য বঙ্গ সন্তান সম্যকরূপ
হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়, কবির নবীনচন্দ্র
সেই জন্যই খ্রীষ্টকাব্য লিখিয়া বঙ্গবাসীকে
উপহার দিয়াছেন এবং তাঁহার অনুগ্রহেই
বঙ্গ সন্তান খ্রীষ্ট-চরিত পাঠ করিবার সহজ
উপায় প্রাপ্ত হইয়াছে।

খ্রীষ্ট-কাব্য পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত।
ইহাতে খ্রীষ্টের উপদেশাবলী কি প্রকার সরল
ও স্বাভাবিক ভাবে কবি বাঙ্গালা কবিতার
সম্মিলন করিয়াছেন, উহা ২১১ স্থল হইতে
দেখাইয়া আমরা এই কাব্যের উপসংহার
করিব।

না হ’লে তোমরা ক্ষুদ্র শিশুর মতন,
স্বর্গ রাজ্যে পারিবেনা পশিতে কখন।
যে হ’বে বিনীত এই শিশুর মতন,
সেই জন স্বর্গ রাজ্যে হবে শ্রেষ্ঠতম। ”
এরূপ একটা শিশু যে করে গ্রহণ
মন নামে, আমাকেও পাবে সেই জন।

‘আহা! যিনি মানব সন্তান শতকর্ষক
শূলে আরোপিত হইয়াও ভগবানের নিকট,
নিজ যন্ত্রণার কথা ভুলিয়া গিয়া সেই অজ্ঞান-
দের রক্ষার জন্ত প্রার্থনা করেন, তিনি
দেবতানিহেন তবে দেবতা কে?’

দক্ষিণে ও বামে তাঁর তত্ত্বর যুগল

দিল শূণে সেই সঙ্গে। নেত্র ছল ছল

“কমা কর” কহে চিত্ত চাহি উদ্ধ পানে

“কি করে ইহারা পিতঃ! কিছুই না জানে।”

শ্রীমন্তগবদগীতা।

ভগবানের শ্রেষ্ঠ অবতার শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত
গীতার পরিচয় দিতে আমরা অসমর্থ। তবে
ইহা বলিতে পারি যে, গীতার জ্ঞায় সর্ব-
কালের সার্বজনীন বিজ্ঞানসম্মত ধর্মপুস্তক
আর দ্বিতীয় নাই। গীতা কোন সম্প্রদায়
বিশেষের জন্ত নহে। চন্দ্র সূর্যাদির জ্ঞায়
গীতাও সর্বকালে সকল মানবের উপভোগ্য
ও পালনীয়। কুর্দক্ষেত্র রূপ সমুদ্রমহনের এই
অমিয়ময় ফল। বৌদ্ধ বল, খ্রীষ্টান বল বা
মুসলমান বল, ঐ সকলের ধর্ম গাতোক্ত
ধর্মের আবাস্তর মাত্র। ধর্মও পাত্রানুসারে
ইহাতে কিছু কিছু বিকৃতভাব ধারণ করিয়াছে,
মাত্র। ভারতে গীতা প্রচারিত হওয়ার পর
আরু ভগবানের অবতারের আবশ্যক ছিল
না। হর্ভাগ্য ক্রমে ভারতবাসী গীতোক্ত
ধর্ম ভুলিয়ান-গল। বৃথা যাগ যজ্ঞরূপ যন্ত্রে
অধিরত হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল। সেই
জন্তই ভগবানের বুদ্ধ অবতার। প্রকারান্তরে
আবার গীতার প্রচার এবং মানব উদ্ধারের
আবার পুরাতন পথের সংস্কার, কিন্তু জগতের
কি নিয়তি। এখানে ধর্মের পঙ্কিলতার অঁতাব
হয় না। সেইজন্ত ধর্ম সম্বন্ধে আমরা নিভির
মত তুলিতে পাই।

• ভারতে এখন আর সংস্কৃতের স্বেক্স

আদর নাই। অনেকের নিকটই সংস্কৃত
শ্লোক বৃথা সহজ নহে, অথচ গীতা সেই দেব
ভাষায় প্রণীত। সাধারণ লোকে কি সেই
স্বর্গীয় বিমলমুখা পান করিবে না? কবির
হৃদয় সেই জন্তই কঁদিয়াছে; তিনি সেই
জন্তই সাধারণের উপযোগী করিয়া অতি
প্রাঞ্জল ও বিশদ কবিতায় গীতা প্রকাশ
করিয়াছেন। সাধারণ লোকে এখন গীতার
অর্থ জনসম্মত করিতে সমর্থ হইবে, আর
হাত ভুলিয়া ভগবানের নিকট অমর কবির
আম্মার মঙ্গল জন্ত প্রার্থনা করিবে। গীতা
ইতঃপূর্বে কয়েক ব্যক্তি কর্তৃক অনুবাদিত
হইয়াছে, কিন্তু সেগুলি গণ্ডে ও এমন জটিল
যে, সংস্কৃত অপেক্ষা কোন অংশে সরল নহে।
কবি গীতা পত্রাকাষে অনুবাদ করিয়া
সাধারণের যোগ্য উপকার করিয়াছেন, সে উপ-
কার লোক-সাধারণ কখন ভুলিতে পারিবে
না।

ভক্তপ্রাণ বাঙ্গালী এখন গীতা পড়িয়া
প্রকৃত আর্গাধর্ম বুঝিতে পারিবে ও উপধর্ম
সকল আপনাপ্রাপনি বিলুপ্ত হইবে, অপর
সাধারণ প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাসীও নিকাম
হইবে।

কোন মূল হুত্র অবলম্বন পূর্বক সাহিত্য-
কানন শোভিত করা অপেক্ষা অনুবাদ করাও
কম আয়াসসাধ্য নহে। আর অনুবাদের
অর্থের ও ভাবের কি যেন একটা দোষ থাকিয়া
যায়। নবীন বাবুর অনুবাদে আমরা সে
দোষ দেখিতে পাই না। ইহার অনেক স্থল
পড়িতে পড়িতে মূল কি অনুবাদ পাঠ করি-
তেছি, তাহা অনেক সময় যেন বৃক্ষিরা উঠা
যায় না। আমরা কয়েক স্থল উদ্ধৃত করতঃ
পাঠককে উপহার দিয়া শ্রীমন্তগবদগীতার
বিবরণ উপসংহার করিব।

অকূল পবিত্র, স্থির, অচঞ্চল,
সমুদ্র সলিল প্রবেশে যেমন ;
তেমতি কামনা প্রবেশে যাহাতে,
সেই পায় শান্তি, নহে কাবী জন ।

কিন্তু আত্মাতেই রত, আত্মাতেই তুষ্টি বার,
আত্মাতে সন্তুষ্ট সদা, তার কার্য্য নাহি আর ।

সাধুদের পরিজ্ঞান, বিনাশ দ্রুততমের
করিতে সাধন
স্থাপন করিতে ধর্ম্ম, করি আমি
যুগে যুগে জনম গ্রহণ ।

সাথে পায় যেই স্থান, যোগেও সেখানে বার,
অভিন্ন সাধ্য ও যোগ, যে দেখে সে দেখে তার ।

ব্রহ্মে সমর্পিরা কর্ম্ম, নিকাম যে কর্ম্ম রত ;
না হয় সে পাপে লিপ্ত পদ্ম পত্রে জল মত ।

তোমার সহস্র করি নমস্কার
পুনঃ নমস্কার করি বহু বার
সম্মুখে পশ্চাতে করি নমস্কার,
সর্ব্ব দিকে, সর্ব্ব প্রণাম আবার ।
শ্রীরতিনাথ মজুমদার ।

প্রতিবিন্দু ।

নিম্নশ্রেণীর প্রতি সমবেদনার কথা আজ
কাল চতুর্দিকে শুনা যাইতেছে । এই সম-
বেদনাটাকে একবার ব্যবচ্ছেদ করিয়া
দেখিতে ইচ্ছা হয় । বিধাতা সহায় হউন ।

এক সময়ে আমরা, ভারত-সভার একজন
প্রতিনিধির সহিত মিলিত হইয়া, ৮ বিভা-
সাগর মহাশয়কে ঐ সভায় যোগ দিবার অন্ত
অনুরোধ করিতে গিয়াছিলাম । তিনি সকল
কথা শুনিয়া অতি হৃৎখের সহিত বলিয়া-
ছিলেন—“এদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে
ক্যামরা যদি মাহুষ বলিয়া জানিতাম, তবে
আমরা তাহাদের উপকার করিতে পারিতাম—
কিন্তু আমরা তাহাদিগকে মাহুষ বলিয়া
মনে করি না, আমরা তাহাদিগকে পশুর

স্তায় মনে করিয়া থাকি, মাহুষের দ্বারা পশুর
উন্নতি হইতে পারে কি ?” এই কথা
বলিবার সময় তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসি-
তেছিল, ছনমন হইতে জলধারা বহিতেছিল,
সে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, দরি-
দ্রের প্রতি কি সমবেদনা ! হায়, সেক্ষণ
সমবেদনা এই বন্ধে আর কুত্রাপিও দেখিতে
পাই নাই ॥

সেদিন একজন মহারাজা উপাধিধারী
মাননীয় লোককে সালিস বরণ করার
প্রস্তাব হইতেছিল, তিনি একজন মধ্যবর্তী
লোকের কথা শুনিয়া অকুণ্ঠিত করিয়া
বলিয়াছিলেন “যে জমিদার নয়, তাহার সহিত
কিল্পে একাসনে বসিব,” কয়েকদিন পূর্বে
একজন কৃতবিদ্য ধনী ব্যারিটার দরিদ্র

মুশিকিত লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া-
ছিলেন “ঐ মধ্যবর্তী শ্রেণীর লোকেরা ত
পাখাটানা কুলী, তাঁহাদের কথা কে
তিনিবে?” আর কিছুদিন পূর্বে একজন
লেখক গর্স করিয়া বলিতেছিলেন,— “ঐ সব
লোকের কথা ছাড়িয়া দেও, তাহারা মাঠে বাস
কাটুক—তাহারা আমাদের সম-আসনে কিরূপে
বসিবে?” এইরূপ কত কত অহঙ্কারের
কথা অলিতে গলিতে সর্বত্রই শুনা গিয়া
থাকে! হুই দশ দিনের জন্তই ভব-
লীলা—কিন্তু তারই মধ্যে মানুষের এত
অহঙ্কার!! অবস্থাগত, জাতিগত, এবং জন্ম-
গত আভিজাত্য এখন চতুর্দিকে সংক্রামিত
হইয়া পড়িয়াছে। সেদিন, একজন কৃতবিদ্যা
ব্যক্তি একজন অনবদল ব্যক্তির নিকট
হৃর্ভিকের সাহায্য চাহিতে বাইয়া যেরূপে
অপমানিত হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে হৃদ-
কম্প উপস্থিত হয়। কত স্থানে কত জনের
এইরূপ অপমানিত হওয়ার কথা শুনিয়াছি।
মনে হয় যেন, এ যুগ কেবল অহঙ্কারের
জন্তই সৃষ্ট হইয়াছে! ধনী নির্ধনকে, রাজা
প্রজাকে, জ্ঞানী মূর্খকে, কৃতবিদ্যা অশি-
ক্ষিতকে, বুদ্ধিমান বোকাকে প্রতিনিয়ত ঘৃণার
চক্ষে দেখিতেছেন! নিম্নশ্রেণীর প্রতি সমবেদনা
এযুগে কোথায় আশা করিবে? এযুগ আভি-
জাত্যের যুগ,—ডিমোক্রেসি রসাতলে চিরনিমগ্ন
হইয়াছে। চির-স্বাধীনতার উপাসক ইংলণ্ডও
আজ আভিজাত্যের পরিপোষক, তাই আজ
লর্ডসভার দিগ্বিজয়ী প্রতাপ,—চাহিয়া দেখ,
গ্রাডোষ্টোনের দিগ্বিজয়ী চেল। মর্লিও আজ
আভিজাত্যের দাসামুদাস; নচেৎ তাঁরত-
সংস্কার-আইনে জমিদারশ্রেণীর প্রতি এত
সামগ্রহ-দৃষ্টি থাকিত না। হৃদ্যপোষ শিশুও
আজ কাল অনবদল! ইংলণ্ডে আভিজাত্য-

ভোর জয়, ভারতেও আভিজাত্যের জয়, এদেশ,
সে দেশ, কসিয়া, জর্জণী, আমেরিকা, জাপান
সর্বত্রই অবস্থাপনের জয় জয়কার! চতুর্দিকে
ঘন-রব কেবল টাকা, টাকা, টাকা! লাট বেলা-
টের; সকল আফিস ও সকল কাউন্সিলেই এখন
আভিজাত্যের কোলাকুলি, অথবা পা-চাটার
দলের জয় জয়কার! এহেন যুগেও যে নিম্ন
শ্রেণীর প্রতি সমবেদনার কথা শুনিতেছি,
উহা কিরূপ? কথাটা বাতুলের প্রলাপ নয় ত?

মধ্যে মধ্যে শুনিয়া থাকি, অমুক ব্যক্তি বড়
দয়ালু। দয়া শব্দ যখন ভগবানে প্রযুক্তা, তখন
উহা স্বর্গের মন্দাকিনী; যখন মানব প্রযুক্তা,
তখন দানব-লীলার ক্রকটী! দয়াময় কেবল
বিধাতা, মানবে ঐ কথা শোভা পায় না।
মানবে প্রযুক্তা দয়া শব্দটা শুনিতে যত মিষ্ট,
কাজে কিছুতেই তত মিষ্ট নয়। মানব সকলেই
সমাবস্থাপন; স্থিতির বৈচিত্র্য কেবল নয়নের
ভেলুকি, বড় ছোট সব সমান, কেহ এক
বিষয়ে বড়, কেহ অন্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।
মোটের উপর—সব সমান। সমান আবার
সমানকে কি দয়া করিবে? দয়ার মধ্যে সর্বদা
একটু বাহাদুরী-বিষ লুকায়িত থাকে, সে যেন
লুকাইয়া লুকাইয়া অহঙ্কারকে সর্বদা হৃদয়ে
পোষণ করে। সে বলে “দেখ, আমার কত
প্রজা, আমি কতজনকে খাইতে দেই, কত
মানুষকে রক্ষা করি। ইত্যাদি ইত্যাদি!!!”
তুমি যত বড় দরিদ্রের সেবকই হও না কেন,
তুমি দয়ার কথা ভুলিয়া কখনও কর্তব্যের কথা
ভাবিতে পারিয়াছি কি? কখনও দয়ার-
অতীত রাজ্যে উঠিতে পারিয়াছ কি? তিনি,
তিনি ধনী লোক, যদি দরিদ্রের সহিত কথা
বলেন, বা সম আসনে বসেন, বা একদিনও
দরিদ্রকে খাইতে দেন, তিনি ভাবেন এবং
লোকেরা বলে, তাঁহার কত দয়া গো! তিনি,

তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি, একদিনও যদি কাঙ্গাল-দিগকে একটু শিক্ষা দেন, কত প্রকারে তাঁহার দয়ার কথা, তাহার নিজেয় বা তাহার দলের লোকের দ্বারা, সংবাদ পত্রে বোঝিত হয়! অথবা তিনি, তিনি ধর্মপ্রচারক, তিনি যদি দরিদ্রের গৃহে গমন করিয়া একটু ধর্মোপদেশ দেন, কত রূপে তাঁহার সম্মান চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়। এই জগৎটা যেন “পরময়”—পরের উপকার মহা ধর্ম বলিয়া সর্বত্র পরিকীর্ণিত। তাঁহারা বলেন, পরের উপকার সাধন দয়ার একটি মূর্তি। কিন্তু দয়ার ভিতরে লুক্কায়িত কি, জান কি? উহার ভিতরে লুক্কায়িত অহঙ্কারের স্তম্ভ মূর্তি। তাঁহারা বলেন, পৃথিবীতে যত কথাই শুন না কেন, দয়ার মত আর নিষ্ট কথা শুনিতে পাইবে না। কিন্তু ৩০ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত “শরচ্চক্রে”র বিদ্যাবাসিনী ও নীরদার কথা পাঠক একবার মনোবোগ সহকারে শ্রবণ কর।

“বিদ্যাবাসিনী বলিলেন, নীর! তুমি কাকে অধিক ভালবাস?

নীরদা। আমার হৃদয়কে।

বিদ্যাবাসিনী। তবে তুমি স্বার্থপর ব্রত অবলম্বন করিয়াছ; এ সংসারে পরকে যে মন না দিল, তার আবার ভালবাসা কি?

নীরদা। তুমি পরোপকারের কথা বলিতেছ? আমি পর কি, তাহা জানি না, পরের উপকার আবার কি? আমি জানি, বিধাস করি, আমার বাহা, তাহাতেই আমার মমতা, তাহাতেই আমার ভালবাসা। আমার ঈশ্বর, আমার হৃদয়, আমার জগৎ, আমার সকল। আমার বাহা, তাহাকেই ভালবাসি; আর বাহা পর, তাহাকে হৃদয়েও স্থান দেই না।

বিদ্যাবাসিনী।—আপনার অস্ত সমস্ত সংসারই ব্যস্ত, যদি পরের উপকার না করিলে,

তবে তুমি আর মাহুষ কি? তবে তুমি স্বার্থপর—পশু।

নীরদা। বল নাচাক! কিন্তু ভেবে দেখত কে স্বার্থপরের জ্ঞান কথা বলিতেছে? তুমি ‘অন্তকে পর ভাবিয়া উপকার করিতে’ বল, আমি আপনাদের ভাবিয়া কর্তব্য পালন করিতে চাই। এ সংসারে সকল মমতাই আপনাদের জন্য। বাহারা পর পর করিয়া অস্থির, তাহারা মনের সহিত কাহারও উপকার করেনা, তবে যশোলিপ্সা, আত্ম-গৌরব ও সম্মান প্রাপ্তির আশায় পরোপকার ব্রত গ্রহণ করে।” ইত্যাদি।

বাহারা পর ভাবিয়া জগতের সেবা করিতে যান, নীরদা বলেন, তাহারা যশোলিপ্সার দ্বারা চালিত। কথাটা এই স্মদার্ককাল পরেও প্রণিধানের যোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে। মনে হইতেছে—জগতের সহিত আমি যদি একাত্মক না হইতে পারি, জগতের সেবা আমার পক্ষে যশোমন্দিরে যাওয়ার সোপান মাত্র। আমি ও জীবপ্রবাহ কি একাত্মক হইতে পারিব না? আমি কি জগতে ডুবিতে পারিব না?

এই ভারতে ত্রিশকোটি লোকের বাস, তন্মধ্যে ২০ কোটি হিন্দু। এই ২০ কোটি লোকের মধ্যে ৫০ কোটি অস্পৃশ্য! মাহুষ মাহুষকে স্পর্শ করিলে জাতি যায়, এরূপ কথা পৃথিবীর আর কোথাও শুনা যায় না!! এই অস্পৃশ্য শ্রেণীকে তুলিতে এপর্যন্ত কেবল খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারকগণ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা এপর্যন্ত বাহা করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই! কিন্তু আমরা শিক্ষিত শ্রেণী, শিক্ষার আলোক পাইয়াও তাহাদের প্রতি চির উদ্যমীন। প্রকারান্তরে তাহাদিগকে নিপীড়ন করিতে একদিনের অস্তও ছাড়ি না! এই ত দেশের অবস্থা। তাহারা না জাগিলেও

দেশে আগিবে, যাঁহারা বলেন, তাঁহারা কি জ্ঞাত! সর্বপ্রকার অশ্রুজাত্যের নিষ্পেষণে, হায়, তাঁহারা চিরমৃতবৎ !!

সাধকেরা বলেন, মানবের কর্তব্য ত্রিবিধ,—ঈশ্বরের প্রতি, নিজের প্রতি, জগতের প্রতি। আমরা বলি, কর্তব্য একবিধ। মানবের কর্তব্য সকল ঘনীভূত কেবল—নিজস্ব। আমার অস্তিত্ব ভিন্ন সুখলা-সুফলা-শস্য-শ্রামলা প্রকৃতির অস্তিত্ব কোথায়? আমার নিজস্ব ভিক্ষা—ঈশ্বরের অস্তিত্বের বা পরিচয় কোথায়? আমিই তাঁহার প্রত্যক্ষ মন্দির,—আত্মার মূলে পরমায়া। আমার আমিই ভিন্ন পৃথক জগতের অস্তিত্ব আর কোথায়? আমিই পরমাচার সার-চূষক, আমিই জগতের সার-চূষক। তাঁহার প্রতিবিম্ব আমাতে, আমার প্রতিবিম্ব জগতে—অথবা জল-স্থলময় জগৎ ব্যাপিয়া কেবল একেরই লীলা! এক ভিন্ন হই যে করনা করে, সে সাধনার রাজ্য হইতে এখনও বহু দূরে অবস্থিত,—সে দর্শন বিজ্ঞানের সার জ্ঞানে এখনও দীক্ষিত হইতে পারে নাই। বৈষম্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে যে “একতা” না দেখিতে পার, তাঁহার সাধনা মহা ভণ্ডামী। অনন্তরূপিনী অনন্ত প্রকৃতিতে প্রকৃটিভা। অথবা সুখলা-সুফল-শস্য-শ্রামলা প্রকৃতি তাঁহারই রূপান্তর; আর এই যে ধরার নর-নারী, অথবা জীব-প্রবাহ, ইহাও সেই অনন্ত রূপেরই বিরূতি। দেব দানব, সক্ষ রক্ষ, কীট পতঙ্গ, পত পক্ষী—সকল ব্যাপিয়া একই শক্তি। মৃগাধার, হস্তাধার রূপে সকল ব্যাপিয়া কেবল এক মহাশক্তির প্রবাহ। এমারসন কান্টাইল বলেন, ফোর্স, স্পিয়ার বলেন, দুজের শক্তি? বার্কলি বলেন, মায়া; পাতঞ্জল বলেন—লীলাযোগ; বাইবেল বলেন, প্রতিবিম্ব; গীতা বলেন, চিদাত্মা;

বেদান্ত বলেন, কুটুহায়া; ওহ ব্রহ্মেন, সর্বভূতাত্মা,—কত শাস্ত্রে কত ব্যাখ্যা, কত পণ্ডিতের কত কথা;—কিন্তু সব মিলিয়া গিয়াছে—ব্রহ্মেণীতে,—যেখানে এক বস্তু ভিন্ন হই নাই। একের লীলা, একের খেলা, একের রাজ্য, একের ধাম,—সকল মিলিয়া সেই একই। তুমি যত বড় পণ্ডিতই হওনা কেন, এক ভিন্ন হই কিছুতেই প্রমাণ করিতে পারিবে না। সেই এক—সচ্চিদানন্দময় মহাশক্তি। সেই মহাশক্তি, সেই আদ্যা-শক্তিকে কোটা কোটা প্রণাম।

এখন, এই বার্ককে বাই কোথায় এবং করি কি? এখন সকল স্থান ও কাল এবং সকল কাজ সংক্ষিপ্ত হইয়া আত্মার মূলে ঘনীভূত হইতেছে। কে কেন বলিতেছে,—“তাম্রেন প্রীতি একম তত্ত্ব প্রিয় কার্যম্” অথবা “যথা নিযুক্তোহসি তথাকরোমি”। সকল ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া এক সীমায় উপনীত—কেবল তাঁহার সেবা!! দয়া বুঝি না, ধর্ম বুঝি না, নীতি বুঝি না, সেবা বুঝি না, বুঝি কেবল তাঁহার আদেশ পালন ও তাঁহার সেবা।

তাঁহার সেবা?—কিন্তু কোথায় তিনি? তিনি আত্মায়, তিনি জগতায়। আত্মার মূলে, প্রকৃতির মূলে, এবং জগতের মূলে তাঁহাকে দেখ, এবং তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়া নিষ্কামভাবে তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন কর। তিনি ভিন্ন আর কিছু নাই—দয়া নাই, মায়া নাই, সুখ শান্তি নাই, গতি নাই, মুক্তি নাই। তাঁহাতে ডুবিয়া মন্দিয়া যাও, সকল দয়া ও সেবা-ধর্ম মিলিয়া তোমাকে এক অহেতুক কর্তব্যের পথে চালিত করিবে। দেখিবে—এ রাজ্যে বড় ছোট, ধনী, দরিদ্র, জানী বুর্খ, ঐক্য কোন ভেদ নাই—সকলের

অন্তরাত্মারূপে কেবল তিনিই বিদ্যমান । অনন্তরূপ, বিশেষত্বময় অনন্ত প্রকৃতিতে প্রস্ফুট । তখন পরমশ্রীকাতরতা বিলুপ্ত হইবে, তখন অন্তের উন্নতিতে চিত্তে বিমল আনন্দ পাইবে, অন্তের বিপদে ও হুঃখে প্রাণ অস্থির হইবে । তখন বুঝিতে পারিবে—তুমি সকলের অঙ্গীভূত হইয়াছ—সব পরিবার যেন তোমার পরিবার । তাঁহার সূর্য্য যেমন সকলের ঘরে কিরণ দেয়, তাঁহার জল যেমন অবিভেদে সকলের তৃষ্ণা নিবারণ করে, তেমনি, তিনি সকলের অন্তরাত্মা হইয়া বিদ্যমান । সর্ব্ব ঘটে তাঁহাকে যদি দেখিতে পাও, তবে কাহারও প্রতি একটু দয়া করিয়াছ বলিয়া তোমার আর অভিমান হইবে না, বুঝিবে, বাহা কর্তব্য, বাহা তাঁহার আদেশ, কেবল তাহাই করিয়াছ ; আর 'কিছুই নয় । তখন বুঝিবে, তুমিও বাহার, ঐ অস্পৃশ্য পেরিয়া ও চণ্ডালও তাঁহারই, অতএব তখন আর ঘৃণা বিদ্বেষ থাকিবে না । তখন সর্ব্বঘটে এক জাগরিত মহাশক্তি দেখিয়া মোহিত হইবে । অথবা তখন বুঝিবে, তোমারও আর পৃথক অস্তিত্ব নাই—তাহা অনন্ত জন-সংজ্ঞে একীভূত হইয়া গিয়াছে—তুমি ও জগৎ একাত্মক হইয়া গিয়াছ । ঐষতাবৈত একাকার । এই নির্বিকল্প সাধন ভিন্ন জীবের কিছুতেই মুক্তি নাই ।

তুমি কি ছাই আরোজন করিয়াছ ?—দিন ত বাইতেছে—অবিরত বাইতেছে, কোন বাধা মানিতেছে না । আত্মন, তোমাকে সাহুনয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কি আরোজন করিয়াছ ? মনে হইতেছে, এতদিনের সকল আরোজন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, কেননা, আত্মজ্ঞানের 'মূলে যে চিন্তা জ্ঞান, জগতের জ্ঞানের মূলে যে চিদাভাস—সেই জ্ঞান এবং সেই চিদাভাসের গাভীর্ণ এখনও তোমার ডাদুণ হৃদয়জন্ম হয়

নাই । পরসেবা ভগবানেরই সেবা, পরসেবা আপনারই সেবা, এই সারজ্ঞানে দীক্ষালাভ না হইলে কিছুতেই কিছু হইল না, মনে রাখিবে ! যদি নব জন্ম পাইতাম, তবে আজ হইতে 'জগন্ময়-ব্যাপ্ত শক্তির সেবার প্রবৃত্ত হইতাম ; কিন্তু এখন যে যাওয়ার দিন নিকটবর্তী ! হায়, এখন করি কি ?

এখন ইচ্ছা হয় যে, একবার জগতে ডুবিয়া যাই ;—আত্মপর-ভেদ-রহিত যে অহেতুকী চিন্ময়রাজ্য—সেই রাজ্যে প্রবেশ করি । কিন্তু কে জানে কবে তাহা সম্ভব হইবে ?

পরোপকারের কথা, এখন নীরদার স্ত্রীর আর আমাদের ভাল লাগে না । তাঁহার প্রতিবিধ সর্ব্বঘটে, তাহা দেখিয়া যদি আমরা কাঙ্গাল ভাইদের প্রাণে মিলিতে না পারিলাম, তবে আর কি হইল ? বুধা ভণ্ডাসীর কথা ভাই তুমি আর আমাকে বুক ফুলাইয়া বলিও না । তোমার ঐ সমবেদনা, ঐ দয়া কর্ম্মনাশার জলে ফেলিয়া দেও । গরীব কাঙ্গালগণ চির উপেক্ষিত ও চির নিষ্পেষিত হইয়াই চলিতে থাকুক । কিন্তু নিশ্চয় জানিও, একদিন এমন আসিবে, যেদিন ঐ ঘৃণিত ভ্রাতারাও তোমাদিগের উপরে উঠিতে পারিবেন ; এমন দিন আসিবে, যে দিন সকল আভিজাত্যের পরাজয় হইবে—এবং সর্ব্ব ঘটে তাঁহারই অপ্রতিষন্দী "প্রতি-বিম্ব" জাগিয়া উঠিবে । মানুষ তখন বড় ছোট সব তাই একাত্মক হইয়া গাইবে—জয় বিশ্বপতির জয় । তখন জাতীয় একতা স্বর্গ হইতে অবতরণ করিবে—'অহং-কারের' রাজত্ব ধ্বংস হইবে—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা জয়যুক্ত হইবে । সেই দিনের অপেক্ষারই জীবন ধারণ করিতেছি ।

২৩শে পৌষ, ১৩১৬ ।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংগোলোচনা ।

৫৭। কনক-কুম্ম। ত্রীপ্রভাবতী সেন কর্তৃক প্রণীত, ঢাকা গেভারিয়া প্রেস। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৪২ কবিতা ইহাতে সম্মিষ্ট হইয়াছে। এই স্মৃতি পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইলাম;—একটু নমুনা দিলাম—

কুম্মটিরে হৃদে ধরি

• চেয়ে থাকি তাঁদের পানে
তুলনা করি স্নানীলাকাশে
তাঁদের সাথে আপন প্রাণে।
কোন মুখটি মধুর বেশী
কোন মুখ-কমল হাসি ভরা।
কোন হাসিতে প্রাণটি ভাসে,
কোন হাসি মোর হৃদয় হরা।

বিশেষ গুণ এই—স্বদেশী কাগজে ছাপা।
জীশিকার উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে দেখিয়া
খুশ হইলাম।

৫৮। সারস্বত-কল্প। গদ্য সাহিত্য।
ত্ৰীকেশবনাথ মজুমদার, এম-আর-এ-এস।
ষিক্সেলনাথ, দীনবন্ধু, ভূদেব, কালীপ্রসন্ন,
বঙ্কিমচন্দ্র, প্যারীচাঁদ, ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার
প্রভৃতি অমর লেখকগণেব প্রতীমূর্তি ও
সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ। প্রাচীন ও আধুনিক
সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ও সুল্লর সমালোচনা।
পুস্তকখানি সুল্লর ও স্মৃতি হইয়াছে।

৫৯। রূপ-সনাতন। আর্যবর্তী চিকিৎসক,
ত্ৰীশ্রুতেনাথ গোস্বামী বি-এ, এল-এম-
এস প্রণীত, মূল্য ১।।।। থিয়েটারি বাঙ্গালার
নাট্যকাগারে লিখিত। একপ্রকার আমরা
পক্ষপাতী নহি,—ভুতপরি বিলাতী কাগজে
ছাপা। স্মরণ্য বাবুর দ্বারা অশিক্ষিত, সাধু

ভক্তের হাতে বেরূপ আশা করা যায়, সেজন্য
জিনিস না পাইয়া আমরা হুঃখিত হইয়াছি।

৬০। উপসর্গ। গ্রন্থকারের নাম নাই, মূল্য
।।।। সমাজের কয়েকটা উপসর্গের কথা সরল
ভাষায় নিরপেক্ষ ভাবে লিখিত। লেখক
চিন্তাশীল এবং সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ। এ পুস্তকের
আদর হইলে আমরা সুখী হইব। বিলাতী
কাগজে ছাপা না হইলে কত সুল্লর হইত!

৬১। রমাবতী। বিদ্যোগান্ত নাটক।
ত্ৰীমহিমারঞ্জন চক্রবর্তী প্রণীত, মূল্য ১।।।।
বড় ঘরের ছেলে এমন সুল্লর বাঙ্গালা লিখিতে
পারেন, কল্পনাও করিতে পারি নাই। গ্রন্থ-
কার আপন হৃদয়ের সুল্লর ছবিখানি এই
পুস্তকে ঢালিয়া দিয়াছেন। শাস্ত্রশীলের
আদর্শ চিত্র—পড়িতে পড়িতে ভক্তিতে প্রাণ
পূর্ণ হয়। রমাবতী হিন্দুরাণীর আদর্শস্থানীয়া;
দীক্ষার চরিত্রও সুল্লর হইয়াছে। পুস্তকের
গানগুলি বড়ই স্মৃতি। পুস্তকের ভাষা অতি
সুল্লর। পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা বিশেষ
তৃপ্তি পাইলাম।

৬২। গুরুগোবিন্দ সিংহ। ত্ৰীবসন্ত-
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১।।।। শিখ
গুরু গোবিন্দ সিংহের জীবনবৃত্তান্ত। ভারত-
বর্ষের অমূল্য ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা। যদি
এ ভারত কখনও জাগে, তবে এইরূপ জীবনের
আদর্শই জাগিবে। গ্রন্থকার এই সুল্লর
জীবন-বৃত্তান্ত লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষার গৌরব
বৃদ্ধি করিলেন। ভাষা ও লেখন-প্রণালী
বিশেষ মনোযোগের বিষয়। পুস্তকখানি ঘরে
ঘরে আবৃত হউক।

৬৩। Keshab Chandra Sen on British rule in India. মহাজনের অমূল্য উপদেশ। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই উপদেশ অনুসারে চলা সম্ভব কিনা, বিশেষ চিন্তার বিষয়। রাজা অত্যাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ হইলে তাহা সংশোধনের উপায় কি? সংশোধন অসম্ভব হইলে কি কর্তব্য? এসকল বিষয় সম্বন্ধে কোন মীমাংসা এই পুস্তকে নাই, কেবল dogmatical কথাই অভিযুক্তি।

৬৪। শিবাজী ও মারাঠা জাতি। শ্রীশরৎকুমার রায় প্রণীত, মূল্য ১০। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা সহিত। এই পুস্তকের ভূমিকা লেখার কোন প্রয়োজন ছিল না,—যাঁহারা এইরূপ ভূমিকা লেখান তাঁহাদের উদ্দেশ্য ভুল নয়, যাঁহারা লেখেন, তাঁহাদেরও রুচি মার্জিত নয়। এই পুস্তকখানি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ইহাতে যে বিষয় বিবৃত হইয়াছে, তাহা এ জাতির পক্ষে কখনই উপহাসের যোগ্য নয়। বর্গীর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা এদেশের প্রতিজ্ঞার কৰ্ত্তব্য বলিয়া এদেশে পবিত্রীকৃত। এই ঘৃণা পরিহারের একমাত্র উপায় মারাঠা জাতির মহত্ব কীর্তন। গ্রন্থকার এই কার্য্য করিয়া বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। স্বদেশী কাগজে পুস্তকখানি মুদ্রিত। পুস্তকখানি স্থলিখিত।

৬৫। কাব্য-কণা। শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত কর্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত, মূল্য ১০। নানা বিষয়ক কবিতা পুস্তক। সকলগুলি সুন্দর ও হইলেও একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, মধ্যে মধ্যে এক একটা কবিতা অতি সুন্দর হইয়াছে। কয়েকটা কবিতা বাদ দিলেই ভাল হইত।

৬৬। কল্প-কথা। শ্রীমণিলাল গঙ্গো-

পাধ্যায়, মূল্য ১০। জাপানী গল্পের ভাব লইয়া লিখিত। ক্ষুদ্র গল্প। বৈরাগ্য, এত অল্পস্থান, এরূপ গভীর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, পড়িয়া অবাচ্ হইতে হয়। মণিলাল বাবুর লেখনী ধারণ সার্থক হইয়াছে। সুন্দর সুন্দর কথা, স্থলিখিত ভাষায় লিখিত।

৬৭। A Manual of Bengali Composition and model essays: রচনাপদ্ধতি। As. 12, by Joy Gopal Kaviratna.

পদ প্রকরণ, বাক্য প্রকরণ, অমুচ্ছেদ, প্রবন্ধ-মালা, ইতিবৃত্ত, পর্যালোচনা প্রভৃতি বিষয় বিবৃত হইয়াছে। পাঠার্থীগণের বিশেষ উপকারে আসিবে বলিয়া মনে করি। পাকা হাতের পাকা লেখা। সুমিষ্ট এবং স্থলিখিত। রুচি মার্জিত। স্বদেশী কাগজ।

৬৮। প্রভাবতী। কবিবাজ শ্রীসুরেশ চন্দ্র রায় প্রণীত। মূল্য ১০। সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত। সংক্ষিপ্ত কথায় প্রভাবতীর জীবন সুন্দর ফুটিয়াছে। পড়িয়া বড় ক্লেশ পাইলাম। স্বদেশী কাগজ।

৬৯। চিন্তালাহরী। শ্রীহরিদাস বসু প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ১০। ১৫টা ক্ষুদ্র কবিতা। সচরাচর যে রূপ লেখা বাহির হইয়া থাকে, ইহাও সেই প্রকার। কোন বিশেষত্ব নাই। স্বদেশী কাগজ।

৭০। তমালী। মহাভারত-নাট্যকাব্য-প্রণেতা ৬প্রহরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিরচিত। মূল্য ১২। পৌরাণিক নাটক গল্প ও পঙ্কে লিখিত। স্বর্গীয় মহাজনের অক্ষয়কীর্তি। এই পুস্তক বাঙ্গালা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিবে। স্বদেশী কাগজ।

৭১। জামাই জাদাল। শ্রীবোম্বেশ্বর কুমার চট্টোপাধ্যায় বিরচিত; মূল্য ৬০। ৬টা ছোট ছোট গল্প। পাকা হাতের পাকা বিবৃতি, সরল এবং মিষ্ট ভাষায় গল্প কয়েকটা বেশ। স্বদেশী কাগজ।

মোনীবাবা !

(পরিশিষ্ট)

আমরা ইতিপূর্বে মোনীবাবার জীবন আলোচনা করিয়া ইহাই বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনি দীন এবং শান্ত সাধক ছিলেন ; উৎসাহী ও উত্তমশীল প্রচারক ছিলেন না।

আত্মগোপনই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, আত্মপ্রকাশে তিনি সর্বদা সঙ্কুচিত ছিলেন। আপনাত্মক ক্ষমতা ও গৌরব যে কিছু আছে, তাঁহা তিনি জানিতেনই না। আপনাকে তৃণ অপেক্ষাও হীন জ্ঞান করিতেন, অপরকে আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধে শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেন। একরূপ ব্যক্তির পক্ষে প্রচারণা-সাহ স্বাভাবিক নহে।

সচরাচর দুই শ্রেণীর লোককে প্রচার কার্যে ব্রতী হইতে দেখা যায়। কতিপয় ক্ষণজন্মা প্রত্যাশিষ্ট ব্যক্তি, ঈশ্বরের আদেশ লাভ করিয়া মানব-সেবার জীবন অর্পণ করেন, নিজের ইচ্ছা কিছুই রাখেন না ; আর এক শ্রেণীর উৎসাহী ও আত্মপ্রভাবশীল লোক, যাহারা সংসারের লোকের পাপ-ত্রুষ্টিচীর দেখিয়া স্তির থাকিতে পারেন না, স্বীয় শক্তি ও সামর্থ্যকে তাহাদের উদ্ধার সাধনে নিযুক্ত করেন। দেব-প্রসাদই প্রথম শ্রেণীর সফল, দ্বিতীয় শ্রেণী আত্মপ্রভাবকে প্রধান রূপে অবলম্বন করেন। ইহারাও ঈশ্বরবিশ্বাসী ও সরলচিত্ত, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু কার্যগত জীবনে উভয় শ্রেণীর

পার্থক্য প্রকাশ হইয়া পড়ে ও এই পার্থক্যের উপর ফলাফল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এ সত্য সচরাচর প্রত্যক্ষ করা যায়।

মোনীবাবার আত্মপ্রভাব মাত্রও ছিল না। তিনি জানিতেন না যে, তাঁহার দ্বারা তাঁহার প্রভু কি কার্য্য করাইয়া লইতেছেন। তৃণ-বানের হস্তের যন্ত্রের স্তায় চিরদিন চলিয়াছেন। যাহারা অনেক বলিলেন, তাঁহাদের অনেক কথাই যেন নিফল হইয়া গেল, যিনি মোনী রহিলেন, তাঁহার কথা শুনিবার অল্প অসম্ভব জনতা হইল! মোনীবাবার জীবন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে—কথা না বলার কি মহতী শক্তি। আমরা আত্মার শক্তিতে বেশী আস্থা স্থাপন করিতে শিখি নাই বলিয়াই, বোধ হয়, বাক্যের শক্তির উপর বেশী নির্ভর করিতে যাই—তাই অনেক সময় বৃথা বাক্যব্যয় মাত্র হইয়া যায়। ওঁকারনাথে প্রতিদিন আপরাহ্নে মোনীবাবার দর্শনার্থী বহু লোক সমবেত হইতেন, প্রতি একাদশী তিথিতে অপরাহ্নে সচরের অধিকাংশ লোক মোনীবাবাকে দর্শন করিয়া তবে জলগ্রহণ করিতেন, পরোপলক্ষে সহস্রলোক—মহারাজা হইতে দীনতম তিথারী পর্যন্ত—তাঁহার দর্শনাশায় উপস্থিত থাকিতেন। ইহা নীরব প্রচার—জীবন দ্বারা প্রচার। মোনীবাবার

১৩১৫ সালের জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় সংখ্যার নব্যভারতে মোনীবাবার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইবার পর কতিপয় বছর নিকট হইতে তাঁহার জীবনের কয়েকটি ঘটনা জ্ঞাত হইয়াছি। এবার আমরা একজন আত্মীয়ের পুরাতন চিঠিকাইলে মোনীবাবার কঠোর নিকট লিখিত একখানি স্বদীর্ঘ পত্র এবং একখানি পত্রাংশ ও একখানি কার্ড পাইয়াছি। সেই সকল অবলম্বন করিয়া পরিশিষ্ট লিখিত হইল।

জীবনের চিত্র আমরা ভাল করিয়া আঁকিতে পারি নাই। কিন্তু সেই অসম্পূর্ণ চিত্র নব্য-ভারতে প্রকাশিত হওয়ার পথ দেখা গেল যে, বুদ্ধ ভক্ত ব্রাহ্ম, শ্রবীণ ব্রাহ্ম সাধক, অনেক ধর্মপ্রাণ যুবক ব্রাহ্ম তাহা পড়িয়া উৎসাহিত ও উপকৃত হইয়াছেন। অনেক পূজনীয় সাধুর আশীর্বাদ প্রসাদে লেখিকা কৃতার্থ হইয়াছে।

শুধু কি ব্রাহ্মেরাই মৌনীবাবাকে গ্রহণ করিয়াছেন? তাহা নহে। মৌনীবাবা শেষ অবস্থায় সকল গণ্ডীর সীমা অতিক্রম করিয়া মুক্ত ব্রাহ্মণের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সকলকে আপনার বলিয়া স্বীকার করিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্ত তাঁহার জীবনচরিত পাঠ করিয়া অনেক ভক্ত হিন্দু ব্রহ্মসংসার উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কতজন তাঁহার বিস্তৃত জীবনী গ্রন্থকারে প্রকাশ করিতে অগ্ররোধ করিয়াছেন। একজন হিন্দু সাধু বলিয়াছেন, “ব্রাহ্মসমাজ বাবুদের সমাজ বলিয়া লোকে অবধা নিন্দা করিয়া থাকে; যে সমাজ মৌনীবাবার জ্ঞান সাধু পুরুষকে প্রভুত করিতে পারিয়াছে, সে সমাজ ধর্ম! মৌনীবাবার জীবন পড়িয়া আমি ব্রাহ্ম-সমাজকে সমধিক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে শিখিলাম।”

আমরা ইহাকেই মৌনীবাবার নীরব প্রচারের ফল বলিয়া গণনা করিতেছি। সংসারী মানুষ সংসারাতীত কিছু দেখিয়া সন্তোষিত হইয়াছে। আর সকলকে বিবরীর চক্ষু উপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু যখন দেখে যে তাহাদেরই মত একজন বিবরকে পারে তৈলিয়া সর্বব্যয় ত্যাগ করিয়া আর্পণিচিত ব্রাহ্ম-প্রেমের মগ্ন হইলেন, তখন কণকালের জন্তও

সকল দেশে ও সকল কালে এইরূপ ঘটনাক্রম প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মৌনীবাবার জীবনেও তাহাই দেখিতেছি।

উত্তরবঙ্গে বাসকালে বিবর কর্তৃক হইতে অবসর পাইলেই মৌনীবাবা ঐ প্রদেশের ব্রাহ্মপরিবার ও ব্রাহ্মমণ্ডলীর সঙ্গে আগ্রহের সহিত মিলিত হইতেন। বগুড়ায় কোন পরিবারে আকস্মিক বিপদপাত হইয়াছে, মৌনীবাবা তথায় উপস্থিত; রংপুরে কোন বন্ধু বিশেষ পরীক্ষায় পতিত, মৌনীবাবা তাঁহার পার্শ্বে; উৎসবে, অহুষ্ঠানে সকল বন্ধুই মৌনীবাবাকে আগ্রহের সহিত চাহিতেন। তিনিও তাঁহাদের সহিত মিলিবার জন্ত সময় করিয়া লইতেন। তাঁহার সঙ্গ-লাভের জন্ত উত্তরবঙ্গের ব্রাহ্মগণ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন এবং তাঁহার সঙ্গের প্রভাব তাঁহারা এখনও স্বীকার করেন।

মৌনীবাবা রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ী, সৈয়দপুর, নিলকামারী, শিলিগুড়ী, কুড়িগ্রাম প্রভৃতি স্থানে প্রচারার্থ গমন করিতেন। তিনি যে শুধু মুখে উপদেশ দিতেন, তাহা নহে, বিপদে, দুঃখে, শোকে আত্মীয়ের জ্ঞান সকলের সহিত ব্যবহার করিতেন। একবার ছয় মাসের অবসর লইয়া ব্রাহ্মপ্রচারক পূজনীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সহিত তিনি কাশী অঞ্চলে গমন করেন। এই সময়েই গোস্বামীদেবের সহিত তাঁহার বিশেষ বনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল।

বাগআঁচড়ার ধর্মপ্রচারার্থ লোক পাওয়া যাইতেছে না, ইহা কাগজে পড়িয়া মৌনীবাবা কার্যহইতে বিদায় লইয়া ৬৬ মাসের জন্ত সেখানে গমন করেন। ছয় পরিবারের শিক্ষাবঞ্চিত বালক বালিকাযের জন্ত তিনি

ছিলেন; পরীতে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেখানে সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ঐতি করিতেন। এখনও বৃদ্ধ ও হুঁয়ারা ভক্তির সহিত তাঁহাকে স্মরণ করেন।

কিন্তু এইরূপ প্রচারে তাঁহার আত্মা পরি-
তুষ্ট হইল না। অন্তঃকণ ভগবৎ সঙ্গলাভের
জন্ত তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল এবং
এইরূপ নিত্যযুক্ত অবস্থানান্তরের পূর্বে
প্রচার করাকে তিনি গুরুতর আত্মবিনাশের
কার্য্য বলিয়া অনুভব করিলেন। তিনি বলি-
তেন—“আগে অধিকারী হই।”

• সম্প্রতি গয়ার এক সিদ্ধ পুরুষকে দর্শন
করিতে যাইয়া তাঁহার নিকটেও এইরূপ
কথাই শুনিয়াছি। প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি বলি-
লেন, পূর্ব দিন তাঁহার নিকটে ৪ জন ইউ-
রোপীয় পিয়সফিষ্ট আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের
মধ্যে একজন গয়াতে বজ্রুতা দান করিয়া
আসিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া সিদ্ধপুরুষ বলি-
লেন, “আপনি ভাল কাজ করেন নাই। এই
বজ্রুতা দ্বারা আপনার এবং শ্রোতাদের অনিষ্ট
করা হইয়াছে।” বক্তা মহাশয় সন্তুষ্ট হইয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কেন এরূপ বলি-
তেছেন?” সিদ্ধপুরুষ উত্তর করিলেন—“আপনি
এখনও অনধিকারী। অনধিকারীর পক্ষে উপ-
দেষ্টার আসন গ্রহণ করা বিপজ্জনক। জ্ঞান-
লাভ করিয়া উপাদেশ দিলে লোকের উপকার
হইবে, আপনারও উপকার হইবে।” মোনী-
বাবাও তাঁহার কনিষ্ঠের প্রচারব্রত গ্রহণের
সংবাদ পাইয়া এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন।

মোনীবাবার একজন বিশেষ বন্ধু নব্য-
ভারতে বাবার জীবনচরিত প্রকাশিত হইবার
পরে এই ঘটনাটী আমাদিগকে জানাইয়া-
ছেন। মোনীবাবার সঙ্গলাভের জন্ত তিনি
কিছু দিন সন্তপুত্রিণীতে মোনীবাবার গৃহে

বাস করিয়াছিলেন। মোনীবাবা প্রতিদিন
এতে নির্দিষ্ট বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া দত্ত বাধন
করিতেন। এক দিন ডাল ভাঙ্গিতে গিয়া
আর ডাল ভাঙা হইল না। ইহা দেখিয়া
বন্ধু তাঁহার এরূপ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা
করিলেন। তিনি বলিলেন যে, সবুদিন তো
মন আগ্রত থাকে না—আজ তিনি বৃক্ষের
মধ্যে আত্ম-রক্ষণ-চেষ্টা দেখিতে পাইয়াছেন।
তাহাতেও চৈতন্ত আছে; প্রতি দিন যে
তিনি নথর ডালখানি ভাঙ্গিয়া লন, ইহাতে
সে বেদনা বোধ করে। সেই হইতে মোনী-
বাবা আর দাঁতন ব্যবহার করেন নাই।

তপস্তায় যাত্রার পূর্বে তিনি কিছুকাল
নলহাটিতে ত্রাতৃগৃহে বাস করিয়াছিলেন।
যাত্রার দিন বাড়ীর ময়লা পরিষ্কারকারিণী
(মেথরাণী) যখন ময়লা পরিষ্কার করিতে
আসিল, মোনীবাবা ধীরে ধীরে তাহাকে
ডাকিলেন। মেথরাণী নিকটে আসিলে তিনি
বলিলেন,—“তুমি আমার মা। শিশুকালে
মা স্বহস্তে মল মূত্র পরিষ্কার করিতেন; এত
দিন তুমি আমার সেই কার্য্য করিলে—তুমি
আমার মা। আমি তপস্তায় যাইতেছি—
তুমি আশীর্বাদ কর যেন সিদ্ধিলাভ করিতে
পারি। তোমার আশীর্বাদ ভিন্ন আমার
সাধনা সফল হইবে না।” এই বলিয়া
তাহাকে শ্রদ্ধার সহিত নমস্কার করিলেন।
মোনীবাবা কোন জগতের লোক ছিলেন,
এই একমাত্র ঘটনা হইতেই তাহা স্পষ্ট
প্রতীয়মান হয়।

মোনীবাবার একজন একান্ত অহরহ
ভক্ত তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

“মোনীবাবা সত্যকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া-
ছিলেন। আমরা বাহ্য করনা বা স্মরণ
বা অনুভব করিয়া থাকি, অথবা সত্য বলিয়া
বীকার করিয়া থাকি, মোনীবাবা দিব্যদৃষ্টি

তাহা দর্শন করিতেন। এইজন্যই যোধ হয় সাধনার চরমাবস্থায় তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, “প্রচার, তপস্তা বা সাধনার অঙ্গ নহে, ইহাধে তপস্তা বা সাধনার ফল বলিতে হয় বল।” সত্যদর্শী সিদ্ধপুরুষ বাঁহারা, তাঁহারা লোকালয়েই থাকুন বা লোকসঙ্গ ত্যাগই করুন, বাক্যদ্বারা উপদেশ প্রদান করুন বা মৌন অবলম্বন করুন, তিনি ইচ্ছা করুন বা না করুন, তাঁহার অর্জিত সত্য, তাঁহার সাধনার ধন জগতের ধর্মভাণ্ডারে যুযুত ও বাকুলাদ্বাদিগের জন্ত সঞ্চিত রহিয়া গেল। যিনি চাহিবেন, তিনি তাহা প্রাপ্ত হইবেন। আমরা ত কত মহৎ উপদেশ শ্রবণ করি এবং কত মহৎ সঙ্গ লাভ করি, কিন্তু তাহা সব সময় কি সার্থক হয়? সরলভাবে স্বীকার করিতেই হইবে, অনেক সহুপদেশ ও সাধুসঙ্গ জীবনে ব্যর্থ হইয়া থাকে। কেন একরূপ হয়? হয়, উপদেষ্টা সাধু ব্যক্তি তেমনভাবে স্মরণ সত্যদর্শন করেন নাই, শেখা কথা বলিয়াছেন মাত্র; না হয়, শ্রোতা উদ্ধৃৎ নহেন, অর্থাৎ অনধিকারী। মৌনী-বাবা এই কারণেই বারবার বলিতেন, এ দেশের লোকের নিকট প্রচারের এ প্রণালী সফল হইবে না। চতুর ব্যক্তির যেমন স্বল্প-পুঞ্জী ফিরিওয়ালাদের নিকট হইতে সহজে সহজে কোন বস্তু ক্রয় করেন না, তাহারাই ভেল জিনিস দিবা অধিক মূল্য আদায় করিবে বলিয়া ভয় কবেন, এ দেশের ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণ, সেইরূপ, ভ্রমণশীল উপদেষ্টাদিগের নিকট হইতে সহজপ্রাপ্য সত্য সকল সমধিক শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেন কি না, গভীর সন্দেহের বিষয়। যেখানে মহাজনেরা বিরাট দোকান খুলিয়া বসিয়া আছেন, একদরে খাটি জিনিস সেখানে মিলিবে বলিয়া লোকেরা বিশ্বাস করেন। সাধক মহাজন—বাঁহারা পবিত্র তপস্কেন্দ্রে সত্যধন লাভ করিয়া বসিয়া আছেন, ভারতীয় যুযুত ব্যক্তিগণ সহজে সেখানেই বান এবং বিশ্বাস ভক্তি ইহা করে সেখানেই হইতে সত্যলাভ করেন। এই সমস্ত

সিদ্ধাঙ্গাগণ লোকের দ্বারে দ্বারে মুক্তি বিতরণ করিয়া বেড়ান নাই, কিন্তু লোকে মুক্তির সমাচার চিরদিন এই শ্রেণীর ধর্মীরা লোকের নিকট হইতেই সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল চিত্তা মৌনীবাবার হৃদয়কে এমন সজোরে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল যে, প্রচারের বর্তমান সহজ পথ পরিত্যাগ করিয়া ঋষিজনোচিত তপোবলের আশ্রয় লইতে ও মুনিজনোচিত মৌনব্রত অবলম্বন করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। গভীর আধ্যাত্মিক ধর্মের সাধনা ভারতের তপোবলেই হইয়াছিল। জীবাশ্ম ও পরমাশ্মার নিত্যযোগ্য শিক্ষার জন্ত আমাদিগকে ভারতবর্ষের ঋষিদিগের দিকে চাহিতে হইবে এবং যথাসম্ভব তাঁহাদের পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে—মৌনীবাবার মত এই প্রকার ছিল। পাশ্চাত্য দেশবাসীগণ, প্রধানতঃ ধনোপাসক; সাংসারিক সুখের উন্নতির সাধনার তাঁহারা সিদ্ধ। তাঁহাদের অহুসরণে ধনলাভ হইতে পারে, বিলাসবিভবের প্রীতি হইতে পারে, বাহ্যিক চাকচিক্যময়ী ‘মতাতা’ লাভও হইতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক ধর্মলাভ হইতে পারে কিনা, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। অথচ ব্রাহ্মসমাজ, ধর্মসাধন ও প্রচার বিষয়েও সেই একান্ত বহিস্মৃৎ বণিকজাতিরই অহুসরণ করিয়াছেন। প্রচারক ও প্রচারপ্রণালী পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালা। দেশবাসীগণ সেইজন্ত যোধ করি, ব্রাহ্মসমাজকে তেমন প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিতেছেন না এবং আপনাদের বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারিতেছেন না। মৌনীবাবা ইহা তীব্ররূপে অহুসরণ করিতেন। ব্রাহ্মসমাজে বহিস্মৃৎ ভাব ও বিকট বিলাসিতার আবল্য দর্শন করিয়া তাঁহার আত্মবিক বৈরাগী হৃদয় একেবারে

আহত ও আত্মল হইয়া উঠিল। লোক-
শিকার জন্তই হয় ত ভগবান তাঁহাকে তীব্র
বৈরাগ্যব্রত সাধনে নিযুক্ত করিলেন। -আমা-
দিগের জন্ত মৌনীবাবা কঠোর প্রারম্ভিত
করিলেন। আমি খুব আশা করি, তাঁহার
তপস্তা বুধা হয় নাই।

“তপস্তার প্রারম্ভে মৌনীবাবার মনে
কিছু আত্মপ্রভাব ছিল, কারণ তপস্তার গমন
কালে বলিয়াছিলেন “বস্ত্রলাভ হইলে ভাই
ভগ্নীকে তাহা দিবার জন্ত আবার আসিব।”
কিন্তু চরমাবস্থায় স্পষ্ট লিখিয়া পাঠাইলেন—
“আমি ধর্মপ্রচার প্রভৃতি যে সকল মিথ্যা
উপাধি দ্বন্দয়ে ধারণ করিয়া আসিয়াছিলাম,
তাহা সমূলে বিনাশ করিয়া (পিতা) আমাকে
তাঁহার কচি ধোকা করিয়াছেন।” কচি ধোকা
লাভলোকসানের ধার ধারে না। এই জন্তই
সর্বত্যাগী হওয়া—এইজন্তই, মৌনী হওয়া।
মৌনীবাবার জীবন এই আত্মিকধর্ম বজ্র-
গভীর স্বরে প্রচার করিতেছে। নশ্বদার
পবিত্রগুলিনে যে পবিত্র দেহ সমাধিস্থ হই-
য়াছে, তাহা এত দিনে মৃত্যিকার মিলাইয়া
গিয়াছে; কিন্তু তাঁহার অমরাত্মা ভারত-
সন্তানদিগকে আত্মবলিদান করিতে আহ্বান
করিতেছেন। এইরূপ আত্মবলিদান দ্বারা এ
ভারত উদ্ধার পাইবে। ইহাই আমার বিশ্বাস।

“সমবেত সামাজিক উপাসনা সম্বন্ধে
ক্রমশঃ মৌনীবাবার মত পরিবর্তিত হইয়া-
ছিল। তপস্তার ব্যতীর দিন পর্য্যন্ত
তিনি পারিবারিক উপাসনার খুব ভাবের
সহিত যোগ দিয়াছিলেন। বেশী কথা
বলিয়া উপাসনা করিতেন না। বটাব্যাপী
উপাসনার মধ্যে তাঁহাকে হুচারিটামাত্র বাক্য
উচ্চারণ করিতে শুনা বাইত; কিন্তু তাঁহাতে
কত ভাব, কত গভীরতা, কত তত্ত্বব্যাঙ্গলতা!
সে ভাব উপস্থিত সকলকে স্পর্শ করিত। তিনি
বলিতেন; বেশী কথা বলিয়া উপাসনা করাকে

অসত্য কথা আসিতে পারে। ঠিক বড়ই
প্রাণে পাও, কথা তাহা অপেক্ষা কম হউক।
বেশী হইলেই অসত্য হয়। তিনি সর্বদাই
বলিতেন, উপাসনা প্রাণের বস্তু। অতি
সমোপনে অন্তরে উপাসনা সাধন করিতে
হয়। লোক-চক্ষুর অগোচরে সত্য উপাসনা
সম্ভব হয়। আপনাকেও ভুলিলে তবে উপা-
সনা সার্থক হয়। এমন বস্তুকে ব্রাহ্মগণ
প্রকাশ্য মন্দিরে সর্বসাধারণের নিকট প্রদর্শ-
নের বস্তু করিয়া বোধ হয় খুবই ভুল করিয়া-
ছেন। ব্রাহ্ম আচাৰ্য্যগণ বলিয়া থাকেন,
প্রকাশ্য উপাসনা লোকশিক্ষা বা প্রচারের
জন্ত। মৌনীবাবা একথাকৈ নিতান্ত রাগাত্মক
মনে করিতেন। বলিতেন, “আশুন নিয়ে
খেলা” ইহা শক্ত অপরাধ। উপাসনাকে
বাহিরে প্রদর্শনের বস্তু করাতে যে অপরাধ
হইয়াছে, তাহার ফল আমরা ভুগিতেছি।
আসল স্থানে এই প্রকার ভাব প্রবেশ
করাতে উপাসনা বহিষ্কৃত হইয়া বাই-
তেছে। তাঁহার সঙ্গে ব্রাহ্মের সবকাজে
বহিষ্কৃতিভা প্রবেশ করিয়াছে। বাক্য,
কার্য্য, চিন্তার, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও
সামাজিক সব বিষয়ে যেন হালকা বহিষ্কৃতি
ভাব। উপাসনাকে প্রচারের বস্তু করাতেই
এই সাঙা!! তিনি বলিতেন, মন্দিরে উপা-
সক অপেক্ষা দর্শক এবং সমালোচক অধিক
হইবার কথা। তাঁহাদিগকে বেশ করিয়া
কীৰ্ত্তন শুনাও, স্বকণ্ঠ পাঠকগণের দ্বারা স্তব্ধ
স্বন্দর গ্রন্থ বা প্রবন্ধ পড়াইয়া শুনাও, সুবক্তা
দ্বারা ভাল উপদেশ শুনাও—তদতিরিক্ত
করাতে বিপদ আছে। খুব সমভাবাপন্ন
ব্যাকুলাত্মা কতিপয় ব্যক্তির সম্মিলনে ভাল
ভাব আসিতে পারে; তবু সঙ্গে মিলিয়া
গভীর উপাসনার মধ্যে ডুবিয়া বাওয়া খুব
স্বাভাবিক। এরূপ উপাসনা রুদ্ধদ্বারে বা
সমোপনেই সাধন হয়। এইজন্ত মৌনীবাবা
উপাসনার অসত্যাচরণ সম্বন্ধে বার বার আমা-
দিগকে সাবধান করিতেন। ধর্ম সম্পূর্ণ
নিজস্ব। একাকী নির্জনে যে সাধন তাহাকেই
তিনি স্রেষ্ঠ সাধন বলিতেন। মৌনীবাবার
এই সকল গভীর কথা ব্রাহ্মসমাজে ছালা

করিয়া আলোচনা করার সময় আসিয়াছে।
পরিজ্ঞান দেওয়া অপেক্ষা পরিজ্ঞান পাওয়ার
দিকে বেশী চক্ষু পতিত হউক। মৌনীবাবার
মুক্তাত্মা আমাদেরকে এই আশীর্বাদ করুন।”

মৌনীবাবার হস্তলিখিত একখানি সুদীর্ঘ
পত্র, একখানি কার্ড ও একটি পত্রাংশ
পাইয়াছি। পত্রখানি তপস্বীমাতার এক
বৎসর পরে চিত্রকূট হইতে তাঁহার কনিষ্ঠ
ভ্রাতাকে লিখিয়াছিলেন। কার্ডখানি যাত্রার
দুই বৎসর পূর্বে সত্তপুষ্করিনী হইতে
তাঁহার সোদরোপম বন্ধুর নিকটে লিখিত।
এই দুইখানি প্রকাশিত হইল—

ও

প্রিয় তারক,

তোমার কার্ডখানি পাইয়া সুখী হইলাম,
কিন্তু ভাই, তোমার একটি কার্যে বিশেষ
হুঃখিত হইয়াছি। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,
তুমি যদি তোমার সহোদর ভায়ের নিকট
হইতে একটা জিনিস লইতে, তাহা হইলে কি
তাহার প্রতিশোধের জন্য আবার তাহার
স্বাস্থ্যের মধ্যে সেইরূপ একটা বস্তু রাখিয়া
আসিতে? বোধ হয় কখনই পারিতে না।
যাহা হউক, ভাই! আমার স্বদয়ে বড় আঘাত
দিয়াছ। আমি কখন রংপুর যাইব বলিতে
পারি না। আমাদেরকে গালাগালি দিয়াছে,
তাহাতে হুঃখের বিষয় কিছুই নাই, কিন্তু
দেশের লোকের অবস্থা দেখিয়া বড় কষ্ট হয়।
আমাদের স্থলের গোলমালের কিছুই নিষ্পত্তি
হয় নাই। কি হইবে, তাহা দরাময়ই জানেন।
আমার মানসিক অবস্থা বড় শোচনীয়। শীঘ্র
সংসার ছাড়িতে পারিলেই যেন বাচি। মনটা
বড় কঁপরে পড়িয়াছে।

মেঘের—প্যারীলাল।

ব্রহ্মকপাহিকেশ্বর।

১৮। ১১। ৮২

প্রাণের ভাই,

আইস তোমাকে প্রাণ ভরিয়া আশি-
র্জন করি। দেখিতেছি, পিতা আমার প্রার্থনা
তুনিয়াছেন। আমাদের সমস্ত পরিবারকে
অতি শীঘ্র প্রেমে মাতাইবেন। ধন্ত পিতা!
আর কি, আমাদের সকলকে একেবারে
তোমার করিয়া লও। অতীত অবিখ্যাতী
আমি, তজ্জাত তুমি আমার প্রতি প্রার্থনা পূর্ণ
করিতেছ, না জানি বিখ্যাতী ভক্ত হইতে
পারিলে কত উপকার হইত। হয়ত এত দিন
মনোবাহা পূর্ণ করিতে।

প্রাণের ভাই, তুমি কোন অপরাধ কর
নাই। পিতা থাকতে এত হুঃখ কিসের
জন্ম? আশাযিত হও, অতি শীঘ্র পিতা আমা-
দিগকে কৃতার্থ করিবেন। নীলকান্ত টাকা
পাঠায় নাই, সে পিতারই ইচ্ছা। পিতা
তোমাদের টাকা বন্ধ রাখিয়া আমাকে অপূর্ণ
লাগা দেখাইয়াছেন। তুমি যে সময়ে বাড়ীতে
গিয়াছিলে, সে সময়ে নীলকান্ত আমাকে ৫
টাকা পাঠায় এবং বামন তাহার ২৩ দিন
পরেই ৫ টাকা দেয়। এই সময়ে একজন
বৃদ্ধ সাধু পদদেশে ভরানক কত হওয়ার পৌড়িত
হইয়া পড়েন। পিতা আমাকে লইয়া তাহার
সেবার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমি ক্রমা-
গত ২৩ মাস পিতার ক্রুপায় তাহার সেবার
নিযুক্ত ছিলাম। ২৪শে আগষ্ট আমাদের
আহারীয় দ্রব্য ফুরাইয়া যায়। ২৫শে আমি
কাহারও নিকট ঋণ করিব না, অথবা চাহিব
না বলিয়া নিশ্চয় করিয়া পিতৃচরণসেবার
নিযুক্ত থাকি। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ নিকটবর্তী
সাধকদিগের আলয়ে গিয়াছিলেন। তাহার
সমস্ত জিজ্ঞাসা করিয়া অতীত জানিতে পারিয়া

ভাষাকে একজনের উপস্থিত কিছু আহারীয়
দ্রব্য দান করিয়াছিলেন। বুদ্ধ তাহাই আনিয়
আমাকে রুটি প্রস্তুত করিতে দিলেন। সেই
রুটিতে আমাদের আধপেটা করিয়া খাওয়া
হইল।- ভোজনান্তে আমি বুদ্ধকে বলিলাম
আমার একটা ছাতা আছে, কোন সাধুর
নিকট বিক্রয় করিয়া অথবা রাখিয়া
টাকা আনিয়া দিলে আমি খাণ্ডদ্রব্য
ক্রয় করিয়া আনিতে পারি। বুদ্ধ বলিল, আজ
প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, কল্যা দেখা যাইবে।
ইহার প্রায় ৫১৬ মিনিট পরেই উপর হইতে
একটা লোক আসিল এবং কিকিৎকাল কথা-
বার্তার পরেই বুদ্ধের হস্তে দুটা টাকা দিল।
এই লোকটি চিত্রকূটের নহে, অন্তস্থান হইতে
নবাগত। সে আমাদের অভাব কিছুই জানে
না এবং কথাবার্তায়ও এরূপ কিছু প্রকাশ
পায় নাই। এখন দেখ, কোন শক্তিবাদী
চালিত হইয়া সেই লোকটি আসিয়াছিল।
আরও কি তাপসমালার অলৌকিকরূপে খাণ্ড
ঘোটার বিষয়ে অবিশ্বাস করিতে চাও? আরও
শুন, ঐ খাণ্ড বেই ফুরাইয়া আসিয়াছে, আর
এক ব্যক্তি একদিন আসিয়া একটাকা দিয়া
গেল। বলা বাহুল্য যে, সাধকসংখ্যা অধিক
হওয়াতে এখানে এরূপ টাকা ঘোটা এক
প্রকার অসম্ভব। ভিকাই ঘোটে না। তার পর
ঠিক খাণ্ড ফুরাইবার সময় বুদ্ধের সন্তান ৬
টাকা পাঠাইয়াছিল। তাহার সেটাকা থাকিতে
থাকিতে নীলকান্ত ২ টাকা দেয়। তাহার
পর ত রীতিমত টাকা আসিতেছে। এবার
ঠিক যেদিন খাণ্ড ফুরাইয়াছে, পোষ্ট আফিসে
বাইয়া দেখি, টাকা উপস্থিত। এই প্রকারে
অধিবাসীদের সহিত পিতা অপূর্ণ লীলা খেলা-
ইতেছেন। এখন আর অবিশ্বাস করিতে
পারি না? খাণ্ড ফুরাইলে সেইদিনই খাণ্ড

আসিবে, এ বিষয়ে পিতা এক প্রকার নিশ্চিত
করিয়াছেন। বীণার ৫ রুটিবারা বহুসংখ্যক
লোকের দ্বাধারে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন
করিতে শিকি করিতেছি।

এ ত গেল খাণ্ড সম্বন্ধে। পিতা আমার
আদিবার পূর্বেই এখানে স্থলীয় শাসন
অতি স্থলীয় স্থানে নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন।
তাহার আভাস আমার ভায়ারীতে জানিতে
পারিবে। না দেখিলে বুঝিতে পারিবে না।

কিকিৎকাল এক বৎসরের পর আমি
পিতার অপার রূপার সম্পূর্ণ স্বাহ্যলাভ করি-
য়াছি। এখন একবার আহার করি, এক-
বার রান করি. * * * *। শরীরও
ক্রমে পিতার সেবার নিয়মিত হইতেছে।
আমার আলস্য সম্বন্ধে পিতা ঠিক করিয়া
লইতেছেন। এই পীড়িতে পিতার পূর্ণ
মঙ্গলময় ভাব খুব প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং
প্রার্থনার আশ্রয় কল প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি।
যে পক্ষে তোমাদিগকে প্রার্থনা করিবার
জন্ত অহুরোধ করিয়া লিখিয়াছিলাম, তাহার
পর দুই পালা অতি অল্পমাত্র জর হইয়াছিল।
তোমাদের অবশ্যকেহ আমার জন্ত প্রার্থনা
করিয়াছিল। এক বৎসরেরও অধিক পীড়িত
ছিলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য! পিতা আমাকে
একবার ২১ দিন ভিন্ন অন্তের অধীন করিয়া-
ছেন বলিয়া মনে হয় না। প্রায় ১০০ হাত
নীচ হইতে কলসিতে জল আনিয়া বহুতে
আহারাদি প্রস্তুত করিয়া পিতার চরণে বসিয়া
আনন্দে আহার করিয়াছি। সুখের রুচি
এবং আহারের প্রবৃত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া-
ছিল। এ সকলই পিতার কার্য্য। আমার
শরীর রক্ষার্থে তিনি নিজে সমস্ত করিতেন,
আমি উপলব্ধ মাত্র। তাহার পর চরিত্র
নরক বরণার আমায় আত্মহত্যা করিবার

প্রভৃতি অত্যন্ত প্রবল হইত। হর ত এক-
দিন অরের সময় ১৫ কি ১০ ছাড়াই খাইরা
বসিলাম, কিবা ১ কি ১৥ তেঁতুলই খাইলাম,
অথবা অধিক পরিমাণে গুড়ই খাইলাম
এই অবস্থায় বেরগ বিপদ হওয়া উচিত,
আমার ভাণ্ডার কিছুই হইত না। বরং অরাত্তে
নব আশায় আশাবিত্ত হইয়া নববলে বলীয়ান
হইয়া উঠিতাম। এ সকল লীলা আমাকে
কে চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়াছেন ?
পিতা আমার অবিখ্যাসের দস্তপাটি উৎপাটন
এবং তাঁহার অপার কৃপা দেখাইবার জন্ত
করিয়াছেন। পাপমন ইহাতেও গলিল না।
আরও এই এক শিক্ষা পাইয়াছি যে, পীড়াকে
আর এখন ভয় করি না। এরূপ চিকিৎসক
এবং সেবক আর কোথায় পাইব। গৃহে
 থাকিলে এই শিক্ষা লাভ করিতে পারিতাম
না। পাপ জীরনের জন্ত এত নিরাশ হই-
য়াছ কেন ? এমন পিতা থাকিতে আর
নিরাশ হইও না। আমাকে যদি বিশ্বাস
কর, তবে তখন, “দিবা রাত্রি প্রার্থনা করিতে
থাক, নিশ্চয় উদ্ধার পাইবে।” পিতা বলিয়া-
ছেন যে, সম্পূর্ণরূপে যে আমার উপর আশ্রয়
সমর্পণ করে, আমি তাহার নীচ প্রভৃতি
বশীভূত করিয়া দি। কেবল পাপ তাড়াইতে
চাহিলে হইবে না। পিতাকে লাভ করিবার
জন্ত তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইতে সাধনা কর।
সাধনা করিবার জন্ত তাঁহার নিকট হইতে
বল এবং কৃপা ভিক্ষা কর। তিনি নিজে সমস্ত
করিবেন। মাথুবেব নিকট ছুটাছুটি করিবার
ভার যতদিন থাকিবে, এবং যতদিন নিজের
উপর নির্ভর রাখিবে ও সম্পূর্ণরূপ আশ্রয়নাশ
করিতে “শিখিবে না, ততদিন এ সকল
‘সত্য অমুভব অথবা সন্তোষ করিবার’ ক্ষমতা
হইবে না। আশ্রয়নাশ হইলে পিতাকে

দেখিতে পাইব না। আশ্রয়নাশের জন্ত
পিতা আমাকে এই শিক্ষা দিয়াছেন এবং
নিজে তাহা সাধনা করাইতেছেন। সেটা
এই—নিজকে, নরনারীকে, জগৎকে ব্রহ্ম-
‘কৃপা রূপে অমুভব করা। এই সাধনার সিদ্ধি
লাভ করিলে অনেক শত্রু এক বাণে বিনাশ
হইবে। যে সর্বদাই অমুভব করে, আমার
শক্তির মূলে ব্রহ্মকৃপা, জ্ঞানের মূলে ব্রহ্মকৃপা,
প্রাণের মূলে ব্রহ্মকৃপা, এক কথায় সকলোব
মূলেই ব্রহ্মকৃপা, তাহার নিকট সাধনার
মহাশত্রু অহঙ্কার স্থান পায় না। নরনারী
এবং জগৎকে এইরূপে দেখিতে শিক্ষা করিলে
অপবিত্রতা চলিষা যাইবে এবং প্রেমে স্বদয়
পূর্ণ হইয়া উঠিবে। এই কৃপাতে সিদ্ধিলাভ
করিলে কোন আর অভাব থাকিবে না,
তখন কেবল এক ব্রহ্মকৃপা-ছটা তোমার
চতুর্দিকে, আত্মাতে, প্রতি রক্তবিন্দুতে এবং
প্রত্যেক ভূগগাছিতে দেখিবে। তখন ভূগের
চেয়ে নীচ হইবে, আর কাহাকেও ঘৃণা করিতে
পাবিবে না। এই কৃপা সাধনায় আমি এখন
বিশেষভাবে পিতা কতক নিযুক্ত হইয়াছি।

পীড়িত অবস্থায় গালসা প্রভৃতি কতক-
গুলি রিপু মাথা উঠাইয়াছিল। সেগুলি পিতা
আবাব ক্রমে বশীভূত করিয়া দিতেছেন।
এখন দিন এক প্রকাবে যাইতেছে। প্রাতে
উঠিয়া কিছুকাল পিতৃচরণ মস্তকে ধারণ
করিয়া ব্যায়াম করি। তাহার পর সুখ
মুখিয়া পিতার চরণতলে বসি। অধিকাংশ
সময়ই কৃপা স্মরণ এবং বিশেষ প্রকারে উপ-
লব্ধি করিতে চেষ্টা করি। পিতার ‘কৃপায়
অনেক সময়ই সকল হই। সময়ে সময়ে
পিতার মহাশ্রু দ্বি দিয়া নিজের ক্ষুদ্র অমুভব
করিয়া পরম সুখী হই। সময়ে সময়ে পিতার
কৃপা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞাত্বান্নে নিযুক্ত

• থাকি। সময়ে সময়ে পিতা কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার স্বরূপ কথঞ্চিরূপ অমৃতভব করান। মধ্যে মধ্যে খাবার চিন্তা এবং বাহিরের চিন্তাও স্থান পায়, কিন্তু তাহাদের অবস্থা পিতার কৃপায় ক্রমে শোচনীয় ভাব ধারণ করিতেছে। এই প্রকারে প্রায় দুই প্রহর কাটিয়া যায়। তাহার পর কিকিৎকাল পাঠে রত হই। কখন কখন মোহ আসিয়া গ্রূরূপ করিয়া ধরে যে, আমি এ সকল হইতে একেবারে বঞ্চিত হইয়া নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকি। কখন কখন আত্মহত্যার প্রবৃত্তি দেয়, কিন্তু ইহারাও ক্রমে বলহীন হইতেছে। তাহার পর আহাৰাদি নিত্যকার্য্যে ব্যাপৃত হই। রান্না করিয়া আচ্ছা করিয়া আহাৰ করি। প্রায় এই সকল দ্রব্যই অধিক আহাৰ করিয়া থাকি, যথা—

আটা (উত্তম গমের) ১/১০

আতপায় ১/১০

ডাইল (যুগ কিয়া অড়হর, ছোলা) ১/১০

॥

টিনের ছোট চামচেব এক চামচ যতও তাহার সহিত সংস্কৃত থাকে। কখন কখন তক্তাকারি টক প্রভৃতিও হয়, কিন্তু তাহা কদাচিৎ। তৎপর কিছুকাল পিতাকে স্মরণ করিতে কঠিনে গড়াগড়ি দিয়া, কিকিৎকাল পিতার চরণতলে বসিয়া, পাত্ৰাদি পরিষ্কার করিয়াও কোন কোন দিন পিতার চরণতলে বসিবার সময় থাকে, কচিৎ দুই একদিন থাকে না। সন্ধ্যার সময় একটু ঘুহের উপর স্রমণ করিয়া এবং ব্যায়াম করিয়া পিতার চরণায়ত পান করিবার জন্ত বসি। • কোন কোন দিন ২১ বণ্টা পিতা বসাইয়া রাখেন, কোন কোন দিন শীত্ৰই গুইয়া পড়ি। • কোন

কোন দিন গুইয়া গুইয়া পিতার স্মরণ মনন ইত্যাদিতে অনেক সময় পিতা বাপন করান। জাহ্নকপূর ২৩ বণ্টা ঘুমাই, পরেই আবার উঠাইয়া দেন। তাহার পর আর বড় ঘুম হয় না। এইরূপ দিন গত হইতেছে। ক্রমেই আশা বৃদ্ধি পাইতেছে, নিরাশা অন্তর্ধান হইতেছে। এই প্রকার সর্বশক্তিমান পরম দয়ালু পিতা বাহার, তাহার আবার মুক্তিযন্ত্র জন্ত চিন্তা? পাপচিন্তা, নরকভোগ যদিও পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, তত্ৰাচ তাহাদের শক্তি যে থরস হইয়াছে, তাহা বৃদ্ধিভেছি। পিতা শীত্ৰই আমাদের জন্ত উপায় করিবেন। বাহির হইতে সাধন ভজন সম্বন্ধে কোন উপকার, প্রাপ্ত হই, এরূপ কোন সঙ্গী এখানে নাই। কেবলমাত্র পিতা আছেন। আমি আর অন্য সঙ্গী চাই না। পিতা ভিন্ন অন্যদিকে দৃষ্টি করিলেই আমার সর্বনাশ উপস্থিত হয়। সর্বসাকী আগ্রত জীবন্ত দেবতা আমার গুরু, পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু হইয়া আছেন। তবে আর অভাব কি। আমি তাঁহার সঙ্গেই কথা বলি, তাঁহার ক্রিকট হইতেই অব্যর্থ উপদেশ পাই। তিনিই আমার দয়া করিয়া আমাকে ঘাড়ে ধরিয়া সেই সকল সাধনায় নিযুক্ত করেন। যখন আমাকে দেখি না, তখন তাঁহাকে দেখি এবং যখন আমাকে দেখিতে পাই, তখনই সর্বনাশ উপস্থিত হয়, আর পিতাকে দেখি না। পরম দয়ালু পিতা শক্তিরূপে, জ্ঞানরূপেই বিশেষভাবে আমার নিকট প্রত্যক্ষ হন। আমার নরকভোগ তাঁহারই ইচ্ছা। আমার অহঙ্কারের , দন্ত-পাটি উৎপাটন করিতেছেন এবং আমার মধ্যে যে কিছু নাই, তাহাই চক্ষুতে অন্তর্ভুক্ত দিয়া দেখাইতেছেন। পূর্ণ মঙ্গলময় শীত্ৰ আমাকে মুক্ত করিয়া লইবেন। আমি আর কিছু চাই

না, কেবল তাঁহার অভয় চরণ পূজা করিকার অধিকার চাই। পিতা অনেক লিখাইরাছেন— এই প্রকার চলিলেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। পিতার প্রতি যদি প্রেম না হয়, সৎসার ছাড়িয়া বনে গেলেও তাহার নিকৃতি নাই। তুমি কৃপালাভনের দ্বারা প্রেম লাভ করিতে থাক। পিতা নিশ্চয়ই তোমাকে কৃতার্থ করিবেন। আর একটা দ্রব্য চাই— ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা। পিতার নিকট প্রার্থনা করিয়া যে প্রার্থনা পূর্ণ হইবার অল্প অপেক্ষা না করে, সে কখনই ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ-অধিকার পাইবে না। ধৈর্য্যশীল এবং সহিষ্ণু হইয়া পিতার চরণে পড়িয়া থাকিলে তিনি উদ্ধার করিবেনই। আর কি? আর একটা কথা—সত্যবাদী হইতে শিক্ষা কর। ব্রাহ্মসমাজে এইটীর বড় অভাব। তাহার আশ্রয় লইয়া থেলা করিতেছে। উপাসনা, গান প্রভৃতি মোখিক হইয়া দাঁড়াইরাছে। এই অপরাধে অনেকে পুড়িয়া মরিতেছে। সাবধান যেন তোমাদের পরিবার মধ্যে যুগা পিতার নাম উচ্চারিত না হয়। ভাবের সহিত যত-টুকু হয়, সেই টুকুই ভাল। ছোট ছোট শিশু যেন উচ্চ উচ্চ গান করিয়া পিতার অবমাননা না করেন। তাহাদিগকে কেবল সরলভাবে এই শিক্ষা দাও—ঈশ্বর আছেন এবং তাঁহাকে খুব ভালবাস। যদি তাহারা উঁচড়ে পাকা হয়, তবে নিশ্চয় জানিও, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। নিশ্চয়ই তাহারা অভক্ত নাস্তিক হইয়া ব্রহ্মসমাজকে কলঙ্কিত করিবে। কিছুই একদিনে হয় না। বালক একেও ১২ বৎসর কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। অস্থির হইও না। স্থির ভাবে সাধনার নিযুক্ত হও। মাসে ২ খানা পত্র দিয়া কি করিবে? পিতা এই পত্রে বাহা লিখাইলেন, এই সাধ-

নার সিদ্ধ হইয়া আর কিছু চাহিও। Bible, তাপসমালা, Pilgrim's Progress এবং অন্যান্য সাধুদের জীবনী খুব ভালর সহিত পাঠ করিবে। বীণ নরপ্রেরণ। তাহার অধ্যয়ন অবিরাম বরিও না। তাপসমালার আওল হোসেন খিকানীর জীবনচরিত বেশ করিয়া পাঠ করিবে।

* * * * *
তোমাদের মধ্যে সাধন ভজন কি প্রকার চলিতেছে, আমাকে জানাইবে এবং আমার পত্র সকলকে পড়িয়া শুনাইবে।

* * * * *

পিতামাতার সেবা গুরুত্ব না করিলে সাধনার একটা অঙ্গহীন থাকে। এই অভাব আমি বিশেষ করিয়া অগ্রহণ করিতেছি। তুমি সর্ব্বদা চিঠি দ্বারা এবং টাকাকড়ি দ্বারা তাঁহাদের অভাব মোচন করিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবে। যদি পিতা দিন দেন, মনো-বাহা পূর্ণ করিয়া তাঁহাদের সেবা করিব।

* * * * *
তোমাদের প্রত্যেকের সংবাদ চাই। আর কি লিখিব?
উপাসনাদি করিতে থাক। প্রাণের দেব-তাকে প্রাণে রাখিও, বাহির করিয়া দিও না, যখনই কোন কুপ্রবৃত্তিকে উপস্থিত হইতে দেখিবে, তখনই প্রার্থনা আশ্রয় করিয়া উপবাস নিবে, ইহাতে পিতার অগ্রহণ প্রচুর পাইবে। রাজি আগিয়া পিতৃপদ মন্তকে করিয়া, প্রেমের আলো আলিয়া, ব্রহ্মরূপারূপ শাণিত অসি-ধারণ করিয়া এবং উপবাসাদি ব্রত নিয়ম পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হও, নিশ্চয় সর্ব্বদা হইবে। তবে এখন বিদায়।

তোমার দাঁদা—

অল্পকালে মৌনীবাঁবা সবচেঁ বাহা
আনিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা
করিলাম। ভগবানের ইচ্ছা হইলে ইহা
পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া সাধকদিগের
অহুজা এবং অহুরোধ পালন করিব। যদি
কেহ মৌনীবাঁবা সবচেঁ কোন বিষয় আমাকে

দয়া করিয়া জানান, আমি কৃতজ্ঞতার সহিত
তাহা গ্রহণ করিব ও তাহার জীবনীমধ্যে
সন্নিবেশিত করিব।

বিষণপুং }
সীতামারি পোঃ } শ্রীনিবাসিনী ঘোষ।
মজঃকরপুর।

শ্রীমান্ সুপ্রসন্ন ও কুমারী সান্ত্বনার শুভবিবাহের উপদেশ।

৩০শে মাস, শনিবার, ১৩১৬।

শ্রী সান্ত্বনা, বাঁবা সুপ্রসন্ন—তোমরা আজ
বিশ্বাধাধ্য বিশ্বপতির নাম স্মরণ পূর্বক, হ্রালোক
তু-লোকবাসী গুরুজন এবং সাধুভক্তিগেব
পদপ্রাপ্তে বসিয়া মহামিলন মন্ত্র উচ্চারণ
করিলে—“তোমার হৃদয় আমার হউক”—
এ মন্ত্র অতি পবিত্র এবং অতি গভীর, সকল
সাধনার ঘনীভূত সার এই মন্ত্রে নিবদ্ধ। আমি
সুদীর্ঘকাল সংসার-কাননে পবিত্রমণ কবিতা,
বার্থ এবং পরার্থের বে অনাবিল মিলন-স্থান
লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা অহেতুকী প্রেম-মন্ত্র।
তাহা দেখিয়াছি এবং বাহা করিয়াছি, বাঁবা
পাইয়াছি এবং বাঁবা পাইবার প্রত্যাশী হইয়া
আছি,—তাহা কেবলই প্রেম-মন্ত্র-পুত। আমি
সে দিন বলিতেছিলাম, যে বিধাতার প্রত্যক্ষ
ও প্রেক্ষিত ছবি এই জগৎকে ভালবাসিল না,
সে ভক্তি বা বিশ্বাসের বিজয়-ধামে কখনও
পৌছিতে পারিবে না। ভালবাসার মূল-মন্ত্র—
আর্থত্যাগ বা আত্মত্যাগ, অহঙ্কার বা আত্মা-
ভিমান বিনাশ। আত্মত্যাগ বা অহঙ্কা-
রের বিনাশও প্রাহাই। সংসার এই মন্ত্র-
সাধনের প্রধান সহায়,—নিবৃত্তি-মার্গ-সাধনা

ভিন্ন কেহ এই পবিত্র জিতেজিরিষের আমল-
ময় ধামে পৌছিতে পারে না। নিবৃত্তি-মার্গ-
সাধনে যে কখনও প্রবৃত্ত হয় নাই, কৈবল্য
সাধন কি বস্ত, সে কখনও তাহা বুঝিতে
পারে না। যে সুখাধেবণে জগতে বিচরণ
করে, মুগ্ধভুক্তিকার প্রতারিতের জায় সে
চিবদিনই হৃৎ-বিপদ-ভুক্তার চটকট করে।
আব যে চিবানন্দের প্রেম লহরী, এই প্রেক্ষিত
মর্ত্য-লীলা রাজ্যের প্রতি অণু পরমাণুতে
দর্শন করে, সে সুখ হৃৎ-সম জ্ঞানে আত্মগারা,
হৃদয়নে তাহার প্রেম ধারা, সে কৈবল্য
সাধন বলে জরা-মরণের অতীতে বিলীন,—
যে সংসারকে শিক্ষাহান মনে করে বটে,
কিন্তু লক্ষ্য মনে করে না, তাহার লক্ষ্য
অতীত্রে নিবদ্ধ, তাহার গতি দ্বন্দ্বীক্য
অহেতুকী সজ্জিবানন্দ-ময় ধাম,—সে প্রকৃ-
তিয়ত সংসার-নিরপেক্ষ এবং আত্মপর-ভেদ-
বিবহিত হইয়া গভীর সাধনার লক্ষ্য
নিশ্চিত্তে ও নির্ভয়ে চলিয়া যার। এই -
সংসারের কোন সুখ-স্পৃহাই তাহার চিত্তকে
আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। শুভজি-

গতি তাহাকে নিত্য-নিরঞ্জন-ধামের অচ্যুত বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখেন।

আজ এই পবিত্র শুভ মুহূর্ত্তে যদি তোমরা প্রেম-যজ্ঞের মহা যজ্ঞ উচ্চারণ করিলে, আমি আশীর্বাদ করি, তোমরা এই যজ্ঞ সাধনে সিদ্ধ হও, আশীর্বাদ করি, তোমরা সংসারের লাভ-লোকসান-গণনার অতীত কৈবল্যে মিশিয়া যাও। সর্বদা স্মরণ রাখিবে, আত্মত্যাগই এই যজ্ঞের একমাত্র ইন্ধন—মহাযজ্ঞে আত্ম এবং স্বার্থকে ত্যজ করিয়া—সেই ত্যজ প্রেম-যুগে মিশাইয়া অঞ্জনরূপে নরনে লেপন করিয়া জগতের দিকে চাহিয়া দেখ—বুঝিতে পারিবে সবই জ্যোতি-বনের প্রেম-বন সূৰ্ত্তি; কেহ আর সংসারে পর নাই—সবই আপনার। দেখ, স্বার্থ এবং পরার্থ;—চিৎপদ্মাতে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে;—বাহা ছিল প্রেম-গন্ধা, তাহা মিলিয়াছে জ্ঞান-ব্রহ্মপুত্রে—দুই মিলিয়া মিশিয়া দরিদ্র করিদপুরকে এবং তথা হইতে সমস্ত মাতৃহুমিকে স্মৃশীতল করিতে, উৰ্দ্ধরা করিতে, অথবা সঞ্জীবিত করিতে ছুটিরাছে। হার, আমার এ কি আশার স্বপ্ন? সগর বংশকে উদ্ধার করিতে যদি ভাগীরথী প্রবাহিত হইয়াছিল, করিদপুরের অগণ্য মুমূৰ্খ বংশকে উদ্ধার করিতে এই প্রেম-পদ্মা কি প্রবাহিত হইবে না? বিপিন বিহারী বাহা করিতে আজীবন চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া শুধু চক্ষের জল উহাতে মিশাইয়া গিয়াছেন, এত দিনে, তাহা যদি জমাট হইয়া প্রেম-বন সূৰ্ত্তি ধারণ করিল, তবে আমার আশা ব্যর্থ হইবার নয় যে, এই মহাশিল্পে অসাধ্য সাধিত হইবে;—দরিদ্র করিদপুর এবং তাহা হইতে সমস্ত মাতৃহুমি উদ্ধার-হইয়া যাইবে। তবে যাও,

আজ উত্তরে মিলিয়া ভিহারী ভিহারিণীর সূৰ্ত্তি পত্রগ্রহ করিয়া পতিত দেশকে উদ্ধার করিতে ধাবিত হও। বিধাতার মহান ইচ্ছা তোমাদের জীবনে পূর্ণ হউক।

‘‘ মা সাস্বনা, তোমার জীবনের এই বিশেষ দিনে বিশেষ করিয়া তোমাকে বলিতেছি, তোমাকে এই করদিন যে সকল উপদেশ দিয়াছি, তাহা সৰ্ব্বপ্রযত্নে প্রতিপালন করিবে। তত্ত্ব কেশবচন্দ্রের ধর্ম-মতকে যেমন তাহার সাধনী কস্তাগণ হৃদয়ে ধারণ ও প্রতিপালন করিতেছেন, আমার জীবনের ধর্মবিশ্বাসকেও, সেইরূপ, তুমি হৃদয়ে সর্বদা ধারণ করিবে। আমার বিশেষত্ব তুমি বিশেষ রূপে জান, আমার জীবনধারণকে বল দরিদ্র কাঞ্চাল ভাইদের অন্ত, তাহা তুমি বিশেষ ভাবে জান। আমি না খাই-য়াও অন্তকে খাওয়াইতে পারিলে সুখী হই, না পরিয়া অন্তকে পূরাইতে পারিলে আনন্দিত হই; তাহা তুমি জান। আমি মনে করি, বিশ্বাবিপের প্রকটলীলা এই মন্তোর নরনারী। তাঁহাদিগের সেবা, তাঁহারই সেবা। সকলকে আপন কারিতে পারিলেই তিনি আপন হন। এই ক্ষণে আমার প্রিয়বন্ধ স্বর্গত বিপিন বিহারী আমার প্রাণকে আকর্ষণ করিয়া ছিলেন। আমি চিরদিনই তাঁহার অনুগত ছিলাম। তিনি মানব সমাজের কল্যাণের জন্য সকল অর্পণ করিতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার তিরোধানের পর, এই কয়েক বৎসর যে বেদনা হৃদয়ে ধারণ করিতেছি, তাহা একমাত্র বিধাতাই জানেন। তাঁহার সংগ-রাশিকে রক্ষা করিবার ভার তুমি পাইলে, দেখিও, আত্ম-সুখাধেবনে মত্ত হইয়া, কাহারও সুখ শান্তির অন্তরায় হইও না, কখনও কাহারও প্রতি বিরূথ হইও না—কখনও কাহাকেও পর ভাবিও না।

সকলেই তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী, ইহা মনে রাখিয়া সকলের সেবা ও পরিচর্যা করিবে। দেখিও কেহ যেন কখনও তোমার ব্যবহারে বাধিত না হন, দেখিও কেহ যেন কখনও তোমার গৃহ হইতে অভুক্ত অবস্থায় না যায়। সুপ্রসন্ন তাহার পিতৃদেবের দয়ার প্রত্যক্ষ মূর্তি, ইহা সর্বদা অন্তরে রাখিয়া তাহাকে সর্বপ্রযত্নে আদর ও যত্ন করিবে এবং তাহার সহিত মিলিত হইয়া প্রতিদিন উপাসনা-পুত্ৰ হইয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিবে। তোমার মূর্তি প্রেমে পঠিত—অহেতুকী প্রেমই যেন তোমার চির লক্ষ্য থাকে।

বদেশী মন্ত্র, এই দরিদ্র দেশের একমাত্র উদ্ধারের মন্ত্র, এই কথা মনে রাখিয়া এই পঠিত দেশের উদ্ধারের জন্য সর্বদা চেষ্টা করিবে। তোমার জীবন আদর্শ জীবন হউক, তোমার দ্বারা তোমাগ্নি পিতামাতার কুল এবং ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল হউক। তোমার জীবন দেশের জন্য পাত হইলে আমাদের জীবন সার্থক হইবে।

বাবা সুপ্রসন্ন, আমি আদর করিয়া তোমার নাম সুপ্রসন্ন রাখিয়াছিলাম, তোমার জীবনে ঐ কথার মর্যাদা সুরক্ষিত হইলে আমি বিশেষ আনন্দিত হইব। তুমি ছালোক-বাসী ভুলোকবাসী সকলের প্রতি সুপ্রসন্ন হও, ইহাই তোমার নিকট প্রার্থনা। তোমার জীবন হুঃখপূর্ণ,—অর্থাৎ শৈশবে তোমার মাতৃদেবী স্বর্গে গিয়াছেন, তোমার বাল্যেই তোমার পিতৃদেব স্বর্গত হইয়াছেন। হুঃখে তোমার জীবন আরম্ভ, হুঃখেই সংবদ্ধিত। তুমি আজ এই বিশেষ দিনে তোমার পিতৃদেবী এবং মাতৃদেবীকে বিশেষভাবে স্মরণ কর, যে ব্রহ্মকণা, তোমাকে এতদিন রক্ষা করিয়াছে, তাহা আজ অহুযান কর।

অপরাধিতার স্বর্ণারোহণের পর আমরা বক্ষ দাক্ষণ শোকে অহির হইরাছিলাম, তখন বিশ্বজননী আমাদের হুঃখ অপনোদনের জন্য সাত্বনাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই আদেশে সাত্বনা তোমার সহচরী হইতে চলিল। আমাধিগের দাক্ষণ শোকে ক্র দিনের সাত্বনা যদি তোমার সুখের কারণ হয়, আমাদের আনন্দের সীমা থাকিবে না।

সাত্বনা তোমার যোগ্য কিনা, তাহা একমাত্র বিধাতাই জানেন। সাত্বনা বিধাতার অহেতুকী প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিতা—ভালভাসাই তাহার স্বভাব, ভালভাসাই তাহার জীবনের লক্ষ্য। এভাবে কাল সে বাহাকে পাই-রাছে, তাহাকেই ভালভাসার মুখ করিয়াছে। তুমি যদি তাহার এই অহেতুকী প্রেম-মন্ত্র সাধনের সহায় হও, তবে তাহার আদর্শ প্রেমমূর্তি অগতঃ মোহিত করিতে পারিবে।

তুমি সাধু বিপিনবিহারীর বংশধর—আমরা তোমাকে তাহার গুণধর বলিয়াও বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি, তুমি তাহার পবিত্র স্মৃতি-সংরক্ষণের একমাত্র কারণ। তাহার জীবনের আদর্শ যদি তোমাতে সংরক্ষিত হয়, তবেই আমাদের আশা পূর্ণ হইবে। তিনি মনে করিতেন, প্রতি পরমা বিধাতার দরিদ্র সন্তানদের সেবার জন্য তিনি প্রাপ্ত হন, এইজন্য, তিনি প্রতি পরমা দরিদ্রদের সেবার জন্য ব্যয় করিতে ভালবাসিতেন। নিজের সুখের জন্য যে বিধাতার দানের অপব্যবহার করে, তাহার ঘরে অবাচিত দান বহুদিন অব-তরণ করে না, একদিন তাহাকে একজন কাদিতে হইবেই হইবে। তিনি ছিলেন, জনক শ্রীমন্ত ভায়—যনী হইয়াও অনাসক্ত যোগী, দরিদ্রের বন্ধু, দরিদ্রের সহচর। তোমার পিতার এই পূণ্যকীর্তি তুমি কি শ্রদ্ধা করিবে, না হুঃখিত

দ্রও পালনে সাধনঃ তোমার সহচরী হইতে
পারিবে বলিয়া আশা করিতেছি। বিধাতা
আমাদের সেই আশাকে পূর্ণ করুক।

পবিত্র গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র মিলিয়া কোন
একটা দরিদ্র দেশকে উর্বরা করিতেছে,
তাহা জান কি ? সে দেশ—অতি দরিদ্র ফরি-
দপুর। তোমাদের মিলনকে আমি পতিত
দেশের উদ্ধারের কারণ মনে করিতেছি।
দেখিও, সুপ্রসন্ন, আমার মনোবাঞ্ছা যেন
পূর্ণ হয়, তোমাদের মিলনে বংশের, দেশের
এবং ব্রাহ্মসমাজের মুখ বেন উজ্জ্বল হয়।

এই জীবন পথের সহায় কি, তাহা জান
কি ? একমাত্র সহায়—ব্রহ্মরূপা। ঐ রূপা
তোমাকে অশেষ দুঃখ বিপদে রক্ষা করিয়াছে,
আমি বিশ্বাস করি, ঐ রূপাই তোমাকে
অবিশ্রুতেও রক্ষা করিবে। তুমি শয়নে
স্বপনে ব্রহ্মরূপা অবলম্বন করিয়া চলিবে,
আমার একান্ত অহরোধ। তোমাদের দাম্পত্য
জীবনে তাহার অল্পস্ব রূপা বর্ধিত হউক।

ও শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

ঐ বিবাহের উপহার।

(১)

বিবাহ প্রণয় নহে—শুভ পরিণয়,
তপস্বী সাধনা যোগ, এ মিলনে উপভোগ,
কেবল কার্যনা-শূন্য কৈবল্য ভঙ্গ !
নহে মোক্ষ নহে স্বর্গ, ধর্ম অর্থ চতুর্ভুজ,
শুধু পূজা শুধু অর্থ ধ্যানে আত্ম লয়,
ঐক্য হিন্দু বিরা কেবল আত্ম হিঁসার,
‘সমুচ্ছিন্ন প্রজা-নেত্রে কাম ভঙ্গ হয় !
যোগ সনাতন স্তুতি ধরি, মিলে তাহে হরগৌরী
আমিও সে কথা স্মরি শুভ হিমালয় !
বিবাহ প্রণয় নহে—কৈবল্য ভঙ্গ !

বিবাহ প্রণয় নহে, পুত্র প্রয়োজন ;
পুত্রও পিতের জন্ত, উদ্দেশ্য নাহিক অস্ত,
স্বজাতি স্বগোত্র বংশ রক্ষার কারণ !
যখন অহর দলে, পরাজিয়ে পশু বলে
লইল অমর রাজ্য রাজ-সিংহাসন—
দেবতার উপবাস। দেবের মুখের গ্রাস—
দেবতার অর পিত্ত করিল লুণ্ঠন,—
দেবের নরকে গতি, কি দুর্গতি ! কি দুর্গতি !
অমরের অপমৃত্যু—কি অধঃপতন !

(ভখন)

দেবের উদ্ধার তরে পরিণয় উমা-হরে,
জাতি গোত্র বংশ পিত্ত রক্ষা প্রয়োজন—
কুমারের জন্য তাই, অপর উদ্দেশ্য নাই,
তোমরা দাম্পত্য তাহা রাখিও স্মরণ,
ভগবান্ পূরিবেন আশা আকিঞ্চন !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

—

(২)

ঐ বিবাহের আশীর্ব্বাদ।

“জগতের যত হাসি, জগতের যত সুখ
হোক তোমাদের হোক” সকলে ছুটিয়া মুখ
বলিল যখন, সেই পূর্ণ সভা-গৃহ-তলে
“সুখে যেন থাকিরোনা,” আমি উঠিলাম বলে !
অভিশাপ মনে করি, শিহরি’ চাহিল সবে
অবজ্ঞার বার বার, মোর সেই কণ্ঠ রবে।
উপহার, আশ পাই, আনে নাই শুভ দিনে—
তার পরে অভিশাপ ? মিলি জন দুই তিনে
আমারে টানিয়া ল’য়ে উত্তম মধ্যম কিছু
দিতে প্রায় অগ্রসর, এমন সময় পিছু
দাঁড়াইল একজন, নাহি ভুল, নাহি ভুল—
প্রাণীকৃত আনন তাঁর, নেত্র অশ্রু-সমাকুল !
ভিকি অর্থ বুঝিলেন, শুনিলেন মোর বাণী,
পৌরজন তাই দেখি অরুণ্ডিল কাণাকণি।

শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ বসু।

(৩)

খুশীয়া সাধনা,

খেলা খরে নিতি নিতি মিছে গৃহস্থালী
অনেক করিলি মাগো, সাধ কি মিটেনা !
কুলা কৃষা নাহি জ্ঞান, ধূলা সারা গায়,
করিছ এ ছুটাছুটি ভাল গিরিপনা ।

এস মাগো এস এবে সমাপ্ত এলীলা—
কত ধূলা অঙ্গে আছা লেগেছে তোমার !
গৃহস্থালী সাধ তোর পূরাব গো আজি,—
পাবে মাগো কাজ কর্ম সত্য ঘর ঘর ।

• নারী জীবনের পথে স্বর্ণ তোরণ
খুলিয়াছে, ওই তোমা করিছে আহ্বান ।
ওরি পরে হবে তব স্থব-বাস-ভূমি,
প্রণয়ের ওই চির রম্য লীলা-স্থান ।

কুসুম ভূষণে সাজি নেহার দাঁড়িয়ে
তোরণ দুয়ারে ওই দেখ চাহি তায় !
জীবন-পথের তিনি চির সাথী তোর,
মিলিবেন তোমাসনে চির একতায় ॥

মিলন-সঙ্গীত ওই উঠিল বাজিয়া,
দাঁড়াও তাঁহার পাশে ধর ওই কর ।
শিখাবেন তোমা কত জ্ঞান ধন কথ্য
সাথে সাথে রহি তব চির সহচর ॥

যেকপ খেলার ধব ছাড়ি সত্য ঘরে,
নব প্রমে গাঁথা দুটি জীবন্ত প্রহর,
পশিলে, আসিয়া সেই পথ অমূল্যেরে
প্রেমময় পদে প্রেম করিবে অর্পণ ।

(বাবা) অগ্রসরে অগ্রসর দেখিবে যখন,
ছায়ার মতন তার সাথে সাথে থাকি,
(মা) সাধনা করিবে দিগে আবাস বচন
দেখে চিরদিন জেন যোগা স্থখে থাকি ।

কত যদি মুক্তা ভূমি পাবে উপহার,
ভিখারী কোথায় তাহা খুঁজি পাইবে,
ধর আশীর্বাদ ও ধূপান্ত ও দুর্কার,
বন মাঝে আনায়াসে তাহা পাওয়া বাবে ।

সদ্য মাতৃহারা আমি খুঁজিয়ে বেড়াই,
কোথা গোলে মা ও ছেণের হইবে মিলন,
“আনন্দ-আশ্রমে” আজি দেখিবারে পাই ;
কে মা তোর ? সাধনাই প্রেমের পূরণ ।

যাও মা বাসর ঘরে লগে বিশ্রাম,
বিষময় সন্তানের মাতৃরূপ ধরি,
গভে থেকে অভিমুখ্য বাহের নির্গম
শিখেছিল, সেইরূপ শিক্ষা দাও করি ।

সীমাবদ্ধ একটুকু সংসার সেখিয়া—
বিধ সংসারের কথা মনে যেন ভর,
সকলের পতি যিনি তাঁহাকে অন্নিয়া—
অসাম সংসার যেন সোণা হয়ে যায় ।

আপনি না খেয়ে ক্ষুধাতুর অন্ন দান,—
আছে তব পিতৃ-ধর্ম করিও গ্রহণ,
সে ধর্ম তোমার অংশ আছে বিভ্রমণ,
অরি সুখে, দুঃখে, ব্রত করিও পালন ।

সংযম শিক্ষার সেই আদর্শ দেবতা,
ভীষণ দুঃখ সহ সংগ্রাম করিতে,
অভাস্ত সে দেব, দেখে অন্নহীন ভ্রাতা
আপনি গলিয়া পরে পরের দুঃখেতে ॥

তোমরা তাঁহার পথ ধরিয়া ধরিয়া,
যদি কাটাইতে পার জীবন-সংগ্রামে ;
স্বখী হব চির দিন তোদের দেখিয়া—
এই আশীর্বাদ অরি পরমেশ্বরের ।
শ্রীমদোষোহন দাসগুপ্ত ।

(৪)

সাস্থনা ।

আঁখি মুছে, দেখ চাহি',—

মহিমার সীমা নাহি

এঁহি বিশ্ব তলে !

ক্ষুদ্র গণ্ডী চিন্তা তুলি'

দেখো ভাবি' নেত্র তুলি'—

কি শাস্তিতে চলে

এ নিখিল চরাচর !

কি বিশ্বর মনোহর

জাগেরে এখন—

সর্দীর্ণতা বিশ্বরিয়া,

করি যবে আত্মা দিয়া

বিরাট দর্শন !

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী ।

(৫)

সাস্থনা !

সঞ্চিত কদম্ব-কুঞ্জে—

মধুর সুরভি রাশি,

কল্যাণী, আনন্দময়ী,

চির মুহু মধু হাসি ;

লয়ে যাও আজি, প্রিয়,

তব আনন্দ ভবনে,

করিতে জীবন দান

নব-সুপ্তি-জাগরণে ।

হেথা আঁখি ছল, ছল,

সেখা আবাহন গীতি

রচিছে অগত নব

লইরে তোমারি স্রীতি ।

নারীন্ত সে গৃহ, বোন !

আকাঙ্ক্ষিত, চিরপ্রিয়,

আপনারে তুল্য করি

সেবাক্রত করে নিয়ো ।

আর্জেরে সাস্থনা বল,

ক্ষুধিতেরে অন্নদান

দিতে যদি পার, তবে

ধন্ত হবে মন প্রাণ ।

যে শিক্ষা পেয়েছে, ভগ্নি,

পুত্র পিতৃ পরিবারে ।

যতনে স্থাপিও তাহা

তব নূতন সংসারে ।

দীনে দয়া, স্বার্থে বলি,

নারী ধর্ম পতি-ব্রত

স্বপ্নের সোপান, বোন,

তুমি অরিও নিয়ত ।

তোমার সরলা দিদি ।

ঐ বিবাহের সঙ্গীত ।

সাহানা—স্বাপতাল ।

অনন্তের অন্তঃপুরে উঠিছে গভীর অর,

মিলে বাও, লয় হও, খেকনা খেকনা দূর

কে কোথায় আছ বিন্দু, ওই গুন ডাকে সিদ্ধ,

পুরাও সৃষ্টির লক্ষ্য, দেখ প্রেম কি মধুর ।

কত আর রাখ ধরে, আপনাতে আপনারে ?

তুমি ত তোমার নও, তুমি যে সে অনন্তের ;

সে হুবে বিভোর হয়ে, আছে বিশ্ব হারাইয়ে,

(এস) ডুবিয়া হারিয়ে বাই মহা প্রেমে সে সিদ্ধুর ।

(২)

সিদ্ধ—ফাগুয়ালি ।

সাজারে প্রেমের ডালি জগত এসেছে বারে,

সাধ তার প্রাণে ধরে, বরণ করে তোমারে ।

তুমি হে প্রেমের সিদ্ধ, মিলনের মধ্যবিন্দু,

তোমাতে না প্রাণ মিলে, প্রাণ কি বাঁচিতে পারে ।

(ঐ) প্রেম-দৃষ্টি বধূ তব, স্বর্ণ-স্রষ্ট তথা নব ;

মর্ত্যকে করিতে স্বর্ণ বাচ প্রেম বারে বারে

হুটি মন-ব্রত-ধারী ওই প্রেমের তিথারী ;

বাও দীক্ষা মহামন্ত্রে পরশিয়া ছলনারে

(৩)

বেহাগ—একতাল।

থাক্ বাঁধা থাক্। (এরা)

জীবনে জীবনে, তোমারি চরণে,

(চির) মুগ্ধ, বিহ্বল, অবাঁক ।

নুতন করহে ছুটির নয়ন,

নুতন কর হে নিখিল ভবন,

অসীম ও প্রেম-রহস্য মাঝারে

ছইটি হৃদয় ডুবিয়া যাক ।

যে রূপে ভুলালে অগতের প্রাণ,

বার তরে ভবে এত আশ্রয়ান ;

(এরা) সে রূপ মাধুরী প্রাণে প্রাণে হেরি

মিত্য নব স্বর্গ দেখিতে পা'ক ;

মধুর মধুর হৃদয় জীবন,

মধুর মধুর এ প্রেম-বন্ধন ;

হ'রে মধুর ছইটি হৃদয়

আপনা হারারে তোমাতে মিলাবে ।

(৫)

স্বিস্টিট—একতাল।

প্রসন্নময়ী জননি, শুন শুন প্রার্থনা ।

পূরাও প্রেমের ব্রত, কর সিদ্ধ সাধনা ।

তোমারি ছুটি হৃদয় হ'ক বহা প্রেমের লব্ধি ;

আর যেন নাহি রয় "আমি আমি" ভাবনা ।

যে প্রেম জানে না ভেদ, জানে না স্বার্থ বিচ্ছেদ,

হউক ছুটি জীবন সে প্রেমের আরাধনা ।

হও মা প্রসন্ন হও, ছুরে এক হ'রে রও ;

চরণে প্রণত, মাগো, সুপ্রসন্ন সাধনা ।

ঈকালীনাম ধোষ ।

(৬)

বেহাগ—কাওয়ালি ।

গাও রে শুভ দিনে শুভকরে ।

পরম পুরুষ পরমেশ্বরে ।

চিদানন্দ-বন মোহন মূর্তি

নিরখি বৈরাগ্য নয়ন করে,

আনন্দ-সাগর উথলে হৃদে,

তৃপ্তি মন প্রাণ শীতল করে ।

গাও বদন ভরি যজ্ঞেশ্বর হরি,

সিদ্ধিদাতা সেই মহলাকরে রে ;

জীবন সকল করয়ে মানস,

গাও যতনে তাঁরে প্রেম তরে ।

ঈশ্বাকুমার বন্দোপাধ্যায় ।

রামায়ণে বিশ্বামিত্র ।

বাহার বিশ্বাসী ভেদ অদৃষ্টকারের বোর
আবর্তের মধ্যে পুরুষকারের বৈজয়ন্তী পতাকা
উজ্জীন করতঃ এক অতৃপ্ত দৃষ্টে প্রাচীন
সংস্কৃত সাহিত্য অলঙ্কৃত করিয়াছে, বাহার
কল্পোচিত ও অসম্ভব ব্রাহ্মণোচিত সৌম্যতার
সহিত সখ্যমুখে আবদ্ধ হইয়া আধ্যাত্মিক
প্রহে অপূর্ণ প্রয়াস সক্ষম ঘটাইয়াছে, বাঙ্গালীর
বড় কবি সেই তপঃপ্রভাবপূর্ণ জিকালননী
ব্রাহ্মণকে কি অপকল্প পদার্থে পরিণত করিয়া-

ছেন, কিরূপ নিসর্গের উচ্চতর হইতে অবতীর্ণ
বিকতার আবর্জনারূপ তরুে অবনমিত
করিয়া পৌরাণিকতাগ্রস্ত বাঙ্গালীর মনস্তাট
বিধানের প্রয়াস পাইরাছেন, তাহা ভাবিলে
বিশ্বরাগ হইতে হয় ।

বিশ্বামিত্র বা বশিষ্ঠ ব্যক্তি বিশেষের জন্ম
কি পরিবার বিশেষের উপাধি, বেদজ্ঞ প্রবৃত্ত
বিৎপন্ন তাঁহার বিচার করিবেন । ঐতিহ্যের
বৈচিত্র্য উপাধ্যানে কতটুকু ঐতিহাসিক

সত্যনিহিত আছে, তাহাও আমাদের অগোচর নহে। আমরা অমর কবি বাম্পীকির নিকট এই তেজস্বী কবির যে চিত্রটী উপহার পাইয়াছি, তাহা গৃহে আনিয়া কতদূর পরিকৃত ও অবিকৃত রাখিতে পারিয়াছি, তাহাই একবার দেখিব।

যজ্ঞ-রক্ষার জন্ত রামচন্দ্রকে রাক্ষসবধের উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া বিশ্বামিত্র তাঁহাকে সঙ্গে লইবার জন্ত অযোধ্যাপুরীতে পদার্পণ করেন। এই উপলক্ষেই রামায়ণে বিশ্বামিত্রের সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। বাম্পীকির দশরথ এই “পদার্পণ” স্তম্ভাস্তকরণে মূনির প্রত্যাগমন করতঃ নানা শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন এবং তাঁহার অভিলষিত কার্য্য করিয়া কৃতার্থ হইবার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলেন। কৃতিবাসের দশরথ বিশ্বামিত্রের নাম শুনিবামাত্র সন্নিধি ও চিহ্নিত ; শিষ্টাচার ও চাটুধাকোর অভাব হইল না। কিন্তু অন্তঃকরণে ভাব রহিল “এ বালাই না আসিলেই ভাল হইত।” বিশ্বামিত্র যথাসময়ে রামায়ণ বিনাশের জন্ত রামচন্দ্রকে চাহিয়া গেলেন। দশরথ অবশ্যই বিকটাকার পত্রাক্রান্ত রাক্ষসদিগের সম্মুখে কিশোরবয়স্ক শ্রীমন্তম পুত্রকে প্রেরণ করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু বাম্পীকির দশরথ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া সরল ভাবে আপনার আপত্তি জানাইলেন এবং মূনি কিছুতেই পশ্চাৎপদ না হইলে স্বয়ং সৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিয়া যুতাকে আলিঙ্গন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বাম্পীকির বিশ্বামিত্র অভিপ্রায় জুড় হইলেন, রাজাকে প্রতিজ্ঞা লক্ষ্যরূপে পরিভাষণের সুরণ করাইয়া দিলেন এবং প্রতিজ্ঞাচ্যুত দশরথকে অযোধ্যার রাধিরাবস্থানে প্রস্থান করিবেন বলিয়া ভর প্রদর্শন করিলেন। তখন যথার্থ বর্ণিত দশর-

থকে প্রতিজ্ঞাচ্যুতির অবৈধতা এবং বিশ্বামিত্রের আশ্রয়ে রামচন্দ্রের নিরাপদতা প্রদর্শন করতঃ দশরথের সম্মতি জন্মাইলেন। রাজা রাম ও লক্ষ্মণকে প্রফুল্লমুখে আহ্বান করতঃ বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কৃতিবাসের বিশ্বামিত্র বাক্যবীর ও অভিশাপ প্রদানে কিপ্রহস্ত। তিনি দশরথের -রামচন্দ্রকে প্রেরণে অনিচ্ছাদর্শনে কেবল জুড় হইলেন না, সূর্য্যবংশ বিনাশ করিবার ভয় দেখাইলেন। দশরথ অগত্যা চাতুরীর আশ্রয় লইলেন, রাম ও লক্ষ্মণকে না পাঠাইয়া ভরত ও শত্রুঘ্নকে পাঠাইলেন। পাঠক দেখিবেন, দেশীয় চরিত্রের নীচতা কেবল মেকলের ইতিহাসেই বর্ণিত হয় নাই। বাহা হউক, কৃতিবাসের বিশ্বামিত্র কৃতান্তর বাইতে বাইতে এ চাতুরী ভেদ করিলেন। তখন বিষমকাণ্ড বাবিল। বিশ্বামিত্র ফিরিলেন, তাঁহার নেত্র হইতে অশ্রুগুটি হইতে লাগিল, অযোধ্যাবাসী শ্রমজর বর দ্বার সেই অশ্রিতে দগ্ধ হইতে লাগিল। প্রজারা রামচন্দ্রের শরণাগত হইল, ভক্তবৎসল রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের চরণে ধরিয়া মিনতি করিলেন, মূনি প্রসন্ন হইলেন, এবার অযোধ্যাপুরীর দিকে অমৃত নরনে চাহিলেন, অযোধ্যাপুরী যেমন ছিল, আবার তেমন হইল। ‘যাকালীর কাব্যে ইহার পর ক্রন্দনের পালা উপযুক্তরূপে অভিনীত হইয়াছে। সংকৃত কাব্যের এ অভাবটী কৃতিবাস সূদনমত পূরণ করিয়া লইয়াছেন।

তাহি ও লক্ষ্মণ মূনির সঙ্গে চলিতে লাগিলেন, ক্রমে তাঁড়কা রাক্ষসীর বন আসিল। বাম্পীকির বিশ্বামিত্র বালক-রামচন্দ্রকে তাঁড়কা বনে উদ্ভিজ্জিত করিলেন, একপক্ষেই জীবনে

দোষ নাই, উপদেশ ও মহাজনগণের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিলেন । কৃতিবাসের বিশ্বামিত্র, যিনি কিঞ্চিৎ পূর্বে নেত্রাঘ্নি দ্বারা অযোধ্যাপুরী ভ্রাস্তৃত করিতেছিলেন, তাড়কার নামে একেবারে কম্পিত-কলেবর । বালক রামচন্দ্র তাঁহাকে বুঝাইলেন, রাক্ষসী খাইতে আসিলে তাহাকে মারিতে দোষ নাই, স্পর্ধা করিয়া বলিলেন, রাক্ষসীকে মারিতে তৃতীয় বাণ নিষেধ করিবেন না । কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না । যখন তাড়কা রামচন্দ্রের প্রতি গর্জন করিতে করিতে ধাবমান, তখন বায়ীকির বিশ্বামিত্র হকার করতঃ তাহাকে ভৎসনা এবং রাম ও লক্ষ্মণকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন ; আর কৃতিবাসের বিশ্বামিত্র ?

“উভয় ভ্রাতার মধ্যে থাকি মূনিবর,
দূর হৈতে দেখা গেল তাড়কার ঘর ॥
কর বাড়াইয়া তার ঘর দেখাইয়া ।
অতি দ্রাসে মূনিরাজ গেল পলাইয়া ॥
ত্রীরাম বলেন ভাই মূনির সহিত ।
দীর্ঘ বাহ শুক একা যান অন্তর্গত ॥”

তাড়কা মরивার সময়ে যে বিকট শব্দ করিল, তাহাতে কৃতিবাসের

“বিশ্বামিত্র মূনির হইল হতজ্ঞান ।”

জীবিতাবস্থায় তাড়কাকে দেখিতে মূনির সাহসে কুলাইরাছিল না, তিনি তাড়কার মৃত দেহ দেখিতে গেলেন, কিন্তু তখনও

“মরেছে তাড়কা তবু মূনি কম্পমান ।

বায়ীকির বিশ্বামিত্র তাড়কাবধে সন্তুষ্ট হইয়া স্বাচরিত্রকে বিবিধ অস্ত্র প্রদান করিলেন, তাঁহার সামরিক বল বৃদ্ধি করিয়া দিলেন ।

যখন ভারত পৃথিবী গৌরবস্থ ছিল, তখন ব্রাহ্মণেরা কেবল দেবপুত্র ছিলেন না, বরং যারও শিক্ষা-ওক ছিলেন, কেবল

শাস্ত্রশিক্ষা নহে, কতিয়ক শাস্ত্রশিক্ষা প্রদানও তাঁহাদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল ।

যে কবির প্রথম জীবন সমরক্ষেত্রের বিভীষিকাভূচ্ছ করিতে অভ্যস্ত হইরাছিল, যিনি পুরুষকার বুদ্ধির দুর্দমনীয় আকাজকার রাজ সম্পদ তুচ্ছ করিয়া অরণ্যের দুর্গম প্রদেশে তপোবলে সৃষ্টিকর্তার সহিত পর্যায় প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করিতে উত্তত হইরাছিলেন বলিয়া উক্ত হইরাছেন, তাঁহার জ্ঞান শত্রু শিকার উপযুক্ত শুক কে ?

কৈবর্তের নোকা যে সুবর্ণে পরিাত হইল, এ কাঁহনীটা বায়ীকির রামায়ণে পাই না । কৃতিবাসের কৈবর্ত পাষণ-ক্লিণী অহল্যার মানবী হইবার কথা শুনিরাছিল ; সে পোস্ত বুদ্ধির ও গৃহিণীর গালাগালির ভরে নোকা খানি লইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিবার উদ্যোগ করিল । কিন্তু বাঙ্গালী কবির বিশ্বামিত্র এক্ষণ স্থলে সম্বল লুপ্ত নহেন ।

“কৈবর্তকে ডাকিয়া বলেন তপোধন ।

না আসিলে তবু আমি করিব এখন ॥”

তাড়কাকে ভয় করিতে না পারিলেও কৈবর্তকে ভয় করার স্পর্ধাটা বাঙ্গালী চরিত্রেরই অনুরূপ, জনকরাজার পুরোহিত রাম লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের পূর্ব বৃত্তান্ত বিবৃত করিবার সময়ে আমরা যে সাহস, যে তেজ, যে অধাবসার এবং যে সচেতনতার পরিচয় পাই, পৌরাণিকতা ও অগৌণিকতার আবরণ উন্মুক্ত করিলে তাহাতে ভারতের এক গোবৎসর যুগেরই প্রতিবিম্ব উদ্ভাসিত হয় । বাঙ্গালী কবির বিশ্বামিত্র চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করিয়া কোথাও আমরা বায়ীকির এই বিশ্বামিত্রকে খুঁজিয়া পাই না । তাহার পরিকল্পে পাই, একটা কৌণীন টিলকধারী বায়ীকির কৌণীন কৌণীন কোণীন-কৌণীন

কণ্ঠস্থ করিয়া পুরোহিত । যখন জাতীর
চরিত্র অবনত হয়, তখন পুণ্যনীর পূর্বপুরুষ
বা দেবভারতী নিকৃতি পান না । দোষ ঠিক

কৃতিবাসের নহে; সুসংযম প্রামাণ্যের পৌরা-
ণিকতা-পরিপ্লুত দেশের ।

শ্রীবিবেকানন্দ তত্ত্বাচাৰ্য্য ।

নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা ও বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

ভানুমতী ও প্রবাসের পত্র ।

ভানুমতী ।

আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, ঐহার
সুন্দর কবিতা লেখেন, তাঁহার ভাল গল্প
লিখিতে পারেন না । উদাহরণ স্থলে বাঙ্গালার
প্রধান চই কবির নাম উল্লেখ করা যাইতে
পারে ; কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । ইঁহার উভয়েই
কবিতা রচনার সিদ্ধান্ত ও প্রথিতবশাঃ,
কিন্তু গল্প লিখিতে বাইরা কেহই কৃতকার্য
হন নাই । তাঁহার যে গল্প লিখিয়াছেন,
তাহা চন্দ্রিমা হৃদয়ের কালিমা । উহা না
লিখিলেই যেন ভাল হইত । নবীন বাবুর
বৈদ্যর আমরা ইহার অন্ততর ভাব দেখিতে
পাই । নবীন বাবুর ভানুমতী, পদ্ম গল্প
মিশ্রিত পুস্তক । পদ্ম ভাগের পরিচয় দেওয়া
তত আবশ্যক মনে করি না । কারণ কোকি-
লের স্বপ্নের পরিচয় দেওয়া বুঝা চেষ্টা ।
ইহার গভীরতা প্রোজল ও মধুর, কেমন যেন
তর তর ভাবে হৃদয়-তন্ত্রী সহ ইহা এক সুখে
চমকিয়া যায় । উদাহরণ স্বরূপ আমরা ভানু-
মতীর প্রথম হইতেই কয়েক পংক্তি তুলিয়া
পাঠকদের উপহার দিলাম :—

“সুখংকলি । প্রকৃতির লীলাভূমি চট-
প্রাণের দক্ষিণাঙ্গল প্রাণঃস্বরের বৃহল
কিরণে হাসিতেছিল; পক্ষিদের অবশ্য কান্নার

লীলাশালি, পূর্বে বৃক্ষপল্লব-সমাক্ষর ভ্রামল
পর্কত-মালা । উভয়ের মধ্যে নাতিবিঘ্নত
দীর্ঘায়ত হরিৎ শস্তক্ষেত্র-খচিত তটভূমি ।
তাঁহার স্থানে স্থানে নিবিড় তরু কানন
শোভিত, ছুরা, বড় ঘোলা, বড় বাকিয়া,
পেকুরা প্রভৃতি গ্রাম্যবলীর বর্ষা-বিধৌত ভ্রাম-
কান্তি । উত্তরে বর্ষার পর্কত প্রবাহে পূর্ণ-
কলেবর শঙ্খনদের ও দক্ষিণে মাতামুহুরী
নদীর বিশাল রক্ত-ধারা । বাল সূর্যের
তরল অবর্ণকর-মণ্ডিত হইয়া এই দৃশ্যবলী
যে অপূর্ণ শোভা ধারণ করিয়াছিল, তাহা
কবির বর্ণনাতীত”

অনেকে বলেন, ভানুমতী চরিত্র কিছু অতি-
রঞ্জিত; কিন্তু অসুশীলন প্রভাবে মানবের সমস্ত
ইন্দ্রিয় ও বৃত্তির ক্ষুণ্ণ হয় । তখন তাহার
এমন সকল কার্য্য করিতে সমর্থ হয় যে, সাধা-
রণ লোকে তাহাকে অতিপ্রাকৃত মনে
করিতে পারে । সেই জন্যই আমরা পূর্ব-
কালীন অনেক ঘটনাকে অতিপ্রাকৃত মনে
কুটিল কটাক্ষে অবলোকন করিয়া থাকি ।
আবার পাশ্চাত্য ব্যক্তিদের সেই প্রকার
কার্য্য দেখিয়া অনেক সময় তাহাদের প্রশংসা
করিতে থাকি । অসুশীলন প্রভাবে সমস্ত
যায়া অনতিদীর্ঘ সাগর শাখা অতিক্রম করা
একেবারে অসম্ভবিক নহে ।

তিনি প্রকৃত জৈব-বিখ্যাসী, তিনি প্রকৃতির
জিহ্বা জিহ্বা সহিত ভগবানের বা ভগব-
তীর বিভিন্ন বৃত্তি বর্ণন করেন । সেই জন্যই
সেই কিশোরী শাভ, বিবক, গজদাঁড়

উদার কণ্ঠে বিধিওল কি এক গাঁভীর্ঘ্যে পূর্ণ
করিয়া গাইতেছে ;—

হুই করে লর, হুই বরাস্তর,
লর বিনা সৃষ্টি-হিতি নাহি হয়,
সম্মা শিব উচ্ছ্রাব,
সেব ধ্বংস-মূলে হির আপনি ।

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রকৃত ঈশ্বর-ভক্ত প্রতি
কার্য্যেই কেবল ভগবানের খেলা অবলোকন
করেন। তাহা একস্থল হইতে দেখাই-
তেছি :—

“এক ঘটনা। শ্রীভগবানের মূর্তি দর্শ-
নের জন্ত ভক্তিতে অধীরা হইয়া যদি একটা
কিশোরী একপ ভাবে একজন অজ্ঞাত পুরু-
ষের গলার পড়িতে পারে, তবে ব্রজকিশো-
রীরা অদ্ভুতকথা ও দৈবশক্তি-সম্পন্ন শ্রীকৃ-
ষ্ণকে পাহারা সেই সজল-জলদ-বিন্দু কান্তি
ভগুরান শ্রীকৃষ্ণকে রাসের শেষে ভক্তিতে,
ভক্তির চরম প্রেমে অধীর হইয়া তাঁহার
শ্রীমঙ্গ আলিঙ্গন করিবে, তাঁহার মুখ চুষন
করিবে, তাহাতে নিন্দার বিষয় কি ?”

অন্ততঃ :—

“তখন আমার মনে হইল যে, একটা মূর্খ
কিশোর সন্ন্যাসীকে লইয়া যখন হাঁহারা একপ
করিতেছে, তখন স্বয়ং ভগবান নবীন কিশোর
শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলে হাঁহারা কি করিবে ?”
। “ভানুমতী গ্রন্থে ভানুমতী ও অনাদিনাথ
হুইটা অল্পম চিত্র বা গীতৌক্ত ধর্মের সাকার
প্রতিমূর্তি। যিনি একপ আলেখ্য সমুখে
ধরিতে পারেন, তাঁহার শক্তি ও কবিত্ব কতদূর,
তাহা চিত্তার বিষয় বটে ।

প্রবাসের পজ ।

করিবর ভারতের নানাহানে ভ্রমণ সময়ে
বে সকল স্থানে গমন করিয়াছিলেন, সেই
সেই স্থলের স্থল স্থল বৃত্তান্ত তাঁহার পত্রীয়
নিকট পত্রাকারে লিখিয়াছিলেন। তাহাই
প্রবাসের পজ আখ্যায় একাধিত হইয়াছে ।

ইংরাজীতে বহমানি Cowper সাহেবের পুত্র-
গুলি ছাত্রদের পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া
থাকে। আমাদের মতে নবীন বাবুর পুত্র-
গুলিও আমাদের ছাত্রদের স্থল-পাঠ্যরূপে
ব্যবহৃত হইলে ছাত্রগণ একাধারে আনন্দের
সহিত সাহিত্য ও ইতিহাস শিক্ষা করিবার
সুযোগ প্রাপ্ত হয়। পত্রগুলি যেমন প্রাক্তন,
ভেদনি-তরল ও হৃদয়স্পর্শী। আখ্যায়বর্ত ও
দক্ষিণাপথের প্রধান ঐতিহাসিক স্থলগুলি
প্রায়ই তিনি দর্শন কবিয়াছেন এবং তাহাদের
অতীত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ
সকল স্থানের অবস্থার, বর্তমানের সহিত
অতীতের তুলনা করিয়া বাখিত জনদের যে
ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে
তাঁহার ব্রহ্মবাংসলোর পূর্ণ নিদর্শন প্রাপ্ত
হওয়া যায়। আচ্ছা, সেই চিত্তার, সেই পুনা,
সেই অমৃতসর কি ছিল, আর কি হইয়াছে ?

তাঁহার “ভারতরমণী চিত্র” বাস্তবিক
পড়িবার জিনিষ, এমন সরল ও স্বাভাবিক
ভাবে ভারত-ললনার বর্তমান অবস্থা বর্ণন
ইতঃপূর্বে বাঙ্গালার অন্ত কোন লেখকের
দ্বারা লিপিবদ্ধ হয় নাই। আমরা অহুরোধ
করি, কেহই এই প্রবন্ধটি পাঠের সুযোগ পরি-
ত্যাগ করিবেন না। কিন্তু এতদেশের রমণী-
রহ দেখিয়াও কবি বঙ্গ রমণীর মধুমাখা ভাব
ভুলিতে পারেন নাই। সেই জন্ত কবি
আবার ভাগীরথী তীরে উগ্রস্থিত হইয়াই
তাঁহার বন্ধ হেম বাবুর কণ্ঠে কণ্ঠ শিশাইরা
গাইয়া উঠিলেন :—

কে চার ষাইতে মধু বিনা বঙ্গ-হৃদয়ে ?

কোথা হেন শতদল,

বুকে করি পরিমল,

থাকে শত মধু চেরে মধুমাখা শরমে,

বঙ্গ-হৃদয়া বিকল মধু কোথা হৃদয়ে ?

আমরা এই পত্রগুলি পড়িয়া এমন মুগ্ধ হইয়াছি যে, ইহার কয়েকটা স্থল পাঠককে উপহার না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না :—

ভারতে যেমতি পুরাকালে হায় !
শোভিত আসর আলোক-মালায়,
যেমতি গাইত গীত গায়কায়,
পুরী যামনী সঙ্গীত সুধায়।
সেই নৃত্যগীত রয়েছে সকল,
কিন্তু কোথা গেল সেই বীণাবল ?”

সংসার-সমুদ্রে ডুবিয়া ত তাঁহার জ্ঞে
কোন পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারি নাই,
গোদাকরিতে ডুবিয়া কি পারিব ?

আবার :—

“বিংশতি কোটি নরাদ্যে আজ ভারত
মাতার বক্ষ গুরুভারে পীড়িত না করিয়া,
যদি এরূপ এতটি নারী, একটি দুর্গারতী
থাকিত, জননী কি দুর্গোৎসবই না হইত।
হায় ! হায় ! দুর্গাবতীর কি চিরদিনের জ্ঞে
বিজয়া হইল ! আবার কি তাহার বোধন
হইবে না ?”

অন্ততঃ :—

“যে প্যাস্ত রমণীর হাসিতে আলোকিত না
হইয়াছিল, জগৎ অরণ্য ছিল।” কথাটা বড়
গভীর। আমাদের বঙ্গসমাজ রমণীর হাসি
শূন্য, আমাদের জীবন তাই এত উৎসাহ-
হীন, এত আনন্দ-শূন্য।

পাঠক এ পর্য্যন্ত কোন কবিতা-লেখকের
করনিঃসৃত এমন গভীর ভাবপূর্ণ প্রাঞ্জল হৃদয়-
স্পর্শী গদ্য প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন কি ?
আমরা বলি, এবিষয়ে নবীন বাবু সমস্ত
বাংলা কবিতা-লেখকের শ্রেষ্ঠ স্থান অধি-
কার করিবার যোগ্য।

পঞ্চম অধ্যায়।

‘রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস।

একদা আমরা কবিত্ত ‘রৈবতক’ ‘কুরু-

ক্ষেত্র’ ও ‘প্রভাস’ এই কাব্য ত্রয়ের সমা-
লোচনার প্রবৃত্ত হইব। বাস্তবিক এই
তিন খানা একই মহাকাব্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ
মাত্র। রৈবতক ইহার আদি কাণ্ড, কুরু-
ক্ষেত্র ইহার মধ্য কাণ্ড ও প্রভাস ইহার উত্তর
কাণ্ড। সুতরাং এই তিনখানা গ্রন্থ আমরা
একখানা মনে করিয়াই সমালোচনার প্রবৃত্ত
হইলাম।

এই তিনখানা গ্রন্থ যখন প্রথম প্রকাশিত
হয়, তখন এক সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের ভিতর
হৈ চৈ পড়িয়া যায়। কেহ বলিলেন, আমা-
দের ধর্ম্ম গেল; কেহ বলিলেন, এত দিন
পর মহর্ষির মহাভাবত রসাতলে গেল; কেহ
বা এই মহাকাব্যকে “উনিংশ শতাব্দীর
নূতন মহাভারত” আখ্যা দিয়া অদ্ভুত সমা-
লোচনার এক প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া একদেশ-
দর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে
কবিলেন না যে, কবি বিচরণ-ক্ষেত্র অনন্ত।
কবির আদর্শ এই অনন্ত-বিস্তৃত বিশ্বমণ্ডল।
কবির উদার হৃদয় কখন ইতিহাসের গভীর
মধ্যে আবদ্ধ নহে। কবির চিত্ত কি এক
অদ্ভুত রাগে রঞ্জিত থাকে। তাহা সর্বদাই
সত্য, নূতন ও সর্গীয়তা-পরিপূর্ণ। এই সুধা
সম্প্রদায় বিশেষের জ্ঞাত নহে, ইহা সর্বকালে
সর্বলোকের উপভোগ্য ও অমৃত স্কারিণী।

মহাভারতের অংশ বিশেষ লইয়া এই
কাব্য ত্রয়ের সৃষ্টি। রৈবতকে স্ত্রীস্বয়ং-বিবাহ,
কুরুক্ষেত্রে শত্রুবি-বেষ্টিত অভিমুখ্য-বধ, আর
প্রভাসে যুদ্ধবংশের সেই অমাহুবি আত্মহত্যা
অবলম্বনে লিখিত। তিন কাব্যেই কবির
অদ্ভুত কবিত্ব ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় হজে
হজে প্রকটিত হইতেছে। কবির প্রত্যেক
চিত্ত অতি ভাবশ্রম ও কি বেন একটি অপারি-
ব্রহ্মে রঞ্জিত।

* পাঠক ভূমি, যদি একাধারে নিঃস্বার্থ ভালবাসা, অনন্ত প্রেম, *মানবাভীত বীরত্ব, অতুল শ্রুতিহিংসা, সর্বভূতে সমবেদনা ও কণ্ঠের অনন্ত প্রভাব ও অপরিহার্য ফল, অপার্থিব বিশ্বজনীন উপচিকিৎসা বৃত্তি ও মানবের সর্বাদীন উন্নতি বা দেবত্ব-প্রাপ্তি দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই কাব্যাত্রয় পাঠ করুন। তাহা হইলে, কখন বিষ্ময়ে অভিভূত, কখন শোকে দ্রবীভূত, কখন প্রতি-হিংসায় উত্তেজিত, কখন নিকাম ধর্মের পবিত্র অনন্ত উৎসের স্রুতি পানে মোহিত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই মহাকাব্যের নায়ক নায়িকার চিত্র-গুলির কতকগুলি পৌরাণিক, কতকগুলি কবির নূতন সৃষ্টি—শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, ভদ্রা, অভিন্নমুখা, উত্তরা, ব্যাস, তুর্কাসা, সাত্যকী, সত্যভামা, রুক্মিণী, বলবান, কর্ণ ও ভীষ্ম প্রভৃতি পৌরাণিক চিত্র। কারু ও বাহুকী পৌরাণিক চিত্র হইলেও কবির হস্তে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত। শৈল ও স্থলোচনা কবির নূতন সৃষ্টি। চরিত্র চিত্রনেই কবি কবিত্ব। এখন আমরা দেখিব, কবি এই সকল চরিত্র চিত্রনে কতদূর কৃৎসর্গ্য হইয়াছেন এবং তাহা হইলেই বুঝা যাইবে, বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে কবির আগুন কোথায় স্থাপিত হইবার যোগ্য। *

আমরা প্রায় অধিকাংশ শাস্ত্র গ্রন্থতেই শ্রীকৃষ্ণের লীলা, শ্রীকৃষ্ণের কার্য ও শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব দেখিতে পাই। সকল গ্রন্থতেই শ্রীকৃষ্ণ এক বাক্যে ভগবানের অবতার, কিন্তু অনেক স্থলেই শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র আবিলতার পূর্ণ, সেই আবিলতার সেই বিশ্বপুণ্য শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে নানা কৃত্তিকার কার্য আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু কবি কেমন বাতাবিক ভাবে সেই স্মাতি-

লতার বন জাল বিদ্রুিত করিয়া বীরে বীরে শ্রীকৃষ্ণের কেমন বাতাবিক দেব ভাব প্রকটিত করিয়াছেন। তাহার এই কাব্যাত্রয় মধ্যে এমন একটা কথা নাই, যাহাতে দেবত্ব বিষয়ে সন্দেহ উদ্ভূত পারে। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত কার্যই জগতের হিতার্থ নিয়োজিত। * তিনি দেখিলেন, ভারতের রাজগণ পরস্পর পরস্পরের হিংসায় পরিপূর্ণ। ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। অধাৰ্মিক অহঙ্কারী ক্রিয় রাজগণ নিয়ত কেবল পরস্পর আশ্রয় কলতে নিমগ্ন। নিকাম ধর্ম ভারত হঠতে অন্তর্দীন প্রাপ্ত হইয়াছে। সকাম ধর্মের লীলা খেলি সর্বত্র প্রবল বেগে চলিতেছে। আড়ম্বরপূর্ণ ষাগ যজ্ঞে কেবল পশু হিংসার শ্রোত প্রবাহিত। তাই তিনি বেদবাস ও অর্জুনের দ্বারা এই তর্নীর অবসান সাধন করিতে নিযুক্ত। ভারতকে এক ধর্ম বাজোর শীতল ছায়ায় আশ্রয় দান করিয়া অমূল্য নিকাম ধর্মের বীজ উল্লুপ্ত করাই তাহার এক মাত্র উদ্দেশ্য। সেই সময়ের ধর্মের আবিলতা জড় উপাসনার প্রাবল্য দৃষ্টে কবি শ্রীকৃষ্ণ মুখে অর্জুনকে শুনাইতেছেন :—

“মানব চেহনা হুক্ত, বিবেকী, স্বাধীন,
জড় ওই স্বর্গ হ’তে কত প্রেষ্ঠতর !
মানব ! উৎকৃষ্ট সৃষ্ট। যে অনন্ত তানে
সৃজিত, চালিত এই বিশ্ব চরাচর,
পড়েছে সে জ্ঞান ছায়া জ্বরে বাঁহা
ছাড়ি সে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি,
সে কেন পুজিবে অন্ধ জড় প্রতাকর !”

আবার ভারতে অবস্থা দেখিয়া ভগবানের জ্বর ক্রুরপ উবেলিত হইয়াছে, তাহা কবি স্মরণ ভাবে প্রকটিত করিয়াছেন—

“তধু হস্তিনায় নহে। এই হিংসা-বিষ
সমস্ত ভারত বর্ষে, মগধে চেবিতে

হইতেছে বিধ্বস্ত। প্রত্যেক নৃপতি,
কুধার্ত শাক্য মত, রহেছে চাহিয়া
মিজ প্রতিবাসী পানে। ভাবিছে স্বরূপ
বজ্র লক্ষে পৃষ্ঠে তার পড়িবে কেমনে।”

তাহার পর ঘটনাখ এই মহা আত্মরিক
ভাবের পতন সবন্ধে বলিতেছেন :—

জননী ভারত !

শক্তি স্বরূপিনী তুমি, শক্তি-প্রসবিনী।

ব্যাসের অনন্ত জ্ঞান, ভূমি অর্জুনের,

তোমার সেবার মাতঃ ! হলে নিরোজিত

কোন কার্য নাহি পারে হইতে সাধিত।”

শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার, তাই কবি
তাঁহাকে মানবের অত্যন্ত জিহাংসা-বর্জিত
ও মানবের আদর্শ স্বরূপ চিত্রিত করিয়াছেন।
যখন বাহুবলী ভক্তার হরণার্থ উত্তোপ করিয়া
ব্যর্থমনোরথে কিরিয়া বার্ন, সেই সময় কেশব
তাহার এই অত্যাচার কাহিনী মানবাতীত
ভাবে বলিতেছেন :—

চিনিয়াছি আমি দহ্যের নারকে,

তার অপরাধ কমিব শউ।

নিজ ভয়ীকে অপহরণ করিতে আইসে,
এখন দহ্যকেও বিনি সামর্থ্য ও শক্তিসঙ্গেও
ক্ষমা করিতে পারেন, তিনি দেবতা নয় তবে
দেবতা কে ? শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ধর্ম সবন্ধে
বলিতেছেন :—

নহে পূর্ণ ধর্ম, যদি না হয় নিকাশ,

বাণ, বজ্র, ব্রত, ধর্ম জ্ঞানের গোপান।

পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন,

অসূর্ণ-বাসব মন,

অসূর্ণ সূর্যের জ্ঞান, অস্তে অনন্তের,—

হৃদয় তপতা সাধ্য।

গীতার ভগবান যে ধর্মের প্রচার করিয়া-
ছেন, যদি তাহারই কবিভাষ্যে গাঁধিরা
আমাদের উপদেশ দিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের

দেবদ, শ্রীকৃষ্ণের দেবোপম নৃত্য কবি বহু
স্থানেই সুন্দর ভাবে প্রকটিত করিয়াছেন।
কোন স্থানেই আমরা শ্রীকৃষ্ণের দেবত্বের
অপলাপ দেখিতে পাই নাই। শরশয্যাশায়ী
শ্রীকৃষ্ণের ভগবৎগীতার প্রশংসার বধন ব্যাস
বলিলেন :—

আমি মাত্র মালাকর। জ্ঞানের উত্তানে

ফুটিয়াছে গোবিন্দের যে ফুল নিচর

গাঁধিরাহি গীতাহার, তুলি সেই ফুল—

চির সুবাসিও, পুণ্য—পরিমলময়।

অমনি শ্রীকৃষ্ণের সেই দেবোপম উত্তর
হইল :—

ব্যাসদেব মালাকর। জ্ঞানের উত্তানে

গোবিন্দের ! এরহস্ত বড় হান্তকর।

কার সৃষ্টি গোবিন্দের কুহুম কানন ?

কার সৃষ্টি সে কানন কুহুম নিকর ?

কার পদ তলে হঁসি সংহিতা বেদের

পড়িতাম, উচ্চ উপনিষৎ সকল ?

* * *

শিষ্যের উত্তান আর গুরু মালাকর—

* * *

জ্ঞানের অনন্তাকাশে তুমি প্রভাকর।

আমি মাত্র ভবালোকে দীপ্ত শশধর !

শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই স্থির, ধীর ও আনন্দময়,

তাঁহার স্বহস্ত-পালিত নারায়ণী সেনার

নিপাতে কবি কি বলাইতেছেন :—

সেনা নারায়ণী—

সাধিবারে নারায়ণ কার্য ধরাভলে

হইল সৃজিত, সাধি নারায়ণ কার্য

এই দীর্ঘ কাল, আজি অল-বিঘরাপি

মিশাইল মহা অলে ইচ্ছার তীহার।

প্রথমে দেখিতে পাই যে, ভারতের আত্ম
অনাব্য সকলেই কৃষ্ণ-প্রেরে মুগ্ধ। গীতার
নিকাশ ধর্ম তখন ভারতবর্ষ বিহীন, উজা ও

শৈলেন্দ্র আর্ঘ্যের তখন আর্ঘ্য অনাৰ্ঘ্য একই ধর্মে একত্রীভূত। তাঁরত আর ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে ছিন্ন বিছিন্ন নহে। এক অমৃত স্বর্গীয় প্রেমে সকলেই আত্মহার। ভগবানের কৃপা-বৃত্তারের কার্য শেষ। ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত। তজ্জায় ভারত এক ধর্মে ও এক রাজ্যে অঙ্গপ্রাণিত। তখন একমাত্র বাদবগণ সুরা-পারী ও বথেক্ষাচারী। সুতরাং তাহাদের কর্মকল প্রদানই ভগবানের শেষ কার্য।

যখন স্বারকার নানা অমঙ্গল প্রভৃতি লক্ষিত হইতে লাগিল, তখন রুজ্জী ও সত্য-তামা সকাঁতরে ভগবানের নিকট তাহার প্রতিবিধানের প্রার্থনা করিলে, কবি ভগ-বানের মুখে যে উত্তর শুনাইয়াছেন, তাহা ভগবানেই সম্ভবে :—

শান্তি অমঙ্গল—

সকলই মানবের নিজ কর্মফল।
সেই কর্মফল রেখা, উহাই অদৃষ্ট লেখা—
মানব আপনি যদি না করে খণ্ডন,
কার সাধ্য সেই লেখা করিবে মোচন।

ভগবানের নিকট সকল মানবই সমান, তাঁহার আত্মীয় অনাত্মীয় সম্ভবে না। যে যেমন কর্ম করিবে, সে সেইরূপ ফল পাইবে। রাণীদের জ্ঞান-নেত্র স্পষ্টীকৃত করণার্থ কবি ভগবানের শ্রীমুখ হইতে কোশলে বাহির করিলেন :—

অধর্মের যে উত্থান, জীলাহিল সে শ্মশান,
সে অধর্ম বাদবের অস্থি মাংস গত,
বহিতেছে শোণিতের সঙ্গে অবিরত।
এ অশান্তি অমঙ্গল জানিও তাহার ফল;
কেমনে নিবারি, কেন নিবারিব আমি
নহি বাদবের, আমি মানবের দানী।

কার বধন যোগ-বধ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া
প্রথমে মুগ্ধ হইলেন, পরে “প্রত্যাখ্যান”

স্বরূপ কবিতা একেবারে উত্তমতম ভগবান-প্রতি বিমম শরাদাত করিলেন, তাহার পর, আহত ভগুবান সেই তক্তের আশা পূর্ণ করি-বার জন্য বলিলেন :—

পাইয়াছ বহু দুঃখ এস বন্ধে প্রেমময়ী,
উত্তরের লীলা শেষ, চল শান্তি ধাম।

এ কি মানব-চরিত্র! প্রাণধাতী অঙ্গ প্রহারে এমন অমৃত প্রসবণের উৎপত্তি। মহাত্ম্যেতে কিন্তু জরা ব্যাধ কর্তৃক এইরূপ শব নিক্ষেপ করার কথা আছে। কবি যদিও একটু ইতর বিশেষ করিয়াছেন, কিন্তু চরিত্র চিত্রণে একই স্বর্গীয় ভাবের আবির্ভাব। ভারতে জরার প্রতি যে অমানুষিক অমুগ্রহ, এখানে কারুর প্রতিও সেইরূপ আপার্থিব অমু-গ্রহ, কাজেই রূপান্তর করিলেও কৃষ্ণ চরিত্রের কোন অংশে কালিমা প্রদান করেন নাই, বরং তাহা অপেক্ষা আরও ভাষার হইয়াছে। তার পর বাহুকী বধন কারুর এই অস্বা-ভাবিক নিষ্ঠুর কার্যের জন্য অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, তখন কবি সেই শ্রীমত্যাগবতের অমর শ্লোকের বিকাশ করিলেন :—

নাগরাজ! বৃথা শোক কর পরিহার!
যেজন যেভাবে চায়, সেভাবে আমাকে পার,
অভাবে মানব করে মম অনুসার
ভ্রাতা ভয়ী ছই জন, চাহিয়াছ শত্রু ভাবে,
পাইয়াছ শত্রু ভাবে আজি ছই জন।

যদিও এই স্থল মহাত্ম্যের সহিত অভিন্ন নহে, তথাচ কবি কেমন কোশলে শাস্ত্রের সহিত মিল রাখিয়াছেন :—

যে যথা মাং প্রাপত্ততে তাং তথৈব ক্ষতম্যহম্।
মম বস্মাশ্রুবন্তে মমুখা পার্থ সর্গশঃ ॥

অস্তান্ত ধর্ম গ্রহেও যে ভাবে বেঁচে-
কারণ কথত: কৃষ্ণাবতার নির্দেশ করিয়াছেন,
কবি ঠিক সেই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র চিত্রণ

করিয়াছেন। শাস্ত্রের সহিত কবি কৃষ্ণ চরিত্র কোথাও অসামঞ্জস্য তাঁর চিত্রিত করেন নাই। তিনি যেন শাস্ত্রের সহিত এক স্বরে বলিতেছেন :—

পরিভ্রাণার সাধুনাং বিনাশায় চ হৃকৃতাম্,
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সন্তু বামি যুগে যুগে।

মহাভারতে অর্জুন-চরিত্র সর্বত্র উজ্জ্বল,—উদার, ধার্মিক, অদ্বিতীয় বীর। বীরত্বে ও চরিত্রে তিনি সর্বত্রই অতুলনীয়। আমাদের প্রজ্ঞাম্পদ নবীন কবিও অর্জুন চরিত্রের সর্বত্রই অতি উদার ও সর্বগুণসম্পন্ন মহুয়রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার এই চিত্রে অতি দোষদর্শী সমালোচকও বোধ হয় কোন দোষ প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। সেই অতুলনীয় বীরত্ব, সেই উদার বিশ্বপ্রেম, সেই মহান বৈরাগ্য, সেই অল্পপম কৃষ্ণ প্রেম, সর্বত্রই যেন জীবন্ত ভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। তাঁহার হৃদয়ের যেন প্রতি পরমাণু শ্রীকৃষ্ণে নিয়োজিত। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন তাঁহার যেন জগতে অস্তিত্বই নাই। তিনি কর্তব্যাহরোষে যুদ্ধ প্রবৃত্ত। কিন্তু তাঁহার বিশ্বপ্রেমে-প্রণত-হৃদয় কখন রেহশূন্য নহে। শত্রুর প্রতিও তাঁহার হৃদয় মেহাচ্ছিত। এমন কাঠিন্বে কোমল ভাব, বজ্রাঘাতে রমনীর কুহুমের মনোহর বাস, অগ্নিতে হিমামীর স্তম্ভিকর মধুর ভাব, কবি যেমন স্তম্ভর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা বাক্যলা কাব্যে অতীব দুর্লভ।

মহাভারতের কবি, মহাবীর অর্জুনের তীর্থ ভ্রমণের যে কারণ দর্শাইয়াছেন, সে কারণটা বৈধেই নহে। সেই স্থল বিশেষ মনোবোণের সহিত পাঠ করিলে সত্যই মনে হয় যেন সেই মহাত্মার এই বোঝেনে তীর্থ ভ্রমণের সত্য কোন মহত্বর কারণ প্রচ্ছন্ন আছে। আমাদের কবি সেই প্রচ্ছন্ন কারণটা এমন

ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে, তাহাতে অর্জুনের সহায়ত্ব ও বিশ্বপ্রেম যুগপৎ উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়া অর্জুন-চরিত্র যেন আরও ভাবের ও উজ্জ্বলতর ভাব ধারণ করিয়াছে।

দম্য চক্রচূড় মুখে যখন তাহার নাবালিকা অনাথা বালিকার কথা শুনিলেন, তখন তাহার হৃদয় একেবারে দ্রবীভূত হইয়া গেল এবং সেই কন্ডার জন্ত তিনি যৌবনে যোগী-বেশে কত স্থান অহুসন্ধান করিলেন। এমন হৃদয় না পাইলে কি তিনি জগতে বীরাগ্রগণ্য হইতে পারিতেন। কবি অর্জুন-চরিত্র স্তম্ভর ও স্বাভাবিক ভাবে কেমন মহিমাময় করিয়া তুলিয়াছেন। সেই চক্রচূড়-কন্ডার অহুসন্ধান না পাইয়া তাঁহার হৃদয়ে যে কি অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছিল, তাহা তাহার নিজ বাক্যেই মহাকবি প্রকটিত করিয়াছেন :—

অষ্টম বর্ষার্দ্রেই অনাথা বালিকা
ভাসিতে লাগিল, দেব, নয়নে আমার।
বহু অশ্বেষণে তার না পাই সন্ধান,
কি যে তীত্র মনস্তাপ হৃদয়ে আমার
বসাইল বিবদন্ত, স্তম্ভ শাস্তি মম
হইল বিবাক্ত সব। তীর্থ পর্যটনে
আসিলাম জুড়াইতে সেই মনস্তাপ।

মহাভারতকার মহর্ষি উর্লনীকর নিকম্ব পাষণে অর্জুনের জিতেন্দ্রিয়তারূপ লোক-ললামভূত স্ববর্ণপুঞ্জকে তুলিত করিয়া যেমন নরগণের বিষয় উৎপাদন করিয়াছেন, আমাদেব নবীন কবি শৈলজারূপমাদুরিমাযমী রমনীর দ্বারা অর্জুন চরিত্র সেইরূপ কত মহান ও কত প্রতিভাময় করিয়া তুলিয়াছেন। মহাভারতেও যেমন কৃষ্ণ-পরিভ্রাত্ত অর্জুন আর সে অর্জুন নহেন, নবীন-বাহু-চিত্রিত কৃষ্ণ-কেন্দ্রাদির অর্জুনও কৃষ্ণদ্বারা হইয়া আর সে অর্জুন নহেন। এইরূপ যেখানেই দেখি,

সেখানেই অজুন-চরিত্র আমাদের কবি হার
অধিকতর প্রতিভাময়, ও উজ্জল ভিন্ন কোথায়ও
উহা হীনপ্রভ হয় নাই ।

অভিমত ।—মহাতারতেও দেখি অভিমত
বীর, সরল ও সদা প্রসন্নময়, আবার আশ্রয়
দেয় প্রদেয় কবিও তাঁহাকে অধিতীর বীর,
সংসারের কুটিলতা-বিবর্জিত ও সদা প্রফুল্লিত
ও সদানন্দময় করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন ।
তাঁহার হৃদয়ে সংসারের কুটিলতা যেন একে-
বারেই প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই । তাই
যুদ্ধস্থলে তিনি ধ্বংসোদন-পুত্র লক্ষণকে
বলিতেছেন :—

বিপুল কোরব রাজ্য ; কোরব পাণ্ডব ।

হুই ভাই ; এ হুয়ের হয় নাকি স্থান
এ বিস্তীর্ণ পিতৃরাজ্যে হৃদনের তরে ?
নাহি হয়, হবে ভাই তোমার আমার—
তুমি ভাহুমতী পুত্র আমি সন্তান ।

এক ক্ষুদ্র আন্তরণে গলাগলি করি
ধাকিতে পরম সুখে পারিব আমরা ।

মহাবীর পাণ্ডব পক্ষের সেনাপতি পদে
বরিত । সাক্ষাৎ অস্ত্র গুরু দ্রোণাচার্য্য তাঁহার
প্রতিদ্বন্দ্বী । সিংহ শিশু হৃদয়েব একটী
তন্ত্রীও যেন ইহাতে বিচলিত হয় নাই । বীর
উত্তরার নিকট বলিতেছেন :—

উত্তরে ! কি ভাগ্য তোরা ! কি ভাগ্য আমার !

বোড়শ বৎসর ময়, সেনাপতি পদে
করেছেন ধর্ম্মরাজ এ দাসে বরণ
আজি রণে । এই দেখ উজ্জীবে আমার
আশীর্বাদ, গলে বীর-বাহনীর হার ।
দ্রোণ প্রতিদ্বন্দ্বী আমি । বোড়শ বৎসরে
কলিয়াছে এ গোরব, এ ইন্দ্রক ভীর ।

কোন কজিরের ভাগ্যে, কোন কজিরের ?

আবার মাতার নিকট বিদায় লইয়া ধাই-
বার কালে সেই বীর-লিহের মুখ হইতে

অধিবর্তী আশ্রয়গিরির বাতু নিঃশব্দে হার
কি নির্ভীক বাক্য উচ্চারিত হইতেছে শুনি :—

দেও যা । বিদায় রণে, কর আশীর্বাদ
আজি যেন পরিচয় পায় ত্রিভুবন
অজুনের পুত্র আমি সন্তান-নন্দন,
গোবিন্দের প্রিয়-শিষ্য । স্বধর্ম্ম পালন
করি, ধর্ম্মরাজ্য আজি করিব স্থাপন ।

মহাবীর বীরবাহুব অল্পময় যুদ্ধ কাহিনী
মধুদস্থন দ্ব্যতমুখে লঙ্কেশ্বর দশাননকে শুনাইয়া-
ছিলেন, আর আমাদের অতুলনীর মহাকবি
নবীন বাবু অভিমতের সেই অসামান্যিক যুদ্ধ-
কাহিনী বীরশ্রেষ্ঠ অজুনকে শুণাইতেছেন ।
এরূপ কবিত্ব-ছটা এই ছই স্থল ভিন্ন বাক্যলা
কাব্যে আর অত্র দৃষ্ট হয় না । উহা বধনই
পড়িবে, তখনই হৃদয়তন্ত্রীগুলি যেন কি এক
শোকমিশ্রিত অল্পময় আনন্দের উদ্যম নৃত্য
করিতে থাকিবে ।

বাস ।—মহাত্মা কুরুদৈপায়ন চরিত্র মহা-
ভারতে যেমন ভাবের, নবীন বাবুর কুলিতেও
সেইরূপ ভাব । একাধাও তাহাব চিত্র কোন
পক্ষে হীনতর হয় নাই । তাঁহার সেই উদার
জ্ঞান, অনন্ত বিশ্বপ্রেম, গভীর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ও
ত্রিকালজ্ঞতা সর্বত্রই প্রতিভাত হইতেছে ।
তাই তিনি অজুনকে বলিতেছেন :—

“মাগধের দৃষ্ট ক্ষুদ্র, অদৃষ্ট অনন্ত ।”

তাঁহার আশ্রম বৈরাগ্য ভাবে চিত্রিত হই-
য়াছে, এরূপ চিত্র মর্ত্যে সম্ভবে না । উদার
সর্বত্রই যেন স্বর্গীয় বনোদয় সৌন্দর্য্য-পরি-
পূর্ণ । উহা দর্শনে পাঠক স্বতঃই তারত-
চক্রে স্বরে বলিয়া উঠিবেন ।

বেদার রক্ষক, সে তারি তক্ষক,

সার এই অসার সংসারে ।

ভগবান ব্যাসদেব ভারতে একমিষ্ট গাছ-
রীকে তাঁহার যুদ্ধ সত্যনাথের দর্শন দিয়া-

হিঁমোনে। তাই অদ্ভুতশিল্পী নবীন^১বীণ ও
নৈলকে বৈশারন-কৃপার ভবিষ্যৎ চিত্র দর্শন
করাইয়াছেন। এই কাব্যত্রয়ের মধ্যে যেখা-
নেই ব্যাসোক্তি পাঠ করিবে, সেখানেই তাঁহার
গভীর জ্ঞান, বিশ্বপ্রেমিক উপদেশ পড়িয়া
ছন্দ কি যেন এক অদ্ভুত রসে আম্লুত হইয়া
তালে তালে নৃত্য কবিতাে থাকিবে।

প্রতি পদার্থেরই দুইটা পৃষ্ঠা,—একটা
উজ্জল ও ভাষার, অত্রটা কুটিল ও আশ্লিতা-
ময়। একটা উদার ও বিশ্বপ্রেমময়, অত্রটা
সঙ্কীর্ণ ও জিঘাংসা পূর্ণ। তাহাই দেখিবার
অত্র কবি একাধারে ব্যাস ও হর্কাসা চরিত্র
স্থাপিত করিয়াছেন। আমার পার্শ্বে পূর্ণ-
মাসী, আলোর পার্শ্বে ছায়া, অল্পম শরদিদু
হৃদয়ে যুগপদ-বেধা, মধু বিশ্ব-প্রেম পার্শ্বে
স্বার্থপরতা রূপ আশীবিষ-লতরী। জৈবের
কি লীলা, একের অভাবে অত্রের সৌন্দর্য
লোপ। এখানে আমাদের নবীন বাবুর শিল্প
চাতুর্য। তাঁহার চিত্রিত বৈশারন পার্শ্বে
হর্কাসা। পাঠকের দক্ষিণে স্বর্গের অল্পম
প্রভা ও বামে নারকীয় বিভৎস দৃশ্য। পাঠক
দ্রোণ ও নিজ জীবনের উপকরণ সংগ্রহ
করুন।

অনেকে হর্কাসার এই চিত্রণে দুঃখিত,
আমরা বলি, কোথায় হর্কাসা চরিত্র উদার
ও ভাষার? যেখানে ধ্বংস, সেখানেই হর্কাসা-
সার বেধা। 'ধ্বংস ও অভিশাপই তাহার
নিত্য সঙ্গী।' 'একজ্ঞ' তিনি কত স্থানে বিভি-
ষিত, কোথায়ও সূদর্শন-তাড়িত, কিন্তু স্বভাব
অপরিবর্তনীয়, 'শিল্পী' স্বর্গচাত—হর্কাসার
তপস্তার স্বর্গে। 'একজ্ঞা ও 'অতির-হৃদয়
ব্রাহ্ম লক্ষণের বিচ্ছেদ হর্কাসার সদাশ্রিত্য
'নির্দেশক'। 'বর্ষাঙ্গী' পাণ্ডবদের 'ভয়ভূত
'কীর্তি'র 'অভ' 'বদ'বিনে 'তাঁহার' 'ব্রাহ্মণের

লক্ষণ কি উজ্জল থাকে' একাক্ষ পাঠেই হ'ল।
যত্ববশ ধ্বংসই কি তাঁহার সাহিত্যিকতার লক্ষণ?
পুরাণে বাহার এইরূপ কার্য আমরা ত্রু ত্রু
দর্শন করিতেছি, তখন কবির একরূপ চিত্রণ
'কি করিয়া বলিব যে অসম্ভব হইয়াছে?
আমাদের মতে তাঁহার এইরূপ চিত্রণে কর্তব্য
হিসাবে কবির অদ্ভুত লোকাভিজ্ঞতাই একাক্ষ
পাইতেছে। হর্কাসা চরিত্র যদি ব্রাহ্মণের
অনুকরণীয় হয়, বা সাহিত্যিকতার পূর্ণ ভাষা
হয়, তবে সেরূপ ব্রহ্মণ্য বা সেইরূপ সাহিত্যিকতা
সত্ত্বেই প্রশান্ত মহাসাগরের অতল জলে 'মিথ-
জ্জিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে কি?

সাত্যকি।—সাত্যকিকে আমরা মহাভারতে
দেখিয়াছি, তিনি বীর, জ্ঞানী ও অত্র চালনে
সুকৌশলী। সর্কদায়ই উচিতবাদী, কিন্তু
একটু উদ্ধত ভাব প্রচ্ছন্ন ভাবে যেন তাহার
চবিত্রে অন্তর্নিহিত। 'সেই অত্র দ্রোণ পর্বে
ধৃষ্টদ্যায়ের সহিত ভয়ানক আত্মবিচ্ছেদ।
আবার যত্ববশ ধ্বংস সময় সুরাপানোন্মত্ত।
কবিও ঠিক সেই ভাবেই সাত্যকি চরিত্র
চিত্রণ করিয়াছেন।

কর্ণ।—কর্ণ মহাভারতে অধিতীয় বীর ও
অর্জুনের প্রতিবোধক। কবিও তাঁহাকে ভার-
তোক্ত চরিত্র অক্ষুন্ন রাখিয়াই তুলিত করিয়া-
ছেন। তিনি হর্কাসার অন্যায় যুদ্ধে অভিমত
বধের মন্ত্রণায় কি বলিতেছেন শুননু :—

অহুমতি দেহ গুরোঃ । ধর্ম্মরূপ করে
জ্ঞায় যুদ্ধে বিযুধিব বনের একশরী,
ততোধিক পরাক্রমী পার্শ্বে দিব রণ,
আজীবন প্রতিদন্দ্বী। আজ্ঞন আহবে
বজ্রধারি, শূলধারি, দেহ যেনাপতি^২।
পুলিভ তেজোজ-আজ্ঞা, করিব সশর।
এক দ্বাণ চাহি তিক্তা^৩ বীরকে করিবে।
করিনী^৪ এই বীর কলক অর্পণ^৫।

• দেব পিতৃ, দেবী মাতা, দেবতা মাতৃক ;
জগতের এ দেবত্ব করিব নির্মল ।
এ ধর্মে নিপতিত করোনা দাসেরে ।
দয়া কর, ক্ষমা কর, ধরি তব পার ।
ঠিক কর্ণের উপযুক্ত কথাই হইয়াছে ।
“শুণীর নিকট শত্রুর গুণও অবিরিত থাকে”
না । কি অতুল চিত্র-কোশল !

• “ভীষ্ম চরিত্র কবি অক্ষর রাখিয়াছেন, সেই
গভীর জ্ঞান, সেই ভূয়োদর্শন, সেই ভবিষ্যৎ
অভিজ্ঞতা, সেই দেবোপম উপদেশ ।
তাহার নিকট ক্রোধের দেবত্ব অবিরিত নাই ।
ভবিষ্যতের কল তাহার নিকট জাজ্বল্যমান,
একট কর্তব্যের অমুরোধে পাপ পক্ষ অবলম্বন
ও তাহার ভীষণ পরিণাম জগৎকে প্রদর্শন
করাইয়া নিজ কর্তব্য শেষ করিয়াছেন ।

বলদেব।—ভাগবতে আমরা বলদেবকে
সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া স্তবকে বিনাশ করিতে
দেখিয়াছি । কবিও স্থানান্তরে হলধরকে
সুরাপায়ীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন । তিনি
সুরাপায়ী হইলেও বহুগুণে ভূষিত ও উদার ।

• শুণী না হইলে গুণের মর্ম্ম অস্ত্রে বুঝে না ।
মহামতি বলদেব ও অক্ষু'নের অস্ত্র চালনা
কোশল দেখিয়া একেবারে তিনি সমস্ত ভুলিয়া
গেলেন ও একেবারে আত্মহারা হইলেন ও
• শুণীর গুণ কীৰ্ত্তনে অভিভূত :—

বীরষে বীরের শ্রাণ
মোহিল, আনন্দে রাম
শান্তি আভা করিল প্রচার ।

• “অয় ভদ্রার্জুন অয়”
গাইতেছে ধন ধন,
• উন্মত্ত রোবতী-রমণ ।

ইহা অপেক্ষা বীর চরিত্রের উৎকৃষ্ট তুলি
দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে মনে মনোহর না । এক
কথায় বলদেব চরিত্রের মহিমা কেমন প্রকা-
শিত হইয়াছে ।

ববীন বাবুর কাহ্নকী এক অল্পত্ব চিত্র ।
তিনি একান্ত কৃষ্ণভক্ত অথচ রাহ্ম্যাকাঙ্ক্ষী ও
জ্ঞান পাণ্ডিত্যার্থী । তজ্জন্ম তিনি বারকী
প্রচুরভাবে আক্রমণ করিয়াছেন । দ্বীপায়
সহিত বড়বয়ে মজিয়াছেন—কিন্তু ক্রুরতার
তাহার মন নাই, সদাই সরল পথের পথিক ।
ক্রমে কৃষ্ণ তাহার শত্রুর আসন হইতে
উপান্তরপে পরিণত । তিনি ক্রমে ভলে, স্থলে,
শূন্তে সর্বত্রই কৃষ্ণ দর্শন করিতে লাগিলেন ।
কৃষ্ণ ভিন্ন জগতে আর কিছুই অস্তিত্ব তাহার
নিকট রহিল না । ভক্তের এমন চিত্র, পুরা-
ণোক্ত প্রহ্লাদ চরিত্রে যাত্র দেখিয়াছি । তিনি
দৃঢ়তা সহকারে তাহার পিতাকে বলিয়া-
ছিলেন যে “প্রভু বিষ্ণু জগতের বাবতীর
পদার্থে বিভ্রমণ । তিনি জলে স্থতো শূন্তে
সর্বত্রই সর্বকণে বিভ্রমণ আছেন । ঐ স্তম্ভ
মধ্যে তিনি অবশ্যই বিরাজিত আছেন ।”
আর কবি বাহ্নকী যুগে কি শুনাইয়াছেন,
তাহাও একবার পাঠ করুন :—

কোথা কৃষ্ণ ! দেখিছ না কৃষ্ণ কোথা ধনঞ্জয় !
বীরেন্দ্র চাহিয়া দেখ চরাচর কৃষ্ণময় !
কৃষ্ণ চন্দ্রে, কৃষ্ণ সূর্য্যে, কৃষ্ণ গ্রহে উপগ্রহে ।
অনন্ত আকাশে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সমীরণে বহে ।
মেঘে কৃষ্ণ, বজ্রে কৃষ্ণ, কৃষ্ণদীপ্ত চপলায় ;
কৃষ্ণ ভীম ভূকম্পনে, কৃষ্ণ-বোর ঝটিকায় ।
কৃষ্ণ অমা অন্ধকারে, কৃষ্ণ ফুল জ্যোৎস্নায় ;
কৃষ্ণ সিদ্ধ জলোচ্ছ্বাসে, কৃষ্ণ গৈরিক ধারায় ।
কৃষ্ণ মহা শৈলাচলে, কৃষ্ণ স্থলে, কৃষ্ণ কলে,
কৃষ্ণ জলে, কৃষ্ণ স্থলে, ত্বারে, কৃষ্ণ অনলে ।

ভক্তের শেখাবহার আর তাঁহার নিজের
অস্তিত্ব থাকে না । তখন সে ভগবানের
সহিত ওতপ্রোত ভাবে সম্মিলন অহভব করে,
এবং তাহাতেই সে সর্বত্র অহভব করে ।
ভগবান চৈতন্যদেবের স্তব্ধে এই কায় যুগ্মি- .

সাহিত্য, আর আমাদের কবিবান্ধবী জনগণ এই
ভাব ফুটাইয়াছেন :—

আমি তার পিতা নন্দ, বশোদা জননী আমি ।
শ্রীধাম সুদাম আমি, কত খেলা খেলি সঙ্গে ।
ব্রজের কিশোরী আমি, কত ক্রোড়া করি সঙ্গে ।

বাক মান বাক কুল ! ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও,
জীবন যৌবন নাথ ! নেও তুমি সব নেও !

ভক্তের এইরূপ জীবন্ত ভাব কি অত কোন
বন্ধকবির কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইতে
তিনিরাছেন ? আমাদের বোধ হয় এই প্রথম ।
ইহার মূলমন্ত্র ভগবদ্গীতার সেই অমর শ্লোক ।
ইহা ঐ শ্লোকেই সাকার মূর্তি :—

যো মাং পশুতি সৰ্বত্র সৰ্বঞ্চ ময়ি পশুতি ।
তস্মাহং ন প্রণতামি স চ মে ন প্রণততি ॥
সৰ্বভূতস্থিতঃ যো মাং ভজত্যেকম বাহিতঃ ।
সৰ্বথা বৰ্ত্তমানোহপি স যোগীময়ি বৰ্ত্ততে ॥

ভক্তা।—ভক্তা-চরিত্র মহাভারতে দেখিয়াছি
কিন্তু নবীন বাবু-কৃত ভক্ত অতুলনীয় । মহাভা-
রতে যে সকল ভাব প্রজ্জ্বল, আমাদের কবি-
তুলিকার তাহা স্ফুটিলিত । আমরা মূলকণ্ঠে
বুলিব, এমন দোবশূন্য আদর্শ বঙ্গবাসীর
সম্মুখে কোন বঙ্গীর কবিই আজ পর্যন্ত ধ্বনিত
সমর্থ হন নাই । ইহার সৰ্ব্বত্রই মধুব । তাহার
সমস্ত কার্য্যই যেন একগতের নহে । তাহার
প্রতি কার্য্যই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে মাথা । গীতার
প্রতি শ্লোক যেন তাঁহার প্রতি কার্য্যে সাকার
মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজিত । পৃথিবীতে
ভক্তা চরিত্রের তুলনা কোথাও নাই । ভক্তা
যেন অগতের নহে । সুতরাং তাঁহার তুলনা
কিহেতে অধিক অসমর্থ । কবি-চিত্রিত কোন
কোথাই সান্বিত নহে । যিনি পরহঃ
হেতু নিজ একমাত্র পুঞ্জের বিরুদ্ধতুলিতে
শক্তি, তিনি কি মূঢ় !

দ্বঃখেবহুবিধমনাঃ স্বঃখেবু কিংতস্মহাঃ ।
বীতরাগ ভয়ক্রোধঃ স্তুতবীমুনিরুচ্যতে ॥

ভদ্রার স্তবে দ্বঃখে শোকে শান্তিতে সফ-
লে ও বিফলে সমভাব, কোথাও তাঁহার চরিত্রের
বিকার লক্ষিত হয় না । যখন রূপদেব
অক্ষুণ্ণের বীরত্ব দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া শান্তির
আজ্ঞা দিলেন, তখন সৰ্ব্বত্র আনন্দলহরী দেখা
দিল । সুভদ্রার তখন সৰ্ব্বাপেক্ষা হর্ষিতা
হইবার কথা, কিন্তু কবি তাহাকে অমূল্যভাবে
চিত্রিত করিয়াছেন :—

সৰ্বত্র আনন্দধনি,
সৰ্বত্র হাসির রাশি

সৰ্বত্র আনন্দ ঢল ঢল ।

কেবল চারিটি মুখ

গম্ভীর অবাত-স্কন্ধ

মহিমা মণ্ডিত পায়াবার ।

রথে ভদ্র ধনঞ্জয়

অঙ্গে, কৃষ্ণ, বৈপাশ্বন,

ঝড়-গর্ভ মহা মেঘাকার ।

তাঁহার নিকট শত্রু মিত্রের ভেদ নাই,
তাই তিনি স্বেচ্ছাক্রমে বলিতেছেন—

শত্রু ! কি মায়া নহে লো আমার মত ?

রক্ত মাংস নাহি কি তাহার ?

তোমার আমার প্রাণ, নহে কি শত্রুর প্রাণ !

এক জল ভিন্ন জলাধার ।

* * *

শত্রু ! এক ভগবান ঈর্ষদেহে অধিষ্ঠান,

সর্বময় এক অধিষ্ঠায় ।

কেবা তুমি কেবা আমি, কেবা শত্রু মিত্র কেবা ?

কারে বল প্রিয় বা অপ্রিয় ?

একোই মনবের বাক্য না কোন দেবীর
বাক্য ? আবার :—

মিত্রকে যে ভালবাসে, শত্রুকে সে ভালবাসে,

সেত স্তম্ভ ব্যবসার হল ।

শ্রদ্ধা দিয়া তাঁর বার সমভাবে কাঁদে আশ
সেই জন দেবপ্রাণ আমার।

তিনিরাছি, যোশের বালাগণ পুত্রকে যুদ্ধ-
বেশে সাজাইয়া একখানা ঢাল অর্পণ করিয়া
বলিতেল, হয় শত্রু নাশ করিয়া মহা গৌরবে।
এই ঢাল লইয়া আসিও, না হয় সমুখ সংগ্রামে
দেহত্যাগ করিয়া ইহাতে আশ্রয় হইয়া
আসিও। আমাদের কবিও অভিমতের যুদ্ধ-
যাত্রাকালে স্তম্ভভ্রমণে কি বাক্য ফুটাইয়াছেন,
শুন :—

নারীকুলে ভাগ্যবর্তী কে আছে এমন
তোম জননীর মত ? ভ্রাতা নারায়ণ,
পতি ধনঞ্জয়, পুত্র ষোড়শ বৎসরে
মহারথী, ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে
আজি পুত্র সেনাপতি ! * * *
* * * * *

আনন্দাশ্রু ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল
বীর জননীর বক্ষে !

আর কত দেখাইব ? ভদ্রাচরিত্রের
যেখানে দেখি, সেখানেই অভাবনীয় ও অপা-
র্ষিব। বঙ্কিমচন্দ্র মহাশয়ের সর্ব বৃত্তিগুলির
সম্যক ক্ষুণ্ণকেই মহাশয়ের সর্বকালীন সাফল্য
বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন এবং তাঁহার কৃষ্ণ-
চরিত্রে তাহাই প্রদর্শন করাইতে চেষ্টা করি-
য়াছেন। কিন্তু কোন দ্রো চরিত্রে মানবীর
সর্ববৃত্তির সম্যক ক্ষুণ্ণ দেখি নাই। তিনি
দেবী চৌধুরানীর চরিত্রে এইভাবে দেখাইবার
চেষ্টা পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অত্যধিক
পতিভক্তির জোয়ারে উহা গৃহমধ্যে পর্যাবসিত।
মহর্ষির সীতাচরিত্র, ভারতের দ্রৌপদী-চরিত্র
দেখিয়াছি, তাহাতে মানবীর মাধুর্য্য, সত্য
প্রকৃতি অনেক বৃত্তির ক্ষুণ্ণ দেখিয়া স্তম্ভ হই-
য়াছি, কিন্তু কবি-চিত্রিত ভদ্রীর রক্ত সমস্ত
বৃত্তির ক্ষুণ্ণ কোথাও লক্ষিত হয় নাই।
তাই বলি, ভদ্রা-চরিত্র বালাগা কাব্যে অধি-

ভীষ ও অদৃষ্টপূর্ব্ব। ভদ্রা-চরিত্র শ্রীমদ্ভগবৎ-
গীতার জনম ও সাক্ষাৎ সাকার প্রতিমূর্ত্তি।
যিনি গীতার গভীর ভাব অন্বেষণ করিতে
অসমর্থ, আমরা বলি, তিনি যেন গীতার নীরস
ভাষ্য পড়িতে না যাইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক
নবীনবাবু-চিত্রিত ভদ্রা-চরিত্র পাঠ করেন।
তাহা হইলে স্বতঃই গীতার সেই গভীর ভাব
তাঁহার হৃদয়ে প্রতিকলিত হইবে। ভগবান !
এমন দিন কি হইবে যে, কবি কল্পনার বে-
নন্দনের অমিয়ময় চিত্র তুলিয়াছেন, আমরা
বঙ্গের ঘরে ঘরে সেই চিত্র দেখিতে
পাইব ?

স্পর্শমণির প্রভাবে স্বর্ণের ধাতু সকল
স্বর্ণে পরিণত হয়। তাই ভদ্রার কোলে,
হরীসার বিকারে জ্ঞানচক্ষু প্রফুটিত, যে
কৃষ্ণকে তিনি যুগের চক্ষে দেখিতেন, এখন
দেখিলেন, সেই কৃষ্ণই ব্রহ্মাণ্ডময়। তখন
তাঁহার জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়া, চির অনাবাদিত শান্তি
লাভ করিয়া তিনি চরিতার্থ হইলেন। যে
বাসুকী চিরকাল তাঁহাকে স্নানপথে
প্রাপ্তির কামনার জীবন কাটাইয়াছেন, শেষ
কালে, সেই স্তম্ভভ্রমণে কোলে তাঁহার সে ভাব
তিরোহিত। তখন তিনি তাঁহাকে মাতৃত্বাবে
দর্শন করিলেন। মাতৃপ্রেমে তাঁহার হৃদয়
নাচিল। বিশ্ব কৃষ্ণ-ময় দেখিতে দেখিতে
তিনি প্রেমময় মাতৃ অঙ্কে শায়িত হইয়া অনন্তে
বিলীন হইলেন। বাসুকীর বাসনা পূর্ণ
হইল।

যেখানে আত্মবের উজ্জ্বল, সেখানে স্তম্ভভ্রা ;
যেখানে আত্মের হাহাকার-ধ্বনি, সেখানে
স্তম্ভভ্রা ; যেখানে বিরহিণীর নৈরাশ্র, সেখানে
স্তম্ভভ্রা ; যেখানে আহত সৈনিকের বিকট
চীৎকার, সেখানেই স্তম্ভভ্রা তাঁহাদের
শত্রুর রক্ত। শিশুটিভের কণ্ঠে এখন

সিদ্ধন, অরহীনের মুখে আর দান, হৃত-
জ্ঞান নিত্য কার্য :—

অয়ং নিজ পরবেতি গণনাং লঘু চেক্সাম্ ।
উদারচরিতকৈব বহুধৈব কুটুম্বকম্ ॥

ভদ্রা চরিত্রে ইহার জাজ্জল্যমান প্রমাণ ।
যে কবিতা তুলিতে এমন চিত্র প্রতিফলিত,
সে কবি অমর না হইলে আর অমর কে ?
কবি, তুমি ইহজগৎ পরিভাগ করিয়াছ বটে,
কিন্তু তোমার ভদ্রা-চরিত্র যখনই লোকে পাঠ
করিবে, তখনই তোমার অল্পপম প্রতিভা
পাঠকের মানস-সুকুরে প্রতিফলিত হইবে ।

ভদ্রা মার মানবী নন, তাঁহার স্বথ, হুঃখ,
শোক, তাপ এত্ৰীত ভগবানে অর্পিত । তাহার
অনন্ত প্রেম বিশ্বব্যাপী নরনারীর প্রতি
সমান প্রভিমহ্যার জ্ঞান পূজ-বিরহেও
তাঁহার বিশ্বপ্রেম উদ্বোধিত । মহা কবি
কালিদাসের কুমারসম্ভবে দেখিয়াছি, ভগ-
বান আশুতোষ ধ্যানে নিমগ্ন । কিশোরী
উমা তাঁহার পূজায় নিযুক্ত । অদূরে কামদেব
সুসময় বিবেচনায় ভগবানের প্রতি কুল-বাণ
নিষ্ক্ষেপ করিলেন । ভগবানের সমাধি চঞ্চল
হইল, চক্ষু উন্মিলিত করিয়া সম্মুখে বিশ্ববিমো-
হিনী কিশোরী উমাকে দেখিতে পাইলেন,
তখন অনন্দের সৌদামিনী কটাক্ষই স্বাভা-
বিক, কিন্তু ফল কি হইল, কালের ধ্বংস,
ভগবানের হৃদয়ে প্রেমের শাস্তিময়ী উৎসের
উৎপত্তি । আমাদের কবি কি দেখাইয়াছেন ?
সম্মুখে বীর-পুত্র অভিমহ্যার মৃতদেহ । মাতৃ-
হৃদয়ে শোকের প্রবল উর্ধ্বর আবির্ভাবই
স্বাভাবিক । সেই স্থলে কি অতুল বিশ্ব-
প্রেমের কি বিমল উৎসের উৎপত্তি !—

সমগ্র মানব জাতি আজি অভিমহ্যা মোর,
আজি ভ্রুতিমহ্যা মম বিশ্ব চরাচর ।
এক ধীর পুত্র মম হারা হইয়া, লজিয়াছি
আজি কি মর্যাদা প্রদান অনন্ত সময় ।

এই দৃষ্ট অর্বলোকন করিয়া আমাদের
কালিদাসের সেই অনরলোক মনে পড়ে :—

অবুষ্টিসংরক্ত মিবাধুবাহম্
অপামিবাধার মল্লতরঙ্গম্ ।
অন্তস্তরাগাং মরুতাং নিরোধাৎ
নিবাত নিরুপ্পমিব প্রদীপম্ ॥

উত্তরা।—উত্তরা-চরিত্র একটি আনন্দের
ক্ষণবিকাশ, যেই আনন্দের লয়, অমনি পাণ্ড-
বের একমাত্র ভবিষ্যৎ আশা রাখিয়া তাঁহার
অন্তর্দান । অহো ! সুখের সৌদামিনী ক্ষণিক
চমকাইল, জগত যেন সুখের তরঙ্গে তরঙ্গিত
করিয়া তুলিল । মুহূর্ত্ত মধ্যে সে হাসি কোথায়
লুকাইল, জগত যেন গভীরতর হুঃখ-ঘনে
আবৃত হইয়া অনন্ত হুঃখের উচ্ছ্বাস ছাড়িল ।
অথবা চন্দ্রমা যেন মধুর হাসি হারিতেছিল,
চকোরিণী সুধাপানে উন্মত্ত হইয়া জগতের
নিকট যেন সঙ্গীত-সুধা বিতরণ করিতেছিল ।
অকস্মাৎ কোথা হইতে করাল রাহু আসিয়া
সুধাময় চন্দ্রমা-হৃদয় গ্রাস করিল, চকোরিণীর
কপাল ভাঙ্গিল, জগৎ অন্ধকার হইল । মুহূর্ত্ত
পরে জগত গভীরতম অন্ধকারে আব্রিত
হইল । চকোরিণীর সঙ্গীত চিরতরে অন্ত-
হিত হইল ।

উত্তরা কুরুক্ষেত্ররূপ মরুস্থান । ২১১টা
কবিতা তুলিয়া পাঠকের উপহার দিয়া আমরা
উত্তরা-চরিত্র শেষ করি । উত্তরার কোমল
প্রাণে যুদ্ধের এই বিকট বিকাশ সঙ্ঘ করিতে
পারিতেছে না :—

এই পোড়া যুদ্ধ নাথ । কত দিনে আর
ফুরাইবে, জুড়াইবে অধিল সংসার,
ইচ্ছা করে রাজ্য আশা দিয়া জলাঞ্জলি,
যাই কোন মনোহর অরণ্যেতে চলি ।
মাহুবে মাহুবে বধা হিংসা নাহি করে,
কাঁদে রমণীর প্রাণ রমণীর তরে ।

অন্যত্র কবি বর্ণনার কেমন সুখের তরঙ্গ
তুলিয়াছেন :—

সুখানি ধরিয়া কহিলা কেনব—

“ক’ বাপ তোমার ?”

উত্তর। এবাপ, ওবাপ, ওই বাপ আর,—

কৃষ্ণ। তুনিগে বিরাট রাজ।

বিরাট। মা, কট মা! তোর ?

উত্তর। মা আমার পাঁচ

এক মা বিরাটে ওই মাতা আর,

দুই মাতা দ্বারকার!

• সুলিমা বাপের পায়।

বিরাট। বেয়াই! কে জিতে আজ ?

পাঠক বলুন দেখি, উত্তর। কুরুক্ষেত্র রূপ
মহা মহত্বের শাস্তিদায়িনী উত্তান অরুণিণী
কি না ?

কল্পিণী ও সত্যভামা।—কালিদাসকৃত রঘু-
যুগ্মে গঙ্গা যমুনা বর্ণন পড়িয়াছি, কিন্তু সে
অচেতন গঙ্গা যমুনা। আমাদের নবীন বাবু-
চিত্রিত সজীব গঙ্গা যমুনা বর্ণন পড়িয়াছি
আর চিত্রা করিয়াছি যে, বাস্তবিকই কল্পিণী
যমুনা, সত্যভামা গঙ্গা। এক হিরা, অস্ত
চকলা; একটা শাস্তিপূর্ণ বেলফুল, অস্তটা
সুগন্ধময়ী গোলাপ। একটা কমলীর
উবার শাস্তিময়ী প্রভা, অস্তটা প্রদোষের
আরামদায়িনী ঈষচ্চঞ্চল মনোহারিণী আভা।
কিন্তু এই চকলা ও হিরা রমণী-রত্নের কি
অপূৰ্ণ মিলন, একের বিহনে অস্তের সৌন্দর্য্য
নষ্ট বা একের বিহনে অস্তের অবস্থিতি অস-
ম্ভব। একটা সকাম, অস্তটা নিকাম। সকাম
নিকামের মিলনের কি মনোহর চিত্র! এ
মিলন অপূৰ্ণ, ইহার কলও অপূৰ্ণ। মহা-
ভারতের অনেক স্থলে সত্যভামার কেবল
গর্ভিত মূর্তিই দেখিয়াছি, কিন্তু কথি এই
কাব্য-গর্ভের সহিত যে সময়ের অস্তিত্বতা
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অল্পমাত্র। ঐক্য
কিছুই প্রকাশ করেন নাই, অথচ দেবী, সত্য-

ভামা যেন স্বাধীন মনোভব হুঁসিয়াছেন।
সেই অস্ত স্বাধীন স্রষ্টা অস্তিত্ব বা পাইয়াছেন
তিনি অর্জুনে তথা অর্পণ করিতে অস্বস্তী।
তাহাতেই ঐক্যের ইচ্ছাপূর্ণ, সর্বদিক
রক্ষিত।

কল্পিণী দেবী, তিনি পতিসেবা ভিন্ন অন্য
কোন সংবাদ রাখেন না। পতিই তাঁহার
একমাত্র আরাধ্য। পতি বাহা করেন, তাহাই
শিরোধার্য্য। নিজের মতামত কিছুই নাই,
তাই ভ্রাতার বিবাহ দিব্যের তাহার মত
জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিতেছেন;—

দাসীর কিবা মত—

তুমিই করিবে নাথ অর্জুনের স্তবজ্ঞার
এসকটে পূর্ণ-মনোরথ।

কবি যেমন সপত্নীষয়ের চিত্র ফলাইয়াছেন,
তাহা অগতে অতুল। ইহা পার্থিব কি
অপার্থিব, পাঠকই বিচার করুন;—
সত্য। জ্ঞানের চূড়ান্ত কল, গলার সত্যনী ছুটি!

জ্ঞানের মহিমা বলিহারি!

এমন লক্ষীর পায়ের আমি সত্যনীর কাঁটা
ফুটালে যে তার জ্ঞান ভারি।

কল্পিণী।—

দিদিরে! জুর্জল প্রাণে কত ব্যথা দিবে আর,
তোমার ত হৃদয় দয়াময়;

এমন প্রতিভাময়ী সপত্নী পতির যোগ্যা,
জন্ম জন্মান্তরে যেন হয়।

কি’ যে অভাগিনী আমি পতিসেবা নাহি জানি,
আপনি মরমে মরে রই।

পতি প্রসন্ন মুখ দেখি যবে পাই সুখ,
তোমার কাছে কত কণী হই।

সত্য। এ কভু মানবী নয় কি হৃদয় প্রেমময়!
অগতের পুণ্য-প্রশ্রবণ।

সপত্নী ইহঁরা, আমি, নহে যোগ্যা এ দেবী
দাসী হয়ে সেবিতে চরণ।

“এ কি মানবী কথা, না দেবীর কথা ?
কবি প্রতি স্থানেই এই বর্ণীর অধির বিস্তরণ
করিয়াছেন ।

কবি শ্রীকৃষ্ণের নিজ মুখে রুক্মিণী ও সত্য-
ভামা সম্বন্ধে বাহা ফুটাইয়াছেন, তাহাই পাঠ-
ককে উপহার দিয়া আমরা রুক্মিণী ও সত্য-
ভামা চরিত্রের উপসংহার করিব :—

হাসিরা অগত কৃষ্ণ কহেন—“কি পুণ্য মম
হুই চিত্র অতুল ধরায়,

রুক্মিণী ও সত্যভামা, নিকাম সকাম প্রেম
প্রবাহিণী যুগল ধরায়,

পবিত্র বনুনা গলা বহে এক সিন্ধু মুখে,
আমি সেই পুণ্য-পারাবার ।

সরল সকাম বেদ ভক্তিময়ী সত্যভামা
জান উপনিষদ রুক্মিণী ।

নির্জীব নিকাম ভাব আছে তাহা নুকারিত,
অন্তঃশীলা শ্রীতি-প্রবাহিণী ।

রুক্মিণী নিকাম ধর্মের প্রতিমূর্তি । ভাল
মন্দ, হিত অহিত, সমস্ত শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত ।
তাঁহার সম্বোধেই আত্মসম্বোধ, কাজেই যখন
স্বাক্ষর নানা হৃদয় নরনে সকলে ভীত ও
চকিত, তাঁহার সে নিকে হৃৎপাত নাই ।
তিনি জানেন, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা ।
তাঁহার রাজ্যে মঙ্গল অসম্ভব, কাজেই তাঁহার
চিত্র অক্ষুণ্ণ ও অবিচলিত, সেই জন্যই তিনি
সত্যভামাকে বলিতেছেন :—

কি ভীষণ চিত্র দিদি । অঁকিলি নয়নে !

এও তাঁর লীলা মম হইতেছে মনে ।

কিন্তু তোর একি ভ্রান্তি । ভারতের যে অশান্তি
নুকাইল বঙ্গমত লীলার বাহার
তিনি বাধবের পাঁড়ি, তিনি কর্ণধার ।

সত্যভামা সকাম ধর্মের উপাসক,
সেই জন্যই তিনি স্বাক্ষর অবলম্বন চিত্র
মেধিরা উবিয়া, কিছুতেই তাঁহার মনে প্রাপ্তি
নাই । “সত্যভামা” বঙ্গবীণার মতো উবিয়া ।

রুক্মিণী ও সত্যভামা নিকাম ও সকাম ধর্মের
হুই জীবন্ত প্রতিমূর্তি । কবি দেখাইয়াছেন,
কি হুখে, কি দুখে, কি সম্পদে, কি বিপদে,
সর্বত্রই নিকাম ধর্মের উপাসক নির্জিকার ।
তাঁহার হুখ দুঃখের বা সম্পদ বিপদের “নিকে
লক্ষ্য নাই । নিকামীর ক্ষমতা কখনই কোন
কালিমার দ্বারা পড়িতে পারে না । বরং
তিনি অনেক সময়েই সকামীর হুখ দুঃ
করিতে চেষ্টিত । সেই জন্যই রুক্মিণী সত্য-
ভামার উবেগ দূর করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে
অজরোধ করিয়াছেন । অন্যপক্ষে সকাম
ধর্মের উপাসক হুখে যেমন প্রহুসিত, সম্পদে
যেমন হার্ষিত, আবার দুঃখে তেমনই হতশ্রী,
বিপদে তেমনই চঞ্চল । সেই জন্যই বহু-
বংশের অবলম্বন আশঙ্কার সত্যভামা আর
সে মানিনী নাই । সত্যভামার মনে মহা
হাহাকার উঠিয়াছে । সজে সজে আমরা
বলিব, কবির এই সকাম ও নিকাম উপাসকের
চিত্র অতি জীবন্ত চিত্রিত হইয়াছে ।

স্মরণোচনা ।—স্মরণোচনা কবির একটা মধুর
নূতন সৃষ্টি । এমন মধুর চিত্র বাক্যলা
কাব্যে অতি বিরল । যেখানে স্মরণোচনা,
সেখানেই হস্তের লহরী, আনন্দের তরঙ্গ
উথিত । তাহার লিঙ্গের তীব্রবে কি যেন
মধুমাখা । তিনি সুধরা ; কৃষ্ণার্জুনও তাঁহার
নিকট অব্যাহতি পান নাই । কিন্তু সেই
তরঙ্গ কি মধুরমায়র । স্মরণোচনার সহিত
এমন শান্তির বা আনন্দের মিলন ত কোথায়ও
লক্ষিত হয় না । কবি যেমন স্মরণোচনা-চরিত্রে
আনন্দের লহরী তুলিয়াছেন, এমন আদ-
মের মাকার সৃষ্টি তুলিতে বাক্যলয় করলম্ব
কবি দ্বন্দ্বকাব্য হইয়াছেন ?

পাঠক যদি “তুমি কখন ফুটন্ত কোল লুকে
শিখি, কিম্বদন্তীর মতো বোণ পূর্বক অব-

• সৌন্দর্য করিয়া থাক, কিবা নীল নভুলে
নকশারামির অঙ্গণে • সৌন্দর্য দেখিয়া থাক,
অথবা স্বন্দর জননীকোলে স্বন্দর শিশুর হাসি-
তরা বদনমণ্ডলের স্বর্গীর ভাব প্রতি চুটিপাত
করিয়া থাক বা জ্যোৎস্না-পুলোক্তিত স্বচ্ছ-
সলিলা তটীকীকরণে কুসুমিনী নারক চক্রমার
বিলোল হাত প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাক এবং ঐ
সকলের অঙ্গণে, মধুর সৌন্দর্য হৃদয়ে ধারণ
করিতে কৃতকার্য হইয়া থাক, তবে সুলোচনা-
চরিত্রের বহুরিমা অঙ্গুতব করিতে কিরংপরি-
মাণে সমর্থ হইয়া থাকিবে।

• সুলোচনা বৃষ্টি ভগবানের জ্ঞানিনী শক্তির
সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। এমন সকামে নিকামত্ব
ত কোথায় দেখি নাই। তাহার নিজের
বলিতে কিছুই নাই, কিন্তু কৃষ্ণার্জুন তাহার
পতিস্থানীর। এমন অমৃতমর ভাব সুলোচনা
চরিত্র তির আর কোথাও সূতবে না। অভি-
মত্যা তাহার পুত্রহানীর। অভিমত্যা তাহার
হৃদয়ের সর্বস্ব। এমন পরার্থে সমস্ত নিরোগ,
এমন নিকামে সকাম ক্রিয়া জগতে বিরল।
তিনি নিকাম কিন্তু তাহার নিকামত্ব সীমাবদ্ধ,
কিবা অভিমত্যা অস্ত্র তাহার নিকাম ভাব
সকাম মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। সেইজন্যই
জুহুপ্রতিষ্ঠিত নিকাম কর্ণের প্রতি তিনি বিরাগ
কটাক করিতে বিরত হন নাই।
তোমার নারীধর্ম নিরা মর গিরা মড়া ঘাটি,
আমার তাহাড়ে কাজ নাই।
আহত আমার প্রেমে স্বরং কৃষ্ণার্জুন, অস্ত্র
আহত সেবিতে আমি বাই।

উত্তর ও অভিমত্যা হই পুত্র কত মম
থাকিব লইয়া আমি বুকে।

এই মম নারীধর্ম থাকে যদি ধর্ম আর,
বারি শত কাঁটা তার মূখে। •

সুলোচনার জীবন আনন্দ-লহরী সম্বারে
শিখিত। সেইজন্যই হৃদয়েতে আনন্দকে

প্রতিমূর্তি প্রতিবছর মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গেই করিব-
বরী সুলোচনারও অন্তর্ধান সন্ধ্যোবিন্দু।
বৈকব কুবি যেমন বৃন্দাবন-লীলার সঙ্গে মদ্য
ভগবানের জ্ঞানিনী শক্তি রাখার বিলম্ব সংক-
টন করিয়াছেন, নবীন বাবুও, সেই প্রকার,
আনন্দময় প্রতিমত্যা বিলম্বের সহিত আনন্দ-
গত প্রাণ ভগবানের জ্ঞানিনী-শক্তি বহুশিখী
সুলোচনারও বিলম্ব সংঘোষিত করিয়াছেন।
ইহাতে কবির অন্তরঙ্গটির প্রভাব একাশিত
হইয়াছে। বৃন্দাবন-লীলার পর যেমন কৃষ্ণ-
লীলার জ্ঞানিনী শক্তির বিকাশ অন্তর্হিত,
সুলোচনার মৃত্যুর পরও এই কাব্যরসের ধর্ম
অমৃতমর আনন্দ-লহরী-লীলা অন্তর্হিত।

কাক।—কাক কবির এক অমৃত চিত্র।
বলিও মহাভারতে কাক নাগকস্তার উল্লেখ
আছে, কিন্তু তাহার বিশেষ কার্যের উল্লেখ
নাই। কাজেই এই কাব্যজগ্রে কবি কেবল
নামটী মাত্র ভারত হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন,
আর সমস্তই কবির নুতন সৃষ্টি। কাক
কিশোরী অবস্থার অীকৃষ্ণে হৃদয় অর্পণ করিয়া-
ছেন। কিন্তু সংসার-চক্রের কুটিল গুণ্ডিতে
অীকৃষ্ণ এই অনাজাত কুলের সৌরভ গ্রহণ
করিবার অবকাশ পান নাই। কিন্তু কৃষ্ণ
প্রাপ্তির ক্ষণ তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া-
ছিলেন। জীবন, যৌবন, আশা, ভরসা, সুখ
ও বিলাস, সমস্ত তিনি অীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া-
ছিলেন। তাহার ভালমন্দ নিচায় ছিল না।
শত্রুভাবে হউক, মিত্রভাবে হউক, অীকৃষ্ণ
প্রাপ্তিই তাহার মূল উদ্দেশ্য। অীকৃষ্ণকেও লাভ
করা চাই, আবার জাতীয় রাষ্ট্রাভিমান করা
চাই। সেই জন্য তিনি হুঁসিয়ার কণ্ঠ জী।
তিনি কৃষ্ণ প্রাপ্তির ক্ষণ না করিয়াছেন, এমন
কটাকাষ কার্য নাই। জীবন প্রান্তের সেই
মহা তীতিপূর্ণ কৃষ্ণকে, কাকেরে তিনি মন-

কল্পিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাপ্তি তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। ত্রিকৃষ্ণ অন্তের হয়, তাহা তাঁহার সহ হয় নাই। যখন সখ্যভাবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না, তখন তাঁহার হৃদয়ে প্রত্যাখ্যাত নারী জাতির প্রবল তাক-নাশ তিনি শুশ্রূষাপরায়ণা স্ত্রীজাতিকে বলি-তেছেন :—

অভাগিনী সূর্য্যমুখী মরে চাহি রবিপানে,
অস্ত্র দিকে তবু নাহি দেখে এক বার।
হায়! সূর্য্যমুখী মত চাহি সে রবি পানে
একপে জীবন বুকে ধাব শুকাইয়া।
আর নাগবালা আমি দংশিব তাহার বুকে
মারিব মরিব তারে এ-বুকে লইয়া।

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী তাহাই করিয়াছে। কৃষ্ণে একান্ত বিহ্বলা, অথচ তাঁহাকে পাই-তেছে না। অস্ত্র কৃষ্ণ প্রেমের লাভ করে, তাহা তাহার সহ হয় নাই। তাহার অভিমান নৈরাশ্রে অগ্নিগর্ভ ভূত্বের জ্বায় শেষে ভয়ানক অগ্নি উল্গীরণ করিয়াছে। তাহার সেই অভিমান-বিহ্বলা কৃষ্ণপ্রেম-উন্মত্ততার, তাহার হস্ত হইতে সহস্রা শরক্ষেপণ। সেই শর ভগ-বানের পদে নিপতিত বা তাঁহার সাদরে গ্রহণ। তাহার পরই তাঁহার ভগবান প্রাপ্তি। সেই মারাত্মক শরে যেন ভগবানের প্রেম-উৎস উদ্বোধিত হইল। অমনি ভগবান কাককে ত্রিঅঙ্গে ধারণ করিলেন :—

কণ্ঠ জড়াইয়া কাক অংগোপরে রাধি মুখ
কৌন্তভের মালা যেন বকে সূশোভিত,
বাম করে ধরি তারে, রাখিয়া দক্ষিণ কর
নাগরাজ শিরে, প্রেম অস্ত্র বিগলিত,
নাগরাজ বুধা শোক কর পরিহার!

যেজন যে ভাবে চায়, সে ভাবে আমাদের পায়
অভাবে মানিব করে সম অসুখার।

ইহা কি গীতার সেই প্রোক্তের জীবন্ত
প্রতিবৃতি নহে?—

যে যথা মাং প্রপঙ্তে তাং তৎখং ভজাম্যহং ।
মমবদ্যাহুবর্তন্তে মমুখ্যং পার্থ! সর্বশঃ ॥

কাক নারায়ণ বুকে নাই, বর্ণ বুকে নাই;
কবি দেখাইয়াছেন, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে মাতো-
দ্রারা। তিনি কৃষ্ণকে চাহেন। সেই ইচ্ছা
কবি কাক বুকে কেমন ফুটাইয়াছেন :—

তুনিয়াছি আত্মবিন তুনিলাম ত্রাতৃবুখে
তুমি নারায়ণ, তুমি পতিত পাবন।
না জানি কি নারায়ণ, পতিতপাবন কিবা,
এই জানি তুমি মম জীবন মরণ!
তুমি নয়নের আভা, তুমি রসনার সুধা,
তুমি মম জীবনের সঙ্গীত কেবল!
তুমি মম চির সুখ, তুমি চির দুখ,
সুখ দুঃখ মম্বনের অমৃত শীতল।

ভাসে এই দেহে, ভাসে অঙ্গে অঙ্গে,

কৃষ্ণ শিরি স্রোতে বহে।

হৃদয়েতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নয়নেতে,

অধরেতে কৃষ্ণ নাম।

শ্রবণেতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ দরশনে,

নাসিকারি কৃষ্ণ ভ্রাণ।

প্রেমের ইহা অপেক্ষা উচ্চাদর্শ রাখা ভিন্ন
আর কোথাও দেখি নাই। বাহার এমন
কৃষ্ণ-প্রেম, তাঁহার ত কৃষ্ণ প্রাপ্তি নিশ্চয়। তাই
কবি শেষে কাকের ভগবান প্রাপ্তি দেখাইয়া
কবিশ্বের পূর্ণ বিকাশ প্রদর্শন করিয়াছেন।
আবার সঙ্গে সঙ্গে কবির হৃদয়ে চিন্ময়ের
তরঙ্গ উথিত হইয়াছে। তাই তিনি বিহ্বল
হৃদয়ে গাইয়াছেন :—

যুগে যুগে মানবের নিষ্ঠুরতা আর,
করিবে কি এইরূপে ক্ষত দেহ অকোমল,
জড় ব্যাধ-ক্ষত যুগ শিশু অকুমাৰ
যুগে যুগে এইরূপ না হইলে রক্তপাত,
হায়! নাথ মানবের রক্ত কলুষিত—

হবে নাকি পবিত্রিত? গলিবে না পাণ-শিলা।

কবি আমাদের সম্মুখে আর এক ইবি
ঝরিয়াছেন, ঐতাদেশী বেদিত, ঐক্লেশ, পাপীর
অন্ধ, রক্তপাতের, গর্জ, কল্পিতা থাকেন, তাহা

সুন্দর নহে। ধাঁপরের শেবে ভগবান নিজ রক্ত যোষণ করিয়া লগ্নীর পাপ বিমোক্ত করার স্বপ্নপাত করিয়াছেন। বিস্তর রক্তপাত তাঁহার অমূল্যরত্ন মাত্র। ইহা কবির স্ব-কম্পনলব্ধিত নহে, মহাত্মারত্নই আছে :—

“ইত্যবসারে করা নামক কোন উগ্রমূর্তি লুপ্ত মুগ্ধাভিলাষী হইয়া সেই স্থানে আগমন করত শয়ান যোগযুক্ত মাথাকে যুগ বোধে সমস্ত শায়ক দ্বারা বিদ্ধ করিয়া গ্রেহাভিলাষে নিকট গমন করিল এবং নিকটস্থ হইয়া সেই যোগযুক্ত পীতাম্বরধারী চতুর্ভুজ পুরুষকে দর্শন করত আপনাকে কৃপাপরাধ বোধে সঙ্কিত মনে তদীয় চরণযুগল ধারণ করিল।” মহাভারত মৌলপর্ক চতুর্থ অধ্যায় বক্রবাসীর অনুবাদ।

শৈল।—শৈল নবীন বাবুর একটা অদ্ভুত অভিনব চিত্র। সুভদ্রা ভিন্ন ইহার সহিত অল্প কোন চিত্রের তুলনা হয় নী। আর্ধ্য কবি ভিন্ন অল্প কবির তুলিতে একুপ চিত্র ফুটাই অসম্ভব। আমাদের বোধ হয়, শৈল-চিত্রে কবি সাকার উপাসনার আচ্ছাদ্যমান প্রতিমূর্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠক মনোযোগ পূর্বক শৈল-চরিত্র পাঠ করুন। তাহা হইলে সাকার পূজার গুঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন। সাকার-পূজক প্রথমতঃ নিজের কোন অতীষ্ট সিদ্ধির মানসে ভগবানের কোনো শক্তি বিশেষ বা কোন দেব বা দেবীর মূর্তি বিশেষের প্রতি অমূল্যরত্ন হইয়া তাহার পূজা করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে জ্ঞানের উন্নতি বশতঃ ঐ ব্যক্তিগত বুদ্ধি লোপ পাইয়া সেই মূর্তিতে তিনি ভগবানের ষড়্-মুখ্য ভাব দর্শন করিতে থাকেন এবং চাহিতে তাঁহার ঈশ্বর-দর্শনের ফল লাভ হয়। ক্রমে তাঁহার নিজ অতীষ্ট সিদ্ধির ইচ্ছা লোপ পায় এবং ঐহা সর্ব আনন্দের নিদান হুত আনন্দ-

স্বর মূর্তিরূপে তাহার নিকট একটুকুভাবে প্রকাশ পায়। তিনি তাহার সেবাতেই নিজ সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা ও কামনা অর্পণ করেন। ক্রমে তাঁহার সাকার ভাব নিকামত্বে পরিণত হয়। তখন তাঁহার সাকার ভাব লোপ পায়। চরাচর সমস্তই এক ঈশ্বর তির স্তব কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহার নিকট আনন্দিক সমস্ত ক্রিয়াই যেন সেই ভগবানের খেলা বলিয়া প্রতীতি প্রাপ্য। সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সমস্ত পার্থিব ভাব তিনি ভগবানে অর্পণ করিয়া নিজে কি এক স্বর্গীয় ভাবে বিমোহিত থাকেন।

শৈলজা। প্রথমে অর্জুনকে পতিতাবে কামনা করিয়াছেন, এবং পতিতাবে তাহাকে পূজা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে অর্জুনকে শত্রু জ্ঞান করিতেন কিন্তু তাঁহার মায়া দর্শনে সে ভাব দূর হয় :—

সুনিলাম কাণে

শোকপূর্ণ অমূল্যতাপ জনকের তরে,
অনাধার অশেষে দেশ দেশান্তরে,
উঠিল হৃদয় ক্ষুদ্র, কঠিন অর্পণ
পিতৃহত্যা পদে এই অনাধার জীবন।

ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে অধিক দিন অর্জুন আর পতিতাবে স্থান পাইলেন না, ক্রমে অর্জুন তাহার হৃদয়ে একাধারে পিতা, মাতা, পতি, ভ্রাতা, পুত্র ও কল্লার স্থান অধিকার করিল। দেবতা জ্ঞানে তিনি অর্জুনকে পূজা করিতে লাগিলেন :—

এই চরাচর

হইল অর্জুনময়, হইল তময়।

কত পার্থ পতি, আমি প্রেমে আত্মহারা
কত পার্থ পিতা, আমি ভক্তিতে অধীরা।
কত পার্থ ভ্রাতা, আমি স্নেহে নিমজ্জিতা,
কত পুত্র পার্থ, আমি বাৎসল্যে পূজিতা।
কত পার্থ সখা, আমি সখী স্মিতা দিলী,
কত পার্থ প্রভু, আমি দাসী আত্মাধীনা।

কতু আমি পার্ব, পার্ব শৈলজা আমার,
অতির অতির কতু—নদী পারাবার।

কি হৃদয় উপাসনা, কি গভীর প্রেম,
উপাত্ত উপাসকের কি অতির ভাব। যখন
শৈলজার এইরূপ অবস্থা, সেই সময় তাঁহার
সৌভাগ্যে মতর্ষি ব্যাস তাঁহার আশ্রমে উপ-
স্থিত। মহাবীর উপদেশে অর্জুনের প্রতি
তাঁহার যে ভাব ছিল, তাহা ঐক্যে অর্পিত
হইল। তিনি পূর্ণ-মনোরথ হইলেন, তাঁহার
উপাসনা সফল হইল।—

শৈল !

সিদ্ধম্ভব পার্ব পুত্রা, পুত্র তুমি এবে
পার্বরূপে ভগবান, অনন্ত হৃদয়,
অনন্ত মহিমান্বয়, প্রেম পারাবার।
ধাকে যদি কণামাত্র কামনা উত্তাপ,
হৃদয়ে নিবিবে, শাস্তি পাইবে পরম।

কবি এই ছলে সংস্করণে সেই মানব হৃদয়ের
উপর অনন্ত প্রভাব প্রদর্শন করাইয়াছেন।
এখন শৈলহৃদয়ে যে ভগবান প্রীতির প্রেম
উৎখিত হইল, সেই প্রেম মানবের স্বর্গের সোপান
সে প্রেমে আসক্তির করণি ভাব বা কামনার
ছাড়া মাত্র রহিল না। শৈলহৃদয়ে স্বর্গীয় কি
এক প্রেমের হিলোল উঠিল। শৈল শাস্তি
পাইল ও তাহার হৃদয় পরিষ্কৃত হইল। সমস্ত
কামনা ভগবানে অর্পিত হইল। সেই ক্ষণেই
প্রাণাদিক অতিমাত্রায় মুক্তান্তেও তিনি বিচ-
লিত নহেন। তাহার কামনা ভগবানে অর্পিত,
তাঁহার সমস্তই ভগবানে মিলিত। তিনি
প্রেমকণ্ঠে বলিয়াছেন :—

ওই সর্ব শোক মিবারণ

দীড়াইরা নাগরূপ শাস্তি প্রাপণ,

শাস্তির জিহব বৃকে

পুত্র সবর্ণিরা হৃদে

করি আশ্রয়ন শোক চরণে অর্পণ

প্রেম হৃদে কক্ষ নক্ষ হৃদয় আশ্রয়।

এই ভাবই মহাভারতের পূর্বস্ব, এই ভাবই মহা-
ভারতের শেষ কামনা, অথবা সিদ্ধাবস্থা। এ
আদর্শের কি আর ব্যাখ্যা আছে? তাই
বলিতেছিলাম, কবির শৈলজা চিত্র অতুল বা
শৈলজার কবির কবিত্ব। এরূপ কবিত্ব বর্ণ-
কাব্যোদ্যানে বড়ই বিরল। এখানেই কবির
শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্পনা-চাতুর্যের পূর্ণ বিকাশ।

আবার বলি, শৈলজা চিত্র সাকার পুত্রার
পূর্ণ বা অলস্ত আদর্শ। এমন সাকার পুত্রার
আদর্শ আর কোথাও দেখি নাই। সাক
কেমন অনন্তে মিলিত হয়, অতু কেমন চিত্রে
পরিণত হয়, কামনাস্রোত কেমন নিকাল
পারাবারে নিশিরা যায়, তাহার এক অলস্ত
আদর্শ কবির শৈলজা চিত্র।

শৈল ও কার উভয়েই কামনার প্রস্রবণ।

প্রথমে অর্জুন ও কেশবহৃদয়ে কামনা-অগ্নি
প্রজ্জ্বলিত হয়, সেই অগ্নি নির্মাণ
করিতে ছইজন ছই পথে গমন করি-
য়াছেন। শৈল যে পথে গমন করিয়াছেন,
সে পথ শাস্তিময়, সেই কারণে শৈল বতই
অগ্রসর হইয়াছেন, ততই তিনি শাস্তিময়ী
ও কারুর পথ কটেকময়, সেইজন্য কার বতই
অগ্রবর্তিনী, ততই অশান্তি, ততই আবেগময়ী,
ততই নিরাশা, ততই অশান্তির আগুন তাহার
হৃদয়ে প্রবলতর হইয়াছে। স্রোতবতী তরঙ্গ-
ময়ীই হটক, আর শাস্তিময়ীই হটক, সেই
অনন্ত মহাসাগরেই 'তাঁহাদের পরিণতি।
কবি দেখাইয়াছেন, বিপদের কল অশান্তি ও
স্রপথের কল চিরশাস্তি। সেইজন্য কারুর
হৃদয় বিরহ-বিবে অর্জুরিত, আর শৈলের হৃদয়
ক্রমে শাস্তিময়ী।

অনেকে বলিতে পারেন, নদীর বাবু এই
সে অসংখ্য বর্ণিত অতির উপাসন কেউ করণ
করিয়াছেন, তাহা কেমনভাবে দেখাইবে?

আমরা বলি, ইহাও তাঁহার একেবারে স্ব-কপোল করনা নহে? মহাত্মারভেই ইহার নির্বাক ইঙ্গিত আছে :—

“কেশব পার্শ্বস্থিত বক্ষর প্রতি দৃষ্টিনির্দেশ করত বলিলেন, আপনি সম্বর দ্বারকানগরে গমন করিয়া রমণীগণকে রক্ষা করুন। যেন দম্পত্য ধনলোভে তাহাদিগকে হিংসা করিতে না পারে। জ্ঞাতিবধ সন্তপ্ত বহুমন্ত বক্ষরিত্যক্ত প্রান্ত হইলেও কেশব কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া প্রস্থিত হইতেছেন, ইত্যবসারে ব্রহ্মশাপ বশতঃ কোন লোকের একটা কুট সংযুক্ত দ্রবস্ত্র মুদল সহসা আপতিত হইয়া কক্ষের সন্নিধানেই তদীয় জীবন হরণ করিল।”

মহাত্মারত মোঘল পক্ষ—চতুর্থ অধ্যায়।

বঙ্গবাসীর বর্জমান অসুবাদ।

এইরূপ বধ কি কোন প্রজন্ম শত্রুভূত নহে? আর এই ইঙ্গিত কি কবির পক্ষে বখেট নহে? আবার ক্রকও এইরূপ কোন লক্ষ্য কর্তৃক বিদ্ধ। ইহাতে কি একটা বক্তব্যের আভাস পাওয়া যাইতেছে না?

কবি কোনও হুজ অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিয়া থাকেন, কিন্তু কোন কবিই ত সেই আদর্শের সহিত সর্বতোভাবে এক পথে গমন করেন না। কবি নূতন নূতন ফুল তুলিয়া তাহার কাব্য গ্রন্থকে সাজাইয়া থাকেন। মহর্ষি বাম্বীকির রামায়ণের অমুকরণে অনেক রামায়ণ হইরাছে। সকলেই কি মহর্ষির কৃত রামায়ণের সহিত একপথে গমন করিয়াছেন? মহাকবি কালিদাস মহর্ষি বাম্বীকির রামায়ণ অবলম্বন করিয়াই রঘুবংশ রচনা করিয়াছেন, তিনি কি তাহাতে নূতন নূতন ফুল সন্নিবেশ করেন নাই? মহাকবি-কালিদাস পশুস্তলা লিখিয়া মহাত্মারভের সেই অস্ব-কাব্যে মহর্ষি-নির্দেশিত পথ ভিন্ন অন্য পথে

কি গমন করেন নাই? বসি তাঁহার ক্রকপথে গমন করিয়া রতনা-নৈপুণ্যে কাব্য-অগন্তে সুমর হইয়াছেন, তবে আমাদেব করনা-কোশলী নবীন বাবুই বা কেন তাঁহার এই অমুগম সৃষ্টি-চাতুর্য্যে অমর পদবীতে ভূষিত হইতে পারিবেন না?

কবিতা জীবনের পথ সন্ধান করে। কল্পনা শক্তিকে অনন্ত বিরাট পথে প্রাবল্যিত করিয়া ইহলগ্নে ভগবানের কৃত লীলা প্রকটিত করে। কবিতা মনেই দৃষ্টিনির্দেশকে ক্ষুণ্ণি বিশিষ্ট করে। অস্ত্রে যে সূত্র বস্মেও কল্পনা করিতে পারে না, কবির শিকট তাহা অতি সুলভ। সাধারণ লোক বাহাতে কোন রসের সত্তা অমুভব করিতে অসমর্থ, কবি তাহাতে নব রসের লীলা-ক্ষেত্র অবলোকন করিয়া নিলেও বিভোর হন ও অপর সাধারণকেও তাহার স্তরে স্তরে হান্ত, করণ, বীতংস, ও বীর রসের লহরী-লীলা অবলোকন করাইয়া বিশ্বর সাগরে নিমগ্ন করিয়া থাকেন। এক কথার সাহিত্যে মানব হৃদয়কে কি এক স্বর্গীয় মদিরা পানে পবিত্র সূত্র-তরুর উল্লসিত করিয়া রাখে। সে সূত্র কবিতা-সেবী ক্লিন্ন অন্যের উপভোগ্য নহে এবং কবিতা-সেবী ভিন্ন অন্য কেহ সে বিমল সূত্রের অধিকারীও নহে।

কবি কোন নিয়মে আবদ্ধ নহে; কিংবা কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রদর্শিত পথের পথিক নহে। ইহার পথ নিত্যই নূতন, কবি কখন পুরাতন পথে গমন করেন না। পরোপদ্রষ্ট মার্গে গমন করা কবির অবমানকর। কল্পনার কবি হৃদয়কে এক উল্লসিত পথে প্রাবল্যিত করে। সেই অমৃত কল্পনা শক্তি বলে কবি যেন সধীই বলীমান, সেই প্রজ্ঞা কবি-অস্ত্রের প্রদর্শিত পথকে সধীই স্বপ্নের ঢকে অবলোকন

করেন, এবং কি এক অমৃত রসে অভিষিক্ত হইয়া তিনি যেন, কি এক স্বর্গীয় অমৃতময় পথে সদাই বিমুগ্ধ ভাবে প্রধাবিত। আবার নবীন বাবুর পক্ষে এ নিরন্তর অস্ত্রধা ভাব লক্ষিত হইবে কেন? তাঁহার কাব্য পড়ুন; কখন হস্ত কখন করুণ প্রভৃতি নানা রসে বিভোর হইয়া কবিকে তত্ত্বি পূর্ণ পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা স্বতঃই পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

উপসংহার ।

বঙ্গের কোন কৃতি সন্তান বলিয়াছেন, “বে ভাষাতে ভাবের ছায়া স্পষ্টতঃ লক্ষিত হয়, তাহাকে উৎকৃষ্ট ভাষা বলা বাইতে পারে। এইরূপ ভাষাকে ইংরাজীতে ভাবের প্রতিধ্বনি কহে।” কবির নবীনচন্দ্রের কবিতার বহু স্থলে এইরূপ কবিতার সন্নিবেশ লক্ষিত হয়। অনেক স্থলেই বোধ হয় যেন কবিতাগুলির ভাব স্বচক্ষে পরিদৃশ্যমান হইতেছে :—

ওই শুন বাজে বাঁশী, ওই ডাকে—“আর! আর!
“এই বাই, এই বাই” প্রেমে রোমাঞ্চিত কার
ছুটিলা বাঁহুকী বেগে, নাচি কত তালি দিয়া,
ধরিলেন ধনঞ্জয় হুই বাহ প্রসারিয়া।
“বাক মান, বাক কুল, ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও!
জীবন যৌবন নাথ! নেও তুমি সব নেও!”
কাদিতে কাদিতে ভাবাবেশে মূরছিত
হইল পাথের বকে, হুই বক সন্নিহিত।

ঘোর গরজন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
ভৈরব বিক্রমে ঝটিকা বৃণিত;
রহিয়া রহিয়া, আসিছে বাইছে,
আঘাতে, পৃথিবী করিয়া কম্পিত।

কার্য্যক্ষে আবার বন হইত পুরিত
জুগতীর সুন্দরীদে, বেণুব বঁকায়ে।
ভামণী, ধবলী, লালী! বলি উঠে: স্বরে
উজ্জ্বল রংগালগণ আসিত ছুটিয়া
ভামণী, ধবলী, লালী, লইয়া।

অকৃত তুণের প্রাণ, প্রাণিত আদরে
আপন রাখাল দেহ।—

এইরূপ ভাষা বাস্তবিকই ভাবের প্রতিধ্বনি। নবীন বাবুর কাব্যে অনেক স্থলেই এইরূপ প্রতিধ্বনি লক্ষিত হয়।

বঙ্গালা সংস্কৃতির আদরের কল্পা। সংস্কৃতির ন্যায় বঙ্গভাষাও প্রথমে কবিতাকারে প্রকাশিত হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই বঙ্গালা গদ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। প্রথমে যে সকল বঙ্গালা গদ্য পুস্তক বাহির হয়, তাহা পাঠ করিলে এখন পাঠকের সেই পুস্তক বঙ্গালা কি অন্য কোন ভাষার বলিয়া সন্দেহ হওয়ারই স্বাভাবিক। রাম রাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিতের লিখন প্রণালীর সহিত বিভাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর তুলনা করিলে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। সেই প্রকার বঙ্গালার বাল্য কবি ঘনরামের কবিতার সহিত মাইকেল কি নবীন বাবুর কবিতা তুলনা করিলে অল্পত পার্থক্য অল্পভূত হইবে। ইহারই নাম ভাষার বিবর্তবাদ বা ক্রমোন্নতি।

প্রথমে যে সকল মহাত্মা মাতৃ ভাষাকে কবিতা-মালায় সজ্জিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কুন্তিলাস, কাশীদাস ও যুক্তেশ্বর চক্রবর্তী বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। প্রথমোক্ত কবি-দ্বয় রামায়ণ ও মহাত্মারত্নের পদ্যাকারে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। কাশীদাসী মহাত্মারত্ন ও কুন্তিলাসী রামায়ণের ভাষা সরল, প্রোজল ও মাধুর্য্যগুণবিশিষ্ট কবিতা। শুধু বঙ্গালার কেন, অত কোন ভাষায়ও আছে কি না সন্দেহ? সরলতা ও মধুরতা গুণে কুন্তিলাস ও কাশীদাস সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত। যত দিন বঙ্গভাষা থাকিবে, তত দিন, সাধারণ কর্তৃক মধুর কুন্তিলাস ও কাশীদাসের

সাধা স্বাক্ষরিত হইতে থাকিবে। কৃত্তিবাসের
সাময়িক ও কাশীদাসের মহাভারত যেমন
বঙ্গালীভাষায় অধিকার করিয়াছে, এক্ষণে বৃষ্টি
আর কিছুতেই করিতে সমর্থ হইবে না।
কিন্তু কবিত্ব হিসাবে কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের
প্রতিভা তত সূর্যগামিনী নহে। চরিত্র
চিত্রণে তাঁহারা উভয়েই কলঙ্কিত। মধুর
সরল অনুবাদের প্রতিভা ভিন্ন বিশেষ কোন
উদ্ভাবনী শক্তি তাঁহাদের কাব্যে লক্ষিত হয়
না। যেখানে তাঁহারা মহর্ষিদের নির্দেশিত
পথ অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন,
সেখানেই তাঁহাদের পদাঙ্কন হইয়াছে। এই
পদাঙ্কন অনেক স্থলে বড়ই সাত্ত্বাত্তিক।
তাঁহারা অনেক চিত্রই যেন মহর্ষিদের বর্ণিত
চিত্র অপেক্ষা খাটো করিয়া কেলিয়াছেন।
কৃত্তিবাস অপেক্ষা কাশীদাসই এ দোষে
অধিকতর দোষী। তিনি স্বর্ণ প্রসঙ্গে দ্রোণ-
দ্বীর এমন উজ্জ্বল চরিত্রেও কালিয়া প্রদান
করিয়াছেন। দ্রোণ, ভীষ্ম প্রভৃতিকেও
দ্রোণদ্বীর লজ্জা লক্ষ্যভেদ করিতে প্রয়াসী
করিয়া ব্যর্থমনোরথ করিয়াছেন। কণ্ঠ প্রভৃতি
অনেক চরিত্রই তাঁহার হাতে তেমন ভাষার
হয় নাই। বিশেষ বিবেচনা করিতে গেলে,
কৃত্তিবাস বা কাশীদাসকে অনুবাদক ভিন্ন
কবি-প্রেরীভূক্ত করা কাহাতে পারে না।

কবিত্ব-হিসাবে ধরিতে গেলে যুক্‌ন্দরাম
চক্রবর্তী বা কবিকঙ্কন আমাদের প্রথম কবি।
তাঁহার কবিত্ব ও কল্পনাশক্তি অতি অল্প।
তাঁহার চণ্ডী কাব্য বড়ই কবিত্বপূর্ণ, হৃর্ভাগ্য-
ক্রমে তাঁহার অবলম্বিত ঘটনা তত উচ্চতর
নহে এবং তাহাতে তেমন বিচিত্রতা লক্ষিত
হয় না। বিশেষ উচ্চ অঙ্গের চরিত্রচিত্রণে
তিনি তত সিদ্ধহস্ত নহেন।

তাঁহার পরই আমরা ভারতচন্দ্রের দ্বায়ে

আসিয়া পড়ি। ভারতচন্দ্রের ভাষা অতুলনীয়,
এমন মধুর-স্বাক্ষরী শিক বঙ্গকাব্যোত্তানে আর
নাই বলিলে অতুক্তি হয় না। তাঁহার সেই
মধুর প্রাঞ্জল ভাষা, তাঁহার সেই অমৃতবর্ষী
কবিতা-ভরঙ্গ যেন হৃদয়ের তন্ত্রী উপর মধুর
স্বাক্ষর করিয়া হৃদয়ের অতৃপ্ত লালসা আরও
বর্দ্ধিত করিয়া যায়। তাঁহার কল্পনা শক্তি ও
রচনা-বিচিত্রতা অতি উচ্চ অঙ্গের। কিন্তু
বঙ্গবাসীর হৃর্ভাগ্য এ হেন সরসভীর বরপুত্র
বড়ই সুপথে গমন করিয়াছেন। সেই পবিত্র
দোষে তাহার মনোহর গদ্যবিশিষ্ট পুস্তাকজি-
দেব চরণে অর্পিত হওয়ার অবোধ্য। তাঁহার
ভাষা কোকিলকুজনবৎ স্বাক্ষরিত এবং মন
প্রাণহারিনী; এবং ভাষার লাগিত্য ও মধুরতা-
গুণে তাঁহার কাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেও কুরুটি-
বাহুল্যে তাহা অতি নীচ স্থান অধিকার
করিয়াছে। আহা! তাহার অবলম্বিত বিষয়
যদি পবিত্র হইত, তাহা হইলে আমরা
তাঁহাকে আজ বঙ্গকাব্যোত্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ
আসন প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না।

তাঁহার পর আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্মুখে
আসিয়া উপস্থিত হই। ইহার পূর্বে বৈষ্ণব
কবিদের দ্বারা মাতৃভাষা সুলভ অলঙ্কারে
অলঙ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সেই
সকল একঘেয়ে তত্ত্বসাম্রাজ্য গ্রাহ। তাঁহার
কোনখানি কাব্য নামে অভিহিত হও-
য়ার বোধ্য নহে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই আমাদের
পূর্ব ও আধুনিক কবিতা-যুগের সঙ্গম-স্থান বা
মহান মধ্যস্থান রেখা। তিনি কবিতাত্রোভ-
বর্তমান আকারে পরিণত করার সূত্রপাত
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কবিতারূপ
যেন কিছু তরল। তাঁহার কবিতা অতি
স্বয়ংপ্রাণী হইলেও তেমন গভীর নহে।
তাঁহার অবলম্বিত বিষয়গুলিও অতি সাধারণ।

আমাদের জুর্ভাগ্যক্রমে তিনি তেমন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কাজেই আমরা এই মহাকবির নিকট সাধারণ কবিতা ভিন্ন কোন কাব্য গ্রহণাই নাই। কিন্তু তিনি বাংলা দিয়াছেন, সেই অমৃতপূর্ণ কবিতাগুলি চিরকাল বঙ্গ-সন্তান পাঠ করিরা কৃতার্থ হইবে।

ঈশ্বরচন্দ্রের পরই—আমরা কবিকুলচূড়া-মণি মধুসূদনের অমৃতময়ী স্বাক্ষর শুনিতে পাই। ইনিই প্রথমে বাঙ্গালার অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। বাস্তবিক পক্ষে ইনিই বাঙ্গালার প্রথম বিশুদ্ধ কাব্য প্রণয়ন করেন, তাঁহার মেঘনাদবধ, তাঁহার ব্রজাঙ্গনা তিলোত্তমা প্রভৃতি কাব্য বঙ্গকাব্যোদ্যানের উজ্জ্বল পুষ্পগুচ্ছ, বহু দিন বঙ্গভাষা থাকিবে, তত দিন বঙ্গবাসী তাঁহার অমৃতময় মধুচক্র-নিঃসৃত অমিয়পানে বিভোর থাকিবে। মাইকেল বঙ্গ-কবি-সমাজের বরণীয়, তাঁহার ভাষা অনেক কবির গুরুস্থানীয়। আধুনিক কবিদের মধ্যে তাঁহার কবিতা লালিত্য কিম্বা মধুরতার অন্ত কাহারও কবিতা হইতে কোনংশে হীনতর নহে। বরং অনেক স্থলেই গুরুস্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলেই তাঁহার কাব্যগুলি ব্যাকরণ দোষে দূষিত। তাঁহার কাব্যের অধিকাংশ স্থলেই বিজাতীয় কবির ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার কবিতার উদ্ভাবনী শক্তিতে যদি এই দোষ না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা উদ্ভাবনী প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিতাম। তিনি পাশ্চাত্য ছাঁচে চিত্রিত করিতে গিয়া রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতি মর্ষি-চিত্রিত ভাষার চিত্র-তুলিতে বড়ই কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার অবশ্য রক্ষকুল-প্রীতি অন্ত বৈদেহো-গন্ধ চরিতাবলীতে, কালিদাস লেপন করিয়া-

ছেন, তাহাতেই তাঁহার কাব্য যেন একটু হীনপ্রভ হইয়া পড়িরাছে। তাঁহার কাব্যগুলি ভাব্য, পাণ্ডিত্যে ও লালিত্যে অভুলনীয় হইলেও চরিত্র-চিত্রণ দোষে তাঁহাকে আমরা বড় দূষিত মনে করি।

ইহার পরই আমরা রঙ্গলাল বাবুর প্রাভাতিক পিক স্বাক্ষরবৎ মধুর কবিতাবলীর তানে মোহিত হই। তাঁহার কাব্য প্রধানতঃ বীর রসপূর্ণ, চরিত্র চিত্রণ বিষয়ে তিনিই প্রথমে অগ্রসর হইয়াছেন। এই চরিত্র-চিত্রণ হেম বাবু ও নবীন বাবু কর্তৃক শেষে পূর্ণতর পরিণত হইয়াছে। আমাদের জুর্ভাগ্যবশতঃ এই পিক বঙ্গ-কাব্যোদ্যানে আসিয়া মধুর গান গাইতেছিল, সহসা একথানা কালমেঘ দেখা দিল, অমৃতবর্ষা পাখী কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, আর ফিরিল না। তাহার সে স্বাক্ষরে আমরা বঞ্চিত হইলাম।

ইহার পরই আমরা হেম বাবুর কবিতা-স্বাক্ষর বঙ্গ কাব্যোদ্যানে শুনিতে পাই। তাঁহার সঙ্গীত নানা পথগামিনী ও মনপ্রাণ-উন্মাদিনী। উভয়েই চরিত্র-চিত্রণে সিদ্ধহস্ত। লালিত্যে অনেকস্থলে ইঁহার মাইকেল অপেক্ষা কিছু হীন হইলেও চরিত্র চিত্রনে ইঁহাদের তুলনা নাই। কল্পনাশক্তিতে ইঁহারা অধিতর। কবিত্তে ইঁহারা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। আমাদের পুরাণোক্ত ইন্দ্র, পোলমী প্রভৃতির চরিত্রের সহিত হেমবাবু-চিত্রিত উক্ত চরিত্রগুলি মিলাইয়া দেখ, আর মহাভারতীয় বা পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণ ভদ্রা প্রভৃতির সহিত নবীন বাবু-চিত্রিত উক্ত চরিত্রগুলির তুলনা কর, আর দেখ, কেমন চিত্রকর ও কেমন চিত্র।

নবীন বাবু-চিত্রিত চরিত্রগুলি কত মহান ও ভাষ্য, তাহা আমরা ব্ৰাহ্মস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। করিষ ও কবিতার সর্ববিষয়ে

বিশেষ অনুধাবন করিয়া বিচার করিলে আমরা হেমবাবু ও নবীন বাবুকে বঙ্গ-কাব্যোন্মাদনের সর্বপ্রথম আসনধর প্রদান করিতে পারি।

গান্ধীর্ষ্য ও ভাবগ্রাহিতা গুণে নবীন বাবুর কবিতা অতুলনীয়। পূর্বে যে সকল স্থল উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার উপর দৃষ্টিপাত করিলেই এই বিষয় পাঠক বুঝিতে পারিবেন। পলাশীর যুদ্ধকাব্যের প্রারম্ভ ভাগ যেমন গভীর, তেমনি বিস্ময়কর। এইরূপ গান্ধীর্ষ্য মাইকেলের মেঘনাদবধের প্রারম্ভ ভাগ ভিন্ন বাঙ্গালার আর কোন কাব্যে লক্ষিত হয় না। ইহা শ্রুতের নহে, দৃশ্যের বা শোকের পূর্ণচিত্র অথচ কেমন মনোহর। ইহা বুঝি কণ্টকময় বৃন্ত-স্থিত গোলাপ অথবা উগ্রতর বিবধের মস্তক-মণি।

উদ্ভাবিনী শক্তিতে নবীনচন্দ্র অধিষ্ঠীয়। কবির শৈলজা ও কারু প্রভৃতি চরিত্র তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। নবীন বাবু কল্পনা শক্তি দূর প্রসারিণী, তাহা বধ্যস্থানে আমরা দেখাই-
রাছি। নবীন বাবুর কবিতা অমুকরণ দোষে দুষ্ট নহে। এই দোষে বাঙ্গালার আধুনিক প্রায় সমস্ত কবিই দূষিত। মাইকেলের মেঘ-
নাদবধ কাব্যে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত স্বপ্নে পর-
লোকগত দশরথের দর্শন পাশ্চাত্য ছায়ায়
কলঙ্কিত। এইরূপ তাঁহার চিত্রিত অনেক
চরিত্র ও বিষয়ে, পাশ্চাত্য কলঙ্করোপ স্পষ্ট

বিরাজমান। হেমবাবুর বৃজসংহারের বিধ-
কর্ম্মায় কর্ম্মস্থল বর্ণনাটি ও তাঁহার ছায়াবর্ষা
কাব্য ইঙ্গলণ্ডীর কোন কোন কবির পূর্ণ অনু-
করণ। ইহা ভিন্ন তাঁহার কৃত “বৃজাস্ত্রবধ”
কাব্যের আরও কয়েকস্থানে অমুকরণ-গন্ধ
অনুভূত হয়।

নবীন বাবুর শেঠভবনের মন্ত্রণাগৃহ বর্ণন
স্থলে Milton's Paradise Lost নামক
মহাকাব্যের দ্বিতীয় সর্গের ছায়া পড়িয়াছে
বলিয়া প্রথম দৃষ্টিতে অনুমিত হয়, কিন্তু মিল্ট-
নের সে স্থল কাল্পনিক জীবে পূর্ণ, আমাদের
শেঠভবনের মন্ত্রণাগৃহ ইতিহাস-বিশ্রুত বিখ্যাত
ব্যক্তিদের সমবায়ে গঠিত। ইহা কাল্পনিক
নহে, প্রকৃত ঘটনা। কাজেই কিছু সাদৃশ্য
 থাকিলেও নিকৃষ্ট অমুকরণ নহে। পলাশীর
যুদ্ধের দ্বিতীয় সর্গে ‘আশার বর্ণনা’ অংশটি
অতি উপাদেয় হইয়াছে। অনেকে বলেন,
উহাতে কবির ক্যাথলিকের অমুকরণের ছায়া
পড়িয়াছে। আমরা অমুকরণের কোন গন্ধ
পাইতেছি না। উভয় কবিরই উদ্ভাবিনী
শক্তি পৃথক পৃথক। পাঠক যদি ঐ বিভিন্ন
দেশীয় কবির চিন্তাস্রোত একত্র করিয়া পাঠ
করেন, তাহা হইলে উভয়ের পৃথক পৃথক
কল্পনাশক্তি দর্শনে সুখ হইয়া কবিধরের তৃপ্তি
প্রাপ্তসা করিতে থাকিবেন।

শ্রীমতিনাথ মজুমদার।

লাদক !

(অপূৰ্ণ দেশের বিবরণ)

প্রখ্যাত পরিভ্রমকগণ জম্মু ও শ্রীনগর 'হিলেন ; তিনি কহিয়াছেন "সমস্ত আসিরা মহাদেশ মধ্যে লাদক এক অপূৰ্ণ স্থান । বিশেষতঃ প্রাধান্যে ইহা অতুল । এই প্রদেশ শোভার ভাণ্ডার, ইহা জম্মু, শ্রীনগর ও উদয়পুর হইতেও অধিকতর বরণ্য । লাদক না দেখিয়া প্রত্যাগমন করিলে, প্রাচ্য দেশের সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠতম স্থান দেখিতে বাকী থাকিয়া যায় ।"

বিশ্ব ও বিবাদের বিষয় এই, লাদক প্রদেশ কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও পথিকেরা ইহা দর্শন করেন না । দুর্গমতা ইহার কারণ হইতে পারে, কিন্তু সে কারণ মার্জনীয় নহে । কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া লাদকে না যাওয়া, আর কলিকাতা মহানগরীতে প্রবেশ ও অবস্থান পূৰ্ব্বক কালীবাট দর্শন না করা একই কথা । লাদক, কাশ্মীরাদিপতি মহারাজার শাসন ও অধিকার ভুক্ত, কিন্তু এই অদ্ভুত প্রদেশ কাশ্মীর দেশের সীমান্তবর্তী বা অন্তর্ভুক্ত নহে । অনতিপূৰ্ণ কালে কাশ্মীর এবং কাশ্মীর প্রান্তর হইতে বহুদূর পর্যন্ত কাশ্মীরাদিপতির রাজ্য ছিল, চিহ্ন প্রভৃতি করেকটা রাজ্য ক্রমে ক্রমে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের 'করতলগত হইয়াছে, কিন্তু লাদক অত্ৰাপি মহারাজার সম্পত্তি । প্রভাস তীর্থ, দ্বারিকাপুরী প্রভৃতি বরোদা

মহাভারতীর এই একই তীরী জীবনের শেষ অবসর । যত্নাশ্রয় করা করিয়াও বঙ্গভাবার সেবার কথা তিনি ভুলিতে পারেন নাই । তাঁহার জীবন রহস্যময় হইলেও একথা ঈর্ষবানীসম্মত যে, তিনি বাদালাভাবার বেগুণ পরিচর্যা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাম সুখীকাল দ্রুতিতে থাকিবে । ২৬ সে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩১৩, তিনি বদায়ের করিয়াছেন । তাঁহার ইচ্ছাতে আদর্য্য বারপর নাই মনোকেট পাইরাহি । বিধাতা তাঁহার আশ্রয় কল্যাণ করিল । ২৬ ।

হইতে বহুদূরে অবস্থিত হইলেও ইহারা যেমন
বরোদাধিপতি মহারাজারই অধিকারভুক্ত,
তেমনি লাদক, কাস্মীর রাজ্যধিপতি মহা-
রাজা বাহাদুরের সম্পত্তি ও শাসনভুক্ত।
কাস্মীরের সীমান্ত হইতে লাদক অতিদূরে
অবস্থিত।

পাঠকেরা কহিতে পারেন, অসংখ্য অতুল
গোলাপপ্রস্থর রাশি কাস্মীরকে সৌরভে ও
সৌন্দর্য্যে গোরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে,
লাদকে তাহা আছে কি? উত্তরে আমি
কহিতে পারি, লাদক তো আপনি দেখেন
নাই, স্তভরাং এইরূপ প্রশ্ন করিবার অধিকার
আপনার আছে কিনা সন্দেহ। লাদকের
তরুলতা, কুঞ্জ, গুল, ফুল, সংখ্যায় প্রচুর-
তর এবং তুলনার শ্রেষ্ঠতর। কাস্মীরের
রমণী সৌন্দর্য্যের খনি বলিয়া অনেকের
বিশ্বাস; কিন্তু গোলাপপ্রস্থর পরিপূর্ণ কাস্মী-
রের গোলাপী রংভরা রমণীর মুখমণ্ডলের
সুগঠন কৈ? বর্ণটাই ভাল, কিন্তু চোখ,
মুখ, জ, নাসিকা ইত্যাদির সুগঠন কোথায়?
তাহার পরে আর এক কথা এই, কাস্মীরের
রমণী কুড়ি হইলেই বুড়ী হইয়া যায়, আর
লাদকের রমণী? দুইটি বা তিনটি ছেলে
যেহেতু “মা” হইলেই কাস্মীরের স্কন্দরী
একেবারে সৌন্দর্য্যের সীমা হইতে—
অধিক কি মহাশয়ের সীমা হইতে সম্পূর্ণ
স্বতন্ত্রা হইয়া স্কন্ধের আলিয়া পৌছেন; তখন
তিনি নারী কি বানরী, কিছুই ঠিক করিয়া
উঠিতে পারি না। লাদকের নারীকুল চির-
যৌবন ভরা, ইহাদের ঘরে, বাহিরে ও শরীরে
চিরদিনই বসন্ত। বর্ণে ও গঠনে কাস্মীর-
রমণী ইহাদের পরিচারিকা; পঞ্চাশ বৎসর
বয়স হইলেও যৌবন, উৎসাহ, ভেজ, বীরত্ব
ও সাহসাদি নষ্ট হয় না। তখনও তরবারি

হাতে লইয়া, আবস্তক হইলে, এই প্রাচীন
প্রদেশের বৌদ্ধ ও হিন্দুভাতি মহাবীরের ভাষা
সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ। হইতে পারে। দুই
চারিটা সন্তান বা সন্ততির প্রসূতি হইলেও,
যৌবনের সৌন্দর্য্য, মানসিক ভেজ, দৈহিক
শক্তি প্রভৃতি নষ্ট হয় না। লাদকের প্রত্যেক
রমণীই স্বাস্থ্য-সুখভোগিনী, ব্যায়ামে শিক্ষিতা,
বীরগৃহে পালিতা, বলবতী, বুদ্ধিমতী ও স্বদেশ-
প্রিয়া। এখন বল দেখি, লাদকের কাননের
ফুল ও গৃহের রমণীকুল, কাস্মীর অপেক্ষা
অতুল কিনা? অথচ লাদকের রমণী সতী-
শ্রেষ্ঠ।

লাদক-প্রদেশে গমন করিতে হইলে,
মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, পার্শ্বতীর তুরঙ্গ, তির্য্যতীর
“ইয়াক্” নামক যৎ অথবা বলদ-শকট আব-
স্তক হয় না, কারণ এই সকল বান-যোগে
লাদক বাইবার সুবিধা নাই। অথপূর্বে অনেক
পথ অতিক্রম করা যায়, কিন্তু সমুদ্র পথ নহে,
এই অর্থ আমাদের দেশীর ঘোড়া নহে, পার্শ্ব-
তীর বলবান ও অত্যন্ত অর্থ। কাস্মীর ও
লাদকের মধ্যস্থলে “বোজী লা” নামক ১১৩০০-
ফিট উচ্চ গিরিমালা দণ্ডায়মান আছে, এই
পর্ব্বতমালা লাদককে কাস্মীর হইতে বিচ্ছিন্ন
করিয়া রাখিয়াছে। কোজী লা, নামিকা লা
প্রভৃতি পাহাড়ের শাখাসমূহ স্থানে স্থানে
পথকে আরও দুর্ব্বল করার পরিব্রাজকগণকে
অত্যন্ত ক্লান্তি ও ক্লেশ সহ্য করিতে হয়।
কোনও পাহাড়ই দশহাজার ফিটের নিম্ন নয়।
এই সকল পর্ব্বত অতিক্রম করিতে পারিলে
লি নারী যনোহারিণী নগরীতে। পথিকেরা
পৌছিতে পারেন। কাস্মীরের রাজধানী
শ্রীনগর হইতে লি নগরী এক শত চল্লিশ
ক্রোশ। অনেকে অষ্টাদশ দিবস মধ্যে এই
দুর্ব্বল পথ অতিক্রম করিতে পারেন। উষ্ট-

পৃষ্ঠে আগ্রহণ করিয়া লাদকে বাইবার অবিধা
সংকোত্তম। মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে মরুভূমি
আছে, উঠে না হইলে তাহা অতিক্রম করা
যায় না। পথ কষ্টদায়ক ও অসুবিধাজনক
বটে, কিন্তু এই দুর্গম ও দুঃস্বপ্ন পথের বিচি
ত্রতা, বিশেষত্ব ও অপার সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ
করিতে করিতে পরিব্রাজকগণ বিমোহিত
হইয়া অনেক সময়ে পথের কষ্ট ভুলিয়া যান।
উপরি-উক্ত লি-নগরী লাদক-প্রদেশের রাজ-
ধানী। এই নগরীতে পৌছিলে আর কোন
কষ্ট থাকে না। তির্কত রাজ্যের পশ্চিম-
সীমায় ইহা অবস্থিত। অতি অল্প সময়ে
এখান হইতে তির্কতে প্রবেশ করা যায়।

শ্রীনগর হইতে লি (Leh) পর্য্যন্ত যে
অসুবিধৃত পথ আছে, তাহা কোথাও অরণ্য,
কোথাও সমতলভূমি, কোথাও উপত্যকা এবং
কোথাও বা অত্যুচ্চ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া
গিয়াছে। হিংস্র পশাদি হইতে বিপদা-
শঙ্কা আছে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও এই দুর্গম
পথ নিরাপদ। স্থানে স্থানে তির্কতীয় সাধু-
দিগের আশ্রম আছে, তথায় বাইলে ভোজ্য-
দ্রব্য পাওয়া যায় এবং বিশ্রামেরও সুবিধা
আছে। অনেক সময়ে সাধুদিগের আশ্রম
অহুসন্ধান করিয়া আনিয়া লইতে হয়। পথি
মধ্যে হুৎ, কল, সুবাহু মূল প্রভৃতি প্রাপ্ত
হওয়া যায়। অনেক স্থানে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ মরু-
ভূমি দৃষ্ট হইয়া থাকে, উদ্ভেদ্য তাহা পার
করিয়া দেয়। কোন কোন স্থানে হয়তঃ দুই
দ্বিবসের পথ পর্য্যন্ত পানীয় সলিল পাওয়া যায়
না, আবার কোথাও বা পার্শ্বতীয় উৎসের
জলে ভূমিসমূহ নীরসাবিত বলিয়া বোধ হইয়া
থাকে। এইরূপে কোমলতা ও কঠোরতা,
সুবিধা ও অসুবিধা, শীতলতা ও মনোহারী-
ত্বের সুখ-বিষাদ পথ অতিক্রম করিতে হয়।

পথের অনেকস্থান অত্যন্ত শীতল এবং অনেক
স্থান অত্যন্ত উষ্ণ বলিয়া অস্বস্ত হইয়া
থাকে।

লি-নগরীতে বিদেশী লোক প্রবেশ করিলে
“দেখিতে পাইবেন, ছোট ছোট বালক বালি-
কারা আসিয়া তাঁহাকে বেঠন পূর্ব্বক পরসী
ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিছু না
দিলে সহজে তাহারা নবীন পথিককে ছাড়িয়া
দেয় না, অত্যন্ত বিরক্ত করিতে থাকে।
নাসিক বা পঞ্চবটী নগরীতে নবাগন্তকে
বালক বালিকারা বেঠন করিয়া ঘুরিয়া মারাঠী
ভাষায় গান গাহিয়া পরসী ভিক্ষা করে, সে-
গানের কিয়দংশ এই—

“নাসিক নগরী,

গঙ্গাতীরি,

দেবাচা আছে স্থান।” * ইত্যাদি

বৃন্দাবনধামে বালক বালিকারা মুরলী
বাজাইয়া গায়—

রাধা কুণ্ড, শ্রামকুণ্ড,

গিরি গোবর্দ্ধন।

মধুর মধুর বংশী বাজে

এই তো বৃন্দাবন ॥

লি নগরীর বালক বালিকা তাহাদের
দেশের ভাষায় বাহা গাহিয়া পরসী চায়,
তাহার মূল আমি দিতে পারিব না, কিন্তু
তাহার অর্থ এই—

নবীন দেশে, নবীন বেশে,

হেসে হেসে আও।

আমাদের হস্তে, আন্তে আন্তে

কিঞ্চিৎ পরসী দাও।

পরসী বদলে ভোজন দিও,

ভোজন বদলে চিনি।

* পঞ্চবটী নগরী গোদাবরী নদীর ধারে অবস্থিত,
গঙ্গার তটে নহে, কিন্তু সে যেখানে গোদাবরীর সন্ধান
গঙ্গার মত। লেখক।

• চিনির বদলে কল মূল, কিম্বা

• গাখোরকিপি। •

বালক বালিকাদিগের হস্ত হইতে পরি-
জ্ঞাপ্ত প্রাপ্ত হইয়া নগরীতে প্রবেশ পূর্বক
দেখিবেন, রাজধানীর সর্বত্র জাপানী,
তিব্বতী, চৈনিক, সারামী, বোর্নিওবাসী,
আনামী, ইরান্ধকলী বণিকেরা বিচরণ করি-
তেছে। সমস্ত সহর সওদাগরে পরিপূর্ণ।
রোগদান, বসোরা, রসিয়া, তুর্কী, মধ্য আসিয়া,
কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান হইতে ব্যবসায়ীরা
এখানে যাতায়াত করে। সোণার নিরেট
গহনায় যেমন “টোল” থাকে না, সহরের
কোথাও তেমন খালি নাই, সর্ব স্থান সওদা-
গরে ভরা। সমস্ত বৌদ্ধ রাজ্যের ইহা অস্ত্র-
তম প্রধান বণিক-আড্ডা। নানাদেশীয়
লোকের এখানে গতিবিধি আছে। বাজার,
দোকান, হাট ইত্যাদি খুব বড়, জল বায়ু
স্বাস্থ্যকর; দ্রব্য, স্বত, মাংস খুব সস্তা কিন্তু
‘আটা’ ও ডাউলের দাম অধিক। চাউল
সস্তা নয়। আটা ও চাউল প্রধান খাদ্য।

অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৮৫ জন
বৌদ্ধ, ১ জন হিন্দু এবং বাকী বিদেশীয়।
বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণের আচার ব্যবহার অনেক
প্রকারে হিন্দুর মত। এক সময়ে সমুদয়
দেশ হিন্দু ছিল, কালপ্রভাবে অনেকে বৌদ্ধ-
মতাবলম্বী হইয়া গিয়াছে।

লাদকের রাজধানী নী নগরীতে প্রবেশ
করিলেই পথিকেরা অশ্ব ও ত্রীনগরের সহিত
তুলনায় লাদক প্রদেশের উৎকৃষ্টতরতা ও

* আমাদের দেশে মুড়িমুড়িকির চোকানে বাতাসা
বা “বাসাতা” বিক্রয় হয়। গাখোরকিপি গুণবাংসে
একত মিষ্ট বাতাসা বিশেষ। ইহা খুব সস্তা, এক
পরসার আট বা দশ খানি প্রাপ্ত হওয়া যায়। চিনি
দ্রব্যা। লেবু।

পার্থক্য অল্পতর করিতে সমর্থ হইবেন। লাদ-
কের পুরুষ যেমন সুন্দর, রমণী তেমন
সুন্দরী। অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে
একটা পরিচিত প্রবাদ আছে, “লাদকে মাথার
চুল ভিন্ন কালো আর কিছু নাই।” কাশ্মীরে
তাই কি? কাশ্মীরে সুন্দর পুরুষ আছে
সত্য; কিশোর ও যৌবনাবস্থার খুব সুন্দর
পুরুষ দেখা যায়, কিন্তু কদাকার হইতে
কদাকার পুরুষও কাশ্মীরে আছে; লাদকে
ভাড়া দেখাও দেখি। এদেশে তাহা নাই।
এখানে সকলই সুন্দর। মাছ ও নিদর্গ
উভয়েই সুন্দর। মালাবার উপকূলের
রমণীপুঞ্জ যেন পরী, কিন্তু শতকরা ১ জন
পুরুষ যেন অত্যন্ত এবং অতি কদা-
কার কৃষ্ণকায়ভূত। কাশ্মীরের অনেক স্থানে
ঠিক তাই, কিন্তু লাদকে সকলই সুন্দর এবং
সকলই সুন্দরী।

তাহার পরে আর একটা বিশেষ প্রয়ো-
জনীয় কথা এই, লাদক প্রদেশে বৌদ্ধধর্মপতি
ও সম্রাসীদিগের ঐত অল্প আছে যে, অল্পের
জন্ত সে দেশে কাহাকেও চিন্তা করিতে হয়
না। কিন্তু নিরামিষাশীর তত সুবিধা নাই;
এদেশের সকলেই মাংসভোজী, স্তত্রাং পশু ও
পক্ষী মাংস ভিন্ন পাকশালাই নাই। এখানে
বৌদ্ধ যেমন, হিন্দুও তেমন।

পুঞ্জাঙ্গপুঞ্জরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে
লাদক-পরিভ্রমণকারীরা জানিতে পারেন,
এদেশে তিন জন রাজা রাজত্ব করিয়া
থাকেন। রাজনৈতিক রাজা—কাশ্মীরাবিশিষ্ট
মহারাজাধিরাজ বাহাদুর; ধর্মনৈতিক রাজা
—তিব্বতের প্রধান লামা মহাশয়; আর সম্রাজ
ও গার্হস্থ্যচারাদির রাজা—“তোংরংপু।”

প্রধানমন্ত্রীর নাম।

রাস্তা রামানন্দ ।

“রসজ্ঞ ভক্তের শ্রেষ্ঠ রামানন্দবার ।

কৃষ্ণনামে সদাসিদ্ধ লবনধারার ॥

বিশুদ্ধ আনন্দভোগ রামরায় করে ।

হরিনামে হয় তাঁর আনন্দ অন্তরে ॥”

গোবিন্দদাসের করচা ।

ভবানন্দরায় উড়িষ্যার কন্নড় বংশীয় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ইহঁর পাঁচ পুত্র। গোপীনাথ, বাণীনাথ, রায় রামানন্দ, কলানিধি, জ্ঞাননিধি। ভবানন্দরায় গোপীনাথ প্রমুখ পুত্রচতুষ্টয়ের সঙ্গে চিরকাল উড়িষ্যার রাজ-সংসারে উচ্চরাজকর্ষচারী পদে অভিষিক্ত ছিলেন।

রামানন্দরায় গোদাবরী তীরস্থ বিদ্যা-নগরের শাসনবর্তী ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল রাজা। যে সময়ে খ্রীষ্টেতন্য নীলাচলে, সেই সময়ে এই সপুত্র ভবানন্দ খ্রীষ্টেতন্যের সঙ্গে গুণে যুদ্ধ হইয়া তাঁহার আহুত্যা স্বীকার করিয়া তাঁহারই পরিকর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

পরমভাগবত রাস্তাক্ষের নিত্য উপাসক রায় রামানন্দ তদানীন্তন বৈষ্ণবসমাজের মধ্যে একজন অধিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইহঁর জীবনে ত্রিবেণীর ন্যায় পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা একাধারে সমঞ্জসীভূত দেখিতে পাই। এক জগন্নাথবল্লভনাটকই ইহঁর কবিত্বের জীবন্ত সাকী। শ্রীকৃষ্ণের রাস্তা প্রভাপক্ণের আদেশানুসারে ইনি উক্ত নাটক রচনা করেন। শ্রীমদ্ব্যপ্রভু অন্তরঙ্গ ভক্তসমিধিয়ারীয়ে যে পাঁচখনি গ্রন্থ আন্বাদন করিয়া পরমানন্দ প্রভুত্ব করিতেন, রামা-

নন্দের জগন্নাথবল্লভ নাটক তাহার অন্যতম, যথা—

“চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ ।

স্বরূপরামানন্দসনে, মহাপ্রভুরাজিদিনে,
শ্রীর তুনে পরম আনন্দ ॥

জগন্নাথবল্লভ নাটক ব্যতীত পদাবলী গ্রন্থে রামানন্দের কতকগুলি শ্লোক সংগৃহীত আছে। ভক্তির পদকল্পতরুতে সংস্থত ভাবার লিখিত অনেকগুলি স্থললিত স্মরণীয় পদ দেখিতে পাওয়া যায়।

রায় রামানন্দের ন্যায় এমন নির্লিপ্ত সংসারী, এমন প্রসাদর্শ ভক্ত, এমন নিকাম ভগবৎপ্রেমিকের জলন্ত দৃষ্টান্ত জগতের সাহিত্যে-বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। রায় রামানন্দ খ্রীষ্টেতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত, প্রিয় পার্শ্ব ও নীলাচলীর লীলার প্রধান সঙ্গী ছিলেন। এবং ইনি মাধবেজ্রপুরীর শিব্য রাঘবেজ্রপুরীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া-ছিলেন।

খ্রীষ্টেতন্য ও রায় রামানন্দ রূপ মণিকাক-নের যে কোথায় কেমন করিয়া কোন সুযোগে সন্মিলন হইয়াছিল, এই মণিকাকনের সংঘর্ষে হিন্দুধর্ম যে কি এক অপর্ক রত্ন, বৈষ্ণবসমাজ সাধনরাজ্যের যে কি এক নিগূঢ় তত্ত্ব লাভ করিয়াছে, তাহা সহস্র পাঠকদের মনোপে যথাযথ বিবৃত করিতেছি।

যে সময়ে নীলাচলে খ্রীষ্টেতন্যদেব সার্ক-ডোম ভট্টাচার্যের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তীর্থপর্যটন উপলক্ষে দক্ষিণাঞ্চলভিমুখে গমন

করেন, সেই সময়ে সার্কভৌম অধুরোধ করিয়া খ্রীষ্টেতন্যকে বলিয়াছিলেন, প্রহু, আমার একটা অধুরোধ রক্ষা করিও। গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরে উৎকল-রাজ-প্রতিনিধি রামানন্দর নামে এক মহাহুতব ব্যক্তি আছেন, তাঁহার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিও। তিনি তোমার পবিত্র সঙ্গের উপযুক্ত পাত্র। শূদ্রবিষয়ী জ্ঞানে তাঁহাকে উপেক্ষা করিও না। তাঁহার জ্ঞান সুরসিক তরু আর দেখা যায় না।

যথা খ্রীষ্টেতন্ত চরিতামৃত—

‘রায়রামানন্দ আছে গোদাবরী তীরে।

অধিকারী হইলেন তেঁহো বিদ্যানগরে ॥

শূদ্রবিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবা।

আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবা ॥

তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহো একজন।

পৃথিবীতে রসিক তরু নাহি তাঁর সম ॥”

ভক্তবৎসল খ্রীষ্টেতন্তদেব কোথাও কোন ভক্তের কথা শুনিলে তাহার সঙ্গে সম্মিলিত হইবার জন্য, তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দিবার জন্য ব্যাকুলিত চিতে সেই ভক্তের উদ্দেশে ধাবমান হইতেন। ইহা তাঁহার করুণ-হৃদয়ের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম। খ্রীষ্টেতন্তদেব সার্কভৌমের সমীপে, রায়রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যীকৃত হইয়া সেখান হইতে বিদায় হইয়া সমুদ্র কুলের পথ দিয়া লুক্কাপথ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন। ক্রমে আলালনাথ, কুর্নক্ষেত্র, জিরড় নুসিংহক্ষেত্র প্রভৃতি পুণ্যভূমি দর্শন করিয়া কতদিন পরে গোদাবরীতীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই গোদাখীর নীল নির্মল জল ও তীরস্থ শ্রাবল সুন্দর ভরুয়ারি দেখিয়া বহুলা বৃন্দাবন মনে করিয়া অধিরাগ-ভরে বনবধ্যে অনেকক্ষণ নৃত্য কীর্তনাদি করিলেন। এবং মদ্য পান হইয়া পুরণারে

আসিয়া আনাঘগাহনাদি সাক করিয়া ঘাটের সন্নিকটে নাম সংকীর্তন করিতে লাগিলেন। এই ঘাটেই অদূরেই একটা বর্ধিত নগর। এই নগরের নামই বিত্তা-নগর বা রাজমহেন্দ্রী। এই বিত্তা-নগরই উৎকল রাজ্যের দাক্ষিণাত্য প্রদেশের রাজধানী। ত্রিগম্মগাওঁত্র নাম সংকীর্তন করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, জনৈক সম্রাট ব্যক্তি বহুজন-পরিবেষ্টিত হইয়া দোলায় চড়িয়া গোদাবরী স্নান উপলক্ষে সেই ঘাটে পহঁছিলেন। ঘাটে পহঁছিয়াই সেই রাজপুরুষ বর্ণাবিধি স্নান তর্পণ সমাধা করিলেন। খ্রীষ্টেতন্তদেব এই রাজপুরুষকে দেখিয়াই সার্কভৌম-কথিত রায়রামানন্দ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন; এবং তাঁহার সঙ্গে সম্মিলিত হইবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে সেই রাজপুরুষ খ্রীষ্টেতন্তদেবের শত সূর্য্য সম-কাঙ্ক্ষি, সুললিত সুদীর্ঘ দেহ, আজামুলবিত বাহ, কমল লোচন, অরুণ বসন দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া তাঁহার সমীপে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। খ্রীষ্টেতন্ত উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিয়া রাজপুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমিই কি রাজা রায় রামানন্দ? রাজপুরুষ উত্তর করিলেন,—হাঁ আমিই সেই মন্বন্ত্রী শূদ্রাধম। তখন ত্রীগোবিন্দ বাহ প্রসারিয়া রামানন্দকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। রামানন্দও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমোন্মত্ত হইলেন। উভয়ে উভয়ের প্রেমে বিভোর হইয়া, শুভ্র শ্বেদ অশ্রু কম্পাদিতে উভয়ে বিহ্বল হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন! কে জানে কে বলিতে পারে,—তগবৎ-প্রেমিকের অন্তরে অন্তরে কি এক অদৃশ্য বৈজ্ঞাতিক শক্তি আছে; যাঁহা যারা সামান্ত দর্শন স্পর্শনোচিত অপরিচিত ও স্বপ্ন-

চিঠি হইয়া যায়। বাহা হউক, অনেককণ
পরে উভয়ের প্রেম বিতোরতা ভাঙিল;
উভয়েই ধৈর্য্যালব্ধন করিলেন। পরে শ্রীচৈ-
তন্ত বলিলেন;—নীলাচল হইতে আসিবার
সময় সার্কভোম ভট্টাচার্য্য আমার নিকটে
তোমার গুণ গান করিয়া তোমার সঙ্গে
সাক্ষাৎ করিবার জন্ত বলিয়া দিয়াছিলেন।
তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্তই আমি
এখানে আসিয়াছি। ভাল হইল; অনা-
রাসে তোমার দর্শন পাইলাম। রায় রামানন্দ
শ্রীচৈতন্তের কথা উত্তরে বলিলেন;—সার্ক-
ভোমের কুপার আমি আজ আপনার শ্রীচরণ
করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আজ আমার মনুষ্য
জন্ম সফল হইল। কোথার আপনি সাক্ষাৎ
নারায়ণ, আর কোথার আমি বিবরী শূদ্রা-
ধম। * তবে যে আমাকে স্পর্শ করিলেন;
সে কেবল আপনার কুপার গুণে। এইরূপে
নানা কথাবার্তার পর রায় রামানন্দ বলি-
লেন,—বদি দয়া করিয়া অধমকে তরিতে
এখানে আসিয়াছেন, তবে আমার গৃহে
কতকদিন থাকিয়া ছুটি চিত্তকে সংশোধন
করিয়া দিন।

শ্রীচৈতন্য রায়ের সাহসের নিমন্ত্রণ স্বীকার
করিয়া তাঁহার গৃহে গমন করিয়া মাধ্যাহ্নিক
ক্রিয়া সমাপন করিলেন। পরে রায় রামা-
নন্দের সঙ্গে বিবিধ কথোপকথনাতে শ্রীচৈতন্য
বলিলেন, রায়! তোমার মুখে কৃষ্ণ কথা
শুনিতে বড় সাধ আছে। বল দেখি সাধ্য
বস্তু কি? রায় রামানন্দ উত্তর করিলেন,
স্বধর্ম্মাচরণে কিছু তক্তি লাভ।

শ্রীচৈতন্য। ইহা বাহিরের কথা, ইহার
পরে কি আছে বল?

রামানন্দ। শ্রীকৃষ্ণে কর্ত্ত্বাপণই সাধ্য
শ্রেষ্ঠ।

শ্রীচৈতন্য। ইহাও বাহিরের কথা,
ইহার পরে কিছু থাকে তো বল।

রামানন্দ। তবে স্বধর্ম্মত্যাগই সাধ্য
শ্রেষ্ঠ।

শ্রীচৈতন্য! ইহাও বাহিরের ধর্ম্ম।

রামানন্দ। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই প্রকৃত
সাধ্য-শ্রেষ্ঠ।

শ্রীচৈতন্য। ইহাও বাহিরের কথা।

রামানন্দ। জ্ঞান-শূন্য ভক্তিই সাধ্য
শিরোমণি।

শ্রীচৈতন্য। ইহা এক রকম বটে, কিন্তু
ইহার পরে কি আছে বল?

রামানন্দ। তবে প্রেম ভক্তিই সাধ্য-
শ্রেষ্ঠ।

শ্রীচৈতন্য। ইহাও এক রকম উত্তম;
তারপর।

রামানন্দ। দান্ত প্রেমই সর্বসাধ্য সার।

শ্রীচৈতন্য। ইহাও উত্তম, তারপর কি?

রামানন্দ। সধ্য প্রেমই সাধ্য শ্রেষ্ঠ।

শ্রীচৈতন্য। ইহাও বেশ উত্তম; তার
পর?

রামানন্দ। বাৎসল্য প্রেমই সর্বসাধ্য
শ্রেষ্ঠ।

শ্রীচৈতন্য। ইহাও অতি উত্তম, ইহার
পর আর কিছু থাকে তো বল।

রামানন্দ। সতী স্ত্রী যেমন প্রিয় পতিকে
দেহ, আত্মা, প্রাণ, মন সমস্তই সমর্পণ
করেন। তদ্রূপ পতিভাবে আপনা তুলিয়া
বিষ ব্রহ্মাণ্ড তুলিয়া, দেহ, আত্মা মন, প্রাণ
সমস্তই শ্রীভগবানে অর্পণ করিতে হয়। ইহার

* ‘কার্য্য তুমি ঈশ্বর সাক্ষাৎ নারায়ণ।’

‘কার্য্য যুক্তি রাজসেবী বিবরী শূদ্রাধম।’

শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত।

রাখ কান্ড ভাব। এই কান্ড ভাবই সকল সাধ্যের শ্রেষ্ঠ সাধ্য।

শ্রীচৈতন্য, ইহাই সকল সাধ্যের সীমা বটে; কিন্তু ইহার পরেও যদি কিছু থাকে, তবে দয়া করিয়া তাহা বল।

রাখানন্দ। ইহার পরের কথা জিজ্ঞাসা করে, এমন লোক জগতে আছে; পূর্বে জানিতাম না। বাহা হউক, শ্রীরাধার প্রেমই সর্বাপেক্ষা সাধ্য শিরোমণি।

শ্রীচৈতন্য। রাখানন্দ, তোমার মুখ হইতে অন্তঃস্রাবী নিঃসৃত হইতেছে; বুঝাইয়া বল রাখাশ্রম কিসে সাধ্যশিরোমণি?

রাখানন্দ। রাসরসিক রাসবিহারী শ্রীভগবান শতকোটি গোপীকার সঙ্গে রাস-বিলাসে প্রবৃত্ত থাকিয়াও শ্রীরাধিকাকে ভুলিতে পারেন নাই। কোটি গোপীকার সঙ্গে থাকিয়াও তাঁহার যে কামনার নির্দ্বন্দ্বিতা হয় নাই, একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই তাহা হইয়াছিল। ইহাতেই রাখাশ্রমের গভীরতা বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীচৈতন্য। যে লোক আমি তোমার সমীপে আসিয়াছিলাম, সেই “সাধ্যতত্ত্ব” তোমার নিকটে শুনিয়া আমি সুখী হইলাম।

রাখানন্দ। প্রভু, তুমি বাহা বলাইতেছ, আমি তাই বলিতেছি। তোমার মত কৃষ্ণ-প্রেমিক লোকের আর কেহ নাই। দয়া করিয়া আরও কয়দিন থাকিয়া আমাদের আরও কিছু কৃষ্ণতত্ত্ব শিখাইয়া দাও।

শ্রীচৈতন্য। রাখানন্দ, আর কয়েক দিন কেন; আমি বত দিন ধরাধামে থাকিব, তত দিন তোমার সঙ্গে ছাড়িতে পারিব না। মীলা-চলে তুমি আমি এক সঙ্গে থাকিব এবং উভয়ে একত্রে মধুর কৃষ্ণকথার কাল কাটাইব।

এই বলিয়া সে দিন উভয়ে নিজ নিজ

কর্তব্য কর্ষে ব্রতী হইলেন। পর দিন সন্ধ্যার সময় আবার নির্জন স্থানে উভয়ে মিলিত হইলেন। এবং অন্তঃপ্রসঙ্গের পর শ্রীচৈতন্য রাখানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—রাখানন্দ, বিদ্যার মধ্যে কোন বিদ্যা সার?

রাখানন্দ উত্তর করিলেন, কৃষ্ণ-ভক্তি ব্যতিরেকে আর বিদ্যা নাই।

শ্রীচৈতন্য। কোন কীর্তি শ্রেষ্ঠ?

রাখানন্দ। সেই প্রকৃত কীর্তিমান, যাহার কৃষ্ণভক্ত বলিয়া খ্যাতি আছে।

শ্রীচৈতন্য। শ্রেষ্ঠ ধন কি?

রাখানন্দ। যার রাখাকৃষ্ণ সখ্যতার প্রেম আছে; সেই সর্বাপেক্ষা ধনী।

প্রশ্ন। হৃৎকের লক্ষ কোন হৃৎকণ্ঠকর? উত্তর। কৃষ্ণ-ভক্তি বিরহের দ্বার আর হৃৎকণ্ঠ নাই।

প্রশ্ন। মুক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

উত্তর। কৃষ্ণ-প্রেমিকই মুক্ত শিরোমণি।

প্রশ্ন। কোন্ গীত শ্রেষ্ঠ?

উত্তর। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমকলি গীত।

প্রশ্ন। প্রের: কি?

উত্তর। কৃষ্ণ-ভক্ত-সঙ্গ-বিনা জীবের আর প্রের: নাই।

প্রশ্ন। স্মরণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি?

উত্তর। কৃষ্ণ লীলাই প্রধান স্মরণীয়।

প্রশ্ন। ধ্যেয়ের মধ্যে কোন্ ধ্যেয় শ্রেষ্ঠ?

উত্তর। শ্রীরাধাকৃষ্ণের ত্রিপাদীপদই জীবের শ্রেষ্ঠ ধ্যেয়।

প্রশ্ন। জীবের কোন্ স্থানে বাস করা কর্তব্য?

উত্তর। ভগবানের মিত্যলীলানিকেতন শ্রীকৃষ্ণাবনধামে।

প্রশ্ন। কোন্ শ্রবণ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?

উত্তর। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই প্রকৃত কর্ণগায়ন।

প্রঃ। শ্রেষ্ঠ উপাত্ত কি ?

উত্তর। রাখাকৃষ্ণ—যুগল নামই শ্রেষ্ঠ উপাত্ত ।

প্রঃ। মুক্তিবাছাকারী ও ভক্তিবাছাকারীর মধ্যে প্রভেদ কি ?

উত্তর। স্বাভাব্য দেহে আর দেবদেহে যেমন প্রভেদ। জ্ঞানরূপ তিক্তনিষেভোজী অরুসিক কাক আর প্রেমরূপ আত্মযুগলান্বাদী অরুসিক কোকিলে যেমন প্রভেদ; তেমনই প্রভেদ। এইরূপ তত্ত্বকথার পর উভয়ে নৃত্যকার্ত্তনে বিস্তার হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের সেই ভাব-বিস্তারতার মধ্য দিয়া রাজি প্রভাত হইয়া গেল। কথিত আছে, এই স্থানেই এই সময়েই প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য রায় রামানন্দের সমীপে স্বরূপতঃ ধরা পড়িয়াছিলেন। উপযুক্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত রায় রামানন্দের অমুরোধে রাখা-অঙ্গ-স্পর্শে স্বীয় অঙ্গ বৈবর্ণ্যের কথা, শ্রীরাধিকার ভাবে স্বীয় আত্মার পূর্বতন কৃষ্ণাবতারীর মধুর রসাবাদন করা প্রভৃতি যাবতীর গুপ্ত তত্ত্ব কথা স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকটে অপূর্ণ রসরাজরূপে স্নান প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইরূপ রসকথা, প্রেমালাপ, তত্ত্ববিচার, স্বরূপদর্শন, কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে উভয়ের দশদিন দশ রাজি অতিবাহিত হইল। দশরাত্রির পরে শ্রীগৌরচন্দ্র রামানন্দের নিকটে বিদায় চাহিয়া বলিলেন; তুমি শীঘ্র বিষয় বৈভব ছাড়িয়া নীলাচলে যাও।

আমিও দাক্ষিণাত্য তীর্থ ভ্রমণ করিয়া শীঘ্রই নীলাচলে তোমার সঙ্গে সন্মিলিত হইতেছি। সেখানে দুইমনে একত্রে কৃষ্ণকথার কাল কাটাইব। এই বলিয়া রায় রামানন্দকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র বিদায় হইলেন।

এদিকে রামানন্দ প্রভুর বিরহে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং সেখানকার বিষয়-বৈভবের মারা মমতা গুটাইয়া, নীলাচলে আসিয়া পূর্বকথিত মত শ্রীগৌরচন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

অতঃপর আমরা প্রধান রসতত্ত্ববেত্তা গৌরচন্দ্রের প্রধান ভক্ত শ্রীয পান্দব পুরম ভাগবত পণ্ডিতপ্রবর রামানন্দের সহক্ষে প্রাচীন ভাষায় দুই একটা কথা বলিয়া বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

“রায় রামানন্দ বন্দ্য বড় অধিকারী।

প্রভু ধারে লভিলা হৃদ ভজ্ঞান করি ॥”

ইতি—বৈষ্ণব বন্দনা।

“সহজে চৈতন্যচরিত্র ঘন ছন্দপুর।

রামানন্দ-চরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর ॥

রাখাকৃষ্ণ লীলা তাতে কর্পূর মিলন।

ভাগ্যবান যেই সেই করে আবাদন ॥

রামানন্দ রায়ে মোর কোটা নমস্কার।

যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার ॥”

ইতি—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা।

শ্রীগৌরগোপাল সেন।

ঈশ্বর ও জগতের দুর্ঘটনা ।

বর্ষ শেষে, ৩১শে চৈত্র, ১৩১৫, সাধারণ-ব্রাহ্ম-

সমাজ মন্দিরে পঠিত উপদেশ ।

অনন্ত কাল-সাগরে আর একটা বৎসর
বিলীন হইল। আমরা এই অনন্তকালকে
সুত্র সুত্র অংশে বিভক্ত করিয়া লইয়াছি।
পৃথিবীর নিজকক্ষে ও সূর্য্যের চতুর্দিকে
দুর্গে দিবারাত্রি মাস ঋতু বৎসর এবং বটিকা
বস্ত্রের দ্বারা ঘণ্টা মিনিট সেকেন্ড দণ্ড গুল
অল্পগুল প্রভৃতি অংশ করিয়াছে। এই যে
“এখন” “তখন” “পূর্বে” “পর” আমরা সময়
সম্বন্ধে বলিয়া থাকি, ইহা শূন্য বিষয় নহে,
ইহারা ঘটনা-বাচক, ঘটনার বিশেষণ মাত্র,
ঘটনা ছাড়িয়া ইহাদের কোন অর্থ নাই।
সুতরাং ঘটনা ছাড়া কাল অর্থহীন, অসম্ভব।
কাল আছে বলিলে ইহাও বুঝিতে হইবে যে,
কালের উপকরণীয় ঘটনা আছে। কাল
বলিলেই পূর্বাপর ঘটনা সমূহের সম্বন্ধ বুঝায়,
অপরদিকে কাল-শূন্য ঘটনাও অর্থশূন্য অস-
ম্ভব ব্যাপার। ঘটনামাত্রের কাল ঘটে, ঘটনা-
মাত্রেরই এখনকার বা তখনকার ঘটনা।

এই যে বৎসর চলিয়া গেল, ইহার মধ্যে
কত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহার সমুদয়
আমাদের জ্ঞানের অতীত, অতি অল্পই আমরা
দেখিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি। দৃষ্টান্ত সাক্ষ্যই
আমাদের চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত
হয়, কেননা তাহারা আমাদের দৃষ্টিকে ব্যতিত
করে। আমরা যে শত শত সুখ পাই, তাহার

বিষয় শুভ ভাবি না, তাহা তত অরণ্য রাখি না,
কিন্তু কোথায় বিন্দুমাত্র দুঃখ পাইরাছি, তাহা
হৃদয়ে ভাল করিয়া আঁকিয়া রাখিয়াছি, তাহাই
সকলের কাছে বলিয়া থাকি। দূর্ঘা তিন শত
পরশুটি দিনের মধ্যে যদি ২১০ দিন মেঘাবৃত্ত
হইল, পৃথিবী বারিধারায় পূর্ণ হইল, আমরা
অভিযোগ করিতে থাকি, কিন্তু তাহা না যে,
মেঘবৃষ্টি না হইলে পৃথিবী ফলশালী, ব্রতশালী
হইতে পারে না, আমাদের জীবন-ধারণের
আবশ্যীয় জব্য উৎপন্ন হয় না।

অন্ত বৎসরের জ্ঞান কত অর্ধবগোত জল
মগ্ন হইয়াছে, কত গৃহ অগ্নিদাহে তমীভূত
হইয়াছে, কত অনিতে বাষ্প প্রক্ষালিত হই-
য়াছে, কত রেল রেল সংঘর্ষ হইয়াছে, কত
বৃদ্ধ বিগ্রহ, রাক্ষসবিগ্রহ, স্থানে স্থানে বিসৃষ্টিক,
বনস্ত, প্রেগ, প্রভৃতি মহামারী রোগের আতঙ্ক
হইয়াছে, অল প্রাবনে ও বস্তার কত দেশ ভা-
সিয়া গিয়াছে, সর্বোপরি যেমিনার ভরানক
ভূকম্পের কথা সকলেই অবগত আছেন। এই
সকল দৃষ্টান্ত কত মোক দ্বন্দ্ব, আহত হইয়া
মৃত্যুযুগে পতিত হইয়াছেন ও কত না দুর্দৃষ্ট-
প্রভ হইয়াছেন। অপরদিকে সমুদ্রতল হইতে
পর্বত সকল শিরোভঙ্গন করিতেছে, কোথায়
নৃত্য-জীব ও উদ্ভিদের সার্বিকতা হইয়াছে।
এইরূপ অজস্রতির পরস্পরের সংঘর্ষে পৃথি-

* ১৩১৬ সনের শেষে এই প্রবন্ধটি আমাদের হৃদয়গত হয়। বর্ষ শেষে একাধি ভূরিবারে এত ইহা
রাখিয়া দিয়রাহিল। পঠির দুঃখের বিষয়, সর্বত্র দেখক ভগ্নকর্তৃক ইহা হইয়াছে। ন, ন।

বীর পরিবর্তন চিরকালই সংঘটিত হইতেছে। যেমন অড়রাজ্যে ও প্রাণিরাজ্যে বিবর্তন চলিতেছে, সেইরূপ, মানবসমাজে নানা বিভাগে, রাজনীতি, সমাজনীতি, নৈতিক জীবনে, ধর্মসমাজে স্ত্রী পুরুষের অধিকার ও স্বাধীনতা লইয়া যোঁর বিপ্লব চলিতেছে। দৃষ্টান্তস্বলে তুরকে স্বাধীন-ভক্ত লাভ, পারস্তে তাহা লাভের জন্য যোঁর বিপ্লব। ইংলণ্ডে একদল সম্রাজ্ঞ মহিলা তাহাদের রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য যোঁরতর আন্দোলন করিতেছেন, সম্প্রতি কোপোতসন নগরে স্ত্রীলোকেরা সে স্বাধীনতা পাইয়াছেন। বিজ্ঞান রাজ্যে কত আবিষ্কার হইয়াছে। মহা সমুদ্রমাঝে বিপদ-প্রস্তুত তরলী শুল্ক আকাশে তাহাদের বিপদের কথা ভাষ্যহীন টেলিগ্রাফে প্রচার করিয়া উদ্ধার পাইয়াছে, ত্রিগবলিক নামক অর্ববপোত এই উপায়ে হৃদনা হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। শুল্ক আকাশে পক্ষীর ন্যায় মাছুব উড়িতেছে। সহজে বাহাতে অগ্নি নির্ঝাপিত হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, ঢুকক্ষে বাহাতে গৃহ ভূমিসাৎ না হয়, সেরূপ গৃহ নির্মাণের উপায় অবলম্বিত হইতেছে। আমেরিকার লোক মেসিনার ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে ৫৬ কুঠবী-সম্বিত গৃহ নির্মাণ করিয়া দিতে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার কতক অর্থ সাহায্যের পরিবর্তে এইরূপ গৃহ নির্মাণ করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। এই সকল দৃষ্টান্তের সুসভ্য অগতে সকল স্থানেই মানব মনে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্দেশেব এক বিশ্ববাসী সহায়ত্বের উদ্বোধন হইয়া থাকে, লোকে বখাসাধা অর্থ সামর্থ্য দিয়া বিপদগ্রস্ত লোকবিশেষ উপকার করিতে সত্যই প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সাধারণ লোকের মনে এক স্তরতর প্রেরণ উদ্ভব হয়। প্রায় এই—যদি অগতির কোন-কিছর থাকেন,

আর তিনি যদি সর্বশক্তিমান ও দয়ালু হইবেন, আর তিনি যদি আমাদের সকলের পিতা মাতা হইবেন, তাহা হইলে, এই সকল বিপদ সম্বন্ধে তাহার দায়িত্ব কি? তিনি কি এই সকল পাঠাইয়া থাকেন, অথবা তিনি কি এই সকল ঘটতে দেন? তাহার নিবরণের শক্তি থাকিতেও নিবারণ করেন না কেন? এরূপ জৈবরকে কেমন করিয়া সং ও দয়ালু বলিব? কেমন করিয়া বলিব, তিনি আমাদের জন্য সর্বদা চিন্তিত আছেন, আমাদের গকে ভাল-বাসিতেছেন। মোসনার ভূকম্পে বা জনটোন নগরে, বস্তার অথবা চিকাগোর অগ্নিদাহে ধ্বংস নগরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শত শত লোকের মৃত্যু ও হৃদনা দেখিয়া সহজে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কঠিন হইলেও চিন্তাশীল ও অঙ্গসন্ধিৎসু লোকের নিকট ইহার মর্শ্বোৎপাতন করা একেবারে অসম্ভব নহে। অবশ্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে অপার অগম্য জৈবরের কার্য সকল সম্পূর্ণ-রূপে বুঝিতে পারা কখনই সম্ভবপর নহে। তথাচ চিন্তা করিলে, অবেষণ করিলে এরূপ আলোক পাইতে পারি, বাহাতে অনেক অন্ধকার অপসারিত হয় এবং আমরা বিশ্বাসের দৃঢ় ভূমিতে দাঁড়াইতে পারি।

প্রকৃতি বা জৈবরের দয়া নির্দয়তা বুঝিতে হইলে অনেক বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমত, আমরা সামাজিক জীব, সমাজের উপর, অন্তান্ত মনুষ্যের উপর আমাদের গকে নির্ভর করিতে হয়, একজন অন্যের সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ, একজন অন্যের স্বাধীন। 'এই স্বাধীনতা, হইতে অনেক দৃষ্টান্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে, একজনের' বুদ্ধির দোষে বা অসাব্য-ধানতার কত গৃহ দহন হইয়াছে, কত পোত অগম্য হইয়াছে, কত রেল-রেল-সংঘর্ষ

• ষাটরা ক'ত লোক হত আহত হইরাছে, এই শ্রেণীর বিপদে আমরা অভিযোগ করি ও বলি, ঈশ্বর এমন কেন করিলেন যে, একজনের দোষে অস্ত্র সফল করিবে? ইহাতে যদি ঈশ্বরকে নির্দয় বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়, তিনি যে আমাদেরকে সামাজিক জীব করিয়াছেন, একজনকে অস্ত্রের উপর নির্ভর করিতে দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নির্দয়তা প্রকাশ পায়। যত দিন আমাদেরকে অজ্ঞান, নির্দোষ, দুর্বল, নৈতিক সন্ধে অসম্পূর্ণ মনুষ্যের প্রতি নির্ভর করিতে হইবে, তত দিন যে আমাদের নির্ভর-বশি সময় সময়ে তাদিয়া যাইবে, এবং আমরা পড়িয়া যাইব, হত আহত হইব, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং যে সকল অমঙ্গল আমাদের সহকারীর উপর নির্ভর অস্ত্র ষাটরা থাকে, তাহা মানবে মানবে সন্ধের মূলে অবস্থিতি করিতেছে, সৃষ্টি-প্রকরণেই রহিয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, মানুষে মানুষে সন্ধ ও নির্ভরশীলতা, ইহার সকল দিক দেখিলে ইহা কি অমঙ্গল বলিয়া মনে হয়। এক্ষণে সন্ধ না থাকিলে তাহার সন্ধ ঈশ্বরী, জ্ঞান প্রেম পুণ্য কি অধিকতর বৃদ্ধি হইত, তাহার দুঃখের ভাগ কি অল্প হইত? কখনই নহে। সন্ধ-বিহীন হইয়া মানব এক্ষণে এক নিমেষ থাকিতে পারিত না, তাহা হইলে জীবনই অসম্ভব হইত, কেন না তাহার প্রথম সন্ধ জননীর রক্ত মাংসের সহিত, সন্ধ সম্পদ পদের কথা। আমরা যে আহা করি, বস্ত্র পরিধান করি, যে গৃহে বাস করি, আমাদের দৈনিক জীবনের শতকরা ৯৯ ভাগ সন্ধ স্বচ্ছন্দতার জন্য আমরা অস্ত্রের উপর নির্ভর করি।

এই যে মানব শত শত বৎসর ধরিয়া ক্রমে ক্রমে পদক্ষেপ করিয়া, পতন ছাড়িয়া

মহত্তর লাভ করিতেছে, বর্ধক অবস্থা হইতে সন্তোষ অবস্থার অগ্রসর হইতেছে, তাহা কি সম্ভব হইত, যদি না মানুষ সন্ধে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, পরিশ্রমে বিশ্রামে, একত্র সংযুক্ত না হইত, পরস্পরকে সাহায্য না করিত? তবে কি আমরা বলিব, ঈশ্বর মানবকে এইরূপ সন্ধে আবদ্ধ করিয়া নির্দয়তার পরিচয় দিয়াছেন? এইরূপে সন্ধের ফলে মানবজাতি ও প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে যে অপরিণাম ও অপরিণেয় কল্যাণ লাভ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার সহিত তুলনায় মানবের অসম্পূর্ণতা বশতঃ যে সামান্য দুঃখ কষ্ট পাই, তাহা কিছুই নহে।

পৃথিবীতে থাকিতে হইলে আমাদেরকে হয় পরস্পরের অধীনে বাস করিতে হইবে, নতুবা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে হইবে। যদি স্বতন্ত্র ভাবে থাকিরা বর্তমান অবস্থা অপেক্ষা মানব অধিক সুখ ও অল্প দুঃখ পায়, তাহা হইলে সৃষ্টিকর্তার জ্ঞান ও বুদ্ধির হীনতা অথবা তাহার নির্দয়তা বলিতে হইবে। পক্ষান্তরে যদি আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে বর্তমানে আমরা যে সন্ধে আবদ্ধ হইরাছি, তাহা যে কেবল শ্রেষ্ঠ, তাহা নহে, কিন্তু ইহা জাতির স্থিতির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন; তাহা হইলে আমাদেরকে ইহা বলিতেই হইবে যে, বিশ্বপতি যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা জ্ঞান ও প্রেমে পূর্ণ, তাহা তাঁহার দয়ার নিদর্শন।

দ্বিতীয়ত, দুর্ঘটনা সকল ঈশ্বরের নির্দয়তার পরিচয় কিনা, বিচার করিতে হইলে, মানবকে যে বিশেষ প্রকৃতি ও শক্তি দিয়াছেন, তাহার বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। দেখিতে পাওয়া যায়, মানব স্বাধীন জীব, স্বাধীন ইচ্ছা-সম্পন্ন, তাহার গৃহ করিয়া লইবার শক্তি রহিয়াছে, সেই জন্য, এস-তাহার কার্যের জন্য দায়ী; তাই অসৎ কার্য-করিতা

জোক' কামালায়ে যায়। অল্প কোল জীয়ে
এরূপ দেখা যায় না। অধিকাংশ অমঙ্গল
মানব নিজের আনিয়া থাকে। তুমি আশুনে
হাত দাও পুড়িয়া যাইবে, সীতার না আনিয়া
গভীর জলে বাও, ডুবিয়া যাইবে; জল বুষ্টি
ঠাণ্ডার রাখির হও, সর্দি কাশি হইবে; অতি
ভোজন কর বা অসময়ে ভোজন কর, অঙ্গীর্ণ
হইবে; চুরি কর, জেলে যাইবে; হত্যা কর,
প্রাণ নষ্ট হইবে; ইন্ড্রিয়ালসক্ত হও, তুমি ও
তোমার ধন্যাবলী তাহার কুফল ভোগ
করিবে; ভগ্ন ভনী আরোহণ কর, জলমগ্ন
হইবে। একপে নানা প্রকারে মানব স্বাস্থ্য-
রক্ষা ও আত্মরক্ষার নিয়ম সকল লভন
করিলে অবশ্যই তাহার প্রতিকূল পাইবে।

এইরূপে নিজে আমরা যে সকল অমঙ্গল
আনয়ন করি, তাহার অল্প কি ঈশ্বরের উপর
দোষার্পণ করিব? তাহা হইলে বলিতে হয়,
তিনি কেন আমাদেরকে এরূপ স্বাধীনতা ও
শক্তি দিয়াছেন? কিন্তু তাবিয়া দেখিবা যে, এই
জ্ঞার অন্তর, সৎ ও অসৎ পথ স্বেচ্ছামত
অবলম্বন করিবার শক্তি পাইয়াই মানব মানব
হইয়াছে। এই স্বাধীনতা-বিহীন হইলে
মানব কখনই মানব নামে বাচ্য হইত না।
মানবকে এই স্বাধীনতা না দিয়া কেবল
শ্রমের বা বস্ত্রের জ্ঞার করিলে কি
ঈশ্বর অধিক দয়ালু হইতেন? প্রত্যেক
মানুষ বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে
বুঝিতে পারিবেন, আমরা যে অসংখ্য পরি-
ভ্রমণ করিতে পারি, এলোভন হইতে উদ্ধার
হইতে পারি, অসত্য ছাড়িয়া সত্য গ্রহণ
করিতে পারি, ইহা আমাদের জীবনের উচ্চ
অধিকার। 'স্বাধীন ইচ্ছা' ব্যতীত চরিত্রের
কোন অর্থ থাকে না, সৎ ও অসৎ থাকে না;
সেইবৎ থাকে না। যদি বধি হইয়া সৎ

কার্য্য করিতে হয়, সৎ হইতে হয়, তাহার
কোন মূল্য থাকে না। 'স্বতন্ত্র' যে সকল
অমঙ্গল আমাদের নিজের বুদ্ধির দোষে বা
অসাবধানতায় আমরা আনিয়া থাকি, তাহাতে
যদি ঈশ্বরকে নির্দয় বলিতে হয়, তাহা হইলে
তিনি আমাদেরকে জড়পদার্থ না করিয়া, পশু
না করিয়া, যন্ত্রবৎ না করিয়া মানুষ করিয়াছেন,
নৈতিক জীব করিয়াছেন বলিয়াই তিনি
নির্দয়।

তৃতীয়ত, দেখা যাউক শাভাবিক শক্তি ও
তাহার নিয়ম সকল ঈশ্বরের নির্দয়তার পরি-
চায়ক কি না? আমরা নিয়ম কাহাকে বলি?
বাঁহীর ঘারা সকল সময় একই রূপ কার্য্য হয়।
মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কোন উচ্চ অট্টালিকা হইতে
পতিত মহুবার অল্প পরিবর্তিত হয় না,
তাহাকে ভূমিসাৎ করে ও তাহাতে তাহার
মৃত্যুও সম্ভব হয় বলিয়া কি আমরা উহাকে
নির্দয় বলিব? অগ্নি-দাহের অহুকূল অবস্থার
গৃহ, বন, উপবন দগ্ধ করে বলিয়া, অগ্নির
দাহিকা শক্তি ও উহার নিয়মকে কি আমরা
নির্দয় বলিব? গভীর জলে জলমগ্ন হইলে
বা বীথ ভাঙ্গিয়া দেশ জল-প্রাপ্ত হইলে, গৃহ
মহুয়া পশু প্রভৃতি সকল ভাসিয়া যায় বলিয়া
কি, যে নিয়মে জল স্রোত শাসিত হয়,
তাহাকে নির্দয় বলিব? ঝড় বৃষ্টির মধ্যে
মানুষ পড়িয়া জীবন হারায় বলিয়া কি উহাকে
নির্দয় বলিব? নিয়ম সকলের অপরিবর্তনীয়-
মতা কি নির্দয়তার পরিচয়? উহাদের
পশ্চাতে যে শক্তি আছে, যে ঈশ্বর আছে,ন,
তিনি কে অবিচারক অজ্ঞানকারী? তুচ্ছ
কি? উহা প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় নিয়মের
কার্য্যের 'ফল'। বায়ু সকলের প্রসারণ ও
সঙ্কোচনের নিয়ম আছে, সেই নিয়ম অবলম্বন
করিয়া মহুয়া নানা ঔষধ এজিন করিয়া কল

কারখানা কিরিতা সৃষ্ট জগতে মানবের কত কাজ সাধন করিতেছে। এই নিয়মে অবস্থা বিশেষে ভূকম্প উৎপন্ন হইতেছে। পৃথিবীর উপরের ছিট দিয়া জল উহার গভীর প্রদেশে করে, ভূমধ্যস্থিত উদ্ভাপ দ্বারা উহা বাষ্পাকারে পরিণত হয়, তথার আবদ্ধ বাষ্পের প্রসারণ শক্তির দ্বারা পৃথিবী কম্পিত হইতে থাকে, তাহাকেই আমরা ভূকম্প বলি। ভূকম্পের অন্য কারণও আছে। পৃথিবীর উপরিভাগ ক্রমশঃ শীতল হইয়া সঙ্কুচিত হয়, এই সঙ্কোচনের ফলে পর্বত ও উপত্যকা উৎপন্ন হয় এবং উহাতে ভয়ানক আন্দোলন হয়, উপরিভাগ নানাস্থানে বিদীর্ণ হইয়া পৃথিবীর গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়, ইহা ভূকম্পের অন্যতম ফল। এই ভূকম্প দ্বারা পৃথিবীর উপরিভাগে যে নানা পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে, তাহার দ্বারা পৃথিবী মানবের বাসোপযোগী হইয়াছে। সূত্রাং ভূত কালে যদি কোন ভূকম্প না হইত, অদ্য উহা আমাদের বাসোপযোগী হইত না। তবে কি আমরা বলিব, ভূকম্প ঈশ্বরের নির্দয়তার নির্দশন? মনে করুন, আমরা এমন জগতে বাস করি, যেখানে কোন নিয়ম শৃঙ্খলা নাই। মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম, রাসায়নিক নিয়ম, শক্তির স্থিতি ও সঞ্চালনের নিয়ম, বৃষ্টি, ভূবারপাত, অগ্নির দাহশক্তি, দিবা রাত্র প্রভৃতির নিয়ম সকল কখন কার্য্য করে, কখন কার্য্য করে না। এরূপ হইলে, আমাদের দশা কি হইত? যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কখন উপর দিকে কখন নিম্নে আকর্ষণ করিত, তাহা হইলে আমরা গৃহ নির্মাণ করিতে পারিতাম না, পৃথিবীর উপরিভাগে কোন বস্তুই স্থিরভাবে থাকিতে পারিত না। অগ্নি আমাদের কার্য্যে আসিত না, অর্থাৎ পোতে বা রেলে আমরা গমনাগমন করিতে পারিতাম না।

সূত্রাং দেখিবে, নিয়মই পরম দয়ার নির্দশন, নিয়মবিহীনতা আর অরাজকতা, নিষ্ঠুরতার চিহ্ন। এই নিয়ম আছে বলিয়া কৃষকেরা জানে, কখন ভূমিকর্ষণ করিতে হইবে, কখন বীজ রোপণ করিতে হইবে, কখন শস্য সংগ্রহ করিতে হইবে, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকলই নিয়মে চলিতেছে।

যে রাজতন্ত্র এইরূপ নিয়ম দ্বারা শাসিত হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ, যে গৃহ উচ্চ ও মহৎ নিয়ম দ্বারা শাসিত হয়, সেই পরিবারই শ্রেষ্ঠ। নিয়ম ভঙ্গ করিয়াই আমরা দুঃখ পাই, কষ্ট পাই, যতই আমরা জগতের গভীর স্তর সকল বুঝিতে পারি, ততই দেখিতে পাই যে, জগতের মধ্যে এক মহা শৃঙ্খলা রহিয়াছে, উহা ক্রমশঃ জগতকে ও আমাদের উন্নতিপথে লইয়া যাইতেছে। উহা সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য।

চতুর্থত, আমরা দেখিতে পাই যে, সৃষ্টি-ক্রিয়া এখনও চলিতেছে, ইহার শেষ হয় নাই, কবে যে শেষ হইবে বা কখনও ইহার শেষ হইবে কিনা, তাহা কেহ বলিতে পারে না। পৃথিবীর স্তর সকল পরীক্ষা করিয়া ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, ইহার বর্তমান অবস্থা আসিতে কোটা কোটা বৎসর লাগিয়াছে। যদি কোন অসম্পূর্ণ গৃহের চারিদিকে ভারী বাধা থাকে, কোথায় চূণ, কোথায় সুরকি, কোথায় ইট, কাট প্রভৃতি চারিদিকে ছড়ান থাকে, তাহা হইলে আমরা বলি, গৃহটি অতি কদাকার, ইহার কোন সৌন্দর্য্য নাই, ইহা বাসোপযোগী নহে। জগত সম্বন্ধেও আমরা সেইরূপ সমালোচনা করিতে পারি না। ইহার কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। ইহার সম্মুখে এখন আত্মোক্ত শ্রেষ্ঠ মহৎ ব্রহ্ম কার্য্য রহিয়াছে। মহাব্য ও ঈশ্বর

একত্রে সেই কার্য সম্পন্ন করিবে। ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত মহাব্যোম মস্তিষ্ক, জ্ঞান, হস্তপদ চক্ষু দ্বারা কার্য করিবে, ঈশ্বর তাঁহার প্রকৃতির শক্তি ও নিয়ম দ্বারা কার্য করিবেন। যেমন পৃথিবী অসম্পূর্ণ, তেমনি মানবও অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ জীবের অভাব থাকিবেই থাকিবে। অভাব থাকিলে দুঃখ থাকিবে। জীবন পথে যে দুঃখ কষ্টের অভিজ্ঞতার মধ্যদ্বারা আনাদিগকে বাইতে হয়, তাহাতে ঈশ্বরকে নির্দিষ্ট মনে হইতে পাবে বটে, কিন্তু তাহাতেই আমাদিগকে দ্রুড়ি, বলিষ্ঠ ও বিকশিত করে, পূর্ণতার দিকে লইয়া যায়। আদি কাল হইতে মনুষ্য অতি কষ্টে শ্রেষ্ঠ উদ্ভিদকে বাইতে সক্ষম হইতেছে। বন্য পশুর সহিত অথবা পঞ্চভূত বা ৭০ ভূতের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, তাহাতেই তাহাকে বলিষ্ঠ করিয়াছে। জরলাভ করিয়া বেগে উখিত হইয়াছে। যে দেশের প্রকৃতি অমূল্য, ভরণ পোষণের সামগ্রী সকল অনায়াসলব্ধ, অল্প পরিগ্রহ ও প্রচুর বিশ্রামেই সকল অভাব পূর্ণ হয়, সে দেশের লোক কষ্ট সম্পন্ন সম্বন্ধে অতি হীন অবস্থায় রহিয়াছে এবং একপ অবস্থাপন্ন ভারতবর্ষের জায় হই একটি জাতি ভিন্ন মানসিক সম্পদ ও লাভ করিতে পারে নাই, সভ্যতার উন্নত শ্রেণীতে উঠিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে যে দেশের লোককে কষ্ট ও বিপদের সহিত অহরহ সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, তাহারাই উন্নতির উপায়ে আয়োজন করিয়াছে। প্রকৃতির যে সকল প্রতিকূল অবস্থাকে শত্রু বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহারাই তাহাদের প্রকৃত বন্ধু। আমাদের কোন শক্তি নাই, অথচ আমাদের মনের মতন সরিষা পৃথিবীকে গড়িতে চাই। আমরা সকল বিকটই নীচ নীচ সম্পন্ন করিতে

চাই। একটি ভাল আত্মকল হইতে যে যুগ যুগান্তর লাগিবে, তাহা আমাদের কখনই সহ্য হয় না। আমরা ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র, অনন্তগুণে বৃহৎ ও কার্যকরী ঈশ্বরের সৃষ্টি আমরা কি বুঝিব? আমাদের জ্ঞাননেত্র উন্মোচিত হইলে আমরা ঈশ্বরের অসীম মঙ্গল অভিপ্রায় কিরূপ পরিমাণে বুঝিতে পারিব এবং আমাদের অভিযোগ যে অর্থশূন্য ও অসার, তাহা দেখিতে পাইব। এ জগৎ অক্ষশক্তির আগার নহে ও অর্থশূন্য নহে, কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান ও প্রেমের দ্বারা শাসিত হইতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিব। ইহা সৌন্দর্য্য, শৃঙ্খলা ও আশ্রয়্য পরিপূর্ণ। ইহার আকাশ সময়ে সময়ে যে মেঘাচ্ছন্ন হয়, তাহা অবিলম্বে অপসারিত হয়। বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা, কোলাহলের মধ্যে স্বর-লহরী উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে এই প্রশ্ন উখিত হইতে পারে যে, সমগ্র মানব জাতির সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতেছে, উন্নতি লাভ হইতেছে, স্বীকার করিলেও প্রত্যেক মানব সম্বন্ধে কি ঐ কথা বলা যায়? জাতি উঠিতেছে বটে, কিন্তু অনেক মানবকে পড়িতে দেখা যায়। ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই, বন্ধুকে যেমন অনেকগুলি গুলি থাকে, ত্রুই একটি গুলিতেই কার্য্যসিদ্ধি হয়, অপর গুলি সেই ত্রুই একটি গুলিকে শক্তি প্রদান করে, সেইরূপ, ঈশ্বরের কার্য্য সিদ্ধির জন্ত জগতের উন্নতিকল্পে যদি আমাদের কাহার কাহার জীবন যায়, তাহা হইলে তাহাকে ধন্ত বলিতে হয়। অপরদিকে দেখিতে হইবে যে, প্রেরিক দয়াল পিতার হস্ত কি আমাদের প্রত্যেক জীবনের উপর নাই? পৃথিবীর এই ক্ষুদ্র সীমা অভিক্রম করিয়া বৃত্তার পরপারে অবিনশ্বর জীবন, অনন্তকাল ও অনন্তদেবে যে

ব্যাপ্ত আছে, তাহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। তিনি যে অনিস্তকালের ও দেশের আশ্রয় আশ্রয়গণকে দিয়াছেন, তাহা হইতে কখন বঞ্চিত করিবেন না। যে গুটীপোকা একদিন মৃত্তিকার উপরে ময়ূরগতিতে গমন করিত, তাহাকে যিনি বিচিত্র পত্র ও ভূষণে ভূষিত করিয়া স্বচ্ছন্দে গগনবিহারী পক্ষীর জায় সর্বস্থানে গমনাগমন করিবার শক্তি দিতেছেন; যিনি স্রুসময়ে বৃক্ষগণকে হরিষ্মণ পত্রে বিভূষিত করিতেছেন, যিনি হংসদিগকে স্রুকোমল অমল খেত আবরণে আবৃত করিতেছেন, যিনি শুকদিগকে হরিষ্মণ পত্রে মণ্ডিত করিতেছেন, যিনি ময়ূরদিগকে চিত্রিত পক্ষ দিয়াছেন; যিনি ঋতুর পর ঋতু পরিবর্তন করিয়া ধরণীকে ধনধান্তশালিনী করিয়াছেন, ও ইহার সমুদয় প্রাণীকে আনন্দিত করিতে-

ছেন, তিনি মানব আত্মার জন্তও নব বস্ত্র রাখিয়াছেন। হে মৃত্যু ভয়ে কাতর মানব, তোমার চক্ষে জলধারা কেন? তোমার আনন বিষাদ ছায়ায় আবৃত কেন? তোমার নয়ন দীপ্তিহীন কেন? চাহিয়া দেখ, এ জগতে মৃত্যু কোথায়? দুঃখ কোথায়? এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তি মৃত্যু নহে, তাহা বাঁলারূপ স্পর্শে শতদলের উন্নীলনের জায় আত্মার ক্রমবিকাশ, তাহা আত্মার অনন্ত উন্নতি পথে পদক্ষেপ, তাহা নব জীবনের অভিষেক। আজ যে দেহ ভঙ্গে পরিণত হইতেছে, তাহারই মধ্য হইতে চির শোভাময় নবদীপ্তিশালী জীবন প্রস্ফুটিত হইয়া অমর লোকে শোভা সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছে!

• ত্রিযোগেজনাথ মিত্র।

মানব সমাজ । (৮)

সমাজের সে চতুর্ধি কক্ষের আলোচনা করিলাম, উহাই এতদেশীয় আভিভেদের মূল। সকল দেশেই এইরূপ কক্ষভেদ আছে, কিন্তু এতদেশে তাহা নানা কারণে এক বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহাতে সমাজের অশেষ মঙ্গল হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। বর্তমান সময়েও আভিভেদ অনেক শুভ ফল উৎপাদন করিতেছে। কিন্তু আমার বিবেচনার ইহার প্রধান অপকারিতা দুইটি;— (১) বিবাহ-ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করা; (২) পান ভোজনে স্পর্শ দোষ স্বজন করা। যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ, আধ্যাত্মিক উন্নতি-পথের প্রকৃত পথিক, তাহার সম্বন্ধে এই দুইটি সঙ্কোচ প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু বর্তমান সময়ে

হিন্দু সমাজ যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, তাহাতে এই সঙ্কোচে দুইটি উন্নতি-পথের বিঘ্ন হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমটি অর্থাৎ বিবাহক্ষেত্রের সঙ্কোচ—অতীব গুরুতর বিষয়; ইহার সাক্ষ্য-কূলে প্রতিকূলে অনেক বিবেচ্য বিষয় আছে। তাহা যথাসময়ে পশ্চাৎ আলোচিত হইবে।

এক্ষণে, কক্ষালোচনার পর, সমাজের উন্নতি-অবনতি আলোচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; কারণ কক্ষই সমাজকে উন্নতি অথবা অবনতির পথে লইয়া যায়। উন্নতি কি? সমাজ কিরূপ অবস্থায় উপনীত হইলে উন্নত বলা যায়? সমাজস্থ ব্যক্তিগণ যখন বংশে বাড়িলেই যে উন্নত হইল, তাহা নহে। অধিক ধনবৃদ্ধি, অবনতির পথও

সমাজকে লইয়া খাইতে পারে। আর অতিরিক্ত বংশবৃদ্ধি দরিদ্র সমাজের পরিচায়ক। ইংল-
ণ্ডাদি দেশ অপেক্ষা এতদেশীয় বংশবৃদ্ধির
পরিমাণ দ্বিগুণেরও অধিক। বংশবৃদ্ধির পরি-
মাণ দারিদ্র্যের লক্ষণ, কিন্তু সমাজস্থ জনগণের
সংখ্যা অল্পসারে আহার সংস্থানের কিছু অধিক
হওয়া উন্নতির একটি প্রধান কারণ। বাহা
হউক, প্রকৃত উন্নতি বলিতে বাহা বুঝা
যায়, তাহা এ সকল নহে। মহাত্মা ডাক্তার
বলেন, সামাজিক উন্নতি তিনটি বিষয়ের উপব-
নির্ভর করে;—(১) মোট জন সংখ্যা;
(২) মানসিক অবস্থা, অর্থাৎ জনগণের বুদ্ধি-
মত্তা ও নৈতিক ভাব; (৩) তাহাদিগের উৎ-
কর্ষতা। * উৎকর্ষতা শব্দে আমি চরিত্র বল
ও ধর্মবল বুঝি। ডাক্তারইন দৈহিক অবস্থা
অপেক্ষা মানসিক অবস্থার উপরেই দৃষ্টি
অধিকতররূপে আকর্ষণ করিয়াছেন। জাতীয়
উন্নতি মনের উপরই অধিক নির্ভর করে।
সমাজের সকলেই মানসিক উন্নতি লাভ
করিতে সমর্থ হয় না, সত্য। কিন্তু কতিপয়
ব্যক্তির মন সমধিক উন্নত, অর্থাৎ সামাজিক-
ভাবে আগ্রহ না হইলে, সামাজিক উন্নতি
অসম্ভব। † বর্তমান যুগে এবং ভবিষ্যতে
বিভিন্ন সমাজের সংঘর্ষে কোন্ সমাজ জয়ী
হইবে, তাহা মানসিক অবস্থার উপরই অধিক
নির্ভর করে। ‡ চরিত্রবল, নীতিবল ও ধর্ম-

* We can only say that it (progress) depends on an increase in the actual number of the population, on the number of men endowed with high intellectual and moral faculties as well as on their standard of excellence. Corporal structure appears to have little influence except so far as vigour of body leads to vigour of mind. Descent of man p. 216

† The future struggles for supremacy
* * * will be contests between minds, and muscles will be at a discount.
Nature, 9th May, 1902, p. 36.

‡ Moral sense.

বল—এ সকলই মানসিক অবস্থা। ডাক্তারইন
নৈতিক ভাবকেই সামাজিক উন্নতির কারণ
সকল মধ্যে প্রাধান্ত দিয়াছেন বলিয়া বোধ
হয়। কিন্তু নৈতিক ভাবঃ কোথা হইতে
উৎপন্ন হয়? তাহার মতে উহা মূলতঃ
সামাজিক বৃত্তি হইতেই উৎপন্ন হয়। † বাহা
সমাজের মঙ্গলজনক, তাহা স্মৃতি-সম্মত;
আর বাহা অমঙ্গলজনক, তাহা স্মৃতিমূলক।
সামাজিক বৃত্তি, অর্থাৎ স্ব-সমাজের মঙ্গলেচ্ছা
হইতে যে সকল কর্ম উৎপন্ন হয়, ও যেসকল
কর্ম সমাজেব মঙ্গল সাধন করে, তাহা
স্মৃতি-সম্মত। এই মতেরই বিস্তৃতি সাধন
করতঃ প্রাচীনকালে মনীষিগণ বলিয়াছিলেন
“পুণ্যঞ্চ পরোপকারং পাপঞ্চ পরপীড়নে।”
পাপ পুণ্য, ধর্ম অধর্ম, সকলেরই মূল এই
স্থানে। সামাজিক বৃত্তি হইতেই নৈতিকভাব
জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সামাজিক বৃত্তি,
সমাজস্থ জনগণের মঙ্গল-সাধনেচ্ছা, কর্মে
পরিণত করিতে হইলে মনের বল থাকা চাই,
স্বার্থত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি থাকা চাই, আর
চাই সংযম। ডাক্তারইন ইহা বিবর্তনবাদের
দিক হইতে যেরূপভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহা
এতদেশীয় প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির পাঠ
করা কর্তব্য। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন,
“No man can practice the virtues
necessary for the welfare of his
tribe without self sacrifice, self
command and the power of endu-
rance.” ‡ সকল পীড়ন সহ্যশ্রবদনে সহ্য করিবার
ক্ষমতা না থাকিলে, সকল স্বার্থ স্ব-সমাজের মঙ্গল
সাধনে তৃণবৎ উপেক্ষা করিতে না পারিলে,
এবং ক্রোধঃ, মন ও বাক্য—এই ত্রিবিধ

† “The * * * moral sense is aborigina-
lly derived from the social instincts. De-
sent of Man, p 182

‡ Ibid 181

সংযমে বলীয়ান না হইলে, সমাজের মঙ্গল-সাধনের আশা করা যায় না। কিন্তু এ সকল কি সকলেরই হয়? না, তাহা নহে। যিনি শ্রেষ্ঠ, যিনি অগ্রণী, তাহারই হয়; অত্রে তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। “সদৃশদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ স্তত্তদেবেতারাম্ জনঃ।” বহু হট্টগোলে সামাজিক বিশেষ মঙ্গল হয় বলিয়া সকল স্থলে বিশ্বাস করি না। কিন্তু ডারুইনের প্রদর্শিত তিনটি ভাব কোন ভাগ্যবানের হৃদয়ে উদিত হইলেই যথেষ্ট হয় না; ঐ ভাব পরিপুষ্ট হওয়া আবশ্যিক, যেন অত্র বিরোধী ভাবে ঐ সকলকে আচ্ছন্ন করিতে সমর্থ না হয়। পরিপুষ্ট হইবার প্রধান উপায়, অভ্যাস। যে কর্ম অতি কষ্টসাধ্য, চেষ্টা দ্বারা কোন মতে নিষ্পন্ন কবিতে হয়, তাহাও পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিলে অবশেষে অনায়াসে করা যাইতে পারে। স্তরায় ধেরুপেট হডক, সংযম ও সহিষ্ণুতার সহিত তাহা পুনঃ পুনঃ আচরণ করিতেই হইবে; তাহা না করিলে উহা অভ্যস্ত হইবে বা, অনায়াস-সাধ্য হইবে না। আর অভ্যস্ত না হইলেও উহা কোন কালেই সহজাত বৃত্তির ন্যায় অবশ্য-কর্তব্য হইয়া উঠে না। বাল্য হইতে ক্ষুদ্রকণ ভাবে মনকে উত্তেজিত করিতে হয়, তাহা হইলে উহা সহজাত বৃত্তির ন্যায় অনুষ্ঠিত হইতে পারে। আর তরুণ হইবার পরে উহা বুদ্ধির সাহায্য ব্যতীতই হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। * বুদ্ধির ইতস্ততঃ দোহলামান শাসন হইতে মুক্ত হইয়া ভাব অথবা বৃত্তি জয়গ্রহণ করিতে না পারিলে

* A belief constantly inculcated during the early years of life whilst the brain is impressible appears to acquire almost the nature of an instinct and the very essence of an instinct is that it is followed independently of reason. —ibid 187.

উহার অদম্য তেজ, উন্মাদিনী শক্তি, একাগ্র লক্ষ্য বিকাশ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না। তাই দৈন্য চিন্তার কর্ম নিষ্ফল হইয়া পড়ে। অতি বুদ্ধির নিন্দাবাদ চির প্রচলিত। মন সংকল্প করিবে, বুদ্ধি সহপারে তাহা নিষ্পন্ন করিবে। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধি মনের আজাবহ হইবে। তবেই কর্মের সকলতা। অত্যাচ্ছন্ন নৈতিক ভাব সামাজিক বৃত্তি হইতে জাত, আর সামাজিক বৃত্তি সংজাত বৃত্তির ন্যায় হওয়া নাই। স্তরায় সমাজের মঙ্গলজনক কর্ম বাল্য হইতে অভ্যাস করা আবশ্যিক। নতুবা অন্য পথ নাই। সাময়িক উত্তেজনার কর্ম অনুষ্ঠিত হইলে বাহ্য আচরকাল মধ্যেই মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। সমাজের চতুর্দিক কর্মই আবাল্য অনুষ্ঠিত হওয়া অত্যাশঙ্কক। নতুবা সমাজের উন্নতি সুদূরদূরত।

পূর্বে যাঁহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, সামাজিক উন্নতির মূলে—

(১) আহার সংগ্রহ।

(২) জন সংখ্যা।

(৩) জনগণের স্বাস্থ্য।

(৪) এবং সর্বাপেক্ষা প্রধান কথা, জনগণের নীতি-বল ও ধর্ম-বল।

এতদ্দেশীয় সমাজে, বিশেষতঃ হিন্দু সমাজে (১) আহার পূর্বে ছিল, এখন নাই; (২) জনসংখ্যা অল্প বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু জনন-হীনতা উপস্থিত হইয়াছে, কারণ জন্মের হার কমিয়াছে ও কমিতেছে। * জনসংখ্যা যে বৃদ্ধি হইতেছে, বলিলাম, তাহাও উচ্চ শ্রেণী হিন্দুগণের মধ্যে নহে, এবং প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গে। হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজেই

* The slower rate of growth seems to be due rather to a falling off in the birth rate.—Imperial Gazetteer of India, 1909 Vol p 38.

জনন-হীনতা উপস্থিত হইরাছে, কারণ জন্মের হার হ্রাস হইরাছে। মুসলমান সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে সত্য, এবং হিন্দু সমাজ অপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাও সত্য; কিন্তু মুসলমান সমাজেও জনন-হীনতা স্পষ্ট পরিলক্ষিত হওয়ার জনসংখ্যা ফুরাইয়া যাইবার আশঙ্কা হইতেছে। যে সমাজেই জনন-হীনতা উপস্থিত হয়, তাহা নিবৃত্ত না হইলে সে সমাজ বিনষ্ট হইবেই। * ইহার কি কোন প্রতিরোধক নাই? আছে। আহার, স্বাস্থ্য ও (সর্বোপরি) বিবাহ বন্ধনের উন্নতি না হইলে জনসংখ্যা সঙ্কটে কোন আশাই করা যায় না; আর ঐ ত্রিবিধ বিষয়ের উন্নতি সাধিত করিতে পারিলেই সমাজ ঠিকিয়া গেল এবং উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল।

আহার ও স্বাস্থ্যের বিষয় পূর্বে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। বিবাহ বন্ধন সম্বন্ধে প্রথম কথা বিবাহকেন্দ্রের বিস্তৃতি, নচেৎ যথোপযোগ্য বর কত্তার অভাবে, রূপ, দুর্বল, বংশ-দোষগ্রস্ত বর কত্তা বিবাহিত হইয়া সমাজকে অধোগতির দিকে লইয়া যায়। এ সম্বন্ধে আর একটি গুরুতর কথা এই যে, অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহ; এই দ্বিবিধ বিবাহ পদ্ধতিই মধ্য সময় অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ সমাজের উন্নতির বিশেষ আশা করা যায় না। † অন্তর্বিবাহ অর্থে এক জাতীয় জন-

গণমধ্যেই যৌন সম্বন্ধ স্থাপন; ইহাতে জাতীয় চরিত্রকে স্থায়ী প্রদান করে। আর বহির্বিবাহ অর্থে বিভিন্ন জাতীয় জনগণের যৌন সম্বন্ধ স্থাপন; ইহাতে সমাজ মধ্যে নব-জীবন সঞ্চার করে। প্রাচীন সমাজ মাত্রেই এই কথা মনোযোগ পূর্বক স্বরণ রাখা উচিত। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতির প্রধান উপকরণ মানসিক উন্নতি। ‡ উচ্চমনা কর্মী, প্রায়ই বংশানুক্রমে জন্মিয়া থাকেন। সুযোগ্য ব্যক্তির বংশে তৃতীয় পুরুষ পর্যন্ত সুযোগ্য ব্যক্তি জন্মবার সম্ভাবনা অধিক। জন সাধারণের মধ্য হইতে যোগ্য অযোগ্য বিচার না করিয়া কোন একজনকে বাছিয়া লইলে, এবং যোগ্য ব্যক্তিগণের পুত্র পৌত্র প্র-পৌত্রদিগের মধ্য হইতে কোন একজনকে লক্ষ্য করিলে,— এই শেথোক্ত ব্যক্তিকেই প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা যোগ্যতর হইবার অধিক সম্ভব। § এ বিষয়ের প্রধান বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতবর গার্টন এই কথা বিস্তৃতরূপে বুঝাইয়াছেন। যোগ্য পিতা মাতা যদি একটি যোগ্য সন্তান লাভ করেন, তবে তাহা হইতে সমাজ যেরূপ লাভবান হইল, এরূপ আর কিছুতেই নহে। একজন উত্তমশীল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কর্তব্যপরায়ণ, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি কোন সম্বন্ধে জন্মগ্রহণ করিলে সে সমাজ উন্নত হইবেই। ব্যক্তির গুণ জাতিতে প্রতিকলিত হয়। বংশানুক্রমে অল্পসারে অনন্যসাধারণ মস্তিষ্ক ও শ্রামুৎপন্ন প্রাপ্ত হইয়া যে মহাপুরুষ ভদ্ররূপ মনের অধিকারী হন, তিনি একাই দেশের অসাধ্য

* The most potent cause of extinction appears to be lessened fertility and ill-health.&c. ...the births have been few and the deaths numerous. Descent p 29.

† The establishment of a successful race or stock requires the alteration of period of inbreeding in which characters are fixed and periods of outbreeding in which, by the introduction of fresh blood, new varieties are produced—

Heredity, p 537

‡ The law of the whole animal kingdom is the same as for the individual. Success in this world depends upon brain.—Gaskell

§ Galton's Hereditary Genius.

*সাধন করতঃ সমাজকে উন্নতি পথে অগ্রসর
করাইয়া দেন। * সামাজিক আচার ব্যবহার,
অনুষ্ঠান এবং বহুবিধ গুরুতর কর্তব্য শারীর
তত্ত্বের নিয়মাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট। স্পেন-
সার বলিয়াছেন,—

"Some of the most important human
institutions are intimately connected
with those fundamental physiologi-
cal laws, more especially the laws of
reproduction, inheritance and vari-
ation."† উপযুক্ত দেহ বিধান বাতীত উপযুক্ত
মনের উদ্ভব হওয়া সম্ভব নহে। ‡ তাই মনের
উন্নতি বিচার করিতে হইলে, মনের উন্নতি
সাধিত করিতে হইলে, জীব-তত্ত্বের নিয়ম
সকল অবগত হইয়া তদনুসারে বংশাধিক্রম
চালিত করিতে হয়। § তাহাতে যদি সমাজস্থ
কোন বংশেও একটা অনন্যাসাধারণ দ্বা-
মণ্ডলযুক্ত সম্ভান লাভ হয়, তাহা হইলেই
সমাজ ধন্য হয় এবং প্রচুর লাভবান হইয়া
থাকে। উন্নতি পথে গুরুতর সামাজিক
বিবর্তন এইরূপেই অধিকতর সম্ভব, এবং
চেষ্টা-সাধ্য, নচেৎ আকস্মিক ঘটনার ন্যায়
হইয়া উঠে। যে সকল মানসিক গুণ থাকিলে
সমাজ উন্নত হয়, তাহা উপযুক্ত দেহেরই
ফল। দেহ ধোঁন সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন হয়।

* "The community receives the advan-
tage of the foresight possessed by any in-
dividual who happens to be endowed with
a central nervous system which transcends
that of his fellows in its powers of dealing
with sense impressions and other symbols"

† Herbert Spencer Lecture, 1909.
University of Oxford.

‡ "The mental condition is often caused
by the physical conditions, and the sound
body is still required upon which to build
the sound mind."

Race culture, p 14.

§ Biological studies have a human in-
terest and human application * * (They
are) important in the elucidation of social
questions &c..... Ibid.

হুতরাং বংশাধিক্রমের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া
বিবাহ বন্ধন অস্থিতি না হইলে সমাজকে
উন্নতির পথে লওয়া সম্ভব হইবে না। প্রাচীন
সমাজের জাতীয় স্বভাব একটা স্থায়ী লাভ
করে, তাহাকে নবজীবনে অস্থিপ্রাণিত করিতে
হইলে বিবাহ প্রথা পরিবর্তন অবশ্য-কর্তব্য।
আন্তর্জাতিক † বিবাহের স্বকল সকল চির-
স্থায়ী নহে; তাই বহির্জাতিক ‡ বিবাহ
সময় সময় প্রবর্তিত করা আবশ্যিক। উহার
ফলও চিরস্থায়ী নহে। এই নিমিত্তই পণ্ডিত-
গণ উত্তরবিধ বিবাহ প্রথা প্রচলন করাই
সম্ভব বোধ করেন। কিন্তু যে সকল জাতি
মধ্যে দেহ ও মনের গুরুতর প্রভেদ লক্ষিত
হয়, তাহাদিগের বিবাহ বন্ধন অপেক্ষা, অল্প
প্রভেদ-বিশিষ্ট অথচ বিভিন্ন জাতীয় অধিগণের
বিবাহই অধিক ফলপ্রসূ। এই বিষয় মনো-
যোগী না হইলে কোন সমাজই দীর্ঘকাল
উন্নত থাকিতে পারে না। এ পথ অবলম্বন
করিতেই হইবে।

এ স্থলে এতদ্বিশীর্ণ একটা দৃষ্টান্ত দিবার
প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারি না। বিশ্বরীটী
সর্বসম্মত না হইতে পারে, তথাপি উল্লেখ-
যোগ্য। বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান সমাজের
কথা বিবেচনা করুন। বাঙ্গালী জাতি বিস্তা
বুদ্ধি এবং উদ্ভাবনী শক্তিতে ভারতের দীর্ঘ-
স্থানীয় হইয়াছে কেন? ইহার অন্য যত
প্রকার কারণই থাকুক, জীব-বিজ্ঞানানুসারে
কারণই প্রধান। প্রবাদ আছে, বকের ব্রাহ্মণ
কারণ জাতির পূর্বপুরুষ কান্যকূজ দেশ
হইতে আসিয়াছিলেন। মোটেই পাঁচজন
ব্রাহ্মণ ও পাঁচ জন কারণ আসিয়াছিলেন।
এ দেশ তখন জনশূন্য মরুভূমি ছিল না।*

† Endogamous.

‡ Exogamous.

এখানেও ব্রাহ্মণাদি ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা বৈদ্যপারগ ছিলেন না, এই মাত্র। বহু ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির সমাজে আসিয়া ঐ পক্ষ গোত্রীয় পঞ্চজন মাত্র ব্রাহ্মণ ও কার্য্য কতদিন স্ব স্ব বংশানুক্রম স্থির রাখিতে পারিয়া ছিলেন?। তাঁহারা এতদেশীয় নারীদিগের পাণিগ্রহণ করতঃ অসত্য উৎপাদন করিলে ক্রমে তাঁহাদিগের বংশধারা মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্বতন বাকালী রক্তে নূতন রক্তের মিশ্রণ হইয়াছিল। তাহাতে মিশ্রিত বংশক্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান বাকালী জাতির দেহ, বিশেষতঃ মস্তক পরীক্ষা করিলে এ বিষয় বিশেষ সন্দেহ থাকে না। কাণ্যকূজ দেশীয় কতিপয় ব্রাহ্মণ ‘কার্য্য এবং এতদেশীয় কতিপয় কার্য্যের মস্তক পরিমাপ করিয়া যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, * তাহাতে মোটের উপর বলা যায় যে, কাণ্যকূজীয়গণের মাথা লম্বা, আর বঙ্গীয়গণের মাথা চওড়া। এই কথাই একটু বিস্তৃত ভাবে বলিলে এইরূপে বলিতে হয়, মাথার প্রস্থ ও দৈর্ঘ্যের অনুপাতে এতদেশীয়গণের অধিক। আর কান্যকূজীয়গণের তদপেক্ষা অল্প। মাথার খুলির পিছের দিকে যে একটি টিপি আছে, তথা হইতে ক্রয়ুগলের মধ্যস্থান পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য ধরিলাম; আর এক বর্ণের উপর হইতে অন্য কর্ণের উপর পর্য্যন্ত প্রস্থ ধরিলাম। এখন অনুপাত জানিতে হইলে, প্রস্থকে দৈর্ঘ্য দিয়া ভাগ করিতে হয়, এবং ঐ ভাগ-ফলকে একশত দিয়া গুণ করিতে হয়। যথা—

$$\frac{\text{প্রস্থ} + ১০০}{\text{দৈর্ঘ্য}} = \text{অনুপাত}$$

* কয়েক মাস হইল আমি ও বন্ধুবর, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র মহাশয় রাজসাহী জেলাতে অনেকের মাথা পরিমাপ করিলাম। তাহার বল শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। উহা বিস্ময় সাহেবের পঞ্চবর্ষার সহিত আর মিল হইয়াছে।

এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া দেখি-
য়াছি, কাণ্যকূজীয়গণের মস্তকের গড় অনুপাত ৬২, ৭৩; এবং বঙ্গীয়গণের গড় অনুপাত ৭৮, ৭৯ হইতে ৮০; এবং কোন কোন স্থলে তাহারও কিছু অধিক। এ টৈবন্য বংশগত, অর্থাৎ জাতিগত; ইহা এতদেশীয় জলবায়ু নিবন্ধন নহে। তবেই কান্যকূজীয়গণ হইতে বঙ্গীয়গণ কত পৃথক! তাহা হইবে তো। পূর্বতন পৃথক সমাজের সহিত কান্যকূজীয়গণের সংমিশ্রণের ফল এইরূপই হইবার আশা করা যায়। তার পর, আর একটা কথা;—ঐ পূর্বতন বঙ্গীয় সমাজ কাহার? উহারা কি কান্যকূজীয়গণের সহিত এক জাতীয়? উহাদিগের দেহবিধান এখন পর্যালোচনা করা সহজ নহে; তথাপি বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ কার্য্যগণের মুখেব আকৃতি ও অস্থি-সংস্থান, বর্ণ এবং মাথার খুলির নানা স্থানের মাপ ও অনুপাত ইত্যাদি পর্যালোচনা করিলে দ্রাবিড়ী ও মঙ্গোলীয় জাতির সহিত বিশেষ নৈকট্য দেখা যায়। এ বিষয় এস্থলে বিস্তৃত আলোচনা হইতে পারে না। ইহাও জলবায়ুর ফল নহে। এতদেশীয় ইতিহাস ও লোকতত্ত্বের মীমাংসা এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে পারে।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গীয়গণের দেহে দ্রাবিড়ী, মঙ্গোলীয় এবং আর্য্য শোণিত মিশ্রিত হইয়াছে। তাই বঙ্গীয়গণকে বহিজাতীয় যৌন সম্বন্ধের ফল মনে করা যায়। উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে বঙ্গীয়গণের প্রতিভা ও শক্তি মানসিক বলের অল্প কারণ অনুষ্ঠান করা নিপ্রয়োজন। ইহাতেই প্রচুররূপে বুঝা যায় যে, এ জাতি ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবেই।

ঐ মিশ্রিত অবস্থা বঙ্গীয়গণের গৌরবজনক ভিন্ন কোন মতেই গৌরবের ক্ষতিকর নহে।

একশ্রেণে এতদ্বন্দ্বের মুসলমান সমাজের কথা ভাবিতে গেলে প্রথমেই মনে উদয় হয় যে, ইহারা কে ? ইহারা ত হিন্দুই। যে জাতি দ্রাবিড়ী, মল্লোলীয় ও আর্য্যরক্তসম্মত, ইহারা ত সেই জাতিই। তাহার উপরও কোন কোন স্থলে আরবীয়গণের রক্তমিশ্রিত হইয়াছে। ইহাদিগের প্রাধিকৃত এই দিক হইতে দেখিলে ত্রুটীকোষ হয় না। ইংলণ্ডীয় জনগণের শিয়ার শিয়ার কত মিশ্ররক্ত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা সকলেই জানেন। মানব-সমাজের ইতিহাস ও লোকতত্ত্ব পর্যালোচনা করিলে বহির্বিবাহ যে জাতীয় শক্তি সঞ্চয়ের একটা প্রধান উপায়, ইহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন হয় না।

যাহা হউক, সমাজের উন্নতির মূল কারণ যে সকল নির্দেশ করিয়াছি, তন্মধ্যে ধর্ম ও নীতির স্থান সর্বোচ্চ। ধর্ম ও নীতি পৃথক নহে; ধর্মই সমস্তের মূল। ধর্ম বলিতেই কর্মকে বুঝায়। ধর্ম জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা এতদ্বন্দ্বেরে পুরাকাল হইতেই পৃথকভাবে আলোচিত হইতেছে। পূর্বমামীংসা এবং উত্তর মীমাংসা দুই স্বতন্ত্র শাস্ত্র। ধর্মজিজ্ঞাসা কর্মকাণ্ড লইয়া ব্যাপ্ত এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জ্ঞানকাণ্ড লইয়া ব্যাপ্ত। কিন্তু কর্মে জ্ঞান দৃঢ় হয় এবং জ্ঞানে কর্ম সুসম্পন্ন হয়। তাই এতদ্ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে পৃথক নহে। স্রুতি বলেন—

অন্ত দেবাহবিজ্ঞয়াহ অন্তদেবাহরত্নিতয়া।

ইতি শুশ্রুমধীরানাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥

বিজ্ঞানকাণ্ডবিজ্ঞান বস্তুধোদোতংসহ। •

অবিজ্ঞয়া মৃত্যুঃ তীর্থী বিজ্ঞয়া মৃত্যুশ্চ নৃত্যে ॥ •

* ইঙ্গোগনিবৎ ২-১২১।

জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের একত্র অমূল্যমূল্য আবশ্যক। নতুবা সকলতার আশা নাই। কর্মক্ষেত্র বিশাল; কেবল ব্যক্তিগত কর্ম সমাজের পক্ষে সর্বনা। সুকলপ্রদ হয় না; তাই সামাজিক কর্ম অচ্যুত হওয়া চাই। যাহাতে সমাজস্থ জনগণের মঙ্গলজনক কর্ম অবাধে সংসাধিত হইতে পারে, তাহাই প্রধান সামাজিক ধর্ম। ইহাতে বিভিন্ন সমাজের সংঘর্ষ হইবে বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে সামাজিক জড়তা, অবশেষে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি তজ্রপ সংঘর্ষ না হয়, সেত আরও মঙ্গলের কথা, কিন্তু হইলেও নিবৃত্ত হওয়া ধর্ম বিরুদ্ধ। ঐ সংঘর্ষে জয়ী হইতেই হইবে, সমাজের কর্ম আপন আয়ত্বাধীনে আনিতেই হইবে; নচেৎ সামাজিক উন্নতির আশা করি বাতুলতীর নামাত্রের মাত্র; বরং সামাজিক অস্তিত্বও বিনষ্ট হইতে পারে। সামাজিক কর্মের উপযোগী সামাজিক মন চাই। যেমন ব্যক্তির মন ও দেহ একই, দেহের অবস্থা অনুসারেই মন নিয়মিত হয়, তেমনই সমাজ দেহ ও সামাজিক মনও একই পদার্থ। সর্ব প্রযত্নে দেহ ও মন গঠিত করিতে হয়। দেহ গঠিত করিতে বিবাহ প্রথার দিকে দৃষ্টি রাখা, এবং মন গড়িয়া আবার্য সংশিক্ষা ও সংসঙ্গ অভ্যাবশ্যক। এইরূপে উপযুক্ত ব্যক্তির আধিষ্ঠান হইলে সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবেই, নচেৎ ক্রাহারও সাধ্য নাই যে, উন্নতি-পথে স্থায়ী ফল লাভ করে, ইহা সুনিশ্চিত।

কিন্তু এইরূপ উপযুক্ত ব্যক্তির আধিষ্ঠানের প্রত্যাশার সমাজ কি নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিবে ? না, তাহা নহে। উপরে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, ইহাও সমাজের প্রথম-সাধ্য। বিবাহ বন্ধনের দিকে

রাখিতে হয়, আর রাখিতে হয় সমাজের সাধারণ উৎকর্ষতার দিকে । গান্টন দেখাইয়াছেন যে, সমাজের সাধারণ যোগ্যতার গড় ধরিলে সমাজের অবস্থা যেমন দেখা যায়, বিশেষ ধীশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ তাহা অপেক্ষা কিছু অধিকতর যোগ্যতা লাভ করিয়া জগৎগ্রহণ করেন । গাধার সমাজে ঘোড়া হয় না, ঘোড়ার বিবর্তনেও মানুষ হয় না । তাই সমাজস্থ জনসাধারণের উন্নতি বিধানই মহাপুরুষ আবির্ভাবের কারণ । জনসাধারণের

উন্নতি হইলেই সে সমাজে অতীব যোগ্য ব্যক্তির শুভাবির্ভাব সম্ভবপর হয় । * ব্যক্তি সমাজ-বৃক্ষেরই ফল । তাই পূর্ব-কথিত হই দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া যত্নবান হইলেই যথা-যোগ্য ব্যক্তির আবির্ভাব সম্ভব হইতে পারে । আর তখন হইতেই সমাজও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে । এতদ্ব বিষ্মত হইলে কোন সমাজই আশ্চর্য্যক্য অথবা উন্নতি বিধান করিতে সমর্থ হয় না ।

শ্রীশশধর রায় ।

গিরিজা প্রসন্ন । (৭)

(৩৮৬ পৃষ্ঠার পর ।)

জ্যোতিষাশুশীলন ।*

গিরিজাপ্রসন্ন যে বৎসর বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন, সেই বৎসর তাহার প্রথম পুত্র-টার মৃত্যু হয় । গিরিজাপ্রসন্ন প্রতিকূল ঘটনার নিষ্পেষণে এই সময় অদৃষ্টবাদী হইয়া পড়িয়াছিলেন । পুত্রশোকে অধীর হইয়া তিনি অদৃষ্টের ফলাফল জ্ঞাত হইবার জন্ত পূর্বোক্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রের পর্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । অল্পকালের মধ্যেই এ শাস্ত্রে তাহার প্রভূত অধিকার জন্মিয়াছিল । তাহার গৃহলক্ষ্মীর ২য় ভাগে এই জ্যোতিষ-বিষয়ক একটি প্রবন্ধ আছে । জ্যোতিষশাস্ত্রের কিয়দংশ রমণীজাতিরও জানা কর্তব্য । ঐ গ্রন্থে তাহাদের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এমন সুস্বাক্ষরতার সহিত সরলভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে, উহা পাঠ করিলেই তাহারা জ্যোতিষাভিজ্ঞতার বিলক্ষণ পরিচয় লাভ করিতে পারে । আমরা ঐ প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া জানিলাম, হিন্দুশাস্ত্রকার মহামুনি

মহুর মতের সঙ্গে, জ্যোতির্বিদদের মতের অনেক সাদৃশ্য আছে । পাত্র ও পাত্রী নিরূপণ, সন্তানোৎপাদন, বিবাহের বয়স নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে, জ্যোতির্বিদগণ, ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের বিরুদ্ধমতাবলম্বী হইতে পারেন নাই ।

মাননীয় রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার জীবিতাবস্থায়, তাহার পুত্র মহামাভ সজ্ঞাট সপ্তম এডওয়ার্ড একবার সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত হয়েন । তিনি যে ঐ সময় রোগাক্রান্ত হইবেন, তাহা হুই একজন জ্যোতির্বিদ গণনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন এবং ঐ পীড়া যে তাহার সিংহাসনারোহণে ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিবে না, তাহাও নাকি তাহার প্রকাশ করিয়াছিলেন ।

মহাহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত ষারকা

—* কোনও সমাজে ধর্ম্মের মানি উপস্থিত হইলে দ্বায়ম্ভগবান ধর্ম্মরক্ষার্থ অবতীর্ণ হন । এই প্রাচীন মতের সহিত, আলোচ্য বৈজ্ঞানিক মতের বিরোধ নাই । উভয়ের একীকরণ হইতে পারে ।

রাথ সেন মহাশয়ের যোগ্য-তনয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন বিত্তাভরণ এম-এ মহাশয় গিরিজাপ্রসঙ্গের নিকট কিছুকাল জ্যোতিষ শিক্ষা করেন, তিনি বলিয়াছেন, “গিরিজা বাবুর জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। মহামাজ্ঞ সপ্তম এডওয়ার্ডের পীড়ার সময় তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র দ্বারা আমাকে ঐ পীড়ার কারণ দেখাইয়াছিলেন।”

গিরিজাপ্রসঙ্গ কোম্পি রচনা করিতে আনিতেন, তাঁহার গ্রামের অনেক লোক তাহা দ্বারা কোম্পি প্রকাশ করাইয়া লইতে আগ্রহ প্রকাশ করিত। গিরিজাপ্রসঙ্গের প্রতিভা সর্বতোমুখী ছিল। যে বিষয়ই আয়ত্ত করার জন্য সচেষ্টিত হইতেন, অতি অল্পাভ্যাসেই তিনি তাহাতে আশাতীত জ্ঞানলাভ করিতে পারিতেন।

মহানুভাবকতা।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যেও অনেক সময় মহৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভবানীপুত্র ঈশ্বর-পরায়ণ স্বর্গীয় পঞ্চানন রায় কবি চিন্তামণির বাসায় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করিতেন। গিরিশচন্দ্রের জন্মভূমি গিরিজাপ্রসঙ্গের বদশে। একদিন কেখন কার্যোপলক্ষে ৮পঞ্চানন রায় মহাশয়ের নিকট গিরিজাপ্রসঙ্গ গমন করেন। সেখানে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে প্রথমই গিরিজাপ্রসঙ্গের সাক্ষাৎ হয়। গিরিশচন্দ্রের বলিকাতা বাসের ব্যয় তাঁহার অতিভাবক বহন করিতেন। কোন কারণবশতঃ গিরিশচন্দ্রের অতিভাবক এই সময় অর্থ পাঠাইতে বিলম্ব করায়, গিরিশচন্দ্র বড়ই বিপন্ন হইয়া পুড়িয়াছিলেন, এমন কি, পরিধেয় বস্ত্র অব্যবহার্য হও-য়ায় তিনি গৃহের বাহির হইতে পারিতেন না। গিরিশচন্দ্রকে মলিন বস্ত্র পরিহিত দেখিয়া ও

তাঁহার মুখমণ্ডলে বিবাদ চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া গিরিজাপ্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলেন, “গিরিশ, তোমাকে অত চিন্তায়ুক্ত দেখাইতেছে কেন?” গিরিশচন্দ্র তখন অকপট চিত্তে তাঁহার বিবাদের কারণ গিরিজাপ্রসঙ্গের নিকট খুলিয়া বলিলেন। পরদুঃখকাতর গিরিজাপ্রসঙ্গ আত্ম-পুষ্কিক শ্রবণ করিয়া গিরিশচন্দ্রের দুঃবস্থা বুঝিতে পারিলেন এবং বলিলেন “এস, এজন্য তোমাকে কষ্ট পাইতে হইবে না।” গিরিশচন্দ্র তাঁহার অঙ্গুগমন করিলেন, গিরিজাপ্রসঙ্গ বাসায় পহঁছিয়া আবগুকীয় অর্থ প্রদান করত গিরিশচন্দ্রের দুঃবস্থা দূর করিলেন। গিরিশচন্দ্র মহাকৃতজ্ঞ, তিনি গিরিজাপ্রসঙ্গের একরূপ অনেক উদারতার বিষয় আমাদিগকে বলিয়া তাঁহার অকালমৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

সাহিত্যানুভাগ।

গিরিজাপ্রসঙ্গের শ্রদ্ধের বন্ধু শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসঙ্গ ভট্টাচার্য্য মহাশয় গিরিজাপ্রসঙ্গের সাহিত্যানুভাগ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “কলিকাতা শেষ বাসকালে তিনি একটা ছাপাখানা করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ উহা প্রসিদ্ধ উপ-গ্রাম-লেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এক যোগে আরম্ভ করেন এবং পরে পৃথক ভাবে চালাইয়াছিলেন। সাহিত্য বিষয়ক ভাল ভাল পুস্তক প্রকাশ করাই তাঁহার এই ছাপাখানা করার প্রধান উদ্দেশ্য। এই ছাপাখানার নাম যেন “বন্ধিম চন্দ্র”। নামকরণেই তাঁহার অতিপ্রায় যথেষ্ট বুঝা যায়। তৎপরে চিরকাল লাহিত্যের সাহায্যে উন্নতি ও উৎসাহ হয়, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ছাপাখানার লাভ লোকসন্নের দিকে একেবারে না তাকাইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অনেক বলা যায়।

আদ্যোপন্যাস সামান্য লোকের কথা বলি, অনেক মানিক পত্রিকায় আমার দুই একটা সামান্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। গিরিজাবাবু আমার প্রতি একান্ত অহুঃসাগ্র বশতঃই আমার কয়েকটা প্রবন্ধ নিজ ব্যয়ে নিজে চেষ্টা করিয়া প্রকাশ করেন। তিনি চেষ্টা না করিলে বোধ হয় আমার লেখা প্রবন্ধ কখনই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইত না। আর অনেক সাহিত্যাহুঃসাগ্রের দৃষ্টান্ত জানি। এক দিন তিনি ছাপাখানায় বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন গরিব ভ্রমলোক তাঁহাকে তাঁহার লিখিত কয়েকটা কবিতা দেখান। গিরিজাবাবু তাহাতে প্রকৃত করিষের বিকাশ দেখিয়া কেবল মাত্র কাগজের মূল্য লইয়া পুস্তক ছাপাইয়া দেন। একি কম কথা ?”

ধর্ম্মাহুঃসাগ্র।

পূজাপাদ জীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গিরিজাপ্রসন্নের ধর্ম্মাহুঃসাগ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—“যে বৎসর কলিকাতায় প্রথম প্রোগ্রেশ হাঙ্গামা হয়, লোকজন কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইয়া যায়, তিনিও কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এ সময় আমার সঙ্গে কথা হয়, আমি কবে সপরিবারে কলিকাতা ত্যাগ করিব। আমি তখন কলিকাতা থাকিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার পরামর্শে আমাকেও কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তিনি বলিলেন যে, ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ভক্তি থাকি ভাল, তাঁহার উপর নির্ভর করা আরও ভাল, কিন্তু তাঁহাকে পরীক্ষা করা ভাল নহে। তাঁহার উপর নির্ভর করা চাই, কিন্তু তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করাও চাই। এই বলিয়া তিনি কলিকাতা গমন করিয়াছিলেন। তাহা আমি কখনই ভুলিব না, গল্পটী এই—এক সহরে

একটা হাতী কঁপিয়া যথেষ্ট বাইতেছে। হাতীর উপর হইতে মাহুত ক্রমাগত চীৎকার করিয়া সকলকে সাধবান করিয়া দিতেছে, কেহ সম্মুখে না পড়ে। সকলেই মাহুতের কথায় সতর্ক হইয়া পলাইতেছে, এমন সময় একজন সাধু ভগবৎ চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, তিনি মাহুতের কথায় কর্ণপাত না করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া ভগবানের চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন, ক্রমে হাতী তাহার কাজ করিয়া গেল, যেমন তাঁহাকে সম্মুখে পাইল, শুড় দিয়া ধরিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। সাধু তাহাতে বড় বেদনা পাইলেন, তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তাহাতে তিনি ভগবানের প্রতি অভিমান করিয়া করিয়া পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন এবং ভগবানকে জানাইলেন যে, তিনি তাঁহাকেই ডাকিতেছিলেন, তাহার কি এই ফল হইল ? তাহাতে ভগবান বলিলেন, বাপু সাধু, তুমি আমাকে জান, কিন্তু আমার কথা মাননা কেন ? মাহুতের মুখ দিয়া আমি যে আদেশ প্রচার করিয়াছিলাম, তাহা তুমি মানিলে না কেন ? তুমি মাহুত ভগবানের কথা শুনিলে না বলিয়া হাতী-ভগবান তোমাকে দণ্ড দিয়াছেন, তাহাতে দুঃখিত হইবে না। সকলই আমার কাজ। এই গল্প শুনায় পর গিরিজাবাবু কথায় আমি না শুনিয়া আর থাকিতে পারিলাম না; তিনি কলিকাতা ত্যাগ করার পূর্বেই আমি স্থানান্তরে চলিয়া গেলাম।”

গিরিশ বাবুর অহুঃসাগ্রে এই ঘটনাটী আমরা তাঁহার জীবন-চরিতে গ্রহণ করিলাম।
কর্তব্যপারায়ণতা।

একবার আমি ও আমার জ্যেষ্ঠভাতা গিরিজাপ্রসন্ন বাড়ী হইতে কলিকাতা গমন করি। আমাদের মধ্যমপ্রণীর টিকিট ছিল।

• গিরিজাপ্রসন্ন ভীমারে কোন ভিনিষই আহাৰ
করিতেন না, একে সমস্ত দিবস উপবাস,
তাহাতে আবার পপ-কষ্ট, গিরিজাপ্রসন্ন ট্রেনে
উঠিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।
আমি ট্রেনের এক বেঞ্চের উপর তাহার শয্যা
রচনা করিয়া, তাহাকে বিশ্রামের জন্য শয়ন
করিতে অনুরোধ করি, গিরিজাপ্রসন্ন সেই
শয্যায় কিছুকাল শয়ন করিয়া বিশ্রাম-সুখ
লাভ করিতেছিলেন, কিছুকাল পরে ট্রেন
খানি কোন ষ্টেশনে পহুছায় ষ্টেশন হইতে
একজন লোক আমাদের গাড়ীতে উঠিবার
জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিল। ঐ লোকটি
আমাদের গাড়ীতে আরোহণ করিলে আমার
জ্যেষ্ঠভাতের বিশ্রামসুখ নষ্ট হইতে পারে,
এই উদ্দেশ্যে আমি আরোহী মহাশয়কে বলি-
য়াছিলাম, আমাদের গাড়ীতে স্থান হইবে না।
আপনি অন্য গাড়ীতে উঠিয়া পড়ুন। উক্ত
লোকটি আমার কথাতেই বিশ্বাস স্থাপন
করিয়া অন্য গাড়ীতে যাইতেছিলেন, এমন
সময়, আমার জ্যেষ্ঠভাত শয্যাখিত হইয়া
গাড়ীর দ্বার মুক্ত করিয়া ঐ লোকটিকে
তাঁহার কাছে আনিয়া বসাইলেন, ও সমস্ত
রাত্রি বিশ্রাম-সুখ বিসর্জন দিয়া গাড়ীর
এক কোণে উপবিষ্ট রহিলেন। বলা বাহুল্য
যে, ঐ আরোহী মহাশয়ের নিকট আমি
মিথ্যা বলায় জন্য ভৎসিত হইয়াছিলাম।
কর্তব্য পালনের জন্য আমি তাঁহাকে এরূপ
দুঃস্বপ্ন কাজ করিতে দেখিয়া নিতান্ত
বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিলাম, ইনিত
সাধারণ পুরুষ নহেন, পরের একটু উপকা-
রের জন্য সমস্ত রাতটা ক্লান্ত শরীর লইয়া
আগিয়া থাকিতে সম্মত হইলেন, একটু সময়ও
শয়নের জন্য ও একটু লাগারিত হইলেন না!
তাঁহার দ্বার একজন চরিত্রবান লোক এ

পর্যন্ত কোথায়ও আমার দৃষ্টিপথে পড়িল
না।

মাসুষের ঘেন দুইটা জীবন, একটা বাহি-
রের, আর একটা ভিতরের। বাহিরের জীবন
কতকগুলি সুবিধাদি দ্বারা নিয়মিত, সর্পিণ
সীমার মধ্যে আবদ্ধ, কিন্তু ভিতরের জীবন
প্রশান্ত, সুদূর বিস্তৃত ও গগন-সঞ্চারী বায়ুর
ন্যায় স্বাধীন। এই জন্য প্রাচীন কালের
ঋষিরা বাহিরের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া
ভিতরের জীবনকেই অধিকতর সার জ্ঞান
করিতেন।

গিরিজাপ্রসন্নের কলিকাতা অবস্থিতি
কালে একবার একটা ছোট ব্রাহ্মণ তাঁহার
পাকের জন্য নিযুক্ত হয়। কলিকা-
তার পাকের ব্রাহ্মণ প্রায়ই হীনোপায়ে
জীবিকা নির্বাহ করে। ঐ ব্রাহ্মণটিও এত
দুঃখ ছিল যে, বাসার ভিনিষ পত্র অপহরণ
করিয়া গৃহে লইয়া যাইত। সে দুই দিবস
ঐরূপ নিম্ননীর কার্যের জন্য গিরিজাপ্রসন্নের
নিকট অভিযুক্ত হইয়াছিল। তিনি প্রথম
দুই দিবস উপদেশ ও ভয় প্রদর্শন করিয়া ঐ
ব্রাহ্মণটিকে সন্তোষিত করিয়া দেন। তৃতীয়
দিবস ব্রাহ্মণের ঐরূপ একটা দুর্কারের বিষয়
জ্ঞাত হইয়া তৎক্ষণেই তাহাকে বিদায়
দেওয়ার জন্য মনস্থ করিলেন। তাঁহার ভৃত্য
দেখিল, এখনও আহারের বন্দোবস্ত হয় নাই,
অথচ বেলা অধিক হইয়াছে, ব্রাহ্মণকে অসময়
বিদায় দিলে কেইবা আহারীয় দ্রব্য পাক
করিয়া দিবে? গিরিজাপ্রসন্ন ভৃত্যের মনো-
গত ভাব স্বয়ংক্রিয় করিয়া বলিলেন “পাকের
জন্য কাহাকেও ভাবিতে হইবে না, আমি
ব্রাহ্মণের সামান্য উপকার প্রত্যাশায় এরূপ
অজ্ঞাত কার্যের প্রস্তর দিতে পারিব না।
গিরিজাপ্রসন্ন তখনই দুষ্টব্রাহ্মণকে বিদায়

পাওনা মিটাইয়া বিদায় করিয়া দিলেন ও নিজে পাক করিয়া সকলকে পরিতোষ সহকারে আহ্বান করাইয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন। জ্বায়ের মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া গিরিজা-প্রসন্ন ঐন্দ্রিয়িক স্মৃতিটাকে বড়ই তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। তাহার মন খানি যেন ভেঙের আধার ছিল।

সৌহার্দ।

গিরিজাপ্রসন্ন বি-এ পাশ করিয়া বি-এল পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইলেও তৎসঙ্গে “নব-জীবনে” বঙ্কিমবাবুর উপভাসাস্থিত নরনারী চরিত্রের সমালোচনা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। নবজীবন-সম্পাদক বিজয়রত্নীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সঙ্গে এই সময় তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ জন্মে। তিনিই নাকি সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। গিরিজাপ্রসন্ন বন্ধুবর্গের বড়ই শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, হাহকোটের কোন একজন খ্যাতনামা উকাল তাঁহা দ্বারা পাঠ্যজীবনে পরম উপকৃত হইয়া তাঁহাব সৌহার্দ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহার মর্ম্ম নিয়ে প্রকাশ করিল্যাম।

“গিরিজা বাবু সঙ্গে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের বাসায় আমার প্রথম পরিচয় হয়। আমি ও গিরিজা বাবু তখন নব-জীবনে প্রবন্ধ লিখিতাম। পরস্পর পরস্পরের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি অহুরক্ত হইয়াছিলাম। ইতিপূর্বে কাহারও সঙ্গে কাহারও মৌখিক আলাপ ছিল না, গিরিজা বাবু আমাব পরিচয় অক্ষয় বাবুর বাটীতে পাইয়া, আমাকে বি-এল পড়ার জন্ত অহুরোধ করেন। আমি সে অহুরোধ এখন উপেক্ষা করিতে চেষ্টা করি। যখন বুঝিতে পারিলাম, গিরিজা বাবু আমার প্রকৃত হিতৈষী ও মঙ্গলোদ্দেশ্য, তখন আর তাঁহার স্পন্দনাম, অস্বাদ্য করিতে পারিলাম না। আমার

নিকট বি-এল পরীক্ষার পুস্তক ছিল না, গিরিজা বাবু তাহা শ্রুত হইয়া বলিলেন, “আমার যে পুস্তক আছে, উহাতেই আপনার পাঠের কাজ চলিবে, আপনাব পুস্তক ক্রয় করিতে হইবে না।” বাস্তবিক পরীক্ষার শেষ দিন পর্য্যন্ত, তিনি আমার পুস্তক দিয়া অধ্যয়ন সাহায্য করিয়াছেন। যখন পরীক্ষাব দিন সন্নিহিত হইল, গিরিজা বাবু আবশ্যকীয় পুস্তকগুলির মধ্যে যেগুলি উত্তরের একই সময় প্রয়োজনীয়, সেইগুলির মধ্যভাগ ছিন্ন করিয়া অর্দ্ধেক আমার নিকট রাখিয়া অপরাধ স্বয়ং পাঠের জন্ত রাখিয়া দিলেন। গিরিজা বাবুর সৌহার্দ লাভ করিতে না পারিলে আহন পরীক্ষা আমার দেওয়া হইত কিনা সন্দেহ।”

উক্ত প্রসিদ্ধ উকীল মহাশয় কেবল উল্লিখিত ঘটনাটী বলিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, এই পুস্তকখানির যখন পাণ্ডুলিপি তাঁহার দৃষ্টার্থ প্রেরিত হয়, তখন এই ঘটনাটী বিস্তৃত ও ইহার সঙ্গে গিরিজাপ্রসন্ন সম্বন্ধীয় আরও কয়েকটা ঘটনা স্বয়ং সংযোজিত করিয়া আমাকে নিতান্ত অহুগৃহীত করিয়াছেন। নিম্নে তাহার লিখিত অংশ অবিকল উদ্ধৃত হইল;—

“কেবল কি তাহাই, যখন পরীক্ষার ফল বাহির হইল, আমি গিরিজা বাবুর অপেক্ষা একটু উচ্চস্থান পাইয়াছিলাম, তাহাতে সাধারণ লোকের মনে কি হয় সহজেই বুঝা যায়, কিন্তু অসাধারণ মহৎ গিরিজা বাবু তাহাতে অপার আনন্দ অহুত্ব কবিলেন এবং পরিহাসচ্ছলে আমাদের উত্তরের একান্ত হিতৈষী অক্ষয় বাবুর নিকট অভিযোগ করিলেন যে, তাঁহার পুস্তক পড়িয়া তাঁহার অপেক্ষা পরীক্ষার উচ্চস্থান লাভ করা আমার উচিত হয় নাই।

তাঁহার পর আর একটা কথা, উত্তরে একজন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতিতে প্রবিষ্ট হইলাম, তাঁহার নানা কারণে ওকালতি ভাল লাগিল না। ‘শেষে একরকম

ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ঈশ্বরের আশ্রয় আমার অপেক্ষাকৃত একটু ইবিধা হওয়ার তিনি যে আনন্দোচ্ছ্বাস করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। একদিন তিনি হাইকোর্টে আমার একটা মোকদ্দমার সওয়াল জবাব শুনিয়া আমার প্রতি এত সন্তুষ্ট হন যে, বাসায় আসিয়া আমাকে একখণ্ড পুস্তক পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করেন, বলেন যে, আমার ত ওকালতি করা হইল না, আপনাদের এ সকল পুস্তকে উপকার দেখিবে। যে কারণে সাধারণের ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বীতা হয়, তাঁহাব সেই স্থলে কি প্রকার দ্বেষ ভালবাসার উচ্ছ্বাস! ইহাই ও বড়মনের পরিচয়, মোহাদেৱ লক্ষণ।”

সত্যরক্ষণে ঐকান্তিক যত্ন।

গিরিজাপ্রসঙ্গ বি-এল পাশ করিয়া প্রথম আলিপুর কোর্টে আইন ব্যবসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এই সময় তিনি ভবানীপুৰে অবস্থিত করিতেছিলেন, কয়েক বৎসর পরে হাইকোর্টে যোগদান করেন। আইন ব্যবসায়ের তাঁহার অমুরাগ ছিল না, এজন্য তিনি ঐ ব্যবসায়ের কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। গিরিজাপ্রসঙ্গের চরিত্রের আর একটা প্রধান উপাদান সত্যপ্রিয়তা; তিনি বিনা কারণে অপরের প্রতি অত্যাচার হইতে দেখিলে বা কাহাকেও অন্যায়রূপে কোন প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে দেখিলে তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি আশৈশব জ্বরের পক্ষপাতী ছিলেন। যে কার্য্যটা তাঁহার জ্ঞায়া বলিয়া ধারণা হইত, তিনি তাহা বন্ধ মুষ্টিতে ধরিতেন, কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন তাঁহার সংকল্প-পথ চ্যুত করিতে পারিত না। এই বিষয়ের সমর্থনকারী একটা ঘটনা নিম্নে দেওয়া গেল।

গিরিজাপ্রসঙ্গের কোন জাতী ভ্রাতা অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ঐ ভ্রাতার

পিতা তৎকালে জীবিত ছিলেন। শতনি পুত্রশোকে নিতান্ত অধীর হইয়া কিয়ৎকাল উৎকট রোগাক্রান্ত হইলেন। তাঁহার আর অন্য পুত্র ছিল না যে, তাঁহার মৃত্যুর পর বিধবের উত্তরাধিকারী হইয়া বিষয় ভোগ করিবে। ঐ ব্যক্তি ঘোর বিষয়ী ছিলেন, বিষয়-লালসা তাঁহাকে একটা পাপকার্য্যে উত্তেজিত করিল। তিনি প্রকাশ করিলেন, তাঁহার পুত্রের মৃত্যু সময় যে একটা দত্তকপুত্র রাখার অমুমতি আছে, তিনি, জীবন ত্যাগ করিলে যেন ঐ পুত্রটী রক্ষিত হয়। এই সংকল্পের কিছুদিন পরে তিনিও মানবদেহ ত্যাগ করেন।

গিরিজাপ্রসঙ্গের ভ্রাতা হঠাৎ রোগে আক্রান্ত হইয়া, রোগ বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চেতনা-শূন্য হইলেন। তিনি মৃত্যুর ৭৮ দিবস পূর্ব পর্যন্ত যেরূপ অজ্ঞানাবস্থায় ছিলেন, দত্তক পুত্র রাখার অমুমতি দান তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। ঐ দত্তক পুত্র রক্ষিত হইলে গিরিজাপ্রসঙ্গ বিত্তের ওয়ারাস হইয়াও প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন, গিরিজাপ্রসঙ্গ দত্তক পুত্র রাখার কথা শ্রবণ করিয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন, কোন্ হিন্দুই বা জ্ঞাতাগণকে পূর্বপুরুষের নরক-গমনের ফাঁদ পাতিতে দেখিয়া অসহিষ্ণু না হইলেন? বিত্ত ইহ জীবনের সুখের জন্ত, কিন্তু ধর্ম ইহ জীবন ও পর জীবনের সহায়। কোন্ হিন্দু ইহ জীবনের সুখকেই সারহুত করিয়া ধর্মটাকে জলাঞ্জলি দিতে সম্মত হইলেন? গিরিজাপ্রসঙ্গ বুঝিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতৃবধু ধর্ম-প্রণোদিত হইয়া স্বামীর বাক্য পাইয়া দত্তক রাখার অভিপ্রায় করিতেছেন না, তাহাকে প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করাই ভ্রাতৃবধুর মূল উদ্দেশ্য। গিরিজাপ্রসঙ্গের সিদ্ধান্ত

তখন জীবিত ছিলেন, গিরিজাপ্রসন্ন এই
অন্ত্যায় কার্যের প্রতিবিধানের অস্ত্র তাঁহার
পিতৃদেবকে আদালতে বিচার-প্রার্থী হইতে
অনুরোধ করিলেন। গিরিজাপ্রসন্ন ঐ সময়ে
স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছিলেন, “বামীর আদেশ
তিনি জীব ঐরূপ অনুষ্ঠান ধর্ম্মানুমোদিত নহে,
ঐ দত্তক পুত্র দ্বারা সম্পত্তি রক্ষা হইতে পারে
বটে, কিন্তু পূর্বপুরুষের পারলৌকিক কার্য
নির্বাহ হইতে পারে না। আমরা কখনও
জ্ঞাতসারে আমাদের জাতীগণকে বিনা আপ-
ত্তিতে আমাদের পূর্বপুরুষের গ্লানিজনক
ও ধর্ম্মনাশক কার্যে প্রবৃত্ত হইতে দিব না।
ঐরূপ কার্যে আমরা পাপ সঞ্চয় করিয়া
মরকগামী হইব ও পূর্বপুরুষগণকেও নিপা-
তিত করিব।” গিরিজাপ্রসন্ন সত্য সংরক্ষ-
ণের জন্য আদালতে মোকদ্দমা স্থাপন করিয়া-
ছিলেন। যেসকল অত্রভদ্রী গিরিজাজের
নিরোপরি প্রবল ঝটিকা বহিয়া যায়, গিরি-
রাজ আপনাদি দৃঢ়তাগুণে আপনি দণ্ডারমান
থাকে, গিরিজাপ্রসন্নও ভগবৎ-জ্ঞান-ফলে

সর্বদাই সকল প্রকার বিপদে অবিনশিত ও
অটল রহিয়াছেন। এই মোকদ্দমাটা পরি-
চালনে গিরিজাপ্রসন্ন কিরূপ প্রতিভার পরি-
চয় দিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে হাইকোর্টেব প্রসিদ্ধ
উকীল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
মহাশয় যাহা আমাদেরগকে লিখিয়া দিয়া
বাধিত করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

“এই মোকদ্দমা হাইকোর্টে আসি-
য়াছিল এবং তাহাতে সুবিধায়ত কোন্সলি,
উড্রক্ নিযুক্ত হন। গিরিজাপ্রসন্ন তখন
আইন পড়িতেছেন মাত্র, কিন্তু এমন করিয়া
মোকদ্দমার বিষয়ীভূত বৃত্তান্ত ও আইন হৃদয়ঙ্গম
করিয়াছিলেন যে, তাহার লিখিত (Notes)
টাকা টিপ্পনী পড়িয়া উড্রক্ সাহেব বিস্তর
প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছেন,
তাহাতে তাঁহার অনেক সাহায্য হইয়াছে।
অপরপক্ষ স্কুলের ছাত্রের বুদ্ধ কোন্সলি
উড্রক্কে সাহায্য করার কথা শুনিলে
আশ্চর্য্য হইতে হয়। এসকল অলৌকিক
মেধা ও ধীশক্তির পরিচায়ক।”

শ্রীমুরজেনাথ রায়চৌধুরী।

ব্রাহ্মসমাজ ও তাহার কার্য।

তৃতীয় অধ্যায়—রাজা বামমোহন রায়েব বালাকাল। স্বকাণ্ড সম্বন্ধে বামমোহন
রায়েব উক্তি—রামমোহন বায় সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের উক্তি—
রামমোহনরায়েব জন্ম—তাঁহার বংশ পরিচয়—লিখিত
আত্মবিবরণে পিতৃপুরুষ কথা।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া আমরা
যে বীরচরিত্রের নাম উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে
কাহ্যকর্তা পরিভ্যাগ করিবার উপায় নাই;
একথা, বলা বাইতে পারে না যে, ইহাকে

ছাড়িয়া দিলে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে
পারিত। তবে ‘সকলকেই ইহা স্বীকার’
করিতে হইবে যে, উক্ত মহাপুরুষদ্বিগের মধ্যে
ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে রামমোহন রায়েব

অগ্রণী ছিলেন। অপর তির্যক-নামক প্রকাশ-সাধনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের জন্য পাঁচজন লোকের কাছে বাতাস-মত, অর্থ-সংগ্রহ, পুস্তকাদি গিৰিয়া অন্তর্গত খণ্ডন-পূর্বক সমস্ত স্থাপন, এই সকলই-রামমোহন স্বয়ং করিয়াছিলেন। এই কারণে ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য করিলেই সর্বপ্রথমে তাঁহারই নাম-স্মৃতিপথে উদিত হয়।

৯ রামমোহন রায় যে কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার মূল্য বুঝিবার লোক তখন অতি অল্পই ছিলেন। তাই তিনি বেদান্তসারের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকার হুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, “তিনি সত্য ও সরলতার পথ অবলম্বন করিতে সকলের, এমন কি, আত্মীয় স্বদেরও বিরাগ-ভাজন হইরাছেন, কিন্তু সর্বদর্শী ঈশ্বরের কাছে তিনি নির্দোষ।” ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্য তিনি কত-না কষ্ট ও কতি স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাকে উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থসকল আপন ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া অকা-তবে বিতরণ করিতে হইয়াছিল। একবার তিনি বেশাঙ্কস্বত্র ছাপাইতে সংকল্প কবিতা তাহার একখণ্ড এই কলিকাতাতে অধেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি এবং তাঁহার সহোদ্যোগী রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সমস্ত কলিকাতা খুঁজিয়া বহু অধেষণের পর একটি ব্রাহ্মণের গৃহে একখানি বেদান্তদর্শনের পুঁথি দেখিতে পাইলেন। ব্রাহ্মণ পুঁথিটিকে নিত্য পূজা করিতেন, সুতরাং তিনি তাহা তাঁহাদের হস্তে কিছুদিনের জন্য রাখিতে পারিলেন না। অবশেষে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সেই স্থানে বসিয়াই সেই চন্দনচর্চিত-পুঁথি-খানির অঙ্কলিপি করিয়া আনিলেন এবং রামমোহন রায় তাঁহা হইতে বেদান্তস্বত্র শাক-

ৰ্ণ করিয়া মুদ্রিত করিলেন। তাঁহাদের সেই-প্রথম উদ্যোগের ফলে আত্ম-সমীক্ষা-এত দূর উপনিষদ্, বেদান্তদর্শন প্রভৃতি আলোচনা করিতে বন্ধন-হইতেছি। বেদান্ত-নাথ রামমোহন রায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন “প্রথম মত ব্রাহ্মসমাজের কথা মনে হইলই—এই দেশের প্রথম বহু রাজা রামমোহন রায়কেই স্বরণ করি। তাঁহার শরীর বেদন-বলিষ্ট ছিল, প্রজ্ঞা ভক্তি, হৃদয়ের বল ও তাঁহার সেই প্রকট ছিল। এখন প্রথমই তাঁহার মুখশ্রী আমার চক্ষের সমক্ষে আবির্ভূত হইতেছে। তাঁর ভক্তি প্রজ্ঞা পূর্ণ উজ্জল মুখ; তাঁর সেই উদার ভাব, সমুদয় যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাঁর শরীরের বল, মনের বীর্য, হৃদয়ের ভাব সকলই অমূল্য। বর্ণের উন্নতির জন্যই তিনি এখানে উদিত হন।” ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে (১৮০৫ শকের শেষ ভাগে) হুগলী জেলার, অল্প-গত খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামে রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন।

রামমোহনের জন্মকালে শাক্ত ও বৈষ্ণব, এই উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-এতদূর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে “শাক্ত ও বৈষ্ণবের মন” সকল প্রকার গুরুতর বিবাদ-বিসম্বাদের উপমান্বল হইয়া উঠিয়াছিল। রামমোহনের পিতৃকুল বৈষ্ণব ছিলেন, মাতা-মহাকুল শাক্ত ছিলেন। রামমোহন রায়ের সৌভাগ্য ক্রমে শাক্ত বৈষ্ণবের মিশ্রণে মধ্যে-মধ্যে বর্ধিত হইতে হয় নাই। বহু-নির্কাসনের গল্পটা এই—রামমোহন রায়ের পিতামহ ব্রজবিনোদ রায় অতিদূরকালে গঙ্গা-তীরস্থ হইলে, শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী চাটুর্গা-নিবাসী ভ্রাম ভট্টাচার্য্য কল্যাণার, প্রাণ হইয়া-ভিকারীবিধরণে তাঁহার নিকট উপস্থিত হই-

* শাক্তবিশিষ্ট মন্দিরের সমীপস্থ পুস্তালিকা

লেন। 'ভ্রাম ভট্টাচার্য' সম্রাট বংশীর—
 এতৎসংশ্লিষ্ট দেশগুরু বলিরা বিখ্যাত
 ছিলেন। ব্রজবিনোদ রায় তাঁহার প্রার্থনা
 পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, ভ্রাম ভট্টাচার্য
 তাঁহার যে কোন একটি পুত্রকে নিজকন্যা
 সম্প্রদান করিবার অহুমতি ভিক্ষা করিলেন।
 ব্রজবিনোদ বড়ই বিপদে পড়িয়া আপনার
 সন্ত পুত্রের প্রত্যেককে এবিষয়ে অহরোধ
 করিলেন। কিন্তু পঞ্চম পুত্র রামকান্ত ব্যতি-
 রেকে আর কেহই তাঁহার অহরোধ রক্ষা
 করিতে স্বীকার করেন নাই। এই রাম-
 কান্তের ঔরসে এবং ভ্রাম ভট্টাচার্যের কন্যা
 তারিণী দেবীর গর্ভে রামমোহন রায়ের
 জন্ম। সর্বকাৰ্য্যবিধাতা ভগবান যেন রাম-
 মোহনের জন্মের পূর্বাধিই তাঁহার ভবিষ্যৎ
 জীবনের উপকরণ সমূহর ব্যবস্থা করিয়া
 দিতেছিলেন। রামমোহন রায় উপযুক্ত
 বয়সে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পিতৃকুল
 বৈক্য এবং মাতামহকুল শাস্ত, তখন অপর
 সাধারণ পাঁচ জনের স্তায় নিজের পৈতৃক
 ধর্মের গুণগান করিয়া অপরাপর ধর্মের
 নিন্দারত ছিলেন না, কারণ সেরূপ নিন্দা
 প্রধানত তাঁহাবই মাতৃকুলে লাগিবার সম্ভাবনা
 ছিল। সকল সম্প্রদায়ের নিন্দা হইতে বির-
 তির হরত ইহাই মূল সূত্রপাত হইয়াছিল।

রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায় পিতৃ-
 ধর্ম রক্ষা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাব
 নিজের অথবা তাঁহার বংশের ধর্মনিষ্ঠা সঙ্কে
 প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু রামমোহনের মাতা-
 মহকুলের ধর্মনিষ্ঠা তথা বিশেষ রূপে শোনা
 যায়। রামমোহনের মাতা অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী
 ছিলেন। তিনি স্বামীগৃহে আসিয়া বিষ্ণুমন্ডে
 কীৰ্ত্তিতা হন। শেব বয়সে তিনি জগন্নাথ
 ধর্মের স্তম্ভ বসনা করেন। দেবদর্শনে

হইতে হইলে কষ্ট স্বীকার করিয়া যাইতে
 হয়, এই বিশ্বাস বশতঃ সাম্প্রতিক অল্প
 ভাল মতেও তিনি সঙ্গে একজন দাসী
 পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। এমন কি, পণ্ডে
 তাঁহার সুবিধা ও সুখের জন্য কোন
 প্রকার উপায় করিতেও যেন নাই;
 চুঃখিনীর ভ্রাম পদব্রজে, শ্রীকৃষ্ণে, কাণ্ডা
 করিয়াছিলেন। পরলোকগমনের পূর্বে
 একবৎসর কাল দাসীর ভ্রাম জগন্নাথ দেবের
 মন্দির সম্বর্দ্ধনীর দ্বারা প্রত্যহ পরিষ্কার করি-
 তেন। কথিত আছে, মৃত্যুর এক বৎসর
 পূর্বে রামমোহন রায়কে তিনি বলিয়াছিলেন,
 “রামমোহন! তোমার মতই ঠিক। আমি
 অবলা স্ত্রীলোক এবং অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়াছি;
 সুতরাং যে সকল পৌত্তলিক অল্পস্থানে আমি
 সুখ পাইয়া থাকি, তাহা আর পরিত্যাগ
 করিতে পারি না।” রামমোহন-জননী ধর্মে
 নিষ্ঠাবতী হইলেও বিষয় কর্মে অমনোযোগিনী
 ছিলেন না এবং যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে
 বোধ হয় যে তাঁহার প্রকৃতি কিছু উগ্র ছিল।
 রামমোহনের শৈশবকালে একদিন তাঁহার
 মাতামহ ইষ্টদেবতার পূজার পর শিশু রাম-
 মোহনকে পূজোপকরণ বিষয়ল প্রদান
 করেন। রামমোহন-জননী আসিয়া দেখেন
 যে, তাঁহার পুত্র বিষপত্র চর্চ্চন করিতেছেন।
 বিষ্ণুমন্ডদীক্ষিতার ইহাতে বড়ই ক্রোধ
 হইল। তিনি সম্রাটের মুখ হইতে বিষপত্র
 ফেলিয়া দিয়া মুখপ্রকালন করিয়া দিলেন এবং
 বিষপত্র দিবার কারণে পিতাকে তিরস্কার
 করিলেন। রামমোহন কলিকাতার আসিবার
 পূর্বে, নিজ গ্রামে যখন প্রকাণ্ডে পৌত্তলিক-
 তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান করেন, তখন তাঁহার
 জননী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পত্নীঘর ও নব-
 পুত্রবধূ সহিত গৃহ হইতে দূর করিয়া, দিবার

সংকর করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় তাঁহার মাতার সহিত বিবাহে প্রবৃত্ত হইবার পরিবর্তে নিকটবর্তী এক অশানকৃষির উপর বাটা নির্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার জননী ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে বিধর্মী বলিয়া তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য স্থপ্রীমকোর্টে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, বোধ হয় আশা ছিল যে, যদি তাহাতেও তাঁহার মতিগতি কিরিয়া যায়। আদালতে প্রমাণ হইল না যে তিনি বিধর্মী, সুতরাং তিনি পৈতৃক বিষয় হইতে বঞ্চিত হইলেন না। কিন্তু তিনি জননীর হাত হইতে বিষয়ভার কাড়িয়া লইলেন না। তাঁহার জননীও গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দ এবং শালগ্রামমূহ সমুখে রাধিয়া জমিদারী কার্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। রামমোহনের জননীর এক বিশেষ তেজ ছিল, বাহা দ্বারা তিনি সন্তানগণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইতেন।

রামমোহন রায় বলিখিত সংক্ষিপ্ত আত্ম-বিবরণে লিখিয়াছেন যে, পিতার আদেশে বিষয়কর্মের উপযোগী আরব্য ও পারস্তভাষা শিখিয়াছিলেন এবং মাতামহকুলের অমুরোধে সংস্কৃত ও শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতেও বুঝা যায় যে, তাঁহার পিতৃকুল রীতিমত বিষয়কর্ম ব্যাপ্ত পরিবার এবং তাঁহার মাতামহকুল শাস্ত্রাধ্যবসারী নিষ্ঠাবান পরিবার ছিলেন।

উপরে বাহা কিছু বলিয়া আঙিলাম, তাহা হইতে এটুকু বুঝা যাইবে যে, উভয় কুলের মিশ্রণোদ্ভূত চরিত্র সম্বন্ধগত রমণ্যপ্রধান হওয়াই উচিত। স্মার বাস্তবিকই রমণ্যগুণই তাঁহার প্রকৃতির মূলস্থ ছিল, তবে সম্বন্ধগত

আবরণ থাকাতে সেই রমণ্যগুণ অনেকটা নির্মল-প্রকাশ-তাবাপন্ন হইয়াছিল এবং তাঁহাকে, ধর্মপথের পরিবর্তে ভাল পথেই পরিচালিত করিয়াছিল।

উপসংহারে পিতৃপুরুষ সম্বন্ধে রাজার নিজের কথা উদ্ধৃত করিয়া শেষ করি। “আমার পূর্বপুরুষেরা উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন।” অরণ্যভীত কাল হইতে তাঁহারা কৌলীজ ধর্মসম্বন্ধীয় কর্তব্যসাধনে নিবৃত্ত ছিলেন। পরে আমার উর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ (অতিবৃদ্ধ প্রাপ্তিমহ) ১৪০ বৎসর পূর্বে ধর্মসম্বন্ধীয় কার্য পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক কার্য ও উন্নতির অমুরণ করেন। তাঁহার বংশধরেরা সেই অবধি তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসারে চলিয়া আসিয়াছেন। রাজসভাসদ-দিগের ভাগ্যে সচরাচর বেকশপ* ঘটিয়া থাকে, তাঁহাদিগেরও সেইরূপ অবস্থার পতনোপাত হইয়া আসিয়াছে; কখনও সম্মানিত হইয়া উন্নতিলাভ, কখনও বা পতন; কখনও ধনী, কখনও নির্ধন; কখনও সফলতার উৎকল, কখনও বা নিরাশার কাতর। কিন্তু আমার মাতামহ-বংশীয়েরা কৌলিক ধর্মামুসারে ধর্মযাজকতাই জীবনের অবলম্বন করিয়াছিলেন। ধর্মযাজকদিগের মধ্যে মাতামহবংশ অপেক্ষা উচ্চতর আর কোন পরিচয় ছিল না। তাঁহারা বর্তমান কাল পর্য্যন্ত সমভাবে ধর্মামুষ্ঠান ও ধর্মচিন্তার অমুর্ত ছিলেন। সাংসারিক আড়ম্বরের প্রলোভন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার উত্তেজনা অপেক্ষা তাঁহারা মানসিক শক্তি প্রেরণের জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন।”

ত্রিভীষ্মনীঠাকুর।

* Last days in England of Raja Ram-mohan Roy.

দুইটা তত্ত্ব কথা । (২)

(যোগ বা আত্মজ্ঞান)

কর্মযোগ, ভক্তিবোধ, জ্ঞানযোগ, এই ত্রিবিধ যোগের কথা আমাদের শাস্ত্রান্বিতে উল্লিখিত, * অর্থাৎ কর্মের দ্বারা, ভক্তির দ্বারা বা জ্ঞানের দ্বারা জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ফলে একটীর দ্বারা সমুন্নত হইলে অপর দুইটা আপনি আদিয়া হস্তগত হয়। কর্মে মানুষ বতই অগ্রসর হইতে থাকে, ততই দেখিতে পায়, জ্ঞান ও ভক্তি তাহার স্বয়ং অধিকার করিতেছে। কলাফল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে আপনাকে ছুঁয়া সংসারের সেবার নিযুক্ত থাকিলে তাহার অবশ্যস্বাভাবী ফল জ্ঞান ও ভক্তি লাভ। আবার জ্ঞান ব্যতীত ভক্তি অসম্ভব, কারণ ভগবান স্বয়ংক্রিয় একটা পবিত্র জ্ঞান ভক্তির পূর্বস্বর্তী ভাব; নচেৎ ভক্তি কাকে করা যায়? এবং কিসেব জ্ঞান? “জ্ঞানই ভক্তির সাধন।” † ভক্তি বুদ্ধি “সহকারে জ্ঞান ও জ্ঞানভর না হইয়া থাকিতে পারে না। তখন ক্রমশঃ ভক্তের অন্তঃকণ্ঠ খুলিয়া যায়, এবং তিনি সেবাক্রম অবশ্যকর্তব্যের দিকে স্বতঃই আকৃষ্ট হইয়েন। আর জানী যখন “সর্বং খণ্ডিতং ব্রহ্ম” মত্রে দীক্ষিত হইয়া মহা-সত্যের দ্বারা আলোকিত হইলেন, তখন “সমস্ত তাঁহাতে, এবং তিনি সকলেতে” দেখিয়া ভগবদ্ভক্তি ও সেবাপরায়ণতা দ্বারা

অধিকৃত হইতে বাধ্য। বিবরণটা বেকপ বিশাল, অল্প কথার প্রকাশ করা সুকঠিন, অনেক বাক্যব্যয়ের আবশ্যক, এবং পৌরাণিক দৃষ্টান্ত সমূহ দ্বারা ব্যাখ্যাত হইলে ভাল হয়, কিন্তু এখানে তাহার স্থানান্তর। সূত্ররূপে সংক্ষেপে সারিতে হইবে। মূল কথা, জ্ঞান, ভক্তি, ও কর্ম পরস্পর অবশ্যকারে জড়িত, একটীর বিকাশ হইলে তাহা অপর দুইটাকে টানিয়া আনিতে বাধ্য, তবে প্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত ভক্তি, প্রকৃত কর্ম চাই, নিজের নিজের মনের মত একটা গড়িয়া লইলে চলিবে না।

প্রকৃত জ্ঞান আত্মজ্ঞান, তথা পরমা-জ্ঞান। আত্মজ্ঞান ব্যতীত সেই জ্ঞান লাভের অন্য উপায় নাই। “আত্মাকেই দেখিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, নিরব-চ্ছিন্ন অধ্যয়ন করিতে হইবে।” (১) এই ক্রতিবাক্যানুসারে দর্শন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যা-সন দ্বারা আত্মাকে অহুসন্ধান করিলে যে জ্ঞান বা পরাবিদ্যা উপজন্মিত হয়, তাহাই প্রকৃত জ্ঞানপদবাচ্য, কারণ তাহারই দ্বারা ব্রহ্মবস্তুর অধিগত হইয়েন। (২) ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি হইলে অভ্যুৎপত্তময় সমস্ত জগৎ আত্মাতে অবলোকিত হয়, এবং জীবাত্মা, পরমা-ত্মা ও পরিদৃষ্টমান বিধে কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না। (৩) এই জ্ঞানেতে নিখিল কর্মের পরি-

* বা শ্রীমদ্ভাগবতে—

“সেবায়তঃ শ্রীমদ্ভাগবতে যুগং যোগোবিধিঃসমা ।
জ্ঞানং কর্মণ ভক্তিত্বং সোপযোগ্যমোহিতং মুক্তিমি ।”

৩৭ দারদ্র্য ৪০৮

(১) বৃহদারণ্যক । ৪।৪।৫

(২) মুক্তক । ১।১।৫

(৩) নীতি । ৪।৩৫৫

- সমাপ্তি হইয়া থাকে। (৪) ঈশ্বরের সহিত জীব তত্ত্ব হইয়া যায়।—প্রকৃত ভক্তি ভগবানের প্রতি একান্ত প্রেম, (৫) ঈশ্বরে পরায়ুগতি। (৬) “যে ব্যক্তি এই ভক্তিধন লাভ করিয়াছে, তাহার কোন বিষয়েই বাসনা, শোক, ঘেব, রতি উৎসাহ থাকে না।” (৭) এরূপ অবস্থায় নিকামকর্মা ও ভক্ত প্রভেদ কি? যিনি সমুদায় কর্ম ভগবানে অর্পণ পূর্বক তৎপরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তিযোগে তাঁহার ধ্যান করতঃ উপাসনা করেন, ভগবান্কে নিবিড়চিত্ত সেই সকল ভক্তকে তিনি অচিরে মুক্তা-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। (৮) আবার শাস্ত্রকারেরা অনেক স্থলে বলিয়া গিয়াছেন, বলবতী ভক্তিই পরম জ্ঞানের হেতু। বাস্তবিকই, জীব যে জ্ঞান দ্বারা ভগবান্কে জানিতে পারে, ভক্তি সেই জ্ঞানের কারণ। (৯) ভক্তিপূর্বক ভগবদ্ভিত্তা অর্থে অহুরাগবশতঃ সর্বদা তাঁহার স্বরূপের স্মৃতি। (১০) মানুষ আপনাতে যেমন অহুরক্ত, তেমন আর কাহাতেও নহে, কৃপণের ধনচিন্তার মত ভগবানের গুণাবলীর
- (৪) গীতা ১০।৩৩
(৫) নারদস্মৃতি ১।২
(৬) শাণ্ডিল্যস্মৃতি ১।১।১২
(৭) নারদস্মৃতি ১।৫—গীতা ১২।১৭
(৮) গীতা ১২।৬, ৭
(৯) শাণ্ডিল্য স্মৃতি, ১।১২
(১০) শাণ্ডিল্য, ১।২।৫
(১১) কর্মযোগিনী মহামতি বৈশাখ একস্থানে প্রকাশ করিয়াছেন :—

Perfect renunciation: No longer moved by personal desire to enjoy the fruit here; no longer by the personal desire to enjoy the fruit on the other side of death, no longer by the higher person's desire to reap the love and gratitude of his fellow-men, but the renunciation of all desires, the doing of action with no regard to the fruit. Let success come; what is it the doer? Let failure come, what matters it to him who has done his work?—Annie Besant (The Three Paths)

আলোচনা সহকারে তাঁহার ঐতিহ্যকর অহুরাগ ভাবিলে ভক্তিতে সেইগুলি আশ্রয় বর্ত্তিবেই, তাবনাত্মক সিদ্ধি অনিশ্চয়, সুতরাং তখন উভয়ে এক হইয়া যাইবেনই। কৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধিকা বা ক্রীতচৈতন্যের যে প্রেমীর অহুরাগ প্রকাশ পাইয়াছিল, সেই প্রেমীর অহুরাগ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার অহুরাগকে ভক্তি বলা যায় না, ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য।—প্রকৃত কর্ম কি, তাহা ভগবান গীতাতে সম্যকরূপে উপদেশ দিয়াছেন; আর কাহারও কিছু বলিবার কাক রাখেন নাই। (১১) ঐহিক পারলৌকিক সকল প্রকার কলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতঃ কেবলমাত্র প্রভুর ইচ্ছা, অভিপ্রায়, আদেশ অহুযায়ী তাঁহার আরাধনার উদ্দেশে বাবতীর কর্ম কর্তব্য, (১) অশন, বস্ত্র, দ্বীপ, তপস্যা সমস্তই ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে। তাহা হইলে শুভাশুভ সর্ববিধ কর্মের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভানন্তর সন্ন্যাসযোগযুক্ত হইয়া ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিবে। (২) অনীসক্ত হইয়া কর্মাহুতান করিলে ঈশ্বকে লাভ করিয়া থাকে। (৩) কলাভি-সন্ধি বর্জন ও কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে সমস্ত কর্ম অর্পণ করিতে পারিলে তাঁহার আর বাকী রহিল কি? তিনি ত সর্বতোভাবে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইলেন। এক প্রকার মহাকর্মা যে পরাতত্ত্ব ও পরমজ্ঞান লাভ দ্বারা কৃতার্থ হইয়া পরমেশ্বরের সহিত মিলিত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ কোথায়?

আমাদের কল্যাণার্থ যোঃ সখকেশাঃ

- (১) গীতা ৩।৩
(২) গীতা ৯।২৭, ৩০
(৩) গীতা ১০।১০

বাহ্য-জ্ঞান' নিভাত 'প্রয়োজন, তাহা-মহাত্মা কেশবচন্দ্রের পুস্তিকার দেখিতে পাওয়া যায় নাই। যেভাবে তাঁহার দ্বারা তিন প্রকার যোগ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাতে যেন যোগ অর্থে বিশেষ প্রকার সহিত পূজা-ধ্যান-বন্দনা ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। তাঁহার মতে তিন যুগে ত্রিবিধ যোগ বিকাশ পাইয়াছিল;— বৈদিক কালে মানব সমাজের শৈশবাবস্থায় জড়প্রকৃতির শক্তি সমূহে ঈশ্বরের মহিমা দেখিয়া তাঁহার সহিত "প্রাকৃতিক" যোগ; মধ্য বা বৈদান্তিক সময়ে মানবাত্মাতে ত্রককে উপলব্ধি করতঃ তাঁহার সহিত "মানসিক" যোগ; আধ্যাত্ম্যতার শেখাবস্থায় পৌরাণিক যুগে বিধাতার লীলাবিলাস প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার সহিত "ভক্তিযোগ," (৪) শুক কেশবচন্দ্রের স্বাক্ষরোপস্থাপন পণ্ডিত তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য বহু-শাস্ত্রবেত্তা মহামহোপাধ্যায় * গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় তৎপ্রণীত "শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম" গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রকাশ করিয়াছেন :— "সাধারণতঃ এ দেশের ধর্মের বিবরণ আলোচনা করিতে গিয়া বৈদিক, বৈদান্তিক, ও পৌরাণিক, এই তিন ভাগে উইকে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। এক্ষণে বিভাগ দেখিয়া সহজে মনে হয়, বৈদিক সময় নিঃশেষ হইয়া বৈদান্তিক সময়, বৈদান্তিক সময় নিঃশেষ হইয়া পৌরাণিক সময় উপস্থিত হইয়াছিল। এ তিন সময় যে যুগপৎ পার্শ্বাপাশ্চাত্যে

(৪) "We see in the earliest or Vedic period, communion with God in Nature, this is objective yoga. Then we have in the Vedantic period communion with God in the soul, this is subjective yoga. Thirdly, in the Puranic period we have communion with God in History or with God of Providence, this is Bhakti or Bhakti yoga."

বর্ণনায়-যেভাবে-বুঝিত বদ, শব্দে বাস্তবিক
খ্যাপিত।

বিকাশ লাভ করিয়া চলিতেছিল, "বর্ণনায় যেদ যেদান্ত পুরাণ শাস্ত্র পর্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারেন।" এখানে শুকশিষ্যের মতভেদ দেখিয়া আশা-দ্বিগকে গবেষক শিষ্যের সঙ্গেই চলিতে 'হয়, যে হেতুক কেশবচন্দ্র মহা মনীষী ভগবন্ত হইলেও আত্ম শাস্ত্রাদিতে তাঁহার সেরূপ দখল ছিল না, বাইবেল ও পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্বে তাঁহার পারদর্শিতা প্রসিদ্ধ। (১) একারণে তাঁহার ইংরাজী যোগের পুস্তকে তিনি মুসা ও যিশুর ঈশ্বর দর্শনকে যোগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈদিক যোগের বর্ণনাতে তখনকার লোকের পূজাবন্দনাদি (যাহাকে তিনি যোগ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন) উল্লেখকালে যেন মক্ষমূলরাদি (২) প্রতীচ্য পণ্ডিতদিগের সহিত স্মৃতি মিলাইয়া বলিতেছেন যে, বৈদিক-মহাদ্বি-প্রণেতা ঋষিগণ মানব-সমাজের আদিমাবস্থার জীব ছিলেন; তাঁহাদের প্রচারিত বাক্যসমূহ "অর্দ্ধসত্য কৃষকের

(১) এইজন্য কেশব ব্রিটানের "গড্ (God) ও "সোল" (soul) লইয়াই নাড়াচাড়া করিয়া গিয়াছেন, বড়-জোর সাহসের "সোলের" অভিরুক্ত স্পিরিটের (spirit) কথাও উল্লেখ করিয়াছেন, পরন্তু "গড্" কি, পরার্থ, "সোল" কি জিনিস, "স্পিরিট" শব্দে কি বুঝায়, ইত্যাদির ব্যাখ্যা কোথাও করেন নাই। তিনি কেন? ব্রাহ্মসমাজের কেহ কখন কোথাও এ সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া ত মনে হয় না। কেবল ধ্বস্তর ভাবে দীর্ঘাতির টীকাটীকানিতে প্রজ্ঞাপদ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের ঐ দিকে যে কিছু চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। অসুখ দার্শনিক ভিত্তির উপর মতবিবাস সংস্থাপন করিবার প্রয়াস প্রাচীন আত্ম-বিস্ময় যেভাবে করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অনুসরণ করিতে ব্রাহ্মসমাজ কি অপারক?

(২) "Babbings of an infant race." Max Muller:

প্রকৃত কথা এই যে, যেমন আনাদের
শৈশবাবস্থায় আমরা অজ্ঞান অসহায় অবস্থায়
থাকি। বহু-অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন গুরুজনের
আশ্রয়ে ও তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত বর্ধিত
হইয়াছি, ঠিক তদ্রূপ জগতের শৈশবাবস্থাতে
সাধারণ মানবসমূহ জ্ঞান সম্বন্ধে পশ্চাৎপদ
থাক। হেতু তাহাদের অভিজ্ঞাবসরূপে, বৈ-
সকল পূর্বপূর্ব কর্মের কৃতকৃত্তিরোগ, সর্ব-
ফলনিধান, সত্যোপপন্ন, সিদ্ধি, মহাপুরুষগণ
সংসারের হিতসাধনার্থে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,
বৈদিক ঋষিগণ সেই অদ্বৈতবৈজ্ঞানিক-অভিজ্ঞতা-
সম্পন্ন পুত্ৰাশ্রমিগণকে দেখে।

বিজ্ঞানবিদগণ; অতুলবিভূতিশালী, নিত্য-
অক্ষ পুরুষেরা মানবসমাজকে বোবনে উপনীত
এবং বাবলবনে সক্ষম দেবিতা এবারকার মত
পৃথিবী হইতে অবলম্বন গ্রহণ করিয়াছেন।
পিনোপিতা যেমন হস্তির মর্যাদা বৃদ্ধিতে
অক্ষম, আরবীও তেমনি উক্ত নরসিংহদিগের
বিশালতা ধ্বংসকরিতে পারি না।

“সর্বকারণকারণং,” বাহাকে আমরা
পরব্রহ্ম বলিয়া থাকি, তাঁহার অব্যক্ত সত্তার
লব্ধে কিছু বৃষ্টিবার কানিবার মোটেই বো
নাই (১) সত্য, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তাবস্থার ভাব
উপলব্ধি করিতে আমরা ততটা অক্ষম নহি।
বিনি নিষ্ঠুর, নির্জিকার, নির্জিত পরব্রহ্ম,
তাঁহাকে জড় বা জড়ের মত কোন পদার্থ
বলা যেমন অসঙ্গত, চৈতন্য বা সচিবের (২)
জ্ঞান কিছু বলাও তেমনি মুক্তিবিহীন, কারণ
আমরা ঐ শব্দদ্বয়ে বাহা বৃষ্টি, তাহা অপেক্ষে
সত্তবে, ইহা কি ধারণাবোধ্য? অবশ্য আমা-
দের দেহাপেক্ষা সূক্ষ্মতর নানা শ্রেণীর
দেহধারী উচ্চতর দেহভান্ডিতে (৩) তাঁহার
স্থিতি, ও প্রভাব উপলব্ধি করিতে পারা যায়;

(১) 'No words can describe it, for words imply discrimination, and this is All. We murmur, Absolute, Infinite, Unconditioned—but the words mean naught. Sat, the wise speak of: Bee-Ness, not even Being nor Existence. Only as the Manifested becomes can language be used with meaning; but the appearance of the Manifested implies the Unmanifested, for the Manifested is transitory and mutable and there must be something that eternally endures. This Eternal must be postulated, else whence the existences around us? It must contain within Itself That which is the essence of the germ of all possibilities, all potencies: Space is the only conception that can even faintly mirror it without preposterous distortion, but silence least offends in these high regions, where the wings of the spirit beat faintly and lips can only falter not pronounce. Annie Besant.

(২) Consciousness.
(৩) Higher spiritual intelligences.

পরব্রহ্ম একেবারে সীমা রহিত সর্বপাণিক
অবস্থার (৪) উহা কি ভাবে তিষ্ঠিতে পারে,
তাঁহা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধির অগম্যতর। বাহা
বোধ শক্তির অতীত ব্যাপার, তৎসম্বন্ধে কোন
কথা বলাই অসুচিত। সীমাবদ্ধ ব্যক্তির
বিশিষ্ট সত্তা আমাদের অগম্য লক্ষণে
সমুন্নত হইলেও অব্যক্তের প্রসঙ্গে তাঁহাকেও
নিরাক থাকিতে হইবে; এই নিমিত্ত প্রাচীন
আর্য্য ঋষিরা অনাদি আদিকারণকে কেবল
মাত্র “তৎসৎ” বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। সেই
কারণে বর্তমান কালের একমাত্র বুদ্ধ প্রাপ্ত
মহাত্মাগণী শাক্যমুনি বিশ্বের মূলহীন মূল (৫)
সম্বন্ধে বারবার জিজ্ঞাসিত হইয়াও সর্বদা
নিরুত্তর ছিলেন; তাই না বৃষ্টিরা সাধারণ
লোকে তাঁহাকে নাস্তক উপাধি দিয়াছে।
চরাচরের যাবতীর পদার্থ জ্ঞাতা, জ্ঞের, জ্ঞান,
এই তিনের একটামু মধ্যে আসিবেই, কিন্তু
তাঁহাকে ইহার কোনটীর ভিতর ফেলা যাইতে
পারে না; অথচ এই তিনের মূল কারণ
তিনিই। তাঁহা হইতে যে মহাশক্তি কেন্দ্র
অভিব্যক্ত, তাঁহাকে প্রাচীন পাশ্চাত্য ধর্ম-
বিজ্ঞানবিদগণ (১) “লগস (২) বলিয়া গিয়াছেন,
আমরা তাঁহাকে “ঈশ্বর” “প্রভাগাত্মা” “শব্দ-
ব্রহ্ম” আখ্যা দিয়া থাকি। ইহাকেই খ্রীষ্টান-
গণ (৩) “ভর্সম্” বা “ওয়ার্ড” (৪) বলেন,
ইনিই তাঁহাদের “খ্রীষ্টস্”; (৫) বোধের
“অমিতাভ” “অবলোকিতেশ্বর” নাম দিয়া-
ছেন; গ্রিহী জাতি “জহোবা” (৬) নামে

- (১) distinct individualized existence.
- (২) Rootless root.
- (৩) Theologians.
- (৪) Logos
- (৫) Gnostics
- (৬) Verbum-word
- (৭) Christos.
- (৮) Jehovah.

• ভাস্কর্য্য-কলারূপে বর্ণিত "আত্মা" "খোদা" বলিয়া অভিহিত; • প্রাচীন চীনদেশে "ডাও" নাম প্রদত্ত; এবং জোরাজীর গাথার "আত্মা-মাজদা" বলা হইয়াছে। সুস্থির অবস্থায় আমাদের ব্যক্তিত্ব (১) যে ভাবে থাকে, ইনিও প্রলয়কালে সেই ভাবে সজ্জা-নন্দরূপে পরব্রহ্মে অবস্থিতি করেন। নূতন করারন্তে ইনিই প্রথম জ্ঞাত। এস্থলে একথাও বলিয়া বাধা কর্তব্য যে, পবত্রকে এই শ্রেণীর মহাশক্তিকেই অসংখ্য রহিয়া-ছেন।

• প্রথম পবত্রক, দ্বিতীয় ঈশ্বর বা প্রত্য-গাত্মা, তৃতীয় ঈশ্বরের ভিতর দিয়া পরব্রহ্মের বে জ্যোতি অভিযুক্ত হয়, গীতার বাহাকে দৈবীপ্রকৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে, চতুর্থ মূলপ্রকৃতি, যাহাকে স্থলভাবে পরব্রহ্মের আবরণ বলিলে কোন প্রক্টারে চলে। ইহা-দের মধ্যে দৈবীপ্রকৃতিকে জ্যোতি, সখিৎ অথবা পরাক্রম (৮) বে ভাবে দেখা যায়, মূলে সেই একই শক্তি। (৯) মূল প্রকৃতির উপর এই শক্তির ক্রিয়া দ্বারা প্রলয়ান্তে ঈশ্বর কর্তৃক নূতন বিশ্বের বিকাশ হইয়া থাকে। বিশ্বরূপ-বিরাট পুরুষের স্থলশরীর যেন মূল-প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থা, দৈবীপ্রকৃতি তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর এবং স্মরণ ঈশ্বরের সেন তাঁহার কারণ বা সমন্বয় শব্দ, মানবাত্মা যেমন আমাদের কারণ-দেহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বিশ্বরূপ বিরাটপুরুষের ঈশ্বররূপ সমন্বয় শরীরে পরব্রহ্ম সেই ভাবে বিরাজিত।

বিকুপূরণে এবং সাংখ্যমতেও "তৎসৎ" হইতে পুরুষ (১), প্রধান (২) ও মহ-

- (১) Ego
- (২) Light Consciousness or force
- (৩) Energy
- (৪) Essence of spirit
- (৫) Essence of matter,

ভের (৩) উৎপত্তি : উল্লিখিত (১) হইতে আমাদের মনঃ (৪) উৎপত্তি; • বোধোপভুক্ত সময়ে মানবের দেহমন্দির কাব্যে বাসোপযোগী হইলে "মানসপুত্ররূপ" কর্তৃক উনি নরশরীরে প্রবিষ্ট হন; ইহার আর এক নাম ক্ষেত্রজ। এই মহাশক্তিশালী সত্তা সমূহ (৫) মানাত্মানে মানাত্মকার আত্মা প্রাপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়:—বধা, "জ্ঞানায় মানসপুত্র" "তেজোনিখাধিপতি" (৬) "জ্যোতি-স্তত্ত্ব" (৭) "জ্যোতিপ্রভু" (৮) "জ্ঞানধিপা" (৯)। ইহার কোন কারণ আমাদেরই মত জীব হিলেন। পটল বোগতপোবলে সিদ্ধিলাভ করতঃ অত্যাচ্ছন্ন পদবীতে সমাকট। মনপ্রবেশের পূর্বে কেবল মাত্র আমাদের স্থল ও সূক্ষ্ম দেহ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাব পরে ইহার বাসোপযোগী কাবণ শরীরের বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে। এইখান হইতে তগবানের সঙ্গে মাহুষের একটা বিশেষ নূতন রকমের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। মন সেই সম্বন্ধ-বন্ধনের শৃঙ্খল স্বরূপ। এই মন কর্তৃক আমরা দ্বন্দ্ব-চৈতন্য (১) পাইয়াছি, স্তবং ইনি আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। মানবদেহে অধিষ্ঠিত হইবার পর কার্য্যসৌকর্য্যার্থে ইনি আপনার সত্তা হইতে কর (২) প্রসারণ করতঃ তাহাকে ভূতাক্রমে নিযুক্ত করিলেন। ইহা তৎপূর্বে বিকাশপ্রাপ্ত কামশক্তির (৩) সহিত

- (৩) Universal Mind
- (৪) The thinker-human soul—Image of the Universal Mind,
- (৫) Spiritual Intelligences of a higher order.
- (৬) Lords of the Flame,
- (৭) Pillars of Light
- (৮) Lords of Light
- (৯) Lords of Wisdom
- (১) Self-consciousness—"I am I"
- (২) Ray
- (৩) Kamic principle in man

মিলিত ভাবে কামনাসমূহ, অশুদ্ধ বা ক্ষুদ্র মন (৪) নামে অভিহিত হইয়া অজ্ঞপদের সহিত ব্যবহার দ্বারা অভিজ্ঞতা, সংগ্রহে নিয়োজিত হইল। এই কার্যপ্রধান মনের দ্বারা আমরা সাংসারিক বিজ্ঞা বুদ্ধি (৫) সহকারে বাবতীর পার্থিব ব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকি। উচ্চ বা বিশুদ্ধ মন (৬) আত্মার প্রতিনিধি স্বরূপ, সুতরাং ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিলে বলা যায়। অশুদ্ধ মনঃ নখর, শুদ্ধ মন অবিনাশী, ইনিই কারণ পরীয়ে অভিব্যক্ত থাকিয়া বাবহার সংসারে বাস্তবায়ন করিতেছেন। ইহার দ্বাৰাই আমরা ব্যক্তিত্ব (৭) লাভে সক্ষম হইরাছি, যাহাতে জন্মান্তরায়নের অসংখ্য অভিজ্ঞতা সংস্কাররূপে সংরক্ষিত হইতেছে।

যেখানে সংযোগ, সেই খানেই বিদ্রোহ, সংমিশ্রিত পদার্থ (১) অবিনাশী হইতেই পারে না; বিশেষ আমাদের ব্যক্তিত্বের যখন

(৪) "Lower mind—the coarser energies of the higher expressed in denser matter by which the Thinker gathers experiences."
A. Besant

"মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধকামশুদ্ধম্বেচ।

অশুদ্ধং কামসংকরং শুদ্ধং কামবিবর্জিতম্।

—ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ ১।১

(৫) Brain or physical intellect

(৬) Higher Manas

(৭) Individuality

* (১) Compound

একদিন আরম্ভ হইয়াছে, তখন আর এক দিন উহার শেষ অনিবার্য, বাহা নাদি, তাহা স্নাত না হইয়া যাহু না; পরন্তু যদি উচ্চ মনের শাসনাধীনে উক্ত ব্যক্তিত্ব সেই একেই সহিত মিলিত হইতে সক্ষম হয়, তবেই উহা অমরত্ব লাভ করতঃ চরিতার্থ হইতে পারে, নচেৎ নয়। (২) এই মিলন বা যোগের উপায় আত্মবিজ্ঞান (৩) দ্বারা প্রদর্শিত। এখন গীতাব উপদেশানুসারে যদি আমরা আপন্যু-দিগকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া ফেলিবার জন্ত মোটামুটি চেষ্টা আরম্ভ করিতে প্রস্তুত হওয়া বিশেষ কর্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতে শিখি, গুরু অবশ্য মিলিবে, যিনি জ্ঞানাজন-শলাকা দ্বারা আমাদের তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত করিয়া সরল পথ দেখাইয়া দিবেন।

বিষয়টা যেরূপ গুরুতর, আমাদের মত লোকের হাতে তাহা পবিত্র হওয়া কখনই সম্ভব নহে। মোটা কথা ভিন্ন আমরা কি বলিতে পারি? এমন কি, যে ভাষাতে এক-দ্বিধ প্রসঙ্গ ব্যাখ্যাত হইলে শোভা পায়, সে ভাষাই আর্থবা জানি না। বাহা হইক, আর এক দিক দিয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রীতশ্রীশেখর সেন।

(২) দাক্ষিণাত্যের দর্শনশাস্ত্রবিদ্যার মহাবোধী স্বকারণও বলিয়া গিয়াছেন :—

"Depend upon it that unless a man's individuality or ego can be transferred to the Logos immortality is only a name"

(৩) Science of the Soul

অদেহ-প্রেম :

৩য় দৃশ্য ।

স্থান—দেবভবন ।

কাল—অপরাক্ষ ।

বিজয়, রমানাথ ও হবগোবিন্দ আসীন ।

বিজয় । বাবার মত হইরাছে, ধীরেনের সঙ্গে মনোরমার বিয়ে দেবেন ।

রমানাথ । খুব ভাল । ধীরেন কোথায় ?

বিজয় । সে তার কস্তা-শোকোন্মত্ত পিতার অশেষণে গিরাছে । হরগোবিন্দ তাদের খোঁজে গিয়েছে ।

রমানাথ । আমিও বাই না কেন । শুভ কাজ বত শীঘ্র হয়, শুভই ভাল ।

বিজয় । না রমানাথ । “বিবাহে ব্যবসা” নিবারণ করার জন্য আমাদের এখন বিশেষ বস্ত্রের ও উত্তমেষ সঙ্গে প্রচার কার্য করা আবশ্যক । আমরা যে কাজ নিয়েছি, তা অতি কঠিন ।

রমানাথ । হাঁ আমি দেখছি । হিন্দু সমাজ এখন দুই দলে বিভক্ত । বাদের মেরে নাই, ছেলে আছে, তারা প্রায়ই লোভে অন্ধ । তারা বিবাহ-ব্যবসাতে লজ্জিত নয় । যারা কস্তাদারে পাড়িত, তারাই আমাদের দিকে । বাদের কেবল ছেলে আছে, অথচ বিবাহে পণ লওয়ার পক্ষপাতী, এমন লোক খুব কম ।

বিজয় । সেইটাই মুর্খিল । ধন্যজ্ঞান বা আত্মমর্যাদা বলে যে জিনিষ আছে, তা যেন সমাজ থেকে একবারে উঠে গেল ?

রমানাথ । তা বই কি । সমাজে এখন কেবল লুট । যে যেমনি পাচ্ছে, সে তেমনি টাকা লুটছে । “তুমি পার আমার টাকা জোটে, আমি পারি তোমার টাকা লুট” — এই হয়েছে সমাজের মূলমন্ত্র ।

বিজয় । এই লোটারুটি ব্যাপার থেকে সমাজকে দূরিয়ে আনতে হবে । ছোটের উপর বড়দের হস্তে সমাজকে বিবেক ক-

ধর্মের শান্তিনিকেতনে কিরিয়ে নিজে আসতে হবে । রমানাথ, তুমি কবে প্রচার কার্যে বেরোবে ?

রমানাথ । কাল ।

বিজয় । বেশ কথা । এই প্রচার কার্যে দৃষ্টান্তই প্রধান উপদেষ্টা, তা তুমি জান । যেখানে বতগুলি দরিদ্র পবিবারে অর্থের অভাবে কস্তার বিবাহ হচ্ছে না, তার তালিকা ত তোমার কাছে আছে । সর্বত্রই মধুসূদন ভট্টাচার্যের বাটীতে যাওয়া আবশ্যক নয় কি ?

রমানাথ । আমি ত তাই করি । নব্বীপে একটা বক্তৃতা কোরে ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়ী যাব ।

৪র্থ দৃশ্য ।

স্থান—প্রমাদপুর । ব্রাহ্মণবাটী । কাল, বেলা ৪টা ।

রমানাথ ও মধুসূদন আসীন ।

রমানাথ । আপনার একটা অবিবাহিতা কস্তা আছে ?

মধুসূদন । (হুপিত ভাবে) আছে । তার হবে কি ? টাকা নেই, একগুণ বিয়ে দিতে পারি নি, এতে আমার অপরাধ কি ?

রমানাথ । বয়স কত ?

মধুসূদন । বয়স হয়েছে, তা কর্কো কি ? বলি আমার যে টাকা নেই । টাকা না দিতে পালোঁ যে আজ কাল মেয়ের বিয়ে হয় না, তা কি জাননা ?

রমানাথ । বলি, মেয়েটা আমি কি এক বার দেখতে পাইনে ?

মধুসূদন । দেখে হইবে কি ?—মহা দেখতে এসেছ ? মেয়ে আমার সন্দেহী, খুব সন্দেহী, হ'লে হবে কি ? টাকা নাই ।

রমানাথ । কেহ যদি টাকা না দিলে বিয়ে করে, —তা দেখানো, আপত্তি কি ?

মধুসূদন । এতদূর রকম কদমক রকম

বাঁহু দৈবে গিয়েছে, অনেক হুড়ো চুড়ো
বুড়ো দৈবে গিয়েছে, দেখা হলো, মেয়ে গছন্দ
হলো, আর সব ভাল, শেষে ওই টাকার কথা।
আমি ত পূর্বেই বলি, আমি নিঃশ্রম ধামন।
তবে বেটারা মেয়ে দেখে, শেষে টাকার কথা
বলিস্ কেন?—তুই এক জনের সঙ্গে গালি
গালাজ, লাঠালাঠি হব হব হোয়ে থেমে
গিয়েছে।

রমানাথ। আমি পূর্বেই বলছি, মেয়ে
গছন্দ হ'লে বিয়েতে আপনার এক পরস্যাও
লাগবে না।

মধুসূদন। ওরে আমার সোণার চাঁদ!
ঠিক কথা বলছো? কিন্তু এবার যদি
টাকার কথা উঠে, তা হ'লে আমি মার্কো,
সাক্ বলাহ, মার্কো।

রমানাথ। যে আজ্ঞা।

মধুসূদন। মেয়েটার আবার মা নেই।
কি কষ্টেই পড়েছি।

বিয়ে হয়নি বোলে পাড়ার লোকের
গল্পনার মা আমার, দুহ বৎসর মুখ তুলে
তাকান না—আমি মেয়ে নিয়ে আসছি।

(মধুসূদনের প্রস্থান এবং সরস্বতী সহ
পুনঃপ্রবেশ)

মা—বসো। দেখছো বাপু! আমার
মেয়ে সুন্দরী নয় কি? ভাল কাপড় পরেনি,
দ্বার গয়না নাই, তবু কি একটী পরিচয় মত
দেখাচ্ছে না? বলি, সত্য কথা বলো।

রমানাথ। হাঁ, পরিচয় মতই বটে, যেন
বিরলে পদ্মকল ফুটে, আপনার এই কুটার
আলো করে রেখেছে। (কস্তুর প্রতি)
তোমার নাম কি?

মধুসূদন। বলো, তাতে দোষ নাই।

সরস্বতী। শ্রীমতী সরস্বতী দেবী।

রমানাথ। কি পড়েছো?

সরস্বতী। বাকালী বারোণ, মহাভারত,
কাবচরী, নীতার বনবাস।

রমানাথ। আপনার কস্তা এখন যেতে
পারে।

(কস্তার প্রস্থান)

মধুসূদন। (উদ্ভিগ ভাবে) এখন বল কি?

রমানাথ। এক পরস্যাও লাগবে না।

মধুসূদন। অ্যাঃ—বল কি! বিয়েতে
টাকা লাগবে না?—র্যা! র্যা! বিয়েতে
টাকা লাগবে না? (রমানাথকে আপাদমস্তক
নিরীক্ষণ করে) এ কি স্বপ্ন না বাস্তবিক—তুমি
আমোদ কচ্ছ না ত?

রমানাথ। না মহাশয়।

মধুসূদন। কার সঙ্গে বিয়ে?

রমানাথ। পাত্র জমীদারের ছেলে,
এম-এ পাশ করেছে, দেখতে ও বরষ ঠিক
আমার মত। বাসস্থান পাবনা জেলার প্রভা-
পুর গ্রামে, কান্তাপ গোত্র। কুলীন। এই
প্রথম বিবাহ।

মধুসূদন। বলেন কি! মহাশয়, সত্য?

রমানাথ। নিতান্ত সত্য।

মধুসূদন। কবে বিয়ে হতে পারে?

রমানাথ। আপনি যদি ইচ্ছা করেন,
এই মাসেই। আর পাত্রের বিষয় আর যদি
কিছু জানতে চান—কলিকাতার বেচু চাট্-
খোর ষ্ট্রীট জমিদার রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশয়ের নিকট অথবা তাহার পুত্র বিজয়চন্দ্র
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট জানতে পারেন।

মধুসূদন। (উর্দ্ধে তাকাইয়া) ভগবান্,
তুমি যাক্ এতদিন পরে আমার জাত ধর্মরক্ষা
কলে!

এম দৃষ্ট।

স্থান,—মেসের বাসা। কাল অপরাহ্ন।

ভূপেন্দ্র, গণেশ, হরি ইত্যাদি আশীন।

ভূপেন্দ্র। আমি পড়ি শুন। ভারি
মজার বিজ্ঞাপন।

"Matrimonial Market" বিবাহের
বাজার।

"১। পাত্র এক দম্পত্য বিক্রয়।

আজি কালি বিবাহে পাত্র বেচা কেনার
দ্রব্য দস্তর করিতে লোকের অনেক সম্মত
নষ্ট হয়, আর অনেক হয়রাণি হয়। একজন
আমরা সাধারণের সুবিধার জন্য পাত্র বিক্রয়ের
একটি দোকান খুলিয়াছি। আমাদের সমস্ত
মাল এক দম্পত্য বিক্রয় হইবে। পাত্রের বৈশিষ্ট্য,
নাম ধর্ম, পিতার নাম, কটা পাখ, আর কত
বরষ কত ইত্যাদি বিষয়, তাহার প্রত্যেক
প্রত্যেক নিকট সমীচীন লোকের নিকট
জানাই।

“আছে। বোকারীনে ঐ সব কটো সাফান আছে।”

গণেশ। বা! বা!

ভূপেন্দ্র। শোন না। “আর দশ হাজার ক্যাটালগ ছাপান হইরাছে, তাহাতে পাজ সকলের কটোগ্রাফের তলে গোজ, আর কটা ‘পাশ’ ইত্যাদি বিবরণ, এবং দব লেখা আছে। পাজ পছন্দ হইলে যে ট্রান্সপ-মারা চুক্তি-পত্র লিখিতে হইবে, তাহাব ফারম ক্যাটালগে ছাপান আছে। চুক্তি অহুসারে টাকা পেমেণ্ট হইলে মাল অর্থাৎ পাজ বিবাহ রাজিতে কস্তার বাটীতে ‘ডিলিভারি’ দেওয়া হইবে। প্রতি রবিবারে বেলা দুইটা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত পণ্য পাজগুলি সম্বন্ধে আমাদের দোকানে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের “ক্যাটালগের” মূল্য প্রতি কপি ২ মাজ।” হরি। Capital.

ভূপেন্দ্র। বিজয় বাবু আগেই বলেছিলেন যে, এইরূপ বেচা কেনা ক্রমশঃ হবে।

গণেশ। এত শীঘ্র হবে, অস্বস্তঃ তা আমরা ভাবিনি।

ভূপেন্দ্র। দেখুছো না, আজ্ কাল আমাদের দেশে ভাল মন্দ বা হচ্ছে, সব বিদ্রোহের বেগে হচ্ছে। দেখুতে ভাবতে সময় দিচ্ছে না।

হরি। তোমার হাতে ওটা কি?

ভূপেন্দ্র। ওটাও বিজ্ঞাপন। ধর্ম্মতলার একটা ছোড়া ট্রানকারে ফেলে দিল। ওটা আরও মজার।

হরি। পড় না।

হরগোবিন্দ। পড়ি শোন, বিজ্ঞাপন নং ২।

বিজ্ঞাপন।

“আমরা বিশ্বস্তহুত্রে অবগত হইরাছি, Hart Brothers ঘোড়া বিক্রয় নীলামের কিনে এসেণীর পাজ নীলাম করার একটা কারবার খুলিবার মনস্থ করিয়াছেন। আমাদের দেশের পাজগুলি বিদেশী ব্যবসাদারের হাতে বাওরা, বিশেষতঃ ঘোড়া এবং পাজ এক স্থানে এক দিনে নীলাম হওয়া, আমা-
র দেশের পাজসম্বন্ধে বিস্ময়। এইজন্য

আমরা Hart Brothers দোকানের একদূরে পাজ-নীলামের একটা কারবার করিয়াছি। প্রতি শুক্রবারে বেলা ১১ টার পর নীলাম আরম্ভ হয়। অত্যন্ত বিবর আনিবে আকিমে জ্ঞাতব্য।

পাজ নীলাম কোং লিমিটেড,
ধর্ম্মতল, কলিকাতা।

রমানাথের প্রবেশ।

ভূপেন্দ্র। রমানাথ, তোমার বিয়েতে মোটে জাঁক জমক কলৈ না? এ কি রকম বিয়ে?

রমানাথ। এ খুব ভাল বকম বিয়ে। বিয়েতে জাঁক জমকে যে টাকাটা খরচ হ’ত, তার অর্ধেক “বিশুদ্ধ বিবাহ-প্রচলন সভার” কণ্ডে (fund) দেওয়া, আর অর্ধেক দরিদ্র-লিকা সভার কণ্ডে দেওয়াতে তোমার কোন আপত্তি আছে কি?

ভূপেন্দ্র। নিশ্চয়ই না।

রমানাথ। বিজয়ের সংবাদ পেরেছ কি?

ভূপেন্দ্র। না।

রমানাথ। কুমার বেন একট tragedyর দিকে ঘটনাটা যাচ্ছে। ঘটনাটা টাকা নিয়ে তাপনীর বিয়ে। কৈলাস জীর পোকে আত্ম-হত্যা করেছে শুনি, কেদার বাবু পাগল হয়ে কোন মতেই বাড়ী আসতে চাচ্ছেন না। ধীরেন তাহার কিন্তু পিতার সঙ্গে পথে পথে কিরছে। বিজয় কেদার বাবুকে ও ধীরেনকে শেষে নিজে আনতে গিরেছে।

গণেশ। বিজয় গিরেছে, তাত ভালই, ধীরেনের সঙ্গে মনোরমার বিয়ে হবে।

রমানাথ। তা ত ভাল। কিন্তু এদিকে

বিজয়ের মা বিজয় সন্ন্যাসী হয়ে চলে গ্যাছে বলে দিবা রাজি কানুছেন।

গণেশ। স্বামধন বাবু?

রমানাথ। বিজয়ের খোঁজে গিরেছেন।

গণেশ। তাতে কি আশঙ্কা করে?।

রমানাথ। তোমরা হয়ত, বলবে, আমায় superstitution কিন্তু আমার মনে একটা আশঙ্কা হচ্ছে—এটাটা দেওয়ানী-বিষয় tragedy-র মতো মনে হচ্ছে।

১. 'বৈ সমস্ত' সামাজিক 'বিধানে এই ভাব অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তাহা বার্তার দৌরলো জর্জরিত হইয়া উঠিবে। সামরিক ঐশ্বর্যে প্রাসাদ নির্মাণ সম্ভব,—কারণ তাহা ইষ্টকের সংযোগে গ্রথিত হয়—কিন্তু মানব লইয়া যেখানে সমাজবিধি রচনা কবিতো হয়—সেখানে তাহা পর্যাপ্ত নহে। উদাহরণ দ্বারা কিছু প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছি।

২. ইউরোপেব রাষ্ট্রতত্ত্ব গ্রীক এবং রোমীয় আদর্শে বহুপরিমাণে গঠিত হইয়াছে। বহুবাষ্ট্রবাদেব (Theory of Universal dominion) আদর্শও বোমক সাম্রাজ্যই ইউরোপকে দান করে। বোমক সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর ফ্রাঙ্ক, ভিসিগথ অষ্ট্রগথ প্রভৃতি বারবোরিয়ান (Barbarian) জাতি, (Obotribs, Wiltus, Sorabes, Bohemians প্রভৃতি জাতি এবং দক্ষিণ হইতে আরবগণ কর্তৃক পর্যাস্ত হইয়া ইউরোপ নিঃশূন্য চকল ও অস্থির অবস্থায় ছিল। ফরাসী ভাবুক গিজো (Guizot) বলেন, এ সময়ে কোন জাতির স্থির নিবাসভূমি ছিল না—সকলেই ইচ্ছুক: যুবিয়া ফিবিয়া থাকিত। দশম শতাব্দীতে ইউরোপের জীবন কতক পাবমাণে শ্বেধ্য লাভ করে। কতকগুলি স্বাভাবিক সীমায় নিবদ্ধ হইয়া সকলেই অপেক্ষাকৃত শান্তির নিয়ন্ত্রণ ভোগ করিতে ইচ্ছা কবিল। এ সময় এ যুগেব সর্ব প্রধান ব্যক্তি Charlamgne-র কৌতুকবা বা স্পেনের কোন্সল প্রভৃতির স্থিতিও কতকটা চলিয়া গেল—কিন্তু তাহাতে কোন অনিষ্ট ঘটিল না। গিজো বলেন—“এই সময়ে ধীরে ধীরে শৈথিল্যবিহীন ক্রমশ-কাতর জীবন সমগ্র ইউরোপের মাঝে শান্তির পথে চলিল; জনসাধারণ ধীরে ধীরে ভূমিখণ্ড সমূহ আশ্রয় করিল;

ভূমি-সম্পদ স্থিরীকৃত হইল, এবং বর্ষাকালের সংঘর্ষে অব্যবহিত সম্পর্ক ক্রমশঃ সুনির্দিষ্ট হইল। সর্বত্র ছোট খাট সাম্রাজ্য গঠিত হইয়া উঠিল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যও বিশেষ ভাব কর্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া আবির্ভূত হইল। এই ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য এবং রাজ্যগুলির মাঝে আচার ব্যবহার প্রভৃতি মূলক যে ঐক্য-বন্ধন ছিল, তাহা ক্রমশঃ পরিষ্কৃত সম্পর্কে পরিণত হইলেও পরস্পরের স্বাভাব্য অক্ষুর রহিল। এক দিকে ক্ষমতাবিশিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব ভূমিখণ্ডে পরিবার, পরিজন সহ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং অন্যদিকে উচ্চ নীচের মাঝে কর্তব্য পরস্পরা শৃঙ্খল-বদ্ধ হইয়া যুদ্ধপ্রিয় সাধারণের মাঝে সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনের উপযোগী এক প্রকার বোকা পড়া হইয়া গেল।”

ইহাব পরেই ফিউডেলিজ্যামের যুগ। ফিউডেলিজ্যাম ব্যক্তির পক্ষে হিতকারী—কিন্তু সামাজিক শান্তিব পক্ষে অপরিপাক, একজ্ঞ তাহাও দীর্ঘায়ু হইতে পারে নাই।

এই সমস্ত গঠনে খ্রীষ্টধর্ম মাত্র পরোক্ষ ভাবে ছায়াপাত করিয়াছে। পঞ্চম শতাব্দী হইতে আমরা, সুস্পষ্ট ভাবে ঠিক খ্রীষ্টধর্মকে না হইলেও, সুগঠিত ও সুসম্বন্ধ খ্রীষ্টীয় রাজক সাম্রাজ্যকে দেখিতে পাই। ইহাদের একটি স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন অস্তিত্ব ছিল। এই ধর্ম সমাজটার আদর্শ যদিও ইহার নিজেব কলেবরের মাঝেই আবদ্ধ ছিল, তবুও ধীরে ধীরে ইহার বিধান সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল।

রোমক সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর বধন এই ধর্ম-সাম্রাজ্যটি ক্ষুধিত শাব্দুল সমূহের দ্বারা বর্ষাকালের বিলোড়নের সম্মুখে গিয়া পড়িল। অরক্ষিত ভাবে দাঁড়াইল, কখন তাহার নিত্যক

শিখার ও ভীতিভর হইল। 'রোমের সাম্রাজ্য' লেখক সহিত তাহা নানা রকম, নানা ভাব ও স্বভাব দ্বারা ভূষিত ছিল, কিন্তু এই সমস্ত নব্য উন্নত জাতির আচার ব্যবহার, কর্ম-প্রণালীর সহিত কোন সাম্য, কোন প্রকৃতিগত একতা থাকার ছিল না।

এই ভীতির বেষ্ট্রায়াতলেও এই ধর্ম-সমাজটা বর্ষরাতিধেয়গণের মাঝে নবধর্ম প্রচারের দ্বারা তাহাদের শ্রদ্ধা ও প্রেম আকর্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু তাহা বহুপরিমাণে নিষ্ফল হইল। নব্যজাতিগুলির মূল্যবোধ, ও হৃদয়হীনতার আঘাতে খ্রীষ্টীয় চার্চের মতামত ধূলিপটলের স্তর উড়িয়া গেল। তারপর বাহা বটিল, তাহা মুখ্যতঃ বর্তমান সুদূর পর্যন্ত ইউরোপীয় সমাজকে প্রচলিত করিয়াছে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিক নিজে বলেন :—

"For her defence, she (Christian Church) proclaimed a principle, formerly laid down under the Empire although vaguely this was the separation of the spiritual from the temporal power and their reciprocal independence. It was by the aid of this principle that the church lived freely in connection with the Barbarians; she maintained that force could not act upon the system of creeds, hopes and religious promises; that the spiritual world and the temporal world were entirely distinct."

লৌকিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া ইউরোপায়ণগণ বলেন, "ষ্টেট" ধর্ম হইতে বিযুক্ত হওয়াতেই তাহারা অগচ্ছন্ন হইয়াছে, যেখানে ধর্ম কিছু পরিমাণে "অড়িত" হইয়াছে, সেখানে রাষ্ট্র দুর্বল হইয়াছে। একজন ইউরোপীয় শাসনতন্ত্র-বিহীন সর্বত্র বেচ্ছাচারমূলক শাসনব্যবস্থা বর্তমান; তাহা সত্যই হটক-
 "ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস" ২

কি তথ্যগরিভ হটক, ইহাদের দ্বারা প্রমাণিত।

বাংলা হটক, ইউরোপের ব্যক্তিবিদেশের মতের দ্বারা আমাদের সমাজের কিছু হানি নাই—কিন্তু ইউরোপেই এই প্রণালীর কল-ফল কি হইয়াছে, বিচার করা যাক।

পারিবারিক কিম্বা সামাজিক জীবনে একশ্রেণীর কর্তব্য চার্চের মাঝে চিন্তের অন্ত প্রকোষ্ঠ হইতে তিরশ্রেণীর কর্তব্য কল্পনা চিরকাল চলে না। ইতিমধ্যেই এন্টিষ্টেলের জীবন রাষ্ট্রপতি 'মনার্কি', 'র্যারিষ্ট্রোক্রেনী' ও 'কমনওয়েলথ' এবং ইহাদেব বিকার 'ট্রিয়াণী' 'এলিগ্যান্সিকি' এবং 'ডিমক্রেনী' প্রভৃতির নানা পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।

ইহাদের ধাক্কাধাক্কি হইতে এংলো-সেক্সন জাতি পালিয়ামেন্ট এবং রাজ্য প্রভৃতির দ্বারা 'মনার্কি', 'র্যারিষ্ট্রোক্রেনী' এবং 'ডিমক্রেনী' মিলাইয়া যে খিচুড়ি তৈয়ার করিয়াছে, তাহাও কি বর্তমান সময়ে মুখরোচক হইতেছে?

ইউরোপের শাসন ব্যবস্থার মাঝে মানব-চিন্তের নানা প্রশ্ন মীমাংসিত এবং স্থবীকৃত হইতে পারে নাই। সমগ্র মানব সমাজের চরম লক্ষ্যকে অবহেলা করিয়া যে সমস্ত বিধি সৃষ্ট হইবে, তাহা অনবরত পরিবর্তন করিতে অসমর্থ হইয়াছে—এই জন্য আইনপ্রণেতা আইন রচনা শেষ করিতে অসমর্থ হইয়াছে। অহরহ নব নব আইন যন্ত্রশালা হইতে নির্মিত হইতেছে।

কর্মকে যেখানে মহত্তর লক্ষ্যের উপায় স্বরূপ মনে করা হয় না, সেখানে তাহার উৎকর্ষ এবং উপক্রম পীড়নরূপ হইয়া উঠে। তুলে অর্থ সঞ্চয় দ্বারা স্বাধীন-স্বস্তি-স্বাভাবিক চরম লক্ষ্য করে। অর্থ-সঞ্চয়কে প্রাথমিক

করিবে। ইউরোপে এই অর্থ-সমস্যা এতই গুরুতর হইয়াছে যে, ব্যক্তি, সমাজ বা শাসনতন্ত্র এই অধিরাগকে কল্পে ধ্বংস করিবে, স্থিতি করিতে পারিতেছে না।

ইউরোপের রাষ্ট্রতন্ত্রে ইতিমধ্যেই টেট সোশিয়ালিষ্টগণ এবং সোশিয়াল-ডিমক্রেটগণ মাথা তুলিয়াছে। জার্মানীর মার্কস, লাসেস প্রভৃতির চেষ্ঠা ক্রমশঃ ফলপ্রসূ হইতেছে। মার্কসই সমগ্র ইউরোপের নিম্ন শ্রেণীর শ্রমজীবীগণকে সংহত করিয়া মুক্তি-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিল। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের “আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সম্মিলনী” ইউরোপের রাজন্যবর্গের শঠন: শঠন: ভীতি উৎপাদন করে। জার্মানরাজ শঙ্কিত হইয়া উঠে। ১৮৭৭ খ্রী: বুদ্ধ সম্রাট উইলিয়মকে ছইবার হত্যা করার চেষ্টা হয়। প্রকৃতির পরিশোধ এই উপায়ে সূত্রপাত হয়।

এই সমস্ত ভাবপ্রবাহ নিরুদ্ধ করিতে “বিশেষ ক্ষমতাবিষয়ক আইন” * প্রভৃতির সৃষ্টি হইল। সোশিয়ালিষ্টগণকে নানাভাবে নির্যাতন করা হইল। কিন্তু আন্দোলন ক্রমশঃই বহিঃপ্রকাশ ছাড়িয়া অন্তরালে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ‘ওয়াইডেন’ নগরে সোশিয়াল-ডিমক্রেটগণ ক্রুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিল:—“তাহাদের লক্ষ্য পূর্বস্থিরীকৃত “প্রত্যেক আইন-সম্প্রদায়ের” পরিবর্তে “প্রত্যেক উপায়” অনুসৃত হইবে।

ইহা দেখিয়া তীক্ষ্ণবী বিস্ফার্ক, ১৮৮৩, ১৮৮৪, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে কতকগুলি সোশিয়ালিষ্ট জাবদ্ধ আইন প্রবর্তন করেন।

• তবেই দেখা বাইতেছে, স্বাধীনতাই শান্তির চরম ব্যাপার নহে। শুধু ঐক্যে

মানব সমষ্ট নহে—তাহার আকাঙ্ক্ষার বৃত্ত সে না পাইলে তাহাকে দমন করা অসম্ভব।

উপরোক্ত সম্প্রদায়ের প্রশংসা হইতেছে। আমেরিকার “অরেল ট্রাট” “টিল ট্রাট” প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিধি-সংহাদ-ভ্রাতাদের আরও কয়েকটা মতের উল্লেখ করিতেছি।

(১) জাশানেলিজ্যাম—উদ্দেশ্য—“Nationalisation of the functions of production and distribution”। ইহাদের মূখ্য-পত্র The Nationalist Magazine ১৮৮৯ খ্রী: প্রকাশিত হয়। এই বিধানমতে ব্যক্তিসম্পত্তি অসম্ভব।

(২) পপিউলিজ্যাম। ইহার উদ্দেশ্য ব্যাক-সমূহ দূরীকরণ, শুধু রাজস্বের জন্য টাক্স গ্রহণ, রেলওয়ে এবং ক্যানেল সমূহেব কর্তৃত্ব এবং স্বামিত্ব গবর্ণমেন্ট কর্তৃক গ্রহণ, বিনা মূল্যে বোপা হইতে মুদ্রা প্রস্তুত করা।

(৩) এনার্কিজম। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে Ghent নগরস্থ কংগ্রেসে Social Democratগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন:—(ক) Communists বা Social Democrats, (খ) Anarchists। এই সম্প্রদায় মতামতকে অগ্রাহ্য করিল। তাহাদের মতে শত্রু-সর্বস্ব মিলিটারী শাসন বেরূপ অকলাপকব, শিল্পমৌলিক গতর্গ-মেন্ট ও তথৈবচ; কেন্দ্রগত বিশাল ক্ষমতামাত্রই স্বাধীনতার বিরোধী। কোন লেখক বলেন:—They desire the abolition of all great central Governments and the establishment in the place of the present system of things or groups of small communities, in which the individual man shall support himself according to his wants and capacities.”

কাজেই দেখা বাইতেছে, ছই স্বাধীন

বৎসর পরে আবার ইউরোপ প্রাচীন কালের পুনর্মূলিক হইতে কামনা করিতেছে। আমাদেব পক্ষান্তরে বা মণ্ডলি-গঠন প্রথার সহিত ইহার তেমন পার্থক্য কোথায় ?

এনাক্টিগণকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) প্রথম শ্রেণী মনে করে, পোলিটিক্যাল শাসন মাত্রই অকল্যাণকর—একজ্ঞ তাহারা গভর্ণমেন্ট বিনাশে বন্ধপরিকর। ইহা-দিগকে Nihilist বলা হয়।

(২) একদল communist আছেন, বাহারা কেন্দ্রবদ্ধ রাজকীয় ক্ষমতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সাধারণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতে পছন্দ করেন।

(৩) Individualist বা স্বাতন্ত্র্যবাদী। ইহাদের মতে রাজকীয় ক্ষমতা যত কম হয়, ততই ভাল, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রসার বৃদ্ধি কল্যাণকর।

হার, এই কি ইউরোপীয় “আদর্শ” শাসন-পদ্ধতির পরিণতি! বিষবৃক্ষের বীজ ধারণ করিয়া তাহা কি করিয়া দীর্ঘকাল আত্ম-বিরোধ সংহরণ করিয়া রাখিবে? ক্ষুদ্র আদর্শ দ্বারা আপাততঃ ক্ষণিক আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়, কিন্তু তাহা সফলতার গৌরবের অধিকারী হইতে পারে না।

ইউরোপের “রিলিজিয়ান” ষ্টেট হইতে পৃথক হইয়াও নিকৃতি লাভ করে নাই। ইংরাজমন্ত্রী গ্লাডস্টোন “Church and State” নামক গ্রন্থে, ষ্টেটের চার্চের উপর কর্তৃত্ব করা প্রয়োজন, এই মত প্রকাশ করিয়া এক আন্দোলন উপস্থিত করিয়া-ছিলেন। মেকলে এই পুস্তকের জুড়ীত সমালোচনা দ্বারা বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন।*

* Critical and Historical Essays.

বলা প্রয়োজন “চার্চ” বলিতে “religion” অগ্নিকাণ্ড সর্গীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ ব্যাপার বুঝায়। সাম্প্রদায়িক দলাদলির সুখময়, আচার অর্চনা প্রভৃতির দ্বারা খ্রীষ্টীয় “চার্চ” সহস্রাধি বিচ্ছিন্ন। ইহার প্রত্যেকেই পরস্পর বিরোধী, একটা প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত বিশেষে নরহত্যার প্রয়োজনও হইয়াছে—তাহাকে ঠিক “নরবলি” বলিলে ইউরোপ-ভক্তেরা চটিবেন—কারণ, এংলো-সাক্সনদের মতে “নরবলি” ভারতেরই ব্যাপার। এই বিরোধে উত্তরোত্তর ইক্ষন সংযুক্ত হইয়াছে। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে St. Bartholomewতে বিংশ সহস্র Huguenotsকে “বলি” দেওয়া হয়। ধর্মগত বিরোধটা, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সহিত যুক্ত হইয়া, প্রবলতর বিরোধের জন্ম প্রস্তুত হইয়াছে। আফ্রিকা, চীন প্রভৃতি স্থানে মিস-নরীয়া এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

তবেই দেখা যাইতেছে, ইউরোপের শাসন-তন্ত্র এবং তৎপশ্চাতে স্থিত রণতরী ও জয়-গোলক শ্রেণী দেখিয়া সহসা করতালি দেওয়ার তেমন বিশেষ কোন কারণ নাই। লৌকিক আদর্শের চরম কথা “All men are equal” প্রচার করিয়া ইউরোপ ঠিক দ্বিপাক্ষিত তথ্যটা প্রমাণ করিতেছে। এই কাল-নিক আদর্শও চূঃখের অবসান সূত্রপাত করিল না। কাজেই ঐতিহাসিক অল্পসঙ্কানের দোহাই দিয়া বলা হইতেছে “তাহাও কি সম্ভব?” ইহা বলিলে কতকটা আপদ চুকিয়া যায়। কিন্তু মনে করা উচিত, সাম্য-বাদীর উদ্দেশ্য, ঐ কালনিক আদর্শে স্নাত্যা-চার, উৎপীড়ন, মানবের প্রতি মানবের নৃসং-সভা অপনোদন করা বই আর কিছুই নহে। সাম্যবাদ পরিহারের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং

নৃশংসতা দূর হইল কি? ইউরোপের বিজ-
তমেরা পাজি পুঞ্জি খুলিয়া কোন ব্যবস্থা
খুলিয়া পাইয়াছেন কি?

হায়, এই সমস্ত আদর্শই ভারতের উদার
ধর্মবিধানের মাঝে, বজ্রপাতেব অপ্রত্যাশিত-
ভাবে উৎপত্তি হইয়া, চক্ষু অন্ধ এবং কর্ণ
বধির করিয়া দিয়াছে।

বস্তুতঃ ঠিক অসময়েই অধ্যাত্মনিষ্ঠ ভারত-
বর্ষে, ধর্ম্মানুবর্ত্তিত বর্ত্তমান উত্থানের সূচনা
হইয়াছে। ইহাতে সুস্পষ্টভাবে ভগবানের
অনুলি সন্কেত অন্বেষ্য হইতেছে। কেননা,
ইউরোপের বর্ত্তমান সমস্তা কেবল ভারতের
আধ্যাত্মিক আদর্শেব আলোক-বেধার জন্মই
যেন অপেক্ষা করিয়া আছে। লৌকিক
এবং সাময়িক আদর্শেব চূড়ান্ত পরীক্ষা হইয়া
গিয়াছে—কিন্তু তাহা। অসন্তোষের এবং
জিহ্বাসংসার পবিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করি-
য়াছে মাত্র।

মহত্তর লক্ষ্য, মহত্তর মানবত্ব, ক্ষুদ্রতার
আফালনে আপাততঃ অবনত ও নিম্নিত
হইতেছে। অবশ্য ইউরোপীয় দার্শনিকগণ
সমাজের নানা বকম আদর্শ করুনা করিয়া-
ছেন। কিন্তু ইহার মাঝেও আবার শ্রম-
বিভাগ দেখা যায়। ধর্ম্ম এবং নীতি পৃথক
ভাবে আলোচিত হয়। নীতিবেত্তাগণ
ব্যক্তিগত জীবনের তুল্যমন্দ নির্ণয়েব জন্ম
নানা প্রণালী আবিস্কার করিয়াছেন।

Hobbe, Bentham প্রভৃতি মানবেব
নৈতিক ভিত্তি স্থাষেষণের উপব জন্ত, এই-
রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। Bentham
বলেন :—

“Nature has placed mankind
under the goverhance of two sover-
eign masters, pain and pleasure It

is for them to point out what we
ought to do as well as we deter-
mine what we shall do” *

যাহা ইউরোপীয় দার্শনিকদের পাণ্ডিত্য, এমন কি,
উচ্চতর আদর্শও কেতাবে বদ্ধ হইয়া আছে—
তাহাব প্রয়োগ ইউরোপে সম্ভব হয় নাই।
জীবনে প্রয়োগ ইউরোপে সর্ব্বতোভাবে
উপরোক্ত কারণে ব্যর্থ হইয়াছে।

এইজন্য তাহাদের কল্যাণের জন্মই ভার-
তেব উত্থান প্রয়োজন। ভারতে ধর্ম্ম, নীতি,
সমাজ, রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি, একই ধর্ম্মবিধানে
প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, বিশেষতঃ এই বিধূন কোন
মানব চেষ্টাকে অস্বীকার না করাতে এবং
ইহাদেব মাঝে কর্তব্যের সুনির্দিষ্ট পরিধি
থাকাতে ভাবতে অপূর্ব সামঞ্জস্য হইয়াছে।
শঙ্করের জ্ঞান দার্শনিকও কর্ম্মকাণ্ডের সহিত
তাহাব অপূর্ব মায়াদানের সামঞ্জস্য রাখিয়া-
ছেন। ভারত কোন চেষ্টাকেই ষণ্ডভাবে
দেখিতে পারে নাই—কারণ পূর্বে উল্লেখ
করিয়াছি। এইরূপ সামঞ্জস্যেব ঐতিহাসিক
ক্রমবিকাশ অমুখাবনাব যোগ্য, সন্দেহ নাই।

ইউরোপেব চরম রাষ্ট্রীয় কল্পনা, “সাম্য”
“মৈত্রী” এবং “স্বাধীনতা”—কিন্তু এই আদর্শ
মানব আত্মার চরম লক্ষ্যের সহিত বিচ্ছিন্ন
থাকাতে, হাজার নৈসর্গিক নগ্নতা ক্ষুধা, ভোগ-
লালসা, প্রতিযোগিতার দৈন্য বাড়িয়া
উজ্জ্বল ভাবে রণতরী, ডিনেমাইট, ম্যাক্সিম
গান, টর্পিডো মাত্র সৃজন করিতেছে। এই
সমস্ত ছাড়া। বর্ত্তমান সময়ে সাম্য রক্ষাও
সম্ভব নহে, মৈত্রীও কথার কথাই পর্য্যবসিত
হয়—কেননা “মৈত্রী” ক্ষুদ্র এবং মহত্তে-
মার্দ্দুল এবং মেঘশাবকে সুবিধাজনক নহে;
স্বাধীনতাও “ড্রেডনট্” ছাড়া সম্ভব নহে।

এই সমস্ত ইউরোপের চতুর ডিপ্লোমেটগণ
বিলক্ষণ অশুভব করেন।

ইউরোপের ভোগভূষা নৌকিক কোন
মস্ত্রে নিবৃত্তি হইতেছে না।

ইউরোপে ইঞ্জিয়-গ্রাহ্য জগতের মাঝেই
একটা বোঝাপড়া সম্ভব হয় নাই—অতীজিয়
ও ইঞ্জিয়গ্রাহ্য সৃষ্টির মাঝে সামঞ্জস্য কি
করিয়া প্রত্যাশা করিতে পারি ?

এদিকে মানবের সহিত যেরূপ মানব
রেখারৈষি করিয়া ফিরিতেছে—মানবের সহিত
প্রবৃত্তিরও সেখানে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, কেননা
সেকপীয়রের প্রস্পিরোর ভ্রায় ইউরোপ প্রকৃ-
তিকে ভোগ্যবস্তুতে মাত্র পরিণত করিতে
চেষ্টা পাইয়াছে—স্বীয় সবার সহিত অভিন্ন
ভাবে তাহাকে উপলব্ধি করে নাই। (১)
একজ্ঞ ভারতের হৃদয় হইতে যে প্রেমের
আহ্বান প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করিয়াছে,
ইউরোপে তাহা সম্ভব হয় নাই। কলেজ-
পাঠ্য পুস্তকে এবং সমালোচনা গ্রন্থে ইউ-
রোপীয় গ্রন্থকারেরা প্রত্যেক কবির “His
ways of looking into nature”—অর্থাৎ
প্রকৃতিকে উপলব্ধি করিবার প্রণালী বর্ণনার
ফ্যাশন ভ্যাগ করিতে পারে নাই। আধুনিক
ভারতীয় অধ্যাপকগণ ইহার মৌলিক
কারণ বিশ্লেষণ করিতে না পারিয়া
ইউরোপের চর্কিত চর্কণ রোমন্থন পূর্বক
শিষ্টমণ্ডলীর কর্ণে উদগার করেন। কেহ
ইহাকে লাভ বা প্রেম, কেহ বা জ্ঞান
বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। ফ্যাক্টরীর চিম-
নীর ধূম নির্গত হইয়া, কিম্বা মানব সমাজের
উৎকট সংঘর্ষে পীড়িত হইয়া, শ্রামল বন-
রাজির মাঝে উপনীত হইলে যে ইঞ্জিয়-পরি-
তৃপ্তি ঘটে, তাহাকে প্রেমও বলা যায় না,
জ্ঞানও বলা যায় না।

(১) এই শব্দের প্রমাণ নষ্ট।

তৎসম্বন্ধে উচ্চ কলরব ও যথার্থ প্রেম
জীবের প্রতিষ্ঠার প্রমাণ নহে। প্রেমের
নিদর্শন ও পরিণাম শুধু বহিঃপ্রচারে নহে,
তাহা জীবনের মাঝে দেখিতে হইবে। বাহ্য
আমার প্রেমের ব্যাপার, সে আমার হৃদয়ের
সামাজিকতার সিংহাসন গ্রহণ করে—তেমনি
যথার্থ জ্ঞান ও কুটুম্বও অভেদ দৃষ্টি জন্মায়।

ইউরোপীয় সাহিত্যে মানব ও প্রকৃতির
মাঝে এই সহজ পারস্পরিক বিলীনত্ব, এই
অভেদ জ্ঞান সম্ভব হইয়াছে কি ? প্রকৃতির
প্রতি ‘অনুকম্পা প্রদর্শন, কিম্বা তাহাকে
বাহবা দেওয়া—যথার্থ প্রেম কিম্বা জ্ঞানের
বিষয় নহে। তাহা সেই পথাভিমুখী ভ্রান্ত
অনভিলক্ষ প্রয়াস মাত্র—তাহা হয়ত ইঞ্জিয়জ
ব্যাপার, লক্ষ্যহীন অলীক উচ্ছ্বাস কিম্বা ঐহিক
ভোগপীড়িত মানবচিন্তার প্রতি প্রতিবাদ
বা প্রতিক্রিয়া (re-action)। তাহা কোন
ব্যাপক, স্পষ্ট, সুস্বাদু ধারণা হইতে জাত
নহে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের—“The world is
too much” with us” কবিতাটি ইহার
একটা স্বীকারোক্তি।

আমার বক্তব্যটি একটি উদাহরণ দ্বারা
সুস্পষ্ট করিব। শকুন্তলা নাটকের চতুর্থ
অঙ্কে শকুন্তলার বিদায় দৃশ্যে কাশ্যপ বলি-
তেছেন :—

ভোঃ ভোঃ সন্নিহিতাস্তমবনোত্তরবঃ
পাতুং প্রথমং ব্যবস্যাতি জলং যুগ্মবপীতেষুবা,
নাদন্তে প্রিয়মণ্ডলাপি ভবতা স্নেহেনবাগবনম।
আন্তেবঃ কুসুম প্রসূতি সময়ে যন্তা ভবতুংসবঃ
মেয়ংযাতি শকুন্তলা পতিগৃহঃ সর্কোরমুজারতানু॥

ইউরোপীয় সমালোচক মাঝেই ইহা
পড়িয়া বিস্মিত হইবে। কাশ্যপের ভায়
পণ্ডিত ব্যক্তি একি বাসকব্দ করিতেছে।
তপোবন-তরুর নিকট আবার বিদায় কি ?

পরিবারের আত্মীয় স্বজন হইতেই ত বিদায়
লওয়া সম্ভব। তবে কি ইহারাও আত্মীয় ?
ইহাদের সঙ্গে কি শোণিত-সম্পর্ক আছে ?
তারপর বনরাজিব মাঝে কোকিল রব হইল !
কাত্তপ বলিতেছেন :—

‘ অমুমতগমনা শকুন্তলা

• তরুণিবিয়ং বনবাসবন্ধুভিঃ ।

পরভূত বিরক্তঃ কলং যথা

প্রতিবচনীকৃত মেতিরীদৃশম্ ॥

• তরুণ উপরোক্ত ভাবে কোকিলরবে
শকুন্তলার পতিগৃহ-গমন অমুমোদিত কবিল।
তাহাদের অমুমতি ছাড়া গমন সম্ভব নহে—
তাহা যে পরিবাব বর্ণ। কবি এই ক্ষেত্রে
কোন সন্দেহ রাখেন নাই।

শুধু এই ঋনে ব্যাপার শেষ নহে।
তপোবন তরুণ আত্মীয়ের জায় উপহারও
দিতেছে। কিচর্য্য বসপার ! কি সুন্দর দৃশ্য !
কোমং কেনচিদিন্দু পাণ্ডুরূপা মাজল্যামাবিকৃতং
নিষ্ঠ্যতশ্চংগোপরাগমুভগো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ
অনোভো বনদেবতাকরতৈলরাপবভাগোন্মিথিতৈর
দন্তাজাতরগানি তংকিমলয়োক্তে প্রতিঘম্মিভিঃ”

শকুন্তলাব প্রস্থানকালে :—

উপলিত দর্ভকবলাঃসুগাঃ পরিত্যক্তনর্তনাঃসমুবাঃ

অপমৃত পাণ্ডুপত্রাঃ মুকুন্তি অঞ্জনীব লতাঃ ।

• এই ত প্রেমের প্রমাণ ! ইহাই ত লক্ষণ।

ইহা ইউরোপীয় প্রেম নহে। ইহা অভেদ-
জ্ঞানজাত মিলন ! ইহা প্রেমের চরমোৎকর্ষ।

শকুন্তলা লতাপুঞ্জ হইতেও সখীবৎ
আলিঙ্গন কামনা করিতেছে :—

“বনজ্যোৎস্নে, চূতমলতা অপিমাং

প্রত্যালিঙ্গ ইতোগতেঃ শাখাধাহতিঃ ।”

• এই শ্রেণীর ভাব ইউরোপীয় চিত্ত এই
পর্যন্ত উপলব্ধি করে নাই। পাঠককে উত্তর-
চরিতের তৃতীয় অঙ্কের প্রতিও দৃষ্টিপাত
করিতে অনুরোধ করি।

ভারতবর্ষ বিশ্বের সর্বত্র ব্রহ্মোপলব্ধি করে
বলিয়াই এইরূপ সামাজিক ও সম্ভব হইয়াছে।
ভারতবর্ষে মানব ও অজ্ঞানের মাঝে দেবত্ব
অমুভব করে বলিয়াই তাহা জাতসারেই
হউক—বা স্বাক্ষর দোষেই হউক, এখানে
কোন অস্বাভাবিক রেখারেখা সম্ভব হয়
নাই—সম্প্রদায়গত প্রকৃতিভেদ সহজেই
নির্দিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। ঠিক এই
দেবত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হইলে
শাস্তি ও বিবোধবিহীনতা আশা করা বৃথা।
“মানব মাত্রেই সমান” এই উক্তিটা ঐতি-
হাসিক সত্য হইলেও আদর্শরূপেও ব্যর্থ
হইয়াছে। দেবত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইলেই
কেবল পারম্পরিক প্রতিঘম্মিতার বিরাম
আশা করিতে পারি।

আমাদের গ্রন্থীয় এবং বরণীয় পদার্থ
মাত্রেই ব্রহ্মের বিকাশ কল্পিত হইয়াছে।
জড়জগৎ একাকীত্বের মাঝে ব্যর্থ—তাহার
পশ্চাতে বৃহত্তর ব্যাপকতার শক্তি বহুতর
কার্য্য চলিতেছে—অগ্নির দাহিকাশক্তি, বায়ুর
গ্রাহিকা শক্তির মাঝে ব্রহ্মেরই বিকাশ
দেখিয়া ভারতবর্ষ ধস্ত হইয়াছে।

“বায়ুযথৈকো ভুবনং প্রতিষ্ঠো

কপং কপং প্রতিরূপো বভূব

একস্তথা সর্বভূত্বাস্বাত্মা

কপং রূপং প্রতিরূপো বহিষ্ঠচ ।”

যেমন বায়ু ভুবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নানা

বস্তুভেদে ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে, তেমনি
অস্তরায়্য নানা বস্তুভেদে ভিন্নরূপ ধারণ করি-
য়াছে। “ব্রহ্মৈবদর্থমুভং পূরিত্বাদ্ ব্রহ্মপশ্চাদ্

ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ ।

অধশ্চোদকং প্রস্থতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং”

বৈরিষ্টম্ ॥

অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই অগ্রে, ব্রহ্মই পশ্চাতে,

ব্রহ্ম দীক্ষিণে এবং উত্তরে। তিনি অধঃ এবং উর্দ্ধে বিস্তৃত হইয়া আছেন। এই শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মই সমস্ত !

কিন্তু ভারতবর্ষে এই সর্বভূতে দৈবীভাব উপলব্ধি আদর্শ যাত্রা নহে, কিম্বা দার্শনিকের জ্ঞানসূত্র হইতে লব্ধ জ্ঞান যাত্রা নহে। ইহা সমাজের সর্বত্র অনুভূত হইতেছে। ইহা করণ্য নহে, উপলব্ধির বস্তু।

ইহা উপনিষদের ভাব যাত্রা নহে—সমাজ-বদ্ধ ভারতবর্ষ এই ভাবের অঙ্কে পুষ্ট ও বর্ধিত হইয়া ইহাকে উপলব্ধি করে।

ভারতে পিতা দেবতা, গুরু দেবতা, মাতা দেবতা—অর্থাৎ সন্তানের প্রতি পিতার ত্যাগমূলক পিতৃভ, মাতার বিশ্বয়জনক সেবামূলক মাতৃভ, ভগবানের শক্তিরই আংশিক বিকাশ যাত্রা—ব্রহ্মবর্জিত মানবের রিক্ত চিত্তে কি আছে? ভগবানই ইহাদের মাঝে প্রকাশিত হইয়া এই অপূর্ণ সৃজন করিতেছে। তেমনি গো দেবতা। তাহা কর্ণধে, ধাত্ত দানে, অজস্র প্রাণরূপী হৃৎ দানে ভারতীয় পরিবারের অন্তরতম পদার্থ। ভগবানই তাহার মাঝে প্রকাশিত হইয়া মঙ্গল সাধন করিতেছেন! কিন্তু দেবতা বলিয়া তাহাকে গো-শালা হইতে আহরণ করিয়া প্রাসাদের চুড়ায় রাখিতে হইবে, এমন কথা নহে। স্বয়ং ব্রহ্মবিকাশের উপলক্ষ্য যাত্রা। বস্ত্রীণের বস্ত্র পূজা, পাঠাখীর গ্রহ পূজা, এই ভাব হইতেই উদ্ভূত। তেমনি জলে স্থলে সর্বত্র ব্রহ্মের অনন্ত আনন্দ এবং শক্তি ভারত প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতেছে। *

একজ্ঞ ভারতের বক্ষে কিছুই হীন নহে—অবহেলা অধর্ম।

* পিতৃপিতৃপোদের ভাব অনুষ্ঠান কেবল ভারতেই লক্ষ্য হইয়াছে।

ভারতের মর্মে মর্মে এই হিতোপদেশ আছে বলিয়া আজ সেই প্রাচীন সংস্কারবলে ক্ষুধার্ত হইলেও ভারত মানবক হারায় নাই। দ্বির্ভিক্ষে লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও এংলো-সাক্সনদের বা তাহাদের শিষ্যশুশিষ্য রাজনৈতিকগণের গৃহ লুণ্ঠন করেনা; নিঃশব্দে শরীর ত্যাগ করে। কোন দেশের ইতিহাসে এমন ঘটে কিনা, জানি না। এমন উচ্চ ধর্ম-নীতি, প্রেম এবং ভগবদ্ভক্তি, এমন সংবর্ধ, আত্মশাসন, ত্যাগ আধুনিক সংগ্রাম-যুগে কাহারও কাহারও মতে বর্জনীয় হইতে পারে, কিন্তু দ্বিকৃত নহে।

এই নিঃশব্দ, নিম্পদ আত্মত্যাগ “এঞ্জিটে-টরগণের” ত্যাগ অপেক্ষা মহত্তর, সন্দেহ নাই, —ইহার ভিত্তিও ভারতের সনাতন ধর্ম! ধর্মের জন্ত, চিরপ্রবাহিত অধ্যাত্মনীতির জন্ত ভারত কোন্ ত্যাগ করে নাই?

আরও একটা কারণ আছে।

ইউরোপের সমাজতন্ত্র মুখ্যতঃ ব্যক্তিত্ব-তার উপর প্রতিষ্ঠিত—কেবল কয়েক বৎসরের মাঝে যাত্রা সোশিয়ালিজম মাথা তুলিতেছে।

সেইখানে যাবতীয় কার্যচুক্তির উপর নিহিত। বর্তমান যুগে চুক্তি-আইনের উত্তরোত্তর প্রসার হইতেছে। তদ্রূপ সমাজের যাবতীয় কার্যই চুক্তির উপর দিবারাত্র চলিতেছে। রাজা প্রজার সম্বন্ধও চুক্তির উপর নির্ভর করে। নানা প্রকার চাটার প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। রাজা প্রজার সম্বন্ধ এই চুক্তির সর্বগুলি পরিষ্কৃত করা যাত্রা, ইহা তাহাদের চোখে কিছুতেই অস্বাভাবিক ঠেকে না। বিলাতের সামাজিক যাবতীয় বিধানে প্রত্যেকই নিজের স্বতন্ত্র প্রতি ধরতর দৃষ্টি রাখিয়াছে।

প্রত্যেকই সমাজের নিকট এক অজ্ঞান-

ভের নিকট তাহার বোল আনা দাবী আদায় করিতে ছাড়ে না। এই দাবীর খাতিরেই তাহার তাগ বা কর্তব্য—ইহা বিনিময়েই তাহার কার্য, অস্ত্র নাহে। পরিবার, সভা, সমিতি, চার্চ, রাষ্ট্র, ক্লাব, সর্বত্র প্রত্যেকের স্থিতিস্থাপন স্বত্ব আছে, তাহার বিপর্যয় তাহার পক্ষে হুঃসহ ও অমার্জনীয় এবং এই সমস্তের প্রতিদানে তাহার কর্তব্যও নির্ভব করে। নীতি, দুর্নীতি এই বিষয়ী বন্ধন হইতেই স্থিতি-কৃত হয়। বলা অনাবশ্যক, এই বিরোধমূলক চুক্তি উৎকটভাবে ইউরোপেব মজাগত। “চার্টার অফ বাইটস্” “বিল অফ রাইটস্” “রাইটস অফ মেন” প্রভৃতি নানা হট্টগোলে ইউরোপকে গঠন কবিয়াছে। এত স্বত্বজ্ঞানের উৎকট বিকায়ে পীড়িত ইউরোপ এসিয়ার মিশনবী প্রেবণ, নৌসেনা স্থাপন, বাণিজ্য-প্রসার এবং বাজ্য-প্রদাবও স্তারানুমোদিত মনে কবে। শান্তি স্থাপনের স্বত্বের চোটে ব্রহ্মপুত্রি রাজ্য হারাইল, নানা শ্রেণীর “ফিউডেটাবী” এবং “বাফার” ষ্টেট সৃষ্ট হইল। জাপানও সম্প্রতি ইউরোপের এই নীতির সাহায্যে কোবিয়ায় শান্তি স্থাপনে জাপানের স্বত্ব আছে প্রচার কবিয়াছে; ইউরোপ সহজেই ইহাতে সম্মত।

কাজেই এই স্বত্বজ্ঞান হইতে উদ্ভূত আন্দোলনের জন্ত ইউরোপে রক্তাবক্তির কোয়ারা ছুটে! বিলীতে সেদিন কর্মবিহীন লোকদের যে সমস্ত “ব্রেডরাস্ট” বা অন্ন-সংগ্রাম হইল, তাহার ইতরতাও এই জ্ঞান হইতে জাত। গভর্ণমেন্ট যখন প্রত্যেকের আদায় যোগাইতে বাধ্য, অর্থাৎ সাধারণের যখন গভর্ণমেন্টের উপর এই “অধিকার” আছে, তখন শাসনকর্তার অসামর্থ্যে অপরপক্ষের শাসনবিধির উপর বিরোধোদ্ভাবন হইবার

অধিকার আছে। ইউরোপের আইন সাধারণের এই সমস্তা নীমাংগ না করিলে, কেহই আইন মানিতে বাধ্য নহে। একপক্ষ চুক্তি-ভঙ্গ করিলে অপবক্ষও চুক্তি-অপরদিক ভাঙ্গিবে। অধিকার রক্ষিত না হইলে কর্তব্য স্থলত হইবে না। ইউরোপেব রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মূলকারণও ইহাই; পাঠকগণ ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার বিপ্লব-সাহিত্যে পছা দেখিবেন।

ভারতবর্ষে যে রাজকার্য চলিতেছে, তাহা সমগ্রভাবে দেশের ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন। একজ্ঞ আমাদের সমাজদেহে বর্তমান রাজার আসন মুসলমান বা হিন্দুপুত্রির আসনের জায় নহে। উপরোক্ত অসামঞ্জস্য অনেক অনর্থ ঘটাইতেছে। বিলাতের জার জারতের প্রজা যদি আন্দোলন না করে, তবে রাজা তাহাদিগকে অকর্মণ্য, হর্ষণ বা সন্তুষ্ট মনে করে। ইউরোপেব মস্তিষ্ক চুক্তি-আদর্শ-মূলক তত্ত্বাবহারিচি হইয়াছে।

এইজন্তই বর্তমান সময়ে নেতি-ভাবক সংঘর্ষাদি (passive resistance) প্রয়োজন হইয়াছে।

কিন্তু ভারতের সমাজ সাধারণ আন্দোলন না করার কাবণ ভারতের চিত্তে এই চুক্তিজ্ঞানের আধ্যাত্তিক অভাব। কথাটা বর্তমান সময়ে বিশেষ অমুখাবন যোগ্য, কেননা বর্তমান যুগে জনসাধারণকে কতকটা এই জন্তই নিন্দা কবিতো, ইউরোপের ভারতবর্ষীয় পোস্তপুত্রগণ, অলীক উৎসাহ অমুভব করে।

ভারতবর্ষের সমাজের কোন অঙ্গ অঙ্গের সহিত চুক্তি ধারা সংযুক্ত নহে। কলো এই দাঁড়াইয়াছে—প্রত্যেকেই স্ব স্ব কর্তব্য, অমুষ্ঠান করিতে ধর্মগুরুগণ, কর্তৃক অমুশাসিত হইয়াছে সত্য। ব্রাহ্মণ, খ্রীষ্টিয়,

কর্তব্য না করিলে কষ্টের স্বায়-কর্তব্য অব-
হেলা করিবে, কিবা কৃষি-জীবী উজ্জ্বল বলরব
তুলিবে—ভারতে এইরূপ বিমদশ ব্যাপার
ঘটে নাই। ইহা সমাজের উচ্চতর ‘অবস্থা’
সন্দেহ নাই। অল্প লোক কর্তব্য করুক না
করুক—আমার কর্তব্য আমি করিব, আমার
মঙ্গল আমি অর্জন করিব—ইহাই যথার্থ
ধর্ম্যভাব। ফলনিরপেক্ষ হওয়াও ইহার আর
একটা দিক্ মাত্র। ইউরোপের সামাজিক
ইতিহাস এখনও এই পথ অবলম্বন করিতে
পারে নাই—একথা বলিলে আশ্চর্য্যবোধ
হইল না, একটা সত্য অথচ অপ্রিয় কথা বলা
হইল মাত্র।

ভারতের আদর্শ শুধু কর্তব্যের জন্য
কর্তব্য করাও নহে। (১) সর্ব প্রকার আত্মা-
ভিমান নিরাকরণার্থে এবং স্বার্থমূলক সংঘর্ষ
হইতে মুক্তির জন্য ধর্ম্মগুরুগণ একটা স্বাবাদ
প্রচার করিতেছেন। আমরা প্রত্যেকেই
স্বার্থী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। *
অতীতের ভাবনামটির অধিকারীরূপে, পিতৃ-
কুলের নানা বিচিত্র সম্পদের প্রাপক-
রূপে, ভগবানের মঙ্গল আশীর্ব্বাদের
শক্তির গ্রাহকরূপে আমরা জন্ম হইতে মৃত্যু
পর্য্যন্ত আপাদ-মস্তক স্বাববদ্ধ—আমাদেব
জৈবনিক কার্য্য এই স্বার্থ পরিশোধ করা
মাত্র। এই মতবাদের দ্বারা অধিকারিত্ব-
জ্ঞান চূর্ণীকৃত হইয়াছে।

(১) কোন প্রকার লেখক এই মতের পোষক—
“স্বার্থের মত নির্দিষ্ট” “Duty for duties sake” ও
সমাজের চরম কথা নহে, যদিও ভারতবর্ষে তাহার
স্থান আছে।

* বর্তমানের Physiology এবং Psychology
এবং বিবর্তনবাদ মানবের দৈহিক ও মানসিক কা-
র্য্যকূট করিতেছে।

“দেবানাক পিতৃণাক স্বার্থীণাক তথানরঃ
স্বার্থবান্ জায়তে যন্তাত্তোকে প্রযাতং সদা ॥”

উপরোক্ত স্বার্থের পরিশোধের উপায়ও
উল্লিখিত হইয়াছে :—

“দেবানামনৃণো জন্তুর্ষটৈর্ভবতি মানবঃ ।
অন্নবিত্তশ্চ পূজাভিকপবাসত্র তেষুথা ॥
প্রাক্চেন প্রজন্মাতৈব পিতৃণামনৃণোভবেৎ ।
স্বার্থাণাং ব্রহ্মচর্য্যেণ প্রতেন তপসাতথা ॥”

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ।

কাহারও মতে স্বার্থ চতুর্বিধ—যথা :—
স্বার্থৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তা জায়ন্তে মানবাত্মবি ।
পিতৃদেবর্ষি-মহর্ষৈ দের্ষ্যং তেভ্যশ্চ ধর্ম্মতঃ ॥
যজ্ঞৈশ্চ দেবান্ প্রীণাতি স্বাধ্যায়তপসামুনীন্ ।
শ্রুতৈঃপ্রাক্চৈঃ পিতৃশ্চাপি আনৃণস্যোন মানবান্

উপরোক্ত ভক্তি মতে সমগ্র মানবজাতির
নিকট আমরা স্বার্থী—তাহা অহিংসা দ্বারা
পরিশোধ করা প্রয়োজন।

যে ভক্তির অন্তর্লক্ষণ এইরূপ, তাহার
পক্ষে “ব্রেড্‌রায়ট” সম্ভব নহে। হৃদিকে
পতিত হইলেও প্রাক্তন কর্ম্ম এবং অদৃষ্টের
উপর নির্ভর করিয়া সেই জাতি আশ্রয়
হইবে।

ভারতীয় চিত্ত আত্মার ঐহিক এবং পার-
লৌকিক অধ্যাত্মের জন্যই দাবীকরী মানসের
টুকরা লইয়া নৃশংসভাবে আরণ্য জন্তুর আশ্রয়
কোলাহল করে নাই। প্রাক্তনবাদী ভারত-
বর্ষ জীবনের স্বায় নির্দিষ্টমার্গকে বিদিকর্ষক
নির্দিষ্ট এবং ধর্ম্ম কর্তৃক অহুমোদিত মনে
করিয়া অল্প শ্রেণীর সহিত বিরোধ ত্যাগ
করতঃ কর্তব্য করাকেই সমীচীন এবং স্বাভাবিক-
মোদিত মনে করিয়াছে। ইহাতে আত্মা-
শীলনেরও তেমন বাধা নাই—“ব্যাবসায়ীতা”
তাহার প্রমাণ।

মানবের দেবত্ব প্রতিপাদিত হইলে ঠিক

সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না, ঐক্য মাত্র উপলব্ধি হইবে। ইউরোপ একবার এই আদর্শ গ্রহণ করিলে তাহার অনেক সমস্তার সীমাংসা হইবে, সন্দেহ নাই। এই বাণী কি কখনও 'হাইড পার্ক' এর মানব-প্রজাপতির কর্ণে উচ্চারিত হইবে না? ভারতের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎগুহাই তাহা প্রমাণিত করিবে।

কিন্তু তৎপূর্বে ভারতবর্ষকে স্বপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, নচেৎ প্রজাব্যস্তাব বণতঃ ভারত-বর্ষ হইতে জ্ঞানগ্রহণের পথ কণ্টকিত হইবে। শিক্ষিত এবং অবনত-ভূখণ্ড হইতে কে জ্ঞান সংগ্রহ করিবে? ইউরোপের এবং জগতের কল্যাণেব জন্ত অধ্যাত্ম ব্রহ্মনিষ্ঠ ভারতবর্ষকে হয়ত মঙ্গল-পরশ হস্তে ধারণা করিতে হইবে। এইজন্তই আয়রল্যান্ড এবং আশ্বপুত্র প্রয়োজন, কোন ক্ষুদ্র ঐহিক আদর্শেব জন্ত নহে। ইহা ব্যতিরেকেও যদি জগৎ-তর শ্রদ্ধা আকর্ষণ সম্ভব হয়, নগ্ন ভারতের কন্যাপুত্র হইতে জ্ঞান-কণা লাভ করিতে ইউরোপ নত হয়, তবে সমধিক আনন্দেব বিষয়। ইউরোপের ঐহিক এবং পারমার্থিক কল্যাণেব দিক হইতে বিচার করিতে গেলেই শুধু মাঝে মাঝে মনে হয়, এইজন্তই বৃষ্টি বা ভগবান প্রভৃৎ ব্রহ্ম সৃষ্টি-বিহীন ইউরোপের মঙ্গলেব জন্তই এই সংযোগ বিধান করিয়াছেন। এই হিসাবে ভারত ও ইংলণ্ডের সম্পর্ক "প্রভিডেন্সিয়াল" হইলেও হইতে পারে।

ঠিক এই পথেই প্রব্রুত, আমাদের শক্তি, কোথায়? কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, জাতি বা সম্প্রদায় যে বস্তুকে পরমার্থ বলিয়া মনে করিয়াছে—সেই জাতির ত্যাগ সেই পথেই অনুসন্ধান করিতে হইবে।

ভারতবর্ষ ধর্মকেই সত্যপদার্থ মনে করি-

য়াছে, এইজন্ত, এই ক্ষেত্রে তাহার ত্যাগের সীমা বা ভুলনা নাই। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ গৃহ, জী, পুত্র, ভাগ্যী সন্ন্যাসী, তাহাদের অসীম ত্যাগেব দ্বারা বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত তাহা প্রমাণ করিতেছে। কোন্ দেশে এমন ব্যাপার আছে? গৃহ, জী, পুত্র, সংসার ত্যাগ বড় সহজ ব্যাপার নহে। শুধু কথার চোটে এমন ব্রহ্ম ব্যাপার হয় না—এখনও সংগ্যা-হীন ধর্মশালা ও অন্নচক্র জগতের ইতিহাসে বিশ্বয়জনক ব্যাপার! জগৎ বক্ষে ইহার প্রতিলিপি পাইবে না।

কতকগুলি ত্যাগেব ব্যাপার ইউরোপ স্বচক্ষে দেখিয়া প্রত্যয় করিতে পারে নাই। ভাল মন্দ বিচার করিবার প্রয়োজন বর্তমান প্রবন্ধে নাই—আমরা কেবল ত্যাগীর মনের দিকটা, চিত্তের দিকটা অধ্যয়ন করিতে চেষ্টা করিব। বিচ্ছিন্ন পূর্বে বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালী মাতা নাকি তাহার প্রথম সন্তানকে গঙ্গাদেবীর ক্রোড়ে ভাসাইয়া দিত! আমরা এই ত্যাগে শিহরিয়া উঠি!—এমন তাকে দানবী বলা আমাদের মুখে আসে না—কেবল এই প্রবলা করালী গঙ্গার তটে দণ্ডায়মানা সম্মুখিত-অশ্রু-মূর্ত্তিকে দেবী মাত্র বলিতে পারি। কেন?

ইউরোপ ইহাকে বর্জিত বলুক, আমরা কিন্তু জানি, ইতর জন্তুর মাঝেও মাতা শিশুকে প্রাণপণে রক্ষা করে। কাকী, আন্ডামানীর প্রভৃতি জাতীয় মাতাও পুত্রস্নেহ বর্জন করিতে পারে না, এমনকি, গবিলা বা মর্কটও শিশুকে বক্ষে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সর্বপ্রযত্নে তাহাকে বিবাদ হইতে রক্ষা করে। ভারতের অজ্ঞাত জাতির মাঝে বাঙ্গালী-মাতার পুত্রস্নেহ হ্রস্বতা আখ্যাও প্রাপ্ত

হইয়াছে । এমন মাতার পক্ষে সম্ভব ত্যাগ কি বিশ্বজনক ব্যাপার !—তাহাব হৃদয়ে এইজন্ত কোন আঘাত অনুভবই করেনা, এ কথা বালকও বিশ্বাস করিবে না । তবে এই দুঃসহ পীড়া পর্য্যন্ত ধর্মের জন্ত (অন্ততঃ সত্যভাবে ও সবলভাবে উপলব্ধ) বাঙ্গালী জননী স্বীকার করিয়াছে । আজ অশ্রুক্ষেপে কে না ইচ্ছা করিতেছে, বাঙ্গালী মাতা এমন ভাগ্যশীলা ইউন, এমন ভাবে বর্তমানের জটিল সংগ্রাম-গঙ্গা প্রবাহে অক্ষুণ্ণচিত্তে তাহার সরল সন্তানকে প্রেরণ করুন !

আবশ্যবিচ্ছুকাল পবে এই শৈলীর ঘটনা ঐতিহাসিকগণ বিশ্বাস করিবে না । ইতি-মধ্যেই “সতীর” আত্মত্যাগ জীব-জবরদস্তীৰ ব্যাপার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । নানা কারণে এই প্রথাটা ত্যাগ্য, ইহাব পরিহাব বিশেষ মঙ্গলজনক হইয়াছে—কিন্তু এইরূপ ত্যাগকে অসম্ভব মনে করিবার কি হেতু আছে ? রাজপুত-বর্মণীবা কি দলে দলে অনলকুণ্ডে কাঁপ দেয় নাই ? ধর্মের জন্য ভাবতবর্ষে অসম্ভব কার্যও সম্ভব হইয়াছে । প্রত্যয় বাধ্যবাসী-গণ তাহা উপলব্ধি করিতে পাবিবেনা ।

তাবপর সাহিত্যে দাতাকর্ণ, দধীচি, শুনঃসেক প্রভৃতিব ত্যাগেব তুণনা অজ্ঞকোন সাহিত্যে অন্তসকান পণ্ড্রমে পধ্যবসিত হইবে । বর্তমান মুর্ছিত পর্য্যন্ত অশীতিবর্ষ বয়স্কা পুৰমহিলাগণ পর্য্যন্ত তীর্থযাত্রায় যেকপ অচিন্তনীয় ক্লেশ এবং ত্যাগ সহ কবেন যে মনে হয়, এই শৈলীর প্রবল অমুরাগে ভাব-তের বিপর্য্যস্ত সম্ভানগণ ভাবতের ভবিষ্যতেব জন্ত যদি এক দিনের জন্তও অমুপ্রাণিত হইত, তবে ধবের কাগজে কাঁদিবাব দিন শেষ হইত !

‘ভারতের “ত্যাগ” আমাদের বর্তমানযুগের

“স্যাক্রিফাইস্” (Sacrifice) অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন পদার্থ ! বুদ্ধদেবের প্রব্রজা “শ্রাক্রিফাইসের” দৃষ্টান্ত নহে—ত্যাগের ধর্ম ।

আমাদের যুগে বৈদ্যাতিক ফ্যানের হাওয়ায় অভিষিক্ত হইয়া চারবেলা খাওয়াসম্প্রদায় গলাধঃকরণ কবিয়া, কুড়িটা চাকর ইঁকাইয়া, মোটরের চক্র আবর্তন কবিয়াও শ্রাক্রিফাইস্ চলে, করতালিও সঙ্গে সঙ্গে কপালে জুটে, রেলওয়ে শকটের প্রথমশ্রেণীব মঞ্চ আগ্রহ কবিলে, কিম্বা হিমনিবাস শৈলের মুক্কা হইতে একদিনের জন্ত বক্তৃতার্থ অবরোধ করিলে “শ্রাক্রিফাইসের” উৎকটত্বে জয়ধ্বনি হয় ।

কিন্তু ত্যাগ বড় কঠিন ব্যাপার—ইহা দীক্ষার একতম অংশ, ইহা হৃদয় বৈরাগ্যের, অনাসক্তি, এবং ফল-জনরপেক্ষতার ব্যাপার । এখানে দোকানদারী চলে না, এখানে ভেল দুঃসহ, এখানে চকুল বাধা স্বতঃই বার্থ, এখানে পাবস্ত গালিচা এবং কুশাসনের একই মূল্য, এখানে ক্ষটিকেব অসংখ্য দীপসলাকার আলো মৃৎপ্রদীপের ত্রিবদীপ্তির মাঝে মুচ্ছিত হয় । বর্তমান সময়ে একটা মাত্র প্রশ্ন, কে কে ভাবতেব এই সহস্রবর্ষাগত ত্যাগের দীক্ষা লইবে ? যে দীক্ষা, যে ত্যাগব্রত মনীষীগণ গ্রহণ কবিয়াছেন, শঙ্কব, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি যাহাব প্রবাহ-স্রব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, ক্ষুদ্র পবিত্র মাঝে প্রতি ভারতেব অমব আত্মা যাহাব দ্বারা যুক্ত, কে তাহা আজ অনাদব এবং অবজ্ঞাব ধূলিব মাঝে লুপ্তিত হইতে দিবে ?

ভারতবর্ষের সনাতন ভাব-প্রবাহ আমদের চক্ষুব অন্তরাল হইয়াছে—বৈদেশিকেব নানা আবর্জনা আজ শরীর এবং মনকে প্রলিপ্ত করিয়াছি । একজ্ঞ ক্ষীণ স্রব অবলম্বন কবিয়া

যদি আকর্ষণ করি, তবে তাহা ছিন্ন হইলেই
প্রতিমূহুর্তেই হাহাকার ধ্বনি তুলি।

কিন্তু ত্যাগের আর একটা দিক আছে।

বেদ, শ্রুতি, পুরাণ, মহাকাব্য, নাটক, সঙ্গীতশাস্ত্র তন্ত্র, প্রভৃতির মাঝে ভারতের চিত্তকথা যেমন অসুস্কেন্ন, তেমনি, বঙ্গদেশে রঘুনন্দন প্রভৃতি বৈকুণ্ঠ সামাজিক কল্পকল্পিত বাবস্থা করিয়া গিয়াছেন, (ভাবতের কোন অংশই স্বার্থগণের এক প্রাণ অনুশাসন হইতে নির্লিপ্ত হইতে পারে না) তাহাও বিচায়া ।

ভাবত্বেব এই সামাজিক ইতিহাসও অতি
জটিল এবং প্রাচীন। স্বাধীনতা তট্টাচায়েব
“অষ্টবিংশতি তত্ত্ব”, বাঙ্গলাদেশেৰ ক্ষে
সামাজিক ব্যাপার নহে। বুনন্দনেৰ স্বা
ত্বেব কতকগুলি বিষয় লেখ কৰিলে
আমাদেব গুপ্ত কল্পেত্বেব আর একটা দ্বা
উন্মোচিত হৰ। উহাতে নিৰ্ৱলিখিত বিষয়গুলি
আছে :—(১) তিথিতত্ত্ব (২) প্রাক্তত্ত্ব (৩)
আত্মিক তত্ত্ব (৪) প্রাৰ্শিতত্ত্ব (৫) জ্যোতিষ
তত্ত্ব (৬) নানান তত্ত্ব (৭) সংস্কাৰিতত্ত্ব (৮) একা-
দশী তত্ত্ব (৯) উৰ তত্ত্ব (১০) বত তত্ত্ব (১১)
দায় তত্ত্ব (১২) বাবহার তত্ত্ব (১৩) স্ত তত্ত্ব (১৭)
বস্ত্ৰবগ তত্ত্ব (১৫) কৃত্য তত্ত্ব (১৬) বদুৰে দিপ্রাক
তত্ত্ব (১৭) দেব প্রতিষ্ঠা তত্ত্ব (১৮) জনাশপ্ৰাংসগ
তত্ত্ব (১৯) ছন্দোগবৃষোংসগ তত্ত্ব (২০) স্বাপুৰণো-
ত্তমতত্ত্ব (২১) দিব্যতত্ত্ব (২২) মঠপ্রতিষ্ঠা তত্ত্ব
(২৩) শূদ্রকৃত্যবচারণ তত্ত্ব (২৪) বজুৰ্ৱেনি-
বৃষোংসগ তত্ত্ব (২৫) দাক্ষাতত্ত্ব প্রত্যন্ত এব
ইংৰাজৰাজেব গণ্ডাব বাহিৰে—ইহাৰ ভিত্ত
তাহাব প্রবেশ হঃসাধ্য। সামাজিক দিকেব
বিস্তৃতি ও বিক্ষেপ প্রদৰ্শন কৰিবার জন্তই
উল্লিখিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ কৰিলুম। বমাল
সেনেব ব্রাহ্মণ কল্পস্থদিগেব মায়ে কৌলীত

* জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সঙ্করণ দ্রষ্টব্য ।

মর্যাদা সংস্থাপন এবং এতদসম্পৃক্ত কুটিল
আচাৰপদ্ধতিও কাহাৰও অজ্ঞাত নহে।
অপরদিকে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবশাস্ত্রজ্ঞাত
সামাজিক ব্যবস্থা ও সাহিত্য, বুদ্ধাবিন দাসেব
“চৈতন্যভাগবত”, কৃষ্ণদাস কবিরাজেব
“চৈতন্যচরিতামৃত” এবং অন্যান্য গ্রন্থ পাঠকেব
অজ্ঞাত নহে।

বর্তমান সমাজের উৎসব ওষিকে শুধু
 একদিক্ হইতে দেখিলে তাহাদেব পতি
 বিচার করা হয় না। দেশেব সমাজ্যাহীন
 পূজা এবং বহুভাষ্যেব ধর্ম্মচর্চাব 'দন্দ্' বাদ
 দিলেও (এ ক্ষেত্রে যাহাদেব ব্যক্তিগত আপত্তি
 আছে) উহার সামাজিক, সিঙ্গল, আন্তর্জাতিক
 শাসনেব দিক, যুগপ্রবাহিত ভাস্কর্য্য ও চিত্র-
 জালেব আদর্শমূলক প্রাচ্য সৌন্দর্য্যচর্চাব
 দিক্, নৈতিক দিক্, বিশেষতঃ গভীর অধ্যাত্ম-
 নিষ্ঠা ও সংযমেব দিক্ হইতে বিচার কবি-
 বার অনেক কিছু আছে। তত্বেমধ্যে মনীষী
 দুই একজন তাহাব স্তম্ভপাতেল চেষ্টা কবি-
 তেছেন। সমাজবাদ এবং অভিজ্ঞ রাষ্ট্রায়-
 যাবতাপেক্ষেব ব্যাধকর জ্ঞান সহজেও সব
 কিছুই ভাঙিয়া চাছেন—কেননা জ্ঞানায়-
 ভাঙিয়া সত্য সত্য, গভী তত্ত্ব নাই। এজন্ত
 শক্তিব্যয়সাৎকরণ এবং গভীর নিজেব কার্য্যেব
 অগ্রগতি কবিব মুঠি হয়।

পন্যাবধানের মাধ্যমে নিজের কার্য এবং
পরিবারের কার্য পৃথক করা যায় না—
কেননা নিজের কার্যের পরিবারের জন্য—এই
বিবেধ বিধানতায় ব্যক্তিগত কর্তব্য এবং
পারিবারিক কর্তব্যের মাঝে কোন শ্রেণী-
ভেদ নাই। তেমনি, কয়েকটা পরিবার লুইয়া
যে সমাজ গঠিত হইয়াছে, তাহার সহিত
সম্পৃক্ত সামগ্র্য বিদ্যমান আছে। সম্প্রতি
প্রত্যেকের ক্রিয়া দ্বারা প্রতিবৃদ্ধি এই

জন্তই সমাজ সচকিত হয়—কেননা ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজের মাঝে পূর্ণ প্রবাহে রক্তসঞ্চালন আছে।

এতদিন সমাজ এই সংহত শক্তির আধ-কূল্যেই প্রত্যেক গ্রামে পঞ্চায়ত প্রথা দ্বারা আত্মশাসন কার্য চালাইয়া আসিয়াছে।

এমন হুনিপুণ জাতির মাঝে আজ এত বক্তৃতার কলরব, দৈনিকের ছড়াছড়িও “পোলিটিক্যাল” জ্ঞান বিস্তার করিতে পারিতেছে না কেন? বিরাট এবং বিশাল সমুদ্র-বৎ ভারতের জনসাধারণ নব্য পোলিটিক্যাল পাদ্রীদের প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেছে না কেন? ছই একজন যুবক গ্রামের মাঝে প্রাণপণ বক্তৃতা এবং কার্য করিয়াও সমাজের মর্ষ মর্ষ করিতে, পারিতেছে না কেন? সভা, সমিতি, সমাজ-সংস্কার, নৈশবিদ্যালয় প্রভৃতি কার্যের তালিকা হাতে লইয়া স্কুল-ছাত্রদের কেবল উত্তেজিত করিতেছে—কিন্তু ঐ অতলম্পর্শ সমাজের কাছে কেন সে প্রতিপদে ব্যর্থ?

ভারতের বর্তমান শাসনকার্যটিব সহিত আমাদের সমাজবিধির কোন স্থানেই খোঁজ নাই। গ্রামের মাঝে নব্যস্থাপিত পুলিশ স্টেশন, কিম্বা দেওয়ানী অফিস প্রভৃতির সহিত গ্রামের সামাজিক কোন সম্পর্ক নাই। এই ব্যাপারগুলি সদ্য উপস্থিত হইয়া অহরহ নুতন বিরোধ সৃষ্টি করিয়া সমাজকে দুর্বল করিয়া ফেলিতেছে। ইহারাই সমাজের প্রবল প্রতিদ্বন্দী, এংলো-সায়ান্ন জাতির বিজয় পতাকা। ইহাদের সংঘর্ষে সমাজ কণ্টবিক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের আধ-কূল্যে একাকী একটি দুর্বৃত্ত সমগ্র গ্রামকে উপেক্ষা করিতে পারে।

গ্রামের স্যানিটেশন সম্বন্ধে একটি উদা-

হয়ণ দেওয়া যাক। পল্লীবাসী বিজ্ঞগণ পল্লীর স্বাস্থ্যের জন্ত একটি পরঃপ্রণালী খনন সিদ্ধান্ত করিলেন। সকলেই স্ব স্ব ভূমিখণ্ড হইতে অজ্ঞাতের মঙ্গলার্থ কিঞ্চিৎ ভূমি দান করিলেন। কিন্তু ঠিক মধ্যবর্তী একটি গোক হুচ্যাগ্রমেদিনী দান করিতে অসম্মত হইল, অমনি সমগ্র প্রান্তী ভূমিমাং হইল। সমাজের কোন ক্ষমতা নাই, যাহাতে ঐ ব্যক্তি হইতে ভূমিটুকু গ্রহণ করে।

সমাজ দণ্ড দিতেও অক্ষম—পুব্ধারও তাহাব সাধ্যায়ত্ত নহে। সম্প্রতি নিতান্ত আচার মূলক সঙ্গীর্ণ পরিসরে কিঞ্চিৎ সামাজিক শাসনও বৈদেশিকের হুঃসহ হইয়া পড়িয়াছে।

নব্যপ্রতিষ্ঠিত পুলিশ, দেওয়ানী এবং ফৌজদারী কর্মচারিগণের ঔীবব জীবনের সজিত, শতাব্দী হইতে প্রতিষ্ঠিত কুটারের কোন সামাজিক সম্পর্ক না থাকিতে এবং পুরোক্ত ব্যাপার সংশোধনবৎ প্রণালী কিম্বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সহিত জাতীয় আদর্শমুখী কর্ম পরম্পরার সমান ধর্ম্মিষেব অভাবে, কার্য ব্যর্থ হইতেছে।

এই সামঞ্জস্য নাই বলিয়াই ব্যক্তিগত কার্য-ক্ষিপ্ত রক্ততরঙ্গ জাতির মর্ষে পৌর্ছিতেছে না। এই জন্ত ধর্ম্ম-ইথরের তবঙ্গ প্রেরণে যে জাতি শিহরিয়া উঠে, সারা বৎসর-ব্যাপী বায়ব-তরঙ্গের ধাক্কা তাহা সাড়া দেয় না।

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অগ্নান-বদনে গুণ-জর্জসিত, হইয়াও যে জাতি জন্মোৎসবে, পনিগ্ন-ব্যাপারে, শ্রাদ্ধাদি পিতৃকৃত্যে এবং প্রতি বাৎসরিক পূজা, ব্রত প্রভৃতির জন্ত অর্থব্যয় কবিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে কবে, সামাজিক এবং ধর্ম্ম-সম্পৃক্ত কার্যের জন্ত

• এই শ্রেণীর চাঁদা দিয়া 'সর্বস্বাস্থ্য হইয়াও আনন্দ অমূল্য করায়—তাহার নিকট একবার বই ছইবার পোলিটিক্যাল চাঁদার জন্ত গেলেন রিক্তহস্তে ফিরিতে হয় ।

পল্লবগ্রাহীবা এই জাতির মাঝে “স্যাঙ্ক্রি-ফাইন্স” নাই বলিয়া এই জন্ত নিন্দাও করে—অথচ এই জাতিটাই বাস্তবিক ভগবান কর্তৃক যেন ত্যাগের জন্তই সৃষ্ট ।

• বস্তুতঃ ভারতের যেই অসুস্থরূপে বেগ-বতী অনন্তশোভময়ী ভাববজ্রা প্রবাহিত হইতেছে, সেই তবঙ্গ-প্রবাহে যাবতীয় কর্ম-তটিনী-কুলের সংযোগবিধান করিতে হইবে, তবেই সিদ্ধ-সঙ্গনাকুল মহানদের জীব তর্জয় গৌরবে আধুনিক ভারত নব্যযুগের নবমুকুট জগতের দুর্দল কম্পিত কর হইতে আচরণ করিতে সক্ষম হইবে । ভারত স্বকীয় পথে অজ্ঞেয়, অপ্রণয়, অমর ।

সাময়িক কোপাহলে উথিত ধূলি-পটলেব মাঠে সেই পথের ছায়া যেন ক্ষণে ক্ষণে প্রতিবিম্বিত হইতেছে ।

গাঁট পাশ্চাত্য ভাঁদে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ভারতে সম্ভব নহে—যদি তাহা হয়, তবেও তাহা বড় সূখের হইবে না । তাহাতে আমবা চুরিজেব যতটা মর্যাদা ও কোলোনা হাবাইব, রাষ্ট্রীয় স্বাভাব্য তাহার বিনিময়ে কিছুই নহে । জনস্ব জীবনপথে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা উপায় মাত্র, লক্ষ্য নহে । সে উপায় প্রধান বা শ্রেষ্ঠ উপায়ও নহে—তাহা একটা নিয়ন্ত-রের সোপান—কিন্তু তবুও তাহা কিছুতেই অবহেলার বিষয় নহে ।

এক শ্রেণীর প্রচারকদের মতে স্বাধীনতা লাভ করিতে, সাধারণের জায় এবং ধর্মের অবতার হওয়া প্রয়োজন ; কিন্তু স্বাধীনতা যেখানে সম্ভ্রতি বিচরণ করিতেছে, যেখানে

জায় এবং ধর্ম অনেক সময় খুঁজিয়া পাওয়াই দুষ্কর । মধুকর বৃত্তি সঞ্চর ইহার প্রাপ্তির পক্ষে সর্ব সহজ পথ, কিন্তু যে মানব-সম্প্রদায় সংস্কার এবং শিক্ষা দ্বারা ধর্ম ও নীতির অম-লিন পথে ভ্রূয়িষ্ঠ পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে, কিম্বা যাহার পরিবারপুঞ্জ সমাজ এবং রাষ্ট্র ধর্মমূলক ব্যবস্থা দ্বারা সাময়িক এবং সনাতন আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গ্রথিত হইয়াছে, তাহাব পক্ষে মধুকর-বৃত্তিতে সজ্জিত হওয়া সম্ভবও নহে, কিম্বা উচিতও নহে । সে জাতি সহজেই দুর্নীতির ভিতব দিয়া অগ্রসর হইতে পারিবে না । লৌকিক জীবনেও সার্বভৌমিক এবং সার্বজনীন মঙ্গল একদিকে এবং জাতীয়, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত মঙ্গল অন্তর্দিকে—এই উভয়েব সামঞ্জস্য বিধান পূর্বক তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে ।

এই সামঞ্জস্য উপলব্ধি কেবল ভারতের পক্ষে সম্ভব—কারণ পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । বিশ্বাসীরা মনে করে, এই সামঞ্জস্য বিধানের জায়দণ্ডও বিধাতা ভারতের হস্তেই দিয়াছেন । চতুর্দশ বৎসরের নানাদর্শ ও নীতিবাদের পারস্পরিক সংঘর্ষে ভারতবর্ষই কেবল পরস্পর বিবোধীর কর্মকথা উপলব্ধি করিয়াছে ।

উপরোক্ত অনুমান যে অমূলক নহে, তাহা বর্তমান যুগের ত্যাগী দেশ-প্রেমিকগণের নিবিড় ধর্মপ্রাণতা, কর্মে গীতাজ্ঞ স্বার্থমুক্ত অনাসক্তি, চিত্তবৃত্তির অপূর্ণ ঐক্য, হৃৎ-ক্লেশের প্রতি উদার ওদাস্য প্রমাণ করিতেছে । ইহার ঐক্যভৌমিক কাগচায়ের ভারতে নব-রোপিত ফল নহে । ইহাদের মনের ইতিহাস খুঁজিতে গেলে যুগান্ত অতী-তের অক্ষয় সূত্রের গ্রন্থি উপলব্ধি হইবে ।

• পোলিটিক্যাল ব্যাপার চর্চা ইংরাজ-শাসিত ভারতেরও প্রধান ঘটনা নহে । ভারতের

স্বাভাবিক সংস্কার বশতঃ গত শত বৎসরেও আমরা উত্তরোত্তর বাঙ্গালাদেশে এবং অন্তর্ভুক্ত ধর্ম-বিপ্লবই দেখিতে পাই। তাহা আলোচনার স্থান এই প্রবন্ধে নাই। 'তবে' তাহা যে বিশেষভাবে বর্তমান ভারতকে পারম্পরিক প্রতিঘাতে সচকিত করিয়াছে, তদ্বশে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা যাইতে পারে, সিপাহী বিদ্রোহও ধর্মবিপ্লব, কেননা, তাহা যুগাগত আচারে হস্তক্ষেপ-সম্পৃক্ত আশঙ্কা হইতে সূত্রপাত হইয়া ছিল।

ভারতের বর্তমান এবং প্রাচীন আন্দোলনের মাঝেও পার্থক্যটা অনুধাবনার বিষয়। কংগ্রেস-পলিটিক্সের কোন ধর্মের দিক্ ঠিক ছিল না, তাহা হইতে দূরে থাকাই ইহার বিশেষত্ব—অবশ্য ইউরোপীয় আদর্শে। কিন্তু বর্তমানের পলিটিক্সই সম্প্রতি ধর্মের একটা দিক্ বলিয়া অনুভূত হইতেছে—সাম্প্রদায়িক ধর্ম নহে বা সাময়িক ধর্মও নহে—যে ধর্ম সমগ্র কৰ্মপরম্পরাকে পান্ডুজ্ঞা দান করিয়াছে।

তাহারা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা কৰ্ম-ব্যবহারের চরমলক্ষ্য মনে করে, তাহারা কার্যমাত্রই ঐ আলোকের আনুকূল্য হইতেই সম্পাদন করিবে। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই আমরা যাত্রা করিয়াছি; তাঁহাকে পাইতেই আমরা ছুটিয়াছি। ঊপনিষৎকার বলিয়াছেন—

'তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদেত্য়ং সৌম্যবিক্রি।

তিনি সত্য, তিনি অমৃত, তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে। তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে।

"ভারতবর্ষ মণে করে, এই রূপ-রূপ-গন্ধ-পর্শমর্দ জগতের পত্রে পত্রে, পল্লবে পল্লবে মানুষ্য বাহা করিতেছে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে

সকলই তাঁহাকে বিদ্ধ করিবার জন্ত। আমরা-দের শিক্ষা দীক্ষা রাষ্ট্রধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ললিতকলা, সমগ্রের ভিতর দিয়া তাঁহার সত্যস্বরূপকে, মঙ্গলস্বরূপকে, সুন্দরস্বরূপকে দিনে দিনে পলে পলে মানুষ্যের মনোময়ী-শক্তি গঠন করিয়া তুলিতেছে। সমাজধর্ম, রাষ্ট্র-ধর্ম, পারিবারিকধর্ম বাহা অসত্য, অসুন্দর, অমঙ্গল, তাহা পরিহার করিতে হইবে। তবেই ব্রহ্মের উপলব্ধি সম্ভব হইবে। ব্যক্তিতে, পরিবারে ও সমাজে—ব্রহ্মকে অর্থাৎ সত্য, সুন্দর, এবং মঙ্গলের অর্থও এবং অবিচ্ছিন্ন আদর্শকে খর্ব করিব না। রাষ্ট্রতন্ত্রে বাহা, দুর্বল, অসত্য, অসুন্দর রহিয়াছে, বাহা ভগবানের দৈবীভাব খর্ব করিয়াছে, তাহা আমাদের আঘাত করে। তাহার মঙ্গল্যবিধান প্রত্যেকের করতলগত। যতদিন তাহা হইতেছে না, ততদিন ধর্মবিধান হইল না।

ভারতের যাবতীয় চেষ্টার ইহাই মর্মকথা। বহুমুখী সামাজিক দৈত্ব দূর করা এবং পরম্পরের মাঝে আলোচনায় এবং আন্দোলনে ঐ দৈত্বের বিচাচ করা—ইহাই মূল কথা। কি করিয়া সমাজশবীবের সুন্দর স্বরূপ গঠন করিয়া তুলিতে হইবে, কি করিয়া কৰ্মযজ্ঞে মঙ্গলকে বরণ করিতে হইবে, কি করিয়া অন্ন-কষ্ট, দুর্বলতা, ভীকতা দূর করিয়া সমাজকে উহার সনাতন সিংহাসন অর্পিত হইবে, আজ সেই চিন্তাই উদ্যম হইয়া উঠিয়াছে। এই কার্যে দেশকর্মে গীতাকারের সবল উৎসাহ-বাণী অপূর্ব আলাপে ঝঙ্কত হইতেছে :—
"মাক্ৰেব্যং গচ্ছকৌন্তেয় নৈতৎস্বাপনন্ততে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যাবোত্তিষ্ঠপন্নস্তপ ॥"

হে পুত্র, কতরভাবাপন্ন হইও না, যে পরস্তপ, হৃদয়ের ক্ষুদ্র দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া উত্থান কর। এই পথে না গেলে :—

“ততঃ স্বধর্ম্যং কীর্ত্তিকং হিমা পাপমবাপ্তম।”
যদি না করা যায়, তবে স্বধর্ম্য এবং স্বকীর্ত্তি
পরিভ্রাণের জন্ত পাপের ভাগী হইতে হইবে।
ভগবানের এই উপাসনায় “স্বখে দুঃখে সমে-
কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ো” অগ্রসর হইতে
হইবে।

আমাদের সম্বল কি? শক্তি কি? এই
প্রশ্নের উত্তর ভারতবর্ষ যত সহজে এবং সরল-
ভাবে দিয়াছে, এমন আর কেহ নহে। ভারত-
বর্ষ মানবীয় আত্মার ক্ষমতার পরিধি স্বীকার
করেন না। কেনোপনিষত্ত্ব অগ্নি যাহা
হইতে দাহিকা শক্তি লাভ করিয়াছিল, বায়ু
গ্রাহিকা শক্তি লাভ করিয়াছিল, মানবও সেই
শক্তির অধিকারী। অবিদ্যার আবরণে তাহাকে
আমরা উপলব্ধি করিতেছি না। পুরাণোক্ত
শিলাময়ী অহল্যার স্তায় ভারতের মনোবৃত্তির
উপর বিমূর্ত্তির যবনিকা আঁত হইয়াছে।
সেই পাদস্পর্শ প্রয়োজন, যাহা পুনর্বার মৃত
উপলথণ্ডে উষ্ণ শোণিত ছুটাইবে—সেই
অঙ্গুরিয়ক প্রয়োজন, যাহার দর্শনে অভিজ্ঞান
জন্মিবে, সেই যাহ্নমন্ত্র প্রয়োজন, যাহার মুহু-
প্রবেশে ডাকিনীর মায়াপাশ কাটিয়া যাইবে।
কর্ম্মের পিতর দিয়া যাহারা এই শক্তি উপ-
স্থাপ্ত করিয়াছেন, তাহারা ধন্ত,—জ্ঞানের
ভিতর দিয়া যাহারা ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন,
তাঁহারা ধন্ত; প্রেমের ভিতর দিয়া যাহারা
স্বর্ণপেণ্ডে অমৃত্তব করিয়াছেন, তাঁহারাও ধন্ত।
এই শক্তির অধিকারীরা বিমূর্ত্ত জগতের
সম্মুখে বলিয়াছেন:—আত্মা অস্ত্রকে হনন
করে, যিনি একপ ভাবেন এবং অস্ত্রের দ্বারা
আত্মা হত হয়, ইহা যাহার বিশ্বাস, তাঁহারা:—

উভৌ ভৌ ন বিজানিভৌ নায়ম্হস্তি ন
হস্ততে।”

এতদিন পরে যেন আবার এই বাণী

নূতন শরীর পরিগ্রহ করিয়া উঠিতেছে—
ঈজিপ্তের সবলরক্ষিত সহস্রবর্ষের মসী শরীর
আবার যেন রাজদণ্ড ধারণ করিতে জাগ্রত
হইতেছে। গীতার রহস্যময় পুরুষ আজ
যেন প্রতিচ্ছন্দে জাগ্রত দেবতাপ্রায় স্বপ্ন-
কাশ হইতেছে।*

বেদান্তোক্ত অদ্বৈতবাদ দীর্ঘ ধীর্বে কঠে-
কটা মহাপুরুষের অপূর্ণ জীবন-চর্চার বিশ্বয়-
জনক শক্তি লইয়া ভারতে আবার অগ্রসর হই-
তেছে—ভারতের ভবিষ্যৎ ইহার সহিত
নানাভাবে যুক্ত না হইয়া পারে না। ইহার
ভবিষ্যৎ বিরাট। পশ্চিম দেশীয় ধর্ম্মযোগ-
বিহীন, ইতর, নগ্ন, রাষ্ট্রীয় উত্থান যে ইহাকে
আশ্রয় করিয়া উত্থিত হইবে না—বলা সাহ-
সিকতা। এই ক্ষেত্রে গীতাগ্রহ ভারতের
চিত্তকে অপূর্ণ আশ্রয় এবং শান্তি দিবে।
শিখজাতি যেমন ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া
গঠিত হইয়াছিল, ভারতের নৈসর্গিক প্রকৃতি
অনুসারে ধর্ম্মপ্রবাহ লইয়াই ভারত আবার
জাগ্রত হইবে। অবশ্য শিখজাতির বর্ধমানতার
দিক্‌টা সর্বথা তাজা—তাঁহাদের অধ্যাত-
নের কারণও এই সংঘের অভাব বই আর
কিছুই নহে—শুধু গঠন প্রণালীর দিক্‌টার
বিষয় বলিতেছি—তাহা ধর্ম্মমূলক—তাহা
ঠিক ভারতবর্ষীয়। প্রাথমিক শিখগণের
ত্যাগ এবং নেতিভাবক সত্বর্ষ, মহম্মদ বা
খ্রীষ্টের অনুচরগণের অনুভূত অত্যাচারের
মাঝে হৈর্য্যের সহিত তুলনীয়। জগতের
কল্যাণের জন্ত—পূর্বে ও পশ্চিমের সাম্রাজ্যের
জন্ত, সম্মিলনের জন্ত, বলা যাইতে পারে,
স্বাভাব্যের জন্ত—এই ভাবে অনুপ্রাণিত

* বর্তমান লেখক কর্তৃক চটগ্রাম জেলা সমিতির
অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে
নিম্নোপযোগী বোধে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

ভারতবর্ষ খাবতীয় বাধাকে তুচ্ছজ্ঞান করিবে।
এই চরম মিলনের পূর্বে সজ্বর্ষ অপরিহার্য
হইলে তাহা হইতে আত্মসংহরণের কোন
প্রয়োজন নাই। পরস্পরের অর্ন্তিমুখে ধাব-
মান তড়িত-পুষ্টি মেঘখণ্ডের সান্নিধ্যে বজ্র-
সঞ্চার অস্বাভাবিক নহে—কর্ণের দ্বারা এই
আসক্তিও থক্ক হওয়া প্রয়োজন। সমগ্রের
দিক্ হইতে দ্রষ্টা কখনও অংশের বিচার
করিয়া ক্রন্দন করিবে না। বরং চরম-
লক্ষ্যের পথ সজ্ঞাতের ভিতর দিয়া বিস্তৃত,
মনে করিয়া আশ্রয় হইবে। তবে কার্য্য-
পরস্পরাকে স্বার্থযুক্ত অনাসক্তির মর্য্যাদা
দান করিতে হইবে, পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

তবে বর্তমান ভারতবর্ষে পূর্ন পশ্চিমের
মিলনকাঁথো বর্ষের সংঘর্ষ কেইই কামনা

করে না। তাহা অপরিহার্য্য নহে—ইহাই
শান্তিবাদীদের আশার কথা। ভারতবর্ষ
অনাসক্ত-বৈরাগ্যের দ্বারা ঐতিপক্ষের প্রকৃতি
পরিবর্তনে সমর্থ হইতে পারে। গ্রীক্ মোগল-
দের মাঝে ইহা সম্ভব হইয়াছিল। আধুনিক
নেতিভাবক সংঘর্ষ (Passive resistance)
এই নৈতিক বলদ্বারা পুষ্ট হইতেছে।
বর্তমান সময়ে এই পথই অবলম্বনীয়—ইহাতে
সংঘম ও শিক্কার নানা উপাদান আছে।
তদ্বারা সজ্জের প্রকৃতি গঠন প্রয়োজন—
নচেৎ ব্যক্তিগত প্রলোভন এবং অসংঘম
ভ্যাগ কতিন ব্যাপার হইয়া উঠে।”

এই শেষোক্ত বিষয়টী সন্দেহে নানা
আলোচনার বিষয় আছে—কিন্তু তাহা এই
প্রবন্ধে বিচার্য্য নহে। শ্রীধামিনীকান্ত সেন।

প্রাচীন ভারত ও আধুনিক।

স্কুল কলেজে প্রচলিত ভারত ইতিহাস
পাঠ করিলে আমরা সাধারণতঃ জানিতে
পারি'বে, ১৫২৬ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট বাবর পানি-
পথের যুদ্ধে সর্ব প্রথম আধুনিক ব্যবহার
করেন; কিন্তু প্রাচ্য-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ
বলিয়া থাকেন, উহার বহু পূর্ন হইতেই ভার-
তীয় আর্ঘ্যগণ বারুদ বা 'আধুনিক' সাহায্যে
যুদ্ধাদি করিতেন; 'Sir Henry Elliot'
বহু গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে,
অতি পূর্ন সময় হইতেই ভারতীয় আর্ঘ্যগণ
বারুদ আবিষ্কার করিয়াছিলেন; এবং মহা-
ভারত-রামায়ণ-বর্ণিত সময়ে এদেশে আধুনিক-
জ্ঞের বহুল ব্যবহার ছিল।

কো'বিয়া ইজুগা প্রমাণ করিয়াছেন যে,
১৪২৮ খ্রীঃ অব্দে; পটুগীজগণ এদেশে আলি-

বার পূর্বে ভারতে বন্দুকের সাধারণ ব্যবহার
ছিল, (Srigg's Vol. II, P 432)

সেই সময়কার পটুগীজ ভ্রমণকারীদের
দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয়, তাঁহারা বলেন,
“ভারতবাসীরা বন্দুক ব্যবহারে অত্যন্ত
সুপটু।”

প্রাচ্য-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ক্যানিংহাম
বলেন, কাশ্মীরের মন্দির সম্রাট শিকন্দর
কর্তৃক বারুদের সাহায্যে ধ্বংস হইয়াছিল;
এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই,
সুতরাং Sir Henry Elliot, ক্যানিংহাম
প্রভৃতি প্রাচ্য তত্ত্ববিদগণের সিদ্ধান্তে জানা
যায়, মুসলমানগণ ভারতে আসিয়াছেন অবধি
এদেশে আধুনিক জ্ঞের ব্যবহার ছিল; কিন্তু
ইহার পূর্বে এদেশে আধুনিক জ্ঞের ব্যবহার

ছিল কি না, আমবা তৎসম্বন্ধেও সংক্ষেপে
হই একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।—

বারুদের ইতিহাস বর্ণন সঙ্গি Major
Wordell লিখিয়াছেন, (Encyclopaedia
Britanica) Helhad অথবা দিত হিন্দু-
দিগের শাস্ত্র গ্রন্থে বারুদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন
উল্লেখ পাওয়া যায়, তথায় দৃষ্ট হয়, শাসনকর্ত্তা
প্রভারগাময় যন্ত্রের সাহায্যে বিমুক্ত অস্ত্র
‘লইয়া, কিংবা কামান, বন্দুক বা অস্ত্র কোন
প্রকার আধুনিক লইয়া যুদ্ধ করিবে না।
Helhad সাহেব ইহা উপর মন্তব্য প্রকাশ
করিয়া বলেন—“চীন দেশে ও হিন্দুস্থানে বহু
পূর্বে হইতেই বারুদের ব্যবহার ছিল।” তাব
পর তিনি হিন্দুর পুরাণ বর্ণিত শতাব্দী অস্ত্রের
শুণ বিবৃত করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত
হইয়াছেন যে, ভাবতবর্ষে বহু পুরাকাল হই
তেই আধুনিক অস্ত্রের ব্যবহার ছিল।

গ্রীকদিগের লেখনী হইতেও ইহা ভূবি
ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারা যায়।
গ্রীকবীর আলেকজান্ডারের সহিত যে সকল
গ্রীক এদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্য
ভেমিসটাবাস নামক জনৈক পণ্ডিত বলেন,
“ব্রাহ্মণগণ দূর হইতে বিদ্যাত ও বস্ত্রের
সাহায্যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।” বোধ হয়, ইহা
কাহাকে বুঝিতে হইবে না যে, বিদ্যাত ও
বস্ত্র আধুনিকের শব্দ ও আলোকমালা।
টিমিয়াস, ইলিয়ান, ফাইলষ্ট্রেটস্ প্রভৃতি
এক প্রকার আশ্চর্য আধুনিকের উল্লেখ
করিয়াছেন, এ অস্ত্র বারুদের সাহায্যে ব্যব-
হৃত হইত না; ‘Wilson’ প্রভৃতির মতে
কুস্তীর তৈল হইতে কোন রাসায়নিক
সংযোগে উক্ত লেখকগণ-বর্ণিত অস্ত্রের উৎ-
পত্তি হইত। টিমিয়াস বলেন,—সিদ্ধান্তে
এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়, ইহা সুংগায়ে

বাধিয়া কাঠাদি নিক্ষেপ করিলে ভয়ঙ্কর
অনলের সৃষ্টি হয়। ভারতবাসীরা ইহা কেবল
ব্রাহ্মণের রাজার অস্ত্রই প্রস্তুত করে। ইলিউট
বলেন, এই তৈল পূরিত অস্ত্রের এত ক্ষমতা
যে, ইহাতে পশু পক্ষী মানুষ সকলই ধ্বংস
হয়, ভাবতীর নরপতিগণ ইহা দ্বারা নগর
জয় করেন।

গ্রীকদিগের এই বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টই প্রমা-
ণিত হইতেছে যে, তাঁহারা হিন্দুদের সমর-
কৌশলে নিজদের কোন অজ্ঞাত শক্তির
পরিচয় পাইয়াছিলেন; এতদ্ব্যতীত প্রাচীন
পারস্ত্র ও আরব্য-গ্রন্থ বর্ণিত এতবিষয়ক বর্ণ-
নার সামঞ্জস্য দেখিলে তাহাদের (গ্রীকদের)
নিখিত বৃত্তান্ত অসত্য বলিবার কোন কারণ
থাকে না, ফাইলষ্ট্রেটস্ বলেন, শিকল্লর
যতপি হাইপাসিস্ (Hyphasis) উত্তীর্ণ
হইতেন, তাহা হইলে কোন মতেই এই সকল
মহাবীরদের প্রাচীর-বেষ্টিত বাসস্থান জয়
করিতে পারিতেন না। শত্রু আসিয়া তাহা-
দের সহিত যুদ্ধ করিলে তাহারা ঝড় ও বজ্রের
সাহায্যে তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন।

‘মাতোলাম লিন’ (Ma-tuam-Lin)
নামক চৈনিক গ্রন্থে ভাবতবর্ষ বর্ণনায় দেখিতে
পাওয়া যায়, ‘কাঠবৃক্ষ’ ও ‘সুর্ণায়মান ঘটক’
ভারতবাসীরা সমনকালে ব্যবহার করিতেন।
এই সুর্ণায়মান ঘটকের কথা গ্রীক ও আরব্য
লেখকগণও উল্লেখ করিয়াছেন। মজুমদার
তাবিখী নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়,
ব্রাহ্মণেরা হালকা একটা হাতী নির্মাণ করিয়া
সৈন্য সমূহের পশ্চাতে রাখিতে পরামর্শ
দিতেন এবং যখন কাশ্মীর-রাজসেনা নিকট-
বর্তী হইত, তখন সেই হাতী-বিনীত হইয়া
বাহিত এবং তাহার পরীক্ষার হইতে প্রস্তুত
লিত অগ্নিধারা নির্গত হইয়া সৈন্য সৈনীর

করণ করিত। সুতরাং এই সকল বৈদেশিকদের বর্ণনাও প্রাচ্য তত্ত্ববিদদের ধারণা হইতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হিন্দুগণ বহু পূর্বকাল হইতেই ইচ্ছানুসারে আয়েন্নাজ প্রস্তুত ও তাহার ব্যবহার করিতে জানিতেন। এক্ষণে আমরা জাতীয় সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি হইতে এ সম্বন্ধে দুই একটা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধে উপসংহাব কবিব।

বেদে স্তূর্ণিনামক এক প্রকার অস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, অশুরগণ দেবতাদিগেব সহিত যুদ্ধে ইহা ব্যবহার করিত; বর্তমানকার অভিধানে স্তূর্ণি শব্দে লৌহ প্রতিমা বুঝায়; কিন্তু বৈদিক সময়ের অভিধানে উহা লৌহ 'স্থণা' বা 'চোঙ্গা' অর্থে ব্যবহৃত। সায়ন ভাষ্যানুসারে এই স্তূর্ণী ছিত্র-বিশিষ্ট লৌহময়ী 'স্থণা'; ইহার ভিতবে জলন্ত অনল, যাহা নির্গত হয়, তাহাও অগ্নিময়,—

“এবা টৈব স্তূর্ণী কর্ণকা চস্যত্যহ্নায়ৈব দেবা অন্তরানং সতত হাঁং হৃং হস্তি যদে-
তরা সমিধ মাদধাতি বজ্রমেধৈঃ তচ্ছতীক্লং
যজ্ঞান ত্রাতব্যং প্রহবতি।”

তৈত্তরীয় সংহিতা ১।৫।৭।৬

“জলন্ত লৌহময়ী স্থণা স্তূর্ণী। সাচছিত্র-
বতী। অতএব জলন্তীতার্থঃ।” সায়ন।

অপরূপ বেদেও সীসক দ্বারা শত্রু বিনাশের উল্লেখ পাওয়া যায় ;—

“সীসরা ধাহ্ বরুণঃ সীসযাশি কপাবতী।
সীসং স ইন্দ্র প্রায়চ্ছং তদঙ্গ যাতুচাতনম্ ॥
যদি নোগাং হংসি যদ্যং যদি পুরুষং।
সংতা সীসেন বিধ্যাম যথা নোসি অধিরহা ॥

এতদ্বারা বুঝি গেল, শত শত্রু-বিনাশক রক্ত ও অগ্নিসম্বিত স্তূর্ণী বর্তমানকার কামান, দ্ব্যতীত আর কিছুই নহে। বৈদিককালে

ছাড়িয়া দিলে গৌরালিক কালেও আয়েন্নাজের বহুলতা দৃষ্ট হয়। রাসায়ন মহাভারতে উহার বর্ণনাও বর্ণনা আছে। শুক্রনীতির ৪র্থ অধ্যায়ে বৃহন্নালিক অস্ত্রের উল্লেখ আছে, তাহার আকৃতি এইরূপ,—

—যথাযথা তু ত্বক সাবং যথাস্থলবিলাস্তরং
যথা দীর্ঘং বৃহদগোলং দৃবতেদী তথা তথা।

প্রবাহং শকটাতৈস্ত স্মৃক্লং বিজয় প্রদং ॥

অর্থাৎ নালীকার ত্বক যত কঠিন, আর তন যত বৃহৎ, গর্ভ যত স্থূল, গোলা যতই বড় হইবে, উহা ততই দূর ভেদা হইবে। উহা শকটাদি দ্বারা বাহিত হয় এবং উপযুক্তরূপ স্থাপিত হইলে যুদ্ধে বিজয়লাভ ঘটে।

অতঃপব শুক্রাচার্য গোলাগুলি প্রস্তুত সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন ;—

গোলো লৌহময়গর্ভ শুটিকঃ কেবলোহপিবা
সীসস্ত লঘনালার্থে হৃদধাতু ভবোপি বা।

এবমিধ গোলাগুলি-সম্বিত বৃহন্নালিক অস্ত্রকে কামান ব্যতীত আমরা আর কি বলিতে পারি।

নানাবিধ প্রমাণ উত্থাপন করিয়া সার হেনরি ইলিয়ট হির করিয়াছেন, “বারু-দেব উপাদান যবক্ষারজান ভারতবর্ষে অত্যধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, সুতরাং অতি প্রাচীন সময়েও বারুদ হিন্দুগণ কর্তৃক যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।”

যাহা হউক, বোধ হয়, ইহা হইতেই প্রমাণিত হইল যে, অতি প্রাচীন সময় হইতেই ভারতীয় আর্ষগণ ইচ্ছা মত আয়েন্নাজ প্রস্তুত ও তাহার ব্যবহার কবিতে জানিতেন এবং কবিতেন। প্রয়োজন হইলে এ সম্বন্ধে আমরা ভূরি ভূরি প্রমাণ দর্শাইতে পারিব।

শ্রীরমেশচন্দ্র সাহিত্য-সরস্বতী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা ।

বুঝিনা কেন ?

চাহিনা কল্যাণ, নাথ, নাহি অধিকার
করুণার দাওয়া করি তোমার দ্বার
দাঁড়াইতে জীবিতেশ ! ভ্রাম্য করুণার
সময় করি পিতঃ, যে ক্ষুদ্র বিচারে
পাতকীর ভাগ্যফল হ'তেছে ফলিত,
প্রতি পদ-চ্যুতি হেতু এ পিচ্ছিল পথে
যে কর্দ্দমে পরিলিপ্ত হইতেছি পিতঃ,
যে কণ্টকে ছিন্ন ভগ্ন, ওহে বিশ্বপতে,
সে কণ্টক সে কর্দ্দম তোমাৰি বিধানে
আমার পথের মাঝে জানি পরমেশ ;
কিন্তু কেন দয়াময় এ সামান্ত জানে,
পারি না বুঝিতে হ্রাস ? ইতর বিশেষ
সম্পদে বিপদে বল কেন করি নাথ ?
পারি না তোমার দান নিতে পেতে হাত !
শ্রীমুকুন্দনাথ ঘোষ ।

আহ্বান ।

[শ্রীমুকুন্দ কৃষ্ণকুমার মিত্রের প্রতি]
মধুর প্রভাতে, মধুর আলোকে,
আশার কাননে, প্রেমের বাগানে,
মম এ কবিতাকুঞ্জে,
যদিও এসেছ
কথাকি করেছে ?
প্রেমের মালিকা, রেহের মতিকা ।
কুসুম চূষন
সবই কি পেয়েছ ?
তোমারই মাটি, তোমারই জমি,
তোমারই বায়ু, তোমারই ফল,
পুণ্য লাগি, জনমিষা, প্রভু,
করেন আকুল আহ্বান !
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ।

পাণ্ডবের অজ্ঞাত-বাস ।

সমগ্র বলের সাথে বিচারের ভাণে,
হৃদয়া শক্তিরে তুমি করিলে তাড়না
কোন দূর দেশে ; বিতাড়িত, ক্ষুদ্র জানে
তখনো তোমাতে তারা করিছে মার্জনা ।

কুটচক্রী শত ভাই শকুনির সাথে
মন্ত্রণা করিলে সবে, হলো নির্দাসন,
বঞ্চিত গৈতুক রাজ্য অধিকার হতে,
তবু কি করেছে শির কভু উত্তোলন ?

ভ্রাম্য ধর্ম তবুও ত ছিল অবিচল,
নীরবে মরমতলে শুধু ধুমায়িত
হতেছিল ক্ষণে ক্ষণে প্রতিহিংসানল,
কবোধ নয়নবারি হইয়া সিক্ত ।

কে জানিত সেই শিখা উগ্রমূর্তি ধরি,
ব্যাপি' সান্না রসাতল, অকস্মাৎ কবে
কুরুক্ষেত্রে মহারোধে উঠিবে বিক্ষুব্ধি,
সে আগুনে এ ভারত ভয়সাগ হেতু ।

রাজ্যলোভে মত্ত হ'য়ে দলি পদতলে
সবটুকু মহাঘাঘ, গেছিলে ভুলিয়া
বিবেকের দৈববাণী, ধন-জন বলে
বুঝেছিলে রাজলক্ষ্মী রাখিবে বাঁধিয়া ।

করাইলে ছল করি হলাহল পান,
বন্ধ করি জতুগৃহে দিছিলে আশ্রয়,
তবু তারা ময়িল না, পেয়েছিল প্রাণ,
তখনো করেনি হাতে তীর-ধনস্তম ।

মিথ্যা ও ছলনা দিয়ে কত দিন পাড়ে .

করিবারে নিরীহের পরে অত্যাচার ;

রাহার গোধূলিসন্ধ্যা ঘনহিছে দ্বারে

বাহার পাণ্ডের বোকা কপ কপ করে ।

একদিন অবশেষে বলে হৃদযোধান—
“বিনা ঘুকে নাহি দিব সূচ্যে মেদিনী”
অমনি কোষেতে অসি করে ঝন্ ঝন্,
অখনি রইল চক্ৰ কাঁপে রিনি ঝিনি।

অমনি ভীমের হৃদে হইল স্পন্দন,
শিব মন্দিরের মাঝে হইল আরতি !
আকাশে উড়িল বেগে ধবল সান্দন,
অমনি গাইরা গীতা আসিল সারথি।

যত শক্তি নিল হরি’ অধর্ম আসিরা,
তত শক্তি দিল ধর্ম বাহু মাঝে তার,
বাধা বিয়-অন্ধকাব চুটিয়া পাশিরা,
পাঞ্জকত শব্দ বাজি’ উঠিল আবার।

কত বর্ষ পার ভূমি রাখিবারে তথা ?
জানিখে তাইতে তার সাধনা কুরার,
এক দিন এক পল দিবে স্বাধীনতা,
তাই তারি দিখিলে হইবে সহায়।

কেবা কক, কে বল্লভ, কেবা বৃহন্নলা
সবী বৃক্ষে বেঁধে গেছে অস্ত্র শস্ত্র যত,
পশিছে বিরাটপুরে নত কবি গলা
খণ্ড খণ্ড ভস্মাবৃত অনলের মত।

শ্রীধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী।

—
স্বাগত।

এস, এস, এস, স্বাগত। স্বাগত।

ভারতীর প্রিয় তনয়গণ।

আজ্ঞানিছে ওই গৌরীপুর বাজ,

বিনয়ে কবিছে সম্ভাষণ।

তুণ গর্ভ দিয়া বস্ত্র কুসুম

রঙেছি সখ্যা অক্ষত যুত।

করহ গ্রহণ, সবে নিজগুণে,

আমাদের শ্রুজা করহ পূত।

গৌরীপুরে স্বাহিত বিগত উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-
পাঠকদের স্বাগত-বাণীক অঙ্গিবেশনে পঠিত।

ভারত-প্রসিদ্ধ পুরণি-প্রসিদ্ধ,

ভগদত্ত প্রাগ্-জ্যোতিষরাজ।

ভয়ে বিহ্বল, ক্ষত্রিয়গণ,

সমুদ্র রণে পাইত লাজ।

আজ সুধীগণ, কোন্ দেশে আসি,

মিলিত হয়েছো জান কি তারে ?

সেই ভগদত্ত, রাজা-অধিকৃত,

সেই ভূমি পুণ্য নদের তীরে।

হয়েও সাবেও, এই দেশে আসি,

ফল ফুলে ভরা অসংখ্য তক,

দেখিয়া বিস্মিত, হয়েছিল পুনঃ,

দেখেছিল কত প্রাসাদ গুহ।

ভানুর বর্ষা, আছিল নৃপতি,

তর্ষদেব যার আছিল সখা।

রাজা নীলাশ্বব, উলঙ্গ ক্রপাণে,

দেখা’ল যবন কলঙ্ক রেখা।

বীব শুক্লধ্বজ, এই ভূমি হ’তে,

যে বিজয় উচ্চ পতাকা বেধা,

উচ্চ গগনোত, উড়াইয়াছিল,

ভবে বীবগণ দিত না দেখা।

জান ইতিহাসে বাঙ্গালা-বিজয়ী,

বক্তির আর আসি এদেশ হ’তে,

জীবনের দায়ে, ব্রহ্মপুত্র নদ,

সাঁতারি’ পলায় সৈনিক সাথে।

এখানে শঙ্কর, এখানে মাধব,

উচ্চ ধর্মগীত গাহিয়াছিল;

কত রাশি রাশি, সংস্কৃত গ্রন্থ,

এখানে পণ্ডিতে রচিয়াছিল।

এখানে কামাখ্যা, উমানন্দেশ্বর,

রয়েছে মাধব বেদার হেব।

বশিষ্ঠাশ্রম, ব্রহ্মপুত্র নদ,

পুনশ্চ নেহার শিবসাগর।

উত্তর বঙ্গের সহিত মিলিত

বয়েছে, রয়েছে আসাম দেশ।

বাণীর চবণে দেও পুষ্পাঞ্জলি,

পূরস্পরে মিশি ছাড়িয়া দেব।

শ্রীকৃষ্ণাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য।

সুপারিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুতে ।

কি শুনিছ আজি হার পণ্ডিত প্রবর
চন্দ্রকান্ত মহাশয় নাহি এ অগতে,
ছুটিয়াছে দেশবাসী শোকের লহর,
ভানিছে ভারত, বঙ্গ অশ্রু-বারি-শ্রোতে ।

চন্দ্র তুলা দীপ্তি যার ব্যাপ্ত চরাচরে,
চন্দ্রকান্ত মণি তুলা যার উজ্জ্বলতা,
তিনি আজ ডুবাউয়া শোকের সাগরে
স্বদেশ বিদেশ হার, নাহি স্বরে কথা,

চলিলেন মৃত্যুপুরে, যাহার কাবণ
প্রধান পণ্ডিতগণ মিলিয়া কাশীতে
মহতী সমিতি এক করিয়া গঠন,
করিয়াছেন শোক ব্যাপ্ত ঐক্য ভাষাতে ।

স্বরগ হইত সৃষ্টি যার বক্তৃতায়,
যার সম স্পৃহিত নাহি বঙ্গ-ভূমি,
কোথার গেলেন তিনি মবি হার হার,
আবিরিয়া বঙ্গভূমি অন্ধকার-ধূমে !

শ্রীঅমৃতানন্দবী দাসগুপ্ত ।

স্বর্গারোহণ উপলক্ষে ।

সর্বজন-বিদিত কণ্ঠবীর মহাত্মা, আমার
স্নেহময় পিতা, কুমারখালির বিখ্যাত ডাক্তার,
নবদীপচন্দ্র পাল মহাশয়ের অকালে স্বর্গা-
রোহণ উপলক্ষে নিম্নলিখিত কবিতাটি
লিখিত হইয়াছে। তিনি শুধু আমাদেরই
পিতা ছিলেন না এবং আমরাই শুধু
তাঁহার সন্তান ছিলাম না; তিনি হৃদশেব
পিতা ছিলেন। আজ দেশবাসী সন্তানগণ
তাঁহার শোকে মুহমান। কি ধনী, কি
দরিদ্র, সকলকেই তিনি সমভাবে স্নেহ-

করিতেন। শত্রুও বন্ধি বিপদে সাক্ষী
হইত, তিনি প্রাণপণে তাকে বিপদ হইতে
উদ্ধার করিতেন। বিনা অর্থে সহস্র সহস্র দরিদ্র
স্ত্রের জিকিঙ্গা করিতেন এবং নিম্ন অর্থ-
ব্যয়ে পথাদি প্রদান করিতেন। নদীরাই
প্রতি গৃহেই তাঁহার খ্যাতি; রাজদ্বারে তাঁহার
সম্মান; তিনি ২০ বৎসর ধাবৎ কুমারখালির
চেন্নাবমান পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেশের
মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। তিনি প্রথম প্রেনীর
অনাবাবী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার সুবিচার-
গুণে জেলার মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরও সন্তুষ্ট ছিলেন।
তাঁহার জ্ঞান মাতৃভক্ত কর্মচারী এ সংসারে
আর কমটি আছে, জানি না। তাঁহার অসীম
ঈশ্বর-প্রদত্ত কমতাগুণে এই স্বদেশী আন্দো-
লনেও এদেশে পুলিশের অত্যাচার হয় নাই।
পুলিশ কি এবং দাঙ্গাহাঙ্গামাই বা কি, তাহা
তাঁহার দেশবাসী সন্তানগণ জানেন নাই।
তাঁহার সেই প্রস্ফুটিত শতদল-সম
সদা প্রফুল্ল আনন শোকে, হৃৎখেণ্ড কেহ
কখনও মলিন দেখে নাই, তিলার্জের
তরেও সে মুখে চিন্তা কিবা ভীতি-চিন্তা দৃষ্ট
হয় নাই। ভয় কাহাকে বলে, তাহা জানিতেন
না। জীবনে কাহাকেও ভয় করেন নাই।
তিনি সত্যবাদী, উচিতবক্তা মহাপুরুষ ছিলেন।
তাই জীবনের সমস্ত কার্য সম্পূর্ণ করিয়া,
বেরি-বেরি বোগে, কলিকাতা ধামে, ১৩১৬
সালের ৮ই মাঘ, শুক্রবার, রাত্রি ১২ ঘটিকার
সময় "মা আমার নাও" এই কথা বলিয়া,
মাতৃভক্ত সন্তান সহাস্তবৎনে মায়ের শান্তি-
মাখা কোলে উঠিয়া চির শান্তি লাভ
করিয়াছেন।

এসেছিল দেখ, কণ্ঠবীর এক,

জগৎ জননী আদেশে ;

মাতৃভক্ত সে যে, মর্ত্যভূমি মাঝে,

বহু সেবা কৈল স্বদেশে ।

নদীরার চন্দ্র, নবদীপ চন্দ্র,

নাম তেঁই তাঁর লগতে ।

হিন্দু মুসলমান, বৃহৎ বিদ্বান,

সবে সম, তাঁর কাছাকাছি ।

• কী কি নির্ধনী, শুণী কি নির্ধনী,

তুবিত সবারে স্নেহেতে,

ঔষ সুধাধার, স্নেহ-পারাবার,

পেয়েছে সকলই দীনেতে ।

সংসার প্রাক্ষণে, সুখি প্রাণপণে,

উদ্ধারিমা দেশবাসীরে,

পরের লাগিয়ে, নিম্বার্থ হৃদয়ে,

খেটে গেছে সে যে সংসারে ।

যেজন বিপদে, তাঁহারি ত্রীপদে,

স্মরণ লয়েছে কাতরে,

তুবি লেহ দানে, আশ্বাস প্রদানে,

বলিয়াছে “ভয় কাহারে ?

নির্ভর অন্তরে, যাও গৃহে ফিরে,

আমি এর মাঝেতে ।”

দেই স্নেহধন, পেয়ে দীন জন,

হরিষে গিয়াছে স্নেহেতে,

শীর্ণ রোগীজনা, রোগের যাতনা,

সহিতে না পেরে কাঁদিয়ে ;

বলিছে যে আর সহেনা এ ভার,

আহ কি শমন ভুলিয়ে !

হেন রোগীপাশে, দেবতার বেশে

দাঁড়িয়েছে গিয়ে যখনি ;

তপ্তনি যাওনা, কমি বোল আনা,

ফিরে পেত রোগী জীবনী ।

• হেন মতে সে বে, কর্ণভূমি মাঝে,

আশ্রয়দান করি কশ্মেতে ।

শেষ হল কাজ, পবি বীর-সাজ,

শুণ গান তাঁর ক’বাতে !

‘মা নাও বলিয়া,’ মবত ছাড়িয়া ;

উঠিলে মায়ের কোলেতে !

প্রিয় পুত্র ধনে, কোটি চুখদানে,

বুক রেখে বুক জুড়াতে ।

• লইলা জননী যথা মন্দাকিনী

কুল-কুল-বুলু বহিছে ।

যথা দেবগণ হরিষ বদন

সদাই আনন্দে ভাসিছে ;

সেই দেব দেশে সেই বীর বেশে

রতন আসনে বসায় ।

সুবলাগণ কুহুম চন্দন

সে অঙ্গে দিতেছে সাজায়ে ।

শ্রীমতী মাধবালতা দাসী ।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

৭২। ভাষদাস গ্রন্থাবলী — দ্বিতীয় ভাগ, ভারত-রহস্য, রত্ন-রহস্য ও বুদ্ধদেব । প্রকাশক শ্রীমণিযোহন সেন, মূল্য ২৮। স্বদেশী কাগজে সুশ্রীকার ছাপা । স্বদেশী কাগজ বলিয়া কেহ যে অকুণ্ঠিত করিতে পারিবেন, সে সম্ভাবনা নাই ।

৭৩। রামদাস বাঙ্গালা ভাষার এক সম্বন্ধে শুভ-বক্তব্য ছিলেন, — তিনি ধর্মীয় গন্তান হইয়াও

দীন। বাঙ্গালা ভাষার জন্ত যাহা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, চিরদিন তাহা তদীয় জীবনের আবাক-চিহ্নস্বরূপ প্রদীপ্ত থাকিকে । তাঁহার জীবন, বঙ্গোদ্ধারের জন্ত বিধাতার অধাচিত দান । ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার জয় । এদেশে প্রত্নতত্ত্ববিদ বড় অধিক হয় নাই—তাই চারি জনের মধ্যে রামদাসের স্থান, আমাদের বিবেচনায়, রাজেন্দ্রলালের পরেই চিহ্নিত ।

স্বদেশীয় এদেশের অমর সন্ধান। তাঁহার সুযোগ্য সন্তান বহুভাবে পিতৃকীর্তি বজায় রাখিতেছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। পিতৃপাশে মণিমোহনও অমর হউন।

এই গভীর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থের আশি বিশেষ কি পরিচয় দিব—আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালা ভাষাভাষী সকলেই ইহা পড়িয়াছেন। এই গ্রন্থ সকল পুস্তকালয়ে সুরক্ষিত হউক।

১০ ১৩। কাদম্বরী। পণ্ডিত তাবশঙ্কর তর্কবন্ধ প্রণীত গ্রন্থ অবলম্বনে শ্রীচাক্ষু বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ ও শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সংস্কৃত মূলানুযায়ী কবিতা সম্পাদিত। মূল্য ১/০। শ্রীবীজনাথ ঠাকুরের ভূমিকা সহিত। সংস্কৃত কাদম্বরী বাণভট্ট বিরচিত, পণ্ডিত তাবশঙ্কর বাঙ্গালা কাদম্বরী বচনা করেন। তাবশঙ্কর কাদম্বরী বাঙ্গালা ভাষায় অতুল সম্পত্তি। বর্তমান কাদম্বরী পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং তাবশঙ্কর কাদম্বরী প্রাচীন বাঙ্গালায় চিব আদর্শ হইয়াই রহিল। একপ পবিত্রন ও পবিত্রজনেব কাহারও অধিকার আছে কিনা, জানি না। এইরূপ করার বন্ধিমেব ধর্ম্মতত্ত্ব মাটা হইয়াছে, কৃত্তিবাস ও কাশীদাস মাটা হইয়াছেন। মৌলিক গ্রন্থের একপ পবিত্রন মার্জ্জনীয় নয়। ভাষাব ক্রমিক উন্নতি দেখাইতে হইলে, প্রাচীন লেখাব আদর্শ নিত্য প্রয়োজনীয়, একপ পরিবর্দ্ধন কবিলে তাহার কি, ক্ষতি হয় না? কোন্ গ্রন্থকার চশাব প্রভৃতির ভাষা পরিবর্দ্ধন বা পরিবর্দ্ধন কবিলে সাহসী হয়? বর্তমান লেখকগণ, দেশের হিতকামী ব্যক্তি, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা একপ পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্দ্ধনকে মার্জ্জনার চক্ষে দেখিতে পারি না।

গ্রন্থখানি স্বদেশী কাগজে মুদ্রিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইলাম।

১৪। আদর্শ-জীবনী। শ্রীমতী সরোজিনী দেবী প্রণীত, মূল্য ১/০। শ্রীমৎপ্রসন্নকর ত্রিবেদী কর্তৃক লিখিত ভূমিকা সহিত। কৃত্তিবাস হইতে আরম্ভ করিয়া রাজনারায়ণ বসু পর্য্যন্ত ১৬ জন সাহিত্য-সেবীর জীবনের আলোচনা। সবল ভাষায় একপ সংক্ষিপ্তভাবে স্থাপিত মহাজনকাহিনী এদেশে আর প্রকাশিত হয় নাই। পুস্তকখানি বিজ্ঞানগ্রে অগত হইবার যোগ্য। এই পুস্তকখানি ঘরে ঘরে আদৃত হইলে আমরা বড়ই সুখী হইব। স্বদেশী কাগজ।

১৫। বীব-বালক। শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী প্রণীত। রামায়ণ অবলম্বনে লবকুশের কাহিনী অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বচন নৈপুণ্য এবং ভাষার পাবিপাট্যে পুস্তকখানি উপাদেয় হইয়াছে। কিন্তু বিদেশী কাগজ ॥ একটু নমুনা তুলিয়া দিলাম—

“জননী গো! দাব প্রাণ্ডে নিরথ আসিয়া,
তোমার চরণ পদে আনিয়াছি আজি,
অজিত গোবব চিহ্ন। বীরত্বের গাথা
শুনি নিত্য বামাগ্নে; আজি দেখাইব,
তোমার হৃৎথেব ধন লব কুশ দৌড়ে
মর্চির শিক্ষা বলে কি রত্নে আজিকে
ভূষিত হইয়েছে দেবি! দেখ মা হৃৎখিনি!
স্নান মুখে হাসি বশি ফুটাও মা আজি!
আমাদের চিব কাম্য প্রিয় পুত্রকার।
সিংহ শিশু সম মাগো! তব আশীর্ব্বাদে
জগতেবে দেখায়েছি সতীর সন্তান।”

আনন্দ আবেশে ছুটি আসে লব কুশ
দাবো রাগি তপ রজ্জু আবদ্ধ করিয়া,
বীরশ্রেষ্ঠ হনুমান। আনন্দে তাদের

গদগদ কণ্ঠবহ, রাঘব-বনিতা
আপিল! আনন্দচিত্তে পুত্রের সম্মুখে
কহিলা হাসিত মুখে,

“দীর্ঘ সারা দিন,

নাহি কিরে এক বিন্দু ক্ষুদ্র অবসর
আসিতে কুটীরে বৎস! অপরাহ্ন কালে?
একাকিনী গৃহে আমি, শুদ্ধ বনফল
কাঁদি খেদে,” (প্রদাপের স্তিমিত আলোকে
হেরিলা কোমল কায়ে অস্ত্র ক্ষত পত)
“একি দেখি প্রাণাধিক, কি খেলা খেলিয়া
অস্ত্র ক্ষত সর্কি অঙ্গে রক্তধারা বহে!
হা অভাগ্য! কম কায়ে কোন্ সে নিষ্ঠুর
আঘাতিল অস্ত্র, আহা! শিবী বকুন্ম
কে দিল কটকাঘাতে বিদানিত করি?
অজ্ঞেয় নয়ন তোরা বাক্কি কো সখল,
কেন দ্বন্দ্ব কর কত রাজপুত্র সনে
জীড়াঙ্কলে, বয়োজ্যেষ্ঠ সবে গোমাদেব।”
অশ্রুত কাতর কণ্ঠে কে চাহে সলিল
স্বারদেশ হ’তে? মাগা ছুটিয়া বাহিবে
আধ অন্ধকাব, আধ গোধূল আলোকে
হেরিলা অন্ধ চেতন, বন্ধ অবয়ব
স্বদৃষ্ট লতা বন্ধনে পবন কুমার’

চির প্রিয় ভক্ত তাঁর পুত্রাধিক চিব।”

৭৬। প্রথম ভাগ সংস্কৃত শিক্ষাকৌমুদী।
শ্রীপঞ্চানন কবিরত্ন প্রণীত, মূল্য ৯০। এই
পুস্তকের টাইটেল পেজ ইংরাজীতে লিখিত
হইল কেন, আমরা বুঝিলাম না। এক
পুস্তকে দুই রকম কাগজ। এই পুস্তকেব দ্বারা
সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপকার সাধিত
হইবে।

৭৭। সঙ্গীত ও সঙ্গীতর্জন। শ্রীমনোমোহন
চক্রবর্তী বিরচিত, মূল্য ৯০। সুন্দর হৃদয়ের

সুন্দর অভিব্যক্তি। সঙ্গীতজ্ঞগণ শুধু গানের
হিসাবে নয়, কবিত্বের হিসাবেও তাহার উচ্চ-
স্থান লাভে অধিকারী। এরূপ বিস্তৃত সাহিত্য-
ভাবপূর্ণ লেখা যত বাহির হয়, ততই দেশের
মঙ্গল। লেখকের লেখনীতে পুষ্পচন্দন ধর্ষিত
হউক। স্বদেশী কাগজ।

৭৮। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেব বিবৃতি। ভূতনিধি
শ্রীক্ষিত্তাননাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ৮০। ৩০১
পৃষ্ঠার পুস্তকের মূল্য ৮০ মাত্র। ভাল কাগজের
ভাগ ছাপাব এত বড় পুস্তকের মূল্য ৮০, অতি
সুগত। আখ্যাপত্র, গ্রন্থকারের বংশপরিচয়,
উৎসর্গ, ভূমিকা, অনুক্রমিকা, অত্য প্রার্থনা,
উদ্বোধন, ব্রাহ্মধর্ম্মেব অসাধারণিকতা, ব্রাহ্মধর্ম্ম-
বাজ, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ, সৃষ্টিতত্ত্ব, আমাদের আদর্শ,
জ্ঞান প্রাপ্তি, যাগযজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাব-
ভেদ, অজ্ঞেয়বান, ঈশবাস্তব, ভুলোক ঈশ্বর,
তপস্যা, হিরণ্ময় ধোব, অব্যাক্সবোগ, অমৃত-
মৈত্রী, একত্বার্থ, তত্ত্বনাভ্যাসিত কণ্ঠন, প্রিয়তম
পবনেশ্বর, একচক্র, ব্রহ্মলোক, ধর্ম্মপথ, শাস্ত্র-
নিকেতন, প্রার্থনা, ব্যাকুলতা, অব্যাক্সধর্ম্ম,
অনতোমাসংসার, বিবেক ও বৈবাগ্য, প্রার-
ম্ভিক, গৃহাবধান, অব্যাক্সধর্ম্মেরাভ্যাস, ব্রাহ্ম-
ধর্ম্মের বিস্তার, উপবাস, সংসারাত্মা, ব্রাহ্মধর্ম্ম-
প্রচারের অন্তরায়, ব্রাহ্মের কস্তব্য, কাম্যগো-
বাধিকারসত্তে, আনন্দাহ্বান ও জীবন সমর্পণ
প্রভৃতি বিষয় আছে। পুস্তকখানির প্রতি
পৃষ্ঠায় চিত্রাশীলতা স্বাধীনচিত্ততা এবং
উদারভাব পরিচয় পাওয়া যায়। গণ্ডার প্রবাহে
নিমজ্জিত ব্যক্তির নিকট একপ স্বাধীনভাবা-
পন্ন-বিবৃতি কখনও প্রত্যাশা করা যায় না।
এরূপ ধর্ম্মভাক্তিগ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষার গৌরব।
এখ গ্রন্থ, চিত্রাশীল স্বাধীনভাবে বিবেচনাপূর্ণ
প্রাদৃত হইবে, আমরা আশা করি।

ভাগলপুর সাহিত্য-সম্মিলন ।

• বিগতবর্ষে রাজসাহীতে একাকী গল্পা-
ছিলাম। এবার তিনজন সহযাত্রী সমভি-
ব্যাহারে ২৯শে মাঘ, শুক্রবার, সন্ধ্যা ৬টার
সময় গোহাটি হইতে রওয়ানা হইলাম। পথে
প্রায় দশবার ট্রেন ও খেয়ার জাহাজে উঠা-
নামা করিয়া ৩০শে মাঘ, শনিবার, রাত্রি প্রায়
৯টার সময় ভাগলপুর পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে
আমাদের ক্ষুদ্র দলের অভ্যর্থনায় অভ্যর্থনা-
কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার
মহোদয়-প্রমুখ অনেক বয়স্কান পদস্থ ব্যক্তি
উপস্থিত ছিলেন—চন্দ্রশেখর বাবুর রাজপ্রাসা-
দোপন হুস্মা হুস্মার দ্বিতণ্ডে আননা উত্তর
বঙ্গের আরও কতিপয় সাহিত্যিকগণের সঙ্গে
স্থান লাভ করিলাম।

বঙ্গের বাহির্দেশে যাহারা কৃত্তবে ও চরিত্রে
বাঙ্গালীর নাম সমুজ্জ্বল করিয়াছেন, আমাদের
আবাস-ভবনের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর
সরকার মহাশয় তাহাদের অত্মতন। আমরা
তাঁহার সাবনয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছি—
বাঙ্গালী ও বিহারী প্রভৃতির মুখে তাঁহার
শুণাবণী পূর্বেই শ্রবণ করিয়াছিলাম—
ইদানীং তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া কৃত্তার্থ
হইলাম।

পরদিন রবিবার প্রাতঃকালে পাটনার
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, কলিকাতার
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিজাভিনোদ প্রভৃতি
নানা স্থান হইতে সমাগত অনেক প্রবীণ
সাহিত্যিক 'মহাশয়দের সঙ্গে পরিচয়' করিয়া
ধন্য হইলাম। প্রায় ১০টার সময় চন্দ্রশেখর
বাবুর বৈঠকখানায় সম্মিলন উপলক্ষে সমাগত

সমস্ত সাহিত্যিক মহাশয়দের সমাবেশ হইয়া-
ছিল—সেই স্থানে অশেষ সম্মানস্পদ সভাপতি
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের সহিত
সাক্ষাৎ হইল। শ্রীমদ্রাহাভাজ কাশ্যমপুর্বাধি-
পতি বাহাজর এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রমুখচন্দ্র
রায় মহোদয় প্রভৃতি যে সকল মহাশয়গণের
সঙ্গে রাজসাহীতে আলাপ হইয়াছিল, তাহা-
দিকাকে পুনশ্চ এই সম্মিলনোপলক্ষে দেখিয়া
বড়ই আনন্দ হইল। কন্যাসং সম্মিলনে
যাওয়ার প্রধান ফলসং সজ্জনগণ সহ অশোপ
ও পরিচয়—এবার তাহাও নিমিত্ত যতদূর
সম্ভব প্রারম্ভ হইতেই প্রঘাস করিয়াছি।
গতবৎ অপেক্ষা এইবার সাহিত্য সম্মিলনে
অভ্যাগত সাহিত্যিক সংখ্যায় অনেক অধিক
হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের বাসস্থান
দূরে দূরে হওয়ায় আলাপ পরিচয়ে কিঞ্চিৎ
অসুবিধা ঘটিয়াছিল। আবাব সভাপতি
প্রত্যেক স্থান হইতেই অধিবাসী হইয়াতে
সাহিত্যিকগণের বাতায়তেও অনেকটা অসু-
বিধা হইয়াছে।

এই প্রারম্ভিক সভায় এইবার একটী নূতন
অন্তর্ধান দেখিলাম। প্রত্যেক অভ্যাগত
সাহিত্যিকের বকে এক একটী কৃত্তিম পুষ্প
পিন দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইটী
বোধহয় কংগ্রেসের অঙ্কুরণে "ডেলিগেট"-
দের "বেজ"। অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণের
এবং স্বেচ্ছাসেবক যুবকবৃন্দের বক্ষঃস্থলেও
ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন শোভা পাইতেছিল। অভ্যা-
গতদিগকে এইরূপ চিহ্নিত করিবার রীতিটী
ভালই; তবে একটু পরিবর্তিত করিয়া দেখিলে

ধরণে কলিতা করিলেই বড় সুন্দর হয়। একটি টেবিলের উপর পুষ্পমালা ও চন্দন থাকিবে, তৎসমীপে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দণ্ডায়মান থাকিবেন। প্রত্যেক অভ্যাগত সাহিত্যিককে টেবিলের নিকট আহ্বান করিয়া আনিয়া তিনি তাঁহার নাম ও স্বাক্ষরে পরিচয় দিয়া তাঁহার ললাটে চন্দন ও গলদেশে পুষ্পমালা অর্পণ করিবেন। গুরুপুষ্প দ্বারা অভ্যাগতের অচর্চনা সনাতন রীতি, অথচ এই উপায়ে সাহিত্যিকগণ পবনস্পরের নিকট অনায়াসে পরিচিতি হইয়া যাইবেন। প্রারম্ভে এইরূপ সমাগ্র পরিচয়ে পশ্চাৎ গাঢ়তর ভাবে আলাপ পরিচয় হইবার পথ যে সুগম হইয়া পড়িবে, ইহা বলাই বাজিয়া। এই ব্যাপারে স্বেচ্ছাসেবিকগণ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয়ের সহায়তাকিবিবেন। ঘণ্টায় একশত জনের অভ্যর্থনা ও পরিচয় অনায়াসে হইতে পারে। এই পরিচয় প্রদান করিয়া সম্বন্ধে একটু অপত্তি হইতে পাবে যে, অনেক অভ্যাগত অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত হইতে পারেন। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, অনিমন্ত্রিত হইয়া কেহই সম্মিলনে উপস্থিত হইবেন না। নিমন্ত্রণ করিবার কাগ্য অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিই করিয়া থাকেন। নিমন্ত্রিতের তালিকায় তাঁহাদের ঠিকানা প্রভৃতি পূর্ণা-বধিই নোট করিয়া রাখিতে পারেন। যে সকল সাহিত্যিক সভা-সমিতি * প্রতিনিধি

* সাহিত্যসম্মিলনে কেবল সাহিত্যিক সভা-সমিতিরই প্রতিনিধি আহৃত হইবেন, এমন নহে—বাদ্য-লা সংবাদ পত্র ও সামিক পত্রিকা সমূহের প্রতিনিধি-বর্গেরও আমন্ত্রিত হওয়া আবশ্যিক। ইহা নাকি যথেষ্ট ভাবে হইতেছে না তালিয়া একজন অতি পাবন পত্রিকা-সম্পাদক আমাকে আক্ষেপ সহকারে বলিয়াছেন।

পাঠাইবার নিমিত্ত অমুকক হন, তাঁহাদের নির্ধারিত প্রতিনিধিবর্গের পরিচয় ত তাঁহা-রাই পত্র দ্বারা জানাইয়া দিবেন।

অপিচ, পরিচয় প্রদান ব্যাপার যে একটি বড় গুরুতর বিষয়, তাহাও বোধ হয় না। প্রথিতনামা ব্যক্তিগণের নাম গ্রহণেই পরিচয় হইয়া যাইবে—আবার অনেকেই “ইনি অমুক সাহিত্য সমিতির নির্ধারিত প্রতিনিধি—নাম অমুক” এই রূপেই পরিচয় হইয়া যাইবে। বাসস্থানের ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন শিবির নির্দিষ্ট থাকিলে কে কোন্ স্থানে আছেন, তাহাও এই সঙ্গে বিজ্ঞাপিত হইতে পারে।

এই পরিচয়ের পর অভ্যাগত সাহিত্যিক-বর্গের মধ্যে যদি কাহারও কাহারও ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ পরিচয়ের আবশ্যক হয়, তবে তাঁহারা অনায়াসে তাহা করিতে পারেন। কিন্তু অভ্যাগতগণ বাহাতে সকলে একত্র অবস্থান করিতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করিতে পারিলে বড় ভাল হয়। গৌরাপুত্রের রাজা বাহাদুর তাদৃশ ব্যবস্থা করিয়া উত্তরবঙ্গীয় সাহিত্যিকবর্গের অনেক উপকার সাধন করিয়া ধন্যবাদই হইয়াছেন। ভাগলপুরে বোধহয় সেইরূপ স্থানের অভাব বশতঃ একত্র স্থান ঘটতে পারে নাই—ইহাতে অভ্যর্থনাকারক ভদ্রলোকদেরও অনেক অসুবিধা ঘটয়াছে।

রবিবার অপরাহ্নে তিনটার সময় ভাগল-পুরস্থ সাধারণ পুস্তকালয়ের সংলগ্ন প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত মণ্ডপে সম্মিলনের অধিবেশন আরম্ভ হইল। মাঙ্গল্য সঙ্গীত ও স্তোত্র পাঠের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় কর্তৃক সস্তাবণ পত্র পঠিত হইল। তৎপর যথারীতি প্রস্তাবের পর সভাপতি নির্ধারিত হইয়া দেশ-গৌরব শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র

মহোদয় তদীয় অভিভাষণ পাঠ করিলেন।
 অক্ষাৎসহবাবে সভাস্থ ব্যক্তিবৃন্দ তাহা শ্রবণ
 করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। অতঃপূর্ব বিগত
 বর্ষের বাৎসাহী সম্মিলনের স্তবেগ্য সম্পাদক
 শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহোদয় গতবর্ষের
 সম্মিলনের প্রস্তাব অনুসারে যে যে কাজ
 হইবাছে, তৎসম্বন্ধে একটি বিবরণী প্রকাশ
 করিলেন। বড়ই স্তথের বিবরণে, বিগত
 সম্মিলনের অনুবোধে রাসাতীর্থ শিক্ষিত
 মহোদয়গণ যে সকল কার্যের ভান গ্রহণ
 করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ের সম্পাদনকরে
 তাঁহারা যথেষ্ট শ্রমস্বীকার করিয়াছেন।
 তৎপরে শ্রীযুক্ত আমেন্দ্রনাথ বিবরণী মহাশয়
 সম্মিলনের নিবন্ধাবলীর মুদ্রিত পাণ্ডুলিপি
 সভামধ্যে উপস্থাপিত করেন এবং সন্ধ্যার
 পর বিষয় নির্বাচন কমিটিতে অষ্টাষ্ট বিষয়ের
 সঙ্গে ইচ্ছাবৎ আলোচনা হইবে, ইহা
 বিজ্ঞপিত করিলেন। প্রথম দিনের অধি-
 বেশন এইরূপ সমাপ্ত হইলে আমবা সভা-
 স্থলের পশ্চাদ্ভাগে, সাধাবণ, পুস্তকালয়
 একটি প্রকোষ্ঠে সুসজ্জিত পান্থনীর দ্রব্যগুলি
 দেখিবার জন্ত গমন করিলাম। সাহিত্যিক-
 বর্গের কৌতুহলোদ্দীপক অনেক জিনিস এট
 স্থানে সংগৃহীত হইয়াছিল। ফলতঃ এট
 সংগ্রহের জন্ত ভাগলপুর সম্মিলনের উদ্যোক্ত-
 বর্গ যেদূর যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্ত
 তাঁহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ প্রদান করিতে
 হয়। হৃৎখেদ বিষয় এই যে, সমগ্রভাবে এট
 প্রদর্শনী বস্তুজাত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার
 অবসর পাই নাই। আমাব জন্ম অনেকবই
 মনে এই ক্ষোভ উপজাত হইয়াছিল। যদি
 একদিন এই সকল জিনিস সভামণ্ডপের উন্মুক্ত
 স্থানে সজ্জীকৃত হইয়া সমগ্র সভামণ্ডলীর
 নিকট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক একে একে

প্রদর্শিত হইতে পারিত, তবে কি স্তথের বিষয়
 হইত। গোবীপুত্র, উগ্রব-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মি-
 লনে একরূপ করিতে পাবা গিয়াছিল। বস্তুতঃ
 বচন-পাঠ ইত্যাদি ব্যাপার কিছু কমান্ধিতে
 পাবলে বোধ হয় ইহা সুকাজেই করা যাইতে
 পাবে।

রবিবার সন্ধ্যার পর শ্রীমহাশয় রাজ মল্লিক
 চন্দ্র নন্দ বাহাদুরের আবাস-বাটিকায় বিষয়-
 নির্বাচন-কমিটি উপলক্ষে প্রায় সমস্ত সাহি-
 ত্যিকবর্গ সমবেত হইলে, মহাবাজা বাহাদুর
 মোট বড় নির্বিশেষে সকলের সহিত আলা-
 পাদি করিয়া সভাবসিক্ত অমায়িকতার পরিচয়
 প্রদান করিলেন।

সকলে মিলিত হইবার পূর্বে কথা প্রসঙ্গে
 জানা গেল যে, মহাকায় শ্রীযুক্ত পোদ্দনাথ
 ঠাকুর মহোদয় সেই স্থানেই সমাধীন রহিয়া-
 দেন। আশ্চর্য্য! যে রবীন্দ্রনাথের রসগর্ভ
 কবিতাব এবং গল্পের আরাধে বঙ্গী পঠক-
 সাধাবণ নিহবল প্রায় হইয়া থাকে, তিনি চুপটি
 কবিয়া বসিয়া আছেন! আমি ইতঃপূর্বে
 তাহাকে কুর্খাপ দেখি নাই, কিন্তু কখনার
 তুলিকায় তাঁহাব মহাজন-সুসভ স্মরণশীল
 এবং সুবাসক কবিজন-সুসভ শ্রীঃ-প্রমুখ-
 অধারি সঞ্চাব-নেত্র বিশিষ্ট যে এক মুর্তি মানস-
 পটে অঙ্কিত করিয়া বাবিরাহিলাম, তাহা
 মুহূর্ত্তে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। ফলতঃ তাহাকে
 একরূপ গুরু-গম্ভীর দেখিব, তাহা নাই, শুনিলাম
 তিনি অসুস্থ; বোধ হয়, ইহাই এই বিরস-
 গাষ্ঠীর্ণ্যের হেতু।

সভায় উপস্থিত করিবার জন্ত যে কয়ে-
 কটা মন্তব্য নির্দ্ধারিত হইল, তাহার অধি-
 কাংশই সভাপতি মহাশয় কর্তৃক প্রস্তাবিত
 হইবে, জ্ঞানিয়া সুখী হইলাম; কেন না
 ইহাতে বস্তুতঃ-গুরু একটু স্থব হইবার

কথা । বিষয় বিশেষের আলোচনা উপলক্ষে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাগ্রপতি মহাশয়ের বক্তৃতা প্রদানে বোধ হইল যে, “সাহিত্য” ও “বহুমতীর” তেজস্বী সম্পাদক যে কেবল লেখনী বলে বসিয়ায়ান, তাহা নহে, তিনি ওজস্বী বক্তা রূপেও পরিগণিত হইবার অধিকারী । সম্মিলনের নিয়মাবলী পেশ হইলে, অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের পরিচালনের ভার সাহিত্য-পরিষদের উপবর্ত্তী কর্ত্ত করা কর্ত্তব্য । বস্তুতঃ সম্মিলনের এতদিন একটা স্থায়ী ভিত্তি ছিল না, “সম্মিলন” বলিবেই ব্যক্তিবিশেষের উপর দৃষ্টি পতিত হইত । এইরূপ ভাবে একটা সম্মিলন বহুকাল চালাতে পারে না । অতএব সাহিত্য-পরিষদ যে এই ভার গ্রহণ করিতে-ছেন, ইহা অতিশয় আনন্দের কথা । অস্থায়ন করিয়া দেবিত্তে গেলে সম্মিলন যে সকল ব্যক্তির চেষ্টি ও ঘরে এতাবৎকাল পরিচালিত হইয়া আসিতেছে, তাহার সকলেই সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে দৃঢ়দৃঢ়, এমন কি, সমবেত সাহিত্যিকবর্গের প্রায় সকলেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বা তদীয় শাখা প্রশাখার সভ্য-শ্রেণী ভুক্ত । এগুন আশা হয়, এই সম্মিলন বর্ষে বর্ষে অব্যাহতভাবে থাকিবে—যদি দৈবাৎ কোনও বর্ষে মফঃস্বলে আহুত না হয়, তাহা হইলে সাহিত্যপরিষদ অন্যায়সে কেন্দ্র-ভূমি কলিকাতায় সম্মিলনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন ।

পরদিন সরস্বতী পূজা—ঐ দিন হিন্দু সাধারণ বিশেষতঃ ষাঁহার “লেখনী-পুস্তক” সম্বন্ধে স্পর্কিত, লেখাপড়ার কাজ হইতে বিরত থাকেন ; অন্ততঃ মধ্যাহ্নে পুষ্পাঞ্জলি দিবার ধরে অপূরাহ্নে পঠন বা লিখনেই কার্য্য করণী করেন না । সম্মিলনে ষাঁহার উপ-

স্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু হইলেও, এই সনাতন রীতির মর্যাদা রক্ষা করা ইহঁদের নাই । ফলতঃ, ঐ দিন অন্ততঃ অপরাহ্নে প্রবন্ধ পাঠাদি সভার কার্য্য বন্ধ রাখিয়া প্রদর্শনীর দ্রব্যজাত সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই শোভন হইত ।

সোমবার দিবস পূর্বাহ্নে ৮ টায় সভার কার্য্য আরম্ভ হইল । শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বক্তৃক উপস্থাপিত কয়েকটা প্রস্তাব দ্বারা ভাগলপুত্রসিগণের উপর সাহিত্য-বিষয়ক উপকরণ সংগ্রহ-কল্পে ভারপণ করা হইল । তৎপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় একটা সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা ৩৭মশেচন্দ্র দত্তের স্মৃতিরক্ষার্থ সারস্বত-ভবন নিম্নাণেব প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নৈত্রৈয় মহাশয় স্থায় স্বতাবস্থলত সরগভাষায় উহার সমর্থন করিলেন ; প্রস্তাব সর্বসম্মতিতে গৃহীত হইল । অতঃপর আরও কয়েকটা প্রস্তাব উপস্থাপিত, সমর্থিত ও গৃহীত হইলে পর বিজ্ঞানবিষয়ক কতিপয় প্রবন্ধ পাঠান্তে মধ্যাহ্ন ক্রিয়া নিবৃত্ত সভাবিবেশন কিংবৎসময়ের জন্ত স্থগিত হইল ।

অপরাহ্নে তিনটার পর আবান সম্মিলনের কার্য্য চলিতে লাগিল । এইবার ইতিহাস-বিষয়ক কতিপয় প্রবন্ধ পাঠ হইল । ‘প্রসিদ্ধ তিব্বত-পর্যটক রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি-আই-ই মহোদয় তাঁহার ভ্রমণ বিবরণ বিষয়ে কিয়ৎক্ষণ বক্তৃতা করেন এবং লাসানগরীর যে প্রকাণ্ড বাড়ীতে তিনি অবস্থান করিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহার মানচিত্র এবং কতিপয় বৌদ্ধগ্রন্থ সভাস্থলে প্রদর্শন করেন ।*

* আশ্চর্যের বিষয় এই যে ‘বেঙ্গলি’ প্রভৃতি পত্রে কিম্বা ‘বহুমতী’তে সম্মিলনের যে কার্য্যবিবরণী প্রকা-

ভাঙ্গের পব সাহিত্যিকবর্গের কটো তোলা হইয়াছিল; কিন্তু তাঁড়াতাড়ি কবাবে এবিষয়ে তেমন সূক্ষ্মালামতে কাজ হইতে পারে নাই।

পরদিন সম্মিলনের কার্য্য প্রসঙ্গে ৮১ হইতে প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত হইয়া পরিসমাপ্ত হয়। সর্বপ্রথম কৃত্তিবাসের স্মৃতিবিস্মার্ত্ত সঙ্গীত কবিরাব জন্ত এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৮২পব সাহিত্য বিষয়ক অনেকগুলি পবন্ধ এবং প্রবন্ধের সাবাংশ সভাস্থলে পাঠিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বদীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের “বর্ণনামান অসি-যোগ্য” এস্থানে সফাগ্রে স্মরণযোগ্য; এহ প্রবন্ধের আদ্যোপান্ত সবস বাকাবিজ্ঞাসে সমুচ্ছল ছিল, শ্রোতৃবর্গ অনবসত হাত্তকোলাহলে সভাস্থল মুখাবত কবিবা ইহাব বসাস্বাদন কবিরাব ছিলেন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় শিক্ষা বিষয়ে একটা স্মৃতিখিত প্রবন্ধ পাঠ কবিরাবছিলেন বিস্তৃত গাঠাতে হিন্দু নিকট যাহা পবম পুঙ্খমাণ, তাহা উপেক্ষিত হইয়াছে দেখিয়া এবটু ব্যথিত হইলাম। অতঃপব অনুকল্প হইয়া সাহিত্য-সমিটি শ্রীযুক্ত বদীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটা নাতিহর বক্তৃতা করবেন। বদীন্দ্রনাথের বক্তৃতা সভাস্থ ব্যক্তি সমূহ বৈলাতিবেকহেতুক অধৈর্য্য-চাকল্য পরি-ত্যাগ কবিরাব নীবব নিষ্পন্দ ভাবে শ্রবণ কবিরাবছিলেন। বদীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক

শিত হইয়াছে, তাহাতে ঘৃণাকরেও রাগ বাহাদ্রব শবৎ বাবু নামটা উল্লেখ কবা হয় নাই। অথচ তাহাব জ্ঞান ব্যক্তিব সম্মিলনে যোগদান যে একটা উল্লেখযোগ্য কথা, তাহা বোধ হয় সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিষদিন পবে ‘অমৃতবাজার’ পত্রিকায় ভাঙ্গল-পুর হইতে একখানি প্রেরিত পত্রে শরণ বাবুর কথা লিখিত হইয়াছে।

স্বর-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই যেন শ্রোতৃবর্গের চিত্ত তাহাব দীর্ঘজটিল-বাক্যলহবাব সঙ্গে সঙ্গে গুচ্ছাতরঙ্গে নীচমান তৃণরাজিব জ্ঞান ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বক্তৃতাব কি প্রবল বেগ! এই খবরশ্রোতা: সরস্বতীর অন্তস্তল হইতে ভাব-রত্ন উদ্ধার কবা খুব শক্তিবর শোতার কাজ; বর্ণরূপ ফনোগ্রাফে যিনি সঙ্গ ‘বক্তৃতা’ ধরিয়া বাধিয়া আত্মোপাস্ত বাবংবাব স্মরণ করিতে পাবেন, তিনিই ঈদৃশ বক্তৃতার সম্পূর্ণ মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ বটেন—মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তিব পক্ষে বিহ্বলচিত্তে স্বর-সুগা পান ভিন্ন বিশেষ কিছু লভ্য হইবাব কথা নহে।

সর্বশেষ ধত্তবাদ পর্ব অভিনয়ের পর সম্মিলনের বঙ্গমঞ্চে যবনিকা পতন হইল।

এখন প্রস্তাব প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সমালোচনা আবশ্যক মনে কবিত্তেছি। গত বর্ষে রাজসাহী সম্মিলনের কার্য্য-প্রণালী এই-বাবকার অপেক্ষা যেন অধিকতর সূক্ষ্মাল ছিল। গতবাবে সভাস্থলে যে সকল প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা বিষয়নির্বাহক কমিটিতে আলোচিত হইয়া প্রস্তাবক, সমর্থক, অনুমোদকাদির নাম সহ নির্দিষ্ট হয় এবং পবদিন ঐ গুলি মুদ্রিত হইয়া সভাস্থলে প্রচারিত হয়; সভায় উপস্থিত মত কোনও নূতন প্রস্তাব আদৌ করা হয় নাই। এইবার বিষয় নির্বাচন-কমিটিতে যে সকল প্রস্তাব বিবেচিত হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি সভাপতি মহাশয় কর্তৃক উপস্থাপিত হইবে, স্থির হয়। অগ্রগুলি কে প্রস্তাব করিবেন, কে সমর্থন কবিবেন, ইহাব কোন কথাই হয় নাই। তাবপর সম্মিলনের নিয়মাবলী ঐ কমিটিতে পঠিত হইয়া অনেক তর্ক বিতর্কের পর সংশোধিত হইয়াছিল; কিন্তু সভাস্থলে উহা প্রস্তাব

বিভ' হইল না—কেবল সাহিত্য-পরিষদের উপর একবৎসরের জন্ত ইহাব পবিচালন ভাব অর্পিত হইল, এবং নিয়মাবলী সম্বন্ধে তিন মাস মধ্য মতামত প্রেরণ করিতে সভ্য-দিগকে অনুরোধ করা হয়। অপিচ সভাস্থলে অনেকটা নূতন প্রস্তাবও সৃষ্ট হইয়াছিল। কে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবেন, কে সমর্থন করিবেন, ইহা তৎক্ষণাৎ যাহাকে নিশ্চিতে পাওয়া গেল, ধরিয়া বাধিয়া স্থির করা হইল। ফলে এই হইল যে, কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে ৩৪টা প্রস্তাব উপলক্ষে সভাস্থলে বাবংবার দণ্ডায়মান হইতে হইল—অথচ এতদুপলক্ষে যে অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির সভাস্থ সাহিত্যিকগণের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া একটু পরিচিত হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা হইল না।

সভাস্থলে সৃষ্ট প্রস্তাবাবলীর মধ্যে খুব একটা গুরুতর প্রস্তাবও ছিল—যাহাতে ব্যবহারিক বিজ্ঞানকেও সাহিত্যেব অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। অর্থাৎ ডাক্তার সবকাবের বিজ্ঞান সভা এখন সাহিত্যপরিষদের শাখা ভুক্ত হইতে পারিবে—বেঙ্গল ফার্মাসিউটিকেল ওয়ার্কসও কালে বোধ হয় ইহাব অধিকায়ে আসিবে। এখন সাহিত্যপরিষদে বৈজ্ঞানিকেরই প্রাধান্য, বৈজ্ঞানিকের স্পিচিট লেম্প অনেক জিনিষেরই সম্প্রদায় ঘটাইয়া থাকে, সাহিত্যেবও প্রদায়ন হইতেছে; তবে স্পিচিট লেম্প এইভাবে ক্রিয়া করিতে থাকিলে সম্প্রদায়ের পবে আসেও কিছু ঘটতে পারে—জগদম্বা সাহিত্যকে যেন তাহা হইতে, রক্ষা করেন।

এতদ্বিষয় গতবর্ষের রাজসভা সম্মিলন বিষয়ক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম—অতএব প্রচার বেলী কিছু বলা বালো। আমাদের দেশে বোধহয় কল্পার সংখ্যা কম

হওয়াতেই কর্ম বিভাগ নাই। যিনি বিজ্ঞান চর্চা করেন, তিনি সমাজ ধর্ম সম্বন্ধেও কথা বলেন; যিনি কবিতা লেখেন, তিনি রাজনীতিবও ধার ধারেন। সাহিত্যেবও তাই, শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি অবাস্তব বিষয়ের ধর রাখিতে হইতেছে। যদি এই সমস্ত লইয়া সাহিত্যপরিষদ ও সম্মিলন প্রকৃত কার্য করিতে পারেন, তবে ভালই—তখন বৎ "সাহিত্য" শব্দটী নূতন অর্থ অবনত মস্তকে মানিয়া নাইব। কিন্তু কার্যেব গণ্ডী বাড়াইয়া কার্য দেবাইতে পারা যাহবে কি? গ্রন্থ সংগ্রহ, গ্রন্থ প্রকাশ, পরিভাষা সংকলন প্রভৃতি বিষয় যে পাবনদ পর্যন্ত কার্য করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা ও বোধ হয় না। যাউক অলমতি বিস্তবেন।

ভাগলপুর সাহিত্য সম্মিলন বেশ সমাবেশে সম্পন্ন হইয়া গেল। এত অধিক সংখ্যক সাহিত্যিক পূর্বে ছই অবিশেষে সমবেত হন নাই। বঙ্গের বহির্ভূত স্থানে হইলেও ভাগলপুরে বাঙ্গালীর সংখ্যা মন্দ নহে—আবার বড় স্তরের বিষয়, বিহানবাসী ভদ্রলোকগণও এত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের কার্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। এমন কি, যে সকল সুবক স্বেচ্ছাসেবকের কার্য করিয়া সাহিত্যিকবর্গের অশেষ ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক বিহানী ছিলেন। ইহা বাস্তবিক বড়ই প্লাবন কথা—সম্মিলন যথার্থই বাঙ্গালী ও বিহারীয় সম্মিলনে সাধক-নাম * হইয়াছে।

এইরূপ সাহিত্য সম্মিলনে যাহাতে আরও অধিক পরিমাণে সাহিত্যিকবর্গের অধিষ্ঠান হয়, ওদ্বয় উপায় বিধান আবশ্যক।

• রাজনীতিক সম্মিলনের যেমন তিনটি স্তর আছে,—নেশনল কংগ্রেস, প্রতিনিধিয়েল কন্ফারেন্স ও ভিক্টরী এসোসিয়েশন; সাহিত্য বিভাগেও সেইরূপ আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনকে কংগ্রেস স্থানীয় কবিলে। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন কন্ফারেন্স স্থলবর্তী হইতে পারে। প্রীট ও ময়মনসিংহ ভিলাব সাহিত্যকর্ণেবও বৈঠক হইয়াছিল। কিন্তু “উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন” এতদ্বিধয়ে একাকা। আনাব বোধ হয়, বাঙ্গাসাহী বিভাগ, কোচবিহাব ও বঙ্গ-পুত্র উপত্যকা (আনাম) ল-বা যেনন “উত্তর-সাহিত্য সম্মিলন” গঠিত হইতে পারে। নেটকর্ণ, ঢাকা, চট্টগাম ও মধ্য উপত্যকা (শ্রীট-কাতাত) লটরা “পূর্ববঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন” গঠিত হইতে পারে। এবং প্রেসিডেন্স ও বঙ্গবান বিভাগ, বিমান, উড়িয়া ও গোটাগ-পুত্র লহনা “পশ্চিম বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন” গঠন কবা বাহতে পারে। * উত্তর বঙ্গ যেমন সাহিত্য পরিষদের বঙ্গপুত্র শাখা নেতৃপদ গ্রহণ করিয়াছেন, পূর্ববঙ্গ পরিষদের শাখা এবং পশ্চিম বঙ্গ বঙ্গবান শাখা নেতা হইতে পাবেন। মুন পবন অবশ্যই স্বাধীনপে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ভার গ্রহণ করি-

বেন। এবং উহারই তত্ত্বাবধানে পরি-উল্লিখিত তিন সম্মিলনের কার্য্য হইবে। অপিচ প্রতি জেলার বাহাতে সাহিত্যপরিষদের শাখা স্থাপিত হইয়া মধ্যে মধ্যে উহার উদ্দেশ্যে জেলার সাহিত্যকর্ণ একত্র মিলিত হন, তাহারও বিধান কবা আবশ্যক।

এইরূপ হইলে যে একটা সাহিত্যের বিভাগ। তরঙ্গ সমগ্র যুক্ত বঙ্গকে আলোড়িত কবিবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ভাগল-পুত্র সম্মিলনে সমাগত সাহিত্যিক বর্গ হইতে, কানকাতা হইতে আগত ব্যক্তিদিগকে বাদ দিলে, উত্তর বঙ্গায়গণের সংখ্যাই নূর্য্যাপেক্ষা অধিক ছিল; রাজসাহী বিভাগ ও বঙ্গবান বিভাগ উভয়ই ভাগলপুরের সংলগ্ন, কিন্তু রাজসাহী বিভাগ হইতে অভাগিত সংখ্যা বোধহয় বঙ্গবান। বিভাগ হইতে সমাগত সাহিত্যিকের সংখ্যার দণ্ডগুণ অধিক হইবে। “উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন” ব ফলে এইরূপ ঘটিল। ফলতঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের উন্নতি ও পরিষ্টি সাধন কবিতে হইলে প্রস্তাবিত পদ্ধতিই বোধ হয় সমীচীন হইবে। আশা করি, এহু বিষয়টা বঙ্গের সাহিত্যিকরা মনোদায়গণ প্রণিধান করিয়া দেখিবেন।

শ্রীপদ্মনাথ দেব শর্মা।

• ভাস্কর্য্য । (২)

এইক্ষেণে দাসাখ্য গ্রহণের বিবরণ বিবৃত করি গেছি।
সংক্রান্তে কলৌষোবে বৌদ্ধধর্ম্মঃ স্পদ্বিষাম্।
অধিকৃত্য খিলানুদেশান্ কান্যাবলম্বিনা হিতঃ।
বঙ্গজকর্ম্মরকা।

* বিহাবকে উত্তর বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হইতে পারে, তাহা হইলে বোধ হয় তিনটি বিভাগই আর সমান পরিমাণের হইবে।

অর্থাৎ তৎকালে দেবতাবিষেবী বৌদ্ধধর্ম্ম, কান্যকুব্জ ব্যতীত, সমগ্র ভারত অধিকার করিয়াছিল।

সেই কারণে

যজ্ঞার্থং ব্রাহ্মণাঃ পঞ্চ তথা কার্য্যহা পঞ্চকাতাঃ।
ভূপাশ্রয় সমানীতা দেশাং কৌলকসংজ্ঞকাতাঃ।
বঙ্গজকর্ম্মরকা।

কর্ণাধি আদিশুর কোলক দেশ হইতে
যজ্ঞার্থে ৫ জন ব্রাহ্মণ ও ৫ জন কায়স্থ আনয়ন
করিয়াছিলেন। আদিশুর কান্যকূজে যে
পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা বজ্রকায়িকাতে
এই ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

সুস্কৃতসুস্কৃতসংহাঃ সর্বশাস্ত্রার্থদক্ষা ।

লপিত হত বিপক্ষাঃ স্তুতিবাক্যাঃ স্তুতিজ্ঞাঃ ॥

সুজিত সুগত বুদ্ধে গোড় রাজ্যে মদীয়ে ।

বিজকুলবরজাতাঃ সান্নকম্পাঃ প্রয়াস্ত ॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, অল্পগ্রহ পূর্বক
সর্বশাস্ত্রার্থে দক্ষ, বিপক্ষ পরাজয়ে সমর্থ,
স্তুতিজ্ঞ বিজকুল-সুস্কৃত বিজ পাঠাইবেন।
কবিত্ব শালিবাহন ধৃত বচনে প্রকাশ আছে,
গোড়েশ্বরে মহারাজো রাজস্বয়মুত্তিতঃ ।

তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞ উপযুক্তা বিজাদশ ॥

শেষোক্ত শ্লোকদ্বয়ে “লপিতহতাবিপক্ষাঃ”
ও “উপযুক্তা বিজাদশ” বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট
প্রতীয়মান হইতেছে, ৫ জন সাধিক ব্রাহ্মণ ও
৫ জন কায়স্থ কলিত্র যজ্ঞ প্রয়োজন হওয়াতে
তাঁহারা বঙ্গ আসিয়াছিলেন। এস্থলে প্রশ্ন
হইতে পারে, আদিশুর যে অশ্বমেধ অথবা
পুস্ত্রৈষি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহাতে কলিত্রের
কি প্রয়োজন ছিল, কারণ সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ-
গণ দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদিত হয়। অশ্বমেধাদি
যজ্ঞ তিন ভাগে বিভক্ত যথা, প্রাতঃসবন,
মাধ্যান্নসবন, ও তৃতীয়সবন। এই সবনে
অর্থাৎ যজ্ঞে ৮টা বরণ হইয়া থাকে যথা, ব্রহ্মা,
হোতা, তত্ত্বধার, ও সদস্য এবং অতিরিক্ত
একজন স্তুতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ, এই ৪ জনের সাহা-
য্যার্থে মোট ৫ জন ব্রাহ্মণের আবশ্যক।
ভৃগুদেবী, স্তুতি, ঋদ্ধি, ও পুণ্যাহ, এই ৪টা
বরণের জন্য ৪ জন সুদক্ষ কলিত্র, ও যজ্ঞ
সুকার্য্য হইবে, একজন কলিত্র এই ৫ জন
কলিত্রের প্রয়োজন হয়, তজ্জন্য আদিশুর

দশ জন বিজ কান্যকূজ হইতে আনিয়া-
ছিলেন। * কানোজ হইতে মালদার নিকট
গোঁড় বুদ্ধে আসিতে হইলে তৎকালে নানা
উপদ্রব পূর্ণ স্থাপদসকল অতি দীর্ঘ পথ
অতিক্রম করিতে হইত, তজ্জন্য তাঁহারা
সাময়িক বেশে একটা “পতিবৃহ” রচনা
করিয়া আসিয়াছিলেন। ঐবানন্দ বলেন—

গজাখননরযানেষু প্রধানা অতি সংস্থিতাঃ ।

গোধানারোহিণো বিপ্রাঃ পতিবেশ সমস্থিতাঃ ॥

তৎকালে কায়স্থের ক্ষত্রিয় সমালোচনার
বিষয় ছিল না, কারণ তাঁহারা সকলেই
সোপবাত ছিলেন, তথাপি এই সকল পুরা-
তন কারিকা পাঠ করিলে কায়স্থের ক্ষত্রিয়
যেন স্বতঃসিদ্ধ হইয়া পড়ে। উপরোক্ত
শ্লোকে “প্রধানা” ও “পতি” শব্দের দ্বারা
সমাগত ৫ জন কায়স্থের ক্ষত্রিয় সিদ্ধ হই-
তেছে। পতি শব্দটী সকল অবস্থায় ক্ষত্রিয়
বাজক পুংলিঙ্গে বীৰ পদাতিক, ও স্ত্রীলিঙ্গে
সেনা বিশেষ। “একেটৈকরথাত্মা পতিঃ
পঞ্চপদাতিক।” ইত্যমরঃ। ৫টা পদাতিক,
একজন প্রজাবোহী, একজন রথী ও ৩ জন
অশ্বারোহী দ্বারা “পতিবৃহের সমাবেশ হইত।
এই পত্তিতে প্রধানা (officers of the regi-
ment) ছিলেন, পঞ্চ কায়স্থ। তাঁহারা গঞ্জে
অশ্ব ও নরযানে ও ৫ জন ব্রাহ্মণ পদাতিক
বেশে গোযানে আসিয়াছিলেন। বিজ
বাচস্পতি মিশ্রের দক্ষিণ রাষ্ট্রীয় কুলগ্রন্থে
লিখিত আছে—

* গোযানেনাগতা বিপ্রা অশ্বঘোষাদিকল্পয়ঃ ।

গঞ্জে দত্ত কুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃস্থধীঃ ॥

* ইংরেজ জাতির অভ্যুদয় কালে নবদ্বীপাধি-
পতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, যে একটা যজ্ঞ করিয়াছিলেন,
তৎসম্বন্ধে ক্ষিতীশবংশাবগীতে লিখিত আছে—
অগ্নিহোত্র মহাবজ্ঞে কায়স্থান্ কলিত্রাসনে ।
ববার শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপাধিপত্নয়ীঃ ।

• দক্ষিণ রাষ্ট্রীয় কুলপঞ্জিকার লিখিত আছে—
বসিতে আসন দিলা গোড়ের ঈশ্বর ।

ক্ষত্রোচিত নতি কৈলা সৎ কায়স্থ-ব্রাহ্মণ
পঞ্চের প্রভায় সন্না হইল উজ্জল ।

• তেজঃপুঞ্জ বিজ্ঞ পঞ্চ বিপ্রের সম্মল ॥

কুলপঞ্জিকা হইতে আর অধিক উদ্ধৃত
করিলে প্রবন্ধ বাড়িয়া যায় । কুলাচার্য্যগণ মধ্যে
দেবীবর পঞ্চ কায়স্থকে শূদ্র বলিয়াছেন ।

ইহা কেবল বিবেচ্য বশতঃ । যে দেবীবর
স্বৈচ্ছ্যাচারের বশবর্তী হইয়া অনেক ব্রাহ্মণের
সম্বন্ধে ষড়্গাহত হইয়াছিলেন, তিনি স্মার্ত্ত
• শিরোমণির ডিক্রীর বিরুদ্ধে কায়স্থকে ক্ষত্রিয়
বলিবেন, তাহা কখনই সম্ভবপর হয় না ।

এই দেবীবর রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগের দ্বৈল
স্থাপক । তিনি ব্রাহ্মণদিগের কুলপঞ্জিকাস্থ
বিবৃত করিবার সময়ে কায়স্থদিগের কায়স্থ-
দিগের বিবরণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ।
তিনি প্রভাকরের বংশকে নিম্নলিখিত বলিয়া বর্ণন
করেন—

ডেকে বলে দেবীবর,

নিম্নলিখিত প্রভাকর ।

নিম্নলিখিত অপদস্থ হইয়া প্রভাকর ও দেবী
বরকে অভিসম্পাত করিলেন—

• ডেকে বলে প্রভাকর,

নির্ম্মাণ দেবীবর ।

ব্রাহ্মণগণের পণ্ডিত্যর অস্তে ভট্টনারায়ণ,
যিনি আদিশূরের বজ্রে হোতা হন, কায়স্থ
পঞ্চের পণ্ডিত্য দিয়াছিলেন । সেই সমস্ত
পণ্ডিত্য এখানে কীর্ত্তন করিলে প্রবন্ধ অতি
দীর্ঘ হয় । মকরন্দ ঘোষ ভট্টনারায়ণের, দশরথ
বসু দক্ষের, বিরাট গুহ ত্রিহুর্দার, ও কালি-
দাস মিত্র ছান্দড়ের শিষ্য ও সেবক বলিয়া
নিজ নিজ পণ্ডিত্য দিয়াছিলেন । কেহ কেহ
বলেন যে, পুরুষোত্তম দত্তের গুরুদেব, কান্য-

কুজ হইতে আসেন নাই, তজ্জন্ত তিনি
বলিয়াছিলেন—

“এতদ্বাং রক্ষণার্থায় আগতোহস্মিত্ত্বাংলয়ে ।”

অর্থাৎ সকলকে রক্ষা করিবার জন্য আমি
এখানে আসিয়াছি । দেবীবর বলেন, কালি-
দাস মিত্র বেদগর্ভের দাস, তিনি “শিষ্য” শব্দ
আদৌ ব্যবহার করেন নাই, এবং পুরুষোত্তম
দত্ত ছান্দড়ের দাস হইয়াও তাহা স্বীকার
করেন নাই । তিনি বলিয়াছিলেন—

বাৎস্য গোত্রেষু সমুত্তমছান্দড়শ্চৈত্ সংজ্ঞিতঃ ।

মৌদগল্য গোত্রজোদত্ত পুরুষোত্তম সংজ্ঞকঃ ।

এতদ্বাং রক্ষণার্থায় আগতোহস্মিত্ত্বাংলয়ে ।

দেবীবর ।

অর্থাৎ বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড়মুনি, মৌদগল্য
গোত্রীয় আমি পুরুষোত্তম দত্ত ইহাদিগকে
রক্ষা করিতে আপনাদের (আদিশূরের) গৃহে
আসিয়াছি । যদি দেবীবরের এই কথা সত্য
হয়, তবে অবস্থানসারে ও তাত্‌কালিক ব্যব-
স্থানসারে পুরুষোত্তম দত্ত মহাশয় নিজের
গুরুদেবের প্রতি অসম্মানজনিত গুরুতর অপ-
রাধে অপরাধী হইয়াছিলেন । আদিশূর বহু
অর্থ ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়া অতি দূরদেশ
হইতে ৫ জন সামিক ক্রতিজ্ঞ ঘোষী মহা-
পুরুষদিগকে রাজস্ব যজ্ঞ সম্পাদন করিতে
নিজ সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহা-
দিগের প্রতি কোনও প্রকার অসম্মান রাজার
নিকট, সভাস্থ সকলের নিকট অসম্ভব হইবে,
আশ্চর্য্য কি ? এবং পুরুষোত্তম দত্তের এই
কার্য্য কি প্রশংসার হইয়াছিল ? কথিত আছে,
এই ৫ জন ব্রাহ্মণ আদিশূরের প্রাসাদের
সম্মুখে আসিয়া তাহাদিগের আশীর্বাদ
নির্ম্মাণ্য গুরু মন্ত্র কাঠোপারি রাখিলে ঐ কষ্ট
সম্মুখ হইয়া কল ও পুষ্প সংযুক্ত হইয়াছিল ।
এতদ্বশনে রাজার শরীর কাঁপিতে লাগিল ।

তদা কাঠং সজীবং ত্রাংকলপনবসংযুতম্ ।

ইতিদৃষ্ট্ব নৃপস্তমিন্ কল্মাষিত কলেবরঃ ॥

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষিত ইংরেজী বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের যুবকদল এই সমস্ত কথা অতি-
সজ্জিত মনে করিয়া হাস্যমুখাভব করিতে
পারেন । ফলতঃ বাহাদিগের যোগবল নাই,
তাহারা যোগপ্রসূত অদ্ভুত কার্য্যবিবরণ পাঠে
শংশয়চিত্ত হইবেন, আশ্চর্য্য কি ?

বঙ্গীয় কায়স্থবীজ পুরুষগণের যে পরিচয়
বৃত্তান্ত আমরা বিবৃত করিলাম, তাহা হইতে
পাঠকবৃন্দ দেখিবেন যে, তাহারা যে অবস্থায়
ব্রাহ্মণগণের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন,
তাহাতে অন্তরূপ ব্যবহার করিলে তাঁহাদিগের
মজ্জনাত্মা, বেদোপদেষ্টা ও আচার্য্যগণের প্রতি
অবমাননা করা হইত । পুরুষোত্তম দত্ত মহা-
শয় সত্তার যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে
তাঁহাকে আমরা প্রশংসা করিতে পারি না,
কারণ তিনি সভামধ্যে মহর্ষি ভট্টনারায়ণকে
উপেক্ষা করিয়া নিজেই তাঁহার পরিচয় দিয়া-
ছিলেন । সে পরিচয়ে ব্রাহ্মণের প্রতি অব-
মানন্য প্রদর্শিত হয় । সেই প্রাচীন কালে
মকরন্দ ঘোষ, কালিদাস মিত্র, দশরথ বসু ও
বিরাট গুহ তাঁহাদিগের মজ্জনাত্মাদিগের প্রতি
যে অহুপম ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া-
ছিলেন, তাহার শতাংশের একাংশও ব্রাহ্ম-
ণের অবনতির বর্ত্তমান যুগে আমরা অহুতব
করিতে পারি না । পুরুষোত্তম দত্ত সত্য
কথাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পরিচয়ে
ধিনয়-গুণের অভাব ছিল । পক্ষান্তরে তাঁহার
সহযোগিগণ ধিনয়-গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন
করিয়া সকলেমনিকট সম্মানিত হইয়াছিলেন ।
তাঁহারা নিম্নোক্ত কোনও প্রকার প্রলো-
ভনে আকৃষ্ট না-হইয়া কেবল সন্মান প্রদর্শন
করিবার জন্যই ব্রাহ্মণের ভূতাত্ত্ব স্বীকার

করিয়াছিলেন । যদি পুরুষোত্তম দত্ত অন্ত-
রূপ ব্যবহার না করিতেন ও তাঁহার বংশ-
ধর্ম্মের এই বৃষ্টতা অন্ত পরবর্ত্তী কালে দণ্ডিত
না হইতেন, তবে এই সামান্য ঘটনাটী ইতি-
হাস মধ্যে স্থান পাইত না । ধীরেন্দ্র বাবুর
“দাসাখ্য” গ্রন্থ করতঃ শূদ্রত্ব বরণ উক্তি
সর্ব্বৈব মিথ্যা, কারণ তৎকালে কায়স্থবীজ-
পুরুষগণ সকলেই সোপবীত ক্ষত্রিয় ছিলেন,
শূদ্রত্ব বরণ তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব ।
যে সময়ের কথা আমরা কীর্ত্তন করিতেছি,
তৎকালে সমগ্র ক্ষত্রিয় সমাজ ব্রাহ্মণের দাসত্ব
স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না । ফলতঃ
ব্রাহ্মণের শাস্ত্রানুযোদিত দাসই ক্ষত্রিয়, কারণ
শূদ্র অস্পৃষ্ট, ব্রাহ্মণের গাত্র স্পর্শাদি দ্বারা সেবা
করিতে পারিত না । আমরা পুরাণে পাঠ
করি—

“বিপ্রশ্চ কিকরোচ্ছৃপোদৈবশ্রুতপশ্চ কিকর ।”

ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণ, গণেশখণ্ড ।

পুরাকালে ভূতাত্ত্ব অথবা দাসোপাধি,
ব্রাহ্মণভক্তি ও রাজকীয় পদের পরিচায়ক
ছিল । গুরুত্ব পুরাণে পূর্ব্বখণ্ড ১১২ অধ্যায়ে
আমরা দেখিতে পাইব, সৈন্যধ্যক্ষ, ধর্ম্মাধ্যক্ষ,
লেখক, এমন কি রাজপুরোহিত পর্য্যন্ত দাস
বা ভূতাপদ বাচী ছিলেন । যুদ্ধিরের রাজ-
ত্ব যজ্ঞে অরং পূর্ণব্রহ্ম ত্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণদিগের
পদসেবার নিযুক্ত হন ।

“সত্যং শুশ্রবণে জিহ্বাঃ কৃষ্ণাঃ পাদাবনজনে ।”

ভাগবত ১০ম স্কন্ধে ৭৫ অঃ ৫ম শ্লোক ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সাধুদিগের শুশ্রবায় অর্জুন
ও পদসেবার ভগবান ত্রীকৃষ্ণ নিযুক্ত হই-
লেন ।

ধীরেন্দ্র বাবুর উক্তি “বাহা কর্ণদোষে
গিমাছে, তাহা গুণকর্ণে লাভ করিতে হইবে”
ইহা সত্য কারণ বোধবিপ্লবে ব্রাহ্মণদিগের

লব্ধান রক্ষা করিতে কার্যসংগণ অলোক সম্ভা-
টের সময় হইতে লক্ষণসেনের সময় পর্যন্ত
শতেনঃ শতেনঃ যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন,
অন্তকের শিখার স্তার হুজ একদিনে কার্যসং-
গণের স্বরূপে হইতে অন্তর্হিত হয় নাই,
হুজ তিরোধানের সময় আনুমানিক ১৪০০
বৎসর। এই স্মরণীয় কালের মধ্যে অত্যাচার,
বিভ্রম ও বিজ্ঞপন সহ করিতে না পারিয়া
জ্ঞানগণের স্তার কার্যসংগণ হুজ পরিত্যাগ করি-
য়াছিলেন। বৈদিকী দীক্ষার স্থলে তাত্ত্বিকী
দীক্ষা গ্রহণ করতঃ অনেক কার্যসংগণ
তাহাদিগের দ্বিজত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন।
কিন্তু যজ্ঞোপবীত ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে শূদ্রাচার
তাহাদিগের অঙ্গের ভূষণ হইয়াছিল। প্রবা-
নন্দ তাৎকালিক অবস্থা এই প্রকারে চিত্রিত
করিয়াছেন—

ততঃকালেগতে চাপি আগমাদীক্ষিতাভবন্ ।

আগমোক্তবিধানেন পূতা কার্যসংগণাঃ ॥

তাত্ত্বিকান্তে সমাখ্যাতস্তত্ত্বানামপি পারগাঃ ।

তথাহিশূদ্র ধর্ম্মাভ্যেখ্যাতাচক্রতিশাসনাৎ ॥

অর্থাৎ—অনেক দিবস হুজত্যাগের পর
গত হইলে কার্যসংগণ তত্ত্বজ্ঞানের বিধানানু-
সারে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাপি
বৈদিকী আচার পরিত্যাগ করায় শূদ্রাচার
তাহাদিগকে কলঙ্কিত করিয়াছিল।

বকীয়া কার্যসংগণ জাতি নিঃসন্দেহে শূদ্র নহে,
তবে যে শূদ্রাচার তাহাদিগকে আক্রমণ
করিয়াছে, তাহার এক মাত্র কারণ যজ্ঞোপ-
বীত ত্যাগ। তাত্ত্বিকাচার গ্রহণ করিয়া
আমাদের পূর্ব পুরুষগণ দ্বিজত্বের এক মাত্র
চিহ্ন যজ্ঞহুজ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই
শূদ্রাচার 'অর্থাৎ ব্রাত্য' প্রারম্ভিত দ্বারা
পরিহার করিয়া কার্যসংগণ বর্তমান সময় যথা
শাস্ত্র উপনীত হইতছেন।

কৌলীন্য'মর্ঘালা সযজ্ঞে কথঞ্চিৎ সন্তো-
চনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।
বল্লালের সময় গুণ কর্ম্মানুসারে কুল বন্ধন
হয়। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজ বল্লাল সেন
সযজ্ঞে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, তিনি বৈজ্ঞ
ছিলেন। দেখা যাইতেছে, দুই জন বল্লাল
ছিলেন। কার্যসংগণ—কল্পিত সেন যৎ-সমুদ
বল্লাল, যিনি ব্রাহ্মণ ও কার্যসংগণের কুল বন্ধন
করেন, তাহার শেষ জীবনে দান সাগর
নামক একখানি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন
করেন। তাহাতে লিখিত আছে

লিখিল চক্র তিলক শ্রীমদ্ বল্লাল সেনেন
পূর্ণে ।

নবশশী দশমিতে শকাব্দে দানসাগোর
রচিতঃ ॥

অর্থাৎ ১০৯১ শকে বা ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দে
"দানসাগর" গ্রন্থ রচিত হয়। বৈজ্ঞ বল্লালের
শিক্ষক গোপাল ভট্ট "বল্লাল চরিত" নামক
একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে লিখিত
আছে—

বৈজ্ঞবংশাবতঃসোহম্ বল্লাগ নৃপ পূর্ববঃ ।

তদাজ্ঞয়া কৃতমিদং বল্লাল চরিতং শুভম্ ॥

গোপাল ভট্ট নাম্না চ তদ্রাজ শিক্ষকেন চ ।

অন্ধ্ররাজজমানে বহুভিব্যতৈরধিক শাকেশু ॥

"বল্লাল চরিত" ১৩০০ শকে অর্থাৎ ১৩৭৮
খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ইহাতে স্পষ্টতঃ দেখা
যাইতেছে যে, কার্যসংগণ বল্লাল দ্বৈত বল্লালের
আনুমানিক ২১০ বৎসর পূর্বে অবতীর্ণ হইয়া-
ছিলেন। কুল বন্ধন সযজ্ঞে প্রবানন্দ মিশের
গোড় বংশাবলি হইতে নিম্নলিখিত, স্রোত স্রলি
উদ্ধৃত করিলাম—

"শিষ্টাচার পরিত্যক্তা বায়েজ্ঞা বদ্রাচর্য্যকাঃ ।
আর্য্যভার্য্যে তথা দৃষ্টো সৈব' তদ্বাতি
কন্তুঃ ॥

তথা কুলভেদং নাতি সৰ্ব্বং ভুল্যাইবা ভবন্ ।
চকার ভূপ বহ্নে ন কুল শাস্ত্রং নিরুপনম্ ॥

আচার্যো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ ভ্রমণম্ ।
নিষ্ঠাবৃদ্ধি স্তম্ভোদানং নবধা কুল লক্ষণম্ ॥

নবগুণৈস্ত সংযুক্তাঃ কুলীনো দেবতা স্বরূপ ।
মকরন্দ দশরথো কালিদাসো বিরাটকঃ ।
এতেষাঞ্চ স্মৃতা সৰ্ব্বৈ অভবন্ কুলীনা বরাঃ ॥
দত্ত বংশ সনুভূতো নারায়ণো মহা কৃতীঃ ।
চকার সনুপতিস্বং নিরুপং বিনয়াকীনম্ ॥

অর্থাৎ—বল্লাল নৃপাত খারেল্ল, বঙ্গল, ও
রাষ্ট্রীয় কায়স্থ সমাজের শোচনীয় অবস্থা
লক্ষণ করিয়া যজ্ঞ পূর্বক তাঁহাদিগের কুল-
বন্ধন করিলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের
মধ্যে কে আৰ্য্য, কেই বা অনাৰ্য্য, তাহার
পার্থক্য ছিল না। আচার্যাদি নবগুণ সংযুক্ত
ব্যক্তি কুলীন হইলেন। তাহার স্বয়ং দেবতা
স্বরূপ। মকরন্দ ঘোষাদি কুলীন হইলেন,
পুরুবোত্তমের বংশধর নারায়ণ দত্ত তাঁহার
পূর্ব পুরুষের বিনয় গুণের অভাব বশতঃ
কুলীন হইলেন না।

নবধা গুণ সংপ্রাপ্তাঃ সৰ্ব্বৈ আৰ্য্য বিসঙ্গকাঃ ।
কিক্রিত গুণ বিহীনা যে মধ্যল্য মধ্যমা স্মৃতাঃ ।
এতেভ্যঃ গুণহীনা যে মহাপাত্মা প্রকৃতিভাঃ ।
অশ্লাশ্চবরা যস্মাৎ কুলকর্ম বিবর্জিতাঃ ॥
ব্রাত্যায়ান্ কায়স্থাজ্ঞাতাঃ করণাশ্চ প্রকীৰ্ত্তিতা,
কায়স্থ্যে শূদ্র ভাৰ্য্যায়ান্ জাতো ডেকর
সংজ্ঞকঃ ॥

কায়স্থ্যে গুণবতো দাসা ডেকর সংজ্ঞকাঃ ।
ভেদপি শূদ্রা সমখ্যাতঃ সেবারুতি সমম্বিতাঃ ॥
অর্থাৎ বাঁহারা নবগুণ বৃদ্ধ, তাঁহারা মোর্ধ্য,
ভাৰ্য্য হইতে কিক্রিত গুণ হীন বাঁহারা মধ্যল্য,
ভাৰ্য্য হইতে আরো গুণ হীন বাঁহারা, তাঁহারা

মহাপাত্ম হইলেন। বাঁহাদিগের কুলকর্ম
ছিল না, তাঁহারা অশ্লা হইলেন। ব্রাত্য
অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত হীন বংশে কায়স্থ কল্লার
গর্ভজাত সন্তান করণ উপাধি পাইলেন, শূদ্র
স্ত্রীর গর্ভে কায়স্থের গুণে কে সন্তান হইল,
তাঁহার উপাধি ডেকর হইল। ইহারই
সেবাস্থর্ম সম্বিত শূদ্র জাতি।

এই বিবরণ হইতে প্রতীকমান হইতেছে
যে, তৎকালে কুলীন, মধ্যল্য ও মহাপাত্মের
যজ্ঞোপবীত ছিল। বাঁহাদিগের যজ্ঞোপবীত
ছিল না, অর্থাৎ বাঁহারা ব্রাত্য, তাঁহাদের
সমক্ষে বল্লাল অস্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এইক্ষণ ধীরেন্দ্র বাবু দেখিলেন যে, শূদ্র
কোন্ জাতি। কায়স্থ কখনই শূদ্র ছিলেন
না ও শূদ্রত্ব বরণ করেন নাই। যে সকল
ঐতিহাসিক তত্ত্ব আনন্দা গিপিৎক কবিতাম,
বোধ হয় তাহাতে শিবেন্দ্র বাবু এবং তৎসঙ্গ
ব্যক্তির ব্রাহ্ম ধারণা অপনীত হইবেক। যে
জাতির মধ্যে অগ্নির সত্য কথা পর্য্যন্ত নিষেধ,
তাঁহার অন্তর্ভুক্ত একজন শিক্ষাভিমাত্রী
ব্যক্তির পক্ষে অগ্নির অসত্য কথা বোষণা
কতদূর অনায়াস, তাহা নব্যভারতের পাঠকগণ
বিবেচনা করিবেন।

ধীরেন্দ্র বাবু পবিত্র যজ্ঞোপবীতকে এত
গাছি দড়ী বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু
ধর্মক্ষেত্র ভারতে এই দড়ীর মাহাত্ম্য স্বয়ং
বিধাতাও কীর্ত্তন করিতে পারেন নাই।
ইহার স্পষ্ট বন্ধন চারি সহস্র বৎসরের ধর্ম-
বিলম্ব মধ্যে হিন্দু জাতি তিষ্ঠিয়া রহিয়াছে,
নচেৎ এই জাতির পরিণাম কি হইত, কে
জানে। ইহার শক্তি প্রভাবে মাহুয আখ্যা-
ত্বিক অগুণে প্রবেশ করিয়া যে যমস্ত চরমতত্ত্ব
আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহাতেই দেবভার
সৃষ্টি হইয়াছে, আত্মরী অন্ধকারের মধ্যে দৈবী

সম্পদের আলোক দেখা গিয়াছে। হিন্দুর
ব্রহ্মচর্যের ইহাই একমাত্র সফল ও নিদর্শন।
সেই ব্রহ্মচর্য হইতে অগ্নিত হইয়া জ্ঞানের

এত দূর্গতি। আমি জানিনা কবে জানরা
এই ব্রহ্মচর্যবীরের প্রকৃত বাহ্যিক সত্য
রূপে বুঝিতে পারিব।

• শ্রীকালীএসর সরকান্তদেববর্মা।

সাংখ্য সূত্র।

(৪৪৪ পৃষ্ঠার পর)

৫৫। অবিবেক হেতুই এই যোগ
হয়। এজন্য ইহা সমান রূপে হয় না।

পূর্বে ১৮ সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃ-
তির সহিত নিত্য গুণ মূল্যবতাব আত্মার
যোগই বন্ধনকারণ। ৫০ সূত্রে উক্ত হইয়াছে
যে, কর্মাদি চিত্তের—তাহা অত্মকে অর্থাৎ
আত্মাকে বন্ধ করিতে পারে না। এ উভয়
স্থল বিরোধ নাই। কেন না, ইহা হইতে
বুঝা যায় যে, এই চিত্তের ধর্ম দ্বারা আত্মার
বন্ধন—পারমার্থিক নহে, তাহা ঔপাধিক—
অভিমানজ। তাহার মূল অবিবেক। অবি-
বেক হইতেই পুরুষপ্রকৃতি সংযোগ হয়।

সুতরাং যে পুরুষ অবিবেকী, কেবল
তাহারই সহিত প্রকৃতির যোগ হয়। মূল
পুরুষ অবিবেকী নহে। তাহার সহিত প্রকৃ-
তি সংযোগ হয় না। সুতরাং মূল ও বন্ধ
লক্ষণে নিরূপ সমান নহে।

প্রকৃতি পুরুষের অভেদজ্ঞান অবিবেক
নহে। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগের পূর্বে
তাহা সম্ভব নহে।

বিবেকের প্রাগভাব বা বাসনাই অবি-
বেক। তাহার বুদ্ধির ধর্ম নহে বটে, কিন্তু
অবিবেক পুরুষের বিষয় হইয়া, তাহার ধর্ম
রূপে উক্ত হয়। বুদ্ধিরূপী প্রকৃতি স্বামী
পুরুষে, তাহার বুদ্ধিরূপ হইয়া মূল হয়।
সাংখ্য কারিকায়, অন্ধ পশুর দ্বারা, পরম্পরের
অন্ধ পুরুষ প্রকৃতির সন্ধ কথিত হইয়াছে।

অবিবেক তব্ব নহে। কেবল সংযোগ
দ্বারাই উহা বন্ধন কারণ হয়। উহা সাংখ্য
বন্ধন কারণ হয় না। এইজন্য প্রথমকালে
অবিবেকীর হ্রঃ থাকে না। আর জীবমূল
বিবেকীরও জীবিতকালে হ্রঃ থাকে না।

ভোগ্য ভোক্তৃষের নিরামক অনাদি
স্বাধীনতা বর্জ্যাদি সংযোগের কারণ হইলেও,
প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ কারণ নহে। গীতার
আছে—

“পুরুষঃ প্রকৃতিষো হি ভূতন্তে প্রকৃতিজানু
গণানু।

কারণং গুণঃ সংযোগস্য সদস্য বোনিজস্বরূপঃ”
অতএব সাংখ্য অভিমানই সংযোগের
হেতু।

অন্যথা জ্ঞান হইতে মুক্তি হইত না।

অবিবেকই মুখ্য সংযোগ হেতু। স্বা-
পাধিক কর্ম যোগ হেতু। তাহার সহিত
পরম্পরা সন্ধ।

প্রকৃতি পুরুষের অভেদ জ্ঞানই অবিজ্ঞা—
অবিবেক। “বন্ধো বিপর্যায়ানু” “বিপর্যায়-
ভেদাঃ পক। এই সূত্র ও যোগসূত্র হইতে
অবিজ্ঞাই বন্ধহেতু বলা যায়। সেই অবিজ্ঞা
অভাবস্বরূপ নহে, তাহা বিদ্যার বিরোধী
অন্য জ্ঞান। ইহা পাতালে স্বীকৃত। অগ্নিয়া
অভাবস্বরূপ হইলে তাহা বন্ধন কারণ হইত
না।

সাংখ্যমতে “বাসনারূপ অবিবেকই প্রকৃতি

পুরুষের সংযোগ হেতু । অথবা অভিমানাধ্য সংযোগকেই প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ বলা হয় ।

এই অব্যবহিক তিন প্রকারে সংযোগ হেতু হয় । (১) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, (২) ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তিধারা, (৩) বিষয়ানুসারি ধারা । অবিদ্যা সাক্ষাৎ সংযোগের কারণ । অবিদ্যা ধর্ম্মা-ধর্ম্মাদির ধারা ও বিষয়ানুসারি ধারা সংযোগের হেতু হয় । ত্বাস্মাক রাগরূপ বীজ হইতে তাহার জন্ম হয় । রাগ বা বিষয়ানুসারিও অব্যবহিকের কার্য্য ।

‘ক্লেশমূলঃ কৰ্ম্মাশয়ঃ’ ও ‘সতিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যাযুক্তোঃ’—ইত্যাদি পাতঞ্জল সূত্র দৃষ্টব্য জৈমিনি গীতার আছে—

অনাশ্রিত্যস্বকিঞ্চিৎ তস্মাৎ হৃৎখং তথেষতঃ ।
রাগদ্বৈবাদ্যো দোষাঃ সর্বেত্রান্তি নিবন্ধনাঃ ॥
কার্য্যহস্ত ভবেদ্যোঃ পূর্ণ্যাপূর্ণ্য নিতিশ্রুতিঃ ।
তদ্ব্যপাদেব সর্বেবাঃ সমদেহ সমুদ্ভবঃ ॥

জ্ঞান সূত্রে আছে, “হৃৎখলু প্রভৃতিদোষ মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরা পার্য্যৎ অপবর্গঃ ।”

অতএব সংযোগার্থ জন্মধারা বন্ধাধ্য হৃৎখের মূল কারণ অব্যবহিক ।

যুক্ত পুরুষে এই সংযোগ সম্ভাবনা নাই ।

৫৬। অন্ধকারের জ্ঞান তাহারও (অব্যবহিকের) নিয়তকারণ হইতে উচ্ছেদ হয় ।

অন্ধকার যেমন কেবল আলোকের দ্বারা নষ্ট হয়, সেইরূপ নিয়ত কারণ অব্যবহিকেরও উচ্ছেদ হয় ।

অন্তর ব্যতিরেকের দ্বারা বাহ্য বাহ্য কারণ, তাহা, স্থির হয় । তাহাই নিয়ত কারণ । যেমন আলোক অন্ধকারনাশের নিয়তকারণ, সেইরূপ অব্যবহিকও অব্যবহিকনাশের নিয়ত কারণ ।

এই অন্ধকার অজ্ঞানরূপ তক্ষ নহে । এই অন্ধকার প্রাণতাবাদি চারি প্রকার অজ্ঞানের কোন প্রকার নহে । সেইরূপ অব্যবহিকও অজ্ঞান নহে ।

এই হৃৎখের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায় কি ? গুণিতের রজত ভ্রম মপার্থ জ্ঞান দ্বারাই নিরাকৃত হয় । বিবেকই অব্যবহিক নাশের নিয়তকারণ । কৰ্ম্মাদি সে কারণ নহে । তাহা জ্ঞানের প্রধান সাধন । কেন না, তাহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় । তাহা যোগা-
জ্ঞের অন্তর্গত । প্রাণোপ বৈদান্তিকেরাও স্বীকার করেন যে, মোক্ষ বিষয়ে কৰ্ম্ম জ্ঞানের অঙ্গ বিশেষ ।

“সচকারিষ্মেন চ”—ইতি বেদান্ত সূত্র ।

“জ্ঞানিনাজ্ঞানিনা বাপি যাবদেহস্য ধারণং ।
তাবদ্বর্ণাশ্রম প্রোক্তং কৰ্ত্তব্যং কৰ্ম্মযুক্তয়ে ।

“উপমর্দং চেতি”—বেদান্ত সূত্র । ইহা-
দ্বারা যোগীর কৰ্ম্মত্যাগ উক্ত হইয়াছে ।

কৰ্ম্ম চিত্তবিক্ষেপ করে—এরূপ তাহা জ্ঞানাত্ম্যাসের বিরোধী—এরূপ আপত্তি হইতে পারে । তাহা ভ্রম ।

অন্ধকার আলোকাত্ম্য নহে । তাহা ভ্রম । এরূপ তাহা নীলবর্ণ প্রতীতি হয় ।

“তসঃ খলু চলং নলং পরাপর বিভাগবৎ ।
প্রসিক্ত ধর্ম্ম বৈধর্ম্ম্যাং নভভ্যো ভেদত্বমর্থীতি ॥”

৫৭। প্রধান বিষয়ে অব্যবহিক থাকিলে, অপ্রধান বিষয়েও অব্যবহিক থাকে । প্রধান সম্বন্ধে অব্যবহিক দূর হইলে অল্প অব্যবহিকও দূর হয় ।

সকলের মূল প্রধান বা প্রকৃতি । তাহার অব্যবহিকই অল্প অব্যবহিক । প্রধানে অব্যবহিক দূর হইলে আর “বুদ্ধিতত্ত্বে, অহংতত্ত্বে বা” ভৌতিক দেহে অব্যবহিক থাকে না ।

যেমন শরীর হইতে আত্মার পার্থক্য-

জ্ঞানে আর দেহাভিমান থাকে না, দেহের ধর্মকে আর আত্মার ধর্ম বলিয়া ভ্রম হয় না। সেইরূপ প্রকৃতি হইতে পুরুষের পৃথিকী ভ্রম হইলে আর কোন অবिवেক থাকে না। কারণ নাশে কার্য্য নাশ হয়। চিত্তাধার নাশে চিত্ত নষ্ট হয়। প্রকৃতির বিবেকেই মোক্ষ। বুদ্ধির বিবেকেও প্রকৃতি অভিমান থাকে। ক্ষেত্র আমার এ অভিমান থাকিলে তাহার ধন্যও আমার এই প্রতীতি হয়। (বিঃ ভিঃ)

৫৮। পুরুষের বন্ধন ইহা বাক্য মাত্র; তব্ব নহে। এই বন্ধন চিত্তে অবস্থিত।

চিত্ত সন্নিধান জন্ত আত্মার এই অভিমান। নিত্য সঙ্গযুক্ত আত্মার বন্ধন তাত্ত্বিক নহে। “বন্ধ মোক্ষো মুখং দুঃখং মোহাপত্তিশ্চ মায়য়া। অগ্নে বধাশ্বনো ধ্যাতিঃ সমুত্থিতনতু বাস্তবী”।

স সমান সঙ্গভৌ লোকাবলুসঙ্করতি ধ্যায়তীত লেলায়তীব.....ইত্যাদি শ্রুতি।

পুরুষে চিত্তের দুঃখ প্রতিবিম্ব গ্রহণই দুঃখ ভোগ বাসনার উচ্ছেদে বিবেকও যুক্তি হয়।

৫৯। দিক্ভ্রম হইলে যেমন প্রত্যক্ষ ব্যতীত তাহা দূর হয় না, তেমনি অপরোক্ষ ব্যতীত কেবল যুক্তি দ্বারা অবিবেক দূর হয় না।

আত্ম সাক্ষাৎকার ব্যতীত কেবল শ্রবণ মননের বা যুক্তির দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয় না।

শ্রবণ হইতে বিবেক জ্ঞান হইলেও অনেক জন্ম আয়াস দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়।

দিক্ভ্রম বাহাদের কথনু হয় নাই, তাহার দিক্ভ্রমের আশ্রয়্য প্রভাব, বুদ্ধিতে পায় না। দিক্ ভ্রম আসিলে, আত্ম লোকের কথার বিশ্বাস হয় না, স্বর্ষ্যের উদয় দেখিয়াও সে ভ্রম বাইতে চাহে না।

পুরুষের বন্ধন কথা মাত্র হইলেও, কেবল শ্রবণ মননাদির দ্বারা আত্ম-সাক্ষাৎ-কার ব্যতীত, তাহা বোধ হয় না। বিবেক ব্যতীত বন্ধবোধ হয় না। এই অপ-রোক্ষ জ্ঞান ব্যতীত, উপর বিবেক হয় না। কেবল যুক্তি ও শ্রবণ দ্বারা অবিবেক দূর হয় না। (বিঃ ভিঃ)

(এহলে মূল সূত্রে যুক্তি অর্থে মনন, আর অপি অর্থে শ্রবণ বুঝিতে হইবে।)

৬০। যেমন ধূমের দ্বারা অদৃশ্য বস্তুর বোধ হয়, সেইরূপ অসুমান দ্বারা চক্ষুর অগোচর পদার্থের বোধ হয়।

প্রকৃতি প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হয় না; তাহার ইন্দ্রিয়গোচর নহে। তবে কিরূপে তাহাদের অপরোক্ষ হইবে, কিরূপে তাহাদের সাক্ষাৎ-কার হইবে? সে অপরোক্ষের উপায় অসুমান। ধূম দেখিয়া পূর্বেতে বহ্নি আছে, ইহা অসুমান দ্বারা সিদ্ধ হইলে, তাহার সম্বন্ধে অপরোক্ষ সামান্য জ্ঞান হয়। বর্তমান অন্তরে তাহার অস্তিত্ব অনুভব না করা যায়, ততক্ষণ তাহার অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না।

প্রকৃতি পুরুষ প্রত্যক্ষ নহে। এহলে উক্ত হইল যে অসুমান প্রমাণ দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয়। বাহা অসুমান সিদ্ধও নহে, তাহা আগম প্রমাণে সিদ্ধ হয়। সাংখ্য শাস্ত্র অসুমান প্রমাণ, এজন্য এহলে অসুমানেই উল্লিখিত হইয়াছে। তবে আগমের যে একে-বারে অপেক্ষা নাই, তাহা নহে; ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে, সাংখ্যশাস্ত্র মনন শাস্ত্র। কারিকার আছে। (বিঃ ভিঃ)

সামান্ত্রিক দৃষ্টাদতীজ্ঞানান্য প্রতীতিরসুমানাৎ
তস্মাৎপিচ্যসিদ্ধং পরোক্ষমাধ্যগির্বাৎসিদ্ধম্।

৬১। সম্ব রত্নঃ ভষ্মঃ—ইহাদের

সাম্যাবস্থা প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে মহান্, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পুরুষতমাত্রা ও উভয়ইন্দ্রিয়, তমাত্রা হইতে স্থলভূত, আর পুরুষ।— এই পঞ্চবিংশতিংগণ।

যদিও এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি, তথাপি উহাদের প্রত্যেককেই সাংকেতিক রূপে প্রকৃতি বলে। মহান্=বুদ্ধিতত্ত্ব। অহঙ্কার=অভিমান। শব্দস্পর্শ রূপ রস গন্ধ,— এই পাঁচ তমাত্রা। অন্তর ইন্দ্রিয়=মন। বাহ্য ইন্দ্রিয়, দর্শন; যথা পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়,—চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্। পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়,—বাক্, পাদি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। পাঁচ স্থলভূত,—আকাশ, বায়ু, জল, ভূমি।

স্থল ইহা উপর্যুপরি, ইহাও মধ্যে যন্তরীণ ও গ্রহণ করিতে হইবে। সর্বশুদ্ধ এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।

সত্যাদি স্রব্য, শুণ নহে। উহাদের সংযোগ বিভাগাদি ও লঘুত্ব, চগত্ব, শুক-
ছাদি ধর্ম আছে। উহার রজ্জুর স্তর পুরুষকে বদ্ধ করে ও উহার পুরুষের উপ-
করণ, এইজন্য উহাদিগকে শুণ বলে। উহা-
দের মধ্যে যখন কোনটা নূন বা অতিশয়িত
থাকে না, তখনই উহাদের সাম্যাবস্থা। অর্থাৎ
অকাণ্যাবস্থা। বৈষম্য অবস্থার আর যে
তাহাদিগকে প্রকৃতি বলা যায় না, তাহা
নহে। (কিং ভিঃ)

সব্ব রজ্জ্বম ইতি এতৈব প্রকৃতিঃ সদা।

এতৈব সংস্কৃতিঃ স্তোত্রাতাঃ পারো পরম্ পদম্ ।

‘উহা হইতে আনি যায় যে, শুণমাত্রই
প্রকৃতি’ মহত্ত্বাদি কার্যাবস্থা হইলেও
পুরুষের উপকরণ বলিয়া তাহাদের প্রকৃতি
বলে।

সাংখ্যমতে মূলতত্ত্বকে প্রথমতঃ তিন
বিভাগ করা হয়। যথা জঃ, অব্যক্ত ও ব্যক্ত।
(কারিকায় উক্তব্য) পুরুষে=জঃ। মূল প্রকৃতি
=অব্যক্ত। মহত্ত্ব হইতে স্থলভূত পর্যন্ত
সমুদায় ব্যক্ত। ব্যক্ত ২০। সর্বসমেত ২৫
তত্ত্ব।

সাংখ্য মতে এই পঞ্চবিংশতি পদার্থ
ব্যতীত আর কোন পদার্থ নাই। তবে
সত্যাদি প্রত্যেক পদার্থ অনন্ত। এই জন্য
‘পঞ্চবিংশতিংগণ’ বলা হইয়াছে। ইহার সমু-
দায়ই স্রব্য। শুণ, কল্প, সামাত্র, সমুদায়ই
ইহাদের অন্তর্গত।

সাংখ্য মতে প্রাণ বা দিক্ কাল—স্বতন্ত্র
পদার্থ নহে। পদার্থ সকল পরস্পরে প্রবেশ
ও অপ্রবেশ দ্বারা কোন মতে এক, কোন
মতে ছয়, কোন মতে ষোড়শ, আবার কোন
মতে অনন্ত। স্বাধীন বৈধর্ম্য দ্বারা পদার্থের
স্বরূপ বিজ্ঞান হয়।

একান্নসি দৃষ্টে প্রবিষ্টানীতবানি চ।

পূর্বস্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্তে তবানি সর্বশঃ ॥

ইতি নানা প্রসংখ্যান্যঃ তদানামুবিভিঃ কৃতম্ ।

সর্বং জ্ঞায্যং বুদ্ধিমহাছিত্বাং কিমগোচরম্ ॥

ইতি ভাগবতঃ ।

‘প্রতিতেও এইরূপ পদার্থ গণনা আছে ।

“অষ্টৌ প্রকৃত যঃ ষোড়শ বিকারাঃ”—

গর্ভোগনিষৎ ।

“পৃথিবী চ পৃথিবী মাত্র—...”প্রপোগনিষৎ ।

“অষ্টৌ চ প্রকৃতয়ঃ”—মৈত্রায়ণি উপনিষৎ ।

“স্থলপ্রকৃতিরবিকৃতি, মহদাত্মা প্রকৃতিঃ

বিকৃতয়ঃ সপ্তঃ ।

ষোড়শত্ব বিকারো ন প্রকৃতি ন বিকৃতিঃ

‘পুরুষঃ’ ইতি কারিকা ।

প্রতিতে আছে “একমেবাদ্বিতীয়ং”। ইহার
অর্থ সকল তত্ত্ব পুরুষে লয় হয়। শক্তি

শক্তিমানের অভেদ নাই। লয়ে হৃদ্যভাবে অবস্থান মাত্র। লয়—নাশ নহে। শ্রুতিতে আরও আছে, “আনীজজ্ঞানমধোপাখ্য এক মেবাধিকমিত্তিঃ।” এইরূপে সাংখ্যের সহিত বেদান্তের অদ্বৈতবাদের বিরোধ থাকে না। যাহারা ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাহারা বলেন, ঈশ্বর চৈতন্য একমাত্র তত্ত্ব। যাহারা নিরীশ্বরবাদী, তাহাদের মতে ত্রিবেণীর জ্ঞায় মূলক তত্ত্ব কুটস্থ পুরুষে অবিতক্ত রূপে থাকে। যেমন আদিত্য মণ্ডলে তেজোরূপি থাকে। সেইরূপ পুরুষে হৃদ্য প্রকৃতির সহিত মহত্ত্বাদি অবিতক্তরূপে থাকে। এই জ্ঞত আত্মা একমাত্র তত্ত্ব।

৬২। স্থূল ভূত হইতে পঞ্চতন্মাত্রের সিদ্ধান্ত হয়। স্থূলভূত প্রত্যক্ষ, অগ্ন্যতত্ত্ব অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ।

সব, রজঃ তমোভেদে শান্ত ঘোর মূঢ় রূপ স্থূল পঞ্চভূত হইতে তাহার কাবণ রূপ পঞ্চতন্মাত্রের অনুমান হয়। (অনিঃ)

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলভূত—কার্য্য। কার্য্য বলিয়া তাহার কারণের অনুমান হয়। আমরা যে সকল স্থূল পদার্থ দেখি, ইহাদেব কারণকেই তন্মাত্র বলে। (সংকার্য্যবাদ)। (বিঃ ভিঃ)

যাহাদের গুণসকল বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহারা স্থূল। এইজন্ত আকাশও স্থূল। কেন না তাহার গুণ (শব্দ) কর্ণগ্রাহ্য। স্থূলের শাস্তাদি বিশেষ গুণ আছে। যে জাতীয় শব্দ স্পর্শাদিতে শাস্তাদি বিশেষ গুণ নাই, সেই শব্দাদির আধারভূত যে হৃদ্য জব্য, তাহাই তন্মাত্র। শাস্ত—সুখাস্বাদ, ঘোর দুষ্টাস্বাদ, “আর মূঢ়—মোহাস্বাদ। বিষ্ণু পূবাণে আছে—“তস্মিৎ জন্মিস্ত তন্মাত্রান্তেন তন্মাত্রতান্বতা। ন শাস্তা নাশপি ঘোরাভেন মূঢ়াশ্চাবিশেষিণঃ ॥

বিশেষ গুণ নাই বলিয়া তন্মাত্র বিশেষ। তন্মাত্র দেবগণের ভোগ্য—এ জন্য তাহারা শাস্ত বা সুখাস্বাদ। তাহারা সমস্ত ভূতের উপাদান।

বারণ-গুণ অনুসারে কার্য্য-গুণ হয়। মূল প্রকৃতি শব্দাদি বিহীন—রূপাদি বর্জিত। বুদ্ধি অহঙ্কার ইহারা ভূতের কারণ, এজন্য ইহারা উক্ত গুণাদি বর্জিত।

যদি কারণ জব্যের নানাবিক ভাবে যে সংযোগ, তাহাই তন্মাত্রের রূপাদির কারণ, ইহা বলা যায় না।

শব্দ দ্বারা আকাশের দর্শনাদির দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অনুমান হয়। যোগযজ্ঞ মতে—অহঙ্কার হইতে শব্দতন্মাত্র, সেই অহঙ্কার সহকৃত শব্দ তন্মাত্র হইতে শব্দ ও স্পর্শ গুণা-স্বক স্পর্শ তন্মাত্র জন্মে। ইত্যাদি আকাশই স্পর্শ তন্মাত্র সৃষ্টি করে, তাহা হইতে বায়ু—ইহা বিষ্ণু পুরাণে আছে। স্থূল ভূত হইতে এই যে তন্মাত্র সৃষ্টির কথা আছে, তাহা ভূত রূপে পরিণাম মাত্র।...

৬৩। বাহ্য ও আন্তর ইন্দ্রিয় হইতে ও পঞ্চতন্মাত্র হইতে (তাহাদের কারণ) অহঙ্কারের অনুমান হয়।

অভিমান অহঙ্কারের বৃত্তিমাত্র। অভিমানবৃত্তিক অন্তঃকরণই অহঙ্কার। তিনি (হিরণ্যগর্ভ) কল্পনা করিলেন, “আমি বহু হইয়া উৎপন্ন হইব।” ইহাই শ্রুতি, ইহা হইতে জানা যায় যে, অহঙ্কারই সৃষ্টির পূর্ববর্তী কারণ। সমষ্টিরূপ বুদ্ধি সৃষ্টির উপাদান কারণ ইহা পূবাণাদির মত। হিরণ্যগর্ভের অহঙ্কার হইতে সৃষ্টি হয়, বিজ্ঞানিতক্স বুঝাইয়াছেন। কুন্তকায়ের “ষট সৃষ্টির মূল যে অহঙ্কার, তাহা কুন্তকায়ের নহে, হিরণ্যগর্ভের। ইহাও বলা যায় যে,

মূল পুরুষের অন্তঃকরণের সে পুরুষের ভোগ হেতু পরিণাম নাই মত, কিন্তু পরিণাম-সামান্যরূপ অন্তঃকরণ মাত্রের উচ্ছেদ হয় না। মূল পুরুষের উপকরণ অল্প পুরুষের প্রকৃতি সাধন করে। (কুস্তকার কল্পিত ঘট, সেইজন্য অল্প পুরুষের প্রয়োজন সাধন করে।)

৬৪। সেই অহঙ্কার হইতে অন্তঃকরণের অনুমান হয়।

(মুখ্য অন্তঃকরণই বুদ্ধিতত্ত্ব। নিশ্চয় বৃত্তিমৎ জ্ঞেয়াত্মক বুদ্ধিই অহঙ্কারের উপাদান। কারণের বৃত্তিজ্ঞানে কার্যোক্ত বৃত্তিজ্ঞান হয়।)

(প্রত্যেক ব্যক্তি 'আমি এ ই কার্য্য করিব'—এইরূপ স্বরূপতঃ পদার্থ নিশ্চয় করিয়া পরে সেই বিষয়ে অভিমানী হয়, বা সেই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়।—“অন্যমহং ময়েদং কর্তব্যম্।”

প্রতিতে আছে।—“স জ্ঞকত বহস্যং প্রজ্ঞায়ের ইতি। এই জ্ঞকগই সৃষ্টির মূলে বুদ্ধিতত্ত্ব। তাহাই হইতে নিখিল সৃষ্টি হইয়াছে। ‘বহস্যাম্’—ইহা অহঙ্কার।

অন্তঃকরণ এক হইলেও বৃত্তিভেদে তাহা ত্রিবিধ—বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন।

মনই মহান, তাহা এক বৃত্তিভেদে ভিন্ন। প্রাণও মনের ক্রিয়া।

অহং অর্থোদয়ো যোহয়ং চিত্তাত্মা বেদনাত্মকঃ এতচ্চিত্তজ্ঞমস্যাণ্য বীজং বিদ্ধি মহাসতে।

এতস্যাং প্রথমোক্তিরায়ং অকুরোহভিনবাকৃতিঃ নিশ্চয়াত্মা নিরাকারো বুদ্ধিরিত্যভিধীরতে।

অস্য বুদ্ধ্যভিধানস্য যাকুবস্য প্রলীনতা

সংকল্পরূপিনী তস্তা শ্চিন্ত্যেত্যো মনোহতিধা ॥”

ইতি যোগবাসিনঃ।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বহু।

বাঙ্গালার বর্তমান হিন্দু সমাজ।

হিন্দু জাতির ভবিষ্যৎ ভাবনার কোন কোন চিত্তাশীল সমাজহিতৈষী ব্যক্তি অতি মাত্র চিন্তিত হইয়াছেন। নানাকারণে হিন্দু জাতির দিন দিন বলক্ষয় ঘটতেছে। হিন্দু যেমন শরীরে দুর্বল, মনে দুর্বল হইতেছে, হিন্দুসংখ্যাও ক্রমে হ্রাস হইতে হইতে হিন্দুকে সেইরূপ বা তদুপাধিক দুর্বল করিতেছে। গত ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দের লোক-গণনার সমগ্র ভারতে হিন্দুর সংখ্যা ২০, ৭৭, ৩১, ৭২৭ জন ছিল; পরবর্তী ১৯০১ অব্দের গণনায় ঐ সংখ্যা ২০, ৭১, ৪৭, ০২৬ জন নিকৃপিত হইয়াছে। অতরাং দশ বৎসর কাল মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ঐক্রে হ্রাস লক্ষ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, আনা গিয়াছে; কিন্তু ঐ সময়েই অপরাপর

ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ভারতে যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইয়া ক্রমে হ্রাস পাঠিতেছে কেন, গড়ে প্রতি বৎসর ৬০ হাজারের উপর হিন্দু সংখ্যা হ্রাস হইতেছে কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ হিন্দুর জাতীয় জীবন মরণের, জাতীয় অস্তিত্ব-স্তিষ্কের গুরু প্রশ্ন ইহাতে বিজড়িত, অন্ত্যস্ত কথার কি কাজে ঐদান্ত আলস্ত ততটা আন্ত সাংঘাতিক না হইতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ে আজও আমরা অবহেলা করিলে আমাদের জাতীয় বিলোপ অতি সঙ্কর সংঘটিত হইবার আশঙ্কা।

সমস্ত ভারতবর্ষে মুসলমানের সংখ্যা প্রায়

ছয় কোটি। কিন্তু এক বঙ্গদেশেই তাহার সংখ্যা প্রায় তিন কোটি। ভারতের পূর্ব প্রান্তভাগে, মুসলমানের, ভারতবর্ষের ~~অধিকাংশ~~ অধিকাংশ প্রদেশ-বার পঞ্চদশ প্রদেশ হইতে বহু শত মাইল দূরে, এই বঙ্গদেশে মুসলমানের সংখ্যা সমগ্র ভারতের মুসলমান সংখ্যার প্রায় অর্ধেক পরিমাণ কেন, তাহা কি আমাদের একবারও ভাবিয়া দেখিবার বিষয় নহে?

১. গত লোক-গণনার ভারতবর্ষের কয়েকটা প্রধান প্রধান প্রদেশে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যার অল্পগাত কত, তাহার একটা মোটা-মুঠ হিসাব আমরা নিয়ে দিলাম।

প্রদেশ—	মুসলমানের অল্পগাত—
মধ্যপ্রদেশ (C.P.)	২ ½ অংশের নূন
মাজ্জাজ	৩ ½ অংশ
উঃ প্রদেশ (N.W.P.)	১ ½ অংশ
পশ্চিম বঙ্গ	১ ½ অংশের উপর
বোম্বাই	১ ½ অংশ
পূর্ববঙ্গ	১ ½ অংশ

পাঠক! এই হিসাবে দেখুন, পূর্ববঙ্গের শত করা প্রায় ৮০ জন অধিবাসী মুসলমান, অবশিষ্ট ২০ জন মাত্র হিন্দু; কোন কোন জেলায়, কোন কোন উপবিভাগে, কোন কোন থানায় মুসলমানের সংখ্যা এ অল্পগাতও অতিক্রম করিয়াছে। ময়মনসিংহ জেলার আমালপুর উপবিভাগে গত ১৯০১ খ্রীঃ অব্দে হিন্দুর সংখ্যা ১২৭৩৭৩ জন এবং মুসলমানের সংখ্যা ৫৪২৬৯৩ জন নির্ধারিত হয়; নিজ আমালপুর থানায় হিন্দুর সংখ্যা ৪৪৩৯৫, অপরদিকে মুসলমানের সংখ্যা ২৪৭৯৪০ জন গণিত হয়। আবার দেওরানগঞ্জ থানায় হিন্দুর সংখ্যা ১৬১৯৮ জন মাত্র, আর মুসলমানের সংখ্যা ১২৮৭২৪ এক লক্ষ আটাইশ হাজার সাত শত চব্বিশ জন অর্থাৎ দেওরান-গঞ্জে প্রতি নব্ব জন অধিবাসীর মধ্যে আট জনই মুসলমান।

পূর্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির অল্পগাতও অত্যন্ত অধিক। আমরা এখানে কেবল একটা জেলায়ই হিন্দু এবং মুসলমান, উভয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির অল্পগাত প্রদর্শন করিব। বুদ্ধিমান পাঠক তাহাতেই উক্ত সমাজের অস্তিত্ব জেলার অবস্থার অনেকটা বুঝিতে পারিবেন। গত ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাসে ময়মনসিংহে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ২০,৪১,৫২৩, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া ২৩,৯৬,৪৭৬ তে পরিণত হয়। পরবর্তী দশবৎসরে, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের গণনার তাহা ২৭,৯৫,৫৪৮ সংখ্যার পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ সামান্য দশবৎসর কাল মধ্যে একমাত্র ময়মনসিংহ জেলাতেই মুসলমানের বৃদ্ধির পরিমাণ ষাড়ে সাত লক্ষেরও অনেক বেশী। গত ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ঐ জেলার হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৯,৮৭,৬০৮ জন, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ১০,৪৫,৫৬৬ জন এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সংখ্যা ১০,৮৮,৮৫৭ হইয়াছে, অতরাং দশ বৎসরে হিন্দুর সংখ্যা মোট বৃদ্ধির পরিমাণ ১,০১,২৪৯ জন মাত্র। কোথায় সাড়ে সাত লক্ষ, আর কোথায় এক লক্ষ! হিন্দুর বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ১০ জন। অপর দিকে মুসলমানের বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৩৭ জন, প্রায় চতুর্গুণ। মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধিতে আমরা দুঃখিত কিম্বা স্তব্ধ হইতেছি, এরূপ কেহ মনে ভাবিবেন না। একই স্থানের অধিবাসী, উভয় সম্প্রদায়ের লোক বহু বিষয়ে তুল্যাবস্থা, কেবল ধর্ম সমাজ সম্পর্কে উভয়ের পার্থক্য আছে বলিয়া তুলনার সমালোচনার সুবিধা প্রভৃতি এ সকল সংখ্যার এখানে উল্লেখ করিলাম।

এখানে আর একটা কথা উল্লেখ করা

আমরা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বিস্তৃত জেলার একটি মুসলমান মস্তকও দৃষ্ট হয় নাই। ১৪২১ খ্রীঃ অব্দেই এ জেলার মুসলমান প্রথম প্রবেশ লাভ করেন। * চারিশত বৎসর পূর্বে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগে একটিও মুসলমান অধিবাসী ছিল না, আজ সেখানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বোধ হয় ৩০ তেরিশ লক্ষের নূন হইবে না।†

পূর্ব বঙ্গে সুদূর তুরস্ক, পারস্ত, আরব, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশাগত সৈয়দ, মোগল, পাঠান প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। সুতরাং ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলার অধিকাংশ মুসলমান, এ দেশের পূর্বতন আদিম অধিবাসী কিম্বা নিম্নস্তরের হিন্দুদিগের বংশধর, এরূপ অনুমান করিবার বখেটে সঙ্গত কারণ আছে। এ দেশে যে এত অধিক সংখ্যক লোকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিল কেন? কেহ তাহার কারণ অনুসন্ধান জন্ত কোন চেষ্টা করিয়াছেন কি?

বাঙ্গালার বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহার, জীবনযাত্রা পদ্ধতি, বিবাহ বিধি, নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণের প্রতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের ব্যবহার, এ প্রদেশের হিন্দু সমাজের উন্নতির সহায়ক না হইয়া বরং কিরূপ সর্বনাশ করিয়াছে এবং আজও করিতেছে, তাহা প্রত্যেক বুদ্ধিমান সমাজ-হিতৈষী হিন্দুর এখনও ভাবিয়া দেখা নিতান্ত

* ময়মনসিংহের ইতিহাস ৩০৩৭ পৃষ্ঠা দেখুন, (খ্রীষ্টীয় কেরান্য মজুমদার প্রণীত)।

† ১২০১ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান সংখ্যা প্রায় ২৮ লক্ষ ছিল। ১১১১ খ্রীষ্টাব্দে আর ৫ পাঁচলক্ষ বৃদ্ধি হইয়াছে, অনুমান অর্পণ করিতে পারি।

কর্তব্য। দিন দিন সংখ্যা হ্রাস, অন্নকষ্ট, অর্থাত্যাব, বৃত্তিলোপ, সামাজিক নিগ্রহ, বিবাহেও পুণ্য, পাকস্পর্শ প্রভৃতির ব্যাধিক্য, বিবাহ যোগ্য বয়স্ক পাত্রীর সংখ্যানুভা, নিম্নশ্রেণীর লোকের প্রতি উচ্চস্তরের লোকের ঘৃণা বিদ্বেষ, নির্যাতন প্রভৃতি নানা প্রকারের অশান্তি ও অস্থিরতার কারণ সম্মিলিত হইয়া সমাজের নানা স্তরে অসন্তোষের আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। তদুপরি, মুসলমান জাতি প্রভৃতি কয়েকটা নূতন কারণে পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ শীত-সঙ্কচিত ভুজ-স্রবের জ্বালা, বিতান-ভীতি-বিহ্বল ক্রোধের জ্বালা সদা সশঙ্কিত অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে। অনেকে ভবিষ্যতেও ভাবনার যেমন চিন্তিত, কেহ কেহ বর্তমানের ভাবনারও তেমন উদ্বিগ্ন। বাস্তবিক পূর্ববঙ্গের হিন্দু জনসাধারণের অবস্থা অতি শোচনীয়; ভবিষ্যৎ যেন একবারে অন্ধতমসাক্ষর। বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন না হইলে শাস্ত্রপ্রকৃতিক ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু দীর্ঘকাল পূর্ববঙ্গে বাস করিতে পারিবে কিনা, তাহাই অনেকের চিন্তার বিষয় হইয়াছে।

হুঃখের বিষয়, লোক গণনার হিসাব (সেন্সাস রিপোর্ট) আমাদেরকে আজও সতর্ক করিতে পারিল না, আমাদের কর্তব্য বুদ্ধিকে জাহিরিত কবিতো পারিল না। জামালপুর, বক্সীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের পৈশাচিক কাণ্ডেও আমাদের জানচক্ষু উদ্বীণিত করিতে পারিল না—সমাজ-অনৈতাগণের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারিল না। সামাজিক যে সমস্ত হুঃখ দুর্গতির কারণ আমরা সামাজ্য চেষ্টা দ্বারা অপনোদন করিতে পারি, যে অপর্যায়কৃত স্নেহ লিপ্ত করিয়া বাত-নার বহুপরিমাণে লাভবান করিতে পারি, প্রেম ও সহানুভূতির দ্বারা বর্ষণ দ্বারা সমাজের

বে বে শুক প্রত্যেকে সজীবিত এবং সরস করিতে পারি, আলস্য, অসুদারতা এবং অজ্ঞানতার নিমিত্ত আমরা তাহাতে নিরস্ত হইয়াছি। ভূস্বামিবর্গের অমনোযোগে, ব্রাহ্মণ কার্য্যহাদি উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের ঔদাস্য এবং বিবেচ্যেদেশাচারের কঠিন নিষ্পন্ন নিষ্পে-বণে সমাজের অস্থি-মর্শ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া শাস্ত্র, জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিচার-বুদ্ধি, জাতীয় মঙ্গল, সমস্তকে পদদলিত করিয়া বাক্সালার হিন্দু জাতির কি সর্ব্বনাশের স্থচনা করিয়াছে, আজও কি আমরা তাহার প্রতিকার জ্ঞাত সচেষ্ট হইব না? অতীত যুগের অশুভ্যনে কিংবা অবিমুখ্যকারিতার জ্ঞাত অশুভাপ কিংবা অশ্রুপাত করা নিরর্থক। কিন্তু অতীতের শিক্ষাকে অবহেলা না করিয়া--বিস্মৃতির অতল জলধিতে বিসর্জন না করিয়া, অনাগত ভবি-ষ্যৎ এবং বর্তমানের কর্তব্য স্থির করাই বুদ্ধি-মানের কাজ। নিরস্তরের হিন্দুগণের কথাই আজ আমরা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি; উচ্চস্তরের ব্রাহ্মণ কার্য্য প্রভৃতি শ্রেণীর লোকের বর্তমান অবস্থা আমরা সমরাস্তরে বিস্তারিত আলোচনা করিব। নিরস্তরের হিন্দুগণের অসুখ অশান্তির বেন অন্ত নাই। তাহাদের দুঃখ দারিদ্র্য-পূর্ণ সংসারে আনন্দের অমিয় প্রস্রবণের উৎস যেন চিরদিনের তরে রুদ্ধ। রোগে, শোকে, অনাহারে, অগ্নাহারে, শত অপমান নির্যাতনে জর্জরিত হইয়া তাহাদের অনেকেই বিড়ম্বনা-বহুল জীবনভার যেন দুর্ভহ মনে করিতেছে। আশা আশ্বাস উল্লাসে উল্লসিত করিবার আ-লোক-রেখা যেমন অল্পসংখ্যক, তেমনি অস্পষ্ট, ক্ষীণ জ্যোতি-বিশিষ্ট। পূর্বতন কালের সেই স্বর্গীয় ক্ষুধা, আজকাল আর কোথাও যেন দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বখশান্তি, সৌভা-

গ্যের বিমল হাত বহু পরিবারে অধিকাল-দুর্লভ-দুর্লভ। সংগর, শত্রু, অভাব, উদ্ভ্রাণ, অবহেলা এবং নির্যাতনের নিরাশ-সমুদ্রে অনেকেই অহর্নিশি হাবুডুবু খাইতেছে। আধিনে মা আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দের মজুমদাকিনীতে অবগাহন করিয়া স্বখশান্তিতে পরিতুষ্ট হইবার বাসনা এখন আর অনেকের মনে জাগে না। চির-বিবাদের দুর্ভিক্ষ বিঘ-তরঙ্গিনীতে আশৈশব নিমজ্জিত থাকিয়া তাহাদের অনেকেই জীবন-ভার জার দিন বাপন করিতেছে।

চির-শ্রামল পূর্ববঙ্গ প্রকৃতই স্বর্গভূমি। পৃথিবীর অপর কোন ভূখণ্ডের সহিত এই স্ব-বর্ষণ-পরিবিষ্কৃত নদীমাতৃক দেশের তুলনা হইতে পারে, মনে করি না। বস্তুমাতার অপরিমেয় রূপা-সুখা বার মাসের তের মসলে যেন বস্তাই উৎখলিয়া পড়িতেছে। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ ভূম্যধিকারীই হিন্দু। কিন্তু প্রায় ভূমিই মুসলমান কৃষকের হাতে। মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যারূপাত অপেক্ষা অনেক বেশী জমী মুসলমানদের হাতে রহিয়াছে। মাহিব্য-দাস, নমঃশূদ্র, কৈবর্ত প্রভৃতি জাতীয় অল্প-সংখ্যক লোকে পূর্বে কৃষিকর্মে লিপ্ত ছিল। বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক ব্যয়-বাহুল্যে তাহাদের অনেকে অবস্থা আজ কাল শোচ-নীয়। অনেকে ঋণদ্বারে চাবের জমী বিক্রয় করিয়াছে; কেহ দীর্ঘকাল ভুজ্য উত্তমবর্ণের করে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। পূর্ব বঙ্গের অধিকাংশ হিন্দু অধিবাসী, তালুকের উপসত্ত, টাকার স্বদ, ব্যবসায়ের লাভ, এবং কর্ম্মকার, কুস্তকার, তক্তবার, তেলী, স্বত্বদার প্রভৃতি কোন কোন শ্রেণীর লোকে এতদিন, স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসা দ্বারা দিনপাত করিত। তাহাদের অধিকাংশের ব্যবসা এখন হস্ত-

হ্যাত হইতেছে। অনেক বার্ষিক বিদেশীয়ের সহিত ঐসম প্রতিযোগিতার বিনষ্ট হইয়াছে। কোম কোম ব্যবসারে মুসলমান হস্তক্ষেপ করায় হিন্দুগণ পরাক্ত হইয়াছে। তাই আজ কাল বহু হিন্দু বৃত্তিবিহীন হইয়া প্রমাদ গণিত হইতেছে। প্রাকৃতিক কারণে, বিশেষতঃ ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূমিকম্পে এ প্রদেশের বহু খাল বিল নদী নালা বন্ধ হওয়ার এবং পাটের চাষ অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ার, পাটপচা জলের দুর্গন্ধে মৎস্য সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। পূর্ববঙ্গে হিন্দুব অত্যন্ত প্রধান খাত্ত মৎস্যের দিন দিন অপ্রাচুর্য্য এবং দুর্গ্ণ্যতা বৃদ্ধি হইতেছে। জলপথ বন্ধ হওয়ার এবং মৎস্য সংখ্যা হ্রাস হওয়ার মাল, কৈবর্ত ও পাটুনী প্রভৃতির বৃত্তিলোপ হইবার আশঙ্কা হইয়াছে। যেনে গোচারণের ভূমি ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, এ কারণে অনেক গ্রামে গোপালনের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। একদিকে অধিকাংশ ভূমিতে খাত্ত না দিয়া পাট উৎপন্ন করার পন্থা পণ্ডিত খাত্তার্তাব হইয়াছে, তাহাতে ভূমির দুপ্রাপ্যতা বশতঃ গোচারণ ভূমি পর্য্যন্ত কবিত হওয়ার দেশে দুই ব্রতাদির অত্যন্ত অভাব হইয়াছে।

পাটের চাষ এবং মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে বটে এবং কৃষক শ্রেণীর হাতে টাকার কিছু প্রাচুর্য্য হইয়াছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ ভূমি মুসলমান কৃষকের হাতে আছে। পাট-চাষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জায়গায়ই মহাবর্ততা বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার ফলে কৃষিজন্তু হিন্দুগণের অন্নবস্ত্রাদির সর্ব বিধেরে কষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে। উপযুক্ত পরিমাণে স্বাস্থ্যজনক আহার্য্য এবং পরিচ্ছন্ন অভাবে ভুক্তের বহু হিন্দু কি ভাবে দিন বাপন করিতেছে, তাহা স্থানীয় অবস্থাসিদ্ধ ব্যক্তিব্যক্তির বলিতে পারেন।

নিম্নশ্রেণীর বহু হিন্দুর বিবাহে কস্তার পিতাকে পণ দিতে হয়। কলে, উপযুক্ত বয়সে অনেক যুবক বিবাহ করিতে পারে না। এই সকল শ্রেণীতে বালিকা বিবাহ, শিশু কিরাহ বহু পরিমাণে লক্ষিত হয়। বয়োবৃদ্ধ বরের সহিত শিশু কস্তার বিবাহের বিষয় কল—বাল বিবাহ সংখ্যাধিক্য। যে সকল শ্রেণী মধ্যে অতি অল্প কাল পূর্বেও বিবাহ বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহারও ব্রাহ্মণ, কায়স্থের অনুকরণে বিবাহ বিবাহ প্রথা রহিত করিয়াছে। এ কারণেও সমাজের সংখ্যা-মতা ও দুঃখ আশঙ্কি বৃদ্ধি করিতেছে। শাস্ত্রানুসারে স্বসমাজ-প্রীতি এবং স্বদেশ-প্রীতি আর্থ্য ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণের সনাতন ধর্ম্মেরই অঙ্গীভূত, অবশ্য-কর্তব্য বিষয়। সুতরাং স্বসমাজের স্থিতি এবং উন্নতির জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়া হিন্দু সমাজ মাত্রেই পরম পবিত্র “ধর্ম্ম”। ব্যাপ্তিকে বাদ দিয়া আমরা যেমন সমষ্টিকে পাইতে পারি না, সেইরূপ, সমাজের এক একটা ক্ষুদ্র শ্রেণীকে উপেক্ষা করিয়াও আমরা “সমাজকে” পাইতে পারি না। বাহার হননে মাতৃভক্তি নাই, তাহার স্বদেশ-প্রীতি যেমন অবিদ্যমান এবং অসম্ভব, বাহার স্বসমাজ ও স্বধর্ম্মের প্রতি প্রীতি অহুরাগ নাই, তাহার স্বদেশ-প্রীতিও কল্পার কথা মাত্র। সমাজবৎসলতা না হইলে স্বদেশবৎসলতা জন্মিতে পারে, ধারণা কবিতো পারি না। সমাজের উন্নতিতে আমার উন্নতি এবং সমাজের অবনতিতে আমারও অবনতি দৃঢ়-সম্পৃক্ত। এজন্য স্ব-সমাজের হিতকামনা সর্বোপায়ে কর্তব্য। ব্যক্তিগত স্ব স্ব সমাজস্থ বহুলোকের স্বার্থের বিরোধী বা ব্যাঘাতক হইলে ঐরূপ স্থলে সমাজস্থ বহুলোকের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যক্তিগত

স্বথ, ক্ষুদ্র স্বার্থ, ভোগাভাজনা পরিত্যাগ করাই কর্তব্য। হিন্দু শাস্ত্রের ইহাই মর্শা-দেশ। সুপ্রসিদ্ধ “হিতবাদী” সম্প্রদায় প্রভৃতি বহু বিজ্ঞ সমাজেরও ইহাই অভিমত। এই জন্তই সর্বোপায় স্ব-সমাজের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। এবং এই জন্তই আত্মরক্ষা অপেক্ষাও সমাজ রক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এজন্য আমাদের হিন্দুসমাজ আমাদের প্রত্যেকেরই, হিন্দুসমাজেরই অতি সম্মানের, অতি সমাদরের, অতি প্রীতির, অতি গৌরবের আশ্রয়। বৌদ্ধেরাও এই সমাজকে “সংঘ” বলিয়া পরম শ্রদ্ধা ভক্তির চক্ষে অবলোকন করেন। বিশেষতঃ আমাদের ভ্রাতৃ অতি প্রাচীন মহা-মহিমাবিশিষ্ট পূজ্য সমাজ এ জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

হিন্দুসমাজ সর্বোপায়েই আমাদের মাতৃ-স্থানীয়। ব্রাহ্মণ এই সমাজ-দেবতার মন্তক, বৈষ্ণব কারুণ্য এ সমাজ দেহের চক্ষু কর্ণ, নব-শাখ এ বিরাট দেহের কাণ্ড, ঠিক বর্ষ, নাহি, সাহা, নমঃশূদ্র, রজক, পাটুনি, ডোম, বাদলী, প্রভৃতি কেহ হস্ত, কেহ পদ, কেহ হস্তাঙ্গুলী, কেহ পদাঙ্গুলী, ক্ষুদ্র বৃহৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। মায়ের বিরাট দেহে সকলের এবং প্রত্যেকেরই যেমন প্রয়োজনীয়তা, তেমনি শোভা-নীয়তা আছে। কোন একটিকে বাদ দিলে মায়ের অঙ্গ শোভার নিশ্চয়ই হানি হইবার আশঙ্কা। যদি হস্ত পদ বা একটা পদাঙ্গুলী ক্ষত, বিকৃত, কার্যাক্ষম কিম্বা দেহ-বিচ্যুত হয়, তবে মায়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাদের গুরুত্ব দূরে থাকুক, তাহার জীবনেরই কত আশা করিতে পারি? দূষিত কত (cancer) সামান্য হইলেও কালে দৃষ্টিক্রিয়ায় আণ্ডারকর ব্যাধিতে পরিণত হইয়া থাকে।

উক্ত শ্রেণীর হিন্দুগণের ব্যবহারেও অনেক

নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু মনোবৃত্তি প্রাপ্ত হইতেছেন। এ জগতে প্রায় সকলেই আত্মস্বার্থপর। কিন্তু আত্মস্বার্থপরতার অর্থ হইয়া, অপরকে তাহার জীব্য আশ্রয়াদিকার হইতে বঞ্চিত করিবার অবৈধ চেষ্টা করিলে, অপরের প্রতি অত্যাচার করিয়া তাহার স্বাভাবিক ক্ষুধা বিনষ্ট করিলে, কোন জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি তাহার অনুমোদন করিবেন? মানব-ভোগ্য সর্ববিধ সামাজিক স্বথ-সম্মান-সন্তোষ সম্ভবপর হইলে, কোন দারুণ প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক না থাকিলে, সেগুলি নিজের এবং আপনাদের আত্মীয় প্রিয়জনগণের উপভোগ্যের আয়ত্তা-ধীন করিবার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়াস মনুষ্য মাত্রেই স্বাভাবিক এবং তাহা নিশ্চিন্ত নহে। আমাদের হিন্দুসমাজের নিম্নতরের বহু শ্রেণীর লোকে আজকাল হিন্দুসমাজে কথঞ্চিৎ আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। শিক্ষার আলোক-রেখার জ্বলন্ত স্পর্শেই অনেকের আত্মজ্ঞান জাগরুক হইয়াছে। বর্তমান যুগের বিদ্যালয়, বিচারালয়, রেলপথ, ষ্টেশন, সংবাদপত্র, মিউনিসিপালিটি, লোকাল বোর্ড, সর্বজনের সম্মোহন-মন্ত্র তারুণ্যে প্রচারিত হইতেছে। তাহার গতিরোধ করা কাহারও সাধ্যাত্ত নহে। এমন যে প্রবল প্রতাপবিশিষ্ট ‘কলির ব্রাহ্মণ’ ইংরাজ, তিনিও তাহা সম্পূর্ণ সহ্য করিতেছেন এবং এতদংশীর্ণ জনসাধারণের স্বাস্থ্য-শাসন-লাভ-প্রচেষ্টার তুচ্ছ-মনীয় স্পৃহা এবং নিত্য-প্রবর্তমান শক্তিকে সমূলে উৎপাটিত করা অসম্ভব জিনিয়া শান্ত-সংযমিত করিবারই বিধি চেষ্টা করিতেছেন। প্রত্যেক বিষয়, ইতিহাসের উপদেশ আমন্ত্রণ-উপেক্ষা করিয়া আমাদের স্বলম্বের নিম্ন-স্তরের ভ্রাতৃগণের আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার সর্ব

বিধ চেষ্টাকে আজও কেবল ফণা বিধেব এবং উপহাসের চক্ষেই অবলোকন করিতেছি। রাজশক্তি আমাদের করায়ত্ত নহে। পূর্বের সেই ব্রাহ্মপুত্র, ক্রান্তপুত্র কিছুই আর নাই। আজকাল “গুণ এবং কর্ম” মানদণ্ডের সাহায্যে পরিমাপিত করিলে বর্তমান সময়ে আমরা—ব্রাহ্মণ কায়স্থ সাহা নমঃশূদ্র সকলেই আর তুল্যাবস্থ “শূদ্র” পর্যায়ে পরিগণিত হইব। ভয় এবং সন্ত্রাসের কোন কারণই আর বর্তমান যুগের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ সম্মান মধ্যেও বিস্তারিত নাই। আমাদের তর্জন-গর্জন নিরর্থক, নয়ৎ অনেকের নিকট উপহাসের বিষয়। তবে কেন আজও আমরা হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরের অসংখ্য নরনারীর হৃদয়-বেদনা দূর করিতে চেষ্টা না করিব? আজও কি আমরা আমাদের জাতীর বিনাশকে আগাদের কর্ম দোষে নিকটবর্তী করিতেই রত থাকিব?

সাহা, শৌভিক, নমঃশূদ্র, পাটুনী প্রভৃতি কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, হিন্দু নাপিত এবং কেহ কেহ হিন্দু রজক দ্বারা কোন কাজ করাইতে পারে না।—আশ্চর্যের বিষয়, এই সকল শ্রেণীর কোন হিন্দু যদি মুসলমান কিম্বা খ্রীষ্টানের ধর্ম অবলম্বন করিতে চাহে, তবে সে তৎক্ষণেই হিন্দু নাপিত ধোপার দ্বারা কাজ করাইবার অধিকার লাভ করে। যত-কর্ম ভাঙ্গারা হিন্দুসমাজ তুচ্ছ থাকিয়া হিন্দুর দেবতা এবং ব্রাহ্মণকে ঐতিহাসিক চক্ষে অবলোকন করে, ততক্ষণই তাহারা হিন্দু কৌরকার এবং রজকের নিকট অবজ্ঞাত ও অস্পৃশ্য থাকিবে। কিন্তু ধর্মাত্মর গ্রহণ করিবার মার্গ; তাহারা হিন্দুর অধাত্ত ভোজনে অকুষ্ঠা প্রকাশ করিবার মার্গ, হিন্দুর দেবদেবী বিধেষ্ঠা হইবার মার্গ, তাহারা হিন্দুর নিকট অধিকতর সম্মান, সম্মানের পাত্র বলিয়া গণ্য হইয়া

থাকে। এমন আত্মবাহী নীতি, এমন অহংকার ক্ষুদ্র বুদ্ধি জগতে আর কোন দেশে, কোন-ধর্মলম্বী কখনও দেখিতে পাইবেন কি?

১. স্বধর্মীর প্রতি প্রেমাত্মক প্রকাশ হিন্দুর অবশ্য কর্তব্য ধর্ম বলিয়া শাস্ত্রে কীর্তিত হইলেও, আমাদের মনে হয়, এ সম্পর্কে বর্তমান যুগের অধঃপতিত বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ অপেক্ষা খ্রীষ্টান মুসলমান প্রভৃতি সমাজের লোকেরা বহু উন্নত। মুসলমানের চরিত্রে অপর বহু দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু মুসলমানের স্বধর্মী-প্রীতির তুলনা বোধ হয় জগতে অজ্ঞান নাই। ইউরোপীয়দের এবং নব্য জাপানের স্বদেশ-প্রীতি প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই, ব্রটনীয়ের সাম্রাজ্য-প্রীতিও অতুলনীয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু মুসলমানের স্বধর্মী-প্রীতি যেমন কোন দেশের কিম্বা কোন সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া, ইসলামের বৃহত্তম ধর্ম-পতাকার আশ্রয়-স্থিত খেত, পীত, কৃষ্ণ নির্দিষ্ট-শেবে এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকার মুক্তিকার জন্মভেদ বিচার না করিয়া, পৃথিবীর সকল দেশের নরনারীর মধ্যে অবাধে অজস্র-ধারে পরিব্যাপ্ত হয়, বর্তমান কালে অপর কোন সম্প্রদায়ে সেরূপ পরিণতি হয় না। ডেমোক্রেটিক ইংরাজ, এমন কি, সাম্য-ঈশ্বরী স্বাধীনতার জয়-পতাকাধারী করাসী, উচ্চতর কণ্ঠে সাম্যবাদ ঘোষণা করিতে পারেন, কিন্তু মুসলমানের মত বৃকে হাত দিয়া ধর্ম সাক্ষী করিয়া, এখন সাম্যবাদের আর কেহ সম্মাননা করিতে পারিবেন না। বিজাতীয় অজ্ঞাত কুলশীল বিধর্মী ক্রীতদাসকে স্বধর্মে বীক্ষা দান করিয়া একমাত্র মুসলমান নৃপতিই তাহার করে কড়া সম্মান দান করিয়া এবং তাহাকে স্বীয় সাম্রাজ্যের তাবী-উত্তরাধি-

• করী করিয়া খ্রীষ্মবিশ্বাসের এবং সাম্য-
বাদের অতুল বৈজয়ন্তী উদ্ভাটন করিয়া গিয়া-
ছেন। * অজ্ঞাত-কুলনীল ভিন্ন জাতীয়-সম্প্রদায়
নিকট কল্পা সম্প্রদান রূপ—শতাব্দীব্যবহারের অপর
শতাব্দ্যে থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা মুসল-
মানের সাম্যবাদের এবং মত বিশ্বাসের যে
অসাধারণ উদাহরণ, তাহার আর সন্দেহ
কি ?

.. সে যাহা হউক, হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরের
বহু লোক, উর্দ্ধস্তরের স্বধর্ম্মদেব দ্বারা অত্যন্ত
রূপে বিড়ম্বিত ও নিগৃহীত হইতেছে,
• মনে নিদারুণ কষ্ট পাইতেছে, অসন্তোষের
তুষানল হৃদয়ে ধরিয়া সর্বদা তপ্তশ্বাস
ফেলিয়া সমাজের বায়ুকে দিন
দিন অধিকতর বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে,
তাহার আর সন্দেহ নাই। কত শত সহস্র
লোক আজও এই দুঃস্থ পতিত সমাজকে
ধিকার দিতে দিতে, কেহ খ্রীষ্টান সমাজ, কেহ বা
মুসলমান সমাজের ক্রোড়ে শান্তি লাভের
আশায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। আমরা
দিন দিন বলক্ষয় জ্ঞাত দুর্বল হইতেছি, অপর-
দিকে বিধর্ম্মীরা অধিকতর দলপুষ্টি হওয়ার বল-
শালী হইতেছে। হিন্দুসমাজের এ ক্ষয়-রোগের
প্রতিকারক্ষম উচ্চ স্তরের সামাজিকগণের এ
ব্যর্থির •মূলোৎপাটন করিতে আর বিলম্ব
করা সঙ্গত হইতেছে কি ? কোন গোষ্ঠীপতি
কেবল স্বকীয় সুখ দুঃখের ভাবনার সর্বদা
তন্ময় থাকিয়া পরিবারস্থ অপর কাহারও
অসুখ অসুবিধার প্রতিবিধান জ্ঞাত একবারও
দৃষ্টিপাত না করিলে সে পরিবারের কখনও
মঙ্গল হইতে পারে কি ? নিম্নস্তরের হিন্দুগণও
কে আমাদের এক পরিবারের ছোট ভাই,

* ভারতবর্ষের পাঠান রাজগণের মধ্যেও এ দৃষ্টান্ত
দেখিতে পাওয়া যায়।

তাহা বুঝিবার ও সকলকে বুঝাইবার এখন
নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। একটুকু আদর্শ
শ্রীতি, একটুকু ভালবাসা দেখাইয়া, সুদূর ব্য-
হারে আপনাদের জনকে অধোনে পড়িতে রাখিবার
অপমান কিম্বা ক্ষতিকি ?

বঙ্গদেশে আমরা অধিকাংশ হিন্দুর জল
অনাচরণীয় করিয়া রাখিয়াছি। পশ্চিম
ভারতে বঙ্গদেশের মত জল এত সহজ প্রাপ্য
নহে। অনেক স্থলে জল ৪০।৫০।৬০ হাত
মৃত্তিকার নিম্নস্থ কূপ হইতে উত্তোলিত করিতে
হয়। সে সকল দেশের মৃত্তিকাও বঙ্গদেশের
জায় এত নরম নয়। সুতরাং মৃদ্বয় কলসে
কিষা ধাতব পাত্র সে দেশে কূপ হইতে
জলত্তোলন সম্ভবপর নহে, কঠিন মৃত্তিকার
লাগিবা মাড় ধাতব পাত্রও সহজে এবং সস্তর
ভগ্ন হইবার কথা। সুতরাং সে সকল প্রদেশে
বহু নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, এমন কি, কোন কোন
স্থানে মুসলমানেও চর্চ্চ-নির্ম্মিত কলসে—মশকে
কুয়া হইতে জল তুলিয়া ব্রাহ্মণাদি জাতির
দেবপূজা সন্ধ্যাকর্চনা স্নানাহারের সরবরাহ
করে। তাহাতে সে সকল দেশের ব্রাহ্মণাদির
ধর্ম্মাচার অব্যাহত থাকে। বঙ্গদেশে জলের
প্রাচুর্য্য বলিয়া আমাদের এত আঁটাআঁটি
সঙ্গত হইতেছে কি ?

এমন কি, পশ্চিমবঙ্গে যে সকল শ্রেণীর
• হিন্দু কোন ঘরে উপস্থিত থাকিলে অল্প এক-
জন উচ্চশ্রেণীর হিন্দু তাহার সহিত অবশ-
্য-সংস্পর্শ-বিরহিত হইয়া জলপান করিতে
কোন আপত্তি প্রকাশ করেন না, পূর্ব এবং
উত্তর বঙ্গে তাহাদের অনেকের গায়েই বাতাস
লাগিলেও গৃহের অদূরস্থিত জলভাও দৃষিত
হইয়া যায়। সমাজের কত উচ্চশ্রেণীর হিন্দু-
সুন্নান কত সাহেবের ছোট্টলে কত অন্তর্য্য
ভক্ষণ, কত অপের পান করিয়াও নিশ্চেষ্ট

রহিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। লেমনেড, সোডা ওয়াটার এবং সহরের কলের জল না খাইতেছেন, কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহে এরূপ পতিত ব্রাহ্মণের বোধ হয় আজ কাল একেবারে অভাব না লইলেও অত্যন্ত সংখ্যা-মত। ইউরোপীয় কোন খ্রীষ্টান ভ্রমলোক স্পর্শ করিলে পান খাইতে, এমন কি জলভরা হকায় তামাক খাইতেও, অনেকের আপত্তি নাই। কিন্তু একজন নমঃশূদ্রের বেলায় বত দোষ! গো শূকরভোজী ইউরোপীয় খ্রীষ্টান খেতচরী এবং রাজার আক্তি বলিয়া তাহার কি এই গোরব?

বৈশ্ব এবং কার্যসিদ্ধির মধ্যে কেহ কেহ উপবীত গ্রহণ করিতেছেন। যদি তাঁহাদের "পৈতৃ" গ্রহণে হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণ সমাজেব কোন গুরুতর ক্ষতি কিম্বা 'অপমান না হইয়া থাকে, যদি মহাভারত অন্তর্ভুক্ত না হইয়া থাকে, তবে সাহা, নমঃশূদ্র, নাথ যুগী, প্রভৃতির যজ্ঞোপবীত গ্রহণে ব্রাহ্মণাদির এত গাঢ়দাঙ্ক হইতেছে কেন? কয়েক বৎসর পূর্বে ময়মনসিংহের এক সম্ভ্রান্ত কার্যসূ সন্তান এক যুগী জাতীয় ব্যক্তিব পৈতা ছিঁড়িয়া এক ফোজদারী মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি হাবড়াতেও এরূপ আর একটা মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, শুনিবাছি। বিজ্ঞেয় চিত্র উপবীত গ্রহণে হিন্দু সমাজের এমন কি সর্বনাশ হইতে পারে, বুঝি না। বরং অধিক সংখ্যক লোকে এ কারণে অধিকতর শুদ্ধ এবং সংযত। পাপভীরু হইলে হিন্দুর জাতীয় চরিত্র তদ্বারা উন্নততর হইবারই কথা।

ভাসবাসার হৃদয় জয় করিতে না পারিলে তদ্বৎ রক্তচক্ষু দেখাইয়া, শাসনের লোহদণ্ড উত্তোলিত করিয়া কেহ কোম দেখে, দীর্ঘকাল শাসন করিতে পারে নাই, বিশেষতঃ

এই নবযুগে পারিবার আশা করা নিতান্ত বাতুলতা মাত্র। করিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানের নমঃশূদ্রগণ কার্যতঃ ব্রাহ্মণ, কার্যতঃ বৈশ্ব প্রভৃতির বিরুদ্ধে বহুশত ঘোষণা করিয়াছে। "নমঃশূদ্র", "নমঃশূদ্র মুহুদ" "বোগী-সখা" "ঝালমাল-বান্দব" প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মুখ পত্র পত্রিকায় "বৈশ্বভূতব" "সদগোপ-সমাজভূতব" "মাহিষ্য-প্রসঙ্গ" প্রভৃতি পুস্তক পুস্তিকায়, বৈশ্ব-সাহা-সমিতি প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক সভাসমিতির, কার্য-বিবরণীতে, নিয়ন্ত্রকের হিন্দুগণের মনের ভাব এবং আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে। শিকার প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-সম্মান-জ্ঞান ক্রমেই বর্ধিত হইতে থাকিবে। নিয়ন্ত্রকের সমস্ত হিন্দুগণের সম্বন্ধ সম্মিলিত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। দেশে জাত্যাভিমাত্রী উচ্চস্তরের হিন্দু সংখ্যা অধিক নহে, অপরদিকে জল-অনাচরণীদের সংখ্যা কোটা কোটা। নিয়ন্ত্রকের সকলে সম্মিলিত হইয়া, সাহা-শৌণ্ডিক, যুগী-নাথ, মাহিষ্য-কৈবর্ত, স্বর্ণ-বণিক স্যাকরা প্রভৃতি পরস্পর পরস্পরের মধ্যে আত্ম-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় বিকল-প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া, সকলে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণকে সাধারণ শত্রু জ্ঞান করিয়া বিষেব কিম্বা উপেক্ষার চক্রে দেখিতে আরম্ভ করিলে তখন উচ্চস্তরের হিন্দুগণের সুখ সম্মান বন্যার জলে কোথায় ভাসিয়া যাইবে, তাহাও এসন ভাবিয়া দেখা কঠব্য। পরে অহুতাপ বিফল হইবে। ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লব এক দিনে কিম্বা একের পাপে সংঘটিত হয় নাই। রুসো রুবেম্পেরায় এবং মেরাবোর কথায় প্রথমে কর্ণপাত করিলে অগতের ইতিহাসের একটা সুবৃহৎ রক্ত-রঞ্জিত ইতিহাস বোধ হয় অন্তর্ভুক্ত অল্পকালে চিত্রিত হইত। মেরাবো প্যারিসের প্রধানতম রাজ-নৈতিক সভার মধ্যস্থলে দণ্ডারমান হইয়া বেন

সমস্ত পৃথিবীর প্রতিনিধিরূপে অতি গভীর-
কণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে—“রাজা, রাজপদ ও
রাজদণ্ড মর্যাদা অতিরিক্ত অবনীত পুঙ্খ হইতে
প্রকাশিত হইয়া যাইবে, কিন্তু জনসাধারণের
কোন কালেও বিলয় নাই।” ফ্রান্সের তুলা-
নীচের জাতীয় হৃদয় প্রতাপ বারুদ-গৃহের
উপমাশ্রয় ছিল। উহা সাত শতাব্দীর সঞ্চিত
দুঃখে দগ্ধ হইয়া একটা ভয়ঙ্কর অবস্থায় পহ-
ঁছিয়াছিল। এই কথা উহাতে অগ্নিফুলিঙ্গের
জ্ঞার নিপতিত হইল।* আমাদের এই বঙ্গ-
দেশের বারুদখানার “নমঃশূদ্র সূহৃদ” প্রভৃতি
কি প্রকার অগ্নিফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিতেছেন,
এখানে তাহার কিছু পরিচয় প্রদান করি-
তেছি। ফরিদপুরের “নমঃশূদ্র সূহৃদ” লিখি-
তেছেন :—“কত্নির তেজ সূক্ষ্ম নমঃশূদ্র
জাতিও হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ কার্য্যাদি
জাতি অপেক্ষা কৌন অংশে হীন নহেন।
ঈশ্বরের রাজ্যে সকল মনুষ্যই সমান। তাহার
রাজ্যে উচ্চশ্রেণী বা নিম্নশ্রেণী নাই, অর্থাৎ
সকলেই এক। ব্রাহ্মণাদি জাতি যেমন
ঈশ্বরের সৃষ্ট, আমরাও তদ্রূপ ঈশ্বরের সৃষ্ট।
সুতরাং একজনকে অস্ত্রের স্থগিত বা অস্পৃশ্য
জ্ঞান করিবার অধিকার নাই এবং আমরা
সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে
কার্য্য করিতে ইচ্ছুক নহি। কিন্তু ব্রাহ্মণ
কার্য্যাদি হিন্দুগণ যখন সেই নীতির মস্তকে
পদাঘাত করিলে আমরা আমাদিগকে স্থগিত ও
অস্পৃশ্য জ্ঞান করিতেছেন, তখন আত্মদাম্ভান
রক্ষার্থে কেন আমরাই তাহাদিগকে সম্বন্ধের
চক্ষে দর্শন করিব? নমঃশূদ্রগণ বহুদিন এই
অত্যাচার নীরবে সহ করিয়া আসিতেছেন।
কিন্তু বর্তমান সময়ে তাহাদের ঘৈষ্যের রাজ্য

এত কমিয়া গিয়াছে যে, আর তাহাদের ভয়-
অত্যাচার সহ করিতে পারিতেছেন না। এ
বিষয়ে যশোহর, ফরিদপুর, প্রভৃতি কতিপয়
জেলায় লোক বিশেষ অগ্রবর্তী হইয়াছেন।
তাঁহারা ব্রাহ্মণাদির জল অস্পৃশ্য জ্ঞানে আর
গ্রহণ করিতেছেন না।” বুদ্ধিমান পাঠক!
একবার ভাবিয়া দেখুন, প্রতিক্রিয়া কত দূরে
উঠিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও কি না হইতে
পারে? নমঃশূদ্র-সূহৃদ আর একস্থানে
লিখিতেছেন—“উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ চিরদিনই
নমঃশূদ্র জাতির উন্নতির একান্ত বিরোধী।
চিরকালই আমাদের প্রতি তাঁহারা হিংসা
বিদ্বেষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া আসিতে-
ছেন। নমঃশূদ্র প্রভৃতিগণ কি তাঁহাদের
স্বদেশবাসী নহেন? স্বদেশবাসী এবং প্রতি-
বেশীর প্রতি য়াহারা এইরূপ ব্যবহার করিতে
পারেন, তাঁহারা আবার কি প্রকার স্বদেশী
আন্দোলনের নেতা সাজিয়া স্বদেশ-হিতৈষী
বলিয়া পরিচয় দেন?” এ কথা কি উত্তর
দেওয়া যাইতে পারে, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে
তাঁহা ত খুঁজিয়া পাই না। বিলাতের পালিয়া-
য়েন্ট সভা, লিবারেল দল, সাধু কুন বর্লী
প্রভৃতির উপর এদেশের অনেক শিক্ত
ব্যক্তির প্রজ্ঞা বিশ্বাস আজ কাল পূর্ববৎ অটল
নাই। প্রবল প্রতাপাঘিত ইংরাজরাজও
এজ্ঞ ভাবিয়া আকুল। নমঃশূদ্র, সাহা,
মাহিষা প্রভৃতি স্তরের লোক নবদ্বীপ, ডব্রী-
পল্লী, কোটালিপাড়া, বিক্রমপুরের পণ্ডিত-
সমাজের উপর আজও একেবারে বীতশ্রদ্ধ হয়
নাই। আজও তাঁহাদের লক লক গোক
আশার সহিত আমাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমা-
জের পানে চাহিয়া রহিয়াছে এবং পূরণ স্মৃতি
হইতে লোক অহুসধান করিয়া উদ্ধৃত করিয়া
স্ব স্ব জাতীয় শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে

* শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহোদয়ের “নিষ্কৃত
ভিত্তি” বিক্রয় সংস্করণ ১৭১০ পৃষ্ঠা।

চাহিতেছে। কিন্তু যেদিন তাহারা আমাদের উপর নিরাশ হইয়া আমাদের প্রতিভাগ করিবে, সেদিন আমাদের যে কি শোচনীয় দশা হইবে, তাহা একবার এখনই ভাবিয়া দেখা কর্তব্য।

আমরা মুখে মুখে বিখ্যাত প্রাচীনতাবাদ প্রশংসাবাদ করি এবং হিন্দু পার্শী জৈন খ্রীষ্টান মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোক মিলিয়া আন্তর্জাতিক-ভোজন-প্রথা International dinner প্রবর্তিত করিতেও চেষ্টা করি। কনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠের, অশিক্ষিতের প্রতি শিক্ষিতের, শিষ্যের প্রতি গুরু, দেবকের প্রতি প্রভু আদর্শ প্রেমপ্রচার জন্ত আমরা কত বক্তৃতা করি, কত প্রবন্ধ পুস্তিকা লিখি, চুঃখের বিষয়, আমাদের আত্মজীবনে তাহার আদর্শ রেখাইতে হইলেই পশ্চাদপদ হই। লর্ড-মলির শাসন-সংস্কার-বিধি প্রবর্তিত হইবার পূর্বে বিদেশে তার পাঠাইয়া এ দেশে হিন্দু মুসলমান মধ্যে কিরূপ প্রীতি সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা জানাইবার জন্ত কত কোশল করি! অভিপ্রায়, কোশলে কার্যোদ্ধার। কিন্তু আমাদের বিরাট হিন্দু জাতির মেরুদণ্ড যে স্নেহ ভালবাসা-সহানুভূতির প্রেমবারি সঞ্জন অভাবে দিন দিন শুষ্ক বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে, মৃতবৎ অসার হইয়া কার্য-ক্ষম হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা একবারও শুদ্ধাঙ্গুল দ্বারা পরিষ্কার করি না। পক্ষ, ছিন্নোখিত কেশ দামের সৌষ্ঠব সম্পাদন আশাষ অথবা তৈল বিভ্রাসে ব্যাপৃত থাকিয়া দেহের স্বাস্থ্য-সম্পর্কের গৌরব করিবার জন্ত বৃথা শক্তি কয় করিতেছি; রক্ত-হৃৎ ব্যক্তির স্তব্ধিত মনো-রূম পটভাসে সর্পিদের দ্বিভিত কত গুনি আচ্ছাদিত করিয়া জনসমাগে স্থব্র সুপুঙ্খ বলিদান প্রদর্শন করিবার প্রয়াসের জাতি

আমাদের এই মিলন ভোজের ব্যাপার * উপহাসাস্পদ এবং ক্ষিপ্ত হইবারই যোগ্য। হায়! বিশ্বক বন্ধনা করিবার অভিপ্রায়ে আমরা কতই বুদ্ধি-কোশল খাটাইতেছি। বিশ্বের বিষয় এই যে, তাহাতে নিজেস্বাই দিন দিন যেন বন্ধনার সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতেছি। ইণ্টার-নেশনেল ডিনার প্রচলিত করিবার পূর্বে যে সকল সম্প্রদায় হিন্দুসমাজের বিরাট দেহের অঙ্গীভূত থাকাই পরম গৌরবজনক মনে করিতেছে, তাহাদের প্রতিবিধান-যোগ্য অনায়াস-সাধ্য অভাব অভিযোগের প্রতিকারের জন্ত কথঞ্চিৎ উদারতা সহ চেষ্টা করাই অধিকতর প্রয়োজনীয় এবং সম্ভব। মাহিষ্টি, কৈবর্ত, সাহা, সুবর্ণবণিক, নমঃশূদ্র, যুগী, মাল, পাটুনী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অপমান-ক্ষেত্রে স্নেহ দীক্ষিত করিয়া স্বকীয় সমাজ-দেহকে সর্বাঙ্গে সুস্থ করা আবশ্যক। এজন্য আমাদের তাহাদের কাহারও হাতের ভাত খাইতে হইবে না, কিম্বা কাহারও বাড়ীতে কন্যা গ্রহণও করিতে হইবে না। International dinner কিম্বা শঙ্কর বিবাহের তাহারা আকাজ্জক কিম্বা সমর্থকও নহে। তাহারা কেবল একটুকু সক্রিয় ব্যবহার পাইবার কুপাতিথারী মাত্র।

মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকে জগতের সর্বত্র স্ব স্ব ধর্ম মত প্রচারিত করিবার জন্য, অপারকে স্বীয় ধর্ম মতে দীক্ষিত করিয়া স্বকীয় মণ্ডলীভুক্ত করিবার নিমিত্ত অজস্র অর্থব্যয়, এমন কি, অকাতরে শোণিত দান করিতেছেন। এজন্য মুসলমানের অসংখ্য জীবনদান—খ্রীষ্টানের অজস্র অর্থব্যয়ের কাহিনীতে পৃথিবীর ইতিহাস জানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। মহামহিমাম্বিত

* এলবার্ট হলের ইণ্টারনেশনেল ডিনার।

আর্য্য-ধর্ম এবং আর্য্য-সভ্যতার—আর্য্যদর্শন-নীতির বিন্দু শাষ্ট্রাঙ্কন, অরম্য অরতিপূর্ণ আশ্রয়তলে—সার্বজনীন মুক্তি বঁওপে প্রবেশ লাভ করিয়া জালা দখল জীবন ভার জুড়াইবার জন্য, আর্য্যের দেবোপম “ধর্ম”, জীবনে নীধন করিয়া, পূর্ণাঙ্গমহুত্ব লাভ করিবার জন্য, সভ্য জগতের বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি আজও সোৎসুকে চাহিয়া রহিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মুখার-বিন্দ-বিনিঃসৃত বেদান্ত মহিমা-পূর্ণ স্মমধুব বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিজয়-মদ-গর্ভিত ইউরোপ ও বিশ্বয়-বিনোদনকারী মার্কিন ভূমির অনেক অশিক্ষিত মহাশয় ব্যক্তি বস্তুতঃ মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। ঐহাদিগকে আমাদের এই আর্য্য সমাজের অঙ্গীভূত করিবার প্রয়াস ত বহু দূরের কথা; কিন্তু যে প্রণালী, যে উদারতা-বিমিশ্রিত বিষয়-বুদ্ধি ভারতের এবং পারিপার্শ্বিক নানা দেশের অসভ্য অনার্য্য জাতিগণকে ক্রমে ক্রমে সুবৃহৎ এই আর্য্য জাতির বিভিন্ন শাখা-ভুক্ত করিতেছিল, যে সুযোগ, সহায়তা ও সহায়তার বলে শক, হুন প্রভৃতি বলদৃপ্ত ধীর্ঘ্যবান জাতীয় লোক আর্য্য ক্ষত্রিয় বলিয়া ভারতীয় সমাজে প্রবেশ লাভ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিল, তাহা বহুদিন যাবৎ বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের আর্য্য মহাপুরুষগণ আমাদের স্মৃতি কৃপমণ্ডুক ছিলেন না। মহারাজ ইক্ষাকু হইতে কোরব ও পাণ্ডবদিগের সময় পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবীতে ভারতীয় আর্য্যগণের অবাধ গতায়াত এবং বহু দেশে আর্য্যাদিকার অপ্রতিষ্ঠিত ছিল। পাতাল পুরী ঠাকুরের রাজ-কত্তা উলোপীর সহিত আর্য্যবীর অর্জুনের বিবাহ হইয়াছিল। * অর্জুনের

অপর স্ত্রী চিত্রাঙ্গদা মণিপুরের পার্বত্য রাজ-কত্তা ছিলেন। তদবধি মণিপুরের রাজবংশ হিন্দু “কুজির” রাজা বলিয়া ভারতবর্ষে সর্বত্র কীৰ্ত্তিত এবং সমাদৃত হইয়া আসিতেছেন। এ সব ঐতিহাসিক কথা কাহারও অস্বীকার করিবার শক্তি নাই। বঙ্গদেশের পূর্বাংশে যে প্রবল প্রভাপাশ্রিত বীরধর্মী ত্রিপুরজাতির নিবাস, সেই ত্রিপুর জাতির শূর-শিরোমণি বর্ধ-মাণিক্য রাজগণ মণিপুর রাজবংশের সহিত এবং নেপাল, ঢোলপুর প্রভৃতি পৃথিবী-বিখ্যাত রাজেন্দ্রগণের সহিত পুরুষ পরম্পরাক্রমে পবিত্র বীর-শোণিত-সম্পর্কে সম্পৃক্ত। বঙ্গদেশের পূর্ব, পূর্বোত্তর এবং উত্তর ভাগে ত্রিপুরা, মণিপুর এবং নেপালের শক্তিশালী নরনাথব্রহ্মের নিবাস। * অর্জুন-গোত্রাপত্য মণিপুর রাজবংশের সহিত চির-সম্পর্কিত ত্রিপুরার মহিমাশ্রিত রাজবংশ নানা কারণে বঙ্গদেশীয় অর্জু-মাজেরই পরম সমাদর এবং সম্মাননার পাত্র। হুঃখের বিষয়, বঙ্গের আর্য্যসমাজ-শিরোমণি, বিক্রমপুরের বরেন্দ্র্য বিজ্ঞা-বিভবাবাসিত ব্রাহ্মণ-সমাজ, পরলোকগত বঙ্গগৌরব ত্রিপুরাধিপতি শ্রীমন্নহারাজ বীর-চন্দ্র বর্ধ মাণিক্য বাহাদুরের সহিত আর্য্যোচিত সন্মানস্বত্বপূর্ণ সপ্রেম ব্যবহার—বিজ্ঞ বিচক্ষণের ব্যবহার করিতে পারেন নাই। হহা আমাদের হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা এবং অপরি-নামবর্শীতার যেরূপ প্রকট পরিচয়ক, সেই রূপ গভীর পরিতাপ ও লজ্জার বিষয়, তাহাতে আব সন্দেহ নাই।

আন্তর্জাতিক বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ের বিস্তারিত বিষয় রাজপুতানাসম্পর্কিত আমরীর নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হর বিলাসী সর্দা শ্রীতি “Hindu Superiority” নামক হালিস্তি প্রামাণ্য গ্রন্থে পাঠক দেখিতে পাইবেন। মহাত্মজের দান্য হুলেও এ সম্পর্কে বহু প্রমাণ-পাওয়া যায়।

* অধ্যাপকের উপনিবেশ, দিগ্বিজয়, বাণীনাথ এবং

তিনিহাছি, জয়ন্তিয়া পাহাড়ের রাজা এবং রাজবংশীয় লোকেরা হিন্দু আচার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া “সংশূদ্র” মধ্যে পরিগণিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। * একথা শুনিয়া কোথায় আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হইব, না শত প্রকারে তাহাদিগকে নিরুৎসাহিত করিতে ও তাহাদিগের কার্যে বাধা দিতেই অগ্রসর হইয়া থাকি ! হায় দুর্লভ ! ! সাঁওতাল, কোল, গারো প্রভৃতি বহু জাতীয় বহু লোক হিন্দুসমাজে আশ্রয় লাভ করিয়া সুখী ও সম্মানিত হইবার জন্য আজও লালসিত রহিয়াছে। কিন্তু আমরা উপেক্ষা এবং উপহাসের বাণ বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে কোন প্রকারে নিকটে আসিতে দিতেছি না। সামাজিক সুখ সম্মান লাভ করা দূরের কথা, বরং অধিকতর নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা ভোগের আশঙ্কা থাকিলে এমন কার্যে কে সাধ করিয়া অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক হয় ? তাই আজ কাল তাহারা দলে দলে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিতেছে, শুনা বাইতেছে। কিন্তু আমার এবং অন্যান্য বহু অবস্থান্তিত্ত বিজ্ঞ ব্যক্তির দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, খ্রীষ্টান সমাজ ভুক্ত হইয়া তাহারা এখন যে সকল সম্মান ও সুখ সুবিধা সন্ভোগ করিতেছে, তাহা হিন্দু সমাজেও লাভ করিতে পারিলে তাহাদের অনেকে এই মুহূর্ত্তেই দলে দলে হিন্দু নাম ও ধর্ম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে। † সাধারণ ব্রাহ্মসমা-

জের প্রচারক লোকহিত-ব্রতধারী, করুণ-হৃদয়, কর্মবীর শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্তী মহাশয় যে ভাবে-আশ্রয়স্বর্গ করিয়াছেন, সে ভাবে আরও কতক গুলি বঙ্গীয় যুবক অনুপ্রাণিত হইলে আজ বস্তুতই এ দেশে এক যুগান্তর উপস্থিত হইত।

পঞ্জাবের “আর্য্য-সমাজ” স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর উপদেশ অনুসরণ করিয়া “শুদ্ধ প্রক্রিয়া” দ্বারা ভিন্ন ধর্ম্মপ্রিত বহু নরনারীকে, আপন ক্রোড়ে স্থান দিতেছেন। অত্যাচারী মুসলমান রাজপুরুষগণের শাসন কালে যে সকল আর্য্য সন্তান অনিচ্ছায়, পীড়ন ভয়ে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, বহুযুগ শতাব্দী পরে আজ, এত দিনে, তাহারা আবার হাসিমুখে আপন মায়ের ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে। আমাদের দুর্লভতা কিবা ক্রটি অন্য বিতাড়িত অথবা অপহৃত শত শত তাই ভগ্নীকে আজ আবার আমাদের সুখ দুঃখের সাথী করিতে পারিয়াছি। কিন্তু বঙ্গদেশে ওরূপ কর্ম্মনা করিবার আজও সময় হয় নাই।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে শাস্ত্রাদেশ অপেক্ষা দেশাচারই প্রবলতর। এ সম্বন্ধে মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—“Bengal is governed not by Sastras but by custom. It is true, that very often custom follows the Sastras ; but as* after again custom conflicts with the

* “প্রবাসী” ৮ম বর্ষ, আষাঢ় সংখ্যা দেখুন।

† ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মরমনসিংহ জেলার খ্রীষ্টানের সংখ্যা ছিল ২১১ জন মাত্র। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের লোক-গণনার দেশীয় খ্রীষ্টানের সংখ্যা ঐ জেলার ১২৯১ জনে পরিণত হইয়াছিল। ৬ খ্রীষ্টান পাত্রী মহোদয়েরা যে প্রকারে কৃত্রিম পুষ্টিভাষ্য রচনা করিতেছেন, তাহাতে বর্তমান সময়ে ঐ জেলার খ্রীষ্টানের সংখ্যা ১২৯১ জন হইয়াছে,

গুলিতে কিছুমাত্র বিস্তৃত হইব না। এ সকলের আর সকলেই গারো অথবা হরী প্রভৃতি নিরতম প্রেলীয় হিন্দু ছিল। মুসলমান বোধ হয় ১ জনও ছিল না। মরমনসিংহের উত্তর ঠামার “গারো পাহাড়” এখন পৃথক জেলা। ‘সে খানে আজকাল খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা বোধ হয়’ সহস্র সহস্র। অদূর ভবিষ্যতে বোধ হয় সমস্ত পারোপণ, হয় খ্রীষ্টান কিবা মুসলমান হইয়া পড়িবে।

Sastras. When there is such a conflict, custom carries the day" (হিন্দু সমাজের সমুদ্রপথে বিদেশ যাত্রা। সবচেয়ে রাজ্য বিনয়কৃষ্ণের নিকট বক্তৃতাচলনের পত্র ।) বঙ্গদেশকে দেশাচারের এই কঠিন নিগড় হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়েই দারুণ ক্ষোভভরে মহাত্মা বিজ্ঞানাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন :— "ধন্যরে দেশাচার! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অহুগত ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃঙ্খল বন্ধ বাধিয়া কি একাধিপত্য কারিতেছিস্। তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদাৰ্পণ করিয়াছিস্, হিতাহিত বোধের গতিরোধ করিয়াছিস্, জ্ঞান অজ্ঞার বিচারের পথরুদ্ধ করিয়াছিস্! তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে।" •

কিন্তু যে দিন যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বিজ্ঞানাগর মহাশয় এই দেশাচার অসুরকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, কালের প্রবাহে বঙ্গদেশ আজ আর সেই স্বাধীন স্বাধুবৎ স্থির থাকিতে পারে নাই। বিদেশ-প্রত্যাগত শিক্ষিত চরিত্রবান্ যুবকগণকে হিন্দুসমাজের বঙ্গজননীর প্রেমকোড়ে আশ্রয় দিয়া পূর্ববৎ স্বপ্নসুন্দরে রাধিবার অস্ত্র আজ এদেশের বহু সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠীপতি, বহু সমাজ নেতা প্রস্তুত হইয়াছেন, অনেকে সাদরে স্থান দিয়া ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

বক্তিমচন্দ্র আমাদের পূর্বোক্ত পত্রের স্তন্যাস্তরে লিখিয়াছেন :—"My own conviction is that it is impossible to carry out social reformation regarding any particular practice merely on the strength of the Sastras without religious and moral regeneration along the whole line.....

Reforms in custom can be achieved only when there is an advance in religion and morals along the whole line"। এই কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য, বর্তমান সময়ের বিদেশ-প্রত্যাগত যুবকদিগকে সমাজে পুনর্গ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপারে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

দেশ এখন এদিকে যেন একটু হু বাতাস বহিতেছে, মনে হইতেছে। চারিদিকে নানা উপজাতির আত্মপতিষ্ঠা-প্রয়াসের সহিত, উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পদস্থ হিন্দুগণও যেন বর্তমান অবস্থার উপযোগী উদ্যোগেরও কতকগুলি কর্তব্য আছে, মনে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির পাবনার অধিবেশন কালে, এই কার্য্যজাই, হিন্দু নিয়ন্ত্রণের প্রতি-উচ্চ শ্রেণীর লোকের সহায়-ভূতি-সহায়তা-প্রকাশক মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। বঙ্গের সুসম্মান সমাজহিতৈষী চিন্তাশীল শ্রীবুদ্ধ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমর-বুঝিয়া "Dying race" শীর্ষক প্রবন্ধ রাজি বেঙ্গলিপত্রে প্রকাশিত করিয়া হিন্দুসমাজের তীরদৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। মাতৃভক্ত কন্দবীর সুপ্রসিদ্ধ শ্রীবুদ্ধ অম্বিকারূপ মজুমদার মহাশয়ের জ্ঞান শক্তিশালী জননাযকও আজ বঙ্গদেশের উপজাতি-সঙ্কট-সমস্যার সমাধান অস্ত্র সচেষ্ট হইয়াছেন। বঙ্গদেশের কোন কোন পত্র পত্রিকা-সম্পাদকও এ বিষয়ে সময় সময় সদাশোচনা করিয়া দেশবাসীকে উদ্ভুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন।

কিন্তু কোন শুভ প্রস্তাবকে বাস্তব ব্যাপারে পরিণত করিতে হইলে সমগ্র দেশের বহু, সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোকের ব্যক্তিগত সম্মতি, সহায়ভূতি এবং শুভেচ্ছা-পূর্ণ সাধনার প্রয়োজন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাহ্যিক আঘাত

যে নেতৃত্ব করিতেছেন, শুধু তাঁহাদের স্বক্কে সকল ভাৱ ন্যস্ত করিলে আমরা দায়-মুক্ত হইতে পারিব না। বিশেষতঃ কলিকাতার নেতৃগণ অপেক্ষা এ সকল সামাজিক ধার্ম্যারে আমাদের মত সাধারণ জনমণ্ডলীরই অল্প রূপে কর্তব্য করিবার শক্তি ও সুযোগ যে অধিক, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ইহার সাফল্য জন্য নব্যশিক্ষিত যুবকগণের দায়িত্বও সামান্য নহে। দেশচর্যা, সমাজ-সেবার ব্যাপকতা কিম্বা সারবত্তা উভয়ই অত্যন্ত বৃহৎ। কর্তব্য বিশেষেও কোনটা সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নহে। পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর সুযোগে ও সাহচর্য্যে স্ব স্ব শক্তি অনুসারে স্বদেশ ও স্বসমাজের সেবা করিয়া আত্ম প্রসাদ লাভ করিতে পারিলেই আমরা জীবন সার্থক মনে করিতে পারি। সমাজের যেখানে যে অভাব আছে, তাহার পূরণ জ্ঞাত চেষ্টা করিতে হইবে। যে প্রকারে যে কার্য্যাজ্ঞান করিলে সমাজ শক্তিশালী, দেশ সুখী ও সমৃদ্ধ হইতে পারে, তাহাই আমাদের করিতে হইবে। কর্তব্য কৰ্ম্মের ছোট বড় নাই।

যে দেশে বকিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের সমধুর

বংশীধ্বনি আজ শত যুগে নিত্য প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যে দেশ রাজর্ষি রামমোহন ও ব্রহ্মানন্দ স্তোত্রবচনকে ফোলে নিয়া ধস্ত হইয়াছে, যে দেশ পুণ্যলোক বিভাসাগরের জন্মস্থান ও কর্মস্থান, যেখানে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সুবারবিন্দ বিনিঃসৃত অমৃতোপম বচনাবলী মলয় মাকুতের জায় সুরভি প্রদান করিয়া সমগ্র দেশ, সমাজ ও সাহিত্যকে সুশীতল করিয়া রাখিয়াছে, বিশ্ব-প্রেমের, বিজয়-পতাকা স্বক্কে নিয়া এক দিন যে পুণ্য ভূমিতে শ্রীমদ্ভগবত্ “আচণ্ডালে কোল দিয়া” প্রেমের বজ্রায় সমগ্র দেশকে পরিপ্লাবিত করিয়াছিলেন, যে দেশে তাঁহাদের শত শত পুণ্য কাহিনী আমাদের মত অকিঞ্চন দীন দুর্দলকেও ভবিষ্যতের আশায় সর্বদা সঞ্জী-বিত, আনন্দে উৎফুল্ল করিয়া রাখিতেছে, সে দেশে নিরাশ হইবার কাহারও কোন কারণ নাই। ‘আরো আলোক’ ‘আরো জ্ঞান’, ‘আরো প্রেম’ পাইবার নিমিত্ত আমরা সকলে আশা ও বিশ্বাসের সহিত ভগবানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে স্ব স্ব ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োজিত করিয়া যেন কৃতার্থতা লাভ করিতে পারি, এই প্রার্থনা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী।

ব্রাহ্মসমাজ ও তাহার কার্য্য ।

পঞ্চম অধ্যায়—রামমোহন রায়, কলিকাতা বাসের পূর্বে । *

“হিন্দুদিগের সামাজিক ধর্ম্মপ্রণালী”—গৃহত্যাগ—হিন্দুত্বানের বহিঃপ্রবেশে গমন—রামমোহন রায়ের “কিত্ত”—ভূতকতুল মহাদীন—দেওয়ানী লাভ—রাংপুরে তবালোচনা সভা—ভাটুবধুর বৃত্তবাসীর সহগমন—পৈতৃক বিবাহ লাভে নিষেধ—তাঁহার উপর অত্যাচার ।

রামমোহন রায়ের সম্পূর্ণ জীবনী আমরা লিখিতে বিরত রহিলাম । তাঁহার জীবনের যে সকল ঘটনা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা স্থচিত করিয়া দিয়াছিল, সেই সকল ঘটনাই

আলোচিত হইবে। বর্তমান অধ্যায়ে তাঁহার কলিকাতার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইবার পূর্ব-কালীন কার্য্যকলাপ আলোচনা করিব।

এ পর্য্যন্ত অহুসন্ধানে বতদূর জানা

* ইহার পূর্বের অংশ এবার পৃষ্ঠা ৬, আগামী পাত্রে বাইবে ।

থিরাছে, তাহাতে দেখা যায় যে, রামমোহন রায়ের প্রথম প্রকাশ্য কার্য একখানি পুস্তক লিখন। পুস্তকখানির নাম “হিন্দুধর্মের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী।” এই সময়ে তাঁহার বয়স ছিল নুনাধিক বোল বৎসর। পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সভ্যতার রসিকপ্রবেশের সম্পূর্ণ প্রয়োজন এবং “পৌত্তলিকতার নিবিড় অন্ধকারে সমগ্র দেশ নিমজ্জিত” না থাকিলেও মূর্তিপূজা প্রধানত বঙ্গদেশের জনসাধারণে যখন বিশেষ প্রচলিত ছিল, সেই সময়ে আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে মূর্তিপূজার প্রতিরোধক এরূপ এক খানি পুস্তক লেখা হৃদয়ের স্বাধীনতার প্রসি-চয় দিয়াছিল, নিশ্চয়ই বলিতে হইবে। অরুণদেব যেমন স্বর্ঘ্যের অগ্রবর্তী দূত, সেইরূপ স্বাধীনতাই প্রতিভার আলোকধারী দূত। তখন পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নাই। তথাপি বোধ হয় যে রামমোহন রায় স্বীয় নবীন যৌবনের প্রথম উত্তমের কথা পিতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের নিকট ব্যক্ত করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই সম্ভবত তাঁহার মনোভাব সকল প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব অধ্যায়ে বলিয়া আসিয়াছি যে, তিনি নবম বৎসর বয়সে পাটনার আবাবী ও পারশী শিখির জন্ত প্রেরিত হইলেন। তথাব কয়েক বৎসর থাকিয়া আরবী ভাষার কোরণ, ইউক্লিড ও এরিস্টটল আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ, বিশেষতঃ মুসলমান ধর্ম তাঁহার উপর আত্মীবন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গ্রন্থের নামও এই কথার যথার্থ উপলব্ধ হইবে। এই নামের মধ্য দিয়া মুসলমানদিগের “সুৎপন্নিত” গোছের একটা ভাব উকিঝুঁকি করিতেছে।

চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার এক-

বার সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ হইতে চলিয়া গাইবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু পিতামাতার বিশেষ অস্বীকারে তাঁহার সন্ন্যাসী হওয়া ঘটিল না। এই সন্ন্যাসী হইবার ভাবটা বোধ হয় রামমোহন তাঁহার মাতামহকুলের সংসর্গে লাভ করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের উপরোক্ত মূর্তিপূজা-বিরোধী পুস্তক লিখনের ফলে তাঁহার পিতা ও আত্মীয় স্বজন বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই অনুমান হয়। পুস্তকে বোধহয় মুসলমানদিগের জ্ঞান মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে কিছু বেশী রকমের তীব্র আক্রমণ ছিল। রামমোহন রায়ও ভাবিলেন যে, তাঁহার চিরপোষিত দেশভ্রমণের আশা সফল করিবার ইহাই উত্তম সুযোগ এবং হয়তো কিছুকাল পিতার চক্ষের আড়ালে থাকিলে তাঁহার বিরক্তির তীব্রতাস্থির হইবে। তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। রামমোহন রায় অনেক বয়স পর্যন্ত গাছের শাখার জাল টাঙ্গাইয়া কুলশষ্যায় শয়ন করিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার আহার ব্যবহারের বিষয় আলোচনা করিলে বোধ হয় যে তিনি বাল্য-কালে একটা ডানপিঠে পাড়ারগেয়ে বালক ছিলেন। তখনকার কালে এরূপ দেশভ্রমণে বহির্গত হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে, বিশেষতঃ রামমোহন রায়ের জ্ঞান ডানপিঠে পাড়ারগেয়ে বালকের পক্ষে। তীর্থপর্যটন তখন নিত্য-নৈমিত্তিক কার্যের মধ্যে পরিগণিত হইত। এখন বরঞ্চ যতই তীর্থপর্যটনের সুবিধা বাড়িতেছে, তীর্থমহাস্রাব্যও লোকদিগের হৃদয়ে হইতে ততই বিদায় গ্রহণ করিতেছে। সেকালে দেশভ্রমণের সর্বপ্রধান অন্তরায় ছিল, ঠগীদের হস্তে প্রাণনাশের আশঙ্কা। রামমোহন রায় সম্ভবতঃ সন্ন্যাসীবেশ এবং অর্থ-

দীন তির্কক অবস্থায় বহির্গত হইয়াছিলেন, তাই ঠগীদের হস্ত হইতে আশ্রয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই দেশভ্রমণকালে কোন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সন্লাভ করিয়াই হউক বা অন্য কোন কান-গেই হউক, হিন্দুস্থানের পরপারে যাইয়া, বৌদ্ধধর্মের এবং সম্ভবত পুরাণেশ্বর শাসনের ৩৭ বিষয় জানিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়াতে, রামমোহন তর্কভিত্তিতে চলিয়াছিলেন। কেহ বা বলেন যে, তিনি তির্কক উপস্থিত হইয়াছিলেন, কেহবা তাহা স্বীকার করেন না। তির্ককে তাঁহার উপস্থিতি স্বীকার করিলেও তাহাতে কেবল তাঁহার ইচ্ছার দৃঢ়তারই পরিপরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার তির্ককে উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধেই আমাদের সন্দেহ আছে। কুমারী কার্পেন্টার রামমোহন রায়ের শেষ জীবন বিষয়ক পুস্তকে তাঁহাব যে পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে যে “ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাবশতঃ আমি হিন্দুস্থানের সীমানার বাহিরে কয়েকটি দেশে গিয়াছিলাম।”

এই সময়ে নেপাল ভূটান সিকিম প্রভৃতি দেশ ইংরাজদিগের আয়ত্ত হয় নাই। সুতরাং তখন হিন্দুস্থানের সীমার বহিঃস্থ দেশ বলিলে তির্ককের পরিবর্তে পূর্বোক্ত প্রদেশ সকল বুঝানই সম্ভব। তির্ককে গিয়া যে বৌদ্ধ অথবা, অন্য কোন প্রকার ধর্মের বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহার কোন পরিচয়, তাঁহার পক্ষে প্রকাশ পায় না। আমাদের অনুমান হয় যে, নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়া তথায় লামাপুত্রী তির্ককীয়দিগের ধর্ম আলোচনা করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। নেপাল সিকিম প্রভৃতি তখন বিশেষভাবে তির্ককের অধীন ছিল, সুতরাং এই সকল প্রদেশে গিয়াও

রামমোহন রায়ের বলা কিছু অসম্ভব ছিল না যে, তিনি তির্ককরাষ্ট্রে গমন করিয়াছিলেন। আর তির্ককে গমন করাও সেকালে বিশেষ অসম্ভব কার্য ছিল না। তখন বৌদ্ধ ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের ভারতে ও তির্ককে সর্ক-দাই অবাধ গতিবিধি ছিল। এখনকার ভ্রাম্য তখন প্রতি পদে আদেশপত্র লইয়া যাত্রা-তের বিধি ছিল না। হিন্দু সন্ন্যাসীগণ তখন মানসসরোবর, কৈলাস প্রভৃতি তীর্থদর্শনের জন্য তির্ককে যাইতেন এবং বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীগণ সারনাথ, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি তীর্থদর্শনের জন্য ভারতে আগমন করিতেন। উভয় দেশের জনসাধারণ এই সকল সন্ন্যাসীদিগকে অতি-মাত্র ভক্তিপ্রদর্শন করিত। সন্ন্যাসীদের সুবিধার জন্য নেপালবাসী রক্ষক প্রভৃতির নিয়মিত ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। চীন জাপান প্রভৃতি সমগ্র বৌদ্ধরাষ্ট্রে আবহমান কাল বঙ্গবাসীদের প্রতি বিশেষ সমাদর ছিল দেখা যায়, কারণ “অনেক বঙ্গাচার্য্য” এই সকল দেশে গিয়া বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। লেখকের পিতামহদেব যখন চীনদেশে ক্যান্টন নগরে গিয়াছিলেন, তখন বঙ্গদেশীয় সন্ন্যাস লোক বলিয়া বিশেষ আন্তরিক সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় গৃহ হইতে চলিয়া গেলে তাঁহার পিতা ভগ্নহৃদয় হইয়া অবশেষে তাঁহার অনুসন্ধানে লোক পাঠাইলেন। চারি বৎসর ভ্রমণের পর পিতৃশ্রুতির লোকের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাদেরই সঙ্গে রামমোহন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এখন পুত্রের বয়স কুড়ি বৎসর। সুতরাং পিতার সহিত তাঁহার অনেক সময়েই বন্ধুভাবে তর্কবিতর্ক চলিত। রামকান্ত রায় বাহা কিছু বলিতেন, তাঁহার প্রত্যেক উক্তির উত্তরে রামমোহনের একটি

করিয়া “কিন্তু” থাকিত। সময়ে সময়ে রাম-কান্ত রায় নিজস্ব জুংখিতকরে বলিয়া ফেলিতেন, আমি বাহা কিছু বলিব, তৌমার তাহার প্রত্যুত্তরে একটা কিন্তু থাকিবেই। পিতার সহিত প্রতিপদে উত্তর প্রত্যুত্তর করা সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতাপ্রিয় হইলেও বালক রামমোহন রায়ের ভাল লাগিত না। এবারে পিতার সম্মতি লাভ করিয়া রামমোহন রায় শাস্ত্রাধ্যয়নের নিমিত্ত পুনরায় কাশীধামে যাত্রা করিলেন। রামকান্ত এবারে তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতে লাগিলেন। বৎসর দশ কাশীধামে থাকিয়া উপনিষদাদি ভালরূপ অধ্যয়ন করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

রামকান্ত রায় ক্রমে কৰ্ম্মে অশক্ত হইয়া পড়িতেছিলেন, কাজেই রামমোহন রায়কে উপার্জনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। কৰ্ম্মের আশায় তিনি মুর্শিদাবাদে গেলেন। তথায় থাকিবার কালে “ভূহফতুল মহদীন” অথবা “একেশ্বরবাদীদিগের প্রাতঃদান” নামক একখানি পুস্তক এবং তাহার কিছু পূর্বে “নানাদর্শবিষয়ক আলোচনা” নামক আর এক খানি পুস্তক আরবী ভাষায় লিখেন। শেষোক্ত পুস্তকে মহম্মদীয় ধর্ম্মের উপর বোধ হয় কিছু তীব্র কটাক্ষপাত ছিল। এই কারণে সম্ভবত তাঁহাকে মুবশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাপন্ন করিতে হইয়াছিল। এদিকে তাঁহার পিতাও মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। রামমোহন রায়ের সম্মুখেই রামকান্ত রায়ের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে জন ডিগবি সাহেবের সহিত রামমোহন রায়ের কোন স্রুত্রে আলাপ ঘটিয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পরেই তিনি ডিগবির অধীনে কেরানীগিরি স্বীকার করিলেন। পিতার উত্তরাধিকারী হইলেন কৈষ্ঠপুত্র জগমোহন,

জুতরাং কৰ্ম্ম স্বীকার করা তখন রামমোহনের নিত্যসুই আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ডিগবির অধীনে প্রথম কেরানীগিরি পাইয়া ক্রমে ক্রমে তিনি দেওয়ানী-পদ লাভ করিয়াছিলেন। কলেক্টরের সেরেস্তাদারকে তখন লোকে দেওয়ান বলিত এবং এই পদই সেকালে দেশীয়দিগের প্রাপ্য সর্ব্বোচ্চ পদ বলিয়া পরিগণিত হইত। ক্রমে রামমোহন রায় এবং ডিগবি সাহেব উভয়ের পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুতাৎ জন্মিল। মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই বন্ধুতা স্থায়ী হইয়াছিল। তাঁহার উভয়ে মিলিয়া ইংরাজী ও দেশীয় সাহিত্যের চর্চা করিতেন এবং তদ্বিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য করিতেন। ডিগবি সাহেব ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে পর্য্যন্ত রংপুরে কলেক্টরী করেন। এই রংপুরে অবস্থিতকালেই রামমোহন রায়ের কার্য্যক্ষেত্রে ডিগবি সাহেব তাঁহার জমাবন্দোবস্তী কার্য্যে বিশেষ সখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

রংপুরে রামমোহন রায় সন্ধ্যার পর আপনাদের বাসাবাটিতে তত্ত্বালোচনার জন্য সভা আহ্বান করিতেন। মাড়োয়ারী, বণিকদিগের অনেকে এই সভার সভ্য ছিলেন। রামমোহন রায় রংপুরে থাকিতেই পারসী ভাষার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা এবং বেদান্তের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন।

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহনের মৃত্যু হয়। বিধবা ভ্রাতৃবধূ রামমোহনের নিষেধ সত্ত্বেও পতির সহগমন করিলেন। কিন্তু যখন চিতাঘির উত্তাপ সহ করিতে না পারিয়া তিনি একবার পলায়নের চেষ্টা করেন, সেই সময় আত্মীয় স্বজনগণ বলপূর্ব্বক বৃষ্টি, বৃষ্টি, বংশদণ্ডের সাহায্যে তাঁহাকে চিতা হইতে উঠিতে না দিয়া দখলিত করিলেন। রামমোহন রায়

নাকি স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখিয়া অত্যন্ত অতিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেই অবধি তিনি এই কুপ্রথা রহিত করিবার জন্ত বদ্ধ প্রতিজ্ঞ হইলেন ।

রামমোহন রায় পিতার মৃত্যুর পর অবধি একটু বেশী প্রকাশ্য ভাবে নিজ মত প্রকাশ করিতেছিলেন, দেখা যায় । ইহার কালে তাঁহার মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়ের সহিত তাঁহার আন্তরিক সম্বন্ধ থাকিতে পারে নাই । রংপুরে থাকিতে যখন রামমোহন রায় তত্ত্বালোচনার সভা স্থাপন করিলেন, তখন তত্রস্থ জজকোর্টের দেওয়ান গোরাকান্ত ভট্টাচার্য্য তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কয়েকটা নিন্দাপূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন । এ দিকে রামমোহন গৃহের মধ্যে মাতাকে প্রধানত প্রতিভূ দেখিয়া বিষয়ের অংশ লাভের জন্ত কোনই চেষ্টা করেন নাই । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তিনিই বিষয় ভার গ্রহণ করিলেন, রামমোহনও নিশ্চিন্ত হইলেন । পৈতৃক বিষয়ের জন্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ না করিবার কারণও একটা কারণ এই যে, বর্ধমান রাজার সহিত এই বিষয় লইয়া বহুকাল যাবৎ সিবাদ চলিয়া আসিতেছিল—লাভের গুড় পিপড়ার খাইতেছিল । বাই হউক, জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতার মৃত্যুর পর দেবার দায়েরই হউক বা ভ্রাতৃপুত্রের পৈতৃক বিষয় রক্ষা করিবার অক্ষমতা বশতই হউক, যখন তাহা রামমোহন রায়ের হস্তে আসিয়া পড়িল, তখন তিনি তাহা রক্ষা করিতেও বাধ্য হইলেন । তাঁহার মাতা কিন্তু আপত্তি করিলেন যে বিষয়ী পুত্র বিষয় পাইতে পারে না । রামমোহনের মত সকল হিন্দুধর্মের বিপরীত নহে, ইহা প্রমাণিত হওয়ায় মাতার উত্থাপিত আপত্তি আদালতে অগ্রাহ্য হইল । রামমোহন রায় যথাপূর্ব্ব মাতাকেই বিষয় পর্য্যবেক্ষণের ভার প্রদান করিয়া স্বয়ং তাঁহার জমিদারীর সংলগ্ন এক প্রান্ত ভূমিতে একটা ক্ষুদ্র বাসস্থান নির্মাণ করিয়া রাখিলেন—কর্ম্মস্থান হইতে আগমন করিলে তথায়ই অবস্থিত করিতেন । সেই বাসা গৃহে “শুভতংসং” এবং “একমেবাদ্বিতীয়ং” খোদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন । মাতা ব্যতীত রামমোহনের জ্ঞাতি রামজয় বটব্যাল তাঁহার উপর বধেষ্ট অত্যাচার ও উপদ্রব করিতেন । রামমোহন উক্ত জ্ঞাতির সহিত বিবাদ করিবার স্বয়ং অক্ষমতা বুঝিয়াই সম্ভবতঃ ধৈর্য্যধারণ করিয়াছিলেন । সেই গুণে ক্রমে সেই সকল অত্যাচার আপনাপনিই থামিয়া গেল ।

ত্রিফিত্তিঅনাথ ঠাকুর ।

দুটা তত্ত্ব কথা । (৩)

পূর্বে বলা হইয়াছে, যোগশাস্ত্রের আর এক নাম আত্মবিজ্ঞান । এস্থলে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার সহিত আত্মজ্ঞান-চর্চা বা যোগাভ্যাসের যেরূপ বিষয়ে কিছু বলিলে দোষের হইবে না ।

মোটামুটি পৃথিবীতে বিবিধ সত্যতা

দেখিতে পাওয়া যায় ; প্রাচীন প্রাচ্যসত্যতা ও আধুনিক প্রতীচ্য সত্যতা । সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সুখাশ্বেষণের চেষ্টার উৎকর্ষতা ও সাফল্যের নামই সত্যতা । সুতরাং উভয় সত্যতারই মূলে সুখাশ্বেষণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । পরন্তু দুই স্থলে দুই প্রকার সুখ

অধেষিত এবং উভয়ের মধ্যে এত প্রভেদ
যে, আধুনিক সভ্যতার স্বার্থদেষণকে হুংখা-
দেষণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পাশ্চাত্য
সভ্যতা যেন ক্রমাগত চীৎকার করিয়া বলি-
তেছে :—“হে মানুষ ! যদি সভ্য নামে
আখ্যাত ও গৌরবাসিত হইতে চাও, যথা-
সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব অধিক
মাত্রায় সুখ খুঁজিয়া লও। তোমার সুখের
উপাদান সমস্ত তোমার বাহিরে বিদ্যমান।
চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহায়তায়,
বিশ্লেষণী বুদ্ধি ও কল-কারখানার সাহায্যে
বহির্জগৎ বা জড় প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে
তোমার অধীনে আনয়ন কর, বড় সুবিধা,
বড় আরাম, বড় সুখ পাইবে। ঐ জড়
প্রকৃতিকে করায়ত্ত করিতে তোমার ভিতর-
বাহিরের সমগ্র শক্তি ব্যয়িত হউক ; তাহার
ফলে তুমি সুখ ত পাইবেই, অধিকন্তু যে
সকল জাতি উহাকে স্বীয় দাসত্বে নিবৃত্ত
করিবার চেষ্টায় পরাযুখ থাকিবে বা তৎ-
সংক্ষেপে অক্ষম সাব্যস্ত হইবে, তাহাদিগের
উপর তোমার অদীম প্রভুত্ব ও দৌর্দণ্ড
প্রতাপ সংস্থাপিত হইবার কথা, এবাধ
রাজত্বে তোমার আরও কত সুখ কত প্রভাব
বৃদ্ধি পাইবে।”—সমস্ত ইউরোপ আমেরিকা
আজ এই উদ্দেশ্যে গোলা, বারুদ, গ্যাস, বাম্প,
তড়িৎ, ইথার প্রভৃতির ভিতর সুখের প্রস্রবণ
খুঁজিতে গিয়া সমস্ত মানসিক শক্তি বহির্জ-
গতে ব্যয় করিতেছে। ইহাতে সুখের পরিবর্তে
ক্লিষ্টরূপ হুংখ পাইতেছে, তাহা উহাদের মনোবী-
গণের “মানব জীবনের কোনই মূল্য বা
অর্থ নাই”!!—* ইত্যাকার হাছা-রবে
সম্যক রূপে প্রমাণিত। দেহাশ্র-বুদ্ধি,
জড়োপাসক, ইহসর্বস্ববাদী ঘোর স্বার্থপর

* Life is not worth living.

স্বার্থপরতার সাহা পরিণাম, তাহা হইতে পান্ডিত্য
অগতে প্রকটিত হইতেছে। আত্মহত্যার
সুবিধার জন্য গুপ্ত সমিতি† স্থাপিত,
বাহার সভাবন্দ পরস্পরে পরস্পরের আশ-
নাশের সাহায্য করিতে পারে—নিষিদ্ধ
রূপে করিতেছে, আর কি চাই! প্রেমময়
পরমেশ্বরের রাজ্যে কি অভিনব দৃষ্ট পাঠক
একবার ভাবিয়া দেখুন—এক দিকে কোটি
কোটি নরনারী কৃতদাস দাসীর হায়ে দিবা
রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা যৎসামান্য
গ্রাসাচ্ছাদন লাভে কৃতার্থ বোধ করিতেছে,
অপরদিকে কতকগুলি লোক-বিপুল অর্থ
সংগ্রহ করিয়াও অতৃপ্ত অবস্থায় “আরও ধন
চাই”! “আরও ধন চাই”! বলিয়া চীৎকার
করিতে করিতে বস্ত্র গুপ্ত হায়ে উদ্ধৃৎসে
ছুটাছুটি করিতেছে।†

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কিন্তু সম্পূর্ণ
ভিন্নরূপ উপদেয়। আমাদের ঋষিগণ বহুযুগ
পূর্বে বলিয়া গিয়াছেন “সর্বমাত্মগতং সুখং”,
সুখ আমা বাতীত অন্য কোন পদার্থের
অপেক্ষা করে না, সুখ বাহা কিছু সব ভিতরে,
বহির্জগৎ বা জড় প্রকৃতির মধ্যে সুখ থাকিতেই
পারে না। বাহিরে বাহাকে সুখ বলিয়া মনে
করা যায়, তাহা হুংখের কারণ, অসন্তোষের

† “Suicide Club” in New York. U. S. A

‡ We see on the one hand millions of men and women chained to a ceaseless slavery, interminably toiling in order to obtain a poor and scanty meal and a garment to cover their nakedness, and on the other hand we see thousands, who already have more than they require and can well manage, depriving themselves of all the blessings of a true life and of the vast opportunities which their possessions place within their reach, in order to accumulate more of those material things for which they have no legitimate use. Surely men and women have no more wisdom than the beasts which fight over the possession of that which is more than they can well dispose of, and which they could all enjoy in peace.

* “All these things added”—James Allen

পূৰ্ণবর্জী ভাব মাত্র; ভিতরের স্ব্থের নাম শান্তি; শান্তি সন্তোষের দাসী, স্বতবাং আগে সন্তোষ শিক্ষা আবশ্যক, যদি শান্তিলাভের প্রয়াস থাকে। তাই আৰ্য্য উপদেশটা বলিয়া গিয়াছেন :—

সন্তোষামৃততৃপ্তানাম্

যং স্বথং শান্ত চেতসাম্।

কুতস্তজ্জনলুকানাম্

ইতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্ ॥

দেহটাকে রক্ষা করিবার জন্য যতটুকু দরকার, বহির্জগতের প্রতি ততটুকু মনোযোগই দেয়; শারীরিক স্বাস্থ্য ও প্রাণ রক্ষাব জন্য অতি সামান্য মাত্র শক্তি জড়ের প্রতি ব্যয় করিয়া মনের বাকী সমস্ত বল ভিতরের দিকে প্রযুক্ত। প্রকৃত স্বথ, শান্তি, প্রভূত যদি কেহ চায়, কেবলমাত্র যথা প্রয়োজন জড়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আত্মার প্রতি সম্যক মনঃসংযোগ তাহাব একান্ত কর্তব্য। মন স্থির হইয়া আত্মাব প্রতি সংযুক্ত হইলে জীব যে কি অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে, তাহা ত বর্ণনাভীত, অধিকন্তু এমন এক অদ্বিতীয় শক্তি তাহাতে সমুদ্ভূত হয়, যাহার বলে স্থিতির যাবতীয় রহস্য তাহার নিকট উদ্ঘাটিত হয় এবং তৎসঙ্গে জড়চৈতন্যের সমগ্র অগৎ তাহার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তাহার আচ্ছাদিত প্রতীক্ষা কবে। সংসারের সমস্ত ধুরন্ধর ও লৌকিক আধিপত্য তখন তাহার নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া সাব্যস্ত হয়, সে তখন অনন্তকে গ্রাস করিবার জন্য প্রস্তুত, যখনই ইচ্ছা করিলে ক্ষমতা লাভ তখন তাহার লক্ষ্য।

এখন দেখা যোয়, উল্লিখিত দ্বিবিধ গভ্যতার কিরূপ আধিপাতাল প্রভেদ। একের প্রতি জড়ের ঐক বিপরীত দিকে, যেহেতু

একটা সত্যসুপের, অপরটা বোর কলিকালের। একটা জড়ের মোহিনী মায়ার মুগ্ধ হইয়া জড়ের সঙ্গে তাদৃশ্য ভাব বশতঃ পরাধীন, জড় বুদ্ধিগত, গুরুতরাক্রান্ত, অধোগতি প্রাপ্ত, অপরটা আত্মসংসর্গে উন্নত হইয়া চৈতন্যের মুক্ত আকাশে স্বাধীন ভাবে পক্ষ বিস্তার করতঃ উচ্চাৎউচ্চতব লোকে উড্ডীন।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে যাহাবা অংশে ধীসম্পন্ন বিজ্ঞানধুরন্ধর বলিয়া পৃথিবীতে আত্মসম্পূর্ণিত, তাঁহারা মানব মনের অদ্বিতীয় শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পরায়ুখ, পঞ্চেন্দ্রিয়জাত বিময় ব্যতীত অন্য কিছুই অস্তিত্ব তাঁহারা স্বীকার করিতে চাহেন না।* আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পরিদর্শন, প্রক্রিয়া ও সাধারণীকরণ † ভিন্ন জ্ঞানোপার্জননের যে অন্য কোন উপায় আছে, একথা তাঁহাদের নিকট নিতান্ত অস্বীকৃত ও অবিজ্ঞান-সম্মত। হয়। পণ্ডিতোপাধিক জড়বাদিগণ বস্তুতঃ কত মূর্খ। প্রকৃতজ্ঞানে তাঁহারা শিশুবৎ।

পবিত্রাণেব বিষয়, আজকাল পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানেব "চাক্চিক্যে আর্থাৎসত্ত্বানগণ এতাদৃশ মুগ্ধ ও তডিচ্ছক্তি-প্রভায় তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি এ পবিমাণে অপ্রভূত যে, চৈতন্য বাজ্যের অনন্ত সত্য সমূহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

* ইংলণ্ডের বিজ্ঞান সভার সভাপতি জড়বিজ্ঞান বিশাষণ মহাশয় টিডাল এক সময়ে উক্ত সভার প্রচার করিয়াছিলেন,—

"In matter I see the promise and potency of every form of life" Prof Tyndall—President, Royal Society

পরন্তু সে দিন সেই আসন হইতে বিজ্ঞান প্রকৃৎ সাহেব বলিয়াছেন—

"In life I see the promise and potency of all forms of matter"—Sir William Crookes;

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ক্রমে বাতাস উট্টা বহিতে আরম্ভ হইয়াছে।

‡ Observation, experiment and induction.

প্রমাণাভাবে তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ উপ-
ক্ষেপীয় বিষয় হইয়াছে; মানুষ মনোব-
ধারণ শক্তিতত্ত্ব চর্চা করণি দ্বারা উপলব্ধি
হইবার নয় বলিয়া তাঁহারা উহাকে বিজ্ঞান-
বিরোধী স্বতরাং অগ্রাহ্য বিবেচনা করিতে
ছেন। তাঁহাদের মতে এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ-
রহিত অনিশ্চিত ব্যাপারের আলোচনায়
সময়ক্ষেপ দ্বারা আমার নিষ্ফলপ্রদ উত্তমে বৃথা
শক্তি প্রয়োগ বুদ্ধিবৃত্তি মাহুষের পক্ষে অস-
ম্ভব ও বিগহিত।

যোগশাস্ত্র কি, বা কিরূপে আমরা যোগ-
মার্গে আরোহণ করিতে পারি, এ সকল
কথার আলোচনাই আমাদের জ্ঞান বাসনা-
বিমুক্ত বিষয়বুদ্ধি পামরের পক্ষে বোর খুঁটতা,
সন্দেহ নাই। স্বতরাং এই গভীর দর্শন
সম্বন্ধে কোন প্রকার জ্ঞান বিস্তার এ অবস্থার
উদ্দেশ্য নহে। তবে কৌল্যপিত পাশ্চাত্য
বিজ্ঞানে লক্ষণিক উপাধিকরণকে জটিল-
সবজ্ঞান ও জড়োপাসনা-প্রবৃত্তি হইতে
বিস্তৃত করিবার জন্ত দুটা কথা বলা মাত্র
উদ্দেশ্য। আমার এই স্বরাগ্যসে যদি কাহারও
যোগশক্তির অদ্ভুত ক্ষমতা পরিজ্ঞান ও পরীক্ষা
করিবার বাসনা উদ্রিক্ত হয়, তিনি এ বিষয়ে
গুরুগুরু অবেষণ করতঃ উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন
পূর্বক সকল জ্ঞানের লাভে প্রয়াস পাইবেন।
কেবল এই কঠোরতম বিজ্ঞানের মাহাত্ম্য;
কাঠিন্য, অলৌকিক শক্তিমত্তা ও বিশেষ
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দুই চারিটা মোটা কথা
মাত্র বলিব।

বিশেষত্বের সৃষ্টি-রহস্য কিছুমাত্র পর্য্য-
লোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, জড়-
চৈতন্যের সমগ্র জগৎ ঐক্যব্যা ক্রমবৃত্তীয়
নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। একটা
সামান্য চিন্তাকণিকাও অনিয়মে বা মনো-

রাজ্যেব কোন একটা নিয়ম অতিক্রম করিয়া
মানব মস্তিষ্কে উদয় হইতে পারে না।
ভৌতিক রাজ্যেও যেমন, মানসিক রাজ্যেও
তেমনি $2 + 2 = 8$ এর মত কঠোর বৈজ্ঞানিক
নিয়মাবলী বিস্তারিত প্রাকৃতিক সপ্রমাণে কার্য
করিতেছে, কোথাও তিলমাত্র ভুলভ্রান্তি
হইবার যো নাই। যে প্রকার জড়জগতের
নিয়মগুলি সম্যক অবগতির পর আমরা নানা-
বিধ প্রক্রিয়া দ্বারা নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার
করিয়া থাকি, তদ্রূপ মনস্তত্ত্বের সম্যক জ্ঞান
লাভান্তর সুসম্পন্ন মানসিক প্রক্রিয়া সমূহ
দ্বারা জ্ঞানে গভীরানু ও বলে মহীম্বন হইতে
পারি; তখন জড়শক্তি সকলকে স্বায়ত্ত
কবা ত নিঃসৃত সহজসাধ্য কাজ। কিন্তু
হায়! মনের বলকে সংযত করিয়া আপন
অধীনে আনিতে হইলে যে কিরূপ প্রবল
ইচ্ছা শক্তি, কিরূপ দৃঢ় সংযমাত্ম্য ও
কিরূপ কঠিনতম ত্যাগ-স্বীকার প্রয়োজন,
তাঁহা ভাবিলে মন প্রাণ নৈরাশ্রে অবসর
হইয়া পড়ে। যেমন কঠোর বিজ্ঞান, তেমনি
কঠোর অভ্যাসত্রয় চাই। এই মহাবিজ্ঞানে
পারদর্শিতা লাভ বিপুল অধ্যবসায় ও সুদীর্ঘ
কাল সাপেক্ষ। যোগজ্ঞান কত যুগযুগান্তর
ধ্যানস্থ থাকিয়াও চরমফল লাভ করিতে
পারেন না; পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্রতবাস মোহময়
শরীর-নিগড়ে বদ্ধ ক্ষুদ্র জীব আমরা কি
প্রকারে বুঝিব, এই যোগধর্মের কি জ্ঞান-
মধু পাপরা যায়, বাহ্য পান করিয়া একাসনস্থ
যোগিবর জ্ঞানানন্দে সুদীর্ঘকাল বিভোর
থাকিতে পারেন?

জড় পরমাণুর যেমন ধ্বংস নাই, সেইরূপ
প্রতি মুহূর্তের চিন্তারও কিছুই বিফল নষ্ট
হয় না। মানুষ মনের প্রত্যেক চিন্তা বালের
সঙ্গে সঙ্গে আকর্ষণে বিভীন হইয়া থাকিতেছে।

‘বলিষ্ঠ’ আশ্রিততঃ বোধ হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ ছোট বড় সকল চিন্তাই আমাদের মনোময় কোষে এক একটা ছাঁপ বসাইয়া বাইতেছে। আমাদের এখনকার মন পূর্ণ পূর্ণকায়ের অল্পভূত চিন্তা সমষ্টির ফল মাত্র।* আমাদের চিত্তের প্রতি আমরা আদৌ খেয়াল করি না, মনে করি উহা ত কেহ দেখিতে পাইতেছে না, পরন্তু ঐ চিন্তাগুলিই আমাদের চরিত্র গঠন করিতেছে। এক একটা সজ্জিতা দ্বারা যেমন আমাদের সাধুভাব বৃদ্ধি পাইতেছে, ঠিক কুচিন্তা সমূহ দ্বারা তেমনি অসাধু ভাব বর্ধিত হইয়া ক্রমে কুঅভ্যাস-পরিণত অবস্থায় লোক চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। চিন্তাই কৰ্মের প্রযুক্তি, কোনরূপ অহুতান-আগে চিন্তার দ্বারা কল্পিত না হইলে ক্রিয়াক্ষেত্রে কার্যোপযোগী হইবে? মানুষ কৰ্মাধীন জীব, সে ক্ষেত্রে আপনাপন চিন্তা-রাশির প্রতি বাহ্যদের দৃষ্টি নাট, তাহাদের জীবনতরী নিউ-নির্ঘর চক্রবর্ণনে অসমর্থ অন্ধ কৰ্মধার পরিচালিত ও জলধানের জায় উদ্বেগ-বিহীন মার্গাবলম্বনে অচিরে বিপর্য হইবে,

— ৫ —

* As you think, you create thought forms, every thought of your intellect creates a corresponding form in the matter of the mental plane, those thoughts of the intelligence, thoughts of the passionate nature, are objectivated and take substantial form, those thoughts make your mental atmosphere, cluster round you, remain with you, modifying your whole development. They mould your body to some extent. * * When you die these thought images remain, making the character that you have built by your thought, by your intellectual activity during life—that character endures, and when the time comes for re-incarnation the thought-image is thrown downwards to the astral plane, and there becomes densified by building into it astral matter, and this astral form is the outcome of your thought and life today, is the mould into which the physical body is cast, so imbedding the form of the physical apparatus by the form that has been made by you in a previous life.—Annie Besant.

সে বিষয়ে অহুতান সন্দেহ নাই। হইতে পারে, প্রাক্তন স্মৃতি কলে কেহ কেহ স্বীয় চিন্তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিয়াও সাধুভাবে চলিয়া বাইতেছেন, উত্তরোত্তর উন্নত হইতে গেলে তাহাদিগকেও সৰ্বদা সমস্তে পুঞ্জি বাড়াইতে চেষ্টা করা কর্তব্য।

অহুতানবিহীন সাধুচিন্তা দ্বারা সম্যক ফল লাভের আশা দেখা যায় না; শুদ্ধপদটি পছন্দ অবলম্বন পূর্বক চেষ্টাকৃত চিত্ত সংযম এবং প্রণালীগত সজ্জিতা ও সংকল্প মাহুতকে যোগ্য মার্গে বিলক্ষণ সাহায্য করিয়া থাকে। আমাদের চিত্ত পূর্বাভ্যাস বশতঃ—সুতরাং স্বভাবতঃ—বড়ই চঞ্চল। মন সৰ্বদা স্বতঃই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটিতে প্রবৃত্ত এবং তত্ত-বিষয়ভূগত সুখ ও দুঃখের অল্পভূতিবশাৎ মনের স্থিরতা কোথায়? সাধারণ জীবের মন নিয়তই বিকারদশাগ্রস্ত। এবিধ বিকার হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা আরম্ভ না করিলে যোগমার্গে প্রবেশ করা যায় না। যেমন বাত্যা-প্রকম্পিত উর্ধ্বচকল সরসীকে গগনবিহারী চৈত্রের ছবি সূচাক্রমে প্রতিফলিত হইতে পারে না, কেবল স্থির জল-রাশিতেই শশপরের অখণ্ড শুভ্রোজ্জ্বল কান্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, সেইরূপ, যে ধন্য পুরুষের মানস-সরোবরে বিষয়প্রভঞ্নের নিক্ষেপ ক্রিয়া আদৌ পড়িছে না, বাহার চিত্ত মোহ-বিকারের হাত এড়াইয়ে সক্ষম হইয়াছে, প্রত্যুত সমভাবাপন্ন হইয়া আত্মমুখী, কেবল তিনিই বিশ্বরহস্যভেদী ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সক্ষম।

অনেকের ধারণা গৃহস্থাপ্রম পরিভ্যাগ-না করিলে যোগার্থ্যাস অসম্ভব, ইহা ভ্রমাত্মক। প্রত্যেক গৃহী সংসারধর্ম্মে নিবিষ্ট থাকিয়াও উপযুক্ত শুদ্ধর অধীনে যোগসাধন আরম্ভ করিতে পারেন। এখানে যোগসাধন অর্থে

কতকগুলি অস্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়া
বুঝিতে হইবে না। মনোবিজ্ঞান ও
নীতিবিজ্ঞান, উভয়ের বিহিত অধ্যয়ন দ্বারা
চিত্তের সাধারণ অভ্যাস সমূহ আমূল পরি-
বর্তিত না হইলেও বিশেষরূপে সংশোধিত
হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নচেৎ যোগরাজ্যের
প্রথম প্রদেশে প্রবেশাধিকার জন্মে না। গৃহী
বা সন্ন্যাসীর বিচার নাই, হিন্দু মুসলমানে
ভারতময় নাই; যে কোন নির্মলচিত্ত ব্যক্তি
বিষয়বিমুক্ত হইয়া চেষ্টা করিবেন, তিনিই যোগ-
বিজ্ঞানের প্রক্রিয়া দ্বারা সংসারের সকল
প্রকার রহস্য ভেদ করতঃ কৃতার্থ হইবেন।

স্বার্থসেবী ভোগগণ কতকগুলি শারীরিক
অভ্যাস ও উত্তমের দ্বারা সময়ে সময়ে যে ছই
একটা অসূত প্রক্রিয়া অনসমাজে দেখাইয়া
প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকে, তাহা তাহাদি-
গকে জ্ঞানের উন্নত সোপানে না উঠাইয়া
অধঃপতনের দিকে লইয়া যায় এবং অচিরে
বৈজ্ঞানিক নিয়মমাফলে সেই সামান্য শক্তি-
টুকুও তাহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হয়।
পরন্তু যথার্থ যোগী কখন স্বীকৃতবে অকৌর
অলোকসামান্য বিহুতি সাধারণের মধ্যে
প্রচার করেন না, কারণ নীতিবিজ্ঞান তাহা-
দিগকে প্রথমেই স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছে
যে যশ মান, খ্যাতি প্রভৃতির জন্ত বা অজ্ঞ
কোন প্রকার স্বার্থসাধনার্থ তপস্তালব্ধ শক্তি
ব্যবহার করিলে আত্মীয় অশেষ অকল্যাণ হইয়া
থাকে।

পৃথিবীর অজ্ঞাত ধর্মশাস্ত্র চিত্তসংযম ও
মনোমগ্ন দূরীকরণের পর আর কোন উপদেশ
দেন না; কিন্তু পরমার্থজ্ঞানী জিগুগাভীত
আর্য্য স্বর্বিদগের শিক্ষা দীক্ষা এই যে, চিত্ত-
তত্ত্বের পর ধ্যানধারণাদি ভৌগিক পন্থাবলম্বনে
জ্ঞানমার্গে উন্নীত হইয়া ঈশ্বরকে পূজিতে

হইবে; ইহার পূর্বে কল্পকল্পাত্মকী কল্যা-
ণের আকাঙ্ক্ষা মর্যাদিকার জন্মে আশা।
বিনা যোগে জড়চেতন সত্ত্বকে জ্ঞানলব্ধ
হয়, তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে, জ্ঞানের খোলা
মাত্র। প্রতিমিতনয়ন যোগীসত্তম এককালে
সমস্ত বিশ্বরহস্যের অন্তর্ভুক্তি বিরাট করিতে
থাকেন।

একবল যোগশাস্ত্রই আমাদেরকে সম্যক-
রূপে বুঝাইয়া দিতে সক্ষম যে, বহির্জগতে বসত
কিছু শক্তি বিজ্ঞান, সুতরাং আমাদের ভিতরে
অবস্থিত, কারণ মানুষ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। যে
আত্মা আমাদের মধ্যে প্রাণরূপে বিরাজিত,
ক্ষিপ্তপতেজময়ব্যোমেও একমাত্র তাহারই
শক্তি কার্য্য করিতেছে; ঐ ক্ষুদ্র জলুপ্তরে
আত্মা যে শক্তি বিজলীরূপে খেলিতেছে,
আমাদের মনোমধ্যে সেই শক্তি পূর্ণমাত্রার
ক্রিয়াশীল;—বিদ্যাক্ষতি যদি এক মিনিটে
এখান হইতে ইংলণ্ড যাইতে পারে, আমাদের
মন যোগবলে মুহূর্ত্তমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া না
আসিবে কেন? পরিদৃশ্যমান জড়শক্তি এত
শক্তির বহির্বিকাশ ব্যতীত আর ত কিছুই নয়,
সুতরাং উহা আত্মপ্রতিভার অমুগত দানী-
মাত্র। আত্মশক্তির ইচ্ছাক্রমেই জড়শক্তির
উৎপত্তি, গঠন, স্থিতি ও নাশ বা রূপান্তর-
প্রাপ্তি; একথা আজ আমরা বিশ্বত, তাই
দেখিতেছি, সমস্ত পৃথিবী জড়ের সেবক জড়ের
উপাসক। হায়! আমাদের জ্বিতরে অনন্ত
শক্তি চির-বিদ্যমান থাকিতেও অতি সামান্য
শক্তির জন্ত আমরা বুধা জড়ের পশ্চাতে ছুটা-
ছুটি করিতেছি; মনুষ্য হইয়াও মনুষ্যত্বকে
ব্যবহারে আনিতে শিখিলাম না। হায়!
হায়! কবে আমরা যথার্থ মানুষ হইব, বিশেষ-
স্বরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্যতা
লাভ করিব! কবে আবার সেই পূর্ণরোহিত্য

প্রাচীন আৰ্য্য মহাপুরুষদিগের প্রচারিত আত্ম-বিজ্ঞান পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানকে পদদলিত করিয়া জগতীতলে প্রকৃত সূত্র ও শাস্ত্রের পতাকা উড়াইবে, মানব মনে স্বর্গের রাজত্ব সংস্থাপিত হইবে।

অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে গর্ভ করিতে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে আৰ্য্যগণ জড়-বিজ্ঞানেরও যথেষ্ট চর্চা করিয়াছিলেন এবং তৎসম্বন্ধে এমন সকল আবিষ্কার করিয়া যান, যাঁহার মধ্যে বর্তমান ব্যাঙ্গার সমূহ ত ছিলই, তৎকালীন এ প্রকার বহুতর বিষয় তাঁহারা জানিতেন, যাঁরা আধুনিক বিজ্ঞানাদির এখনও অগোচর রহিয়াছে। তাঁহারা বলিতে চান যে, ইউরোপীয় প্রণালীতে আৰ্য্য মনীষীরা প্রক্রিয়া-বিজ্ঞান সমূহ* আয়ত্ত করিয়াছিলেন; তাই রসায়নশাস্ত্র,† পদার্থবিজ্ঞান, ‡ জ্যোতি-বিজ্ঞান, § শরীরতত্ত্ব || প্রভৃতি সম্বন্ধেও অদ্ভুত বিচক্ষণতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা কি তাহাই? তাঁহারা কদাপি কোন শ্রেণীর জড়বিজ্ঞানের পশ্চাতে একবিহুও শ্রম ব্যয় করেন নাই; জড়তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য তাঁহাদিগকে কারখানায় গা প্রক্রিয়া দ্বারা মাথা ঘামাইতে হয় নাই, তাঁহাদের চিন্তা আদৌ ওদিকে যায় নাই। মানুষের স্বচ্ছন্দজীবনবাগন ও স্বাহ্যরক্ষার জন্য যে সকল জড়তত্ত্ব জানা আবশ্যক, সুস্ব-দর্শী ঋষিগণ আত্মবিজ্ঞান প্রভাবে তাহা যথা-যথভাবে অবগত হইয়া শাস্ত্রের অমূল্যসনাক্তে অপায়সসাধারণের নিকট প্রচার করিয়া

যাইতে ক্রটি করেন নাই, এখানে যথাযথভাবে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহাদের জ্ঞানের সূত্র যুক্তিসূত্র অসুমান* ছিল না, সমস্তই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি † দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছিল। তাঁহারা আমাদের চক্ষুচক্ষে দেখাশ মত অন্তঃকক্ষ দ্বারা ঠিক তজ্ঞপ দেখিয়া পুণ্য-মুগ্ধরূপে জড়পদার্থ সমূহের শক্তি, কার্য্য কারণ সম্বন্ধ ও সংযোগ বিয়োগ প্রণালী অস-ধাবন করিতেন। তদভাবে পাশ্চাত্য উপায়ে, লব্ধ তথ্যাদি নিতান্ত একদেশী, সূত্ররাং অস-ম্পূর্ণ, কাজেই নিত্য পনিবর্তনশীল। এতদ্বলে জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে যে, ঋষিগণ যদি যোগ-বলে ভৌতিক জগতের সমস্ত তত্ত্ব সম্যকরূপে অবগত ছিলেন, তবে তদানীন্তন ও পরবর্তী লোক সাধারণের গোচরার্থ তাহা কেন প্রকাশ্যভাবে প্রচাৰ করিয়া গেলেন না? জড়রাজ্য সম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা মানব জ্ঞানের উন্নতি সাধন না করা কি তাঁহা-দের উচিত হইয়াছে? এবিধ অচিন্তা-গ্রন্থত প্রশ্নের উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, জড়বিজ্ঞানের অমুশীলন জন্য ভৌতিক জগ-তের পশ্চাতে ছুটাছুটি করা মানব জীবনের উদ্দেশ্য নহে। সাধুকার্য্যের দ্বারা প্রাক্তন-অকস্ম-বিকর্ষ-কর, বাসনা বিনাশ সহকারে, সর্বকর্ম্মকর, সর্বকর্ম্মকর দ্বারা মারামোহময় সূচুৎ সংসার শৃঙ্খল ছেদনান্তর মুক্তিলাভ করত সূত্র হুঃখ ব্যাধিজন্ম মরণের অতীত হইয়া সচ্চিদানন্দে অবস্থানজনিত পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণানন্দ উপভোগ—কর্ম্মবাদী আর্ষ্যের নিকট ইহা অপেক্ষা জীবের মহত্তর উদ্দেশ্য আর কি হইতে পারে? এ নিমিত্ত একমাত্র

* Experimental sciences.

† Chemistry.

‡ Physics.

§ Optics.

|| Anatomy and physiology.

¶ Laboratory.

* Rational hypothesis.

† Direct perception.

বিষ্ণুর পরমপদ তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল; বিষয়
স্বপ্নে জলাঞ্জলি দেওয়াই, ঋষিদিগের প্রধান
উপদেশ। পঞ্চেন্দ্রিয়ামৃত, অমরা-প্রসূত;
ভ্রমজালামৃত, ক্ষণবিশ্বংসী প্রগল্ভ মানবের
দ্বিবিজ্ঞান-প্রণোদিত উল্লিখিত উদ্দেশ্য, সাধ-
নের ইচ্ছা ও চেষ্টাতে প্রতিনিয়ত লক্ষ প্রকার
বাধা প্রদান করিতেছে। অর্জু তমোন্তপ
প্রসাধক, তাই আজ জড়ের সেবা করিতে
করিতে সমগ্র পৃথিবী বোর স্বার্থাক্রমতমসাক্ষর
হইয়া ভ্রাতৃত্বেষে জর্জরিত। অর্জু চৈতন্ত্যেব
বিরোধী, তল্লিমিত ঋষিগণ গোময় হইতে
গেহতার্য্য পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূতের তত্ত্ব আয়-
বিজ্ঞান দ্বারা অবগত হইয়াও পাছে অর্জু-
বিজ্ঞান কর্ম্মযোগের বিরূপাবক হয়, এই
আশঙ্কায় তাহা সাধারণে প্রচার দ্বারা জীবের
অকল্যাণ সাধন করিয়া যান নাই।

পরিশেষে বক্তব্য, ইউরোপীয় মনতত্ত্ব (১)।
পাঠ করিয়া, আত্মজ্ঞানী ত্রিকালদর্শী ঋষি-
দিগের বাক্য অবহেলা করা যু তাহাতে
সন্নিহান হওয়া আমাদের কর্তব্য নয়।
জড়ের আলোচনার নিয়ত রত থাকিয়া এবং
চতুর্দিকে জড়ের মাহাত্ম্য দেখিতে দেখিতে
আমাদের মস্তিষ্ক অড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে।
তাই এই সহজ কথাটা বুদ্ধিগত হয় না যে,
ঋষি নামে আখ্যাত বেদবেত্তাগণ কখন মিথ্যা
বা অহিত কথা প্রচার করিয়া যাইতে পারেন
না, বা জ্ঞান ধর্ম্ম সৎকারী গুরুতর ব্যাপার
সমূহে গলিভরের ভ্রান্ত অজ্ঞতকল্পনাশক্তির
পরিচয় দিয়া বাহাহুরী লাভার্থে শাস্ত্রাধি-
প্রণয়ন করেন নাই।

ঐচ্ছ্যশেখর বসেন।

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ।

বঙ্গের পণ্ডিতকুল-চূড়া মহামহোপাধ্যায়
চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় আর ইহজগতে
নাই। গত ২০শে মাঘ, বুধবার, পূণ্যতীর্থ
বারাণসী বঙ্গে প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের
দেহত্যাগ ঘটিয়াছে! মৃত্যু-কালে তাঁহার
বয়স ৭৪ বৎসর হইয়াছিল।

বঙ্গের সংস্কৃত শাস্ত্রের ইতিহাসে চন্দ্রকান্তের
নাম চিরস্মরণীয় রাখিবার যোগ্য। আজ
তাঁহার অভাবে সংস্কৃত শাস্ত্রের যে গৌরব-
মুকুট ধসিয়া পড়িল, তাহা কত কালে পূর্ণ
হইবে, কে বলিতে পারে?

ময়মনসিংহ জেলায় অন্তর্গত সেরপুর
নামক স্থান সেরী নদীর উপর প্রতিষ্ঠিত।
সেরপুর এক দিকে যেমন কলমর্দিনি স্রোত-
স্বিনীর মুহুমন্দ প্রবাহে উর্ব্বর, নিবিড় পত্র

বিটপী-শ্রেণীর বন সন্নিবেশে প্রকৃতির কান্তি
যেমন মনোহর, শিফা, দীক্ষা ও সভ্যতার
আলোকে ময়মনসিংহেব মধ্যে তেমনি প্রেত।
সেরপুরের সুবিখ্যাত চৌধুরী বংশ তথু জন্মি-
বার নহেন; তাঁহারা মাতা প্রকৃতি দেবীর
যোগ্য সন্তান—তাঁহারা একান্ত মনে মাতৃ
পূজায় নিরত। সেরপুরের চৌধুরী বংশ তাবুক
এবং কবি। ইংহাবা লক্ষ্য ও সরস্বতীর সাধক
বলিয়া বিখ্যাত। সেই সেরস্বতীর কুলে
সেরপুরের মণিরাজির মধ্যে ভগবান "চন্দ্রকান্ত"
মণির সৃষ্টি করিয়াছেন।

চন্দ্রকান্তের পিতামহ মানকোন্স হইতে

* Western psychology ব্যাভূতে মোটা কথা
ছাড়া অন্য কথা আদৌ নাই।

t Gullivar

সেরপুরে আসিয়া বাটী নির্মাণ করেন। ইঁহারা রাঢ়ী শ্রেণীর শাণ্ডিল্য গোত্রীয় উচ্চ বংশজ ব্রাহ্মণ। চন্দ্রকান্তের পিতার নাম রাধাকান্ত সিন্ধাকান্ত-বাগীশ। পিতার নাম রাধাকান্ত বলিয়াই আচার্য্য ম্যাক্সমুলর চন্দ্রকান্তকে শোভাবাজারের বিখ্যাত পণ্ডিত শঙ্করচন্দ্র-প্রণেতা রাধাকান্ত দেবের পুত্র বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।

চন্দ্রকান্ত বাল্য ও কৈশোরে লেখা পড়ায় ভাবী কালের কোনও স্তম্ভ চিহ্ন প্রদর্শন করিতে সক্ষম হন নাই। প্রভূত তাঁহার উত্তর কালে গভীর তমসাক্ষর ভাবিয়া রাধাকান্ত বিমনা হইতেন। প্রায় চতুর্দশ বৎসর বয়সে চন্দ্রকান্তের প্রতিভার উৎস খুলিয়া যায়।

পিতার মৃত্যুর পর তিনি বিক্রমপুর ও মনসীপে শ্রুতি ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ ২০ বৎসর বয়সে তর্কালঙ্কার উপাধি গ্রহণ করেন।

সেরপুরে নিজ বাটীতে টোল বা চতুশ্চাঠী স্থাপন করিয়া চন্দ্রকান্ত অধ্যাপনা করিতেন। এই ভ্রমে তিনি গোভিল গৃহস্থের ভাষ্য রচনা করেন। এই ভাষ্য পাঠ করিয়া কলিকাতার পণ্ডিত-সমাজ চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইলেন। এ ক্ষেত্রে চন্দ্রকান্ত মল্লিনাথ অপেক্ষা অল্প যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করেন নাই। বিখ্যাত প্রস্তুতবিৎ পণ্ডিত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কতিপয় প্রধান বঙ্গদেশজনের ঐকান্তিক আগ্রহে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জুবিলী উপলক্ষে তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন ও ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজের কার্য্য ত্যাগ করেন।

সংস্কৃত কলেজে অবস্থান কালে তিনি ছাত্রের মত দিবারাত্র জ্ঞানার্থে বর্ণিতেন। তাঁহার কলসে তিনি সাহিত্য, অলঙ্কার, শ্রুতি, দর্শন, বেদ, বেদান্ত, দর্শন প্রভৃতিতে অসামান্য পাণ্ডিত্য লাভ করেন। এই সময়েই তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমূহ রচনা করেন। তিনি অবিশ্রান্ত অধ্যয়ন করিতেন এবং অনবরত গ্রন্থ রচনা করিতেন। তাঁহার গ্রন্থ সমূহ তুলনায় কোন স্থান অধিকার করিবে, তাহা যোগ্য ব্যক্তি আলোচনা করিবেন।

চন্দ্রকান্ত বালকের জ্ঞান সরল ছিলেন। তিনি কখনও কাহাকেও রুদ্ধ ভাষা প্রয়োগ কবিতেন না। তাঁহার মত নির্মল চরিত্র সাধু পুরুষ প্রায় দেখা যায় না।

শেষ অবস্থায় কলেজ ছাড়িয়া তিনি খ্রীঃগোপাল বসু মল্লিকের প্রদত্ত বেদান্তদর্শনের প্রবন্ধ রচনার জন্য বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা হাবে পঁচিশ হাজার টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ই় সকল প্রবন্ধ “ফেলোশিপের লেকচার” নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে কবিত্তে তাঁহার রাজ-বন্দা বোগ জন্মে। এই বোগেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুব পূর্বে তিনি বিখ্যাত জনৈক মাদোয়ারীর নিকট যে চিঠি লিখেন, তাহা হিতবানীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

চন্দ্রকান্ত নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অপ্রকাশিত গ্রন্থও আছে। ভরসা করি, তদীয় পুত্রগণ তাহা প্রকাশ করিবেন।

১। ব্যাকরণ—শিক্ষা (বাক্যলা) সত্যবতী চন্দ্র (বাক্যলা) কাতন্ত্রঃছন্দ প্রক্রিয়া (কলাপ-ব্যাকরণের অ-পূর্ব প্রকাশিত বৈদিক অংশ)।

২। নাটক—সত্যপরিণয়, কৌমুদী-স্বধাকর।

৩। খণ্ডকাব্য—প্রবোধটক, বুঝাও-
প্রশস্তি, আনন্দ-ভরঙ্গী, ভাষ্য-পুষ্পাঞ্জলি ।

৪। মহাকাব্য—চন্দ্রবংশ ।

৫। অলকার—অলকারস্থ ।

৬। স্থিতি—গোভিল গৃহস্থ-ভাষ্য,
শ্রীকৃষ্ণ-ভাষ্য, গৃহ সংগ্রহ-ভাষ্য, উদ্বাহট্টা-
লোক, শুদ্ধচন্দ্রালোক ।

৭। দর্শন—মহর্ষি কনাদ প্রণীত বৈশে-
ষিক সূত্রের-ভাষ্য, কুম্ভমাজলির টীকা, তবা-
বলী, ফেলোসিফের লেকচার, ৫ খণ্ড ।

যে কয়েক জন শিক্ষিত ব্যক্তির অন-
গ্রহণে মরমুনুসিংহ জগতের সমস্ত সুপরিচিত,
তদ্ব্যতীত চন্দ্রকান্ত সর্বপ্রচেষ্টা, এক কথা বলিলে
অবিচার হয় না । তৎপরে মিঃ আনন্দমোহন
বহু মহাশয়ের নাম । হায়, আজ ছই মহা-
শূন্যই মরমুনুসিংহ অলকার করিয়া, কে জানে
কোন অজ্ঞাত রাখে চলিয়া গিয়াছেন !

শ্রীকুম্ভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ।

পাণ্ডব বংশ ।

প্রতীপ

শান্তহ + সত্যবতী = চিত্রাঙ্গদ ও

বিচিত্র বীৰ্য্য + অধিকা ও অশালিকা =

ভীষ্ম
সত্যবতী + পরাশর = বৈশ্যায়ন + } গুতরাষ্ট্র
বিধবা অধিকা ও অশালিকা + } ও পাণ্ডু

দাসী + বেদব্যাস = বিদুর

কুন্তী + (স্বর্ঘ্য ও পাণ্ডু)

কুন্তী + স্বর্ঘ্য = কর্ণ

কুন্তী +
ও মাত্রী } + পাণ্ডু =

কুন্তী + (ধর্ম, বায়ু ও বাসব)

= যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও অর্জুন

মাত্রী + অশ্বিনীকুমারদ্বয় = নকুল
ও সহদেব

অপদী + পঞ্চপাণ্ডব

পরাশর + সত্যবতী = বৈশ্যায়ন]

দাস রাজ কন্তা ।

“তৎপত্নী সত্যবতী পিতৃ গুহ্যায় ।

করিত নাবিক কার্য্য নদী বহুনায় ॥”

এই সময় রূপবতী সত্যবতী যৌবনে পদা-

র্পণ করিয়াছেন, বধা—

“এক দিন আমি মম প্রথম যৌবনে—

গমন করিয়াছিলাম যে তরী বাহন ॥”

তখন পরাশির মুনি “নদী পার হইতে

আসিয়া সেই স্ত্রীকে দর্শন মাত্র

“হে কল্যাণি কুমি মম, কাম কর উপশম ।”

এবং “পবে মুনি নিজবসে লইয়া আমার ।”

ক্রীড়িল অনঙ্গ ক্রীড়া, উপজিল তার—বৈশ্যায়ন ।

শান্তহ + সত্যবতী = চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্র বীৰ্য্য]

মহারাধ শান্তহ যুগয়ার যমুনা তীরস্থ

অরণ্যে প্রবেশ পূর্বক অতীব মনোহর

সৌরভে উন্নত হইয়া শৌরভাহুসন্ধানে প্রবৃত্ত ।

এ হেন সময়ে বনকুমার সত্যবতীর দর্শন

পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন—

“শান্তহ প্রেত তুনি কন্তা ৬০০ কর ।

আপনার মঙ্গল হউক মঙ্গলময় ॥

মহারাজ আমি ছই বাসের হুহিতা ।

দাসগণ অধিপতি আমার বেশিতা ॥

পিতার নিরোগে ধর্ম সাধন কারণ ।

“যমুনার করি আমি করণী বাহন ॥”

ও “সত্যবতীর পরিচর্য্য পাইয়া,” “বিবাহ

কামনা রাখা করি মন মনে ।” দাস-রাজের

নিকট প্রমাণ করিলেন—

“দাস রায় ! তোমার কৃত্তার মোর সনে ।

বিভা দিতে ইচ্ছা তুমি কর কিনা মনে ॥”

‘এই প্রভাবে স্বীকৃত হইয়া দাস রায় সত্যবতীকে সম্প্রদান করেন । এই সংযোগের ফল চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীৰ্য্য ।

বিধবা অধিকা ও অশালিকা + ব্যাসদেব =

ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু]

চিত্রাঙ্গদ যৌবনের পূর্নাঙ্কে গন্ধর্ব্ব হস্তে নিহত ও বিচিত্রবীৰ্য্যের সন্তানাদি হইবার আগেই মৃত্যু মুখে পতিত হইলে ভারত বংশ রক্ষা দেতুন সত্যবতী বড়ই কাতরা হইয়া ব্যাসদেবকে বলিলেন “তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র” অতএব—

“অতিমত পাত্র তুমি ইথে বাছাধন ।

সে দৌহার গর্ভে কর পুত্র উৎপাদন ॥”

মাতৃ আজ্ঞার বিলুপ্ত প্রায় ভারত বংশের রক্ষা মানসে ব্যাসদেব অধিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, অশালিকার গর্ভে পাণ্ডু এবং দাসী গর্ভে বিহুরের জন্ম দিলেন ।

কুন্তী + (বর্ষ, বায়ু ও বাসব) = যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন

মাত্রী + অশ্বিনীকুমারদ্বয় = নকুল ও সহদেব]

মহারাজ পাণ্ডুর উৎপাদিকা শক্তি থাকিতে ও মৃত্যু ভয়ে কোম জায়াতে উপগত হইতেন না ; বধা—

“তদবধি এক দিনো আপন জায়াতে ।

উপগত না হ’তেন পাণ্ডু কোন যতে ॥”

সুতরাং পাণ্ডু পত্নিদগকে আজ্ঞা দিলেন—

“কুন্তি ! তুমি মম উদ্ধারের তরে ।”

পুত্র উৎপাদন কর আপন উদরে ॥”

পতির আদেশে কুন্তী বর্ষ দ্বারা যুধিষ্ঠির, বায়ু দ্বারা ভীম, বাসব দ্বারা অর্জুন ও মাত্রী অশ্বিনীকুমারদ্বয় দ্বারা নকুল ও সহদেব নামক পুত্রগণের উৎপাদন করাইয়াছিলেন ।

কুন্তী + বর্ষা = কর্ণ]

কুন্তীর অবিবাহিত অবস্থার পুত্র কর্ণ ।

দ্রুপদী + পঞ্চ পাণ্ডব ।

পাণ্ডব বংশ তখনকার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বংশ ছিল । সেই শ্রেষ্ঠ বংশে (১) যৌবন বিবাহ, (২) বিবাহেব পূর্বে সন্তান প্রসব, (৩) কেবট কৃত্তার গর্ভে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পুত্র উৎপাদন, (৪) অবিবাহিত অবস্থার সন্তান হইলে পব বিবাহ, (৫) বিধবার গর্ভে ভাণ্ডার কর্তৃক পুত্র উৎপাদন, (৬) স্বামী বর্ত্তমানে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ সংযোগে পুত্র উৎপাদন, (৭) দ্রাব বহু পতি প্রভৃতির অভিনয় হইয়াছিল । যখন সেই শ্রেষ্ঠ বংশে অত উদার নীতির আদর ছিল, তখন আমরা অবশ্যই ভাবিতে পারি যে, ঐ রূপ নীতি তখনকার সকল সম্প্রদায়স্থ বংশেই ছিল । যদি তাহ হয়, তবে তখনকার শোণিতাংশ আমাদের সমাজ শরীরে বর্ত্তমান । যদি সেই শোণিতে আমবা হইয়া থাকি, তবে আমাদের এত বাধাবাধি কেন ? সেই মহান উদার ভূমি হইতে বর্ত্তমান অহুদার ভূমে আসিয়াছি বলিয়া আমরা বীৰ্য্যহীন । বীৰ্য্যহীন জাতি পবদলিত ।

শ্রীদেবনারায়ণ বোম্ব ।

বৃন্দাবন ।

‘কি দেখিব, সৰ্বপরিবর্তনকারী কালে,
কোন্ কীর্তি অক্ষয় রাখিয়াছে ? বাহা ছিল,
ভাঁহাও অবোধ মানব কেহ না বুঝিতে পারিয়া,
কেহ বা ভাসিক ভাবে আশ্রয়তপ্তির জন্ত,
কেহ বা আপন ভাবে প্রাচীন কীর্তি বক্ষার
জন্ত এবং ন্যায়ম ব্যবসাদারগণ স্বার্থ সাধনের
জন্ত সব বিনাশ করিয়া ফেলিয়াছে । বৃন্দাবন
আর সে সাধন-কানন নাই ;—সেই অশিক্ষিত
মনোহর স্বাভাবিক স্বর-লহরীতে, কুমক বাল-
কের বা গোষ্ঠের রাখানের বজ্রগানে উদ্ভাসিত
বা মনোহর বেণু-বাদনকারী কদম বৃক্ষ-
বোহী রাখাল বালকের বিহার-ভূমি নাই ! কি
দেখিব ?

বৃন্দাবনে সে বন নাই,—স্থান-সুগত মৃৎ
প্রস্তরে, কঠোর প্রস্তরবাশিতে, ধাতুময়-
প্রস্তুত নান ব-নির্মিত হস্তাশ্রয় দেখিবার জন্ত
কেহ বৃন্দাবনে আইসে না । তজ্জন্ত বৃহৎ সহব
সকল রহিয়াছে । যে সকল নিকুঞ্জ বন বলিয়া
বিখ্যাত, তার কোথায় সে সকল নিকুঞ্জবন ?
‘তথায় কলিকাতা কি বড় সহরের অট্টালিকা-
বাসীদিগের টবে রক্ষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষভার
জায় বন, সকল বিরাজ করিতেছে ; সেত বৃন্দা-
বন নহে, সে বিলাতে Hot-house পূর্ণ কৃত্রিম
বাগিচা । তথায় সরল রাখাল বালকের পরি-
বর্তে কতকগুলি প্রতারক গায়ে ভক্তচিহ্ন
ধারণ করিয়া নানাভাবে সরল দর্শকগণকে
মোহিত করিয়া নিজের মাধুকরীর বোণাড়
করিতেছে এবং সঙ্গীর ব্রজবাসী অধু-নিফ্রমণের
অনন্ত কোণে লোককে প্রতারণা করি-
তেছে । হায়, এই কি সেই বৃন্দাবন ?

সর্বাঙ্গেকা পুতুল খেলাই এদেশে প্রবল
হইয়া সকল উচ্চ অঙ্গের সাধন-রাজ্য বিনাশ
করিয়াছে । বালক পুতুল খেলে, কিন্তু বই
খরিলেই পুতুল ছাড়িয়া দেয় । বালিকা পুতুল
খেলে, কিন্তু সংসার ধায়াই পুতুল ছাড়ে । কিন্তু
এই সকল সাধন-রাজ্যের বালক বালিকাগণ
কতকগুলি আশ্রয়িত মূর্তিধারা নিজের
চুপ্তিগাত করিতেছে । এই পুতুল খেলার
ভারত মাটি হইয়াছে । ইষ্টদেবের নামে পুতুল,
ঈশ্বরের নামে পুতুল, মহাপুরুষের নামে পুতুল,
ব্যবসায়ের নামে পুতুল, ভক্তের নামে পুতুল,
হায়, এত পুতলকে ভারতকে মাটি করিয়াছে !
সে কি পুতল ? বালিকার হাতে গড়া শিব যেমন
শিবও নহে, য়ানও নহে, এ তাঁহাই । ভক্ত-
গণ ধৃত যে, এত পুতল খেলারই মনকে ভুলাইয়া
বাখে । তাঁই বলিতেছি, কি ভাবিয়াছিলাম,
আর কি দেখিলাম ! ভাবিয়াছিলাম, সম্বন্ধ-
রক্ষিত-ব্রহ্মকুন্তলবন সকল স্বাভাবিক সৌন্দর্যে
শোভিত হইয়া, প্রাচীন স্থান সকলে বেদী কি
অষ্ট চিহ্ন রক্ষিত হইয়া দর্শকগণকে বলিবে,
এই স্থানে আদ্য পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ রাখাল সঙ্গী-
গণের সহিত গো-রক্ষণ করিয়াছিলেন, এখানে
ক্রিয়াবিহার করিয়াছিলেন ; এখানে সমবয়স্ক
বালিকাগণের সহিত নানাপ্রকার হাসি
তামাসা রঙ্গ করিয়াছিলেন, এখানে ব্যাঘ্র-
ভীতিগ্রস্ত সঙ্গীগণকে ব্যাঘ্র বধ করিয়া নিউর
করিয়াছিলেন, ইহা ‘সেই স্থান, যেখানে
শ্রীকৃষ্ণ বালা-বীরকে বালিকগণ ও গো-
পোষিকাগণকে মোহিত করিয়াছিলেন, যেখানে
তিনি নিজের মধুর বৃত্তাবে সকল সঙ্গবাসী

নরনারীকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। ভাবিয়া
হিলাম সেই সকল স্থান, মানবহৃদয়ের কৃত্রিম-
গঠনে বিনষ্ট না হইয়া স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে
রক্ষিত হইতেছে। তথায় দর্শকগণের কোতুহল
ঝাড়াইবার অস্ত্র লিখিত কিম্বা জ্ঞানী লোক
কর্তৃক বর্ণিত বিষয়ে সকল পূর্বস্বত্তি রক্ষা
করিতেছে। কিন্তু তাহার কিছুই নহে।
যদি গঠিতমূর্ত্তির দ্বারা বিচার করিতে হয়,
তবে বোধ হয়, কৃষ্ণের ন্যায় কুৎসিত পুরুষ
ও স্নায়ু জ্ঞান কুৎসিতা স্ত্রী অগতে নাই।
এই সকল মূর্ত্তি দেখিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিলিপট-
নিবাসী মানবের জ্ঞান বিকৃত চক্ষু, দেহ, মুখ
বিশিষ্ট মানবগণ কি প্রকারে ভক্তির চিত্ত
অন্বৰ্ণন করিতে পারে? স্তম্ভরাং পুত্তলই
বুঝাবন স্ত্রীটি করিয়াছে।

অথচ পুত্তল লইয়াই হিন্দুর সব। মথুরায়
গিয়া ভাবিলাম, সেই প্রকাণ্ড উচ্চ মল্লভূমি
সমস্তে রক্ষিত হইয়াছে, দেখিব, যেখানে ত্রিকৃষ্ণ
মল্লযুদ্ধে কংসকে বিনাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু
কি দেখিলাম? প্রকাণ্ড দৈত্যাকার কংস, আর
পঞ্চবর্ষবয়স্ক অতি কোমল, অতি মুহু ছইটী
শিশু সেন দর্শকগণের দ্বারা আকর্ষণ করি-
তেছে, সিংহের নিকট ক্ষুদ্র ইন্দুরের জ্ঞান,
সেই প্রকাণ্ড দৈত্য সহজেই শিশু ছইটীকে
পাঁচ অঙ্গুলীতে বিনাশ করিতে পারে। এই
রূপ অযোগ্য কবিতাহীন মূর্ত্তিতে সকল তীর্থ-
স্থান পরিপূর্ণ। আমি প্রকার চক্রে দেখিতে
গিয়াছিলাম অন্ধভক্তি আমার নাই, দেখিয়া
একটুও সন্তুষ্ট হইলাম না, বরং জন্মের পোষিত
শুকের ভাব সব বিনষ্ট হইয়াছে। ভক্তির মূর্ত্তি
এ দেশে একরূপ কেন? দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক প্রাণ্ড
বালকদ্বয়কে কংসের সমান রূপে গঠিত
করিলে কি যৌবন হইত? শারীরিক বলে

এই ছই বালক কোন মতেই এই কংসের
কিছু করিতে পারেন না; এবং মশকের জ্ঞান
সিংহের নাসারুদ্ধে প্রবেশ করিয়া তাহার
জীবনান্তের জ্ঞান কোণলের কথা শাস্ত্রে লিখিত
নাই। কি দিয়া যে আশাদের ভক্ত হিন্দুগণ
তীর্থ দর্শনে পবিত্রীকৃত করেন, বুঝি না।
চিআংশে, কল্পনাংশে, ভাকর কার্য্যে যে
জাতি এইরূপ স্বত্তিরক্ষা করিতেছে, তাহার
অতি নিকট শ্রেণীর, সন্দেহ নাই। ভক্তের
মনের ভক্তি এ সকলের অনধীন থাকিলে
উদ্ধার হইতে পারে, কিন্তু ইহা কর্তৃক চালিত
হইলে তাহাদের পরজন্মে নিগ্রো বেশে অন্ন-
গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। কেবল এখানে
নহে, যেখানে যেখানে এই মূর্ত্তি রক্ষিত হয়,
সেখানেই এইরূপ অবস্তা শিল্প বিভ্রাট। অগম্য
দেবের যে ছবি উড়িয়ায় বিক্রীত হয়, সে
যদি অগম্যথের মূর্ত্তি হয়, তবে অগ-
ম্যথ, বলরাম শুভদ্রাকে পূজা করিব না।
শাস্ত্রে কি এমন কথা আছে যে, অগম্যথ,
বলরাম, শুভদ্রার জ্ঞান কুৎসিত স্ত্রীভা
অগতে কখনও অন্নগ্রহণ করে নাই? যদি
তাহা হইত, কোন মতে ভাবিয়া লইতাম,
সে পুরুষ ও নারীকে দেখিতেছি। কিন্তু
যদি আদর্শ সৌন্দর্য্যের এই মূর্ত্তি ও এই চিত্র
হয়, তবে ভক্ত যে কোট নরকের উপযুক্ত
হইতে পারেন, আমি বুঝি না।

তাই বলিতেছি, পুণ্ডের জ্ঞান নির্জীব,
পুত্তলের জ্ঞান নিশ্চেষ্ট ও পুত্তল পূজার মুগ্ধ
হিন্দুর যে বর্ত্তমান অধোগতি হইয়াছে, ইহা যে
কোন পণ্ডিত ব্যক্তি এই পুত্তল পরিপূর্ণ ভাবে
আসিয়া অনুভব করিতে পারেন।

ঐয্যারীশকর দাস গুপ্ত।

প্রাচীন মূর্তি শিল্প :

পূর্বে ভারতে মূর্তিশিল্পের কিরূপ উৎকৃষ্ট আদর্শ ছিল, তাহা সম্যকরূপে অবগত হইবার এখন আর কোনও উপায় নাই, কারণ মুসলমানগণের প্রাচুর্য্যাবে শিল্প বিস্তার এই প্রধান অঙ্গটি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

মুসলমান নরপতিগণ বজ্রশিল্প, চিত্রশিল্প ও তাঁহাদের অভিমতানুযায়ী স্থাপত্য শিল্পাদি কার্য্যে, শিল্পিগণকে ধ্বংস নানা প্রকারে পুরস্কৃত ও উৎসাহিত করিতেন, প্রাচীন স্থাপত্য কিম্বা মূর্তিশিল্পের প্রতি তৎক্ষণাৎ কিছুই করেন নাই। বরং প্রাচীন দেবমন্দির ও দেব প্রতিমা সকল ধ্বংস করা, তাঁহাদের অনেকেরই একটা নিত্য কর্ম্মের মধ্যে ছিল। এই রূপ বহবাব নির্ধর্ম ও কঠোর অত্যাচারের ফলে প্রাচীন দেবমন্দির ও দেবমূর্তি সমূহের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন স্থাপত্য ও মূর্তিশিল্প বহুদিন হয় অতীতের অন্ধকার-গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

মুসলমানগণের ভয়ে লুক্কায়িত, প্রাচীন দেব প্রতিমা বহুই একটা অন্ধত অবস্থায়, এখন বাহা জলাশয় কিম্বা ভূগর্ভ হইতে উদ্ধৃত হইতেছে, তাহার কোন কোনটাই পরিচাত্তর্য্য দেখিলে একবারে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তখন সার্থ সত্যই মনে হয়—এ সোণার ভারতে কিরূপই অভাব ছিল না। সে কালে যাহা ছিল, এখন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বুঝি তাহা বংশতঃশের এংশং ও করা যায় না।

বঙ্গাঙ্গার প্রাচীন রাজধানী রামপালের ভূগর্ভ হইতে সপ্রমাণিত এই প্রেণীর এক রক্ততমর বাহুদেব প্রতিমা উত্তোলিত হইয়াছে। এই মূর্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে, প্রসঙ্গতঃ রাজধানী রামপালের একটুকু বিবরণ এখানে প্রকাশ করা আবশ্যিক :

• রামপাল পূর্বে বঙ্গাঙ্গার বিক্রমপুর মধ্যে অবস্থিত। পালবংশীয় বৌদ্ধরাজাদিগকে পরাস্তব করিয়া, মহারাজ আদিশূর এখানে রাজধানী সংস্থাপন করেন। পুণ্ড্রোত্তর বঙ্গাঙ্গা-ঠানে কালকূজ হইতে পঞ্চরাজ্য আনয়ন উপলক্ষে তিনি এই রামপালের নাম চিরস্মৃতি

দীর্ঘ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী সময়ে এখান উত্তরাধিকারিক্রমে সেনবংশীয় রাজত্ব-গণের হস্তগত হয়। তাঁহারাও এখন সুদীর্ঘকাল রাজপাট সংস্থাপন করতঃ স্বাধীন রাজত্বের স্থাপত্য করিয়াছিলেন।

• অপরদীর কাল প্রভাবে রাজধানী রামপালের পূর্বে গোরবের এখন কিছুই নাই। মাত্র,—রাজা বঙ্গালসেনের স্বাক্ষরিত বৃহৎ পরিখা ও রামপাল দিঘীর সুবিদ্যুত খাত অতীতের সাক্ষ্য স্বরূপ বর্তমান রহিয়াছে। আর ব্রাহ্মণগণের আনীর্ণাদে পূর্বস্বীকৃত সেই গজারি বৃক্ষ এখনও বহু সংখ্যক নরনারী দ্বারা প্রত্যহ আর্জিত হইতেছে।

রামপাল বলিয়া এখন যে স্থানটুকু প্রসিদ্ধিত হয়, তাহা একটা ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র। পুরাতন রামপালের বহু অংশ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া বহু কাল হইতে বিভিন্ন নামে বর্তমান রামপালের চতুর্পার্শ্ব প্রায় রূপে পরিচিত। এই সমস্ত গ্রামের কোন কোন স্থান খনন করিলে স্বর্ণ, রৌপ্য, স্নায়বান নানা প্রকার প্রস্তর, প্রাচীন সময়ের ইটক-নির্মিত প্রাচীর, গৃহভিত্তি, পাবাগমর দেবমূর্তি প্রভৃতি বাহিন হয়। এই ভাবে বাহুদেব, কাভ্যারনী সূর্য্যদেব প্রভৃতির ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আর তিন শত প্রাচীন মূর্তি উত্তোলিত হইয়াছে।

আমাদের আলোচ্য এই মূর্তি খানিও মূর্তিকা খনন উপলক্ষে উদ্ধৃত হইয়াছে। মূর্তিটি চাদি রূপার নির্মিত। নিয়ে বেদী, বেদীর সম্মুখে গরুড় কর্ণধোড়ে উপবিষ্ট, পঞ্চাঙ্গাগে চালী। বেদীর উপরে শম্ব চক্র গদা পদ্ম ধারী চতুর্ভুজ বাহুদেব দণ্ডায়মান। বাহুদেবের মস্তকে কিরীট, দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। চালী সমেত মূর্তিটির দৈর্ঘ্য ১১ ইঞ্চি, প্রস্থ ৪ ইঞ্চি, ওজন ১১৬ তোলা। এই প্রকার ক্ষুদ্রাবয়বের মধ্যে যেরূপ গঠন-নৈপুণ্য ও হস্ত কারুকার্য্য, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ঢাকার বিখ্যাত প্রাক-প্রধান শিল্পিগণ ইহা দেখিয়া প্রাচীন এই মূর্তি শিল্পের তুণ্ডো-ভূয়ঃ প্রশংসা করিয়াছেন। আর এরূপ হস্ত কারুকার্য্য ও গঠন-নৈপুণ্য দেখাইতে

“তাঁহারা সম্পূর্ণ অক্ষম বলিয়া, সকলই মুক্ত-
কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। এই মূর্তি পাঁচ
সহস্র বর্ষা দ্বারা ক্রম করিতেও কেহ কেহ
উৎসুক ছিলেন। মূর্তিটা এখন ইণ্ডিয়ান
মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে।”

“এই মূর্তি সম্বন্ধে গত ১৩১৬ সনের
জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বোণেজনাথ
কণ্ঠ মহাশয় “বিক্রমপুরে প্রাপ্ত রক্তত নিশ্চিত
বিষ্ণু মূর্তির বিবরণ” নামক একটি প্রবন্ধ
প্রকাশ করিয়াছেন। উহার এক স্থলে—

“এসিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষগণের
নিকট ইহা প্রথমে প্রেরিত হইয়াছিল, তাঁহারা
ইহাকে মহারাষ্ট্রীয় শিল্প বলিয়া এবং ৮০০।
১০০০ শত বৎসরের পূর্বে নিশ্চিত, এইরূপ
মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।”

এইরূপ নির্দিষ্ট লেখক নিজেই আবার
ইহার একটুকু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

“আমাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার কিন্তু তাঁহা-
দের এ উক্তি যথার্থ বলিয়া অনুমিত হয় না।
কারণ ইহা সহিত মহারাষ্ট্র শিল্প অপেক্ষা
মাজাজ অঞ্চলের দেবমূর্তি সমূহেরই অধিকতর
সোসাদৃশ্য অনুভূত হয়। যাহারা দক্ষিণ
ভারত ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারাও বোধ হয়
চিত্রদৃষ্টে আমাদের এ মন্তব্য অগ্রাহ্য করিতে
পারিবেন না।”

এই প্রকার লেখার কিম্বা মন্তব্য প্রকা-
শের তাৎপর্য্য কি, আর কি স্মৃতিই বা লেখক
—তাহার এই বিবরণ সংগ্রহ কবিতে সমর্থ
হইলেন, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি-
লাম না। কারণ মূর্তিটা এসিয়াটিক সোসাইট

এই সমস্ত চেষ্টা বিগ্রহ যেন প্রাচীন সময়ের
শিল্পগণকৃত এবং মহারাষ্ট্র আদিপুত্র কিম্বা
সেনবংশীয় নরপতিগণের প্রতিষ্ঠিত ছিল,
তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সময়ান্তরে
রাজধানী রামণালের ইতিহাস একটু বিস্তৃত-
কারে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীতরুণীকান্ত চক্রবর্তী সরস্বতী।

টিতে প্রেরিত হইলে, সোসাইটির সেক্রেটার
শ্রমশিল্প বিভাগের স্পারিটেণ্ডেন্ট শ্রীযুক্ত
I. Henry Burkill, M. A. মহোদয় যে
অভিমত প্রদান করেন, তাহাতে “ইহা মহা-
রাষ্ট্রীয় শিল্প” কিম্বা ইহা “মাজাজ শিল্প নয়”
এমত কোন কথাই উল্লেখ নাই, মাত্র
দক্ষিণাত্য শিল্প বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়া-
ছেন। সকলের অবগতির জন্য তাঁহার
অভিমতের অংশটুকু আমরা এস্থলে উদ্ধৃত
করিলাম—“The Statue appears to
be about 100 150 years old and
looks as of Southern India work-
manship.”

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই—বার্কিল
মহোদয় যে ইহা ১০০ হইতে ১৫০ বৎসরের
মধ্যে নিশ্চিত বলিয়াছেন, তাহা আমাদের
নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ
মূর্তিটা যে ইহা অপেক্ষা আরও পুরাতন
সময়ের, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ বর্তমান রহি-
য়াছে। সময়ান্তরে রাজধানী রামণালের
ইতিহাসের সঙ্গে এ সম্বন্ধে সমস্ত আলো-
চনা করিবার বাসনা রহিল।

প্রবন্ধ লেখক।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কবিতা ।

পাঁক চাই ।

(১)

ধর্মস বদন, জীবের বদন, চক্ষে পড়ে তাই !
হৃদয় হুঁটে রক্ত ছুটে, অধীর হ’য়ে বাই !
হাসি, স্নেহ, মনের স্নেহ, যদি কেহ যায়,
দেখি তাঁ’রে পরাণ ভরে প্রফুল্ল হিয়ার ॥

(২)

এ সংসারের ঘুরে কি’রে, দেখি’ বৃদ্ধের জালা
কঁদে মরি হরি ! হরি ! হৃ’সন্ধ্যা হ’বেলা ।
আবার দেখা, শিশুর কথা, মধুরভাস ।
আ’সে কানে পোড়া আঁশে, কৃতজ্ঞ হয় ॥

(৩)

অনাগরে, সকাতির, যখন কেহ কঁদে,
যমের শিকল, ক’রে বিকল আমার যেন বাঁধে ।
ক্ষীর শর, বহুতর, দানা মাগন যায়,
এমন লোকে দে’খে’চোখে, হৃদয় জুড়ায় ॥

(৪)

অতি দীন, বস্ত্রহীন, শীততে কাতর
দেখি বদা, হই তদা, বিহ্বল অন্তর ।
আবার যদি, ভ্রমণের গদি, শাল-দোশালা দেখি,
সেই গরমে, মন-ধরমে, কত বা হই সুখী ॥

(৫)
অতি ক্লান্ত, পথপ্রান্ত, পথিকের ক্রোশ
দেখি যখন চিতে তখন, দুঃখাই অশেষ।
আরাগমেতে, নিরাশ্রিতে, দেখিলে মন
হৃদয় মম, দুঃখ ক্রম, হৃষ্ট দেহ মন ॥

(৬)
মোহাপন্ন, মতিচ্ছন্ন, অদাড়া কুপণ
দবশনে, পরশনে, হারাই চেতন।
দানশীল, অনাবিল, কুপার গৌসাই
নর নারী, যদি হেরি, প্রেমে গ'লে যাই ॥

(৭)
অনাচারে, পাপ ভারে, হেঁটমুণ্ড হেরি
"হারতে যাতনাতে সারা হ'রে মরি।
পুণ্যবান, ধর্মপ্রাণ, সমুদ্রত মনা
দেখিতে দেখিতে হই আক্লাদে আটখানা ॥

(৮)
ত পিতৃ: করুণা-সিন্ধু! পতিত-পাবন!
অথমে, এই তিক্তা দাও নারায়ণ,
জাবের হৃৎথেতে হৃৎথে স্থখী হৃৎথী হ'রে
তব পদে স্থান পাই সত্য লোকের গিরে ॥

(৯)
একা নাহি যে'তে চাই সবে মি'লে যা'ব,
বরঞ্চ সবাব শেষে আনন্দে পৌছিব।
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম "অপেক্ষা-সাধন";—
ক্রমে তু'লে দিয়ে সবে শেষেতে গমন ॥

(১০)
যত ভাই পারে যা'বে, দেখিয়া হাসিব,
বাচ তু'লে হরি ব'লে প্রোমতে নাচিব।
মুখের আর কেহ বাকী না বহিবে যে'তে
তখন নিশ্চিন্ত মনে উঠিব নাথেতে ॥

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

সুগলমূর্তি।

শুনি দুঃখ জলদেব গভীর আস্থান,
ছাড়া আসি সৌদামিনী মিশে যায় বৃকে,
কুন্দ তটিনীর শুভ্র স্রোতঃ বেগবান
দিল্লবকুলে লুটি যুগ্ম গুণ শত মুখে।
কোটা ভূজ প্রসাবিয়া দীপ্ত সৌরকর
কমঠ পৃষ্ঠক নীলী দর্পণ উরসে
কেন্দ্রে কেন্দ্রে ভূত হয় হৃদয়তব,
দ্রুতগ বাননা যথা ভূপ্তিব পুরণে।
দূর বনে হয়েছিল সুবলীর ধ্বনি,
সবরেছিল কপ্ত বকে শ্লোপ বালিকার,
তাহ নীপতকমলে প্রেম উন্মাদিনী,
শোভিছে নীলাকিবুকে ফুল জ্যোৎস্নাহার।
সুদীর্ঘ আকাঙ্ক্ষাময় বিরহাবসানে,
অনন্ত মিলন আজ ভক্ত-ভগবান ॥

শ্রীকৃষ্ণনাথ ষোড়শ।

করুণা।
জীবনের প্রান্তে এসে একি দেখি মাঝে?
অবশ অক্ষয় যত ইন্দির-নিচর;
বুঝিনা কোন্ পথে যায় দিবা-রাত;
মনে হেন হয় বিশ্ব পাইরাছে লর।
বাহিরে আঁধার বোর, নীরব কুবনী;
কিছু হেরি অন্তরের অন্তরালে ঘীরে
প্রকাশিছে তব উষা-বিমল বরণী,
কনক-কিরণ ঢালি আশ্রা-গৃহ-শিরে।
শ্রীমণীকৃষ্ণনাথ ষোড়শ।

সোণার ভারত।
চরণ চুম্বিয়া চকলে চলে
চির চকল সিন্ধু,
সোণার এদেশে সোণার জ্যোছনা
বিতরেন সদা ইস্রু।
শৈল বিরাজে মন্তকোপরি
মাথার মুকুট হেন,
বিধাতা ইহারে-স্বরগ সম্পদে
ভূষিত করেছে বেন।
চারি গাইছে বীরত্ব গীতি,
অতুল মহিমাময়,
এ সোণার দেশে বেদসঙ্গীত
এখনও গীত হয়।
এরি দর্শন—মোহিয়া অগত
স্বপ্ন করেছে সবে,—

আমার দেশের মতন দেশটী
নাই আর এই ভবে।
যদিও মোদের কীর্তি লুপ্ত
যদিও হুগু মোরা,

তবুও মোদের জ্ঞানের আলোক
সারাটা পৃথিবীভাড়া।

আমাদের জ্ঞানে এ বিশ্বে জ্ঞান,
আমাদের ধানে এ বিশ্বে ধান,
আমাদের গীত ছনিয়ার গীত,

কিসে বা আমরা হীন,
আজ নর বোরা পরপদনত
আজ নয় পরাধীন।

মনে থাকে বেন জননী মোদের
শ্রেষ্ঠ স্বর্গ হতে,

তাহলে আমরা পড়িব না আর
পাপ-পরিপূর্ণ-শ্রোত।

মনে থাকে বেন এদেশে মোদের
সোণার শৈলী কর।

আমাদের সোণা ছড়ান রয়েছে
সারাটা ভূবন বোড়া।
শ্রীকৃষ্ণনাথ ষোড়শ।

শ্রীত ও বসন্ত

“ভদ্র সব, শীত কহে বসন্তের ডাকি—
“মদৈর মতন করি” সাঁঝ ও ধরার !
বেধা তুমি বাও আমি সেধা না হি থাকি ।
আবার আসিতে হ’বে, এখন দিয়ার !
এক ব্রত বোহাকার তোমার আমার ।

নূত বসন্ত এ রহত বুঝিবারে ন্যূরে ;
আমি ভাবি, তাই তুমি আস গড়িবারে ।
‘ভাবা’ গেলে চলে ‘গজ’রবে নাক আর,
ভাবা গড়াতেই গড়ে নিরিল-সংসার ।”
শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

৭২। নুতন বাবু। নুতন নক্সা। শ্রীহরি মোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এই সামাজিক নক্সাখানি পড়িয়া, সুখী হইলাম। সুচিন্তিত এবং সুলিখিত। ইচ্ছা কর্তে এক শ্রেণীর লোকের বিশেষ শিক্ষা হইবে। বদেনী কাগজ ।

৮০। অমর। শ্রীহেমচন্দ্র সেনগুপ্ত বি-এ, প্রণীত। কালিদাস, ভবভূতি হইতে আরম্ভ করিয়া কালিদাস পর্যন্ত ১১ জন অমর ভারত-সজ্ঞানের কথা পক্ষে লিখিত। লেখা সরস এবং সুসজ্জিত। পড়িয়া তৃপ্তি হইলাম। বদেনী কাগজ ।

৮১। চাঁদের ঢালাকি। ঐ গ্রন্থকাব। মূল্য এক পয়সা। গল্প পণ্ডের উপযোগী ভাবলহরী নিবন্ধ। লেখার বেশ পারিপাট্য আছে। বদেনী কাগজ ।

৮২। শিখ। দৃষ্টকথা। শ্রীবিপিন বিহারী নন্দী প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ১০। বাঙ্গালা ভাষা আগিতেছে, ইহা স্বরণে বাঁহাদের হৃদয় উৎফুল্ল হয়, তাঁহারা এইকুদ পুস্তক খানি একার পাঠ করুন। শোণিতাদরে এ পুস্তক লেখা—পড়িতে ২ প্রাণ উকা হয়—দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হয়—কি জানি কেন, এক অজানা অপ্রশ্ন প্রেমে হৃদয় পূর্ণ হয়।

৮৩। চাকুবালা। গার্হস্থ্য উপন্যাস। শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র প্রণীত। মূল্য ১০। নুতন হাতের নুতন লেখা হইলেও গ্রন্থকারের ভবিষ্যতের আশা উজ্জল। এ পুস্তকের লিপিতাত্ত্ব্যে প্রশংসনীয়।

৮৪। বোকার বই। শ্রীমোহিনীমোহন বসু প্রণীত, মূল্য ১০। ছেলেদের অত্যন্ত রচিত এই পুস্তকখানি বেশ সুন্দর হইয়াছে। বিলাতী কাগজ ।

৮৫। কুদারী। (উপন্যাস) শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস, এম-এ, বি-এল প্রণীত, মূল্য ১। পাকা হাতে লেখা—পড়িতে বহুবিস্তৃত, পাঠে উপভোগ্য হইবে। পরিসরাজিত বাঙ্গালা

ভাষা বাঁহারা ভাগবাসেন, এই গ্রন্থ তাঁহাদের চিত্ত বিনোদন করিবে। বদেনী কাগজ ।

৮৬। সাবিত্রী-চরিত। শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম-এ প্রণীত, মূল্য ১০। বাহিরের চাক চিক্য নাই,—কিন্তু হৃদয়ে কবিতার সাদৃশ্য চবিত্ত বিবৃত। সাধু লোকের জন্ম-পুত্র-চরিত্রে অতি সুন্দর ছুটিয়া বাহির হইয়াছে। বিধাতা আশীর্বাদ করুন।

৮৭। সিদ্ধ-গৌরব। শ্রীকুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ প্রণীত। জোবেদী, কাশেম এবং মর্জিনার চিত্র অতি সুন্দর হইয়াছে, চক্ষের জল সঞ্চার করা যায় না। নীরব গভীর ভালবাসার অপূর্ণ কাহিনী। পুস্তক খানিপড়িয়া সুখী হইলাম। কিন্তু হায়—বিলাতী কাগজে মুদ্রিত। ইহা সিদ্ধ-গৌরবের অমার্জ্জনীয় কলঙ্ক।

৮৮। মস্তকের মূল্য প্রভৃতি। শ্রীসরোজ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১০। ১০টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প। লেখকের লিপি-চাতুর্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়, অল্প অল্প কথায় অনেক চিত্র বেশ ফুটিয়াছে। গ্রন্থকারের ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল।

৮৯। The Mission of the Brahmo Samaj, by Pandit Sivanath Sastri, Price As. 12 only

কল্প সাধু ব্যক্তি, জন্মের এই অভিব্যক্তি, অথবা সরল উক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিকট-পরীক্ষায় অটুট না থাকিবার হইলে পাঠ করিয়া আমরা বড়ই উপকৃত হইব। সংক্ষিপ্ত, অগচ্ছ ধারাবাহিক ইতিহাস, শকাব্দার নাই, ভাব কুহেলিকা নাই, অমার্জ্জিতের কুচি নাই;—কিন্তু উদারতা এবং নিরপেক্ষতার কিছু কিছু অভাব আছে। ব্রাহ্মধর্মের মূল ভিত্তি কি?—তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিতে পারেন নাই। এ সকল ঘোষ সত্ত্বেও আমরা বিধিত্তে বাধ্য—একটি সরল বিবৃতি-দীর্ঘকাল চাড়া নাই। বদেনী কাগজ ।

